ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

(১৩২৩ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০] ভারতী কার্য্যালয়, [বার্ষিক মূল্য ৩।৵০
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আশীর্ব্বাদ

ভারতীকে গড়িয়া তুলিলাম কিরূপে, এইকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি ভারতীকে কতটুকু গড়িয়াছি বা না গড়িয়াছি তাহা ত আমি জানি না, ভারতী যে আমাকে 'এই আমি' করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, ইহাই আমি জানি।

পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানস-তনয়া, কল্পনালব্ধা ভারতী; সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাঁহার বরপুত্র, আমার সাধ্য কি যে আমি তাঁহাকে গড়ি। তাঁহার সেবার অধিকার পাইয়াছিলাম ইহাই আমার সৌভাগ্য।

পূজার আয়োজনে ফুলমালা হইতে রত্ন-মালা গাঁথিয়াছি; জানিনা, সে ফুল পারিজাত বা অপরাজিতা, সে রত্ন হীরকমণি বা কঙ্কর, —সে বিচার আজি তোমরা কর; ভারতীকে মাল্যভূষিত করিয়া আমি যে আনন্দ লাভ করিয়াছি আমি শুধু তাহাই জানি।

ভারতীর নব-আবির্ভাব দিনে পূজা করিতে আসিয়াছেন যত নবীন পূজারি; তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের গুরুর আসনে বসাইয়া আমার নিকট হইতে শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। স্বল্প-সন্তানের জননী আমি, ভারতীর প্রসাদে শত-সন্তানের মাতা হইয়া [illegible]াকে কৃতার্থ, ধন্য বোধ করিয়াছি। এখনো তাঁহাদের নিকট আমার গুরুর অধিকার অচল অটল কিনা তাহা জানি না; একদিন যে তাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ মাতৃ-সম্বোধনে হৃদয় গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, আমি শুধু তাহাই জানি।

কত সময় পূজার উপচার যোগাইতে না পারিয়া দুঃখে কষ্টে অবসন্ন হইয়াছি; তখন কত অযাচিত বন্ধু আমার সহায়তায় অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা অনেকেই আজি আর ইহলোকে নাই, কিন্তু তাঁহাদের সেই অকৃত্রিম প্রীতি-সহায়তা আমার হৃদয়মন এখনো স্মৃতিপূর্ণ করিয়া আছে —চিরদিনই থাকিবে, আমি ইহাই জানি।

আজিও আমার আনন্দের দিন। দেখিতেছি ভারতী-মন্দিরে পূজারির আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। মণিভূষণে দেবী মনোমোহিনী-রূপ ধারণ করিয়াছেন।

হে নবীন পূজারি, তোমার কথা—ভাবে ভাষায়, তোমার গাথা—ছন্দে বন্ধে, তোমার বীণা—রাগে মূর্চ্ছনায়, তোমার গান—সুতানে সুলয়ে, ভারতীর পত্রে পত্রে ঝঙ্কার শিহরণ তুলিয়া বঙ্গের সাহিত্যাকাশ অপূর্ব্ব যশঃ পূরিত করুক, প্রবীণ পূজারির এই আশীর্ব্বাদ লইয়া নববর্ষে নবউদ্যমে, নব অনুরাগে তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ কর।

[illegible] পাঠিয়ে দি[illegible]দেবী।

নব বার্ষিকী

তব যাত্রা শুভ হোক; বান্ধব আমার,
অরুণের তরুণ কিরণ শ্রান্ত ললাটে তোমার,
প্রভাতের আশীর্ব্বাদ দিক্ বারম্বার !

উন্মেষিত কমলের আনন্দ সৌরভ,
বিকাশের আগমনী, জাগিবার একান্ত গৌরব
তোমার অন্তরে দিক্ তৃপ্তি অভিনব।

নিশীথের বিদায়ের সিক্ত পুষ্পাঞ্জলি
ঝরুক আতপ্ত শিরে, নেত্রে আলো উঠুক উজলি,
কল গীতে পূর্ণ হ'ক স্তব্ধ বনস্থলী !

পিছনে পড়িয়া থাক্ নিশার কালিমা,
অশ্রুভরা মর্ত্ত্যব্যথা, আকাশের অমর নীলিমা
সম্মুখে দেখাক্ খুলি অপার মহিমা !

যে আনন্দে ক্ষোভ ক্ষতি লোপ হয়ে যায়,
যে আলোকে সব ছায়া ত্রস্ত পদে চকিতে মিলায়,
সে সম্পদ লভ' সৌম্য,—প্রাণ মোর চায় !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কবির নীড়

স্নেহাস্পদেষু

কি-সূত্রে ভারতীর জন্ম হল, আমার জীবন-স্মৃতিতে, সেটা সংক্ষেপেই বলেছি বটে। অনেক দিন হল; সব কথা আমার এখন মনে নেই। তবে, কি রকম আব্-হাওয়ার মধ্যে, কি রকম পরিবেষ্টনের মধ্যে ভারতীর জন্ম হয়, তার একটু আভাস তোমাকে দিতে পারি।

সে সময়ে নব-রত্নপরিবেষ্টিত আমাদের সাহিত্য-বিক্রমাদিত্য, বঙ্কিমচন্দ্র, "বঙ্গদর্শনে"র সিংহাসনে আসীন হয়ে বঙ্গ-সাহিত্যের রাজ্যে একাধিপত্য করছিলেন। আশ-পাশের আকাশে দুই তিনটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, কবিতার কিরণধারা বর্ষণ করছিলেন। বঙ্গদর্শনের প্রতিভা-প্রভাবে অর্দ্ধ-সুপ্ত বঙ্গ-সাহিত্য আবার জেগে উঠেছিল। মৃতকল্প হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম খুব একটা নাড়া পেয়েছিল। আমাদের বাড়ীতেও এই সময় কাব্য-রচনার, গান-রচনার সাহিত্যালোচনার খুব ধুম পড়ে গিয়েছিল। আমার তখন পূর্ণ যৌবন। মন উৎসাহ উদ্যমে, আনন্দ উল্লাসে পূর্ণ। সৌন্দর্য্যরস, কবিত্বরস উপভোগের জন্য আকুল। একটা অনির্দ্দেশ্য আকাঙ্ক্ষা মনকে দখল করে বসেছিল। "কিছু-একটা করতে হবে"—কিন্তু সে কি তা আমি জানি না। —তা দেশের হিতসাধনই হোক্ আর সাহিত্যের উন্নতিসাধনই হোক্! নানা প্রকার কল্পনা আমার মনে উদয় হত কিন্তু সে-সব অনেক সময়ে কল্পনাতেই অবসান হত।

আমি তখন আমাদের যোড়া-বাড়ীর তেতালায় বাস করতুম। সে

ঘরের সংলগ্ন একটা লম্বা ছাদ আছে, তাত তুমি জান। সেই সময়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টবে পোঁতা ঝাউ, নারকেল প্রভৃতি উদ্যান-সুলভ খুব বড় বড় গাছ একটা নিলামে কিনেছিলুম। সেগুল নীচের বাগানে না রেখে, ছাদের উপরে * উঠিয়েছিলুম। গাছগুল কোথাও বা কুঞ্জের মত পুঞ্জীকৃত করে, কোথাও বা সারি-সারি সাজিয়ে, কোথাও বা লতা-বিতান তৈরি করে, ছাদটাকে একটা উদ্যানে পরিণত করেছিলুম। আর, কোকিল, পাপিয়া, দোয়েল, শ্যামা, ভীমরাজ প্রভৃতি সকল রকম গায়ক বিহঙ্গ আমার ছিল। তাদের কলকূজনে, কুহুতানে, ঝঙ্কারে ছাদটা অষ্টপ্রহর মুখরিত হত। আর, নানাপ্রকার সুরভি-ফুলের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হত। জায়গাটা ভারতী-সেবার পক্ষে কেমন অনুকূল হয়ে উঠল তা ত বুঝ্তেই পারচ। কত জ্যোৎস্নাময়ী মধু-যামিনী আমরা এই ছাদে কাটিয়েছি।

আমি তেতালায় যে-ঘরটিতে বস্তুম, সেখানে একটা গোল টেবিল, তার চারিধারে খানকতক চৌকি। আর দেয়ালের গায়ে একটা পিয়ানো ছিল। রবি আমার নিত্য সঙ্গী (বালক-কবি তখন জগৎ-কবি হন নি), আর-এক কবি, আমার বাল্যবন্ধু অক্ষয় মধ্যে মধ্যে এসে জুট্তেন। আমরা তিন জনে যখন একত্র এই টেবিলের চারিধারে বসতুম, কত গাল্-গল্প হত, কত কবিতা পাঠ হত, কত গান বাজনা হত, গান রচনা হত, তার ঠিকানা নেই। পাখীর গানে যেমন ছাদটা মুখরিত হত, এই দুই কবি-বিহঙ্গের গানে ও কবিতা-পাঠে বৈঠক-খানাটাও তেমনি প্রতিধ্বনিত হত।

একদিন প্রাতে এই টেবিলে বসে আমরা সাহিত্যালোচনা করচি—কি-শুভক্ষণে আমার হঠাৎ মনে হল,—এই দুই কবি-বিহঙ্গ কেবল আকাশে-আকাশেই উড়ে বেড়াচ্চে, ওদের মধুর গান আকাশেই বিলীন হয়ে যাচ্চে। লোকালয়ের কোন কুঞ্জ-কুটীরে ওরা যদি আশ্রয় পায় কিংবা একটা নীড় বাঁধ্তে পারে, তাহলে কতলোকে ওদের স্বর-সুধা পান করে কৃতার্থ হয়। এই কথা মনে হবা মাত্র, দোতালায় নেমে এলুম!

দোতালার দক্ষিণ-বারণ্ডায় আর-একটি প্রবীণ বিহঙ্গরাজের আসন ছিল। আসনটি জমিতে থাক্লেও তিনি স্বপ্নরাজ্যেই উধাও হয়ে অষ্টপ্রহর বিচরণ করতেন। তাঁর সুললিত অপূর্ব্ব স্বরলহরীতে আমাদের সবাইকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। বুঝ্তেই পারচ তিনি কে। আমার প্রস্তাব শোনবা মাত্রই তিনি রাজি হলেন, আর তখনি দেবী "ভারতী"কে আবাহন করে তাঁরই পুণ্যকুঞ্জে, নবীন কবি-বিহঙ্গদের জন্য একটি নীড় বেঁধে দিলেন। সেই অবধি দেবীর পূজা অর্চ্চনা হয়ে আস্চে। কিছুকাল পরে, দেবীর হাতের বীণাটি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়, তারপর এখন আবার সেই স্বর্ণ-বীণাটি মণি-ভূষণে ভূষিত হয়েছে। একেই বলে "মণি-কাঞ্চনের যোগ"!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* কিছুকাল পরে, ভারী-ভারী টবের ভারে ছাদটা জখম হবে এইরূপ আপত্তি ওঠায় ও আশঙ্কা হওয়ায় আমি সেই গাছগুল পালিত-সাহেবকে উপহার-স্বরূপ পাঠিয়ে দি[illegible]

তখন ও এখন

ভারতী চল্লিশ বছরে পড়িল। এই সাময়িক পত্রের নৌকাখানি সময়ের স্রোতে যেদিন প্রথম ভাসানো হইল, সেদিন আমার বয়স ছিল ষোলো। চাণক্যের মতে তখন আমার চুপ করিয়া থাকিবার অবস্থা ছিল। কিন্তু তাঁহার উপদেশটি আমি যেমন হেলা করিয়াছি এমন আর কেহ নহে।

মানুষের পক্ষে চল্লিশটা বছর বড় কম নয়। ইতিমধ্যে নিজের পরিচয়-দেওয়া এবং জগতের পরিচয়-নেওয়ার মেয়াদ প্রায় শেষ হইয়া আসে। সংসারে যত-রকমের উমেদারি আছে—ধন মান বিদ্যা স্নেহ প্রীতির—সবই প্রায় চুকিয়া যায়—শিখার পালা শেষ হইয়া ছাইয়ের পালা আরম্ভ হইতে থাকে। অর্থাৎ এই চল্লিশ বছরের মধ্যে মানুষের জীবনটা হাউয়ের মত জ্বলিতে জ্বলিতে উপরে উঠবার পর্ব্ব শেষ করিয়া নিবিতে নিবিতে নীচে নামিবার পর্ব্ব সুরু করে। জীবন যে একটা অনিশ্চিতের মুখে রওনা হইয়াছিল তাহার শেষ-সীমানায় ঠেকিয়া নিশ্চিতের মুখে যাত্রা করিতে থাকে—তাহা সেই নিশ্চিত পরিণাম, যাহার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ আপন বিশেষত্ব ত্যাগ করিয়া পঞ্চত্ব লাভ করে।

এই সাময়িক পত্রের খেয়া নৌকাটি প্রথম-ভাসানের দিনে আমরা যাহারা দাঁড়ি-মাঝি ছিলাম আজ আর-একবার কলম হাতে আমাদের তলব পড়িয়াছে। সেদিন-কার কথা কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে।

রূপকথায় শুনিয়াছি রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন সকাল বেলায় উঠিয়া যার মুখ দেখিবেন তারই সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিবেন। কন্যাদায়-হরণের এটা সোজা রাস্তা—যারা কুঁড়ে মানুষ তাদের পক্ষে এই রাস্তাই ভালো। আমিও ভাবিলাম যে-কথাটা সব-প্রথমেই মনে আসিবে সেইটে দিয়াই লেখা সুরু করিব। নিজেকে ঠেলা মারিয়া বলিলাম যে কথাটা মুখে আসে বলিয়া ফেল।

মুখে এই আসিল, আজ চল্লিশ বছর আগে দৈবক্রমে আমার বয়স ছিল ষোলো, এবং সেই-সময়ে দৈবাৎ আমার গুরুজনদের খেয়াল গেল তাঁরা ভারতী বাহির করিবেন। দৈবক্রমে সমস্তই অন্যরকম হইতে পারিত—দৈবক্রমে সে-সময়ে আমি না জন্মিতে পারিতাম, দৈবক্রমে ভারতী বাহির করিবার কথা কাহারো মনে না আসিতে পারিত।

মনে করা যাক্ আজকের দিনে আমার বয়স ষোলো, এবং আজ ভারতী প্রথম বাহির হইতেছে। তাহা হইলে সমস্তটাই অন্যরকম কিছু হইত এ-কথা বলাই বাহুল্য।

সেই চল্লিশ বছর পূর্ব্বে দেশের মনটা ছিল অনেক-বেশি কাঁচা। লেখক কাঁচা, পাঠক কাঁচা, সাহিত্য কাঁচা। ঠিক সেই সময়ে আমি যে ষোলো বছরে পড়িয়াছিলাম এ আমার ভারি সুবিধা ঘটিয়াছিল।

তখনকার কাঁচা বুদ্ধিতে যাহা আসিত তাহাই কাঁচা কলমে লিখিতে বসিলাম;

মনে ভয়-ডর-মাত্র ছিল না। কোনো কড়া লোকের কাছে এ-সম্বন্ধে যে বিশেষ একটা জবাবদিহি আছে এ-ভাবটাই যেন দেশের কোনোখানেই নাই। ভারতীতে যাঁহারা বালকের সেই লেখাগুলি বাহির করিলেন তাঁহারাও দিব্য নিশ্চিন্ত। জগতে তখন যেন কর্ম্মফলের নিয়মটা অত্যন্ত ঢিলা ছিল।

তখনকার দিনে, পাঠকরা যে আছে, এটা খুব স্পষ্ট করিয়া যেন দেখা যাইত না, এই জন্য ভয়-লজ্জাটা মনে ছিল না। তখনকার গৃহস্থ ঘরের উৎসবে যে-খুসি যেমন-তেমন সাজ করিয়া বা না করিয়া আঙিনায় গিয়া জড় হইতে সঙ্কোচ করিত না—কিন্তু এখনকার কালের নিমন্ত্রণ-ক্ষেত্রে তেমন অবাধ-প্রবেশও নাই স্বচ্ছন্দ-সঞ্চরণও সম্ভবপর নয়। সাহিত্য-উৎসবেও তখনকার কালের সঙ্গে এখনকার কালের সেই তফাৎ ঘটিয়াছে। তখনকার দিনের সেই ষোলো বছরের অর্ব্বাচীনটা নিশ্চয় এখনকার কোনো যজ্ঞেই স্থান পাইত না।

তখনকার দিনে পাঠক-দলকে বিশেষ সমীহ করিবার দরকার ছিল না এটা ভালো কি মন্দ সে তর্ক করিব না—আমার বলিবার কথা এই যে, এই সুযোগটুকু না হইলে লিখিবার বদ্-অভ্যাসটা বাল্যকাল হইতে আমাকে পাইয়া বসিত না—অতএব এ-সম্বন্ধে আমার যত-কিছু অপরাধের জন্য আমি একলা দায়ী নই।

অল্পবয়সেই মাঝে মাঝে দর্শকসাধারণের সম্মুখে, বাল্মীকি প্রতিভা প্রভৃতি নাট্য আমাকে অভিনয় করিতে হইয়াছে। অথচ আমার স্বভাবটা লাজুক ছিল। সুবিধা ছিল এই যে, আমি চোখে কম দেখিতাম। দর্শকদের কারো মুখ দেখিতে পাইতাম না, সমস্ত যেন একটা লেপা রং। ইহাতে অসঙ্কোচে অভিনয় করা আমার পক্ষে সহজ ছিল।

তখনকার পাঠকরাও সেই-রকম অস্পষ্ট ছিলেন। তাঁরা ইব্‌সেন, মেটারলিঙ্ক, অয়কেন, ব্যর্গসঁ, বার্ণার্ড শ, আনাটোল ফ্রাঁস পড়িয়াছিলেন কি না কিছুমাত্র বুঝা যাইত না। তাই ষোলো বছরের মূঢ় লেখকের পক্ষে সেটা সত্যযুগ ছিল। আমার দাদার এক ভিংরাজ পাখী ছিল, সে হাঁচি কাশি দরজা বন্ধ করার শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বিড়াল কুকুর কাক কোকিলের ডাক পর্য্যন্ত সমস্ত এত উচ্চস্বরে নকল করিত যে অন্য খাঁচার দোয়েল শ্যামা বেচারাদের একেবারে মুখ বন্ধ করিয়া দিত। সেই চল্লিশ বছর আগে আমরা যখন একটু-আধটু ডাক আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন কাছা-কাছির মধ্যে কোনো ভিংরাজ ছিল না।

অর্থাৎ, যাকে ডারুয়িন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলিয়াছেন সেই নিয়মটা বঙ্গসাহিত্যে পূরাপূরি জোরে চলিতে সুরু হইবার পূর্ব্বেই দৈবক্রমে আমি ষোলো বছরে পড়িয়াছিলাম, এবং দৈবক্রমে ঠিক সেই-সময়ে ভারতী বাহির হইয়াছিল। এই শাসন-শৈথিল্যের মধ্যে মানুষ হইবার যা ভালো মন্দ তা আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কঠোরতা শৈশবের ঘাড়ে যাতে চাপিয়া না পড়ে এজন্য মা-বাপকে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয়। বাহিরের ঘা

না বাঁচানো যায় ত সে বাঁচেই না। এই জন্য সকল সাহিত্যের ইতিহাসেই স্বভাবত দেখা যায় যে সাহিত্যের যখন কিশোর বয়স তখন সমালোচকের আবির্ভাব হয় না। যাহা কচি তার উপরে ক্রমাগত নজর-দেওয়া বা হাত-দেওয়া ভালো নয়।

এখন প্রশ্ন এই, বাংলা সাহিত্যকে কি আমরা পাকা বয়সের সাহিত্য বলিতে পারি? না পারি না। এখন ইহাকে ঘের দিয়া বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে—ইহার কচি ডালপালাগুলোকে গোরু ছাগল দিয়া মুড়াইয়া খাইতে দিলে যে ইহার উপকার হইবে এমন কথা আমি মনে করি না।

এই জন্য আমার মতে বাংলা সাহিত্যে কঠোর সমালোচনার দিন আসে নাই। যে লেখা ভালো বলিতে পারিব না তার সম্বন্ধে চুপ করিয়া যাইতে হইবে।

অথচ দেখিতে পাই বালক বাংলা সাহিত্য যেন অভিমন্যুর মত সপ্তরথীর হাতে চারদিক হইতে কেবলি বাণ খাইতেছে। না, সপ্তরথী বলাও ভুল—কেননা বীরের হাতের মারও নয়। ছোট ছোট সমালোচকের ছোট ছোট খোঁচা তাহাকে হয়রান করিয়া মারিতেছে। দিল খুলিয়া প্রশংসা করিবার ইচ্ছাটুকু কোথাও দেখা যায় না।

যেমন দেখা যায় তরকারিকে স্বাদু করিবার শক্তি যাহাদের নাই তারা সকল রান্নাতেই খুব কষিয়া লঙ্কামরিচ প্রয়োগ করে তেমনি সাহিত্যিক রান্নায় যাদের হাতে আর কোনো মসলা নাই তাদের কথা কিছু সংগ্রহ করিয়া মৃতকল্প হি...

অথচ এই সহজ কথাটা সকলেরই জানা উচিত সাহিত্যে এবং অন্যত্র সৌজন্যই সৌজাত্যের লক্ষণ। কটুকাটব্যের জন্য বিশেষ শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন হয় না, তাহা হাটে মাঠে সর্ব্বত্র দেখা যায়। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে অসৌজন্যের কোনো লজ্জা নাই ইহাতে স্বজাতির জন্য লজ্জা বোধ করিতে হয়।

বাংলা সাহিত্যের জন্য সৌজন্যের চেয়ে আরো বেশি কিছু চাই, তাহা স্নেহ। স্নেহের লক্ষণ এই, তাহা বর্ত্তমানের অসম্পূর্ণতাকেই বড় করে না, তাহা ভবিষ্যতের আশার প্রতিই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করে। যে জিনিষ কাঁচা, যার বাড় ফুরায় নাই, এই স্নেহ, এই ভবিষ্যতের আশ্বাস, তার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক। যে বাড়িয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ যার শক্তির পরিচয় তার বর্ত্তমানেই, প্রধানতঃ ভবিষ্যতে নহে, স্নেহ তার পক্ষে অনাবশ্যক ও অনিষ্টকর।

সমস্ত অপরিণতির মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও গৌরব অনুভব করিবার শক্তি আমাদের থাকা চাই,—ভালো বলিতে পারিবার আনন্দ যদি আমাদের মনে না থাকে, যদি মন্দ বলিবার উৎসাহই যখন-তখন ছোবল মারিতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করে তবে এমন নির্ম্মমতার পথে বঙ্গসাহিত্যের কোনো কল্যাণ দেখি না।

ভাষা আপনার সম্পূর্ণ শক্তি এবং সাহিত্য আপন পূর্ণতার আদর্শ একদিনেই পায় না। যতদিন না পায় ততদিন তাহাকে অবজ্ঞা যে করে সে নিজে অন্ধ



অন্ধ বাউল

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ

ও অক্ষম। আমাদের সাহিত্যের মধ্যে একটি অসামান্য শক্তি আছে, সে শক্তি প্রমাণ করা যায় না, অনুভব করা যায়। বাংলায় যে-রচনা সকল-দেশের ও সকল-কালের তাহা সংগ্রহ করিলে দেখা যায় সংখ্যায় বেশি নহে, কিন্তু আমাদের সাহিত্যের এখন সেই দশা যখন ওজন করিয়া গুন্‌তি করিয়া তার গৌরব প্রমাণ করা যায় না। যার হৃদয় আছে ও সত্য দৃষ্টি আছে, সে ভিতর হইতে অনুভব করিতে পারে।

যদি আমরা এই অন্তর্গূঢ় অব্যক্ত শক্তিটিকে সত্য অনুভব করি তবে সাময়িক ও অসাময়িক পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে আমাদের নবীন সাহিত্যকে অহরহ অশ্রদ্ধা করিবার যে অভ্যাস আমরা পাকাইয়া তুলিতেছি তাহা আমাদিগকে দূর করিতেই হইবে। যে শক্তি আমাদের মাতৃভূমির কোলের শিশু ও হৃদয়ের ধন, যাহা তাঁহাকে একদিন বিশ্বসভায় রাজমুকুট পরাইবে, তাহাকে অনেক যত্নে অনেক স্নেহে সমস্ত আঘাত বাঁচাইয়া মানুষ করিতে হইবে,—সমস্ত অপরিণতিসত্ত্বেও তাহাকে শ্রদ্ধা করিবার ক্ষমতা আমাদের থাকা চাই। ছোট ছেলের কান মলিতে পারি বলিয়াই তার কানমলা যে মস্ত একটা বাহাদুরি এই বর্ব্বরতা যেন আমাদের মনে না থাকে। ছোট ছেলেকেও যে শ্রদ্ধা করিতে পারে সেই মহৎ।

বাহিরের যতটা শিক্ষা আমাদের রক্তে মাংসে মিশিয়া যায় কেবলমাত্র তাহাই আমাদের সাহিত্যে ভালো করিয়া ব্যক্ত হয়, যাহা আমাদের ভাঁড়ারে স্তূপাকার হইয়া আছে তাহা নহে। আমাদের মুস্কিল হইয়াছে এই যে, আমাদের চিত্তের প্রকাশ যতদূর পৌঁছিয়াছে আমাদের পুঁথির বুলি তার চেয়ে অনেকদূর আগাইয়া গেছে। আমরা পরের সাহিত্য হইতে পড়িয়া থাকি বিস্তর—সেই পড়ার জোরে আমাদের সমালোচক তৈরি হইয়া থাকে,—কিন্তু লেখক ত কেবলমাত্র পড়ার জোরে হয় না, তার হজমের জোর, প্রাণের জোর থাকা চাই। এই জন্য, পড়ার আদর্শ, যাহা বাহিরের, তাহা আমাদের প্রাণের বিকাশের চেয়ে ওজনে অনেক ভারি হইয়াছে। যাহা কেবলমাত্র বোঝা তাহা আমাদের জীবনীশক্তিকে লজ্জা দিতেছে। ভোজে আমাদের পাতে যাহা পড়িয়াছে তাহাকে ভাণ্ডারী তাঁহার বস্তার তুলনায় যদি টিট্‌কারী দেয় তবে তাহাতে ভাণ্ডারীর সুবুদ্ধি বা সহৃদয়তা প্রকাশ পায় না। ইব্‌সেন, বার্ণার্ডশকে নমস্কার করি, যাঁহারা তাঁহাদের বস্তা বহন করেন তাঁহাদেরও যথাযোগ্য খাতির করিব কিন্তু মাতৃভাষা নিজের লক্ষ্মীহস্তের যে অন্ন পরিবেষণ করিতেছেন তাহাকে প্রত্যেক গ্রাসে নিন্দা নাই করিলাম। ভালো যদি নাও লাগে তবে মৌন থাকিতে বলি।

সেই জন্য এই কথাটাই আমার আজ সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়িতেছে যে, দৈবক্রমে চল্লিশ বছর আগে আমি ষোলোয় পড়িয়াছিলাম। যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম তাহা ষোলো বছরেরই যোগ্য, তবু প্রশ্রয় পাইয়াছিলাম। অন্তত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুর তুলিয়া বঙ্গসাহিত্যের জন্য তখন কণ্টকশয্যা পাতা হয় নাই।

তাহার ফল কি হইয়াছিল? দক্ষিণ-হাওয়ার প্রশ্রয় পাইয়া বসন্তে যেমন অজস্র আমের বোল ধরে তেমনি অজস্র লিখিয়াছি। তবু হাজার প্রশ্রয় পাইলেও যাহা ঝরিবার তাহা ঝরে, যাহা ফলিবার তাহা ফলে। অতএব সেই প্রথম মুকুল প্রায় সবই ঝরিয়াছে। কিন্তু সেই অপ্রতিহত প্রাণের উদ্যমটা রহিয়া গেছে।

আমাদের দিনে আরো অনেক লেখক দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের নামও আজ কেহ জানে না। তাঁহাদের দিন যেমন ফুরাইয়াছে অমনি তাঁরা অন্য সকলকে পথ ছাড়িয়া সরিয়া গেছেন। পদে পদে পথের মধ্যে তাঁদের গায়ে পাঁক-ছড়াইবার কোনো লোক ছিল না বলিয়া সাহিত্যের যে লেশমাত্র ক্ষতি হইয়াছে আমি তাহা বিশ্বাস করি না।

সকল সাহিত্যেই প্রশংসাই সমালোচকের গুণের পরিচয়। ভালোর গুণগান দ্বারাই আমরা মন্দকে সত্যরূপে দেখিতে পাই। এই ভালোর গুণ বুঝিতে ও গাহিতে পারায় কেবল বুদ্ধি নহে হৃদয়ের প্রয়োজন আছে। এই জন্যই ভালো সমালোচক সকল দেশেই দুর্লভ।

সত্য ব্রূয়াৎ প্রিয় ব্রূয়াৎ। এ কথাটা বড় কথা। পৃথিবীতে দেখা যায় প্রিয়-সত্যই অধিকাংশ লোকের মুখ দিয়া কোনোমতে বাহির হইতে চায় না। অপ্রিয়-সত্য বলিতে পারি বলিয়া গর্ব্ব করে এমন-লোক রাস্তায় ঘাটে দেখিতে পাই। অন্যক্ষেত্রের কথা বলিতে পারি না কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এই উপদেশটি অমূল্য—

সত্য ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কৈফিয়ৎ

নববর্ষের ভারতীর জন্য একটি লেখা চাইই চাই—আমারও প্রতি এইরূপ একটি নোটিস জারি হইয়াছে। কেন? অপরাধ? না, কিছু দিনের জন্য একসময় আমিও ইহার সম্পাদক ছিলাম। বেশ, হুকুম-নামা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া সেই-কৈফিয়ৎই তবে এখানে প্রকাশ করি, যে-কারণে আমাকেও এই অসম-সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। লেখাটি যদি সুপাঠ্য না হয় ত আমার কিন্তু দায়-দোষ নাই। এ কথাটি আমি আগে হইতেই বলিয়া রাখি।

* * *

ভারতী যখন জন্মগ্রহণ করে তখন যে আমরা খুবই ছোট ছিলাম এ কথাটা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও বোধ হয় চলিতে পারে। তখন সবেমাত্র আমাদের অক্ষর-পরিচয় হইয়াছে। ৺পিতৃদেব তখনও ইংলণ্ডে যান নাই, আমরা থাকি তখন বীডন ষ্ট্রীটের একটি

বাড়ীতে। আমার পূজনীয় নতুন-মামা শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী' বাহির হইবামাত্র পত্রিকাখানি হাতে লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া সহাস্যমুখে মাতৃদেবীর হাতে দিলেন। তাঁহাদের সেদিনকার আনন্দ-উৎসাহের ভাব শিশু-আমাকেও এতটা আনন্দ প্রদান করিয়াছিল যে সেদিনটি আমার মনে একটা শুভদিন বলিয়াই অঙ্কিত আছে।

সাহিত্য-রসে প্রবেশ করা দূরে থাক, তখন বেশ পরিষ্কাররূপে পড়িতেই পারিতাম না। কিন্তু ভারতীর নাগাল পাইলেই পাখীর মত কবিতাগুলি কণ্ঠস্থ করিতে চেষ্টা করিতাম। অর্থ না বুঝিলেও ছন্দে আমি মুগ্ধ হইতাম। শিশুকাল হইতেই—যখন হইতে আমার স্মৃতি আরম্ভ তখন হইতেই—কবিতার প্রতি আমার এই টান। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে সেই সকল কণ্ঠস্থ কবিতার অর্থবোধ যেমন সহজ হইতে লাগিল, অন্যদিকে ভারতীর সহজ সরল প্রবন্ধ ও গল্পগুলি আমাদের পাঠ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপে ভারতী আজন্ম-কাল আমাদের সাহিত্য-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

* * *

যতদূর মনে পড়িতেছে ভারতীর বয়স যখন দুই বৎসর তখন পিতৃদেব আমাদের যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রাখিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। এই সময় রবিমামাও বিলাত যান। আমার বড়মামা পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক ছিলেন নামে, কিন্তু কার্য্যতঃ নতুন-মামা ও রবিমামাই ভারতী চালাইতেন। রবিমামা বিলাত যাত্রা করিবার পর নতুন-মামার স্কন্ধেই সম্পূর্ণরূপে এ ভার পড়িল; তাঁহার একজন প্রধান সহায়ক হইলেন মাতৃদেবী। "দীপ নির্ব্বাণ" ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে রচয়িত্রীর নাম ছিল না। মেজমামা পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদেশে এই বইখানি হাতে পাইয়া ভাবিলেন, নতুনমামার রচনা। তিনি লিখিলেন, "জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?"

'দীপ নির্ব্বাণে'র পর যোড়াসাঁকোয় অবস্থান কালে ২য়-৩য় বৎসরের 'ভারতী'তে মাতৃ-দেবীর 'ছিন্নমুকুল', 'গাথা' 'মালতী' প্রভৃতি রচনা প্রকাশিত হয়। বসন্ত-উৎসবও তাঁহার সেই সময়ের লেখা। যোড়াসাঁকো হইতে কাব্য-নাট্যের সৃজন প্রথম এই 'বসন্ত-উৎসবে'ই। ইংলণ্ডে বইখানি পড়িয়া রবিমামা মাকে যে আনন্দপূর্ণ পত্র লেখেন, বড়ই দুঃখের বিষয়, সে পত্রখানি মা রাখেন নাই। রবিমামা বিলাত হইতে বাড়ী ফিরিবার পর আমাদের অন্তঃপুরে বসন্ত-উৎসবের অভিনয়ও হইয়াছিল।

* * *

তারপর রবিমামা 'বাল্মীকি-প্রতিভা' 'কালমৃগয়া' প্রভৃতি কাব্যনাট্য রচনা ও অভিনয় করেন। এই সময় রবির কিরণে, জ্যোতির জ্যোতিতে, স্বর্ণের দীপ্তিতে বাড়ী আলোকময়। পুরবাসী আনন্দে তাহাতে "করিছে পান, করিছে স্নান"; ভারতীর পাঠকবর্গও বঞ্চিত নহেন। নিত্য সভায় নিত্য নব গান নব সুর নব রচনা—নব-লীলা। বড়রা যা করেন, আমরা ছেলের দল তাহার অনুকরণ করি। বাল্মীকি-

প্রতিভা বড়দের যেমন অভিনয় হইয়া গেল, আমাদের পালা আরম্ভ হইল! স্থির হইল, আগে বড়দের এ বিষয় জানিতে দেওয়া হইবে না। গোপনে সব উদ্যোগ চলিতে লাগিল। ষ্টেজ কোথায় পাওয়া যায়? বাড়ীতে তখন হরিশবাবু নামে একটি পোষা চিত্রকর থাকিতেন। তিনি একলা নহেন, বাড়ীতে আরো কতকগুলি পোষা মানুষ তখন ছিলেন। সরকার, মাষ্টারদের সঙ্গে তাঁহারা দপ্তরখানায় বসবাস করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের কোন নিয়মিত কাজ ছিল না; আসলে বাবুদের মোসাহেবী করিতেন।

আমরা হরিশবাবুকে ধরিলাম যে আমাদের একটি ষ্টেজ আঁকিয়া দিতে হইবে। আমাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা বৃথা! রফা হইল যে ৫০৲ টাকায় তিনি সে কাজটা করিয়া দিবেন। কিন্তু এত টাকা আমরা কোথায় পাই একেবারে? মাসে মাসে জল-খাবারের পয়সা হইতে কিছু কিছু পাইবেন এই বন্দোবস্ত হইল। আমাদের পড়ার ঘরে ষ্টেজ খাটাইয়া অভিনয়ের আয়োজন করা হইল। মাতৃদেবীর জন্মদিনে বড়দের সকলেই সেই ঘরে আমাদের তৈরী জল-পানের নিমন্ত্রণে আসিলেন। অভিনয়ের কথা অগে প্রকাশ করা হয় নাই। তাঁহারা আসিয়া ষ্টেজ দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন, অভিনয় দেখিয়াও আনন্দ লাভ করিলেন। আমার মামা মহাশয় স্বর্গীয় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ষ্টেজের ইতিহাস শুনিয়া হরিশবাবুর দেনা-পরিশোধের ভার লইলেন। হরিশবাবুর কপাল ভাল। আমরা কত দিনে সে টাকা শোধ করিতাম জানি না; এখন পাওনার সঙ্গে বখসিসও মিলিল। বাস্তবিক সে ষ্টেজ হইয়াছিল বড় সুন্দর। "ভারতী"র মলাটে তখন বীণাপাণির যে ছবি থাকিত, আমাদের ষ্টেজের শিরোভাগে অঙ্কিত হইয়াছিল সেই ছবি। ড্রপ্‌সিনে—মধ্যে অঙ্কিত রবিমামার মুখ—আর তার চারদিকে একটি ফুলের মালা—কিন্তু সে ফুল, বাগানের ফুল নয়—নাট্যাভিনেতা ছেলে-মেয়েদের মুখগুলি। আজ সে মালার ফুলগুলি কোন্‌টি কোথায়? যদি যত্ন করিয়া রাখিতে জানিতাম—আজ সে ড্রপসিন অমূল্য ধন!

* * *

ভারতীর ৭ম বর্ষের শেষে আমার পূজনীয়া নতুন-মামী ইহলোক ত্যাগ করিলে মামামহাশয়েরা শোক-মুহ্যমান হইয়া ভারতী ছাড়িয়া দিতে সংকল্প করিলেন। মাতৃদেবী নববর্ষে ভারতী-রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। ভারতী নূতন গৃহে প্রবেশ করিল। পিতৃদেব দুই-এক বৎসর পূর্ব্বেই দেশে ফিরিয়াছেন—আমরা বাস করি তখন কাসিয়া-বাগানে। এই সূত্রে আমরা ভারতীর সহিত ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা-সম্পর্কে আবদ্ধ হইলাম। আমরা আর তখন কেবল ভারতীর পাঠক নহি—লেখকও হইলাম। এই সাত বৎসরের শিক্ষা-দীক্ষায় ভারতী আমাদেরও সাহিত্য-জীবন পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। আমারি নববর্ষের কবিতা-বরিত হইয়া ভারতী আমাদের গৃহে স্বাগত হইলেন।

ওই যে রে কেঁদে হেসে
নববর্ষ নব বেশে
বর্ষচক্রে আরবার আসিল ফিরিয়া;

নয়নে শোকাশ্রুরাশি
অধরে বিদায়-হাসি
ফুলময় আশা-ডালা করেতে ধরিয়া।

ভারতীর ভার মা গ্রহণ করিয়াছিলেন সভয়ে সঙ্কোচে। কিন্তু বৈশাখের ভারতী বাহির হইবার পর যখন মামারা আসিয়া প্রফুল্ল মুখে সার্টিফিকেট দিয়া গেলেন—সাধারণে তাহাতে যোগদান করিলেন, তখন আমরা আশ্বস্ত হইলাম।

* * *

ভারতী হাতে লইয়া মাকে আমার কি অসীম পরিশ্রমই করিতে হইত! ছোট গল্প বড় গল্প ত তিনি লিখিতেনই, হাস্যকৌতুক হইতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পর্য্যন্ত অনেক সময় তাঁহাকে নিজে লিখিতে হইত। ইহা ছাড়া সমালোচনা, অন্যের লেখা নির্ব্বাচন, সংশোধন এবং প্রুফ দেখার কাজত ছিলই; ঘরকন্নার কাজ, লোক-লৌকিকতা—এসবও ত বাদ যাইবার নয়,—তাহার উপর সখী-সমিতির পর্ব্ব!

তখন মাসিক-পত্রের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না—বঙ্গদর্শন তখন বন্ধ, তাহার স্থলে নবজীবন ও প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর্য্যদর্শন, বান্ধব, নব্যভারত প্রভৃতি আরও কয়েকখানির নাম উল্লেখযোগ্য।

এক বৎসর পরে জোড়াসাঁকো হইতে প্রথম 'বালক' পরে 'সাধনা' বাহির হইল। মামাদের নিকট হইতে প্রবন্ধ-লাভের আশাও আর তখন রহিল না। বাহিরের ভাল লেখকের সংখ্যাও অঙ্গুলি-গণ্য। যে দুই চারিজন খ্যাতনামা লেখক আছেন, সকল সম্পাদকই তাঁহাদের লইয়া টানাটানি করেন। ফলে দাঁড়ায় এই,—যিনি সম্পাদক, তাঁহার নিজের লেখা দিয়া এবং তাঁহার দলের লোককে দিয়া লেখাইয়াই কাগজ পূরাইতে হয়। প্রকৃত পক্ষে তখন সম্পাদকের পরিশ্রমের উপরই একান্তভাবে মাসিক-পত্রিকার পরিচালনা নির্ভর করিত।

কাঁচা লেখকের লেখা পাকা করিয়া তুলিতে মা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেন। যে লেখার মধ্যে একটুও ক্ষীর তিনি দেখিতেন, তাহা নীর-বর্জ্জিত করিয়া লইতেন। অনেক সময় এমন হইত যে সংশোধনের পর লেখক বুঝিতে পারিতেন না যে লেখাটি তাঁহার কি না! আজকাল লেখকের সংখ্যা, তুলনায় অনেক বেশী—ভাল লেখা সহজেই পাওয়া যায়; তখনকার দিনের লেখার কষ্ট তাই তোমরা ঠিক বুঝিতে পারিবে না। সে সময়ের অনেক সাহিত্যনবীশ এখন খ্যাতনামা লেখক। এই সময় ভারতীর নিয়মিত লেখক ছিলেন কৈলাস সিংহ, যাদব সিংহ, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

তখন আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে—রাজসাহী হইতে চুঁচুড়ায় আমরা বদলী হইয়াছি—তাই অনেক সময়ই কলিকাতায় আসিয়া থাকি এবং মাকেও যথাসাধ্য সাহায্য করি। আমার প্রধান কাজ ছিল ইংরাজী পুস্তক হইতে 'চয়ন' সংগ্রহ করা। নিজে কবিতা এবং ছোট গল্পও লিখিতাম। তখন আমি স্বামীর নিকট হইতে বিজ্ঞান, দর্শন যাহা শিখিতাম তাহাও মধ্যে মধ্যে অনুবাদ করিয়া দিতাম। আমার ভগিনী সরলার তখন পাঠ্যাবস্থা তাই আমরা ভারতী গ্রহণ-কালে তাঁহার রচনা

পাই নাই। পরে তিনিও মাতার সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সংস্কৃত-সাহিত্যের সমালোচনা ভারতীর উপাদেয় প্রবন্ধাবলী।

মাতৃদেবীর একজন প্রধান সহায়-বন্ধু ছিলেন ৺কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। তিনি প্রায়ই কাসিয়া-বাগানে আসিতেন এবং মাতার রচনা শুনিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেন। বিহারীবাবু মায়ের একজন প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। তিনি বসন্ত-উৎসবের গানগুলি ঠিক তাঁর নিজের রচিত গানগুলির মতই ভাব-বিহ্বলকণ্ঠে গাইতেন। তাঁহার মতে ছিন্নমুকুলের মত উপন্যাস আর বাঙ্গলায় বাহির হয় নাই। মা আমার চিরদিনই নিরভিমান—তিনি কোন প্রশংসায় কোন দিনই চঞ্চল হ'ন নাই। ইহার প্রধান কারণ তাঁহার নিজের আদর্শ তাঁহাকে নম্র বিনীত করিয়া রাখিয়াছে। যে মহোচ্চ আদর্শ তাঁহার মনে আছে—তাঁহার রচনাকে সে শিখরে তুলিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। কিন্তু তিনি গর্ব্ববোধ না করুন—তাঁহার প্রশংসায় গর্ব্ববোধ করিতাম আমরা—তাঁহার সন্তানেরা। আর আনন্দ অনুভব করিতেন আমার পিতৃদেব। মাতার এই সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা সে ত তাঁহারি যত্নের ফল।

৺কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মাতার আর একজন অকৃত্রিম সাহিত্য-বন্ধু ছিলেন। প্রচারপত্র বাহির হইবার পর হইতে লেখক-সূত্রে ইঁহার সহিত আমাদের পরিচয় আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উভয় পরিবারের মধ্যে একটি আত্মীয়তা-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কৃষ্ণধন বাবুর স্ত্রী মাকে দিদি বলিতেন, মা তাঁহাকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ যত্ন করিতেন। মার ধাতটাই স্নেহপ্রবণ; সেজন্য তাঁহার জীবনে বন্ধুতার কখনো অভাব হয় নাই। মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী, সরোজকুমারী, নিস্তারিণী দেবী এবং সুলেখিকা শরৎকুমারী চৌধুরাণী প্রভৃতি সকলেই তাঁহার বন্ধু।

* * *

এই অত্যধিক পরিশ্রমে ১০।১২ বৎসর ভারতী পরিচালিত করিয়া মাতার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। ১৩০১ সালের চৈত্রমাসে একদিন চুঁচুড়া হইতে কাসিয়া-বাগানে আসিয়া দেখি ভারতীর ম্যানেজার সতীশবাবু ভারতীর ভাসান-আয়োজনে ব্যস্ত। ডাক্তার বলিয়াছেন মাকে ভারতী হইতে অবসর গ্রহণ করিতেই হইবে। তাই সতীশবাবু—নববর্ষে আর ভারতী বাহির হইবে না এই মর্ম্মে একখানি মুদ্রিত নোটিস-সহ আগামী বর্ষের অনেক গুলি অগ্রিম মনিঅর্ডার ফিরাইয়া-দিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। কাসিয়া-বাগানে তখন ভারতীর নিজেরই প্রেস ছিল। তাই নোটিস অবাধে অবিলম্বে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। এই আয়োজন দেখিয়া আমার মনে যে কিরূপ আঘাত লাগিল তাহা বর্ণনাতীত। আমি তৎক্ষণাৎ নোটিস বিলি প্রভৃতি বন্ধ রাখিয়া যোড়াসাঁকোয় গিয়া রবিমামাকে সম্পাদক হইবার জন্য ধরিয়া পড়িলাম। তিনি তাহাতে কিছুতেই রাজী হইলেন না, কিন্তু আশা দিলেন যে আমি ভারতীর সম্পাদন-কার্য্য গ্রহণ করিলে তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। অগত্যা তাঁহার খাতা-পত্র ঝাড়িয়া যাহা কিছু পাইলাম তাহা সংগ্রহ করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। মাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য নীলগিরি লইয়া

গেলাম। সেখান হইতে তাঁহাকে মহীশূরে সরলার কাছে রাখিয়া আমি বাড়ী ফিরিয়া ভারতীর ধান্ধায় রহিলাম। এই উপলক্ষে অনেক সময়ই আমার রবিমামাকে আক্রমণ করিতে হইত এবং কোন দিনই প্রায় একবারে শূন্য-হস্তে ফিরিতাম না। সেই জন্য মাতুল-মহাশয় এখনো বলিয়া থাকেন—"আমার এই ভাগিনেয়ীটিকে আমি কিঞ্চিৎ ভয় করি।"

সম্পাদন-ভার ত গ্রহণ করিলাম কিন্তু নিজের নাম তবু ভারতীর কলেবরে প্রকাশ করিতে বড়ই সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলাম একলার নাম না দিয়া যদি দুই ভগিনীর নামে ভারতী চালাই ত নিশ্চয়ই দেখাইবে ভাল। সরলাকে লেখায় তিনিও এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আমি অনেকটা আরাম বোধ করিলাম। উমেশবাবু, রামেন্দ্র বাবু, অক্ষয়-বাবু, ঠাকুরদাসবাবু এই সময় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। দীনেন্দ্রবাবু এবং জলধরবাবুও লিখিতেন। এজন্য তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। মাও মধ্যে মধ্যে লেখা পাঠাইতেন। এইরূপে তিন বৎসর কাল আমরা দুই ভগিনী ভারতীর সম্পাদক ছিলাম। আমি কিন্তু ইহার মধ্যে একটি দিনও মাতুল মহাশয়কে ভারতী গ্রহণের জন্য ভজাইতে ছাড়ি নাই। ক্রমাগত জল ঢালিলে পাথরও ক্ষয় হয়—মামামহাশয়েরও আমার প্রতি করুণার উদ্রেক হইল। তিনি ভারতীর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে অর্থাৎ লিখিতে ও লেখা নির্ব্বাচন করিতে সম্মত হইলেন। ম্যানেজারী করা—প্রুফ দেখা, লেখা সংগ্রহ করার ভার আমার উপর রহিল। এইরূপে পুনরায় ভারতীকে যোগ্যহস্তে সমর্পণ করিয়া আমার সে কি আনন্দ! তবু মামাটির স্বভাব আমার জানা ছিল—বেশী দিন যে এ আনন্দ ভোগ করা আমার ভাগ্যে ঘটিবে না মনে মনে তাহা বুঝিতাম—তাই বিদায়-সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম :—

রবি যদি অস্ত যায় আসে অন্ধকার,
তবু রব কাছে; যদি নিভে যায় হাসি,
ম্লান হয়ে আসে রূপ, কোলে তুলে নিয়ে
যতনে মুছায়ে দেব অশ্রুজলরাশি।

সে দুর্দ্দিন শীঘ্রই আসিল। কিন্তু মাতৃদেবী ও সরলা তখন মহীশূর হইতে দেশে ফিরিয়াছেন। কাসিয়া-বাগান হইতে উঠিয়া বালীগঞ্জে তখন আমরা বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছি। সরলা এ ভার একাই বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন। ভারতীর নিকট সর্ব্বতোভাবে বিদায় লইয়া আমি মৃত সখী-সমিতিকে পুনর্জ্জীবিত করিবার ভার গ্রহণ করিলাম।

এখনও পর্য্যন্ত সেই কাজ লইয়াই আছি। —বাঙ্গালীর মেয়ের অবসর কোথায়? সংসার আমাদের দেহ মন প্রাণ ষোল আনায় দখল করিতে চায়। জোর করিয়া ইহার মধ্য হইতে যে কড়াক্রান্তি বাঁচাইতে পারি, হে নবীন সম্পাদক, সেটুকু তোমায় দিলে আমার ব্রত উদ্‌যাপন হইবে কিসে? অতএব আমার এই কৈফিয়ৎ গ্রহণ করিয়াই আমাকে মুক্তি প্রদান কর; আমি আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করি।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

ভারতীর ছবি

ছোটদের জন্য তখন বাসন্তী-কাগজের দুইখানিমাত্র পাতায় "পূজার সুলভ"—আদুরে ছেলে গাল-ফুলাইয়া ক্রমাগত সাবানের বুদ্‌বুদ্‌ উড়াইতেছে এই চিত্রটির ছাপ লইয়া বাহির হইত; আর সবই ছিল বড়দের জন্য; —'বঙ্গদর্শন' 'ভারতী' 'বামাবোধিনী' 'তত্ত্ব-বোধিনী' সবই। অন্ততঃ বিশ বৎসর বয়স হওয়া পর্য্যন্ত 'ভারতী'র কাছে আমরা ঘেঁসিতে পারি নাই;—সে ঘরের আদরিণী কন্যার মত বড়দের কাছে-কাছেই থাকিত।

আমাদের তেতালার উত্তরের ঘরে মায়ের একটা বড় কাচের আল্‌মারি; তারি সর্ব্বোচ্চ তাকের একটা অংশে 'ভারতী'। চৌকির উপর চৌকির সোপান বহিয়া আমরা অনেকদিন এই আলমারির চালটা পর্য্যন্ত উঠিয়া গেছি—এবং সেই অজানা রাজত্বের কত সংবাদ, কত টুকিটাকি সংগ্রহ করিয়া দিগ্‌বিজয়ী বীরের মত দলে ফিরিয়া আসিয়াছি, কিন্তু ঐ একখানিমাত্র কাচের আবরণ ভাঙিয়া ভারতীর উপরে হস্তক্ষেপ —এটা কোনো দিন আমার সাহসে কুলায় নাই। লণ্ঠন-ঘেরা আলোর বাইরে পতঙ্গ যেমন, আমাদের শিশু-কালটা তেমনি ভারতীর বাইরে-বাইরেই ঘুরিয়া মরিয়াছে বলিলেও চলে।

কেবল একটি দিন—বছরে একটিবারমাত্র মা আমাদের হাতে আল্‌মারির চাবি ছাড়িয়া দিতেন—সে ভাদ্র মাসের রৌদ্রোজ্জ্বল একটি প্রভাত। ভারতীকে কাঁধে তুলিয়া আমরা ছাদের উপর রোদ পোহাইতে চলিতাম। সেই-দিন ক্ষণিকের জন্য ভারতী আমাদের কাছে আসিত। আমরা দেখিতাম—সে পদ্মের উপরে পা-খানি রাখিয়া গালে হাত দিয়া সুদূরে চাহিয়া আছে;—কোলে তার অনাহত বীণা। এই ছবিটি মাত্র—এছাড়া তখনকার ভারতীর আর কোন ছবি আমার মনে আসে না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতী

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে দার্জ্জিলিঙে ভারতী-সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা দেবীর সহিত আমার পরিচয় হয়। প্রথম-পরিচয়েই তাঁহার অসামান্য বিদ্যাবত্তা ও অদম্য জ্ঞানানুশীলনের আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হই। সাহিত্যের যে-সব বিষয়ে সাধারণতঃ কেহ কোনো চর্চ্চা করে না, দেখিলাম সে-সব বিষয়ে তাঁহার গভীর অনুরাগ আছে এবং সেগুলির চর্চ্চায় তিনি অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন। আমার সহিত তিনি মহা উৎসাহে বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্যের কতিপয় গুরুতর বিষয়ের



দোদুল দোলা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

আলোচনা আরম্ভ করিলেন। সেই প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয়ের প্রমাণগুলি কোন্ কোন্ গ্রন্থে আছে তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারই অনুরোধে ঐ সময় হইতে আমি ভারতীতে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া প্রাচীন ও নব্য সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার সহিত বহুদিন বহু বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার এতই উৎসাহ ছিল যে এই আলোচনার জন্য তিনি আমাকে প্রায়ই আহ্বান করিতেন। তর্কে তাঁহার যুক্তির তীব্রতা ও জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইতাম। এই সময়ে তাঁহার নাম চারিদিকে শুনিতাম। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও উৎসাহশীলতার কথা তখন বঙ্গের প্রত্যেকে শিক্ষিত গৃহে শ্রদ্ধা ও গৌরবের সহিত আলোচিত হইত। সকল বিষয়েই দেখিতাম তাঁহার প্রতিভা অসামান্য।

বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জাতিকে চারিটি মূল-বর্ণে পরিণত করিবার উপায় কি—আমার সঙ্গে এই সম্বন্ধে তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত আলোচনা করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল এইটি আমাদের দেশের একটি গুরুতর প্রশ্ন। এই প্রসঙ্গে আমি তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ হইতে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তের বিধি সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিয়াছিলাম।

কোথায় কোন্ গুণ আছে, এবং সেই গুণের আদর কিরূপে করিতে হয় এবং ঐ গুণের দ্বারা সমাজের ও সাহিত্যের উপকার কিরূপে হয় তাহা বুঝিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। এবং এই অসাধারণ গুণ ছিল বলিয়াই তিনি সেই সময়ে বঙ্গের প্রধান প্রধান সাহিত্যিকগণের নিকট হইতে সুন্দর প্রবন্ধরাজি সংগ্রহ করিয়া ভারতীকে সুসজ্জিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

"ভারতী"র কথা উঠিলে সেই মূর্ত্তিমতী ভারতীকেই মনে পড়ে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

ভারতী ও ভারতী-সম্পাদিকা

সে আজ বহুদিনের কথা—প্রায় ত্রিশ বৎসর—যেদিন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল পবিত্র প্রয়াগধামে আমাদের দুই বন্ধুর সম্মিলন হয়। তখনকার দিনে সাহিত্যক্ষেত্রে এখনকার মত এত বঙ্গরমণীর আবির্ভাব হয় নাই! সুতরাং সে সময়ে একজন বঙ্গরমণী মাসিক-পত্রের সম্পাদক—এই সংবাদেই মন আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিল। শুধু আনন্দ নয়,—বিস্ময়ও ছিল;—কোন্‌টা বেশী তাহা বলা শক্ত। ভারতীর ভূতপূর্ব্ব-সম্পাদিকা মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী তখন এলাহাবাদে একখানি ইংরাজী সংবাদ-পত্রের সম্পাদকতা করিতেন, তদুপলক্ষে তিনিও কিছুদিন প্রবাসের সুখ উপভোগ করিতে আসিয়াছিলেন।

এই বিদুষী মহিলাটিকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা বহুদিন হইতে মনে জাগিতেছিল কিন্তু সাক্ষাৎ হয় নাই। হঠাৎ একদিন দৈবযোগে, ৺পূজনীয় পিতৃদেবের বন্ধুভবনে আমরা উভয়েই নিমন্ত্রিত হইলাম। ইহার বহুপূর্ব্ব হইতেই আমার পিতা ও ভ্রাতার সহিত ইঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত জানকীনাথ

ঘোষাল মহাশয়ের যথেষ্ট আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু আমার ভাগ্যে দেবী-দর্শন ঘটে নাই। জানিনা সে কোন্ শুভলগ্ন ছিল, পরস্পরকে দেখিবামাত্র অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব-সূত্রে গ্রথিত হইলাম। সেই প্রথম-দর্শনে মনে যে কি আনন্দ হইয়াছিল এবং নিজেকে যে কত ধন্য মানিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সাক্ষাতে সে মনোভাব বিন্দুমাত্র প্রকাশ করিতে পারি নাই;—মনের কথা মনেই থাকিয়া গিয়াছিল। যেমন বিদ্যার প্রভা, তেমনি রূপেরও প্রভা;—রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—একেবারে মূর্ত্তিমতী। এমন রূপ, এমন গুণ দেখিলে কে না মুগ্ধ হয়? আমি ভক্তিনম্র হৃদয়ে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পদে বরণ করিয়া লইলাম। এই মিলনের প্রধান দূতী হইল আমাদের সাহিত্যালোচনা; তদ্দ্বারা আমরা ক্রমশ নিকটতর হইতে নিকটতম হইয়া গেলাম। ভারতীর পত্রে ইতিপূর্ব্বেই ইহাঁর রচনার রস-মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলাম; এখন হইতে ভারতীরও ভক্ত হইয়া পড়িলাম।

সেকালে ভারতীর মত পত্রিকা বড় বেশি ছিল না; এবং ভারতীর স্থান মাসিক সাহিত্য-জগতে প্রধান ছিল। মহিলাদ্বারা সাহিত্য-রচনা দূরে থাক, তখন মহিলা-পাঠিকার সংখ্যা বিরল ছিল বলিলেও চলে। এমনি সময়ে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতীর সম্পাদকীয় আসন গ্রহণ করিলেন। বাঙ্গলা মাসিক-পত্রের সম্পাদক একজন বাঙ্গালী-মহিলা হইতে পারেন—এ কথা তখন বোধ হয় কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারিতেন না। সেই সময় আমার মনে হইত, একদিকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজ্যশাসনদণ্ড হাতে লইয়া যেমন জগতে রমণীর গৌরববর্দ্ধন করিতেছেন, আর-একদিকে আমাদের ক্ষুদ্র বাংলা দেশের সাহিত্য-শাসন-দণ্ড হাতে লইয়া স্বর্ণকুমারী আমাদের বঙ্গরমণীর মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন।

তখনকার সেই শিশু-সাহিত্য স্বর্ণকুমারীর মত একটি স্নেহময়ীর স্নেহ ও যত্নের অপেক্ষায় ছিল। তখন আমাদের দেশের যাঁহারা সাহিত্যগুরু ছিলেন তাঁহারাও ত অনেক মাসিকপত্র চালাইয়াছেন কিন্তু বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন নাই। ভারতী যে আজ এত-বড়টি হইয়াছে তাহার কারণ, সে যে অনেকদিন ধরিয়া মাতৃস্নেহ পাইয়াছে। এত বাধা-বিপদের মধ্যেও যে ভারতী দীর্ঘজীবী হইয়াছে সে ত শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর অপরিসীম যত্ন ও তাঁহার পরিপাটীরূপে পরিচালন-ক্ষমতার ফলে। যখনই ভারতী যায়-যায় হইয়াছে তখনই তিনি তাহাকে কোলে লইয়া তার শুশ্রূষা করিয়াছেন।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী প্রতিভা লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। সে প্রতিভা যে অন্তঃপুরের অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায় নাই ইহা আমাদের সৌভাগ্য। কথায় বলে আগুন কখনো ছাই চাপা থাকে না। আর-কিছু না করিয়া তিনি যদি কেবলই ভারতীর সম্পাদকতা করিতেন তাহা হইলেও তাঁহার কৃতিত্ব বড় কম হইত না। শুধু এদেশে কেন, দেশ-দেশান্তরেও তাঁহার মত মহিলা-সম্পাদিকা কয়জন আছেন? তিনি যখন সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন তখন বিদেশেও নাম-করা কোন মহিলা-সম্পাদিকার

কথা ত শুনি নাই। এ কথা যাক্। বঙ্গসাহিত্যকে যে তিনি বহুমূল্য রত্নরাজি দান করিয়াছেন তাহাই বা কে অস্বীকার করিবে? কবিতা বল, গল্প বল, উপন্যাস বল—এমন কি বিজ্ঞান-আলোচনা, কোনটা তিনি বঙ্গ-সাহিত্যভাণ্ডারে দান করেন নাই? এবং গুণে কোনটাই বা কম? সেকালে ত দেখিয়াছি ঘরে ঘরে তাঁহার উপন্যাস সানন্দে পঠিত হইতেছে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার সফলতাই তাঁহার পরবর্ত্তী লেখিকাদের উৎসাহিত করিয়াছে—ইহা ত স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তিনি যে শুধু সাহিত্য-রচনার যশ-গৌরবেরই অধিকারিণী তাহা নহে—তিনি বঙ্গরমণীর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি সাহস করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে না নামিলে আর কোনো রমণী এ পথে আসিতেন কি না আমার সন্দেহ হয়! সেই জন্য বলি, তিনি বাংলা দেশে রমণীজাতির আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সমস্ত বঙ্গনারীর পক্ষ হইতে আজ আমি তাই তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছি।

তাঁহার গ্রন্থাবলী সমালোচনা করিবার স্থান ইহা নয়। তবে এইটুকু বলিতেই হইবে যে তাঁহার রচনা যেমন সরস, তেমনি জীবন্ত—এ যেন পুরাতন হইতে চাহে না। ভাষায় এমন-একটি মাধুর্য্য আছে যে কালের দীর্ঘতাতেও তাহার নবীনতা ম্লান হয় না। এরূপ ভাষার গুণ খুব কম লেখকেরই আছে—বিশেষত সেই যুগের লেখকদের, যখন স্বর্ণকুমারী লেখা আরম্ভ করেন। চরিত্র-চিত্রনে স্বর্ণকুমারীর আশ্চর্য্য ক্ষমতা; কিন্তু একটি বিশেষত্ব আছে তাঁর নারী-চরিত্র-রচনায়। তাঁহার রচিত নারীগুলি এক মহিমাময়ী দীপ্তিতে উজ্জ্বল। তাহারা রমণী বলিয়া যে ধূলি-অবনত, তাহা নহে; তাহাদের মধ্যে আত্ম-সম্মানের তেজ, নারীত্বের গর্ব্ব এবং অন্তরের একটি শক্তি আছে। তাহারা অন্ধবিশ্বাসের পথে চোখ বাঁধিয়া চলে না এবং বিপদের মুখে কেবলই হাহাকার করিয়া মরে না। তাঁহার অন্তরে নারীজাতির প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সম্মান আছে তাহারই প্রেরণায় তিনি আমাদের দেশের নারীজাতিকে একটি প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। ইহা শক্তিমানের কাজ, স্বর্ণকুমারী সেই মহাশক্তির অধিকারিণী।

সম্প্রতি স্বর্ণকুমারীর যশ বঙ্গ ছাড়াইয়া সমুদ্র-পারে গিয়া পৌঁছিয়াছে—ইহাতে আমরা সকলেই আনন্দিত। তাঁহার কয়েক খানি উপন্যাসের অনুবাদ বিলাতে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ইহাতে দেশে বিদেশে আমাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে।

আমরা শুনি, মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে উগ্র হইয়া উঠে—তাঁহাদের নারীত্বের কোমলতা মরিয়া যায়। স্বর্ণকুমারী এই উক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। যে তাঁহাকে দেখিয়াছে সেই জানে বিদ্যার প্রভায়, জ্ঞানের দীপ্তিতে তাঁহার নারীত্বটি আরো কেমন সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষাভিমানের লেশমাত্র তাঁহাতে নাই।

শিক্ষার মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন বলিয়া স্বর্ণকুমারী চিরদিনই স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে পক্ষপাতিনী। কিসে স্ত্রী-সমাজ সর্ব্বপ্রকারে উন্নতিলাভ করিবে ইহাই তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা। এই উদ্দেশ্যে তিনি সখীসমিতি

ও মহিলা-শিল্পমেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির উৎসবে যাঁহারা যোগদান করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন রমণীদের চিন্তা উন্নত করিবার, রুচি মার্জ্জিত করিবার ও বিমল আনন্দ দিবার আয়োজন তাহাতে কত ছিল। তিনি ধনী-কন্যা হইয়াও সকলশ্রেণীর রমণীর সহিত এমন সহাস্যমুখে মিশিতেন যে দেখিবামাত্র সকলে তাঁহার আপনার হইয়া যাইত। সেই সখীসমিতি ও মহিলা-শিল্পমেলার উজ্জ্বল স্মৃতি এখনো অনেকের মনে জাজ্জ্বল্যমান আছে, সন্দেহ নাই!

স্বর্ণকুমারীর অক্লান্ত সাহিত্য-সাধনা এখনো অব্যাহত। মনে হয় তাঁহার জীবনের একমাত্র আনন্দ এই সাহিত্যচর্চ্চা। এমন করিয়া সাহিত্যে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতে পারেন কয়জন? বাংলাভাষা অল্পদিনের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমরা অবাক হই, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, এর মূলে ইঁহার মত কয়েকজন ভক্তের তপস্যা নিহিত আছে বলিয়াই এমনটি হইতে পারিয়াছে। বঙ্গভাষার ইতিহাসে স্বর্ণকুমারীর নাম স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত থাকিবে।

ভারতী চল্লিশ বৎসরে পড়িল—ইহা আমার কাছে বড়ই আনন্দের দিন। বিশেষ করিয়া এই জন্য আনন্দ যে, ইহা স্বর্ণকুমারীরই জয়-গান আজ বিঘোষিত করিতেছে। চিরদিন করুক ইহাই প্রার্থনা করি।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

ভারতী-স্মৃতি

'ভারতী' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমরা পড়াশুনা করিতাম—সে আজ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা—সেকালের কথা বলিলেই হয়। তখন আমরা ইংরাজী স্কুলে পড়িলেও বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ চর্চ্চা করিতাম; কারণ তখন আমরা কাঙ্গাল হরিনাথের কাছে শিক্ষানবিশী করিতাম। সে সময়ে যে কত আগ্রহে 'ভারতী' পড়িতাম, তাহা বলিতে পারি না; অনেক প্রবন্ধ বুঝিতে পারিতাম না, তবুও পড়িতাম, এখনকার কালের মত শুধু গল্প পড়িয়া অবশিষ্ট পাতাগুলি উল্টাইয়া যাইতাম না, যাহা পড়িতাম তাহার রীতিমত পরীক্ষা দিতে হইত; যাহা বুঝিতাম না, তাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইত। তখন মাসিকপত্র পাঠ আমাদের সখের ব্যাপার ছিল না, আমরা সখের খাতিরে বাঙ্গালা পড়িতাম না। বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, জ্ঞানাঙ্কুর, ভারতী এবং তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা আমরা আমাদের সেই পল্লীভবনে বসিয়া যথারীতি পড়িতাম; শব্দের প্রয়োগ শিখিতাম; ভাল ভাল কথা খাতায় লিখিয়া রাখিতাম, কণ্ঠস্থ করিতাম, এবং যখন কিছু লিখিতাম, তখন ঐ সকল কথা, ঐ সকল শব্দ, ঐ সকল ভাব গ্রহণ করিতাম। এই ভাবে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্য শিক্ষা করিতাম। মাসিকপত্রের জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিতাম, ডাকঘরে আনাগোনা করিতাম; কোন একখানি মাসিকপত্র আসিলে কাড়াকাড়ি লাগিয়া যাইত। আমাদিগের জ্যেষ্ঠেরা প্রথমে

পড়িতেন, তাহার পর আমরা পড়িতে পাইতাম; তখন ত আর বাড়ীতে বাড়ীতে কাগজ আসিত না; বিশেষতঃ আমি অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলাম, বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক কিনিবারই শক্তি আমার ছিল না; কাজেই আমাকে অপরের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াই পত্রাদি পড়িতে হইত।

তাহার পর কতদিন চলিয়া গেল; আমার মাথার উপর দিয়া কত ঝড় বহিয়া গেল; কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিলাম; কত বিয়োগ-বেদনা বুক পাতিয়া লইলাম; কত দেশ-দেশান্তরে ঘুরিলাম, কত পর্ব্বতে প্রান্তরে অরণ্যে কত বিনিদ্র রজনী কাটাইলাম। তাহার পর দেশে ফিরিয়া আসিলাম। সে সকল কথা আর বলিব না।

বাঙ্গালা দেশে আসিয়া আমি যখন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মহিষাদলের রাজার বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইয়া যাই, সেই সময় আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় সেখানে ছিলেন। তিনিই আমাকে মহিষাদলে যাইতে বাধ্য করেন; চাকুরী করা তখন আমার অভিপ্রেতই ছিল না, আমি তখন আর একবার অজ্ঞাতবাসে যাইবার কল্পনা করিতেছিলাম। তাহা হইল না, আমি মহিষাদলেই গেলাম।

যখন আমি হিমালয়ের মধ্যে ছিলাম, সেই সময় আমার আর কিছুই সম্বল ছিল না, সুধু সম্বল ছিল কাঙ্গাল হরিনাথের বাউলের গানের একখানি বই। আমার এক বন্ধু সেই বইখানির দুরবস্থা দেখিয়া যখন ভাল করিয়া বাঁধাইয়া দেন, তখন তিনি তাহার সহিত কয়েকপৃষ্ঠা সাদা কাগজ জুড়িয়া দিয়াছিলেন। আমি সেই সাদা পৃষ্ঠাগুলিতে আমার ভ্রমণের কথা একটু-আধটুকু লিখিয়া রাখিতাম,—ওটা একটা খেয়ালমাত্র; পরে যে কিছু করিব, এ কথা ভাবিয়া লিখিতাম না; সে অভিপ্রায় থাকিলে যথাযথভাবে অনেক কথা লিখিয়া রাখিতে পারিতাম। যখন মহিষাদলে গেলাম, তখনও ঐ বইখানি আমার সঙ্গে ছিল—কাঙ্গালের গানগুলি যে আমার নিকট বড়ই বহুমূল্য ছিল—আমি ঐ গানগুলিকেই আমার জপমন্ত্র করিয়াছিলাম—উহারই মধ্যে আমি সব পাইতাম। মহিষাদলে একদিন দীনেন্দ্রবাবু আমার সেই গানের বইখানি দেখিতে পান এবং পেন্সিলে লেখা সেই কথাগুলিও পড়েন। সে সময়ে তিনি 'ভারতী'তে প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং 'ভারতী'-সম্পাদিকামহাশয়াও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। দীনেন্দ্র বাবু আমাকে ধরিয়া বসিলেন যে, আমার হিমালয়-ভ্রমণকথা 'ভারতী'তে লিখিতে হইবে। আমি ত কথাটা প্রথমে হাসিয়াই উড়াইয়া দিলাম। শৈশবকাল হইতে যদিও একটু-আধটুকু লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতাম, কাগজপত্রেও সামান্য কিছু লিখিতাম; কিন্তু বাঙ্গালা দেশ ত্যাগের পর হইতে লেখাটা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। আর ওদিকে যাইবার ইচ্ছা ছিল না; নিজের শক্তিসামর্থ্যও ছিল না। সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে একরকম বিদায় গ্রহণই করিয়াছিলাম; অন্ধকারের মধ্যেই জীবন কাটাইব বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। কিন্তু দীনেন্দ্রবাবু কিছুতেই ছাড়িলেন না, জোর করিয়া হিমালয়-ভ্রমণের প্রথম প্রস্তাব

লিখিয়া লইলেন এবং নিজেই বিশেষ উদ্যোগী হইয়া 'ভারতী' পত্রে প্রেরণ করিলেন। বোধ হয় সে সময় পূজনীয়া সম্পাদিকা মহাশয়া এবং তাঁহার কন্যাদ্বয় ফাইল খুঁজিয়া প্রকাশের মত কিছু পান নাই, অথবা দীনেন্দ্রবাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই; তাই আমার সেই লেখাটা 'ভারতী'তে প্রকাশিত করিলেন। আমি কিন্তু সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, আমার নামটা যেন ছাপা না হয়; আমার মত নিতান্ত অপরিচিত, নিরক্ষর, গ্রাম্যস্কুল মাষ্টারের অতি অকিঞ্চিৎকর লেখার নীচে আমার নিরাকার নাম দিয়া 'ভারতী'র প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিবার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। কিন্তু সম্পাদিকা মহাশয়া বোধ হয় রহস্য দেখিবার জন্যই আমার আকার-ইকার-উকার-বর্জ্জিত নামটা প্রবন্ধের শেষে ছাপিয়া দিলেন এবং আমাকে আরও লিখিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিলেন। প্রবন্ধ-দৈন্যই যে তখন এই অনুরোধের একমাত্র কারণ হইয়াছিল, তাহা আমি এখনও হলফ্ করিয়া বলিতে পারি; নতুবা 'ভারতী'র ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হইবে কেন?

কিন্তু সম্পাদিকা মহাশয়া আমাকে জানাইলেন যে, আমার হিমালয়-ভ্রমণ পাঠকগণের ভাল লাগিয়াছে, এ সংবাদ তিনি পাইয়াছেন। ইহা হইতেই বর্ত্তমান পাঠক-পাঠিকাগণ সে সময়ের পাঠক-পাঠিকাগণের সাহিত্য-রস বিচারের ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন। সে যাহাই হউক, আমি 'ভারতী'তে লিখিতে লাগিলাম। যে পত্রের সম্পাদিকা পূজনীয়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী পরে শ্রীমতী হিরণ্ময়ী ও শ্রীমতী সরলা দেবী, যে পত্রে পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য দিগ্‌গজ সাহিত্য-রথী যথানিয়মে লেখেন, সেই পত্রে আমার লেখাও বাহির হইতে লাগিল —পুষ্পের সহিত কীটও দেবতার মাথায় উঠিতে লাগিল। হিমালয়ের কথা তাহার পূর্ব্বে কেহ বাঙ্গালায় হয়ত লেখেন নাই; তাই আমার লেখা যা-তাই সকলে পড়িতে লাগিলেন। তখন আমার সেই প্রবাস-পল্লী হইতেই শুনিতে লাগিলাম যে, 'জলধর সেন' নামে কোন ব্যক্তি নাই, ঠাকুর-বাড়ীর কেহ ছদ্মনামে হিমালয়-কাহিনী লিখিতেছেন। কিন্তু এ কথাটা কেহই ভাবিয়া দেখিলেন না যে, বাঙ্গালা ভাষায় নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, মহেন্দ্র প্রভৃতি শ্রুতিমধুর নাম থাকিতে উক্ত প্রবন্ধাবলীর লেখক দীনবন্ধু বঙ্কিম কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ঐ নামটিই ছদ্মনাম বলিয়া গ্রহণ করিবেন কেন? আরও একটি কথা আছে, তাহা এখানে বলিতে হইতেছে। আমি যখন 'ভারতী'তে হিমালয় ভ্রমণ লিখিতে আরম্ভ করি, তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ইউরোপ যাত্রীর পত্র' প্রকাশিত করিয়া ছিলেন। আমি হিমালয় লিখিবার সময় তাঁহারই অতুলনীয় লিখন-পদ্ধতি (style) অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা যে অক্ষম অনুসরণ, তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না; কিন্তু সে সময় হয়ত-বা ঐ লিখন-পদ্ধতি দেখিয়াই অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন! আর যাঁহারা আমার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন,

তাঁহাদিগেরও দোষ দিতে পারি না; কারণ আমার নামটার সহিত পূজনীয় বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু এমনই একটা চিত্র জড়াইয়া দিয়াছেন যে, কোন পিতামাতাই পুত্রের ঐ নামকরণ করিতে কিছুতেই রাজী হইতে পারেন না। আমার পক্ষ হইতে কৈফিয়ৎ এই যে, উপরিউক্ত সাহিত্যরথীদ্বয়ের লেখনীধারণের পূর্ব্বেই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব খোসখেয়ালের বশেই আমার ঐ নামকরণ করিয়াছিলেন। তিনি যদি ভবিষ্যৎ জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত এমন কার্য্য করিতেন না। যাক্ সে কথা। আমি প্রায় দুই বৎসর ক্রমাগত লিখিয়া 'ভারতী'-পত্রে আমার হিমালয়-ভ্রমণের এক অংশ শেষ করিয়াছিলাম; তাহাই একত্র সংগ্রহ করিয়া পরে 'হিমালয়' ছাপাইয়াছিলাম।

যে 'ভারতী'কে অবলম্বন করিয়া আমি বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, সেই 'ভারতী' চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিল, ইহাতে আমার ন্যায় 'ভারতী'র নগণ্য সেবকের যে কি আনন্দ বোধ হইতেছে, তাহা বলিবার ভাষা নাই।

শ্রীজলধর সেন।

পথের প্রেম

ভাবনা নিয়ে মরিস কেন ক্ষেপে?
দুঃখ সুখের লীলা
ভাবিস্ একি রৈবে বক্ষে চেপে
জগদ্দলন-শিলা?
চলেছিস্ রে চলাচলের পথে
কোন্ সারথির উধাও-মনোরথে?
নিমেষ তরে যুগে যুগান্তরে
দিবে না রাশ-ঢিলা।

শিশু হয়ে এলি মায়ের কোলে,
সেদিন গেল ভেসে।
যৌবনেরি বিষম দোলার দোলে
কাট্‌ল কেঁদে হেসে।
রাত্রে যখন হচ্ছিল দীপ জ্বালা'
কোথায় ছিল আজকে দিনের পালা?
আবার কবে কি সুর বাঁধা হবে
আজ্‌কে পালার শেষে!

চল্‌তে যাদের হবে চিরকালই
নাইক তাদের ভার।
কোথা তাদের রৈবে থলি-থালি,
কোথা বা সংসার?
দেহযাত্রা মেঘের খেয়া বাওয়া,
মন তাহাদের ঘূর্ণা-পাকের হাওয়া;
বেঁকে বেঁকে আকার এঁকে এঁকে
চল্‌চে নিরাকার।

ওরে পথিক, ধর্ না চলার গান,
বাজারে এক-তারা!
এই খুসিতেই মেতে উঠুক প্রাণ—
নাইক কূল-কিনারা।
পায়ে পায়ে পথের ধারে ধারে
কান্না-হাসির ফুল ফুটিয়ে যা রে,
প্রাণ-বসন্তে তুই যে দখিন হাওয়া
গৃহ-বাঁধন-হারা।

এই জনমের এই রূপের এই খেলা
এবার করি শেষ।
সন্ধ্যা হল, ফুরিয়ে এল বেলা,
বদল করি বেশ।
যাবার কালে মুখ ফিরিয়ে পিছু
কান্না আমার ছড়িয়ে যাব কিছু,
সাম্‌নে সেও প্রেমের কাঁদন ভরা
চির নিরুদ্দেশ!

বঁধুর দিঠি মধুর হয়ে আছে
সেই অজানার দেশে।
প্রাণের ঢেউ সে এম্‌নি করেই নাচে
এম্‌নি ভালোবেসে।
সেখানেতে আবার সে কোন্ দূরে
আলোর বাঁশি বাজ্‌বে গো এই সুরে,
কোন্ মুখেতে সেই অচেনা ফুল
ফুট্‌বে আবার হেসে!

এইখানে এক শিশির-ভরা প্রাতে
মেলেছিলেম প্রাণ।
এইখানে এক বীণা নিয়ে হাতে
সেধেছিলাম তান।
এতকালের সে মোর বীণাখানি
এইখানেতেই ফেলে যাব জানি,
কিন্তু ওরে হিয়ার মধ্যে ভরে'
নেব যে তার গান।

সে গান আমি শোনাব যার কাছে
নূতন আলোর তীরে
চিরদিন সে সাথে সাথে আছে
আমার ভুবন ঘিরে।
শরতে সে শিউলি-বনের তলে
ফুলের গন্ধে ঘোম্‌টা টেনে চলে,
ফাল্গুনে তার বরণমালা খানি
পরাল মোর শিরে।

পথের বাঁকে হঠাৎ দেয় সে দেখা
শুধু নিমেষ তরে।
সন্ধ্যা-আলোয় রয় সে বসে একা
উদাস প্রান্তরে।
এম্‌নি করেই তার সে আসা-যাওয়া,
এমনি করেই বেদন-ভরা হাওয়া
হৃদয়-বনে বইয়ে সে যায় চলে
মর্ম্মরে মর্ম্মরে।

জোয়ার-ভাঁটার নিত্য চলাচলে
তার এই আনাগোনা।
আধেক হাসি আধেক চোখের জলে
মোদের চেনাশোনা।
তারে নিয়ে হলনা ঘর-বাঁধা,
পথে পথেই নিত্য তারে সাধা,
এম্‌নি করেই আসা-যাওয়ার ডোরে
প্রেমেরি জাল-বোনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

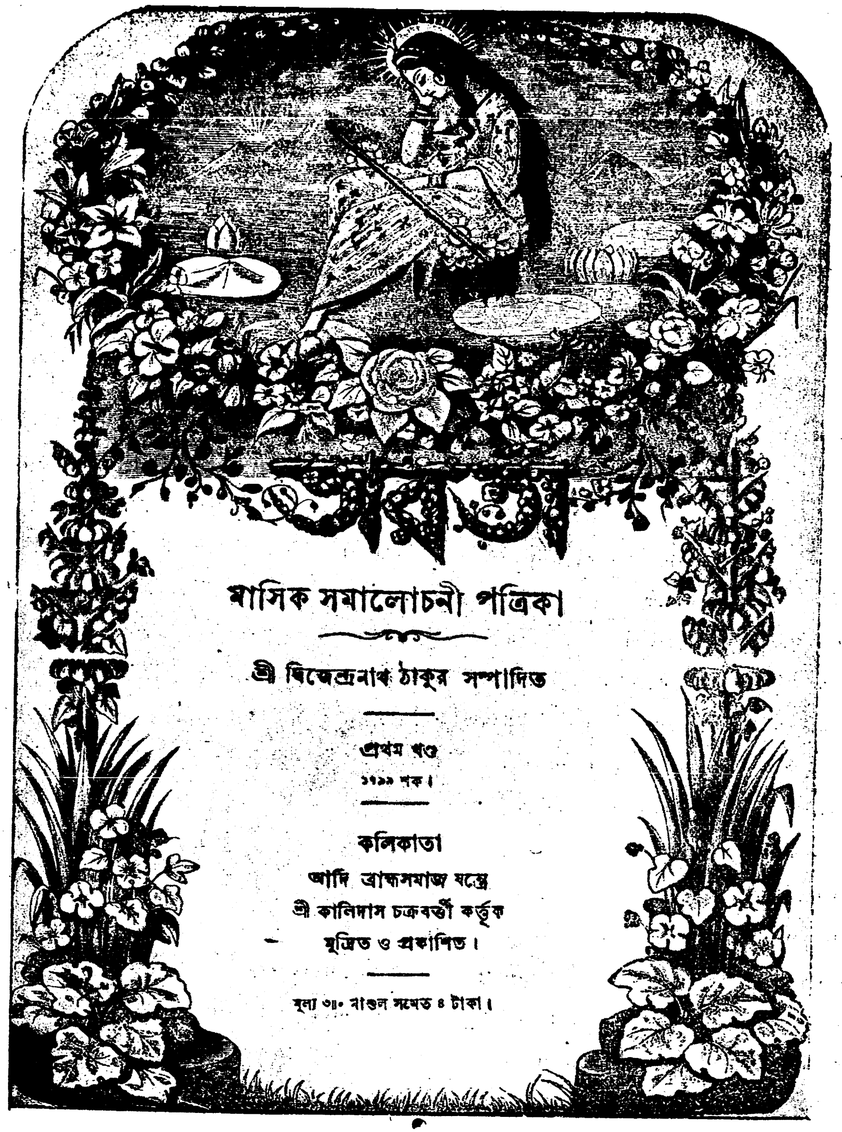

প্রথম বর্ষের প্রচ্ছদপটের নমুনা

পদ্মের পাপড়ি

[যে পদ্মের উপর ভারতীর আসন তাহার কয়েকটি পাপড়ি এইখানে ছড়াইয়া দেওয়া হইল। এগুলি প্রথম বর্ষের ভারতী হইতে সংগৃহীত। পুরাতন ভারতীতে এমন অনেক রচনা আছে যাহা এখনও নবীনতার দাবী রাখে। সেগুলি এ যুগেও পাঠকদের মনের খোরাক ও চিত্তের আনন্দ দানে সমর্থ। অনেক বহুমূল্য জিনিষ আছে কিন্তু স্থানাভাব। যাহা পাঠক-সাধারণের চিত্তরঞ্জন করিতে পারে এমন প্রবন্ধের অংশবিশেষ বাছিয়া এই বিভাগে উদ্ধৃত হইবে।]

ভূমিকা

ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তাঁহার নামেই সুপ্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণী স্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ,—জ্ঞানোপার্জ্জন এবং ভাবস্ফূর্ত্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্থলে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ-নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহাই নত-মস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিব। পক্ষপাত-মানসে যে আমরা এরূপ করিব, তাহা নহে। যে সকল বস্তু উপার্জ্জন করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, বিজ্ঞান তাহার মধ্যে একটি; কিন্তু ভাব তাহার মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভাবের উদয় সম্ভবে, ভাবের উদ্রেক সম্ভবে, ভাবের স্ফূর্ত্তি সম্ভবে, কিন্তু উপার্জ্জন সম্ভবে না। যাঁহারা মনে করেন যে, আমরা আর এক জাতি হইতে তাঁহাদের ভাব উপার্জ্জন করিয়া ঠিক সেই জাতির পদবীতে আরূঢ় হইয়াছি, তাঁহাদের মনে করা মাত্রই সার। পাদ্‌রী সাহেবেরা যদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক বাঙ্গালীর মত বাঙ্গলা লিখি, এবং ইঙ্গ-বঙ্গেরা যদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক ইংরাজের মত ইংরাজি লিখি, তবে তাঁহাদের সে সুখস্বপ্নে আমরা ব্যাঘাত দিতে চাহি না। কালিদাস শকুন্তলার এক স্থলে বলিয়াছেন—"স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বং।" স্ত্রীলোকদিগের অশিক্ষিতপটুত্ব; এই যে একটি কথা ইহা ভাবের পক্ষে খুব খাটে। ভাব বাহির হইতে শিক্ষা করিয়া পটুত্ব লাভ করে না, পরন্তু ভিতর হইতে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। ইংরাজী মহাকবি শেক্‌স্‌-পিয়র বলিয়াছেন,—"Our poesy is a gum which oozes from whence 'tis nourished" কবিত্বরূপ নির্যাস ভিতরে যেখানে যত্নপূর্ব্বক পোষিত হয় সেই স্থান হইতে চুঁয়াইয়া পড়ে। আমাদের দেশে সেদিনকার উপস্থিত-ভাষী কবি হরুঠাকুর বলিয়াছেন,—

"প্রেম কি যাচ্‌লে মেলে খুঁজলে মেলে?
সে আপনি উদয় হয় শুভযোগ পেলে॥"

স্বদেশ হইতে যে ভাব আপনি উদয় হয়, অযাচিতভাবে উদয় হয়, তাহাই ঠিক; যে ভাব অন্যত্র হইতে যাচিয়া আনা হয় তাহা কৃত্রিম, তাহা কোন কার্য্যেরই নহে।

বীণাপাণির হস্তে বীণাই শোভা পায়; হার্প কি শোভা পায়? এই সকল কারণে ভাবের আলোচনা আমরা স্বদেশীয় ভাবেই করিতে ইচ্ছুক।

অতঃপর আমরা বলিতে চাই যে, যে কারণে ব্রিটানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রিটানিয়া নাম ধারণ করিয়াছেন, এবং তাহার বহু পূর্ব্বে এথেন্স নগরের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা মিনর্বা—এথেনিয়া নাম ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কারণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী—ভারতী নাম ধারণ করিতে পারেন। সে কারণ কি? না, নামের সহিত ধামের অকাট্য সম্বন্ধ। আর্য্য-ভাষা মূলসমেত অদ্যাপি কোথায় বিরাজ করিতেছেন? ভারতে! আর্য্য ভাষার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি। পুনশ্চ, যত প্রকার বিদ্যা আছে, ভারতভূমি তাবতেরই জন্মভূমি। গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, চিকিৎসা, দর্শন, সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি বিদ্যা-সমূহের বীজ প্রথমে ভারত-ভূমিতেই অঙ্কুরিত হয়, পরে তাহার ফল দূর দূর দেশে বিকীর্ণ হইয়া, এতদিন পরে তবে তাহা সাধারণ জনগণের ভোগায়ত্ত হইয়াছে। ভারতভূমি বিদ্যার জন্মভূমি, বিদ্যার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি। এইরূপ যে দিকে দেখা যায় সেই দিকেই ভারতী এবং ভারতের মধ্যে ভাবের প্রগাঢ় মিল দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব ইহা মুক্ত-কণ্ঠে উক্ত হইতে পারে যে, হংসের যেমন পদ্মবন, মহাদেবের যেমন কৈলাস-শিখর, ভারতীর তেমনি ভারতভূমি। কিম্বা পদ্মের যেমন সৌরভ, নক্ষত্রের যেমন জ্যোতি, ভারতের তেমনি ভারতী। ভারত-ভূমিতে যদি জাগ্রত দেবতা অদ্যাপি কেহ বিরাজ-মান থাকেন তবে তিনি ভারতী। ভারতের প্রতি ভারতীর এমনি কৃপাদৃষ্টি যে তাঁহাকে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। সেই শ্বেতবর্ণা শ্বেতাম্বরা দেবী আমাদের এই দুরবস্থার সময় যদি আমা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তবে কাহার চরণ সেবা করিয়া আমরা দুঃসহ কারাবাস-যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকিব? তাই আমরা ভারতী-দেবীকে বলি যে "হে মাত-র্ভারতী! তুমিই আমাদের আঁধারের প্রদীপ, তোমার আলোকেই আমাদের আলোক, তোমার অধিষ্ঠানেই আমাদের জীবন, তোমার অন্তর্ধানেই আমাদের মৃত্যু। তোমার শুভ্র বদন-জ্যোতি কাল-যবনিকায় সহস্র সহস্র ভাঁজের মধ্য দিয়া এখনো যখন আমাদের নয়ন আকর্ষণ করিতেছে, তখন ইহা নিশ্চয় যে, প্রলয়-কালেও তাহা অন্তর্হিত হইবে না। তোমার প্রসাদাৎ আমরা দুর্ব্বল হইয়াও সবল, গতশ্রী হইয়াও নবশ্রী, নির্জ্জীব হইয়াও সজীব। আমাদের প্রতি এই যে তোমার অনিমেষ কৃপাদৃষ্টি, আমরা আমাদের নিজদোষে যেন তাহা না হারাই, এই আমাদের প্রার্থনা।"

আমরা ভাই বন্ধু একত্র হইয়া ভারতীকে আবাহন পূর্ব্বক এই ত প্রতিষ্ঠা করিলাম। এক্ষণে ভারতীর বরপুত্রগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহার যাহাতে রীতিমত সেবা চলে, তাহার ব্যবস্থা করুন, ভারতীর আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

ভারতী

শুধাই অয়ি গো ভারতী তোমায়
তোমার ও বীণা নীরব কেন ?
কবির বিজন মরমে লুকায়ে
নীরবে কেন গো কাঁদিছ হেন ?
অযতনে আহা সাধের বীণাটি
ঘুমায়ে রয়েছে কোলের কাছে,
অযতনে আহা এলোথেলো চুল
এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে।
কেন গো আজিকে এ ভাব তোমার
কমলবাসিনী ভারতী রাণী
মলিন মলিন বসন ভূষণ
মলিন বদনে নাহিক বাণী !
তবে কি জননি অমৃত-ভাষিণি
তোমার ও বীণা নীরব হবে ?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও বীণা আর না বাজিবে তবে ?
দেখ তবে মাতা দেখ গো চাহিয়া
তোমার ভারত শ্মশানপারা !
ঘুমায়ে দেখিছে সুখের স্বপন
নরনারী সব চেতন-হারা !
যাহা কিছু ছিল সকলি গিয়াছে
সেদিনের আর কিছুই নাই,
বিশাল ভারত গভীর নীরব
গভীর আঁধার যেদিকে চাই।
তোমারো কি বীণা ভারতী জননি
তোমারো কি বীণা নীরব হবে ?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও বীণা আর না বাজিবে তবে ?

না না গো ভারতী নিবেদি চরণে
কোলে তুলে লও মোহিনী বীণা !
বিলাপের ধ্বনি উঠাও জননি,
দেখিব ভারত জাগিবে কি না ?
অযুত অযুত ভারত নিবাসী
কাঁদিয়া উঠিবে দারুণ শোকে
সে রোদনধ্বনি পৃথিবী ভরিয়া
উঠিবে জননি দেবতা-লোকে।
তা যদি না হয় তা হলে ভারতি
তুলিয়া লও গো বিজয়-ভেরী !
বাজাও জলদ গভীর গরজে
অসীম আকাশ ধ্বনিত করি !
গাও গো হতাশ-পূরিত গান
জ্বলিয়া উঠুক অযুত প্রাণ
উথলি উঠুক ভারত-জলধি
কাঁপিয়া উঠুক অচলা ধরা।
দেখিব তখন প্রতিভা-হীনা
এ ভারতভূমি জাগিবে কি না
ঢাকিয়া বয়ান আছে যে শয়ান
শরমে হইয়া মরমে মরা !
এই ভারতের আসনে বসিয়া
তুমিই ভারতী গেয়েছ গান
ছেয়েছে ধরার আঁধার গগন
তোমারি বীণার মোহন তান।
আজও তুমি মাতা বীণাটি লইয়া
মরম বিঁধিয়া গাও গো গান
হীনবল সেও হইবে সবল,
মৃত দেহ সেও পাইবে প্রাণ ॥

সমালোচনা

(মেঘনাদবধ কাব্য)

বঙ্গীয় পাঠকসমাজে যে কোন গ্রন্থকার অধিক প্রিয় হইয়া পড়েন তাঁহার গ্রন্থ নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিতে কিঞ্চিৎ সাহসের প্রয়োজন হয়। তাঁহার পুস্তক হইতে এক বিন্দু দোষ বাহির করিলেই, তাহা ন্যায্য হউক বা অন্যায্যই হউক, পাঠকেরা অমনি ফণা ধরিয়া উঠেন। ভীরু সমালোচকেরা ইহাঁদের ভয়ে অনেক সময়ে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। সাধারণ লোকদিগের প্রিয় মতের পোষকতা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে আমাদের বড় একটা বাসনা নাই। আমাদের নিজের যাহা মত তাহা প্রকাশ্যভাবে বলিতে আমরা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইব না বা যদি কেহ আমাদের মতের দোষ দেখাইয়া দেন তবে তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে আমরা কিছুমাত্র লজ্জিত হইব না। এখনকার পাঠকদের স্বভাব এই যে, তাঁহারা ঘটনাক্রমে এক একজন লেখকের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন, এরূপ অবস্থায় তাঁহারা সে লেখকের রচনায় কোন দোষ দেখিতে পান না, অথবা কেহ যদি তাহার কোন দোষ দেখাইয়া দেয় সে দোষ বোধ-গম্য ও যুক্তিযুক্ত হইলেও তাঁহারা সেগুলিকে গুণ বলিয়া বুঝাইতে ও বুঝিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আবার এমন অনেক ভীরুস্বভাব পাঠক আছেন, যাঁহারা খ্যাতনামা লেখকের রচনা পাঠ-কালে কোন দোষ দেখিলে তাহাকে দোষ বলিয়া মনে করিতে ভয় পান, তাঁহারা মনে করেন এগুলি গুণই হইবে, আমি ইহার গভীর অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না।

আমাদের পাঠক সমাজের রুচি ইংরাজি শিক্ষার ফলে একাংশে যেমন উন্নত হইয়াছে অপরাংশে তেমনি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, বসন্ত লইয়া বিরহ বর্ণনা করিতে বসা তাঁহাদের ভাল না লাগুক, কবিতার অন্য সকল দোষ ইংরাজি গিল্‌টিতে আবৃত করিয়া তাঁহাদের চক্ষে ধর তাঁহারা অন্ধ হইয়া যাইবেন। ইহাঁরা ভাব-বিহীন মিষ্ট ছত্রের মিলন-সমষ্টি বা শব্দাড়ম্বরের ঘনঘটাচ্ছন্ন শ্লোককে মুখে কবিতা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হন কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীতাচরণ করেন। শব্দের মিষ্টতা অথবা আড়ম্বর তাঁহাদের মনকে এমন আকৃষ্ট করে যে ভাবের দোষ তাঁহাদের চক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কুশ্রী ব্যক্তিকে মণি-মাণিক্য-জড়িত সুদৃশ্য পরিচ্ছদে আবৃত করিলে আমাদের চক্ষু পরিচ্ছদের দিকেই আকৃষ্ট হয়, ঐ পরিচ্ছদ সেই কুশ্রী ব্যক্তির কদর্য্যতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচ্ছন্ন করিতেও পারে কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে সৌন্দর্য্য অর্পণ করিতে পারে না।

অভিনয়-সমালোচনা

আমাদের নাট্যশালার একটা বড় আশ্চর্য্য দেখিতেছি, কতকাল হইল তাহার আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু গোড়ায় যাহা দেখিয়াছিলাম আজও তাহাই দেখিতেছি, ইহার আর উন্নতিও হইল না, অবনতিও হইল না। বীররস অভিনয় করিতে হইলেই তাঁহারা চীৎকার করিতে থাকেন, করুণ রস হইলেই তাঁহারা বুক চাপড়াইয়া নিশ্বাস টানিয়া টানিয়া বিকৃত অস্ফুট স্বরে কাঁদিতে থাকেন, হাস্য রসের অবতারণা করিতে হইলেই বিবিধ অপূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গী করিয়া বিকৃত কণ্ঠে সে যে কত প্রকার ভাঁড়ামি করিতে থাকেন তাহার আর সীমা-পরিসীমা নাই। ধীর প্রশান্ত গম্ভীর বীরত্ব যে কিরূপ, তাহা তাঁহারা জানেন না, চটুল চপল আস্ফালনই তাঁহাদের বীরত্বের আদর্শ; প্রশান্ত চিন্তাময় যে এক প্রকার বিষাদ আছে তাহা তাঁহারা জানেন না, তাঁহারা যখন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকেন, তখন করুণ রসের আবির্ভাব দূরে থাকুক, উল্‌টা এমন বিরক্তি বোধ হয় যে, তাহা আর বলিবার নহে; আর ভাঁড়ামি না করিয়া, নিরর্থক প্রলাপোক্তি না করিয়াও যে হাসাইবার শত সহস্র উপায় আছে ইহা কি তাঁহারা এ-পর্য্যন্ত বুঝিলেন না? কিন্তু দর্শক-মণ্ডলীরই বা কিরূপ বিচার? নাটকের যদি কোন বীর প্রাণপণে ভগ্ন কণ্ঠে চীৎকার করিতে পারিলেন, যদি কোন শোকগ্রস্ত ব্যক্তি দুই চারিটি কথা বলিয়া সোজা হইয়া মূর্চ্ছা যাইতে পারিলেন, তবে আর রক্ষা নাই; করতালির পর করতালি, রঙ্গ-ভূমির কম্পার্ট বাদ্য অপেক্ষাও আমাদের বিরক্ত করিয়া তুলে। দর্শকমণ্ডলীর রুচির উপর অভিনয়ের ও অভিনেতাদিগের অভিনয়ের উপর দর্শকমণ্ডলীর রুচির উন্নতি নির্ভর করে সত্য, এবং নাট্যশালাধ্যক্ষেরা বলিতে পারেন যে, দর্শকদের যাহাতে ভাল লাগে সেই অনুসারেই তাঁহাদের কার্য্য করিতে হইবে, নহিলে তাঁহাদের চলিবে কি করিয়া। চাতক পক্ষীর ন্যায় তাঁহাদিগকে ঐ করতালির ধারা বর্ষণের জন্য তৃষিত কর্ণে অপেক্ষা করিতে হয় কিন্তু তাহাতেও বঞ্চিত হইলে তাঁহাদের উৎসাহ থাকিবে কিরূপে? এবং উৎসাহ অভাবে যে অভিনয় অধিকতর নিকৃষ্ট হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কথাটি সত্য বটে, কিন্তু ইহা তাঁহারা নিশ্চিত জানিবেন যে, ভাল অভিনয় হইলে দর্শকদিগের সন্তোষজনক হইবে না ইহা অসম্ভব; যদি দর্শকদিগের এতই রুচি বিকৃত হইয়া থাকে তবে তাঁহাদের দোষেই হইয়াছে এবং তাঁহাদেরই হস্তে তাহার সংস্কারের ক্ষমতাও আছে। অভিনেতাদিগের আর এক দোষ আছে গ্রন্থকার নাটকের প্রতি ছত্র কত ভাবিয়া চিন্তিয়া কত সাবধানে বসাইয়াছেন তাহা তাঁহারা ভাবেন না। তাঁহারা যে মুহূর্ত্তের-মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে দুই এক কথা বাড়াইয়া বা কমাইয়া দেন, তাহা অতিশয় অবিবেচনার কার্য্য বলিতে হইবে। একটি ক্ষুদ্র কথায় সামান্য স্বর ও হস্তপদ-ভঙ্গীতে একএকটি চরিত্র উলটিয়া পালটিয়া যায়, তাহা তাঁহাদের জ্ঞান নাই।

বুড়ার কথা

[কাঁচড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত উমানাথ রায় লিখিত। ইহাঁর বয়ঃক্রম তখন অশীতি বৎসর। ইনি এই প্রবন্ধের সূচনায় লিখিতেছেন—"এই অশীতি বৎসর বয়সে আমি যাহা দেখিয়াছি এবং স্বর্গীয় অতি-বৃদ্ধদের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিতে আরম্ভ করিলাম।"]

গাড়ি পাল্কি।—বোঁচা ও মেয়ানা পাল্কি, বজরা, তানজান ইত্যাদিতে বড়লোকেই চড়িতেন। বাঙ্গালির মধ্যে চুঁচুড়া-নিবাসী মৃত নীলমণি হালদার প্রথমে গাড়ি চড়েন, তাঁহার সাহেব কোচম্যান ছিল। তাঁহার দেখা দেখি কলিকাতার বড়মানুষেরা গাড়ি ধরিলেন। পূর্ব্বে এ প্রকার ছেক্‌ড়া গাড়ি ছিল না, দড়িতে ঝুলান নৌকা আকারের গাড়ি কয়েকখানা মাত্র ছিল।

বুড়ার সম্মান।—এখনকার নব্য সম্প্রদায় "বুড়া" মাত্রকেই "ওল্‌ড্ ফুল" বলিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্বে বুড়াদের অত্যন্ত সম্মান ছিল। গ্রামের বুড়া কলহ ভঞ্জন করিবেন, দলাদলি নিবারণ করিবেন, পঞ্জিকা দেখিয়া দিন স্থির করিবেন, বিবাহ শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য কর্ম্মোপলক্ষে আয়োজনাদির ব্যবস্থা দিবেন; এমন কি, তিনি গ্রামের শিরোমণি, যাহা বলিবেন তাহাই হইবে। গ্রামের জামাতারা আসিয়া অগ্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, নূতন লোক আসিয়া প্রথম তাঁহার সহিত আলাপ করিবেন, গ্রামস্থ নব্য দল তাঁহার নিকটে উচ্চ কথা কহিবে না, শীষ দিবে না, বা গান করিবে না, বৌ-ঝিরা সে পথে যাইলে মলের বাদ্য করিবে না; এমন কি, মাথায় ফের্‌তা দিয়া সেখান দিয়া কেহ যাইবে না।

বয়স্যের শৈশব-সরলতা।—কলিকাতার কোন বড় মানুষ প্রত্যহ বৈকালে গল্প শুনিতেন। গল্প করিবার জন্য মাহিনা করা চাকর নিযুক্ত ছিল। গল্পের নায়ক নায়িকা বা অপর কেহ যদি অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইত, বা তাহাদিগের কোন বিপদ উপস্থিত হইত, তাহা হইলে তিনি এত উত্তেজিত হইতেন যে তৎক্ষণাৎ বলিতেন "মেরো না মেরো না, ওকে বাঁচাও আমি দশ টাকা দিব" অথবা "ঐ বাঘটাকে তাড়াইয়া দেও, ঘুমন্ত কোটালের পুত্রের অনিষ্ট না হয়, আমি ৫ টাকা দিব।" কথকেরা ইচ্ছা করিয়া বাবুকে উত্তেজিত করিত ও নায়ক-নায়িকাদিগকে কষ্টে ফেলিয়া টাকা সংগ্রহ করিত।

গণিকা।—তখনকার অধিকাংশ লোকেই বেশ্যালয়ে গমন করিতেন। যাইবার কোন কদর্য্য অভিপ্রায় ছিল না। কেবল দশ জন ভদ্রলোকে একত্রিত হইয়া গান বাদ্দন, ক্রীড়া বা সদালাপ করা মাত্র। এ বিষয়ে পূর্ব্বকার গ্রীকদিগের সহিত বাঙ্গালীদের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কুটীয়ালেরা আফিস হইতে আসিয়া হস্তপদাদি ধৌত করিয়া, বৃদ্ধ ও আধ বৃদ্ধেরা হরি-নামের ঝুলি লইয়া বেশ্যালয়ে উপস্থিত হইতেন; বয়সের তারতম্য ছিল না, সকল বয়সের লোকই সমবেত হইতেন। অনেকে ঐ সমস্ত স্থানে "সহবৎ" শিক্ষা করিতে আসিতেন।

সম্পাদকের বৈঠক

বায়রণের কথোপকথনকালীন উক্তি

অমরত্ব।—আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসই জীবনের দুঃখ-কষ্ট নিবারণের একমাত্র প্রকৃত ঔষধ।

যশের যন্ত্রণা।—কোন গ্রন্থ জনসমাজে সমাদৃত হইলে তাহার লেখক চিরকালের জন্য অসুখী হয়েন। ইহাতে তাঁহার যশ-তৃষ্ণা এত দূর বর্দ্ধিত হয় যে, তাঁহার মন হইতে শান্তি চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়। তাহার একটি গ্রন্থ জনসমাজে আদৃত হওয়ায় তিনি উৎসাহিত হইয়া আরও অন্যান্য গ্রন্থ লিখিতে সচেষ্ট হয়েন; লোকেও প্রত্যাশা করে যে, তাঁহার প্রথম গ্রন্থ অপেক্ষা পরবর্ত্তী গ্রন্থগুলি আরও উৎকৃষ্ট হইবে। এই জন্য নিরাশা উপস্থিত হয়। কারণ লেখকের আশা এতদূর উত্তেজিত হয় যে, তাহা কিছুতেই পূর্ণ হয় না। বিশেষতঃ আজ কালের এইরূপ ধরণ যে, গ্রন্থকারের একটি রচনাও যদি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হয় তাহা হইলে আর তাঁহার রক্ষা নাই—তাঁহার পূর্ব্বরচিত যদি ৫০ খানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ থাকে তথাপি একটি নিকৃষ্ট গ্রন্থ তাঁহার পূর্ব্ব-কীর্ত্তির অপলাপ করে।

জীবন।—জীবনের স্বল্পতা লইয়া লোকে আক্ষেপ করে, জীবন অতি দীর্ঘ বলিয়া বরং তাহাদিগের আক্ষেপ করা উচিত। কারণ জীবনচক্রের অর্দ্ধ পথে যাইতে না যাইতেই জীবনের সমস্ত সুখ তিরোহিত হইয়া যায়। যে সকল ছলনার অস্তিত্বে জীবন ভারবহ বলিয়া বোধ হয় না, সেই সকল ছলনা-গুলি চলিয়া গিয়া যখন গম্ভীর উপদেষ্টা অভিজ্ঞতা আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করে তখন আর জীবনে কি সুখ? তাহার পূর্ব্বেই যাহারা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় তাহারা অতি ভাগ্যবান্। যৌবন যখন জীবন-তরণীর হাল ধরিয়া থাকে, প্রবৃত্তি-স্রোত যখন তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়—অভিজ্ঞতা তখন তফাৎ থাকেন। কিন্তু যখনি যৌবন পলায়ন করে ও প্রবৃত্তির বেগ মন্দীভূত হয়, যখন অভিজ্ঞতার সাহায্য আর প্রয়োজন হয় না, তখনি অভিজ্ঞতা আসিয়া অতীতের জন্য আমাদিগকে তিরস্কার করিতে থাকেন, বর্ত্তমানের প্রতি বিরক্তি জন্মাইয়া দেন, এবং ভবিষ্যতের জন্য ভয় প্রদর্শন করেন।

কবিতা-প্রবণ প্রকৃতি।—আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কবিতাপ্রবণ-প্রকৃতিতে কি একটি উপাদান আছে যাহা সুখের নিতান্ত বিরোধী। যাহার প্রকৃতি কবিতাপ্রবণ সে নিজেও সুখী হয় না—তাহার সম্পর্কীয় লোকদিগকেও সুখী হইতে দেয় না।

প্রতিভা ও জন-সমাজ।—জনসমাজ ও প্রতিভা এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী পদার্থ। প্রতিভা জনসমাজের সহিত অধিক কিম্বা ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিলে প্রায়ই অধোগতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রসিকতা ও কার্য্যপটুতা সম্বন্ধে সেরূপ নহে। এই দুইটিগুণ জন-সমাজের ঘর্ষণেই উত্তেজিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হয়।



মৃগয়া
প্রাচীন চিত্র হইতে

স্বেচ্ছাচারী

পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক

[শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত; অধ্যয়ন-অধ্যাপনে তাঁহার সময় অতিবাহিত হয় এবং গ্রামের জমিদার মুখোপাধ্যায়-গোষ্ঠীর পৈতৃক টোলের বৃত্তি ও ব্রহ্মোত্তরের আয়েই তাঁহার জীবিকা। তাঁহার একমাত্র পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র প্রথম হইতেই তীক্ষ্ণ মেধা ও অসাধারণ তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া অল্পকালের মধ্যেই গ্রামের সকলের পরিচিত হইয়া উঠে। গ্রামের জমিদার কালিকামোহন মুখোপাধ্যায় এই বালকের রূপেগুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার একমাত্র কন্যা শৈলজাসুন্দরীর সহিত ভবিষ্যতে বিবাহ দিবার ইচ্ছা করেন এবং সেইজন্য কার্ত্তিক ও তাহার বন্ধু সর্ব্বানন্দকে টোল ছাড়াইয়া গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। কালিকামোহন তাঁহার এই ইচ্ছাটা প্রথমে গোপন রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার দেওয়ান দুর্গাশঙ্কর শীঘ্রই তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিয়া তাঁহার মদ্যপ ও কুসঙ্গী পুত্র মণিশঙ্করের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে এই দুইটী জীবন্ত বাধাকে সরাইবার জন্য জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন। কিন্তু কার্ত্তিক তাহার প্রচণ্ড শক্তিতে সর্ব্বপ্রকার বাধা অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। শেষে একদিন মণিশঙ্করের মাতলামিতে দুর্গাশঙ্করের সর্ব্বপ্রকার আশা সমূলে উৎপাটিত হইল এবং মণিশঙ্করও লাঞ্ছিত হইয়া তাহার পিতার মস্তকে অপমানের বোঝা চাপাইয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল। কার্ত্তিক প্রথম হইতেই তেজস্বী এবং একরোখা—সে তাহার শক্তির পরিচয় সর্ব্বপ্রকারেই প্রদান করিয়া শীঘ্রই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কার্ত্তিকের পিতা সরলবুদ্ধি ব্রাহ্মণপণ্ডিত; তিনি এতদিন পর্য্যন্ত কালিকামোহনের মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ধনী ও বদান্য কালিকাবাবু যেমন সকলকেই মুক্তহস্তে সাহায্য করেন, কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দকে সেইরূপই করিতেছেন। কিন্তু তিনি যখন কালিকামোহনের মনের কথা বুঝিতে পারিলেন, তখন কার্ত্তিকের কলিকাতায় যাইয়া পড়াশুনা করার বিরোধী হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "সকলেই মনে করবে যে আমি টাকার লোভে ছেলে বিক্রী করেছি।" কিন্তু অবশেষে কালিকামোহনের অনুনয়-বিনয়ে ও কাতর প্রার্থনায় তিনিও শৈলজার সহিত কার্ত্তিকের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন। ইতিমধ্যে কার্ত্তিক জানিতে পারিল যে সর্ব্বানন্দ শৈলজাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, এবং সেইজন্য যাহাতে সর্ব্বানন্দর সহিত শৈলজার বিবাহ হয়, তাহার চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। তারপর যথাসময়ে সে তাহার বন্ধুর সহিত কলেজে এফ-এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেল।]

দ্বিতীয় খণ্ড

১

"বৈরাগ্যমেবাভয়ং"—সনাতন ভারতবর্ষের এই সনাতন উক্তির সনাতন সার্থকতা দেখাইবার জন্য মণিশঙ্কর পশ্চিমে নানা স্থানে ঘুরিয়া অবশেষে যখন আবার তাহার জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিল, তখন সে একজন প্রবল প্রাণায়ামী পরিব্রাজক পরমহংস। যদিও পরিব্রাজক ধর্ম্মের প্রচলিত রীতি-অনুসারে দ্বাদশ বর্ষের শেষভাগে একবার জন্মভূমিতে দেখা দিতে হয়, তথাপি 'তেজীয়সাং ন দোষায়' শাস্ত্রের এই বচনানুসারে পরিব্রাজকাচার্য্য শঙ্করানন্দ স্বামীজি ওরফে মণিশঙ্কর তাঁহার অজ্ঞাতবাসের দুই বৎসর অতীত

হইতে না হইতেই শিববামপুরে আপনার পূর্ব্ব পীঠস্থান পোড়া বাঙ্গলায় আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন না এবং সেই কারণেই তাঁহার পুণ্যনাম অচিরে দিকে দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। গ্রামের বৃদ্ধগণ বলিলেন, "মানুষ কি আর চিরদিন এক-রকমই থাকে? সুবাতাস বহিলে সকলেরই পরিবর্ত্তন হয়। আহা, মণির আমাদের কি সুন্দর পরিবর্ত্তনই হইয়াছে! হইবে না কেন? সনাতন ধর্ম্ম!"

সনাতন ধর্ম্মের এই অপূর্ব্ব সন্তানটির কীর্ত্তি-কলাপের কথা ইতিমধ্যে সুপ্রচারিত হওয়ায় সে সংবাদ যথারীতি জমিদারী অন্তঃপুরেও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। গ্রামস্থ অন্যান্য ভদ্র পুরাঙ্গনাগণ যেমন সাধু দর্শনার্থ মাঝে মাঝে পোড়া বাঙ্গলায় যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন, কালিকা-বাবুর পুরমহিলাগণের মধ্যেও সেইরূপ করিবার একটা কথাবার্ত্তা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। নবীন স্বামীজিটির যশের অন্যান্য নানাবিধ কারণের মধ্যে একটী কারণ ইহাই ছিল যে, তিনি নাকি শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদিতে সিদ্ধহস্ত এবং নাস্তিপুরের রাজকন্যার দুই চারি বৎসরের মূর্চ্ছারোগ তিনি নাকি তিন দিনের স্বস্ত্যয়নে আরাম করিয়াছেন! সর্ব্বোপরি তিনি সামুদ্রিক বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া আসিয়াছেন।

যদি কোন হতভাগ্য ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিত, দুই-এক বৎসরের মধ্যে মণিশঙ্কর এত শিখিল কি করিয়া! তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে স্বামীজির নবীন ভক্তগণের দ্বারা তিরস্কৃত হইত। কেহ বলিত, "দৈবশক্তির দ্বারা কি না হয়?" যাঁহারা অধিকতর বুদ্ধিমান, তাঁহারা বলিতেন, "কেমন করিয়া হইল, সে প্রশ্নের কি প্রয়োজন! গণনার ফলই স্বামী শঙ্করানন্দের অমানুষিক ক্ষমতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।" স্বামীজির এমনি অদ্ভুত ক্ষমতা যে তিনি হাত দেখিয়া বলিয়া দিতে পারেন, কোন্ ব্যক্তির গৃহ কোন্ দুয়ারী এবং সেই গৃহের ঈশান কিম্বা নৈঋৎ কোণে কোনও বৃক্ষাদি আছে কি না। এমন কি সদর রাস্তা সেই গৃহের কোন্ দিকে, তাহাও অধিকাংশ সময় মিলিয়া যায়। তবে যদি কখনও তাঁহার ভুল হয়, সে ভুল ব্যস্ততা-প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকে, কারণ স্বামীজির নিকট লোক-সমাগমের বিরাম নাই।

স্বামীজির গণনা-শক্তির একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। নিকটস্থ গ্রাম হইতে এক বৃদ্ধ গোপজাতীয় ব্যক্তি স্বামীজির নিকট আপনার ভাগ্য-গণনার জন্য উপস্থিত হইল, এবং সাড়ম্বরে একটী রজত মুদ্রা পরমহংসের পদতলে রাখিয়া প্রণাম করিল। পরিব্রাজকাচার্য্য তৎক্ষণাৎ বৃশ্চিক-দষ্ট ব্যক্তির ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি ভয়ঙ্কর! এ লোকটি, দেখছি, ঘোর-বিষয়ী! সন্ন্যাসী যোগীর কাছে এসেও টাকার কথা ভুলতে পারেনি! টাকা-কড়ির চেষ্টায় আমার কাছে কেন, বাপু?" বৃদ্ধ গোয়ালাটি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এ কি মানুষ! আমার মনের কথা আসতে মাত্র ধরেছে! বাবাঠাকুর, আমি বড় গরীব, আমায় দয়া কর—হাতটি দেখ।"

মণিশঙ্কর কহিল, "হাত দেখাতে এসেছিস্ ত টাকা এনেছিস কেন?"

ভক্তগণের মধ্যে একজন তখন ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ওহে বাপু, উনি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী; ওঁকে কি টাকার লোভ দেখাতে আছে? টাকাটা তুলে নাও, দেখছ না, উনি টাকার জন্য বসতে পাচ্ছেন না!"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি টাকাটা উঠাইয়া লইয়া বলিল, "বাবাঠাকুর, আমি গরীব, আমার কপালে কি যে লিখেছে বিধেতা, তা জানিনে! আমার চার-চারটে গরু মরে গেল। দেখ দেখি বাবা-ঠাকুর, আর কতদিন এমনি চলবে?"

শঙ্করানন্দ স্বামী আসন পরিগ্রহ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ওরে তোদের গ্রামে চামার আছে?"

বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বলিল, "আজ্ঞে আছে বই কি!" স্বামীজি পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, "তাদের মধ্যে বেঁটে মোটা কালো রংয়ের যে, সে-ই তোর শত্রু, সে-ই তোর গরুদের বিষ দিয়ে মারছে। তাকে বিশ্বাস করিসনে।"

বৃদ্ধ চমকিত হইয়া বলিল, "এঁ্যা, হারাণে! হারাণে বেটার এই কাজ! ভাগ্যে বাবাঠাকুর তোমার কাছে এয়েছিলুম! দাঁড়া বেটা, তোর চামারগিরি বার করছি!"

বৃদ্ধ আরও দুই-চারিটী প্রশ্নের সঠিক উত্তর গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল। তৎপরে এই সংবাদ নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করিয়া সারা গ্রামময় রাষ্ট্র হইতে বাকী রহিল না।

তবে যেমন সকল মহৎ ব্যক্তিরই শত্রু থাকে, তেমনি স্বামীজিরও দুই-একজন শত্রু জুটিয়াছিল। গ্রাম্য বিদ্যালয়ের দুই-একটী ত্রিপণ্ড ছাত্র স্বামীজির বৈরাগ্যমেবাভয়ং এই সূত্রের অদ্ভুত ব্যাখ্যাও বাহির করিয়াছিল। তাহারা বলিত, শঙ্করানন্দ পরমহংস নন, পরম বক; এবং বৈরাগীর বেশ তাঁহার ভণ্ডামির আশ্রয়, তাই বৈরাগ্যই তাঁহার পক্ষে অভয়। অবশ্য এ ব্যাখ্যার জন্য তাহারা গুরুজনের নিকট যথারীতি শাস্তি পাইত বটে, তবুও তাহারা এ কথা বলিতে ছাড়িত না।

তাঁহার সম্বন্ধে এইরকম একটু-আধটু সন্দেহজনক জনরব প্রচারিত হইবার কারণও ছিল। স্বামীজি প্রতিরাত্রে পূজায় বসিয়া বীরাচার-মতে দুই-এক বোতল কারণ-সলিল বা সুধাপান করিতেন এবং ভক্তির আবেগে মধ্যরাত্রের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রাসভ-নিন্দিত স্বরে যখন গান ধরিতেন,

"সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই
জয় কালী বলে,
আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ
যত মদ-মাতালে মাতাল বলে।"

তখন পথিকের চিত্তে ভক্তি-মোহের পরিবর্ত্তে ত্রাসেরই সঞ্চার হইত। কিন্তু অন্তরে অন্তরে "মহাকৌল" হইয়াও বাহ্যতঃ তিনি কখনও সে ভাব প্রকাশ করিতেন না; যদি কোন সংশয়ী শিষ্য তাঁহার এই অসমঞ্জস ভাবদ্বয়ের বিষয়ে কোন প্রশ্ন তুলিত, তাহা হইলে তিনি মৃদু হাসিয়া বলিতেন,

অন্তঃ শাক্তঃ বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ।

অন্তরে শাক্ত রহিয়া বাহিরে শৈবের ন্যায় আচরণ করিবে এবং সভায় বৈষ্ণবের ন্যায় কথা কহিবে। ইহাই হইতেছে কুলধর্ম্ম, ইহাই শিববাক্য।

২

এ-হেন মহাপুরুষ যে তাঁহার লৌকিক পিতামাতার সহিত আপনার জ্ঞানগরিষ্ঠ চরিত্রোচিত ব্যবহার করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করাই অন্যায়। ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্ন ভ্রাতা,—কেহই কিছু নয়, সকলেই মায়ার বিজৃম্ভন মাত্র। অতএব এই "শিব-স্বরূপ" পুত্রের, এই চলন্ত শঙ্করের মাতা হইয়া নিস্তারিণী দেবী স্বভাবতই আপনাকে ধন্যা মনে করিতেছিলেন। কিন্তু পিতার সহিত এই মহাপুরুষ-সন্তানের প্রথম দর্শনেই চোখে চোখে যে কথা হইয়া গিয়াছিল, স্থূল শরীরে যে যে ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছিল, সে কথা প্রাকৃত লোকের বুদ্ধির অগম্যই রহিয়া গিয়াছে।

সে যাহা হউক, প্রভুপাদ শঙ্করানন্দের পিতা-মাতা উভয়েই উপযুক্ত পুত্রের যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে নানাভাবে বিস্তারিত করিতে ত্রুটি -রাখেন নাই; এবং তাঁহাদের, বিশেষতঃ নিস্তারিণী দেবীর সহিত শিবচন্দ্র ন্যায়রত্নের পত্নী মনোরমা দেবীর বিশেষ সখিত্ব থাকায় শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন কোন-এক প্রভাতে শঙ্করানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন ও স্বামীজির সদালাপে মুগ্ধ হইয়া গৃহে গিয়া কেবলমাত্র এই কথাটী উচ্চারণ করিলেন, "কাকঃ কাকঃ।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় উঠিয়া গেলে সহসা স্বামীজির চিত্তে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি যেন সহসা একটা প্রচণ্ড বিষাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বলিলেন, "অহো, এমন জ্ঞানী পিতার এমন কুসন্তান!" শিষ্যগণ প্রভুর মুখ হইতে এবম্বিধ বাক্য উচ্চারিত হইতে শুনিয়া বিস্মিত হইল। কিন্তু কেহই প্রভুর উক্ত প্রকার অদ্ভুত উক্তির কারণ জানিতে পারিল না। প্রভু কেবল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ক্রমশঃ এই কথাটী অজ্ঞাত উপায়ে জমিদারী অন্তঃপুরেও প্রচারিত হইয়া গেল। কালিকাবাবুর মাতা পুত্রকে ধরিয়া বসিলেন যে অদ্য কালিকাবাবু স্বয়ং গিয়া এ-বিষয়ে সঠিক সংবাদ জানিয়া আসুন। কালিকাবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মণিশঙ্করের কথায় যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে যে-কোন মাতালের মাতলামিতেও বিশ্বাস করতে হবে।"

মাতা বলিলেন, "কিন্তু মণি আর যাই হোক, ওর কথা যে শুনছি অনেক সময় ফলে যায়। ওর একটা-কিছু ক্ষমতা হয়েছে নিশ্চয়, নইলে এত লোক ওকে মানবে কেন?"

কালিকাবাবু কহিলেন, "মা, সহজে বিশ্বাস করা সাধারণ লোকের একটা রোগ। বিশেষ যদি তার সঙ্গে দৈব শক্তি-টক্তির ভণ্ডামি থাকে, তাহলে ত আর কথাই নেই। আমায় যদি স্বয়ং ভগবান এসে বলেন যে মণিশঙ্কর সাধু হয়েছে, তাহলেও আমি সে কথা বিশ্বাস করব না।"

মাতা কহিলেন, "এ তোমার অন্যায়! সাধু-সঙ্গে কি না হয়?"

"হ্যাঁ, সাধু-সঙ্গ হলে! কিন্তু ওর যে

সাধু-সঙ্গ হয়েছিল, তা কে বল্লে? তা-ছাড়া আমার বিশ্বাস, কয়লাকে হাজার ধুলেও তার কালো রং যায় না।"

"কিন্তু আগুনে লাগলে সে কালি যেতে পারে ত।"

"মা, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, দেশের যত ওঁছা ত্রিপণ্ড্র, মায়ে-তাড়ান বাপে-খ্যাদান ছোঁড়া ওর সঙ্গে গিয়ে জুটেছে। সাধুর প্রথম লক্ষণ এই যে তার কাছে গিয়ে বসলেই মনটা ঠাণ্ডা হবে। সাধু-চরিত্র ঠিক চিনির গুদোমের মত, ঘরে ঢুকলেই মুখটা মিষ্টি মিষ্টি হয়ে যাবে। যার একটুও ভাল-মন্দ বিচার করবার ক্ষমতা আছে, সে-ই ওর কাছ থেকে ফিরে এসে বলছে, ওর মধ্যে আঠারো-আনাই ভণ্ডামি। বাস্তবিক শান্ত প্রকৃতির সাধু-চরিত্রের লোক কি একটিও এ-পর্য্যন্ত ওর সঙ্গী হয়েছে? ইংরিজিতে একটা চলিত কথা আছে, যার মানে হচ্চে, মানুষের সঙ্গী দেখেই তার চরিত্র ধরা যায়।"

মাতা কহিলেন, "তোমাদের ইংরিজি-পড়া লোকেদের ঐ কেমন এক ধরণ! কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না! কিন্তু ডাকিনী যোগিনী সিদ্ধি এ সবও যে শুনি আজকাল বড় বড় ইংরিজি-জানা লোকও মানছে। বিলেতে সাহেবরাও না কি মানছে।"

"তা মানুকগে, মা, আমি মানতে পারব না।"

"যাই হোক, তুমি কার্ত্তিকের বিষয় তাহলে খোঁজ নাও।"

"তার খোঁজ আমি রোজই পাই মা, এই ত কালও মনোহর তার বিষয় লিখেছে। মনোহরের ছেলে শশীর সঙ্গে কার্ত্তিক আর সর্ব্বানন্দর খুব ভাব হয়েছে। তার কাছ থেকে মনোহর রোজই কার্ত্তিকের খবর পায়।"

"তোমার টৌর্ণি বাবুকেও চিঠি লিখে দাও। কি জানি, সহর বাজার স্থান—কার্ত্তিক হয়ত—"

"তুমি ভয় করো না। আমি কার্ত্তিকের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রেখেছি, নইলে কি এতদিন ধরে আমার মেয়ের বিয়ে না হয়ে থাকে? কার্ত্তিক যদি সহজে নষ্ট হবার মত ছেলে হত, তাহলে এমন করে ওকে পাবার জন্য চেষ্টা করতুম না।"

তথাপি কালিকাবাবুর মাতা জগদম্বা দেবীর সন্দেহ দূর হইল না। তিনি নানা কৌশলে মণিশঙ্করের নিকট হইতে কার্ত্তিকের সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজির সেই এক কথা, —"আমি কখন্ কি যে বলি, সব কি আমার মনে থাকে? যখন যে ভাব যে কথা গুরুর কৃপায় আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভেসে ওঠে, তখন তাই প্রকাশ করি। তবে যদি কারও কিছু জানবার দরকার থাকে, সে যেন একটা হরিতকী হাতে করে জিজ্ঞাসু-ভাবে আমার কাছে আসে, তাহলে তার প্রশ্নের সদুত্তর আপনিই আমার মনে উদয় হবে এবং সেও জান্‌তে পারবে।"

কালিকাবাবুর মাতা জগদম্বা দেবী ব্যস্ত হইয়া একদিন মণিশঙ্করের মাতা নিস্তারিণী দেবীকে ধরিয়া বসিলেন যে তাঁহাকে সঠিক সংবাদ আনিয়া দিতে হইবে। আর যদি নিস্তারিণী দেবী অক্ষম হন, তাহা হইলে

জগদম্বা দেবী স্বয়ং একদিন তাহার কাছে যাইবেন। শৈলজার মাতা ইন্দিরা দেবী এ সংবাদে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে মৃদু অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "মা, আপনি কেন এত ব্যস্ত হচ্চেন? উনি যখন নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, তখন আমাদের ভয় কি? আর আপনি এই রকম কাণ্ড করছেন শুনলে উনি দুঃখিত হবেন। সে দিন তিনু ঠাকুরঝি ক্ষান্ত পিশি মণির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন বলে উনি কত রাগ করলেন! তার ওপর যদি আপনি যান, তাহলে উনি বড্ড দুঃখিত হবেন।"

জগদম্বা কহিলেন, "বৌমা, শৈল ত তোমাদের একার নয়! ওর কিসে ভাল-মন্দ হবে, তা আমিও বুঝি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি যা করছি, তাতে কেউ দোষ দিতে পারবে না।"

ইন্দিরা দেবী ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিলেন। জগদম্বা দেবী শৈলজাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শৈলজা আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, "ওরে তোর মণি-দার সঙ্গে একদিন দেখা করতে যাবি? সে এখন মস্ত সাধু হয়ে এসেছে। চল্‌না, একবার দেখে আসি।"

শৈল কহিল, "মণিদার সঙ্গে দেখা করতে যাব! কেন?"

জগদম্বা কহিলেন, "শুনিসনে, সে না কি ভারি গুণতে পারে! চল্, তোর হাতটা দেখিয়ে আনি।"

শৈল কহিল, "কেন, আমার হাত দেখিয়ে আবার কি হবে?"

জগদম্বা কহিলেন, "তোর কেমন বর হবে, সেটা জানবি নে?"

শৈলজা হাসিয়া বলিল, "সে তখন যেমন হয় হবে, তার জন্য আমি এখন থেকে ভাবতে যাব কেন?"

জগদম্বা কহিলেন, "তুই ভাববি না ত কে ভাববে?"

শৈলজা কহিল, "যার দরকার হয়, সে ভাবুকগে, আমি ভাবব না।"

জগদম্বা কহিলেন, "অর্থাৎ তোর ভাবা-টাবা সব ফুরিয়ে গিয়েছে, এখন কেবল হাতে পেলেই হয়, কেমন?"

শৈল কহিল, "যাও, তুমি বড় দুষ্টু! আমি চল্লুম।"

জগদম্বা কহিলেন, "আহা, চল্ না! তোকে যে বিয়ে করবে, সে কেমন লোক হবে, এ কথা কি জান্‌তে ইচ্ছে করে না?"

শৈল কহিল, "কে কেমন হবে, তা কি কেউ হাত দেখে বলে দিতে পারে না কি?"

জগদম্বা কহিলেন, "যারা গুণতে জানে, তারা পারে।"

শৈল কহিল, "তা পারুক, আমি সে সব গুণে-টুনে দেখতে চাইনে।"

জগদম্বা কহিলেন, "কেন, শুনি?"

শৈল কহিল, "কেন আবার কি! আমি বারে বারে তোমার 'কেন'র উত্তর দিতে পারব না,—আমি কোথাও যাব না।"

জগদম্বা এইবার গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আমার কথা তবে রাখবিনে? তোর বাবার ভয় করছিস? আমি নিয়ে গেলে সে কিচ্ছু বলবে না।"

শৈল কহিল, "আর যদি আমিই না যাই?"

জগদম্বা কহিলেন, "তাহলে আর আমি কি করব!"

শৈল কহিল, "তবে সেই বেশ কথা! আমিই যাব না। কোথাকার একটা কে, মদো-মাতাল গাঁজাখোর লোক, তার কাছে হাত দেখাতে যেতে হবে! তোমার দিন দিন বুদ্ধি-শুদ্ধি যেন কি হয়ে যাচ্ছে!"

জগদম্বা কহিলেন, "কোথাকার কে কেন হতে যাবে? ও যে আমাদের মণি।"

শৈল কহিল, "হলই বা মণি! কে ওর মনের ভিতর ঢুকে দেখতে গিয়েছে যে, ওর মনে কি আছে? এই ত' বছর-দুই আগে ও একটা মস্ত মাতাল বওয়াটে ছিল। এরই মধ্যে দুবছর যেতে না যেতে একখানা গেরুয়া কাপড় পরে এল, আর অমনি তোমরা দেশশুদ্ধ লোক ওর পেছনে ছুটতে আরম্ভ করেছ। তোমার যেখানে ইচ্ছে যাও, মা যেখানে যেতে বারণ করেন, সেখানে আমি কিছুতেই যাব না।"

শৈলজা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। জগদম্বা দেবী নানা প্রকারে বুঝাইয়াও কিছুতেই তাহাকে মণিশঙ্করের নিকট হাত দেখাইতে লইয়া যাইতে পারিলেন না। শেষে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "হায় হায়, দেবতা-বামুনে ভক্তি আজকাল কোথায় চলে গেল? হায় রে সেকাল!"

৩

কলিকাতার কোন এক প্রসিদ্ধ কলেজের সেকণ্ড ইয়ার ক্লাশে সংস্কৃত অধ্যাপক প্রবেশ করিবামাত্র ছাত্রগণ নানারূপ গল্প-গুজবে প্রবৃত্ত হইল। অধ্যাপক মহাশয় 'রোল্' 'কল্' করিয়া রঘুবংশের কোন এক সর্গের শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র কয়েকজন ছাত্র সর্ব্বানন্দকে ধরিয়া বলিল, "সর্ব্ব-দা, আজ পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে ব্যাকরণ-ঘটিত একটা তর্ক জুড়ে দাও, আমরা একটু মজা করি।"

সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বসিল, "রোজ রোজ তোমাদের জন্য পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারিনে।"

যোগীন্দ্র নাছোড়-বন্দা। সে বলিল, "সে হবে না সর্ব্ব-দা, তোমায় তর্ক করতেই হবে। ঐ দেখ, পণ্ডিত মশায় কেবল বাঁকা চোখে তোমার দিকে চাচ্ছেন। তোমাকেই সব-চেয়ে সমজদার ছাত্র বলে জানেন। তুমি চুপ করে থাকলে আজকের ঘণ্টাটাই উনি ব্যর্থ মনে করবেন।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তা করুন! আজ আমার নিশ্চুপের পালা। আজ কার্ত্তিককে গিয়ে ধর্ না।"

পিছন হইতে কালো-কোলো মোটা-সোটা দেবনাথ তাহার অসম্পূর্ণোদ্গত গুম্ফে তা' দিতে দিতে বলিল, "ওখানে দাঁত ফুটবে না, তার চেয়ে বাইরে চলুন, সর্ব্ববাবু, আপনার উদ্ভট শোনা যাক গিয়ে।"

গীতবাতিকগ্রস্ত কাব্য-কূপ সত্যজীবন তাহার স্বাভাবিক ব্যস্ততা দেখাইয়া অতি দ্রুতবেগে বলিল, "উদ্ভট কবিতা, উদ্ভট কবিতা! আমি—আমি—আমি সেদিন যে একটা চমৎকার কবিতা পেয়েছি, তার কাছে, তার কাছে, সব, বুঝেছ কি না, সব কবিতা meaningless trash বলে মনে হবে। কবিতাটা ঠিক যেন ইয়ের মত,—মন-প্রাণ একেবারে উঃ, সে কি বলব, ভাই!"

দেবনাথ তাহার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া বলিল, "তা আর বলে কাজ নেই।"

সত্যজীবন কহিল, "ওহে না, না, সেদিন আমি যাঁর কাছ থেকে শুনলুম—"

যোগীন্দ্র কহিল, "ওঃ বোঝা গেছে! যাঁর কাছ থেকে শুনেছ, তাঁরই কমনীয় কণ্ঠের যোগ থাকাতে সেটা এত সুমিষ্ট হয়ে উঠেছিল।"

বন্ধুদের দলে একটা চাপা হাসির স্রোত বহিয়া গেল। সত্যজীবনের মনের "চর্ম্ম"টা কিঞ্চিৎ স্থূল, তাই যোগীন্দ্রর বিদ্রূপে সে-ই বেশী হাসিল; কিন্তু পরক্ষণেই অতি প্রবলবেগে হাত-মুখ নাড়িয়া সে বলিল, "তোমরা যদি তাঁর গলা শুনতে, তাহলে আর সে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করতে না! আঃ, সে কি সুন্দর! গলা ত নয়, যেন—"

দেবনাথ বাধা দিয়া কহিল, "মিছরির ছুরি! চোরের নাক কাটা চলে! খেতেও মিষ্টি!"

আবার চাপা হাস্যধ্বনি উত্থিত হইতেই সর্ব্বানন্দ বলিল, "ওহে, পণ্ডিত মশায় চশমার ওপর দিয়ে ঘন-ঘন এ ধারে তাকাচ্ছেন। তোমরা বাইরে যাও।"

সত্যজীবন তাহার "তিনি"র গল্প করিবার জন্য ছটফট করিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি বলিল, "তাই চল, তাই চল।"

যোগীন্দ্র তাহার পার্শ্বস্থিত 'ঠাকুরদা'-নামধারী প্রকাণ্ড-কালো-দাড়ী-সমন্বিত নিদ্রিত বন্ধুটীকে একটা খোঁচা মারিয়া জাগাইয়া দিল। এই ঠাকুরদা দশ-বারো বৎসর ধরিয়া এফ, এ পরীক্ষায় ফেল হইয়া উক্ত উপাধিটি অর্জ্জন করিয়াছিল, এবং আপনার বহু-দিনের অধিকারের ফলে যে-কোন ঘণ্টায় নিদ্রা যাইবার একটা অবাধ ও চিরস্থায়ী সত্ব প্রফেসর ও ছাত্রগণের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছিল। খোঁচা খাইয়া 'ঠাকুরদা' তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটী উন্মীলিত করিয়া একবার কক্ষের চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইল, তারপর মৃদু স্বরে বলিল, "ওঃ, পণ্ডিত এসেছে! চল্ রে, তামাক খেয়ে আসি।"

যোগীন্দ্র ও সত্যজীবন সর্ব্বানন্দকে টানাটানি আরম্ভ করিতেই কিঞ্চিৎ দূরস্থিত কার্ত্তিকের দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল। কার্ত্তিক তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরাইয়া লইল বটে, কিন্তু সর্ব্বানন্দ আর উঠিতে পারিল না। যোগীন্দ্র তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কার্ত্তিক কি তোমার অভিভাবক না কি যে, ওর মত না নিয়ে তুমি নড়বে না?"

ঠাকুরদা হাই তুলিয়া বলিল, "কার্ত্তিকটাকেও ডেকে নাও না। ও'ই বা কি করছে বসে?"

যোগীন্দ্র কার্ত্তিকের নিকট গিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, ঠাকুরদা তোমায় ডাকছে, এস।"

কার্ত্তিক তাহাদের সঙ্গে বাহিরে আসিয়া বলিল, "সর্ব্ব-দা, দিন-দিন তোমার এ কি হচ্ছে? পণ্ডিতমশায় নিরীহ গোবেচারা বলে তাঁকে কেন তোমরা এমনভাবে রোজ রোজ অপমান কর? তোমাকে উনি সব চাইতে বেশী ভালবাসেন, আর তুমিই ওঁকে সব-চাইতে বেশী অবহেলা দেখাচ্ছ!"

সর্ব্বানন্দ লজ্জিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় যোগীন্দ্র রাগিয়া বলিল, "এদিকে ত' দাদা বলা হয়, কিন্তু কথা শুনে মনে হয়, যেন তুমিই ওর দাদা!"

কার্ত্তিক কহিল, "অন্যায় দেখলে সকলকেই সাবধান করা যেতে পারে, তাতে বড়-ছোট বলে কোন কথা মনে রাখবার দরকার নেই।"

সত্যজীবন বেগতিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি যোগীন্দ্র আর কার্ত্তিকের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আরে যেতে দাও, যোগীন। কার্ত্তিকবাবু, রাগ করবেন না। আমিই একটা কথার জন্য সর্ব্ববাবুকে ডেকে এনেছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "কি কথা?"

ঠাকুরদার নিদ্রার ঘোর সিগারেটের ধোঁয়ায় ক্রমশঃ কাটিয়া আসিতেছিল, তাই সে দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "আরে, সে কথা কি তোর সঙ্গে হতে পারে রে বেরসিক? সতুর কথার মর্ম্ম যারা বুঝবে, তাদের কাছেই ও বলবে। তুই আমার কাছে আয়, একটা কথা আছে। ও চ্যাংড়াদের ছেড়ে দে।"

বয়সে চৌদ্দ-পনেরো বৎসরের তফাৎ হইলেও এই ঠাকুর্দ্দা ওরফে শশিভূষণের সঙ্গে কার্ত্তিকচন্দ্রের এই কয় মাসের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। শশিভূষণ মনোহর বসু মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। মনোহরবাবু সীতাপুরের জমিদার এবং কালিকাবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু। পুত্র শশিভূষণ যখন বারম্বার চেষ্টা করিয়াও এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না, তখন তিনি পুত্রকে লেখাপড়া ছাড়িয়া গ্রামে ফিরিয়া কাজকর্ম্ম দেখিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পুত্র শশিভূষণ পত্রোত্তরে লিখিল, সেকণ্ড ইয়ারের বেঞ্চখানার মায়া সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। দ্বিপ্রহরে একবার কলেজে গিয়া ঐ বেঞ্চখানায় বসিয়া ঐ ডেস্কের উপর মাথা রাখিয়া না ঘুমাইলে তাহার সারারাত্রি নিদ্রা হইবে না। এমন কি রবিবার প্রভৃতি ছুটির দিনে অন্ততঃ এক মিনিটের জন্যও সে দরোয়ানদের দ্বারা দ্বার খোলাইয়া সেই বেঞ্চখানায় বসিয়া আসে। অতএব যতদিন না ঐ বেঞ্চখানা ভাঙ্গিবে, ততদিন আর শশীর নিস্তার নাই, তাহাকে কলেজে যাইতেই হইবে!

স্নেহ-দুর্ব্বল পিতা আর কোন উপায় নাই দেখিয়া মাসে মাসে যথারীতি টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। পুত্রও এক পুরাতন পুস্তকের দোকান হইতে সের বা মণ-দরে কতকগুলি অতি পুরাতন পুস্তক কিনিয়া আনিয়া একটা আলমারি সাজাইয়া রাখিল এবং কলেজের নিয়মিত নিদ্রায় ও প্রতি সন্ধ্যার উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে পরম সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিল।

কার্ত্তিক ঘাসের উপর বসিয়া পড়িয়া নিকটস্থ পুষ্পবৃক্ষ হইতে একটা ডাল ভাঙ্গিয়া লইল এবং সপত্র সেই ডালটাকে মাটির উপর আছাড় মারিতে মারিতে বলিল, "কি কথা?"

শশিভূষণ দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "আমি এক মুস্কিলে পড়েছি। বুড়োবয়সে বাবা বলছেন, আবার বিয়ে কর। এখন এর উপায় কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "বিশ-পঁচিশ বছরে কেউ বুড়ো হয় না। তুমি যদি বুড়ো হও, আমরা তাহলে কি প্রৌঢ় না কি!"

শশিভূষণ কহিল, "তুমি আমার চেয়েও

বুড়ো। বয়স নিয়ে কি হবে? যাক্ ও কথা। এখন উপায় কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "উপায় আবার কি! তোমার বাবা যখন ধরেছেন, তখন হয় বিয়ে কর, নয় সাফ লিখে দাও, করব না।"

"লিখে না হয় দিলুম, কিন্তু কারণ কি দেখাব?"

"কারণ আবার কি! বিয়ে করা না করা তোমার ইচ্ছে।"

"উঁহুঃ আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে ত নয়,—"

"তবে কার?"

"সেই কথাই তোকে বলব। আজ আমার ওখানে সন্ধ্যার সময় যাস্, সর্ব্বাকেও নিয়ে যাস্। ওকেই আমার বিশেষ দরকার।"

ইতিমধ্যে দেবনাথ নিকটে আসিয়া বলিল, "ওহে ঠাকুরদা, সতুর কথা শোনো, ও বলে কি যে ওর সে ইতিমধ্যে ওকে এমন সব পত্র লিখে ফেলেছে, যা বঙ্গসাহিত্যে কাউপারের letterএর স্থান অধিকার করবে!"

সত্যজীবন উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করছ না?"

শশিভূষণ কহিল, "ওরা বিশ্বাস না করুক, আমি করি। প্রেম-পত্রের ঠেলায় এই যে এত-বড় দাড়ী দেখছ, এর প্রত্যেক গাছিতে পাক ধরে গেছে। সতু ভাই, মাভৈঃ, আমি তোকে বিশ্বাস করি।"

সত্যজীবন কহিল, "ঠাকুরদা, ঠাট্টা করছ? কিন্তু সেগুলো যদি তোমায় দেখাতে পারতুম, তা'লে—"

শশিভূষণ কহিল, "অমন কাজটি করো না, ভাই। প্রেমপত্র আর সব সইতে পারে, পকেটের বাইরে আসা শুধু সইতে পারে না। প্রেমেরও যেমন আঁধারে স্বভাব, প্রেমপত্রেরও তেমনি সর্দ্দির ধাত,—ঠাণ্ডা লাগিয়েছ, কি সর্ব্বনাশ!"

ইতিমধ্যে সে ঘণ্টা শেষ হইয়া যাওয়ায় বন্ধুগণের সভাভঙ্গ হইল এবং তাহারা তাড়াতাড়ি ক্লাসে ফিরিয়া আসন গ্রহণ করিল।

কলেজের ছুটী হইলে সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিক তাহাদের বেনেটোলা লেনের মেশের একটা কক্ষে যাইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন ও কিঞ্চিৎ জলযোগ সারিয়া চাঁপাতলায় শশিভূষণের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। শশিভূষণ একটা ষ্টোভে চায়ের জল চড়াইয়া ভৃত্য রঘুনাথ উড়েকে তামাক কিনিয়া না রাখার জন্য বকিতেছিল; এবং মাঝে মাঝে তাহার সযত্ন-বর্দ্ধিত দাড়ীর উপর সিগারেটের ছাই পড়াতে তাহাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে রেলিংয়ের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছিল, সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিক আসিতেছে কি না।

কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ আসিয়া পৌঁছিলে সে বলিল, "তোরা চা-ও খাবিনে, তামাকও খাবিনে, কি দিয়ে তোদের অভ্যর্থনা করি?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "মৃদু মধুর হাস্য দিয়ে।"

শশিভূষণ কহিল, "তাও ত ঐ দাড়ীর ফাঁকে মিলিয়ে যাবে।"

শশিভূষণ চা প্রস্তুত করিয়া পান করিতে লাগিল। ইত্যবসরে চাকর আসিয়া গড়গড়ায় তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। একচুমুক

করিয়া চা ও একটান করিয়া তামাক সেবন করিতে করিতে শশিভূষণ বলিল, "আজ তোদের কেন ডেকেছি, জানিস?"

সর্ব্বানন্দ বলিল "জানি বৈ কি! খুব বড়রকম একটা ভোজের আয়োজন করতে।"

শশিভূষণ কহিল, "হ্যাঁ, সে কথা ঠিক বটে! তবে কে যে তার খরচ জোগাবে, সেটা এখনও ঠিক হয় নি। যাক্, আজ আমার সঙ্গে এক জায়গায় তোদের যেতে হবে।"

কার্ত্তিক কহিল, "ভোজের জোগাড় করতে ত? খুব রাজি আছি।"

শশিভূষণ কহিল, "এখন ত বলছিস্, খুব রাজি, কিন্তু কোঁৎকা দেখে তখন যেন পেছুস নে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সে আবার কি, ঠাকুরদা? কোৎকা-টোৎকার ভয় থাকে ত' আমি ভাই তাতে নেই। গরীব গুঁটী মাছের প্রাণ, আমায় দুটো-একটা সন্দেশ টন্দেশ দাও ত কষ্টে-সৃষ্টে খেতে পারি।"

শশিভূষণ কহিল, "আগে থাকতে ভয় পেলে কোন শক্ত কাজই করা যায় না। যাক, ভণিতা ছেড়ে, চল্, একটা কাজ করি আগে।"

শশিভূষণ উঠিয়া পাশের ঘরের দরজা খুলিল। এই ঘরটা সর্ব্বদাই বন্ধ থাকিত, কেহ কখনও শশীকে ও ঘর খুলিতে দেখে নাই এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেও সে কখনও কোন উত্তর দিত না। আজ হঠাৎ ঐ কক্ষ উন্মুক্ত হইলে সর্ব্বানন্দ উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিল, "ব্যাপার কি, ঠাকুরদা, আজ কি তোমার যক্ষের ধনাগার আমাদের দেখাবে না কি? এত অনুগ্রহ কেন আজ!"

শশী কোন উত্তর দিল না, গম্ভীর ভাবে উক্ত কক্ষের জানালা-দরজাগুলি খুলিয়া দিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "এস তোমরা!"

তাহারা কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কক্ষটী বেশ প্রশস্ত। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের উন্মুক্ত গবাক্ষ হইতে আলো ও বাতাস আসিবার দিব্য বন্দোবস্ত রহিয়াছে। বাসার অন্যান্য কক্ষ হইতে এটি সর্ব্ব-প্রকারেই শ্রেষ্ঠ। কক্ষের চারিদিকেই আলমারি। একটা জানালার সম্মুখে একটা বড়-রকমের টেবিল, এবং তাহার পার্শ্বস্থিত একটা র‍্যাকে নানা প্রকারের কেমিকেলের শিশি ও নানাবিধ যন্ত্র-পাঁতি। আলমারি গুলির ভিতরে বিপুলকায় পুস্তকাবলী; এবং সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার, উত্তরের দেওয়ালের গায়ে একটা প্রকাণ্ড তৈল-চিত্র। চিত্রে একটী রমণী বিস্ফারিত নেত্রে কোন এক গবাক্ষের পর্দ্দা সরাইয়া আলোকের অবাধ প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। চিত্র তেমন কোন অসাধারণ সুন্দরীর নয়, তথাপি ঐ বিস্ফারিত-নেত্রা রমণীর মুখের উপর এমন একটা ভাব চিত্রকরের অসামান্য নৈপুণ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা দেখিবামাত্র বুঝা যায়, রমণীটী অন্ধ। তথাপি আলোকের জন্য তাহার একটা আন্তরিক ব্যাকুলতা চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ধরিতে পারা যায়! চিত্রাঙ্কিতা রমণীর প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গী, এমন কি তাহার গাত্র-বস্ত্রের প্রত্যেক

ভাঁজটা অবধি যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "আলো, আলো, আলো দাও, আমি একবার দেখি।"

সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিকের মুখ হইতে হাস্যোপহাসের রেখা মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে একটা গূঢ় বেদনায় ব্যথিত হইয়া উভয়েই যুগপৎ শশিভূষণের দিকে ফিরিয়া চাহিল। চাহিয়া দেখিল, শশিভূষণ একটা গবাক্ষের কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে চাহিয়া আছে। কার্ত্তিক অতি সন্তর্পণে তাহার নিকটে গিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "ছবিখানা কার?"

শশিভূষণ না ফিরিয়া উদাসভাবে মৃদু স্বরে বলিল, "মানুষের আত্মার।"

সর্ব্বানন্দ শুনিতে না পাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কার?"

শশিভূষণ মুদিত নেত্রে আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "আমার স্বর্গগতা স্ত্রী আশাময়ীর।"

বহুক্ষণ তিনজনে আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। পরে শশিভূষণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "আমি এ ছবি আজ পর্য্যন্ত বাবা ছাড়া আর কাকেও দেখাইনি। আমার এ ঘরের যা-কিছু দেখছ, সবই ঐ ওঁরই জন্য। বিবাহের চার-পাঁচ বছরের পর ওঁর বাতশ্লেষ্মা বিকার হয়, তারপর বছর-দুই ভুগে উনি মারা যান। ঐ রোগেই ওঁর প্রথমে দুই চোখ যায়, শেষে সেই অবস্থাতেই উনি প্রাণ পর্য্যন্ত হারান। কিন্তু সেই ব্যারামের সময় আলোর জন্য তাঁর যে ব্যাকুলতা দেখেছিলুম, তা এ জীবনে কখনো ভুলব না। সেই ভাবটী তাঁর একটা সুস্থ সময়ের ছবির উপর আঁকিয়ে নিয়েছি। আর সেই সময়ে একটা প্রতিজ্ঞা করেছি যে সারা জীবনে আমার আর কোন কাজ রইল না। কেবল সংসারে যারা অন্ধ, তাদের দৃষ্টি দেবার চেষ্টা করব। ভগবানের আলো থেকে যারা বঞ্চিত, তাদের চোখে আলো ফোটাবার চেষ্টা করব। যদি তা না পারি ত এমন কোন উপায় করব, যাতে চোখের অভাবের কষ্ট যৎকিঞ্চিৎও দূর হয়। এই যে সব বৈ এই আলমারিতে দেখছ, এ সমস্তই চক্ষুরোগ সম্বন্ধে। এ সব ওষুধ-পত্রও তারই জন্য। ঐ তিনটে আলমারি হলে অনেক খরচ করে বিলেত থেকে বাঙ্গলা আর ইংরিজি বৈ raised অক্ষরে আমি transcribe করিয়ে আনিয়েছি। আমি নিজেও অনেক কষ্টে ঐ রকম transcription শিখেছি। তোমাদের কেন এ সব বলছি, তা' বলি। আমি একা আর এ কাজ পারছি না। তোমরা যদি আমায় এ কাজে সাহায্য কর, তাহলে অবশ্য তোমাদের তাতে কোন লাভ হবে না, কিন্তু ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত যে-সব হতভাগারা আছে, তাদের অন্তরের আশীর্ব্বাদের যদি কোন মূল্য থাকে, তা তোমরা পাবে।"

শশিভূষণ নীরব হইলে সর্ব্বানন্দ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ঠাকুরদা, আমায় সঙ্গে নাও, আমি তোমায় সাহায্য করব। আমার আর কেউ নেই যে আমায় বাধা দেবে!"

শশিভূষণ কহিল, "কিন্তু তোমায় মিছিমিছি খাটাতে চাইনে, তোমার এমন অবস্থা

নয় যে একটা wild goose chaseএ বাজে কাজে সারাজীবন কাটাবে। তাই যাতে তোমার দিনপাত হয়, অথচ আমার কাজটাও সফল হয়, তা করব। সেজন্য চিন্তা করো না।"

কার্ত্তিক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আর আমি! আমায় কেন এ সব কথা জানালে, যদি কোন কাজ না দেবে?"

শশিভূষণ কহিল, "তোমার জীবনের লক্ষ্য আর পরিণতি ঠিক হয়ে গিয়েছে। আমি তোমাকে অন্য পথে নিয়ে যেতে পারব না। তা যদি করি, তাহলে কালিকা কাকার ক্ষতি করা হবে!"

কার্ত্তিক কহিল, "কালিকাবাবুর ক্ষতি হবে বলে আমার নিজের কোন স্বাধীনতা থাকবে না? আমি নিজের ইচ্ছে-অনুসারে নিজের জীবন গড়ে তুলতে পাব না? আমি কি তাঁর ক্রীতদাস যে তিনি আমাকে দিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করিয়ে নেবেন।"

শশিভূষণ কহিল, "তোমার মত তেজী একগুঁয়ে লোককে নিয়ে আমার চলবে না। তোমার সঙ্গে আলাপ করে বুঝেছি, তোমাকে আমি ঠিক আমার হাতের তেলোর মধ্যে ধরে রাখতে পারি, এমন শক্তি আমার নেই। তুমি যে কাজে আছ, তাতেই লেগে থাক, তাতেই তুমি যথেষ্ট উন্নতি করতে পারবে, তাতেই তুমি সংসারের অনেক উপকার করবে।"

কার্ত্তিক কহিল, "তা হবে না, ঠাকুরদা। আমায় এই অন্যায় পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে দাও, আমায় তোমার সঙ্গী করে নাও। আমি কলের পুতুল নই, আমাকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। আমি স্বাধীন।"

শশিভূষণ কহিল, "কার্ত্তিক, তোর হাত ধরে বলছি, তুই স্বাধীনতার অহঙ্কার করিস নে। জগতে কেউ স্বাধীন নয়—স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। যে স্বেচ্ছাচারী, সে কখনই পরার্থপর হতে পারে না। আজ কতদিন হল যে চলে গিয়েছে, সেও যদি পর-জগৎ থেকে আমাদের ইচ্ছেকে, আমাদের কাজকে তার ইচ্ছে দিয়ে চালাতে পারে, তাহলে যারা বেঁচে আছে, তাদের ইচ্ছে অনুসারে কেন আমরা চলব না? নিজেকে বড় করে দেখতে শিখলে, নিজের ইচ্ছেটা নীতির বাঁধকে ডিঙ্গিয়ে গেলে, তখন নিজেকে ছাড়া জগতে আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। এই দেখ, বাবা আমার সব জানেন, সব জেনেশুনেও তিনি আমায় আবার তাঁর সংসারের মধ্যে টেনে নেবার চেষ্টা করছেন। তাঁর কষ্ট হচ্ছে বলে আমাকেও ফিরতে হবে; জানি না, হয়ত তাঁকে সুখী করবার জন্য বিয়েও বুঝি করতে হয়। বাবাকে বোঝাব, কিন্তু তিনি যদি না বোঝেন, আমার তখন আর কোন উপায় থাকবে না। সেইজন্যই সর্ব্বাকে তাড়াতাড়ি এই কাজে ঢোকাতে চাচ্ছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "কিন্তু সর্ব্বদাদাও ত স্বাধীন নয়।"

শশিভূষণ কহিল, "ও সম্পূর্ণ স্বাধীন নয় বটে, তবু কতকটা স্বাধীন। কারণ প্রথমতঃ ওর নিজের বলতে কেউ তেমন নেই যার মুখ চেয়ে ওকে থাকতে হবে। আর কালিকা কাকা? তিনি ওর

ভালবাসা আর সম্মান ছাড়া ওর উপর অন্য কিছুরই দাবী রাখেন না। এ সংবাদ আমি জানি, তাই ওকে আমার কাজে ডেকে নেবার চেষ্টা করছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "কালিকাবাবুরই অর্থ-সাহায্যে ওর সমস্ত হচ্চে, অথচ ও মুক্ত! আর আমার ওপর তাঁর লুব্ধ দৃষ্টি আছে বলে আমি বদ্ধ!"

শশিভূষণ কহিল, "লোভ! কালিকা কাকার এত বড় অপমান তুই করলি? তোর মুখ না দেখাই উচিত। যিনি তোকে এত ভালবাসেন যে তোর হাতে তাঁর সর্ব্বস্ব অর্পণ করতে এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করবেন না, তাঁকে বল্‌ছিস্, লোভী! এতখানি ভালবাসার এত-বড় অপমান করতে তোর সাহস হল! না কার্ত্তিক, আমি তোমায় চাই না।"

কার্ত্তিক মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার সমস্ত দেহের মধ্যে একটা প্রচণ্ড অভিমান ও ক্রোধের উষ্ণ রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া সর্ব্বানন্দ তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, ভাই, আমায় ক্ষমা কর!"

কার্ত্তিক কহিল, "ক্ষমা! ক্ষমা আমি আমাকেই করতে পারছি না তা তোমাকে! আমি কাউকে ক্ষমা করব না। আমি তোমায় ছাড়ব না, তোমাকে দিয়েই আমার স্বাধীনতা কিনে নেব।"

শশিভূষণ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কথায় কথায় বেলা গেল। চল, আজ যেখানে তোমাদের নিয়ে যাব বলে-ছিলুম, সেইখানে নিয়ে যাই। কার্ত্তিক, ভাই, সেখানে গিয়ে সব অবস্থা দেখেও যদি না তুমি আমাদের ক্ষমা করতে পার, যদি না কেমন করে নিজের ইচ্ছেকে দমন করে পরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হয় শিখতে পার, তাহলে বুঝব, তোমার আর কোন আশা নেই।"

৪

বাগবাজারে এক গলির মোড়ে এক দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে শশিভূষণ ও তাহার বন্ধুদ্বয় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বড় রাস্তা ও গলির সব আলোগুলাই জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং অনতিদূরস্থিতা গঙ্গার যে অংশ দেখা যাইতেছিল, তাহাতেও অসংখ্য সচল আলোক-বিন্দু ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

শশিভূষণ কড়া ধরিয়া কোন এক কৌশলে টানিবামাত্র ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল। শশিভূষণ বন্ধুদের লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বন্ধুদ্বয় প্রবেশ করিয়া দেখিল, গৃহটি বাহির হইতে যেরূপ মনে হইয়াছিল, সেরূপ নয়। উঠানটি বেশ প্রশস্ত। উঠানের চারিদিকেই বারান্দা এবং সেই বারান্দা নানাজাতীয় পুষ্পিত ও অপুষ্পিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতায় শোভিত। সমস্ত বাড়ীটি বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। দেখিলেই বুঝা যায়, যেন সমস্ত বাড়ী হইতে চেষ্টা করিয়া অন্ধকারকে দূর করা হইয়াছে। যেখানে আলোর কোন প্রয়োজন নাই, সেখানেও হয়ত একটা বড় টবে বড় একঝাড় জুঁই ও তাহার উপর একটা আলোকাধার হইতে আলোক বিকীর্ণ হইয়া স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত শ্বেতপুষ্পের অমল শুভ্রতা আরও

বাড়াইয়া তুলিয়াছে। উঠানটির মাঝখানে গোলাকার বেদী; তাহার উপরও একটা প্রকাণ্ড চিনামাটির টবে একরাশ গন্ধরাজ ফুটিয়া রহিয়াছে!

বন্ধুদ্বয় অধিকক্ষণ ধরিয়া এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় পাইল না, কারণ দুইটী বালক ও একটী বালিকার সঙ্গে এক সুবেশা রমণী আসিয়া অপর দিকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিল, "শশিদা, মার জ্বর আজ বেড়েছে, তোমায় ডাকছেন।"

শশিভূষণ কহিল, "সরোজ, এদের নিয়ে গিয়ে আমার ঘরে বসাও। আমি যাচ্ছি।"

শশী তাড়াতাড়ি একটী সোপান অব-লম্বনে উপরে চলিয়া গেল। রমণী; বন্ধুদ্বয়ের নিকটে আসিয়া বলিল, "আসুন আপনারা।"

কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ দেখিল, রমণী, সুন্দরী, বয়স অনুমান সতেরো আঠারো বৎসর হইবে। সে যে-ভাবে তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাতে যথেষ্ট লজ্জাহীনতা প্রকাশ পাইল বটে, কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উভয় বন্ধুই নিমেষে বুঝিল, রমণী দৃষ্টি-শক্তি-হীনা। যদিও সুন্দর মুখখানির উপর দুইটী আয়ত নয়ন লজ্জা-সঙ্কোচহীন সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া রহিয়াছে, তথাপি তাহাতে অন্ধজন-সুলভ উদ্দেশ্যহীনতা প্রকাশ পাওয়ায় উভয় বন্ধুরই সমস্ত সঙ্কোচ মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। এক দুর্ভেদ্য অন্তরালে অবস্থিত নরনারীর মধ্যে যেমন কোন সঙ্কোচের প্রয়োজন থাকে না, তেমনি কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ তাহাদের সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ করিয়া বলিল, "চলুন।"

রমণী, বালক-বালিকাদের নিকটস্থ হইয়া বালকদ্বয়কে বলিল, "তোমরা সুকুকে নিয়ে রঘুকাকার কাছে গিয়ে গল্প শোনোগে— আমি এঁদের নিয়ে ওপরে যাচ্ছি। সুকু, এদের সঙ্গে যাও।"

বালকদ্বয়ের মধ্যে একটী বালক নিকটে আসিয়া কার্ত্তিককে স্পর্শ করিয়া বলিল, "আপনি কি সর্ব্বদাদা?"

কার্ত্তিক বলিল, "না, আমি কার্ত্তিকদাদা" তার পর উহার হাতখানি সর্ব্বানন্দর গায়ে ছোঁয়াইয়া বলিল, "উনিই তোমার সর্ব্বদাদা।"

সর্ব্বানন্দ বালকটিকে হস্ত দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "চল, তোমরা আজ আমার কাছেই থাকবে। তোমার নাম কি ভাই?"

বালক বলিল, "আমার নাম শ্রীমণীশ চন্দ্র ঘোষ, ওর নাম শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ রায়। আর সুকুর নাম, শ্রীমতী সুকুমারী দেবী।"

কিশোরীটি হাসিয়া বলিল, "আর আমার নাম বললিনে?"

মণীশ বলিল, "তোমার নাম কি তুমি এতক্ষণও বল নি? আপনারা সরোদিদির নাম জানেন না?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "এই ত জানলুম। চল, ওপরে যাই।"

কার্ত্তিক দেখিল, রমণী অন্ধ বটে কিন্তু অভ্যাসের জন্য এমনভাবে চলিতেছে যেন সে সমস্তই দেখিতে পাইতেছে। সোপান অতিক্রম করিয়া সে উপরে উঠিল, এবং পথে যে সমস্ত বস্তু ছিল, অনায়াসে তাহাদের পাশ কাটাইয়া একটী কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ভিতরে চলুন।"

কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, উহার সাজ-সজ্জা একটু

অন্য ধরণের, এটি যেন পাঠ-কক্ষ। সমস্ত বাড়ীর প্রত্যেক গলি-ঘুঁজিও যেমন নানা-রূপ চিত্রাদিতে পরিশোভিত, এই কক্ষে তেমন কিছুই নাই। ইহাতে কেবল আলমারি, টেবিল ও পুস্তকের রাশি। কক্ষের মধ্যস্থলে একটা বড়-রকমের ফুলের তোড়ার মত বৈদ্যুতিক আলোকের তোড়া কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো রহিয়াছে।

কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কার্ত্তিক সর্ব্বানন্দকে বলিল, "সর্ব্ব-দা, আজ যেন আমার প্রথম চোখ ফুটল। আগে জানতুম না, আলো এত সুন্দর!"

সর্ব্বানন্দর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মণীশ বলিয়া উঠিল, "আমি ছেলেবেলায় আলো দেখেছি, কিন্তু জ্যোতি বলে, আলো কেমন, জানিনে। ও বলে, আলো নেই, ও-সব মিছে কথা।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সুকু কি বলে?"

সুকুমারী আর জ্যোতিপ্রসাদ বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের দিদি ঘরে প্রবেশ না করিলে তাহারা প্রবেশ করিবে না। এইভাবে তাহাদিগকে রমণীর অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কার্ত্তিক বলিল, "আপনারা ভিতরে আসুন, আর আমাদের কাছে সঙ্কোচ করবার প্রয়োজন নেই, আমরা আপনাদের আত্মীয়।"

রমণী প্রবেশ করিয়া বলিল, "সঙ্কোচ করবার আর আমাদের উপায় কৈ? যার জন্য সঙ্কোচ, তাই আমাদের নেই।" সর্ব্বানন্দ সসঙ্কোচে বলিল, "আপনি জন্মাবধিই কি এই রকম?"

সরোজ কহিল, "কি রকম সে কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করছেন কেন? আপনাদের চোখ আছে, তাই এ বিষয়ে আপনাদের হার! আমাদের চোখ যেদিন থেকে গিয়েছে, সেইদিন থেকে ও বাধাটুকুও দূর হয়েছে। এখন আমাদের পক্ষে সবই সমান। আমি জন্মান্ধ নই, এখনও আমার চোখে সম্পূর্ণ অন্ধকার নেমে আসেনি—ঐ আলোর একটা অস্পষ্ট আভাস আমি পাচ্ছি—যেন একটা পুরু কাপড়ের মধ্য দিয়ে আলো আসছে। আমার যখন আট-ন' বছর বয়স, তখন থেকে আমার চোখের দোষ দেখা দেয়, তার পর ক্রমশ আমার এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।"

কার্ত্তিক কহিল, "আপনার আবার সেই পূর্ব্বাবস্থা পেতে ইচ্ছে করে না?"

কথাটা শুনিবামাত্র সর্ব্বানন্দ লজ্জিত হইয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কার্ত্তিকের পানে চাহিল। কিন্তু নির্লজ্জ কার্ত্তিক নির্ব্বিকার চিত্তে সরোজিনীর দিকে উত্তরের প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল। সরোজিনী তাহার দৃষ্টি-শক্তিহীন বিশাল চক্ষু কার্ত্তিকের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল, "হারানো জিনিস কে না ফিরে চায়।"

কার্ত্তিক কহিল, "আর যার কিছু হারায়নি? যে জন্মান্ধ?"

সরোজ কহিল, "তার কি হয়, তা এই সুকুকে জিজ্ঞাসা করুন। কেমন সুকু, তুই আলো দেখতে চাস?"

সুকুমারী মাথা নাড়িল। সরোজ তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, "তা লজ্জা কি, বল্ না?"

সুকুমারী মৃদু স্বরে বলিল, "আলো যে কি, তাই আমি বুঝিনে।"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব সুকু, তুমি আমার কাছে এস।"

সরোজিনী তখন হাসিয়া বলিল, "আপনারা তাহলে এদের সঙ্গে আলাপ করুন, আমি আপনাদের জলখাবারের জোগাড় করে আনি।"

সে বাহির হইয়া গেলে সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিককে বলিল, "কার্ত্তিক, তোর একটুও বুদ্ধিশুদ্ধি নেই! কি করে ও কথা ওঁকে জিজ্ঞাসা করলি?"

কার্ত্তিক কহিল, "অন্ধের কাছে লজ্জা বা সঙ্কোচ দেখানো আর একটা অন্ধতা।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "উনি অন্ধ হলেও স্ত্রীলোক ত!"

কার্ত্তিক কহিল, "ওটাও একটা অন্ধতা! তুমি দেখতে পাচ্ছ বলে ওঁকে বলছ, স্ত্রীলোক! যদি না দেখতে পেতে, তাহলে উনি স্ত্রীলোক কি পুরুষ, তা-নিয়ে কোন প্রশ্নই উঠত না। এ স্ত্রীলোক, ও পুরুষ, এ সমস্তই চক্ষুষ্মানের অন্ধতার ফল। আমি তোমার মত অন্ধ নই, তাই ওঁকে কেবল মানুষ বলেই দেখছি।"

সর্ব্বানন্দ আর কোন উত্তর না দিয়া বালক-বালিকাদের সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে শশিভূষণ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দেরী হয়ে গেল,—কি করব? আমার শাশুড়ীর জ্বর বেড়েছে। আজ বোধ হয় তোমাদের সঙ্গে ফিরতে পারব না। সরোজ কৈ? তোমাদের জল-টল দেয় নি যে এখনও!"

কার্ত্তিক কহিল, "তিনি তোমার চেয়ে কম বুদ্ধিমতী নন। আমরা যে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অতিথি, সে কথা তিনি আগেই বুঝতে পেরেছেন, আর তারই জোগাড়ে গেছেন।"

শশিভূষণ কহিল, "এই অন্ধের বাথানে পড়ে তোমাদের কষ্ট হয়নি ত?"

কার্ত্তিক কহিল, "এত কষ্ট হয়েছে যে ইচ্ছে করছে, আমিও অন্ধ হয়ে গিয়ে এই রকম করে তোমাদের সেবা নি। মোদ্দা, তোমার শ্বশুর-মশায় সুন্দর বাড়ী, লোক-জন, সব ফেলে মলেন কি করে, আমি তাই ভাবছি আর আশ্চর্য্য হচ্ছি!"

শশিভূষণ কহিল, "তিনি ডাক্তার ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনটির মধ্যে বোধ হয় কবিতা দেবী সর্ব্বদাই উঁকি-ঝুঁকি মারতেন।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "ভাই, অমন লঘুভাবে তাঁর বিষয় নিয়ে কথা বলো না। ঠাকুরদা, এই সরোজ তোমার কে হয়?"

শশিভূষণ কহিল, "সরোজের পরিচয় এখনও পাওনি? এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে তার খলি খালি হয়নি, এইটেই আশ্চর্য্য! ওর পরিচয় তবে দি। ও আমার শাশুড়ীর গুরুদেবের নাতনী। অন্ধ হবার পর থেকে ওর চিকিৎসার জন্য শ্বশুর-মশায় ওকে এখানে নিয়ে আসেন। সেই থেকে ও এই হতভাগার জোগাড়-করা সম্পত্তি। শাশুড়ীর কন্যাটী মারা যাবার পর থেকে, কি জানি কেন, হঠাৎ তাঁর খেয়াল ওঠে যে, গরীব-দুঃখীর অন্ধ ছেলে-মেয়েদের চোখের চিকিৎসায় তাঁর স্বামীর ত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি তিনি ব্যয় করবেন। এমন সময় আমি জুটে পড়ে তাঁকে আমার খেয়ালে যোগ দিতে অনুরোধ করি। তার পর

থেকে এই যা দেখছ। এরা ছাড়া আরও দু-চারটি ছেলে-মেয়ে এখানে আসে, কিন্তু তারা দিনে আসে, দিনেই চলে যায়। সরোজের উপরই এদের সব ভার। সে-ই প্রোফেসর, আমি প্রিন্সিপাল মাত্র, যখন খুসী আসি, যখন খুসী চলে যাই।"

তাহাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় সরোজিনী একজন দাসীর সাহায্যে তিনখানি রেকাবিতে মিষ্টান্নাদি লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। শশিভূষণ হাসিয়া বলিল, "সরোজ, এই রকম করে কি তুমি অতিথি-সেবা কর না কি? অতিথিরা ত তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরবার মত হয়েছিল। আগে থেকে জোগাড় করে রাখনি কেন?"

সরোজ কহিল, "তুমি যে আজই এঁদের আনবে, তা ত বলে যাওনি। আপনারা ত্রুটি মার্জ্জনা করে মিষ্টিমুখ করুন।"

কার্ত্তিক কহিল, "ঠিক! আপনার যথেষ্ট বুদ্ধি আছে বটে, ঘুষ দিয়ে আগে মুখ বন্ধ করে দিন, তার পর আর আমাদের কিছুই বলবার থাকবে না।"

শশিভূষণ কহিল, "তোমার মত জ্যাঠা মশায়ের মুখে ঘুসি মারলেও মুখ বন্ধ হবে না, তা ঘুষ! যাক্, লেগে পড়ি, এস। সরোজ, আমার চা কৈ?"

সরোজ কহিল, "সে আর বলতে হবে না। লোকজন বেশী দেখে রঘুদা বামুন ঠাকরুণের হাঁড়ি নামিয়ে বড় কেটলিতে জল চাপাবার চেষ্টায় ছিল, আমি বারণ করে দিয়ে ষ্টোভে চড়িয়েছি। আগে জল খেয়ে ঠাণ্ডা হও, তার পর চা খেয়ে গরম হয়ো। বিন্দি, তুই দেখ্‌গে, জল হল কি না।"

বিন্দি দাসী চলিয়া গেলে শশী রাগিয়া বলিল, "এই যে দেখছ ব্রাহ্মণীটিকে, ইনি চোখের মাথা খেয়ে অবধি লজ্জার মাথাও খেয়েছেন! ওগো, দুটো অপরিচিত মানুষ এখানে আছে, দেখতে পাচ্ছ না?"

সরোজ তাহার অন্ধ স্বভাবের বহির্ভূত ভাবে একটু জোরে হাসিয়া বলিল, "কি করে দেখতে পাব? আশাদিদি গিয়ে পর্য্যন্ত তুমি এমনই অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়েছ যে আমাদের অন্ধকারও তোমার আগমনে তিন গুণ বেশী হয়ে দাঁড়ায়, তা দেখব কি?"

শশিভূষণ কার্ত্তিকের পানে ফিরিয়া বলিল, "এঁর আক্কেলটা ত শুন্‌লে তোমরা! নিজের চক্ষুদুটো খেয়েও তৃপ্তি নেই! আবার আমার দুটীর উপরও টাঁক করছ?"

সরোজ তেমনি হাসিতে হাসিতেই উত্তর দিল, "ধৃতরাষ্ট্রের চোখ ছিল এমন অপবাদ ত অতি বড় শত্রুতেও দিতে পারেনি। তাইতেই ত আমার আশা-দিদি গান্ধারীর মত চোখ ঢাকেন। তোমার চোখ ছিল কবে যে, তা খাব?"

শশিভূষণ হতাশভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দর পানে চাহিতে লাগিল। কার্ত্তিক অত্যন্ত হাসিতে হাসিতে বলিল, "আঃ ঠাকুরদা, তোমার এমন হার—এ আমাদের পক্ষে যে কি উপভোগের জিনিস, তা আর কি বল্‌ব?"

সর্ব্বানন্দ এইসকল হাস্য-পরিহাসে যোগ দিতে না পারিয়া মণীশের হাতে একটা রসগোল্লা দিয়া বলিল, "এটা কি বল ত?" মণীশ নির্ব্বিবাদে সেটা উদরসাৎ করিয়া বলিল, "রসগোল্লা।"

কার্ত্তিক তাহার হাতে সর্ব্বানন্দর রেকাবিটা উঠাইয়া দিয়া বলিল, "বোকা কোথাকার! বলতে হয়, আরও দু-চারটে না পেলে বুঝব কি করে?"

বালক রেকাবি নামাইয়া দিয়া বলিল, "আমরা জল খেয়েছি সর্ব্বদাদা, আপনি খান।" জ্যোতিপ্রসাদের বোধ হয় প্রসাদ পাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই সে একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। কার্ত্তিক তাহার ও সুকুমারীর হাতে সন্দেশ দিতে উদ্যত হইলে শশী বলিল, "ওরে শূয়ার, মেশে পৌঁছুতে রাত দশটা বেজে যাবে। বোকামি করিস্ নে, খেয়ে ফেল্।"

ইতিমধ্যে বিন্দি দাসী তিন পেয়ালা চা লইয়া উপস্থিত হইল। সর্ব্বানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "তিন পেয়ালা কেন? আমরা ত চা খাই না।"

শশিভূষণ কহিল, "সরোজ আজ তোমাদের জাত মারবে ঠিক করেছে। ওর হাতে যখন পড়তে যাচ্ছ, আর আমার সাকরেদী যখন নিতে চলেছ—"

সরোজ কহিল, "তখন আপনাদের চক্ষু দুটীও যাবে, বুদ্ধিও খোঁড়াবে! আরও যে কি সব বিপদ ঘটবে, তা মনেই আনতে পারছি নে।"

কার্ত্তিক কহিল, "তার আর আশ্চর্য্য কি! এ বাড়ীর সমস্ত স্থানই বোধ হয় চক্ষু রোগের বীজাণুতে পরিপূর্ণ। আর কথায় বলে, সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।"

শশিভূষণ কহিল, "এই রে সর্ব্বনাশ করলে! সংস্কৃত আউড়েছ কি মরেছ! ঐ যে দেখছ ব্রাহ্মণীটিকে, উনি এই আমার আমার মত বর্ব্বরকে দিয়েও দু'খানা সংস্কৃত বই transcribe করিয়ে নিয়েছেন। অতএব চেপে যা, কার্ত্তিক, যদি ও টের পায় যে তুই ভাল সংস্কৃত জানিস, তাহলে তোকে এমন চৌচাপটে ধরে বসবে যে আর তোকে উদ্ধার করা যাবে না। তখন রোজ এসে একখানা করে বৈ শুনিয়ে যেতে হবে। বাইরের দুটি চক্ষুর মাথা খেলে কি হয়—ভিতরের আর একটি চোখকে দেবী খুব উজ্জ্বলভাবেই জগতের উপর স্থির রেখেছেন। ওঁর সেই তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিলাভটি যার কপালে ঘটে, তার আর সহজে নিস্তার নেই! তাছাড়া—"

শশী কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল, কারণ সরোজ এবার সত্যই লজ্জিত হইয়াছিল। কার্ত্তিক কিন্তু থামিবার পাত্র নহে। এই অন্ধ নারীর সঙ্কোচহীন আলাপে তাহার মাথার মধ্যে এক অপূর্ব্ব খেয়াল জাগিয়া উঠিয়াছে। সরোজের অন্ধ-নয়নের অন্ধকারের ব্যবধান দুই হাতে সরাইয়া তাহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিবার একটা উদ্দাম চেষ্টা তাহাকে পাইয়া বসিল। সে বলিল, "আমি রাজী আছি।" শশী এইবার শঙ্কিত হইয়া বলিল, "তা হয় না, কার্ত্তিক! আমিই এ ক্ষেত্রে ওঁর একমাত্র কর্ণধার হয়ে থাক্‌বার দাবী রাখি। সে দাবীর সত্ত্ব আর কাউকে বিলিয়ে দিতে পারব না।"

সরোজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "বটে! আমরা যাই পৃথিবীতে আছি, তাই তোমার মত অকেজো লোকের দিনপাত হয়! তা স্বীকার না করে উল্টে কর্ণধারের খবর! আমরাই বরং এ কথা বল্‌তে পারি, তা জান!"

শশিভূষণ কৃতাঞ্জলি-পুটে নিজের কান সরোজের হাতের দিকে অগ্রসর করাইয়া দিয়া বলিল, "দেবি, ভৃত্যের অবিনয় ক্ষমা করে তার কর্ণটি করপল্লবে ধারণ করে এই দেবী যে জগতে মাত্র একা এরই, এটি সর্ব্বসমক্ষে প্রমাণিত করে দাসকে কৃতার্থ কর।"

সরোজ সে কথা কানে না তুলিয়া নিজ-মনে বলিল, "দয়ার দাবী জগতের প্রত্যেকেরই আছে। এ কারও সত্ত্বের বস্তু নয়, কার্ত্তিক বাবু, আপনার ইচ্ছা হলেই স্বচ্ছন্দে আপনি আসবেন।"

কার্ত্তিক এতক্ষণে রুদ্ধ নিশ্বাসকে মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল, "বাঁচ্‌লুম! আপনাদের রাজায়-রাজায়-যুদ্ধে উলু খড়ের প্রাণ যাবার জোগাড় হয়েছিল, আর কি! আপনার অভয়-বাণীই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

শশিভূষণ তাহার আশঙ্কাকে যথাসাধ্য দমন করিয়া কৃত্রিম কোপে চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিল, "তবে রে অকৃতজ্ঞ! একেবারে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস্ খাওয়া! তুই কি ভেবেছিস্, ঢুকে পড়লেই হল! এ সভার যোগ্য অকেজো হওয়ার যোগ্যতা তোর হাড়ের দিক্ দিয়েও যে নেই। তখন পালাবার পথ পাবি:না, তাই বল্‌ছি, এই বেলা সাবধান হ।"

কার্ত্তিক অকুণ্ঠিত মুখে হাসিতে হাসিতে বলিল, "যোগ্যতা কি একদিনেই পাওয়া যায়? কতদিনের সাধনায় ক'বছর এফ এ ফেল্ করে এমন যোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছ, বল দেখি? তেমনি—"

সর্ব্বানন্দ এতক্ষণে বাধা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল কার্ত্তিক, আর না! ঠাকুরদা, আজ আমরা আসি।" কার্ত্তিককে একটু অনিচ্ছুক বুঝিয়া সে আবার বলিল, "মেশের ঠাকুর হয় ত এতক্ষণ চলে গেছে, আর দেরী নয়।" শশিভূষণ সাগ্রহে বলিল, "আজ না হয় এইখানেই সে কাজটা সারো! এই ব্রাহ্মণী দ্রৌপদীটির তত্ত্বাবধানে মেশের চেয়ে সে কাজটা এখানে একটু পরিপাটী রকমেই সম্পন্ন হবে।" সর্ব্বানন্দ রাজী হইল না, অগত্যা কার্ত্তিকও বাধ্য হইয়া তাহার অনুসরণ করিল।

(ক্রমশ)

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

আরোহণ

রাজপুরের পান্থশালায়, হিমালয়ের ঠিক পায়ের কাছটিতে বসে বিশ্রাম করছি। বরফের বাতাস-দিয়ে-ধোয়া তরুণ প্রভাত, আকাশ-জোড়া পাহাড়ের কোলে ছোট এই সহরের ঘরে-ঘরে জাগরণের সোনার কাঠি স্পর্শ করে যাচ্ছে। দক্ষিণে একটি গিরিনদী,—গোপন গুহা থেকে স্বচ্ছ ধারাটি তার উপলণ্ডের উপর দিয়ে, পুষ্পিত কুঞ্জের ভিতর দিয়ে নেমে এসেছে—তরল কল্লোলে পৃথিবীর বুকের উপর; আর বামে উঠে গেছে গিরি-পথ—পৃথিবীছেড়ে ক্রমাগত আকাশের দিকে, ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধে, মেঘের অন্তরালে। এই

আকাশের দিকে উঠে চলা আর এই অনন্ত সাগরের দিকে নেমে আসা—এরি মাঝে মুহূর্ত্তের বিশ্রাম এই পান্থশালার কুঞ্জতীরে।

পর্ব্বতের নীলের ভিতরে প্রবেশ করছি। চোখ-জুড়ানো নীল অঞ্জন, ঘুম-পাড়ানো নীল রহস্য,—এরি একটি স্নিগ্ধ আভা সমস্ত দিনটিকে, সকল পথটিকে সুশীতল করেছে।

পাহাড়ের একটা বাঁক। মেঘ-ফাটা রৌদ্রে একখানা প্রকাণ্ড পাথর, মাথায় একবোঝা শুক্‌নো ঘাস চাপিয়ে, পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ওধারে ভীষণ একটা ভাঙ্গন—পাহাড়ের গায়ে অগ্নিদাহের ক্ষত-চিহ্নের মত কালো দেখা যাচ্ছে। প্রখর রুদ্রমূর্ত্তিতে দিক্‌বিদিক্ এখানে দেখা দিয়েছে—যেন দুঃস্বপ্নহত! একটা নির্জ্জীব ঘোড়া এরি মাঝ দিয়ে একরাশ পাথর বহে চলেছে—পাষাণ-প্রাচীর-ঘেরা একটা রাজঅট্টালিকার দিকে।

এ-পাহাড়ের আর একটা বাঁক। বনতরুর ঘনপল্লবের তলায় ছায়া—একখানি নীড়ের মত—পায়ের তলা থেকে মাথার উপর পর্য্যন্ত ঘিরে নিয়েছে। চির-রাত্রি এখানে অবগুণ্ঠন টেনে, কোলের মধ্যে ঝরা-পাতা নব-কিশলয় জীবন-মরণ সবাইকে নিয়ে দোলা দিচ্ছেন—নির্জ্জনে, মেঘ-রাজের গোপন অন্তঃপুরে।

পর্ব্বতের সানুদেশ অতিক্রম করছি। দুই ধারে উপবন; তারি মাঝ দিয়ে পথ; জনমানব নাই; কিন্তু সমস্ত যেন কারা সযত্নে সুমার্জ্জিত করে রেখেছে! সুবিন্যস্ত তরু-শ্রেণী, সুশ্যাম সুচারু তৃণভূমি; তারি প্রান্তে দেখা যাচ্ছে পার্ব্বতী মন্দির—সুধাধবল। এধি ওপারে পাহাড়ের নীলের কূলকিনারা-হারা একটিমাত্র গভীর প্রলেপ বর্ষার মেঘের মত আকাশ ঢেকে রয়েছে। এই কালোর উপরে আলো নিয়ে শোভা পাচ্ছে সমস্ত দৃশ্যটি স্থির বিদ্যুতের মত। দেখতে দেখতে কুয়াশা এসে সমস্ত দৃশ্যটি মুছে দিয়ে গেল; অনাবিল শুভ্রতার কোলে ফুটে উঠলো সোনার ফুলে সাজানো একটি মাত্র কর্ণিকার।

মেঘের মধ্যে দিয়ে চলেছি! কুয়াশার সুবিমল শিশির-চুম্বন মুখে লাগছে, চোখে লাগছে—প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত স্পর্শ করছে—পথের ক্লেশ ক্লান্তি ধুয়ে মুছে।

পাহাড়ের একটি অন্ধকার কোণ। লতা-পাতার ভিতর থেকে একটা জলপ্রপাত নেমেছে; তারি উপরে অপরিসর সেতু। ছত্রাকে ভরা জীর্ণ একখানি কাঠের উপর ভর দিয়ে রসাতলের দিকে চেয়ে রয়েছি! একখানা বিশাল পাথর অতলস্পর্শ অন্ধকারের উপরে ঝুঁকে রয়েছে; আর তারি তীরে বনদেবীটির মত বনলতা—পুঞ্জপুঞ্জ তারা-ফুলের একটিমাত্র গুচ্ছ! জলের হাওয়ায় কাঁপছে—কচি পাখীর ডানাদুখানির মত দুটি লতাবল্লরী; আর তারি পাশ দিয়ে ফেনিল জল চলেছে অট্টরোলে অতলের মুখে! ঝাঁপিয়ে-পড়া, গড়িয়ে-চলা, তলিয়ে-যাওয়ার একটা প্রকাণ্ড ডাক! অনেকখানি জুড়ে দূরে দূরে পর্ব্বতে পর্ব্বতে রণিত হচ্ছে এই নিরুদ্দেশের দিকে নৃত্য করে চলে-যাওয়ার এই গহনের কোলে ঝাঁপিয়ে-পড়ার ঝনৎকার!

মেঘরাজ্যের উপরে উঠে এসেছি। প্রকাণ্ড অজগরের নির্ম্মোকের মত একখণ্ড কুয়াশা

সমস্ত গিরিশ্রেণীটি বেষ্টন করে নিশ্চল হয়ে রয়েছে। নীচে একটা সুদীর্ঘ কালো ছায়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত লতিয়ে উঠেছে; আর উপরে একটা সবুজ উচ্ছ্বাস নীল আকাশে তরঙ্গিত দেখা যাচ্ছে! ঐখানে—নির্মেঘ ঐ নীলের বুকে, শরতের সুতীক্ষ্ণ হাওয়ায় কোন্ দেবদারু বনের ছায়ায় আমাদের এবারের নীড়;—মন যেখানে উড়ে যেতে চাচ্ছে এখনি, —অর্দ্ধপথের এই পান্থশালা ছেড়ে!

পাহাড়ের গা দিয়ে একটি সরু পথ; একদিকে খাড়া পাথরের দেয়াল, আর একদিকে অতলস্পর্শ শূন্য! অনেক দূরে—যেন একটা প্রকাণ্ড হ্রদের পরপারে, ধূসর গিরি শ্রেণী দেখতে পাচ্ছি। একখণ্ড মেঘ শূন্যের উপরে সাদা পাল তুলে ধীরে ধীরে চলেছে —বাতাস তাকে যেদিকে নিয়ে যায়! মাঝে মাঝে পর্ব্বতের এক-একটা মোড় নেবার সময় এই শূন্যের উপর দিয়ে খেয়া দিতে দিতে চলেছে আমার এই জীর্ণ কাঠের দোলাখানি! পাথর আপনার অটুট পরমায়ু, লতাপাতা আপনাদের ক্ষণিকের জীবন যৌবন নিয়ে এই শূন্যতায় একেবারে তীরে এসে প্রতীক্ষা করছে—ঝরে যাবার জন্য খসে যাবার জন্য। এইখানে একটি পাখীর গান! অদূরে বনের নিবিড় ছায়া থেকে সে ক্রমান্বয়ে বলছে—পিয়া পিয়া পিউ পিউ।

শুষ্ক নদীর খাতের মত উসর একটা গিরিসঙ্কট; তারি মোহড়ায় একটা লোক সরকারি-আফিসে বসে যত লোকের কাছে চুঙ্গি আদায় করে ছেড়ে দিচ্ছে। একটা বুভুক্ষিত কুকুর এইখানের চারিদিকে মাটি শুঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পর্ব্বতের সুনীল ছায়া, সমস্ত শোভা, এই শুষ্ক ভূমিটাকে ছেড়ে দেখছি, অনেক দূরে পিছিয়ে গেছে! এ যেন আকাশের উপরে একটা রাশিকৃত পাথর আর ধূলার মরুভূমি! এরি পরে বনের নীলের মধ্যে আর-একবার অবগাহন। সেখানে পায়ের তলায় পাহাড় ক্রমান্বয়ে অন্ধকারের ভিতরে গড়িয়ে গেছে। দিন সেখানে যেতে পারেনি; কেবলমাত্র কেলু-বনের শিখরে শিখরে পূর্ব্ব-সন্ধ্যার একটু ধূসর জ্যোতি নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হয়েছে। সূর্য্যদেব এখন মধ্য-গগনে বিরাজ কচ্ছেন, কিন্তু এই বনরাজির তলায় শিশিরসিক্ত ঝরা-পাতার বিছানায় এখনো রাত্রি! ঝিল্লিরবের ঘুম-পাড়ানো সুর এখানে বাজছেই—কিবা রাত্রি কিবা দিন। পুরাতন অরণ্যানীর নিসুপ্তির মধ্যে এই একটিমাত্র ডুব দিয়েই পথ একেবারে জনতা, সভ্যতা, কর্ম্মকোলাহলের মাঝখানে গিয়ে মাথা তুলেছে। একটা মানুষ এখানে কর্কশ গলায় চীৎকার করে কেবল ডাকছে —ফাল্‌তো ফাল্‌তো এ ফাল্‌তো! এরে বেকার কুলী!

সভ্যতার এই প্রবেশ-দ্বারেই একদিকে রয়েছে দেখি 'ওল্ড ক্রুয়ারী' বা পুরাতন মদের ভাটি; আর-একদিকে কতকগুলা দোকানঘর; সেখানে একটা দর্জ্জি, সে বসে কাপড় ছাঁটছে, আর-একটা টেবিলের সাম্‌নে সোডা লেমনেড্, হুইস্‌কির বোতল সাজিয়ে হোটেল-ওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। এখানথেকে ক্রমাগত চোখকে পীড়া দিচ্ছে টিনের ছাদ, পোষ্ট আফিস, রয়েল হোটেল, ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ড, সাহেবদের

হ্যাটকোট; একটা মাড়োয়ারি রাজার ক্যাসেল এবং পর্ব্বতের গায়ে বড় বড় অক্ষরে ছাপা নিলাম, কন্‌সর্ট ও স্কেটিংরিঙ্কের বিজ্ঞাপনী! বাহকেরা যখন দেখিয়ে দিলে আমাদের বাসাটা অনেক দূরে—আর-একটা পর্ব্বতের শিখরদেশে, তখন মনটা যেন সুস্থির হল।

দুর্গম দুরারোহ গিরিপথ উচ্চ হতে উচ্চ হয়ে বন্ধুর একটা গিরিসঙ্কটে গিয়ে প্রবেশ করেছে; তারি শেষে, পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে—হাটবাজারের অনেক উর্দ্ধে—পাখীর বুকের পালকের মত শুভ্র সুকোমল মেঘে-ঘেরা শরতের আমার এবারের বাসা—ফুলে-ঢাকা পর্ব্বতের একটা বিশাল অলিন্দের একটি কোণে, গোলাপলতা আর মল্লিকা-ঝাড়ের পাশাপাশি!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যুদ্ধ-প্রসঙ্গে

ভগবানের সঙ্গে ত সন্ধি সর্ত্ত চলেনা, তিনি যা দেন তাই নিতে হয়। তিনি প্রত্যেকের মনে, প্রতি জীবনেই কাজ করেন সর্ত্য, কিন্তু এ কাজ শুধু একের জন্য নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্য। তা না হলে বিশ্ব-ব্যাপারে এত রহস্য, এমন অকারণ শোক-দুঃখ-বেদনার স্থান হয় কোথা হতে? এই যে ভয়ানক যুদ্ধ হচ্ছে, এই যে দিনের পর দিন গৃহ শূন্য, পরিবার বিচ্ছিন্ন, দেশ বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে, সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হচ্ছে, বহুকাল ধরে বহু জীবনের আত্মদানের বিনিময়ে যে শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল সমস্তই ভেঙ্গে চুরে পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে যাচ্ছে এ কি একেবারেই নিরর্থক? এক-একটি জীবনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, এ ব্যাপারে সর্ব্ব-শক্তিমানের শক্তি ও করুণা দুয়েরই সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়তে হয়, কিন্তু সমগ্রের দিক দিয়ে যখন দেখা যায় তখন এর অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই যুদ্ধে ভাই ভাইকে গ্যাস দিয়ে নিশ্বাস রোধ করে মারছে; সহর, নগর, পল্লীগ্রাম, শ্যাম শস্যক্ষেত্র সব পুড়িয়ে ছারখার করছে;—ন্যায় দয়া ধর্ম্ম কোন-কিছুরই দোহাই মান্‌ছেনা। এতদিন ধরে ইউরোপ ধর্ম্মের ধ্বজা ধরে, বিশ্বমৈত্রীর বাহানা করে, যে-বিরাট-মিথ্যার অভিনয় করে আসছিল, আজ কি তাই অবারিত হয়ে পড়েনি?

মানবের সামাজিক জীবনে সামঞ্জস্য যখন চলে যায়, যখন প্রবল লোভ দয়া-ধর্ম্মকে অভিভূত করে, তখনই পিনাকীর জটা নড়ে ওঠে—তখনি প্রলয় উপস্থিত হয়। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, ঘটনা যখন ঘটতে থাকে তখন তার নিগূঢ় কারণটি বুঝতে পারা যায় না,—মন একটা ভালর দোহাই দেয়ই। কিন্তু যখনই লোভ মোহ আর অহঙ্কারের প্রবল প্রলোভনের আকর্ষণ হ'তে সরে দাঁড়ান যায়, যখনই মিথ্যার আবছায়া কেটে যায়, তখনই প্রখর উজ্জ্বল দিব্যালোকে দেখতে পাই ব্যাপার কি বীভৎস, কি অশোভন, কি বিশ্রী!

ইউরোপের এ যুদ্ধে যাঁরা লিপ্ত নাই, যাঁরা দূর হ'তে দেখ্‌ছেন, আর স্থির হয়ে ভাববার অবসর পেয়েছেন, তাঁরাই এর স্বরূপ সম্যক দেখতে পাচ্ছেন। কেননা নিতান্ত ঘেঁষা-ঘেঁষি করে পড়ে থাকলে, কিম্বা চোখের উপর একেবারে ঠিক্‌রে পড়লে কোন-কিছুরই ঠিক পরিমাণটি পাওয়া যায় না। প্রমাণ করে নিতে হ'লে একটু দূরতার প্রয়োজন, কিঞ্চিৎ ব্যবচ্ছেদের আবশ্যক!

খৃষ্টানধর্ম্ম বিশেষ করে ক্ষমারই ধর্ম্ম, এক-গালে চড়-খেয়ে বিনা আপত্তিতে অন্য-গাল পেতে দেবার বিধান এঁদের ধর্ম্মগুরু করেছেন, তাছাড়া সর্ব্বস্বত্যাগী হওয়াই খৃষ্টান-জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য, অথচ খৃষ্টের ধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপ এবং খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক ইউরোপীয়ের ভাবটি সাধারণতঃ এমন নিরঙ্কুশ নয়। এঁরা যাদের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে যান, তাদের একটা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়স্বরূপ গণ্য করেন। যাকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করলেন তাকে উদ্ধার করলেন বলে মনে করেনইত; তার মধ্যে জয় করবার একটা গর্ব্বও আছে। এই যে-পাশ্চাত্য জাতি শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে পৃথিবীর প্রায় সমস্তই অধিকার করেছেন, তাঁরাই আবার ধর্ম্মের অস্ত্রে সমস্ত জাতিকে আয়ত্ব করবেন এ বিশ্বাস তাঁদের খুব দৃঢ়। যদিও এঁদের ধর্ম্ম দারিদ্র্য সন্ন্যাস উদারতা ও ত্যাগের ধর্ম্ম তবুও ইউরোপীয় ভাবগতিকের সঙ্গে এ সাধনার কেমন যেন খাপ খায় না,—যেটা দান করা হয়,তার মধ্যেও আদায়ের একটা ভাব আছে। তাই বলে সবারই এ-ভাব নয়, এক-এক-জন ধর্ম্মে একেবারে তন্ময়! সবচেয়ে প্রশংসনীয় এঁদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও নির্ব্বিচার বাধ্যতা যাঁকে বড় বলে গুরু বলে মেনে নিয়েছেন, তাঁর কোন ভাব কি কথার কৈফিয়ৎ চাইবার এঁদের ইচ্ছামাত্রও নাই। এঁরা যোদ্ধার জাত, বহুকাল ধরে রাজ্য অধিকার করেই আসছেন, তাই নেতার অনুসরণ করে চলবার অভ্যাস এঁদের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে। আমরা পরাধীন জাতি, তাই স্বস্বপ্রধান, কখনই আত্মরক্ষা করতে পারিনি, তবু আমাদের আত্মম্ভরিতার অন্ত নাই, প্রত্যেকেই আত্ম-মতের সমর্থন করতে উদ্যত। তাই আমাদের কিছুই হওয়া হলনা। বড় হ'তে হ'লে যে ছোট হয়েই আরম্ভ করতে হয়, প্রধান হ'তে হ'লে যে "মহাজনো যেন গতঃ" তারই অনুসরণ করতে হয়, এ শিক্ষা আমাদের এখনও হয়নি; কবে হবে কে জানে! আমাদের আছে একমাত্র সম্বল-বুদ্ধি তাও কখনো কার্য্যকরী হয়নি কেন?

এমন কারো কি অভ্যুদয় হবে না, যিনি আমাদের বুদ্ধি বিদ্যা সব ভুলিয়ে দিয়ে, একে-বারে শিশুর মত অবোধ করে দেবেন, একেবারে সরল বিশ্বাসে জীবনের প্রত্যেক অংশ অনুপ্রাণিত করে তুলবেন, আর আমরা বিনা প্রশ্নে ধর্ম্ম-গুরুর অনুসরণ করে ধন্য হব। সমস্ত দেশের উদ্ধার সাধন হবে।

এখনও আমাদের কাজের সময় আসেনি, ধ্যানধারণার ফলে যখন আমরা ধর্ম্মে একেবারে তন্ময় হয়ে যাব, তখনি দেশে আশ্রম গড়ে উঠবে, শিক্ষা বিস্তার লাভ করবে, সেবার ধর্ম্ম প্রচার হবে। যতক্ষণ সে ধর্ম্মের আর সেই ধর্ম্ম-বীরের আমাদের মধ্যে

অভ্যুত্থান না হচ্ছে ততক্ষণ কিছুরি আশা নাই। কিন্তু আশা কি নাই? আছে ত! এই যে গারো, খাসি, কোল, ভীল, জেলে, ধোপা, চাঁড়াল, চামার সবাই ধর্ম্মব্যাকুল হয়েছে, সবাই উঠতে চায়, সবাই নূতন পথে চল্‌তে উৎসুক, এর কি কোন অর্থ নাই? এই ত আশার সম্পূর্ণতা লাভের প্রথম সোপান।

ইউরোপ যুদ্ধ, বিগ্রহ, বিপ্লব, রক্তপ্লাবনের মধ্য দিয়ে শান্তির পথে চলেছে; আমাদের শান্ত-কর্ম্মের পথে সার্থকতা অর্জ্জন করতে হবে। ইউরোপ অনধিকার চর্চ্চার স্বাধিকার প্রমত্ত হয়েছে, আর আমরা অপরের অনধিকার চর্চ্চার প্রশ্রয় দিয়ে স্বাধিকার-বঞ্চিত, অসাড় হয়ে বসে আছি। যুদ্ধ-প্রিয় ইউরোপ দেখ্‌বে যুদ্ধ কি ভয়ানক, ভাইয়ের বুকে ভায়ে ছুরি বসান কি কুৎসিত, কি অস্বাভাবিক; তেম্নি আমাদেরও দেখ্‌তে হবে, কর্ম্মহীন অসাড় জীবন কি অসার, জড়তা কি পরিমাণ স্বার্থপরতা, মানুষের স্বাধীন চিত্তবৃত্তি অকর্ম্মণ্য হয়ে থাক্‌লে কত পাপেরই সৃষ্টি করে, যুগান্ত ধর্ম্ম ভিন্ন তার বিনাশ নাই। তাইত গীতায় বারম্বার বলে কাজ কর। ভুল কাজ কর সেও ভাল, নিষ্কর্ম্মা হয়ে থেক না। মানুষ পথে পড়ে মরছে, আর আমাদের নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ চন্দনতিলক কেটে, নামাবলি খানি গায়ে সামলে নিয়ে, মালা জপতে-জপতে পাশ-কাটিয়ে চলে গেলেন, পাছে অশুচি স্পর্শে তাঁর জাতি-ধর্ম্ম নষ্ট হয়। অথচ তিনি কি জানেন না যে ভগবানের জীবকে দয়া করলেই তাঁর যথার্থ পূজা করা হয়; ও মালা-জপে কিছুই নাই! সবই জানেন, তবুও করেন না কিছুই। করার মধ্যে যে-যে অসুবিধা আছে, যে স্বার্থত্যাগ আবশ্যক, সেইটি স্বীকার করতে সম্মত নন। নিজেকে ভুলিয়ে, দশের চোখে ধূলা দেবার চেষ্টায় বলেন, "যাঁর কর্ম্ম তিনিই করবেন, আমি কি করতে পারি? সময় যখন আস্‌বে তখন সবই হবে।" কিন্তু এ কথা ত ঠিক্ নয়, সময় তো সব সময়েই এসে রয়েছে, আমরা প্রত্যেকেই যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের সহায় হতে পারি। একেই দশের কাজ করে, —আমাদের দেশের ইতিহাস ধর্ম্ম ও পুরাণ-কাহিনী এই সত্যই বার বার প্রচার করে আস্‌ছে। একা রাম রাবণের অগণ্য সৈন্য অপরিসীম ক্ষমতা দর্প চূর্ণ করে দিয়েছিলেন; এক শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিবলে পঞ্চপাণ্ডব কৌরব-অক্ষৌহিণী সমূলে নিধন করেছিল। একা বুদ্ধ সমগ্র আসিয়া-খণ্ড অহিংসা পরমধর্ম্মে জয় করেছিলেন; একা নিমাই প্রেমের প্লাবনে সব ভেদবুদ্ধি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। মানুষ তখনই দুর্ব্বল যখন তার ইচ্ছা আর কাজ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী কিন্তু যখন তার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়, তখন সে যে অজেয়, অপার শক্তির অধিকারী;—কিছুই তার পক্ষে অসম্ভব থাকে না, তখনি সে অলৌকিক কাজ সকল করতে সক্ষম হয়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

প্রথম প্রণয়

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহে ফিরিয়া বসিবার ঘরে ঢুকিয়া বরদাবাবু ডাকিলেন, "বিভা—"

কালো রঙের শাড়ী-পরা এক অপূর্ব্ব-সুন্দরী কিশোরী চঞ্চল চরণক্ষেপে "বাবা—" বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল; কিন্তু পিতার সহিত অপরিচিত এক তরুণ যুবাকে দেখিয়া সসঙ্কোচে থমকিয়া দাঁড়াইল। যুবার হাত ধরিয়া বরদাবাবু হাসিয়া কহিলেন, "এঁকে চিনতে পারছিস্ না? এঁর নাম শিশির বাবু—যাঁর লেখা গল্প-টল্প পড়ে তোরা খুব সুখ্যাতি করিস্, ইনি সেই শিশিরবাবু। ইনি এখানকার কলেজে ফিলজফির প্রোফেসর, আজ পাঁচ-ছ' মাস ভাগলপুরে রয়েছেন।" তাহার পর যুবার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, "বসুন, শিশির বাবু—"

শিশির নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে আসন গ্রহণ করিলে বরদাবাবু হাঁকিলেন, "রামফল—"

সে আহ্বানে একজন ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইল। বরদাবাবু তাহার হাতে লাঠিগাছটা দিয়া চাদরখানা টেবিলের উপর ফেলিলেন ও সম্মুখস্থ ইজিচেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "এইটিই আমার মেয়ে, শিশিরবাবু,—বিভা। এরই কথা আপনাকে বলছিলুম। বেচারী নেহাৎ একলা থাকে। বাড়ীতে আমার আর ত কেউ নেই—আমি আর আমার এই ছোট্ট মা-টি। তুই ঐ চেয়ারটায় বোস্ না, বিভা, দাঁড়িয়ে রৈলি কেন? এঁর সঙ্গে আলাপ কর্। আজ আমি এঁকে একরকম আবিষ্কার করেছি। কেমন শিশির বাবু, নয় কি?" বলিয়া বরদা বাবু হা-হা করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

শিশির একবার মুখ তুলিয়া বিভাকে দেখিয়া লইল। অপূর্ব্ব সুন্দরী বটে! কালো রঙের কাপড়খানায় সে রূপে আরও যেন মাধুরী ফুটিয়াছে। বিভা সস্মিত দৃষ্টিতে এই তরুণ আগন্তুককে দেখিয়া লইতেছিল। সে দৃষ্টির সম্মুখে শিশিরের চোখ আপনিই নত হইল। বিভা কোন কথা কহিল না, বা কোনরূপ চাঞ্চল্য দেখাইল না। শিশিরের মনে হইল, সে যেন এই ক্ষুদ্র নিভৃত শান্তির কুঞ্জটিতে কোথা হইতে দস্যুর মত সহসা প্রবেশ করিয়া ইহার সরল সহজ আনন্দটুকুকে একেবারে হরণ করিয়া লইয়াছে। সে না থাকিলে এখনই এ ঘরে হাসি ও কথার লহর ছুটিয়া যাইত! শিশির ঈষৎ কুণ্ঠিত হইল। বরদাবাবু কহিলেন, "আজ টাউন হলে এঁরই বক্তৃতা ছিল। 'কাব্য ও কবি'র সম্বন্ধে ইনি চমৎকার প্রবন্ধ পড়েছেন। কবি আর কাব্য—দুটো আলাদা জিনিষ নয়। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির আলোচনা করলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়। ঠিক কথা! ভারী সুন্দর কথা! আর কি যুক্তি

দিয়েই তা বুঝিয়েছেন। সত্যি বিভা, ইনি যে এমন ইংরিজিও লিখতে পারেন, তা বোধ হয় তোর জানা ছিল না। তুই সেদিন ওঁর কি-একটা গল্পের খুব সুখ্যাতি করছিলি না? ভারী সুন্দর বাঙ্‌লা লেখেন, বলছিলি! হাঁ ভাল কথা, শিশির বাবু, আপনি চা খান ত?"

শিশির সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া কহিল, "আপনি আমায় 'বাবু' বলবেন না, শুধু শিশির বলবেন। বাবু বললে আমি বড়ই লজ্জা পাব।"

বরদাবাবু কহিলেন, "কেন, আপনি কি এই নতুন শ্রীযুতদের দলে?" শিশির বিভার পানে চকিতের জন্য একটা লজ্জা-মিশ্রিত দৃষ্টি হানিয়া মৃদু স্বরে কহিল, "আপনি আমার পিতৃতুল্য। আপনি আমায় 'আপনি' বলে কথা কইলে আমার বড় সঙ্কোচ হয়।"

বরদাবাবু উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "ওহোহো, তাই বলছেন! আচ্ছা, আমি তোমাকে 'তুমি'ই বলব। বিভা, তুমি মা দু' কাপ চায়ের জোগাড় দেখ। আপনি কি চায়ে চিনি বেশী পছন্দ করেন, শিশির বাবু? না, না, ভুল হয়েছে, পছন্দ কর?"

শিশির কোনমতে উত্তর দিল, "আজ্ঞে না, বেশী চিনি দিতে হবে না।"

বিভা উঠিয়া গেল। বরদাবাবু কহিলেন, "বুঝেছেন, শিশির বাবু? না, না, বুঝেছ শিশির, বিভা নেহাৎ একলাটি থাকে। ওর সঙ্গী বা বন্ধু কেউ নেই। আমি বুড়ো মানুষ, তায় আমার আবার একটু ঐ নুড়ি-পাথর নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করা এক রোগ আছে। আমার স্ত্রী মারা গেছেন আজ দশ বছর; বিভা তখন সাত বছরের মেয়ে। সেই অবধি ঐ নুড়ি-পাথরে ঝোঁকটাও আমার অসম্ভব বেড়ে গেছে। তবু এর মধ্যে বিভার লেখাপড়ার দিকে যে মোটেই মনোযোগ করিনি, তা ভেবো না। ও ইংরিজি সংস্কৃত অনেক পড়ে ফেলেছে। তা-ছাড়া ওর একটু বাঙ্‌লা লেখারও সখ আছে। এত-বড় মোটা খাতা পাঁচ ছ'খানা লিখে ফেলেছে, গল্প আর কবিতা—নেহাৎ মন্দ লেখে না!"

শিশির একটা কথা কহিবার বিষয় পাইয়া যেন বর্ত্তাইয়া গেল। সে কহিল, "কোন মাসিকপত্রে ছাপিয়েছেন কি সে-সব?"

বরদাবাবু কহিলেন, "না, সে দিকে ওর খেয়ালই নেই। এই আমিই ওর একটি মাত্র পাঠক। মাঝে মাঝে আমাকেই দু'-চারটে এসে শোনায়। আমাকেও ও নুড়ি-পাথর সরিয়ে শুনতে হয়! কি করি, ও ছাড়ে না। কিন্তু কি জানো, ও-সবগুলো, তোমাদের ঐ কবিতা কি গল্প, আমি কেমন বুঝতে ভালো পারি না। তবুও শুনতে হয়—না হলে বেচারী মনে ব্যথা পাবে। আমিই ওর মা-বাপ, ভাই-বন্ধু সব কি না!"

বরদাবাবুর স্বর ঈষৎ আর্দ্র হইয়া আসিল। শিশির তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। এই স্বরে বৃদ্ধের ভিতরটা যেন তাহার চোখের সম্মুখে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। স্নেহময় সুন্দর একটি প্রাণ—সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ, সমবেদনায় সুমধুর!

বরদাবাবু একটু থামিয়া একটা দীর্ঘ

নিশ্বাস ফেলিলেন, পরে আবার কহিলেন, "তুমি যদি মাঝে মাঝে এসে ওর সঙ্গে একটু আধটু সাহিত্যালোচনা কর—তাহলে দেখবে, ও বেশ বুদ্ধিমতী! মেয়েটার যখন এদিকে একটু ঝোঁক আছে, তখন আমার ইচ্ছে নয়, সেটা দমে যায়! ঐ নিয়ে ও যদি ভালো থাকে, থাকুক!"

শিশিরের চিত্তে একটা তীব্র কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। সে কৌতূহলে একটু বেদনাও যে না ছিল, এমন নয়। বিভার এই সুন্দর তরুণ জীবনে তবে বিষাদ কি কোন করুণ রেখা পাত করিয়াছে? অকাল বৈধব্যের ছায়া কি তাহার এই শুভ্র জীবনে কালি মাখাইয়া দিয়াছে? কিন্তু না, তাহার ঐ সজ্জিত সুন্দর বেশ, সস্মিত দৃষ্টি—! তবুও একবার কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা সে রোধ করিতে পারিল না, কোন-মতে জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটির বিয়ে দেন নি?"

বরদাবাবু যেন স্বপ্নোত্থিতের মত কহিলেন, "এ্যাঁ, বিয়ে! না, বিয়ে আর দেওয়া হয় নি—" বরদাবাবু আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু বলা হইল না। বিভা কক্ষে প্রবেশ করিল, সঙ্গে রামফল; হাতে তাহার ট্রে, ট্রের উপর চায়ের কেট্‌লি, কাপ প্রভৃতি সরঞ্জাম।

বরদাবাবু একটা বড় রকমের নিশ্বাস চাপিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "এই যে চা তৈরি। বাঃ, এর মধ্যে হয়ে গেল!"

বিভা কহিল, "রামফল আগে থেকেই জল চাপিয়ে রেখেছিল—" বিভা কাপে চা ঢালিয়া চামচে চিনি লইয়া শিশিরের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনার কাপে দু'চামচে চিনি দি?"

শিশিরের সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কোনমতে মুখ তুলিয়া জড়িত স্বরে সে কহিল, "না, এক চামচেই হবে।"

চায়ের কাপ মুখে তুলিতেই শিশিরের সব কেমন গুলাইয়া গেল। একজন কিশোরীর সহিত এমন অসঙ্কোচ আলাপ তাহার জীবনে এই প্রথম! ফিলজফির প্রোফেসরি করিলে কি হইবে, এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই—নারী-হৃদয়ের সহিত তাহার পরিচয় গৃহে আপনার মাতা ও ভগ্নীদের লইয়াই! সে স্নেহ, সে অভ্যর্থনা আর-এক জিনিষ! কিন্তু এ অভ্যর্থনার মাধুরী, —এ অপূর্ব্ব! কেতাবে-পড়া নারী-চরিত্র হইতেই তাহার নারী-হৃদয়ের অভিজ্ঞতা! তাহারই উপর রঙ্ ফলাইয়া কল্পনার তুলিতে গল্পে-উপন্যাসে সৃষ্টিছাড়া কত নারীর চিত্র সে আঁকিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজিকার এই বিজন প্রবাসে মধুর সন্ধ্যায় নারী-হৃদয়ের যে সঙ্কোচহীন সরল সহজ লীলাটুকু তাহার চোখে পড়িল, তেমন ছবি তাহার কল্পনাতেও কোন দিন উঁকি দেয় নাই!

চা পান করিয়া বরদাবাবু কহিলেন, "ঐ যাঃ! বেরোবার আগে যে পাথরটা দেখ-ছিলুম, সেটা বাগানেই ফেলে এসেছি। যাই, দেখে তুলে আনি সেটা—"

বরদাবাবু চলিয়া গেলেন। শিশিরের বুকের মধ্যটা অস্বাভাবিক স্পন্দনে দুর-দুর করিয়া উঠিল। সে স্পন্দনের ধ্বনি শুনিয়া লজ্জায় তাহার মরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল।

তাহার শুধু মনে হইতে লাগিল, মূকের মত এমনভাবে বসিয়া থাকাটা নিতান্তই বিশ্রী দেখাইতেছে! একটা কথা বলা ভারী দরকার—নহিলে মহিলার সম্মান রক্ষা হয় না। আর এরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে এই বুদ্ধিমতী কিশোরীর মনে এ ধারণাও জন্মিতে পারে যে, সে একেবারেই বেকুব! কিন্তু কি কথা কহা যায়? কি কথা? সহসা একটা কথা তাহার মনে পড়িল। অমনি তাহার মন সস্মিত হইয়া উঠিল! বাঃ, ঠিক হইয়াছে—এই ব্যাপার লইয়াই কথা আরম্ভ করা যাক—বিষয়টা প্রাসঙ্গিক হইবে এবং প্রথম আলাপের পক্ষেও মন্দ নহে।

শিশির কথা কহিবার চেষ্টা করিল কিন্তু এমন একটা জড়িত অস্পষ্ট স্বর বাহির হইল যে তাহার মনে হইল, এই মুহূর্ত্তে চক্ষু মুদিয়া ঘর হইতে সে ছুটিয়া পলায়! সুন্দরী শ্রোত্রীটি কোনরূপ চাঞ্চল্যের আভাষমাত্র না দিয়া কহিল, "আমাকে বলছেন?" এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! কথা কহিতে গেলে স্বর বাধিয়া যায়!

প্রাণপণ বলে স্বরটাকে স্পষ্ট করিয়া শিশির কহিল, "আমার এ তুচ্ছ নগণ্য লেখা তাহলে আপনি পড়েন—এ শুনে আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে!"

বিভা দিব্য অচপল স্বরেই উত্তর দিল, "আপনার কতকগুলো গল্প আমার ভারী ভাল লেগেছিল। সেগুলো আমি বাবাকেও পড়ে শুনিয়েছি।" শিশির মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার লেখার এমন পাঠিকা আছে! আর সে পাঠিকাকে কখনও চক্ষে দেখিবে, ইহা যে সে স্বপ্নেও কোন দিন ভাবিতে পারে নাই!

শিশির কহিল, "শুনলুম, আপনি বেশ লিখতে পারেন। দয়া করে সেগুলি আমায় একবার পড়তে দিতে হবে! আমি তাহলে কৃতার্থ হব।"

মৃদু হাসিয়া বিভা কহিল, "বাবা বুঝি বলেছে? হ্যাঁ, সে আবার লেখা! আপনি পাগল হয়েছেন!"

শিশির কহিল, "পাগল হব কেন? একটু আলাপেই যা বুঝেছি, তাতে আপনার বাবার উপর আমার শ্রদ্ধা বড় অল্প হয় নি।"

বিভা একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "না, সে আমায় মাপ করবেন, শিশিরবাবু—সে আমি কিছুতেই দেখাব না! আপনি একজন অত-বড় লেখক—না, না, সে লেখা দেখানো হবে না।"

শিশির কহিল, "আমি 'তরণী'তে ছাপাবার জন্য পাঠিয়ে দেব।"

বিভা কহিল, "আমি ত সে-সব ছাপাবার জন্য লিখি না—আর সে সাধ্যও আমার নেই। ছাপাবার মত লেখাই যদি হত, তাহলে কি আর কারও সুপারিশের জন্য এতদিন ফেলে রাখতুম!"

"তবু—"

"না, সে আমায় মাপ করবেন, শিশির বাবু—"

বিভার এই আব্দার-মাখানো অসম্মতি-টুকু শিশিরের ভারী ভাল লাগিল। সে আবার অনুরোধ করিতে ছাড়িল না, কহিল, "নিজের লেখার ঠিক সমালোচনা কেউ করে না, করতে পারেও না! তাই আপনি

বলছেন, আপনার লেখা ছাপাবার যোগ্য নয়—”

ঈষৎ হাসিয়া বিভা এবার কহিল, “এ কথাটা ঠিক হল না, শিশিরবাবু। নিজের লেখা যত নিকৃষ্টই হোক, লেখকদের ধারণা থাকে যে তা ভারী সরেস হয়েছে। তা যদি না হবে ত এত-সব লক্ষ্মীছাড়া লেখা নিয়ে নতুন-নতুন মাসিক-পত্রই বা রোজ-রোজ বেরুবে কেন?”

শিশির হাসিয়া কহিল, “আপনার এ কথাটা ভারী খাঁটি, বটে!”

শিশিরের কথার সঙ্গে সঙ্গেই বিভা কহিল, “কিন্তু আপনাকে দেখে আজ আমি ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেছলুম, শিশির-বাবু—”

শিশির কহিল, “কেন?”

বিভা একবার দ্বিধা করিল, কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই বলিল, “আপনার লেখা পড়ে আপনার চেহারার সম্বন্ধে আমার অন্য রকম ধারণা ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি ঢের বড়—মাথার চুলেও কিছু-কিছু পাক ধরেছে, আর—”

শিশির হাসিয়া কহিল, “কিন্তু দেখলেন কি!”

“দেখলুম, আপনার বয়স তার চেয়ে ঢের কম।”

বরদাবাবু এই সময় ঘরে আসিলেন, আসিয়াই কহিলেন, “দেখলি বিভা, ভাগ্যে গেছলুম—পাথরটা কে ফেলে দিয়েছিল! না নিয়ে এলে হয়ত হারিয়ে যেত! অথচ এটার জন্য কত দাম লেগেছে, জানিস ত? সাতচল্লিশ টাকা। পুরোনো পাটলিপুত্রের পাথর। এর লেখা উদ্ধার করতে আজ এক মাস কি কষ্টই পাচ্ছি!”

বিভা হাসিয়া কহিল, “তা তুমি ত বাবা আমাকে ও-সব তুলতে-নাড়তে দেবে না!”

বরদাবাবু কহিলেন, “কি জানিস্ মা, কত রকম করে ধরে, কত লেখার সঙ্গে মিলিয়ে ঠিক-ঠাক করি; তোরা যদি ঘাঁটতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলিস্, তাহলে আমার পরিশ্রম বেড়ে যেতে পারে! এই জন্যই আর কি বলা! কি বলেন, শিশির বাবু—না, না, শিশির, তাহলে তোমাদের আলাপ-পরিচয় হল? কেমন, বিভার বুদ্ধি-সুদ্ধি কেমন দেখলে? আমি যা বলেছি—exceptionally intelligent—নয় কি?”

শিশির ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

সেদিন বিদায় দিবার সময় বরদাবাবু বারবার অনুরোধ করিলেন, “যখন সময় পাবে, তখনই এসো, শিশির। আমরা এখানে এক রকম নির্ব্বান্ধব-গোছ রয়েছি।” বিভা কোন কথা কহিল না; কিন্তু আসিবার সময় শিশির তাহার পানে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, বিভার চোখেও বেশ একটা ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে! সে ঔজ্জ্বল্যের সে যে অর্থ বুঝিল, তাহাতে তাহার আর তৃপ্তির সীমা রহিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিন সারারাত্রি শিশিরের ঘুমটা বড় সুবিধার হইল না। মনের মধ্যে অনেকখানি আনন্দ যেন কে ঠাসিয়া দিয়াছে—হৃদয়ের দুই কূল অপরূপ মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে নিঃসঙ্গ প্রবাসের নিরানন্দ দিনগুলাকে

ঠেলিয়া এ কি হর্ষ শতদলে আজ ফুটিয়া উঠিল! সার্থক সে টাউনহলে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিল! জয়ের এতখানি আনন্দ সে আর কখনও পায় নাই।

তাহার পর প্রতিদিনই কলেজের ছুটি হইলে শিশিরকে কে যেন মন্ত্র-চালিতের মতই টানিয়া বরদাবাবুর গৃহের দিকে লইয়া যাইত! যে শিশির আপনার নির্জ্জন গৃহ কোণটিতে আবদ্ধ থাকিত, সে আজ অবসর-কালে সে জায়গায় একান্তই দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল। বরদাবাবুর গৃহের চায়ে সে কি অপূর্ব্ব রসের স্বাদ পাইয়াছিল, তাহা সে-ই জানে। সন্ধ্যায় নিজের গৃহে চায়ের পাঠ একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। ভৃত্য-পাচক মনিবের ভাবান্তরে বিস্মিত হইল।

সেদিন রবিবার। সকালেই শিশির বরদাবাবুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। চায়ের কাপ নামাইয়া বরদাবাবু কহিলেন, “আরে শিশির যে, এস, এস। রামফল, তোর দিদিমণিকে বল্, শিশিরবাবুর জন্য এক কাপ চা চাই।”

শিশির হঠাৎ কেমন লজ্জা পাইয়া বলিল, “এধারে একটু কাজে আসতে হয়েছিল, ভাবলুম, আপনার এখানেও অমনি একবার ঘুরে যাই।”

বরদাবাবু কহিলেন, “বেশ করেছ হে! আজ রবিবার, তোমার ছুটিও আছে। তোমাকে তাহলে একটু খাটিয়ে নি। কি বল? কোন অসুবিধে হবে না ত?”

অসুবিধা! শিশির বর্ত্তাইয়া গেল। অনেকক্ষণ সে স্বচ্ছন্দে এখন এখানে কাটাইতে পারিবে!

বিভা চায়ের কাপ লইয়া আসিয়া কহিল, “এই নিন্ চা, শিশিরবাবু—” বরদা-বাবু কহিলেন, “হাঁ, চাটা খেয়ে নাও, শিশির। তারপর, বুঝলি বিভা, আজ শিশিরকে একটু খাটাব মনে করছি। আমি ভাবছিলুম, কি করি—তা শিশির খুব এসে পড়েছে, যাহোক্।”

শিশির কহিল, “বলুন, আমায় কি করতে হবে।”

বরদাবাবু কহিলেন, “এমন কিছু নয় —প্রায় পঁচিশ-ত্রিশখানা পাথর থেকে বিস্তর লেখার পাঠোদ্ধার করা গেছে। সেগুলো অমনি নোট্ করা আছে; তুমি সেগুলো দেখে একটা indexএর মত করে দেবে। কেন না, ওগুলো গুছোনো থাকলে আমার লেখবার সুবিধে হবে। এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালের জন্য একটা প্রবন্ধ লিখছি কি না!”

বিভা হাসিয়া কহিল, “তবেই হয়েছে! তুমি বাবা বাঙলা দেশের একজন এত-বড় নভেলিষ্টকে একেবারে প্রত্নতাত্ত্বিক করে দিতে চাও! সাহিত্য পরিষৎ এতে কৃতার্থ হতে পারে, কিন্তু দেশের যত গল্পখোর পাঠক তোমার উপর খড়্গহস্ত হবে। কি বলেন, শিশিরবাবু, আপনি তাহলে গল্পটল্প ছেড়ে এবার তাম্রশাসন লিখতে সুরু করবেন না কি?”

বরদাবাবু কহিলেন, “তাম্রশাসন লেখাটা কি নগণ্য কাজ হল?”

বিভা কহিল, “না বাবা, ও-সব দুর্ব্বোধ টীকা-টিপ্পনী দেখলে আমার জ্বর আসে। যাক্, আমি কোথায় ভাবছিলুম, শিশিরবাবু যদি এলেন, ওঁর সঙ্গে একটু

শাজঙ্গীর দিকে বেড়িয়ে আসব—না, তুমি ওঁকে একেবারে একরাশ নুড়ি-পাথরে চাপা দিয়ে বসলে!"

এই সরল সহাস স্বর শুনিয়া শিশির মুগ্ধ হইয়া গেল। এ যেন পাখীর গান! স্বর কোথাও এতটুকু বাধে না, কথায় কোথাও একটু খোঁচ নাই—সলীল স্বচ্ছ প্রবাহে হৃদয়খানি উছলিয়া চলিয়াছে! আর সে, এত-বড় হতভাগা বেকুব সে—যে, এই বিভার সহিত কথা কহিতে তাহার গলা বুজিয়া আসে, কথা বাধিয়া যায়, দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না!

বরদাবাবু কহিলেন, "তা যা, না হয় একটু বেড়িয়ে আয় তোরা। এক কাজ করলে হয় না বরং? শিশিরের যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে এখানেই না হয় আজ ওকে নিমন্ত্রণ কর্ না! কি বল, শিশির, তোমার আপত্তি আছে?"

শিশির তেমনই কুণ্ঠার সহিত বলিল, "না, আপত্তি আবার কিসের?"

বিভা কহিল, "কি জানি, শিশিরবাবু, ঘরের কোণে ঐ ভাঙ্গা পিয়ানোটা দেখে যদি আপনার মনে কোন খটকা উঠে থাকে! আমরা ব্রাহ্ম নই, শিশিরবাবু। আমাদের বাড়ী খেলে জাত যাবে না—বামুনেই রাঁধে, বাবুর্চ্চিতে নয়।"

কথাটা কাঁটার চাবুকের মতই শিশিরের হাড়ে গিয়া বিঁধিল। প্রথম পরিচয়ের দিন হইতে এই সংশয়টুকুই তাহার মনের মধ্যে উঁকি দিয়া ফিরিতেছে এবং সে যে ঠিক প্রাণ খুলিয়া ইহাদের সহিত মিশিতে পারিতেছে না, এই সংশয়টুকুও তাহার এক প্রধান কারণ!

দুইজনে বেড়াইতে বাহির হইয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শিশিরের বাড়ী কোথায়, সেখানে কে-কে আছেন, কেন তাঁহাদের এখানে আনেন নাই ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া হঠাৎ কি উপলক্ষ করিয়া এই প্রসিদ্ধ গল্প-লেখকটি সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইলেন, এ প্রশ্নও বিভা বাদ রাখিল না। অনায়াস কৌতূহলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া সে তাহার নূতন অতিথির মনের অলি-গলির বিস্তর বার্ত্তা সংগ্রহ করিল। এই ভক্ত তরুণীটির সম্বন্ধে শিশিরের মনেও যে কোন কৌতূহল জাগে নাই, এমন কথা বলা যায় না। তবে সঙ্কোচই এক্ষেত্রে দারুণ অন্তরাল রচনা করিয়া তুলিল। কি জানি, কোন্ প্রশ্ন সমীচীন হইবে, কোন্‌টাই বা কিশোরী মহিলার কানে অমর্য্যাদার মত শুনাইবে! তাই প্রতিপদে সে কেমন থমকিয়া পড়িতেছিল। তাহার উপর আশপাশের পথিকগুলার নিতান্ত অসন্দিগ্ধ দৃষ্টি যখন তাহার উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন সে লজ্জায় কেমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল। প্রকাশ্য পথে কিশোরীর সহিত এভাবে ভ্রমণ করার ব্যাপার যে তাহার জীবনে সকল সম্ভাবনার বাহিরে ছিল!

পাহাড়ের উচ্চ টিলার সম্মুখে আসিয়া বিভা কহিল, "এই শাজঙ্গী।" টিলার কোলে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী—টিলার উপরে দেওয়াল-গাঁথা ছোট একটা ঘরের মত। শিশিরকে লইয়া বিভা সেই ঘরের সম্মুখে আসিল। স্নিগ্ধ রৌদ্রালোকে চারিধার ঝলমল করিতেছিল—নীচে জমির উপর কয়-ঘর দরিদ্র মুসলমানের বাস—তাহাদের ছোট

ছেলেমেয়েরা পুকুরের পাহাড়ে খেলা করিতেছিল। পথে একরাশ ধূলা উড়াইয়া গরুর গাড়ী বোঝাই লইয়া চলিয়াছে—বলদগুলার গলায় ঝুলানো ঘণ্টা হইতে বিচিত্র ধ্বনি মৃদু তালে রণিয়া উঠিতেছে। শিশিরের কাছে আগাগোড়া ব্যাপারটা স্বপ্নের মতই মনে হইতেছিল। নিভৃত প্রদেশ, দূর লোকালয়ের হাস্য-কলরব মৃদু গুঞ্জনের মত কানে আসিয়া লাগিতেছে, পার্শ্বে তরুণী সঙ্গিনী! কল্পনা-লোকের এই তরুণ অতিথিটির সহসা মনে হইল, জগৎ-সংসার ছাড়িয়া সে যেন আজ সাধারণের বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে—সঙ্গে কেহ নাই, কিছু নাই! আছে শুধু অপরূপ মাধুরীর জীবন্ত প্রতিমা, এই সুন্দরী সহচরী! তাহার বুকের মধ্যে এক বিচিত্র বাসনা সাগর-মন্থনের সুধার ন্যায়ই ভাসিয়া উঠিল। বিশ্বের ললামভূতা এই ললনা চিরদিন যদি তাহার পাশে থাকিত! যাক্ মুছিয়া সমস্ত জগৎ-সংসার, কলেজের প্রোফেসরি, ফিলজফির লেকচার,—কি তাহাতে আসিয়া যাইবে!

বিভা এদিকে স্থির ছিল না। দেওয়ালের গায় বন্যলতাগুলা বিচিত্র বর্ণের ছোট ফুলে ভরিয়া ছিল। সে ক্ষিপ্র হস্তে অজস্র ফুল-পাতাসহ একটা লতা টানিয়া শিশিরের নিকট আসিয়া হাসিয়া বলিল, "আজকাল কবিদের অভিনন্দন দেবার ভারী ধূম চলেছে, আমি আপনার একজন নগণ্য ভক্ত পাঠিকা—এই laurel আপনার শিরে আজ জয়মাল্যের মত পরিয়ে দিচ্ছি—নিন্।" বলিয়া দিব্য অসঙ্কোচে সে সেই লতাটি শিশিরের মাথায় পরাইয়া দিল।

নিটোল সুন্দর সেই হাতের স্পর্শ শিশিরের শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত ছুটাইয়া দিল। নিমেষের জন্য তাহার চোখের সম্মুখ হইতে সমস্ত বনভূমি, আকাশ-চরাচর অদৃশ্য হইয়া গেল—সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা দুইটি উদগ্র কোমল বাহুর বেষ্টনে পরিণত হইল! শিশিরের একবার ইচ্ছা হইল, এই দুটি বাহুকে সাদরে সে আপনার তপ্ত বুকে চাপিয়া ধরে! সে কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল—তাহার চৈতন্য ছিল না। চোখের সম্মুখে এই যে কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল, ইহা কি সত্য! না, স্বপ্ন! ভাল করিয়া সব বুঝিবার পূর্ব্বেই শিশিরের হাত ধরিয়া টানিয়া বিভা কহিল, "আসুন, শিশিরবাবু, ঐ টিলার উপর বসিগে—আপনি চারধার দেখে-শুনে একটা প্লট ঠিক করে ফেলুন। সেটার নাম দেবেন, 'শাজঙ্গী'। আসুন।" বিমূঢ় শিশিরকে একরূপ টানিয়া আনিয়া বিভা টিলার একধারে একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িল—শিশির দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে বিভার পানে চাহিয়া রহিল। বিভা হাসিয়া কহিল, "অবাক হয়ে আমার পানে চেয়ে রইলেন যে! আমি ঠাট্টা করছি না। বসুন, দেখুন দেখি কোন প্লট পান কি না! আচ্ছা শিশির বাবু, আপনি গল্প লেখেন কি করে? আমায় আজ সব বলতে হবে। আমি ত কিছুতেই প্লট পাই না—কত ভাবি, তবুও না।"

শিশির কথা কহিবে কি—তাহার বাক্-শক্তি একেবারে লোপ পাইয়াছিল। বিভার কণ্ঠস্বরে কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত উছলিয়া

উঠিয়াছিল,—হায়, বিভা কি তাহার কোন সন্ধান রাখে? বাঁশীর তানে মুগ্ধ মৃগ যেমন সকল চেতনা হারাইয়া ব্যাধের শর বিনা যাতনায় বক্ষে ধারণ করে, বিভার এই সরল মধুর কণ্ঠস্বরে এক অদৃশ্য দেবতার পুষ্প শর অলক্ষ্যে তাহার বুকে বিঁধিতেছিল। সে স্বরে এমনই সে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার খেয়ালই ছিল না, এই যে অনুভূতি তাহাকে গ্রাস করিতেছে, ইহা সুখের, না, যাতনার? তাহার মনটা এক ঘূর্ণীপাকের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিছুই হুঁস ছিল না! তার পর হঠাৎ এক সময় শিশির চাহিয়া দেখে, বিভা নীরবে মূক প্রকৃতির পানে চাহিয়া আছে। শিশুগাছের বিস্তীর্ণ জঙ্গল চারিদিকে বহুদূর অবধি বিস্তৃত—টিলার উঁচু জমি হইতে সে জঙ্গল চমৎকার সজ্জিত দেখাইতেছিল। শিশির বিভার পানেই চাহিয়া ছিল। মাথার মধ্যে কি একটা কথা তাল পাকাইতেছিল। হঠাৎ তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কম্পিত স্বর ফুটিয়া বাহির হইল, "বিভা—"। বিভা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল—একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস চেষ্টা করিয়াও সে রোধ করিতে পারিল না। শিশির তাহা লক্ষ্য করিল। কেন এ নিশ্বাস! বিভা কি ভাবিতেছে! বিভার চোখ ঝাপসা হইয়া আসিয়াছিল—পাছে শিশির তাহা দেখিতে পায়, তাই সেদিকে না চাহিয়া নত নেত্রে সে বলিয়া উঠিল, "রোদ উঠেছে—চলুন শিশিরবাবু, বাড়ী যাই!" এবং তখনই শিশিরের মতামতের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া সে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সেদিন খর রৌদ্রে ফিরিবার পথে শিশির স্পষ্ট বুঝিল, তাহার নিজের অস্তিত্ব বলিয়া আর-কিছুই নাই। সে যে চলিতেছে, ফিরিতেছে, কথা কহিতেছে, এ শুধু এই তরুণী সহচরীটিরই তর্জ্জনীর ইঙ্গিতে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সোমবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে শিশির যখন বরদাবাবুর গৃহে আসিল, বরদাবাবু তখন জর্নালের জন্য কাপি লিখিতেছেন। শিশিরকে দেখিয়া বরদাবাবু কহিলেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি এই কাজটা সেরে নিয়েই একটু বেড়াতে বেরুব। আজ জ্যোৎস্না আছে—নদীর ধারে বেড়াতে কোন অসুবিধা হবে না। বিভা বাড়ীতে নেই, আমার দাইয়ের ছেলেটির খুব জ্বর হয়েছে, তাকে দেখতে গেছে—সেবা-শুশ্রূষা নিজের হাতেই সে করছে সব। মার আমার ভারী মমতা! আমিও একবার ফেরবার মুখে দেখে আসব।"

শিশির এ কথা শুনিয়া অভিভূত হইয়া গেল। বিভার প্রতি শ্রদ্ধার আর তাহার সীমা রহিল না। এই কিশোরী কি নিষ্ঠুর জগতের বুকে শুধু আনন্দ আর করুণা বিলাইতেই আসিয়াছে!

নদীর ধারে খানিকটা ঘুরিয়া শিশির কহিল, "চলুন, এবার দাইয়ের ছেলেটিকে দেখে আসি।"

বরদাবাবু বলিলেন, "চল, অসুখটা বেশী। যদি সে ভাল না থাকে, তাহলে বিভাকে রাত্রে বাড়ী ফেরানো দায় হবে।"

দরিদ্র পল্লীর এক জীর্ণ কুটিরে দাইয়ের বাস। দুইজনে সেখানে আসিতে বিভা বরদা-

বাবুকে কহিল, "ডাক্তারবাবু এই মাত্র চলে গেলেন, বাবা—তিনি বললেন, টাইফয়েডই। সাত-আট দিন চিকিৎসা ত হয়ই নি, উল্টে কুপথ্য চলেছিল। ভরসা ত তিনি এখন কিছুতেই দিতে পারলেন না।"

বরদাবাবু অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাই ত, বেচারী দাই! শিশির কহিল, "এ রকম রোগে এরা ব্যবস্থা ঠিক রাখতে পারবে কি? তার চেয়ে হাসপাতালে—"

"শিশির বাবু—" বিভার স্বরে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই সে আপনাকে শান্ত করিয়া লইয়া বলিল, "বলেন কি, আপনি! তা-ছাড়া এদের ধারণা কি জানেন, হাসপাতালে গেলে কেউ বাঁচে না। ঘরে পড়ে বিনা চিকিৎসায় এরা মরতে রাজী আছে, তবু হাসপাতালে গিয়ে সারতেও এরা চায় না। তখন এদের কাছে ও কথা তোলায় ফল কি! ডাক্তার বাবু অবশ্য এসে ঐ কথাই তুলেছিলেন, শুনে দাই ত কেঁদেই অস্থির! আমি অনেক করে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেছি। রোগীকে নাড়া শক্ত। না হলে আমাদের বাড়ীতেই নিয়ে যেতুম।"

শিশিরের মুখে মুহূর্ত্তের জন্য কথা ফুটিল না, লজ্জায় তাহার মাটীতে মিশিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। বরদাবাবু বিভাকে কহিলেন, "তাহলে রাত্রে তুমি ফিরছ কি?"

বিভা কহিল, "কি করে ফিরি, বল! মাথায় আইস্-ব্যাগ দেওয়া, টেম্পারেচার নেওয়া, ওষুধ-পথ্যি—কে করে, এ-সব? এই ত লোক এরা! একবার হদ্দ-মুদ্দ চেষ্টা করে দেখি, আমরা। এই যে রামফল ফিরেছে—কিরে, বরফ এনেছিস? নে, খানিকটা চট্ করে ভেঙ্গে ঐ আইস্-ব্যাগটায় পুরে দে দেখি। দাই ভিতরে আছে, একটু ভাল জল চেয়ে নে। রামফলকে তুমি নিয়ে যাও, বাবা, না হলে তোমার কষ্ট হবে। তুমি বরং রাত্রের জন্য সহিসকে পাঠিয়ে দাওগে—"

শিশির কহিল, "যদি অনুমতি পাই, তাহলে আমিও রাত্রে থেকে রোগীর সেবার অংশ নিয়ে কৃতার্থ হই!"

"আপনি!" বিভার স্বরে অনেকখানি বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। শিশির হাসিয়া কহিল, "আমাকে এতই অপদার্থ ভাবছেন কেন?"

বরদাবাবু কহিলেন, "শিশির, তোমার এ কথা শুনে ভারী আনন্দ পেলুম। আর্ত্ত বেদনাতুর মনুষ্যত্বের সেবা করতে যে অগ্রসর হয়, তারই শিক্ষা সার্থক!"

শিশির কৃতজ্ঞভাবে কহিল, "কিন্তু এ শিক্ষা কলেজে কখনো পাই নি, বরদাবাবু, এ শিক্ষা আজ এই প্রথম পেলুম, আপনার কন্যার কাছে।"

বিভা কহিল, "এখন এ সব ধন্যবাদ আর কীর্ত্তিগানের পালা বন্ধ রাখুন, শিশির বাবু। যদি রাত্রে সেবা করতে চান, তাহলে আমাদের ওখান থেকে খেয়ে আসুন গে—বাবাকেও নিয়ে যান।"

শিশির এ কথার বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে পারিল না। সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। এই যে তরুণী, স্বরে তাহার এতখানি কাঠিন্য নাই, আদেশ করিবার কোন ধারও সে ধারে না, অত্যন্ত কোমল সরল ভঙ্গীতে যাহা বলে, তাহা মাথা পাতিয়া লইতেই হয়—না লওয়া ছাড়া

উপায় নাই। রাজার আদেশও বুঝি কেহ এত খানি মাথা পাতিয়া লইতে পারে না। এ কি মন্ত্র জানে, না, উহার স্বরে কি যাদু আছে!

রাত্রি তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। শিশির বরফ ভাঙ্গিয়া আইসব্যাগে পুরিয়া রোগীর বিছানার পাশে আসিয়া বসিলে বিভা কহিল, "বাইরে ইজিচেয়ার আনিয়ে রেখেছি, শিশির বাবু, আমার হাতে ব্যাগ দিয়ে আপনি বরং একটু গড়িয়ে নিন্‌গে, তারপর না হয় শেষ রাত্রে আপনাকে ডেকে দেব।"

শিশির কহিল, "আর আপনি সারা-রাত জাগবেন! দিনের বেলাতেও ত খাটুনি কম যায় নি, তার উপর মুখেও কিছু দেন নি, বোধ হয়?"

বিভা কহিল, "মুখে দেবার প্রবৃত্তিই মোটে নেই। তাছাড়া আমি ত বেলা দুটো-তিনটের সময় এসেছি, সারাদিন আর কি খাটলুম! দাই গিয়ে কেঁদে পড়ল—তা'ও যদি দু'চারদিন আগে খবরটা দিত!"

শিশির কহিল, "যাক্, এখন আপনি বরং একটু ঘুমিয়ে নিন—শেষ রাত্রে আমি ডেকে দেব। কি বলেন?"

বিভা বলিল, "আমার ঘুম পায় নি মোটে। তা-ছাড়া কি জানেন, শিশির বাবু, এ-সব সেবার কাজ আমাদের দ্বারাই চির কাল ধরে চলে আসছে। এ কাজে মেয়েদের মত তৎপরই বা কে! দেখুন না, পুরুষ নার্শ কোন হাসপাতালে নেই, মেয়েরাই সারা পৃথিবীতে নার্শের কাজ করে বেড়াচ্ছে। এ কাজে মেয়েদের ভগবান-দত্ত সার্টিফিকেট আছে। পুরুষ দৌড়-ঝাঁপের কাজে খুব দড় বটে, কিন্তু এ কাজ বড় কোমল মিহিভাবে করতে হয়। মেয়েমানুষের প্রাণ—মার প্রাণ, বোনের প্রাণ, স্ত্রীর প্রাণ, তাই রোগী কোনো বিষয়ে একটু কাতর হলে খুব সহজেই সে তা বুঝতে পারে। তাছাড়া এতে সহ্য করবারও ঢের আছে, পুরুষ তত সহ্য করতে পারে না।"

শিশির কহিল, "আমাদের জাতকে এ-সব মহৎ কাজ থেকে একেবারে বরখাস্ত করতে চান না কি!"

বিভা কহিল, "দেখুন, এই আজই সকালে একখানা বাঙলা মাসিকপত্রে একটা প্রবন্ধের উপর কেমন আমার নজর ঠেক্‌ল, হঠাৎ। প্রবন্ধটার নাম, "নারী ও পুরুষ"—লেখক অবশ্য পুরুষ। একটু কৌতূহল হল—পড়তে লাগলুম—দেখি, লেখক মশায় লিখেচেন, পুরুষ আর নারীর মধ্যে সব রকমে সাম্য আনতে হবে, কোন পার্থক্য থাকবে না। ঘোড়ায় চড়া, মোটর হাঁকানো থেকে আরম্ভ করে অফিসে কেরাণীগিরি এবং কোর্টে ওকালতি করা—কোন বিষয়েই না! আমার হাসি পেলে, সে প্রবন্ধ পড়ে। আমাদের বাঙ্গালী পুরুষদের নিজেদের কি অধিকার আছে, তা তাঁরা নিজেরা জানেন না, অথচ তাঁরা ছুটেচেন, মেয়েদের অধিকার নির্ণয় করতে! তাঁদের কাছে আমাদের একটা শুধু নিবেদন আছে, ঘোড়ায় চড়তে পেলে আমরা বর্ত্তে যাব না! ও-সব কাজ তাঁদেরই থাক্, আমাদের শুধু তাঁরা যেন মানুষ বলে মনে করেন, একটু আলো-হাওয়া থেকে বঞ্চিত না করেন, আর জ্ঞান-

রাজ্যের বাইরে অন্ধ করে যেন ফেলে না রাখেন, তাহলেই আমাদের অধিকার আমরা নিজেরা বুঝে নিতে পারব!"

এমনি কথা আলোচনা ও সেবার মধ্য দিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল। সকালে বরদাবাবুর বাড়ী হইতে চা ও প্রাতরাশ আসিল। বিভা শিশিরকে বলিল, "আপনি মুখে হাতে একটু জল দিয়ে চাটুকু খেয়ে নিন, বিস্কুট ক'খানাও খেয়ে ফেলুন। আর যদি আপনার অসুবিধা না হয় ত আধঘণ্টা অপেক্ষা করলে আমি তার মধ্যে বাড়ী থেকে স্নানটা সেরে আসি। রামফলের সঙ্গেই তাহলে যাই!"

শিশির কহিল, "বেশ, আধঘণ্টা কেন, এখনও দেড়ঘণ্টা আমি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারি। আপনি একেবারে সব সেরে-সুরে আসুন। বলেন ত, দুপুর বেলায় আমি কলেজের ছুটি করেও আসতে পারি।"

বিভা কহিল, "কোন দরকার নেই! তার চেয়ে বরং আর এক কাজ করলে ভাল হয়। ক'রাত্রি এখন জাগতে হয়, তার কোন ঠিকানা নেই! আপনি বরং বেশী রাত করে আসবেন! শেষ রাতটায় একলা রোগীর কাছে থাকতে ভয় পায়, সে সময় দু'জনে জেগে থাকলে তবু কতক ভরসা হয়।"

শিশির হাসিয়া বলিল, "দিনে-রাতে চব্বিশ ঘণ্টাই তাহলে আপনি রোগী নিয়ে থাকবেন! কিন্তু এভাবে ক'দিন কাটাবেন? নিজের শরীরটাকেও ত দেখা চাই। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক না! আপনি না হয় রাত বারোটা অবধি জাগবেন, তারপর ঘুমুবেন—ও রাতটুকু আমিই জাগব। কেন না, আবার দিনটা ত আপনারই হাতে পড়ছে।"

বিভা হাসিয়া কহিল, "আপনারও ত দিনের বেলা কলেজ আছে, ঘুমুবেন কখন? তার চেয়ে ও ঘুম পেলেই ঘুমোনো যাবে, এই ব্যবস্থাই ভাল। এখন আমাদের এ কষ্টটুকু সার্থক হয়, তবেই না! কিন্তু আপনার এ সাহায্য আমি কখনো ভুলব না, শিশিরবাবু। এক অজানা দুঃখী লোকের ছেলের জন্য এত কষ্ট করছেন!"

শিশিরের বুকটা আনন্দে ভরিয়া গেল। সস্মিত মুখে সে কহিল, "যদি আমি কোন কাজে এতটুকুও যোগ্যতা দেখাতে পেরে থাকি, তবে সে জানবেন, শুধু আপনারই আদর্শ অনুসরণ করে—"

"আপনারা লেখক মানুষ তিলকে একেবারে তাল করে তোলেন! বড়-বড় কথা ছাড়া কিছু জানেনই না—"

এই সময় রামফল আসিয়া কহিল, "দিদিমণি, তাহলে যাবে না কি?"

"হাঁ, চ—" বলিয়া বিভা রামফলের সহিত বাহির হইয়া পড়িল। যতক্ষণ দেখা যায়, শিশির মুগ্ধ দৃষ্টিতে বিভার পানে চাহিয়া রহিল। এ কি মানুষ! এমন ত সে কখনো চোখেও দেখে নাই। একে নারী, তায় এই তরুণ বয়স, তাহার উপর দিব্য লেখাপড়া শিখিয়াছে, নিজের আরাম-বিলাস, বসন-ভূষণ লইয়া যে বয়সে মত্ত থাকিবার কথা, বাহিরের জগৎ রহিল কি গেল, সে সংবাদে কিছুই আসিয়া যায় না—এই নারী ঠিক সেই বয়সে সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও এ কি তপশ্চারিণীর দুরূহ

পবিত্র ব্রত যাচিয়া হাতে লইয়াছে! শিশিরের সাহায্য! হায়, বিভা কি এটুকু বুঝিতে পারে না যে, তাহার সঙ্গ-সুখ পাইবার জন্য জগতে এমন কোন কঠিন কাজ নাই, যাহা সে পালন করিতে না পারে! রোগীর সেবার মত এই কঠোর নীরস কর্ত্তব্য কাল রাত্রে তাহার যে অমন সহজ সুন্দর ঠেকিয়াছে, সে কি কেবল নিষ্কাম কর্ত্তব্য-পালনের জন্য—না, বিভার সাহচর্য্যে! বিভা পাশে থাকিলে সারা জীবনে সারা দিনরাত্রি ধরিয়া অক্লান্ত ভাবে যে সে এ কাজ করিয়া যাইতে পারে! এতটুকু ক্লান্তি বা দুঃসহতা বোধ করিবার কোনই আশঙ্কা থাকে না!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আরও পাঁচ-সাত দিন সেবা-শুশ্রূষার পর সুরাহার লক্ষণ দেখা গেল। বিভা তখন দাইয়ের ছেলেকে নিজেদের গৃহে লইয়া আসিল।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা শিশির আসিল না দেখিয়া বিভা একটু চিন্তিত হইল। সকালে শিশিরের শরীর তেমন ভাল ছিল না, চোখ দুইটাও লাল হইয়া উঠিয়াছিল। বিভার মনটা অস্থির হইল। তবুও এ চিন্তার কথা মুখ ফুটিয়া সে কাহারও কাছে বলিতে পারিল না। এ কয়রাত্রে শিশিরের সঙ্গে পরিচয় তাহার অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে; তাই আজিকার এই প্রথম অভাবটা নূতন করিয়াই তাহার মনে বাজিতেছিল।

পরদিন প্রাতে বিভা উঠিয়া বরদা বাবুকে বলিল, "বাবা, শিশির বাবু কাল মোটেই এলেন না,—আমার কেমন ভাবনা হচ্ছে, বুঝি, তাঁর কোন অসুখ হয়েছে! কাল সকালে স্পষ্টই বলে গেলেন, শরীরটা কেমন ভাল ঠেকছে না।"

বরদাবাবু চিন্তিতস্বরে কহিলেন, "তাই ত, কাল সে এলই না মোটে! আমারও তত খেয়াল ছিল না—নিজের ঐ লেখাটা নিয়েই ব্যস্ত ছিলুম—ভাবলুম, বুঝি, তোরা ওধারে কোথাও গল্পসল্প করছিস—তা আমি এখনই একবার কাকেও পাঠাই—"

বিভা কহিল, "তার চেয়ে বাবা, আমি নিজেই একবার গাড়ী করে গিয়ে দেখে আসি—রামফলকে সঙ্গে নি, সে তাঁর বাড়ী চেনে। বেহারী ভালই আছে—তার বন্দোবস্তও আমি সব করে রেখে গেলুম।"

বিভার আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহিতেছিল না। যদি সত্যই শিশির বাবুর অসুখ করিয়া থাকে! আত্মীয়-স্বজনহীন সুদূর প্রবাসে কষ্টের তাহা হইলে যে আর সীমা থাকিবে না। যদি অসুখ বেশী হয়—! বিভার সমস্ত প্রাণ বেদনায় ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিল। সৌখীন মানুষ, অভ্যাস নাই, কয়দিন রাত্রি জাগিয়া রোগীর সেবা—শরীরে সহিবে কেন? গাড়ী যতই বাড়ীর কাছে আসিতে লাগিল, ততই তাহার ভাবনা বাড়িয়া উঠিল। নানা দেবতার কাছে শিশিরের কুশল মাগিতে মাগিতে উদ্বিগ্ন চিত্ত লইয়া বিভা একখানা ছোট বাঙলার ফটকের সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিল! তাহার গা ছম ছম করিয়া উঠিল। একটা অমঙ্গল-আশঙ্কায় নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। ফটক পার হইয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে বাঙলার বারান্দার

পানে সে চাহিল—ঐ না, কে বসিয়া আছে—শিশিরবাবুই যে! আঃ, রাজ্যের আরাম যেন সে কুড়াইয়া পাইল!

বাঙলার পথে পদশব্দ পাইয়া শিশির উৎকর্ণ হইয়াছিল—বিভাও ততক্ষণে একেবারে সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। শিশির চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—এ কি, বিভা—! বিস্ময়ে তাহার মুখে কথা ফুটিল না। বিভা কহিল, "কেমন আছেন, শিশিরবাবু?"

শিশির কহিল, "কেন, আমি ত ভালই আছি।"

বিভা কহিল, "তবু ভাল। কাল আপনি গেলেন না বলে এমনি আমার ভাবনা হয়েছিল—"

এইটুকু বলিয়াই বিভা কথাটা শুধরাইয়া লইল, কহিল, "বাবা বললেন, এসে আপনার খোঁজ নিতে! তিনি ভারী ব্যস্ত বলে নিজে আসতে পারলেন না। যাই হোক্, আপনি যে ভাল আছেন, এই আমাদের পরম মঙ্গল। আমরা ভাবছিলুম, ক'রাত্তির খেটে বুঝি কোন অসুখ-বিসুখ করে ফেললেন—"

শিশির কহিল, কলেজ হইতে ফিরিয়া সে কেমন ক্লান্তি বোধ করিতেছিল—একটু গড়াইয়া লইবে ভাবিয়া বারান্দায় শুইয়া পড়িয়াছিল; তার পর আর-কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! যখন ঘুম ভাঙ্গিল, রাত্রি তখন দশটা, কাজেই আর যাইতে পারে নাই। কথার শেষে সে একটা পরিহাসের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল না। বসন্তের প্রভাত, স্নিগ্ধ আলোর বিকাশ, মহুয়া ফুলের গন্ধে মাতাল হাওয়া, গাছের ডালে পাখীর বিচিত্র গান—আর সম্মুখে এই তরুণী সহচরী! শিশির কহিল, "আপনি বুঝি তাই রোগীর সেবার ভার নিতে ছুটে এলেন! কিন্তু তেমন ভাগ্য কি আমার হবে যে আপনার হাতের—"

বিভা বাধা দিয়া হাসিয়া কহিল, "সে আপশোষ রাখবার দরকার কি? বলুন না, কি করতে হবে, মাথায় অডিকলোন দেব, না, পা টিপে দিতে হবে! যদি এতই সাধ হয়ে থাকে ত রোগ করে সেবা নেবার চেয়ে সুস্থ শরীরে যেচেই নয় সেটা নিলেন! তাতে তবু উদ্বেগের হাত এড়ানো যায়!"

শিশির বিস্ময়ে বিভার পানে চাহিল। বিভার মুখে কোনরূপ ভাবান্তর দেখা গেল না। এ কথাগুলার অর্থ কি! তবে কি তাহার আশা দুরাশা নয়!

বিভা কহিল, "শিশিরবাবু, আপনি ত আদর-অভ্যর্থনার কোন কায়দাই জানেন না, দেখচি। একজন মহিলা বিনা-নিমন্ত্রণে যেচে এসে আপনার অতিথি হল, আর আপনি তাকে বসবার আসন দেওয়া দূরে থাক্, ঘরে ঢুকতেও বল্‌লেন না। যাক্, অতিথি বিমুখ হলে গৃহস্থের পক্ষে ভাল কথা নয়—আমি নিজেই তাহলে আপনার ঘর-টরগুলো দেখে নি! লেখক মানুষের ঘর! গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, এখনই আবার ফিরে বাবাকে খবর দিতে হবে ত!"

বিভা ঠিক বসন্তের এক ঝলক মিষ্ট বাতাসের মতই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল—শিশিরের বই-ভরা ছোট আলমারিটার সম্মুখে খানিকক্ষণ দাঁড়াইল, দেওয়ালের গায়ে যে সকল ছবি ঝুলিতেছিল, একবার সেগুলাও

দেখিয়া লইল, পরে টেবিলের উপরকার খাতাপত্র ঘাঁটিয়া দেখিল শুনিল; পরে একেবারে শিশিরের মুখের পানে চাহিয়া শরের মতই একটা অদ্ভুত প্রশ্ন নিক্ষেপ করিল, "আচ্ছা শিশিরবাবু, আপনি কখনও লভে পড়েছিলেন?"

শিশিরের মুখ পাংশু হইয়া গেল—সমস্ত রক্ত ছলাৎ করিয়া তাহার মুখ হইতে মুহূর্ত্তে নামিয়া গেল! সে কি বলিবে, কিছুই বুঝিতে পারিল না—সমস্ত বহির্জগৎ নিমেষে তাহার চোখের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, তাহার পায়ের তলায় মাটি নাই! শূন্যে যেন কে তাহাকে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে! বিভা উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া তেমনি অচপল স্বরে কহিল, "আপনি এ উদ্ভট প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গেছেন—না? কিন্তু কাল রাত্রে আপনার কতকগুলো গল্প নতুন করে ফের পড়ছিলুম—আপনি ত বিয়ে করেন নি—তবুও আপনার গল্পের মেয়েগুলো সম্পূর্ণ নতুন ধরণের—অথচ তাদের জলজ্যান্ত প্রাণ আছে—তাদের মনের এত খুঁটিনাটি তত্ত্বকথা আপনি জানলেন কি করে? তাই আমার জিজ্ঞেস করা। থাক্, নির্লজ্জ কৌতূহল দিয়ে আপনার কোন গোপন কথা আমি টেনে তুলতে চাই না। আমার এ প্রগল্‌ভতাটুকু ক্ষমা করবেন। আর যদি সুবিধে হয় ত আজ ওবেলা আমাদের ওখানে যাবেন, ঐখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন। এ খাওয়ানো শুধু নার্শিংয়ের পুরস্কার! বুঝলেন? তাহলে এখন আসি।"

একটা দম্‌কা বাতাসের মতই বিভা চলিয়া গেল। সে যেমন আসিয়াছিল, অনেকখানি গন্ধ, বর্ণ ও আনন্দ লইয়া—তেমনি গন্ধ, বর্ণ ও আনন্দ এখানে ঢালিয়া দিয়াই সে চলিয়া গেল। ছড়াইয়া-দেওয়া সে গন্ধ, বর্ণ ও আনন্দ যে লাভ করিল, তাহার মুখের একটা কৃতজ্ঞ বাণী শুনিবার জন্য মুহূর্ত্তকালও অপেক্ষা করিল না! হায় দুর্ব্বোধ সৌন্দর্য্য, শিশিরের কাছে প্রহেলিকার মত ক্রমেই তুমি জটিল হইয়া উঠিতেছ, এবং যত তুমি জটিল হইতেছ, ততই তোমার পাকে-পাকে তাহাকে অসহ্য উপায়হীন ভাবে বাঁধিয়া ফেলিতেছ! তুমি তাহাকে দুরাশার পিছনে ছুটাইয়াছ, অথচ আশা যে একেবারে দাও নাই, এমনও নহে! যদি শিশিরের মনের বার্ত্তা পাইয়া থাক, তবে আর কেন এ দুর্ভেদ্য অন্তরালে তাহাকে ব্যথিত উন্মাদ করিয়া রাখ!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার সময় বরদাবাবুর ঘরে বসিয়া শিশির তাঁহার সহিত কথা কহিতেছিল। শিশির বলিতেছিল, "আপনি এই প্রত্নতত্ত্বে আমার একটু interest create করিয়ে দিতে পারেন ত ভালো হয়!"

বরদাবাবু কহিলেন, "এ তোমার ভাল লাগবে না। বিশেষ তুমি রক্ত-মাংসের মানুষ গড়ছ, কত বিচিত্র চরিত্রের নর-নারী সৃষ্টি করছ, এ নুড়ি-পাথরের নীরস কর্কশ কাজ, এ তোমার ভাল লাগবে না। তা-ছাড়া emotional লোকের পক্ষে এ দিকে না আসাই উচিত। কারণ সত্য

আর উচ্ছ্বাসে মিশলে এর মধ্যে অনেকখানি মিথ্যা জড়িয়ে পড়বে।"

এমন সময় বিভা আসিয়া কহিল, "বাবা, দুটো তরকারী আর বাকী আছে, এখনই হবে —আর এক ঘণ্টা পরেই তোমরা খাবে ত?"

শিশির কহিল, "আপনি নিজের হাতে সব তৈরী করছেন?"

বিভা কহিল, "আমরা এখনও কলকেতার বাতাস পেয়ে এত বড় পণ্ডিত হয়ে উঠিনি যে বাড়ীতে অতিথ আনিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করব, হোটেলের উচ্ছিষ্ট দিয়ে! যাক্, আপনার সঙ্গে ভারী ঝগড়া আছে, কিন্তু শিশিরবাবু! আপনি আমায় এখনও 'আপনি' বলা ছাড়লেন না—এত বলি—"

শিশির কহিল, "আপনি যদি সেটা seriously mean মনে করে থাকেন, তা হলে তাই হবে।"

বরদাবাবু কহিলেন, "দু'একটা গান আজ গাস্ মা। অনেক দিন তোর গান শুনিনি।"

বিভা মুহূর্ত্তের জন্য একটু অপ্রতিভের মত হইয়া পড়িল, পরে কহিল, "আচ্ছা, আগে এদিককার সব হোক ত, তারপর যদি সময় থাকে, দেখা যাবে।"

কিছুক্ষণ পরেই এক বিচিত্র সুরের প্লাবনে ঘর ভরিয়া গেল। বিভা যখন তাহার ললিত কণ্ঠে গাহিতে সুরু করিল,

তুমি কেমন করে' গান কর যে গুণী,
আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি!
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী!

তখন শিশিরের সমস্ত চেতনা লোপ পাইল। তাহার মনে হইল, সমস্ত চরাচর এক বিচিত্র সুরের জালে ঘিরিয়া গিয়াছে, চারিধারে সুরের হাওয়া ছুটিয়াছে, সুরের আলো ফুটিয়াছে!

বিভা যখন মৃদু কণ্ঠে গাহিল,

কইতে কি চাই কইতে কথা বাধে,
হার মেনে যে পরাণ আমার কাঁদে,
আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি!

তখন শিশিরের মনে হইল, তাহার আর কোন আশা নাই! চারিদিকে সুরের জাল বুনিয়া শিশিরকে কে আজ এমন বন্দী করিয়া ফেলিয়াছে যে, প্রাণ তাহার অহরহ এক গভীর অতৃপ্তির কান্না কাঁদিয়াও নিজের অবস্থা ঠিক বুঝাইতে পারিতেছে না, বুঝাইবার ভাষা তাহার নাই, কথাও সব বাধিয়া যায়।

মন যখন সহসা গানের সুরে স্বপ্নলোকে উধাও হইয়াছিল, ঠিক এমন সময়ে বাহিরে প্রলয়-ঝঞ্ঝা বিশ্ব-সংহারে মাতিয়া উঠিল। বরদাবাবু চমকিয়া উঠিলেন, "এ কি হঠাৎ ঝড় এল যে!"

বিভা পিয়ানো ছাড়িয়া হাসিয়া কহিল, "হঠাৎ নয়, বাবা, ও পুরোপুরি আয়োজন করেই এসেছে। অনেকক্ষণ থেকেই মেঘ জমছিল। তোমরা ঘরে বসে কথা কইছিলে, তাই কিছু লক্ষ্য করনি।"

শিশির ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তাই ত, বড় বিপদ হল যে! এ কি চট্ করে থামবে?"

বিভা কহিল, "নাই বা থামল! আপনি ত আর জলে পড়েন নি!"

এ কথার উপর আর কথা চলে না।

শিশির ভাবিল, আর সে ইহার সহিত কোন তর্ক করিবে না—যখনই সে কথা কহিবে, তখনই কি বিভা একটা আঘাত না দিয়া ছাড়িবে না!

বিভা কহিল, "মেঘের কথা আমি বলিনি, তার কারণ, আমার খাবার তৈরি হবার আগেই আপনারা তাহলে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। ধীরে সুস্থে খাওয়া হত না।"

বাহিরে তুমুল রবে বায়ু গর্জ্জিয়া ফিরিতেছিল—সার্শিগুলা বন্ধ করা হইয়াছে—সেগুলাকে কাঁপাইয়া এক দারুণ আর্ত্ত রব বাহিরে উন্মাদের ন্যায় হাহাকার করিতেছিল। সেই সঙ্গে বৃষ্টিরও বিরাম ছিল না।

রাত্রে খাইতে বসিয়া বরদাবাবু কহিলেন, "এই যে সব মিষ্টান্ন দেখচ, এর কোনটি বাজারের নয়, সমস্তই বিভা তৈরী করেছে!"

আহারাদির পরও ঝড়-বৃষ্টি থামিল না দেখিয়া শিশির চিন্তিতভাবে সার্শির ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরের পানে চাহিয়াছিল। বিভা হাসিয়া বরদাবাবুকে ডাকিয়া বলিল, "বাবা, এই রাত্রে শিশিরবাবু জলে পড়তে চান।"

বরদাবাবু কহিলেন, "তুমি আর বাইরের পানে চেয়ে কি দেখচ! এই দুর্য্যোগে মানুষ বেরোয়! এখানেই আজকের মত থেকে যাও—কোন অসুবিধে হবে না। তোমার জন্য একটু ঠাঁই দিতে পারব হে।"

বিভা কহিল, "আসুন শিশিরবাবু, বৃষ্টি যদি দেখতে চান ত ওধারের বারাণ্ডা থেকে দেখবেন, আসুন। আপনাদের এ-সব দেখার দরকারও আছে। কোন এক গল্পে বর্ণনা জুড়ে দিতে পারবেন। নায়ক-নায়িকার মনের দ্বন্দ্বের সঙ্গে উপমা দেবারও দরকার হতে পারে!"

শিশির চমকিয়া উঠিল। এই কিশোরী কি অন্তর্যামী? তাহার মনের মধ্যে বিচিত্র ভাব ঝড়ের তালে প্রচণ্ডরকম নৃত্য সুরু করিয়াছিল—কত বিরুদ্ধ কথা, কত চিন্তা! ঝড় পাইয়া শিশির কতক বর্ত্তাইয়া ছিল। বাহিরের এ গর্জ্জনে তাহার মনের ভিতরকার সে সব দ্বন্দ্ব-কোলাহল কেহ আর শুনিতে পাইবে না! বিভার কথায় তাই সে চমকিয়া উঠিল। কি করিয়া তাহার নিভৃত হৃদয়-পুরের দুরন্ত সংগ্রামের সংবাদ সে বুঝিল! বাহিরে আঁধারের বুক চিরিয়া বিদ্যুতের একটা তীব্র রেখা ছুটিয়া গেল। সে আলোয় আর একটা জিনিস তাহার চিত্তে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল! তবে কি বিভার বুকেও এ ঝড় এমনি তালে-ছন্দে এমনই রুদ্র গর্জ্জনে ছুটিয়াছে!

বিভা শিশিরকে নিরুত্তর দেখিয়া কহিল, "কি, আপনার ভাব লেগে গেছে না কি? অবাক হয়ে আকাশ দেখচেন! কি দেখচেন—যেন এক দুরন্ত বালিকা বিশ্রস্ত কেশপাশ এলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই কেশপাশ বয়ে চারিধারে মত্ত হাসির ফোয়ারা ঝরে পড়েছে! আমায় মাপ করবেন শিশিরবাবু, এমনি ধারাই সব কবিতা মাসিকপত্রে পড়ি কি না, তাই বলছি। নিজে ত ও-সব idea'র ধার ধারি না। যাক্, ওঘরে আপনার বিছানা তৈরি হচ্ছে, আপনি ততক্ষণ ঝড় দেখবেন, আসুন।"

শিশির মন্ত্র-চালিতের মতই বাঙ্‌লার পিছন-দিককার বারাণ্ডায় আসিয়া বসিল। সার্শির বাহিরে বাগান দেখা যাইতেছিল—অন্ধকারে ঝোপগুলা আরও কালো দেখা-

ইতেছিল—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ হানিয়া যায়, আর মনে হয়, যেন দৈত্যগুলা মাথা ঝাড়া দিয়া হাসিয়া উঠিতেছে! গাঢ় অন্ধকারের পানে চাহিয়া দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। শিশির ভাবিল, বিভার এ কি দুষ্টামি! তাহাকে লইয়া এমন নির্দ্দয় খেলা সে কেন খেলিতেছে? স্পষ্ট করিয়া কেন সে ধরা দিতেছে না? পাকে-প্রকারে আকারে-ইঙ্গিতে আপনাকে যেটুকু সে দেখাইতেছে, তাহা হইতে ত শিশিরের কিছুই দুরাশা বলিয়া মনে হয় না—তবুও স্পষ্ট একটা আশা দিতে কেন বিভা এতখানি চাতুরী খেলিতেছে! এই যে সরলতার সে আভাষ দিতেছে, সে কি সত্যই সরলতা, না, এ ভাণ! শুধু আলেয়ার আলোয় দুইদণ্ড তাহাকে মাতাইয়া দিয়াই বিভার খেলা শেষ হইবে? না, না, এমন পিশাচী কি সে হইতে পারে? বিভার মুখে-চোখে কৈ তেমন-কোন লক্ষণ ত দেখা যায় না!

সহসা কড়কড় শব্দে চারিধার কাঁপাইয়া দীপ্ত আলোয় আকাশ ভরাইয়া অদূরে বাজ পড়িল। বিভা সরিয়া আসিয়া শিশিরের হাতটা চাপিয়া ধরিল। শিশির চপলার আলোয় বিভার মুখের পানে চাহিল, তাহার চোখে জল ছাপাইয়া উঠিয়াছে!

শিশিরের প্রাণের মধ্যটা জ্বালাইয়া দিয়া এক তীব্র বিদ্যুৎ-শিখা ছুটিয়া গেল। বিভা কাঁদিতেছে! কেন! কি তাহার দুঃখ! সে যে যাতনায় অহর্নিশি দগ্ধ হইতেছে, সে যাতনা কি তবে বিভার বুকেও বিঁধিয়াছে? মুহূর্ত্তে এক দারুণ বাসনা শিশিরের বুকে জাগিয়া উঠিল। মুখ ফুটিয়া একটা কথা বলিতে পারিলে ত আর এ দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের দুইপারে বসিয়া দুইজনকে হা-হুতাশ করিতে হয় না! এই নীরব নিঝুম বাদলার রাত,—প্রাণের সে গোপন বাসনা ফুটাইবার পক্ষে এমন অবসর যে আর মিলিবে না!

শিশির মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, "বিভা—" সে স্বরে নিজেই সে চমকিয়া উঠিল। বিভা কোন কথা কহিল না। শিশিরের মাথা ঘুরিতে ছিল। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় সে বিভাকে দুই হাতে আপনার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বিভা, আমি তোমায় ভালবাসি, বড় ভালবাসি।" তাহার সর্ব্বশরীর দারুণ উত্তেজনায় থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আবার বিদ্যুৎ চমকিল। উত্তর পাইবার আশায় বিভার পানে শিশির নিমেষের জন্য চাহিল; সহসা বিভা শিশিরকে প্রচণ্ডভাবে ঠেলিয়া দিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "শিশিরবাবু—এত বড় আপনার স্পর্দ্ধা! একলা পেয়ে এভাবে আপনি আমায় অপমান করেন! যান, এখনই চলে যান, আপনি!"

শিশিরের মাথায় তখনও আগুন জ্বলিতেছিল। সে বিভার পানে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "শোন বিভা—"

বিভা তেমনই কঠিন স্বরে কহিল, "কিছু শুনতে চাই না, কোন কথা নয়! এত ছোট মন নিয়ে আপনি শিক্ষার ভাণ করে বেড়ান! নারীকে কেবল ভোগের সামগ্রী বলেই জেনেছেন! আর কোন পবিত্র সম্পর্কের কথা ধারণাও করতে পারেন না! আমি ভুল করেছিলুম, তাই আপনার

সঙ্গে এমন অসঙ্কোচে মিশেছিলুম—আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। যাক্, আপনার সঙ্গে এর পর যদি কখনও আর আমার দেখা হয়, তা হলে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত ব্যবহারই আপনি আশা করবেন।"

শিশিরকে তাহার অবস্থা বুঝিবার অবসর মাত্র না দিয়া বিভা ক্ষিপ্র সে স্থান ত্যাগ করিল। শিশির হতাশ চিত্তে সেই অন্ধকারে বসিয়া পড়িয়া বাহিরের জমাট অন্ধকারের পানে উদাসভাবে চাহিয়া রহিল! তখনও ঝম্-ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, প্রলয়ের অট্টহাসি চারিধারে ভীষণ বিদ্রূপ ছড়াইয়া হো-হো করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে!

পরদিন। বেলা প্রায় আটটা। শিশির বিছানায় পড়িয়াছিল—ভৃত্য শিবু আসিয়া সংবাদ দিল, বরদাবাবু আসিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বরদাবাবুও কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

শিশির উঠিয়া বসিল। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। স্নিগ্ধ সূর্য্যরশ্মি কক্ষে হিল্লোলিত হইয়া পড়িয়াছিল। বরদাবাবু কহিলেন, "কাল রাত্রে ঐ ঝড়ে-জলে তুমি একটিও খবর না দিয়ে চলে এলে! ব্যাপার কি, বল ত?"

শিশির লজ্জায় বরদাবাবুর পানে চাহিতে পারিল না। বরদাবাবু কহিলেন, "এ রকম পাগলামি করলে কেন, হঠাৎ? এ্যাঁ? আমি সকালে তোমার জন্য বসেছিলুম—তুমি চলে এসেছ, তা জানতুমও না।"

শিশির সারারাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই। অপরাধের অনুতাপে জ্বলিয়া মনটাকে সে অনেকখানি প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়াছিল। বরদাবাবুর কাছে একরকম কাঁদিয়াই সে কহিল, "আপনার বাড়ীতে পদার্পণ করবার যোগ্যতা আমার নেই। আমি বিশ্বাসঘাতক, নরাধম।"

বরদাবাবু এ-সকল শুনিয়া ভড়কাইয়া গেলেন—জিজ্ঞাসুভাবে শিশিরের পানে চাহিলেন। শিশির তাহার সে দুর্ব্বল মোহের কথা অতি কষ্টে কোনমতে খুলিয়া বলিল। শুনিয়া বরদা বাবু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, কহিলেন, "আমারই দোষ, শিশির। আমি যদি তোমাকে সব কথা আগেই খুলে বলতুম, তাহলে আর এটা ঘটত না। এ বয়সে তোমাদের ওরকম ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। তুমি ত জান না, বিভার জীবনের উপর দিয়ে কি প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে!"

বরদাবাবুর স্বর আর্দ্র হইয়া আসিল। তিনি কহিলেন, "নরেন আমারই এক বন্ধুর ছেলে ছিল। পিতৃমাতৃহীন তাকে আমিই মানুষ করি। বিভার সঙ্গে তার বিয়েরও ঠিক হয়। তারপর তাকে বিলেত পাঠাই। সেখানে তিন বছর থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে আর বছর সে বাড়ী ফিরছিল। পথে জাহাজেই তার জীবনের সঙ্গে আমাদেরও সমস্ত সাধ আশা অকালে ফুরিয়ে গেল। তারই জন্য বিভাকে বিলেত-ফেরতের স্ত্রীর মতই এতখানি free করে গড়ে তুলছিলুম।" খানিকটা থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, "তারপর বিভার বিয়ের আবার সব স্থির করেছিলুম। শুনে সে একেবারে কি দীন মূর্ত্তিতে আমার সামনে এসে দাঁড়াল! কাঁচি দিয়ে মাথার চুল নির্ম্মূল করতে গেছল! আমি তার হাতখানি ধরে ফেললুম। সে একটা

নিশ্বাস ফেলে শুধু ডেকেছিল, "বাবা—" সেই সুর, আর তার চোখের সেই চাওয়া—আমার বুকে ছুরির মত বিঁধেছিল! সে ভৎর্সনার সুর আমি জীবনে ভুলবো না। বিভা তার সমস্ত কায়-মন দিয়ে নরেনের স্মৃতিকে আঁকড়ে আছে। এর পর দ্বিতীয় বার আর আমি বিয়ের কথা তুলিনি। তারপর আমার চোখে জল দেখে সে দীন সাজ সে খুলে ফেলে; তবে এই বেশভূষা আর হাসির খোলসে শোকটা যে সে চেপে রেখেছে, এ শুধু এই বুড়োর মুখ চেয়েই।"

বরদাবাবুর কাতর দীর্ঘনিশ্বাস বাতাসে মিশিয়া গেল। শিশির স্তম্ভিতভাবে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখে একটিও কথা ফুটিল না।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের লিপি-রীতি বনাম সবুজপত্র

সবুজপত্রের সম্পাদক-মহাশয় 'অলঙ্কারের সূত্রপাত' প্রবন্ধে লিপি-রীতির দোষ বুঝাইবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রথম-বয়সের কাব্য' হইতে কয়েকটি ছত্র তুলিয়া, নানা রকম ভুল-ভ্রান্তির বিচার করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের নূতন যুগের অধিনায়ক নিজেই স্বীকার করিতেন যে, তাঁহার প্রথম-বয়সের রচনায় অনেক ত্রুটি ছিল; কিন্তু চৌধুরীমহাশয় তাঁহার যে প্রয়োগগুলিকে ভুল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার একটিও ভুল বলিয়া মনে হইল না। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল অগ্রহায়ণ মাসে; তবে আমি দোলযাত্রার পরে উহার সহিত পরিচিত হইতে পারিয়াছি বলিয়া এতদিন পরে উহার সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিতেছি। যেগুলি ভুল বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার বিচার করিতেছি।

(১) **প্রগল্‌ভবয়সী**—চৌধুরীমহাশয় বলেন যে, "প্রগল্‌ভ শব্দের অর্থ দাম্ভিক, নির্লজ্জ ইত্যাদি।" "ইত্যাদি" কথায় আর যত অর্থই চাপা থাকুক না কেন, ঐ শব্দে যে, বয়সের একটু আধিক্য বুঝাইতে পারে তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই; অর্থাৎ প্রগল্‌ভ অর্থ যে matured, developed বা full grown হইতেই পারে না ইহাই তিনি জোর করিয়া বলিয়াছেন। যে-কোন সংস্কৃত কোষ-গ্রন্থেই শেষোক্ত অর্থটি পাওয়া যায়, এবং স্বয়ং কালিদাসের রচনাতেও ঐ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গের ৫১ শ্লোকে গৌরীর 'প্রগল্‌ভ বয়সের' কথা পাই। আমরা ঐ শ্লোকটির অর্থ বুঝিতে গোল করিতে পারি, কিন্তু মল্লিনাথ ঐ কথার টীকা করিয়া লিখিয়াছেন,—"অস্যাঃ পার্ব্বত্যাঃ **প্রগল্‌ভে** বয়স্যপি যৌবনে সত্যপি ইত্যাদি"। তাহা হইলেই দেখিলাম 'প্রগল্‌ভবয়স' ভুল নয়। সমালোচক নিজেই বলিয়াছেন যে প্রাকৃত বা ভাষা ব্যাকরণের অনুসারেই আমাদিগকে চলিতে হইবে, এবং 'বয়সী' যে

চলিত ভাষার ব্যাকরণে শুদ্ধ হয়, তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। তবে আবার সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র খুঁজিয়া ঐ কথাটির বিচার হইল কেন?

(২) মুখাবয়ব—প্রবন্ধে আছে—"তারপর দেখিতে পাই যে তিলোত্তমার 'দেহায়তনে ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকা-ভাব ছিল।' 'মুখাবয়ব' বলায় 'অবয়ব' শব্দের প্রয়োগ শিষ্ট হয় নি। 'অবয়ব' শব্দের অর্থ হস্তপদাদি অঙ্গ। ইংরাজিতে যাকে বলে limb।" হস্ত ও পদের সহিত 'আদি' যুক্ত থাকিলেও, যখন limb দিয়া খাঁটি অর্থ বুঝান হইয়াছে, তখন লেখকের মতে 'অবয়ব' শব্দের অর্থ কেবল হাত-পা বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। Obsolete ইংরাজিতে organs প্রভৃতিও limb অর্থে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এখন ধড় ও মুণ্ড বাদ দিয়া হাত-পাকেই limb বলে। Organকে limb-এর সামিল করিয়া লইলেও মুখের গণ্ডাদি অংশকে কোন প্রকারে limb বলা চলে না। কাজেই 'অবয়বের' অর্থ limb নয়, যদিও limb অবয়বের অন্তর্ভুক্ত বটে। মুখের নাক, চোখ, গাল, চিবুক প্রভৃতি লইয়াই মুখের সম্পূর্ণ অবয়ব; ঐ সকলগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে বয়সের কাঁচা বা পাকা ভাব বেশ অনুমিত হয়। তাহা হইলে **মুখাবয়ব** শব্দের ব্যবহার অশিষ্ট হইল কেন? মুখের উপরকার নাকটা যে মুখের অবয়বের মধ্যে, তাহা কবি কালিদাসের রঘুবংশের ১২ সর্গের ৪৩ শ্লোকে নাক-কাটা সূর্পণখার বর্ণনাতে আছে, যথা "মুখাবয়ব লুণাং তাং—"ইত্যাদি। গণ্ড প্রভৃতি অংশও যে মুখের অবয়ব তাহা যখন প্রবন্ধের একটি পরবর্ত্তী ছত্রে স্বীকৃত দেখিতেছি, তখন অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই।

(৩) প্রবন্ধটিতে আছে—"তার পর তিলোত্তমার—'ললাট……নিশীথ কৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায়।' নদীর ন্যায় তরল পদার্থের সঙ্গে কপালের মত নিরেট পদার্থের তুলনা করা আলঙ্কারিকের মতে সঙ্গত নয়।" ঠিক হইল কি? কঠিনের সহিত কঠিন, তরলের সহিত তরল গ্যাস্ বা বায়বীয়ের সহিত বায়বীয়, মিলাইয়া মিলাইয়া উপমা না দিলে কি সংস্কৃত-শাস্ত্রের মতেও উপমায় দোষ ঘটে? চৌধুরীমহাশয় তাঁহার সমালোচনায় আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রের উদাহরণই দিয়াছেন, আমিও বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থনের জন্য প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের দৃষ্টান্তই দিতেছি। ঋতুসংহারে ৫ম সর্গের তৃতীয় শ্লোকে সাদা পাথর-মোড়া হর্ম্ম্যতলকে শরদিন্দুর মত নির্ম্মল বলা হইয়াছে, এবং শীতল বাতাসকে তুষারের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহাতে চাঁদের শুভ্র কিরণকে মার্ব্বেলের মত শক্ত মনে হয় না কিংবা বাতাসকে জমাট পদার্থ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে না। তবুও যদি তিলোত্তমার কঠিন কপালের কথা উঠে, তাহা হইলে Hard "luck!" বলিয়া কথা শেষ করিতে হয়। উদ্ধৃত বাক্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, "নদীর গায়ে জ্যোৎস্না পড়লে তার চঞ্চল হয়ে ওঠবারই কথা।" এটুকু হয়ত অসাবধানে লিখিত। চাঁদের কিরণ পড়ার দরুণ নদী চঞ্চল হইয়া উঠে অথবা সমুদ্রে জোয়ার হয় একথা ঠিক নয়।

চাঁদের কিরণে অমাবস্যায় জলের উচ্ছ্বাস হয় না। আর তাহা যদি হইতই, তাহাতেই বা ক্ষতি ছিল কি? চাঁদের মত মুখ বলিলে যে কলঙ্কের দাগযুক্ত গোলাকার মুখ বুঝায় না, কিংবা চাঁদের ক্ষয়-বৃদ্ধির হিসাবে মুখের ক্ষয়-বৃদ্ধির কথা ধ্বনিত হয় না, এ কথা ত প্রাচীন আলঙ্কারিকেরাই বার বার বলিয়া গিয়াছেন।

চৌধুরীমহাশয় দৈবাৎ ভুলিয়া গিয়াছেন যে নিশীথ অর্থ গভীর রাত্রি; যে অর্দ্ধ রাত্রে মানুষেরা একেবারে ঘুমাইয়া পড়ে তাহাকেই বলে নিশীথ। সাধারণভাবে রাত্রি-জ্ঞাপক শব্দ হইল নিশা; তবে অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে নিশা অর্থে নিশীথ শব্দ অসাবধানে ব্যবহৃত দেখা যায়। যে গভীর রাত্রে মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে, তাহাকেই যে খাঁটি সংস্কৃতে নিশীথ বলিত এবং কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতির লেখায় যে সেই অর্থই পাওয়া যায় তাহা যে-কোন সংস্কৃত কোষ-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। আপ্তে-সঙ্কলিত সংস্কৃত অভিধান-গ্রন্থে দৃষ্টান্ত তুলিয়া অর্থ দেওয়া আছে; সেই সহজলভ্য গ্রন্থখানি সকলেই দেখিতে পারেন। প্রাচীন সংস্কৃতের নিশীথ, ঠিক অর্থেই প্রাচীন প্রাকৃতে পাই, যথা, "অগ্‌গি যথা পজ্‌জলিতো নিশীথে" (থেরী গাথা)। আমাদের ভাষাতেও অতি চলিত কথায় গভীর রাত্রি অর্থে "নিশীথ রাত্রি" বলে। এই নিশীথ শব্দ হইতেই, খাঁটি অর্থ ধরিয়া, আমাদের 'নিশুতি' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। নিশুতি সময়ে গভীর রাত্রে যে জলের উপর চাঁদের আলো আমাদের মনে অতি মধুর ও প্রশান্তভাব জাগায়, তাহা হয়ত স্বীকৃত হইবে। তাহা হইলেই দেখা গেল যে বঙ্কিমবাবুর প্রয়োগটিকে দোষযুক্ত না বলিয়া প্রশংসা করাই উচিত।

(৪) বঙ্কিমবাবু ১৬ বছরের তিলোত্তমার চুলের 'নিবিড় বর্ণের' কথা বলিয়াছেন; কিন্তু সে রং যে কাল, কি কটা, কি সোনালি, কি সাদা তাহা বলেন নাই। এইজন্য বর্ণনাটা দোষযুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। চুলের রং যে কটা কিংবা সোনালি হয় তাহা আমাদের মনেও পড়ে না; গুপ্তকবি যাঁহাদিগকে বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী বলিয়াছেন তাঁহাদের চুলের স্বপ্নে কোন পাঠকের মনে চুলের রং সম্বন্ধে খট্‌কা উপস্থিত না হইবারই কথা। বিদেশকে মনে করিয়া রং প্রভৃতির কথা কেহ বড় লেখে না। ইউরোপের বাজারে Skin Colour নাম দিয়া যাহা বাহির হয়, তাহার ব্যাখ্যায় যে ভারতে এবং আফ্রিকায় খট্‌কা লাগিবে, একথা বিক্রেতারা মনে করেন না। গল্পের নায়িকাদিগকে প্রায়ই একটুখানি 'পাকা' দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ১৬ বছরের মেয়ে তিলোত্তমার মাথার চুল যে পাকা ছিল, এ সন্দেহ হয় না; কাজেই ইউরোপের Skin Colourএর মত এদেশে চুলের রং বিনা বিশেষণেই বুঝিতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ কিন্তু লিখিয়াছেন যে চুলের রং লাল, কি সোনালি, কি কালো, পাঠকের মনে এ সন্দেহের উদয় হওয়া আশ্চর্য্য নয়। বঙ্কিমবাবুর প্রয়োগে 'সংশয় দোষ' ঘটে নাই, কিন্তু লেখকের এ সংশয়টুকু দোষের হইয়াছে।

(৫) কুঞ্চিতালক—এই কথাটা

একটু অসাবধানে কেশসকল-এর বিশেষণ-রূপে লইয়া চৌধুরীমহাশয় গোল করিয়াছেন। প্রথম গেল ললাটের বর্ণনা; এবং তাহার পরেই লিখিত আছে যে 'তৎপার্শ্বে অতি নিবিড়বর্ণ কুঞ্চিতালক' ইত্যাদি। 'তৎপার্শ্বে' অর্থাৎ কপালের পাশে বা উপরভাগে যাহা আছে বলা হইল, তাহার শেষে একটা দাঁড়ি না দিলেও সেমিকোলন দিতেই হয়; কারণ পরে যে মুক্তকেশ স্থানে স্থানে পড়িয়াছে, সে 'কেশসকল' কোন প্রকারে 'তৎপার্শ্বে'-এর সহিত যোজনা করা যায় না। বঙ্কিমবাবু যদি কুঞ্চিতালক অর্থ কোঁকড়া কোঁকড়া ভাবিয়া লিখিয়াছিলেন (অতিরিক্ত কেশটুকু না হয় তর্কের খাতিরে ছাঁটিয়াই দিলাম) বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে বিনা সেমিকোলনে বাক্যটি কিরূপ দাঁড়ায় দেখাইতেছি ঃ—তৎপার্শ্বে (ললাট-প্রান্তে) অতি নিবিড়বর্ণ 'কোঁকড়া কোঁকড়া' কেশসকল ভ্রূযুগে, কপোলে, গণ্ডে, অংসে, উরসে আসিয়া পড়িয়াছে। কেশ (কর্ত্তা) আসিয়া পড়িয়াছে নানাস্থানে; তাহার উল্লেখও হইল; এখন তৎপার্শ্বে বা কপোল-প্রান্তে কি করিয়া রক্ষা করা যায়? কাজেই সহজে বুঝিতে পারা যায় যে "তৎপার্শ্বে... কুঞ্চিতালক" পর্য্যন্ত গিয়াই একটি ছেদ চাই এবং এই ছেদ সেমিকোলন হইলেই যথেষ্ট হইবে। ছাপায় আছে কিনা জানি না; না থাকিলেও বিরাম-চিহ্ন দিতেই হইবে।

অ ক শব্দের অর্থ যে কেবল কোঁকড়া চুল, তাহা নয়। আমি কালিদাসের দৃষ্টান্তই দিয়া আসিতেছি; এখানেও সেই দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি যে অলক অর্থে কেবল চুল-ও হয়। সংস্কৃত কোষগ্রন্থেও ইহা দেখিতে পাইবেন। রঘুবংশের ৪র্থ সর্গের ৫৪ শ্লোকে দেখিতে পাইবেন যে কেরল রমণীদের অলকে অর্থাৎ চুলে চমূরেণু উড়িয়া পড়িতেছে। এখানে মল্লিনাথ অলককে কোঁকড়া চুল অর্থে বুঝেন নাই, এবং অলক শব্দের যে সোজাসুজি চুল অর্থ হয় তাহাও সংস্কৃত কোষগ্রন্থে কালিদাসের এই প্রয়োগ এবং অন্যান্য প্রয়োগের দৃষ্টান্তে লিখিত হইয়াছে। আপ্তে-সঙ্কলিত কোষগ্রন্থ দেখিতে পারেন। বহুদৃষ্টান্ত তুলিতে পারা যাইত, কিন্তু প্রয়োজন নাই। দেখা গেল যে কুঞ্চিতালক ললাটপ্রান্তে শিষ্টভাবেই সুসজ্জ রহিয়াছে।

ললাটপ্রান্তের কুঞ্চিত কেশের পর মুক্ত কেশের বিচার করিতেছি। সেই কেশ যে-যে স্থানে পড়িয়াছে তাহার মধ্যে একটি স্থানের নাম কপোল, আর একটি স্থানের নাম গণ্ড। কপোল শব্দের অর্থ ঠিক গাল বা Check বটে; গণ্ড শব্দও আংশিক অর্থে গৃহীত হইলে কেবল গালকে বুঝায়; কিন্তু গণ্ডের পূর্ণ অর্থ—ললাটের পার্শ্বদেশ হইতে মুখের সমগ্র পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত অংশ। বট্‌লিং ও রোট্ প্রণীত সংস্কৃত কোষগ্রন্থে এবং আপ্তে পণ্ডিতের কোষগ্রন্থে দেখিতে পাইবেন যে গণ্ড অর্থ—The whole side of the face including temples. কবি কালিদাসকৃত কুমারসম্ভবের ৭ম সর্গের ৮২ শ্লোকে আছে, যে, 'আচারধূম' গ্রহণ করায় বধূর মুখমণ্ডলের সমগ্র গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু গালটুকু যে রাঙা হইয়াছিল, তাহা নয়; কোষ-

কারেরাও এইস্থলের গণ্ডশব্দের প্রয়োগকে Temples সহ মুখের সমগ্র পার্শ্বদেশ বুঝিয়াছেন। Temple শব্দের কোন বাংলা কথা নাই; ঐ স্থানের শিরকে আমরা রগ বলিয়া থাকি; সেটা পারস্যদেশের কথা। কাজেই বিশেষ বিশেষ স্থান বুঝাইবার জন্য বঙ্কিমবাবুকে সংস্কৃত গণ্ড শব্দটিকে কপোল হইতে ভিন্নভাবে প্রাচীন অর্থে ব্যবহার করিতে হইয়াছে। প্রাচীন শব্দ ব্যবহারে যদি দোষ থাকে, তবে বঙ্কিমবাবু দোষ করিয়াছেন; কিন্তু অর্থ বুঝিবার ভুল অথবা কুপ্রয়োগ করেন নাই।

(৬) দুর্গেশনন্দিনীতে আছে যে, তিলোত্তমা কাদম্বরী, সুবন্ধুর বাসবদত্তা এবং গীতগোবিন্দ পড়িয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রমথ-নাথ, কুমারীর সুরুচি এবং শিষ্টাচার রক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছেন যে তিনি বাসবদত্তা এবং গীতগোবিন্দ পড়েন নাই। গল্পের নায়িকারা কি কি পড়িয়াছিলেন তাহা বলিতে পারিব না, কিন্তু কাদম্বরী পড়িলে যদি কোন দোষ না হয়, তাহা হইলে বাসবদত্তা পড়িলেও দোষ হয় না। আমি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বাসবদত্তার কথা বলিতেছি না, সুবন্ধুর কাব্যের কথাই বলিতেছি। সুবন্ধুর কাব্যে ব্রীড়াদিব্যঞ্জক কোন কথা বা বর্ণনা নাই। প্রেম এবং বিরহের যেরূপ বর্ণনা বাসবদত্তার আদর্শে কাদম্বরীতে লিখিত হইয়াছিল তাহা সুরুচি-সঙ্গত বিবেচিত না হইলে, কাদম্বরী প্রভৃতি সকল কাব্যই পরিত্যাগ করিতে হয়। সুবন্ধুর কাব্যে প্রত্যেক শব্দের এরূপভাবে নানা অর্থ কল্পিত হইয়াছে, যে শিবরাম ত্রিপাঠীর দর্পণ নামক টীকা না দেখিলে পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পারা যায় না; এজন্য তিলোত্তমার পক্ষে বইখানি পড়িয়া উঠা শক্ত ছিল বলিতে পারি। কারণ কবি সুবন্ধু মুখবন্ধে নিজেই লিখিয়াছেন ঃ—

সরস্বতীদত্তবরপ্রসাদ-
শ্চক্রে সুবন্ধুঃ সুজনৈকবন্ধুঃ
প্রত্যক্ষর শ্লেষময় প্রবন্ধ-
বিন্যাসবৈদগ্ধ্যনিধির্নিবন্ধম।

স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের একালের বিবেচনায় গীতগোবিন্দে শ্লীলতা রক্ষিত হয় নাই। স্বয়ং কমলাকান্তই বলিয়াছেন, যে গীতগোবিন্দে ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে। কিন্তু প্রাচীনেরা যে ঐ গ্রন্থকে তিলমাত্র অশ্লীল মনে করিতেন না এবং পড়িতে পড়িতে ভক্তিভাবে মজিতেন, তাহা ভুলিলে চলিবে না। বৈষ্ণবদের কথা ছাড়িয়া দিয়া একালের অন্য শ্রেণীর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণদের বড় বড় ভদ্রঘরের সকল বয়সের মেয়েদিগকেই ভক্তিপূর্ণভাবে সুর করিয়া গীতগোবিন্দ আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। সংস্কৃত না জানিলেও, মোটামুটি যে সকল কথা উচ্চারণ করিতে হয়, সেগুলির অর্থ ভাষায় অতি সহজ বলিয়া ভদ্রলোকের মেয়েরা গীত-গোবিন্দের অনেকস্থলের অর্থ অথবা ভাবটুকু অনায়াসে ধরিতে পারেন। এ অবস্থায় কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না যে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের মেয়েদের লজ্জাশীলতার অভাব আছে, অথবা গীতগোবিন্দ পড়েন বলিয়া পাপসঞ্চয় করিয়া থাকেন। কাজেই

সেকালের কুমারীর পক্ষে গীতগোবিন্দ অপাঠ্য বিবেচনা না করিলে চলিত।

চৌধুরী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, যে বঙ্কিমবাবু যখন তাঁহার প্রথম বয়সের লিপিরীতি পরিহার করিয়াছিলেন, তখন সে রীতি অবলম্বিত হইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী সময়ের লিপি-রীতিকে যে বঙ্গসাহিত্যে আদর্শ বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সত্য বলিয়া স্বীকার করি। দুর্গেশনন্দিনী হইতে যেটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে সুগঠিত শব্দটি দেখিতে পাই; কিন্তু আদর্শ বলিয়া সীতারাম হইতে যেটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে গড়ন শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। চৌধুরী মহাশয় বঙ্কিমবাবুর যে ভাষা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন সে ভাষার গড়ন শব্দটি ছাড়িয়া, এই বিচারিত প্রবন্ধটিতে বহুবার গঠন এবং গঠিত লিখিয়াছেন কেন? ভাষায় গড়া কথা আছে; এবং ঐ কথাটি ওড়িয়া এবং মহারাষ্ট্র প্রাকৃতেও আছে। পঠনের অপভ্রংশরূপে আমাদের পড়া শব্দটি আছে; পড়া এবং গড়া একরূপ উচ্চারিত হয় বলিয়া, পঠ্ ধাতুর অনুকরণে কোন সাধারণ ব্যক্তি একটা মন-গড়া গঠ্ ধাতুর সৃষ্টি করিয়াছেন। গঠ্ নামে যখন একটা সংস্কৃত ধাতু নাই, তখন গড়া, গড়ন প্রভৃতিকে সাধু আকার দিবার প্রয়োজন কি?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সনেটের নিবেদন

বঙ্গবধূসম আমি অন্তঃপুরে সতত বন্দিনী,
বঙ্গবধূসম তবু মুখে বুকে ভরপুর সুখ।
পতি-সোহাগিনী বধূ করে যথা আনন্দ-কৌতুক,
কবি-সোহাগিনী আমি, লীলারঙ্গে সতত রঙ্গিণী।
শাখা-বাহু মেলিয়াছে আঙ্গিনায় যেমন কামিনী,
আমিও গো লীলাময়ী! লভিয়াছি কুসুম-যৌতুক,
দেবতার আশীর্ব্বাদে। হের মোর মধুময় মুখ,—
মধুর জীবন যেন মধুময়ী বাসন্তী যামিনী।
বঙ্গনারী নহে কভু সারী সম পিঞ্জর-বাসিনী;
পশি যবে পূজাগৃহে হয় ধনি—পূজায় বিভোর,
হরি-মুখচন্দ্র-সুধা পিয়ে যবে নয়ন-চকোর,
সেও হয় মুক্তাকাশে বিহঙ্গিনী, বন-বিহারিণী।
আমিও গো মুক্তাকাশে শুভ্র ডানা আনন্দে মেলিয়া,
করিতেছি নাম-গান—সুধারাশি পড়িছে ঝরিয়া।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

ট্যালিসম্যান

(গল্প)

কর্ণেল টড সাহেবের আদ্দালি ছিল পঞ্জাবি রণবীর; নামে, কাজে কিন্তু কাণ্ডারী। যত-রকম বিপদে আপদে সে তাঁহাকে রক্ষা করিত।

তীরবেগে মোটার না চালাইলে সাহেবের মন উঠিত না; মোটারে বসিয়া কল্পনা করিতেন, তিনি উড়িয়াছেন ব্যোমযানে।

প্রভু চালাইতেন মোটার, পাশে বসিয়া থাকিত ভৃত্য রণবীর। রণবীরের ইঙ্গিত কৌশলে, বা 'অকাল্ট' প্রভাবে, ঠিক বলা যায় না, এমন বেগগতিতে অর্থাৎ বেগগতিতেও চৌরাস্তা অতিক্রমকালে কোন একটি দিন সাহেবের হাতে accident হয় নাই, বা চৌরঙ্গির পথে তিনি পুলিস সারজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। আর যে দিনটি রণবীর তাঁহার পাশে ছিল না—ঠিক সেই দিনই কিনা বাড়ীর রাস্তার মোড়ে একটি লোক তাঁহার মোটরে চাপা পড়িয়া গেল!

মেম-সাহেবের চাকর-মহলে বড় একটা সুনাম ছিল না। তিনি নাকি অন্যকে ন্যায্য আহার্য্য সঞ্চিতেও বঞ্চিত করিতেন, আর নিজে—পানাপানেও দোষ জ্ঞান করিতেন না। পান অর্থেই বা তাহাদের অভিধানে কি লেখে, আর অপান অর্থেই বা তাহারা কি ইঙ্গিত করিত সে কথাটা মেমসাহেবের লবণভোগী দলেরা স্পষ্ট করিয়া কখনো বলে নাই। তবে ঘটনাচক্রে তাঁহার ধূমপান প্রীতির কথাটাই বাজাররাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল।

কোন একটি বিশেষ মেল-দিবসে মেমসাহেব সিগারেট-খণ্ড মুখে লইয়াই নাকি লিখিতে ব্যস্ত ছিলেন; কখন্ বা কেমন করিয়া বহ্নি হইতে ভস্ম বা ভস্ম হইতে বহ্নিকণা নির্গত হইয়া কার্পেটখানি যে ধূমায়িত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই। সহসা পায়ের দিকটা গরম বোধ হওয়ায় নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন এ শুধু ধূম নয় তাঁহার ঘাগরাপ্রান্তটি অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই যদি না রণবীর তৎক্ষণাৎ আসিয়া সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিত, তবে তাঁহার এই নবনী-কোমল সুমূর্ত্তির যে কিরূপ বিদগ্ধ বিকৃতরূপ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল, সাজসজ্জার সময় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইলেই এই চিন্তায় বহুদিন ধরিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে একটা আতঙ্ক-শিহরণ উঠিত।

টিম বাবা তাঁহাদের একমাত্র সন্তান। তাহার জন্মদিনে জু-গার্ডেনে ছেলের দল লইয়া তাঁহারা গিয়াছেন পিকনিক করিতে। কতকগুলি মানবশিশু বানরশিশু দেখিতে ছুটিয়াছে, কোন দল বা সর্প কুম্ভীরের আড্ডায়, কেহ কেহ বা বাঘ সিংহের খাঁচার কাছে দাঁড়াইয়া ডাক শুনিবার অভিপ্রায়ে নির্ভয়ে লাঠির খোঁচা দিতে উদ্যত; কিন্তু গর্জ্জন শুনিবামাত্র সভয়ে পিঞ্জরের নিকট হইতে পিছাইয়া পড়িতেছে। এক এক ছেলের দলের সহিত দু-একজন সাহেব মেম বা ভৃত্য।

কয়েকটি বালক নৌকা করিয়া হ্রদ-ভ্রমণ করিতেছিল ; হালী স্বয়ং বাবা টিম। রণবীর এ দলের নেতা, তাহার ইচ্ছা ছিল সে নিজেই কাণ্ডারী হইয়া ছেলেগুলিকে কম্পানীর হ্রদ পার করে। কিন্তু টিম বাবা পিতামাতার একটি সন্তান—জেদ ধরিলে সৃষ্টিকর্ত্তাকেও তিনি হার মানাইতে চান, রণবীর ত সামান্য ভৃত্য। সে বেচারা হাল ছাড়িয়া ম্লান মুখে তীরে আসিয়াই দাঁড়াইল, কিন্তু নিশ্চিন্তমনে নহে। হায় রে! যা ভয় করিয়াছিল তাহাই হইল; অল্পদূর না যাইতেই নৌকাখানি উল্টিয়া পড়িল। যদি না রণবীর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই হাতে ধরিয়া ধোবার কাপড়ের মত ছেলেগুলাকে তীরে আছড়াইয়া ফেলিত তবে এই আনন্দের দিনে একটা শোকাভিনয় কাণ্ড ঘটাও বিচিত্র ছিল না।

এইরূপে জলে স্থলে, কর্ণেল সাহেবের শ্রীমধুসূদন ছিলেন আর্দ্দালি রণবীর। তাই প্রভু আদর করিয়া এই উপকারী 'পেয়ারে'র চাকরের নাম দিয়াছিলেন ট্যালিসম্যান।

(২)

তিন বৎসরের ফার্লো লইয়া সাহেব যখন বিলাতযাত্রা করিলেন তখন রণবীর আর অন্য কাহারও চাকরী গ্রহণ করিল না। প্রয়োজনও ছিল না, সাহেবের অনুগ্রহে সে বেশ দু পয়সা সংস্থান করিয়া লইয়াছিল। দেশে জমীজিরাৎ দুদশবিঘা যাহা ছিল তাহার চাষবাস আরম্ভ করিয়া দিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া সে গৃহবাসী হইল। বিবাহ তাহার বাল্যকালেই হইয়াছিল।

রণবীর জাতিতে ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত না হইলেও চলনসই লেখাপড়া জানিত, প্রত্যুৎপন্ন মতিও তাহার চমৎকার, পরের উপকারেও বিমুখ নহে, কাজেই গ্রামের মধ্যে সে একজন মাতব্বর ব্যক্তি। চিঠিপত্র পড়াইতে, বিবাদে সালিসি মানিতে, মকদ্দমা মামলার পরামর্শ লইতে গ্রামের সকলেই তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে—এমন কি পাঁজিপুথি দেখাইতেও এখন বড় একটা কেহ গণকের নিকট যায় না।

গ্রামখানির নাম বামনিয়া, ব্রাহ্মণ-স্থান বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। নিজের এই ক্ষুদ্র বাসভূমিতে, গ্রামের লোকের আদর সম্মান এবং স্ত্রীপুত্রের প্রীতিযত্নের মধ্যে রণবীরের জীবন বেশ সুখেই কাটিতেছিল, এমন সময় ১৩১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইয়োরোপে যুদ্ধের ডঙ্কা বাজিল।

আশ্বিন মাস, আকাশে বাতাসে, বনে উপবনে দিগ্‌দিগন্তে শরতের প্রভাব—শরতের শোভা। আকাশে ঘননীলিমার ছটা, শস্যশীর্ষ ক্ষেত্রে, তরুঘন-বনপ্রান্তে, তৃণময় শুষ্ক প্রান্তরে স্তবকে স্তবকে, স্তরে স্তরে শুভ্রশ্বেত কাশপুষ্পের ঘটা!—প্রভাতে সন্ধ্যায় শেফালি পুষ্পের মধুর গন্ধ এই বর্ণলালিত্যের প্রাণে কি মোহ-উন্মাদনা জাগাইয়া মৃদুমন্দ গতিতে কাহার অভিসার উদ্দেশে গমন করে—কে জানে?

এবার ক্ষেত্রের অবস্থা বড় ভাল, কৃষক-পরিবারের আনন্দের সীমা নাই। সমস্ত ধান্য-ক্ষেত্রই প্রায় পীতশ্যামল, মাসখানেকের মধ্যেই হৈমন্তিক শস্য কাটিবার সময় আসিবে, এখন হইতেই তাহার আয়োজন চলিতেছে।

রণবীর ক্ষেত্র-কার্য্য তত্ত্বাবধান করিয়া

পরাহ্ণে বাড়ী ফিরিতেছিল। রবির আলো স্ত যাইতেই পশ্চিমগগনে শুকতারা হাসিয়া ঠিয়াছে, মধ্যগগনে নবমীর চন্দ্রকলা াসমান, গ্রীষ্মের পর প্রথম শীতের ায়ুপ্রবাহ নবীন বসন্তের মতই সুখসঞ্চার রিয়া ফিরিতেছে।

আকাশের সেই স্নিগ্ধ আলো, ক্ষেত্রের সই শ্যামল শোভা, বাতাসের সেই চঞ্চল লক রণবীরকে কি এক যেন অভূতপূর্ব্ব ানন্দে অভিভূত করিয়া তুলিল। অতি খের বিহ্বলতায় একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস লিয়া সে ক্ষণকাল ঊর্দ্ধমুখ স্তম্ভিত ইয়া দাঁড়াইল। এই চিত্রবিচিত্রা ধরণী াহার শোভা, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী যাঁহার হিমা, এই সুখদুঃখভোগী জীব যাঁহার জন, ক্ষুদ্র মনুষ্যের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত াম্য সেই বিশ্বপতি পরমকারণের উদ্দেশে পরিপূর্ণ প্রাণে বারবার নমস্কার করিয়া নরায় গৃহাভিমুখী হইল।

রণবীরের পত্রছায়িত মৃন্ময় গৃহে গোময়-লিপিত সুপরিষ্কৃত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে পাথরের কাট ক্ষুদ্র শিবমন্দির। গ্রামে সন্ধ্যারতির ণ্টা পড়িবার পূর্ব্বেই পত্নী পার্ব্বতী সন্ধ্যাদীপ ালিয়া স্বামীর অপেক্ষা করিতেছিল। রণবীর াসিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া জয় মহাদেব জয় য় বিশ্বেশ্বর বলিয়া স্তুতি পাঠ আরম্ভ করিয়া তেই, সীতা সতী রুক্মিণী ভবানী প্রভৃতি ারও কয়েক জন স্ত্রীলোক দুই চারিটি ালকবালিকা সহ এখানে আসিয়া উপস্থিত ইল। ইহাদের মধ্যে কেহ বা রণবীরের াশ্রিতা,—কেহ বা অল্পদিনের জন্য আত্মীয়-বনে আসিয়াছে, কেহ বা পাড়া প্রতিবাসী, একঘণ্টার জন্য দেখা শুনা করিতে আসিয়া সারাবেলাটা এইখানেই কাটাইয়া আরতির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তৎপূর্ব্বে বারবেলায় কি দ্বারের বার হইতে আছে? এতক্ষণ ইহাদের গানের ধূম লাগিয়াছিল রান্নাঘরের রোয়াকে। সেখানে দুই জনের হাতের ঘূর্ণায়মান চাকির সম লয়ে সমবেত সকলের সম্মিলিত কণ্ঠতান এতক্ষণ বেশ সমজোরেই ঘুরপাক খাইতেছিল। তাহারা আসিলে সকলে মিলিয়া দীপারতি শেষ করিয়া দেব প্রণাম করিবার পর যে যাহার স্থলে গমন করিল।

পার্ব্বতী সাধারণ হিন্দুকন্যার ন্যায় সুগৃহিণী এবং নিষ্ঠাবতী পত্নী। পূজা শেষে স্বামীর পা ধুয়াইয়া দিয়া, তাহাকে খড়ম পরাইয়া সে গেল চা আনিতে। চা পানটা অনেক দিন হইতেই রণবীরের এমন অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে যে ভাত রুটি না পাইলেও বরঞ্চ একদিন চলে কিন্তু সকালে সন্ধ্যায় চা টুকু না পাইলে প্রাণটা তার ঠোঁটের আগায় আসিয়া জমে।

রণবীর ততক্ষণ মাদুরপাটির উপর তৈলদীপের সম্মুখে বসিয়া পকেট হইতে একখানি হিন্দুস্থান কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কিছুপরে স্ত্রী আসিয়া মস্ত একবাটী নাতিউষ্ণ চা তাহার সম্মুখে ধরিতেই কাগজখানা একবার নীচে রাখিয়া দুইহাতে চাপাত্র ধরিয়া এক নিশ্বাসে সমস্তটা নিঃশেষ পূর্ব্বক বাটীটা পার্ব্বতীর হাতে দিয়া পুনরায় পাঠে প্রবৃত্ত হইল।

পার্ব্বতী তখন ক্ষুদ্র একটী আলবোলা রণবীরের নিকটে রাখিয়া বসিল তামাক

সাজিতে। রোয়াকের একপাশে ছোট একটি কড়ায় গুলের আগুন প্রস্তুত ছিল, সেইখানে বসিয়া সে টিকা ধরাইয়া তাহা কলিকার তামাকের উপর রাখিয়া ফুঁক পাড়িতে লাগিল। সে ফুঁক কৌশলে তামাক একদণ্ডও স্থির থাকিতে না পারিয়া অচিরাৎ জ্বলিয়া উঠিল। তখন আলবোলার মাথার উপরে তাহাকে স্থানদান করিয়া নলটা স্বামীর হাতে তুলিয়া দিবামাত্র, কাগজ পড়িতে পড়িতেই তিনি তাহাতে টান সুরু করিয়া দিলেন। তাহার শিশুপুত্র কিষণদাস আজ বাহিরের ছেলেদের সহিত সমস্ত দুপর বেলাটা মাতামাতি করিয়া বেড়াইয়া ঠিক সন্ধ্যাবেলাতেই রোয়াকের একখানা খাটিয়াতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; আলবোলার শব্দে হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে লাফাইয়া নীচে নামিয়া পিঠের দিক হইতে আসিয়া রণবীরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিয়া ডাকিল, "বাবুজি, পিতাজি"!

পিতা কিন্তু আজ এমন পাঠনিমগ্ন যে পুত্রের আদরের বিনিময়ে তাহার প্রতিদিনের ন্যায্য পাওনাটা পর্য্যন্ত তাহাকে দিতে ভুলিয়া গেলেন, এমন কি হাসিয়া তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

রণবীর পড়িতেছিল, একবিংশ পঞ্জাবী রেজিমেণ্টের নায়ক হইয়া কর্ণেল টড সাহেব ফ্রান্সে লড়াই করিতে যাইতেছেন। সমস্ত পঞ্জাবে সেজন্য নবসৈন্য সংগ্রহ চলিয়াছে। এই গ্রামে সৈন্য ভর্ত্তি হইবার শেষ দিন আগামী কল্য। এই সংবাদেই তাহাকে এতদূর বিমনা করিয়াছে। টড সাহেবের সঙ্গে সে যদি না থাকে তবে তাঁহাকে রক্ষা করিবে কে? সে যে তাঁহার ট্যালিসম্যান—রক্ষাকবচ! আর তাঁহাকে রক্ষা করিতে না পারিলে ইংলণ্ডেরও ত সমূহ ক্ষতি। সে জানে তাহার কর্ণেল সাহেবই ইংলণ্ডের একটি মাত্র সেনাপতি যাঁহার জীবন মৃত্যুর উপর সমগ্র রাজ্যেরই জয়পরাজয় নির্ভর করিতেছে।

রণবীরের মন দুশ্চিন্তায় আলোড়িত হইতে লাগিল। "কি করিবে সে? যাইবে না থাকিবে? কি তাহার কর্ত্তব্য?"

খোকা আরো দুএকবার পিতাজি—বাবুজি—বলিয়া ডাকিল, কিন্তু উপেক্ষিত হইয়া কণ্ঠ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রণবীর তখন কাগজখানা আছড়াইয়া নীচে ফেলিয়া শিশুকে বুকে টানিয়া লইয়া বারবার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন, দু একবিন্দু অশ্রুজল শিশুর মুখে পতিত হইল।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল—"লড়াই কা ক্যা খবর পতিজি?"

মুখ নত করিয়াই রণবীর উত্তর করিল "কুছ নেহি, কুছ নেহি।"

(৩)

"আরে ভাইজি রণবীর ডেরামে হো।"

তাহার জ্ঞাতি ভ্রাতা মহাবীর এইরূপে হাঁকিয়া পরদিন প্রায় বেলা দ্বিপ্রহরে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। এমন অসময়ে এত প্রখর রৌদ্রে, বাড়ীতে আরাম করিয়া নিদ্রা যাইবার পরিবর্ত্তে গ্রামের ডাকসাইটে অলস মহাবীরের এখন এখানে আসিবার অবশ্যই একটু নিগূঢ় কারণ ছিল। কারণটা এই,

তাহার গর্ভবতী পত্নীর মূর্চ্ছা হইতেছে, পাঁচজনে বলিতেছে ঝাড়ফুঁক কর। রণবীর যদি এ কার্য্যের ভারটা লয় তাহা হইলে আর অন্য ওঝার সন্ধানে যাইতে হয় না। তাহার মাথার একটা বোঝা নামে।

পার্ব্বতী এতক্ষণ উঠানের ছায়ার ধারটাতে বসিয়া বিচালি কাটিতেছিল, কাজটা শেষ করিয়া সবে মাত্র বঁটিখানা রোয়াকের গায়ে ঠেসাইয়া কাটা বিচালির রাশি থলির মধ্যে ভরিতে আরম্ভ করিয়াছে,—কৃষাণ গরু লইয়া আসিয়াই যাহাতে জাব দিতে বিলম্ব না হয়, এমন সময় মহাবীরের আবির্ভাবে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল "ঘরমে ত নেহি হ্যায়, ভাইজি, খবর ক্যা হো?"

খবর যে বড় ভাল নয়, সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করিয়া ক্ষুণ্নহৃদয়ে সে অন্য ওঝার তল্লাসে চলিয়া গেল; কিন্তু বিশেষ করিয়া বলিয়া গেল রণবীর আসিলেই তাহাকে যেন পার্ব্বতী পাঠাইয়া দেয়। ঝাড়ফুঁক না করিলেও সে সময়টা সেখানে তাহার উপস্থিত থাকাটা চাইই চাই।

পার্ব্বতী খবরটাতে বড় দুঃখিত ও চিন্তিত হইল। কাজকর্ম্ম শেষে সন্ধ্যাবেলাটা সেখানেই কাটাইবে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিচালি গুলা থলি বোঝাই করিয়া লইল; তাহার পর উঠানটি একবার পরিষ্কাররূপে ঝাঁটাইয়া শয়নগৃহের দিকে যাত্রা করিল। আজ বাড়ীর আর সকলেই কিষণদাসকে লইয়া শিবনারায়ণের কথা শুনিতে পার্ব্বতীর ভ্রাতৃ-ভবনে গিয়াছে। ভ্রাতা স্বয়ং আসিয়া তাহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। কাজকর্ম্ম দেখিবার ছুতায় পার্ব্বতী কেবল যায় নাই, আসল কথা সে গেলে রণবীরের অসুবিধা হইবে যে। কিন্তু ভাইয়ের কাছে পার্ব্বতী কথা লইয়া ছাড়িয়াছে যে তিনি আজই কিষণ দাসকে আবার নিজে রাখিয়া যাইবেন। সে একটি রাতও ছেলে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না যে।

তখনো অনেকটা বেলা ছিল; কিষণ দাসের অভাবে আশ্বিনের বেলাও পার্ব্বতীর আষাঢ়ের বেলার ন্যায় সুদীর্ঘ বলিয়া মনে হইতেছিল। কাজকর্ম্মেও কেমন মন লাগিতে ছিল না। কিষণদাস ঘরে থাকিলে সমস্ত বাড়ীটা গুলজার করিয়া রাখে, ছোটে, খেলা করে, দোলনায় দোলে, আর মায়ের সকল কর্ম্মের সহযোগী হইতে গিয়া প্রতিকর্ম্মে বাধা দেয়—তবুও সকল কর্ম্ম কত সহজে কত শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া যায়। আজ তাহার মা বেলায় বেলায় বিছানাপত্র ঠিক করিয়া লইয়া বেলায় বেলায় রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। উনুনে আগুন দিয়া সন্ধ্যার তরকারীটা কুটিয়া লইয়া রুটির ব্যঞ্জনটা প্রস্তুত করিয়া রাখিল, স্বামী আসিলে শুধু গরম গরম রুটি কয় খানা তৈয়ার করিয়া দিয়া তাঁহার আহারের পর দুজনে মহাবীরের স্ত্রীকে দেখিতে যাইবে। তরকারীটা নামাইয়া চায়ের জলটা উনুনে চড়াইয়া সে বাসনগুলা কূয়ার তলায় লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় দরজায় উঁকি মারিল নিহিল সিং, রণবীরের গ্রামবন্ধু। তাহার ছোট ভাইটির বরাত প্রেরণ উপলক্ষে সপরিবার রণবীরকে সে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে। তাহারা কাল না যাইলে এ

কাজটা যে সুসিদ্ধ হইতেই পারে না, ভাবে ইঙ্গিতে, বাক্যে ভাষ্যে, তর্ক যুক্তিতে নানারূপে ইহা সপ্রমাণ করিয়া, রণবীরসহ পার্ব্বতী নিশ্চয়ই কাল সেখানে যাইবে, পার্ব্বতীর নিকট হইতে এই কথা লইয়া তবে শুভ গোধূলি লগ্নে সে বিদায় গ্রহণ করিল।

গোয়ালে তখন গরুগুলির হাম্বারব শুনিয়া পার্ব্বতী সেখানে গিয়া প্রত্যেক গরু বাছুরের নাম ধরিয়া ডাকিয়া তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিল; প্রতি গামলায় জাব ঠিক মত পড়িয়াছে কিনা দেখিল, দু একটা গামলা খালি রাখিয়া কৃষাণ জল আনিতে গিয়াছিল, কৃষাণ আসিতে না আসিতে পার্ব্বতী ভূষি বিচালি প্রভৃতি গামলায় ঢালিয়া ঠিক করিয়া রাখিল। তাহার পর গোশালে ধূঁয়া দিয়া দীপ হস্তে যখন উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল তখন গ্রামে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহার যে এখানে আসিতে এত বিলম্ব হইয়াছে সে বুঝিতেই পারে নাই। আকাশে চাহিয়া দেখিল, দিনের আলো একেবারেই নিবিয়া গিয়াছে; ঠিক মাথার উপরে সুনীল আকাশে মস্ত চাঁদখানা হাসিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সে আলোকে তাহার হাতের দীপ একান্ত ম্রিয়মান।

এত দেরী হইয়াছে এখনো আজ রণবীরের দেখা নাই! আরতির যে বিলম্ব হইয়া যায়!

একেই ছেলেটা কাছে নাই বলিয়া মনটা খারাপ আছে; মহাবীরের পত্নীর খবরেও মনের উপর একটা চাপ পড়িয়াছে—এ সময় স্বামীকে অনাগত দেখিয়া কেমন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা, অকারণ আকুলতা তাহার মনের মধ্যে যেন চমকিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে কিনা একটা টিকটিকি গৃহকোণে টিক টিক করিয়া উঠিল! একটা বাদুড় পাখনার ঝাপটা দিয়া মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল! ইহা অলক্ষণ বা সুলক্ষণ! কি জানাইতে চাহে ইহারা?

কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য দিবার আজ তাহার সময় নাই! সন্ধ্যা যে বহিয়া যায়। কষ্ট দুঃখ আশঙ্কা মনে চাপিয়া লইয়া একাকী সে সন্ধ্যারতি সমাপন করিল; রণবীর চাকরী ছাড়িয়া গৃহে আসিবার পর আজি এই প্রথম এ সময়ে সে ঘরে নাই। আরতির শেষে স্বামী পুত্রের মঙ্গল কামনায় একান্ত প্রাণে দেব প্রণাম করিয়া উঠিয়া আবার সে দরজার দিকে চাহিল। দূরে যেন নাগ্‌রা জুতার শব্দ শুনিল; শব্দ নিকটবর্ত্তী হইল; তাহার সর্ব্বাঙ্গে আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইল এতক্ষণে রণবীর আসিতেছেন। দরজা ভেজান ছিল আগন্তুকের হস্তস্পর্শে খুলিয়া গেল—কিন্তু উঠানে প্রবেশ করিল কে? রণবীর নহে; তাহার দেবরপুত্র রণজিৎ। নৈরাশ্যের একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "ক্যা খবর বেটা?"

ধীর কণ্ঠে রণজিৎ কহিল "পলটন চলা গিয়া।"

"যানে দেও বেটা! সরকারজিকা জয় জয়কার!"

"কাকাজি বি গিয়া।"

"কাঁহা?"

"পলটন কা সাৎ।"

"পলটন কা সাৎ? কাঁহেরে?"

"লড়নেকো!"

"লড়নেকো! হমারা বেটাকো পিতাহীন করকে গিয়া! হা ভগবানজি!

এই বলিয়া মর্ম্মভেদী আকুল ক্রন্দনে ভূমিতলে সে লুটাইয়া পড়িল।

(৪)

ভারতসৈন্য ফ্রান্সে পৌঁছিয়া যেরূপ অভূতপূর্ব্ব অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিল তাহাতে যে মাথাগুলা তাহাদের পায়ের দিকে লুটাইয়া পড়ে নাই ইহাই আশ্চর্য্য। সংবাদপত্রে সে সময় ইহার যে বিশদ বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে জানা যায় যে,—ফ্রান্সের নরনারী সিপাহী সৈনিকের উপর কেবল জয়ধ্বনি এবং ফুল বর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। অনেক প্রবীণা—এমন কি অনেক নবীনাও চুম্বন-আশীর্ব্বাদে তাহাদিগকে সমাদৃত করিয়া লইয়াছিল। উজ্জলকান্তি সুরূপ সুপুরুষ রণবীর প্রমুখদলের উপর যে এইরূপ সম্মান অতি মাত্রায় বর্ষিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। লজ্জাবতী স্ত্রীলোকের মতই এই আদর-ভারে রণবীর মুহ্যমান কাতর হইয়া পড়িয়াছিল।

উল্লিখিত আনন্দ উল্লাসের মধ্যে যখন সিপাহীর দল গম্যস্থানে আসিয়া পৌঁছিল তখন তাহাদের হর্ষহাসি "ট্রেঞ্চে"র অন্ধকারের মধ্যেই বিলীন হইয়া পড়িল।

যুদ্ধ কোথায়? যুদ্ধ কাহার সঙ্গে? কোথা হইতে গোলা গুলি পড়ে, কাহার উদ্দেশে কামান ছোটে? রণতূর্য্যই বা বাজায় কে? যুদ্ধের আহ্বান ইঙ্গিত কোথা হইতে ভাসিয়া আসে? সেনানায়কই বা কে তাহাদের?

রণবীর টড সাহেবের রেজিমেণ্টের সৈনিক কিন্তু এপর্য্যন্ত মুখামুখি ভাবে একটি দিনের জন্যও সে তাঁহার দেখা পায় নাই। এ কিরূপ দানব যুদ্ধ?

তবুও তাহাদের এ যুদ্ধে অভ্যস্ত হইতে খুব যে বেশী দিন লাগিয়াছিল তাহাও নহে। বলিতে গেলে যুদ্ধারম্ভেই তাহারা সুনাম অর্জ্জন করে। ভারতসৈন্য ইয়োরোপ পৌঁছে শীতের প্রারম্ভ কালে—অক্টোবরের প্রথমদিকে। মাসান্তেই ৩১শে অক্টোবরের যুদ্ধে সিপাহী গোলন্দাজ খুদ্দাদ এই 'সমরাগ্নি পরীক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ ভি সি উপাধি লাভ করিল। যখন তাহার দলের সকলেই নিহত আহত, একটি কেহ আর তাহার সহায় সম্বল নাই, তখনও চতুর্দ্দিকের সেই মৃত্যুবেষ্টনের মধ্যে একাকী বসিয়া দ্বিতীয় "কাশিবিয়ানকা" খুদ্দাদ অকুতোভয়ে তাহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল—এক মুহূর্ত্তের জন্য ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া কামান ত্যাগ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করে নাই।

কামানের প্রাণান্ত ধ্বনির মধ্যেও ১৩১৪ সাল নিঃশব্দে পলায়ন করিয়াছে। ১৩১৫ খৃষ্টাব্দ মার্চ্চ মাসে অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। জর্ম্মাণরা এখন কোথায়? যুদ্ধের প্রারম্ভেই তাহারা বেলজিয়ম ছারখার বিধ্বস্ত করিয়া তাহা অধিকার করিয়া বসিয়াছে, কিন্তু একান্ত ইচ্ছা এবং চেষ্টা সত্বেও প্যারিসের ফটকে প্রবেশ করিতে না পারিয়া নগরীর প্রায় ৬০ মাইল দূরে আইন নদীর ধারে আটকা পড়িয়া গিয়াছে।

মিত্রদল ছোটখাট যুদ্ধে তাহাদের হটাইয়া মাত্র রাখিয়া জর্ম্মাণ-নিপাত-যজ্ঞের আয়োজনে আপনাদিগের সর্ব্বশক্তি প্রায় ব্যাপৃত রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। যুদ্ধারম্ভের প্রায় ৮ মাস পরে ২২শে মার্চ্চে নুভে-স্যাপলে যে যুদ্ধ হয় প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই ইংরাজের প্রথম জর্ম্মাণ আক্রমণ। এই আক্রমণে সিপাহীগণ যেরূপ অসম সাহস এবং অপূর্ব্ব পরাক্রম দেখাইয়াছিল তাহা ইতিহাসের চিরকীর্ত্তি। সিপাহী গণবীর সিং (গোবর সিং) এই যুদ্ধে V. C. উপাধির অধিকারী হন। কিন্তু জীবিত অবস্থায় ইহা গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটে নাই, সম্রাট এই সম্মান দ্বারা মৃতবীরের স্মৃতি ভূষিত করিয়াছিলেন।

অনুজ্ঞা পাইবা মাত্র এই মহাবীর বায়নেট হস্তে কতিপয় মাত্র সহচর অনুচর সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে জর্ম্মাণদিগের সর্ব্বপ্রধান (main) ট্রেঞ্চে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার প্রত্যেক বিভাগ এমন অসীম বলে ও কৌশলে আক্রমণ করেন যে শত্রুগণ অচিরাৎ আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। যে কয়েকজন ভারতীয় সৈন্যের সহায়তায় গণবীর জর্ম্মাণদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, রণবীর তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

ইহার পর ষাট পাহাড়ের (Hill 60) যুদ্ধ। আমাদের এই ক্ষুদ্রগল্পের নায়ক রণবীরের ভাগ্য ইহারই সহিত বিশেষরূপে জড়িত।

(৫)

ওয়াইজার (Yzer) নদীর ধারে শত্রু মিত্র উভয় পক্ষই নিজ নিজ কোটর-সদনে (trench) থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। জর্ম্মাণেরা প্রতিনিয়ত অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে, মিত্রদল হটাইয়া দিতেছেন। যদি কোন একটা অশুভ মুহূর্ত্তে শত্রুদল পার্শ্বের উচ্চস্থান Hill 60 অধিকার করে তবে তাঁহাদের সমূহ বিপদ, আর তাঁহারা যদি পূর্ব্ব হইতেই ইহা লইতে পারেন তবে তাঁহাদের সংস্থিতি (Position) অনেকটা নিরাপদ। এই অধিকারের চেষ্টায় কোন পক্ষেরই ছল বল কৌশলের ত্রুটি নাই।

ব্যোমযান উপরে উঠিয়া সৈন্যাবাসের সংবাদ লইতেছে, কামানসংস্থান লক্ষ্য করিতেছে। শত্রুদল মিত্রবেশ ধরিয়া ঠকাইবার চেষ্টা করিতেছে! মিত্রদল বনের মধ্যে লুকাইয়া অগ্রগামী। গ্রামপথে যুদ্ধ-ক্ষেত্র সহসা রাতারাতি বনে পরিণত হইতেছে। বিস্ফোটকপূর্ণ সুরঙ্গ প্রস্তুত হইতেছে। বারুদ-বিদীর্ণ ধরাতলে লুকাইয়া শত্রুর কাছে থাকিয়াও একপক্ষে আত্মরক্ষা সহজ হইবে, অন্যপক্ষে এই সুরঙ্গ পথে শত্রুর ট্রেঞ্চে অগ্নি দিতে পারিলে ত মহা মঙ্গল।

কত রকমের কামান, উভয়পক্ষের ট্রেঞ্চের স্থানে স্থানে গুপ্তভাবে রক্ষিত। ইহার মধ্যে জর্ম্মানের হাউইটজার (howitzer) কামানই ধ্বংসসাধনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার গোলা গুলি সঙ্কীর্ণ ট্রেঞ্চের মুখেও আসিয়া পড়ে, অন্য কামানের দ্বারা একার্য্য সাধিত হয় না। অথচ এই নিশ্চিত মৃত্যুও ব্যর্থ করিয়া কৌশলী সেনাদল অগ্রসর হইতেছে।

উভয়ের ট্রেঞ্চ-বাসভূমি সম্মুখাসম্মুখী, এত কাছাকাছি যে কোন কোন অংশ হয়ত বা ৫০ হাতও দূরে নয়। ট্রেঞ্চে লুকাইয়া বসিয়া অনুমানে অথচ অঙ্ক গণনার মত অব্যর্থ

সন্ধানে পরস্পরের আবাসের উদ্দেশে গোলাগুলি চলে। ট্রেঞ্চের পরিখায় বালির স্তূপ, ট্রেঞ্চের বাহিরে জালের বেষ্টন, তাহা ভেদ করিয়া শত্রুর অধিকারে প্রবেশ করা নিতান্ত সহজসাধ্য নহে।

তিনজন সৈনিক একটা সুরঙ্গ প্রস্তুত করিতেছিল। একজন ইংরাজ, একজন ফ্রেঞ্চ, একজন হিন্দুসিপাহী। তিনজনের অবস্থা অনেকটা একই রকম। ঘরে নরাইভরা শস্য, সুন্দরী স্ত্রী, নয়নমনোহারী শিশু। এমন সুখের গৃহবাস ছাড়িয়া তিন-জনেই স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিতে আসিয়াছে। এখানে কর্ম্মক্ষেত্রে বর্ণের বা জাতির ভেদাভেদ নাই; তিনজনেই ইহারা অকৃত্রিম বন্ধু। রণবীরের প্রতি ইহাদের পরম শ্রদ্ধা, অসীম বিশ্বাস। ইহার প্রত্যুৎপন্নমতি, রণকুশ-লতা কত বার তাহাদিগকে আসন্ন মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা করিয়াছে।

কাজ করিতে করিতে ইহারা নীরব নির্ব্বাক ছিলনা। ফ্রেঞ্চ বলিতেছিল, গৃহের এত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া সে যে এখানে আসিয়াছে, তাহার কারণ তাহার দেশ, to sauver sa Patrie, la France, ইংরাজ বলিল, আর তাহার আসিবার কারণ, তাহার জাতি to save his Nation; এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের উপর তাহাদের জাতীয় মান সম্মান প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিতেছে। এই বলিয়া উভয়েই চাহিল তাহার হিন্দুসহযোগীর প্রতি। মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিল না কিন্তু ফরাসী সৈনিকের নীরব নয়নের প্রশ্ন রণবীরের কর্ণে সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইল, "তুমি কেন আসিয়াছ? Pour quoi etes vous venu?" সে উত্তর কি দিবে এ প্রশ্নের? সত্যই ত সে কেন আসিয়াছে? তাহার দেশের জন্যও আসে নাই জাতির জন্যও নহে। সৈনিক কর্ত্তব্যপালনেও সে আসে নাই, কেননা সে, সৈনিক ছিলনা। তাহার কর্ত্তব্য ছিল স্ত্রীপুত্রপালন। তাহা অবহেলা করিয়াই সে আসিয়াছে, কি উত্তর দিবে তবে সে? সে উত্তর দিতে যাইতে-ছিল—"জানিনা কেন আসিয়াছি, প্রাণ দিতে আসিয়াছি শুধু এইটুকু জানি।"

কিন্তু তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, ভেরী বাজিল, ইহাই রণসজ্জার ইঙ্গিত। তিনজনে উঠিয়া ত্রস্ত গতিতে সৈন্যের সারিতে আসিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল।

অবিরাম গোলানিক্ষেপে শত্রুপক্ষ পর-স্পরকে সাদর বন্দনা জানাইল অর্থাৎ Bombardment আরম্ভ হইল।

(৬)

অনবরত গোলাগুলি পড়িতেছে, এক-স্থানে গোলা পড়িয়া সহস্রখণ্ডে ঠিকরিয়া দেহ ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, বিষাক্ত গ্যাসে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দিতেছে, জলন্ত তৈল দ্রাবের পিচকিরি ছুটিয়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে, তবুও এই অসীম যন্ত্রণায় লক্ষ্যপাত না করিয়া অনুজ্ঞা পাইবামাত্র অকু-তোভয়ে সিপাহীর দল সম্মুখীন হইয়া সর্ব্ব প্রথমে বায়নেট উঠাইয়া শত্রুর দিকে ধাবিত হইল, ইহাকেই বলে বায়নেট charge। দলে দলে হতাহত হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল, দলে দলে পশ্চাতের সৈন্য তাহার স্থান পূরণ করিতে লাগিল। কিন্তু জর্ম্মাণ

হাউইটজার কামানের গোলায় অল্পক্ষণে লৌহপ্রাচীর ভূমিসাৎ হইয়া যায়, মনুষ্য-প্রাচীর আর কতক্ষণ টিঁকিবে। এই মহাবিপদে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়, যদি ব্যাটারি নিস্তব্ধ করিতে পারা যায়। ব্যোমযান কিছু পূর্ব্বে জর্ম্মাণ ব্যাটারির সংস্থান কোথায় তাহার সংবাদ দিয়াছে। একবিংশ পঞ্জাব রেজিমেণ্টের সেনাপতি আগুয়ান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কে তোমরা আমার সৈনিকেরা এই সাহসের কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিবে? শত্রু নিধন করিয়া জয় সম্মানের অধিকারী হইবে, এস, অগ্রসর হইয়া দাঁড়াও। কে তোমরা আমাদের রক্ষা করিয়া, ইংরাজ ফ্রেঞ্চ মিত্র-মণ্ডলীকে কৃতজ্ঞতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিবে, এস, দাঁড়াও,—আমার বীর সৈনিকেরা, আমাদের সাহায্যে অগ্রসর হও।"

প্রত্যেক দলের সেনানায়ক আপন আপন সৈন্যদলকে এইরূপে উত্তেজিত উৎসাহিত করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক দল হইতে দুইচারিজন সাহসী পুরুষ আসিয়া তাহাদের সেনানায়কের সম্মুখীন হইল। রণবীর আসিয়া দাঁড়াইল সর্ব্বাগ্রে। তাহার সেনাপতির সহিত, প্রভু টড সাহেবের সহিত মাঝে মাঝে ইতিপূর্ব্বে তাহার কয়েকবার দেখা হইয়াছে, কুচ করিবার সময়, রণে প্রবৃত্ত হইবার সময় সৈনিকশ্রেণীতে দাঁড়াইয়া কতবার সে তাঁহার দিকে চাহিয়া নীরবে অভিবাদন জানাইয়াছে, কিন্তু এত নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখের আহ্বান-বাণী সে ইতিপূর্ব্বে আর শুনে নাই।

রণবীর অগ্রসর হইয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইতেই কর্ণেল সাহেবও তাহাকে যেন এই প্রথম চিনিতে পারিলেন, উৎসাহিত কণ্ঠে কহিলেন,—"তুমি ট্যালিসম্যান! আমার brave follower, তুমি আছ এ-যুদ্ধে, আমার কোন ভয় নাই, আমাদের নিশ্চয় জয়।"

এক অপূর্ব্ব আনন্দে রণবীরের মনোপ্রাণ সহসা পূর্ণ হইয়া উঠিল। দেহ অপরিমিত দৈববলে যেন বলীয়ান বোধ হইতে লাগিল। জয়-সম্মানে ভূষিত হইলে কি ইহার অধিক আনন্দ, ইহার অধিক আত্মপ্রসাদ সে লাভ করিবে? রণবীর তাঁহার সাদর বাক্যের উত্তরে নীরব প্রফুল্ল হাস্যে পুনরায় সাহেবকে অভিবাদন করিল, ইহাই তাহার অন্তরের পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

(৭)

অসাধ্য সাধিত হইয়াছে, গোলন্দাজগণ নিহত, বন্দী; ব্যাটারি নীরব। কিন্তু যাহারা একার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক সৈনিকই জীবিত, আর কেহই প্রায় অনাহত নাই।

রণবীর যখন শেষ গোলন্দাজকে হত করিয়া রক্তাক্ত বায়নেট তাহার বক্ষ হইতে খুলিয়া লইল, তখন সহসা অস্ত্রখানা তাহার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। তুলিতে চেষ্টা করিয়া দেখিল তাহাতে সে অক্ষম, স্কন্ধমূল হইতে বাহুমূলে অসীম বেদনা, বস্ত্র বর্ম্ম ভেদ করিয়া রক্তপ্রবাহ ছুটিতেছে। তবুও বামহস্তে বায়নেট উঠাইয়া সে ধীর পদে অগ্রসর হইল। দুঃসাহসী বাহকদল ইতিমধ্যেই রণস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া নিহত, সংজ্ঞাহীন এবং চলৎশক্তি-

রহিত আহতদিগকে শিবিকার মধ্যে উঠাইয়া লইয়াছে, রণবীর তাহাদের পাশে পাশে চলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না, শিবিকা দ্রুত চলিয়া গেল।

তখন মধ্যাহ্ন, কিন্তু সূর্য্য কোথায় কোন্ গগনে লুকাইয়া আছেন কিছুই বুঝা যায় না। আকাশ মেঘে ঘোলা, রাস্তা জলে কাদা, রাত্রি হইতে টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে তাহার বিরাম যে কখন হইবে বা কবে,—কেহ বলিতে পারে না। জর্ম্মাণরা এ যাত্রা পরাজিত; ট্রেঞ্চও দূরে নয়; তবুও পথ নিরাপদ নহে, যে কোন মুহূর্ত্তে একজন জর্ম্মাণ ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বায়নেট বিদ্ধ করিতে পারে, দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতেও পারে। সে এখন অক্ষম,—ছুটিয়া পলাইতে পারিবে না বা যুদ্ধ করিতে পারিবে না। রণবীর কৌশলে বনপথে পড়িয়া কিছুক্ষণ একটা বৃক্ষতলে বসিল। আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেশের উজ্জ্বল সূর্য্যের মূর্ত্তি কল্পনা করিল। আর কি কখনো নিজের দেশের সেই মেঘশূন্য সূর্য্যচন্দ্র বিভাসিত নীলাম্বর সে দেখিবে? আর তাহার সেই সাধ্বী পত্নী—প্রাণাধিক পুত্র—কোথায় পড়িয়া রহিল তাহারা? একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আবার সে চলিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ট্রেঞ্চে পৌছান চাই।

প্রায় তাহাদের ট্রেঞ্চের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এই সময় এ কি দৃশ্য! একপদহীন টড সাহেব কোনরূপে আপনাকে বনমধ্যে টানিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন,—এখান হইতে কেমন করিয়া কি উপায়ে এখন ট্রেঞ্চে যাইবেন? তাঁহার দলের লোক কেহ ত তাঁহার সন্ধান জানে না। সহসা রণবীরকে দেখিয়া তিনি বিস্ময় আনন্দে অবাক হইয়া গেলেন। সত্যই যে সে তাঁহার ট্যালিসম্যান। রণবীরের ডান হস্তে বল নাই, তথাপি কি এক দৈবশক্তিতেই প্রণোদিত হইয়া সে যে এক হস্তের সাহায্যেই তাঁহাকে পিঠে চাপাইয়া লইয়া গুঁড়ি মারিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিষাক্ত গ্যাসে ফুসফুস এখনো পরিপূর্ণ—কষ্টে সে নিশ্বাস গ্রহণ করিতেছিল, দ্রাবানলে গণ্ডদেশের কিয়দংশ বিদগ্ধ বিকৃত, বাহুমূল হইতে রক্তধারা প্রবাহিত কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা তাহার মনেও পড়িতেছে না, তাহার একমাত্র ভাবনা, সে যদি টড সাহেবকে লইয়া হাসপাতালে পৌছিতে না পারে।

কিন্তু পৌছিল—সে পৌছিল। হাসপাতালের পাদদেশে আসিবা মাত্র, সেবকের দল যখন তাহার পৃষ্ঠ হইতে টড সাহেবকে নামাইয়া লইল তখনই সে ভূমে লুটাইয়া পড়িল; তাহার আগে নহে। টড সাহেব ভিতরে যাইবার পূর্ব্বে অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতায় দুইহাতে তাহার হাত ধরিলেন। রণবীরের কর্ত্তব্য সমাধা হইয়াছে, তাঁহার হাতে হাত রাখিয়া সংসারনির্লিপ্ত সেই হিন্দু বীর, ভগবদ্গীতার আদর্শ কর্ত্তব্যসাধক—আনন্দের হাসি হাসিয়া তখনি প্রাণত্যাগ করিল।

* * * *

কর্ণেল টড সাহেব আরোগ্য লাভ করিয়া ভি সি সম্মানে ভূষিত হইলেন। সম্রাট যখন স্বহস্তে এই ক্রস্ অলঙ্কার তাঁহার বক্ষে পরাইয়া দিলেন, তখন সাহেবের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা আনন্দাশ্রু বা শোকাশ্রু!

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

অন্ধকূপহত্যা

সে অনেক দিনের কথা,—প্রায় কুড়ি বৎসরের কথা। তখন "সাধনা" বন্ধ হইয়া গেলে, সিরাজদ্দৌলা-শীর্ষক প্রবন্ধগুলি মাসে মাসে "ভারতী"তে প্রকাশিত হইত। যে মাসে অন্ধকূপহত্যা-কাহিনীর সমালোচনা প্রকাশিত হইবার কথা, সেই মাসের লেখাটি ডাকঘরের গোলযোগে হারাইয়া যায়। নকল ছিল না; "ভারতী" প্রকাশিত হইবারও বড় বিলম্ব ছিল না। অগত্যা সে লেখাটিকে আবার তাড়াতাড়ি লিখিয়া পাঠাইতে হইয়াছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত "সিরাজদ্দৌলায়" তাহাই মুদ্রিত হইয়াছে।

তখন অন্ধকূপহত্যা-কাহিনী সম্বন্ধে তিনটি কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। (১) হলওয়েলের কাহিনীই অন্ধকূপহত্যার প্রধান কাহিনী,—সে কাহিনী বিশ্বাস করা কঠিন। (২) মিথ্যা হইলে কথাই নাই,—সত্য হইলেও, তাহার জন্য সিরাজদ্দৌলাকে অপরাধী করা যায় না। (৩) উত্তরকালে অন্ধকূপহত্যার প্রতিহিংসাসাধনের জন্য পলাসীর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে যে কাহিনী স্থানলাভ করিয়াছে, সমসাময়িক কাগজপত্রে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

যখন "ভারতী"তে এই লেখা বাহির হয়, তখন অন্ধকূপহত্যার স্মৃতিস্তম্ভটি বর্ত্তমান ছিল না;—১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাহা অপসারিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহার কথাও লিখিতে হইয়াছিল।

তাহার পর অনেক বৎসর চলিয়া গিয়াছে,—অনেক তথ্যানুসন্ধানের সূত্রপাত হইয়াছে,—গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগে ও ব্যয়-বাহুল্যে তিনখণ্ড বৃহৎ পুস্তকে * সমসাময়িক কাগজপত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, এবং লর্ড কর্জ্জনের বদান্যতায় অন্ধকূপহত্যার একটি স্মৃতিস্তম্ভও নির্ম্মিত হইয়াছে।

এত কালের পর আবার অন্ধকূপহত্যা কাহিনীর সত্যমিথ্যার আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। এবার শ্রীযুক্ত জে, এইচ, লিট্‌ল্ সাহেব ইংরাজীতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া † জানাইয়া দিয়াছেন,—"অন্ধকূপহত্যা-কাহিনী একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজী!"

ইহাতে আবার হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। সংবাদপত্রে অনেক সমালোচনা ও প্রতিবাদ প্রকাশিত হইতেছে, এবং কলিকাতা ঐতিহাসিক সমিতি একটি বিচার-সভায় ইহার আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া লিট্‌ল্ সাহেবকে ও তৎসঙ্গে আমাকেও আমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই বিচারসভার ব্যবস্থা নূতন যুগের নূতন ব্যবস্থা,—ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের সরল পথ অবলম্বন করিবার লালসা-বিজ্ঞাপক প্রশংসনীয় ব্যবস্থা।

সিরাজদ্দৌলা শীর্ষক প্রবন্ধে "ভারতী"তে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে

* Hill's Bengal in 1756-57.

† Bengal Past and Present Vol, XI.

দুইটি কথা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। সিরাজদ্দৌলার অপরাধ ছিল না,—প্রতিহিংসা-সাধনের জন্যও পলাসীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই,—এই দুইটি কথা যে সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার প্রধান প্রমাণ নূতন স্মৃতিস্তম্ভ। পুরাতন স্মৃতিস্তম্ভে যে ফলক-লিপি সংযুক্ত ছিল, তাহাতে এই দুইটি কথা উল্লিখিত ছিল। নূতন স্মৃতিস্তম্ভে যে ফলক-লিপি সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে এই দুইটি কথা স্থান লাভ করিতে পারে নাই।

ইহা ইতিহাসের পক্ষে অল্প লাভ নয়।



হলওয়েল

আরও একটি লাভের কথা এই যে, হলওয়েল পুরাতন স্মৃতিস্তম্ভে যাঁহাদিগের অন্ধকূপে নিহত হইবার কথা ক্ষোদিত করাইয়া গিয়াছিলেন, নূতন স্মৃতিস্তম্ভ-রচনার সময়ে তথ্যানুসন্ধানে জানা গিয়াছে,—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুর্গজয়ের পূর্ব্বে বা সমসময়ে দুর্গরক্ষার্থ প্রাণত্যাগ করেন,—তাঁহাদের পক্ষে অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইবার সময় ছিল না! সুতরাং হলওয়েলের মৃতের তালিকা যে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে, সে কথাও প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। হলওয়েল ঢাকার হত্যা-কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন,—তাহা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা, সমসাময়িক ইংরাজ-দরবার তদন্ত করিয়া, সরকারী রিপোর্টে সে কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এখন যাঁহারা অন্ধকূপহত্যা-কাহিনীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তাঁহারাও এক-বাক্যে বলিতেছেন,—"হল-ওয়েলের সকল কথা সত্য নহে।"

ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান এইরূপে ক্রমে ক্রমে অন্ধকূপ-হত্যা-কাহিনীর বিরোধী নানা কথা স্বীকার করিবার পর, শ্রীযুক্ত লিট্‌ল্ সাহেব তাহাকে শেষ ধাক্কা দিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ বঙ্গ-ভাষায় অনূদিত হইবার যোগ্য হইলেও কেহ এ

পর্য্যন্ত তাঁহার আলোচনামাত্রও করেন নাই।

শ্রীযুক্ত লিট্‌ল্ একটি নূতন কথা শুনাইয়াছেন। তিনি আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনার আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—যে-সকল ইংরাজ বীরপুরুষ দুর্গরক্ষার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া, ইংরাজের পরাজয়কেও বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, ইংরাজ লেখকগণ অন্ধকূপহত্যা-কাহিনী বিশ্বাস করিতে গিয়া, তাঁহাদিগের পুণ্য স্মৃতিকে অপমানিত করিতেছেন! ইহা অনুমান মাত্র হইলেও, ইহার অনুকূলে যে সকল কথা বলা যাইতে পারে, শ্রীযুক্ত লিট্‌ল্ তাহার উল্লেখ করিয়া, বিষয়টির পুনরালোচনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এতদিনের পর ইতিহাস ইংরাজ বীরপুরুষগণের আত্ম-বিসর্জ্জনের মহিমা-কীর্ত্তনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

এই ইংরাজ-লেখক অধুনা-প্রকাশিত সমস্ত কাগজপত্রের সহায়তায় যেরূপ নিপুণতার সঙ্গে বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত হইবার যোগ্য। হলওয়েলের করুণ কাহিনীকেই প্রধান অবলম্বন করিয়া, এই লেখক প্রচুর সমালোচনা-কৌশলে দেখাইয়া দিয়াছেন,—সে কাহিনী লৌকিক কাহিনী হইতে পারে না,—তাহা যে নিতান্ত রচা কথা, কাহিনীর মধ্যেই তাহার অনেক প্রমাণ প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। হলওয়েলের রচনাভঙ্গী ভুক্ত-ভোগীর অকৈতব রচনাভঙ্গী নহে,—তাহা আখ্যায়িকা-লেখকের সুকৌশল-বিন্যস্ত কৃত্রিম রচনাভঙ্গী। তাহার সাহায্যে কারাকক্ষের যে-সকল বর্ণনা লিখিত হইয়াছে, তাহাও অন্ধকার রজনীর যন্ত্রণাপূর্ণ কারা-কক্ষের বন্দীগণের নয়ন-গোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না!

অধুনা যে-সকল কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সাহায্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে,—অনেক ইংরাজ দুর্গ-জয়-কালে বীরের ন্যায় দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মৃত্যু-কাহিনী দুর্গবাসী অন্যান্য ইংরাজ সহযোগিগণ বিলাতে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। যাঁহারা এইরূপে দুর্গরক্ষার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তাঁহাদের নামও অন্ধকূপে নিহত ব্যক্তিগণের তালিকাভুক্ত করিয়া, হলওয়েল কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। এই তথ্য এত দিন অপ্রকাশিত ছিল; ইহা এখন হলওয়েলের কাহিনীকে আরও সংশয়পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

হত্যা-কাহিনী ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। কি উদ্দেশ্যে হলওয়েল এই কাহিনী-রচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, কি উদ্দেশ্যে এই কাহিনীর প্রতিবাদ করিবার জন্য সেকালের কেহ কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই, শ্রীযুক্ত লিট্‌ল্ তৎসম্বন্ধে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন।

অন্ধকূপহত্যা-কাহিনী ইউরোপীয়গণের মধ্যে প্রচারিত হইলেও, দেশের লোকে তাহার বিন্দু-বিসর্গ জানিত না। অন্য স্থানের লোকের কথা দূরে থাকুক, খাস কলিকাতার লোকেরাও তাহা জানিত না। চন্দননগরের ফরাসী ও হুগলীর ওলন্দাজ যাহা জানিয়াছিলেন, তাহাও স্বাধীনভাবে জানিতে পারেন নাই,—"হলওয়েল

কোম্পানীর" নিকট হইতেই তাঁহারা ইহার কথা অবগত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের কাগজপত্রে ইহার যাহা-কিছু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জানা কথা নহে, শোনা কথা;—আখ্যায়িকা-রচয়িতা হলওয়েলের নিকট হইতে শোনা কথা!

এই সকল কারণে, হলওয়েলের কাহিনীর সমালোচনা করিতে গিয়া হয় তাহাকে বিনা বিচারে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, না-হয় বিচার করিয়া সন্দেহপূর্ণ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাঁহারা এই কাহিনী এখনও গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী, তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন যে, —হলওয়েলের কাহিনী সর্ব্বাংশে সত্য হইতে পারে না। একজন স্পষ্টই লিখিয়াছেন,— "কলিকাতার দুর্গ-জয়কালে অনেকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল, ইহা সত্য কথা। যদি তাহারা অন্ধকূপ-কারাগারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, তবে হলওয়েলের কাহিনী সর্ব্বাংশে সত্য না হইলেও, একেবারে মিথ্যা হইতে পারে না।" এখন ইতিহাসের সকল তর্ক এই "যদির" উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

ভ্রষ্টযাত্রা

সারাটা দিন গেল আমার হেলাফেলাতে,
আর কি এখন জম্‌বে পাড়ি সাঁঝের বেলাতে!
রোদ যা' ছিল গেছে সরে'
বাতাস কখন্ গেল মরে'
বনের আঁখি পড়্‌ছে ঢুলে' ঝাউয়ের শাখাতে—
তন্দ্রা নামে সন্ধ্যাপাখীর কাজল-পাখাতে!

প্রভাত যবে চাইল মুখে আবির ছড়িয়ে
পরশটি তার তপ্ত বুকে ধর্‌ল জড়িয়ে;
ছায়ালোকের আবেশ-পাশে
হৃদয় আমার হারিয়ে হাসে—
চম্‌কে দেখি, কখন বেলা বাড়্‌ল গগনে,
বন্ধ হ'ল যাত্রা আমার উষার লগনে।

দুপুর ধরে' ভাব্‌ছি বসে'—যাব এবারে,
আম্র-মুকুল নেশার মত ঘিরল দুধারে ;
পতঙ্গদের গুঞ্জরণে
গন্ধ ঘুমায় কুঞ্জবনে,
আঁখির পাতা আপ্‌নি কখন্ পড়্‌ল এলিয়ে
ভুলিয়ে দিল স্বপ্নাবেশের পরশ বুলিয়ে।

চাইনু জেগে—সূর্য্য তখন গড়িয়ে গিয়েছে,
নদীর পারে আঁধার তাহার আসন নিয়েছে ;
সর্ষে-ক্ষেতের হল্‌দে গায়ে
সোনার আলো যায় মিলায়ে,
হাঁসের মালা কাতার দিয়ে উড়ছে ওপারে,
নৌকা আমার দুল্‌ছে ধীরে সন্ধ্যা-আঁধারে।

সারাটা দিন কাট্‌ল যাহার এম্‌নি হেলাতে,
তবু তারে বলিস্ যেতে কাজের খেলাতে !
অন্ধকারে বাব্‌লা-বনে
কাঁটার কথাই জাগ্‌ছে মনে,
হায়রে, কোথায় পার সে পাবে রাত্রি-বেলাতে
একটিমাত্র যাত্রা যে তার মৃত্যু-ভেলাতে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

ছন্নছাড়া

(অনুবাদ)

একদিন আমাদের বাড়ি মেলাই লোক এল। ব্যাটাছেলেদের দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন সব গির্জ্জেয় এসেছে—আর মেয়েরা কেমন গম্ভীর হয়ে বুকের উপর ক্রুশের মতো করে হাত রাখছিল।

আমি এদিক-ওদিক চেয়ে ফুস্ করে একবার মায়ের ঘরে ঢুকে পড়লুম। অবাক হয়ে দেখি মায়ের বিছানার পাশে একটা প্রকাণ্ড মোমের বাতি জ্বলছে। মায়ের পাস্তলার রেলিঙের উপর ঝুঁকে বাবা এক-

দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন। মা ঘুমুচ্ছেন। হাত দুটি তাঁর বুকের উপর পড়ে আছে—একটির উপর আর-একটি।

আমাদের পাড়ার কোলা-গিন্নি সমস্ত দিন আমাদের আগ্‌লে রইলেন। মেয়েরা যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল কোলা-গিন্নি বল্লেন—"না আজকের দিনে আদর-করা, চুমু-খাওয়া চলবে না; রোগ যে খারাপ!" মেয়েরা আমাদের দিকে চাইলে আর রুমালে চোখ-নাক মুছলে। কোলা-গিন্নি বল্লেন—"এ অসুখে লোকের আর দয়ামায়া থাকে না!"

দিন-কয়েক পরেই আমরা একটা-করে নতুন পোষাক পেলুম,—বড় বড় সাদা-কালোর ঢ্যারা-কাটা।

কোলা-গিন্নি আমাদের নিজের হাতে খাওয়াতেন; তার পর খাইয়ে-দাইয়ে মাঠে খেলতে পাঠাতেন। আমার দিদি তখন মস্ত মেয়ে;—সে বেড়া টপ্‌কায়, গাছে ওঠে, পুকুর তোলপাড় করে। সমস্ত দিন এই করে দিদি রাত হলে বাড়ি ফিরত। পকেটে যে কত-রকমের পোকা-মাকড় আর বিদ্‌কুটে জানোয়ার সব নিয়ে আসত তার ঠিক নেই। সেগুলোর চেহারা দেখে আমার গা কাঁপত।

মাগো, আমি চক্ষে দেখতে পারতুম না ঐ কেঁচোগুলোকে! তাদের ঐ লাল-লাল রবরের দড়ির মত চেহারা দেখলেই আমার আতঙ্ক আসত। একবার মাড়িয়ে ফেল্লে আর রক্ষে ছিল না,—সমস্ত দিনটা শরীর-মন কেমন বিশ্রী হয়ে থাকত। আমার বুকে একবার বেদনা হতে কোলা-গিন্নি দিদিকে বল্লেন—দেখো, এখন আর খেলতে যেয়োনা, বোনটির কাছে থাক।" সমস্ত দিন ঘরের মধ্যে আটকা থাকতে দিদি পারবে কেন? সে তার ভালো লাগত না। তার ইচ্ছে হত আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বাইরে বেশ হুটোপাটি করে বেড়ায়। তাই সে করত কি—বাইরে থেকে কেঁচো কুড়িয়ে এনে আমার মুখের সামনে ধরত। বাপরে! আমি কোলা-গিন্নিকে তখনই বল্লুম, আমার বুকের বেদনা সেরে গেছে। অমনি আমরা বাইরে যাবার হুকুম পেলুম। একদিন দিদি একরাশ কেঁচো আমার গায়ের উপর ছুঁড়ে দিয়েছিল, আমি ভয়ে তাড়াতাড়ি যেই পিছিয়েছি অমনি এক টব গরম জলে পড়ে গেলুম। আমার ভিজে কাপড় ছাড়াতে ছাড়াতে কোলা-গিন্নি দিদির দিকে চোখ-রাঙিয়ে বল্লেন—"রোসো-না তোমায় দেখাচ্ছি মজা!" এই বলে, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তিন জন চিম্‌নি-সাফ-করা লোক, তাদের ডেকে বল্লেন—নিয়ে যা ত এই মেয়েটাকে ধরে। তারা তিন জন দড়ি-দড়া আর থলি নিয়ে ঘরের মধ্যে হাজির হল। দিদি তাদের দেখে চীৎকার করে উঠল; "পায়ে পড়ি আর করব না!"—বলে কাঁদতে লাগল। গায়ে আমার একটিও কাপড় ছিল না, আমার এমন লজ্জা করতে লাগল!...

(২)

বাবা আমাদের সঙ্গে করে এক-জায়গায় নিয়ে যেতেন—সেখানে বসে লোকেরা মদ খায়। টেবিলের উপর একরাশ গেলাসের মধ্যিখানে আমাকে বসিয়ে দিয়ে তিনি বলতেন—খুকী গান গা! লোকেরা সবাই খুব হাসত, আমায় চুমু খেত আর আমার মুখের সামনে মদের গ্লাস ধরত। আমরা

যখন বাড়ি ফিরতুম তখন বেশ অন্ধকার হয়ে আসত। বাবা লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলতেন এবং এদিক-ওদিক করে টলতেন। কত-বার যে রাস্তার উপর টাউরে পড়তেন তার ঠিক নেই। কখনো কখনো তিনি ছেলেমানুষের মত কাঁদতে আরম্ভ করতেন; বলতেন, আমাদের বাড়ীটা কে চুরি করে নিয়ে গেছে! দিদি অমনি ভয়ে ডাক-ছেড়ে কেঁদে উঠত; তার পর কিন্তু সে-ই বাড়ী খুঁজে বার করত। একদিন কোলা-গিন্নি আমাদের উপর রাগ করে বলতে লাগলেন—"হতভাগীরা, যা, তোদের আমি আর খাওয়াতে পারব না। তোদের বাপ যেখানে মরতে গেছে সেইখানে যা!" বাবা যে কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়েছিলেন তা কেউ জানত না। তার পর যখন রাগ পড়ে গেল তখন কোলা-গিন্নি আমাদের ডেকে আবার খেতে দিলেন। কিন্তু এর দু-চার দিন পরেই, একটা বোঝাই গোরুর গাড়ির উপর আমাদের চাপিয়ে দেওয়া হল। গাড়িটা খড় আর ধানের বস্তায় ঠাসা! দুটো বস্তার একটু-খানি ফাঁকের মধ্যে আমাকে বসিয়ে দিলে। গাড়ীটা চলবার মুখেই পিছন দিকে কাৎ হয়ে পড়ল আর রাস্তার প্রত্যেক ঝাঁকানিতে আমি খড়ের গাদার উপর হুমড়ি-খেয়ে পড়তে লাগলুম।

সমস্ত পথটা ভয়ে আমার বুক ধুক্‌ধুক্ করছিল। এক-একবার যেমন পিছলে পড়ি আর অমনি মনে হয় বুঝি গাড়ি থেকে ছিটকে পড়লুম, বুঝি-বা ধানের বস্তাগুলো হুড়মুড় করে ঘাড়ে এসে পড়ল! একটা সরাইখানার সামনে গাড়ি থামল। একজন মেয়েমানুষ এসে গাড়ি থেকে আমাদের তুলে নিলেন, গা থেকে খড়ের কুটিগুলো ঝেড়ে দিলেন এবং আমাদের একটু-করে দুধ খেতে দিলেন। শুনলুম তিনি গাড়োয়ান সিকঁকে জিজ্ঞাসা করছেন —"এদের বাপ কি খোঁজ খবর রাখে?" সিকঁ মাথা নাড়লে; তার তামাক খাবার পাইপটা একবার টেবিলের গায়ে ঠুকে নিলে; তার পর মজার-রকমের মুখ করে বল্লে—"কে জানে সে কোথায়! জেরার্দ-ছোকরা তো বলছিল পারির পথে তাকে দেখেছে।" খানিকক্ষণ পরে সিকঁ একটা প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে আমাদের নিয়ে এল —রাস্তা থেকে লম্বা-লম্বা সব সিঁড়িয় ধাপ দরজায় গিয়ে উঠেছে। একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে কথা কইতে লাগল। ভদ্রলোকটি হাত নেড়ে নেড়ে পরিশ্রমের মর্য্যাদা নিয়ে অনেক কথা বল্লেন। সে যে মাথামুণ্ড কি তা জানি না! ভদ্রলোকটি আমার মাথায় হাত দিয়ে ধীরে ধীরে চাপড়াতে লাগলেন, থেকে থেকে বলতে লাগলেন—"কই, সে তো কখনো বলে নি তার মেয়ে আছে!" আমি বুঝলুম আমার বাবার কথাই হচ্ছে। আমি বাবাকে দেখতে চাইলুম। তিনি কোনো জবাব করলেন না, শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন; সিকঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এর বয়স কত?" সিকঁ বল্লে—"বছর-পাঁচেক হবে।" এতক্ষণ দিদি একটা বিড়াল-ছানার সঙ্গে সিঁড়ির উপর-নীচে-করে দৌড়াদৌড়ি করছিল। আমরা আবার গাড়িতে গিয়ে উঠলুম, আবার কোলা-গিন্নির কাছে ফিরে গেলুম। তিনি আমাদের উপর বিরক্ত হয়ে

ছিলেন এবং কেবলই আমাদের সরিয়ে দেবার মতলব করতেন। অল্প দিন পরেই তিনি আমাদের ষ্টেশনে নিয়ে গেলেন; সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা আমরা একটা প্রকাণ্ড বাড়ীতে গিয়ে উঠলুম—সেখানে দেখি অনেক ছোট ছোট মেয়ে।

সিস্‌টর গাব্রিয়েল তৎক্ষণাৎ আমাদের তফাৎ করে দিলেন। তিনি বল্লেন,—"দিদি বড় হয়েছে, সে মাঝারি মেয়েদের সঙ্গে থাকবে আর আমি ছোটদের সঙ্গে।" সিস্‌টর গাব্রিয়েল দেখতে ছোট্টটি, রোগা, বুড়ি থুড়থুড়ি; একেবারে বেঁকে পড়েছেন। শোবার ঘর আর খাবার ঘরের ভার তাঁর উপর ছিল। একটি হল্‌দে-রঙের প্রকাণ্ড ভাঁড়ে তিনি কাঁচা-সবজীর চাট্‌নি তৈরি করতেন। জামার আস্তিনটা কাঁধ পর্য্যন্ত তুলে দিয়ে চাটনির ভিতর তিনি হাত দিতেন আর তুলতেন। তাঁর হাত ছিল কালো—ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া। সেই হাত যখন চাট্‌নির ভাঁড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসত তখন তার রং চক্‌চক্ করত—তা থেকে রস ঝরতে থাকত। তাই দেখে আমার মনে হত ঠিক যেন বৃষ্টির সময়কার গাছের শুকনো ডাল!

(৩)

মুহূর্ত্তের মধ্যে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। সে লাফাতে লাফাতে আমার কাছে এসে দাঁড়াল—ভারি বাচাল! আমি যে বেঞ্চিটাতে বসেছিলুম তার চেয়ে মাথায় সে বড় নয়। আমার হাঁটুর উপর তার কনুই-দুটো রেখে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—"চুপটি করে বসে আছ কেন? খেলা করবে না?" আমি বল্লুম, "আমার বুকে যে ব্যথা!" সে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বল্লে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ! শুনেছি তোমার মায়ের ক্ষয়রোগ ছিল বটে! সিস্‌টর গাব্রিয়েল বলছিলেন, তুমি বেশি দিন বাঁচবে না।" সে বেঞ্চির উপর উঠে, নিজের ছোট পা দুখানি মুড়ে আমার পাশটিতে বসল। তার পর আমার নাম জিজ্ঞাসা করলে। সে বল্লে তার নাম ইস্‌মেরি, আমার চেয়ে সে বড়। ডাক্তারে বলেচে সে আর বাড়বে না; ঐ যিনি আমাদের ক্লাসে পড়ান তাঁর নাম মারি এমে! উনি ভারি কড়া;—একটু কথা কইলেই সাজা দেন। হঠাৎ দেখি সে বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে পড়ল, চীৎকার করে উঠল—"ওগিস্তিন্!" তার গলার স্বর যেন ছেলেদের গলার মতন; পা দুটো একেবারে বাঁকা! তার পর খেলাধূলার সময় যখন শেষ হয়ে এল তখন দেখি সে ওগিস্তিনের পিঠে চড়েছে; ওগিস্তিন্ তাকে কেবলই এক কাঁধ থেকে আর-এক কাঁধে ঘোরাচ্ছে—যেন তাকে ফেলে দেবে। আমার সামনে দিয়ে যাবার সময় ইস্‌মেরি তার মোটা গলায় বল্লে—"তোমাকেও এমনি করে আমায় কাঁধে করতে হবে —বুঝলে?" ওগিস্তিনের সঙ্গেও আমার খুব ভাব হয়ে গেল।

(৪)

আমার চোখ ভালো ছিল না; রোজ রাত্রে চোখ এঁটে যেত, না ধুইয়ে দিলে চাইতে পারতুম না;—কাণা হয়ে থাকতুম। ওগিস্তিনের উপর ভার ছিল রোজ ভোরে শোবার ঘর থেকে হাঁসপাতাল ঘরে আমায় নিয়ে যাবে। ঘরে ঢোকবার আগেই আমি তার পায়ের

শব্দ শুনতে পেতুম। সে আমার হাত ধরে ঘর থেকে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে যেত —খাটের গায়ে যে আমার কেবলই ধাক্কা লাগত তা সে গ্রাহ্যই করত না। আমরা ঝড়ের মত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যেতুম—পড়ি কি মরি! সিঁড়ির সব ধাপগুলোর উপর আমার পা পড়ত না। যখন ওগিস্তিন্ আমায় সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনত তখন মনে হত যেন একটা কুয়োর ভিতর গড়িয়ে পড়ছি। তার হাতে খুব জোর ছিল, সে আমাকে বেশ শক্ত করেই ধরত। হাঁসপাতাল যাবার পথে উপাসনার ঘর, তার সামনে একটা ছোট্ট সাদা বাড়ি। একদিন আমি হুঁচোট খেয়ে পড়ে গেলুম; ওগিস্তিন্ তাড়াতাড়ি আমায় টেনে তুলেই মাথায় একটা থাবড়া দিয়ে বল্লে—"চ, চ! এখানে কবর-ঘর!" সেই থেকে তার ভয় হত পাছে আমি আবার পড়ে যাই; কবর-ঘরের সামনে এলেই সে আমায় সাবধান করে দিত। তার এই ভয় দেখে আমারও কেমন ভয়-ভয় করত। অমন করে উর্দ্ধশ্বাসে যখন সে ছুটে পালায় তখন নিশ্চয় একটা ভয় আছে। হাঁসপাতালে গিয়ে যখন উঠতুম তখন আমার রীতিমত হাঁপ ধরত। কে-একজন এসে আমায় চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে চোখ ধুইয়ে দিত। ওগিস্তিনই সঙ্গে করে আমাকে পড়বার ঘরে মারি এমের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকেই সে ভয়ে-ভয়ে আমতা-আমতা করে বল্লে —"এই একটি নতুন মেয়ে এসেছে।" আমারও কেমন ভয় করতে লাগল, মনে হল বুঝি তিনি আমাকে খুব ধমকাবেন কি মারবেন! কিন্তু তা নয়। মারি এমে আমার দিকে হাসিমুখে চাইলেন—আমাকে আদর করে বার বার চুমু খেতে লাগলেন, বল্লেন—"তুমি যে নেহাৎ ছোট, বেঞ্চিতে তো বসতে পারবে না, এস এইখানে বোসো!" বলে তাঁর ডেস্কের তলায় একটি ছোটো টুলের উপর আমায় বসিয়ে দিলেন। জায়গাটি এমন আরামের! তাঁর পশমী ঘাগরার কোমল স্পর্শ এবং তার গরমটুকু আমার গায়ে এসে লাগত—তাতে সকাল-বেলাকার সেই ছুটোছুটি ও পড়ে-যাওয়ার সব বেদনা জুড়িয়ে যেত। প্রায়ই দুখানি পা দুধার থেকে আমায় চেপে ধরত; সেই দুটি পায়ের উপর আমি ঠেসান দিতুম। মধ্যে মধ্যে একখানি কোমল হাতের স্পর্শ উপর থেকে আমার মাথায় এসে লাগত—সেই নরম হাতের চাপড়ানি আর বালিসের গরম পেয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়তুম। জেগে উঠে দেখতুম বালিসটা টেবিল হয়ে গেছে আর তারই উপরে সেই হাতখানি থেকে কেকের টুকরো, মিছরির টুকরো এবং কখনো কখনো মিষ্টি খাবার এসে পড়চে। চারিদিকেই গোলমাল! কেউ কাঁদতে কাঁদতে বলছে—"না দিদি, আমি করিনি!" আর-একজন অমনি সরু বাঁশির সুরে ফুকরে উঠছে—"হাঁ দিদি, ঐ করেছে!" এই গোলমালের মধ্যে আমার মাথার উপর থেকে শুনতুম একটি স্নেহ-মাখা স্বর—"চুপ! চুপ!" তার পরেই ডেস্কের উপর রুলের ঘা পড়ত—সেই শব্দ ডেস্কের তলায় আমার কাছে গম্‌গম্ করে উঠত। কখনো কখনো আমার টুল থেকে সেই পা দুখানি সরে যেত—হাঁটু দুটি এক হয়ে

আসত, চেয়ারখানা হটে যেত আর আমার সেই ছোট্ট নীড়টিতে মাথার কাপড়ের দুটি কোণ এসে ঠেকত; সঙ্গে সঙ্গে একখানি হাসিমাখা মুখ দেখতে পেতুম—ভিতর থেকে মুক্তোর মতো দাঁতগুলি চিক্ চিক্ করতে থাকত। সব-শেষে দেখতে পেতুম দুটি স্নিগ্ধ চোখ, মনে হত সেই চোখদুটি যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে আদর ঢেলে দিচ্চে, আমার মনে আর এতটুকুও অসোয়াস্তি থাকত না।

(৫)

আমার চোখের অসুখ সেরে যেতে কেক ও মেঠাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে হাতে একখানা বর্ণপরিচয় পেলুম। বইখানি ছোট—কথার পাশে পাশে ছবি দেওয়া। একটা বড় জাতের ষ্ট্রবেরি ফল আঁকা ছিল; সেইটে দেখতে আমার ভারি ভালো লাগত—তার দিকে আমি প্রায়ই চেয়ে থাকতুম;—দেখতে দেখতে, একখানা গোল-পাঁউরুটি যত-বড় সেটাকে আমার তত-বড় বলে মনে হত। পড়বার ঘরে যখন তেমন ঠাণ্ডা বোধ হত না তখন মারি এমে আমাকে বেঞ্চির উপর বসিয়ে দিতেন—ইস্‌মেরি ও মারি রেনো এই দুজনের মধ্যিখানে। শোবার ঘরেও এরা দুজনে আমার দু-পাশের দুই বিছানায় শুত। মধ্যে মধ্যে মারি এমে আমার সেই ছোট্ট নীড়টিতে আমায় নিয়ে যেতেন—সেখানটা আমার ভারি ভালো লাগত। ছবির বই পেতুম—তাই দেখতে দেখতে সময় যে কোথা দিয়ে চলে যেত জানতেও পারতুম না।

একদিন সকালে ইস্‌মেরি আমাকে এক-কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বল্লে—"মারি এমে আর আমাদের পড়াবেন না—তিনি সিস্‌টর গাব্রিয়েলের বদলে খাবার-ঘর আর শোবার-ঘরের তদারক কর্ব্বেন।" এ কথা সে কার কাছে শুনেছে-তা বল্লে না, শুধু বল্লে—"এ বড় খারাপ হল কিন্তু।" সে গাব্রিয়েলকে বড় ভালোবাসত—গাব্রিয়েল তাকে খুকীর মতো করে আদর-যত্ন করতেন কি না! সে দুচক্ষে দেখতে পারত না—"ঐ মারি এমেটাকে!" মারি এমেকে সে ঐ-রকম করেই সম্বোধন করত—অবশ্য আমরা-ছাড়া যখন আর-কেউ সেখানে থাকত না! সে বলত, মারি এমে তাকে কারুর পিঠে চড়তে দেয় না, আর গাব্রিয়েলের সঙ্গে যেমন ফষ্টিনাষ্টি হয় মারি এমের সঙ্গে তা চলবে না। গাব্রিয়েল সিঁড়ি-ওঠবার সময় রেলিঙের দিকে মুখ-করে এঁকে-বেঁকে উঠতেন—তাই নিয়ে মেয়েদের মধ্যে ভারি মজা হত। মারি এমে এমনধারা বেয়াদবী তো সহ্য করবেন না!

সন্ধ্যার সময়, উপাসনার পর সিষ্টর গাব্রিয়েল আমাদের বল্লেন, তিনি চলে যাচ্ছেন। আমাদের সকলকে তিনি চুমু খেলেন—সব-চেয়ে ছোট থেকে আরম্ভ করে। আমরা ভয়ানক গোল করতে-করতে সিঁড়ি দিয়ে শোবার ঘরে উঠে যেতে লাগলুম। বড়-মেয়েরা ফিস্-ফিস্ করে বলতে লাগল, মারি এমের কাছে আমরা কিছুতেই থাকব না! ছোটো মেয়েরা তো কান্না জুড়ে দিলে—যেন কি একটা বিপদ এসেছে। ইস্‌মেরিকে আমি পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছিলুম—সে তো চেঁচিয়েই কাঁদছিল। তার সরু সরু আঙুলগুলো আমার টুঁটির উপর জোরে চেপে বসেছিল—আর তার

চোখের জল আমার ঘাড়ের উপর টস্‌টস্‌ করে পড়ছিল। সিস্‌টর গাব্রিয়েলও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঠুক্‌-ঠুক্‌ করে সিঁড়ি উঠছিলেন, কিন্তু তাই নিয়ে সেদিন ঠাট্টা করবার কথা কারও মনেও ওঠে নি। তিনি কেবলই বলছিলেন—"আরে চুপ কর! চুপ কর!" কিন্তু গোল তাতে কমছিল না। শোবার-ঘরের দাসীর চোখেও জল দেখলুম। সে কাপড় ছাড়াতে-ছাড়াতে আমার গায়ে একটা নাড়া দিয়ে বল্লে—"তোমার মারি এমেকে পেয়ে তুমি খুব খুসি, না!" তাকে আমরা "বন্‌ এস্‌তার" বলে ডাকতুম। তিনজন দাসীর মধ্যে তাকেই আমার সব-চেয়ে ভালো লাগত। সময় সময় সে উগ্রমূর্ত্তি ধরত বটে কিন্তু সে আমাদের ভালোবাসত। রাত্রিবেলা আমার কাশি হলে সে উঠে এসে মিছরির টুকরো আমার মুখে দিত; আর আমার বেশী শীত লাগলে, নিজের বিছানাটিতে নিয়ে গিয়ে আমায় গরম করে রাখত।

(৬)

পরদিন সকালে আমরা সবাই গম্ভীর ভাবে খাবার ঘরে গেলুম—টুঁ শব্দটি নয়। দাসীরা বল্লে, বোসোনা কেউ, দাঁড়িয়ে থাক সব। কয়েকজন বড় মেয়ে বুক-ফুলিয়ে সটান সোজা-হয়ে দাঁড়িয়েছিল—যেন মস্ত-কেউ! বন্‌ জিস্তিন্‌ টেবিলের এক-কিনারায় মাথাটি নীচু করে দাঁড়িয়েছিল—মুখখানি তার ম্লান! বন্‌ নেরঁ—ঠিক যেন পাহারা-ওয়ালা—ঘরের মধ্যে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে সে ঘড়ির দিকে চাচ্ছিল আর একটা বিরক্তির সঙ্গে কাঁধটা কোঁচকাচ্ছিল। দরজা ঠেলে মারি এমে প্রবেশ করলেন। দরজা খোলাই পড়ে রইল। তাঁর ঘাগরার উপর সাদা কাপড়ের ঢাকা, আর জামার সাদা হাতা দেখে তাঁকে যেন আরও লম্বা বোধ হতে লাগল। আমাদের সবাইয়ের দিকে চাইতে চাইতে তিনি এক-পা এক-পা করে এগতে লাগলেন; তাঁর বুকের উপরে জপের মালা;—সেটা টুক্‌টুক্‌ টুক্‌টুক্‌ করে শব্দ করতে লাগল; তাঁর চলার সঙ্গে সঙ্গে ঘাগরার কিনারাগুলি দুলে-দুলে উঠছিল। তিনটে ধাপ উঠে তিনি ডেস্কে গিয়ে বসলেন—এবং আমাদের সবাইকে বসতে ইসারা করলেন। বৈকালে তাঁর সঙ্গে আমরা গ্রামের মধ্যে বেড়াতে গেলুম। সে দিন বেশ গরম। একটি ছোট পাহাড়ের উপর আমি তাঁর পাশটিতে গিয়ে বসলুম। তিনি একখানি বই-হাতে পড়তে বসলেন এবং মেয়েরা নীচে একটা মাঠে খেলা করছিল সে-দিকে নজর রাখতে লাগলেন। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল—তিনি তাই দেখছিলেন; আর মাঝে মাঝে বলে উঠছিলেন—"কি চমৎকার! কি সুন্দর!"

সে দিন সন্ধ্যাবেলা দেখলুম শোবার ঘরে সিস্‌টর গাব্রিয়েল যে বার্চ্চ-গাছটি রেখেছিলেন সেটি উঠিয়ে রাখা হয়েছে, আর খাবার ঘরে দুখানা বড় কাঠের চামচ দিয়ে চাটনি মাখা হচ্ছে—বদলের মধ্যে এই হল। ন'টা থেকে বারোটা পর্য্যন্ত আমরা ক্লাসে থাকতুম, তার পর বিকেলে আমাদের বাদাম ভাঙতে হত। এই বাদাম একজন তেলি এসে কিনে নিয়ে যেত। বড় বড় মেয়েরা হাতুড়ি দিয়ে বাদামগুলো

ফাটিয়ে ফেলত আর আমরা খোলা ছাড়াতুম। বাদাম খাওয়া আমাদের মানা ছিল। লুকিয়ে-চুরিয়ে খাবারও যো ছিল না; খেলেই মেয়েদের মধ্যে কেউ-না-কেউ অমনি বলে দিত;—কারণ তাদেরও খাবার লোভ ছিল এবং কেউ খাচ্ছে দেখলে তাদের হিংসা হবার কথা। এস্‌তার মধ্যে মধ্যে এসে আমাদের মুখ খুলে দেখত আর পেটুক মেয়েদের দিকে চোখ-পাকিয়ে মাঝে মাঝে বলত—"আমি দেখচি সব! দেখচি সব!" আমাদের কাউকে কাউকে সে বিশ্বাস করত। "দেখি, মুখ দেখি!"—বলে সে কখনো কখনো আমাদেরও হাঁ করতে বলত; যেন কতই পাহারা দিচ্ছে এম্নি ভাব দেখাত। আমরা হাঁ করে থাকতুম। সে বলত—"ঠোঁট বোজ, ময়না!" বলে হাসতে থাকত।

বাদাম খাবার এমনি লোভ হত আমার! কিন্তু এস্‌তারের জন্য পারতুম না; তাকে ঠকাবো—একথা ভাবতেও লজ্জা হত—সে যে আমায় বিশ্বাস করে! কিন্তু কিছু দিন পরে লোভ আমার এমনি বেড়ে উঠল যে এসব লজ্জাসরমও রইল না। প্রতিদিনই আমি খালি সুযোগ খুঁজতুম কেমন করে সবাইয়ের চোখে ধুলো দিয়ে বাদাম খাবো—ধরা পড়ব না। কখনো কখনো দু-চারটে বাদাম নিয়ে জামার হাতার ভিতর ফেলে দিতুম; কিন্তু আমি এমনি অলবড্ডে যে সেগুলো ঠিক করে রাখতে পারতুম না, টপ্‌ টপ্‌ করে পড়ে যেত। তা ছাড়া ঐ দু-চারটে বাদাম নিয়ে আমার হবে কি?—আমার ইচ্ছে হত এক-গাদা বাদাম খাই—এক বস্তা! একদিন কয়েকটা হাতিয়ে

ছিলুম। সেদিন এস্‌তার আমাদের শুইয়ে দিতে যাবার সময় একটা বাদামের খোলায় পা-হড়কে পড়ে গেল—হাতে ছিল আলো, সেটা ছিট্‌কে পড়ে নিভে গেল; আমি অমনি, সেই অন্ধকারে, সামনের একটা বাটি-থেকে একমুঠো বাদাম নিয়ে পকেটে পূরে ফেল্লুম। সকলে যখন শুয়েছে, পকেট থেকে বাদামগুলো বার করলুম; চাদরে মুখটা ঢেকে সেগুলো মুখের মধ্যে ঠেসে দিলুম। মনে হতে লাগল ঘরে যত লোক শুয়ে আছে সবাই আমার চোয়াল-নাড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে! আমি যতদূর পারি একটু-একটু-করে আস্তে-আস্তে চিবুতে লাগলুম কিন্তু তবুও তার শব্দ আমার কানের কাছে মুগুরের ঘায়ের মত ধপ্‌ ধপ্‌ করতে লাগল।

এস্‌তার উঠল, বাতি জ্বাললে; তার পর সবাইয়ের বিছানার কাছে কাছে গিয়ে দেখতে লাগল। আমার কাছে যখন এল তখন আমার হৃৎকম্প উপস্থিত! সে চুপি-চুপি একবার বল্লে—"তুমি এখনও ঘুমোও নি!" তার পর বিছানা দেখতে-দেখতে চলে গেল। ঘরের একেবারে কিনারায় গিয়ে দরজাটা সে একবার খুললে, আবার বন্ধ করলে। তারপর এসে আলো নিভিয়ে শুয়েছে মাত্র আর অমনি খট্‌ করে দরজায় একটা শব্দ হল—মনে হল কে যেন দরজা খুল্লে! এস্‌তার আবার আলো জ্বাললে; এদিক-ওদিক চেয়ে বল্লে—"দরজা খুল্লে কে? বেড়ালে তো হাণ্ডিল ঘুরিয়ে দরজা খুলতে পারে না!" তার কথার সুরে মনে হল সে ভয় পেয়েছে। আমি শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলুম সে বিছানায় উস্‌খুস্‌ করছে। হঠাৎ

সে চীৎকার করে উঠল—"বাবারে!" ইস্‌মেরি. বলে উঠল—"কি হয়েছে, কি হয়েছে?" এস্‌তার বল্লে—"কার একখানা হাত এসে দরজা খুল্লে!—আমার মুখে কার নিশ্বাসের হাওয়া লাগল!" সেই আলো-আঁধার;—তার মধ্যে দেখলুম সত্যি দরজাটা একটু খোলা রয়েছে। আমার সর্ব্বশরীর শিউরে উঠল। আমার মনে হতে লাগল যেন ঘরের মধ্যে সেই অন্ধকারে একটা বিকট দৈত্য এসেছে—আমায় ধরে নিয়ে যাবে! আমি কাঠ হয়ে পড়ে রইলুম। অনেকক্ষণ কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। এস্‌তারের বিছানার কাছেই বাতিটা জ্বলছিল; সে উঠল না, সে বল্লে—"ওগো, তোমরা কেউ উঠে আলোটা নিভিয়ে দাও না!" কেউ কোনো সাড়া দিলে না। তখন সে আমাকে ডাকলে। আমি উঠলুম। সে বল্লে— "তোমার মতো লক্ষ্মী-মেয়েকে ভূতেরা কিছু বলে না!" আমি দেখি সে সর্ব্বাঙ্গে মুড়ি দিয়েছে। আলো নিভিয়ে দিলুম। যেমন অন্ধকার হওয়া অমনি আমার চোখের সামনে হাজার-হাজার আগুনের ফুল্‌কি কিল্‌বিল্‌ করতে লাগল! আর রক্ষা নেই! দৈত্য-দানারা সব এসে পড়েছে! ঐ তাদের নিশ্বাসের আগুন! তাদের লম্বা-লম্বা ধারালো নখের আঁচড় আমার পায়ে এসে লাগতে লাগল;—আমার চারিদিকে আগুনের ঝলকা! কেমন মনে হতে লাগল আর দাঁড়াতে পারছি না—বসে পড়ি। যখন বিছানায় গিয়ে উঠলুম তখন ভাবছি—যাঃ পা-দুখানা আর নেই—নিশ্চয় কেটে নিয়ে গেছে! সাহস হল না হাত দিয়ে দেখি। অনেকক্ষণ পরে যখন বুক-ঠুকে হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিলুম তখন দেখি পা একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা। পা-দুখানাকে হাত দিয়ে আঁকড়ে পড়ে রইলুম; থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালবেলা উঠে দেখা গেল বেড়ালটা দরজার পাশে এক বিছানায় শুয়ে আছে,—রাত্রে সে বাচ্ছা পেড়েছে। মারি এমে রাত্রের কথা শুনে বল্লেন—"বেড়ালটাই নিশ্চয় হাণ্ডিলের উপর লাফিয়ে দরজা খুলেছে।" কিন্তু কথাটা আমাদের কারো মনে ঠিক লাগল না। ছোট মেয়েরা এই রাত্রের কাহিনী অনেক দিন ধরে চুপিচুপি বলাবলি করতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

মৃত্যুঞ্জয়

আপনি সন্ন্যাসী তুমি, সর্ব্বত্যাগী শিব,
ভোলা ব্যোমকেশ!
তাই নিজ ভক্ত পেলে তারেও সন্ন্যাসী
সাজাও মহেশ!
আপনি শ্মশানবাসী, অঙ্গে মাখ ছাই,
ভিক্ষাপাত্র সার,—
শ্মশান-বহ্নির দাহ, বক্ষে দাও তাই,
ভক্তে আপনার।

উন্মাদ তাণ্ডব খেলা তব,—প্রলয়ের
গরজন গান—
তোমার আনন্দ-গীত তাই ভকতের
রোদনের তান।
কালকূট কণ্ঠভরা তবু মৃত্যু-জয়ী,
তুমি মৃত্যুঞ্জয়।
অসীম দুঃখের বিষে জর্জ্জরিত নর
তবু বেঁচে রয়।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।



স্তব্ধ তরু

শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে-অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতের কৃষিকার্য্য*

কৃষি-সাহিত্য

ভারত আবহমানকাল কৃষিপ্রধান দেশ। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, ব্রহ্ম হইতে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত যে বিশাল উর্ব্বর ভূমিভাগ আমরা বহুপুণ্যফলে মাতৃভূমি-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার কর্ষণে চিরদিনই সোনা ফলিয়াছে ও ফলিবে। শিল্প-বাণিজ্যে ভারত এককালে সমগ্র জগতের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেশ ছিল; ভারতের ভূমিজাত অন্ন চিরকালই ভারতের কেন, বহু দেশ-বিদেশের নরনারীর প্রাণরক্ষা করিয়া আসিতেছে ও করিবে।

অধুনা ভারতের শতকরা আশিজন ব্যক্তির উপজীবিকা কৃষি। কৃষিই ভারতের সর্ব্ব-প্রধান শিল্প। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে কোন্ কোন্ বিজ্ঞানে কতগুলি পুস্তক বঙ্গভাষায় লিখিত আছে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। সেই সময়ে দেখি যে বঙ্গ-সাহিত্যের কৃষিবিভাগে পুস্তকাদি খুব বেশী নাই। অথচ আধুনিক উন্নত কৃষিবিদ্যায় লব্ধ তথ্যগুলি মাতৃভাষায় প্রত্যেক গৃহস্থকে জ্ঞাত করাইতে পারিলে অনেক সুফল মিলিতে পারে। সরকার বাহাদুর কৃষি-বিদ্যার আলোচনার জন্য পুসা, স্যাবোর, পুনা প্রভৃতি স্থানে কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাহা ভিন্ন বাঙ্গালা দেশে ঢাকা, বর্দ্ধমান, রাজসাহী, রংপুর প্রভৃতি সহরে কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে (Experimental farm) কৃষির উন্নতির জন্য বহু পরীক্ষা করিতেছেন। এই সকল স্থানে পরীক্ষায় অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, কিন্তু সেগুলি ইংরাজিতে কৃষি-বিভাগের রিপোর্টে এতদিন আবদ্ধ থাকিত; যাহার জন্য সেগুলি আবিষ্কৃত হইল সেই গৃহস্থকে সেগুলি মাতৃ-ভাষায় জানাইবার এতদিন কোন ব্যবস্থা ছিল না। সুখের বিষয় গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই সকল পরীক্ষার ফল "কৃষি সমাচার" নামে প্রকাশিত হইতেছে। আশা করি, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে বহু পুস্তকাদি রচনা করিয়া একদিকে মাতৃভাষার দৈন্য দূর করিবেন এবং অপর দিকে দেশের উন্নত কৃষি-শিল্পের প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইবেন।

শিক্ষিত সম্প্রদায় ও কৃষি

আজ-কাল এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিনে স্বভাবতই চাকুরি-সম্বল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি শিল্পোন্নতির দিকে পড়িয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কৃষির দিকে এখনও পড়ে নাই। বিশ-পঁচিশ টাকার কেরাণী-গিরিতে আর চলে না, বি, এ, এম এর বাজার-দর মাসিক পঞ্চাশ ষাট টাকা দাঁড়াইয়াছে। এ ক্ষেত্রে আয়ের অন্যবিধ পন্থা উন্মুক্ত না হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর্থিক দৈন্য ঘুচিবে কি করিয়া বুঝিতে পারি না। উপরন্তু যখন দেশে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যাও উত্তরোত্তর

* রঙ্গপুরে নবম উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কৃষি-বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ।

বৃদ্ধি পাইবে, তখন কৃষি-শিল্প প্রভৃতি আয়ের নূতন নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত না হইলে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের বাজার-দর আরও কমিতে থাকিবে। শিল্পোন্নতির জন্য অধিকাংশ স্থলেই হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ টাকার মূলধনের প্রয়োজন; তদুপরি শিল্পশিক্ষা ব্যবসাবুদ্ধি প্রভৃতি অর্জ্জন করা একান্ত আবশ্যক। এ-সকল সংগ্রহ করা দুরূহ। বড় রকমের কৃষি-কারবার চালাইতেও এই-সকলের প্রয়োজন, সন্দেহ নাই, কিন্তু মাসিক যে পঁচিশ বা পঞ্চাশ টাকা মাহিনার জন্য আমরা লালায়িত, তাহা কৃষি-কার্য্যের সাহায্যে অর্জ্জন করিতে শিক্ষিত গৃহস্থের পুঁজিপাটা ও বুদ্ধিই যথেষ্ট। যে সকল শিক্ষিত যুবক পঁচিশ বা পঞ্চাশ টাকার চাকরীর জন্য অফিসের দ্বারে দ্বারে বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন "go back to the land"! এ বিষয়ে কৃষি-বিষয়ক রিপোর্টাদি পাঠ করিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কোন কোন কৃষিজাত দ্রব্যের চাষ করিতে পারিলে যুবকগণ স্বল্পায়াসে ও স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন।

বঙ্গদেশে ধান ও পাট প্রধানতম শস্য। উপজীবিকা-হিসাবে ইহাদের চাষ খুব অধিক বিঘা করিতে না পারিলে শিক্ষিত গৃহস্থের পোষাইবে না। অবশ্য অন্যবিধ চাষ বা পেশার সহিত এ-সকল চাষ চলিতে পারে। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি জিনিসের আবাদ সম্ভবপর যাহাতে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিলে বিঘা-প্রতি খুব বেশী লাভ হইতে পারে। ইহাদের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

(১) ইক্ষুর চাষ—ইক্ষুর চাষ খুব লাভজনক। তাহার উপর যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সার দেওয়া হয় এবং বার-বেডোজ, মরিশস, জাভা প্রভৃতি প্রদেশ হইতে আনীত আখের চাষ করা যায়, তাহা হইলে এক এক বিঘা-জাত আখ হইতে চল্লিশ মণ পর্য্যন্ত গুড় উৎপন্ন হইতে পারে। ইহার মূল্য ন্যূন-কল্পে ২৫০৲ টাকা এবং খরচ প্রায় বিঘা-প্রতি বড়-জোর ৮০৲ টাকা হইতে পারে। অতএব বিঘা-প্রতি লাভ অন্ততঃ ১৫০৲ টাকা দাঁড়ায়। এ-বিষয়ে কৃষি-বিভাগের বাঙ্গালা ১৩১৯—১৩২০ সালের বার্ষিক বিবরণী হইতে বঙ্গদেশের বিভিন্ন কৃষি ফার্ম্মে প্রাপ্ত ফসলাদির বিবরণ উদ্ধৃত হইল—

ঢাকা বিভাগে গেণ্ডারি নামক ইক্ষুর চাষই সমধিক প্রচলিত কিন্তু ঢাকা কৃষি ফার্ম্মে বিঘা-প্রতি ১০ মণ চূণ, ১০০ মণ গোবর ও ৬৳ মণ সরিষার খোল সার দিয়া বিঃ ১৪৭ ও ডোরা ট্যানা নামক বিদেশী ইক্ষু হইতে গেণ্ডারিজাত গুড় অপেক্ষা প্রায় ডবল গুড় উৎপন্ন হইয়াছে।

নাম	তিন বিঘায় কত মণ গুড় পাওয়া গিয়াছে
বিঃ ১৪৭	১২৩
ডোরা ট্যানা	১১২
হরিদ্রা ট্যানা	১০৬
ঢাকা গেণ্ডারি	৭৮

বিঃ ১৪৭ হইতে বিঘা-প্রতি ৪০ মণ গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। রংপুর ফার্ম্মেও

ইংরাজি ১৯১২—১৩ সালে একই প্রকারে আবাদ করিয়া নিম্নলিখিত ফল পাওয়া গিয়াছিল—

সাদা টেনা	তিন বিঘায়	১৩০ মণ গুড়
ডোরা টেনা	"	১২০ " "
মরিশস	"	১০৪ " "
গেণ্ডারি	"	৭১ " "

রাজসাহী ফার্ম্মেও গত কয়েক বৎসর এই বিঃ ১৪৭ ও ডোরা টেনার চাষ হইতেছে, আমি সেগুলি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি, লম্বায় ৮।১০ হাত ও দেখিতে খুব মোটা। সেখানেও বিঘায় ৪০ মণ ভাল গুড় উৎপন্ন হইতেছে। রাজসাহী ফার্ম্মের অধ্যক্ষ তিন-বিঘা-প্রতি নিম্নলিখিত সার দিতে উপদেশ দেন।

২০০ মণ গোবর
১০ মণ রেড়ীর খোল
৬ মণ হাড়ের গুঁড়া।

চুঁচুড়ার ফার্ম্মেও জাভা ইক্ষু হইতে বিঘা-প্রতি ৩০ মণের উপর গুড় হইয়াছে। যাঁহারা বেশী সার দিতে পারিবেন না তাঁহারা যেন এই সকল বিদেশী আখের চাষ না করেন—ঢাকার ফার্ম্মের এই মত। আমাদের দেশী আখের চাষে অত ফলন হয় না, বিঘা-প্রতি ২০।২৫ মণ গুড় হয়, কিন্তু সার কম লাগে বলিয়া উহার চাষেও বিঘা-প্রতি প্রায় ১০০৲ হইতে ১৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। বিঘা-প্রতি কেবল ১০০ মণ গোবর-সার দিয়া ও বিনা-সিঞ্চনে রাজসাহী ফার্ম্মে ১৯১১—১২ সালে নিম্নলিখিত পরিমাণে গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ভেল্লামুখী নামক ইক্ষুই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

আখের নাম	প্রতি বিঘার খরচ	প্রতি বিঘার উৎপন্ন গুড়	প্রতি বিঘার লাভ
গেণ্ডারী	৪০৲	২৪	১১৫৲
শ্যামসারা	৩২৲	২৭	১৪১৲
ভেল্লামুখী	৩৫৲	২৮	১৪৮৲
দেশীয় খাগড়ী	৩১৲	২১	১০৯৲

তবেই দেখা যাইতেছে যে ইক্ষুর চাষে খরচ-বাদে বিঘা প্রতি ১৫০৲ টাকা লাভ হইবার খুবই সম্ভাবনা। ১৫০৲ টাকার জায়গায় ১০০৲ টাকা লাভ হইলেও ১২ বিঘা জমিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইক্ষুর চাষ করিলে বৎসরে ১২০০৲ টাকা অথবা মাসে ১০০৲ টাকা আয় হইতে পারে। এই ১২ বিঘা জমির চাষের খরচের জন্য চারি-পাঁচশত টাকা মূলধন হইলেই চলিতে পারে। যাঁহারা বেশী উপার্জ্জন করিতে চাহেন তাঁহারা ১০০ বিঘায় চাষ করিলে মাসে ৪০০।৫০০ টাকার বেশী উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। (বিদেশী আখের cuttings পাইতে হইলে রাজসাহী ডিভিসনের অধিবাসীরা Superintendent of Agriculture, Rajshahi Divisionএর নিকট আবেদন করিলে পাইবেন। অন্যান্য ডিভিসানের অধিবাসীরা তত্রত্য কৃষি-বিভাগের Superintendentএর কাছে আবেদন করিতে পারেন।)

(২) তামাকের চাষ—তামাকের চাষ আর একটি লাভজনক কৃষিকার্য্য। রংপুরের বুড়ির হাটে কৃষি ফার্ম্মে বিভিন্ন জাতীয় তামাকের পরীক্ষা হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে দেখা গিয়াছে যে সুমাত্রা দেশ হইতে আনীত চুরুটে বহিরাবরণের উপযোগী

তামাকের চাষ বঙ্গদেশে অন্ততঃ রংপুর জেলায় খুব ভাল হইতে পারে। উপযুক্ত সার দিয়া ১৯১০—১১ সালে তিন বিঘায় ১৪১৮-৷৷৵০ আনার সুমাত্রা তামাক উৎপন্ন হইয়াছিল এবং মাত্র ২২৪৵০ আনা খরচ হইয়াছিল, সুতরাং খরচ-বাদে ১১৯৪৵০ আনা লাভ হইয়াছিল। ১৯১১—১৯১২ সালেও তিন বিঘা-প্রতি খরচ-খরচা বাদে ৬২৪৲ টাকা লাভ হইয়াছিল। খুব কম করিয়া ধরিলেও এইরূপ তামাকের চাষে এই সকল রিপোর্ট পড়িয়া বিঘা-প্রতি ১৫০৲ টাকা লাভ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হইতেছে।

(৩) আলুর চাষ—আলুর চাষে অত লাভ না হইলেও বিঘা-প্রতি পঞ্চাশ ষাট টাকা হইতে পারে। বিভিন্ন কৃষিফার্ম্মে পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে অনেক স্থানে দার্জ্জিলিংএর আলুর বীজ হইতেই আলুর সমধিক ফলন হয়। ১৯১১—১২ সালে রাজসাহী ফার্ম্মে তিন প্রকার আলুর বীজ হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ লাভ হইয়াছিল।

আলুর নাম	প্রতি বিঘায় খরচ	প্রতি বিঘায় উৎপন্ন আলু	প্রতি বিঘায় লাভ
ইটালীয়	২৯৲	৩৮ মণ	৪৯৲
দার্জ্জিলিং	২৩৲	৪৮ ,,	৭৬৲
নৈনিতাল	৩০৲	২২ ,,	১৫৲

দেখা যাইতেছে যে দার্জ্জিলিংয়ের আলু হইতে লাভ সব-চেয়ে বেশী। রংপুর আদর্শ কৃষি ফার্ম্মে ১৯১১ সালে বরবটীর সবজি সারের (Green manne) ব্যবহারে প্রতি তিন বিঘায় ২৫৫ মণ দার্জ্জিলিং আলু উৎপন্ন হইয়াছিল এবং খরচ-বাদে তাহাতে ১৯৩ টাকা লাভ হইয়াছিল।

উপরোক্ত হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে যে ফার্ম্মে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অন্ততঃ এই তিন দ্রব্যের মধ্যে যে-কোন এক বা ততোধিক দ্রব্য চাষ করিতে পারিলে উদরান্নের ব্যবস্থা কৃষি হইতেই হইতে পারে। আরও সুবিধা এই যে ঐ তিন দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য আদৌ ভাবিতে হইবে না। কারণ আমাদের দেশে গুড়, আলু ও তামাকের কাট্‌তির অভাব নাই। যাঁহার যেরূপ পুঁজি ও সামর্থ্য তিনি পাঁচ, দশ, পঞ্চাশ বা একশত বিঘা চাষ করিয়া দেখিতে পারেন। তবে ইহার মধ্যে একটি কথা আছে—নিজে খাটিতে হইবে। পরের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না, নিজেকে সব দেখিতে-শুনিতে হইবে। পরিশ্রম করিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে বৃষ্টিতে ভিজিয়া মাঠে যাইতে হইবে। তাহার উপর যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহা কৃষি-বিভাগের অনুমোদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট আমাদের দেশেরই কৃষির উন্নতির জন্য দেশের স্থানে স্থানে ফার্ম্ম খুলিয়া বিবিধ পরীক্ষা করিতেছেন। সেই সকল পরীক্ষিত ফল যদি আমরা কার্য্যক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে না পারি তাহা হইলে বাস্তবিকই আমরা কৃপার পাত্র। এ কথা কেহ যেন মনে না করেন যে এই সকল ফার্ম্মে ঘোড়ার দ্বারা, ষ্টিম বা বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রে কার্য্য হয়। সেখানেও সাধারণ লাঙ্গলাদি যন্ত্র অথবা তাহাদের কোন উন্নত সংস্করণই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে সার প্রভৃতি যেরূপ ও যে পরিমাণে দিবার উপদেশ থাকিবে

তাহার যেন ব্যতিক্রম না হয়। প্রথমেই জমির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ফল কৃষি-বিভাগের কোনও কর্ম্মচারীকে জানাইলে তিনি সেই জমিতে কোন্ দ্রব্যের চাষ প্রশস্ত এবং কি কি সার কত পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিতে সক্ষম হইবেন। এইরূপ চাষ করিতে পারিলে ফার্ম্মে প্রাপ্ত ফসলের সমান পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইবে, নচেৎ সস্তায় সারিতে যাইলে আশানুরূপ ফসলের অপ্রাপ্তিতে বেচারি কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারীগণকে যেন গালি না দেন। জমির জন্য যে খুব বেশী চিন্তিত হইতে হয় তাহা নহে। দশ পঁচিশ বিঘা জমি, ক্রয় করিয়া না হউক, খাজনা করিয়া লওয়া কিছু শক্ত নহে; চারি পাঁচ শত টাকা মূলধন অন্ততঃ ধার করিয়া সংগ্রহ করাও অনেকের পক্ষে অসম্ভব নহে।

মাঠে কৃষি-প্রদর্শন।

এইত গেল শিক্ষিত সমাজের কথা। দেশের কৃষকেরাত নিরক্ষর। তাহারাত কৃষি-বিভাগের রিপোর্ট পড়িয়া শিক্ষালাভ করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে উন্নত কৃষিবিদ্যার কথা মুখে বলিয়া দিলেও তাহারা সে কথা বিশ্বাস করিবে না। সেই জন্য রাজা মান্ধাতার আমলে যে কৃষি-পদ্ধতি ও যন্ত্রাদি প্রচলিত ছিল, তাহাই এতাবৎ কাল চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য কৃষিকার্য্যে বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা তাহার সহায়; কিন্তু অনেক বিষয়ে উন্নতি নিশ্চয়ই সম্ভবপর। উপযুক্ত সার-প্রয়োগে উন্নত কৃষি-বিদ্যার (Intensive cultivationএর) তথ্যগুলি, নূতন যন্ত্রাদির ক্রিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে গিয়া তাহাকে হাতে-কলমে না দেখাইয়া দিলে সে কিছুই বিশ্বাস করিবে না। এই জন্য হাতে-কলমে কৃষি-শিক্ষাদান (Field demonstration) একান্ত আবশ্যক। সুখের বিষয়, গভর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর ধরিয়া এ-বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছেন; বঙ্গদেশের এক এক ডিভিশানে এক-একজন বিশেষজ্ঞ Superintendent of Agriculture, নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার অধীনে কয়েকজন District Inspector আছেন এবং তন্নিম্নে অনেকগুলি Dimonstrators নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের কার্য্য মাঠে গিয়া হাতেকলমে কৃষকগণকে উন্নত কৃষি দেখাইয়া এবং তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করাইয়া দেওয়া। কৃষি ফার্ম্মে এতদিন কেবল পরীক্ষাই চলিতেছিল। ইঁহাদের পরীক্ষার সহিত কোনও সম্পর্ক নাই, ইঁহারা পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি আনিয়া কৃষকের মাঠে পঁহুছিয়া দিবেন। বলা বাহুল্য দেশে কৃষির উন্নতি করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। ভারত-গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কৃষি-বিভাগের যে কনফারেন্স বসাইয়া ছিলেন তাহাতেও এই মাঠে-কৃষি-শিক্ষাদানের প্রথার সমধিক চলন ভারতের কৃষির উন্নতির প্রধান উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। বাস্তবিক কৃষক যদি স্বচক্ষে দেখে যে উপযুক্ত সার দিয়া তাহার ফসল দ্বিগুণ বা তিনগুণ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা হইলে তাহার চিরানুসৃত পন্থা সে নিশ্চয়ই বদলাইবে। বাঙ্গালা দেশের কৃষি-বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠে অবগত হই যে, ইহার মধ্যেই এই উপায়ে

অনেক উপকার দর্শাইতেছে। এখানে দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। বহু পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে বিঘা-প্রতি একমণ হাড়ের গুঁড়া সার দিলে ধানের ফলন অনেক বাড়ে, এমন কি স্থলবিশেষে দুই গুণেরও বেশী ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে, এবং আরও সুবিধা এই যে হাড়ের গুঁড়ার সার একবার ব্যবহৃত হইলে তিন বৎসর আর সার লাগে না। কৃষি-বিভাগ হইতে প্রথমতঃ বিনামূল্যে বা নাম-মাত্র মূল্যে হাড়ের গুঁড়া অনেকগুলি কৃষককে দেওয়া হইয়াছিল এবং কৃষি-প্রদর্শকেরা তাহার ব্যবহার দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার ফল ক্রমশঃ এত সন্তোষজনক হইয়াছে যে হাজার হাজার মণ হাড়ের গুঁড়া জমিতে এখন সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে এবং লোকে অগ্রিম টাকা দিয়াও কৃষি-বিভাগ হইতে হাড়ের গুঁড়া পাইতেছেন না।

পূর্ব্ববঙ্গে আলুর চাষ বড় বেশী প্রচলিত ছিল না। সম্প্রতি কৃষি-বিভাগ কয়েক বৎসর ধরিয়া দার্জ্জিলিং-আলুর বীজ আনাইয়া নাম-মাত্র মূল্যে বা বিনামূল্যে প্রজা-দিগকে দিতেছেন এবং কৃষিপ্রদর্শকগণ উহার চাষ দেখাইয়া দিতেছেন। তাহার ফলে এই কয় বৎসরে ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় এখন আলুর চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কৃষিবিভাগ আশা করেন যে আলুর চাষ অদূর-ভবিষ্যতে পূর্ব্ববঙ্গে একটি সাধারণ কৃষি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

এইরূপে নানাবিষয়ে ইতিমধ্যে উন্নতি দেখা যাইতেছে ও আশা হয় ভবিষ্যতে সমধিক উন্নতি সাধিত হইবে। আমার নিবেদন এই যে, সরকার-বাহাদুরের নিযুক্ত এই সকল কৃষি-প্রদর্শককে যেন আমরা উপযুক্তরূপে খাটাইয়া লইতে পারি। যদি আমরা নিজ নিশ্চেষ্টতার ফলে এই সকল প্রদর্শকের সাহায্য পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে না পারি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দেশে উন্নত কৃষির প্রচলনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়টি আমাদেরই দোষে প্রসার লাভ করিতেছে না।

প্রাথমিক শিক্ষায় কৃষিবিদ্যা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৃষি আমাদের দেশের সার্ব্বজনীন শিল্প। সেই জন্য কৃষির উন্নতি-কল্পে সার্ব্বজনীন কৃষি-শিক্ষার প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। বলাবাহুল্য কৃষিশিক্ষাও শিক্ষা। পুসা, সাবোর, পুনা ও নাগপুরে কৃষিশিক্ষার জন্য বড় বড় কলেজ আছে, সেখানে অধ্যয়ন করিলে কৃষিবিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে পারা যায়। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে কৃষিবিদ্যার প্রচলন নাই বলিলেই হয়। দেশের সার্ব্বজনীন শিক্ষা যদি দেশের সর্ব্বপ্রধান শিল্পের শিক্ষা হইতে একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত থাকে তাহা হইলে সেটা নিতান্ত অন্যায় হইবে বলিয়া আমার ধারণা। আমি সেই জন্য মনে করি যে অন্তত পল্লীগ্রামের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে কৃষি-শিক্ষা অল্পাধিক প্রচলিত হওয়া উচিত। ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষায় ছেলেরা পরিমিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি অধ্যয়ন করে। জানি না যাহারা পরে কলেজে না পড়িবে, এ বিদ্যা তাহাদের কোন কাজে

আসিবে। কিন্তু উন্নত কৃষিবিদ্যা যদি কিয়ৎ-পরিমাণে মাতৃভাষায় নিম্ন-স্কুল-সমূহে পঠন-পাঠনের বিষয় হয়, তাহা হইলে তাহা অন্ততঃ কৃষি-জীবীর পুত্রের পরে কাজে আসিতে পারে। শিক্ষার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ; প্রথম ছাত্রের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন, দ্বিতীয় অন্ন-সংস্থানের উপায় নির্দ্ধারণ। যে শিক্ষা নিভাঁজ সাহিত্যিক ধরণের (literary) তাহাতে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে না বলিয়া আমার বিশ্বাস।

সাধারণের মধ্যে কৃষি-শিক্ষা-বিস্তারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা একমত নহেন দেখিতেছি। লক্ষ্ণৌয়ে গত তৃতীয় বিজ্ঞান-সম্মিলনের কৃষি-বিভাগের সভাপতি ও পুসা কৃষি-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কভেন্ট্রি সাহেব এইরূপে শিক্ষা-প্রচলনের সমধিক পক্ষপাতী; কিন্তু যে কৃষি কনফারেন্সের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে এরূপ শিক্ষায় কোন লাভ হইবে না। এই কনফারেন্সে শিক্ষা-বিভাগের লোক খুব কম থাকাতে শিক্ষার দিকটা ভাল করিয়া দেখান হয় নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। বাস্তবিক জাতীয় শিক্ষা জাতীয় অভাব পূরনেরই জন্য সৃষ্ট হইয়া থাকে। সেজন্য এ ক্ষেত্রে জাতীয় সর্ব্ব-প্রধান জীবিকার উপায়কে বাদ দিয়া কোন প্রকার শিক্ষা ফলপ্রদ হইতে পারে না।

কৃষক-সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা

কৃষিশিক্ষার কথা ছাড়িয়া দিলেও কৃষিজীবী ও কৃষকের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির জন্য সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা ত অন্ততঃ চাই-ই। আমাদের দেশের কৃষকগণ একেবারে নিরক্ষর। কৃষির উন্নতির কথা ত দূরে থাক্, সামান্য হিসাব-নিকাশ পর্য্যন্ত ভাল করিতে না পারায় বহু নীচপ্রকৃতি মহাজন তাহাদিগকে ঠকাইয়া থাকে, এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। কৃষককুলের ঋণভার (indebtedness of peasants) তাহার অজ্ঞতার প্রধান কুফল। ভারতের অধিবাসীগণের মধ্যে তিন কোটি ষাট লক্ষ বালকবালিকা স্কুলে যাইবার বয়সপ্রাপ্ত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মাত্র পঁচাত্তর লক্ষ অর্থাৎ শত-করা কুড়িজন মাত্র শিক্ষার্থী। মনে রাখিতে হইবে যে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভদ্রসন্তান, কারণ ভদ্রসমাজে শিক্ষা আইনতঃ না হইলেও কার্য্যতঃ বাধ্যকরী। অবশ্য যতদিন দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যয়মুক্ত ও বাধ্যকরী না হইতেছে ততদিন কৃষক-সন্তানের মধ্যে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত হইবে না। তাহা যতদিন না হইতেছে ততদিন কৃষক-সন্তানগণের শিক্ষার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? আসামের চা-বাগানের অথবা কয়লার খনির কুলিদের ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সাহেব-ম্যানেজারেরা বিস্তর স্কুল স্থাপন করিয়াছে, আর যাহারা স্বীয় শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অন্ন উৎপাদন করিয়া দিতেছে, তাহাদের সন্তানগণকে সামান্য শিক্ষা দিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে শিক্ষিত-সম্প্রদায় ব্যক্তিগতভাবে কি দায়ী নহেন? আমার মনে হয় অন্ততঃ যদি প্রত্যেক গ্রামে এক বা ততোধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত

হয় তাহা হইলে অনেক কৃষকসন্তান শিক্ষা লাভ করিতে পারে। চারি পাঁচ গ্রাম পার হইয়া কৃষকসন্তান যে শিক্ষা করিতে যাইবে না ইহা নিশ্চিত; অতএব আমাদের সকলের চেষ্টা করা উচিত যাহাতে নিজ নিজ গ্রামে অন্ততঃ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এরূপ স্কুল স্থাপন করিতে ও তাহা চালাইতে বেশী অর্থের প্রয়োজন হয় না, গ্রামবাসীরা একটু চেষ্টা করিলেই হয়। এ সম্বন্ধে আমার একটি ক্ষুদ্র প্রস্তাব আছে। স্কুল-কলেজের গ্রীষ্মাবকাশ সন্নিকট। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে কলেজের ছাত্রেরা তিন মাস ও স্কুলের ছেলেরা দেড়মাস ছুটি পায়। এইরূপ কলেজের ছয় ক্লাসের ও স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রায় পঞ্চাশ হাজার শিক্ষিত যুবক এই গ্রীষ্মাবকাশে তাহাদের স্বগ্রামে ফিরিয়া যায়। এই সময়টা যদি তাহারা তাস পাশা প্রভৃতি ক্রীড়ায় ব্যয় না করিয়া গ্রামে অন্ততঃ একটি স্কুল স্থাপনের জন্য চেষ্টা করে তাহা হইলে মনে হয় অনেক কাজ হইতে পারে। তাহাদিগকে অর্থ দিতে হইবে না, তাহারা কেবল চাঁদা প্রভৃতি যোগাড় করিয়া স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। চাঁদা দিতে অনেকে প্রস্তুত, কিন্তু যোগাড় করিবার লোকের অভাব। যুবকেরা যদি এরূপ চেষ্টা করেন তাহা হইলে পঞ্চাশ জনের মধ্যে মাত্র এক জনও কৃতকার্য্য হইলে বৎসরে এক হাজার প্রাথমিক স্কুল আমরা নিজেরাই স্থাপিত করিতে পারি। এ বিষয়ে ছাত্রেরা কি একটু মনোযোগ করিবেন? আমাদের মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দনের উত্তরে বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি ভারতীয় শ্রমজীবীগণের শ্রম মধুময় করিবার জন্য, এইরূপ বহু বিদ্যালয় (a network of schools) স্থাপিত হইতে দেখিলে নিতান্তই সুখী হইবেন।

কৃষকের কর্ম্মশক্তি ও ম্যালেরিয়া

কিন্তু বঙ্গদেশের কৃষিজীবী ও কৃষকের কর্ম্মশক্তির প্রধান শত্রু ম্যালেরিয়া। ভদ্র-সন্তানকে কৃষিজীবী হইতে হইলে তাঁহাকে গ্রামে যাইতে হইবে, কিন্তু বঙ্গের গ্রামগুলি ক্রমশঃ ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় প্রতি বৎসর যে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে তাহার শতকরা অন্ততঃ নব্বই জন হয় কৃষিজীবী ভদ্রসন্তান না হয় কৃষক; কারণ সহরে ম্যালেরিয়া কমই হইয়া থাকে। তাহার পর মনে রাখিতে হইবে যে, যে-স্থলে এক ব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে, সেখানে ভুগিতেছে অন্ততঃ বিশ জন। এই কাল-ব্যাধিতে বঙ্গের কৃষককুলের স্বাস্থ্য এবং সেই জন্য কর্ম্মশক্তি (efficiency of labour) কত নষ্ট হইতেছে, তাহা পল্লীগ্রামের কৃষকগণের শীর্ণ দেহ ও প্লীহাযকৃৎসংযুক্ত উদর দেখিলে সহজেই বুঝা যায়। প্রভূত সারসংযোগে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া কি লাভ, যদি কৃষকের কর্ম্মশক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতে থাকে? সেই জন্য, মনে হয়, দেশের কৃষিসম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইলে অগ্রে এই ব্যাধির নিরাকরণ করিতে হইবে।

সুখের বিষয় আজকাল দেশের ও দশের দৃষ্টি এই বিষয়ে পতিত হইয়াছে;

ফলে এ সম্বন্ধে আলোচনা সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। বঙ্গদেশকে ম্যালেরিয়া-মুক্ত করিতে হইলে দেশের সমস্ত পুকুর ভরাট করা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, নদীর মোহানা খুলিয়া দেওয়া প্রভৃতি কর্ত্তব্য বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা বহু ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। তাহা যত দিন না হইতেছে ততদিন আমরা বঙ্গের পল্লী-বাসী গৃহস্থেরা নিজেকে ও পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে যাহাতে ম্যালেরিয়ামুক্ত রাখিতে পারি তাহার চেষ্টা কি করিব না? বিশেষজ্ঞেরা যেমন একদিকে পুকুর ভরাট ও জঙ্গল পরিষ্কার করিবার উপদেশ দিয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তিগতভাবে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক কতকগুলি উপায়ও নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। সেগুলি পালন করিয়া নিজেকে সুস্থ রাখিতে সচেষ্ট হই না কেন? এ সম্বন্ধে আমার দুই-একটি বক্তব্য আছে —নিবেদন করিতেছি।

প্রথমতঃ—বিশেষজ্ঞেরা বহু পরীক্ষার ফলে প্রমাণ করিয়াছেন যে দূষিত বায়ুর দ্বারা ম্যালেরিয়া সংক্রামিত হয় না, এনোফিলিস নামক মশকের দ্বারা ম্যালেরিয়া বিষ এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হয়। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তিমূলক এই বৈজ্ঞানিক তথ্য গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। মশা কামড়াইলে ম্যালেরিয়া হয় একথা স্বগ্রামে গিয়া কাহাকেও বলিলে তিনি তাহা হাসিয়াই উড়াইয়া দেন। এই অজ্ঞতা দূর করিতে পারিলে পল্লীগৃহস্থ ও কৃষক মশক-কুল হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে শিখিবে। সুখের বিষয় নব-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার Social Service League এই বিষয়ে বঙ্গভাষার প্রবন্ধ লিখিয়া অনেককে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু কথা হইতেছে যে, গ্রামের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর, এ প্রবন্ধ পড়িবে কয় জন? আমার মনে হয় আলোকচিত্রের (lantern slides) সাহায্যে গ্রামে গ্রামে যাহাতে এ বিষয়ে বক্তৃতাদি হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে, গত কয়েক বৎসর যাবৎ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কয়েকজন এম, বি, ডাক্তারকে এইরূপ আলোকচিত্রের সাহায্যে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি ও নিবারণ সম্বন্ধে দেশের যাবতীয় সরকারী স্কুলের ছাত্রবৃন্দকে শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। রাজসাহীতে গত বৎসর এবং এ বৎসর আমি এই বক্তৃতা শুনিয়াছি। দেখিলাম, ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে দেশের অজ্ঞতা দূর করিবার পক্ষে এইরূপ বক্তৃতাই প্রকৃষ্ট উপায়, কারণ শ্রোতৃবর্গ আলোকচিত্রের সাহায্যে দেহে ম্যালেরিয়া বিষ কিরূপে সংক্রামিত ও বর্দ্ধিত হয় এবং কোন্ কোন্ প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করিলে আমরা ব্যক্তিগতভাবে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে মুক্ত থাকিতে পারি তাহা সম্যক বুঝিতে পারেন। গ্রামে গ্রামে যদি এইরূপ বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ বক্তৃতার জন্য এম, বি, ডাক্তার নিযুক্ত করা বহুব্যয়সাপেক্ষ; কারণ অনেক ডাক্তার প্রয়োজন। স্বল্পশিক্ষিত ডাক্তার এমন কি পাশ করা কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে

জ্ঞাতব্য বিষয় শিখাইয়া এবং এক এক গেট আলোকচিত্র দিয়া যদি গ্রামে গ্রামে বক্তৃতার জন্য পাঠান যায়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়ার নিদান ও নিবারণ সম্বন্ধে পল্লী-গৃহস্থ ও কৃষকের অজ্ঞতা অতি অল্পদিনেই দূরীভূত হইতে পারে। Social Service League এই উপায় অবলম্বন করিয়া দেখিলে ফল মন্দ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়—বিশেষজ্ঞেরা বলিয়াছেন যে মশক-দংশন নিবারণের জন্য রাত্রে মশারি ব্যবহার ও কুইনিন ঔষধ প্রতিষেধকরূপে সেবন করিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। আমরা কুইনিন ম্যালেরিয়ার ঔষধরূপে ব্যবহার করি, কিন্তু উহা যে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক তাহা সকলে অবগত নহি। সপ্তাহে বারো গ্রেন কুইনিন সেবন করিলে উহা প্রতিষেধকের কার্য্য করে এবং যে সকল সাহেব কর্ম্মোপলক্ষে পল্লীগ্রামে থাকেন তাঁহারা প্রায় সকলেই কুইনিন এইরূপে প্রতিষেধক-রূপে সেবন করেন বলিয়া প্রায়ই ম্যালেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হন না। দেখা যায়, বর্ষার শেষে অর্থাৎ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী। সেই সময় যদি পল্লীগ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মশারি ব্যবহার ও কুইনিন সেবনের দ্বারা কৃষকগণকে কার্য্যতঃ দেখাইতে পারেন যে ঐ উপায়ে নিজেকে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে মুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে কৃষকগণও ক্রমশঃ তাঁহাদের অবলম্বিত পথ অনুসরণ করিবে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ম্যালেরিয়ার ভয়ে পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিলে ম্যালেরিয়া-সমস্যার নিরাকরণ হইবে না, তাঁহাদিগকে বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করিয়া সুস্থ থাকিয়া অশিক্ষিত কৃষক-সম্প্রদায়কে কার্য্যতঃ স্বাস্থ্যশিক্ষা দিতে হইবে। বলা বাহুল্য, কৃষকগণের স্বাস্থ্যের উপরই তাহার কর্ম্মশক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

ভারতীর ইতিহাস

(সংক্ষিপ্ত)

এইবার "ভারতী" চল্লিশ বৎসরে পড়িল। চল্লিশ বৎসর! বাঙ্গলার মাসিক সাহিত্যে এ-এক অভাবিত ঘটনা! যে দেশে বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, নব-জীবন, সাধনা, জন্মভূমি ও প্রদীপ প্রভৃতি বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র-পত্রিকা বঙ্কিম-কথিত 'জলবুদ্বুদে'র মতই উদয় ও বিলয় লাভ করিয়াছে, সেই মরণ-সুলভ দেশে "ভারতী" যে এতকাল আপন সাহিত্য-ব্রতে অবিচল থাকিতে পারিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। "ভারতী" সুধু বাঁচিয়া নাই, উত্তপ্ত যৌবনের

স্ফূর্ত্তিতে এখনো তাহার অন্তর-আত্মা উচ্ছ্বসিত। এক বসন্তের ফুল-সম্ভার সে চিরকালের সম্বল করে নাই—"ভারতী"র চির-শ্যামল কুঞ্জবনে বহু-বসন্তের পুষ্পিত আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছে। সে কখনও আপন অঞ্চলে কেবলই পুরাতনের ঝরা ফুল সঞ্চয় করিয়া বসিয়া থাকে নাই—বরাবরই সে নূতনকে সাগ্রহে বরণ করিয়া লইয়াছে! ইহাই তাহার সার্থকতার গুপ্তমন্ত্র।

"ভারতী"র অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধা দুইখানি মাসিক-পত্রিকা বঙ্গভাষায় আছে,—তত্ত্ব-বোধিনী ও বামাবোধিনী। কিন্তু "ভারতী"র সঙ্গে সে দুখানির ধরণ-ধারণ, গতি ও ভঙ্গী ঠিকমত মেলে না।

মাসিকপত্রের দুটি বড় গুণ আছে। প্রথম, তাহা সমসাময়িক যুগের দর্পন;—দ্বিতীয়, তাহা দ্বারা আবর্জ্জনা সরাইয়া সাহিত্য গড়িতে পারা যায়।

গত উনচল্লিশ বৎসরের "ভারতী"র ভিতরে প্রবেশ করিলে আমাদের দেশ, সমাজ ও সাহিত্যের কত বিস্মৃত স্মৃতির সন্ধান পাওয়া যায়! "ভারতী"র প্রথম-প্রকাশ-কালে আধুনিক বঙ্গসাহিত্য শৈশব-দশা পার হয় নাই। সেই শৈশব হইতে সাহিত্যের আজিকার এই যৌবন পর্য্যন্ত, তাহার প্রাণে যত আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, তাহার জীবন-গতি যখন যেদিকে ফিরিয়াছে, বাঙ্গলা ভাষা লইয়া যখন যে প্রশ্ন উঠিয়াছে, যখন যে আন্দোলন হইয়াছে, "ভারতী"র পত্রে পত্রে সে-সমস্ত চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে! সমসাময়িক যুগের সমাজনীতি, রাজনীতি, ললিতকলা, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাসের কথা এবং সর্ব্ববিধ চিন্তার অনাহত ধারা গত উনচল্লিশ বৎসরের "ভারতী"তে পাওয়া যায়—অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে এত-বড় মিলন-সেতু বাঙ্গলার মাসিক-সাহিত্যে এই একটি-বৈ দুটি নাই।

তাহার পর, সাহিত্য-গঠন। উনচল্লিশ খণ্ডের "ভারতী"তে কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রসায়ন, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, কথা-সাহিত্য, ভ্রমণ-কাহিনী, রাজনীতি, সমাজনীতি, ললিত-কলা, শিল্প, অর্থশাস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নীতি ও ধর্ম্ম প্রভৃতি মানব-চিন্তার অধিগম্য সকল বিষয় লইয়াই বিস্তৃত বা ধারাবাহিক আলোচনা আছে। "ভারতী" হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া অসংখ্য পুস্তক সাহিত্যক্ষেত্রে যথাযোগ্য স্থান লাভ করিয়াছে। অনেকগুলি পুস্তকের প্রকাশ-কালে সাহিত্য-সমাজে যথেষ্ট আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। "ভারতী"র কয়েকজন নিজস্ব লেখক বিশ্বসাহিত্যে বা বঙ্গসাহিত্যে অমরত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু "ভারতী"র পসরা এখনও খালি হইয়া যায় নাই; সেখানে এখনও এমন অনেক মাণিক লুকানো আছে, যেগুলিকে পুনঃপ্রকাশ করিলে আমাদের স্থায়ী-সাহিত্য অলঙ্কৃত হইবে। (প্রবন্ধ-শেষে পাদটীকা দেখুন)

এদেশী পাঠকদের রুচি কখন্ কেমনধারা ছিল, "ভারতী"র লেখা ও আলোচিত বিষয়-গুলিতে তাহার প্রমাণ আছে। "ভারতী" যখন প্রথম বাহির হয়, তখনকার পাঠকদের গল্প পড়িবার বা ছবি দেখিবার নেশা এখনকার মত এতটা রঙ্গিন ছিল না। তখনকার প্রতি সংখ্যার মাসিকের

লঘুসাহিত্যে থাকিত দু-একটি কবিতা ও একখানি উপন্যাস (তাহাও ক্রমপ্রকাশ্য), বাদ-বাকী সমস্তই গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধাদিতে পরিপূর্ণ হইত। সে যুগের তুলনায় এ যুগের পাঠকদের রুচি যে কতটা বিস্তৃত হইয়াছে, প্রথম-সংখ্যার "ভারতী"র সঙ্গে এখনকার যে-কোন এক সংখ্যার "ভারতী" মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। এখনকার "ভারতী" আকারে দ্বিগুণেরও বেশী, বিষয়ে বিচিত্র, গল্প-উপন্যাসে পরিপূর্ণ ও চিত্র-মালায় রমণীয়,—কিন্তু পাঠকদের তৃষ্ণা যেন তবুও বলিতেছে, "আরও দাও—আরও দাও!"

প্রথম-সংখ্যার "ভারতী"র পত্র-সংখ্যা ছিল ৪৮। আলোচিত বিষয়গুলি এই :—

১। ভূমিকা
২। ভারতী (কবিতা)
৩। তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক (ক্রমশঃ)
৪। মেঘনাদবধ কাব্য (সমালোচন—ক্রমশঃ)
৫। জ্ঞান, নীতি ও ইংরাজি সভ্যতা (ক্রমশঃ)
৬। বঙ্গসাহিত্য—(ক্রমশঃ)
৭। গঞ্জিকা অথবা তুরিতানন্দ বাবাজির আক্‌ড়া—(রস-রচনা—ধারাবাহিক)
৮। ভিখারিণী—(উপন্যাস—ক্রমশঃ)
৯। স্বাস্থ্য—(ক্রমশঃ)
১০। সম্পাদকের বৈঠক—(বৈদেশিক সাহিত্য)

এই ক্রমপ্রকাশ্য প্রবন্ধে পূর্ণ, চিত্রহীন, গল্পশূন্য "ভারতী" যদি একালে বাহির হইত, তবে প্রথম-সংখ্যাতেই বোধ করি তাহার পরমায়ু শেষ হইয়া যাইত! আসল কথা, তখনকার পাঠকেরা এখনকার চেয়ে ঢের-বেশী ধৈর্য্যশীল ও অল্পে-তুষ্ট ছিলেন। মাসিক-পত্রে সাহিত্যের ভাগ বেশী করিয়া পাইলেই তাঁহারা যে খুসী হইতেন, সমালোচন-মূলক প্রবন্ধগুলিতে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। সে-যুগে পাঠকদের রুচি খুব বিস্তৃত না হইলেও যে বেশ উন্নত ছিল, প্রথম-সংখ্যার 'ভারতী'র সূচীপত্র দেখিলে তাহাও বুঝা যায়।

"ভারতী"র যোগাসনে বসিয়া একজন-মাত্র পুরোহিত বঙ্গবাণীর আরতি করেন নাই। "ভারতী"র সুদীর্ঘ জীবনে কয়েকবার সম্পাদক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাঙ্গলার আর কোন সাহিত্য-পত্রিকায় এতবার সম্পাদক বদল হয় নাই। নিম্নলিখিত সম্পাদক ও সম্পাদিকার তত্ত্বাবধানে "ভারতী" যথাক্রমে পরিচালিত হইয়াছে।

সম্পাদক	সাল
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১২৮৪-১২৯০
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	১২৯১-১৩০১
শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী ...	১৩০২-১৩০৪
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৩০৫
শ্রীমতী সরলা দেবী ...	১৩০৬-১৩১৪
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	১৩১৫-১৩২১
শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৩২২-

দেখা যাইতেছে, গত উনচল্লিশ বৎসরের ভিতরে ত্রিশ-বৎসর-কাল, "ভারতী"র পালন-

ভার বঙ্গমহিলার হস্তে ন্যস্ত ছিল। "ভারতী"র মত এত-বড় একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক-পত্রিকা যে প্রধানত বঙ্গ-মহিলার প্রতিভা ও শক্তির প্রসাদে এত কাল পরিপুষ্ট হইতে পারিয়াছে এ-কথা মনে করিলেও প্রাণে আনন্দ হয়। যে-দেশে যোগ্য পুরুষ-সম্পাদক দুর্লভ, সে-দেশে স্ত্রী-শিক্ষার অনাদর-সত্ত্বেও যে এমন গুণবতী তিনজন মহিলা-সম্পাদক পাওয়া গিয়াছে এ-বড় আশ্চর্য্য কথা! বিশেষ, আমাদের দেশে মহিলার পক্ষে প্রথম-শ্রেণীর একখানি মাসিক নিয়মমত চালানো যে কত-বড় শক্ত কথা, ভুক্তভোগী ভিন্ন আর-কেহ তাহা বুঝিবেন না।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী সর্ব্বশুদ্ধ আঠারো বৎসর কাল 'ভারতী' সম্পাদন করিয়াছেন; —অর্থাৎ 'ভারতী'র গত-জীবনের প্রায় অর্দ্ধাংশকাল তাঁহারই তত্ত্বাবধানে অতিবাহিত হইয়াছে। মাঝে 'ভারতী'র সম্পাদন-ভার ত্যাগ করিলেও 'ভারতী'র সেবাব্রত তিনি কখনই ত্যাগ করেন নাই। 'ভারতী'র প্রায় সমগ্র গত-জীবনই তাঁহার নিপুণ হস্ত-চিহ্নে সমুজ্জ্বল। তিনি যে সুধু 'ভারতী' সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা নহে;—বঙ্গবাণীর চরণে তিনি যতগুলি সাধনার ফুল নিবেদন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ সর্ব্বাগ্রে 'ভারতী'র কমল-বনেই মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে। নানা কারণে 'ভারতী'র দুইবার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছিল; সেই সঙ্গিন মুহূর্ত্তে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী যদি 'ভারতী'র লালন-ভার না লইতেন, তাহা হইলে "বঙ্গদর্শন" "আর্য্য-দর্শন", "বান্ধব" ও "নবজীবনে"র মত "ভারতী"ও আজ কাল-স্রোতে বাসি ফুল-মালার মত ভাসিয়া যাইত। সুতরাং "ভারতী" যে আজ এমন দীর্ঘজীবী হইয়া বঙ্গসাহিত্যের এতটা উন্নতি করিতে পারিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর প্রতিভা, এ-কথা বলিলে কিছু বেশী-বলা হইবে না। কিন্তু এই মাননীয় মহিলা-সম্পাদকের অপূর্ব্ব সম্পাদন-প্রতিভার কথা লইয়া আজ পর্য্যন্ত সাহিত্য-ক্ষেত্রে কাহাকেও কিছু বলিতে শুনি নাই অথবা সাহিত্য-পরিষদেও তাঁহার জন্য কোন সংবর্দ্ধনার আয়োজন হয় নাই—বাঙ্গালীর এ অকৃতজ্ঞতা মার্জ্জনীয় নহে।

১২৮৪ সালে আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন "ভারতী"র জন্মদান করেন, বাঙ্গলা সাহিত্যে



শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তখন একালের মত মাসিক কাগজের 'হরির লুট' ছিল না। বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শন" তখন মৃত; সঞ্জীবচন্দ্র সবে তাহাকে আবার সঞ্জীবিত করিয়াছেন। বঙ্কিম "বঙ্গদর্শনে" প্রথম যে সুর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, সে সুর তখন কতকটা নামিয়া পড়িয়াছে। দেশে প্রথম-শ্রেণীর মাসিকপত্র আরও দুই-তিনখানি ছিল,—"বান্ধব" তাহাদের মধ্যে প্রধান। কিন্তু পাঠক-সাধারণের চিত্তক্ষুধা কেবল তাহাদের দিয়া মিটিত না—সে-সময়ে "বঙ্গদর্শনে"র মত সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ আর-একখানি মাসিকপত্রের প্রয়োজন ছিল, তাই "ভারতী"র প্রকাশ।

১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে "ভারতী"র প্রথম আবির্ভাব। শ্রাবণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত নয় মাসে প্রথম বর্ষ শেষ করিয়া পরবৎসরের বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ-গণনা করা হয়। বিচিত্র-নূতন সুরে ও প্রতিভাবান লেখক-গণের রচনায় "ভারতী" অবিলম্বে সাহিত্য-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। 'বঙ্গদর্শনে'র আসরে বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি নূতন লেখকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার মাসিকসাহিত্য এতদিন প্রধানত তাঁহাদের সাহায্যেই চলিতেছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। একদল নবীন ও প্রতিভাবান লেখক "ভারতী"র বীণাঝঙ্কারে সাড়া দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী। এই নূতন লেখক-সম্প্রদায়ের কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্র-নাথ বঙ্গবাসীকে যে সঙ্গীত শুনাইলেন,—যেমন তাহার মোহন ছন্দ, তেমনি তাহার অপূর্ব্ব রাগিণী! "ভারতী"র লেখার ধরণ নূতন, ভাষার ভঙ্গী নূতন, ভাব নূতন,—দ্বিজেন্দ্রনাথ 'ভারতী'র স্বাতন্ত্র সকলদিকে সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াছিলেন।

"বঙ্গদর্শনে" বাঙ্গলার কথাসাহিত্য সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। 'ভারতী'র আসরে বাঙ্গলার নবযুগের গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। নবযুগের গীতিকাব্যের কবি বিহারীলালের সঙ্গে গান ধরিলেন রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী অক্ষয়কুমার বড়াল, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রিয়নাথ সেন, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও কবিপুত্র অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উদীয়মান কবিগণ। তাহার কিছু পরে আনন্দের কবি দেবেন্দ্রনাথ ও হাসির কবি দ্বিজেন্দ্রলাল আসিয়া নব গীতিকাব্যে বৈচিত্র্য সঞ্চার করিয়াছিলেন।

বাস্তবিক, সে কি যুগই গিয়াছে! 'ভারতী'র পদ্মাসনে তখন সবে প্রভাত-'রবি'র প্রথম আলোর রেখাটি আসিয়া পড়িয়াছে। তরুণ কবির প্রাণে তখন নূতন আশা,- তাঁহার গানে তখন নূতন যুগের নূতন ভাষা!—গুরুগম্ভীর 'মেঘনাদে'র ধ্রুপদ বাজিয়াছে যে আসরে, সেখানে যে তত-শীঘ্র মুরলীর কোমল গুঞ্জন জমিয়া উঠিবে, সে-কথা তখন কেহ ভাবিতেও পারে নাই! নব-যুগের মাহেন্দ্রক্ষণে সে বিচিত্র স্তোত্র বঙ্গসাহিত্যে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে।

আর, সাহিত্যে তখন প্রাণের যে বিশুদ্ধ আনন্দ, যে গভীর আবেগ, যে একান্ত সাধনা দেখা যাইত, একালে তাহাও বোধ হয় দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে!

সাত বৎসর ধরিয়া যোগ্যতার সহিত

"ভারতী" সম্পাদন ও বাঙ্গলার মাসিক-সাহিত্যে নবজীবনের ধারা আনয়ন করিয়া প্রতিভাধর দ্বিজেন্দ্রনাথ অবসর লইলেন। এই সময়ে 'ভারতী'র প্রথমবার জীবন-সংশয় হয়। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী যদি সে-সময়ে 'ভারতী'র গুরুভার গ্রহণ না করিতেন, তবে সেই



শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

শৈশবেই 'ভারতী'র অকাল-মৃত্যু ঘটিত। সম্পাদন-ভার লইয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী বলিয়াছিলেন।ঃ—"আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত যিনি এই পত্রিকা এমন সুন্দররূপে চালাইয়া আসিয়াছেন, অন্য কার্য্যবশতঃ এখন তাঁহার সময় অভাব হইয়াছে, সে নিমিত্ত তিনি যখন সম্পাদকীয় ভার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তখন ভারতী উঠাইয়া দেওয়াই স্থির হইল। আমাদের দেশের এবং বাঙ্গলা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীর ন্যায় কোন একখানি পত্রিকার অকাল মৃত্যু বড়ই কষ্টকর। এইরূপ অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছাতেই আমরা ভারতীর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছি। * * * * অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীবনবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিজ্ঞান, দর্শন, কবিতা, আর উপন্যাসাদি এই সকল গুলিই মাসিক-পত্রিকার সাধারণ আলোচ্য বিষয় এবং এতদিন পর্য্যন্ত ভারতীতে এই সকল বিষয়ই (অধিকই হউক কি অল্পই হউক) আলোচনা হইয়া আসিয়াছে। আমরাও এখন এ সকল বিষয়ে ভারতীর প্রতিষ্ঠা সমান রাখিতে চেষ্টা করিব। তবে আমরা এখন হইতে বিজ্ঞানের মাত্রা কিছু বাড়াইতে ইচ্ছা করি—আমাদের মতে বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ উপকারিতা আছে এবং আজকাল এ দেশে বিজ্ঞান-আলোচনার কতক অনুরাগও দেখা যাইতেছে। ইত্যাদি।"

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী ১২৯১ সালে 'ভারতী'র ভারগ্রহণ করিয়া ১৩০১ সাল পর্য্যন্ত সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য-পালন করেন। ১২৯৩ সালে 'ভারতী'র সঙ্গে "বালক"ও এক হইয়া যায়। আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথের আমোলে বঙ্গসাহিত্যে 'ভারতী' যে অতুল গৌরবের অধিকারিণী হইয়াছিল, সম্পাদিকার যত্ন ও পরিশ্রমে তাহার সে গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সঞ্জীবচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" ইতিমধ্যে উঠিয়া যায়। ফলে, এ-সময়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে 'ভারতী'র যোগ্য প্রতিদ্বন্দী আর কেহ রহিল না,—'ভারতী' বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রধান মাসিক পত্রে পরিণত হইল।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী যে বৎসর 'ভারতী'র সম্পাদিকা হন, সেই বৎসরের শেষভাগে প্রচারিত একখানি বিজ্ঞাপন-পত্রে দেখিতে পাই, "ভারতী অষ্টমবর্ষ অতিক্রম করিয়া

নবম বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিল। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া নিয়মিত-প্রকাশ বঙ্গদেশের আর কোন সাময়িক পত্রিকার ভাগ্যে ঘটে নাই। * * কোন ভারতমহিলা কর্ত্তৃক ভারতীর ন্যায় সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকতা বঙ্গে কেন—ভারতবর্ষে এই প্রথম উদ্যম। * * সকল শ্রেণীর সমালোচকেরই এই মত যে, ভারতীর প্রবন্ধগুলি—বিষয়টি যতই কঠিন হউক না কেন,—লেখার গুণে এত প্রাঞ্জল ও সরল হয় যে তাহা সাধারণ সকলেই বুঝিতে পারেন।"

উদ্ধৃত স্থল হইতে আমরা জানিতে পারি যে:—(১) "ভারতী" সেকালে নিয়মিত প্রকাশে সকলের অগ্রণী ছিল। (২) "ভারতী", সমালোচকবৃন্দের প্রশংসার পুষ্পাঞ্জলি পাইয়াছিল। (৩) "ভারতী" লেখার সরলতায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।



শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

১৩০২ সালে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর সুযোগ্য বিদুষী কন্যা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী 'ভারতী'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে 'ভারতী'তে নিয়মিতরূপে প্রবন্ধাদি লিখিয়া ইঁহারা পাঠক-সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। এখন 'ভারতী'র ভার লইয়া ইঁহারা আপনাদের সম্পাদকীয় কৃতিত্বেরও পরিচয় দিলেন। ইঁহাদের সময়েও 'ভারতী'র নানাদিকে উন্নতি হইয়াছিল। কবিতায় শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর হাত বড় মিষ্ট ছিল। সরলতায় ও ভাবমাধুর্য্যে তাঁহার কবিতাগুলি সকলেরই প্রাণস্পর্শ করিত। দুঃখের কথা, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী তাঁহার কাব্য-চর্চ্চা সম্পূর্ণ করেন নাই।

১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র ভার নেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে আসিয়া 'ভারতী'র সুর ও আকার নূতনতর হইয়া উঠিল। "সাধনা" তখন উঠিয়া গিয়াছে। এই প্রসিদ্ধ পত্রিকার অকাল-মৃত্যুতে সাহিত্যসেবীরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সুযোগে "সাধনা"র ছাঁচে 'ভারতী'কে নূতনভাবে গড়িয়া তাহার সহিত প্রধানত 'সাধনা'রই সুরসংযোগ করিলেন। বাস্তবিক, এ-বৎসরের 'ভারতী'র সর্ব্বাঙ্গে 'সাধনা'র স্মৃতি এমনভাবে মাখানো, যে, উপরে 'ভারতী'র ছাপ না থাকিলে তাহাকে সহজেই 'সাধনা' বলিয়া ভ্রম হইত।

এক বৎসর পরে, ১৩০৬ সালে শ্রীমতী সরলা দেবী একাকী আবার 'ভারতী'র সম্পাদকের আসন গ্রহণ করেন। এ-সময়ে ছোট-গল্পে "ভারতী" বাঙ্গলার আর-সকল মাসিক কাগজকেই হারাইয়া দিয়াছিল। শ্রীমতী সরলাদেবী 'ভারতী'র সুরে আর-একটি নূতন বৈচিত্রের সঞ্চার করিলেন,—তাহা জাতীয়তা। দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে 'ভারতী'র ভেরী-'তে যে দীপক রাগ ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেমন জ্বলন্ত, তেমনি আবেগ-আকুল!

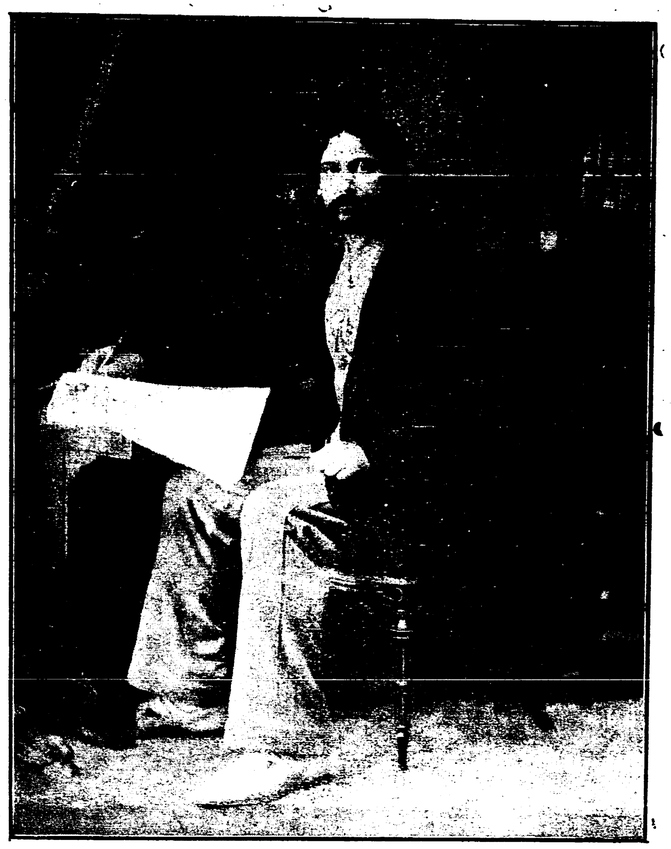

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ-সময়ে 'ভারতী'র সঙ্গে যাঁহারা ভিতরে-ভিতরে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, কেবল তাঁহারাই জানেন যে, 'ভারতী'র সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে শ্রীমতী সরলা দেবীর কিরূপ আগ্রহ,যত্ন ও চেষ্টা ছিল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বিভিন্ন সময়ে 'ভারতী'-সম্পাদনে, সম্পাদিকাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী এখনকার সম্পাদকদের মত দীন ছিলেন না। সম্পাদকেরা এখন অনেক সময়ে লেখকদের ভয় করিয়া চলেন। কিন্তু সম্পাদকীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলে শ্রীমতী সরলা দেবী অনেক ক্ষমতাবান লেখকের অনধিকার চর্চ্চাকেও মার্জ্জনা করিতেন না,—আপন কর্ত্তব্যকর্ম্মে তিনি বজ্রের মতই কঠোর ছিলেন!

শ্রীমতী সরলা দেবীর সম্পাদকতার শেষ-ভাগে 'ভারতী'র অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। সম্পাদিকা পারিবারিক কারণে বিদেশে বাস করিতেন,—সুতরাং 'ভারতী'র কার্যকর্ম্ম দেখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় যদি

এই সঙ্কট-সময়ে নানাপ্রকার বাধাবিপত্তির ভিতরেও নিঃস্বার্থভাবে 'ভারতী'র সেবা না করিতেন, তাহা হইলে 'ভারতী'র অবস্থা কি দাঁড়াইত, বলা যায় না।

১৩১৫ সালে 'ভারতী'র অবনতি দেখিয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী আবার তাহার ভার গ্রহণ করেন। "ভারতী" আবার পুরাতন আকার ধরিয়া বাহির হয়। ১৩১৬ সালে নূতন যুগের পাঠকগণের মনোরঞ্জনের জন্য প্রাচীনা "ভারতী" চিত্র-রঙ্গিন্ হইয়া উঠে। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী 'ভারতী'কে নূতন শ্রী-ছাঁদ ও নূতন উৎসাহ দিয়া তাহার পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। ১৩২১ সাল



শ্রীমতী সরলা দেবী

পর্য্যন্ত অক্লান্ত ভাবে 'ভারতী'র জন্য পরিশ্রম করিয়া শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতায় তিনি সম্পাদন-ব্রত ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

১৩২২ সালে নবীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'ভারতী'র সম্পাদকীয় আসন পাইয়াছেন।

এক বাদলের ধারা সম্বল করিয়া পুষ্করিণী কখনও পূর্ণ থাকিতে পারে না; বার-বার নব-বর্ষার প্রচুর বারিধারায় পরিপুষ্ট হয় বলিয়াই সে মৃত্তিকা-সার হইয়া যায় না। এইরূপ বারংবার নূতন সম্পাদকের নূতন প্রাণের সংস্পর্শে আসিয়া "ভারতী"র যথেষ্ট উপকার হইয়াছে; অন্য-অন্য অনেক কাগজের মত "ভারতী" তাই বৈচিত্রহীন, নির্জ্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে নাই।

"ভারতী"র কাছে বাঙ্গলার স্থায়ী সাহিত্য অনেক বিষয়ে ঋণী। এ-কালের বঙ্গ-সাহিত্য যাঁহাদের কলমের জোরে টিঁকিয়া আছে, তাঁহাদের অনেকেরই প্রতিভা ও শক্তি "ভারতী"র পদচ্ছায়ালীন পদ্মপত্রের সঙ্গে-সঙ্গেই দিনে-দিনে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। "ভারতী": যত লেখক গড়িয়াছে, যত নূতন লেখককে উৎসাহ দিয়াছে, এমন আর কেহ নয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত

জলধর সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, প্রিয়নাথ সেন, স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রতিভা দেবী, সরলাদেবী, ইন্দিরা দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, সরোজকুমারী দেবী, নিস্তারিণী দেবী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী প্রভৃতি লেখক-লেখিকাগণ হয় "ভারতী"র আশ্রয়ে প্রাথমিক সাহিত্যসেবা আরম্ভ করিয়াছেন, নয় "ভারতী"তে লিখিয়াই পাঠকসমাজে পরিচিত হইয়াছেন। এ যুগের অনেক উদীয়মান নবীন লেখকও "ভারতী"রই শিষ্য। আপন লেখকরূপে পাইয়াছে—এ-বড় কম "ভারতী"র কমলকাননে আরও কয়েকটি সৌভাগ্যের কথা নহে। (২)

নবীন লেখকের প্রতিভা জলবিন্দুর মত দুদণ্ড টলমল করিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। যেমন শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, সুকবি শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সুকবি শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, স্বর্গীয় লোকেন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব চন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। লেখনীত্যাগ না করিলে ইঁহাদের রচনাগুণে বাঙ্গলা আলো হইয়া উঠিত। (১)

বাঙ্গলাদেশে এখন এমন মাসিক আর নাই,—যাহাতে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি জীবন্ত আছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্র-নাথ—এই দুই সাহিত্য-সম্রাটকেই "ভারতী" আপন লেখকরূপে পাইয়াছে—এ-বড় কম সৌভাগ্যের কথা নহে। (২)

---

(১) ইঁহারা ছাড়া বাঙ্গালার অন্যান্য বিখ্যাত লেখকগণের মধ্যেও প্রায় অধিকাংশেরই লেখা "ভারতী"তে বাহির হইয়াছে। গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যে যখন যে লেখক আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, "ভারতী"র দেহে তখনই তাঁহাদের হস্তচিহ্ন অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। যথা,—বঙ্কিমচন্দ্র, কবিবর হেমচন্দ্র, কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, কৃষ্ণবিহারী সেন, প্রত্নতাত্ত্বিক রামদাস সেন, চন্দ্রনাথ বসু, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুকবি বরদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়-চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, কালীবর বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দেশনায়ক শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, ও শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রভৃতি। সকলকার নাম করা অসম্ভব। আসল কথা, "ভারতী"তে যেমন নবীন ও প্রবীণ লেখকের সম্মিলন দেখা যায়, তেমন বাঙ্গলার আর-কোন মাসিকপত্রে নহে।

(২) বঙ্কিমচন্দ্রের নামে এখানে একটি কথা মনে পড়িল। "প্রচারে" বঙ্কিমচন্দ্র ও "ভারতী"তে রবীন্দ্রনাথ,—এই দুই প্রতিভাবানের মধ্যে পূর্ব্বে একবার মসীযুদ্ধ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন সাহিত্য-রাজ্যের একছত্র অধিপতি এবং রবীন্দ্রনাথ নবীন অতিথিমাত্র। সেই অসম-যুদ্ধে দুইপক্ষই কিছু অসংযত হইয়া রূঢ় বাক্যব্যয় করিয়াছিলেন।

এতদিন পরে, এখনো নিন্দুকেরা সে পুরানো কথাটা ভুলিয়া যান নাই,—এই উপলক্ষ্যে

সাহিত্যের সকল বিভাগই "ভারতী"র ভিতরে স্থানলাভ করিয়াছে। বাঙ্গলায় এখন ভেড়ার লোমের মত মাসিকপত্রের সংখ্যাও অগুণ্‌তি। সে-সকল কাগজে নানা বিচিত্র বিষয় বাহির হয়। অনেক সম্পাদক আপনাদের নিজস্ব দেখাইবার জন্য নূতন নূতন নামে প্রতিবারেই কতকগুলি বিশেষ বিষয় প্রকাশ করেন; কিন্তু আমরা যদি পুরাতন "ভারতী"র জীর্ণ পাতাগুলি একবার উল্টাইয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিব যে, একালের সম্পাদকেরা অনেক সময়েই নূতনত্বের ছাপ্ মারিয়া "ভারতী"র ব্যবহৃত পুরাণো মালই বাজারে আবার বাহির করিতেছেন।

আমরা এখানে "ভারতী"র নিজস্ব বিষয়গুলির উল্লেখ করিতেছি।ঃ—

১। হেঁয়ালিনাট্য (ভারতীর সম্পূর্ণ নিজস্ব)

২। স্বরলিপি—(ঐ)

৩। ভৌগলিক প্রশ্ন—(ঐ)

৪। কুড়ানো (চুটকী গল্প)

৫। সম্পাদকের বৈঠক

(দ্বিজেন্দ্রনাথের আমোলে "ভারতী"তে নিয়মিত বাহির হইত। এই বিভাগে বিদেশের স্থায়ী ও সাময়িক সাহিত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণগুলি ধারাবাহিকরূপে উদাহৃত হইত। বাঙ্গলা মাসিকসাহিত্যে সঙ্কলনের নিয়মিত চেষ্টা, এই প্রথম। এখন সঙ্কলন, সকল মাসিকপত্রেরই একটি প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।)

৬। বিবিধ প্রসঙ্গ—(সুচিন্তিত ছোট ছোট প্রবন্ধ)

৭। সম্পাদকের চিত্রচয়ন

("সম্পাদকের বৈঠকের"ই রূপান্তর। এ বিভাগটি আজকাল "চয়ন" নামে "ভারতী"তে বাহির হইতেছে।)

৮। কাব্যজগৎ

(শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এই বিভাগটিতে এদেশী পাঠকদের সঙ্গে নিয়মিতরূপে বিদেশী বিখ্যাত কবিগণকে পরিচিত করিয়া দিতেন।)

৯। সাময়িক প্রসঙ্গ (পরে "সাময়িক কথা")

১০। সমসাময়িক সাহিত্য—

(রবীন্দ্রনাথ যখন "ভারতীর" সম্পাদক, "ভারতী"তে তখন মাসিক-সাহিত্যের সমালোচনা বাহির হইত। অবশ্য, নিয়মিত মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা "ভারতী"র নিজস্ব হইলেও, "ভারতী"ই এ-পথের প্রথম পথিক নহে।)

১১।—রাজ্যের কথা।

তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি চোখা চোখা বাক্য-বাণ নিক্ষেপ করিতে ছাড়েন না। অথচ, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সে হাল্‌কা ব্যাপারটি একেবারেই মনের ভিতরে পুষিয়া রাখেন নাই। কারণ, "ভারতী"তে সেই মসীযুদ্ধের ঠিক পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের নাম 'ভারতী'র লেখক-তালিকায় পাই। এই সামান্য ঘটনা হইতে একালের অনেক শূন্যগর্ভ অভিমানী সাহিত্যসেবী যথেষ্ট শিক্ষা পাইতে পারেন। সাহিত্যক্ষেত্র সত্য-নির্দ্ধারণের ক্ষেত্র; এখানে মতভেদ ও সেই সূত্রে দু-চারিটা কটু-বাক্যের ব্যবহার নর-প্রকৃতিতে খুবই স্বাভাবিক!—কিন্তু সেজন্য যাঁহারা শত্রুতার সৃষ্টি করেন, তাঁহারা একান্ত ঘৃণিত জীব। কোন কাগজে কারণবিশেষে অপ্রিয় সমালোচনা হইয়াছে বলিয়া, যাঁহারা সে কাগজের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত হন, তাঁহারা যেন সাহিত্য-সম্রাটের এই উদারতার দৃষ্টান্ত মনে রাখেন।

এখন অন্যান্য মাসিকপত্রে দেশের কথা বাহির হয়। দেশের কথায় যাহা থাকে, "রাজ্যের কথা"য় তাহাই থাকিত।

১২।—রাজনৈতিক আলোচনা (এখন "নিষিদ্ধ ফলে" পরিণত।)

১৩। জিজ্ঞাসা-উত্তর

কেহ কোন "প্রশ্ন" পাঠাইলে "ভারতী"র এ-বিভাগে ছাপাইয়া তাহার উত্তর দেওয়া হইত।

১৪। খেয়াল-খাতা (বিবিধ বিষয়ের বিচিত্র আলোচনা—হাল্‌কা ধরণের লেখা। গদ্য ও পদ্য দুই-ই থাকিত।)

১৫। বাঙ্গলা রঙ্গালয় (বা অভিনয়-সমালোচন)

১৫। আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার (এ-বিভাগে বঙ্গের লুপ্তপ্রায় প্রাচীন ঐতিহাসিক সম্পদের সংগ্রহণ হইত।)

"ভারতী"র এতগুলি নিজস্ব আছে।

আগেই বলিয়াছি এ-যুগের গীতিকাব্য "ভারতী"র কুঞ্জেই প্রথম ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। গীতিকাব্য ও ছোটগল্প নূতন যুগের নূতন জিনিষ। অনেকেই বোধ করি জানেন না যে, মৌলিক ছোটগল্পও সর্ব্বপ্রথমে "ভারতী"তেই বাহির হইয়াছে। প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যায় "ভিখারিণী" নামে একটি গল্প এবং তৃতীয় বৎসরে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "মালতী" প্রকাশিত হয়। এই দুইটিই অনেকটা ছোট-গল্প-ঘেঁষা; কিন্তু ঠিক ছোট গল্প কিনা তাহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। "ভারতী"র অষ্টম বর্ষে অর্থাৎ ১২৯১ সালে রবীন্দ্রনাথের "ঘাটের কথা" বাহির হয়। তাহার ভিতরে ছোট গল্পের যথেষ্ট লক্ষণ আছে। পরবৎসরে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের "সুলোচনা" একটি চমৎকার ছোটগল্প। তাহার পর অন্য-কোন মাসিকপত্রে ছোটগল্প বাহির হইবার আগে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতির লিখিত ছোটগল্প "ভারতী"তে বাহির হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথম ছোটগল্প বাহির হয় "সাহিত্য" পত্রে। আমাদেরও পূর্ব্বে সেই ধারণা ছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, এ-কথাটি একেবারেই ঠিক নয়। কারণ "সাহিত্য" যখন জন্মায় নাই, "ভারতী"তে তখন একটি-দুটি নয়,—অনেকগুলি ছোটগল্প প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। আবার ছোটগল্পে এখন যাঁহারা ওস্তাদ, তাঁহাদের সকলকার লেখাই "ভারতী"তে আছে।

পুরাতন "ভারতী"তে, প্রায় প্রতি সংখ্যায় প্রচুর পরিমাণে সাহিত্য-প্রবন্ধ দেখিতাম,—একালের সকল মাসিকেই এদিকটি একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। এজন্য সম্পাদকেরা দায়ী,—না, নবরুচির পাঠকেরা? —দায়ী যে-পক্ষই হউন, সাহিত্যের পক্ষে এ-বড় সুসংবাদ নহে। "ভারতী"তে পূর্ব্বে সাহিত্য-সম্পর্কীয় কত সরস লেখাই থাকিত, —ভাষার কথা, কাব্যের কথা, কবির কথা, সাহিত্য লইয়া আলোচনা, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের বিচার, স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্যের প্রসঙ্গ এবং সমালোচনা প্রভৃতি এম্‌নি-কত-কি!—এ-সব বিষয়ে তখনকার লেখকদের যেমন আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল, তেমনি বিচার-নিপুণতা ও লিপিকুশলতাও প্রকাশ পাইত। এ-বিভাগে "ভারতী"তে সাধারণত লেখনীচালনা করিতেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ও

শ্রীমতী সরলাদেবী প্রমুখ লেখকলেখিকাগণ। কেবল "ভারতী" বলিয়া নয়,—সে-যুগের আর-আর মাসিকেও সাহিত্য-প্রবন্ধের আধিক্য দেখিয়া বুঝা যায় যে, এখন যেমন গল্প নহিলে কাগজ অচল, তখন তেমনি এ-ধরণের লেখা না থাকিলে কোন কাগজ চলিত না। বলেন্দ্রনাথের প্রাচীন বাঙ্গালী কবির কাব্য-আলোচনা ও শ্রীমতী সরলা দেবীর সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা প্রভৃতি একসময়ে "ভারতী"র প্রধান বিশেষত্ব ও বিশেষ লোভনীয় বিষয় ছিল। সাধারণ সাহিত্যপত্রে তাম্রশাসনের এই বিষম শাসনের দিনে, "ভারতী"র সাহিত্য-অংশটি আবার যদি পূরন্ত হইয়া উঠে তবে অনেকেই যে আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাস্তি!

দলাদলি ও নীচতার জন্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে বরাবরই নানারূপ অপ্রিয় আন্দোলন হইয়াছে। মাসিকপত্রের একটি প্রধান গুণ হইতেছে তাহার অসাম্প্রদায়িকতা। মাসিক-পত্র কোন দলের বা ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে—সকলের আগে তাহার উপর সর্ব্বসাধারণের অধিকার। মাসিকের সম্পাদক, সকল শ্রেণীর মতামত প্রকাশ করিতে বাধ্য,—কারণ তিনি মধ্যস্থমাত্র। আমরা এ-কথা বলিতেছি না যে, সম্পাদক তাঁহার স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে পারিবেন না। সম্পাদক যেমন আপনার বা স্বপক্ষের মতও প্রকাশ করিবেন, বিপক্ষের মতও তেমনি নির্ব্বিকার-চিত্তে প্রকাশ করিবেন। এই নীতি যিনি মানিয়া চলেন, তিনিই আদর্শ-সম্পাদক।:

"ভারতী" কখনও দলাদলির পঙ্কিল কূপে পড়িয়া আপনার গায়ে কাদা মাখে নাই—অথচ আপন স্বাতন্ত্র্য বরাবর বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। "ভারতী"র পবিত্র সাহিত্য-সাধনার মধ্যে কখনও কোন বিশেষ সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে নাই।

"ভারতী"র নির্ভীকতা ও স্বাধীনতার একাধিক দৃষ্টান্ত তাহার সমালোচনার মধ্যে পাওয়া যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের যখন প্রবল প্রতাপ, তাঁহার বিরুদ্ধে যখন কেহ একটি আঙ্গুল তুলিতেও ভরসা করিতেন না, তখন তাঁহার কবিতাবলীর সমালোচন-প্রসঙ্গে "ভারতী"র সমালোচক স্পষ্ট ভাষায় দেখাইয়াছিলেন যে, কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্রের কিছুই গুণপনা নাই। এইরূপ নির্ভীকতার জন্য "ভারতী" তাহার নিজের-হাতে মানুষ-করা অনেক প্রসিদ্ধ লেখককে শত্রু করিয়াছে, এখানে সে-সব কথা প্রকাশ না করিলেও চলে।

"ভারতী" জনসাধারণের কাগজ; সাধারণের কাছে যাহার আদর, 'ভারতী'ও তাহার আদর করিয়াছে। এদেশের রঙ্গালয়গুলি নানাকারণে শ্রেণীবিশেষের কাছে অনাদৃত ও অপমানিত হইয়া থাকে। ফলে বাঙ্গলা রঙ্গালয়ের কতগুলি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য অনেকে তাহার ভাল দিকটাও অবহেলা করেন। বাঙ্গলা রঙ্গালয়ের কথা লইয়া যে ভদ্রসমাজে সঙ্গত ও শ্লীল আলোচনা হইতে পারে, নব্যশিক্ষিতেরা তাহা কখনও ভাবিয়া দেখেন নাই। অথচ বাঙ্গলা রঙ্গালয় সাধারণ বাঙ্গালীকে আনন্দ ও শিক্ষা দিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করে না। 'ভারতী'র সূক্ষ্মদর্শী সম্পাদক বুঝিলেন যে বঙ্গের রঙ্গালয়গুলিতে যখন সাধারণের

গতায়াত আছে, তখন তাহাদের দোষ-গুণের প্রতি উদাসীন থাকিলে সাধারণের অপকার করা হইবে। বিশেষ, অভিনয়-কলা সভ্যতার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ,—তাহাকে উপেক্ষা করা চলে না। এইজন্য 'ভারতী'র আবির্ভাবকাল হইতেই তাহাতে বঙ্গ-রঙ্গভূমি লইয়া আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। ফলে জনকত শুচিবায়ুগ্রস্ত নীতিবাগীশ নাসাকুঞ্চন করিলেও সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যসাধন ও উদারতার জন্য 'ভারতী' সর্ব্বসাধারণের সমাদর-লাভ করিয়াছিল।

আমরা এইখানেই 'ভারতী'র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সমাপ্ত করিলাম। প্রাচীনা 'ভারতী' যখন বাঙ্গলার এই ক্ষণজীবী মাসিক-সাহিত্যের মধ্যে এত ঝড়-ঝাপটা সহিয়াও এতকাল বাঁচিয়া আছে, তখন তাহার জীবন নিশ্চয়ই অনাবশ্যক নহে; অতএব, ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, বর্ষীয়সী হইলেও 'ভারতী' যেন চিরজীবিনী ও চিরযৌবনা হইয়া উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইতে পারে। (৩)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

(৩) 'ভারতী'র প্রথম প্রকাশকাল হইতে তাহাতে যে-সকল রচনা বাহির হইয়াছে, তাহার সকলগুলি পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথের বিখ্যাত দার্শনিক প্রবন্ধ ও তাঁহার কবিতাময়ী রসরচনাগুলি পুরাতনের জীর্ণ কবল হইতে এখনও কেহ উদ্ধার করেন নাই। তা-ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা এখনও "ভারতী"র অজ্ঞাত পৃষ্ঠায় লিপ্ত আছে। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে;—বিশেষ করিয়া তাঁহার সাহিত্য-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি, প্রকাশিত হওয়া উচিত। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর কতক লেখা, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলাদেবী'র অসংখ্য উপাদেয় প্রবন্ধাদি, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কবিতাবলী, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতিরও বিবিধ রচনা এখনও পুনঃপ্রকাশের দাবি রাখে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, এ-গুলি বইএর আকারে বাহির করিলে বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বাড়িবে। শ্রীমতী প্রতিভা দেবী ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর গানের স্বরলিপিগুলিও গ্রন্থকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে তাঁহাদের কৃতিত্ব অসামান্য; শিল্প-কলার একটি দিক তাঁহারা পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। "ভারতী"র পাতায় পাতায় আরও কত ভাল লেখকের কত-যে প্রাণের জিনিষ লুকানো আছে, এখানে সে-সকলের নামমাত্র উল্লেখ করাও অসম্ভব।

"ভারতী"র মধ্যস্থতায় ও সাহায্যে বঙ্গসাহিত্য যে-সকল রত্নলাভ করিয়াছে এবং যেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া সাহিত্য-সমাজে অল্পবিস্তর আন্দোলনের সূত্রপাত অথবা লেখককে জনসাধারণের সহিত পরিচিত করিয়াছিল, এখানে তাহার একটি অসম্পূর্ণ (সম্পূর্ণ তালিকার স্থানাভাব) তালিকা দিলাম।—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বউঠাকুরাণীর হাট, ভগ্নহৃদয়, ভানুসিংহের পদাবলী, চিরকুমার সভা, নষ্টনীড় ও গদ্যেপদ্যে বিবিধ রচনা। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রায় সমস্ত উপন্যাসই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "লীলা" ও ছোট গল্প। স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "ফুলজানি"। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের "বোম্বাইচিত্র" প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ-সাহিত্য প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধিকাংশ রচনা। স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু রচনা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয়ের সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাশিম। স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহের অধিকাংশ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। স্বর্গীয়

সাহিত্যিক স্মৃতি

(১)

আজ ১২।১৪ বৎসরের কথা। ভারতী তখন শ্রীমতী সরলা দেবীর হাতে ছিল। তখনকার নানাবিধ আন্দোলন ও সভা-সমিতির সঙ্গে জড়িত থাকিয়া তিনি পত্রিকা-খানির জন্য চিন্তা করিবার অবসর পাইতেন না, আমার উপর প্রায় সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। আমি যে সকল প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিতাম ও নিজে লিখিতাম, তাহা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে "মহতাশ্রমের" পার্শ্বে একখানি দোতালা বাড়ীর উপরে বসিয়া তিনি বেলা ৩টা হইতে ৫½ টা পর্য্যন্ত সপ্তাহে দুই দিন শুনিতেন; এই বাড়ী হইতে বাবু কেদারনাথ দাসগুপ্ত তাঁহার "ভাণ্ডার" নামক মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিলেন। বাড়ীটিতে ভারতীর কাজ-কর্ম্মের জন্য একখানি ঘর ছিল, এই ঘরে কোন কোন সময় সাহিত্যিক সুহৃদ্বর্গের মিলন হইত। এইখানে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি ভারতী-সম্পাদিকার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। এই ঘরে কেদারবাবু প্রায়ই আসিয়া রবিবাবুর কবিতা নানা ভঙ্গীতে আবৃত্তি করিয়া আমার মন বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেন বলিয়া আমি সম্পাদিকাকে কহিয়া তাঁহার প্রবেশ মানা করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। নানারূপ ফল ও উপাদেয় সন্দেশাদির উপঢৌকন লইয়া তিনি ঘরে ঢুকিতেন ও আমাদের আইন-কানুন রদ করিয়া দিতেন।

রামদাস সেনের অনেক রচনা। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের হিমালয়। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের পল্লীচিত্র প্রভৃতি। কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর অনেক কবিতা। কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের অনেক কবিতা ও "দগ্ধকচু"। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের উড়িষ্যার চিত্র। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনেক ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী ও রমাসুন্দরী নামে তাঁহার প্রথম উপন্যাস। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের অনেক কবিতা। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের প্রথম উপন্যাস নারায়ণী। শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসুর "শারীর-স্বাস্থ্যবিধান"। শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর অনেক কবিতা। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর অনেক কবিতা। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস "স্রোতের ফুল"। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ও অনুরূপা দেবীর প্রথম উপন্যাস অন্নপূর্ণার মন্দির এবং পোষ্যপুত্র ও বাগ্দত্তা। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস বড়দিদি। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনেক কবিতা। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর অনেক কবিতা। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের অধিকাংশ রচনা,—প্রভৃতি।

দেখা যাইতেছে, ঔপন্যাসিকরূপে অনেকেরই প্রথম পরিচয় "ভারতী"র আসরে। ইহার কারণ বুদ্ধিমানেরা অনুমান করুন।—লেখক।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় নিজের হাতে নিজের নাম বসাইয়া দিতে সঙ্কোচ করিয়াছেন; তাঁহার নাম উল্লিখিত তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত। তিনি অন্তরালে থাকিয়া ভারতীর সেবা করিতেছেন; তাঁহার নিকট আমরা নানারূপে ঋণী। আমরা এই সুযোগে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।—ভারতী-সম্পাদক।

এতদূরে আসিয়া সম্পাদিকার ভারতীর কাজ করিবার কারণ এই যে, তাঁহার বাড়ী বালিগঞ্জ আমার বাড়ী শ্যামবাজার হইতে বহুদূর; এজন্য প্রথম কয়েক মাস বালিগঞ্জ ঘন ঘন যাতায়াত করার পর বালিগঞ্জ যাওয়ার পক্ষে আমার অসুবিধা জানাইয়াছিলাম; এ-জন্যই এই নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

ভারতী-সম্পাদিকা কাজের ভার প্রায় সমস্তই আমার উপর ছাড়িয়া দিলেও পত্রিকা-খানির উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রবন্ধ লিখিবার বেশী অবসর পাইতেন না, কিন্তু আয়-ব্যয়ের খবরটা তিনি রাখিতেন; —এ সম্বন্ধে ভার ছিল কেদারবাবুর উপর। যেটুকু লিখিতেন, তাহা চমৎকার হইত। কোন কোন সময় পুস্তক সমালোচনা করিতেন। তিনি অতি অল্প কথায় ভাবের সমাবেশ করিতে জানেন, তাঁহার লেখায় বাক্যপল্লব ও বৃথা কথার আড়ম্বর আদৌ নাই, হঠাৎ ছবির মতন সুন্দর সুন্দর দৃশ্য তাঁহার রচনায় ভাসিয়া উঠে। যাহাতে তাঁহার এই লিপিকুশলতায় ভারতীর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়, এজন্য আমি সর্ব্বদা তাঁহাকে তাগিদ্ করিয়া বিরক্ত করিতাম, এই বিরক্তির ফলে তিনি ক্রমাগতঃ প্রতিশ্রুতি দান করিয়া প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিতেন। কিছু লিখিতে বসিয়াছেন, অমনই রাণী মৃণালিনী আসিলেন কিংবা শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী আসিলেন, নিদেনপক্ষে জোড়াসাঁকোর তলব বা চৌধুরী-বাড়ীর নিমন্ত্রণ ত আসিবেই। এই ভাবে অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ অসমাপ্ত থাকিয়া যাইত।

নূতন সাহিত্যিক দলের মধ্যে শ্রীমান মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় বালিগঞ্জের বাড়ীতে সর্ব্বদা যাইতেন। তখন মণি তরুণ বালক। মণিকে যেদিন আমি প্রথম দেখি, সেই দিনই আমি তাহার প্রতিভাদীপ্ত মুখখানি ও সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া আকৃষ্ট হই। মণিলাল সরলা দেবীকে ভয় করিতেন। তাঁহার কয়েকটি কবিতা তিনি গোপনে আনিয়া আমাকে দেখান, তাঁহার আশঙ্কা ছিল সরলাদেবী কবিতা লেখার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিবেন। সেই সন্তর্পিত, অতি-লজ্জিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে কয়েকটি কবিতা আমার বেশ ভাল বলিয়া মনে হইল। একটি ভারতীতে ছাপাইলাম। সরলাদেবী ছাপার পর তাহা দেখিয়া বলিলেন, "আপনি করিয়াছেন কি, ছেলেটির আখের নষ্ট করিতে দাঁড়াইয়াছেন! ইহার পর এ'কে কবিতার রোগে পাইয়া বসিবে।" কিন্তু মণির কতকগুলি কবিতা আমি সম্পাদিকাকে পড়িয়া শুনাইলাম! তাঁহার মুখে প্রীতির হাসি ফুটিয়া উঠিল এবং তিনি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "তা' আমি আগেই জানিতাম, মণির রচনা-শক্তি আছে, কিন্তু সে এখনও বালক, ইহা স্মরণ রাখিবেন।" কিন্তু ইহার পর হইতে প্রায় প্রতি মাসেই মণির কবিতা ভারতীতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। আজ শ্রীমান মণিলাল ভারতীর সম্পাদক। তাঁহার রচনার সরল মাধুর্য্য এখন অনেক লেখক অনুকরণ করিতে প্রয়াসী; আমি এই ঘটনায় বিশেষ প্রীত, তাহা বলা বাহুল্য। ভারতীর অন্যতম সম্পাদক সৌরীন্দ্রবাবু কলেজে পড়ার সময় ভবানীপুরের সাহিত্য-সমিতিতে বক্তৃতা করিবার জন্য আমাকে প্রায়ই লইয়া যাইতেন, তখন জানিতাম

না—ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে অল্প সময়ের মধ্যে এতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। সেই সময় প্রিয়দর্শন, সদাপ্রফুল্ল চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীর পতাকার নীচে আসিয়া জুটিয়াছিলেন। এই তরুণের দল এখন লিপি-চাতুর্য্যে প্রবীণের দলকে ছাপাইয়া উঠিতে প্রয়াসী। কিন্তু যেদিন ইঁহারা উদ্দাম উৎসাহ লইয়া সবিনয়ে সাহিত্যিক দলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সে দিনের কথা মনে পড়িলে আনন্দ হয়!

(২)

এই সময় নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গদর্শনের সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল। রবিবাবু অনেক সময় বোলপুর থাকিতেন; শৈলেশবাবু মাঝে মাঝে কাগজের তাড়া লইয়া আমার কাছে উপস্থিত হইতেন। রবিবাবুর উদ্যোগে বঙ্গদর্শন চালাইবার জন্য ও সাহিত্যিক চর্চ্চার নিমিত্ত আমরা মজুমদার লাইব্রেরীর উপরে একটা সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। রবিবাবু যখন অনুপস্থিত থাকিতেন তখন এই আড্ডায় যতীনবাবু অনেক সময় তাঁহার কীর্ত্তন ও কথকতার নকল শুনাইয়া আমাদিগকে হাসাইতেন। শৈলেশবাবুর নধর কান্তি আজ আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। তাঁহার মুখ হইতে সোজা লাইন নীচের দিকে টানিলে ভুঁড়িটি অন্তত এক ফুট দূরে প্রমাণিত হইত। এই ভুঁড়ি দোলাইয়া হাসি-মুখে যখন তিনি উপস্থিত হইতেন, তখন বন্ধু-বর্গের আহ্লাদের সীমা থাকিত না। কি জানি কোন্ অজ্ঞাত কারণে সকলের বিদ্রূপের লক্ষ্য হইতেন শৈলেশবাবু। বোধ হয় তাঁহার অমায়িক চরিত্র ও নিরীহতা এই বিদ্রূপ আমন্ত্রণ করিত; কেহ বা তাঁহার দেহের পরিসর লক্ষ্য করিতেন, কেহ বা তাঁহার বুদ্ধির সূক্ষ্মতা, বিশেষ হিসাব রক্ষার বন্দোবস্ত লইয়া তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেন। শৈলেশবাবু উত্তর দিতে ছাড়িতেন না, তিনি সকল ঠাট্টাতেই আমোদ অনুভব করিতেন, যেগুলি নিতান্ত তীব্রভাবে তাঁহার গায়ের উপর পড়িত তাহাতেও তিনি হাসিতেন। এমন উদারচেতা ভোলা-মহেশ্বর সংসারে কমই আছে। বঙ্গদর্শনের লেখকবর্গকে তিনি মুক্তহস্তে টাকা দিতেন,—অর্থাৎ যখন হাতে টাকা থাকিত। এই ব্যক্তি অদৃষ্টের কি রহস্যে পুস্তকের দোকান খুলিয়াছিলেন জানিনা, হিসাব-সম্বন্ধে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান একবারে ছিল না। বন্ধুদের জন্য টাকা খরচ করিতে তাঁহার মত মুক্তহস্ত প্রায় দেখা যায় না। ধার দিলে তাঁহার কাছে ফিরিয়া পাওয়া বড় শক্ত ছিল, নিজের হউক, পরের হউক টাকা পাইলে তাহা খরচ করিতে কোন দ্বিধা বোধ করিতেন না, অথচ যাঁহাদের নিকট হইতে ধার করিতেন, তাঁহারা কিছুতেই নির্ম্মম হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করিতে চাহিতেন না। একজনকে আমি জানি তিনি শৈলেশবাবুকে ৩০০০৲ টাকা ধার দিয়াছিলেন; শৈলেশবাবুর কাছ হইতে কোন ক্রমেই তিনি তাহা আদায় করিতে পারিলেন না, অথচ মেয়াদ চলিয়া যায়। ঋণদাতার অবস্থাও খুব সম্পন্ন ছিল না,—কিন্তু তথাপি তিনি নানা লোকের উত্তেজনা পাইয়াও টাকার জন্য নালিশ করেন নাই, তিনি যাহা আমাকে বলিয়া

ছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। "শৈলেশ কাহাকেও ঠকাইবার মতলব করে না, পরের উপকারের জন্য সে সর্ব্বদা উদ্যত, তাহার দেবচরিত্রের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তাহার হাতে টাকা না থাকিলে কোথা হইতে দিবে? আমি এরূপ লোককে লাঞ্ছনা করিতে কখনই অগ্রসর হইব না।"

শৈলেশবাবুর "দাদার কাণ্ড" যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন তাঁহার গল্প-লিখিবার কেমন সুন্দর ক্ষমতা ছিল, তাঁহার "চিত্র-বিচিত্র" অতি চমৎকার পুস্তক। আমার মনে হয় তাঁহার দাদা শ্রীশ মজুমদার মহাশয় হইতে তাঁহার নিজের লিপি-শক্তি কম ছিল না। ভগবান তাঁহাকে বেশ উচ্চদরের প্রতিভা দিয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্যিক আসরে শৈলেশবাবু এমন নিরীহ ভাবে, এমন বিনীত হইয়া থাকিতেন, যেন তিনি সকলের চেয়ে কত নীচু! এই অনাড়ম্বর ভাবটিতে তাঁহার চরিত্র বড় মধুর করিয়া তুলিয়াছিলেন। একবার শৈলেশবাবু একটা বড় সাহসিকতার কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রবিবাবু বঙ্গদর্শনের সম্পাদক; তাঁহার নামটার ঠিক্ নীচে শৈলেশ ভায়া নিজের নামটি "সহ-সম্পাদক" বলিয়া ছাপাইয়া ফেলিয়াছিলেন। রবিবাবু হাসিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"সহ-সম্পাদক" নহে, "দুঃসহ সম্পাদক।" আমি তাঁহার ঠাট্টাটি মনে গাঁথিয়া রাখিলাম এবং যখন-তখন তাঁহাকে "দুঃসহ সম্পাদক" বলিয়া পরিহাস করিতাম। শৈলেশবাবু যথারীতি মুখে হাসিতেন বটে, কিন্তু ঠাট্টাটি তিনি বেশ আমোদকর বলিয়া বোধ হয় মনে করিতেন না, কারণ এই উপাধিটি যিনি দিয়াছেন, তাঁহার কথা পাছে এই প্রসঙ্গে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় সভয়ে তিনি কথা অন্য-দিকে পাড়িতে চেষ্টা করিতেন।

একবার শৈলেশবাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমি বড় জব্দ হইয়াছিলাম। যেদিন খাওয়াইবার কথা ছিল তাহার দুই তিন দিন আগে আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলাম। নানা কার্য্যের বাহুল্যে আমি একবারে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সে দিন বেলা ১২ টার সময় খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া আমি আমার গল্পের বই "তিনবন্ধুর" প্রুফ দেখিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম "ধীর কুঞ্জর, গতি মন্থর" শৈলেশবাবু বাহু এবং দেহ দোলাইতে দোলাইতে আসিতেছেন। গৃহ-দ্বারে তাঁহাকে দেখিয়াই আমার নিমন্ত্রণের কথা মনে হইল এবং মুখ শুকাইয়া গেল। তখন বাড়ীর সকলেরই খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। যে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর হাঁড়ির একটি শাককণা লইয়া বিপদে তাঁহার মান রক্ষা করিয়াছিলেন, আতঙ্কিত চিত্তে তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে বলিলাম, "এই যে শৈলেশবাবু, আসুন, এত দেরি হইল যে?" শৈলেশ-ভায়া আমার মুখ দেখিয়াই মৌখিক ভদ্রতার মূল্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে গোপন করিতে পারিলাম না। অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া বাজারের লুচি সন্দেশ খাওয়াইয়া বিদায় করিলাম। শৈলেশবাবু ইহার একদিন প্রতিশোধ লইতে চাহিয়াছিলেন। তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

অম্ল-মধুর

প্রবীণা ভারতী চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। সেই উপলক্ষে কিছু বলিবার জন্য বর্ত্তমান সম্পাদক এই অক্ষম ভারতী-সেবককে আহ্বান করিয়াছেন। ভারতী এককালে আমাকে সেবার অধিকার দিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি ঋণী আছি। বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থায় সেই ঋণ পরিশোধে আমার সামর্থ্য নাই। দুই চারিটা কথা বলিয়া শ্রদ্ধাভাজন সম্পাদকের অনুরোধ রক্ষা করিব মাত্র।

শৈশবেই বাঙ্গলা মাসিক-পত্রিকার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল। আমার যখন আট বৎসর বয়স, আমি যখন গ্রাম্য পাঠশালায়, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়। আমাদের বাড়ীতে বঙ্গদর্শন যাইত। লুকাইয়া বঙ্গদর্শন পড়িতাম। সব বুঝিতাম না। বিষবৃক্ষের অধ্যায়ের হেডিং-গুলা,—নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা, কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন-দর্শন, পদ্মপলাশলোচনে তুমি কে?—ইত্যাদি হেডিংগুলা কিরূপে মনের উপর একটা চমক দিত। তখন বিষবৃক্ষের রস আস্বাদনের ক্ষমতা জন্মায় নাই—অথচ পড়িতাম, লুকাইয়া পড়িতাম।

ক্রমে আর্য্যদর্শন বাহির হইল। তাহাতেই প্রথম জানিলাম যে আমরা আর্য্যজাতি, জানিয়া একটা অহমিকা জন্মিয়াছিল, তাহা মনে আছে। পরে বান্ধব বাহির হইল। বয়স্কদের মুখে প্রভাত-চিন্তার গুরুগম্ভীর প্রবন্ধগুলার প্রশংসা শুনিতাম, কিন্তু পড়িয়া আয়ত্ত করিতে পারিতাম না। এই পর্য্যন্ত মনে আছে, যখন এগার বৎসর বয়স, তখন আর্য্যদর্শনে ও বান্ধবে নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধের সমালোচনা পড়িয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিলাম। ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের সহপাঠীদের মধ্যে চারি পয়সা করিয়া চাঁদা তুলিয়া একখানা "পলাশীর যুদ্ধ" কলিকাতা হইতে খরিদ করিয়া আনাই।

আর একটু বয়স হইলে পুরাণ বঙ্গদর্শনের, পুরাণ বান্ধবের, পাতা উল্টাইয়া পুরাতন কবিতা, পুরাতন প্রবন্ধ, পড়িতাম; পড়িয়া আনন্দ পাইতাম। ইস্কুলের পাঠ্য পুস্তকে যে রসের সন্ধান মাত্র পাওয়া যাইত না, তাহার আস্বাদন পাইয়া পুলকিত হইতাম। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাবের গাম্ভীর্য্য ও ভাষার ছটা তখন মোহ আনিত। "ভালবাসা এক মহাযজ্ঞ, এ যজ্ঞের আহুতি স্বার্থ, এ যজ্ঞের দক্ষিণা মান।"—"তোমার মণিমুক্তার মোহনমালা দূরে রাখ, আমি মনুষ্যের নয়নবিলম্বিনী অশ্রুমালা নিরীক্ষণ করিয়া লই।"—"অশ্রু ঝরে কার? না, যার হৃদয় আছে। মনুষ্য কে? না, যে হৃদয়বান্"—প্রভৃতি বাক্যাবলীর ভাষার ঝঙ্কার ও ভাবের মোহ এখনও আমাকে অভিভূত করে।

বয়স হইল, সাহিত্যের রস-পিপাসা বাড়িল বটে, কিন্তু বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব প্রভৃতি ক্রমে অদৃশ্য হইল। অল্পজীবী মাসিক সাহিত্যের প্রতি রাগ হইতে লাগিল।

যখন কলিকাতায় আসিয়া কালেজে পড়িতেছি, তখন ঢাক বাজাইয়া নবজীবন বাহির হইল। সংবাদপত্রে ঘোষণা বাহির হইবামাত্র, দেহে নবজীবন সঞ্চারের স্ফূর্ত্তি লাভ করিলাম; ঘোষণামাত্র ৫১ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটে কার্য্যালয়ে গিয়া মূল্য দাখিল করিয়া গ্রাহক হইয়া আসিলাম। মাসের পয়লা তারিখে নবজীবনের প্রত্যাশায় ব্যাকুল হইয়া বসিয়া থাকিতাম; সূর্য্য অস্ত যাইত, রাত্রি নয়টা বাজিত, পত্রিকা না পাইয়া হতাশ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকেরা কেবলই অসময়ে পত্রিকা বাহির করিবেন, ইহা মনে করিয়া ধৈর্য্যচ্যুতি হইত, মনে মনে গালি পাড়িতাম; ঘরে বসিয়া আমার নিষ্ফল ক্রোধ তাঁহাদের গায়ে লাগিত না; তাঁহাদের সহিষ্ণুতা টলাইত না।

নবজীবনের প্রথম বর্ষেই হঠাৎ একদিন মাসিক-পত্রিকার লেখক হইয়া পড়িলাম। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলাম। যে পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার, লেখক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, তাহাতে স্বনামে প্রবন্ধ পাঠাইতে সাহসী হইলাম না; বেনামিতে পাঠাইলাম। কিন্তু পত্রিকার চতুর সম্পাদক কিরূপে প্রবন্ধলেখককে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। নিজ নামেই প্রবন্ধটি বাহির হইল। সম্পাদকের ছুরিকার আঘাতে প্রবন্ধটি ক্ষতবিক্ষত হইয়া বাহির হইয়াছিল; তাহাতে আমি উপকৃত হইয়াছিলাম,। গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতের মত উহা আমি স্বীকার করিয়াছিলাম। বাঙ্গলা সাহিত্যে আমার গুরুমহাশয়ের সেই শাসন আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণে রাখিব।

তারপর নবজীবনে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি,—কতক স্বনামী, কতক বেনামী। এইরূপে আমার সাহিত্য-সেবার সূত্রপাত।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন চারি বৎসরের পর বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। নবজীবনও চারি বৎসরেই অন্তর্দ্ধান করিল। সাময়িক পত্রিকার উপর আমারও রাগ বাড়িল। কয়েক বৎসর গোসা করিয়া বাঙ্গলা মাসিক পড়া ছাড়িয়া দিলাম।

কালেজ হইতে বাহির হইয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। কোন্ কাগজ পড়িব? বাঙ্গলা মাসিকের তুলনায় ভারতী তখন বয়ঃস্থা হইয়া পড়িয়াছে; হয়ত উহা হঠাৎ ফাঁকি হইয়া অন্তর্দ্ধান করিবে না। অতএব ভারতীর গ্রাহক হইলাম। মাননীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী তখন সম্পাদিকা। ভারতীতে হেঁয়ালি-নাট্য তখনও বোধ করি বাহির হইতেছে। ভারতীতেই আমি বলেন্দ্রনাথের রচনার প্রথম পরিচয় পাইলাম—ইহা একটা পরম লাভ মনে করিয়াছিলাম।

তখন কংগ্রেসের নূতন অভ্যুদয়—আমি তখন ঘরে বসিয়া উৎকট কংগ্রেস-ওয়ালা। কংগ্রেসের খবর পাইবার জন্য মন আন্‌চান্ করিত। ভারতীতে কংগ্রেসের আলোচনা থাকিত;—ভারতীর প্রতি আকর্ষণের ইহাও একটা প্রধান কারণ।

নূতন বেশ-ভূষায় সাধনা বাহির হইল। সাধনায় আমার নূতন করিয়া হাতে-খড়ি হইল। তখন আমি রিপণ কালেজে আসিয়াছি—সম্পাদকের দল আমাকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। সাহিত্য-সম্পাদক আমাকে একবারে বাঁধিয়া ফেলিলেন। অনেকের

আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলাম। ভারতী-সম্পাদিকা শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম। আশা করি এতদিন পরে এ কথা শুনিয়া অন্যে রাগ করিবেন না।

তদবধি কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতীর সাধ্যমত সেবা করিয়াছি। যখন যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছি, ভারতীতে তাহা স্থান পাইয়াছে—লোকে পড়িয়াছে কি না, -জানি না ; পড়িবার যোগ্য হইয়াছে কি না, তাহাও জানি না। ভারতী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্থান দিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি অদ্যাপি ভারতীর নিকট ঋণী।

চারিবৎসর বয়সে সাধনাও লুপ্ত হইল—ইহাতেও নৈরাশ্য আসিয়াছিল। ভারতী অনেক চারি বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন ;—এখন দশ চারি অতিক্রম করিতে চলিলেন ইহাতে আমি সুখী। ভারতী এখন প্রৌঢ়া —ভারতী আয়ুষ্মতী হইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করুন—ইহা প্রার্থনা করি। প্রৌঢ়া ভারতীর প্রৌঢ়া সম্পাদিকা সম্প্রতি ভারতীর কর্ণধার-কর্ম্মে বিদায় লইয়াছেন—তিনিও আয়ুষ্মতী হইয়া অন্তরালে থাকিয়া ভারতীর নূতন সম্পাদকের কোমল কর্ণ ধরিয়া থাকুন, ইহা প্রার্থনা করি। নূতন সম্পাদক ভারতীর এই অতি পুরাতন ভৃত্যকে আজ স্মরণ করিয়াছেন, এজন্য আমি আহ্লাদিত। নূতনের সহিত পুরাতনের এই "অম্ল-মধুর" সম্পর্কে নূতন ভারতী-সম্পাদক সৌভাগ্যবান্, আমিও সেই সৌভাগ্য দর্শনে পুলক অনুভব করিতেছি। আশা করি, আমার ঝাঁঝাল জীবনের বাকি কয়টা দিন ভারতীর পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে সাহিত্যের "অম্ল-মধুর" রসের আস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই উপদেশ পালন করিয়া যাইতে পারিব।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

গাজিপুরে গোলাপক্ষেত্র

["ভারতী"-সম্পাদক মহাশয়গণ-সমীপেষু। আপনারা জানেন কিনা বলিতে পারি না. পূর্ব্বে আমি একজন কবি ছিলাম এবং সেকালে "ভারতী"তে আমার বহু কবিতা ছাপা হইয়াছিল। "ভারতী"র চত্বারিংশত্তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে, "ভারতী"র পুরাতন-লেখক হিসাবে আমার কাছেও আপনারা লেখা চাহিয়াছেন। নিম্নে যে কবিতাটি পাঠাইলাম, তাহা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রচিত। কবিতাটি "ভারতী"তে পাঠাইবার জন্য নকল করিয়া রাখিয়াছিলাম, এমন সময় নূতন "ভারতী" আসিলে মোড়ক খুলিয়া দেখিলাম, তাহাতে কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন-মহাশয়ের "গাজীপুর" শীর্ষক এক কবিতা বাহির হইয়াছে, তাহাতেও গোলাপক্ষেত্রের বর্ণনা রহিয়াছে (আপনারা সেটি দেখিয়াছেন কি?—না, আপনারা উভয়েই

তখন বোধ হয় অতি বালক)। দেবেন্দ্রবাবুর সে কবিতার তুলনায় আমার কবিতাটি, হংস-পার্শ্বে বকোপমার মত আমার মনে হইল, তাই সেটি আর "ভারতী"তে পাঠাই নাই। লেখক]

গোলাপ—গোলাপ শুধু দিগন্ত অবধি !
কোন্ রত্ন-ব্যবসায়ী নানা কার্য্যে ভুলে
এ শোভা-বিপণিখানি ফেলে গেল খুলে
বহাইয়া দিকে দিকে সৌন্দর্য্যের নদী !
অজস্র গোলাপ-বালা মন্দ মন্দ দুলে
কুহক অঞ্জন এ কি চক্ষে দিল আনি—
যেন হায় প্রেয়সীর প্রেমলিপিখানি,
ফুটিয়াছে ভাব-পুষ্প মাধুরী হিল্লোলে।
এ কি সুষমার মেলা !—বসন্ত প্রভাতে
সুবিস্তৃত পুষ্পরাজ্য। কিন্তু ঐ হায়,
শিশির তপন-তাপে শুকাইলে গায়*—
বাহিরিল মালীগণ পাত্র হাতে হাতে।
ভাঙ্গিল শোভার হাট ;—সারাদিন ধরি
কাঁদে কালো গাছগুলি গুমরি গুমরি।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

চিত্র-পরিচয়

১। গৌরীর তপস্যা

চিত্রকর—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু

"কুমারসম্ভবে"র পঞ্চম স্বর্গে আছে, মদনভস্মের পর ভগ্নমনোরথা গৌরী পিণাক-পাণি শ্মশানেশ্বরকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন। হিমবর্ষী শীত-রাত্রে তিনি গৌরী-শিখরের ছায়াসুপ্ত তুষার-শীতল সরোবরে আপনার কোমল তনু ডুবাইয়া মুদিতনেত্রে প্রিয়-ধ্যানে বিভোর হইয়া থাকিতেন। শীতের পরশে তখন সরোবরের পদ্মের ঝাড় শুকাইয়া গিয়াছে; —কিন্তু তুষার-বৃষ্টিতে সুমধ্যমা পার্ব্বতীর শীতার্ত্ত মুখখানি যখন জলের উপরে কমলদলের মতই থর্‌থর্ কাঁপিত থাকিত, তাঁহার মুখের কমলগন্ধে নিশার বাতাস যখন ভরিয়া উঠিত, তখন মনে হইত, সরোবরের পদ্ম বুঝি এখনো পরিম্লান হইয়া যায় নাই ! যত্নাভাবে গৌরীর মোহন কেশমালা আজ জটাসদৃশ, নয়নপ্রান্তে কজ্জলরেখা বিলুপ্ত—তপঃক্লেশে তাঁহার আনন শীর্ণ ও পাণ্ডুর ! তাঁহার চম্পক-অঙ্গুলীতে শুষ্কপদ্মবীজের জপমালা, ক্ষীণ কটিতটে মুঞ্জতৃণের মেখলা।

* শিশির না শুকাইলে সেখানে মালীরা গোলাপ তোলে না।—লেখক।

২। অন্ধ বাউল

চিত্রকরঃ—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্ধ বাউল রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী"র একটি চরিত্র।—"বাউল চোখে দেখ্‌তে পায় না, সে গান গেয়ে বিজনের মধ্যে পথ অবিষ্কার করে। * * অন্ধতার অন্ধকারে সে যে পরম বন্ধুকে লাভ করেছে; তাঁরই চরণশব্দ সে আপনার হৃৎ-স্পন্দনে শুন্‌তে পায়, সেই চরণশব্দ বরণ করে সে চলে। * * সে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছে * * মনের-পাওয়াই এখন তার স্বর্ব্বস্ব।* * এই অন্ধ দুঃসহ দুঃখের আঘাত সহ্য করে অটল নিষ্ঠা লাভ করেছে---* * চির-বসন্তের বীণা তার হাতে।"

৩। দোদুল দোলা

চিত্রকর ঃ—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ-ছবিখানিও "ফাল্গুনী"র।

বসন্তের দক্ষিণা বাতাসে পথের ধারের বেণুবন মর্ম্মরোল্লাসে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

বেণুবণ গায়িতেছে—

"ওগো দখিন হাওয়া, (ও) পথিক-হাওয়া
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে,
* * * *
আমি পথের ধারের ব্যাকুল বেণু
হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু
আহা, এস আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে!"

নিপুণ চিত্রকর তুলির দু-একটি টানে ভাবের রূপটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

৪। মৃগয়া

প্রাচীন চিত্র হইতে। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত। নবাবী আমলের মৃগয়া-ব্যাপার লিখিত।

৫। স্তব্ধ তরু

চিত্রকর ঃ—শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে

এখানি নিসর্গ-চিত্র এবং ইহার ব্যাখ্যাও অনাবশ্যক মনে করি। তবে একটি কথা মনে রাখা দরকার। নিসর্গ-চিত্রে কেবল আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়, নদী বা গাছ-পালার হুবহু নকল দেখিলেই ছবি-দেখা শেষ হইয়া যায় না। ভাল চিত্রকরেরা ছবির প্রকৃতির ভিতর দিয়া নানা রস ও নানা ভাবের প্রকাশ দেখান। ভোরের সূর্য্যোদয়ে, দুপুরের প্রখর প্রভায়, সন্ধ্যার বর্ণ-বৈচিত্র্যে, রাত্রির জ্যোৎস্না বা অন্ধকারে, গাছের আলোকছায়ায়, জনশূন্য ধূ-ধূ মাঠে, বিজন শৈল-শিখরে বা সমুদ্রের তরঙ্গ-নৃত্যে,—চিত্রকরেরা গম্ভীর বা চপল, শান্ত বা রুদ্র, হাস্য বা করুণ রসের সৃষ্টি করেন;—গাছ-মাটি-পাথরকে তাঁহারা নির্জ্জীব ভাবিতে পারেন না; তাহাদের ভিতরও প্রাণের যে লীলা চলিতেছে তাহার তরঙ্গ তাঁহাদের হৃদয়কে আঘাত করে। শিল্পীর এই অনুভূতি দর্শকের মনে রসের সঞ্চার করিতে পারিলেই নিসর্গ-চিত্রের সার্থকতা।

প্রসাদ।

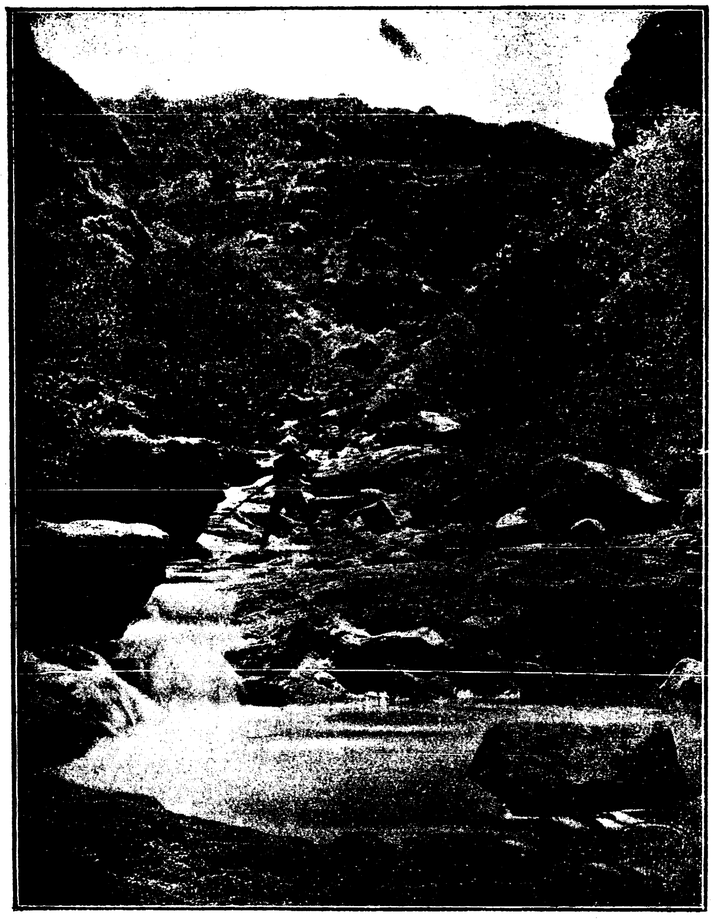

শৈলসুতা

গোড়ায় গোফিলি

আমার দুর্গতির কাহিনী কাকে শুনাই? কোন্ মুখে শুনাই! নাঃ, শুনাতেই হবে। লজ্জা খোয়াতেই হবে! স্বার্থপর হয়ে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না।

না আছে পাঁজিপুঁথি, না জানি দিন বা তিথি। ইংরিজী ক্যালেণ্ডার যত চাও মজুদ, —এক এক ঘরে তিন তিন খানা লম্বমান, কিন্তু দিশী মাস তারিখের উদ্দেশ তাতে পাওয়া যায় না।

আমি নিশ্চিন্ত আছি—এখনও হাতে সময় রয়েছে। হঠাৎ এক বান্ধবী রাণীর বার্ত্তা-বাহক এলেন—"রাণীসাহেব আপনাকে আজ তাঁর গৃহে চা-পানের অনুরোধ করছেন। পরশু রাণীসাহেব অমৃতসর চলে যাবেন।"

—"এই সময়ে অমৃতসর কেন?"

—"বৈশাখীর জন্য।"

বৈশাখী! অর্থাৎ ১লা বৈশাখ! এই যাঃ! এত শীঘ্‌ঘির এসে পড়্‌ল! পঞ্জাব-টঞ্জাব ডিঙিয়ে মনখানা চট্ করে ২২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে সম্পাদকীয় অফিসে গিয়ে পড়ল। লেখা ত কিছু তৈরি হয়নি! লজ্জা রাখি কি করে?

পঞ্জাবী ১লা বৈশাখ ও বাঙ্গলা ১লা বৈশাখে একদিনের মাত্র তফাৎ, এ জেনে শুনেও কেমন ভরসা হল এ বছর বাঙ্গলা বৈশাখ, পঞ্জাবী বৈশাখকে ফাঁকি দিয়ে আমার তরফদারি করবে—অনেকটা আগে সরে যাবে।

কেননা, এ পর্য্যন্ত গোটা আষ্টেক চিঠি ও কার্ড এসেছে বটে, কি তাগাদার তার ত এখনও আসে নি।

হরি হরি! কেন এমন অলুক্ষণে ভাবনা মনে আনলুম। কেননা সর্ব্বনেশে টেলি-প্যাথির জোরে যেমনি ভাবা অমনি ঘণ্টা কতক পরেই তার এসে উপস্থিত! নাঃ বাঙ্গলা বৈশাখও প্রেরে উঠ্‌লে না;—সম্পাদককে ফাঁকি দিয়ে লেখকের সহায়তা করা? অসম্ভব!

মাস যদি চলে গাছে গাছে, সম্পাদক চলেন পাতায় পাতায়!

* * *

চারিদিকের হাওয়ায় বৈশাখীর আগমন-বার্ত্তা! সহরে সহরে মেলার উদ্যোগ, ছেলেদের ছুটী, স্কুল-কাছারী বন্ধ, সকলের মনে আনন্দ;—আমারি মাথায় শুধু লগুড়াঘাত। মাথা-ধরায় মাথা ফেটে গেল, কিন্তু লেখা বেরোল না।

কি করি? কি লিখি? সম্পাদকের প্রতি সদ্ব্যবহার, পাঠকের প্রতি শিষ্টাচার ও নিজের প্রতি সুবিচার একদিনে একাধারে তিনটে জিনিষ কি করে সম্পন্ন করে ফেলি?

সে রাত্রে ঘুম নেই, লোকের বাড়ী চা খেয়ে তৃপ্তি নেই, বাড়ী ফিরে হাঁফ ছেড়ে বসে শান্তি নেই!—লেখা হয় নি!

ছেলেবেলায় রয়াল রিডারে ডিকন্সের একটা গল্পের খানিকটা আমাদের পাঠ্য ছিল। তাতে থেকে থেকে ফি প্যারার শেষে পড়তুম—"লিট্‌ল্ নেল্ ইজ্ ডেড!—আর আমাদের কান্না আস্‌ত।

আজ থেকে-থেকে আমার মন আমায় পড়াচ্ছে—"লেখা হয়নি!"—আর আমার চোখে জল আস্‌ছে।

হায়! আমার মত গোড়ায় গাফিলি করে পাপের দণ্ড কেউ যেন না ভোগে।

উত্তম পাঠকেরা আমার এই আত্ম-কাহিনী থেকে শিক্ষালাভ করে উপকৃত হবেন এই আশা করে কৃতার্থম্মন্য হচ্ছি। কারণ অধম লেখক আমি ভুক্তভোগী হয়েও যে ভবিষ্যতে শোধরাতে পারব সে আশা বিরল। *

শ্রীসরলা দেবী।

---

*শ্রদ্ধাস্পদা লেখিকা কিন্তু আমাদের আশ্বাস দিয়াছেন যে এই "গোড়ায় গাফিলি" কাটাইয়া এইবার তিনি আমাদের রীতিমত লেখা পাঠাইবেন। পঞ্জাবে বাংলা তারিখের হিসাব ঠিক থাকে না বলিয়া তাঁহার সময়-মত লেখার চাড় হয় না। সে জন্য তিনি একখানা বাংলা পাঁজি চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহার এ অনুরোধ আমরা রক্ষা করিয়াছি। অতএব এখন আর কোনো ভয় নাই।—সম্পাদক।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত

N. C. Maitra's Family Library
Narayan Chandra Maitra
Borehoogly
Barnagore P.O.
Calcutta
10-7-16.

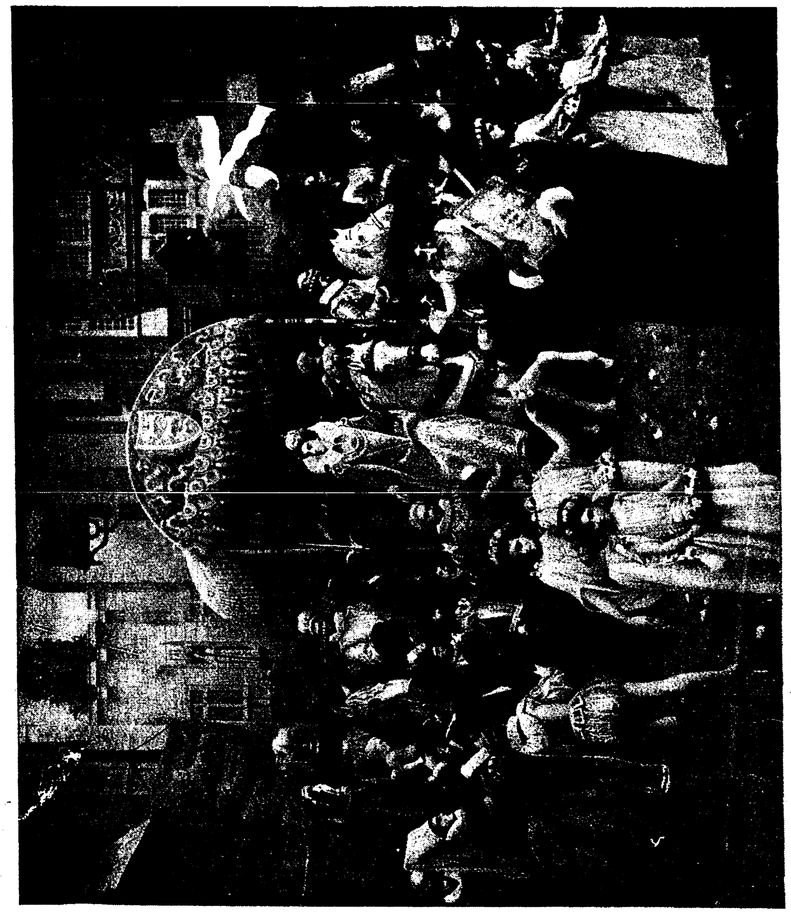

আর্য্যাভা ধ্বংসের পরে রাজী এলিজাবেথের শোভাযাত্রা

ভারতী

৪০শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ [২য় সংখ্যা

জন্মস্মর

১

জন্মান্তর যে প্রামাণ্য, তাহা যে প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় হইতে পারে, সাংখ্যকারিকায় বাচস্পতিমিশ্র তাহা অতি সংক্ষেপে একটি বাক্যেই নিষ্পন্ন করিয়া দিয়াছেন—"কপিলাদিবৎ"। কপিলাদি মুনিরা জন্মস্মর হইয়াছিলেন, সুতরাং জন্মান্তর আছে এবং তাহার স্মৃতিও অনুভবগম্য।

চল্লিশবৎসরের ভারতীর প্রথমসংখ্যাতেই নবীন সম্পাদকও তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। বৈশাখের ভারতীতে ভারতীর কাণ্ডারী-পরম্পরার জন্মস্মরতা প্রত্যক্ষ করিয়া আমার মত বিশ্বাসহীন ভূতপূর্ব্বের যৌগিক দৃষ্টিও অকস্মাৎ খুলিয়া গেল। নতুবা চৈত্রে যখন "সম্পাদকীয় স্মৃতি"র জন্য প্রথম অনুরোধ আসিয়াছিল একটা মস্ত ফাঁকায় মন ঠেকিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে সম্পাদকীয় জন্মের কোন স্মৃতি, কোন ছবি, কোন ঘটনায় সে ফাঁকা ভরিয়া উঠে নাই। তাই 'গোড়ায় গাফিলি' করিয়া ফাঁকি দিতে হইল।

'মানসী'র ঐতিহাসিকপ্রবর নাটোররাজ লিখিয়াছেন—"সেই সকল সুদিনে দুর্দ্দিনে দেবী স্বর্ণকুমারীর বিদুষী কন্যাদ্বয় (শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী) 'ভারতী'র প্রতি মাতার অক্লান্ত স্নেহ-পরিচর্য্যায় গুরুশ্রম লাঘব করিবার জন্য অনেক সাহায্য করিয়াছেন।"—ইহাতে যতটুকু ওজন আছে আমার দ্বাদশবর্ষব্যাপী সম্পাদন ঘটনা এর চেয়ে বেশী ওজন লইয়া আমার স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করে নাই। নাটোর-মহারাজের ঐ ব্র্যাকেটটা ঠিক আমার মনের মাপেই কাটা। কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছিলাম সকলের স্মৃতির মাপ এক নয়। এই নববর্ষের 'ভারতী' ব্যক্ত করিতেছে আমি ভাবি আর নাই ভাবি, সময়ের ও সমসাময়িক অনেকের মনে একটা কুলুঙ্গী আমি দখল করিয়া আছি। তাই সম্পাদকের দৌরাত্ম্যে

ব্র্যাকেট খুলিতে হইল, ব্র্যাকেটের বেণীবন্ধন মুক্ত করিয়া সনির্ব্বন্ধ মণিবন্ধনে ধরা দিতে হইল।

২

ভারতীর সঙ্গে আমার প্রথম প্রণয় সেই কোন্ শৈশবে,—দশ-এগারো বৎসর বয়সে। আহা সে কি মধুময় সাহিত্য-রসাস্বাদের দিন গিয়াছে! মায়ের শেল্‌ফ্ হইতে পুরাণ বাঁধান ভারতীগুলি লইয়া গ্রাস করিতাম—

শুধাই অয়ি গো ভারতি তোমায়
তোমার ও বীণা নীরব কেন
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও বীণা আর মা বাজেনা কেন?

প্রথম ভারতীর এই প্রথম কবিতার তুলনা আমার কাছে আজ পর্য্যন্ত কোথাও নাই। যে সত্য চল্লিশ বৎসর আগে ইহার ভিতর কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, সে সত্য আজও ভারত-প্রেমিকের বুকখানা টন্‌টনাইয়া দেয়। এই বছর চল্লিশের মধ্যে নানা কবি ও শিল্পীর হাতে ভারত-মাতার নানা রূপ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যে মধুরিমা, যে করুণিকা এই প্রথম মাতৃবন্দনায় বিকশিত হইয়াছিল তাহা নিরুপম। আমার দশ-বৎসরের ছোট প্রাণখানি ইহাতে অভিষিক্ত হইয়া অলক্ষ্যে মাতৃভূমি-প্রেমে জাগিয়া উঠিল।

আর-একটি গান সেকালের ভারতীর কোন-এক পৃষ্ঠার পাদদেশে ছিল যেন মনে পড়ে—

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি প্রেমে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান॥
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল
তোমারি কার্য্য সাধিবে।
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
তোমারি পাশ নাশিবে॥
যদিও হে দেবি, শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না,
তবুও গো মাতা পারি তা' ঢালিতে
একতিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে
নিভাতে তোমার যাতনা॥
যদিও জননি, যদিও আমার
এ বীণার কিছু নাহিক বল।
কি জানি যদি মা একটি সন্তান
জাগি উঠে শুনি এ বীণা-তান॥

কতবার আপনা-আপনি পিয়ানোর সাম্‌নে বসিয়া এই গানটি ভাবে ভোর হইয়া সাধনা করিতাম। কারো দেওয়া নয়—নিজেরই খুঁজে-পেতে লওয়া জপমন্ত্রের বীজ হইয়াছিল এ গানটি আমার। "বন্দেমাতরং" গানটি পড়িবার শুনিবার বা শিখিবার বহু পূর্ব্বেই রবি-মামার কতকগুলি কবিতায় ও গানে দেশের মাতৃরূপ আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। বোধ হয় আরও অনেকের মনেও এইরূপ হইয়া থাকিবে। বঙ্কিমের আনন্দমঠের বহু পূর্ব্বেই রবি-মামার এ সকল কবিতা রচিত হয়। সুতরাং দেশমাতৃপূজার প্রধান পূজারী তিনিই। আজ "বন্দেমাতরং" মন্ত্রের অতি ব্যবহার ও অপব্যবহারের উপর রাগ করিয়া "ঘরে-বাইরে" গল্পে নিখিলেশের মুখে দেশকে মাতৃরূপে বন্দনার বিপক্ষে রবিমামা মত

ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রের দোহাই দিয়া ছেলেরা যে-সব কুকর্ম্ম করিয়াছে তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বন্দেমাতরং গানটিকে দেশের অঙ্গ হইতে ছাঁটিয়া ফেলিতে হইলে রবিমামার জাতীয় বা দেশ-সঙ্গীত ও কবিতার অধিকাংশই ছাঁটিতে হয়। আমি ত তাহাতে রাজী নই।

প্রথম বা দ্বিতীয় খণ্ড ভারতীর আর একটি রচনা আমায় নিতান্ত পাইয়া বসিয়াছিল—সে "সম্পাদকের বৈঠক"-এর অন্তর্গত "রামিয়াড," একটি ব্যঙ্গ নাটিকা। হাসিয়া হাসিয়া নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইত। একলা হাসিয়া সুখ সম্পূর্ণ হইত না। তাই মাকে ও মামাদের ধরিয়া ধরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া আগাগোড়া সেটা পড়িয়া শুনাইতাম—"দেখ দেখ কি চমৎকার লেখা আগে বেরিয়েছিল। এখন কেন হয় না?" সেটা বড়মামার লেখা কিম্বা জ্যোতিমামার, কি শুনিয়াছিলাম তখন, ঠিক মনে পড়ে না; রবিমামার যে নয় এটা মনে আছে। কিন্তু যাঁরই হোক্ এ তিনজনের কেহই আমার মুখে সেটার আবৃত্তি শ্রবণ হইতে পরিত্রাণ পান নাই। হাস্য-সাহিত্যের সহিত আমার সেই প্রথম পরিচয়, এবং পরিচয় হওয়া মাত্র সখ্য। সেই সখ্যবলেই দশবারো বৎসর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "হাসির কবিতা"গুলিকে খাস্ মজ্‌লিসের কয়েদ খানা হইতে মুক্ত করিয়া আমসাহিত্যের দরবারে অকুতোভয়ে পেশ করিয়া দিয়াছিলাম। পুরাণ ভারতী কাছে নাই, নয়ত আমার শিশুমনোহারী রত্নগুলি উদ্ধার করিয়া দেখাইতাম।

৩

ভারতীর সহিত দ্বিতীয় সম্বন্ধ আমার সেবক সম্বন্ধ। মায়ের সাহায্যের জন্য প্রথমে মাঝে-মাঝে প্রবন্ধাদি লিখিতাম; ক্রমে অন্যের প্রবন্ধের উপর হাত চালাইতে লাগিলাম। প্রকাশ্যতঃ মা সম্পাদিকা থাকিলেও বস্তুতঃ আমিই সব করিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে জলধর সেনের হিমালয়-ভ্রমণবৃত্তান্তের পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসিয়া পড়ে। তাঁহার লেখায় খাঁটি সাহিত্যের রূপ দেখিয়া আমি আনন্দে ভরপুর হইয়া গেলাম। পাণ্ডুলিপি দীনেন্দ্রকুমার রায় অতি সুভয়ে পাঠাইয়াছিলেন। যদি পছন্দ না হয়, যদি প্রকাশ-যোগ্য মনে না করি, তবে তাঁর লাজুক বন্ধুর লেখা-কুমারীটি বন্ধুর বাক্সবন্দিনী করিয়া রাখিবার জন্য ফেরৎ পাঠানর কষ্ট স্বীকার করিব কিনা এই ধরণের সসঙ্কোচ অনুনয়ের উত্তরে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া লিখিলাম, এ দুর্লভ জিনিষ প্রত্যর্পণের যোগ্য নহে। খনিগর্ভের হীরাকে যতটুকু মাজিয়া ঘষিয়া তোলার আবশ্যক ছিল ততটুকু মাত্র কারিগরি করিয়া ভারতীর প্রদর্শনীতে সাজাইয়া দিলাম। আর প্রতি মাসে সেই খনি হইতে নূতন মাণিক্যের জন্য লোলুপ হইয়া রহিলাম। জানি না আর কাহার কত ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু আমি ত জলধর সেনের দেরাদুন, সহস্রপাণি, টপকেশ্বর, কাকঝোড়া এবং হৃষিকেশ হইতে বদ্রিনারায়ণ পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তাটুকুর বর্ণনায় তাঁর নিকট চির আনন্দ-ঋণে বাঁধা আছি।

"সাধনা" লইয়া রবিমামা যত মগ্ন

হইতে লাগিলেন, মায়ের ভারতী সম্পাদন-কার্য্য যত দুরূহ হইতে লাগিল, আমার ভারতী সেবাও তত প্রখর করিতে হইল। মায়ের শরীর একবার খারাপ বোধ হইতেছিল, আমি তাঁকে দিদির সঙ্গে দার্জ্জিলিঙে পাঠাইয়া একাই সম্পূর্ণ বোঝা নিজের ঘাড়ে লইলাম। দুই-তিন বৎসর এইরূপে সেবক-ভাবে পরোক্ষে ভারতী সম্পাদন করিয়াছি।

৪

ইহার পর দিদির সঙ্গে যুক্তনামে প্রকাশ্য সম্পাদকও তিন বৎসর ছিলাম। কিন্তু ভারতীর সাধক হইলাম ১৩০৬ সালে। তখন আমি মহীসূর-প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। মহীসূর-প্রয়াণে ঘরের বাহিরে গিয়া ভারতবর্ষকে দেখিয়াছি, হিন্দুজাতিকে দেখিয়াছি, হিন্দুসভ্যতা দেখিয়াছি। খাঁচার পাখীর ছটফটানি প্রশমিত হইয়াছে, বিশ্বরূপ দেখিয়া আসিয়াছি এবং আপনাকেও দেখিয়াছি। আত্মীয়স্বজনের স্নেহকোমল নীড়ে আপনার সহিত পরিচয় হয় না। আপনাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একবার সব বন্ধন হইতে দূরে সরিয়া যাইতে হয়। মহীসূরে প্রথম আত্মসন্দর্শন আজও মনে পড়ে।

প্রলয়ের ঝড় আজ বহিতেছে বেগে ;
ভীষণ নিনাদে বজ্র হুঙ্কারে কঠিন ;
গৃহভিত্তি উঠে কেঁপে ;—আমি সঙ্গীহীন,
সারা গৃহে একা নারী বসে আছি জেগে।

কবাট অর্গল নাহি মানে, দুমদাম
উঠে পড়ে ; দীপ নিভে ; বাত্যা গৃহ ভরে ;
বিদ্যুৎ ঝলসে আঁখি ;—একা আমি ঘরে ;
—বাহিরে প্রলয় মেঘ গর্জ্জে অবিশ্রাম।

অজস্র প্রপাতে কভু বৃষ্টিধারা ঝুরে,
ভীমরবে তরুশাখা ভাঙ্গে দিশে দিশে ;
একা আমি নারী হেথা বসি নির্নিমিষে
—আঁধারে চৌদিকে শত বিভীষিকা ঘুরে।

একা আমি ভয়শীলা, কম্পিত, চকিত !
একা আমি ভয়হীনা, আত্মবলীয়ান !
একা আমি ক্ষুদ্রতম বৃহৎ-পীড়িত,
একা আমি বিশ্বকেন্দ্র, অতি সুমহান !

১৩০৫ এর শেষে রবিমামা বলিলেন —"তুই যদি নিস আমি আশ্বস্ত থাকব। আর কারো প্রতি বিশ্বাস নেই। তুই ঠিক চালাবি।"

তাঁহার বিশ্বাসে আমার বিশ্বাস বল পাইল, আমি মানিলাম। এবার শুধু ভারতীর প্রেমিক নয়, মালিক বনিতে হইবে, শুধু সেবক নয়, সাধক হইতে হইবে ;—মায়ের অঞ্চলের আড়ালে নয়, দিদির হাত-ধরাধরি করিয়া নয়—একা বিশ্বের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে ; উত্তাল তরঙ্গমুখে সমুদ্রে নৌকা ভাসাইতে হইবে, চালাইতে হইবে, গন্তব্যে পৌঁছাইতে হইবে—একলা। ভয় হইল, কিন্তু ভরসাও হইল। মন "আহি-তাগ্নিকার" গীত গাহিয়া উঠিল :—

সর্ব্বদেব সাক্ষী করি এ কি ব্রত করিলে গ্রহণ !
পথ যে দুর্গম একায়ন !
সুতীব্র দিবস আর সুদীর্ঘ শর্ব্বরী,
অপ্রকম্প্য চিত্তে সর্ব্ব ভয় পরিহরি,
পারিবে কি যেতে ? তুমি বিক্লববচনা !
অশ্রু-আবিললোচনা

দৃষ্টি-বিষ সর্প সেথা জাগে অতি ভীষণ আকার !
করে নিত্য গরল উদ্গার !
ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, ক্রূর, হিংস্র পরাণী যতেক,
ফিরিছে গোপনে ; আছে কণ্টক শতেক !
পারিবে সহিতে সব ? রে সুখ-লালিতা !
দুরাশা-চালিতা !

উর্জ্জস্বল দ্বিজসম হইবে কি সত্যসঙ্গরা !
অতন্দ্রিতা ! চিরলক্ষ্যপরা !
পারিবে সাধিতে শক্তি রিপুনিবর্হণা ?
লোকহাস, ভয়লজ্জা, মিথ্যা বিগর্হণা
সহিবে প্রশান্তচিতে ? হে আহিতাগ্নিকা !
অতি সাহসিকা !

যে অগ্নি জ্বালিলে আজি চিরদীপ্ত রহিবে কি তাহা !
উচ্চারিবে নিত্য স্বস্তি স্বাহা !
প্রাণাহুতি দিবে তায় ! আত্মবিসর্জ্জন
নিয়ত হইবে তার সমিধ ইন্ধন !
সংকল্পে অটল রবে ! হবে চিরধন্যা !
অয়ি বীরম্মন্যা !

পুষ্পবাসে গন্ধবহ যদি আনে মোহ অভিনব,
নিদাঘ সন্ধ্যায় উঠে বেণুবীণা রব,
ময়ূর-বিরুত-মধু বনভুবচ্ছায়,
পুলকসমুখ কম্প যদি শিহরায়,
রবে অকম্পিতা তুমি ! হে আত্ম-ঈশানা !
চির-অতৃষাণা !

যদি ঝড় ঝঞ্ঝা উঠে, বক্ষ মাঝে অঞ্চল আবরি,
অগ্নি রাখি দিও জাগি, সারা বিভাবরী !
আর সব নারী ভবে প্রিয়-পরিজনা,
তুমি রহ শ্রেয়োনিষ্ঠ-ব্রতপরায়ণা !
অনাকুলা, অনলসা, সুকঠোরব্রতপা !
দৃঢ় পরন্তপা !

* * *

এবারকার ভারতীর গন্তব্য মনে মনে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলাম। সেই দিকে তরীর মুখ ফিরাইলাম, আর আমার হাতের প্রথম সংখ্যায় "মৃত্যুচর্চ্চায়" সকলকে আহ্বান করিলাম—

"হে সাহিত্যকর্ণধারগণ ! বেলা হইয়াছে, জীবনের কূলে কূলে, সুখসেব্য সুগম তীর্থে তরী অনেকবার ভিড়িয়াছে, এবার বাহিয়া চল মৃত্যুসাগরসঙ্গমে, শুনাও সেখানকার জলদগম্ভীর সঙ্গীত, দেখাও সে রাজ্যের অভয় প্রতিষ্ঠা।"

দেশের নবযুগে যাহা ক্রমে ভৈরবরাগে নাদিত হওয়া নিরূপিত ছিল, কালের অলক্ষ্য নির্দ্দেশে আমারি অঙ্গুলিতে প্রথমে তাহা ললিতে বাজিল।

এই সময়ে নিবেদিতা ও স্বামী বিবেকানন্দ আমাকে তাঁদের দলে টানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাঁহারা বুঝাইতে লাগিলেন আমি যদি হিন্দুনারীর প্রতিভূরূপে বিলাতে গিয়া লেক্‌চার দিই অসাধ্য সাধন করিতে পারিব। আমি সে কথা বুঝিলাম না, ভারতীর সেবা ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলাম না, কিন্তু এই সূত্রে তাঁহাদের সঙ্গে মিত্রতা ও ভাবের বিনিময়ে লাভবান হইলাম। আবার এই সময় স্বামী শিবনারায়ণ পরম হংস 'ভারতী-মা'র পুত্রী "সরলা-মা"র ভিতর হঠাৎ এমন কিছু দেখিতে পাইলেন যাতে তাঁহার বিশ্বাস হইল, আমি যদি তাঁহার দলভুক্ত হইয়া সূর্য্যনারায়ণের উপাসক বনি ও নিত্য হোম করি তবে ভারতবর্ষকে হেলাইয়া দিব।

আসল কথাটা এই, একটা বেকার লোক দেখিয়া বেগার-খাটাইবার লোভ সকলেরই জাগিয়া উঠিল। আমি ভারতী-সেবাতেই তন্ময় রহিলাম।

কিন্তু যিনি নিজ হাতে এবার আমায় ব্রতদান করিয়াছিলেন এবং ব্রত-উদ্‌যাপনে সর্ব্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ব্রতসাধনা করিতে করিতে তাঁহারই হাতে ধাক্কা খাইলাম। কোথাও কিছু নাই, অকস্মাৎ ভারতীর প্রতি স্নেহবিমুখ করিয়া শৈলেশ মজুমদার তাঁহাকে বঙ্গদর্শন-এর পুনরাবির্ভাবের প্রলোভনে ভুলাইল।



শ্রীমতী সরলা দেবী

"কাঁহা যূসফ, কাঁহা জুলেখা হায়"! কোথায় বঙ্কিম, কোথায় তাঁহার বঙ্গদর্শন! নূতন বঙ্গদর্শন টিকিল না। শুধু আমার মামাটি

পরকে আপন করে'
আপনারে পর

আমার বুকের মধ্যে একটা মস্ত চিরা দিয়া দিলেন।

বাহিরের আঘাতে সাধনা ভঙ্গ হয় নাই, ঘরের লোকের ঘায়ে তপোশৈথিল্য হইল। তখন দীনেশ সেনাদির তলব পড়িল। যখন অন্তরে উত্তাপের অভাব, তখন বাহিরে নানা কৃত্রিম উপায়ে উত্তাপের আয়োজন করিতে হয়, নয়ত শরীর রক্ষা হয় না। ভারতীর শরীর এইরূপে রক্ষা করিতে থাকিলাম।—আহিতাগ্নিকার অগ্নি না নিভিয়া যায়!

অনিয়মিত বাহির হওয়া সেকালের মাসিক পত্রের একটি প্রধান সংক্রামক রোগ ছিল। ভারতীও তাহাতে আক্রান্তা ছিলেন। সে রোগ দূর করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, কৃতকার্য্যও হইয়াছিলাম। সময়ের কাঁটা ঠিক রাখার জন্য আড্ডির ছাপাখানার গলির সাম্‌নে, এমন কি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটা গলির মোড়ে দপ্তরী মিঞার বাড়ীর সন্নিকটেও গাড়ীতে বসিয়া ধর্ণা দেওয়া মাসের শেষ কটা দিন আমার একটা নিত্যনিয়মিত ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল।

'ভারতী'র ভাণ্ডার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

না হইলেও লেখকমাত্রকেই কিছু না কিছু প্রণামী বা আশীর্ব্বাদী নিবেদন করা আমার আর-একটি উচ্চ লক্ষ্য ছিল। যিনি কিছুই লইতে স্বীকৃত নন, তাঁকে অন্ততঃ একটি স্বর্ণলেখনী গ্রহণে বাধ্য করিতেও চেষ্টার ত্রুটী করিতাম না।

ভারতী-সেবা স্মরণ করিয়া ভাবি—

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই!

যে মণিলাল আজ ভারতীর সম্পাদক হইয়া ভারতীকে নূতন আয়ুদান করিয়াছেন, তাঁর ভক্তি ও সেবায় ভারতী দুইবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন—আজ মা যখন ছাড়িয়া দিয়াছেন, আর দশ-এগার বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন না ছাড়িয়াও প্রায় ছাড়ি। বঙ্গবিভাগের দুর্য্যোগে স্বদেশী যখন বয়কটে বিষাক্ত হইয়া উঠে আমি তখন বঙ্গের বাহিরে। সেদিন আহিতাগ্নিকার অগ্নি এই বালক ভক্তই প্রদীপ্ত রাখিয়াছিলেন।

শ্রীসরলা দেবী।

স্মৃতি

ঐ ডাক পড়িয়াছে! নিমন্ত্রণ নয়—মহানিমন্ত্রণ। এই মহানিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন এইবেলা করিয়া রাখি।

মহাপ্রাণ নচিকেতা পূর্ণমাত্রায় আয়োজন করিয়া এই মহানিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন। যমালয়ে তিন দিন অভুক্ত থাকিয়া, যমরাজ-প্রদত্ত আঙ্গুর, পেস্তা, বাদাম্, আক্‌রোট্ প্রভৃতিকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, অমৃত-ফলের আস্বাদে অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আমার সে অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় কোথায়? যৌবনে গোলাপফুলের পাপ্‌ড়ির দিকে চাহিয়া চাহিয়া আনন্দবিভোর হইতাম। এক্ষণে দেহে শক্তি নাই, চক্ষুতে জ্যোতিঃ নাই। চারিদিকেই সরিষার ফুল দেখিতেছি। আয়োজন করিবার উপযোগী আমার দেহ-ভাণ্ডারে সে ঐশী সম্পত্তি কোথায়?

তবে ইংরাজিভাষায় এক মহাবাক্য আছে,—"Better late than never"। এই সদুপদেশের অনুসরণ করিয়া আমার চিত্তের গুপ্ত-কক্ষে বহুদিন হইতে পোষিত কতিপয় সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিব। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা শ্রীভগবান আমাকে সফলকাম করুন—করযোড়ে সনির্ব্বন্ধে ইহাই তাঁহার রাতুল চরণে ভিক্ষা করিতেছি।

আমার চিরপোষিত সঙ্কল্পগুলির মধ্যে অন্যতম সঙ্কল্প এই, যে বঙ্গসাহিত্য-কণ্ঠহার মনীষী ও মনস্বিনীদিগের সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু জানি তাহা লিপিবদ্ধ করিব। সেতুবন্ধন-কার্য্যে কাঠবিড়ালিও সহায়তা করিয়াছিল, আপনারা হাসিবেন না। আমি বহুকাল ওকালতি-ব্যবসায়ী ছিলাম। বুড়া-বয়সে সব ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু এই

কাঠবিড়ালির নজিরটি ভুলিতে পারি নাই।

আজ পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্বন্ধে যাহা যাহা জানি তাহা সানন্দে লিখিতেছি।

শুনিতে পাই—স্বর্ণকুমারী দেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যাদিগের মধ্যে তাঁহার বিশেষ স্নেহপাত্রী (Favourite) ছিলেন। মহর্ষি এই প্রতিভাশালিনী কন্যার রচনার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যখন-তখন বলিতেন, "স্বর্ণ, তোমার রচনার উপর দেবতার পুষ্পবৃষ্টি হউক।"

যখন স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়স আঠার কি উনিশ হইবে। আমিও তখন খুব ছোট। সে বহুকালের কথা। আমি হেমচন্দ্রের, নবীনচন্দ্রের কবিতা মুখস্থ করিতাম, নিজেও খুব কবিতা লিখিতাম, ও কোন নূতন সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। সে সময়ে মহিলা-কবি অথবা মহিলা-ঔপন্যাসিক কেহ ছিলেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্বর্ণকুমারী দেবীই পথপ্রদর্শিকা।

যখন "দীপনির্ব্বাণ" বাহির হয়, বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। সব কাগজের সম্পাদকেরা এই নবীনা লেখিকার সুখ্যাতি শতমুখে করিয়াছিলেন। আমিতো অবাক্ স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। আনন্দে বিভোর হইয়া উপন্যাসখানি পাঠ করিয়াছিলাম।

তাহার পর "গাথা" নামক তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্য-উপন্যাস প্রকাশিত হয়। আমার বেশ মনে আছে তাহা আমি যতবার পাঠ করিতাম ততবারই বিমুগ্ধ হইতাম। কবিতাগুলির ছন্দের ঝঙ্কার বড়ই সুন্দর। আমি লোভ সামলাইতে না পারিয়া ঐ ছন্দের অনুকরণে, পাপিয়া, কোকিল, শ্যামা, দোয়েল প্রভৃতি পাখীর উপর অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলাম। আমার কাব্যের নাম রাখিয়াছিলাম "আস্‌মানে বাউল"। কবিতাগুলি হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাক্ সে কথা—সহৃদয় পাঠকেরা আমাকে ক্ষমা করিবেন। কথায় বলে "ধান্ ভান্‌তে শিবের গীত"। আমি গৌরী-গীত গাইতে গাইতে মধ্যে মধ্যে ধান্ ভানিতেছি।

তাহার পর বহুবর্ষ, বহুবর্ষ চলিয়া গেল। প্রায় ত্রিশবৎসর অতীত হইয়াছে—আমি তখন গাজিপুরে অবস্থান করি। একদিন শুনিলাম কবিবর রবীন্দ্রনাথ গাজিপুরে আসিয়াছেন। রবিবাবু আমার ফুলবালা কাব্য ও উর্ম্মিলা কাব্যের পক্ষপাতী ছিলেন ও আমার নির্ঝরিণী কাব্যের "আঁখির মিলন" কবিতা তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আলাপ না থাকিলেও, পত্রের দ্বারায় পরিচয় ছিল। তিনি আমার উর্ম্মিলা কাব্যের সম্বন্ধে আমাকে লিখিয়াছিলেন, "ইহাতে স্থানে স্থানে কল্পনার খাঁটি রত্ন বসান হইয়াছে। আমি মুক্ত কণ্ঠে এ কাব্যখানির সুখ্যাতি করিতে পারি" ইত্যাদি। গাজিপুরে অবস্থানকালে রবিবাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। সে এক মহা-আনন্দের—আমার জীবনের দোলপূর্ণিমার দিন ছিল। নিত্য উৎসব, নিত্য পার্ব্বণ! আমার অপ্রকাশিত কবিতাগুলি রবিবাবুকে শুনাইতাম—তিনি আনন্দিত হইয়া শুনিতেন। তিনিও

আপনার অপ্রকাশিত নূতন কবিতাগুলি আমাকে শুনাইতেন। আমি হর্ষবিহ্বল হইয়া শুনিতাম। তখনকার রবিবাবুর যেমন দেবকান্তি, তেমনই সুন্দর কণ্ঠের গান ও আবৃত্তি। আমরা দুইজনে একপ্রকার mutual Adulation Society করিয়া তুলিয়াছিলাম।

একদিন রবিবাবু আমাকে বলিলেন, "ভারতীর সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী এখানে আছেন। আপনার কতকগুলি কবিতা ভারতীতে প্রকাশিত হইবার জন্য দিন"। অনুরোধ শুনিয়া আমিও কৃতার্থ হইলাম। কারণ ইতিপূর্ব্বে আমার কোন কবিতা অথবা কোন প্রবন্ধ কোন প্রখ্যাত পত্রিকায় বাহির হয় নাই। তখন স্বর্ণকুমারী দেবীর খুব নাম—"ভারতী"র খুব নাম। সম্পাদিকা অদম্য উৎসাহে ও অধ্যবসায়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা। যেমন তাঁহার নিজের রচনাপটুতা, তেমনি প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনে দক্ষতা। খুব খাঁটি জিনিস্ না হইলে পত্রিকায় স্থান পাইত না। আমিও ভ্যাজাল্ চালাইতে পারি নাই।

সেই সময়ে আমার "অদ্ভুত সুখ", "অদ্ভুত দুঃখ", "অদ্ভুত বহুরূপী", "অপূর্ব্ব অভিসার", "নাগাসন্ন্যাসী", "গাজিপুর" ও "গোলাপ-সুন্দরী" নামক কবিতাগুলি ভারতীতে স্থান পাইয়াছিল। আমার "অদ্ভুত সুখ" নামক কবিতাটি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ভারতী-সম্পাদিকা আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "শিশুর কান্না দেখিয়া হাসি আসিতে পারে কিন্তু বিধবার রোদন দেখিয়া হাসা অস্বাভাবিক। উহা কবিজনোচিত সহানুভূতির অভাব জ্ঞাপন করে"। তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী আমি নিম্নোক্ত পরিবর্ত্তন করি ও তাহার পর আমার কবিতাটি যথাসময়ে "ভারতী"তে প্রকাশিত হয়:—

"হেরি সে পবিত্র দুখ
উপজে অপূর্ব্ব সুখ
শেষে কিন্তু কেঁদে মরি আমিও বিরলে"।

আমার "গোলাপসুন্দরী" কবিতার এক-স্থলে ছিল—

"ক্ষম মোরে দেবপাতঞ্জল।
চাহিনা করিতে আমি যোগশিক্ষা"।

সুদক্ষা সম্পাদিকা আমাকে পত্রের দ্বারায় জানাইলেন, "এ দুটি ছত্রে মহর্ষি পাতঞ্জলকে অসম্মান-প্রদর্শন করা হইয়াছে"। কথা ঠিক! সুতরাং ঐ দুটি ছত্রকে বাদ দিতে হইল। কবিতাটির আর একস্থলে ঠিক্ অশ্লীল না হউক, দুটি-একটি সুরুচি-বিরুদ্ধ শব্দ ছিল। তাহাও বাদ দিতে হইল। এ বিষয়ে সম্পাদিকার খুবই দৃষ্টি ছিল। তিনি রুচিবাগীশ ছিলেন না। তাঁহার কোনো phobia ছিল না। কিন্তু প্রকৃত অশ্লীলতার ছায়ারও তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

সে সময়ে রবিবাবু, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি গাজিপুর হইতে তিন মাইল দূরে একটি বাঙ্গলায় থাকিতেন, বাঙ্গলাটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত। একদিন গ্রীষ্মকালে সেই বাটীতে গিয়া আমি আমার "কবিপঞ্জিকা"র কবিতাগুলি রবিবাবুকে শুনাইতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম গৃহাভ্যন্তর হইতে একটি সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি যুবক আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত। ইনিই বঙ্গসাহিত্য-কণ্ঠহার

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। যথাবিহিত পরিচয়ের পর জ্যোতিবাবু আমার মাথা Examine করিলেন। শুনিলাম তিনি একজন খুব ভাল phrenologist।

Phrenology বিদ্যায় এখন আমার খুব আস্থা ও বিশ্বাস হইয়াছে। কিন্তু তখন আমি ঘোরতর অবিশ্বাসী ছিলাম। আমার মাথার বহুস্থলে হাত দিয়া জ্যোতিবাবু বলিলেন, "কবিত্বশক্তি আছে—সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিতা আছে—খুব originality আছে—ইত্যাদি"। আমি তাঁহার কথাগুলি বেদবাক্যরূপে মানিয়া লই নাই—মুখের উপরেই বলিলাম, "এ Science-এ আমার বিশ্বাস নাই"। তিনি আরও নিবিষ্টচিত্তে আমার মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিলেন ও ইহাও বলিলেন, "আপনার Sense of veneration টা কিছু কম"। আমরা হাসিতে লাগিলাম।

তিনি আমাকে ও রবিবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা আকাশের—শূন্যমার্গেরই বেশি খবর রাখ। আমি কিছু practical"।

এ ঘটনার বহু বর্ষের পর কলিকাতায় জ্যোতিবাবুর সহিত দুই তিন বার দেখা হইয়াছিল। বালিগঞ্জের বাটীতে একদিন আমাকে সাদরে নিজের কাছে বসাইয়া পাঁচমিনিটে আমার চেহারা আঁকিয়াছিলেন। হুবহু ঠিক! অপূর্ব্ব pencil-sketch।

গাজিপুরে অবস্থিতি কালে পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী গাজিপুর সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা লেখেন। তাহা ভারতীতে পত্রাকারে প্রকাশিত হয়। সেই পত্রগুলির রচনাভঙ্গি এমন সুন্দর যে বোধ হয় যেন উপন্যাস পাঠ করিতেছি! অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলিকে সাজাইয়া মহিমান্বিত করিতে স্বর্ণকুমারী দেবী সিদ্ধহস্তা। যে সব অতিসামান্য বস্তু সামান্য লোকের দৃষ্টি আদপেই আকর্ষণ করে না, তাহা এই উজ্জ্বলচক্ষু লেখিকার দৃষ্টি এড়াইতে অসমর্থ। হিন্দুস্থানী দাসী জাঁতা পিষিতে পিষিতে যে গান গাহিয়াছে তাহাও তাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে এই অলোকসামান্যা মহিলার প্রতিভাবলে অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

গাজিপুরে কিছুদিন থাকিয়া স্বর্ণকুমারী দেবী ও রবিবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া যান্। আমি "গাজিপুর", "হরশিঙ্গার", "নাগা সন্ন্যাসী", "সোহাগিনী ইথে তব এত অভিমান" প্রভৃতি কবিতাগুলি ভারতীর জন্য পাঠাই। "গাজিপুর" নামক কবিতাটির আরম্ভ-ভাগ এইরূপ :—

এবে, গোলাপে গোলাপে, ছাইয়ে ফেলেছে,
এ মধু কানন দেশ।
সখি, তুমিও আইস, গোলাপি অধরে,
ধরিয়া গোলাপি বেশ!
গোলাপের ক্ষেত্, গোলাপি বিহানে
হেরি হারাইবে জ্ঞান,
হেথা, ফুল কি ফুটিছে? ছুটিছে ফোয়ারা
ভেদিয়া বিশ্বের প্রাণ!

কবিতাটির নিম্নে আমার নাম ছিল না। কবি-ভগ্নী সরোজকুমারী দেবী প্রভৃতি মনে করিয়াছিলেন কবিতাটি স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা। "হরশিঙ্গার" নামক কবিতার নিম্নে "শ্রী—উকিল" মাত্র ছিল। "কবির album" কবিতায় ও "দগ্ধকচু" উপন্যাস প্রভৃতিতেও আমার নামের উল্লেখ ছিল না। এজন্য অনেকেই প্রতারিত হইয়াছিলেন। কাহার লেখা কেহ ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কবিবর ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, একবার সাহিত্যসম্রাট রবিবাবুও জব্দ হইয়াছিলেন। যেমন political secrets থাকে, স্বর্ণকুমারী দেবীরও literary secrets থাকিত। "দগ্ধকচু"র লেখক শ্রীমেঘনাদ শক্র কে, ইহা কাহারও কাছে তিনি প্রকাশ করেন নাই। রবিবাবু দেখিলেন যে, "দগ্ধকচু"তে রঙ্গব্যঙ্গ উপহাসের প্রাচুর্য্য আছে—অতএব ইহা নিশ্চয় দ্বিজেন্দ্রবাবুর লেখা—ইহা ঠাওরাইয়া তিনি দ্বিজেন্দ্রবাবুকে একখানি প্রশংসাপূর্ণ পত্র লেখেন। তাহারপর যখন শুনিলেন যে উহা আমার লেখা, তখন যারপর-নাই বিস্মিত হন ও বলিয়াছিলেন, "দেবেন্দ্রবাবু গম্ভীর-প্রকৃতির লোক—তিনি "দগ্ধকচু"র প্রণেতা, কেমন করিয়া বুঝিব"?

আমি গাজিপুর পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিন লক্ষ্ণৌতে বাস করি। সেস্থান হইতে রাশি রাশি কবিতা ভারতীর জন্য পাঠাই। আমি একখানি পত্রে স্বর্ণকুমারী দেবীকে লিখিয়াছিলাম যে, আপনাকে দেখি নাই বটে, কিন্তু আমি আমার হৃদয়-মন্দিরে একটি আদর্শ নারীমূর্ত্তির পূজা করি। উহা আপনারই মূর্ত্তি ও মাতৃমূর্ত্তি। তদুত্তরে পূজনীয়া সম্পাদিকা আমাকে "ভ্রাতা" বলিয়া সম্বোধন করিয়া পত্র লেখেন। এত অকৃত্রিম যত্ন ও এত সুমিষ্ট আদর! তাঁহার পেটে এক, মুখে আর এক নাই। তিনি artificialityর আদপেই ধার ধারেন না। আমি তাঁহাকে "দিদি" বলিয়া পত্রাদি লিখিতাম। তাঁহার সহিত পরিচয় ক্রমে আত্মীয়তায় পরিণত হয়। তিনি শোলাপুরে পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতিকালে আমাকে লিখিয়া পাঠান, "আপনাকে যখন ভ্রাতা বলিয়াছি তখন আপনিও আমাদের আত্মীয়। আমার দাদা এখানকার Session Judge—আপনি আসিলে আমরা আপনাকে খুব যত্ন করিব—। আপনার শরীর ভাল থাকে না। এখানে আপনি আসিলে বায়ুপরিবর্ত্তনে নিরাময় হইবেন। আপনি নিঃসঙ্কোচে এখানে আসুন, ইত্যাদি।" দুঃখের বিষয় যে, অনেকগুলি অপরিহার্য্য কারণবশতঃ এই স্নেহপূর্ণ মধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি নাই।

প্রতি সপ্তাহেই স্বর্ণকুমারী দেবীর পত্র পাইতাম ও নিয়মিতভাবে আমিও উত্তর দিতাম।

আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, স্বর্ণকুমারী দেবী কোন্ কবিতা সাচ্চা আর কোন্ কোন্ কবিতা ঝুঠা, যেমন বোঝেন এমন অল্পলোকেই বাঙ্গলাদেশে বোঝে। তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধ-শক্তি অসাধারণ।

আমি লক্ষ্ণৌতে অবস্থানকালে তাঁহার সমুদয় গ্রন্থগুলি এক set উপহার পাই। আমি তাঁহার উপন্যাসগুলি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হই ও তাঁহার প্রত্যেক উপন্যাসের নায়িকাগুলির উপর কবিতা লিখি। আমি সেই কবিতাগুলি ভারতীতে প্রকাশিত হইবার জন্য সম্পাদিকাকে অনুরোধ করি।

"নিজের পত্রিকায় নিজের প্রশংসার কথা কেমন করিয়া মুদ্রিত করি?" এই বলিয়া তিনি আমাকে পত্রের দ্বারায় নিজ অসম্মতি প্রকাশ করেন। আমিও নাছোড়বান্দা। অবশেষে তাঁহার হার ও আমারই জিৎ হইল। তিনি সমস্ত কবিতা-গুলিকেই ভারতীতে স্থান দিলেন ও foot-noteএ লিখিলেন, "কবি দেখিতেছি আমার উপন্যাসগুলিকে সূতা করিয়া কবিতার হার গাঁথিয়াছেন। ইহাতে যদি কিছু গুণপণা থাকে, তাহা মাল্যকারের—সূতার নহে"। কি মধুর বিনয়!

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

নবপত্রিকায় ভারতী

ভারতীর বয়স চল্লিশ বছর!—শুনিয়া কেবল বিস্মিত হই নাই, আকাশ হইতে যেন একেবারে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলাম। বলে কি? ভারতীর বয়স এত অল্প! দিদিমার মুখে, দাদা-মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি,—কত দিন, কত পক্ষ, কত মাস, কত বছর, কত যুগ চলিয়া গিয়াছে,—ভারতীর বয়সের কেহ খবর পায় নাই। পৃথুর নামেই ত' পৃথিবী, ভগীরথের নামেই ত' ভাগীরথী, কুরুর নামেই ত' কুরুক্ষেত্র, আর ভারতীর নামেই ত' ভারতবর্ষ। আরাঙ্গজেব জন্মিবার আগেই কি আরেঙ্গাবাদের নাম আরেঙ্গাবাদ হইয়াছে? ব্যাসের মহতী ভারতী হইতে মহাভারতের জন্ম; তাই মহাভারতের নাম মহাভারত। সবাই জানে,—ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে যে দেবীসূক্ত আছে, তাহার মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্—ভারতী; ভাবিয়া দেখ—সে কত দিনের কথা। ধরিতে গেলে অনন্তকালের হিসাবে সেও সেদিনের কথা। মানুষে যখন পৃথিবী ভরিয়া গেল, বনের ফলে যখন মানুষের আর আহারে কুলায় না; তখন পৃথুরাজা প্রথম এই পৃথিবীর মন্থন করিলেন। সেই মন্থন এখনও চলিতেছে। সেই মন্থনের ফলে আজও মানুষ খাইয়া বাঁচে। অবশ্য সেও সেদিনের কথা। সেইরূপ বহু পূর্ব্বে দেবাসুরে মিলিয়া সমুদ্রমন্থন করিয়াছিলেন,—সমুদ্রের তল হইতে লক্ষ্মী উঠিয়াছিলেন। মিথ্যা কথা, সমুদ্রের তলে আর কতটুকু লক্ষ্মী আছে, বরং সমুদ্রে সাঁতার কাটিয়া গেলে লক্ষ্মীলাভ হয়। লক্ষ্মী নয়,—লক্ষ্মী নয়, সরস্বতী উঠিয়াছিলেন,—সমুদ্র হইতে।

লক্ষ্মী সরস্বতী দুইই যে নারায়ণের পত্নী। নারায়ণের পত্নী ভাবিয়া ভুলিয়া পুরাণকার লক্ষ্মী বলিয়া ফেলিয়াছেন। বোধ হয়, পূর্ব্বে লক্ষ্মী-সরস্বতীতে প্রভেদ ছিল না, তাই এক "শ্রী"নামে লক্ষ্মীকেও বুঝায়, সরস্বতীকেও বুঝায়। সরস্বতীর উপাসকেরাই ত' লক্ষ্মী লাভ করে। উপাসনা করিল একের, অন্যে আসিয়া তাহার বর দেয়,—এ কেমন, বুঝি না। মূক দেবাসুর মনোমন্দরের উপরে বিশ্ববিধাতা বিষ্ণুকে বসাইয়া ভাবের সমুদ্রকে

অনবরত মন্থন করিলেন, সেই মন্থনের ফলে অমৃত কলস কক্ষে করিয়া ভারতী উঠিলেন। দেবাসুরের মুখ ফুটিল, সেই কলসী লইয়া প্রথমে বাগ্‌যুদ্ধ, পরে হাতাহাতি, লাঠালাঠি। বলে পরাস্ত হইয়া অসুরেরা "হেলয়ঃ হেলয়ঃ" বলিতে বলিতে সিন্ধুর পরপারে বা পাতালে পলাইলেন, অমৃত-কলসও ভারতী-দেবতা-দিগের হইল। অমৃতপানে দেবতারা অমর হইলেন। সেই অমৃত পান করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন বলিয়া বাল্মীকি অমর হইয়াছেন, ব্যাস অমর হইয়াছেন, কালিদাস অমর হইয়াছেন, ভবভূতি, বাণভট্ট প্রভৃতিও অমর হইয়াছেন। সেই অমৃত-ভাণ্ডটিকে উঠাইয়া দেবাধিদেব পঞ্চানন মস্তকে রাখিয়াছেন বলিয়া অতি-মন্থনের ফলে উত্থিত হলাহল পান করিয়াও অমর হইয়াছেন। সেই বিষের ফল মাহেশ ব্যাকরণ, অমৃতের মাহাত্ম্যে দেবতারা সে বিষ হজম করিতে পারিয়াছিলেন, মানুষ পারিল না; কাজেকাজেই তাহার ছায়া-বলম্বনে পাণিনীয় রচিত হইল। তাহাতেও মাহেশ্বর বিষের সম্বন্ধ রহিল; গোড়াতেই "অ, ই, উ, ঋ, ঌ ক" হইতেই আরম্ভ। আবার নাগরাজ অনন্ত আসিয়া সহস্রমুখে যত পারিলেন—তাহাতে বিষ ঢালিলেন। বঙ্গ সহ্য করিতে পারিল না, উৎকল সহ্য করিল না, নেপাল, কাশ্মীর, মারওয়ার সহিতে না পারিয়া পাণিনীয়কে বিদায় দিল, কলাপকে আদর করিয়া লইল, লঙ্কা ও তিব্বত বঙ্গের অনুকরণে তাহাই করিল। যাউক এ সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক কথা, জানা আবশ্যক ভারতীর বয়স কত।

সরস্বান্ সমুদ্রের নাম, সরস্বতী যদি স্ত্রী-সমুদ্র হয়, তবে সরস্বতীর কূল-কিনারা পাওয়া অসম্ভব; সমুদ্রের কি কূল-কিনারা পাওয়া যায়?

জৈমিনি জেঠা-মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি—ভারতী নাকি নিত্য; তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। প্রমাণের বিচার তুলিয়া পাঠক-পাঠিকাকে ফাঁফরে ফেলিতে চাই না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি,—লাঠিয়াল যখন লাঠি ঘুরাইতে থাকে, দড়ির মুখে একটি বল বাঁধিয়া যদি সেই দড়িগাছ ঘুরানো যায়, তবে ভন্ ভন্ শন্ শন্ শব্দ শুনা যায়। রেলের গাড়ীর চাকা, ঘোড়ার গাড়ীর চাকা, গরুর গাড়ীর চাকা ঘুরিলেই একটা-না-একটা শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এই যে অসীম আকাশে সূর্য্য-মণ্ডলকে সমগ্র গ্রহ-চক্র প্রবল বেগে অচিন্ত্য দ্রুতগতিতে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছে তাহাতে কি শব্দ নাই? ভারতী নাই?

আমরা জানি,—নৌকার মাঝীরা সারি গায়িয়া দাঁড় টানে, শকটচালক গান গায়িয়া গাড়ী চালায়, হলচালক গান গায়িয়া জমি চষে ও নিড়ায়, রাখালেরা গান গায়িয়া তৃণপূর্ণ মাঠে গরু লইয়া যায়, পাল্কীবাহক ও ভারবাহক ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হুঁ হুঁ শব্দে ছুটে, মেয়েরা গান গায়িয়া তালে তালে ঢেঁকি ভানে ও যাঁতা ঘুরায়। চেতন জগতের এ নিয়ম অচেতন জগতেও আছে; সকলেই শব্দের সাহায্যে ভারতীর উপাসনায় কার্য্য করিয়া যাইতেছে। অচেতনও শব্দের সহায়তা না লইয়া খাটিতে পারে না।

হিন্দুত সর্ব্বত্র বিশ্বরূপের বিশ্বরূপ দেখিতেছে, কাহাকেও অচেতন বলিতে পারে না। ছান্দোগ্যে আছে—সূর্য্য গান গায়িতে গায়িতে উদিত হয়েন। গ্রহগণ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিলেও সূর্য্য অচল নহেন, তাঁহারও আপন কক্ষায় ঘূর্ণন আছে, সুতরাং সূর্য্য-মণ্ডলেও ভারতীর অধিষ্ঠান, ভারতীর অবস্থান আছে। সূর্য্যের তুলনায় অগাধ-অসীম সমুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেই ক্ষুদ্র জলবিন্দু যখন জোয়ার ভাটা খেলিয়া পর্ব্বত-শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ কাচ-স্বচ্ছ তরঙ্গ তুলিয়া সাত বজ্রাঘাতের মত গভীর গর্জ্জনে অনবরত উথলাইতেছে, তখন উষ্ম তরল প্রকাণ্ড সূর্য্য-মণ্ডল যে নীরবে নিয়ত উথলাইবে ও অনবরত ঘূর্ণনে নীরবে নিয়ত গ্রহ প্রসব করিবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। বিশ্বের শব্দ চলিতেছে, যখন বিশ্ব ছিল না তখন শব্দ ছিল কিনা কে বলিবে? পৌরাণিক ঋষি বলিতেছেন ভগবান্ শেষ শয্যাশায়ী ছিলেন। তখন লক্ষ্মী চরণ সংবাহন করিতেন, সরস্বতী চামর ব্যজন করিতেন; সরস্বতীর হাতে চামর ব্যজনের ভার, সুতরাং শব্দ আছে, বায়ুরাশি আন্দোলিত হইলেই শব্দ আছে। নৈয়ায়িকেরা সুদৃঢ় প্রমাণের বলে শব্দকে আকাশের গুণ স্থির করিয়াছেন,—বায়ুর গুণ নয়—সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "দোধূয় মানা স্তিষ্টন্তি প্রলয়ে পরমানবঃ" নৈয়ায়িকের এই কথা যদি ঠিক হয়, মীমাংসকের প্রদর্শিত যুক্তির বলে শব্দ যদি নিত্য হয়; তবে বলিতে হইবে—প্রলয়ের শব্দ ছিল, প্রলয়ের বক্ষেও সরস্বতীর আসন পাতিত ছিল, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় মৃতপ্রায় পরম শিবের বুকে মা, নীল সরস্বতী অচল অটল ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

তবে কি ভারতীর চল্লিশ বছর বয়স, এ কথা মিথ্যা? না, মিথ্যা নয়। আমরা প্রতিষ্ঠা পণ লইয়াই বয়সের কল্পনা করি। আমি যে বলিতেছি, আমি সপ্ততি বর্ষ বয়স্ক, তুমি যে বলিতেছ,—আমি ষষ্ঠিবর্ষ বয়স্ক; এই আমার কথা, তোমার কথা কি মিথ্যা? আমি শব্দের অর্থ আত্মা, তুমি শব্দের অর্থও আত্মা। হিন্দুত আত্মার উৎপত্তি মানে না!—তবে কি করিয়া সত্তোর বৎসর বহুস ও ষাট্ বৎসর বয়স হয়? বলিতে হইবে, এই শরীরে আত্মার প্রতিষ্ঠা লইয়াই বয়সের বিচার। মন্দিরে দেবপ্রতিষ্ঠা লইয়াই দেবতারও বয়সের বিচার। ঋষিবৃন্দ যাঁহাকে ওঁরূপে, বংরূপে, ক্রীঁরূপে, ক্রীঁরূপে, ক্লীঁরূপে, স্বাহা, স্বধা, বষট্ রূপে দেখিয়াছেন; প্রতিষ্ঠা লইয়াই সেই ভারতীর বয়সের বিচার।

পবিত্র ব্রহ্মবাদী ঋষিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহর্ষির ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হইয়া তত্ত্বদর্শী দ্বিজেন্দ্র সম্মোহিতচিত্তে পত্রিকামন্দিরে "পঞ্চাশল্লিপিভি র্বিভক্ত মুখদোঃ পন্মধ্য স্থলা" মৃণালগৌরী বীণাপাণি ভারতীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যখন মৃদুমধুর শুভ্র জ্যোৎস্না ছড়াইতে ছড়াইতে পূর্ব্বগগনে বর্দ্ধনোন্মুখ বঙ্কিমচন্দ্র হাসিতে হাসিতে দেখা দিয়াছিলেন, বঙ্গদর্শন যখন রসে উচ্ছ্বসিত; সেই সময়ে সেই আপূর্য্যমাণ শুক্লপক্ষে বলিতে হইবে,—বঙ্কিমচন্দ্রের পঞ্চমী তিথিতে এই ভারতীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সেই প্রতিষ্ঠা

লইয়াই এই ভারতীর চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম। এই চল্লিশ বৎসর কম নয়, এই চল্লিশ বছরের ভিতরে, কত সুদৃঢ় দেব-প্রাসাদ ভূমিকম্পের তাড়নায় ভূগর্ভে বিলীন বা ইষ্টকস্তূপে পরিণত, কত সুরম্য হর্ম্ম্য প্রচণ্ড তৃণাবর্ত্তের অপ্রতিহত-প্রবলবেগে চূর্ণ-বিচূর্ণ, কত অট্টালিকা জলপ্লাবনে জলধি-গ্রস্ত! আশ্চর্য্য, বিস্ময় ও আনন্দের বিষয় যে, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহার নির্ম্মাণ হইয়াছে, ভারতীর সেই পত্রিকারূপ মন্দির-খানি, পাতার ঘরখানি ঠিক পূর্ব্ববৎ নিখুঁৎভাবে আজও দণ্ডায়মান, আজও সকলের চোখের সামনে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, চুলের আগার মত একবিন্দু অপচয়ও হয় নাই। এ একলা দ্বিজেন্দ্রের সৌভাগ্য নয়, তোমার-আমার সৌভাগ্য, সমস্ত বঙ্গের সৌভাগ্য, সমস্ত ভারতের সৌভাগ্য। গৃহকর্ত্তা বয়সের সীমায় দাঁড়াইলে আর সে বাহ্য পূজা লইয়া সময় কাটাইতে পারে না, জপ, ধ্যান, মানস-পূজায় তাহার সময় কাটিয়া যায়; প্রতিষ্ঠিত গৃহ-দেবতার পূজার জন্য আর তাহার তিলার্দ্ধ সময় থাকে না। তাই দ্বিজেন্দ্র ক্রমে ভগিনীর হস্তে, ভাগিনেয়ীর হস্তে, ভ্রাতার হস্তে, এই কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া সমাধিস্থ হইয়া-ছিলেন। প্রাণপণে গুরুজনের আজ্ঞা প্রতি-পালন করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহারাও প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজায় দীক্ষিত ও ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। যখন যে পুষ্প যে ফল পাওয়া যায়, রাশি রাশি সেই সকল উপাদেয় ফল পুষ্প আহরণ করিয়া নিজের গৃহজাত সূক্ষ্ম সুচিক্কণ শুভ্র সুরভি শালি তণ্ডুলে প্রকাণ্ড নৈবেদ্য সাজাইয়া তাঁহারা এ পর্য্যন্ত মহা আড়ম্বরে দেবীর পূজা চালাইয়াছেন। ধূপ, ধূনা, গুগ্‌গুলের সৌরভে অগুরু চন্দন কুঙ্কুম কস্তূরী সুবাসিত সুরভিকুসুম রাশির ও বিবিধ সুপক্ক ফল মিষ্টান্নে সুসজ্জিত নৈবেদ্য-সম্ভারের সৌগন্ধ্যে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত হইতেছিল—সেই প্রসাদি-মহামূল্য নৈবেদ্য ভক্তসাধকদিগের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রেরিত ও সর্ব্বত্র বিতরিত হইতেছিল, দীন, হীন, কাঙাল বলিয়া এ পর্য্যন্ত কোন যাচক উপেক্ষিত হয় নাই। প্রসাদি-নৈবেদ্য পাইয়া সকলে ধন্য হইয়াছে—ও ধন্য ধন্য করিয়াছে। অধিকাংশ মাতৃভক্ত সাধক এই মহাপূজায় যথাশক্তি সাহায্য করিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য-বৃদ্ধের পক্ষে এ পর্য্যন্ত সে সৌভাগ্য ঘটে নাই। পুত্রের ভাগে ঘটিয়াছে। কিশোর পুত্র গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া পূতদেহে পূতমনে ভারতীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছে। আজও সেই ক্ষুদ্র-পাণিতলের অঞ্জলির ফুলগুলি বাসি হয় নাই, শুকায় নাই, মায়ের চরণে ফুটিয়া রহিয়াছে। "দেবোভূত্বা দেবং যজেত" কাহাকেই বা বলি? কেবা এই তত্ত্বের অনুভব করিতে পারে? সাধকভক্ত দেখিয়াছ কি? রবিকরে উদ্ভাসিত হইয়া দ্বিজেন্দ্র-সেবিত যে ভারতী লোকলোচনের সমক্ষে দাঁড়াইয়াছে; তাহাকে পূজা করিবার জন্য সেই ভারতীরই স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি স্বর্ণকুমারী পবিত্র আসনে বসিয়াছেন, হিরণ্ময়ী প্রতিমা ধ্যানমগ্না হইয়াছেন; সরলা প্রতিমা বাছিয়া বাছিয়া নবনব পুষ্পদল

অঞ্জলি ভরিয়া মায়ের চরণে অর্পণ করিতেছেন, আর ভক্ত সাধকগণ যথাশক্তি অবিশ্রাম শঙ্খ, ঘণ্টা, কাংস্য, করতাল বাজাইতেছেন; সে কেমন সুন্দর দৃশ্য, সে কেমন জগদ্‌বিমোহন ঐকান্তিকতা, সে কেমন নিজে কার্য্য করিয়া জগতে শিক্ষা দান। মায়ের নিকটে খাইতে শিখিয়াছি, শুইতে শিখিয়াছি, বসিতে শিখিয়াছি, পরিতে শিখিয়াছি, কথা কহিতে শিখিয়াছি, সেইজন্য মায়ের আদরের কোমলশিক্ষা বড় আদরের, মায়ের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া আজও শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে।

মা সন্ধ্যাবেলা দুইটি উপযুক্ত পূজারীর হস্তে পূজার ভার দিয়া তাহাদিগের উপরে চক্ষু রাখিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পূজারিদ্বয়ের হাত পাকিয়াছে। তাঁহাদের নিপুণ হস্তের দীপ-চালনায়, আরতির ইঙ্গিতে, ঘণ্টা-নাদের ভঙ্গীতে নিজের নিজের ভেট মাথায় করিয়া দর্শকবৃন্দ ছুটিয়া মণ্ডপের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। এই আরতির সূত্রপাতেই বুঝিতেছি—অব্যাহতভাবে ভারতীর পূজা চলিবে। চিন্ময়ী মায়ের চরণে প্রার্থনা করি,—ভারতী এই মন্দিরে চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জগতের পূজা গ্রহণ করুন। প্রণব যেমন অতি প্রাচীন হইলেও প্রকৃষ্টরূপে নয়; সেইরূপ আমাদিগের এই প্রাচীন পত্রিকাখানি নিত্য নব নব ভাব লইয়া জগতের সমক্ষে নবীন রূপে প্রতিভাত হউক।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

শিল্পী রোঁদা

(১)

সিন-নদীর তীরে, একটি ছোট পাহাড়ের উপর শিল্পী রোঁদার বাস,—সেখান হইতে, আকাশ-পৃথিবীর বিলীয়মান মিলন-রেখায় সভ্যতার রাণী প্যারিকে দেখা যায়। প্রকৃতির এই মুক্ত-শ্রীর মধ্যে, আপন নিভৃত ভবনে বসিয়া এ-যুগের শিল্প-সম্রাট রোঁদা শুভ্র শিলা-পটে বিচিত্র ভাবের কাব্য ফুটাইয়া তুলেন।

রোঁদা, আধুনিক শিল্প-রাজ্যে যুগান্তর আনিয়াছেন। ললিতকলাকে তিনি যেমন তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন, তাহার ভিতরের গূঢ় কথা যেমন ভাবে বুঝিয়াছেন, তাহার উপরে যেমন নূতন আলোকপাত করিয়াছেন—একালের আর-কেহ তেমন পারেন নাই।

শিল্প-জীবনের আরম্ভে তিনি চলিত রীতি-পদ্ধতির কোন ধার-না-ধারিয়া আপনার উপযোগী একটি বিশিষ্ট পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন। প্রথম-প্রথম কেহ তাঁহার শিল্পের আসল সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিত না,—লোকে ভাবিত, এই অক্ষম শিল্পী শিব গড়িতে বসিয়া বানর গড়িয়া ফেলিতেছে! সকলেই তাঁহাকে ঠাট্টা-তামাশা করিত—সময়ে-সময়ে গালি দিতেও ছাড়িত না।—রোঁদা কিন্তু সে অনাদর-অবহেলা একেবারেই গায়ে

মাখিলেন না—আপন সাধন-পথে তিনি পাথরের মতই অটল হইয়া রহিলেন! কারণ, তিনি জানিতেন যে, প্রতিভার ফুল ত ফুরফুরে বাতাসে ফোটে না,—সে ফোটে ঝড়ের ঝাপটায়, সহস্র বাধা-বিঘ্নের আঘাতে!

প্রাণের সাধনা কখনো বিফলে যায় না!—একে-একে কতকগুলি বিখ্যাত ও সমজদার লোক রোঁদার ভক্ত হইয়া পড়িলেন। রোঁদা যে যথার্থ সত্যপথই অবলম্বন করিয়াছেন—এই কথাটি তাঁহারা সকলকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। ধীরে ধীরে সাধারণের চোখ ফুটিতে লাগিল।

রোঁদা এখন অতি-বৃদ্ধ। পাশ্চাত্য কুরুক্ষেত্রের মহাবিপ্লবে জীবন-সন্ধ্যায় তিনি স্বদেশ ছাড়িয়া প্রবাসী হইয়াছেন। তাঁহার শান্তিসুপ্ত সাধনকুঞ্জে আজ রক্তের ঢেউ বহিতেছে।

কিছুদিন আগে শিল্পাচার্য্য রোঁদা, ললিত কলা সম্বন্ধে আপন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই মত-প্রকাশের ফলে শিল্পী-সমাজ বেশ-একটা নাড়া পাইয়াছে। আমরা এখানে তাঁহার মতামতের কতক-কতক পরিচয় দিলাম। তাঁহার এই অভিমতগুলি মন-দিয়া পড়িয়া দেখিলে কি শিল্পী, কি সাহিত্যসেবী, আর কি সাধারণ পাঠক,—সকলেই যথেষ্ট উপকার লাভ করিবেন।

"আজকাল যাঁরা শিল্পী ও শিল্প-রসিক তাঁরা যেন সেই মান্ধাতা আমলের মানুষ। এখনকার যুগ হচ্ছে যন্ত্রনির্ম্মাতা আর ব্যবসায়ী কারিকরের যুগ—এখানে কলাবিদের ঠাঁই নাই।

একেলে জীবন সুধু দেখিতে চায়, কোন্‌টা কেজো আর কোন্‌টা অকেজো—বিষয়াসক্তিই এখন আমাদের সর্ব্বস্ব। বিজ্ঞান এখন মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নিত্য-নূতন সহজ উপায় আবিষ্কার করিতেছে—শস্তায় রদ্দী মালের আমদানি করিয়া জনসাধারণের ভিতরে বিকৃত বিলাসের প্রচার করিতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতিতে যে সংসারের দৈনিক অভাব অনেকটা পূরণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে মনের স্ফূর্ত্তি, ভাবের মাধুর্য্য ও কল্পনার বৈচিত্র্য কোথায়?—ললিত-কলা মরিয়া গিয়াছে!

মানুষ এখন মনে করে, ললিতকলাকে ছাড়িয়া সে অনায়াসে নিজের কাজ নিজে সারিয়া লইতে পারে। মানুষের মন হইতে ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার রঙ্গিনতা ছুটিয়া গিয়াছে;—সে চায় বাস্তব, সে চায় শরীর দিয়া উপভোগ করিতে! মানবজাতি এখন জড়বৎ—এ উপাদানে কলাবিদের গঠন হয় না।

আর্ট আর রুচি, এক। কলাসৃষ্ট বিষয়ের উপরে শিল্পীর হৃদয়ের যে ছায়াপাত হয়—ললিতকলা তাহারই প্রতিবিম্ব। মানব-আত্মার হাস্য আর্টের রূপ ধরিয়া আমাদের ঘর-দুয়ার আলো করিয়া তুলে! কিন্তু আমাদের ক-জন বুঝেন যে, ঘর-দুয়ার সাজাইতে হইলে রুচির দরকার? সেকালে আর্ট ছিল সর্ব্বত্র। সামান্য চাষা-ভুষারাও এমন-সব জিনিষ ব্যবহার করিত যে, দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যাইত। তাহাদের বাসন-কোসন, বসিবার আসন ও জলের

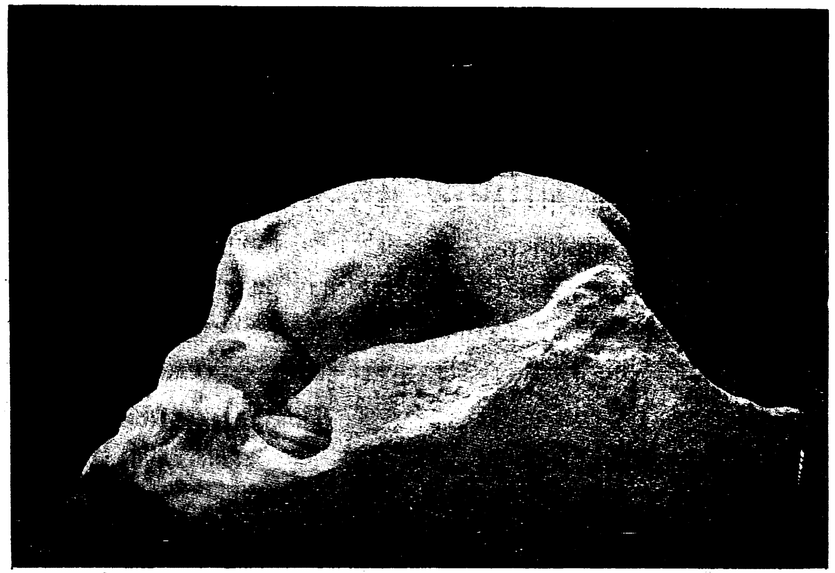

অভিশপ্তা

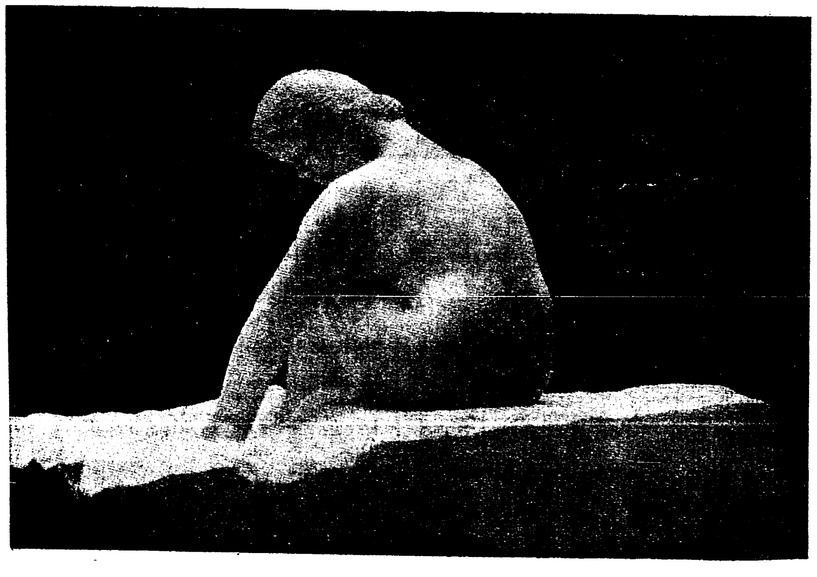

তরুণী

কলসগুলি পর্য্যন্ত সুডৌল-সুন্দর হইত। আজ কিন্তু দৈনিক জীবন-যাত্রায় আর্টের সঙ্গে দেখা হয় না। লোকে বলে কাজ চলিলেই হইল—সুন্দরে কি দরকার? সবই এখন কদাকার, তাড়াতাড়িতে যেমন-তেমন করিয়া তৈরি-করা, সব জিনিষই কলের ছাঁচে পড়িয়া বেঢপ। কলাবিদ এখন সকলকার শত্রু।"

সকলেই বোধ হয় জানেন যে, পাশ্চাত্য শিল্পীরা জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রাঙ্কন বা মূর্ত্তিগঠন করেন। এই আদর্শ-স্বরূপ পুরুষ বা রমণী, শিল্পীর স্বেচ্ছামত ভঙ্গীতে তাঁহার সুমুখে দাঁড়াইয়া, বসিয়া বা শুইয়া থাকে,—তাহাই দেখিয়া শিল্পী আপন পরিকল্পনাকে শরীরিণী করিয়া তুলেন।

রোঁদাও আদর্শ দেখিয়া মূর্ত্তিগঠন করেন বটে, কিন্তু তাঁহার কার্য্যপ্রণালী একটু স্বতন্ত্র। যাহারা তাঁহার আদর্শ হয়, সাধারণত তাহাদিগকে তিনি কোন-এক নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গীতে আড়ষ্ট হইয়া থাকিতে হুকুম দেন না;—তাহারা তাঁহার সম্মুখে স্বাধীনভাবে নানান্ ভঙ্গিমায় চলা-ফেরা ওঠা-বসা করে—সেই বিবিধ অঙ্গবিন্যাসের মধ্যে যেটি বেশী পছন্দসই, স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়, রোঁদা তাহাই আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। তিনি বলেনঃ—

"আমার সহযোগী শিল্পীরা যে প্রণালীতে কাজ করেন, হয়ত তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু প্রকৃতির উপরে এমন স্বেচ্ছাচার ও মানুষের প্রতি এমন গোলামের মত ব্যবহার করিলে, শিল্পীর কাজ কৃত্রিম ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িবার ভয় আছে।



ইভ

আমি সত্য-সন্ধানী,—এমনভাবে আমি কাজ করিতে পারিব না। সজীবতার ভিতরে আমি যে গতিবিধি দেখি, তাহা আমি গ্রহণ করি—কিন্তু আমার মনের-মত হইবার জন্য আদর্শকে আমি বাধ্য করি না।

প্রকৃতিকে আমি সকলতাতেই মানিয়া চলি; তাঁহার উপরে হুকুমজারি করা আমার স্বভাব নয়—আমার একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে,—প্রকৃতির কাছে আমি যেন দাসের মত বিশ্বস্ত হইতে পারি।

প্রকৃতিকে আমি যেমন দেখি, তেমনি ফুটাই—পরিবর্ত্তন করি না। তবুও যে আমার গঠিত মূর্ত্তি দেখিতে অন্য রকম হয় তার মানে প্রকৃতির যে বাহিরের রূপ তাকে অতিক্রম করিয়া আর-এ কটি সত্য রূপ আমার মূর্ত্তিতে থাকে। আমি ত শুধু বাহির লইয়া কারবার করি না, আমার যে ভিতরটিও চাই—এবং ঐ ভিতরটি প্রকৃতিরই নিজস্ব সামগ্রী। ভিতর বাহির এক-করিয়া প্রকৃতির যে রূপ তাহাই আমার শিল্প।

শিল্পী প্রকৃতিকে সে চোখে দেখেন না—সাধারণে যে চোখে দেখে। বাহিরের আকারের আড়ালে যে লুকানো সত্য আছে, আপন আবেগে শিল্পী তাহা দেখিতে পান।

আর্টে একটি কথাই মূলকথা—তুমি যেমন দেখিবে, তেমনি নকল করিবে। প্রকৃতির উপরে হাত চালাইয়া তাঁহাকে তুমি বেশী-সুন্দর করিতে পারিবে না।

প্রকৃতিকে দেখার-মত-দেখাই হচ্ছে আসল কথা।

অল্প যার শক্তি,—প্রকৃতিকে নকল করিয়া সে কখনও আর্টের বিকাশ করিতে পারে না; কারণ, সে না-দেখিয়া শুধু চাহিয়াই থাকে। সে যদি প্রকৃতির সমস্ত খুঁটিনাটি হুবহু নকল করিয়াও যায়, তাহা হইলেও কোনই ফল হইবে না। শিল্পীর ব্যবসা ক্ষুদ্রশক্তির জন্য নহে।

কলাবিদ সেখার-মত দেখেন। মানস-নেত্রে তিনি প্রকৃতির গোপন মর্ম্মটি দেখিতে পান। শিল্পীর প্রধান নির্ভর—তাঁহার দৃষ্টি।"

La Vieille Heanlmére নামে রোঁদার গঠিত একটি মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি এক বৃদ্ধা রমণীর। বয়সের ভারে সে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং আপনার বিগত-যৌবন লোলচর্ম্ম কদাকার দেহের দিকে চাহিয়া সে যেন গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

ললিতকলায় বৃদ্ধবয়সের এমন ছবি আর একটি-বৈ দুটি নাই। তাহা St. Magdeleneএর মূর্ত্তি—ফ্লোরেন্সের প্রাচীন শিল্পী Donatello তাহা গঠন করিয়াছেন। সে মূর্ত্তিও উলঙ্গ—কেবল দীর্ঘ কেশদাম বস্ত্রাকারে তাহার লুপ্ত-শ্রী দেহকে বেষ্টন করিয়া আছে। Saint Magdelene পূর্ব্বজীবনে আপন: পার্থিব দেহের প্রতি যে মিথ্যা যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহারই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মরুভূমিতে গিয়া তিনি কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন,—Donatelloর মূর্ত্তিটি সেই তপস্বিনী Magdeleneরই প্রতিরূপ। Magdelene-এর মুখে স্বর্গীয় ভাবের আবেশ আছে—নশ্বর দেহের জন্য যে তিনি কিছুমাত্র



বৃদ্ধা

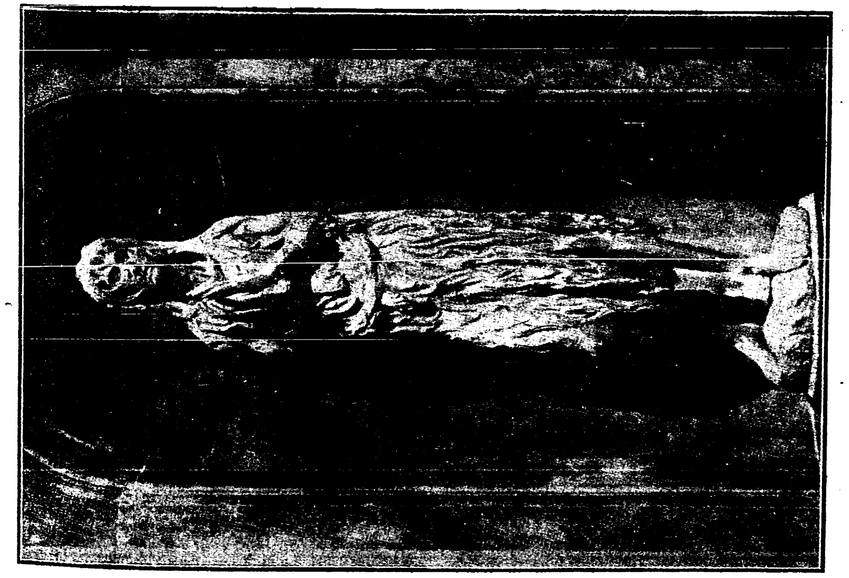

ম্যাগ্‌ডেলিন

আকুল, তাঁহার মুখে এমন কোনই চিহ্ন নাই। কিন্তু রোঁদার বৃদ্ধা রমণী যেন আপনার শবের মত গলিত দেহ দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছে। এইখানেই দুইযুগের দুই শিল্পীর মধ্যে প্রভেদ।

রোঁদার গঠিত এই বৃদ্ধা রমণীর মূর্ত্তিটি দেখিলে দর্শকেরা—বিশেষত মহিলা-দর্শকেরা অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়া থাকেন। সেই উপলক্ষে রোঁদা বলিতেছেন, "এ মূর্ত্তিটি কুশ্রী—সাধারণে তাই ইহাকে দেখিতে চায় না। ইহার কাছে আসিলে মহিলারা তাড়াতাড়ি হাত-দিয়া আপনাদের চোখ ঢাকিয়া ফেলেন। ইঁহারা সত্যকে ভয় করিয়া চলেন।

আমি সুধু গুণজ্ঞের মুখ চাহিয়া কাজ করি। আমি হচ্ছি সেকালের সেই রোমীয় গায়কের মত,—জনতার বিদ্রূপের উত্তরে যিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি সুধু গুণীকে গান শুনাই!'

যারা অবোধ, কেবল তারাই মনে করে, এই দৃশ্যমান বিশ্বে যাহা-কিছু কুশ্রী, কলাবিদের পক্ষে তাহা গ্রহনীয় নহে। কি ভ্রম!

সচরাচর যাহাকে বলা হয় অসুন্দর, আর্টে তাহাই অপূর্ব্ব-সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে। বাস্তবজগতে যাহা-কিছু বিকৃতাঙ্গ, যাহা-কিছু অস্বাস্থ্যকর, যাহা-কিছু রোগ বা অক্ষমতা বা যন্ত্রণার সূচক, যাহা শৃঙ্খলার পরিপন্থী (কারণ শৃঙ্খলাই হচ্ছে স্বাস্থ্য ও শক্তির নিদর্শন),—সে-সমস্তকেই কুৎসিত বলিয়া ধরা হয়। কুব্জ কুশ্রী, খঞ্জ কুশ্রী, দরিদ্রের ছিন্নকন্থা কুশ্রী।

কুৎসিত হচ্ছে নীতিহীন নারকী ও সমাজ-শত্রু নিয়মভ্রষ্ট মানবের স্বভাব; কুৎসিত হচ্ছে গুরুঘাতক, বিশ্বাসঘাতক এবং অধার্ম্মিক দুরাকাঙ্ক্ষীর আত্মা।

যাহাদের নিকট হইতে কেবল অমঙ্গলের আশা করা যায়, তাহাদিগকে যে ঘৃণার্হ উপাধি দেওয়া হয়, তাহা কিছু অন্যায় নহে। কিন্তু একজন প্রতিভাধর লেখক বা শিল্পীকে ঐ-সকল কদর্য্যতার মধ্য হইতে কোন-একটিকে লইয়া ব্যবহার করিতে দাও, দেখিবে এক মুহূর্ত্তেই তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিবে। তাঁহার যাদুযষ্টির একটি স্পর্শেই যাহা কুরূপ, তাহা সুরূপ হইয়া যাইবে;—এ যেন মহামায়া!

Velasquez; রাজসভার বামন সিবাষ্টিয়ানের ছবি আঁকিয়াছেন। বামনের চক্ষে তিনি এমন-এক মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টি অর্পণ করিয়াছেন যে, আমরা দেখিবামাত্র তাহার মধ্যে সেই যাতনাদায়ক গুপ্তকথা জাজ্বল্য হইয়া উঠে,—যাহার জন্য সেই হতভাগ্য জীব, বাধ্য হইয়া আপন মানবতার সম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, এবং একটি জীবন্ত ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছে।

Beandelaire যদি একটি সপূঁজ, কীটদষ্ট, অপরিষ্কার ও গলিত শবের বর্ণনা করেন এবং কল্পনায় যদি তাঁহার প্রাণ-প্রিয়তমাকে এই ভীষণ অবস্থায় নিরীক্ষণ করেন, তবে তাঁহার সে সৌন্দর্য্যের চিত্র অতুলনীয় হইয়া উঠিবে। সেক্‌স্‌পিয়ারের ইয়াগো বা তৃতীয় রিচার্ডের ছবি এবং Racineএর অঙ্কিত নিরো ও নার্সিশাসের মূর্ত্তিও এই হিসাবে সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

ললিতকলায় কেবল তাহাই সুন্দর, যাহার মধ্যে স্বভাব আছে।

সুশ্রী বা কুশ্রী—প্রকৃতির সকল বিষয়েরই সারসত্য হইতেছে, স্বভাব। এই স্বভাবে, ভিতরের সত্য বাহিরের সত্যের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। বাহিরে, মুখের আকারে মানুষের ভাব-ভঙ্গী-কার্য্যে, আকাশের রঙ্গে, চক্রবালের রেখার টানে ভিতরের এই আত্মা, বোধ বা ভাব ফুটিয়া ওঠে।

শক্তিমান শিল্পী, প্রকৃতির সর্ব্বত্রই স্বভাবকে দেখিতে পান; তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্য সকল পদার্থেরই গুপ্ত অর্থ ধরিতে পারে। এবং সুন্দর বলিয়া কথিত জিনিষে যতটুকু স্বভাব প্রকাশিত হয়, যাহাকে আমরা কুৎসিত বলিয়া ভাবি, শিল্পীর শক্তিতে তাহাতে তার-চেয়ে ঢের-বেশী স্বভাব ফুটিয়া ওঠে। কারণ, রুগ্নের সঙ্কুচিত আকারে, পাপীর মুখের রেখায় রেখায়, বিকৃত দেহের মধ্যে, অধঃপতনের মধ্যে ছায়ার পাশে আলোর মত স্বভাবকে যতটা উজ্জ্বল দেখায়, স্বাস্থ্যের মধ্যে, সুনিয়মের মধ্যে ততটা দেখায় না। এই স্বভাবের গুণেই প্রকৃতিতে যাহা যত-বেশী কুশ্রী, আর্টে তাহা তত-বেশী সুশ্রী। আর্টে কুশ্রী বলি তাহাকে, যাহার মধ্যে স্বভাবের অভাব আছে—যাহাতে ভিতরের বা বাহিরের কোন সত্যই পাওয়া যায় না।

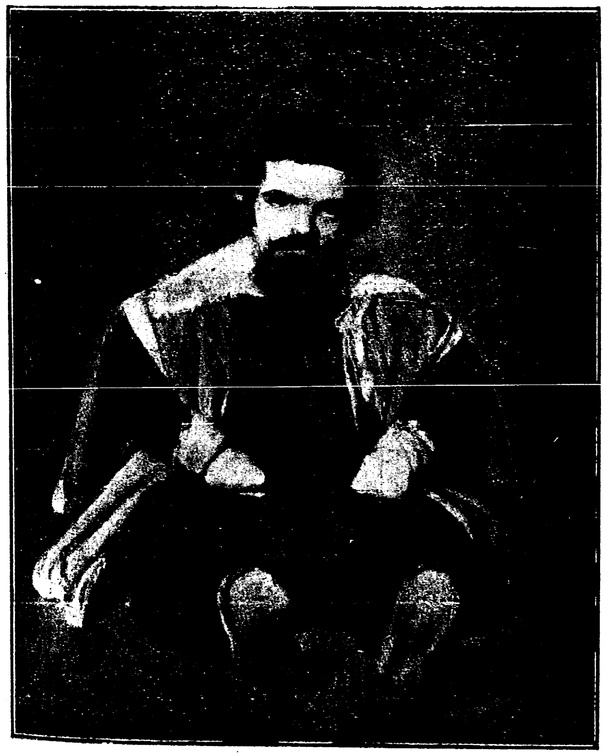

বামন

যাহা-কিছু মিথ্যা, যাহা-কিছু কৃত্রিম, যাহা-কিছু ভাবপ্রকাশ না করিয়া আপনাকে কেবলই পরিপাটি করিয়া তুলিতে চায়, যাহা খামখেয়ালী ও জমকালো, যাহা পাগলের মত হাসে, যাহা অকারণে দেমাকে ডগমগ হইয়া চলা-ফেরা করে; যাহাতে আত্মাও নাই, সত্যও নাই, যাহাতে সুধু সৌন্দর্য্য ও মোহন-শ্রীর নির্জ্জীব সমাবেশ আছে—এক কথায় যাহা-

কিছু ধ্রুবের পরিপন্থী, ললিতকলায় সে-সমস্তই অসুন্দর।

যখন কোন শিল্পী প্রকৃতির উৎকর্ষ বিধানের জন্য বসন্ত-শ্রীর উপরে গাঢ়তর সবুজ রং ঢালিয়া দেয়, সূর্য্যোদয় দৃশ্যকে আরও রক্তরাঙ্গা দেখাইবার জন্য তাহার উপরে বেশী-করিয়া গোলাপের রস নিংড়াইয়া দেয়, তরুণ ওষ্ঠাধর আল্‌তা দিয়া অধিক রঙ্গিন করিয়া তোলে, তখন সে কুৎসিতের সৃষ্টি করে—কেননা, তখন মিথ্যাকে অবলম্বন করা হয়।

যখন কোন শিল্পী যন্ত্রণার মুখভঙ্গীকে বার্দ্ধক্যের আকারহীনতাকে স্বেচ্ছায় কোমল করিয়া আনে, যখন কোন শিল্পী মূর্খ জনসাধারণের বাহবা পাইবার জন্য প্রকৃতিকে কৃত্রিম বেশে সাজায়-গুছায়, তখন সে কুৎসিতের সৃষ্টি করে—কেননা, সত্য দেখিলে সে ভয় পায়।

যাঁহারা 'কলাবিদ' নামের যোগ্য, তাঁহাদের সকলকার কাছেই বিশ্বপ্রকৃতির সমস্তই সুন্দর।

শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্—অর্থাৎ কবি, চিত্রকর ও ভাস্কর,—ইঁহারা সকলেই জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যেও, প্রিয়জনের মৃত্যুর মধ্যেও, বন্ধুবান্ধবের বিশ্বাসহীনতার মধ্যেও এমন-কিছু দেখিতে পান, হৃদয়-বিদারক হইলেও যাহা তাঁহাদিগকে আনন্দদান করে। অনেক সময়ে তাঁহাদের নিজের প্রাণও দুঃখের পীড়নে ভাঙ্গিয়া পড়ে বটে, কিন্তু যখন তাঁহারা আপনাদের প্রাণের যাতনা বুঝিয়া তাহাকে প্রকাশ করিতে বসেন, তখন দুঃখের চেয়ে দৃঢ় এক তিক্ত সুখের প্রসাদে তাঁহাদের চিত্ত ভরিয়া যায়। সকল অস্তিত্বের মধ্যে তিনি নিয়তির ইঙ্গিত দেখিতে পান। প্রাণের আত্মীয় ছলনা করিলে কলাবিদ্ সে আঘাতে নুইয়া পড়েন; কিন্তু তারপরেই সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বিশ্বাস-ঘাতককে আপন সৃষ্টির মধ্যে স্থানদান করেন। তিনি মনে করেন, এই অকৃতজ্ঞতা হইতে তাঁহার এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হইল। তাঁহার ধ্যানের এই উল্লাস সময়ে-সময়ে ভীতিপ্রদ বটে—কিন্তু তাঁহার কাছে ইহা অসীম সুখ ভিন্ন আর কিছুই নহে—কারণ, এ যে অবিরত সত্যের আরাধনা!

যখন তিনি দেখেন, সর্ব্বত্রই সকলে আপনা-আপনির মধ্যে যোঝাযুঝি করিতেছে, যখন তিনি দেখেন যৌবন, জরায় পরিণত হইতেছে, ক্ষমতার ক্ষয় হইতেছে, প্রতিভার লয় ঘটিতেছে, যখন তিনি এই শোচনীয় ধ্বংসের যিনি নিয়ামক,—তাঁহার সামনে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়ান, তখন তিনি আপনার জ্ঞানে আপনিই আনন্দ অনুভব করেন এবং সত্যলাভের জন্য নূতন আবেগে অভিভূত হইয়া পড়েন,—তখন তিনি সুখী!"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সৌন্দর্য্যের বিজ্ঞান

সৌন্দর্য্য দেখিয়া আনন্দিত হয় না এমন লোক পৃথিবীতে বিরল। সৌন্দর্য্যের জ্ঞান স্বাভাবিক হইলেও ইহার বিজ্ঞান তেমন সহজ নহে। এই বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্য বুঝিবার জন্যই আমাদের এই আলোচনা।

সৌন্দর্য্যের প্রকৃত বিজ্ঞান নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমেই সৌন্দর্য্যের উৎপত্তির কথা আলোচনা করিতে হয়। প্রকৃতিই সৌন্দর্য্যের প্রকৃত সৃষ্টিকারিণী। প্রকৃতির সৃষ্টি কখনও উদ্দেশ্যহীন বা অনিয়ন্ত্রিত নহে। প্রকৃতি যেমন সৃষ্ট পদার্থের রূপ-বিকাশের অনুরোধে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনই আপনার প্রজাদিগের চিত্তবিনোদনের জন্যও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। 'রূপ' বলিতে আমরা আকার ও সৌন্দর্য্য বুঝি; তাহা হইতেই আকার-ধারণের সঙ্গেই যে সৌন্দর্য্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইহাও স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। 'রূপংরসোগন্ধ স্পর্শশব্দাশ্চ বিষয়া অমী",—এখানে রূপের অর্থ আকার—আবার 'রূপং দেহি, যশো দেহি' প্রভৃতি প্রার্থনায় রূপশব্দের অর্থ সৌন্দর্য্য। অভিধানে সৌন্দর্য্যের মূল 'সুন্দর' শব্দের পর্য্যায়ে আমরা 'মনোরম', 'মনোজ্ঞ' প্রভৃতি অর্থ দেখিতে পাই। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপাদিত হয়, চিত্তবিনোদনও সৌন্দর্য্যের উদ্দেশ্য।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে, সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উপাদান কি? আমরা জানি, সাংখ্য-দর্শনের মতে প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটি গুণেরই আশ্রয়ভূতা। এই তিনটি গুণ সহযোগেই তিনি সৃষ্টির অশেষ বৈচিত্র্য সাধন করিয়া থাকেন। সুতরাং গুণই যে সৌন্দর্য্যের উপাদানভূত হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু সকল গুণই সৌন্দর্য্যের প্রধান উপাদানভূত হইতে পারে না। গুণবিশেষই ইহার প্রধান উপাদানভূত।

আমরা রজোগুণকেই সেই প্রধান উপাদান বলিয়া মনে করি। রজো-গুণটীর প্রধান লক্ষণই এই যে, ইহা রাগাত্মক; যথা—

"রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥" গীতা।

"হে কৌন্তেয়! রজোগুণকে রাগাত্মক অর্থাৎ অনুরাগাত্মক এবং তৃষ্ণা (অভিলাষ) ও সঙ্গ (আসক্তি) হইতে উৎপন্ন জানিও। তাহা দেহীকে কর্ম্ম-সকলের আসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে।"

রাগ বা অনুরাগই সৌন্দর্য্যানুভবের মূল বলিয়া রাগমূলক রজোগুণই যে সৌন্দর্য্যের প্রধান অবলম্বন, তাহা বুঝা যাইতেছে।

রজোগুণ কর্ম্মপ্রবৃত্তিজনক। রজোগুণ হইতে যে রাগ বা অনুরাগের ভাব পরিস্ফুট হয়, তাহা ইহার কর্ম্মপ্রবর্ত্তকতা হইতেই হইয়া থাকে। এই প্রকারে কার্য্যকারিতার সহিত অনুরাগের সম্বন্ধ হইয়াছে। যাহা আমরা অধিক কার্য্যকরী বলিয়া মনে করি, তাহাতেই আমাদের অধিক অনুরাগ হয়—তাহাতেই আমরা অধিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। গ্রীক্ দার্শনিক সক্রেটিস্ এই

ভাবেই উপযোগিতার (utility) সহিত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

কর্ম্মদ্বারাই সকলে জগতে উন্নতি ও পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। রজোগুণ কর্ম্মের মূলে থাকিয়া এই সমস্তেরই মূলীভূত হইতেছে। উন্নতি ও পূর্ণতা বিকাশেরই উৎকর্ষ। সৌন্দর্য্য এই বিকাশেরই ফল। বিকাশের উৎকর্ষ ও পূর্ণতা-সাধনের জন্য পদার্থ সকলের মধ্যে যতক্ষণ রজোগুণের ক্রিয়া চলিতে থাকে, ততক্ষণই তাহাদের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে। রজোগুণের অল্পতা বা ইহার ক্রিয়ার মন্দীভূত ভাব হইলেই সৌন্দর্য্যের হ্রাস ঘটিতে আরম্ভ করে। ইহা হইতে প্রত্যেক পদার্থের বর্দ্ধন-কালই যে তাহার সৌন্দর্য্য-বিকাশের কাল এবং ক্ষয়ের কালই যে সৌন্দর্য্য-হ্রাসের কাল, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা দেখিতে পাই, পুষ্প পত্র প্রভৃতির যখনই সতেজ সজীব ভাব প্রকটিত হয়, তখনই তাহাদের সৌন্দর্য্য উছলিত হইতে থাকে, কিন্তু যখনই এই ভাবটী তিরোহিত হইতে থাকে—তখনই ইহারা শ্রীহীন হইতে আরম্ভ করে! সেইজন্য যৌবনকালই সৌন্দর্য্য-বিকাশের সময়। কথায়ও বলে, "যৌবনকালের কাকটাও সুন্দর।" যৌবনকাল আমাদের জীবনের বৃদ্ধির কাল, এই সময়ে আমাদের জীবনী-শক্তি ও কার্য্যশক্তি উচ্চমাত্রা প্রাপ্ত হয়। সৌন্দর্য্য তাহারই বাহ্যপ্রকাশ।

কর্ম্মের সহিত যে সৌন্দর্য্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার দৃষ্টান্তও আমরা নিত্য আমাদের চতুর্দ্দিকে প্রকৃতি-রাজ্যের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। পুষ্পটি প্রস্ফুটিত হইয়া যেন আনন্দে হাসিতে লাগিল। এই হাসির মধ্যে কিন্তু ইহার বংশ-রক্ষারই প্রকৃত আয়োজন চলিতে থাকিল। বীজ বা ফলে সেই বংশ-রক্ষার কার্য্য যখন সম্পন্ন হইল, তখন ইহার আর সে প্রফুল্ল ভাব নাই। তখন ইহা নিমীলিত ও শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া ঝরিয়া পড়িল। তখন এই পুষ্পই আনন্দের সঞ্চার ক'রত, এখন আর ইহাকে উপেক্ষায় পদদলিত করিতেও কেহ হয় ত কুণ্ঠিত হইবে না।

নব পল্লব হরিদ্বর্ণের আভায় দর্শকের নয়ন-মন হরণ করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে রস ও বায়ুগ্রহণদ্বারা বৃক্ষের পুষ্টিসাধন চলিতে থাকিল। যখন ইহার পোষণ-কার্য্য শেষ হইল, তখন আর ইহার সে নধর স্নিগ্ধ ভাব নাই। ইহা বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বৃন্তে শুকাইয়া গেল এবং অবশেষে বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূপতিত ও ক্রমে পদতলে মর্দ্দিত হইতে লাগিল।

এমন কি নির্জ্জীব জল-ধারাতেও কর্ম্ম-শীলতার সৌন্দর্য্যই দেখিতে পাওয়া যায়। তর্ তর্ বেগে কুল্ কুল্ রবে স্রোতস্বিনী সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। বর্ষার জলরাশিতে তীর প্লাবিত করিয়া নদী যখন ছুটিয়া যায়, তখন তাহার বিশাল সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যখন কোন কারণে জলপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া ইহার বেগ রহিত হয়, তখন সেই ক্ষীণ নিশ্চল জলধারা হইতে স্রোতস্বিনীর সমস্ত সৌন্দর্য্যই উবিয়া যায়। তাহাতেই সাধারণ কথায় লোকে 'মরা নদী' বলিয়া ইহার কর্ম্মহীন ও সৌন্দর্য্য-হীন জীবনেরই পরিচয় দিয়া থাকে।

যতক্ষণ রজোগুণের আধিক্য থাকে ততক্ষণই কার্য্যশীলতা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধির বিকাশ, ও তৎফলে সৌন্দর্য্যের উন্মেষ। এই রজোগুণের অপগম হইলেই তমোগুণের প্রবলতা হয়, তাহারই ফলে বিবর্ণতা ও সৌন্দর্য্যের হানি। আবরণই তমোগুণের ধর্ম্ম। এই আবরণ সমস্ত রূপেরই বিরূপতা সম্পাদন বা একেবারে তাহার বিলোপ সাধন করে। তাহাতেই তমোগুণাত্মক অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে সর্ব্বরূপই তিরোহিত হইয়া যায়। উজ্জ্বল দিবালোক যখন মেঘাচ্ছন্ন হয়, তখন আমরা উহাকে 'দুর্দ্দিন' বলিয়া থাকি। ইংরাজিতেও এইপ্রকার দিনকে foul day, foul weather বলিয়া কদর্য্য কুৎসিতভাব বর্ণনা করা হইয়া থাকে। আবার উজ্জ্বল দিনকে fine day, fair weather বলিয়া সুন্দর দিনরূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে কৃষ্ণবর্ণকে যে সর্ব্ববর্ণেরই উপসংহারকারী বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহাতেও তমঃ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বোক্ত বক্তব্যেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

আমরা সৌন্দর্য্যের বিকাশ সম্বন্ধে রজোগুণের কার্য্যকারিতার বিষয় আলোচনা করিয়াছি; এক্ষণে আমরা সৌন্দর্য্যের উপভোগ সম্বন্ধেও রজোগুণের কার্য্যকারিতার বিষয় আলোচনা করিব।

রাগ বা অনুরাগ রজোগুণেরই কার্য্য। মনে সেই রাগ বা অনুরাগের ভাব থাকিলে তবেই সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উপভোগ সম্ভবপর হয়। মনে বিরক্তির ভাব থাকিলে কোন বিষয়ই আমাদের প্রীতিকর হয় না। বিরক্তি, অনুরক্তি বা অনুরাগেরই বিপরীত অর্থাৎ মনে রাগাত্মক রজো-ভাবের আধিক্য না থাকিলে আমাদের পক্ষে সৌন্দর্য্যের আনন্দানুভব সম্ভবপর হয় না। যখন আমরা শোক দুঃখ প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হই, তখন আমাদের মনে যেমন কোন স্ফূর্ত্তির ভাব অনুভব করিতে পারি না, তেমনই অপর কোন পদার্থ হইতেও কোন স্ফূর্ত্তির ভাব গ্রহণ করিতে পারি না। এই রাগ বা অনুরাগ ভাবের দ্বারাই অনুরাগীর নিকট অনুরাগের পাত্র নিত্য-নূতন সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া থাকে। আবার বিরহের বিরাগদ্বারা আক্রান্ত হইলেই চন্দ্রও অগ্নির অপেক্ষা সন্তাপ-দায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

আমরা বহির্জগতের সৌন্দর্য্যের আলোচনা করিলাম। এক্ষণে আমরা অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্যের আলোচনা করিব। বহির্জগতের সৌন্দর্য্যের অবলম্বন যেমন রজোগুণ, সত্ত্বগুণ তেমনই অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্যের অবলম্বন। এই সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম গীতায় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে:—

"তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেনবধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥"

হে অপাপ! সেই গুণত্রয়ের মধ্যে নির্ম্মলত্বহেতু প্রকাশক মঙ্গলময় সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখসম্বন্ধ ও জ্ঞান সম্বন্ধ দ্বারা বদ্ধ করে।"

রজোগুণ যেমন 'রাগাত্মক', সত্ত্বগুণ তেমনই 'প্রকাশাত্মক'। রজোমূলক বহিঃ-সৌন্দর্য্য যেমন অনুরাগের দ্বারা উপলব্ধি হয়, সত্ত্বমূলক অন্তঃসৌন্দর্য্য তেমনই জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি হয়। বহিঃসৌন্দর্য্যের

উপভোগে যেমন মনে আনন্দ উৎপন্ন হয়, অন্তঃসৌন্দর্য্যের উপভোগেও তেমনই চিত্তে সুখের উদ্রেক হয়। কর্ম্মে যেমন বহিঃসৌন্দর্য্য প্রকটিত হয়, অনাময় বা মঙ্গলময় ভাবে তেমনই অন্তঃসৌন্দর্য্য প্রকটিত হয়। পবিত্র উজ্জ্বলভাব, ইহাই অন্তঃসৌন্দর্য্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন,

"Small is the worth
of beauty from the light retired."
Waller.

"আলোক-বিরহিত সৌন্দর্য্যের মূল্য অতি সামান্য।"

এই পবিত্র উজ্জ্বল ভাব হইতেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের বিকাশ হয়।

'সত্ত্ব' শব্দের অর্থানুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারি, কি-প্রকারে অন্তঃসৌন্দর্য্যের বিকাশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সত্ত্ব-শব্দ 'সৎ' শব্দের উত্তর 'ত্ব'-প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন। সতের ভাব—ইহাই 'সত্ত্ব'-শব্দের অর্থ। সুতরাং সত্ত্ব-শব্দের অর্থ স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতভাব হইতেছে। সত্ত্বগুণের দ্বারা এই স্বভাবের উৎকর্ষ-সাধনেই অন্তঃসৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়। বহুস্থলে অন্তঃসৌন্দর্য্যই বহিঃসৌন্দর্য্যের উদ্বোধক হয়। "যত্রাকৃতিস্তত্র-গুণাবসন্তি।" এই বাক্যটী—অভ্যন্তর-গুণ-যোগই যে বহিঃসৌন্দর্য্য-বিকাশের কারণ—এই সত্যই ব্যতিরেকী মুখে প্রচার করিয়া থাকে। ইংরাজ-কবি লিখিয়াছেন,

"Deprived of virtue where is beauty's power?" R. Fergusson.

"সদ্‌গুণ-বিবর্জ্জিত সৌন্দর্য্যের প্রভাব কোথায়?"

এই প্রকারেই সত্ত্বগুণদ্বারা বহিঃসৌন্দর্য্য অনুপ্রাণিত হয়। বহিঃসৌন্দর্য্যে সত্ত্বগুণের এইপ্রকার আধিক্য হইলেই তাহাতে একটী সর্ব্বাভিভবকারী ভাব আবির্ভূত হয়। তাহা হইতেই সৌন্দর্য্যের গম্ভীর, সৌম্য, উগ্র প্রভৃতি ভাব পরিস্ফুট হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ রোমান্ বাগ্মী সিসেরো এই সম্বন্ধে অতি সারবান্ মত প্রকাশ করিয়াছেন; আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"I am of opinion that there is nothing so beautiful but there is something still more beautiful of which this is the mere image and expression, something which can neither be perceived by the eyes, the ears, nor any of the senses, we comprehend it merely in the thought of our minds." Cicero.

"আমার মত এই যে, বস্তু যত সুন্দরই হউক না কেন তদপেক্ষাও সুন্দরতর এমন বস্তু আছে যে উহা তাহারই প্রতিমা ও অভিব্যক্তি মাত্র। এই সুন্দরতর বস্তু চক্ষু বা কর্ণ বা কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারাই গ্রাহ্য নহে। আমরা ইহা কেবল মনের চিন্তা-দ্বারাই উপলব্ধি করিয়া থাকি।"

আকাশের অনন্ত সৌম্যভাব, সমুদ্রের বিরাট্ গম্ভীরভাব, অন্ধকারময়ী চন্দ্র-নক্ষত্রাদি-খচিত বিভাবরীর উগ্রভাবে আমরা যেন কোন অসাধারণ অতীন্দ্রিয় অসীম সত্তার বিকাশ দেখিয়া ভক্তি, সম্ভ্রম, ভয় ও বিস্ময়ের ভাবে অভিভূত হই। এই সত্তা অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় সত্তা, সর্ব্ববিভবশালী ভগবানের সত্তা—পরম দিব্য সত্তা। অর্জ্জুনের নিকট এই সত্তারই বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিল। আমরা দিব্যরূপের যে আভাষ উপরে প্রদান করিলাম, গীতার বিশ্বরূপ-দর্শনাধ্যায় হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত ছত্র-গুলিতে তাহারই সমর্থন দেখা যাইবে:—

"ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্ট রোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎসমগ্রম্।
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রপতন্তি বিষ্ণো॥
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তুতে দেববর প্রসীদ॥"
"অনন্তবীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বম্।
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসিসর্ব্বঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদম্।
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা।
ভয়েনচ প্রব্যথিতং মনোমে॥"

তৎপরে বিস্মিত ও রোমাঞ্চিতকলেবর অর্জ্জুন দেবকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন:—

"হে বিষ্ণো! তোমার উগ্রপ্রভা সমগ্র বিশ্ব-তেজের দ্বারা আপূরিত করিয়া বিকীর্ণ হইতেছে।"

"উগ্ররূপ, আপনি কে? আমাকে বলুন। হে দেবশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার করিতেছি—প্রসন্ন হউন।"

"তুমি অনন্ত-শক্তি অনন্ত-পরাক্রম—তুমি সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ। তুমি সর্ব্বস্বরূপ।"

"হে মহাসত্ত্ব! তোমার এই অদ্ভুত বিরাটরূপ দেখিয়া ত্রিলোক অতীব ভীত হইয়াছে।"

"এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া আমি যেমন হৃষ্ট হইয়াছি—তেমনই আমার মন ভয়েও অতীব আক্রান্ত হইয়াছে।

ভগবান্ বলিতেছেন:—

"ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদম্।
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যম্।
যন্মে ত্বদন্যেন নদৃষ্টপূর্ব্বম্॥
মাতেব্যথা মাচ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বারূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বম্
তদেবমেরূপমিদং প্রপশ্য॥
ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুংচতত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

"হে অর্জ্জুন! আমি তোমার যোগবল-প্রভাবে প্রসন্ন হইয়া আমার এই তেজোময় বিশ্বাত্মক অনন্ত এবং আদ্য পরমরূপ দেখাইলাম—যাহা তোমার ন্যায় ভক্ত ব্যতীত আর কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই!"

"আমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া তোমার ব্যথা যেন না হয়; বিমূঢ় ভাবও যেন না হয়। ভয়হীন ও প্রীতমনা হইয়া পুনরায় তুমি আমার এই সেই রূপই দেখ।"

"হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার প্রতি অনন্যভক্তি দ্বারা এবংবিধ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে ও দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।"

ভক্তিকেই দিব্যরূপ উপলব্ধির প্রধান উপায় বলিয়া এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ভক্তি সত্ত্বগুণেরই কার্য্য। সুতরাং সত্ত্বগুণের দ্বারা যেমন দিব্যসৌন্দর্য্যের বিকাশ—তেমনই আবার সত্ত্বগুণের দ্বারাই এই দিব্য সৌন্দর্য্যের উপভোগ। একজন ভক্ত ইংরাজ কবি বিরাট্ দিব্যসৌন্দর্য্যের যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহাও প্রদর্শন করিতেছি। ইহা হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সাদৃশ্য দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইবেন।

"Thou art O God! the life and light
Of all this wondrous world we see,
Its glow by day, its smile by night,
Are but reflections caught from thee;
Where'er we turn, Thy glories shine,
And all things fair and bright are Thine.

* * * *

When night with wings of starry gloom,
O'ershadows all the earth and skies,

Like some dark, beauteous bird,
whose plume
Is sparkling with unnumbered eyes,
That sacred gloom, those fires divine
So grand, so countless,
Lord ! are Thine," Moore.

"হে পরমেশ্বর! এই দৃশ্যমান বিচিত্র জগতের আপনিই প্রাণ ও আলো। ইহার দিবার বিভা ও রাত্রির দ্যুতি আপনারই নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রতিবিম্ব। যে দিকে দেখি না কেন আপনার মহিমাই দীপ্তি পায়। সমস্ত সুন্দর ও উজ্জ্বল বস্তু আপনারই ঐশ্বর্য্য।"

"যখন নিশা অসংখ্য অক্ষিরূপ চিহ্ন দ্বারা জাজ্বল্যমান পক্ষযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিবিশেষের ন্যায় নক্ষত্রাদি মণ্ডিত অন্ধকাররূপ পক্ষদ্বারা সমস্ত পৃথিবী ও আকাশকে সমাচ্ছাদিত করে, তৎকালের সেই পবিত্র তমিস্রা, সেই মহিমাময় অগণ্য জ্যোতিষ্কসকল আপনারই বিভূতি!"

আমরা সৌম্য দিব্য সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অতীব প্রাঞ্জল একটি শাস্ত্রোক্তি প্রচলিত দেখিতে পাই, তাহা এই—"সত্যং শিবং সুন্দরম্।" ইহার অর্থ আমরা এইরূপ বুঝি—"যাহা সত্যস্বরূপ ও শিবস্বরূপ, তাহাই সুন্দর।" এইটিকে আমরা সাধারণ সৌন্দর্য্যেরও মূল-সূত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারি।

'সত্ত্বে' যেমন আমরা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের মূল উৎস দেখিতে পাই, তেমনই 'সত্যে' আমরা সর্ব্বসৌন্দর্য্যেরই মূল উৎস দেখি। 'সত্ত্বে' যেমন সতের ভাব বুঝায়, 'সত্যে'ও তেমনই সতের ভাবই বুঝায়। সত্ত্বে স্বাভাবিক গুণ বুঝায়, সত্যেও স্বাভাবিক ভাব বুঝায়। স্বাভাবিক গুণের উৎকর্ষসাধনে যেমন অন্তঃসৌন্দর্য্য উদ্ভূত হয়; স্বাভাবিক ভাবের উৎকর্ষদ্বারাও তেমনি সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রকটিত হয়। যাহার যাহা প্রকৃত ভাব, উৎকর্ষদ্বারা তাহা প্রাপ্তিই তাহার সৌন্দর্য্য। ইংরাজীতে একটি কথা আছে, "Excellence is true beauty" উৎকর্ষই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। ইহাতে আমরা সত্যে বা প্রকৃত উৎকর্ষেই যে যথার্থ সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়, তাহা বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারি। ইংরাজীতে আর একটি কথা দেখিতে পাই, "Truth is stranger than fiction"—সত্য কল্পনা অপেক্ষাও আশ্চর্য্যজনক। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ন্যায় আর কোন সৌন্দর্য্যই মনোরম হইতে পারে না। ইংরাজীতে যে একটি কথা আছে, "Beauty unadorned is adorned the most"—সৌন্দর্য্যে কৃত্রিম ভূষার প্রয়োজন হয় না, তাহাই উৎকৃষ্ট ভূষিত সৌন্দর্য্য—ইহা দ্বারা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য যে কৃত্রিম সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অধিকতর মনোহর তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

সত্যই যে সৌন্দর্য্যের প্রকৃত আত্মা, জগৎকবি সেক্সপীয়র তাহা এই কয় ছত্রে সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন:—

"Oh, how much more doth beauty
beauteous seem,
By that sweet ornament
which truth doth give !
The rose is fair, but fairer we it deem
For that sweet odour
which doth in it live."

"অহো! সত্যের কমনীয় ভূষায় সৌন্দর্য্য কিরূপ সুন্দরতর প্রতীয়মান হয়! গোলাপ সুন্দর বটে—কিন্তু ইহাতে যে মধুর সুগন্ধ বর্ত্তমান আছে, তাহাতেই ইহাকে আমরা সুন্দরতর বলিয়া বিবেচনা করি।"

সৌন্দর্য্যের কবি কীট্‌স্ (Keats) অমর ভাষায় সত্য ও সৌন্দর্য্যের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এইরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন:—

"Beauty is truth, truth beauty—that is all
Ye know on earth, and all ye need to
know." Ode to a Grecian Urn.

"সৌন্দর্য্যই সত্য, সত্যই সৌন্দর্য্য—পৃথিবীতে ইহাই জানিয়া রাখ এবং ইহাই জ্ঞাতব্য।"

শিব বা মঙ্গল সৌন্দর্য্যের আর একটি লক্ষণ। "শান্তং শিবং সুন্দরম্" এই সুপ্রসিদ্ধ উপনিষদুক্তিই তাহার প্রমাণ।

মঙ্গলাত্মক হইলেই সৌন্দর্য্যের যথার্থ সার্থকতা হয়। সৌন্দর্য্যের বাচক যে 'শোভা' শব্দ আছে, তাহার মূল অর্থ বিবেচনা করিলেও আমরা এই মঙ্গলার্থই তাহাতে বিদ্যমান দেখিতে পাই। 'শোভা' কথাটি 'শুভ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'শুভ' শব্দ এই শুভ ধাতুদ্বারাই নিষ্পন্ন। সুতরাং শোভা শব্দের যে মূলে শুভ বা মঙ্গলের সহিতই যোগ, ইহা হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ইংরাজীতে একটি কথা আছে—"Handsome is he that handsome does"—সে-ই সুন্দর, যার কাজ সুন্দর; ইহাতেও আমাদের এই মতের পোষকতা দেখিতে পাই।

বর্ণের সহিত সৌন্দর্য্যের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এক্ষণে আমরা কোন্ কোন্ বর্ণ সৌন্দর্য্যের বিশেষ প্রকাশক, তাহারই আলোচনা করিব। রক্তবর্ণ যে রজোমূলক বা বহিঃসৌন্দর্য্যের প্রকাশক, তাহা 'রক্ত' ও 'রজঃ' উভয় শব্দের এক মূল বা ধাতু হইতেই প্রমাণিত হয়। রক্তবর্ণই যে বিশেষরূপে সৌন্দর্য্যের উদ্বোধক, রঞ্জধাতুজাত রঙ্গ ও তদপভ্রংশ রঙ্ শব্দ যে বর্ণমাত্রেরই বোধক হইয়াছে, তাহাতেই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রঞ্জন শব্দ দ্বারা বর্ণযোগে যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ভাব প্রকাশ পায়, তাহাতেও রক্তবর্ণেরই সহিত সৌন্দর্য্যের যোগ প্রতিপাদিত হয়।

সত্ত্বগুণটি নির্ম্মল ও প্রকাশক তাহা আমরা গীতার বর্ণনা হইতে দেখিতে পাইয়াছি। ইহাহইতে শ্বেতবর্ণই যে সত্ত্বগুণের বিশেষরূপ দ্যোতক, তাহা বুঝিতে পারি। এই শ্বেতবর্ণের এক নাম 'শুভ্র'। শুভ্র শব্দের মূল এবং 'শুভ' ও 'শোভা' শব্দের মূল একই। ইহা হইতে শুভ্রবর্ণ যেমন সৌন্দর্য্যের প্রকাশক, তেমনই ইহা যে মঙ্গলাত্মকও, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকারে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণমূলক হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণ হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও শ্বেতবর্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কারণ ইহা যে অপর সমস্ত বর্ণেরই সংমিশ্রণ, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন।

হরিদ্বর্ণ প্রকৃতি রাজ্যের বর্ণ। 'হরিৎ' শব্দটি 'হৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন, ইহার অর্থ যাহা হরণ করে অর্থাৎ মন হরণ করে। বিশেষরূপে মনোহারী বলিয়াই 'হরিৎ' নাম হইয়াছে। এই প্রকারে শ্বেত, রক্ত ও হরিদ্বর্ণই যে বিশেষরূপে সৌন্দর্য্যের অনুকূল বর্ণ, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম।

মনহরণই যে সুন্দরের প্রমাণ, তাহা সুন্দরের 'মনোহর', 'মনোরম', 'মনোজ্ঞ',

'সুমন' প্রভৃতির নামে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। A thing of beauty is a joy forever. 'সুন্দর বস্তু চির-আনন্দের উৎস' ইংরাজ কবি কীটসের (Keats) এই প্রসিদ্ধ উক্তির তাৎপর্য্যও আমরা আমাদের সুন্দরের পূর্ব্বোক্ত 'মনোহর', 'মনোরম' প্রভৃতি নামেই দেখিতে পাইতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পরিচয়

এই ধরণীর পরাণের চির পরিচয়,
সে কি শুধু তার শ্যাম শোভা তৃণ পত্রচয় ?
পুষ্প ফল উৎসজল,
নদীর আনন্দ ভরা গতি অবিরল ?
সে কেবলি তার চির ধীর নভোনীলিমায়,
পাখীর কূজনে, জলধির লহরী-লীলায় ?
সে কি তার বার বার
ফিরে আসা, জাগরূক আলোক ঊষার ?
সে কি চন্দ্রকর সুখালসে সুষুপ্ত প্রান্তর,
গোধূলির গৈরিকে বিরাগী উদাসী অম্বর ?
ক্ষণে ক্ষণে ভূকম্পনে
বক্ষ দীর্ণ নহে তার অসহ্য বেদনে ?
সে কি উচ্ছ্বসিত দ্রবধাতু অনল ঝরায়,
অট্ট বজ্র হাসে, বিদ্যুতের বাতুল প্রভায়
বাসনারে অধিকারে
অনাহূত প্রকাশ করে না বারে বারে ?
সে কি উন্মূলিত দ্রুমে, ছিন্ন লতিকার জালে
অকস্মাৎ ধেয়ে-আসা ঝড়ে, বৈশাখের কালে,
গিরিমূলে, নদীকূলে
বন্যার অন্যায় মাঝে দেখায় না খুলে
গোপন মনের করাল কালিকা ভয়ঙ্করী
দীর্ঘ দাহে ওঠে যবে প্রাণ অসংযমে ভরি !

হায় মানবের জীবনের চির পরিচয়,
সে কি হবে এই বাহিরের ব্যর্থতা নিচয় ?
ম্লান করা, অশ্রু ঝরা
প্রতি দিবসের এই দুখের পসরা ?
এই ব্যর্থ শ্রম, ছিন্ন আশা, দীন অপারগ
কর্ম্মের দুর্গতি, নিরন্তর লজ্জা ভয় ভোগ,
পথে পথে, মনোরথে
ভগ্ন করি, পঙ্গু হয়ে চলা কোন মতে!
আপন আশার ধনে আপনি ভাঙ্গিয়া ফেলে,
সুদূরে কাঁদিয়া শুধু ফেরা শূন্য আঁখি মেলে!
লজ্জা ভয়ে, বুকে লয়ে
যে চেতনা আগুসার হয় মৃত্যু-জয়ে
সেকি কারো পড়িবে না চোখে, এ অমর লোকে
জীবনের কাব্য লেখা হবে উদ্ভটের শ্লোকে ?
দেহভার সুষমার
পরিচয়, সে কি মৃত কঙ্কালে তাহার
রবে না কি চিরদিন বেঁচে জনমে জনমে
প্রণয়ের মুগ্ধ প্রাণ ভরা দেখার সম্ভ্রমে ?
সুশ্যামল, সুকোমল
পাষাণ বিদীর্ণ করা অঙ্কুরের দল,
পরিচয় নহেক তাদের মৃদুতার মাঝে,
আলোকের অলৌকিক বল মনে যা বিরাজে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

স্বেচ্ছাচারী

৫

এ বৎসর ভীষণ বর্ষায় শিবরামপুর ও তন্নিকটস্থ বহু গ্রাম ডুবিয়া যাওয়ায় প্রজারা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল। জলের জন্য ধান্যাদির আবাদের ত যথেষ্টই ক্ষতি হইয়াছিল; তাহার উপর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং খাদ্যের অভাবে দলে দলে গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটায় জমিদার কালিকামোহন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নিজের আমলাদের মধ্যেও অনেকে জ্বরাক্রান্ত হইয়া খাজনা-আদায়াদি কার্য্যের অসুবিধা ঘটাইয়াছে। তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ পাইক ও দরোয়ানদের মধ্যেও অনেকে শিবরামপুরের "বিউ-রোটীর" মায়া ত্যাগ করিয়া দেশে পলাইয়াছে। কেবল তাঁহার প্রধান শরীর-রক্ষী ধনবরণ সিং দুই-তিনবার উল্টান্-পাল্টান্ খাইয়াও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। অন্তঃপুরেও অনেকে জ্বরাক্রান্ত হইয়াছে। শৈলজা স্বয়ং দুইবার শয্যাগ্রহণ করিয়া এখন তাহার মাতার সেবা করিতেছে। কালিকাবাবু একাকী সমস্ত গ্রামের তত্ত্বাবধায়ন ও স্বীয় গৃহে ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে করিতে আজ দুইদিন হইতে ক্রমাগত কুইনিন সেবন করিয়া কোন প্রকারে হাঁটিয়া বেড়াইতেছেন। এমন সময় কোথা হইতে এক বেনামী পত্র আসিয়া তাঁহার কপালের চিন্তা রেখাটিকে স্পষ্টতর করিয়া তুলিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শিবচন্দ্র আসিলে তাঁহাকে সে পত্র দেখাইবামাত্র তিনি বলিলেন, "এ কোন শত্রুর কাজ। কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দর উন্নতিতে যারা হিংসান্বিত, তারাই এরূপ পত্র লিখতে পারে। মনোহর বাবুর ছেলেটি কি ইতিমধ্যে কোন পত্র দেয়নি ?" কালিকাবাবু বলিলেন, আজ কয়মাস হইতে তাহারও কোন পত্র পাওয়া যায় নাই। শিবচন্দ্র বলিলেন, শশিভূষণকে পত্র লিখিয়া না হয় এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা হোক। কালিকাবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, এ বিষয়ে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার লজ্জা বোধ হইতেছে। তাহাদের সম্বন্ধে এরূপ সন্দেহ করাও তাঁহার মতে অন্যায়। তথাপি অভিভাবকের কর্ত্তব্যানুসারে এ বিষয়ে অনুসন্ধান না করাও অন্যায়, এই জন্যই তিনি তাঁহার এটর্ণি শ্যামসুন্দর বাবুকে পত্র দিবেন স্থির করিয়াছেন। শিবচন্দ্র ন্যায়রত্নেরও তাহাই সমিচীন বলিয়া বোধ হইল।

ন্যায়রত্নের পত্নী মনোরমা দেবী কিন্তু বেনামী পত্রের কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "কার্ত্তিককে যারা সন্দেহ করে বা তার বিরুদ্ধে যারা কুৎসা রটায়, হোক্ না কেন তারা যত বড় মারণ-উচাটন-বশীকরণ-পটু সাধু-সন্ন্যাসী, তবু তাদের মুখ খসে যাবে।" তাঁহার এই অভিমত কোন গূঢ় উপায়ে দেওয়ান-পত্নী নিস্তারিণী দেবীর শ্রুতিগোচর হইলে তিনিও গম্ভীরভাবে বলিলেন, যদি সে পাপিষ্ঠা এই কথা

বলিয়া থাকে, তাহা হইলে শঙ্করানন্দের ক্রোধানলে শীঘ্রই যেন সে ভস্মীভূতা হয়!

কিন্তু কালিকাবাবু তাঁহার এটর্ণির নিকট হইতে যে পত্র পাইলেন, তাহা মোটেই আশাপ্রদ হইল না। তিনি লিখিয়াছেন, আজকাল সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিকের পড়াশুনায় বিশেষ অমনোযোগ লক্ষিত হইতেছে এবং তাহারা প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় এবং ছুটির দিনে সমস্ত সময়টুকুই বাহিরে কাটায়। কোথায় যায় সে সংবাদ এখনও 'টোর্ণি' মহাশয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তবে শীঘ্রই সে সংবাদ তিনি সংগ্রহ করিবেন, এমন আশাও দিয়াছেন।

কালিকাবাবু এ পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলেন। সন্দেহ ক্রমশঃ বিশ্বাসে পরিণত হইতে চলিল, কারণ ইতিমধ্যে আরও একখানি বেনামী পত্রে কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দর গতিবিধির বিষয়ে সঠিক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ বাগবাজারের কোন এক দ্বিতল গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে এবং সেই গৃহের সমস্ত ব্যাপারই সন্দেহ-জনক।

কালিকাবাবু আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি সেইদিনই দুইখানা পত্রে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া লিখিয়া কার্ত্তিক ও শশিভূষণের নামে তাহা পাঠাইয়া দিলেন। দুই-তিন দিনের মধ্যে উত্তর আসিল। কার্ত্তিক লিখিয়াছে—সংবাদ সমস্তই সত্য, কিন্তু তাহাতে আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই; সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিক কোন-এক পরোপকার-ব্রতে ব্রতী আছে। কিন্তু সে বিষয়ে কাহাকেও কোন কথা খুলিয়া বলিতে সে অনিচ্ছুক। তবে কালিকাবাবু বা পিতা যদি স্বয়ং আসিয়া এই বিষয় জানিয়া যাইতে চাহেন, তাহাতে কোন বাধা নাই। এ-বিষয়ে কোন কথা কণান্তর করিবার ইচ্ছা তাহার নাই; অপরের সন্দেহভঞ্জন করিবারও প্রবৃত্তি নাই। তবে পিতৃস্থানীয় কালিকাবাবুকে এবং পিতাঠাকুর মহাশয়ের কাছে তাহার গোপনীয় কিছুই নাই।

কালিকাবাবুর উৎকণ্ঠা দূর হইল; এবং সেই কারণে তাঁহার যে জ্বরভাব দেখা গিয়াছিল, তাহারও শান্তি হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে লিখিয়া দিলেন যে, ও-বিষয়ে আর তিনি কিছুই জানিতে চাহেন না। তবে পড়াশুনার পক্ষে ক্ষতিকর অত্যধিক পরোপকারের কার্য্য এখন একটু কমাইয়া অধ্যয়নাদিতে মনোনিবেশ করাই তাহাদের উচিত। কারণ পরোপকারের সময় বিদ্যার্জ্জনের কালের পরে আসাই যুক্তি-সঙ্গত। বিশেষতঃ ছাত্রদের বিদ্যার্জ্জনই এক প্রকার তপস্যা।

কিন্তু কার্ত্তিককে পত্র পাঠাইয়া দেওয়ার একদিন পরেই শশিভূষণের পত্র পাইয়া কালিকাবাবু আবার ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। শশিভূষণ লিখিয়াছে, কার্ত্তিককে কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া মফঃস্বলের যে কোন কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা না হইলে সে কিছুতেই এবার পাশ করিতে পারিবে না। যদিও তাহার বর্ত্তমান কার্য্যে নৈতিক অবনতির কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ সে যাহা করিতেছে, তাহা সকল উচ্চমনা ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য; তথাপি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াটাই যখন তাহার পক্ষে বিশেষ

প্রয়োজনীয়, তখন তাহাকে বর্ত্তমান পরোপকার-ব্রত হইতে নিবৃত্ত করাই আবশ্যক। তবে সর্ব্বানন্দর কথা স্বতন্ত্র। সে পিতৃ-মাতৃহীন ব্রাহ্মণ-সন্তান। তাহাকে যে কার্য্যে শশিভূষণ নিয়োজিত করিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বানন্দর আর্থিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ উন্নতিই সম্ভবপর। অতএব তাহার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিয়া যাহাতে একমাত্র কার্ত্তিককে সরানো যায়, সেই ব্যবস্থা করার বিশেষ প্রয়োজন ঘটিয়াছে।

কালিকাবাবু মহা সমস্যায় পড়িয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। আবার শিবচন্দ্রের ডাক পড়িল এবং বহু জল্পনা-কল্পনার পর স্থির হইল যে পরীক্ষার ফল দেখিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে, তবে ইতিমধ্যে বড়দিনের ছুটীতে অথবা লেকচার শেষ করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় কার্ত্তিক যেন শিবরামপুরে চলিয়া আসে, এই মর্ম্মে তাহাকে পত্র দেওয়া হোক।

কালিকাবাবুর মাতা ইতিমধ্যে মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, অরক্ষণীয়া কন্যা যে গৃহে এতদিন পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, সে গৃহের অন্ন-জল তিনি গ্রহণ করিতে অক্ষম; অতএব শীঘ্র যদি শৈলজার বিবাহ না হয় তাহা হইলে তাঁহাকে অগত্যা বাধ্য হইয়া ৺কাশীধাম যাইতে হইবে। না-হয় তিনি স্বয়ং যে-কোন উপায়ে শৈলজার বিবাহ দিয়া শিবরামপুরের জমিদার বংশের সম্মান রক্ষা করিবেন। পুত্র কালিকা মোহনের বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, নহিলে সমস্ত আত্মীয়-বন্ধুর অনুনয়, বিনয় ও ভয়-প্রদর্শনেও সে কেন অবিচলিত রহিয়াছে? সেদিন কালিকামোহনের মাতুল-পুত্র ত স্পষ্টই বলিয়া গেল যে ইহার পর আসিয়া শৈলজাকে যদি সে অবিবাহিতা দেখে, তাহা হইলে সে আর কালিকামোহনের গৃহে জলগ্রহণ করিবে না। ইহাতেও যদি কালিকাবাবুর চেতনা না হয়, তাহা হইলে তাঁহার মাতা আর অমন পুত্রের মুখদর্শন করিবেন না।

কালিকাবাবু বহু প্রকারে মাতাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, সমস্তই যখন ঠিক হইয়া আছে, তখন এত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি! বাগ্‌দত্তা হওয়াও যা, ব্রাহ্মণ-কন্যার পক্ষে বিবাহ হওয়াও তাই। এখন কার্ত্তিকের বিদ্যালাভ করিয়া ফিরিয়া আসারই কেবল অপেক্ষা! জগদম্বা দেবী কিন্তু বুঝিতে চাহিলেন না। কালিকাবাবু তখন বাধ্য হইয়া শিব-চন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন, "এখন এর উপায় কি?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "উপার আর কি! তাহলে এই অঘ্রাণেই বিয়ের সমস্ত ঠিক-ঠাক করুন, আর আমিও কার্ত্তিককে সমস্ত কথা বুঝিয়ে পত্র দি।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কিন্তু কার্ত্তিক যদি অমত করে? সে বলে গিয়েছে, এফ-এ পরীক্ষায় পাশ না হয়ে সে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে না। সে যে-রকম একগুঁয়ে, তাতে আমার ভয় হয়, পাছে কি করতে কি হয়!"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "যদি তাই হয়, এমন কুসন্তানই সে হয়, যে, বাপ-মায়ের কথা বা আপনার মত হিতৈষীর কথা ঠেলে নিজের জেদ বজায় রাখে,

তাহলে কোন্ সাহসে তার হাতে আপনার মেয়েকে আপনি তুলে দিতে চাচ্ছেন? আমার কথা যদি সে না শোনে, তাহলে আমি তার মুখ দর্শন করব না।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কি জানেন ন্যায়রত্ন মশায়, আপনার কার্ত্তিকটি আমায় যেন পেয়ে বসেছে! সদাই ভয় হয়, যদি তাকে না পাই! তার আশা ত্যাগ করতে হবে মনে হলে আমার সমস্তই যেন তিক্ত বোধ হয়। সেই ভয়ে আমি এতদিন পর্য্যন্ত চুপ করেই আছি। ও যখন আমার স্নেহটার অর্থ সম্পূর্ণ বুঝতে পারবে, তখন, আমার ধারণা আছে যে ও নিজেই এসে আমাকে আত্ম-সমর্পণ করবে। আমি সেই আশায় বসে আছি।"

শিবচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "বৈবাহিক, আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আমি স্বয়ং কার্ত্তিককে আপনার পায়ে এনে ফেলে দেব।"

৬

অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াও যখন নিদ্রা আসিল না, তখন বিরক্ত হইয়া কার্ত্তিক শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভিন্ন শয্যায় পাঠ-রত সর্ব্বানন্দকে বলিল, "সব্বদা, আমি ছাতে চল্লুম, তোমার পড়া হয়ে গেলে ডেকো।" সর্ব্বানন্দ পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়া বলিল, "আচ্ছা।" কার্ত্তিক উপরে চলিয়া গেল।

কলিকাতার অবিশ্রাম কর্ম্মকোলাহল ক্রমশ থামিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণাষ্টমীর গাঢ়-অন্ধকার আকাশ প্রকাণ্ড একটা বাটির মতই মাথার উপর চাপিয়া বসিয়া আছে। কার্ত্তিক ছাদের আলিসার উপর হস্তদ্বয় রাখিয়া আপনার নিদ্রাহীন ক্লান্ত ললাট তদুপরি স্থাপিত করিল।

অন্ধকার! অন্তহীন রহস্যময় অন্ধকার! এই অন্তহীন অন্ধকার ভেদ করিয়া উহার অন্তরের লুকানো রহস্যকে জানিতে হইবে। কিন্তু কি উপায়ে? আলোক-প্রবেশে অন্ধকারের রহস্য কোথায় মিশাইয়া যায়! তাহার অন্ধকারত্ব, রহস্যময়তা বজায় রাখিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া? আলোক চঞ্চল, গতিশীল। অন্ধকার স্থির, অবিচল; অথচ আলোকের সমস্তই স্পষ্ট, অন্ধকারের সমস্তই অজ্ঞাত। আলোক আপনাকে উন্মুক্ত করিয়া জানাইতে চাহে, অন্ধকার আপনার গোপন রহস্য লুকাইয়া রাখে। যাহা চঞ্চল, যাহা অস্থির, তাহাই হইল জ্ঞানের কারণ, তাহাই হইল প্রকাশের উপায়, আর যাহা স্থির, যাহা অচঞ্চল, তাহাই মৌন, তাহাই নির্ব্বাক্! এ কি অপরূপ রহস্য!

আলোক সূচির মত বিঁধিয়া, তরবারির ন্যায় চিরিয়া, সকল বস্তুর অণু-পরমাণুকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া যাহা-কিছু অজ্ঞাত, যাহা-কিছু মৌন, তাহাকে কথা কহাইয়া, স্পষ্টতার কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। আর অন্ধকার নীরবে অতি-সন্তর্পণে আপনার হৃদয়ের গোপন কথাটুকু জ্ঞানের বাহিরে লইয়া গিয়া সযত্নে রক্ষা করে। সে কাহাকেও ব্যস্ত করে না, কাহাকেও কিছু বলিতে চাহে না, অথচ আলোক চলিয়া গেলেই ধীরপদে আসিয়া সে নির্ব্বাক ধ্যানে বসিয়া যায়।

কিন্তু যদি কান পাতিয়া থাকি, তাহা

হইলে শুনিতে পাই, অন্ধকারের গোপনতম প্রদেশ হইতে একটা মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কে যেন আপনাকে জানাইতে চাহিতেছে, অথচ তাহার বাহিরে আসিবার জো নাই, যেন তাহার স্পষ্টতর স্ফুটতর হইবার উপায় নাই! কে তুমি? কি তুমি? কে তুমি আপনাকে জানাইতে চাও,—অথচ আলোর মধ্যে নয়, স্পষ্টতার মধ্যে নয়, কোলাহলের মধ্যে নয়, কেবল তোমার গভীর অতল অন্ধকারময় রহস্যের মধ্যে, তোমার সীমাহারা দিশাহারা অন্তহীনতার মধ্যে, তোমার নির্ব্বাক স্থির অবিচল শান্তির মধ্যে? তোমাকে কেমন করিয়া জানিব? আমি আলোকের জীব, স্পষ্টতার প্রাণী, তোমার অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিতে গেলেই যে তোমার রহস্যের অন্তরালটুকু নিষ্ঠুর হস্তে ছিঁড়িয়া ফেলি! কেমন করিয়া তোমার কাছে পৌঁছিব? আমি তোমার নিকটে যাইলেই আমার সঙ্গী রহস্যহীনতা, স্পষ্টতা, আলোকপূর্ণতা তোমার রহস্যকে দূরে ঠেলিয়া দেয়। হে অজ্ঞেয়, হে অন্ধকারের গোপনতা, হে অনির্ব্বচনীয়ের অপ্রকাশ, তোমায়-আমায় মিলন কেমন করিয়া সাধিত হইবে?

কার্ত্তিক নিশ্বাস ফেলিয়া মাথা তুলিয়া পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিল। তখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই; তথাপি তাহার পূর্ব্বাভাস পূর্ব্বদিক-চক্রবালস্থ ভাসমান মেঘখণ্ডের উপর প্রতিফলিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রের উত্থানের পথে সোপানশ্রেণী রচনা করিতেছে। হঠাৎ কার্ত্তিকের মনে হইল, যদি তাহার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে হাত দিয়া চাঁদকে ঠেলিয়া নামাইয়া দিত। তাহার কেবলি ইচ্ছা হইতে লাগিল, সে চীৎকার করিয়া বলে, আলো চাই না, অন্ধকার—অন্ধকার—অন্ধকার দাও। সব ডুবাইয়া, সব ভুলাইয়া, নেমে এস, হে অন্ধকার, হে চির-অজ্ঞাত, তুমি নেমে এস! আমার বাক্য থামাইয়া আমার সমস্ত চেষ্টাকে শান্ত করিয়া, আমার এই জন্ম-জন্মান্তের সঞ্চিত বিশালতাকে অভিব্যাপ্তিকে নিবিড় পেষণে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম করিয়া সূক্ষ্মতম করিয়া আমায় তোমার আপন করিয়া লও। আমায় তোমার মধ্যে হারাইয়া যাইতে দাও। আমি আর কিছু চাহি না, কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য এক নিমেষের জন্য তোমার রহস্যের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে চাই, তোমার অন্ধকার গোপনতার মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে চাই। ভুলাও, আমায় ভুলাও।

কার্ত্তিকের বিলম্ব দেখিয়া সর্ব্বানন্দ উপরে আসিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, তুমি দিনেও পড়বে না, রাতেও বৈ ছোঁবে না, শেষে যদি ফেল হও, তখন কি কৈফিয়ৎ দেবে?"

কার্ত্তিক আলিসার উপর মস্তক রক্ষা করিয়া বলিল, "একজামিন পাস করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। যা সহজেই জানতে পারা যায়, তাকে জেনে কি হবে? যাকে জানতে কেউ পারে না, যাকে সহজে কেউ ধরতে পারে না, আমি তাকেই ধরতে চাই!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "অর্থাৎ কোন একটী স্ত্রীলোকের হৃদয়-রহস্য জানাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য! আর সব মিছে! কার্ত্তিক, তুমি আমার কথা শোনো, তোমার

লেকচার শেষ হয়েছে, তুমি বাড়ী গিয়ে একজামিনের জন্য তৈরি হওগে। এ-সব পাগলামি আর কতদিন চালাবে?"

পাগলামি! কার্ত্তিক ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "পাগল কে নয়? তুমি পাগল, ঠাকুরদা পাগল, বাবা পাগল, কালিকাবাবু পাগল, দুনিয়া পাগল! পাগল সকলেই! কেউ-বা এই জিনিষটার জন্য পাগল, কেউ-বা ঐ জিনিষটার জন্য পাগল। পাগলা-গারদে বসে তুমি আমায় পাগল বলছ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "মিছে তর্ক করে কি হবে? কিন্তু তোমায় বারবার সাবধান করে দিচ্ছি, কার্ত্তিক, কেবল আপন খেয়ালে চলো না। এতে যে তুমি কেবল আপনারই ক্ষতি করবে, তা নয়, আরও দশজনকে জড়িয়ে নিয়ে তুমি অধঃপাতে যাবে। তোমার পতনে যদি আর কারও ক্ষতি না হত, তাহলে কোন কথা কইতুম না! কিন্তু—"

কার্ত্তিক কহিল, "থাম, একটু বুঝে বল দেখি, এই যে আর কারও কিছু-কিঞ্চিৎ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, এতেই কি তুমি এত ব্যস্ত হয়ে ওঠো নি? তোমার আর-কেউ যদি মিছিমিছি আমার সঙ্গে জড়িত হয়ে আমার জীবনটাকে দাসত্বের মধ্যে টেনে নিয়ে ফেলবার চেষ্টায় না থাকতেন, তাহলে তুমি কথাটি কইতে না।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কার্ত্তিক, তুমি ত আমায় ভালবাসতে!"

কার্ত্তিক কহিল, "এখনও বাসি, যদি তুমি তার প্রমাণ চাও, বল, আমি এই মুহূর্ত্তে তা প্রমাণ করতে পারি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "প্রমাণ কর।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি আজই বাবাকে চিঠির উত্তর দিয়েছি। তিনি লিখেছিলেন, এই অঘ্রাণ মাসে শৈলজার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন স্থির করেছেন। আমি লিখে দিয়েছি যে আমি শৈলজাকে বিবাহ করব না, সর্ব্বদাদা প্রস্তুত আছে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করুন।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তুমি খুড়োমশায়ের কথা ঠেলে এই কথা লিখেছ? কার্ত্তিক, তোমাকেও জিজ্ঞাসা করি, তুমিও ঠিক করে বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, এই যে কাজটা করে বসেছ, তোমার জন্মদাতা, জ্ঞানদাতা, তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুর এই যে অপমান করেছ, এ কি শুধু আমারই জন্য? ঐ দেখ, চাঁদ উঠছে,—ঐ চাঁদকে সাক্ষী করে বল যে এই কাজটি আমার জন্য করেছ, না, একটা অন্ধ রমণীর অন্ধকার হৃদয়ের মধ্যে স্থান পাবার জন্য? কি দেখেছ ঐ রমণীর দৃষ্টি-শক্তি-হীন চোখে, যে তার জন্য নিজেকে এতদূর অধঃপতিত করেছ? কি আছে, কি পেয়েছ সরোজের কাছে? সেও মানুষ, তার হৃদয় ত তোমারই মত বাসনা-কামনার আবাস-ভূমি। সেও তোমারই মত সুখে হাসে, দুঃখে কাঁদে,—তবে কি হিসেবে সে এত লোভনীয় হল?"

কার্ত্তিক উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "এক দিন তোমাকেও আমি এই প্রশ্ন করেছিলুম, কিন্তু তুমি কি কোন উত্তর দিতে পেরেছিলে? এ ক্ষেত্রে আমিই বা পারব কি করে? তবু তোমায় একটা উত্তর আমি দেবো, কারণ, এই এতদিন ধরে আমি বৃথাই সরোজের

কাছে যাই নি। তার মধ্যে এমন জিনিষের আভাস আমি পেয়েছি, যার বর্ণনা সহজে করা যায় না। তবু সেটা কি, শুনবে? সেটা হচ্চে ওর অবোধ্যতা। যা সহজ, যা হাতের তেলোর মত নিতান্তই আমার কাছে স্পষ্ট এবং পরিচিত, তা আমি অত্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করি। যা দুষ্প্রাপ্য, যা রহস্যময়, চিরদিন আমি তাই চাই। যা পাব না, তাকেই আমি পেতে চাই! না পাই, নাই পেলুম! আর না পাওয়াই আমার দরকার, কারণ পেলে হয়তো তাকে আর আমি চাইব না। তাই যা পাব না, তাকেই পাবার ইচ্ছা করব, তাকেই মন-প্রাণ দিয়ে চাইব। এই জন্য যা সহজলভ্য, তা আমি অনায়াসে তোমার ভাগে ফেলে দিয়ে যা আয়াস-লভ্য, তার দিকে আমি ছুটে চলেছি। তোমার কি সাধ্য আমায় ফেরাবে? সরোজ যদি অন্ধ না হত, সরোজ যদি আমার জন্য হা-পিত্যেশে বসে থাকত, তাহলে ওর ত্রিসীমা আমি মাড়াতুম না। কিন্তু যেদিন প্রথম ওকে দেখলুম, সে-দিনকার প্রথম সহজ ব্যবহারে, একেবারে আমাকে তুচ্ছ করে, সামান্যের মত, অতি-যৎসামান্য একটা লোকের মত ব্যবহার দেখিয়ে ও আমায় আকৃষ্ট করেছে। বাহ্যতঃ ওর কিছুই গোপন নেই, লুকোনো কথা নেই, তাই ওকে পরম রহস্যময় বলে আমি বুঝতে পেরেছি। ওর অন্ধকার চক্ষুর অন্তরালে কি যে লুকানো আছে, ওর অতি-সরল অতি-স্পষ্ট ব্যবহারের মধ্যে একটা গভীরতম অন্ধকারের মত কি যে লুকানো আছে, তাই আমি জানতে চাই। তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ভাবে প্রতিদিনকার ভাত-ডালের মত করে আমি কিছুই পেতে চাই না। জানিনা, হয়তো তুমি আমার কথা কিছুই বুঝছ না, তবে ঠাকুরদাকে একদিন বুঝিয়ে ছিলুম। যদিও সে কেবল অবাক হয়ে আমার পানে চেয়েছিল, তবু বোধ হয়েছিল যেন, সে আমায় কিছু কিছু বুঝতে পেরেছে, তাই সে দিন থেকে সরোজের কাছ থেকে আমায় দূর করে দেবার চেষ্টাও সে ছেড়ে দিয়েছে। আজ তোমায় বল্লুম, এখন তোমার যা অভিরুচি, তাই কর।"

কার্ত্তিক ফিরিয়া দূর আকাশে একটা নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া রহিল। সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের স্কন্ধে হস্ত দিয়া বলিল, "তবুও তোমায় ফিরতে হবে।"

কার্ত্তিক না ফিরিয়া বলিল, "হয়তো হবে, তাই বলে বর্ত্তমানকে ত্যাগ করতে পারিনে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি তোমার সমস্ত কথা সরোজের কাছে প্রকাশ করে বলব। তারপর—"

কার্ত্তিক কহিল, "তোমার সেটুকু কষ্টও স্বীকার করবার দরকার নেই, আমি নিজেই বলব। আমায় তুমি কি মনে কর? আমি কি—"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি মনে করি, তুমি স্বেচ্ছাচারী, পিতৃদ্রোহী, মনুষ্যনামের অযোগ্য প্রাণী! কি বলব তোমায়—"

কার্ত্তিক কহিল, "কিছু বলার প্রয়োজন নেই সর্ব্বদা, আমি যা, তাই।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি যে, তোমায় যদি না ফেরাতে পারি, তাহলে এ জীবন ত্যাগ করব।"

সর্ব্বানন্দ নাম্নিয়া গেল। কার্ত্তিক কিছুক্ষণ ছাদের উপর পায়চারি করিয়া শেষে নামিয়া গিয়া বলিল, "সর্ব্ব-দা তোমার রাগ কাল সকালেই দেখো থাকবে না, সব ভুলে তুমি বৈ পড়তে লেগে যাবে।"

সর্ব্বানন্দ পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল।

৭

পরমহংস শঙ্করানন্দ আজকাল পরম দয়ালু হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার দয়ায় আজ কাল অনেক পাপী-তাপী উদ্ধার লাভ করিতেছে। তাঁহার এই জীবোদ্ধার-কার্য্যের জন্য আজ-কাল প্রতি সন্ধ্যায় একটি বৈঠক বসিয়া থাকে। এবং সেই সভায় শাস্ত্রীয় বহু গূঢ় তত্ত্বের আলোচনায় শিব-রামপুরের বহু নর-নারী যোগদান করায় আজ-কাল পোড়া বাঙ্গলার অন্ধকার কোণগুলি আলোক-মালায় শোভিত ও উপদেশার্থীর কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। এমন কি এ কথাও রটিয়া গিয়াছে যে কমবখৎপুরের একজন পাকা বিষয়ী লোক তাঁহার বিষয়-আশয় পুত্রকে দান করিয়া শঙ্করানন্দের উপদেশে সংসার ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন,—তবে এখনও সমস্ত বিষয়ের সুবন্দোবস্ত হয় নাই বলিয়া তিনি এতাবৎকাল কাশীবাসী হইতে পারেন নাই, এবং কবে যে হইবেন, তাহারও স্থিরতা নাই।

এই সুনামের জন্য স্বামীজি কেবল মাত্র তাঁহার শিষ্যাবলীর নিকটই নহে, তাঁহার রত্নগর্ভা জগজ্জননীর অংশরূপিনী জননী নিস্তারিণী দেবীর নিকটও বিশেষভাবে ঋণী। তিনি নানা উপায়ে পুত্রের অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ জগৎসমক্ষে বহু গূঢ়ার্থ-বোধক কথাবার্ত্তায় প্রচারিত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারই জন্য কালিকাবাবুর অতি-নিষ্ঠাবতী মাতাও ক্রমশ শঙ্করানন্দের দিকে আকৃষ্টা হইয়াছেন। এমন কি তিনিও মধ্যে মধ্যে জপমালা হস্তে লইয়া একজন দাসী বা অন্য কোন আশ্রিতাকে সঙ্গে লইয়া রাত্রির অন্ধকারে উপরোক্ত ভাগবত-কথা-বৈঠকে যোগদান করিতে আসিতেন।

অদ্যকার বৈঠকে স্ত্রীলোকের কিরূপ স্বামী হওয়া উচিত, বেদী হইতে সেই বিষয়েই অমৃতময়ী উপদেশাবলী বর্ষিত হইতেছিল। ব্যাসদেবের ন্যায় সন্তানের জন্য পরাশরের ন্যায় যোগীর প্রয়োজন, এই কথা কয়টি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা আকারে প্রচারিত হইতেছিল। যে স্বামী সংসারকে যোগবলে স্বর্গ করিয়া তুলিতে পারিবে, সমস্ত পাপকে যে সমাধি-নির্দ্ধূত বুদ্ধিবলে পুণ্যে পরিণত করিতে পারিবে, যে সর্ব্ব দ্রব্য উপভোগ করিতে করিতে সতেজে বলিতে পারিবে, 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং।' একমাত্র সেই লোকই সৎপাত্র; তাহাকে কন্যাদান করাই প্রকৃত কন্যাদান। সেই সৎপাত্রের ঔরসে যে কুলপ্রদীপের জন্ম হইবে, সেই পুত্রই পিতৃকুল ও মাতৃকুলের উর্দ্ধতম চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিতে সক্ষম। নহিলে সংসারে থাকিয়া আর উদ্ধারের কোন পন্থা নাই! নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'—অয়নায় কি না, সংসারে চলিবার অর্থাৎ সংসার-ধর্ম্ম করিবার আর কোন পন্থা নাই—নাই!

জগদম্বা দেবী যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন তাঁহার ভক্তিতে আপ্লুত হৃদয়ের মধ্যে

কবলি জাগিতে লাগিল, সংসার-ধর্ম্মের আর কান দ্বিতীয় পন্থা নাই! সৎপাত্রে কন্যা ান না করিলে সংসারের উদ্ধার নাই। কন্তু কোথায় পাই এমন সৎপাত্র? কেন, ই শঙ্করানন্দ কি সৎপাত্র নয়? সে ত বিবাহিত, তাহার পিতামাতাকে ধরিয়া কি ই স্বামীজীর দ্বারা শিবরামপুরের জমিদার ংশের উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে উদ্ধার করা ায় না? একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি!

জগদম্বা দেবীর যে চিন্তা, সেই কাজ। কিন্তু প্রভুপাদ শঙ্করানন্দ সে সংবাদ ুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া তাঁহার াতাকে বলিলেন, "মা, যদি বিবাহই করব তবে জীবোদ্ধার করব কিরূপে? আমার দি বিবাহ করাই প্রয়োজন হত, তা হলে কোন্‌দিন তোমার কোলে মাথা রেখে আবার ঐ সংসারের মধ্যে ডুবে যেতুম। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে শৈলজার মত "শক্তিই" আমার সহধর্ম্মিণী হবার উপযুক্ত। যা হোক, আমায় চিন্তা করবার অবসর দাও, ভগবানের প্রত্যাদেশ ছাড়া আমি কোন কাজেই হস্তক্ষেপ করতে পারি না। আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর। তার পর যদি আমার প্রকৃত মাতা পরমা-প্রকৃতির আদেশ পাই, তা হলে বিবাহ করলেও করতে পারি।"

জগদম্বা দেবী অন্তরাল হইতে এই আশা ও নিরাশাময়ী বাণী শুনিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে শঙ্করানন্দকে লাভ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার না হইলেও একেবারে দুরাশা নহে। তবে এখন কেবল তাঁহার পুত্রের মতের প্রয়োজন। তিনি সেই কার্য্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন; এবং অন্নজল-পরিত্যাগাদি বহুবিধ সদুপায়ে পুত্রের মত আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শৈলজা তাহার পিতামহীর রকম-সকম দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইল। জগদম্বা দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন, "অত হাসি কিসের?"

শৈলজা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি এই বুড়ো বয়সে না কি আবার বিয়ে করবে?"

জগদম্বা কহিলেন, "তা বর জুটলেই করি, কিন্তু আমার দিদি থাকতে ত আর আগে আমার বিয়ে হতে পারে না, তাই তোর আগে একটা জুটিয়ে দি, তার পর আমার যা হয় হবে।"

শৈলজা কহিল, "ঠাক্‌মা তোমার পায়ে পড়ি, বল না, কেন, আবার তোমার বিয়ে করবার ইচ্ছে হল? আচ্ছা, তা না হয় নাই বল্‌লে, কি করে বরের কাছে ঘোমটা দিয়ে বসবে, তাই দেখাও না! আচ্ছা, তোমার বর যদি বলে, ছোলাভাজা খেতে হবে, তা হলেই বা তুমি কি করবে?"

জগদম্বা কহিল, "আ গেল যা বেহায়ী! তোর জন্যে আমি মরছি, আর তুই আমাকে গালাগাল সুরু করলি?"

শৈলজা কহিল, "গালাগাল কি রকম! তোমার আবার নতুন করে ছোলাভাজা মটরভাজা খাবার সখ হল, আর আমি তা মুখে বলতে পাব না!"

জগদম্বা কহিলেন, "দেখ্ শৈল, তোরা যতই পাগলামি কর্ না কেন, আমি কিন্তু

কিছুতেই এই অঘ্রাণ মাস পার হতে দেব না। কেন? কার্ত্তিক ছাড়া কি সংসারে সুপাত্র নেই? কার্ত্তিকের না হয়—"

শৈলজা কহিল, "ঐ নামের ঠাকুরের মত চেহারা, ঐ রকম গায়ে জোর, ঐ রকম তেজ, ঐ রকম দেব-সেনাপতি হবার মতই লোক চাই।"

জগদম্বা কহিলেন, "থাম্, থাম্, বেহায়া মেয়ে! এখনো যে তোর ওর সঙ্গে বিয়ে হয় নি লো! এর মধ্যেই এত!"

শৈলজা কহিল, "বামুনের মেয়ের বাক্‌দত্তা হওয়া যা, বিয়ে হওয়াও তাই। তোমায় যদি বলি, আবার বিয়ে করবে, তা হলে তুমি কি আর বিয়ে কর?"

জগদম্বা কহিলেন, "আমার সঙ্গে তোর তুলনা?"

শৈলজা কহিল, "কেন নয়? তুমিও মেয়ে মানুষ, আমিও তাই। তুমি যদি ঠাকুর দাদার উদ্দেশ করে এখনো বেঁচে থেকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করতে পার, আমিই কেন পারব না?"

জগদম্বা কহিলেন, "কুলীনের মেয়ের কথা দিলেই কিছু বিয়ে হয়ে যায় না। আমার খুড়িমার ছান্‌লাতলা থেকে বিয়ে ফিরে গিয়েছিল।"

শৈলজা কহিল, "তোমার খুড়িমা! সে তো সত্যি যুগের কথা! কলিযুগে তা হয় না। তোমায় বলে রাখছি, ঠাক্‌মা, যদি তুমি মণিশঙ্করের কাছে আর কোন দিন ভাগবত শুনতে যাও, তাহলে তোমায় কাশী পাঠিয়ে দেব।"

জগদম্বা কহিলেন, "আমার মরণ হয় ত বাঁচি! এ বাড়ীর কেউ আমার কথা শুনবে না! মা গঙ্গা কবে আমায় নেবেন?"

শৈলজা কহিল, "তোমার একশো তেরো বছর পরমায়ু হোক! তুমি হরিনাম করতে করতে সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ কর। আর কেন এ সব ব্যাপারে যোগ দিতে আসছ? দু' দণ্ড তুলসী তলায় বসে হরিনাম করগে যে কাজ হবে।"

জগদম্বা কহিলেন, "হায়, হায়, তিন দিনের মেয়ে! গাল টিপলে দুধ বেরোয়! সে আমায় উপদেশ দিতে এল! হায়রে, যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!"

শৈলজা হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল; আর জগদম্বা দেবীও জপ ভুলিয়া মালা গাছটী লইয়া বারবার মাথায় ঠেকাইতে লাগিলেন। (ক্রমশ)

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা

*
* *

ব্রাহ্ম সমাজ

য়ুরোপের অব্যবহিত প্রভাব, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এমন-একটা আন্দোলন উত্তেজিত করিল যাহা আরও সমধিক ফলগর্ভ। রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) একেশ্বরবাদ শিক্ষা দিলেন; এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে ব্রহ্ম নামে অভিহিত করিলেন। উপনিষদের

ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকায় রামমোহন রায় নিজ অভিপ্রায় এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন:—

"আমার ধর্ম্মবুদ্ধি ও অকপটতার পথ অনুসরণ করিতে গিয়া, জাত্যংশে ব্রাহ্মণ যে আমি,—আমাকে আত্মীয়দের অভিযোগ ও তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছে। তাঁহাদের বদ্ধমূল কুসংস্কার এবং তাঁহাদের বৈষয়িক সুবিধা বর্ত্তমান প্রণালীর স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে। কিন্তু তাঁহারা যতই আমাকে তিরস্কার করুন না কেন, আমি তাহা শান্তভাবে সহ্য করিব। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এমন দিন আসিবে যখন লোকে আমার এই সামান্য চেষ্টাকে ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখিবে অথবা হয়তো কৃতজ্ঞতার দ্বারা পুরস্কৃত করিবে। তাছাড়া, লোকে যাহাই মনে করুক না কেন, আমার একটা সান্ত্বনা থাকিবে,—তাহা হইতে আমাকে কেহই বঞ্চিত করিতে পারিবে না:—যিনি আমাদের অন্তরের গুপ্ত অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাহার যোগ্যতা অনুসারে, প্রকাশ্যে পুরস্কার দান করেন, তিনি অবশ্যই আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন।" (১)

আরও এই কথা বলিয়াছেন:—

"কুসংস্কারের বশীভূত না হইয়া, যে-কেহ এই গ্রন্থখানি এবং বেদান্তের অন্য গ্রন্থাদি পাঠ করিবেন তাঁহার এই ধ্রুববিশ্বাস হইবে যে, ঐ সকল গ্রন্থ মুখ্যরূপে ঈশ্বরের একত্বই প্রতিপাদন করে। কি করিয়া আধ্যাত্মিক-ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে মানুষকে তাহাই শিক্ষা দেয়। অবশ্য বেদ মূর্ত্তিপূজাকে একেবারে অগ্রাহ্য করে না—উপেক্ষা করে মাত্র। যাহাদের চিত্ত অদৃশ্য ঈশ্বরের ধ্যান করিতে পারে না, তাহারা কি মূর্ত্তিপূজায় ব্যাপৃত হইবে না? কিন্তু অনেক স্থলেই বেদ মূর্ত্তিপূজা পরিহারের উপদেশ দিয়াছেন, একটা বিশুদ্ধতর ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন; বেদ ইহাই প্রতিপাদন করেন যে, মূর্ত্তি-পূজার অনুষ্ঠানাদিতে কখনই মোক্ষ লাভ হয় না।" (২)

আরও কিছুকাল পরে, রামমোহন রায় খৃষ্টধর্ম্মের কাছাকাছি অগ্রসর হইলেন। নিম্নলিখিত লেখায় তাহা অবগত হওয়া যায়:—

"ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য, দীর্ঘকাল অবিরাম চেষ্টা করিয়া তাহার পর জানিলাম,—যতগুলি ধর্ম্ম আমার জানা আছে, তন্মধ্যে খৃষ্টের ধর্ম্মমতই অধিকতর ফলগর্ভ, এবং জ্ঞান-বুদ্ধিসমন্বিত জীবদিগের পক্ষে অধিকতর উপযোগী···মানুষের মতামত উন্নীত করিবার পক্ষে, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর সম্বন্ধে উদার ধারণা পোষণ করিবার পক্ষে, এই ধর্ম্ম ও নীতির সহজ গ্রন্থটি চমৎকার উপযোগী; ঈশ্বরের প্রতি, প্রতি-বেশীর প্রতি, আপনার প্রতি বিবিধ কর্ত্তব্য সাধনপক্ষে মানুষের আচরণকে পরিচালন করিবার উহার এতটা যোগ্যতা আছে যে, আমার আশা হয়, উহার বিস্তৃত প্রচারে অধিকতর শুভ ফল লাভ হইবে।" (৩)

(১) Dutt—Literature of Bengal (P. 141)
(২) Brahmanism and Hinduism (P. 481)
(৩) (Brahmanism and Hinduism)

তথাপি রামমোহন রায় খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই; তিনি খৃষ্টধর্ম্মের ত্রিত্ববাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

"আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভূত বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে যে সকল বিভিন্ন দেবদেবীর কথা আছে—সেই বহু দেবদেবীর ধারণা, আমি বহুকাল হইতে পরিত্যাগ করিয়াছি। তাই, খৃষ্টধর্ম্মের যে মতটি এই ধরণের (আধুনিক খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকেরা এই মতটির একটু দোষ কাটাইলেও) আমার অন্তরাত্মা ও আমার ধর্ম্মবুদ্ধি ঐরূপ মত গ্রহণ করিতে আমাকে নিষেধ করে। বহু দেববাদের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি-প্রয়োগ হয়, ঈশ্বরের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধেও ঐ একই যুক্তি প্রয়োগ হইতে পারে। এবং ঈশ্বরের বহু-ব্যক্তিত্বের স্বপক্ষে যে যুক্তি প্রয়োগ করা হয়, বহু দেববাদের পক্ষে সেই একই যুক্তি প্রয়োগ হইতে পারে।" (৪)

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে, রামমোহন রায় ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিলেন; খৃষ্টান্ ও মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি হিন্দুদিগকে সমবেতভাবে ঈশ্বরোপাসনা করিবার রীতি শিখাইলেন। এই সমাজমন্দির, সকল ধর্ম্ম ও সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগের জন্য উদ্‌ঘাটিত হইল, এবং তথায় "ব্রহ্ম" এই নামে এক ঈশ্বরের উপাসনা হইতে লাগিল। উপাসনার কার্য্য চারিভাগে বিভক্ত:—বৈদিক মন্ত্রপাঠ, উপনিষদ্ হইতে শ্লোকাদির ব্যাখ্যান, বক্তৃতা, ধর্ম্মসঙ্গীত। এই সমাজমন্দির কোন মূর্ত্তির দ্বারা বিভূষিত ছিল না।

কিন্তু রামমোহন রায়ের জীবনে, ধর্ম্ম-সংস্কার অপেক্ষা সমাজসংস্কারই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল:—তিনি সমস্ত জাতি বর্ণের সমতা ঘোষণা করিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করিলেন যে, ব্রাহ্মণেরাই হিন্দুধর্ম্মের কৌলিক পুরোহিত; তিনি নারীজাতির দুরবস্থা প্রশমনের চেষ্টা করিলেন, এবং বিশেষত সতীদাহ-প্রথা নিবারণ-কল্পে সহায়তা করিলেন।

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর, তাঁহার মতাবলম্বীরা বিভক্ত হইয়া পড়িল। দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর (১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম) প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম ঘেঁসিয়া রহিলেন; পক্ষান্তরে কেশবচন্দ্র সেন, (১৮৩৪-৮৪) উহা হইতে একেবারে তফাৎ হইয়া পড়িলেন। কেশব চন্দ্র পর্য্যায়ক্রমে বিবিধ প্রকারের মত অবলম্বন করেন।

প্রথমে, উদার-মতাবলম্বী প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টসম্প্রদায়ের মতানুযায়ী, একটা অস্পষ্ট (deism) একেশ্বরবাদ:—ঈশ্বর জগতের আদি কারণ, আত্মার অমরত্ব, অবতার-বাদের প্রত্যাখ্যান। ঈশ্বর-প্রেরিত কেবল দুইটি গ্রন্থ আছে;—বিশ্বপ্রকৃতি, ও মানবাত্মা।

তাহার পর কেশব, ভারতীয় যোগ-রহস্যবাদে ফিরিয়া আসিয়া, ১৮৭৮ অব্দে তাঁহার সমাজের (১৮৬৬ অব্দে প্রতিষ্ঠিত) সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। যে "নিত্য-স্ত্রী-তত্ত্বের" যোগাতর রূপ—ভারতের "ভগবতী মাতা,"—সেই "মাতার" আরাধনা তাঁহার সমাজে প্রবর্ত্তিত করিলেন। ১৮৭৯ অব্দে, তাঁহার কোন প্রসিদ্ধ বক্তৃতায় তিনি Renan-ব্যাখ্যাত যিশুখৃষ্টের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন।

"কোন-এক উচ্চতর শক্তি তোমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, জয় করিয়াছে। সে শক্তিটি কি? আমি কি তাহার উল্লেখ করিব? সে শক্তি—স্বয়ং খৃষ্ট। ইংরাজ-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে, একটা বিপুল নৈতিক শক্তি ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সে কোন্ শক্তি? প্রবক্তা খৃষ্টের যে-জীবন, যে-চরিত্র এই বিশাল সাম্রাজ্যকে জয় করিয়াছে, ও রক্ষা করিতেছে,—ইহা সেই শক্তি। ভারতরূপ রাজমুকুটের অধিকারী কেবল একজন হইতে পারেন—তিনি যিশু যিশু যিশু।"

অবশেষে ১৮৮১ অব্দে, কেশব নব-বিধানের সমাজ স্থাপন করিলেন। এই নববিধানের মতগুলি অনেকটা থিয়সফিষ্টদের মতাদি স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া প্রকৃত দেশীয় ধরণে সম্পন্ন হয় এবং এই সর্ব্বপ্রথম একজন বাঙ্গালী সমস্ত ভারতকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিল।

যদিও রামমোহন রায় ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের সংখ্যা কখনই বেশী ছিল না, কিন্তু তিনটি দৃষ্টি-ভূমি হইতে তাঁহাদের সংস্কার-কার্য্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণের যোগ্যতা লাভ করে। ইংরাজি স্কুলে শিক্ষিত হিন্দুদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সমাজ-সম্বন্ধীয় মতামতের উপর এই সকল সংস্কার পরোক্ষভাবে একটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে আত্মসাৎ করিবার যে চেষ্টা উহা, ঐ সকল চেষ্টারই একটা বাহ্য লক্ষণ মাত্র; ফলতঃ হিন্দু-ধর্ম্মঘটিত ক্রমবিকাশের একটা মুখ্য কাল উহার দ্বারা পরিচিহ্নিত হয়। বিশ্বব্রহ্মবাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দুর মন একেশ্বর-বাদী হইয়া উঠিল; কিন্তু ব্যবহারে, এখনো পৌত্তলিক অনুষ্ঠানই সমধিক প্রচলিত।

রামমোহন রায়ের ন্যায় ঐকান্তিক সংস্কারকেরাও জনসাধারণের উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও, অন্ততঃ তাঁহারা অপেক্ষাকৃত নমনীয় প্রকৃতির লোকদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন; এবং এইরূপ অনুপ্রাণিত হইয়া ঐ সকল লোক হীন কুসংস্কারাদি পরিত্যাগ করিতে এবং অতীত মূর্ত্তি-পূজাকে রূপকে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে।

এই একটা জায়গা যেখানে, য়ুরোপের প্রভাব, ও হিন্দুধর্ম্মের স্বাভাবিক বিকাশ—এই উভয়ের কার-কতটা অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে পরিচিহ্নিত করা বড়ই কঠিন। কেননা, চিরকাল শিক্ষিত ব্রাহ্মণেরা, পৌরাণিক কথাগুলিকে রূপক বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন; এবং সাত শত বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ, হিন্দুধর্ম্মকে একেশ্বর-বাদের দিকেই লইয়া যাইতেছে। (৫)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৪) Brahmanism and Hinduism.

(৫) আধুনিক একেশ্বরবাদীদিগের আদিম সম্প্রদায়গুলি:—রামচরণকর্ত্তৃক স্থাপিত (১৭১৯-৯৪) "রামসনেহি" সম্প্রদায়; ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রথম-তৃতীয়াংশে রামবল্লভকর্ত্তৃক স্থাপিত "রামবল্লভী" সম্প্রদায়।

কাব্য সৌন্দর্য্যে শীল ও শ্লীলতা

দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, পদার্থের সম্বন্ধে এইটি গোড়ার কথা। যে উপাদানে ও যে কৌশলে মনুষ্যের চক্ষু-যন্ত্র রচিত, তাহাতে কোন বর্ণ বা চক্ষুর তৃপ্তিদায়ক, এবং কোনটি বা তাহার পক্ষে যন্ত্রণা-উৎপাদক। যেমন সকল শব্দই সঙ্গীত নহে, সকল গন্ধই সুবাস নহে, সকল রসই মধুর নহে, এবং সকল স্পর্শই কমনীয় নহে, তেমনি

রামমোহন রায় ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রাধানগরে (হুগলী জেলা) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্ষুদ্র এক জমিদারের পুত্র। তিনি ফার্সি, আর্বি, সংস্কৃত, ইংরাজি শিক্ষা করেন, ভারত ও তিব্বতে ভ্রমণ করেন। ১৮০০ হইতে ১৮১৪ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের চাকুরী করেন। উপনিষদের উপদিষ্ট এক ও অদৃশ্য ঈশ্বরের আরাধনার জন্য ১৮১৪ অব্দে "আত্মীয় সভা" এবং ১৮৩৩ অব্দে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। ১৮৩৩ অব্দে বিলাত যাত্রা করেন এবং ১৮৩৩, ২৭ সেপ্টেম্বরে ব্রিষ্টলে দেহত্যাগ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১৮ অব্দে কোন ধনাঢ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৩ অব্দে, রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরে অবনতিগ্রস্ত ব্রাহ্ম-সমাজকে পুনর্গঠিত করেন; অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত মিলিত হইয়া বাঙ্গলা মাসিক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাহির করেন (১৮৪৩ অব্দে সভ্যের সংখ্যা ৮৩ ছিল, ১৮৪৭ অব্দে ৫৭৩ জন সভ্য হয়)।

কেশবচন্দ্র সেন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৫ অব্দে "কলুটোলা ইভ্‌নিং স্কুল" এবং ১৮৫৭ অব্দে Good-will Fraternity স্থাপন করেন। ১৮৫৭ অব্দে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হন, ১৮৫৯ অব্দে "ব্রাহ্ম-বিদ্যালয়" স্থাপন করেন; ১৮৬২ অব্দে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদ গ্রহণ করেন।

১৮৬২ অব্দে, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়। তখন হইতে "আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের" পরিচালন-ভার গ্রহণ করিলেন। "আদি-ব্রাহ্ম-সমাজ" শীঘ্রই অবনতিগ্রস্ত হইল। দ্বিতীয়—"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ"। যিশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে পরামর্শ-সভা (১৮৬৬)। পাশ্চাত্যাভিমুখে মুখ ফিরাইলেন। কেশবকে গুরু বলিয়া ও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিবার ইচ্ছা প্রকাশিত (১৮৬৮)। ইংলণ্ড-যাত্রা (১৮৭০)।

১৮৭৯ অব্দে কেশব কুচবেহারের মহারাজার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন। হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিক অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ-অনুষ্ঠান হইল। ইহা হইতেই ভারতবর্ষীয় সমাজের মধ্যে একটা পার্থক্য উপস্থিত হইল।

একপক্ষে—কেশবের "নববিধান" সমাজ। কেশবের মৃত্যু (১৮৮৪)। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁহার পদের উত্তরাধিকারী হইলেন। কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদে সমাজের অবনতি হইল।

অন্যপক্ষে—প্রতিবাদকারী সমাজ (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ), ২৯টা প্রাদেশিক সমাজের সম্মতিক্রমে এবং ৪২৫ ব্রাহ্মের ঘোষণা-ক্রমে ১৮৭৮, ১৫ মে তারিখে স্থাপিত হইল। ১৮৯১ অব্দে সভ্য সংখ্যা—১৬৯১; তন্মধ্যে ১৫৩৯ জন বাঙ্গালী। ঐ একই আদম-সুমারে দেখা যায়, সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম-সংখ্যা—৩০৫১; তন্মধ্যে ২০৫৬ জন বাঙ্গালী।

দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮২৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৭ অব্দে লাহোরে আর্য্যসমাজ স্থাপন করেন। ৩০ অক্টোবর ১৮৮৩ অব্দে আজমীরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৮৩ অব্দে আদম-সুমার:—৩৯,৯৫২জন আর্য্য; তন্মধ্যে ২২০৫৩ জন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের এবং ১৫,৫৩৯ পাঞ্জাবের। আর্য্যেরা বেদের উপর নির্ভর করে, কিন্তু স্বপ্রদত্ত আধুনিক অর্থে উহারা বেদের ব্যাখ্যা করে।

এ জগতের সকল দৃশ্যই রূপ নহে। উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণে, বা প্রদীপ্ত রক্তবর্ণে চক্ষু ঝলসিয়া যায়; কিন্তু হরিৎ ও নীলবর্ণ চক্ষুর স্নিগ্ধতা বিধান করে। এই জন্যই শ্যামল-পত্র-শোভিত উদ্ভিদ্-জগৎ সুন্দর, নীলিমাময় আকাশ সুন্দর, সমুদ্রে নীলাম্বুরাশি সুন্দর। কিন্তু যত সুন্দর বা স্নিগ্ধতা পূর্ণ হইলেও, নিরবচ্ছিন্ন একই রূপ মানসিক জড়তা, অতৃপ্তি ও বিরক্তি বিধান করে। একঘেয়ে হইলে কিছুই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিতে পারে না। এইজন্য সৌন্দর্য্যের আর একটি উপাদান বিচিত্রতা। পঞ্চমের সুর মিষ্ট বটে, কিন্তু আগাগোড়া একই পঞ্চম তৃপ্তিদায়ক নহে। নরম বিছানায় শুইয়া সুখ আছে বটে, কিন্তু অবিরত দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন, কঠোরতা অপেক্ষাও কঠোর। অতিরিক্ত মিষ্টরসের পর একটু চাট্‌নির প্রয়োজন হয়। তাই রূপ গোস্বামীঠাকুর হংসদূতে, গ্রাম্য-রমণী-প্রেম-বিস্মিত, পুরবধূ-বিভ্রম-মুগ্ধ, সুধাপূর্ণ-চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে একটুখানি তক্র বা ঘোলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। "বড় বড় রাঙ্গা শিমূলের ফুল, গাছ আলো করিয়া থাকে", কিন্তু গাছটি না কি একেবারে নেড়া; তাই শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন যে "ফুলগুলি পাতা ঢাকা হইলে ভাল হইত, কারণ পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রাঙ্গা দেখা যায়, সে সুন্দর।" এইজন্য বিবিধবর্ণ সমাবেশে সৌন্দর্য্য বিহিত হয়।

বহিরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে, যখন কোন দৃশ্য বা শব্দ, মানসিক ভাবেরও তৃপ্তিসাধন করে, তখন তাহা অধিকতর সুন্দর বা মনোহর হইয়া উঠে। প্রথমে শব্দের দৃষ্টান্ত দিতেছি। সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগিণী বা সুর, মানসিক হর্ষ-বিষাদের মূর্ত্ত প্রতিকৃতিমাত্র। বালকের হর্ষ হইলে, সে তালি দিয়া চীৎকার করিয়া আনন্দ-প্রকাশ করে; শোকের সময় প্রবীণও করুণস্বরে বিলাপ করিয়া মানসিক যাতনা প্রকাশ করে। সঙ্গীতের বিভিন্ন সুর এই সকল বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। যখন কোন সঙ্গীত-নিপুণ ব্যক্তি রাগিণী আলাপ করিতে থাকেন, তখন অর্থযুক্ত কোন পদ ব্যবহার করেন না; তবু সেই সুরটুকুর মাধুরীতে আমরা বিমুগ্ধ হই। এস্থলে কেবল কর্ণের পরিতৃপ্তিই, আমাদের মোহের কারণ নয়। সেই সুরের পরদায় পরদায়, কত যে সুখ-দুঃখের স্মৃতি আধ আধ জাগিয়া উঠে; কত যে হারাণ প্রেমের মাধুরী পুনরুদ্দীপ্ত হয়; কত যে কি, যাহা চাহিয়া পাই নাই—আজিও চাহিতেছি, তাহারই হর্ষ-বিষাদময় আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, কত যে অতীত, কত যে ভবিষ্যৎ অজ্ঞাতে প্রাণের রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিয়া যায়; তাহা বুঝিয়াও বুঝি না বলিয়া সঙ্গীত এত মধুর। গানের সুরে এই চমৎকার যাদুটুকু, কবি কালিদাস, অতি সুকৌশলে শকুন্তলার পঞ্চম অঙ্কে বুঝাইয়াছেন। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, তখন হংসপদিকার গানের সুরে ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছেন,—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যত্ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।

তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥

আবার দেখ, সকলেই সুকণ্ঠ নহে; অথচ স্নেহ প্রীতি ভালবাসা বা ভক্তিপ্রসূত আদর-সম্ভাষণাদির কথাগুলি কত মিষ্ট! জগতের সমগ্র বাদ্যযন্ত্রের মিলিত সুস্বর একদিকে, আর অতি কর্কশ কণ্ঠ হইলেও, পিতা-মাতার আদরের একটি ডাক, বা পুত্র কন্যার অনুরাগের একটি কথা, বা বন্ধুর একটু সম্ভাষণ, বা প্রণয়িনীর একটুখানি মমতাময় কথা, আর এক দিকে। এ সকল স্থলেই শব্দের পশ্চাতে একটা ভাবের ছায়া আছে বলিয়াই, শব্দে এত মোহ।

শব্দ সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, রূপসম্বন্ধেও তাহাই। চক্ষুর তৃপ্তির কথা ভুলিয়া গিয়া, ভাবের তৃপ্তিতেই আমরা কত পদার্থ সুন্দর দেখি। হরিৎবর্ণ চক্ষুর আনন্দ বিধান করে বলিয়া বৃক্ষাদি সুন্দর। তাহা ছাড়া আবার যখন একটি সজীব, সতেজ বৃক্ষ দেখি, তখন তাহার দৃশ্যে স্বাস্থ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে, দেখিতে পাই। সুস্থতা আমাদের পরম প্রার্থনীয়, তাই সেই স্বাস্থ্যের ছবি দেখিয়াই আনন্দ হয়। এই জন্য কোমলতা ও সুস্থতা-ব্যঞ্জক বালকের সুপুষ্ট দেহ, রমণীর যৌবনশ্রী, আমাদের চক্ষে এত সুন্দর। অবশ্য এই শেষ দৃষ্টান্তের মধ্যে, সৌন্দর্য্যের মূলীভূত আরও কতকগুলি কারণ আছে, যাহা এখানে উল্লেখ করিলাম না। কিন্তু যে দিক্ দিয়াই দেখ, দেখিবে, সৌন্দর্য্যের মূলে, কতকগুলি স্বীয় মানসিক ভাবের ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। গল্পে আছে, যে একজন রাজা, তাঁহার সভাস্থ সকলকে পৃথিবীর মধ্যে পরম সুন্দর যাহা, তাহাই আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সভাসদ্‌গণের মধ্যে কেহবা ফুল, কেহবা চিত্রিত পক্ষী, কেহবা অন্য কিছু লইয়া, রাজার সমক্ষে আসিলেন। রাজসভার কোণে এক পেঁচা বাসা করিয়াছিল, রাজার আদেশ শুনিয়া পেঁচাটি আপনার কদাকার ছানাগুলি আনিয়া দেখাইল। বাস্তবিক সেই পেঁচার চক্ষে তাহার ঘনীভূত স্নেহ-মমতার ছবিস্বরূপ, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাবকগুলি অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর পদার্থ আর কিছুই ছিল না। প্রবাসী কবি, প্রকৃতির কাম্যকাননে বাস করিয়াও তাঁহার ক্ষুদ্র পল্লীর ক্ষুদ্র গৃহের কথা মনে করিয়া লিখিয়াছেন,—

প্রিয়স্মৃতিবিজড়িত, কাঁটাবনে, মুগ্ধচিত,
তাই ভাল লাগে ক্ষুদ্র গৃহের প্রাঙ্গণ;
শোভাহীন হেরি এই বন-উপবন।

মানুষের মুখ-চোখ দিয়া, সারল্য, প্রফুল্লতা, অনুরাগ প্রভৃতি ফুটিয়া পড়িলেই মুখশ্রী সুন্দর হয়। আর যদি চক্ষুর দৃষ্টি ঘৃণার বাণ বর্ষণ করে; অধর আত্মাভিমানে কুঞ্চিত থাকে; তবে সেই চক্ষু ও অধর, চিত্রকরের আদর্শবস্তু হইলেও রমণীয় হয় না।

তবে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, কোন কোন বিশেষ শ্রেণীর গড়ন, সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইল কেন? ইহার বিচার করিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হয়। সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নীচশ্রেণীর জন্তুদিগের ক্রমবিকাশে মনুষ্যের জন্ম। মনুষ্য যতটা

পরিমাণে পশুদিগের অপেক্ষা ভিন্নরূপ হইয়া উঠিতে পারেন, এবং যতটা পরিমাণে সেই বিভিন্নতায়, তাঁহার মস্তিষ্কের ব্যাবৃত্তি ও স্নায়ুচক্রের জটিলতা বাড়িয়া উঠে, ততই তিনি উন্নতি লাভ করিতেছেন, বলা যায়। এই কারণে অতি পূর্ব্বকাল হইতে, আমাদিগের প্রতি অস্থিমজ্জায়, এই সংস্কারটুকু সংস্রাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে যে, পশুপ্রকৃতি এবং পশু-আকৃতি হইতে, মনুষ্য প্রকৃতি ও আকৃতি, যত বিভিন্ন ভাব অবলম্বন করে, ততই ভাল। কেবল মুখ দিয়া, একটি পশুকে কত কার্য্যই না করিতে হয়। ঘাস-পাতা হউক, মাংস হউক, যাহা কিছু আহার্য্য, তাহারা তাহা সমুদায়ই, মুখের সাহায্যে সংগ্রহ করে, আহারোপযোগী করিয়া প্রস্তুত করে, এবং পরে আহার করে। এই সকল কারণে তাহাদের হাঁ খুব বড় হয়। এবং হাঁ বড় বড় হইতে হইলেই হনু দীর্ঘ হয়; এবং মুখের মাংসপেশীতে ক্রমাগত টান লাগিয়া, নাক খাঁদা হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মানুষকে এতটা অধিক পরিমাণে মুখ খাটাইতে হয় না বলিয়া, হনু খর্ব্ব হয়, নাসিকা উন্নত হয়, হাঁ ছোট হয়। কাজেই আমাদিগের স্বাভাবিক সংস্কারের ফলে, আমরা শেষোক্ত প্রকারের গড়নকেই সুন্দর গড়ন বলিয়া মনে করি। মুখের সম্বন্ধে যাহা কিঞ্চিন্মাত্র বলা গেল, সমগ্র শরীরাবয়বের সম্বন্ধে তাহা যে সম্পূর্ণ খাটে, তাহা দেখাইতে পারা যায়। কিন্তু বিস্তৃত ব্যাখ্যা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আয়ত্তাধীন নহে। যাহা হউক, দেখা গেল যে, বাহ্যিক সৌন্দর্য্যও ভাবযোগজনিত।

মানুষ মাত্রেরই চোখ, কান প্রভৃতি যে উপাদানে ও যে ভাবে রচিত তাহাতে জড়-সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে মানুষে মানুষে বিশেষ পার্থক্য ঘটে না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লোকের মানসিক ভাব, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ও শিক্ষায় বিকশিত হয় বলিয়া, প্রত্যেকেরই মানস-সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে বিভিন্নতা জন্মে। যাহার মন যেমন, যাহার আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা যেমন, তাহার সৌন্দর্য্যানুভূতিও তদনুরূপ। যে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, সে রমণীর ইন্দ্রিয়-লালসাসূচক হাবভাব দর্শন করিয়া মুগ্ধ হয়। এবং তাহার চক্ষে সরলতা ও পবিত্রতার স্ফূর্ত্তি, সতীত্ব ও সংযমের ছবি, নীরস ও বিরক্তি-উৎপাদক।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ের শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থার ফলেই কবিদের সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে প্রভেদ দেখিতে পাই। যে সময়ে এ দেশের বড় অধঃপতন হইয়াছিল, যখন অনায়াসেই মুসলমানেরা এদেশে আসিয়া প্রভুতা বিস্তার করিতে পারিয়াছিল, সে যুগের সাহিত্যে যাহা সুন্দর বলিয়া চিত্রিত, এখন তাহা কুৎসিত বলিয়া উপেক্ষিত। নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্তের সংস্কৃত সাহিত্যে রমণীর আত্মা বা প্রাণের চিত্র নাই, কেবল সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা বাড়াইবার মত শরীরের বর্ণনা আছে। নৈষধকার শ্রীহর্ষ দময়ন্তীকে "মান্মথ রথ" রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। বাহিরের প্রকৃতি ও অন্তর্জগৎ কবির হৃদয়-দর্পণে যেরূপ প্রতিফলিত হয়, সেইরূপই অঙ্কিত হইয়া থাকে। আমরা আমাদের আদর্শ বা দর্পণকে কিরূপ শিক্ষায় মাজিয়াছি, তাহা আমাদের কাব্য

দেখিয়াই ধরিতে পারা যাইবে। নিজের অবস্থার ফলে কবি যে সৌন্দর্য্যকে মনোহর মনে করেন, এবং কাব্যের উপযোগী মনে করেন তাহা অনেক পাঠকের নিকট উপেক্ষিত হইতে পারে; এমন কি কোন কোন যুগের সামাজিক বিশিষ্টতায়, কবির সৃষ্টি একেবারেই ঘৃণ্য বলিয়া নির্ব্বাসিত হইতে পারে।

প্রাচীন কালের কবিতার এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যে এক সময়ে যাহা বড়ই আদৃত হইয়াছিল, তাহা এখন উপেক্ষিত হইতেছে; এক সময়ে যাহা উপেক্ষার সামগ্রী ছিল, এখন তাহা আদরের সামগ্রী হইয়াছে। এ অবস্থা দেখিয়া, হয়ত কেহ বা বলিতে পারেন, যে কাব্য-সৌন্দর্য্যের যখন কোন বাঁধা আদর্শ পাওয়া যাইতেছে না, তখন যে কবির চক্ষে যাহা সুন্দর, তিনি তাহাই করুন, এবং যাহার যাহা ভাল লাগে সে তাহাই পড়ুক। অর্থাৎ 'ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ' এই কথাটির দোহাই দিয়া সকল শ্রেণীর কাব্যই সমান অধিকারে বাঁচিয়া থাকুক। এই কথাটি ঠিক নহে। কাব্যে এমন সৌন্দর্য্য চিত্রিত হইতে পারে, যাহা কালের কোন পরিবর্ত্তনেই মলিন হইতে পারে না। কোন্ শ্রেণীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সকল সময়েই মনোহর হইতে পারে অর্থাৎ কাব্যে কি গুণ থাকিলে উহা সর্ব্বজনীয় ও সর্ব্বজনীন হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিতেছি।

স্বাভাবিক ভাবে যাহা আমাদের চক্ষে সুন্দর, তাহাকেও যে 'মোহন' হইতে হইলে ভাবের মোহে জড়াইয়া যাওয়া চাই তাহা বলিয়াছি। যে ভাবগুলি মোহ রচনা করিয়া জগৎকে নূতন সৌন্দর্য্যে ভূষিত করে, একটি নূতন ভাব-রাজ্যের সৃষ্টি করে, সেই ভাবগুলির মূলে একটা বড় রকমের স্থায়ী ভাব প্রতিষ্ঠিত আছে; এই মৌলিক ভাবটি আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা। আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই বলিয়াই স্বাস্থ্য চাই, আরাম চাই, তৃপ্তি চাই। যাহা আমাদের স্থিতির বিরোধী তাহা আমাদের কাম্য হয় না; যাহা কাম্য নহে তাহা হইতে মোহ বা আকর্ষণ জন্মে না। কোন মানুষই একাকী বাঁচিয়া থাকিতে পারে না; তাই আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা স্বার্থ এবং পরার্থপরতায় রচিত। যাহাদের শিক্ষা অল্প, যাহারা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, যাহাদের ভাবের প্রসার বাড়ে নাই, যাহারা যথার্থ স্বার্থ কি ধরিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহারা অনেক সময়ে এমন সৌন্দর্য্যের অনুধ্যান করে, অথবা জীবনের তৃপ্তিকর ও কল্যাণকর মনে করিয়া এমন সকল ভাবের মোহে পড়িয়া যায়, যাহা জীবন-ক্ষয়কর, ও সমাজ-ক্ষয়কর। ইন্দ্রিয়ের চপলতা যে মানুষকে ক্ষয়ের দিকে টানে, এবং সমাজকে ধ্বংস-প্রবণ করে, ইহা পূর্ণভাবে অনুভূত হইলেই সংযমের আদর বাড়ে, এবং চপলতা ঘৃণ্য বলিয়া মনে হয়। পাপ-পুণ্যের শাস্ত্রীয় দোহাই না দিয়া কেবল জীবন-বিজ্ঞানের চিরস্থায়ী অটল সত্যকে অবলম্বন করিয়াই বুঝিতে পারা যায়, যে 'রভস-লালসা' যমের সহচরী মাত্র। যে কাব্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের মনের ঐ লালসা বাড়াইতে পারে, তাহা অতি নীচ শ্রেণীর কবিতা। যাহা

Sensual বা নীচ-ভোগাত্মিকা, তাহা প্রাকৃতিক কোমল সৌন্দর্য্যে ভূষিতা হইলে তুদারিনী কবিতা হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণ পাঠক উহার সৌন্দর্য্যে ভুলিতে পারেন, কিন্তু যাহাদের যথার্থ দৃষ্টি আছে তাহারা দেখিতে পায়:—

বিবসনা বাসনার হাসি নাই মুখে,
নয়নেতে দীপ্তি নাই তৃপ্তি নাই বুকে।
অবশা লালসা সদা অনবগুণ্ঠিতা,
বাঁধিয়া গলায় ফাঁশ ধূলায় লুণ্ঠিতা।
মারা-পূজ্যা লজ্জাহীনা রহিয়াছে রতি,—
বিরু-পক্ষে নগ্ন-তনু কঙ্কাল মূরতি;
বীভৎস উৎসব-শব, টেনে ছিঁড়ে খায়,
গৃধিনী প্রেতিনীসম ক্ষুধার জ্বালায়।

যাহা যথার্থ সৌন্দর্য্য নয়, তাহা একসময়ে মনোহর হইলেও স্থায়ী হইতে পারে না। আপনার স্থিতির জন্য ও সমাজের স্থিতির জন্য উৎসাহ, উদ্যম ও পরিশ্রম চাই; আমাদের বিশ্রাম ও চিত্ত-বিনোদন, মনুষ্যত্ব-লাভের পরিশ্রমের সময়ে নূতন বলের জন্য প্রয়োজন। কোমল সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া কবি দেখাইয়া দেন:—"শুভ্র শুভ্র যুঁই দুটি, ঐ যে রয়েছে ফুটি, সেকি তব অতি শুভ্র ভালবাসা নয়?"—তখন জীবনে সরসতা অনুভব করি। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন কোমল সৌন্দর্য্যের মোহে যদি একেবারে মজিয়া যাইতে হয়, যদি কেবল সম্ভোগের সামগ্রী মনে করিয়া কোমল সৌন্দর্য্যকেই জড়াইয়া ধরিতে হয় তাহা হইলে অলস ও কর্ম্ম-বিমুখ হইয়া সুকোমল ভাব-রাজ্যেই পড়িয়া থাকিতে হয়। যাহাতে শরীরকে ক্ষয় করে, সেই নীচ আসক্তি না থাকিলেও, অমিশ্র রূপ-ভোগাত্মিকা সৃষ্টি (sensuous creation), উচ্চশ্রেণীর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি বা কবিতা নহে। উহা কবিতা বটে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর কবিতা; কাজেই উহাও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। সাধারণ লোকের কাছে উচ্চশ্রেণীর কবিতা অপেক্ষা এই শ্রেণীর কবিতা সর্ব্বদাই অধিক আদরণীয়।

যাঁহারা বলেন, যে কবিতার জন্যই কবিতা, artএর জন্যই art সাধনা, এবং যাহা (morality) শীল (১), তাহার সহিত কবিতার কোন সম্পর্ক নাই, তাঁহাদের চিন্তায় দার্শনিক জড়তা বড় অধিক। টাকার জন্যই যে টাকা নয়, তাহা আমরা অনেক কষ্টে বুঝিয়া থাকি কিন্তু পরনিরপেক্ষ হইয়া যে কিছু বাড়িতে পারে না, জীবনের প্রয়োজনে না লাগিলে যে ভাবরাজ্যের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য জন্মিতে পারে না তাহা দর্শন-শাস্ত্রের আশীর্ব্বাদে একেবারেই সুবোধ্য হয়

(১) Morality শব্দের ঠিক প্রতিশব্দ 'শীল'। পাঠকেরা St. Petersburg Dictionaryতে এবং অন্য ভাল কোষ-গ্রন্থে, শীল শব্দের ঐ প্রাচীন অর্থ পাইবেন; আমাদের ভাষার জননী বা মাতামহী পালিতে যে ঠিক ঐ অর্থ পাওয়া যায়, Childer's Dictionaryতে এবং D. Andersenএর সুলভ Pali glossaryতে পাইবেন। ধর্ম্ম বলিলে শীল ব্যতীতও অনেক অন্যান্য কথা বুঝায়, কিন্তু 'শীল' শব্দটি কেবল Morality বুঝায়। ৭ম শতাব্দীর ভর্ত্তৃহরির রচনাতেও স্ত্রীলোকের সতীত্ব প্রভৃতি গুণের কথায় লিখিত হইয়াছে, 'শীলং পরমভূষণং'; এখানেও ঠিক ঐ অর্থ। আমাদের 'কুলশীল' কথার ঐ ভাবই ছিল, তবে আমরা তাড়াতাড়ি Moralityর অনুবাদে 'নীতি' লিখিয়া বসিয়াছিলাম।

না। এদেশের এবং বিদেশের অনেক নামজাদা বড়লোক, এই ভ্রান্তির সমর্থন করিয়া থাকেন। গভীর প্রাণের টানে কোন কাজ করিতে গেলে সে কাজে প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিবার সময় থাকে না। এই প্রকার গভীর প্রাণের টান যথার্থই ভাল কাব্য-সৃষ্টির অনুকূল। বড় কবিরা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে মাথা না ঘামাইয়া ভাল কবিতা লিখিলেই ভাল হয়; তাঁহারা যেন অনধিকার-চর্চ্চা করিয়া মনোহর ভাষায় ভুল কথা প্রচার না করেন।

যাঁহাদের চিন্তা দার্শনিক ছাঁচে ঢালা, এইরূপ কয়েকজন নামজাদা ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, যে কাব্যের সহিত শীলের কোন সম্পর্ক নাই, একযুগে যাহা 'শীল' বলিয়া আদৃত, অন্য যুগে তাহা উপেক্ষিত; শীলের নামে এখন যে বিবাহ-প্রথা চলিয়াছে, উহা একটা সামাজিক কৃত্রিম কায়দা (convention); কৃত্রিম কায়দার বাঁধন ছিঁড়িয়া কাব্যকে স্বাধীন করাই কবির উদ্দেশ্য। স্বাধীনতার নামে একটা ফাঁকা আওয়াজ শুনিলেই যাঁহাদের মাথা ভোঁ ভোঁ করে, তাঁহারা এ-কথায় মাতিয়া উঠিতে পারেন; কিন্তু এ উক্তিগুলি বিচারের ভর সহিতে পারে না। এ-কথা সত্য, যে প্রাচীন কালের অনেক সামাজিক কায়দা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এবং নূতন কায়দা গড়িয়া উঠিতেছে; একযুগে যাহার প্রয়োজন ছিল অন্য যুগে তাহা গৃহের জঞ্জালমাত্র। এই অজুহাতে একেবারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কেহ গড়িতে পারে কিনা, বিশ্বে কিছু চিরস্থায়ী আছে কি না, তাহা একটু বুঝিয়া লইতে হয়। কোন শ্রেণীর নিয়ম বা বিধি, যদি আমাদের স্থিতির মূলসূত্র হইতে অভিন্ন হয়, অর্থাৎ যদি কোন বিধি বা নিয়ম আমাদের জীবনের অঙ্গ বা আমাদের 'স্ব' বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সেই 'স্ব'-এর অধীনতাই যথার্থ স্বাধীনতা হইবে, এবং উহার প্রত্যাখানে আত্মহত্যা সাধিত হইবে। জীবন-বিজ্ঞানের (Biology) তথ্য হইতে বুঝিতে পারি, যে প্রবৃত্তির তাড়নায় যে চপল হইয়া উঠে সে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়, এবং যাহার সংযম আছে সে-ই জীবনী-শক্তিকে বাড়াইতে পারে। জীবন এবং সমাজ রক্ষার প্রাকৃতিক গতিতেই সামাজিক কায়দা গড়িয়া উঠে এবং সংযম লাভ করিবার প্রবৃত্তিটির স্বাভাবিক গতি হইতেই অজ্ঞাতসারে বিবাহ-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। গাছে যেমন ফুল ফোটে, সমাজেও তেমনি নানা পদ্ধতি-অনুষ্ঠান ফুটিয়া উঠে। এক সময়ের প্রথা-পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া গিয়া নূতন প্রথা-পদ্ধতির জন্ম হয় বটে, কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি না বুঝিলে, ভাঙ্গার অর্থ বুঝিতে গোল হয়। মনে করুন, সোনা দিয়াই গহনা গড়াইতে হয় ও হইবে; এ-স্থলে যদি আমাদের সোনাটুকু একসময়ে 'নথ' রূপে গড়িয়া উঠে এবং অন্য যুগে পরিবর্ত্তিতরূপে মাথার 'টায়রা' হইয়া গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে গহনার রূপে ও কায়দার পরিবর্ত্তন ঘটে বটে কিন্তু মূল ধাতুটি পরিত্যক্ত হয় না। নিত্য নিত্য নূতন করিয়া সঙ্গিনী লাভের অধিকার থাকিলে যে প্রবৃত্তির চপলতা বাড়িয়া যায়, এবং ঐ চপলতার

ফলে যে আত্মশাসন-ক্ষমতা (inhibition) নষ্ট হইয়া মানুষকে কর্ম্মে অপটু করে, এই শারীরিক নিয়মটি কোন প্রকারের যুগের পরিবর্ত্তনেই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। যে প্রাকৃতিক নিয়মের সোনা, আমাদের স্থিতি বজায় রাখিবার জন্য বিবাহরূপ অলঙ্কারে দেখা দিয়াছে উহাই যদি অন্যবিধ অলঙ্কার-রূপে গড়িয়া উঠে, তাহা হইলেই চলিতে পারে; নহিলে সোনাটুকু ফেলিয়া শূন্য আঁচলে গ্রন্থি বাঁধিলে ফল হইবে না।

ধরিয়া লইলাম, যে William Morris এর Nowhere রাজ্য আসিয়াছে, পার্লেমেণ্ট গৃহটি গোবর বেচিবার আড্ডা হইয়াছে, এবং প্রাচীন বিবাহ-প্রথা আমরা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। তাহাতেও যে সংযমের আবশ্যকতা চলিয়া যায় নাই, প্রজাপতির মত ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়াইলে যে আত্মস্থিতি ও সমাজস্থিতি রক্ষিত হয় না, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। এ কালের সমাজেই হউক অথবা Nowhere রাজ্যেই হউক, যে ব্যক্তি নিজের তৃপ্তিসাধনের জন্য পরের সুখকে পায়ে দলিতে পারে, সে মানুষ কি রাক্ষস তাহার বিচারের প্রয়োজন নাই। কৃত্রিম নিয়মের ফলে হউক অথবা যে কারণেই হউক, একজোড়া পুরুষ ও স্ত্রী যদি পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়া এক সঙ্গে বাস করিয়া সুখে থাকে, তবে তাহাদের সেই সুখটুকু ভাঙ্গিবার প্রয়াসে কোন পক্ষেরই মনুষ্যত্ব বাড়িবে না। কোন স্বাধীনতার ধুয়াতেই নির্ম্মমতা ও নিষ্ঠুরতার পৈশাচিক মূর্ত্তিকে সুন্দর করিতে পারা যায় না।

কাব্যের সহিত শীলের সম্পর্ক নাই; আমরা কেবল নিঃস্বার্থ ভাবে সৌন্দর্য্যের অনুধ্যানই করিতেছি; এ সকল কথা কেহ কেহ মনকে চোখ ঠারিয়া বলিতে পারেন বটে, কিন্তু সে কথায় সকলে ভুলিবে না। মনকে সংযত করিলে সকলেই সুস্পষ্ট দেখিতে পারিবেন, যে সৌন্দর্য্য যেখানে শীলে অনুপ্রাণিত নহে, সেখানে তাহার দৃশ্য অতি কুৎসিত। যে শীলের মূল মনুষ্যের শরীরে প্রাকৃতিক ও চিরস্থায়ী, জীবন-বিজ্ঞানের তথ্যে যাহার মহিমার কথা জানিতে পারি, আমি সেই শীলের কথাই বলিতেছি। নবমীর লাউ, গ্রাম্যকুক্কুট ও যবনের অন্ন যেখানে সংযম, আর্জব ও সত্যনিষ্ঠার সহিত মিলিয়া একসঙ্গে শীল ও ও ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে সেদিকে কাহাকেও তাকাইতে বলিতেছি না। বহুযুগ ধরিয়া আমাদের সমাজের ঘর ঝাঁটাইয়া যত জঞ্জাল সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি আমাদের এক সময়ে অতি প্রয়োজনের সামগ্রীর ধ্বংস-শেষ হইলেও, সেগুলিকে ফেলিয়া দিতে হইবে। উহার বাধায় বিশুদ্ধ বাতাস লাভ করিতে না পারিয়া সাহিত্য চিরদিনই স্বাধীনতা খুঁজিয়াছে এবং খুঁজিবে। কিন্তু জঞ্জাল ফেলিবার অভ্যাসে হাতের কাছে যাহা কিছু পাইলেই জঞ্জাল বলিয়া ফেলিয়া দিবার কু-অভ্যাস যেন না জন্মে। কোন্‌টি জঞ্জাল এবং কোন্‌টি যথার্থই শীল, তাহা কোন প্রকার শাস্ত্রের বিচারে নির্ণীত হইবে না। এখন জীবন-বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়াই পাপ-পুণ্য বুঝিতে হইবে এবং উহার সাহায্যেই সমাজ-বিজ্ঞানের তথ্যে যাহা

যথার্থ শীল তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। যে সকল কথা ব্যবহার করিলে পরোক্ষ-ভাবেও শীলের সহিত বিরোধ ঘটে, অর্থাৎ অসৌন্দর্য্য সৃষ্ট কিংবা ধ্বনিত হয়, তাহাই অশ্লীল। কাব্যে এই অশ্লীলের স্থান নাই। কাব্য আমাদের জীবন ছাড়া কিছু নহে; জীবনের সকল অনুষ্ঠানই যখন শীলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই সুন্দর ও জীবনপ্রদ হইতে পারে, তখন কাব্য-সৌন্দর্য্যে অটল এবং চিরস্থায়ী ভিত্তি শীলের উপরই প্রতিষ্ঠিত করা চাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ভারতের অন্যান্য ধর্ম্ম

প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হইতে,—হিন্দুধর্ম্ম ছাড়া আরও কতকগুলি ধর্ম্ম সমুদ্ভূত হয়। আধুনিক যুগের কয়েক শতাব্দীর পূর্ব্বে যে-ধর্ম্মসম্প্রদায় সংস্থাপিত হয় এবং মধ্যযুগে যাহার প্রসার-প্রতিপত্তি খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল সেই জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো ১৫ লক্ষ ভক্তবৃন্দ পরিগণিত হইয়া থাকে। সচরাচর জৈনেরা হিন্দুদের সহিত বেশ সদ্ভাবেই একত্র বাস করে। উহারাও কতকগুলি জাত গড়িয়া তুলিয়াছে, এবং পৌরোহিত্যের জন্য প্রায়ই উহারা ব্রাহ্মণ-দিগের শরণাপন্ন হইয়া থাকে; গুজরাটের জাতগুলি বাণিজ্য-ব্যবসায়ে, এবং দাক্ষিণাত্যের জাতগুলি কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত। সমস্ত বড় বড় সহরে জৈনেরা প্রায়ই কুঠিওয়ালার কাজে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। যে সন্ন্যাস-প্রবণতা জৈনদিগকে বৌদ্ধদের দারুণ শত্রুরূপে পরিণত করিয়াছিল, এখন জৈন ভক্তদের মধ্যে সেই সন্ন্যাস-প্রবণতা আদৌ লক্ষিত হয় না। কিন্তু জৈন-ভিক্ষুরা একেবারে বিবস্ত্র হইয়া একত্র আহার করিতে বসে। পাছে কোন জীবের প্রাণ-হানি হয় এই ভয়ে উহারা কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিয়া রাখে এবং যে ভূমি মাড়াইয়া চলিতে হইবে, সেই ভূমিটাকে ঝাড়ু দিয়া ঝাঁট্ দেয়। (১)

* * *

জৈনধর্ম্মের সমসাময়িক ও তদপেক্ষা প্রবল বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে অন্তর্হিত

(১) জৈনেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত:—যতী ও শ্রাবক। শ্রাবকদিগের ব্যয়ে স্থাপিত মঠগৃহে যতীরা বাস করে। কিন্তু উহারা এখন আর ভিক্ষা করে না এবং উহাদের মঠের নিয়ম-ব্যবস্থা কঠোর নহে। এখন ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ও আর নাই। জৈনদের দুই দল:—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। দিগম্বর দলটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, কিন্তু শ্বেতবস্ত্রধারী শ্বেতাম্বরেরাই বেশী প্রভাবশালী।

হইয়াছে। উহার অস্তিত্ব রক্ষিত হইয়াছে কেবল হিমালয়ের উপত্যকাভূমিতে—বিশেষ নেপালে। কিন্তু উহার আকারটায় একটু খিচুরী পাকাইয়া গিয়াছে; উহার মধ্যে লামা-ধর্ম্মের ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কতকগুলি অন্ধবিশ্বাস একত্র মিশিয়াছে। ব্রহ্মদেশজয়ের ফলে, ভারত-সাম্রাজ্য, ৯০ লক্ষ প্রকৃত বৌদ্ধপ্রজা লাভ করিয়াছেন। বর্ম্মীরা "হীন-যান" পন্থাবলম্বী। উহাদের মধ্যে ভিক্ষু ও সাধারণ ভক্ত—দুই দলই আছে। ভিক্ষুরা, গৌতমের শিক্ষার বিশুদ্ধ আদর্শ রক্ষা করিয়াছে। সাধারণ লোকে নৈসর্গিক দেবতাদিগকে আরাধনা করিয়া থাকে। কিন্তু এই নৈসর্গিক দেবতাদের সহিত উহারা কতকগুলি বিশুদ্ধতর বিশ্বাসও যোগ করিয়া দিয়াছে। কেননা, যুবকেরা কোন এক মঠে অন্তত এক বৎসর কাল শিক্ষানবীশী করিতে বাধ্য—;উহারা সেখানে সাধারণ শিক্ষাও লাভ করে, ধর্ম্ম-শিক্ষাও লাভ করে। শিক্ষাবিস্তার-পক্ষে ভিক্ষুরা বিস্তর সাহায্য করিয়াছে। পর-মত-সহিষ্ণু বৌদ্ধধর্ম্ম য়ুরোপীয় সভ্যতার বিস্তার-পথে কোন প্রতিবন্ধক স্থাপন করে না; কিন্তু সমস্ত বাসনার প্রতি, সমস্ত চেষ্টার প্রতি অবজ্ঞা-দৃষ্টি থাকায় বর্ম্মীরা কাজকর্ম্মে উদাসী ও অলস হইয়া পড়িয়াছে। (২)

* * *

হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মপ্রসূত অন্যান্য ধর্ম্মমতের সহিত, ভারত আর-দুইটি বিদেশীধর্ম্মকেও নিজবক্ষে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। মনস্তত্ত্বঘটিত মতামত ও ধর্ম্ম-নৈতিক মতামতের পুষ্টিসাধনের উপর ঐ দুই ধর্ম্ম বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল: এক জোরোয়াস্তার ধর্ম্ম—আর এক ইসলাম ধর্ম্ম। একথা সত্য, জোরোয়াস্তার ধর্ম্মের ভক্ত-সংখ্যা (১৯০১ অব্দে ৯৪,১৯০) খুবই কম। ইহারা ভারতে আশ্রয়-লব্ধ পারসীক-দিগের বংশধর। জোরোয়াস্তার ধর্ম্মই ইহাদের জাতীয়ধর্ম্ম। অন্যজাতীয় লোক এ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারে না।

যদিও আজকাল পার্সিরা গুজরাটী ভাষা ব্যবহার করে, কিন্তু উহাদের প্রার্থনা মন্ত্রাদি জেন্দভাষাতেই পঠিত হয়। পার্সি পুরোহিত-শ্রেণী দুইভাগে বিভক্ত:—এক "দস্তুর" (প্রধানাচার্য্য); আর এক, "মোবেদ" (উপাচার্য্য)। উহাদের প্রাচীন শাস্ত্রমতের বিরুদ্ধে, পুরোহিত-বৃত্তি এক্ষণে বংশানুক্রমিক হইয়া পড়িয়াছে। এই কথা লইয়া গৃহস্থ-শ্রেণী ("বেহদিন") ও পুরোহিত-শ্রেণীর ("অন্দিয়ারু") মধ্যে কতবার গুরুতর বিবাদ বাধিয়াছে।

যেখানে বিধর্ম্মীর প্রবেশ নিষিদ্ধ সেই-সব মন্দিরে ধূপ ও চন্দন-কাঠিতে পূর্ণ একটা রজত ধূপাধারে পূণ্যাগ্নি রক্ষিত হইয়া থাকে: অগ্নিই "অমর্জ্দের" প্রতিমূর্ত্তি। বিশুদ্ধ চিন্তা, বিশুদ্ধ বাক্য, বিশুদ্ধ কর্ম্ম—এই মহৎ গুণত্রয়ের সাংকেতিক বিগ্রহস্বরূপ এই অগ্নি। (৩)

(২) ১৮৯১ অব্দে আদম-সুমারের গণনায় ব্রহ্মদেশে ১৫,৩৭১ মঠ ছিল। ব্রহ্ম-মঠের ভিক্ষুগণ "ফুঙ্গী" বলিয়া অভিহিত হয়। য়ুরোপীয়েরা সচরাচর উহাদিগকে ইতর ভাষায় "তালাফোয়া" বলে।

(৩) পার্সিদের ৩০ দিনের নাম যথা:—হর্মজদ, বামন, আর্দিবেহেস্ত, শূরভের, অস্পুন্দাদ, খোর্দ্দাদ,

শিক্ষিত পার্সিরা য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রভাবের বশবর্ত্তী, অশিক্ষিত পার্সিরা হিন্দু অন্ধবিশ্বাস ও উপধর্ম্মের বশবর্ত্তী; কিন্তু সকলেই গার্হস্থ্যজীবনের প্রাচীন অনুষ্ঠানাদি বজায় রাখিয়াছে।' ৭ ও ৯ বৎসরের মধ্যে পার্সি বালকের উপনয়ন-সংস্কার হয়। নগ্ন বালককে একটা প্রস্তর-আসনের উপর বসান হয়, একজন পুরোহিত তার মাথায় জল ছিটাইয়া দেয়। তাহার পর, মুক্ত আকাশের তলে, আর-একটি প্রস্তর-আসনে বসিয়া ঐ বালক দুইটি ডালিমের পাতা ভক্ষণ করে, একটা সাদা ষাঁড়ের গোমূত্র পান করে (ধার্ম্মিক পার্সিরা প্রতিদিন প্রাতে গোমূত্র দিয়া গা ধোয় এবং উহার কয়েক ফোঁটা গাত্রে শোষণ করিয়া লয়)। মন্দির-সংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠে, নবদীক্ষিত বালক একটি নূতন কামিজ পরিধান ও একটি যজ্ঞোপবীত কটিদেশে ধারণ করে ("সদ্‌রা" ও "কুস্তি")।

উহাদের অন্ত্যেষ্টির ক্রিয়াকলাপও কম অদ্ভুত নহে! পার্সিরা শবকে অশুদ্ধ বিবেচনা করে; পবিত্র পঞ্চভূতকে পার্সিরা শব-স্পর্শে কলুষিত না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে শবকে শকুনী গৃধিনীর কবলে সমর্পণ করে। উত্তরাভিমুখে, "ব্যাক্-বে" পরিবেষ্টিত মালাবর-গিরির উপর পাঁচটি "নিস্তব্ধতার স্তম্ভ" সমুত্থিত হইয়াছে। জমকাল দৃশ্য! ঘাটগিরি-শ্রেণীর পশ্চাদ্‌ভাগে,—উহার কঠিন পঞ্জর-অস্থিবিশিষ্ট অপূর্ব্ব বিচিত্রাকৃতি শৈল-দুর্গ-প্রাসাদগুলি—অস্তমান সূর্য্যরশ্মির কিরণে প্রথমে স্বর্ণাভ, তাহার পর গোলাপী, তাহার পর বেগ্‌নী আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠে। আরও নিকটে দেখা যায়—"ত্রয়ে" ও "এলেফাণ্টার" পাহাড়গুলি (ততটা সহসা খাড়া হইয়া উঠে নাই) "সাল্‌সেটে"র বৃহৎ দ্বীপ, "বোম্বায়ে"র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দ্বীপ—যাহা সমুদ্রের মধ্যে অগ্রসর হইয়াছে। "ব্যাক্-বে-র" বিপরীত তটে, "সিয়ন", "সিউরী", মাজগাঁও বন্দরস্থ জাহাজাদির মাস্তুল; "ব্যাক্-বে"-র তটে, বৃক্ষপুঞ্জের দ্বারা কতকটা প্রচ্ছন্ন বোম্বাইনগর; দ্বীপের শেষপ্রান্তে, রোমীয় ও গথিক-ধরনের কীর্ত্তিমন্দিরাদি-সমেত, ক্যাথিড্রাল-গির্জ্জা, গভর্ণমেণ্ট-প্রাসাদ, আর-একটি গির্জ্জা ও দীপ-মন্দির। নগরের এক অংশ হইতে অপরাংশে,—যেখানে ছায়া ও আলোক পরস্পরকে খণ্ডিত করিয়াছে—দুই উপসাগরের জল-আস্তরণ সমুদ্ভাসিত! "বাক্-বে"-র চতুর্দ্দিকে তালীবন—তাহার

অমেরদাদ, দেপাদুর, অদুর, অভ, খোর্শেদ, ক্ষর, তির, দেপ্‌মেতুর, মেহের, সেরশ, রশ্‌সে, ফুরবুর্দ্দিন, বেহরাম, রাম, গুবদ্, দেপ্‌দিন, দিন্, অশাশং, অস্তাদ, আসমান, জেমিয়াদ্, মহরেশ্‌সন্দ, অনিরন্। মাসের নাম যথা:—মেহের, অবন, অদ্দর, দেহ; বেহমান, অস্পেন্দাদ্‌মদ্।

পার্সিদের সব-চেয়ে বড় উৎসব-পর্ব্ব—নব-বর্ষের দিন ("পপ্পটি") "শশনিদ্" বংশের শেষ-রাজা "ইয়েস্‌দের্জেদ্"-এর সময় হইতে পার্সি যুগের আরম্ভ ৩৬৫ দিনে বৎসর হয়। অন্যান্য উৎসব, যথা:—"খের্দ্দাদ্‌শার"; (জোরোয়াস্তারের জন্মবাসর); "ফুরোহুর্দ্দিন সসন" (মৃতদিগের সম্মানার্থ); "নওরোজ" (মহাবিষুব সংক্রান্তি) "তাদব যসন" (অগ্নি-উৎসব) ইত্যাদি।

পার্সিদের দুই সম্প্রদায়:—"কুদ্‌মী" ও "শেনসোই"। "শেন্‌শোই"দের সংখ্যাই বেশী।

ধ্য হইতে উদ্যান-বাটিকা-সমূহের সাদা গুলা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। ম্যালাবার গিরির চূড়াদেশে একটি গ্রীষ্মমণ্ডল-সুলভ উদ্যান: তালজাতীয় বৃক্ষকুঞ্জ; সাইপ্রেস্ গাছ, কুসুমিত গুল্মরাজি। যে সময় অস্তমান সূর্য্যকিরণে বোম্বায়ের কীর্ত্তি-মন্দির-গুলি, অদ্ভুত-বিচিত্র-আকৃতি ঘাটগিরিশ্রেণী, প্রথমে স্বর্ণাভ পরে রক্তিমাভ হইয়া উঠে, তখন কতকগুলি সাদা মূর্ত্তি সারিবন্দী হইয়া, বৃক্ষপুঞ্জের তলদেশ-দিয়া বিসর্পিত একটা রাস্তা দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে উক্ত উদ্যানের দ্বার পার হইয়া যাইতেছে দেখা যায়। সকলেই লম্বা আচ্‌কান পরিহিত, সকলেরই মাথায় সাদা ধুচ্‌নী-টুপী। প্রথমে একটা বস্ত্রখণ্ডে ঢাকা রুটি-হস্তে একজন লোক। তাহার পর, চারি-জন বাহকযুক্ত একটি খাটিয়া। খাটিয়ার উপর নগ্ন শব-দেহ একটা চাদর দিয়া আচ্ছাদিত; উহাদের পশ্চাতে দুইজন শ্মশ্রুধারী লোক ("নস সালার"); কেবল উহারাই শব-দেহ স্পর্শ করিতে পারে। কয়েক কদম পরে পুরোহিতের দল। আরও দূরে, আত্মীয়-স্বজনেরা দুইজন দুইজন করিয়া, একটা রুমালের খুঁট ধরিয়া আছে। এই উদ্যানের মধ্যখানে আসিয়া শোক-যাত্রার দল বিভক্ত হইয়া পড়িল; পুরোহিত ও ভক্তবৃন্দ অগ্নির ("সাগ্রী") মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিতে লাগিল; "নস-সালারেরা" একটা স্তম্ভ-মন্দিরের নিকটে আসিল; ইহা একটি গ্রেনিট্-পাথরের বড় ইমারৎ। অভ্যন্তরটা একটা বৃত্তাকার রঙ্গভূমির মত; একটা কূপ; তিন-সারি মঞ্চ; মঞ্চের গায়ে কসি-রেখাশায়ী কুলঙ্গী। এই দেখ—কতকগুলি শকুনি গৃধিনী স্থূল পক্ষ-সঞ্চালনে চারিদিক হইতে উড়িয়া আসিয়া প্রাচীরের উপর বসিল। "নস-সালারেরা" নিম্নদ্বার দিয়া প্রবেশপূর্ব্বক শব-দেহ একটা কুলঙ্গীতে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিল। দুইটা, তিনটা, দশটা শকুনী প্রাচীর হইতে নামিয়া শব-দেহ ভক্ষণ করিতে লাগিল। উহারা নিজ-অংশের মাংস-টুকরা ছিঁড়িয়া লইয়া, অপরের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিল। কোন-প্রকার ত্বরা নাই, যুঝাযুঝি নাই। আহারান্তে প্রত্যেকেই ধীরভাবে আসিয়া বসে; গায়ের পালকে ঠোঁট পুঁছিয়া, ন্যাড়া মাথাটা ডানায় ঢাকিয়া, বেশ আরামে নিদ্রা যায়। সোয়া ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যেই, শব-দেহের কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। বাকী হাড়গুলা সূর্য্যদেবের কবলে যায়। তিন সপ্তাহের মধ্যে "নস-সালার"গণ শবের দেহাবশেষ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে। পুরোহিত ও আত্মীয়গণ শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া—যেখানে ধনী-দরিদ্র উভয়ই মৃত্যুর সমদৃষ্টি উপলব্ধি করে সেই শব-মন্দির হইতে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল,—এদিকে, নীল সমুদ্রের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াও সূর্য্যদেব আরও কতকগুলা লম্বা লম্বা রশ্মিবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই রশ্মি-পাতে নগরের কাচগুলা, কুঝটিকা-বিলীন ঘাট-গিরিশ্রেণীর বিক্ষুব্ধ শৈলখণ্ডগুলা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুরাতন কথা

ভারতীর সহিত আমার পরিচয়, সে ত আজিকার কথা নয়, সে যে বহুদিনের কথা—প্রায় ২৬ বৎসর।

ভারতীর অনেক পাতায় আমার হাতের ছাপ আছে—আমার হৃদয়ের অনেক ভাব সেখানে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ভারতী-সম্পাদিকার স্নেহ-সলিলে সিঞ্চিত হইয়া তবে সেই ভাবের মুকুল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহার স্নেহঋণে আমি চিরঋণী। আজ সেই পুরানো কথার আলোচনাতেও মনে আনন্দ জাগিয়া উঠিতেছে। এখন আর জীবনে-সে চপলতা নাই, সে আশা, উদ্যম, উৎসাহ নাই, সবই এখন স্থির, ধীর। তবুও সেই অতীতের কথা স্মরণ করিতে এখনো প্রাণে যেন সেই উৎসাহ ফিরিয়া আসে।

ভারতী-সম্পাদিকার সহিত আমার প্রথম দেখা সেই প্রথম সখি-সমিতির শিল্প-মেলায়। তখন আমাদের বাড়িতে বিবাহের পর মেয়েদের বাহিরে যাইবার অনুমতি ছিল না। আমি বাল্যকালে বেথুনস্কুলে পড়িয়াছিলাম, সেইজন্য বেথুনস্কুলে শিল্প-মেলা হইবে শুনিয়া জিদ ধরিয়া বসিলাম, আমিও যাইব। আমার তখন বিবাহ হইয়াছে, কাজেই হুকুম পাইলাম না; কত দিন ধরিয়া সাধ্য-সাধনা চলিতে লাগিল। আমার মায়ের কোনো আপত্তি ছিল না; তিনি শিক্ষিতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মতে কোন কার্য্যই হইত না। শেষে মুন্নি-দার (খুল্লতাত-পুত্র সিভিলিয়ান মাননীয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত) চেষ্টায় আমরা শিল্প-মেলায় যাইতে পাইয়াছিলাম। সেজন্য উপর-ওয়ালাদের কত খোসামোদই না করিতে হইয়াছে!—কত আশা-নৈরাশ্যের তুফান বহিয়া গিয়াছে। শৈশবের সেই পাঠগৃহে প্রবেশ করিয়া আমার যে কি আনন্দ হইল তাহা বলিতে পারি না। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই প্রবেশপথে মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে দেখিলাম, তিনি সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। বেথুনে পড়িতাম বলিয়া শ্রীমতী সরলা দেবীর সহিত পরিচয় ছিল;—কবি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভগিনী বলিয়া আমাকে তাঁহারা সকলেই জানিতেন। সেই সময়ে আবার আমার প্রথম কবিতাটি ভারতীতে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। শ্রীমতী সরলা দেবী তাঁহার মায়ের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন, আমার সেই কবিতাটির কথাও উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না। এখনো বেশ মনে পড়ে, আমায় দেখিয়া সেদিন মাননীয়া ভারতী-সম্পাদিকা কিরূপ স্নেহের হাসি হাসিয়াছিলেন। সেদিন যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, ইহজীবনে ভুলিব না। সেই মায়ার খেলা নাট্য-অভিনয় এখনো যেন স্বপ্নের মত চোখে ভাসিতেছে। তখন ঠাকুর-বাড়ীর কাহারও সহিত পরিচয় ছিল না। কাজেই কে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করিবেন, তাহা জানিতে ভারি ব্যস্ত হইয়াছিলাম। আমার জীবনের প্রিয় বন্ধু

শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীও এই অভিনয়ের মধ্যে ছিলেন। অবশ্য তখন তাঁহাকে জানিতাম না; পরে তাঁহার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। সেই মায়া-কুমারীগণের গান এখনো যেন কানে লাগিয়া আছে। শ্রীমতী প্রতিভা দেবী, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী সকলেই অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী শান্তা ও শ্রীমতী অভিজ্ঞা দেবী প্রমদা সাজিয়া তাঁহাদের সেই সুমিষ্ট কণ্ঠের গীত-ধারায় সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। সেরূপ সুন্দর অভিনয় আর যে কখনো দেখিয়াছি, এমন মনে হয় না। এখনো যেন সেই-সব দৃশ্য বিচিত্র চিত্রপটের মত মানসপটে চিত্রিত রহিয়াছে। মায়ার খেলা নাট্য-অভিনয়ের পর আমি গৃহে ফিরিবার পথে সোপান-শ্রেণীর নিকট দাঁড়াইয়া ছিলাম; ভারতী-সম্পাদিকা আমায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিলে, বেশ ভাল লাগিল?"

আমি এমন আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম! তিনি আমার সহিত কথা কহিলেন! তিনি ভারতীর সম্পাদিকা, কত তাঁর নাম, কত বড় তিনি! আর আমি সামান্য বালিকা; আমার সহিত তাঁর আলাপের ইচ্ছা দেখিয়া আমি ত একেবারে অবাক! এই বিস্ময় ও তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের গর্ব্বের আনন্দ লইয়া সেদিন গৃহে ফিরিলাম।

আমাদের বাড়ীতে তখন চারিদিকে কবিতার উচ্ছ্বাস। সেই আবহাওয়ায় নব-প্রভাতের কাকলীর মত আমার হৃদয় হইতেও কবিতার অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠিয়াছে; তারই উৎসাহে জীবন তখন চঞ্চল। যিনি লেখার সাধনা করিয়াছেন তিনিই জানেন যে এই প্রথম উচ্ছ্বাস জীবনে কি-প্রকার চঞ্চলতা আনিয়া দেয়;—সে কত আশা, কত উৎসাহ! কিছু হোক আর নাই হোক, সেই আকাশ-কুসুমের স্বপ্নেই সময় কাটিয়া যায়। তখন আমাদের মেজদাদা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের স্বপ্নসঙ্গীত থামিয়া গিয়া উপন্যাস আরম্ভ হইয়াছে। মাননীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয়ের প্রভাত-সঙ্গীত, সন্ধ্যা-সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস আমাদের বাটীতে যেমন বহিয়াছিল এমন বোধ হয় কোথাও নয়। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতা আমাকে যতবার আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছে বোধ হয় খুব কম লোকেই তত করিয়াছে। এই সেদিন আমার স্কুলের একটি মেয়েকে একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে শিখাইতেছিলাম—"এত বড় এ ধরণী মহাসিন্ধু-ঘেরা দুলিতেছে আকাশ-সাগরে।" আমার এখনো সমস্ত কবিতাটি কণ্ঠস্থ দেখিয়া মেয়েটি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। তখন প্রভাত-সঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত, রাজা ও রাণী এবং কড়ি ও কোমল আমার আগাগোড়া কণ্ঠস্থ ছিল। বাল্যকালে আবৃত্তি করিবার ক্ষমতা ছিল বলিয়া, যখন শৈশবে বেথুন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িতাম, (আমার ঐ অবধি স্কুলের বিদ্যা) তখন উপর-ক্লাসের মেয়েরা আমায় কাছে ডাকিয়া কবিতা শুনিতেন। সেই উপলক্ষে শ্রীমতী সরলা দেবীর (তিনি প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন) সহিত পরিচয় হইয়াছিল।

* * *

১২৯৬ সালের বৈশাখ-সংখ্যা ভারতী

যেদিন আমার হাতে আসিল, সেদিন আমার কি আনন্দ! আমার সেই ছেঁড়া খাতায় লেখা কবিতা ছাপার হরফে বাহির হইয়াছে —এ আনন্দ রখিবার ঠাঁই নাই। মুন্নিদার সেদিনকার উৎসাহের কথা এখনো মনে হয়; তিনিই জোর করিয়া কবিতাটি ভারতীতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই আমি লেখিকা বলিয়া পরিচিত হইলাম।

কয়েকদিন পরে হঠাৎ একদিন ষ্টার-থিয়েটারে ভারতী-সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে প্রথম দিন দেখিয়াই, মনে মনে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তখন আমরা যে ভাবে থাকিতাম তাহাতে আমাদের নিজ-সমাজভুক্ত কয়েকটি পরিবার ব্যতীত অন্যত্র যাইবার কোনও সুযোগ ছিল না। সেইজন্য তাঁহার সহিত দেখাশুনা হইত না। সহসা সেদিন তাঁহাকে নিকটে পাইয়া আমার ভারি আনন্দ হইল। লোহ ও চুম্বকের আকর্ষণ-শক্তি মনুষ্যের মধ্যেও আছে। নতুবা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা কেন এমন প্রবল হয়? সেদিন অভিনয়ের বিশেষ কিছুই দেখা হইল না; নানাপ্রকার গল্পগুজবে সময় কাটিয়া গেল।

একবৎসর পরে আমার আবাল্য বন্ধু শ্রীমতী হেমলতা দেবীর পিত্রালয়ে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে আমরা আবার মিলিত হইয়াছিলাম। তখন তাঁহার স্নেহলতা উপন্যাস ধারাবাহিকরূপে ভারতীতে বাহির হইতেছে। উপন্যাসের শেষটা কি হইবে তার আলোচনা হইল। তিনি বলিলেন— "শেষটা এখন বলিবনা; দেখে নিজে বোলো কেমন হয়েছে।" সেদিন সেখানে তিনি নিজের রচিত দুইটি গান গাহিয়াছিলেন। তাঁহার গান যিনিই শুনিয়াছেন তিনিই জানেন তাঁহার গাহিবার ক্ষমতা সামান্য নহে।

ইহার পর আমরা বাঁকিপুরে চলিয়া যাই, সে সময় তাঁহার নিকট হইতে প্রায়ই পত্র পাইতাম। এই পত্র-ব্যবহারে আমাদের সম্বন্ধ ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল। এই পত্রের ভিতর কত মনের কথা, কত উপদেশ আশ্বাস, কত সান্ত্বনা সমবেদনা, কত সাহিত্য-আলোচনা থাকিত! সব উদ্ধৃত করা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়,—কাজেই দুই-চারি-খানির একটু-আধটু অংশ প্রকাশ করিলাম। একবার তিনি লিখিয়াছিলেন:—

"আমায় কবিতা লিখতে বলেছ, আমার কি আর সেদিন আছে; এখন গলাভাঙ্গা— কখনো কখনো কষ্টে এক-আধটা বার হয় বইতো নয়—

"আমি নীরব বীণা
অতি দীনা
ভাঙ্গা হৃদয়খানি, ;
আমার ছেঁড়া তার,
নাহি আর
মধুর বাণী।
প্রাণের কথা যত
আগে—গেয়েছি ত
সকলি,
মনে নাহি যার
এখন—তারে আর
কি বলি?

গান গাহে যারা
গাক্ তারা
জানাক ব্যথা,
আমার নাহি ভাষা
নাহি আশা
শুধু আকুলতা।
সবাই বোঝে হেথা
বলা কথা
কে বোঝে নীরব প্রাণে
কেহ কি বুঝিবেনা, একো জনা?
কে জানে?

* * *

"আমরা ইতিমধ্যে পুনা বেড়িয়ে এসেছি। পুনা আমার বড় ভাল লাগে। পুনার বাঁধের বাগানের মত সুন্দর জায়গা খুব কম দেখেছি। বাঁধ ডিঙ্গিয়ে প্রকাণ্ড জলোচ্ছ্বাস কল কল তানে নীচে পড়ছে। শতধারায় তরঙ্গভঙ্গে পাষাণ-বক্ষ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে যাচ্ছে। একপাশে পাহাড় আকাশের গায় উঁচু হয়ে রয়েছে। সম্মুখে বাগান, নানাবৃক্ষ নানারকমে সুশোভিত, মধ্যে ফোয়ারা খেলছে। সুন্দর সুন্দর পার্সি ছেলে-মেয়েরা চারিদিকে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। গাছের ভিতর দিয়ে দিয়ে সুনীল আকাশ দেখা যাচ্ছে—বড়ই সুন্দর। পুনায় আমরা একদিন রমাবাইয়ের সঙ্গে কাটিয়েছি। রমাবাই আমার অনেকদিনের বন্ধু—মানে এবারের শুধু আলাপী নন।

* * *

"তোমার শেষ চিঠি পেয়ে যে কি কষ্ট হল, বলতে পারিনে। আহা, তোমার কোলের ছেলে তোমার কাছ থেকে চলে গেল। তোমার সেই বুকফাটা কষ্ট আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমারো একটি ৬ বছরের মেয়ে মারা গিয়েছিল, সে আজ ১২ বছর, তবু যখন মনে পড়ে কি ভয়ানক কষ্ট হয়। তোমার এই প্রথম সন্তান, আর এমন সুস্থ, কখনো ওরূপ মনেও হয়নি, হঠাৎ কি হোল? যাহোক সবি তাঁরি হাত, জীবন মৃত্যু আমরা কি কাউকে দিতে পারি? আমাদের কেবল মনের ভ্রান্তি। ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে নিয়েছেন তিনি তোমায় সান্ত্বনা দিন, এই কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি।"

* * *

কয়েকবৎসর পরে আমি কলিকাতায় যাই। সে সময় ভারতী-সম্পাদিকা কাশিয়া-বাগানের বাগান-বাটীতে থাকিতেন। তিনি সংবাদ পাইয়া আমায় লইয়া যাইবার জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আমি সেবার প্রায় মাসখানেক কলিকাতায় ছিলাম। সপ্তাহে দুই-তিন বার তাঁহার সহিত দেখা হইত। দুপুরে গিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে থাকিতাম, অনেক উপদ্রব করিতাম, বড়বোনের মত তিনি আমার সব উপদ্রবই সহ্য করিতেন। তাঁর সেই ছাদটিতে বিকালে বসিয়া কত গল্প করিতাম, কত আবলতাবল বকিতাম। তারপর আমার 'হাসি ও অশ্রু' বই বাহির করিবার সময় তিনি আমায় সকল রকমে সাহায্য করিয়াছেন। আমি মোটেই প্রুফ দেখিতে জানিতাম না, তিনি নিজেই সব করিয়াছেন।

আবার আমাদের ছাড়াছাড়ি। কলিকাতায় গেলে কালেভদ্রে কখনো দেখা হয়। নইলে

চিঠিতে আলাপ চলে। এই সময় তিনি দার্জ্জিলিং থেকে একবার লিখিয়াছিলেন—

"আজ সকাল থেকে ঝমাঝম বৃষ্টি হচ্ছে, এ সময় একেলা কি-রকম লাগে। তুমি যদি এখানে থাকতে ত নাজানি তোমার কিরূপ ভাব হত। ভাবতে ভাবতে একটা গান লিখলুম, দেখো-দেখি মনের মত হয়েছে কিনা—

"এমন বারি ঝরে এমন থরে থরে
আকাশ ঘনঘোরে ছেয়েছে,
এমন বরষায়, সে মোর আজি হায়
কোথায় কোন্ দূরে রয়েছে।
নিঝর সচকিত মিলন জাগরিত
চমকি উথলিত পুলকে,
চাতক তৃষা ভরি অমিয়া পান করি
ভ্রমিছে ঘুরি ঘুরি ত্যালোকে।
বনানী নুয়ে নুয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে
গাহিছে প্রাণ খুলে প্রেমগান,
ফুলের রূপরাশি উঠে হাসি
শুভ্র হিম-নীরে করি স্নান।
এ হেন বরষায় কাহার ভরসায়
দিবস যাপি,
কাহার কথা শুনে, কাহার প্রেমাগুনে
হৃদয় তাপি।
কাহার আঁখি-তারা মাতোয়ারা
করে এ প্রাণ মোর,
কাহার সুধা চুমে এক ঘুমে
জীবন করি ভোর।
কাহার প্রাণে গিয়ে লুকাইয়ে
জুড়াই সব ব্যথা,
এমন ঘন ঘটা এমন বারি-ছটা
ওগো সকলি বৃথা।"

* * *

এই রকম করিয়া চিঠিতে তিনি কত যে কবিতা, গান আমাকে পাঠাইতেন—আর আমার আনন্দ ধরিত না।

তাঁর পারিবারিক জীবনের সহিত আমি বিশেষভাবে পরিচিত। যখনই দেখিয়াছি, তাঁহাকে সর্ব্বসুখে-সুখী বলিয়াই মনে হইয়াছে। কোনও রমণীই স্বামীর ভালবাসা ভিন্ন অমন সুখী হইতে পারেন না। তাঁর প্রতি তাঁর স্বামীর ব্যবহার দেখিবার জিনিস ছিল বটে;—মনে হইত যেন পূজা করিতেছেন। একবার ভারতী-সম্পাদিকার অসুখের সময় গিয়াছিলাম, সেই সময় তাঁর স্বামীর সেবা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলাম। যে স্বামী তাঁর জীবনের সকল উন্নতির মূল, যাঁর চেষ্টায় যত্নে তিনি বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়া জীবনে এমন যশস্বিনী হইয়াছেন, সেই স্বামী হারাইয়া তাঁহার জীবন যে শূন্য হইয়া গিয়াছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বামী-বিয়োগের পর তিনি আমায় লিখিয়াছিলেন:—

"তোমার চিঠিখানি পড়ে চোখের জল আর থামতে চায় না। কতদিন ধরে মনে করছি উত্তর দেব, পারিনি। সত্যি এমন স্বামী পাওয়া বহু পুণ্যের ফল; চিরদিন আমার সুখ কিসে হবে তাই দেখেছেন, মৃত্যুর সময়ও আমার কথা ভাবতে ভাবতেই গেছেন, ছেলে-মেয়ে আর কাউকে চাননি। এমন স্বামীকে কি-করে ভুলবো। তবুওত তাঁকে ছেড়ে বেঁচে আছি,—আশ্চর্য্য বলেই মনে হয়!"

* * *

স্বামী-বিয়োগের পর তিনি যথার্থই পৃথিবীর সব কাজ থেকে বিদায় লইয়া একেবারে একাকিনী শূন্য-হৃদয়ে সেই অনন্তের পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন, তাঁর মুখের ভাব দেখিলে যেন তাই মনে হয়।

তাঁহার মস্ত গুণপণা—তাঁহার কন্যাদের জীবন এমন উজ্জ্বল করিয়া তোলা। তাঁহারই চেষ্টার ফলে আজ শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী স্ত্রী-জাতির উন্নতিকল্পে কত পরিশ্রম ও কত চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীমতী সরলা দেবীর ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার করিয়া বঙ্গনারীকে কত উপকৃত করিতেছে, তাহা ক্রমশঃই সকলে বুঝিবেন। শ্রীমতী সরলা দেবী যে এই কার্য্যে অমূল্য সহায়-রূপে শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসকে পাইয়াছেন তাহাও বঙ্গনারীর সৌভাগ্যের বিষয়। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর 'বিধবাশ্রম' তাঁহারই অশ্রান্ত পরিশ্রমের ফল। এই সকলের মূলমন্ত্র তাঁহারা ভারতী-সম্পাদিকার নিকটই পাইয়াছেন। ভারতী-সম্পাদিকা শুধু লেখার আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন নাই। তিনি মহিলাদিগের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য সখি-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলকার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ের পথ খুলিয়া দিয়াছেন।

যখন ভারতী-সম্পাদিকা প্রথম গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন বঙ্গদেশে এত স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ছিল না বা স্ত্রী-জাতির শিক্ষার এখনকার মত এমন উপায়ও ছিল না। তখন ত দূরের কথা,—আমাদেরই সময়ে ছিল না,—আমাদের জীবনেই তাহা দেখিয়াছি। আমাদের পরিবারের মধ্যে যখন প্রথম আমি ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করি তখন তাহাতে কত বাধা-বিঘ্ন পাইতে হইয়াছিল। ইংরাজী পড়িলেই খৃষ্টান বা মেম হইবার আতঙ্ক। আমার ঠাকুমা যে এ-বিষয়ে কিরূপ প্রতিবন্ধক হইতেন এখনো তাহা বেশ মনে পড়ে। এখনো অধিকাংশ হিন্দু-পরিবারের মধ্যে দ্বাদশ বর্ষের মধ্যেই সব বিদ্যা শেষ হইয়া যায়। অথচ আমি দেখিতেছি, বঙ্গদেশের বালিকা-দিগের জ্ঞানের পিপাসা এত অধিক, তাহারা এত বিদ্যানুরাগিনী যে বলা যায় না; শুধু উপায় নাই বলিয়াই কেহ শিখিবার সুযোগ পায় না। যে দেশের স্ত্রীশিক্ষার এই অবস্থা এবং যে অবস্থা পূর্ব্বে আরো ভয়ঙ্কর ছিল, সেই দেশে সেই কালে স্বর্ণকুমারীর মত বিদুষী গড়িয়া-ওঠা বড় সোজা কথা নহে। এত লেখাপড়া জানিয়া, এত সুশিক্ষিতা ও অমন উচ্চবংশের কন্যা হইয়াও (পৃথিবীতে লোকে যাহা কিছু চায়,—বংশ রূপ গুণ কিছুরই অভাব তাঁর নাই) তাঁর স্বভাব কখনো গর্ব্বিত দেখি নাই, এইটেই আমার সব-চেয়ে ভাল লাগে। তিনি যখনি আমাদের বাটীতে আসিতেন, হিন্দু-বাড়ীর মেয়েরা সকলেই তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত, তিনি সকলকার সহিত সমভাবে কথা কহিয়াছেন, যখনি কেহ গান গাহিতে অনুরোধ করিয়াছে গান গাহিয়াছেন। আমার সকল আত্মীয়েরাই তাঁহার মিষ্ট ব্যবহারে মোহিত হইয়াছেন; সকলেই বলিয়াছেন এমন মেজাজ কখনো

দেখি নাই। অমন করিয়া সকল পরিবারে না মিশিলে তিনি এমন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিতেন না। সকল অবস্থার পরিবারের সঙ্গে এমন প্রাণ দিয়া মিলিতে মিশিতে পারিতেন বলিয়াই তাঁর অঙ্কিত উপন্যাস-চিত্র এত জীবন্ত।

আমার লেখা যাহাতে ভাল হইয়া ওঠে তার জন্য তাঁহার কি আগ্রহ! তিনি আমায় সেই ছেলেবেলা হইতে কত উপদেশ, কত পরামর্শই না দিয়া আসিয়াছেন। কোথাও আমার প্রশংসা হইলে তাঁহার আনন্দ ধরে না। তাঁহার এ স্নেহ ভুলিবার নহে। কেবল আমারই প্রতি যে তাঁহার অনুগ্রহ তাহা নহে; আমাদের দেশের মেয়েরা সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করুক, ইহা তাঁহার অন্তরের কামনা।

এই কয়েক মাস আগে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। আর সে মূর্ত্তি নাই, সে শ্রী নাই, শোকে-দুঃখে তাঁর মুখে কি-এক বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। ভাল অবস্থায় সুখের সময়ও কখনো তাঁকে চঞ্চল দেখি নাই, কখনো বেশী কথা কহিতে দেখি নাই, আমি আপনার মনে বকিয়া গিয়াছি আর তাঁর সেই এক উত্তর "তার পর!" এখনো তাঁর সামনে গেলে আমি যেন ছেলেমানুষের মত হইয়া যাই;—কোথা হইতে সেই ছেলেবেলার চঞ্চলতা আসিয়া পড়ে।

এখন আর পূর্ব্বের মত চিঠি-পত্র দিতে পারি না, তবু তিনি যে আমার চির-শুভাকাঙ্ক্ষিণী তা বেশ বুঝিতে পারি। সেদিনও তাঁর চিঠিতে লিখিয়াছেন—

"অনেক দিন পরে তোমার চিঠি পেলুম বটে। যৌবনের সে উচ্ছ্বাস আমাদের চলে গেছে। বিরহ মিলনের সে হাসি কান্না মানাভিমান-স্রোত বন্ধ, কিন্তু তবুও বন্ধুত্ব কি আমাদের প্রাণ থেকে সরে পড়েছে? না, ভালবাসা এখন স্তব্ধ ভাব ধারণ করেছে। এ বয়সের ভালবাসার বোধ হয় ধর্ম্মই এই।"

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

সম্বলপুর।

চয়ন

ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গের নাটক

গত বৎসরের ফাল্গুন মাসের "ভারতী"তে আমরা লিওনিড আণ্ড্রীভের ভাবাত্মক নাটকাবলীর কিছু-কিছু পরিচয় দিয়াছিলাম; অগষ্ট্‌ ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গ, ভাবাত্মক নাট্যসাহিত্যের আর-একজন মহারথ। এবার তাঁহার সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলিব।

আধুনিক রঙ্গালয় অধঃপাতে যাইতেছে;—রঙ্গালয় যাহাতে বর্ত্তমান ভাবধারার

অনুসারী হইতে পারে এবং বিচিত্র সামঞ্জস্যের মধ্য হইতে মানবের আত্মাকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গ নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বাহিরের গঠন ও আকার হিসাবে ইব্‌সেন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী।

মানবের মনোবিজ্ঞানের মধ্যে ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গ, এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার রূপক নাটকগুলির ভূমিকা অভিনয় করা, একরকম অসাধ্য ব্যাপার।—এমন-কি, সাধারণ পাঠকদের কাছে তাঁহার নাটকের পাত্র-পাত্রীদের অবাস্তব বলিয়াও ভ্রম হয়। অন্যান্য দেশের কথা দূরে থাক্—জার্মানিতেও তাঁহার আত্মজীবনীমূলক নাটক "To Damascus, অদ্যাবধি অভিনীত হইতে পারে নাই।

এড্‌গার পো, ডি-গন্‌কোর্ট, নিট্‌শে, ইব্‌সেন এবং সর্ব্বশেষে মেটারলিঙ্ক—সকলেরই অল্পবিস্তর প্রভাব ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গের উপরে পড়িয়াছে। কিন্তু ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গ যাঁহাদের নিকট হইতে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, আপনার প্রতিভাগুণে তাঁহাদের সকলকেই তিনি ছাড়াইয়া উঠিয়া যথেষ্ট নিজস্ব ও নূতনত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

দর্শনের দিক্ হইতে দেখিলে বলিতে হইবে যে, মেটারলিঙ্ক ও ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গের মধ্যে বিপুল ব্যবধান। ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গ যেমন-বেশী দুঃখবাদী, মেটারলিঙ্ক তেমনি-বেশী আশাবাদী। মেটারলিঙ্ক আনন্দোচ্ছাসে বলিতেছেন, "মৃত্যু? মৃত্যু নাই, সবাই জীবন্ত!",—কিন্তু ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গ To Damascus-এ

আত্মজীবনের অভিজ্ঞতা এই দু-কথায় বর্ণনা করিতেছেন,—"আমি তোমাকে 'সুখে থাক' এ-কথা বল্‌তে চাই-না—কারণ, এ দুনিয়ায় সুখ কোথায়? কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তুমি যেন অটল থাক্‌তে পার, এই আমার কামনা!"

মেটারলিঙ্ক আনন্দের কবি; কিন্তু ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গের কাছে এই পৃথিবী, জীবন ও মানব—"কিছু নয়—কিছু নয়, সুধু একটা ছায়া, একটা ভুয়ো ঠাট, একটা স্বপ্নের ছবি!"—এবং মিথ্যা জগৎ হইতে মানব যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাহার উপরে জ্বালা-যন্ত্রণার শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছে! যন্ত্রণা আমাদের সখী, কারণ সে মুক্তিদায়িনী। ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গের মনের এই ভাবটি বুঝিয়া তাঁহার নাটকগুলি পড়িতে বসা উচিত।

"জীবন হচ্ছে পার্থিব নরক!" এই বিষাদ-মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গ ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর নিরাশার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছেন। এইখানেই তাঁহার 'আর্টে'র দুর্ব্বলতা। নিরাশা তাঁহার চারিদিকে যে মায়ার গণ্ডী কাটিয়া দিয়াছিল, জীবনে আর তিনি তাহার বাহিরে আসিতে পারেন নাই; ফলে তিনি 'ঢালের এক পৃষ্ঠ'ই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাই তাঁহার The Dream Playতে Daughterএর মুখে শুনি: "সুবিচার, বন্ধুত্ব ও শান্তি—ও-সব সুধু কথার কথা, ধাপ্পাবাজী!" —"বয়ার মত আশা খালি নিজেকে জলের উপর ভাসিয়ে রাখে, বিপন্ন তার সুমুখে অসহায় হয়ে ডুবে মরে!" তাই তাঁহার

The Spook-Sonataর শোচনীয় সমাপ্তি-কালে 'ছাত্রে'র মুখে মরণাহত প্রিয়জনকে বলিতে শুনি, "অভাগা শিশু!—এই প্রতারণা দুঃখ, ত্রুটি ও মৃত্যু পূর্ণ বিশ্বের শিশু; —এই চির মোহ, পরিতাপ ও পরিবর্ত্তন পূর্ণ বিশ্বের অভাগা শিশু!" তাই তাঁহার Damascus-এ পূর্ব্বপত্নীর সহিত পুনর্দর্শন-কালে তীর্থযাত্রীকে বলিতে শুনি, "আমরা ভালবাসি। হ্যাঁ, আবার আমরাই ঘৃণা করি। আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করি, কারণ আমরা পরস্পরকে ভালবাসি; আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করি, কারণ আমরা পরস্পরের সঙ্গে বাঁধনে বাঁধা আছি; আমরা বাঁধনকে ঘৃণা করি, প্রেমকে ঘৃণা করি; ভালবাসার বস্তুকে ঘৃণা করি—কারণ, যা বড় ভালবাসার, তাই আবার বড় কটু; আমরা সেই সর্ব্বোত্তমকে ঘৃণা করি—যা থেকে এই জীবন আমরা পেয়ে থাকি!" এম্‌নি বিষম দুঃখবাদ প্রচার করিয়াছেন বলিয়াই ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গ জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই।

Father ও The Dance of Death, ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গের দুইখানি ভয়ানক নাটক। Fatherএর সর্ব্বত্র ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গের হতাশ হৃদয়ের ছায়াপাত হইয়াছে। এই Father বা "পিতা",—নর ও নারীর মধ্যে যে অনন্ত সংগ্রাম চলিতেছে, তাহারই উজ্জ্বল চিত্র। ইহার ভিতরে ষ্ট্রিণ্ডবার্গ আপনাকে 'পিতা' রূপেই পরিচিত করিয়াছেন, 'পতি' রূপে নহে। নাটকের পুরুষ বা 'পিতা' দুর্ব্বলচরিত্র, বাতিকগ্রস্ত; রমণী বা 'মাতা' শক্তিশালিনী, নীচচাতুর্য্যে নিপুণা এবং অন্ধের মত আপন পথ ধরিয়া নির্দ্দয় অটলভাবে আপনি চলে।—রমণী এখানে আপন সন্তানকে নিজের বশে রাখিতে চাহে,—পুরুষ তাহাকে মাতার কাছ থেকে তফাতে রাখিতে চাহে; —পুরুষ ও রমণীর এই সংগ্রামের উপরেই নাটকের ভিত্তি। পুরুষ সন্দেহ করিতেছে যে, সে তাহার সন্তানের যথার্থ পিতা কিনা? এই বাতিকগ্রস্ত পুরুষের চঞ্চল মনের উপরে রমণী অশেষ চতুরতার সহিত আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া যাইতেছে। পরিশেষে পুরুষ স্থির করিল যে, সে তাহার সন্তানের পিতা নহে; এবং এইখানে তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া গেল। তাহার পত্নী বন্দী স্বামীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া যে পুরুষকে সে চায় তাহাকে ও আপন সন্তানকে গ্রহণ করিল।

নর ও নারীর মধ্যে অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলের মত যে সন্তান,—সেই সন্তানের জন্য কাতর আর্ত্তনাদ Fatherএর সর্ব্বত্র ধ্বনিয়া উঠিতেছে। মূলে ইহা নৈতিক নাটক; এবং ইহার বাস্তবতার উপরে রূপকের প্রচ্ছাদন আছে। সন্তানের বিষয়ে আর কোন মানব এমন মর্ম্মভেদী কাতর স্বরে কথা কহিতে পারেন নাই।

The Dance of Deatth নামক নাটকখানিতে ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গ তাঁহার প্রতিভার সম্পূর্ণতায় ও 'আর্টে'র চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছেন। ইব্‌সেনের Hjamar, আধুনিক সভ্যতার একটি বিচিত্র সাহিত্য-চরিত্র; ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গের এই নাটকের "the Captain," ইব্‌সেনের উক্ত চরিত্রের ঠিক পাশেই আসন পাইতে পারে। The Dance of Death, ইব্‌সেনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের

সমকক্ষ। কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট না হইলেও ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গের There are Crimes and Crimes নামে নাটকখানিই সকলের চেয়ে বেশী জনপ্রিয় হইয়াছে।

মোঁপাসা সাহিত্যের আসরে যেমন ছোট গল্পের একটি স্থায়ী আসন নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গও তেমনি এক-অঙ্কের নাটক লিখিয়া নাট্যসাহিত্যে একটি নূতন রসের ঝরণা খুলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার রচিত এগারোখানি একঅঙ্কের নাটকেই নাট্যরসসৃষ্টির সুচারু কৌশল দেখা যায়! এই কয়খানি নাটকে হৃদয়ের সকল ভাবেরই নিপুণ বিশ্লেষণ আছে। ইহার মধ্যে Miss Julietএর নাম সারা য়ুরোপে পরিচিত।

ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গের প্রতিভা-বৈচিত্র অপূর্ব্ব! চল্লিশখানিরও বেশী নানাশ্রেণীর নাটক লেখার পর, প্রাচীন বয়সে তিনি ঐতিহাসিক নাটক-রচনায় মন দেন। এখানে সেগুলি লইয়া আলোচনা চলিবে না, তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি জার্মানির মত দেশেও প্রশংসা ও সম্মান পাইয়াছে।

ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গের ঐতিহাসিক নাটকগুলির ভাষা যতদূর সরল হইতে হয়! ঐতিহাসিক নাটকগুলির পাত্র-পাত্রীদের থিয়েটারী ঢঙ্গে না আঁকিয়া, যাহাতে তাহারা জীবন্ত রক্ত-মাংসের মানুষের মত হইতে পারে, ষ্ট্রিণ্ড্‌-বার্গ সকলের আগে প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। তাঁহার Eric XIV., জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বপ্রধান ঐতিহাসিক নাটক-গুলির মধ্যে অন্যতম।

ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গের প্রতিভার বিপুলতাকে অস্বীকার করিতে পারে, তাঁহার শত্রুপক্ষের মধ্যেও বোধ করি এমন ব্যক্তি কেহ নাই। অনেক স্থানে তিনি মেটারলিঙ্ককে ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন ও ইব্‌সেনের সমকক্ষ। তাঁহার Miss Julietএ এক নূতনতর নাট্যসৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান নাট্যসাহিত্যে তিনি রমণীর দেবী ও দানবী, দুই রূপই আঁকিয়াছেন। প্রেম ও ঘৃণা, শোক ও করুণা এবং বিক্ষুব্ধ মানব-আত্মার উপরে তাঁহার চেয়ে ভাল-করিয়া রং ফলাইতে আর কেহ পারেন নাই। এমন-কি, সুকঠিন জার্মান সমালোচকেরাও ঐতিহাসিক নাটকে সেক্‌স্‌পিয়ারের পরেই তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নাট্যজগতে তিনি একেবারে-অজানা নূতন ভাবের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার Damascus গেটের Faustএর কাছে ম্লান নহে। তাঁহার রচনায় বর্জ্জনযোগ্য জিনিষ অনেক আছে; কিন্তু তাহার মধ্যে অমরত্বের উপাদানেরও অভাব নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী-সাহিত্য

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পর ভিক্টর হুগোর অতিরঞ্জিত দার্শনিকতার বিরুদ্ধে একদল প্রত্যক্ষবাদী লেখক আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিত্বশূন্য সাহিত্যের দিকে। সুধু গদ্যে নয়, কাব্য-সাহিত্যেও ইঁহারা আপনাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিতেন না। এই নূতন সম্প্রদায়ের নেতা হইলেন Leconte de Lisle।

Prudhomme, Heredia ও Coppée প্রভৃতি লেখকেরা এই নব-পদ্ধতি অনুসারে সাহিত্য-সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম কাব্য-পুস্তক প্রকাশ করিয়াই Prudhomme স্বদেশে কবি-নামে বিখ্যাত হন। বড় হাল্‌কা যে ভাব, অন্য-কেহ সহজে যা ধরিতে-ছুঁইতে পারেন না, বিচিত্র নিপুণতার সহিত Prudhomme সে সব অতি-লঘু ভাবকেও আপন লেখার বাঁধনে বাঁধিতে পারিতেন। তর্ক-বিচারের উপরে তিনি বিশ্বাসের আসন দিতেন; তাঁহার সমগ্র কাব্যে হৃদয়ের জয়ঘোষণা শোনা যায়।

নবসম্প্রদায়ের অন্যান্য কবির অপেক্ষা Herediaর উপরেই Leconte de Lisleর প্রভাব পড়িয়াছে অধিক। তাঁহার কবিতার ছন্দ পরিপুষ্ট ও পরিপূর্ণ; কাব্যের রং ফলাইতে তিনি বড় পটু ছিলেন। সব জিনিষের বাহিরের দিক্‌টাই তিনি ভাল করিয়া দেখিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার এক-একটি সনেট যেন শব্দের এক-একখানি চারু চিত্র। নিস্ফল মানব-জীবনের তিক্ত রসে ও দুঃখবাদে তাঁহার সনেটগুলি অতি করুণ হইয়া উঠিয়াছে।

Coppée, পূর্ব্বজীবনে কেরাণীগিরির অবকাশকালে কবিতা ও নাটক রচনা করিতেন। কিন্তু ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি বিখ্যাত হইতে পারেন নাই। তাঁহার রচিত Le Passant নামক নাটকেই ভূমিকা লইয়া সারা বার্নাড যশের প্রথম জয়মাল্য লাভ করেন। এ নাটকখানি সুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নহে, জনসাধারণের দ্বারাও পরম সমাদরে গৃহীত হইয়াছিল।

Coppéeর আসল মৌলিকতা তাঁহার বিষয়-নির্ব্বাচনে। দীন-দুঃখীর অশ্রু ও হাস্যে, নেহাৎ-সাদাসিধে হট্টগোলে বা নগর-প্রান্তের নির্জ্জনতার মধ্যেও তিনি কাব্যের প্রকাশ দেখিতে পারিতেন। এইজন্য তাঁহার রচনায় বাস্তবতার ছায়াপাত হইয়াছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-পরিবারের ছবি আঁকিতে তিনি একেবারে সিদ্ধহস্ত। কোন ছবিতে দেখি, রুগ্ন ভাইয়ের সেবায় এক বৃদ্ধা চিরকুমারী আপন জীবন, যৌবন ও সৌন্দর্য্য কিরূপে উৎসর্গ করিয়াছে; কোন ছবিতে দেখি, রাস্তার এক কোণে যুবতী ফুলওয়ালী কনে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার থর্‌থরে আড়ষ্ট হাতে এক-গোছা ভায়োলেট ফুল। Coppée কখনো নিজের ভাবে বিভোর হইয়া সীমা ছাড়াইয়া যাইতেন না। তিনি একজন প্রতিভাবান নাট্য-সমালোচক ও ঐতিহাসিক নাট্যকার ছিলেন। লিখন-ভঙ্গীর গুণে তাঁহার নাটকের

অনেক বড় বড় দোষও ঢাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু কেবল কবি, নাট্যকার ও সমালোচক-রূপে তিনি বিখ্যাত নন,—উপন্যাসেও তিনি একজন ওস্তাদ লেখক। তাঁহার উপন্যাস-গুলিতে রোমান্সের আভাস যথেষ্ট থাকিলেও তাহাদের ভিতরে নূতন বাস্তব ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই নবসম্প্রদায়ের পরে আসিলেন Gustave Floubert,—তিনি রোমান্স ও বাস্তবতার মধ্যবর্ত্তী। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি সাহিত্য-সাধনায় সর্ব্বতোভাবে আপন জীবন উৎসর্গ করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Madame Bovary নামে উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। Floubert কখনো রোমান্স, আবার কখনো-বা বাস্তবতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, কিন্তু কখনো এ-দুইয়ে একাকার করিয়া ফেলিতেন না। তিনি যখন বিষয় বদ্‌লাইতেন তখন লিখন-ভঙ্গীও বদ্‌লাইয়া ফেলিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, ঔপন্যাসিক কোন মত জাহির করিতে অধিকারী নন। যদিও বাস্তবতা অপেক্ষা রোমান্সের উপাদানই তাঁহার রচনায় বেশী দেখা যায়, তথাপি তাঁহার Madame Bovary হইতেই ফরাসী-সাহিত্যে প্রকৃত বাস্তবতার সূত্রপাত। এই উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রণ অতি চমৎকার এবং ইহার অধিকাংশ পাত্র-পাত্রীর চরিত্র বাস্তব জীবন হইতে গৃহীত। Floubertএর অসীম ধৈর্য্য, শক্তি ও প্রতিভা ছিল। লেখার কায়দা বজায় রাখিতে তাঁহার মত পরিশ্রম করিতে আর কোন লেখক পারেন নাই। একটি পাতা লিখিতে তাঁহার একটি সপ্তাহ লাগিত।

Madame Bovaryর দৃষ্টান্তে আর-একদল নূতন লেখক আত্মপ্রকাশ করিলেন। সকলের চেয়ে Emile Zolaর উপরেই এই উপন্যাসের বেশী প্রভাব পড়িয়াছিল। Zolaর স্বভাব-বাদের বিকাশ হয় তাঁহারই জড়বাদ ও দুঃখবাদের মধ্যে। সত্যের খালি এক-দিকটাই তাঁহার চোখে পড়িত,—শরীর ও মনের অন্যান্য ধর্ম্ম অবহেলা করিয়া তিনি সুধু লালসার ছবি আঁকিতে ভাল-বাসিতেন। দুঃখবাদের মহিমায় তিনি মানব-জীবনের নীচতা ও শোক-দারিদ্র, আপনার উপন্যাসের আখ্যান-বস্তু করিয়াছিলেন। স্বভাববাদী হইলেও মনে-মনে Zolaর ঝোঁক ছিল রোমান্সের প্রতি। যতই তাঁহার দোষ থাকুক, এ-কথা মানিতেই হইবে, তিনি অদ্বিতীয় শব্দচিত্রকর।

Zolaর পরে আমরা M. M. Edmond ও Jules de Goncourtকে স্বভাববাদ অবলম্বন করিতে দেখি। তাহার পর Alphonse Daudet,—ইঁহার উপরে Zola ও Goncourt, উভয়েরই প্রভাব পড়িয়াছিল। প্রথমে তিনি কবিতা লিখিয়া বিখ্যাত হন। তৎপরে দুইখানি নাটক ও কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া Letters de Mon Moulin নামে সুন্দর এক ছোট-গল্পের বই বাহির করেন। এই পুস্তক প্রকাশের ফলে Doudet বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মধ্যে ঔপন্যাসিক প্রতিভা আছে। অতঃপর তিনি স্বক্ষেত্রে থাকিয়া অনেক ছোটগল্প ও তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস-গুলি লিখিয়াছিলেন।

লেখা হইতে আপনাকে তিনি বিচ্ছিন্ন

করিতে পারিতেন না বা মনের ভাব ঢাকা দিতেও জানিতেন না; এইজন্যই তাঁহার লেখার সুর যেন পাঠকের প্রাণের সঙ্গে একেবারে গাঁথিয়া যায়। প্রত্যেক নূতন রচনায় তাঁহার নূতন নূতন গুণ ও শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

দশবৎসর পরে Floubertএর ধর্ম্মপুত্র ও ছাত্র Guy de Moupassant আসিয়া স্বভাববাদীদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। Moupassantএর আর্টে ব্যক্তিত্বের ছায়া-মাত্র নাই। তিনি যাহা চোখে দেখিতেন, অনুভব করিয়া তাহাই লিখিতেন। স্বচিত্রিত চরিত্রগুলি এমন স্পষ্টভাবে তাঁহার চোখের সামনে ভাসিত যে, লেখার মধ্যেও তাহারা যেন ঠিক জীবন্ত হইয়া থাকিত! তাঁহার রচনায় কোন নৈতিক বিশ্লেষণ নাই। কারণ, তাঁহার কাছে কল্পনা ও বাস্তব জগতের মধ্যে কোন বিভেদ ছিল না। তিনি মন্দকে ত্যাগ বা ভালকে প্রশংসা করেন নাই।

শেষজীবনে টলষ্টয়

দীর্ঘজীবী টলষ্টয়ের জীবন নানা অবস্থা ও নানা ঘটনার মধ্য দিয়া গঠিত হইয়াছিল; জীবনে তিনি অনেকবার মত-পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বহুমতের ভিতরে অসঙ্গতি দেখিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিলে চলিবে না; কারণ তাঁহার জীবনকে দেখিতে হইবে সমগ্রভাবে,—খণ্ডভাবে নহে।

দীর্ঘায়ু হইয়া তিনি ভাবিবার অনেক অবকাশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহাকে দেবতার মত পূজা করিত। রাজা বা ধর্ম্মের অনাচার দেখিলে তিনি নির্ভীকভাবে অপ্রিয় সত্য বলিতেন,—অথচ রাজদণ্ড বা পুরোহিতের অভিশাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারিত না।

টলষ্টয়ের জীবনব্যাপী ব্রতের অর্থ কি?—তিনি তাঁহার পাঠকের মনে মানুষ হইবার ইচ্ছা জাগাইয়া দিতেন। পাঠককে তিনি তাঁহার সত্য আদর্শের দিকে লইয়া যাইতে চাহিতেন।

যৌবনে তিনি হাল্‌কা-প্রাণ, ফূর্ত্তিবাজ মানুষ ছিলেন। রাজসভায় আদর পাইতেন, যুদ্ধোৎসব ও শীকারে মাতিতে ভালবাসিতেন, আপনার মস্ত জমিদারীর কাজকর্ম্ম নিয়মমত দেখিতেন। তারপর সাহিত্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। আপনার প্রতিভাগুণে কয়-খানি ভাল ভাল বই লিখিয়া সাহিত্যজগতে তিনি পরিচিত হইলেন। তাঁহার War and Peace হইতে Anna Karénina পর্য্যন্ত পুস্তকগুলি এই সময়কার লেখা। তিনি নিজে বলেন: "নিরর্থক আমোদের জন্য লাভের জন্য অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হয়ে আমি বই লিখ্‌তে সুরু করেছিলাম। ফলে আমি টাকা রোজগার করেছি, প্রশংসার পুষ্পাঞ্জলি পেয়েছি, রাজার হালে থাকতে পেরেছি।" সে-সময় কে কোথায় তাঁহার বিষয়ে কি বলিতেছে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। প্রাণে তিনি খাঁটি সাহিত্যসেবী ছিলেন না। তিনি কুলীন-

তন্ত্র (Aristocracy) ভালবাসিতেন এবং লেখককুলকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহার ভিতরে তখন সাধারণ রুশ-প্রকৃতি গোপন ছিল।

কিছুদিন পরে তিনি সাহিত্যের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। পৃথিবীর বড় বড় লেখক ও শিল্পীকে তিনি যা-মুখে-আসে, তাই বলিয়া গালাগালি দিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন, "গেটে হচ্ছে চোর! দান্তে, মিলটন ও সেক্‌স্‌পিয়ার হচ্ছে অশিষ্ট, অসভ্য আর নির্ব্বোধ! বীথোভেন ও ওয়াগনারের গান হচ্ছে অস্বাভাবিক!" সকলের-চেয়ে তিনি বেশী খুসি হইতেন Uncle Tom's Cabin পড়িয়া।

বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে সংসারের ঝালাপালায় তিনি জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন। সভ্যতার হট্টগোলকে তিনি বলিতেন, "পাগ্‌লা-গারদের কারখানা।" শেষে তিনি সাদাসিধে জীবন-লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, খৃষ্টের উপদেশকে জীবনের সার করিলেন। তাঁহার মতে "যে লোক সার সত্য জেনেছে, ক্ষেতের চাষ করাই হবে তার উপজীবিকা।" টলষ্টয় তখন সহর ও গোলমাল ছাড়িয়া সপরিবারে দক্ষিণ রুশিয়ায় গ্রাম্য কৃষকের জীবন যাপন করিতে গেলেন। যাহাতে সরলতা নাই, তাহা তাঁহার চোখের বালি হইয়া উঠিল।

টলষ্টয় নিজের সকল সম্পত্তি বিলাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী আইনের সাহায্যে স্বামীর সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে দেন নাই। তিনি তাঁহার কোন পুস্তকের সত্ব রক্ষা করেন নাই—পৃথিবীর যে-কোন দেশের প্রকাশক, অনায়াসে তাঁহার পুস্তক প্রকাশ করিতে পারিত। বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে টলষ্টয় আপন প্রাপ্যের এক পয়সাও চাহিতেন না। অথচ তাঁহার পুস্তকের আয় ছিল অসাধারণ।

টলষ্টয় গরিবের পোষাক পরিয়া থাকিতেন। আপনাকে তিনি সামান্য এক চাষা বলিয়া ভাবিতেন। কিন্তু এ ধারণা ভুল। কারণ তাঁহার সাধ্বী পত্নী স্বামীর সুখসাচ্ছন্দের দিকে সব-সময়েই খর-নজর রাখিতেন। টলষ্টয়ের গায়ে, গরিবী পোষাকের তলায় থাকিত খুব ভাল কাপড়-চোপড়; তাঁহার খাবার জিনিসগুলি সাদাসিধে হইলেও এত ভাল আর দামী ছিল যে, অনেক বড়মানুষের ভাগ্যেও সর্ব্বদা তাহা জুটিত না।

তিনি মুখে যখন বলিতেন,—

"আমি গরিব। আমার হাতে এক-পয়সাও নাই। কারুকে কিছু দান করবার ক্ষমতাও আমার নাই।"

তখন সত্যকথাই বলিতেন। কারণ বৃদ্ধবয়সে তিনি তাঁহার স্ত্রীর ভালবাসার অত্যাচার ধরিতে পারিতেন না।

পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে শত শত নর-নারী তাঁহাকে দেখিতে আসিত। যাহারা ভক্তিভরে তাঁহার কথা শুনিত, তাহাদের সঙ্গে তিনি সদয়ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন। যাহারা আসিয়া তাঁহার দোষ দেখাইত, তিনি অধীরভাবে তাহাদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিতেন। একবার

আমেরিকার একটি বিখ্যাত ও প্রধান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বহুদর্শী ও সুপণ্ডিত প্রেসিডেণ্ট তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বিদায় হইবার পর একটি লোক টলষ্টয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার মতে এই পণ্ডিতটি কেমন লোক?"

"কিছু নাঃ! ভারি অসভ্য!"

টলষ্টয় আর যাহাই হউন,—তিনি আশ্চর্য্য রকমের সরল। তাঁহার অকৃত্রিম বিশ্বাস, পবিত্রতা ও সত্যপরায়ণতা অশ্রদ্ধার যোগ্য নহে। তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট পৃথিবীকে বাস্তব জগতে আমরা কখনো দেখিব না বটে, কিন্তু তাঁহার মানবতার আদর্শ এবং শিক্ষার উচ্চতা অনেক হতাশের শ্রবণে দৈববাণীর মত আশার প্রেরণা আনিয়া দিবে। আদর্শ জীবনের জন্য তাঁহার প্রাণে যে আকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল,—সে আকাঙ্ক্ষা বিশ্ববাসীর পূজার যোগ্য।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

গদ্য ও পদ্য

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠীবাটার সময় শ্বশুরবাড়ী হইতে দুই মেয়ে আসিয়া বিধবা মাকে ধরিয়া বসিল, ভাইয়ের বিবাহ দাও। মা বলিলেন, "এখন লেখাপড়ার সময় বিয়ে দিলে ও কি আর পাশ করতে পারবে! আর একটা বছর যাক্—বি-এটা পাশ করুক, তখন বিয়ে হবে।"

বড় মেয়ে টেঁপি বলিল, "আমরা দু'জনে তোমার কাছে থাকতে পারি না—তুমি একলা থাকো, বৌ এলে তোমার আর কষ্ট হবে না।"

মা বলিলেন, "আমার একটু কষ্ট ঘোচাবার জন্যে ছেলের ভবিষ্যৎ মাটি করতে পারি না ত!"

ফুলি কহিল, "না হয় বৌদিকে বাপের বাড়ীতেই রেখো, যতদিন না দাদা পাশ হয়!"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তাহলে ও বই খুলে দিন-রাত বৌয়ের মুখই ভাববে—পড়া কি এগুবে আর? জানই ত ওর ধরণ!"

ধরণটার সম্বন্ধে মার মনে সম্প্রতি সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তিন মাস পূর্ব্বে দোলের সময় ফুলি আসিয়া মাকে জানাইয়াছিল, দাদা বড় চমৎকার পদ্য লিখিতে পারে! ধোপার বাড়ী কাপড় দিবার সময় জামার পকেটে প্রাপ্ত টুকরা কাগজে দুই-একটা পদ্যও তিনি পড়িয়া ছিলেন। পদ্যের ভাব দেখিয়া ফুলি চমৎকৃত হইলেও মার কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়াছিল। লেখা-পড়া ঠেলিয়া রাখিয়া ছেলে যে বসন্ত আর কোকিলকে

উদ্দেশ করিয়া আপনার শূন্য প্রাণের হাহাকার ছড়াইতে থাকিবে, এটুকু মার নিতান্তই সৃষ্টিছাড়া সখ বলিয়া মনে হইল। কু-এর গোড়াই এই! ছেলেকে কিছু না বলিয়া তাহার উপর আপনার নজরটুকু এই ঘটনার পর হইতে তিনি আরও কড়া করিয়া তুলিলেন।

কিন্তু কবিতা পড়িয়া অবধি দাদার উপর ফুলির শ্রদ্ধা অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল। আজ দুই বৎসর তাহার বিবাহ হইয়াছে। স্বামীর সহিত নিশীথের নির্জ্জন অবসরে সেও যথেষ্ট কাব্য চর্চ্চা করে; তাই সে দাদাকে একদিন ধরিয়া বসিল, "এ পদ্য কাকে লক্ষ্য করে তুমি লিখেছ, আমায় বল্‌তে হবে, দাদা।" দাদা কহিল, "কাকে লক্ষ্য করে লিখব আবার? মনে ভাব এসেছিল, তাই লিখেছি।"

সেই দিন হইতে ফুলি ভাবিতেছিল, দাদার বিবাহ দিতে পারিলে ভাল হয়! তরুণ কবির হৃদয়ে যে অসংলগ্ন ভাবগুলা এখন কেন্দ্রহীন হইয়া এলোমেলো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একটি তরুণী বধূ আসিলে সেই সব ভাব তাহাকেই কেন্দ্র পাইয়া একটা নীড় বাঁধিবার সুযোগ লাভ করিবে। তাই সে সেবার মার কাছে দাদার এই কবি-প্রতিভা-উন্মেষের পরিচয় দিয়া বিবাহের কথা পাড়িবে বলিয়াই সঙ্কল্প করিয়াছিল; কিন্তু উপক্রমণিকার অবতারণা করিতেই মার মুখের ঘোরালো ভাব দেখিয়া আসল প্রস্তাবটা উত্থাপনে মোটেই আর তাহার ভরসা রহিল না। সেবার দিদি ছিল না—তাই এবার দিদির সহিত পরামর্শ আঁটিয়া দিদিকে দিয়াই ভূমিকা ছাড়িয়া একেবারে আসল কথা সে পাড়িয়া বসিল।

দিদি অবশ্য কবিতা প্রভৃতির বড় পক্ষপাতিনী ছিল না। তাহার বিবাহ হইয়াছিল, পল্লীগ্রামে। দুই-তিনটি সন্তানের জননী হইয়াছে সে,—তাহার উপর স্বামী বিদেশে কোলিয়ারী লইয়া পড়িয়া আছে, কাব্যের চেয়ে পয়সাটারই সে বেশী ভক্ত; টেঁপিও সংসারের সহস্র কাজে লিপ্ত থাকিয়া কাব্য-চর্চ্চার দিকে ঘেঁষ দিতে পারে নাই। বসন্তের অভ্যুদয়ে পল্লবিত তৃণমঞ্জরীর শ্যাম শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া দূরে থাক্, ছেলে-মেয়েদের সর্দ্দি-কাশীর হাঙ্গামে সে তখন এতটা বিব্রত থাকিত যে, ফাল্গুন-চৈত্রে শীতলা, ওলাবিবি প্রভৃতি দেবীর উদ্দেশে মানত-উপবাস করিয়াই তাহার বসন্ত যাপন হইত। দিদি ছিল পুরা-দস্তর কাজের লোক; কাজের দিক দিয়াই সব জিনিষের সে মাপ কষিত। ফুলি তাই কাব্য ছাড়িয়া গদ্যের দিক দিয়াই দিদিকে বুঝাইয়াছিল, বধূ আসিলে মাকে আর একা নিঃসঙ্গভাবে গৃহ-কোণে অতীত শোকের স্তূপের উপর বসিয়া গুম্‌রাইতে হইবে না—গৃহের সহস্র কাজে মাকে সাহায্য করিয়া বধূ মার ক্লেশ বহু পরিমাণে লাঘব করিতে পারিবে—তাহারাও দুইজনে একসঙ্গে এখানে আসিবার সুযোগ লাভ করে না, বৌ আসিলে তাহারাও পিত্রালয়ে বধূর মধুর সঙ্গের স্পর্শ-লাভে অনেকখানি হর্ষের অধিকারিণী হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই টেঁপি আজ ফুলিকে সঙ্গে লইয়া মার কাছে ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাব তুলিয়াছিল।

নিজের সুখ, নিজের সুবিধা—এ কথা গুলা মা কিন্তু ধর্ত্তব্যেরই মধ্যে আনিলেন না। পুত্রের ভবিষ্যৎই ভাবিবার কথা! ফুলি তখন বিস্তর নজীর পাড়িয়া বসিল। তাহার দুই ভাশুরের একটা পাশেরও পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছিল। জায়েরা সুন্দরী—তবুও কোন ভাশুরের পাশের পথে কোন প্রাচীর তাহারা কোন দিন তুলিয়া ধরে নাই! তাহার ননদেরও যখন বিবাহ হয়, নন্দাই তখন বি, এ পড়িতেছে! ননদ বরাবর শ্বশুরালয়েই থাকে, সে আবার শুধুই সুন্দরী নহে—রীতিমত বিদ্যাবতী! বাঙ্‌লার যত মাসিক-পত্রে ননদের বিস্তর কবিতা বাহির হয়! এ সকল সত্ত্বেও নন্দাই এম, এ পাশ করিয়া ফেলিয়াছে এবং এ বৎসর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা দিবে। এ পরীক্ষাও যে সে পাশ করিবে, সে বিষয়ে কাহারও মনে এতটুকু সন্দেহ নাই! তাহার পর সলজ্জে নিজের স্বামীর কথা পাড়িতেও সে ছাড়িল না—বিবাহের পরই ত অনঙ্গ ডবল-অনারে বি, এ পাশ করিয়াছে। বৌয়েরা কিছু কাঁটা গাছ লইয়া শ্বশুরবাড়ী আসে না—এবং স্বামীর লেখাপড়ার পথে কাঁটা গাছ পুঁতিবার জন্যই তাহারা জন্ম লয় নাই! পাশ-ফেলের সহিত পুরুষেরই যা-কিছু সম্পর্ক, বৌয়েদের তাহাতে কোন হাত নাই!

মা বলিলেন, "যে সব ছেলের লেখাপড়ায় আঠা আছে, বিয়ে দিলে তাদের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু সুবোধের ত পড়ায় তেমন আঠা দেখি না। দুটো পাশও সে যা করেছে—সে কেবল আমারই তাড়ায়। তেমন ভাল পাশ করতে পারত তা হলেও নয় কথা ছিল!"

টেঁপি কহিল, "বিয়ে দিলেই ত আর বৌকে নিয়ে অষ্টপ্রহর ঘরের মধ্যে ও বসে থাকচে না। বৌয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে কতটুকু! বৌ ত তোমার কাছেই সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকবে, মা। দিনের বেলা পড়া-শোনা ছেড়ে সুবোধও কিছু বৌয়ের সঙ্গে গল্প করতে আসছে না।"

মা পাকা গৃহিণী, কঠিন অভিভাবিকা, ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিও তাঁহার বিলক্ষণ। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তবু সারাদিন ঐ বৌয়ের মুখখানি দেখবার জন্যেই ছেলে উসখুস করবে! পড়ায় কি আর মন থাকবে! তার উপর আবার বলছিস্, ঐ রকম সব পদ্য লিখতে আরম্ভ করেছে।"

ফুলি কোন কথা কহিল না। সে ভুক্তভোগী—তাহার স্বামী দিনের বেলা সকলে ঘুমাইলে কত অছিলায় অন্দরে আসিয়া তাহার সহিত কিরূপ দুষ্টামি করিত—মুখে পান পুরিয়া, খোঁপা খুলিয়া, কাপড়ে এসেন্স ঢালিয়া দিয়া—নানা উৎপাতে কেমন বিব্রত করিত, তাহা সে কোন দিন ভুলিবে না! তাই সে মার এ কথায় মনে মনে একটু হাসিল।

টেঁপি কহিল, "পদ্য লিখছে—ও একটা সখ। পাঁচখানা বই পড়ে—তারই পাঁচটা ভাব নিয়ে জুড়ে-তেড়ে পাগলামি করে! পড়ার অবসরে ও ওদের এ-বয়সের একটা খেলা বৈ ত নয়!"

মা বলিলেন, "সুবোধ নিজে কিছু বলেছে না কি, বিয়ের কথা?"

টেঁপি জিভ্ কাটিয়া বলিল, "সে ত আর ক্ষেপেনি! আমরা শুধু তোমার

সুবিধের জন্যে বলছিলুম। তার উপর আরও একটা কথা আছে মা, বিয়ে দেওয়া এই বয়সেই মানায়। শেষে যে সভায় গিয়ে বুড়ো-ধেড়ে বর বসবে, মুখে একরাশ গোঁফ নিয়ে—সে দেখতে ভারী বিশ্রী!" একটা উদাহরণও সে যোগাইয়া দিল। তাহার শ্বশুরবাড়ীর পাশে ওমাসে একটি মেয়ের বিবাহ হইয়াছে। বর আসিয়া সভায় বসিল,—গায়ে গরদের কোট, দাড়ি কামানো গালে সবুজ দাগ—আর মুখে একরাশ গোঁফ! পাড়ার মেয়েরা টিট্‌কারী দিয়া বলিয়াছিল, মাগো, এ বর, না, বরের বাপ! বিবাহ-রাত্রের অত আলো ধেড়ে বরের সে গোঁফের ছায়ায় একেবারে যেন কালো হইয়া গিয়াছিল! বাসর-সঙ্গিনীরা বাসর জাগিতে আসিয়া লজ্জায় মুখ তুলিতে পারে নাই!

ইহার পর প্রতিদিনই এই প্রস্তাব লইয়া মাতা ও কন্যাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিল। অবিরল বৃষ্টিধারায় কঠিন মাটিও গলিয়া যায়, এ ত মার মন! মা শেষে প্রত্যাখ্যাতা এক ঘটকীকে একটু আশা দিয়া বলিলেন, "বেশ, এই শনিবারে আমার ছোট জামাই আসছে—নয়, ঠিক কর, বাছা। রবিবার সকালে সে আর ও-বাড়ীর বড়ঠাকুর দুজনে গিয়ে মেয়ে দেখে আসবে।"

এ ঘটকীটি নিরাশ হইয়াও হাল ছাড়ে নাই। এ কথায় খুসী হইয়া এক-মুখ হাসিয়া সে বলিল, "এ ত মেয়ে নয় মা, যেন পরী! নামেও পরী, চেহারাতেও তাই। তবু পাড়াগাঁয় থাকে। বারো উত্‌রে এই গেল ফাগুনে তেরোয় পড়েছে। বাপ মস্ত জমিদার। মেয়ে এখানে এসেছে মামার বাড়ী এক বিয়ের নেমন্তন্নে। মেয়ের বাপ খরচ-পত্রও করবে খুব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আষাঢ়-মাসের মাঝামাঝি জমিদার-কন্যার সহিত সুবোধের বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির সময় বৌয়ের টুক্‌টুকে মুখ ও আয়ত চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখিয়া তরুণ কবি মুগ্ধ হইল।

ফুলশয্যার রাত্রে লোকের ভিড় চুকিলে টেঁপি ও ফুলি যখন বধূর হাত ধরিয়া শয্যার উপর তাহাকে আনিয়া বসাইল, সুবোধ তখন বিছানারই অপর-প্রান্তে জড়ভরতের মত বসিয়াছিল। বাহির হইতে মা হাঁকিলেন, "অনেক রাত হয়ে গেছে সুবোধ, বৌমা ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল—ছেলেমানুষ! ওকে আজকের রাতটা আর জাগাস্‌নে যেন! ঘুমুতে দিস্।"

কথাটা সুবোধের সর্ব্বাঙ্গে বিষ ছড়াইয়া দিল। টেঁপি মৃদু হাসিল; ফুলি মৃদুস্বরে কহিল, "মার যেমন কথা! আজ একটা রাতের মত রাত! আজ কখনো কোন বৌয়ের ঘুম পায়! বৌদি কিন্তু খুব চালাক, দিদি, অছিলে করে এ-রাতটা কেমন ঘুমিয়ে নিলে!" তার পর বৌয়ের গায়ে ছোট একটা ঠেলা দিয়া হাসিয়া বলিল, "কি বল বৌদি, এখন ঝকী রাত-টুকু কোমর বেঁধে জাগতে পারবে বলে মনে হচ্ছে ত?"

টেঁপি বলিল, "আয় ফুলি, আমরা

যাই। সুবোধ, তুই দোরটা দিয়ে শুয়ে পড়্। অনেক রাত হয়ে গেছে।"

ফুলি যাইবার সময় বৌয়ের কানে-কানে একটা উপদেশ দিয়া গেল, "দেখো ভাই বৌদি, দাদাকে খুসী করো। দাদা যেন নিন্দে না করে!"

দিদি ও ফুলি চলিয়া গেলে সুবোধ দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিতে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। বিছানার কাছে আসিয়া সে দেখিল, বধূ একহাত ঘোমটা টানিয়া পুতুলের মতই মৌন মূক বসিয়া আছে। এই কাপড়ে-ঢাকা মূর্ত্তিটিকে দেখিলে কিছুতেই জীবন্ত মানুষ বলিয়া মনে হয় না!

বাহিরে ফুটন্ত জ্যোৎস্নায় চারিধার ভরিয়া গিয়াছে। মেঘহীন নির্ম্মল আকাশ—গুমট মোটেই নাই। বেশ একটু স্নিগ্ধ বাতাসও বহিতেছে। কাচের আবরণে বাতির আলো মৃদু কাঁপিতেছিল। ঘরের কোণে একটা কার্পেট জড়ানো পড়িয়াছিল। সুবোধ নিঃশব্দে কার্পেটখানা মেঝেয় বিছাইল, পরে বিছানার কাছে আসিয়া বধূর সুন্দর কোমল হাতখানি আপনার হাতে ধরিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "পরি—" পরি নড়িল না—সে স্বরে একটু চমকাইলও না!

সুবোধের সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। পরির হাত ধরিয়া সুবোধ কহিল, "তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জীবন চিরদিনের জন্য মিলনসূত্রে বাঁধা পড়ল। আজ এই মধুর জ্যোৎস্না রাত্রে আমাদের প্রথম পরিচয়—!" কথাটা এইখানেই বাধিয়া গেল। তাহার সারা দেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। তাইত, এ কথাগুলা নেহাৎ নাটকের বাঁধা বুলির মতই শুনাইতেছে যে! আজিকার এ পরিচয়টুকু শুধু মৌন নির্ব্বাক দৃষ্টির মধ্য দিয়াই পরিস্ফুট করা ঠিক নয় কি! সে নিজেই যে আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে কবিতা লিখিয়াছে,

তুমি চেয়ে থাক আর আমি চেয়ে থাকি—
এ চাওয়ায়—পরিচয় থাকিবে না বাকী!

তবে?

ঠিক কি-ভাবে প্রথম পরিচয়টুকু জমাইয়া তোলা যায়, সুবোধ স্থির করিতে পারিল না। বন্ধুর দল নানা ইঙ্গিত দিয়াছিল; কিন্তু সবগুলা একসঙ্গে জোট পাকাইয়া সুবোধকে বিব্রত করিয়া তুলিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, হায়রে, বুদ্ধির দোষে জীবনের এই চরম ক্ষণটুকু নিষ্ফল আড়ম্বরেই বুঝি-বা কাটিয়া যায়!

শেষে একটা কথা মনে পড়িল। তখন সে পরিকে কহিল, "একবার বিছানা থেকে নেমে ঐ কার্পেটটায় বসবে?" পরি কোন কথা কহিল না। তাহার মনের কথা জানিবার জন্য মুহূর্ত্তকালও প্রতীক্ষা করা সুবোধ সমীচীন মনে করিল না। সময় না স্রোত চলিয়াছে! পরির হাত ধরিয়া তখন সে মৃদু টান দিল, বলিল, "এস, নেমে এস।" পরি এবার ঈষৎ নড়িল, নড়িতেই পায়ের মল বাজিয়া উঠিল। সুবোধ শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "চুপ্, চুপ্, মলের আওয়াজ নয়। সকলে শুনতে পাবে। মলটা খুলে ফেল—" মলের মুখরতায় বধূ সঙ্কুচিতা হইয়াছিল; সুবোধের সতর্কতার

ইঙ্গিতে লজ্জায় ঘোমটার আড়ালে ঈষৎ হাসিয়া মুখ বাঁকাইল। আনন্দে সুবোধের চিত্ত ভরিয়া উঠিল। এই যে, জীবনের স্পন্দন দেখা দিয়াছে! সুবোধ কহিল, "লক্ষ্মীটি, মল খুলে ফেলো।" পরি মল খুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার অসতর্ক হাতের স্পর্শে মল আবার বাজিয়া উঠিল, "ঝুন্-ঝুন্!" সুবোধ তখন হাত বাড়াইয়া মল ধরিয়া কহিল, "দাও, আমি খুলে দি। তুমি পারবে না।" পরি সুবোধের হাতটা সরাইয়া দিয়া মল খুলিয়া বালিশের পাশে রাখিল। সুবোধ সে করুণায় গলিয়া গিয়া চকিতে পরির মাথার কাপড় সরাইয়া তাহার অধরে ত্বরিতে একটা চুম্বন-রেখা অঙ্কিত করিল।

লজ্জায় তাহার মুখখানাকে ঠেলিয়া দিয়া পরি বালিশে মুখ লুকাইল। সুবোধের সর্ব্ব শরীর দারুণ আবেগে কাঁপিয়া উঠিল। পরিকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া সে বলিল, "লক্ষ্মীটি, নামো একবার। আচ্ছা, আমি নয় সরে যাচ্ছি।" সুবোধ সরিয়া গেল।

পরি নিঃশব্দে নামিয়া কার্পেটে আসিয়া বসিল। সুবোধ গদির তলা হইতে একরাশ কেতাব-পত্র টানিয়া বাহির করিল, ও নিজে পরির পাশে আসিয়া বসিয়া কহিল, "দুজনে একটু পড়ি, এস। এ জীবনটা কাব্যের আলোয় ভোরপুর করে রাখব আমরা, পরি। আমি নিজেও কবিতা লিখি। সেইগুলোই পড়ি, এস। তোমার জন্যে কতদিন ধরে প্রতীক্ষা করে আছি—তোমারি উদ্দেশে কত গান গেয়েছি, তুমিও পড়, দেখ।" কথাগুলায় কোন সায় না দিয়া পরি ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়াই বসিয়া রহিল। সুবোধ অত্যন্ত চাপা গলায় তাহার হৃদয়-নিঃসৃত কাব্য-গাথা পড়িতে লাগিল।

সে শুধু কবিতা পড়িয়া চলিয়াছিল, আর মাঝে মাঝে বাছা-বাছা ছত্রগুলায় বধূর তারিফ পাইবার আশায় ঘোমটার আবরণের পানে ব্যাকুল চিত্তে চাহিতেছিল। নিজের প্রেম-সঙ্গীতে তন্ময়, আত্মহারা হইয়া যখন সে ভাবিতেছিল, আজিকার এ জ্যোৎস্না-নিবিড় রাত্রিটি শুধু তাহারই জন্য উদয় হইয়াছে, মিলনের এই মধুর ক্ষণটি সত্য না বিভ্রম বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে যখন তাহার রোমাঞ্চ হইতেছিল এবং বধূর মধুর হৃদয়ে, শুধু প্রেম নহে, দিব্য একখানি শ্রদ্ধার আসনও সে পাতিতে সক্ষম হইয়াছে ভাবিয়া সানন্দে মৃদু কম্পিত কণ্ঠে যখন সে পড়িয়া চলিয়াছে,

মম হৃদয়-হরণে এসো মধুরা বালিকা,—
এস গো, তব কণ্ঠে দুলায়ে কুন্দ-কুসুম-মালিকা!

ঠিক এমনই সময়ে বধূ ঘুমে একেবারে বালিশের উপর ঢুলিয়া পড়িল। সুবোধের বুকে কে যেন একখানা পাথর ছুড়িয়া মারিল। খাতা বন্ধ করিয়া সে নিদ্রিতা বধূর পানে চাহিল। রাগ হইল। এই তাহার স্ত্রী—তাহার চিরজীবনের সকল সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী এ-ই! হায়, কবির হৃদয়-কুঞ্জের অজস্র পুষ্পিত তরু-লতা, আষাঢ়ের এই স্নিগ্ধ সজল বাতাস, এই আবেশ-করা পাখীর গান, এক অকরুণ হৃদয়ের নির্ম্মমতায় এক-নিমেষে পাষাণের স্তূপে পরিণত হইয়া গেল।

খাতা-পত্র গদির নীচে গুঁজিয়া রাখিয়া পরিকে উঠাইয়া সুবোধ শয্যাপ্রান্তে আপনার আহত স্বামি-মর্য্যাদাকে লুটাইয়া দিল।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে সে চাহিয়া দেখে, পরি ঘরে নাই। সে একেবারে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। বাহিরে কাহারা কথা কহিতেছিল—ফুলির স্বর কানে গেল! ফুলি হাসিয়া উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে অমনি মল বাজিল। রাগে সুবোধের গা জ্বলিয়া উঠিল। এ কি, তাহারই হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলাকে দুই পায়ে মাড়াইয়া ধরিয়া বাহিরে উহাদের উপহাস-নৃত্য চলিয়াছে, তবে! সুবোধ উঠিয়া বাহিরে গেল—যাইবার সময় বারান্দায় উপবিষ্টা ভগ্নী ও বধূর পানে জ্বালা-ভরা একটা চাহনি নিক্ষেপ করিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আহারের পর ফুলি আসিয়া দাদাকে যে সংবাদ দিল, তাহাতে তাহার চোখের সম্মুখ হইতে রঙ্গমঞ্চের চকিত-দৃশ্য-পরিবর্ত্তনের মত সমস্ত পৃথিবীখানা তাহার বিচিত্র হাসি-শোভা লইয়া কোথায় সরিয়া গেল ও তাহার স্থলে নিমেষে এক শ্মশানের দীর্ণ ভীষণ দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। বধূ পরিমলের বিদ্যার দৌড়, বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ অবধি! পরিমলের দিদি বয়সে তাহার চেয়ে ন' দশ বছরের বড়। বনিয়াদী জমিদারী-বংশের চিরপ্রথা ভাঙ্গিয়া বৃদ্ধা ঠাকুরমার সহস্র নিষেধ ঠেলিয়া ফেলিয়া বাঙ্‌লা-সংস্কৃত-ইংরাজী ত্রিবিধ বিদ্যায় তাহাকে পারদর্শিনী করিয়া তুলিবার জন্য পিতা ও স্বামীর গৃহে যখন রীতিমত চেষ্টা চলিতেছিল, ঠিক সেই সময় সে বিধবা হইল। বৃদ্ধা ঠাকুরমা কাঁদিয়া বলিলেন, "তখনই বলেছিলুম, এ বংশে মেয়েদের লেখা-পড়া শেখা সয় না—আমার সে কথা না মেনে মেয়েটার কি সর্ব্বনাশ করলি রে তোরা—", তখন নজীর-পত্রের আলোচনা করিয়াও জমিদার-পরিবার ভয়ে একেবারে কাঁটা হইয়া গেল। দেখা গেল, যে মেয়েরা বইয়ের পাতাও কখনও খুলে নাই, তাহারা পাকা মাথায় সিঁদুর পরিয়া বসিয়া আছে—আর যে দুই-চারিটা বালিকা স্বামী ও নিজের জিদে কেতাব ছুঁইয়াছে, সেইগুলাই কি না সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া চোখের জলে ভাসিয়া সারা হইতেছে! যাক্, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার ত আর চারা নাই। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সকলেই সতর্ক হইল। পরিমল দ্বিতীয়ভাগ পড়িতেছিল— ঠাকুরমার আদেশে তাহার সে ছেঁড়া কুণ্ডলী-পাকানো বইখানা একদিন অগ্নিদেবের জঠরে নিক্ষিপ্ত হইল এবং অন্তঃপুরে কেতাবের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

সুবোধ হতাশের মত ফুলির পানে চাহিয়া বলিল, "কিন্তু আমি ও-সব মানি না, ফুলি! তুই মানিস?"

ফুলির বুকটাও এ কথায় একবার ছাঁৎ করিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু দাদার মুখের পানে চাহিয়া তাহার সাহস বাড়িল। সে কহিল, "ও-সব দাদা, কপালের কথা। বই পড়ার সঙ্গে বুঝি তার আবার কোন সম্পর্ক আছে!"

সুবোধ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমি তাহলে বই আনব'খন। তুই ফুলি, ওকে একটু পড়াস।"

ফুলি কহিল, "কিন্তু আমি আর ক'দিনই বা আছি, বল। এর পর তোমার কাছেই শিখবে'খন।"

সুবোধ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগ! ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য বানান মুখস্থ করাইয়া—ওঃ, কত দিনে এই স্ত্রীকে সে তাহার কাব্যের সমজদার করিয়া তুলিবে! হায়রে, তাহার মনে কত সাধ ছিল, কত আশা—! বন্ধুদের স্ত্রীরা কত লেখাপড়া জানে—দুই-একজন কেমন পদ্যে চিঠিপত্রও লিখিতে পারে, আর তাহার অদৃষ্টে এ কি হইল? একে ত গৃহে কঠিন শাসনের চাপে পড়িয়া সে ভীষণ দুঃখ সহ্য করিতেছে—ভাবিয়াছিল, বিবাহ করিয়া বিদুষী পত্নীর সহানুভূতির সরস ধারার কবিত্বের ছোট চারাটিকে সে বড় করিয়া তুলিবে—পত্নীর প্রেমের ধারা পাইয়া সে গাছে কত ফুল ফুটিবে! কিন্তু 'অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল!' এখন বন্ধুদের কাছে এই নিরক্ষরা পত্নীর পরিচয় দিবে সে কি করিয়া! বন্ধুরা যখন তাহাদের স্ত্রীদের বিচিত্র গল্পে সন্ধ্যার আসর জমকাইয়া তুলিবে, তখন সে নির্ব্বাক হতাশে পরের গল্পই শুনিয়া যাইবে—নিজের বলিবার তাহার কিছুই থাকিবে না—! মূর্খ স্ত্রীর কাছে আদর-সোহাগের কিরূপ বচন, আলাপ-আপ্যায়নে কিই বা সরসতা সে প্রত্যাশা করিতে পারে! তাহার জীবনের ছন্দ চিরদিনের জন্য কাটিয়া গিয়াছে—মিল নাই, কোথাও মিল নাই—আগাগোড়া একঘেয়ে শুধু গদ্যের লাইন চলিয়াছে! কি এ দারুণ দুর্দ্দৈব!

দাদাকে নীরব দেখিয়া ফুলি টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একখানা বই নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "বৌদিকে কেমন দেখলে দাদা?"

সমস্ত পৃথিবীর উপর সুবোধের রাগ ধরিয়াছিল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "জানোয়ার!"

ফুলির সদ্য-স্নাত সুন্দর মুখে একটা মেঘের ছায়া পড়িল। সে চিন্তিতভাবে কহিল, "না দাদা, ভারী চমৎকার লোক। এমন মিশুনে, আর কথাবার্ত্তাগুলি কি মিষ্টি! কে বলবে যে লেখাপড়া জানে না! হাসিটুকু মুখে অমনি লেগেই আছে।" সুবোধের ইচ্ছা হইল, সে বলে, ও হাসি লইয়া তোরা ধুইয়া খা! কিন্তু বলিতে পারিল না।

ফুলি কহিল, "তোমার সঙ্গে বুঝি মোটে কথা কয়নি? আহা, কাল কম কষ্ট গেছে। সারাদিন—তবে'গে সেই রাত এগারোটা অবধি পুতুলের মত ঠায় বসে থাকা—এ কি মানুষে পারে, দাদা? তাই আর কি ঘুমিয়ে পড়েছিল!"

সুবোধ কহিল, "রামায়ণে কুম্ভকর্ণের ঘুমের কথা পড়ে মনে হত, সে শুধু কবির অতিরঞ্জিত কল্পনা। এখন আর আমার সে বিশ্বাস নেই।"

দাদার কথায় ফুলির হাসি পাইল। নিজের ফুলশয্যার কথা মনে পড়িল। কি সে ঘুম পাইয়াছিল। সারারাত্রি অনঙ্গ ঘুমাইতে দেয় নাই, কি জ্বালাতনই না করিয়াছিল! মুখে একটু ঘোমটা অবধি রাখিতে দেয় নাই! আর রাজ্যের যত বাজে গল্প, ছোট কথা! এখনও সে-সব মনে পড়িলে হাসি পায়!

ফুলি কহিল, "আজ আমি বৌদিকে দিনের বেলাতেই ঘুম পাড়িয়েছি—কড়া

পাহারা দিচ্ছি, কেউ না সে ঘুম ভাঙ্গায়! আজ রাত্রে দেখো, বৌদি চোখের পাতা মুড়বে না, একেবারে।”

ভগ্নীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় সুবোধের প্রাণ ভরিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া একখানা বাঁধানো নূতন উপন্যাস আনিয়া ফুলিকে কহিল, “এই নে। তুই সেদিন বলছিলি না ‘বিশ্বদীপ’ কাগজে ‘মাধুরী’ বলে যে উপন্যাস খানা বেরুচ্ছিল, তার শেষটা তুই পড়িস নি। সেটা বই হয়ে বেরিয়েছে—বেশ ভাল বই! তাই তোর জন্যে একখানা কিনে এনেছি। ওখানা তোকেই দিলুম।”

ফুলি দাদার পানে কৌতুক-হাসিমিশ্রিত দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া বইখানা হাতে লইল। দাদার এ ঘুষ দেওয়ার অর্থও সে বুঝিয়াছিল, অর্থাৎ বৌদিকে ব্রেক্ করিয়া দিতে হইবে। দাদার পানে চাহিয়া সে কহিল, “তোমার ত এখন আর কোন কাজ নেই, দাদা। তুমি বরং একটু ঘুমিয়ে নাও!”

সেদিন রাত্রে ফুলির চেষ্টায় বধূকে একটু সকাল-সকাল ঘরে পাঠানো হইল।

বধূ বিছানায় শুইয়াছিল—আপাদ-মস্তক একখানি রঙ-করা কাপড়ে ঢাকা। সুবোধ অত্যন্ত সতর্কভাবে নিঃশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া বধূর পাশে শুইয়া পড়িল! কিন্তু বধূকে সম্পূর্ণ অবিচলিত দেখিয়া এক মিনিট পরেই একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আত্মগতভাবে সে বলিল, “উঃ, এমনি মাথা ধরেছে!” যাহার উদ্দেশ্যে কথাটা বলা হইল, সে বেচারী তখনও কাঠের মতই নিঃশব্দে বিছানায় পড়িয়া ঘামিয়া সারা হইতেছিল এ কথায় একটুও সে নড়িল না।

সুবোধ দেখিল, ঔষধ ধরিল না। সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, আবার একটা স্বগত-উক্তি নিক্ষেপ করিল, “মাথা যেন খসে যাচ্ছে!” তবুও কোন দিক হইতে সহানুভূতির কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সুবোধ আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না, একেবারে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া খড়খড়ির পাশে আসিয়া বসিল। খড়খড়ির ওধারে সরকারদের বাগান। গাছগুলার উপর জ্যোৎস্না লুটাইয়া পড়িয়াছে! বাগানের ওপারে কে বাঁশী বাজাইতেছিল। সুবোধের মনে হইল, বাঁশীটি যেন তাহারই দুঃখে বড় করুণ সুরে কাঁদিতেছে! সুবোধ বাঁশী শুনিতে শুনিতে ভাবিতেছিল, এখনই পরি নামিয়া আসিয়া তাহার তপ্ত ললাটে কোমল হাত দুইটি বুলাইয়া দিবে! ঐ না, খাটটা নড়িয়া উঠিল! সুবোধ চাহিয়া দেখে, কোথায় কি! খাট নড়িল না, পরিও নামিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না।

সুবোধ ভাবিল, আর এভাবে অপেক্ষা করা ঠিক হইবে না। পাড়াগেঁয়ে মূর্খ বধূটা এখনই ঘুমে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে! সে ঘুমের পরিচয় আবার কাল রাত্রে দস্তুর মতই সে পাইয়াছে! সুতরাং আর নয়, এ যে অভিমান করিয়া নিজের পায়ে নিজেই সে কুড়াল মারিতে বসিয়াছে!

সুবোধ তখনই নামের মর্য্যাদা রাখিয়া শান্তভাবে আসিয়া বিছানায় ঢুকিল, এবং একেবারে শুইয়া পড়িয়া ফোঁস্ করিয়া একটা বড় রকমের নিশ্বাস ফেলিল। দুঃখে ক্ষোভে তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। হায়, নারীর প্রাণ এমনই পাষাণে গড়া!

ই নূতন অতিথিটির এতটুকু পরিচয় পাইবার লোভে সে একেবারে পাগল হইয়া উঠিয়াছে, ার ও-পক্ষে একটুও আগ্রহ নাই!

হঠাৎ যেন তাহার মনে হইল, কাহার াতের চুড়িতে রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে, াথার বাতাস গায়ে লাগিতেছে! সুবোধ াশ ফিরিল—ফিরিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে স অবাক হইয়া গেল। পরি বিছানায় সিয়া পাখার বাতাস করিতেছে! ঘোমটার াত্রা একটুও কমে নাই। পাখাটা লের পুতুলের মতই নড়িতেছে। সুবোধ উঠিয়া বসিয়া পরির হাত হইতে পাখা াড়িয়া লইল এবং তাহার মুখের ঘোমটা ুলিয়া দিয়া একেবারে তাহাকে বুকের ধ্যে চাপিয়া ধরিল।

সে রাত্রে বিস্তর বাজে কথার জালের ধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া যে কয়টি কাজের কথা সুবোধ বধূর কাছ হইতে উদ্ধার করিল, তাহা এই ঃ—

১। পরি দ্বিতীয় ভাগ ভুলিয়া গিয়াছে —তবে অক্ষরগুলা এখনও মনে আছে।

২। বাপের বাড়ীতে পড়িবার একে-বারেই সুবিধা হইবে না। ঠাকুরমার নিষেধ সেখানে এখন পূর্ণমাত্রায় রাজত্ব করিতেছে। তাহাকে বই খুলিতে দেখিলে অনর্থপাত হইবে; তবে এখানে যখন সে ঘর করিতে আসিবে, তখন সুবোধের কাছেই নিশীথের স্তব্ধ গোপন অবসরে লেখা পড়া শিখিতে তাহার কোন আপত্তি নাই।

৩। সুবোধকে পরির খুব পছন্দ হইয়াছে। সুবোধ বেশ সুন্দর। পরির ঠাকুরমা বলিয়াছিলেন, পরির বরের রূপে সভা আলো হইয়া গিয়াছে।

আনন্দের আবেগে বধূর অধরে সুবোধ কৃতজ্ঞতার ছাপ মারিয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহের আসর ভাঙ্গিলে বোনেরা শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল। যাইবার সময় টেঁপি বলিল, “দেখিস্, যেন পড়ায় অবহেলা করিস্‌নে,—পাশ না হলে বৌয়েরই সকলে দোষ দেবে।” ফুলি চুপি চুপি বলিল, “দাদা, মা কাল বলছিল, আমি লিখে দিচ্ছি, দেখে নিস্, সুবোধ কখ্‌খনো এবার পাশ হবে না। দেখো দাদা, পড়ায় গাফিলি দিয়ো না ভাই, ক’টা মাস বৈ ত নয়!”

ওদিকে শ্বশুরবাড়ী হইতেও এই ধুয়াই সে শুনিয়া আসিয়াছে। দিদিশাশুড়ী বলিয়া-ছেন, “বাঙলা বিয়ে চট্ করে যেমন পাশ করলে, তোমাদের ইংরিজি বি,এটাও তেমনি পাশ করে আমাদের পরির পয়টা রেখো দিকিন্!” শাশুড়ী জমিদারী বংশের প্রথা মানিয়া জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করিতে পারিলেন না—আড়াল হইতে বিধবা কন্যা অপর্ণার মারফৎ জানাইলেন, এ বৎসর ভাল করিয়া পড়িয়া পরীক্ষাটা চুকাইয়া দাও—ইত্যাদি।

সুবোধ জ্বলিয়া গেল। পাশ! পাশ! পড়া আর পড়া! জীবনটার সৃষ্টি হইয়াছে কি কেবলই কতকগুলা বই মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা-পাশের জন্যই! আর কোন কাজ নাই—উদ্দেশ্য নাই! এই যে বিশাল মানব-চিত্তে কত সাধ-আশার পুলক-নৃত্য চলিয়াছে

—তাহার পানে কেহ চাহিবে না! আনন্দ-রস বিশ্ব-ভুবনে অজস্র ধারায় উছলিয়া পড়িতেছে, তাহার এক ঝলকও পান করিবে না! ষ্টীম-রোলারের মতই কতক-গুলা ভারী কেতাব তাহাদের মামুলি বুলিটুকুকে মনের উপর পিষিয়া গাঁথিয়া দিলেই মানুষ চতুর্ভুজ হইয়া যাইবে না কি!

তাহার পর সুবোধের সুকঠিন বিরহ-তপ আরম্ভ হইল। দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ মাস ধরিয়া পরির ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকুকে অবলম্বন করিয়াই তাহার দিন কাটিতে লাগিল। চিঠি লিখিয়া ফল নাই—ওদিক হইতে কোন স্পন্দনই মিলিবে না! লিখিলেও পরি সে চিঠির মর্ম্ম বুঝিবে না—ঐক্য-বাক্যের বানানই সে ভুলিয়া গিয়াছে! আর-কেহ চিঠি পড়িয়া যদি জবাব লিখিয়া দেয়? কিন্তু হায়, সে পরের লেখায় পরির হৃদয়ের কতটুকুই বা সন্ধান মিলিবে! অপরের মারফতে হৃদয়-ভাব জানানো—সে ত প্রহসনের অভিনয় করা! কাজেই চিঠি লিখিয়া যখন ফল নাই, তখন সে নূতন করিয়া খাতা বাঁধিয়া তাহারই সাদা পৃষ্ঠায় বিরহের ঢেউ তুলিল।

মার পানে চাহিয়া আবার পাঠ্যগ্রন্থ-গুলাকেও এ দুর্দ্দিনে খুলিয়া বসিতে হয়। কিন্তু চোখ যখন ইংরাজী হরফগুলার উপর শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, মন তখন কল্পনার রঙীন ফানুষে চড়িয়া কোথায় সুদূরে এক অজানা পল্লীর গৃহের কিনারে উড়িয়া বেড়ায়। অজানা পথে, অজানা ঠাঁইয়ে অবলম্বন কিছুই মিলে না! ব্যর্থতার ঘা খাইয়া কল্পনার ফানুষ ছিঁড়িয়া চূর্ণ হইয়া যায়—মনটাও ক্ষতবিক্ষত হইয়া ফিরিয়া আসে।

এমন সময় হঠাৎ একদিন একটু সুরাহার সম্ভাবনা ঘটিল। মার আদেশে শ্বশুরবাড়ীতে সে পূজার নিমন্ত্রণ রাখিতে গেল। অনেক-খানি আশা লইয়াই সে গিয়াছিল, কিন্তু ফিরিল, নিরাশার তীরে বুক ছিঁড়িয়া। সেখানে যেদিন সে পৌঁছিল, সেদিন দিনের বেলায় পরির দেখা মিলিল না, বাড়ীর বাহিরের লোক তাহাকে লইয়া অস্থির! রাত্রিটা যাত্রার আসরে 'রাবণ-বধে'র পালা দেখিয়াই কাটিল। দ্বিতীয় দিনে দুপুরবেলায় সে আশা করিয়াছিল, পরির দেখা মিলিবে—শেষে অধীর প্রতীক্ষায় মধ্যাহ্ন যখন অপরাহ্ণের গায় ঢলিয়া পড়িয়াছে, তখন অর্পণা আসিয়া কৈফিয়ৎ দিল, কাল সারারাত্রি জাগিয়া যাত্রা শুনিয়া পরি আজ ঘুমে কাদা হইয়া ঢুলিয়া পড়িয়াছে—মুখে অবধি কিছু দেয় নাই! সুবোধের সর্ব্বাঙ্গে কে যেন কাঁটার চাবুক মারিল। এই তাহার স্ত্রী! ইহারই উদ্দেশে সে পড়া ফেলিয়া রাত্রি জাগিয়া কবিতা রচনা করিয়াছে! রাগে অভিমানে সেই রাত্রেই সে বাড়ী ফিরিল। আসিবার সময় নিমেষের জন্য পরির সঙ্গে দেখা হইলে সে অভিমানের দুইটা ফাঁকা গর্জ্জন ছাড়িয়াছিল; কিন্তু পরির মৌনতার বর্ম্মে ঠেকিয়া সে গর্জ্জন শুধু শূন্যে মিশাইয়াছে, চিত্তে তাহার বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য তুলিতে পারে নাই।

মাঘ মাসে ফুলির শ্বশুরবাড়ীর সকলে পশুপতিনাথ-দর্শনে বাহির হইল। অনঙ্গও ভগ্নীপতির সঙ্গে বোম্বাই বেড়াইতে গেল। ফুলিকে তাহার শাশুড়ী বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

ফুলি আসিলে মা কিন্তু প্রথমেই সুবোধের সম্বন্ধে অনুযোগ তুলিলেন। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে। ছেলের পড়ার ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া ইচ্ছা থাকিলেও বধূকে তিনি এখানে আনেন নাই—কিন্তু ছেলের অন্যমনস্ক উদাস ভাব তাহার সতর্কতা-সত্ত্বেও তাঁহার নজর এড়ায় নাই। বই খুলিয়া ছেলে যে আকা-শের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, তাহাও মার চোখে পড়িয়াছে। তাঁহার বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে। এখন যাহা হৌক, সুবোধের বয়স হইয়াছে, ভাল-মন্দও বিলক্ষণ সে বুঝিতে শিখিয়াছে। বৌ ত আর পলাইবে না, এ কথা কেন সে বুঝিতে পারে না! অথচ এ অবহেলা তাহার পাওনা-গণ্ডা কড়াক্রান্তিতে উসুল করিতে ছাড়িবে না ত! আর তিনি কি চিরদিনই এমন গোয়েন্দাগিরি করিয়াই কাটাইবেন! পূর্ব্বে তাহা বেমানান ছিল না—এখন যে মাঝখানে বৌ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ভাল দেখায় না। এখন কোন কথা বলিতে গেলে বৌয়ের গায়ে ঠেশ লাগিবে! তিনি মা, কাজেই তাঁহাকে এখন নিরুপায়ে চুপ করিয়া চোখেই শুধু সব দেখিয়া যাইতে হয়—অস্বস্তি ধরে, গা নিষপিষ করে, তবু কোন কথা মুখ ফুটিয়া বলা চলে না! ছেলে পাছে ভাবে, বৌয়ের উপরই বুঝি মার যত-কিছু আক্রোশ!

দুপুরবেলা সুবোধ আপনার উপরের ঘরেই চোখের সম্মুখে মার্টিনো খুলিয়া খাটে শুইয়া ছিল। নীতিবিজ্ঞানের বড় বড় উপদেশগুলা মনে ঢুকিবার দিকে যখন কোন স্পৃহা দেখাইতেছিল না, তখন ফুলি আসিয়া ডাকিল, "দাদা—"

সুবোধ বই মুড়িয়া কহিল, "কি ফুলি, —আয়। ইস্, তুই যে বড্ড রোগা হয়ে গেছিস্ রে। কোন অসুখ করেছিল?"

ফুলি কহিল, "না।"

সুবোধ এই ক্ষণটুকুরই প্রতীক্ষায় ছিল। সে জানিত, ফুলি এ ঘরে আসিবেই। তাই সে আহার সারিয়া আজ আর বাহিরে যায় নাই, একেবারে উপরের ঘরে উঠিয়াছিল।

ফুলি কহিল, "বৌদির খপর কি, দাদা? চিঠিপত্র লেখে?"

সুবোধ হতাশের হাসি হাসিয়া বলিল, "লেখাপড়া কি জানে যে লিখবে!" তারপর সুবোধ একেবারেই আপনার অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা পাড়িয়া বসিল। স্ত্রী বাপের বাড়ীতে আছে, ইহাতে কিছু আসিয়া-যায় না; কিন্তু লেখাপড়া শিখিবার পক্ষে এই যে তাহার যোগ্য কোমল বয়সটুকু ঔদাস্যে অবহেলায় কাটিয়া যাইতেছে, ইহার উপায় কি হইবে! বেশী বয়সে লেখাপড়া শেখা কি সহজ ব্যাপার—বিশেষ যাহাকে বানান মুখস্থ করিয়া পড়িতে হইবে! সে স্পষ্টই বলিল, এখনও যদি চেষ্টা করা যায় ত পরির কিছু আশা আছে, কিন্তু সেখানে বই খুলিলে বিষম গোল বাধিবার আশঙ্কা! আর দুই-এক বছর পরে তাহাকেও কাজের মধ্যে বিব্রত থাকিতে হইবে, তখন পড়াই-বার বা পড়িবার কাহারও অবসর মিলিবে না! সুতরাং পরি যে মূর্খ, সেই মূর্খই রহিয়া যাইবে এবং তাহারও ভবিষ্যৎ একেবারে শোচনীয়। এই ভবিষ্যতের

ভাবনায় তাহার নিজের জীবনটাও বুঝি বা একদম বিফল হইয়া যায়!

ফুলি কহিল, "তোমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে? যদি পাশ করতে না পারো, তাহলে আমাদের দুই বোনের আর মুখ থাকবে না কিন্তু। জানই ত, মার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না।"

রোগীর মুখের হাসির মতই সুবোধ ম্লান হাসি হাসিল, কহিল, "সে এক রকম হচ্ছে, মন্দ নয়। মোদ্দা তুই এখানে কদ্দিন আছিস্ এবার?"

"বোধ হয়, মাস দুয়েক থাকতে পাব। ফাল্গুনের শেষে আমার শাশুড়ী তীর্থ থেকে ফিরে আমাকে নিয়ে যাবেন।"

"তাহলে—" কি, তাহলে? কথাটা সুবোধের মুখে বাধিয়া গেল। ফুলি বুঝিয়া লইল। সে কহিল, "বৌদিকে আনাব, মাকে বলে? দিদিও নেই, না হলে একলাটি এ একমাস থাকি কি করে! বৌদি এলে তবু একজন সঙ্গী পাব। কিন্তু তোমায় একটা কথা দিতে হবে, এবার পাশ করবে তুমি, বল, আর বৌদির সঙ্গে দিনের বেলায় মোটে দেখা-শোনা হবে না।"

সুবোধ অবাক হইয়া ফুলির পানে চাহিল। সেও এমন কঠিন কথা কয়! ফুলি দাদার ভাব বুঝিয়া হাসিয়া কহিল, "তা বলে মোটেই কি দিনের বেলা দেখা হবে না, তা নয়। তবে এগজামিনের আগে খুব কম, সে—ক্বচিৎ! কি বল?"

সুবোধ তখন মরিয়া হইয়া ভগ্নীকে বুঝাইল, এই যে বাঙ্গালীর দাম্পত্য জীবনে এত দুঃখ—এতটুকু কাব্য নাই, সরসতা নাই—এ শুধু এই বর্ব্বর প্রথার ফলেই! কেন, স্ত্রীর সহিত দিনের বেলায় দেখা হইলে কি এমন অপরাধ হয়! সেই কখন্—রাত্রে সকলে শয়ন করিলে নিভৃত অবসরে মুখর নূপুর খুলিয়া ফেলিয়া স্ত্রী নিতান্তই নীরব গতিতে স্বামি-সম্ভাষণে আসিবে! এ প্রথা যে নেহাৎ কুৎসিত, অত্যন্ত বর্ব্বর, সমস্ত নারীজাতির প্রতি দারুণ অসম্মান যে এই প্রথায় স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে, তাহারও ইঙ্গিত দিতে সে ছাড়িল না। রাত্রে উভয়ের কতটুকু পরিচয়ের সম্ভাবনা! সংসারের সহিত সারা দিন সংগ্রাম করিয়া দুখানি হৃদয় যখন একান্ত শ্রান্ত, বিশ্রামের কোলে মাথা রাখিবার জন্য ব্যাকুল, তখন তাহারা আপনাদের স্ফুটনোন্মুখী সাধ-আশার কতটুকু পরিচয় পরস্পরকে দিতে পারে! সে ক্ষুদ্র অবসরে কতটুকুই বা সম্ভব হয়! ইহারই ফলে এক সংসারে বাস করিয়াও দুইটি প্রাণী চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক থাকে, সহানুভূতির এক তারে হৃদয় দুটি বাঁধা পড়ে না, প্রাণের পরিচয়ও চির-অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়! কাজেই ভবিষ্যৎ জীবনে বাঙ্গালীর অশান্তির আর সীমা থাকে না।

এই দীর্ঘ বক্তৃতায় দাদার মনের সবটুকুই ফুলির চোখে পড়িয়া গেল। অহরহ এক তীব্র ব্যাকুলতায় দাদা যে ছট্‌ফট করিতেছে, তাহা সে বুঝিল! ইহাও বুঝিল, দূরে থাকিয়া দাদার মনের দ্বারে বৌদি এমন ঠাঁইজোড়া আসন পাতিয়া বসিয়া আছে যে বেচারা মার্টিনো-সেক্সপীয়র মনের মধ্যে ঢুকিতে আসিয়া দ্বারের সম্মুখে ইঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে মাথা নীচু করিয়া পলাইয়া যায়! দাদার পাশের জন্য তাহার ভাবনা হইল,

নৈরাশ্যে দুঃখও যে না হইল, এমন নয়!

কিন্তু তাহার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ! কাব্যটুকুও তাহার জীবনে এতদিনে থিতাইতে পারিয়াছে। জীবনের গদ্য ও পদ্য—দুইটা দিকই সে এখন বুঝিত ভাল। তাই সে মাকে ধরিয়া ফাল্গুনের প্রথমেই বৌদিকে আনাইয়া ফেলিল। সুবোধ পূর্ব্বাহ্নেই এক-খানি বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ সংগ্রহ করিয়াছিল।

বহির্জগৎ তখন হিম-জর্জ্জর শীতের শেষে নব বসন্তের অপরূপ শ্যামশোভায় ভরিয়া উঠিতেছে। পাখীর গানে, ফুলের গন্ধে, নবপল্লবের চিক্কণ বর্ণে চারিধার উজ্জ্বল। সুবোধের হৃদয়-রাজ্যেও নব বসন্ত দেখা দিল। রঙীন ফুলে প্রাণটা রাঙিয়া উঠিল, রাজ্যের কোকিল-শ্যামা সেখানে গান ধরিল। দ্বিতীয়ভাগের ঐক্য-বাক্য-মাণিক্যের বানান-গুলাতেও প্রতি রাত্রে অজস্র হীরা-মাণিক্য ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। চারিদিকে ফাল্গুন জাগিল!

সারাদিন গারদের কয়েদীর মতই বড় বড় বইয়ের আড়ালে হাঁপাইয়া মরিতে হয়—কিন্তু সে কষ্ট কষ্ট বলিয়া তাহার মনেও হয় না। কারণ এই দীর্ঘ গদ্যময় দিনের পর যে রাত্রি আসে, তাহা পদ্যের মিলে ভরা! যেমন বিচিত্র সে পদ্যের ছন্দ, তেমনই মধুর তাহার ভাব!

কিন্তু দুই নৌকায় যাহারা পা দিয়া চলে, তাহাদের যেমন তলাইয়া যাইতে বিলম্ব হয় না—সুবোধেরও সেই দশা ঘটিল। গদ্য ও পদ্যের মাঝে পড়িয়া সেও একদিন তলাইয়া গেল, অর্থাৎ সেবার বি, এ পরীক্ষার ফল বাহির হইলে গেজেটে সুবোধের নামটা কেহ খুঁজিয়া পাইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফেলের খবরে বোনেরা দুঃখ করিয়া চিঠি লিখিল, শ্বশুর সান্ত্বনা দিলেন, আশা দিলেন; মা কিন্তু ভাল-মন্দ কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার এই মৌন তিরস্কার সুবোধের গায়ে কাঁটার মত বিঁধিল। ইহার চেয়ে মা যদি কতকগুলা রূঢ় ভর্ৎসনা করিতেন, তাহা হইলে তাহার নিজের মনের সঙ্গে সে একটা বোঝা-পড়া শেষ করিয়া ফেলিতে পারিত। বৃষ্টি ও ঝড় প্রচণ্ড হইলেও সহা যায়, গুমট একেবারেই অসহ্য!

যেদিন ফেলের খবর আসিল, সে-রাত্রে যথাসময়ে শয়নকক্ষে ঢুকিয়া সুবোধ দেখে, পরি বালিশে মুখ গুঁজিয়া বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। সে নিতান্ত অপরাধীর মত তাহার কাছে গিয়া বসিল, ও গলাটাকে যথাসম্ভব কাঁপাইয়া ডাকিল, "পরি—"

পরি মুখ তুলিয়া কহিল, "যাও, কেন তুমি ফেল হলে?" পরি কাঁদিয়া ফেলিল।

এত দুঃখেও সুবোধের হাসি পাইল। সে কহিল, "ইচ্ছে করে ফেল হই নি।"

"তবে কেন হলে?"

এ কেন'র জবাব দেওয়া কঠিন। সুবোধ কহিল, "যাক্, যা হয়ে গেছে, তা

নিয়ে ভেবে আর কি হবে? এখন তোমার বই আর খাতা নিয়ে এসো।"

পরি আঁচলে চোখ মুছিয়া অভিমানের সুরে বলিল, "না, আমি কখ্‌খনো পড়ব না, কখ্‌খনো না—যতদিন না তুমি পাশ কর।"

সুবোধ কহিল, "সে ত এখন পূরো এক বছরের কথা। এই এক বচ্ছর তুমি বই খুলবে না, মোটে?"

"না।"

এ 'না'র অর্থ সুবোধ বুঝিত। পরি একবার যেটাতে 'না' বলিত, সেটাতে তাহাকে 'হাঁ' বলানো বড় কঠিন। সুবোধ ভাবিল, এই সুদৃঢ় 'না'র পিছনে নিশ্চয় আর কাহারও নেপথ্য-ইঙ্গিত আছে! সে কহিল, "মা কি বললে?"

পরি কহিল, "কিছু না। ও বাড়ীর গিন্নি বলছিল, তাই ত অমুক ফেল হল! তা মা বললেন, তিনি ত আর পড়া গিলিয়ে দিতে পারেন না। এখন ও বড় হয়েছে, যা ভাল বুঝবে, তাই করবে!"

"হুঁ—" বলিয়া সুবোধ বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। পরি কহিল, "কি ভাবছ?"

সুবোধ কহিল, "আমি ফেল হয়েছি বলে আমার উপর তোমাদের খুব ঘৃণা হয়েছে, না?"

পরি এই ঘৃণা কথার অর্থটা ঠিক আয়ত্ত করিতে পারিল না, তাই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নিরুত্তরেই স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

সুবোধ কহিল, "বল—"

পরি বলিল, "আমার মনে বড্ড কষ্ট হয়েছে। শুনেছি, ঠাকুর জামাইয়েরা কখনও ফেল হন্‌নি। আর তুমি ফেল হলে!"

সুবোধ কহিল, "আমি একা নই, আমার মত আরও ঢের হতভাগা ফেল হয়েছে।"

পরি এমন ভঙ্গীতে সুবোধের দিকে চাহিল যে সুবোধের মনে হইল, কথাটা পরি বিশ্বাস করে নাই! পরি স্বরে একটু ঝাঁজ দিয়া বলিল, "আমায় পড়বার জন্যে বকো—নিজে ত এই পড়া করতে পার না।"

কথার হুলটা সুবোধের বুকে বিঁধিল। ঘরে ঢুকিয়া পরির চোখে জল দেখিয়া সে অনেকখানি আনন্দ পাইয়াছিল—এমন প্রাণ-ভরা সমবেদনা ঘরের কোণে সঞ্চিত থাকিলে হাজার বার সে পরীক্ষায় ফেল হইতে পারে—কোন দুঃখ নাই! ফেল হইয়া সে ভাবিয়াছিল, রাত্রে আজ আপনার নিভৃত গৃহের কোণটিতে করুণ রসের দিব্য অভিনয় জমাইয়া তুলিবে। পরির চোখের জল তাহার আভাষও বেশ দিয়াছিল! কিন্তু এই শ্লেষ—তাহার অক্ষমতায় এই বিদ্রূপ! না, অশ্রুটা তবে কপট,—তাহার কোন মূল্যই নাই! হায়!

ইতিমধ্যে ফুলি একদিন বেড়াইতে আসিয়া দাদাকে গোপনে বলিল, এবার ভাল করিয়া পড়িয়া তাহাকে পাশ করিতেই হইবে। ঘরে-বাহিরে সকলে বধূকেই নিন্দা করিতেছে—এতদিন তবু সে যা-হোক ঠুক্‌ঠুক্ করিয়া পাশ করিয়া আসিতেছিল, আর যেই বৌ আসিল—

সুবোধ ফোঁস করিয়া উঠিল, "লোকের এ অন্যায়। বৌ ত আর আমার বই কেড়ে রাখেনি!"

ফুলি কহিল, "মা বলছিল, মা আর

কোন কথায় থাকবে না। লেখাপড়ার সম্বন্ধে কিছু বলবেও না।"

সুবোধ স্থির করিল, আর সে অন্দরে ঢুকিবে না, পরির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও করিবে না—এবং এই সকল কঠোরতা অবলম্বন করিয়া আবার ফেল হইয়া দেখাইবে যে বধূর সহিত এ ব্যাপারের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই! পরমুহূর্ত্তেই আবার তাহার মনে হইল, ফেল হইয়া ফল কি! কেহ ত তাহার দুঃখে সহানুভূতি জানাইবে না। ঘৃণায় লজ্জায় নিজেই সে মাটি হইতে থাকিবে! তাহার চেয়ে—বেশ, শুধু সে বই লইয়াই একটা বৎসর পড়িয়া থাকিবে, বউয়ের ত্রিসীমা মাড়াইবে না। ফুলি কহিল, "এবার ভাল করে পড়বে ত?"

সুবোধ কহিল, "এবার পাশ করবই। না পারি, সংসার ত্যাগ করব।" এই সব বৈরাগ্যের বক্তৃতা ফুলির যেন বিষ বোধ হইত। সে আর-কিছু না বলিয়া বৌদিকে কি-কতকগুলা উপদেশ দিতে চলিয়া গেল।

সুবোধ কঠোর হইল। জীবনটা শুধুই গদ্য, যতিহীন, ছন্দহীন গদ্য! এই গদ্যের চাপেই সে আপনার প্রাণের পদ্যটুকুকে পিষিয়া চূর্ণ করিবে। এই পাশের ফাঁস লাগাইয়া জীবনের যা-কিছু মাধুরী সব সে হত্যা করিবে!

সে রুটিনে আপনাকে বাঁধিয়া ফেলিল। পড়া,—আর পড়া! সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার শুধু গড়ের মাঠে বেড়াইতে বাহির হয়—রাত্রে সকলে শয়ন করিলে যখন সে বই মুড়িয়া শয্যায় আসিয়া আশ্রয় লয়, তখন পরি নিদ্রায় অচেতন! বাতাসে তাহার সুন্দর মুখে অলকগুচ্ছ উড়িয়া পড়ে, কখনো বা জ্যোৎস্না মাখিয়া সে মুখ অপূর্ব্ব রমণীয় দেখায়, সুবোধ নির্নিমেষ নেত্রে সে শোভা নিরীক্ষণ করে। তাহার বুকের মধ্যে চঞ্চল রক্তস্রোত তোলপাড় করিতে থাকে, কিন্তু সজোরে আপনার মনকে চাবকাইয়া সে এই দুর্ব্বলতাটুকুকে তাড়াইয়া দিয়া একেবারে অন্য দিকে পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়ে। মাঝে মাঝে ক্ষোভে তাহার সারা চিত্ত টন্‌টন্ করিয়া উঠে। তাহার এই মৌন অভিমান পরির চিত্তে এতটুকু চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি করে না! সাধিয়া সে নিজে কোনদিন সোহাগ করিতে আসে না! তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয়, সে যেন বর্ত্তাইয়া গিয়াছে! হায়রে, এত বড় দুঃখ সংসারে থাকিয়া কে কবে সহ্য করিয়াছে!

তবুও থাকিয়া থাকিয়া তাহার দুর্ব্বল মন কাঁপিয়া উঠে! মাঠে বেড়াইতে গিয়া যখন সে দেখে, ইংরাজ প্রেমিক-প্রেমিকা হাতে-হাতে মালা গাঁথিয়া প্রাণে অপরূপ কাব্য ফুটাইয়া ধীর-মন্দ গমনে বেড়াইতেছে, তখন আপনার দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া সে আগুন হইয়া উঠে। সব থাকিয়াও তাহার কিছুই নাই! আহা, ইহাদেরই জন্ম সার্থক—জীবনের মূল্য ইহারাই শুধু বুঝিয়াছে! আর অধম বাঙ্গালী তরুণ বয়স হইতেই কাব্যের পুষ্পময় পথটাকে দূরে রাখিয়া ভীষণ গদ্যের পথে জীবনটাকে ছিঁচড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে!

সেদিন মন তাহার অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল! মাঠে বন্ধু সুরেশের সঙ্গে দেখা

হইল। স্ত্রীকে লইয়া মাঠে সে প্রায়ই বেড়াইতে আসে। জ্যোৎস্নায় চারিধার যখন ভরিয়া যায়, দুইজনে তখন একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়ে—স্ত্রী বনলতা মৃদু কণ্ঠে প্রেমের গান গায়—আর তাহারই কোলে শ্রান্ত শির রাখিয়া সুরেশ স্বপ্নলোকে উধাও হইয়া যায়! স্ত্রীকে লইয়া এই বয়সে এ কাব্যটুকু যদি উপভোগ করা না গেল ত এ বয়স, আর এ শোভার সৃষ্টি হইয়াছিল কেন!

ঠিক! সুবোধ ভাবিল, একদিন ছুটি চাই, একদিন ছুটি। পড়ার চাপে প্রাণটা যে গুঁড়াইয়া ধূলা হইয়া গেল! সে স্থির করিল, পরিকে বলিয়া-কহিয়া রাজী করাইয়া একদিন সে মাঠে আনিয়া জীবনকাব্যটুকু পরিপূর্ণ উপভোগ করিবে। পরিকে সে স্পষ্টই বলিবে, একটা দিন শুধু আমার পানে ফিরিয়া চাও। তারপর আবার আমি কেতাবের গহন বনে ব্রহ্মচারী সাজিয়া প্রবেশ করিব! যদি পরি এ কথা না রাখে, তাহা হইলে? তাহা হইলে সে এমন উৎকট প্রতিশোধ লইবে যে সারা বিশ্ব তাহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবে!

বাড়ী আসিয়া সুবোধ দেখিল, চাঁদের আলোয় নীচের দালান ভরিয়া গিয়াছে আর দালানের একধারে বসিয়া জ্যোৎস্না-টুকুকে উপহাস করিয়াই পরি আনাজ কুটিতেছে! মা তাহার পদশব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "ওরে তুই ত পড়াশোনা এখন বেশ করছিস্—আমার চৌকিদারির আর দরকার নেই। বেশ, এমনি করে পড়্ দেখি। তা শোন্, ও বাড়ীর ওঁরা এই জন্মাষ্টমীতে জগন্নাথ দেখতে যাচ্ছেন। আমিও যাই ওঁদের সঙ্গে,—কি বলিস?"

সুবোধ ভাবিল, বাঃ, চমৎকার সুযোগ মিলিয়াছে ত! প্রথমে একটু অনুযোগের সুর তুলিয়া মাকে সতর্কতার উপদেশ দিয়া সহজেই সে রাজী হইয়া গেল। মা খুসী হইয়া বলিলেন, "এখানকার সব গোছ-গাছ আমি করে রেখে যাচ্ছি। বৌমা শুধু ভাঁড়ার বের করে দেবে, তরকারীগুলো কুটে দেবে—বামনীই সব দেখে-শুনে নেবে'খন। কোন কষ্ট হবে না। আমি তিন দিনেয় মধ্যেই ফিরব। কাল রাত্রের গাড়ীতে যাব—তা কাল হল শনিবার—আবার সোমবার রাত্রে বেরিয়ে মঙ্গলবার সকালে এখানে এসে পৌঁছুব। কোন ভাবনা নেই।"

মা চলিয়া গেলে পরিকে নিজের মতে আনিতে বেশী বেগ পাইতে হইল না। সুবোধ বুঝাইল, একটা দিন শুধু সে ছুটি চায়! ইহার পর পড়ায় মনটাকে আরও বেশী করিয়া সে লাগাইতে পারিবে। পরি বই ছাড়িয়া বাঁচিয়া ছিল, তাহাকে যে আবার ঘুম-চোখে দ্বিতীয় ভাগের বানান মুখস্থ করিতে হইবে না, ইহাতে সে বর্ত্তাইয়া গেল। এ প্রস্তাবে সে রাজী হইল।

রাত্রি দশটার সময় বাড়ীর সকলে খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শয্যায় ঢুকিলে সুবোধ চুপি চুপি যাইয়া একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিল। বাড়ীর একটু দূরে গাড়ী রাখিয়া সে পরির হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিল। গাড়ী সদর্পে গড়ের মাঠের দিকে ছুটিল।

গাড়ীতে বসিয়া মাঠ প্রদক্ষিণ করিয়া

পরে পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে গাড়ী রাখিয়া সুবোধ পরিকে লইয়া মাঠে চলিল। গভীর রাত্রি! কোথাও কেহ নাই, তবুও পরির পা জড়াইয়া যাইতেছিল। মুখের ঘোমটা দীর্ঘভাবে টানিয়া সুবোধের হাত ধরিয়া সে একরকম ঝুলিয়াই মাঠে চলিল। সুবোধের বুকের মধ্যে কে যেন ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া মুগুরের ঘা মারিতেছিল। গাড়ী হইতে দূরে আসিয়া গাটাও একবার একটু কাঁপিয়া উঠিল।

উভয়ে একখানা বেঞ্চে আসিয়া বসিল। চারিধারে বড় বড় গাছ ছায়া-নিবিড় কুঞ্জ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। পাতায়-ঘন শাখায় দুই একটা পাখী তখনও ঝট্-পট্ শব্দ করিতেছিল। সুবোধ কহিল, "মাঠের মধ্যে আবার এতখানি ঘোমটা দিলে কেন? কে আছে এখানে? ছি!"

পরি কহিল, "না বাবু, আমার ভয় কচ্ছে। এ কোথায় এসে বসলে! তার চেয়ে গাড়ী করে বেড়ালেই ত চল্‌ত! চল, বাড়ী যাই।"

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "বাঃ, আমি রয়েছি, ভয় কি!"

কিন্তু সুবোধেরও যে একটুও ভয় হয় নাই, এমন নহে। কিছুকাল পূর্ব্বে ষ্টার থিয়েটারে সে "বাবু" প্রহসনের অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছিল, তাই সে ভাবিতেছিল, হঠাৎ যদি একটা মাতাল গোরা কোন দিক হইতে আসিয়া পড়ে! ঐ ত কেল্লা! পথ হইতে এতটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছে! তাই ত! ডাক দিলে কেহ সাড়াও পাইবে না যে! এই রাত্রে এত দূরে আসিয়া বসাটা ঠিক হয় নাই। স্তব্ধ বিজন মাঠ! তাহার উপর আকাশে চাঁদ নাই—খণ্ড মেঘগুলা ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। সুদূর পথ হইতে গ্যাসের আলোগুলা শুধু ঈষৎ সঙ্কোচে চোখ মেলিয়া এই তরুণ বাঙালী দম্পতীর অপূর্ব্ব প্রেমলীলার অভিনয় দেখিতেছে!

সুবোধ পরির হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "এসো, একটু বেড়াই।" পরির সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, ভয়ে জিভ শুকাইয়া আসিয়াছিল, তাহার মুখে কোন কথা সরিল না। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দূরে বির্জ্জিতলার গির্জ্জার ঘড়িতে ঢঙ্ করিয়া একটা বাজিল। সুবোধ কহিল, "একটা! এস তবে, গাড়ীতে উঠি।"

পথের ধারে আসিয়া গাড়ীর দেখা মিলিল না। সুবোধের রাগ হইল। ষ্ট্যাণ্ডেও আর গাড়ী নাই! সে তখন প্রমাদ গণিল। তাই ত, উপায়? হাঁ, এক উপায় আছে! ধর্ম্মতলার দিকে অগ্রসর হইলে গাড়ী মিলিতে পারে। সুবোধ তখন পরিকে লইয়া ধর্ম্মতলায় চলিল।

মিউজিয়মের সম্মুখে এক বিপদ ঘটিল। পুলিশের এক জমাদার আসিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। কে তাহারা—এত রাত্রে মাঠের ধার দিয়া কোথায় চলিয়াছে? কৈফিয়ৎ চাই! জমাদারের কঠোর স্বরে পরি ভয়ে কাপড়ের আবরণের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। সুবোধ কম্পিত কণ্ঠে পরিচয় দিল—এবং এ পথে আসিবার উদ্দেশ্যও কতক বাদ-সাদ দিয়া খুলিয়া বলিল।

পাকা লোক বলিয়া জমাদারের মনে একটা অহঙ্কার ছিল। সে হাসিয়া বলিল,

স্ত্রীকে লইয়া কোন বাঙালী ভদ্রলোককে এত রাত্রে মাঠে বেড়াইতে—এত বছর সে পুলিশে চাকরি করিতেছে—কখনও চক্ষে দেখে নাই। সে স্পষ্টই বলিল, তাহার সন্দেহ হইয়াছে; এবং উভয়কেই সে থানায় লইয়া যাইবে!

ভূমিকম্পের বেগে পৃথিবীখানা দুলিয়া উঠিল। থানায় যাইতে হইবে? কেন! সে কি চোর না বদমায়েস! জমাদার হাসিয়া বলিল, এত রাত্রে স্ত্রীকে কাপড়ে মুড়িয়া পথে হাওয়া খাইয়া বেড়ানোর কেশ সে আরও দুই-চারিটা ধরিয়াছে। তাহার চোখে ধূলা দেওয়া সহজ নহে। যে-সব বাবু স্ত্রীকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হয়, তাহারা এত রাত্রি অবধি মাঠে থাকে না, তাহাদের স্ত্রীর পায়ে জুতা থাকে এবং এতখানি আবরণেরও তাহাদের প্রয়োজন হয় না! এ জ্ঞানটুকু খোট্টা হইলেও চাকরির কল্যাণে তাহার বিলক্ষণ আছে।

সুবোধ জ্বলিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, এক চড়ে এই বর্ব্বরটার দাঁতের পাটি সে উড়াইয়া দেয়! তাহার এ কুৎসিত সন্দেহেরও তাহা হইলে সমুচিত শাস্তি হয়! কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হইল না। সঙ্গে পরি আছে—এখনই তাহা হইলে একটা হুলস্থূল বাধিবে—আর কাল বাঙ্‌লা খবরের কাগজে টী-টী পড়িয়া যাইবে। থানা-গারদ-আদালতের ভীষণ ছবিও চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। তবে এ বিপদে সুবোধ একেবারে যে ধৈর্য্য হারাইল না, তাহার প্রধান কারণ, জমাদারটা কথা বলিতেছিল হিন্দীতে—পরি সে ভাষা মোটেই বোঝে না। সুবোধ জমাদারকে কহিল, "বেশ, সন্দেহ হয়, আমার বাড়ীতে এস, তদন্ত কর।"

জমাদার কহিল, থানায় গিয়া আগে কেশ্ লিখাইতে হইবে, পরে কোন ইন্‌স্পেক্টর হুকুম দিলে তদন্ত হইবে। রাত্রি বারোটার পর যে সব কেশ ধরা পড়ে, তাহার রিপোর্ট একদিন পরে করিতে হয়। সুতরাং তদন্তের তেমন জরুরি প্রয়োজন নাই!

এমন সময় "ক্যা হুয়া" বলিয়া এক সাহেব ইন্‌স্পেক্টর সেই স্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। জমাদার তাহার সন্দেহের কথা খুলিয়া বলিল। সুবোধও সাফাই দিল, সে ভদ্রলোক, স্ত্রীকে লইয়া মাঠে বেড়াইতে আসিয়াছিল—স্ত্রী পর্দ্দানশীন, পথ জনহীন না হইলে মাঠে আসিতে চাহে না—তাই এত রাত্রি হইয়াছে। গাড়ী করিয়াই সে আসিয়াছিল। এখন গাড়োয়ান ফেরার, কাজেই এ দুর্দ্দশা! ইন্‌স্পেক্টর একটা চকিত দৃষ্টিতে সুবোধের আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইল, ও জমাদারকে গাড়ী আনিবার আদেশ দিয়া সুবোধকে বলিল, আপনার ভয় নাই! আমি এখান হইতে এখনই আপনার বাড়ীতে যাইব—থানায় যাইতে হইবে না। যদি সন্তোষজনক প্রমাণ পাই, তাহা হইলে কোন গোলযোগেরই আশঙ্কা নাই! পরে বস্ত্রাবৃতা পরির পানেও মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া কহিল, I see, you are a gentleman, and the lady, oh, she is a decent lady. I do not suspect her.

জমাদার দুই পা আগাইয়া যাইতেই এক চলন্ত গাড়ীর দেখা পাইল। তখনই সে তাহাকে দাঁড় করাইল। গাড়োয়ান কহিল, সে এক বাবুকে লইয়া মাঠে আসিয়াছে; গার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে সে দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় দুইটা মাতাল সাহেব আসিয়া জোর করিয়া তাহার গাড়ীতে সওয়ারি হইয়া বেলগেছিয়া অবধি তাহাকে দৌড় করাইয়াছে, ভাড়াও দেয় নাই। কে জানে, বাবু এখন মাঠে আছেন কি না!

জমাদার তাহাকে ছাড়িল না—টানিয়া ইন্‌স্পেক্টরের কাছে আনিল।

সুবোধ ও পরিকে দেখিয়া গাড়োয়ান তখনই চিনিতে পারিল, কহিল, "এই সে বাবু—"

গোলটা তখন সহজেই মিটিয়া গেল। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব সুবোধের কাছে মাপ চাহিয়া, লেডির কাছে মাপ চাহিয়া জমাদারকে ভর্ৎসনা করিল। আরও বলিল, পুলিশের এই সন্দেহ করা রোগটুকু কত সময় যে নিরীহ ভদ্রলোককে বিপন্ন করিয়া তুলে, তাহার আর ঠিকানা নাই। তবে উপায়ও নাই। মেষের চর্ম্ম গায়ে দিয়া সমাজের পথে বিস্তর হিংস্র পশুও দিবারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তাহাদের জন্যই না এতখানি সতর্কতা! কাজেই পুলিশের সন্দেহ-রোগও সারিতে পারে না। জমাদারের আর দোষ কি? তবে ভাগ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই এত সহজে সব মিটিয়া গেল। নহিলে থানা অবধি বাবুর টান পড়িত। সঙ্গিনীটি যে বাবুর বিবাহিতা স্ত্রী, পুলিশে তাহার দস্তুরমত প্রমাণ দিতে হইত! যদিও ইহাতে ভয়ের কিছু ছিল না, কারণ হীরা চিরদিনই হীরা—তবে দুঃখ শুধু এই যে এই 'লেডি' কি মনে করিলেন! যাহা হোক বাবু, All's well that ends well.

সাহেবের করমর্দ্দন করিয়া সুবোধ গাড়ীতে উঠিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। গাড়ী চলিলে পরিও মুখের ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়া বলিল, "হ্যাঁ গা, ওরা পুলিশের লোক বুঝি? খুব ভাল ত! নিজে থেকে গাড়ী করে দিলে। কিন্তু যাই বল, আর কখনও আমি তোমার সঙ্গে রাত্রে বেরুচ্ছি না বাবু, এত লোকের সামনে বে-আব্রু, ছি!"

সুবোধ কোন কথা কহিল না। স্ত্রীর নির্ব্বুদ্ধিতায় এই প্রথম সে খুসী হইল। তাহার মনে হইল, ভাগ্যে পরি কথাগুলা কিছুই বোঝে নাই। বুঝিলে ঐ মাঠের মধ্যেই ধড়াস্ করিয়া সে হয়ত অজ্ঞান হইয়া পড়িত! তাহা হইলে কি বিপদই না ঘটিত! ওঃ, ভগবান খুব রক্ষা করিয়াছেন! কিন্তু সান্ত্বনা সে যতই পাক্, একটা নির্ম্মম সত্যের আঘাত সেই সঙ্গে তাহার বুকে তীক্ষ্ণ ছুরির মতই বিঁধিতেছিল, 'কাব্যং সুদুর্ল্লভং লোকে—' হায়রে, জগতে শুধু গদ্য, ভীষণ গদ্যই গদা উঁচাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, বেচারী পদ্য ঐ কেতাবের পাতার আড়ালটিতেই কোনমতে আত্মরক্ষা করিতেছে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মিলন-কথা

আজ "ভারতী" চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। সেই "ভারতী",—যাহার সংশ্রবে আমার জীবনের একটী অধ্যায় ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত। তাহার কথা আজি বড় মনে পড়িতেছে, তাই সে পুরানো কাহিনী আজি কিছু বলিব। "ভারতী" উপলক্ষে কিরূপে আমাদের দুইটী হৃদয় এক হইয়া যায়; কিরূপে একটী চির-রক্ষণশীল একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের অভেদ্য দুর্গ-প্রাকারে আমাদের মিলন-মঙ্গল-পতাকা উড্ডীন হয়; তাহা আজ ভারতীর চল্লিশ বৎসর উপলক্ষে ভারতীর নবীন সম্পাদকদ্বয়ের ন্যায্য প্রাপ্য-বোধে উপহার দিতেছি।

সেকালের কথার অবতারণা করিতে হইলে, ঘোড়দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন ধূলার হাত এড়ানো যায় না, তেমনি নিজকে বাদ দেওয়া যায় না; সে প্রসঙ্গ আগেই আসিয়া পড়ে। সেকালের সাহিত্যের ইতিহাস এবং কোন্ সময় হইতে ও কত বয়সে ভারতীর সহিত আমার পরিচয় হয় তাহা বলা কর্ত্তব্য। মনে পড়ে, সন ১২৭৯ সালে আমার প্রথম গ্রন্থ "কবিতা-হার" বাহির হয়; ১২৮০ জ্যৈষ্ঠের "বঙ্গদর্শনে" উহার সমালোচনা বাহির হয়; তখন আমার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। তখন "বঙ্গদর্শনে"র কাল। পরে পরে "আর্য্যদর্শন" "হিন্দুদর্শন" "জ্ঞানাঙ্কুর" "মধ্যস্থ" প্রভৃতি কতই প্রচার হয়; সে সকল কিছুদিন সাহিত্য-গগনে জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া, একে একে সকলেই অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু "ভারতী"র সম্পাদকদ্বয় ঠিক বলিয়াছেন, ভারতী কখনও পিছনকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে নাই, কাজেই "ভারতী" চির-নবীনা। তৎকালে প্রচলিত পত্রিকাবলীর মধ্যে ভারতীর বিশেষত্বই তাই। ভারতীর অগ্রজ-অগ্রজা অবশ্য অনেকই ছিল—"কত এল গেল চলে সে"। তন্মধ্যে বামাবোধিনী দীর্ঘজীবিনী। তত্ত্ববোধিনী এক বাড়ীর ও "ভারতী"র দিদি হইলেও একেবারেই স্বতন্ত্র; ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পত্রিকা; তাহা সকলেই জানেন। সচিত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" তখনকার সাহিত্যিকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। এইখানে আর একটী কথা বলা প্রয়োজন, ভারতীর ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সম্পাদিকার কোমল করে বলয়ের মিষ্ট-মধুর আহ্বান-ধ্বনিই চির মুখরিত হইত, কখনও সে হস্ত সমালোচনার কঠোর আঘাতে নবীন লেখকের উদ্যম ভঙ্গ করে নাই। বলিতে কি এখনকার অনেক প্রথিতযশা লেখকদের তিনিই গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাই মনে হয় আজি তাঁহার বিশ্রাম-বাসরে তাঁহাদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার প্রসূনাঞ্জলি তাঁহার অবশ্য-প্রাপ্য। মনে আছে, ভারতী প্রকাশিত হইলে সে সময়ে ভারতীর ভাষাকে অনেকে 'ঠাকুরি' ভাষা বলিয়া উল্লেখ করেন। রুচি-বৈচিত্র্য যেমন চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে, তাহা দোষের নহে; সৃষ্টি-বৈচিত্র্যও তেমনি; তাহাও উপেক্ষার নয়। সত্য বলিতে কি আমার 'গদ্গদনদ্গোদাবরী বারয়োঃ,' যেমন ভাল

লাগে, আবার ঠাকুরমার মুখে শ্রুত টুপুর টাপুর বৃষ্টি পড়ে নদী এলো বান' ইহাও তেমনি ভাল লাগে; আবার চাষা বৌয়ের মুখে "ঝরোকায় গলা বেড়িয়ে ডেঁড়িয়ে ছ্যালো' এও তেমনি মিষ্ট লাগে। মূল কথা, যেখানে যেমন, সেখানে তেমনটি হইলেই শোভন, সুন্দর হয়।

এইবার ভারতী-সংশ্রবে কিরূপে আমাদের মিলন সংঘটিত হয়, তাহাই বলিব। প্রথম যেদিন স্বামী আসিয়া বলিলেন, "আজ একটী



শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

নূতন খবর দিব। তোমাদেরই স্বজাতীয়া একজন, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা হইলেন। তুমি ত পারিলে না।" (ইহা বলিবার অর্থ, তিনি আমাকে সংবাদ-প্রভাকর অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রে ধারাবাহিকরূপে লিখিতে অনুরোধ করেন।) সেই দিন আনন্দ-কৌতূহলের মধ্য দিয়া নবীনা সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রবল হয়। তার পর ঘটনাসূত্রে যেদিন তাঁহার সহিত ঈপ্সিত মিলন ঘটিল, হায়! সেদিন তিনি, যিনি আনন্দের সহিত স্ত্রী-সম্পাদিকার সংবাদ দিয়াছিলেন, তিনি আর ইহজগতে ছিলেন না। আমাদের বাটী চিররক্ষণশীল হইলেও স্বামী স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি প্রায়ই মিস্ তরু দত্ত ও অরু দত্তের উল্লেখ করিয়া আমাকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহেই তখন 'কবিতা-হার' 'ভারত-কুসুম' রচিত হইয়াছিল। আমার পিতৃদেবও স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পৃথিবী' ও 'দীপনির্ব্বাণ' পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক এমন সুন্দর লিখিতে পারিয়াছেন ইহা বিশেষ গৌরবের কথা। তিনি মেয়েদের বিজ্ঞান-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, এবং স্বয়ং আমাকে

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি পুস্তক পড়াইয়া ছিলেন। আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও চর্চ্চা করিতাম। মনে পড়ে, আমার সংস্কৃত অধ্যাপকের জ্যোতিষের পুঁথি কাড়িয়া রাখিতাম। এ বিষয়ে আমার আগ্রহ দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "তারাই আবার (অর্থাৎ খনা প্রভৃতি) ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।" কিন্তু মেয়েদের জ্যোতিষ-শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার মত ছিল না। তাঁহার ধারণা ছিল, জ্যোতিষী নির্ব্বংশ হয়; এবং আশ্চর্য্যের কথা, তিনি বহুপুত্রক হইয়াও পরে নিঃসন্তান হইয়াছিলেন।

তারপর বহুদিন পরে, সিমুলিয়ায় আমার পিতৃভবনে সেই "পৃথিবী" ও "দীপনির্ব্বাণ" রচয়িত্রীর সহিত যেদিন আমার প্রথম চাক্ষুষ মিলন হয়, সেদিন আমার স্নেহময় পিতৃদেবও পরলোকে। অদৃষ্টের পরিহাস এমনি নিষ্ঠুর!

আমাদের মহিলা-সমাজে নূতন সৃষ্টি এই "সখি-সমিতির" প্রস্তাব ভারতীতে বাহির হয়। সেই আহ্বান-সূত্রে আমাদের প্রথম পরিচয়। আমি উক্ত প্রস্তাব পাঠ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখি। লিপি-দূতীর সে কি আনাগোনা! তখনকার লিখিত পত্রের একখানির পত্রের কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:—"আপনি লিখিয়াছেন 'আমাদের শিক্ষা পুরুষদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাঁহাদের ইচ্ছা-ব্যতিরেকে আমাদের কিছুই করিবার যো নাই'। ইহা সত্য। তবে তাঁহারা কখনো আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার আবশ্যক বুঝিবেন কি না তাহা জানি না। পুরুষেরা আমাদের যতটুকু শিক্ষা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাহা আমরা পাইয়াছি, অর্থাৎ ধোবার বাড়ীর ফর্দ্দ মিলানো, আর কায়-ক্লেশে একখানা পত্র লিখিতে পারা। আমার মনে হইতেছে, একজন লেখক তাঁহার প্রবন্ধে শিক্ষা-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন, 'বাহিরে কোমটী, মিল্, স্পেন্সর লইয়া জ্বালাতন, আবার ঘরেও তাই'। ইহা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন, অধিক বলিবার আবশ্যক কি?"

এখন যে সখি-সমিতি উপলক্ষে আমাদের মিলন হয়, তাহার কথা কিছু বলা আবশ্যক। এই সখি-সমিতি তিনি কিরূপ উৎসাহ পরিশ্রম ও যত্নে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা মহিলামাত্রেই অবগত আছেন। সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার প্রচার-কল্পেই এই মিলন-সমিতির সৃষ্টি। অসূর্য্যম্পশ্যা অবরুদ্ধা হিন্দু মহিলাদের মধ্যে ইহা এক বিশুদ্ধ 'নরোজা'র দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছিল। এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ তাঁহারা আর কখনো ইতিপূর্ব্বে উপভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না! "রমণীতে বেচে রমণীতে কেনে লেগেছে রমণী রূপের হাট।"

আমার মনে আছে, বেথুনে প্রথম উদ্ঘাটিত শিল্প-মেলায় যেদিন মহিলাগণ কর্ত্তৃক মায়ার খেলার অভিনয় হয় এবং মেয়েরা পুরুষদের মত সম্মুখে গ্যালারিতে বসিয়া সে অভিনয় দর্শন করেন, সে কি এক নূতন আমোদ সকলে অনুভব করিয়াছিলেন! মনে আছে, আমারই পার্শ্বোপবিষ্টা একটী মেয়ে বলিয়াছিলেন, "এঁরা যদি সকলে চরিত্রবতী হন, তাহা হইলে এরূপ সুচারু অভিনয়-ক্ষমতা বিশেষ প্রশংসা ও বাহাদুরির বিষয়!" হায়,

হায়, যে দেশে মহিলাদের মধ্যে চিত্রকলা, সঙ্গীত ও নৃত্য স্ত্রীশিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ ছিল, যে দেশের সতী বেহুলা ইন্দ্র সভায় নৃত্যগীত করিয়া মৃত পতির জীবন ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, এখন কোন নারীকে কলা-কুশলা দেখিলে, সেই দেশের মহিলাদেরই এইরূপ মনে হয়!

মনে আছে, সখি-সমিতির এই প্রথম সম্পাদিকার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা কয় মায়ে-ঝীয়ে স্বহস্ত-নির্ম্মিত নানাবিধ বিচিত্র শিল্প-সম্ভার শিল্পমেলার প্রদর্শনীতে পাঠাইতাম। আজ সে দিনও নাই, সে উৎসাহও নাই!

তারপর যখন পত্র-ব্যবহারের মধ্য হইতে 'আপনি' 'আপনার' প্রভৃতি উঠিয়া গেল, যখন

রচয়তি শয়নং
সচকিত নয়নং

পশ্যতি তবপন্থানং-এর অবস্থা, তখন গলির ভিতর পাল্কীর শব্দ হইলেই মনে হইত—

ঐ বুঝি বাঁশী বাজে!

পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়া কতদিন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে উভয়ে উভয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের প্রেমের অভিধানে 'আদব-কায়দা' বলিয়া কোন কথা ছিল না। আমাদের এই প্রণয়াভিসারকে শ্রীমতীর অভিসার হইতে কিছুতেই ছোট বলিতে পারি না। কতদিন আষাঢ়ের সেই ঘনঘোর, সেই মেঘ-আঁধিয়ার, সেই মৃদু বর্ষণ, সেই কনক নিকষ বিদ্যুৎ দীপ্তি আমাদের এই অভিসারকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে! বাস্তবিক টিপি টিপি মেঘান্ধকারে স্নিগ্ধ দিবস দেখিলেই উভয়ের হৃদয় যে উভয়কে চাহিত, তাহা একদিনকার একটী ঘটনায় প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল। সেদিন মেঘ-মেদুর দিবসে উভয়েই উভয়ের সন্ধানে বাহির হইয়াছি, শেষে পথে পথে সাক্ষাৎ।

দুঁহু লাগি দুঁহু জনে বাহিরায় পন্থ।
জনু চাঁদ লাগি ফিরে রাহু. রাহু লাগি চন্দ॥

আমরা সেকালের; সুতরাং 'পাতান' রোগের হাত এড়াইতে পারি নাই। এই মিলন-সূত্রে আমরা "মিলন" পাতাইয়াছিলাম।

তারপর আর একদিনকার কথা। তিনি তখন তাঁর পিতৃদেবের শুশ্রূষার্থে পিতৃগৃহে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় আমি একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলাম, তিনি 'টডের' রাজস্থান পড়িতেছেন। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বইখানি মুড়িয়া ফেলিলেন। সেদিনের কথা ভুলিবার নয়। সে কি দামিনী-চমক, কি হওয়ার দমক, কি ভয়ঙ্কর মেঘ-গর্জ্জন, কি মুষলধারে বৃষ্টি। আমরা দুই জনেও দারুণ গল্পে নিমগ্না হইয়া গিয়াছিলাম। কখন্ যে আমার স্খলিত-কবরী লোহার কাঁটাদুটী তাঁহার শয্যায় পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা কিছুই টের পাই নাই! পরদিন কাঁটাদুটী সমেত এই মধুময়ী পত্রিকাখানি পাই,

"অধরে মোহন হাসি নয়নে অমৃত ভাসে,
বিরহ জাগাতে শুধু মিলন পরাণে আসে!
কইরে মিলন কোথা, সে কি হেথা আছে আর?
রাখিয়া গিয়াছে শুধু গরল-পরশ তার!
ফুলটি সে দিয়ে গেছে প্রভাতের আলো নিয়ে;
হাসি যত নিয়ে গেছে অশ্রুজল গেছে দিয়ে!

সন্ধ্যা করে দিয়ে গেছে, নিয়ে গেছে সন্ধ্যা তারা ;
আঁধার পড়িয়া আছে সুষমা হইয়া হারা।
ফুলটী সে নিয়ে গেছে, ফেলে গেছে কাঁটাদুটি,
বিরহ কাঁদিয়া সারা নয়ন মেলিয়ে উঠি !"

মনে পড়ে, উত্তরে লিখিয়াছিলাম—

দূর হতে কাছে আনা স্বভাব আমার।
ফুরাইয়া যায় কাজ মিশে গেলে দুটি।
জগৎ রয়েছে দূরে হইতে আমার —
আনিতে পরাণে তায় করি ছুটাছুটি।
প্রেমের জগতে আমি মধ্য-আকর্ষণ ;
বিরহ রূপেতে আমি সম্পূর্ণ মিলন।

১৩০৩ সালে মৎ-প্রণীত 'শিখা' প্রকাশিত হয়। সে গ্রন্থ আমি 'মিলন'কেই উপহার দিই। তাহাতে আমাদের সুমধুর সম্বন্ধের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, তাহা আজ আবার যুগান্ত পরে নূতন করিয়া ভারতীর পত্রে উপহার দিলাম।

সখি,

বদ্ধ মুকুলের মাঝে সুরভির মত
অবরুদ্ধ প্রেমরাশি হৃদে করে বাস ;—
কি অভিশম্পাতে কার জানিনাক তাহা,
বাহিরে ফোটে না কভু ক্ষুদ্র এক শ্বাস।
বিরহের কারাগারে বটে বাস করে,
নিশিদিন চেয়ে তবু মিলনের পানে—
কে করে বন্ধন মুক্তি, কে ফুটাবে তারে—
নির্দ্দয় মিলন সেত শত ব্যবধানে।
কিবা দেখ যদি ফেলে সূত্র তল নাহি পাবে কুত্র
এ হৃদয় অকূল সলিলে ;
বিরহের পাশাপাশি, মগ্ন হেথা প্রেমরাশি
তন্ত্রামগ্ন গভীর অতলে ;
অর্ণব মন্থন করে পার যদি নিও তারে
পুত সেই একবিন্দু সুধা ;
কিন্তু, বিরহ গরল আছে তাই ভয় হয় পাছে
যদি তোর নাহি মিটে ক্ষুধা!

ওয়ালটেয়ারে সুদীর্ঘ প্রবাস যাপনের সময় যতদিন না তেলেগু ভাষার সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম, ততদিন সেখানকার লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিতে বিশেষ বাধা হইত। সেই সময়ে আমি যে পত্রখানি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি, ইহাতে সহৃদয় পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না।

ভাবিতাম ভাষার দুয়ারে হয় সদা চিত্ত-বিনিময়,
ঐ দূতী হয়ে অগ্রসর মাঝে থেকে করে পরিচয়।
শুভক্ষণে কোন সুপ্রভাতে
ঘটেছে যা, তোমায় আমায় ;—
মনে পড়ে সে দিনের কথা
দুই যুগ পূর্ণ হলো প্রায়।
লিপি দূতী করে আনাগোনা
দুটি হৃদি করিল বন্ধন,
দেখিবার আগেই দোঁহার
ঘটাইল অপূর্ব্ব মিলন।
কুসুমের পরাগ যেমন
সমীরণে হইয়া বাহিত,
ঘটায়ে ফুলের পরিণয়
দূরে হতে করে সম্মিলিত।
বসে এই সুদূর প্রবাসে
স্মরি সেই ভাষার প্রভাব,
মূক যেথা সুনিপুণ দূতী
নিত্য সেথা প্রেমের অভাব।"

এমন রাশি রাশি ছিল। মধুর যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও আজ-কাল সাগরে অন্তর্হিত হইয়াছে। ভারতীতে আমার 'গ্রাম্য ছবি' নামে কবিতা পাঠাইয়া ভাবিয়াছিলাম, ভারতী-সম্পাদিকা কখনই সেটি মনোনীত করিবেন না। কিন্তু খুব আদরের সহিতই তাহা ভারতীতে গৃহীত হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু

লিখিয়াছিলেন, "ভারতীতে প্রকাশিত গ্রাম্য ছবি' পাঠ করিয়াই আমি তপোবন লিখিয়াছি।" এ-সকল কথা আমি সম্পাদিকার পত্রেই অবগত হই। কত-রকমে তিনি যে আমায় উৎসাহ দিয়াছেন, তাহা বলিবার নয়। আমাদের ভারতীর মাসিক সমালোচনা পত্রমধ্যেই হইত। সে সব লিপির বহরই-বা কত! আমি স্বামীকে যে-সকল চিঠি লিখিতাম, তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া তাঁহার এক বন্ধু কতকগুলি পত্র 'জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী' নামে ছাপাইয়া দেন। তারপর মৎপ্রণীত 'কবিতাহার', 'ভারতকুসুম'ও জনৈক হিন্দুমহিলা প্রণীত বলিয়া প্রকাশিত হয়। ইংরাজী সাময়িকপত্রে "কবিতা-হারের" সমালোচনা পাঠ করিয়া শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী মেরী কার্পেণ্টার এই "জনৈক"এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। আমার এই সাহিত্যিক রহস্য-অবগুণ্ঠন দুষ্টা ভারতী-সম্পাদিকাই উন্মুক্ত করিয়া দেন।

আমার এই ভারতীর স্মৃতিতে "বালক"-সম্পাদিকার প্রসঙ্গও অনিবার্য্য। শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনীর মত সরল, অমায়িক, আন্তরিকতাপূর্ণ উদার-হৃদয়, মধুর-প্রকৃতি রমণী আমি অল্পই দেখিয়াছি। মনের মত লোক পাইলে, এক মুহূর্ত্তের আলাপে একেবারে আপনার করিয়া লইতে তাঁহার জোড়া কেহ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমাদের বর্ত্তমান কৃত্রিম সভ্যতার ঢাক্-ঢাক্ গুড়্-গুড়্ ব্যবহার ইঁহার নিকট মোটেই আমল পায় না। ইঁহার সুমধুর অথচ সপ্রতিভ তৎপরতায় সঙ্কোচ সহজেই দূর হয়। ইঁহার ব্যবহারের গুণে এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িতে হয় যে ইহাঁকে অদেয় বা অস্বীকার করিবার কিছুই থাকে না। এই সম্পর্কে বোধ হয় দু-একটি ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মিলনের কাসিয়াবাগানের বাটীতে প্রায় মাসে মাসেই মিলন-সমিতির বা সখি-সমিতির অধিবেশন হইত। ভদ্রমহিলাগণের সম্মিলন ও কথাবার্ত্তার মধ্যে গল্পচ্ছলে সাহিত্যচর্চ্চা সামাজিক প্রসঙ্গ প্রভৃতি ও সেই সঙ্গে গীত-বাদ্য এবং জলযোগের আয়োজন থাকিত। আমি সেদিন কাসিয়াবাগানে সখি-সমিতিতে গিয়াছিলাম। কখনো পরিচ্ছদে আমি 'সেফ্‌টী' ব্যবহার করিতাম না। একখানি থান ও তদুপরি একখানি মোটা চাদর ব্যবহার করিতাম। মনে পড়ে, সেদিন মাথায় কাপড় টানিতে চুল খুলিয়া গিয়াছিল ; চুল বাঁধিতে চাদর খসিয়া যাইতেছিল ; আমি তাহাতে একটু সন্ত্রস্তা হইয়া পড়িতেছি দেখিয়া মাননীয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাড়াতাড়ি আসিয়া নিজের কবরী হইতে কাঁটা খুলিয়া আমার চুলগুলি আঁটিয়া ও চাদর কাপড় প্রভৃতি যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া কিরূপে আমার লজ্জারক্ষা করিয়াছিলেন। এই মেজবধূ ঠাকুরাণীর সরলতা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

আর একদিনের কথা। সেদিন অপরাহ্নে আমি তাঁহার পার্কষ্ট্রীটের বাটীতে গিয়াছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ফটো আছে কি না ?" আমি 'না' বলাতে তিনি বলিলেন, "আপনার একখানা ফটো থাকা খুব দরকার।" বলিতে বলিতে

বলিলেন, "একটু বেড়াতে যাবেন? দেখি হয় কি না, পাঁচটাও বাজে।" আমি ভালরূপে কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে না করিতেই আমাকে লইয়া একেবারে ফটোগ্রাফের দোকানে উপস্থিত হইলেন, এবং আমার ফটো তোলাইলেন। আমার আপত্তি করিবার অবসর অবধি মিলিল না। তারপর সাহেব বোধ হয় যখন বলিলেন, আমি বড় গম্ভীর হইয়া আছি, তখন তিনি সহসা আমার সম্মুখে আসিয়া এমনভাবে 'একটু হাসুন না' বলিলেন যে, আমি না হাসিয়া থাকিতে পারি নাই। আমার পরিণত বয়সের যে ছবি মাসিকপত্রিকাদিতে বাহির হইয়াছে, তাহা এই ফটোরই প্রতিলিপি।

আমার সেকালের বালিকার শিক্ষাকে সম্পূর্ণতর করিবার দিকে তাঁহার যে আগ্রহ দেখিয়াছি তাহাতে তাঁহার নিকট আমি ঋণী ও তাঁহার জ্ঞানদা নামের সার্থকতারও পরিচয় পাইয়াছি। আমার চিত্রকলানুরাগ বৃদ্ধির মূলেও তিনি। অপরাধের মধ্যে গড়ার উপর সেক্সপীয়রের একখানি ও রবির একখানি ছবি বুনিয়া যথাক্রমে তাঁহাকে ও রবির স্ত্রীকে উপহার দি। পশমে তোলার হিসাবে উক্ত চিত্রিত ব্যক্তিদের সৌসাদৃশ্য না কি একটু বিশিষ্টভাবেই ধরা দিয়াছিল; এই উপলক্ষে মেজবধূ ঠাকুরাণীর উৎসাহ আবার নূতন করিয়া তাঁহাকে পাইয়া বসিল এবং সে উৎসাহ সংক্রামক হইয়া আমাকেও আক্রমণ করে। মেজবধূ ঠাকুরাণী রহস্যেও অতুলনীয়া। আমাকে গান শুনাইবার জন্য আজিকার স্যর রবীন্দ্রনাথকে তিনি যে একদিন একটী পয়সা পেলা দিয়াছিলেন, তাহাও এই মধুর স্মৃতির হিসাবে টোকা আছে।

আমার তখনকার সঙ্কোচপূর্ণ ও অবরোধ-শাসিত সঙ্কীর্ণ ব্যবহারে হয়ত কতদিন তাঁহার মনে অন্যায় ব্যথা দিয়াছি, কিন্তু তিনি বয়োজ্যেষ্ঠা, স্নেহময়ী ভগ্নীর মত তাহা সহ্য করিয়াছেন। ইঁহার প্রসঙ্গে লিখিত আমার কবিতাও আছে।

আমার পুত্র শ্রীমান প্রকাশচন্দ্রের বাঙ্গালা সাহিত্যে হাতে-খড়িও তাঁহার "মিলন-মা"র প্রদত্ত এবং ভারতীর পত্রেই তিনি প্রথম মক্স করিতে শিখেন। এখন ইংরাজি বাঙ্গালা পত্রিকাদি সম্পাদন-কার্য্যে প্রকাশ সিদ্ধহস্ত; কিন্তু সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের গুরুত্ব ও দায়িত্বে 'মিলনই' তাঁকে প্রথম দীক্ষিত করেন। পাহাড়ে যাইবার সময় একবার ভারতীর সমস্ত ভার, আমার বারণ সত্ত্বেও, তিনি উঁহার হাতে দিয়া যান। প্রকাশের বয়স তখন বিংশতি বর্ষ মাত্র। ভারতী-সম্পাদিকার গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা আশ্চর্য্য এবং এ বিষয়ে তাঁহার ভরসা ও আত্মবিশ্বাস দুঃসাহসিক রকমের হইলেও তাঁহাকে কখনও নৈরাশ্য ভোগ করিতে দেখি নাই।

ইংরাজীতে না কি প্রবচন আছে, "ঘনিষ্ঠতা ঘৃণার প্রসূতি", কিন্তু আমাদের উভয়ের এ ঘনিষ্ঠতায় এ যাবৎ কেবল শ্রদ্ধা, সম্মান ও সহানুভূতিই দেখিয়া আসিয়াছি। ইংরাজী ১৮৮২ সালে আমার স্বামীর যত্নে ও উদ্যোগে 'রেইস এণ্ড রায়েৎ' পত্রিকা আমাদের হাতে আসে ও স্বনাম-ধন্য পূজ্যপাদ ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদক-

তায় তাহা প্রকাশিত হইতে থাকে। মুখোপাধ্যায়-মহাশয়ের সহিত আমাদের পরিবারের নিবিড় আত্মীয়তা ছিল। তিনি আমাদের বৈঠক-খানা বাড়ীতেই থাকিতেন এবং ত্রিপুরার মন্ত্রিত্বপদ ত্যাগের পর হইতে তাঁহার দেহান্ত পর্য্যন্ত উক্ত পত্রিকা-পরিচালনে নিযুক্ত ছিলেন। সুশিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী থাকিলেও তিনি বিশেষ রক্ষণশীল এবং তৎকালীন হঠ-প্রকৃতির সংস্কারের প্রতিকূল ছিলেন; এবং ঠাকুর-পরিবারে তখন যে সকল পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাদের সকল-গুলির তিনি অনুমোদন করিতে পারেন নাই।

সেও আজ অনেকদিনের কথা। আমার স্বামী তখন স্বর্গীয়। আমার মনে আছে, কি এক প্রসঙ্গে "বঙ্গবাসী" পত্রিকা 'ভারতী' সম্পাদিকাকে কুৎসিত ভাষায় গালি দেন। উক্ত লেখার প্রতি আমি মুখোপাধ্যায়-মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে "বঙ্গবাসী"কে পুনঃপুনঃ সেই অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের সুনিপুণ লেখনীর তাড়না ভোগ করিতে হইয়াছিল। সে লেখার মধ্যে ভারতী সম্পাদিকার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার যে নিদর্শন বিদ্যমান তাহা ভুল করিবার নহে। মুখোপাধ্যায়-মহাশয় স্বর্গারোহণ করিলে রেইসের সম্পাদকীয় ভার আমার ভাসুর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের হাতে পড়ে। "মিলনে"র "ভারতী"-ত্যাগ-উপলক্ষে 'রেইসে' (১৫ই মে ১৯১৫) যে প্রবন্ধ বাহির হয়, বাহুল্য-ভয় সত্ত্বেও তাহা উদ্ধৃত করিলাম। প্রবন্ধের মধ্যে বাঙ্গালা কবিতাও একটি ছিল।

A Journalistic Retirement.

The retirement of Mrs. Ghosal, better known by her maiden name of Srimati Swarna Kumari Devi, from the editorship of BHARATI is a distinct loss to vernacular journalism. With the traditions of a cultured family, and of varied culture and accomplishment herself, she was eminently fitted by her training, temper and acquirements to hold the post she has hitherto so nobly filled. Besides editing the journal which was started in her father's family with her eldest brother as the first editor, she has contributed largely to Bengali literature; and those contributions, of no mean order, have considerably helped to enrich the language. And she has made the BHARATI what it is on this its fortieth year. How far she has succeeded in gaining one of her objects, namely, the moulding of men of letters it is, as she herself observes, for posterity to say. In the domain of letters many owe her allegiance, and those that do, know that it is a pleasure to do so, and are proud of it. Her encouragement, though lost on many, has been cosmic generally and has made many young men take to literature as a profession and some of them successfully. The present editor of the BHARATI to whom she makes over charge may be cited as an instance. That editor shares with a friend the

burden of responsibility. Of considerable go and regular business habits, she possesses in abundance all the womanly virtues which distinguished her class in the happy by-gone days and are now treasured up in the museum of memories. She is, to use a pleasant line of Locksley Hall Sixty Years after, 'Feminine to her inmost heart and feminine to her tender feet." That is the impression, one who has known her intimately, carries of her. Her manners have a dignity of simplicity, peculiarly striking and her conversation a charm peculiarly free from pedantry. Her kindliness is as genuine as motherliness and her hospitality, homely joys. The words of adieu with which she takes leave of her readers and colleagues are as touching as they are true :

"When I took up the sacred task of editing I did not persuade myself to do so with a view to results; nor did I calculate its profit and loss. It was the pleasure of work which encouraged and inspired me to action. Those days of inspiration and encouragement are now ended and I feel lonely and helpless. My done-up body and mind now earnestly seek cessation."

Here is an appreciation of her by a young graduate admirer which has come to our hands and which we publish with pleasure. The verses are the maiden attempt of the young writer and are therefore the more deserving of encouragement.

পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতি

কেন ভাব সাঙ্গ দেবি, জীবনের কাজ ?
কেন বৃথা ত্বরা এত ? রহেছে ত বেলা।
এখনো রয়েছে বহু যাত্রী হতে পার;—
কিসে হবে বিনা তব ভারতীর ভেলা ?
এখনো নীবার পড়ে যজ্ঞভূমি পরে ;
এখনো জ্বলিছে হের বহ্নি সুমঙ্গল,
কে বল তোমার মত হোত্রী মাতঃ আর
রাখিতে সে পুণ্য-বহ্নি চির-সমুজ্জ্বল ?
ভারতী-পূজার কল্পে নানা উপচারে
সাজালে যতনে যেই নৈবেদ্যের থালা ;
সে নির্ম্মাল্য কেবা লবে পাতিয়া অঞ্জলি ;
কাহারে শোভিবে সেই নিবেদিত মালা।
পারিবে কি তোমা-সম যুগল দায়াদ
অক্ষুণ্ণ রাখিতে কীর্ত্তি প্রাচীন মন্দিরে ?
হারায় না যেন কভু বিবেক মহিমা ;
বরিষ আশীষ-ধারা তাহাদের শিরে।
বিদায়ের কালে দেবি, নমি শতবার।
মাঝে মাঝে দিবে দেখা সেই আশা চিতে।
নাশিয়া তমসা-জাল বঙ্গের অঙ্গনে
করিও প্রদীপ্ত ভূমি মেঘান্তর হতে।

কবিতাটি সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ৺ কালীপ্রসাদ ঘোষের বংশীয় ও আমার আত্মীয় শ্রীমান সুশীলকুমারের লেখা।

সুবিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক এবং "আলোচনা"র অন্যতম সম্পাদক আমার দেবর শ্রীমান গোবিন্দলাল দত্তের সহিত ঠাকুর-পরিবারের অনেকের আলাপ ছিল এবং শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের সহিতও সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সাবিত্রী লাইব্রেরীর বিভিন্ন বাৎসরিক অধিবেশনে, মনে পড়ে, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রবাবুর

সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা" ও রবীন্দ্রের "অকালকুষ্মাণ্ড" প্রভৃতি রচনা পঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন জোড়াসাঁকোর মেয়ে-পরিবারের সহিত আমাদের মেয়ে-পরিবারের পরিচয় ছিল না। গোবিন্দলাল অবরোধের মধ্যে শাস্ত্র-সম্মত স্ত্রী-শিক্ষার পাণ্ডা ছিলেন, এবং সাবিত্রী লাইব্রেরীকে উপলক্ষ করিয়া, নারী-রচনা পুরস্কৃত করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। কঠোর রক্ষণশীল দলের "সেনানায়ক" উপাধি ও তদুপযোগী শিরোপা আমি তাঁহাকে অনেকদিন পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছিলাম এবং কোন দিন ভাবি নাই অবরোধের বাহিরে তিনি গুণের আদর্শ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হইতেছে যে আমার সহিত ভারতী-সম্পাদিকার আলাপের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দলাল ক্রমে তাঁহার গুণ-মুগ্ধ ভক্ত হইয়া উঠেন এবং আমাদের এই মিলন-যজ্ঞের অন্যতম উত্তরসাধক ছিলেন।

ভারতী-সম্পাদিকার প্রতি আমাদের বৃহৎ পরিবারের পারিপার্শ্বিক সাহিত্য-অনুরাগী বন্ধুবৃন্দের এই যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, বলা বাহুল্য, তাহা তাঁহার সহিত আমার এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়েরই ফল। তাই বলিতেছিলাম, আমরা নিতান্ত বাঙ্গালী, আমাদের এই ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে ইংরাজি প্রবচন সার্থক হয় নাই। চল্লিশ বৎসরের সিকির সিকি কাল মাত্র "জাহুবীর" সম্পাদকতা করিয়া বুঝিয়াছি, কত ধানে কত চাল! তাই আজ ভারতী-সম্পাদিকার অসাধারণ ও অক্লান্ত অধ্যবসায়কে অভিবাদন করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

একে সেকালের কথা, তায় বুড়ার লেখা; সুতরাং লিখিবার আছে অনেক। একালের নাতি-নাতিনীরা যে আগ্রহের সহিত তাহা শুনিতে চাহেন, এইটুকুই বৃদ্ধের গৌরব, সান্ত্বনা ও আনন্দ।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

ছন্নছাড়া

(৭)

পরের সপ্তাহে আটবছরের মেয়েরা সব বড় শোবার ঘরটায় চলে গেল। আমার বিছানা ছিল জানলার ধারটিতে—মারি এমের ঘরের ঠিক পাশে। আমার একধারে ইসমেরি, আর-একধারে মারি রেনো। রাত্রে আমরা শুয়ে পড়লে মারি এমে আমাদের বিছানায় এসে বসতেন, আমার হাতখানা ধরে চাপড়াতেন; আর জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে থাকতেন।

একরাত্রে পাড়ার মধ্যে আগুন লাগল;—সে ভয়ানক আগুন! আমাদের শোবার ঘরটা একবারে আলোয় আলো হয়ে গেল। মারি এমে তাড়াতাড়ি জানলাটা খুলে আমায় ঠেলে তুলে দিলেন; বল্লেন—"দেখবি আয়, আগুন লেগেছে।"

আমার ঘুম আর ভাঙতে চায় না। তিনি

হাত দিয়ে আমার চোখদুটো একবার রগড়ে দিলেন। তার পর কোলে তুলে নিয়ে ঠেলা দিয়ে-দিয়ে বলতে লাগলেন—"দেখ, দেখ! ঘুমোস্‌নি;—আগুন লেগে কেমন দেখতে হয়েছে দেখ।"

আমি তখন ঘুমে একেবারে ন্যাতা;—আমার মাথা কেবলই তাঁর বুকের উপর ঢুলে ঢুলে পড়ছে। তিনি বল্লেন—"আ রে হাবাতে মেয়ে!"—বলে আমার কানের ডগাটা ধরে একবার সজোরে নেড়ে দিলেন। আমি ঘুম-ভেঙে চীৎকার করে কেঁদে উঠলুম। তিনি অমনি আমায় কোলে করে বসলেন, বুকের মধ্যে চেপে ধরে দোলা দিতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তিনি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলেন। তাঁর মুখখানি দেখাচ্ছিল যেন স্বচ্ছ ফটিক-দিয়ে গড়া, আর চোখদুটি আলোর আভায় ভরা!

মারি এমে জানলার কাছে এলেই ইস্‌মেরি আগুন হয়ে উঠত। কারণ তাহলে যে তাকে মুখ বন্ধ করতে হয়! সে এত বকতেও পারে!—কথা তার আর থামতে চায় না। আর কী চীৎকার! ঘরের ও-কোণ থেকে তার গলা শোনা যায়। মারি এমে বলতেন—"ঐ আরম্ভ হয়েছে ইস্‌মেরির বক্‌বকানি!" ইসমেরি অমনি ঠোক্কর দিয়ে বলত—"এই আরম্ভ হল মারি এমের বকুনি!"

কী তার সাহস! মুখের উপর তার এই চোপা দেখে আমার বুক দুরদুর করত! কিন্তু মারি এমে এমনি ভাব দেখাতেন যেন সে কথা তাঁর কানেই যায় নি।

একদিন তিনি ধমক দিয়ে উঠেছিলেন—"বাঁট্‌লি কোথাকার! ফের যদি চোপা করবি ত দেখাব মজা!"

ইসমেরি বল্লে—"ঈস্!"

মারি এমে বেতগাছটা হাতে করে এসে দাঁড়ালেন। আমার ভয় হল ইস্‌মেরির এইবার খেলে বেত! কিন্তু ইস্‌মেরি যেমন সেই বেত দেখা অমনি ছুটে এসে মারি এমের পায়ের কাছ উপুড় হয়ে পড়ল! সে কী তার ছটফটানি আর কাতরানি!

মারি এমে হাত থেকে বেতগাছটা ফেলে দিলেন; তার পর পায়ের একটা ঠোক্কর দিয়ে ইস্‌মেরিকে সরিয়ে দিলেন, বল্লেন—"নচ্ছার মেয়ে!"

এর পর থেকে দেখতুম তিনি ইস্‌মেরিকে এড়িয়ে-এড়িয়ে চলেন; সে কি বলে, না বলে কানে তোলেন না। কিন্তু এইবার থেকে একেবারে বারণ হয়ে গেল যেন কেউ আর ইস্‌মেরিকে পিঠে না করে।

চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। ইস্‌মেরি বাঁদর-ছানার মত আমার ঘাড়ে লাফিয়ে উঠত। আমার সাহস হতনা যে তাকে ঠেলে ফেলে দিই। আমি নীচু হয়ে তাকে ভালো করে চড়ে-বসতে দিতুম। শোবার ঘরে যেতে হলেই সে পিঠে চাপত। কারণ সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা তার পক্ষে সহজ ছিল না। নিজের চলার ভঙ্গী নিয়ে সে নিজেই ঠাট্টা করে বলত—"আমার চলা যেন ব্যাঙের থপ্‌থপানি।"

মারি এমে আগে-আগে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতেন, আমি একটু দাঁড়িয়ে শেষ-দলের মেয়েদের সঙ্গে পিছে পিছে যেতুম।

হঠাৎ একএকদিন মারি এমে পিছন ফিরে চেয়ে দেখতেন; ইস্‌মেরি অমনি চোখের নিমেষে সড়াৎ করে আমার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ত। মারি এমের সঙ্গে চোখা-চোখি হয়ে আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে পড়তুম। ইস্‌মেরি বলত—"তুই ভারি বোকা! অমন অপ্রস্তুত হলি কেন? তাইত আবার ধরা পড়লি।"

মারি রেনো কিন্তু ইস্‌মেরিকে কিছুতেই পিঠে উঠতে দিত না। সে বলত তাহ'লে তার কাপড় ছিঁড়ে নোংরা হয়ে একাকার হয়ে যাবে!

(৮)

ইস্‌মেরি ছিল বাচালের একশেষ! কিন্তু মারি রেনো ঠিক তার উল্টো; মুখে তার কথাটি নেই।

রোজ সকালে আমার বিছানা-পাতার সময় মারি রেনোই সব করে দিত। চাদরখানার উপর হাত চালিয়ে চালিয়ে এমন চোস্ত করে দিত—ঠিক যেন ইস্ত্রি-করা। তার নিজের বিছানা ঠিক-করবার সময় কিন্তু সে আমাকে হাত দিতে দিত না; বল্‌ত—"না; তুই সব কুঁচকে-মুচকে একাকার করে দিবি।" ঘুম থেকে ওঠবার পরও তার বিছানা যে কেমন করে অমন চোস্ত থাকত আমি কিছুতেই বুঝতে পারতুম না। একদিন সে প্রকাশ করে বল্লে যে চাদর ও কম্বলখানা সে মাদুরের সঙ্গে পিন্ দিয়ে গেঁথে রাখে।

তার যে কতরকম টুকিটাকি জিনিষ আর কত যে লুকোনো জায়গা ছিল! খেতে বসে সে আগের দিনকার মেঠাই বার করে খেত; আর সেই-দিনকার মেঠাই তার পকেটে জমা হত। ঘুরচে ফিরচে আর পকেট থেকে হাত বেরিয়ে মুখে উঠচে।

প্রায়ই দেখতুম এককোণে বসে সে লেস্ বুনছে। রুস্ করা, ভাঁজ করা, জিনিষপত্র সব ভালো করে গুছিয়ে রাখা—এই সব করতে পেলে সে আর কিছু চাইত না। তারই জন্যে আমার জুতো অমন পরিষ্কার চকচকে আর আমার রবিবারের পোষাক অমন সুন্দর করে পাট-করা থাকত।

একদিন একটা নতুন দাসী এল। নাম তার মাদলিন। সে এসেই আমার অলবড্ডেগিরি ধরে ফেল্লে। চটে আগুন। বল্লে, আমি কুড়ের ধাড়ি। যেন নবাবপুত্রী। নিজের হাতে জলটি গড়িয়ে খেতে পারি না—হাতে ব্যথা লাগে! তাই আমার সঙ্গে-সঙ্গে সব দাসী-বাঁদীরা ঘুরচে!

সে বলতে লাগল—"ছি ছি ছি লজ্জা করে না এমন করে বাছা রেনোকে খাটিয়ে নিতে।"

বন্ নেরঁ বল্লে—"ও মেয়েটা ঐ রকম! গুমরে ওঁর মাটিতে পা পড়ে না। উনি মনে করেন যে উনি কি আর-সবাইয়ের মতন? তাই ওঁর ধরণ-ধারণ আলাদা।"

তারা দুজনেই বল্‌তে লাগল যে আমার মতো এমন মেয়ে তারা কোথাও দেখেনি! —কোথাও না!—এমনি করে দুজনে এক-সঙ্গে আমার মুখের কাছে পড়ে চীৎকার করতে লাগল। তাই দেখে আমার মনে পড়ল সেই দুটো গণ্ডগোলে পরীর কথা—যাদের একজন কালো, একজন সাদা!

মাদলিন দেখতে পরিষ্কার, সুন্দর, কিন্তু

হাঁ বড়, দাঁত ফাঁক-ফাঁক! তার জিব ছিল চওড়া, পুরু; কথা-কইবার সময় ঠোঁটের কোণে এসে লাগত।

বন্ নেরঁ চড় উঁচিয়ে আমায় বল্লে—"চোখ নামা।" আমি শুনলুম সে মাদলিনকে বলতে বলতে গেল—"মেয়েটার ঐ রকম চাহনিতে কেমন যেন অস্বস্তি হয়।"

অনেক দিন থেকে আমার মনে হত বন্ নেরঁ যেন একটা ষাঁড়। কিন্তু মাদলিন্ যে কোন্ জানোয়ারের মতন তা ঠিক করতে পারতুম না। অনেক ভেবেছি—যত জানোয়ার জানতুম সবাইয়ের চেহারা মনে মনে ওলট-পালট করেছি—শেষে হতাশ হয়ে ছেড়ে দিয়েছি।

সে ছিল মোটাসোটা—থপথপে। কিন্তু তার গলার স্বর ছিল একেবারে সরু—বাঁশির মত।—ভারি আশ্চর্য্য কিন্তু! গির্জ্জের গান করবার তার ভারি সখ ছিল কিন্তু একটি স্তোত্রও সে জানত না। মারি এমে আমায় বলে দিয়েছিলেন তাকে শেখাতে।

এর পর থেকে আমার জিনিষ ঝাড়-পোঁচ করাতে মারি রেনোর আর কোনো বাধা রইল না;—কেউ আর সেদিকে লক্ষ্যই করত না। এতে মারি রেনো এত খুসি হয়ে উঠল যে রুমাল আটকাবার জন্য একটা পিন্ সে আমায় উপহার দিয়ে ফেল্লে। আমার হাতের রুমাল প্রায়ই হারিয়ে যেত। দুদিন না যেতে-যেতেই সেই পিন্-সুদ্ধ রুমালও যে কোথায় গেল খুঁজে পেলুম না। উঃ রুমাল! সে একটা প্রচণ্ড বিভীষিকা! সে কি কিছুতেই আমার হাতে থাকবে না—প্রতি সপ্তাহে একখানা করে যাবেই! ময়লা রুমালের বদলে মারি এমে একখানা করে পরিষ্কার রুমাল আমাদের দিতেন—তাঁর সাম্নে ময়লা রুমাল-খানা মাটিতে ফেলতে হত। সেই শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার কোনো হুঁস থাকত না—তার পর হঠাৎ চমকে উঠে পকেট হাতড়াতুম। কিন্তু হায় কোথায় সে! ছোট্, ছোট্;—শোবার-ঘর দেখ, পথের ধার খোঁজ, বিছানাপত্র ওলট-পালট কর—কিন্তু হায় সব জিনিষ আছে কেবল আমার রুমালখানিই নেই। মন উতলা হয়ে উঠত। কোথায় পাই রুমাল—কে দেবে রুমাল! পাগলের মত ছুটোছুটি করতুম। দেবী মেরীর ছবিখানার সামনে দিয়ে যাবার সময় হাত-যোড় করে কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করতুম—"ওগো দয়াময়ী, দয়া কর, আমার রুমাল যেন খুঁজে পাই।" কিন্তু সেই হারানো রুমালের কোনো চিহ্নই পাওয়া যেত না। তার পর ছুটতে-ছুটতে হাঁপাতে-হাঁপাতে মুখ লাল করে নীচে নেমে আসতুম,—মনের দুঃখে আমার কান্না পেত। মারি এমে যে সাফ্ রুমালখানি দিতেন সেখানি হাতে করে নিতে আর সাহস হত না;—সেই সঙ্গে যে বকুনি আমার প্রাপ্য তার সুর আগে থাকতেই আমার কানে বাজতে থাকত। মারি এমে কোনো কোনো দিন মুখে যদিও কিছু না-ও বলতেন ত তাঁর চোখের বিরাগ আমার বুকে এসে বিঁধত—এবং সেই নীরব তিরস্কারের কঠোর দৃষ্টি সমস্ত দিন আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকত। লজ্জায় আমি মরে যেতুম,—হাত পা আমার খেলত না। একটা কোণ পেলে সেইখানে মুখ

লুকোতে ইচ্ছে করত। কিন্তু এত করেও যে-কে-সেই!—পরের দিনেই সেই রুমাল আবার হারিয়ে ফেলতুম।

মাদলিন আমার দুঃখে মৌখিক সমবেদনা দেখাত বটে; কিন্তু আমার যে গুরুতর শাস্তি হওয়া উচিত তার এই মনের ইচ্ছা সে সব সময়ে গোপন রাখতে পারত না।

মারি এমেকে সে খুব ভালোবাসত। দিন রাত তাঁর সেবাতেই লেগে থাকত। এবং তিনি একটু কড়া কথা বল্লেই সে কেঁদে ফেলত। তখন তার গালে মুখে হাত-বুলিয়ে মারি এমে তাকে ঠাণ্ডা করতেন। সে-সময়ে রৌদ্র ও বৃষ্টির মত তার একসঙ্গে হাসি ও কান্না চলতে থাকত—এবং কাঁধটা দুলে দুলে উঠে তার সেই সাদা ধবধবে গলাটা বার করে দিত। নেরঁ বলত তাকে দেখায় ঠিক যেন বেড়ালের মতন।

(৯)

একদিন দুপুরবেলা খাওয়ার সময় বন্ নেরঁ রাগারাগি করে চলে গেল। সব যখন নিস্তব্ধ এমন সময় ঘটনাটা ঘটল। হঠাৎ নেরঁ চীৎকার করে উঠল—"যাবো না ত থাকব না কি! আমি কিছুতেই থাকচি না।" মারি এমে অবাক হয়ে তার দিকে চাইলেন। অমনি নেরঁ চোখ-পাকিয়ে মাথাটা নীচু করে তাঁকে যেন গুঁতোতে এল। চীৎকার করে বলতে লাগল যে, সে কি একটা খুকীর হুকুমে চলবে না কি! সে চেঁচাতে চেঁচাতে দরজার দিকে পিছু-হটে যেতে লাগল; দরজার কাছে পৌঁছে এক-টানে দরজাটা খুলে ফেল্লে; তারপর মারি এমের দিকে তার লম্বা একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে—সপ্তমে চেঁচিয়ে বল্লে—"ও খুকি না ত কি! এখনো পঁচিশ হয়নি।"

ছোট মেয়েদের কেউ কেউ ভয়ে কুঁকড়ে গেল; কেউ হী-হী করে হেসে উঠল। মাদলিন যেন পাগল। সে মারি এমের পায়ের তলায় একেবারে আছাড় খেয়ে পড়ল;—তাঁর ঘাগরার খুঁট ধরে, তাঁর পা জড়িয়ে, তাঁর হাত দুখানা মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে কী যে করতে লাগল বলতে পারি না। এম্নি চীৎকার করছিল যেন কি একটা ভয়ানক কাণ্ড!

মারি এমে তাকে কিছুতেই ছাড়াতে পারছিলেন না। শেষে তিনি ভারি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। মাদলিন অমনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। মারি এমে তার কাপড় খুলে দিতে দিতে আমাদের দিকে ইসারা করলেন। আমি ভাবলুম তিনি আমায় ডাকছেন। আমি ছুটে গেলুম। তিনি বল্লেন—"না, তোমায় নয়, তুমি যাও। মারি রেনো।"

মারি রেনোর হাতে তাঁর চাবির গোছাটা দিলেন, সে নিয়ে চলে গেল। সে কস্মিন কালেও মারি এমের ঘরে যায়নি কিন্তু যে জিনিষটি মারি এমে চেয়েছিলেন ঠিক সেই স্মেলিং সল্টের শিশিটা মুহূর্ত্তের মধ্যে বার করে নিয়ে সে ফিরে এল।

(১০)

মাদলিন্ শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠল। বন্ নেরঁর জায়গা সে দখল করলে। আমাদের উপর এখন তার অসীম কর্ত্তৃত্ব। মারি এমেকে কিন্তু সে ভারি ভয় করত;—তাঁর কাছে একেবারে জড়সড়। যত জারিজুরি আমাদের উপর। খামকা সে যখন-তখন চীৎকার

করে বলে উঠত যে, সে আমাদের দাসী নয়, আমাদের দেখা-শোনার ভার তার উপর!

যে দিন সে মূর্চ্ছা যায় সেই দিন তার ধবধবে সাদা গলাটি আমি ভালো করে দেখতে পেয়েছিলুম—ভারি চমৎকার। কিন্তু সে ছিল বড় হাঁদা। সে আমায় কত-কি বলত, আমি গ্রাহ্য করতুম না। তাতে তার রাগ আরো বাড়ত। সে আমায় যাচ্ছে-তাই করত —এবং প্রত্যেক কথার শেষে ঠেস্ দিয়ে বলত—"নবাব-পুত্রী!"

মারি এমে যে আমায় ভালোবাসতেন এ তার সহ্য হত না। আমাকে আদর করতে দেখলে সে রেগে লাল হয়ে উঠত।

আমি বড় হয়ে উঠছিলুম—এবং আমার শরীর মন্দ ছিল না। মারি এমে বলতেন আমায় নিয়ে তাঁর একটা গর্ব্ব আছে। এক একসময় আদর করে আমায় এমন জোরে বুকে চেপে ধরতেন যে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত। তখন আমার কপালে হাত বুলোতে-বুলোতে আদর করতে-করতে তিনি বলতেন—"লক্ষ্মী আমার! মণি আমার!"

ছুটির সময় আমি তার পাশটিতে এসে বসতুম তাঁর বই-পড়া শুনতুম। গম্ভীর স্বরে তিনি পড়ে যেতেন। বইয়ের মধ্যেকার কোনো লোককে যদি তাঁর ভালো না লাগত, তিনি রেগে বইখানা মুড়ে ফেলতেন —তারপর আমাদের খেলায় যোগ দিতেন।

তিনি চাইতেন যে আমার যেন কোনো দোষ, কোনো খুঁত না থাকে। তিনি প্রায়ই আমায় বলতেন—"তোমায় একেবারে নিখুঁত হতে হবে—বুঝলে?"

একদিন তাঁর ধারণা হল আমি মিথ্যে কথা বলেচি। খানিকটা জমি পড়েছিল—তার মধ্যখানে প্রকাণ্ড একটা বাদাম গাছ। সেইখানে তিনটে গোরু চরত। তার মধ্যে সাদা গোরুটা ছিল ভারি দুষ্টু—তাকে আমরা সবাই ভয় করতুম। একদিন একটা মেয়েকে সে গুঁতিয়ে ফেলে দিয়েছিল। সেদিন দেখলুম লাল গোরু দুটো সেইখানে ঘাস খাচ্ছে আর বাদাম গাছটার তলায় একটা প্রকাণ্ড কালো গোরু। আমি ইস্‌মেরিকে বল্লুম—"দেখ্ ভাই, সেই সাদা গোরুটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে—সেটা যে দুষ্টু!" ইস্‌মেরির মেজাজ সেদিন ভালো ছিল না। সে চীৎকার করে বলে উঠল যে ঐ রকম করে লোকের সঙ্গে ঠাট্টা করা আমার অভ্যাস; ঐ রকম মিছে কথা বলে লোককে আমি ভুলোই। আমি বল্লুম—"মিছে কথা কেন? ঐ দেখনা কালো গোরু!" সে বল্লে—"ওটা কালো নয়, ওটা সাদা।" আমি বল্লুম—"না ওটা কালো।" মারি এমে পাশে ছিলেন তিনি আমার কথা শুনে রেগে উঠে বল্লেন—"অ্যাঁ, তুমি এই রকম মিছে কথা বল!"

গোরুটা সরে এল। দেখি তার খানিকটা কালো, খানিকটা সাদা। বুঝলুম আমি ভুল করেছি। সেই প্রকাণ্ড বাদমগাছটার ঘন ছায়া পড়ে সাদা গোরুকে কালো দেখাচ্ছিল। আমি এমন আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম যে একেবারে হতভম্ব—মুখ দিয়ে কথা বার হয় না। মারি এমে আমাকে ধরে খুব কসে একটা নাড়া দিয়ে বল্লেন—"তুমি মিছে কথা কেন বল্লে?" আমি বল্লুম—"আমি

বুঝতে পারিনি!" তিনি এক কোণে আমায় দাঁড় করিয়ে দিলেন, বল্লেন—"আজ একটুকরো রুটি ও একটু জল ছাড়া আর কিচ্ছু খেতে পাবে না।"

আমি তো মিছে কথা বলিনি, কাজেই শাস্তির জন্য আমার মনে কোনো দুঃখ হলনা।

সেই কোণটায় কতকগুলো পুরোনো আলমারি দাঁড় করানো ছিল, তার মধ্যে রাগানের কাজের সব যন্তর-পাতি থাকত। আমি এটার উপর, ওটার উপর চড়ে চড়ে বেড়াচ্ছিলুম—শেষে সবচেয়ে বড় আলমারিটার মাথার উপর গিয়ে উঠে বসলুম। আমি তখন দশ বছরের। জীবনে এই প্রথম আমার একলা থাকা। সে আমার বেশ লাগছিল! আমি সেখানে পা ঝুলিয়ে চুপটি করে বসেছিলুম—এবং মনে মনে একটা অদৃশ্য জগতের কল্পনা করছিলুম। মরচে-ধরা তালা-দেওয়া সেই ভাঙা আলমারিটা যেন একটা রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার। আমি যেন একটি চমৎকার ছোট মেয়ে—আমাকে একটা পাহাড়ের চূড়োয় ফেলে দিয়ে গেছে। পরীর মতো সুন্দরী একজন মেয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে তুলে নিতে আসচেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরচে তিন চারটে সাদা ধবধবে হাঁস। যেমন তারা আমার কাছে এসেছে অমনি দেখি মারি এমে সেইখানে;—চারদিকে আমায় খুঁজে বেড়াচ্চেন। আমার তখনো হুঁস হয়নি যে আমি সেই আলমারিটার মাথায় বসে আছি—আমি ভাবছি আমি তখনও সেই পাহাড়ের চূড়োয়! আমার ভারি রাগ হতে লাগল,—মারি এমের যেমন আসা অমনি সেই সুন্দর রাজপ্রাসাদ, সেই পরীর মতো সুন্দরী মেয়ে সেই সাদা হাঁস —সব কোথায় মিলিয়ে গেল! মারি এমে দেখতে পেলেন—আমার পা দুটো ঝুলছে। যেমন তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া অমনি আমার মনে পড়ে গেল আমি আলমারির চালে বসে আছি। তিনি আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পর পকেট থেকে নানা রকম খাবার জিনিষ বার করতে লাগলেন, একটার পর একটা দেখিয়ে রাগের সঙ্গে বল্লেন—"এসব তোমার জন্যে ছিল, বুঝলে!" সেই জিনিষ-গুলো আবার তিনি পকেটের মধ্যে পুরে নিয়ে চলে গেলেন। একটু পরে মাদলিন আমার জন্যে একটুকরা রুটি ও একটু জল রেখে চলে গেল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি সেই-খানে রইলুম।

(১১)

মারি এমে দিন দিন বিমর্ষ থেকে আরো বিমর্ষ হয়ে উঠছিলেন। তিনি আর আমাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দেন না; আমাদের খাওয়ার সময় আসতেও তাঁর ভুল হয়। উপাসনা-ঘর থেকে তাঁকে ডেকে আনবার জন্যে মাদলিন আমায় পাঠিয়ে দিত। গিয়ে দেখতুম তিনি হাঁটু গেড়ে বসে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে রয়েছেন। আমি তাঁর কাপড় ধরে টানলে তবে তিনি মুখ তুলতেন। আমার মনে হত তিনি কাঁদচেন, কিন্তু মুখের কাছে গিয়ে দেখতে সাহস হতনা—যদি রেগে ওঠেন! কিসের এক ভাবনায় তিনি যেন সর্ব্বদা ডুবে থাকতেন;

কথা কইলে বিরক্তির সঙ্গে হাঁ আর না এই দুটি উত্তরে সেরে দিতেন।

ইষ্টর পর্ব্বের যে ভোজ প্রতিবৎসর হত তাতে তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। তিনি কেক আনতে বলতেন, আমরা সেগুলো টেবিলের উপর রেখে একখানা সাদা কাপড় চাপা দিতুম—পাছে পেটুক মেয়েরা নজর দেয়। ভোজের দিনে আমাদের যতখুসি কথা কইবার কোনো বাধা ছিল না—আমরা ভয়ানক কোলাহল জুড়ে দিতুম। মারি এমে আমাদের পরিবেষণ করতেন, এবং সকলকার সঙ্গেই কিছু না কিছু কথা কইতেন।

সেদিন তিনি নিজের হাতে কেক বিতরণ করবেন। মাদলিন তাঁর সাহায্যের জন্য সঙ্গে সঙ্গে ছিল। সে কেক-ঢাকা কাপড়টা উঠিয়ে নিতেই একটা বিড়াল সেই কাপড়ের ভিতর থেকে তড়াক করে লাফিয়ে পালিয়ে গেল। মারি এমে ও মাদলিন দুজনেই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলেন—"ওঃ।" মাদলিন বল্লে—"পাজি বেড়ালটা কেকগুলো এঁটো করে দিলে!" মারি এমেও দেখলুম বিড়ালটার উপর খুব বিরক্ত। তিনি খানিকক্ষণ গোঁ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন; তারপর কোণের দিকে ছুটে গিয়ে একটা লাঠি নিয়ে বিড়ালটাকে তাড়া করলেন। উঃ সে ভয়ানক দৃশ্য! বিড়ালটা ভয়ে সারা হয়ে উর্দ্ধশ্বাসে একবার এদিকে ছোটে, একবার ওদিকে ছোটে—লাঠির কাছ থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে আকুল। মারি এমে ক্রমাগত লাঠিটা বেঞ্চের উপর, দেয়ালের উপর ঠক্‌ঠক্ করছিলেন। ছোটো মেয়েরা সব ভয় পেয়ে উঠল—ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গেল। মারি এমে বাধা দিয়ে বল্লেন—"না, কেউ যেতে পাবে না!"

আমি তখন তাঁকে মারি এমে বলে চিনতে পারছিলুম না। ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপা, মুখ একেবারে সাদা, চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরচ্ছে! আমি ভয়ে মুখ ঢেকে ফেল্লুম। কিন্তু বেশীক্ষণ পারলুম না, আবার চোখ খুল্‌লুম। বিড়াল-তাড়ানো তখনও চলচে। মারি এমে লাঠি-হাতে তখনও ছুটোছুটি করচেন—মুখে তাঁর কথা নেই। ঠোঁট তাঁর ঝুলে পড়েচে—ছোট ছোট তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো চিক্‌চিক্ করে উঠচে। একবার বেঞ্চির উপর, একবার টেবিলের উপর—এমনি করে তিনি ছুটোছুটি করতে লাগলেন। বিড়ালটাকে একবার বাগে পেয়ে যেমন লাঠি উঠিয়েছেন অমনি সেটা লাফিয়ে একটা জানলার উপর গিয়ে বসল। মাদলিন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল, সে বল্লে—"একটা বড় লাঠি নিয়ে আসি।" মারি এমে বল্লেন—"না, কাজ নেই। বেঁচে গেল; ওর অদৃষ্ট ভালো।"

বন্ জিস্তিন আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল, সে চোখ ঢেকে বলতে লাগল—"ছি ছি কি লজ্জা!" আমারও মনে হল সত্যি এ বড় লজ্জার কথা। আমার কেমন মনে হত লাগল মারি এমে যেন আগের চেয়ে দেখতে ছোট হয়ে গেছেন। আমার বিশ্বাস ছিল তিনি কখনো কোনো মন্দ করেন না। আজকের এই ঘটনার সঙ্গে আর-একদিন—যে দিন ভয়ানক ঝড় উঠেছিল সেদিনকার কথা তুলনা করতে লাগলুম। সেদিন তাঁকে মনে হয়েছিল দেবী। যখন তিনি বিড়ালটাকে তাড়া করেছিলেন তখন আমার সেই সেদিনকার তাঁর বেঞ্চির উপর উঠে সুন্দর হাতখানি তুলে অতি ধীরে ধীরে জানলা বন্ধ করার মূর্ত্তি আমার মনে পড়ছিল। তাঁর চওড়া আস্তিন কাঁধের উপর উল্টে এসে পড়েছিল। বিদ্যুতের চমকানিতে বাতাসের গর্জ্জনে ভয়ে যখন আমরা অধৈর্য্য তখন তিনি অতি শান্তভাবে আমাদের শুধু বল্লেন—"ঝড় উঠেছে!"

মারি এমে মেয়েদের সবাইকে ঘরের একদিকে দাঁড়াতে বল্লেন। তারপর দরজাটা খুলে দিলেন। বিড়ালটা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

পদ্মের পাপড়ি

রামিয়াড্

অথবা ডাক্তার বাল্মীকি এল্ এল্ ডি, এফ্ আর সি এস্ কৃত
ঊনবিংশ শতাব্দীয় রামায়ণ

পুণ্যতীর্থ তমসা নদীর তীরে ডাক্তার বাল্মীকির তপোবন। তার-কণ্ঠী কুক্কুট কুক্কুটী বিহঙ্গেরা মনের উল্লাসে গান করিতেছে; কোথাও বা আশ্রম-মৃগ কুক্কুরগণ সুখে অস্থি-দুর্ব্বা রোমন্থ করিতেছে। ডাক্তার বাল্মীকি আশ্রম-কুটীরে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ফায়ের-সাইড্-অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে ঈজিচেয়ার-বেদীতে হেলান দিয়া ম্যানিলা পত্রের ধূমপান করিতেছেন; চুরট প্রান্ত হইতে ঘন ধূমরাশি কুণ্ডলী পাকাইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে, সেই ধূপধূনার পুণ্য গন্ধে আশ্রম-কুটীর আমোদিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে মুনিবর পার্শ্বস্থিত বোতল-কমণ্ডলু হইতে শ্যামপেনের সোম পান করিতেছেন; এমন সময়ে কুটীর-দ্বারে ঘা পড়িল। মুনি-কুমার মাষ্টর ভরদ্বাজ, ডাক্তার বাল্মীকির নিকটে আসিয়া সমাচার দিল—"রেবেরেণ্ড মিষ্টর নারদ আসিয়াছেন।" ধ্যানমগ্ন বাল্মীকির চমক্ ভাঙিয়া গেল, অমনি তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া দ্বার-দেশে উপস্থিত হইলেন এবং হাইচার্চ্চ মিসনরি সোসাইটির পরিব্রাজক মিসনরি, সঙ্গীতের অধ্যাপক, সহস্র চুরট ভস্মকারী গোথাদকদিগের অগ্রগণ্য রেবেরেণ্ড নারদের সহিত চটুল-ভাবে হস্তালোড়ন পূর্ব্বক "কেমন করিতেছ" বলিয়া কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ উত্তর করিলেন, "সম্পূর্ণ ভাল—ধন্যবাদ তোমাকে।" অতঃপর বাল্মীকি নারদকে আহ্বানপূর্ব্বক কুটীরের মধ্যে লইয়া গিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। মহামুনি ধুচুনি-উষ্ণীষ মস্তক হইতে অবতারণ পূর্ব্বক চেয়ারে উপবেশন করিলেন, পরে চেয়ারের নিম্নে উষ্ণীষ স্থাপন

করিয়া বলিলেন, "বাল্মীকি! তোমায় আজ এত ভাবিত দেখিতেছি কেন?" বাল্মীকি উত্তর করিলেন, "প্রিয় খুড়া, সত্য বলিয়াছ, আমি কিছু ভাবিত আছি; অনেক দিন হইতে আমি মনে করিতেছি একটি মহা-কাব্য লিখিব—কে নায়ক হইবার উপযুক্ত তাহাই এতক্ষণ আমি এই অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম; বুদ্ধিকে সতেজ করিবার জন্য গ্যালন্ গ্যালন্ সোম-পান করিয়াছি, তথাপি তাহার কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। এক্ষণে, খুড়া, তুমি কি এত দয়ালু হইবে যে, ইহার একটা সৎপরামর্শ দিয়া আমাকে বাধিত করিবে?" সুবিজ্ঞ নারদ আজানুলম্বিত পাকা দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে উত্তর করিলেন—"দেখ বাপু বাল্মীকি, মহাকাব্য, ভাষায় যাহাকে এপিক্ পোয়েম বলে, তাহা অতি দুরূহ ব্যাপার, তাহা লেখা তোমার আমার কর্ম্ম নহে। এক যা' লিখিয়াছিলেন মহর্ষি হোমর; তেমন এপর্য্যন্ত পৃথিবীতে কেহ লিখিতে পারে নাই, পারিবেও না; তুমি সে দুরাশা পরিত্যাগ কর।" বাল্মীকি বলিলেন, "খুড়া অমন আশীর্ব্বাদ করিও না—মনুষ্য যাহা করিয়াছে, মনুষ্য তাহা করিতে পারে। হোমর ইলিয়াড্ লিখিয়াছেন আমি কি কিছুই লিখিতে পারি না? হোমর ইলিয়াড্ লিখিয়াছিলেন, আমি রামিয়াড্ লিখিব! আমার ইন্‌স্‌পিরেষণ আসিয়াছে, তোমার হার্প টা আমাকে দেও, আমি রামিয়াড্ গান করি।" এই কথা বলিয়া বাল্মীকি হার্প বাদনপূর্ব্বক গর্দ্দভ-বিনিন্দিত সুমধুর স্বরে ঊনবিংশ-শতাব্দীয় রামায়ণ গান আরম্ভ করিলেন। বাল্মীকির স্বহস্ত-পালিত আশ্রম-মৃগ কুক্কুরগণ প্রভু-প্রসাদ গো-অস্থি রোমন্থ করিতেছিল—গীত-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নিকটে আগমনপূর্ব্বক ভেউ ভেউ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। উভয় স্বর মিলিয়া একটি মধুর সঙ্গীত-লহরী গগনতলে সমুত্থিত হইল।

রাম নামে একজন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার দেহ মধ্যমাকার, হর্কু-লিসের ন্যায় দৃঢ় গঠন, নাসিকা রোমীয় ছাঁদের, ওষ্ঠাধর কিঞ্চিৎ চাপা, ইহাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সূচিত হইতেছে। তাঁহার কুঞ্চিত কুন্তল আবলুষ-কাষ্ঠ-বিনিন্দিত মসৃণ ললাটে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বোধ হইতেছে যেন বিশাল ওকগাছে আইবি লতা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সেই লোক-পূজিত রাম গাম্ভীর্য্যে নেষ্টরের ন্যায়, ধৈর্য্যে আল্প গিরির ন্যায়, বীর্য্যে এথিলিসের ন্যায়, সৌন্দর্য্যে ক্যুপিডের ন্যায়, ক্ষমায় যীশুখৃষ্টের ন্যায়, ধনে রথচাইল্-ডের ন্যায়, শাস্ত্র-জ্ঞানে মোক্ষমূলারের ন্যায় অসাধারণ ছিলেন। তিনি রাজা দশরথের প্রিন্‌স্ অফ্ ওয়েল্‌স্। একদিন রাম মৃগয়ার্থ মিথিলা-সন্নিহিত কোন অরণ্যে খ্যাঁকশেয়ালী শীকার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ অতি পরিপাটী। নীলাভ উৎকৃষ্ট বনাতের কোট্ ও নব্যতম ঢপের চোস্ত পেন্‌টলুন পরিধান, মস্তকোপরি সোলার হ্যাট্, পদদ্বয়ে শীকারোপযোগী ওয়েলিংটন বুট্ আজানু-সমুত্থিত, এবং উইস্কির বোতল ও কাট্‌লেট্ সম্বলিত চর্ম্মঝুলি চর্ম্মোপবীতে আলম্বিত রহিয়াছে। শিঙ্গার নিনাদে, কুক্কুরের চীৎকারে, শীকারীগণের হুর্‌রে রবে, অশ্বের

হ্রেষাধ্বনিতে কানন-প্রদেশ ধ্বনিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্র বর্শা উদ্যত করিয়া শৃগালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া একেবারে কাননের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলেন। শৃগাল দৃষ্টি-বহির্ভূত হইল। রাম নিরাশ হইয়া একটা বৃক্ষে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইলেন এবং পাকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ঘন ঘন মুখ পুঁছিতে লাগিলেন। সহসা রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত কাতর চীৎকার-ধ্বনি তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাম একজন গ্যালাণ্ট্ লোক। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ধ্বনির অভিমুখে ধাবিত হইলেন!

কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, একটি চত্বা-রিংশৎ বর্ষীয়া বালিকা মূর্চ্ছিতা। রাম অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন—তাঁহার ব্যাগের মধ্যে আঘ্রাণ-লবণ খুঁজিলেন কিন্তু পাইলেন না। পরে উইস্কির বোতলে যে মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ ছিল তাহার এক ডোজ বালিকাটির মুখে ঢালিয়া দিলেন—দিবা মাত্রই সমস্ত শরীর নড়িয়া উঠিল—ক্রমে ক্রমে চক্ষু উন্মীলিত হইল, চক্ষু মেলিতেই সম্মুখে রামকে দেখিতে পাইলেন—অমনি "O my!" বলিয়া দুই হাতে পুনর্ব্বার চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন। রাম বলিলেন, "ভয় নাই, আমি আপনার রক্ষা-হেতু আসিয়াছি। কি জন্য আপনি ভয় পাইয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি?" চত্বারিংশ বর্ষীয়া বালিকা উত্তর করিলেন, "আমি আরণ্যক দৃশ্যের স্কেচ তুলিতেছিলাম আর আমার গাউনের আঁচল ঘেসিয়া কেমন একটা জন্তু—বোধ হয় শৃগাল দৌড়িয়া চলিয়া গেল, তাহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছি।"

রাম। হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া আছেন কেন?

বালিকা। আমার ভয় হইতেছে পাছে আবার শৃগালটা আসে—আমাকে যদি কেউ, এই অরণ্য-পথের রক্ষক হইয়া, আমার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেন, তবে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই।

রাম। তার জন্য চিন্তা কি?

এই বলিয়া বালিকাকে উঠাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি কি আপনাকে বাহুদান করিতে পারি?" সীতা বলিলেন "ধন্যবাদ আপনাকে।" রাম হস্ত বাড়াইয়া দিলেন, বালিকা ঈষৎ ব্লষ্ করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "আপনি যে আমাকে এই মহা বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন, তাহার ঋণ আমি কিরূপে পরিশোধ করিব?"

রাম। আমি যে উপকার করিলাম তাহা অতি সামান্য।

বালিকা। ও-কথা বলিবেন না—আপনার ন্যায় বীর পুরুষ উপস্থিত না থাকিলে নিশ্চয়ই আজ শৃগালের হস্তে প্রাণ হারাইতাম।

রাম। আমি থাকিতে আপনার কোন ভয় নাই। এক্ষণে পরস্পরের নিকট আর অপরিচিত থাকা কর্ত্তব্য নয়। আমার নাম রাম—আপনার নাম জিজ্ঞাসার স্পর্দ্ধা কি মার্জ্জনা করিবেন?

বালিকা। আমার নাম মিস্ সীতা জনক।

রাম। ও! আপনি হিজ্ ম্যাজেষ্টী জনকের কন্যা? তিনি খুব একজন এন্-লাইটেণ্ড লোক। আমার বলিতে সাহস

হইতেছে না—প্রথম দৃষ্টিতেই আপনাকে আমি ভাল বাসিয়াছি। এ ভক্ত কিঙ্কর কি আপনার পাণি গ্রহণের আশা করিতে পারে?

সীতা। (সলজ্জভাবে) সে পিতা জানেন।

রাম। তাঁর কাছে কি আমি প্রস্তাব করিতে পারি? তিনি সম্মত হইলে আপনার কোন আপত্তি থাকিবে না?

সীতা ব্লষ্ করিয়া নিরুত্তর হইলেন।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে জনক রাজার প্রাসাদে পৌঁছিলেন।

রাম জনক রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক আপনার কুলের পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আপনার কন্যার হস্তের নিমিত্ত আমি উমেদার।" জনক রাজা বলিলেন, "অতি উত্তম! কিন্তু আমার একটি বন্দুকভঙ্গ পণ আছে, তাহার আমি অন্যথা করিতে পারি না। আমি টাইম্স্-সংবাদ-পত্রে দেখিয়াছিলাম যে, কোন পর্য্যটক আফ্রিকাবাসী গরিল্লা নামক বীর-চূড়ামণিকে বন্দুক মারিতে যাওয়াতে তিনি তাঁহার বন্দুক কাড়িয়া লইয়া এক মোচড়ে দ্বিখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এইরূপ অসাধারণ বীরত্বের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমি আর নীরব থাকিতে পারিলাম না। আমি দেশ-বিদেশে প্রচার করিলাম যে, গরিল্লা বীরকে আদর্শ মানিয়া, তাঁহার ন্যায় যিনি বন্দুক ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তাঁহাকে আমি কন্যা সম্প্রদান করিব।" রাম বলিলেন, "আচ্ছা, আমি প্রস্তুত আছি।" অমনি এক জন তৈয়ার ভৃত্য দ্রুতগতি একটা মার্টিনি রাইফেল আনিয়া রামের সম্মুখে ধরিয়া দিল। রাম তাহা দুই হস্তে ধরিয়া একটি মোচড়ে কর্ম্ম নিকাশ করিয়া সাত হাত হইয়া ফুলাইয়া দাঁড়াইলেন। জনক রাজা এবং পারিষদ্‌গণের তাক লাগিয়া গেল। জনক রাজা আনন্দে পুলকিত হইয়া বলিলেন, "তুমি যেরূপ অসামান্য বলবীর্য্য দেখাইলে, কন্যা-সম্প্রদানের অগ্রে, তাহার উপযুক্ত একটি উপাধি তোমাকে আমি প্রদান করিতে অভিলাষ করি। অনেকের অনেক প্রকার উপাধি আছে, যথা নর-ব্যাঘ্র, নর-পুঙ্গব, নর-ষণ্ড, কিন্তু সে সমস্তই পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তুমি আজ হইতে লোকে নর-গরিল্লা নামে খ্যাত হইবে। এক্ষণে মিস্ জনকের সম্মতির কেবল অপেক্ষা, অতএব যাও তাঁহাকে রাজি কর গিয়া!" রাম সদ্য সদ্যই কোর্টসিপ্ সুরু করিলেন। সীতা যদিও চত্বারিংশ বর্ষীয়া বালিকা বই নয়, কিন্তু তিনি সকল গুণেই গুণবতী ছিলেন। জনক রাজা একজন এন্‌লাইটেণ্ড্ লোক ছিলেন; তিনি বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক অনেক সভায় বক্তৃতা দিতেন। তিনি আপন কন্যাকে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। সীতা তাঁহার যত্নে সর্ব্বগুণে বিভূষিতা হইয়াছিলেন। তিনি কার্পেট বুনানি কার্য্যে অতিশয় নিপুণা ছিলেন। ফরাশীশ্ ভাষায় নবেল পাঠ করিতেন। পল্কা এবং ওয়াল্‌টস্ নাচিতেন। প্যারিস নগরের নব্যতম ফেসিয়ানের গাউন পরিতেন —সহজে ব্লষ্ করিতে পারিতেন এবং ইচ্ছা করিলেই মূর্চ্ছা যাইতে পারিতেন। এমন রূপ-গুণে বিভূষিতা চত্বারিংশ বর্ষীয়া বালিকাকে দেখিয়া রাম যে মুগ্ধ হইবেন ইহাতে আর

বিচিত্র কি! তিনি শীঘ্রই কোর্টসিপ শেষ করিয়া ফেলিলেন এবং বিবাহের পর এক্ষণে তিনি মনের সুখে মধুচন্দ্র ভোগ করিতেছেন। ইতি সাত ক্যান্তো রামিয়াডের হনিমুন নামকোঽয়ং প্রথমঃ ক্যাণ্টো সমাপ্তঃ।

ছিটওয়ালা সিবিলিয়ান সাহেব

প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, হুষ্টন (Houston) সাহেব নামক একজন সিবিলিয়ান ছিলেন। ইনি উচ্চ কুলোদ্ভব ও একজন গবর্ণর জেনেরেলের স্ব-সম্পর্কীয়। ইনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। ইনি বাঙ্গালা, হিন্দি, পারসী, আরবী এই সকল ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন এবং এদেশের রীতিনীতি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। ইনি কার্য্যেও পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু ইহাঁর ছিট্ ছিল। সে ছিট্ ছিট-মান যন্ত্রের ঠিক ঊনপঞ্চাশ সংখ্যা পর্য্যন্ত না পৌঁছাক, তাহার কাছাকাছি বটে।

যখন তিনি মেদিনীপুর জিলায় স্পেশল কালেক্টর পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি ঐ জেলার একজন চাষা জমীদারকে একবার একটী পরোয়ানা লিখেন। তখনকার রীত্যনুসারে ঐ পরোয়ানা পারসী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। সে পরোয়ানার প্রথমে এই পাঠ ছিল। "ঈশপন্‌হা লাঙ্গল দস্তগা বাদো বয়েল বআফিয়ৎ বাশন্দ" "হে হলযন্ত্র ফলকপ্রতিপালক! হে হলযন্ত্রধারী! দুইটী বলীবর্দ্দ লইয়া তুমি কুশলে থাক।" একদা ঐ জিলায় জমীদারী নিলামের দিন একটি তালুক লইয়া দুইজন জমীদারের প্রতিনিধি দুই মোক্তারের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে একজন মোক্তারের নাম তুলসী, অপরের নাম দামোদর। তুলসীর চেষ্টা তালুকটি আপনার প্রভুর জন্য ক্রয় করে। দামোদরের চেষ্টা তাহার প্রভুর জন্য ক্রয় করে। দুইজনে নিলামের ডাক ডাকিতে ডাকিতে তুলসী কিছু ঘাটিয়া গেল। তখন হুষ্টন সাহেব তাহাকে বলিলেন, "তুলসী! তোম কিস্‌ওয়াস্তে ঘট যাতে হো, দামোদরকা উপর চড়্ বইঠো।" হুষ্টন সাহেব অবগত ছিলেন যে আমরা শালগ্রামের উপরে তুলসী দিই। এই রীতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

হুষ্টন সাহেব ভারতবর্ষকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন, কালীকা বিলাত, শিওকা বিলাত, জগন্নাথকি বিলাত। বিলাত শব্দে পারসীতে দেশ বুঝায়। কালীঘাটের কালী বঙ্গদেশের প্রধান দেবতা, এইজন্য বঙ্গদেশকে তিনি কালীকা বিলাত বলিয়া ডাকিতেন। কাশীর বিশ্বেশ্বর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান দেবতা, এইজন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলকে তিনি শিওকা বিলাত বলিয়া ডাকিতেন। জগন্নাথ উড়িষ্যার প্রধান দেবতা, এইজন্য উড়িষ্যা প্রদেশকে তিনি জগন্নাথের বিলাত বলিয়া ডাকিতেন।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণস্থিত অনার্য্য দেশ বলিয়া বোধ হয় তিনি তাহা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই।

তিনি ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত মান্য করিতেন, আবার ব্রাহ্মণের মধ্যে কুলীনকে সর্ব্বাপেক্ষা মান্য করিতেন। তিনি প্রত্যেক উমেদারের কুলপরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন। যদি কেহ ব্রাহ্মণ বলিয়া, বিশেষতঃ চাটুর্য্যে, বাঁড়ুর্য্যে, মুকুর্য্যে অথবা গাঙ্গুলী বলিয়া পরিচয় দিত; তাহা হইলে তাহার শীঘ্র কর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা। নিকৃষ্ট জাতি হইলে ছয় বৎসর ধরিয়া ঘোল খাইতে হইত।

যখন তিনি মেদিনীপুর জিলায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন একজন সুবর্ণবণিক তাঁহার সেরিস্তাদার ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার উপরওয়ালা যে কমিশনর সাহেব ছিলেন, তিনি বিলাতের এক ধোপার ছেলে। সেরিস্তাদারের সহিত হুষ্টন সাহেবের সর্ব্বদা টক্-ঝক্ হইত, কিন্তু সে ব্যক্তি কমিশনর সাহেবের প্রিয়পাত্র বলিয়া তাহার কিছু করিতে পারতেন না। একদিন তিনি সেরিস্তাদারের উপর কুপিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তোমারা পাণি কোই ছোঁতা নেই, তোমারা মনিবকা পাণিভি কোই ছোঁতা নেই।"

যখন তিনি কৃষ্ণনগর জেলায় বদলি হইলেন, তখন সেখানে গিয়া প্রথম কর্ম্মের চার্জ্জ লইবার সময় প্রত্যেক আমলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমলাদিগের মধ্যে বেচারা সেরিস্তাদার চট্টগ্রামবাসী বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে হুষ্টন সাহেব বলিলেন, "হিয়া কাঁহাসে একঠো মগ্ আয়ারে?" চট্টগ্রাম জেলা ব্রহ্মরাজ্যের সন্নিকট প্র তাহার দক্ষিণভাগে অনেকগুলি ম নিবাস আছে, এইজন্য হুষ্টন সাহেব সিরে দারকে মগ্ বলিয়াছিলেন।

উক্ত জিলায় কর্ম্ম করিবার সময় একবার একটী মোক্তারের প্রতি কুপি হইয়া তাঁহার নিকটস্থ রূলে হাত দি ছিলেন। মোক্তারকে মারিবার ইচ্ছা ছি না, কেবল ভয় দেখাইবার জন্য ঐ প্রকা করিয়াছিলেন, কিন্তু একবার মাত্র তাঁহা সেই রূল-স্পর্শের ফল অতিশয় ভয়ান হইয়া দাঁড়াইল। মোক্তার মনে করি সাহেব বুঝি তাঁহাকে মারিতে যাইতেছে সেইজন্য সে পলাইল! সে যদি পলাই আমলারাও পলাইল। মোক্তার-আমলা যদি পলাইল তবে কাছারীর বাহিরে অ বৃক্ষের নিম্নে উপবিষ্ট মকদ্দমাকারী ব্যক্তি গণও পলাইল। নগরের লোক দেখিল দু তিন শত লোক কেবল উর্দ্ধশ্বা পলাইতেছে। কি খবর, না, সাহে খেপিয়াছেন।

একজন ব্রাহ্মণ-পুত্র হুষ্টন সাহেবে অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহা তাঁহার বাল্যকালে প্রতিপালন করিয়া শে একটী কর্ম্ম করিয়া দেন। সে ব্যক্তি প ক্রমে ডেপুটি কলেক্টর পদ প্রাপ্ত হন। সাহেব যখন হুগলীতে বদলী হইলেন, তখ সেই ব্যক্তি হুগলী জিলায় ঐ কর্ম্ম করি ছিলেন। হুষ্টন সাহেব তথাকার কালেক্ট হওয়াতে তিনি তাঁহার অধীনস্থ হইলেন। সাহেব একদিন তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া চাপরাসীকে তাঁহার কান ধরিয়া ঘোড়দৌড়

রাইতে হুকুম দিলেন এবং সেই হুকুম-সারে কার্য্যও হইল। হুষ্টন সাহেব তদ্দেশে থাকিয়া প্রায় এতদ্দেশীয় লোক য়া গিয়াছিলেন। যখন ঐ হুকুম দিয়া লেন, তখন সে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের উচ্চ র্ম্মচারী ইহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন; এবং তদ্দেশীয় লোকে বাটীর চিরপ্রতিপালিত অন্নদাসের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে সেইরূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা শুনিবেন কেন? তাঁহারা তাঁহাকে অস্বাস্থ্যকর চট্টগ্রাম জেলায় বদলি করিয়া দিলেন, সেইখানেই তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করেন।

বঃ--

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আমাদের পক্ষে একটী কঠোর কর্ত্তব্য বিশেষ। প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহের শুদ্ধমাত্র, প্রাপ্তি স্বীকার করিলে গ্রন্থকার মহাশয়েরা কখনই তৃপ্ত হইবেন না, আবার তাহাদের বিস্তৃত সমালোচনা করিতে গেলে ভারতীতে স্থান কুলাইবে না। সুতরাং সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। কিন্তু সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা প্রাপ্ত গ্রন্থের মোট দোষ-গুণ ব্যক্ত করা ব্যতীত বিস্তৃতরূপে দোষ-গুণ প্রদর্শন করিতে পারি না! মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে এরূপ প্রণালী-অনুসারে অনেক সময়ে আমরা অনেক গ্রন্থকারের প্রতি অনিচ্ছাক্রমেও অন্যায় করিয়া ফেলি। একখানি পুস্তক সমস্তটা পড়িয়া হয়ত আমরা মোটের উপর প্রীতিলাভ করি, আর একখানি পুস্তকের সমস্তটা পড়িয়া হয়ত মোটের উপর আমরা বিরক্ত হই, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর অনেক পুস্তকের অনেক স্থল হয়ত খুব কদর্য্য হইতে পারে, আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেক পুস্তকের অনেক স্থানে হয়ত সুন্দর হইতে পারে। আমরা সংক্ষিপ্ত সমালোচন-স্থলে এই দোষ-গুণের সমন্বয় করিতে যতদূর-সাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইদানীন্তন গ্রন্থসমূহে দোষের ভাগ এত অধিক যে সরলভাবে সমালোচনা করিতে গেলে ইচ্ছা না থাকিলেও কতকটা কঠোর হইয়া পড়িতে হয়। যদিও আমরা জানি যে ক্ষেত্রমাত্রই নব উর্ব্বরতা লাভ করিলে তাহাতে ভাল দ্রব্যের সহিত আগাছাও উৎপন্ন হয়—ফরাসী-বিপ্লব-প্রসূত নব স্বাধীনতার সময় অনেক ভাল কার্য্যের সহিত অনেক জঘন্য কার্য্যও সম্পাদিত হইয়াছিল—ইংরাজি সাহিত্যে ড্রাইডেন ও পোপ কর্ত্তৃক নব প্রণালী উদ্ঘাটিত হইলে থিওবোল্ড্ ও সিবর প্রভৃতিও কবিতা রচনা করিয়া সকলকে জ্বালাতন করিয়াছিল, তবুও ঐ সকল অশুভ অপরিত্যজ্য ও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া যে দমনীয় নহে তাহা আমরা স্বীকার করি না। সুতরাং বাঙ্গলা সাহিত্য নবজীবন পাইয়া যে সকল অসার প্রলাপে

দিক্‌বিদিক্ ধ্বনিত করিতেছে তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা পাওয়া নিতান্ত অন্যায় নহে।

* * *

কিন্তু সময়ে সময়ে এমন সুন্দর পুস্তকও প্রাপ্ত হইয়াছি যে তাহার সুরভি পাঠক মণ্ডলে বিকীর্ণ করিতে উৎসাহ ও উল্লাস পর্য্যন্ত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ অবসর আমাদের অদৃষ্টে অতি অল্প সময়ই ঘটিয়াছে। বঙ্গ সাহিত্য-উদ্যান আজ কাল নানা ফুল-ফলে সুশোভিত সন্দেহ নাই। সংস্কৃত মূল গ্রন্থ হইতে অনুবাদ, ইংরাজি কাব্য-নাটকের অনুকরণে উপন্যাস ও কাব্য, নাটক ও নাট্য-গীতি প্রভৃতি দেশী বিলাতী সগুণ নির্গুণ নানা প্রকার "ইত্যাদিতে" চারিদিক সমাকীর্ণ। গ্রন্থকার হইবার উগ্র লালসায় কেহ পৈতৃক বিভব বিনষ্ট করিতেছেন, কেহ বা বিদ্যালয়ে পাঠ পরিত্যাগ করিতেছেন, কেহ বা সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়াছেন, এবং কেহ-বা রোরুদ্যমান সন্তান-সন্ততিকে প্রবঞ্চনা করিয়া যন্ত্রালয়ের ঋণ পরিশোধ করিতেছেন। অথচ গ্রন্থকার হইতেই হইবে। গ্রন্থকার না হইলে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই—রাজ-কাছারিতে উত্তম পেশাদারীর সম্ভাবনা নাই, এমন কি, সময়ে সময়ে মনোমত বিবাহ হইবারও সম্ভাবনা নাই—সুতরাং গ্রন্থকার না হইয়ে আর উপায় নাই। সরস্বতী দেবীর উদ্ জনাতে না হউক, আবশ্যকতার উপরোধে বঙ্গ-যন্ত্রালয় অনন্ত-প্রসব-বেদনায় অস্থির। ইহার ফলস্বরূপ দেখিতে পাই, কোথাও হিড়িম্বা—কোথাও হিড়িম্বক। সময়ে সময়ে আমরা দু-একখানি প্রকৃত প্রশংসার গ্র প্রাপ্ত হই কিন্তু তাহা বঙ্গদেশীয় সুন্দর বনের বন-ফুলের মত অতিশয় যৎসামান্য। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মভেদী ঔপন্যাসিক কবিত্ব, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর গভীর উচ্ছ্বাস, হেমচন্দ্রের নূপুর-নিক্কন, নবীনচন্দ্রের ইংরাজী বীরভাব, ও আরও দু-একজন প্রশান্ত কবির জ্যোৎস্নাময় কল্পনা-লহরীর কথা যদি উল্লেখ না করি, তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের বাস্তবিক অবস্থা কি? কেব বা চর্ব্বিত-চর্ব্বণের উপর চাকচিক্যের আলেপন দিয়া, কেহ-বা স্বকপোল-কল্পিত বট্‌তলা উচ্ছ্বাসের তুফান তুলিয়া গ্রন্থকার পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে বাসনা করেন। সমালোচকেরই মহা বিভ্রাট। তিনি বঙ্গ সাহিত্যে প্রকৃত মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কখনই মিথ্যা চাটুবাক্যে অকিঞ্চিৎকর লেখক দিগকে স্ফীত করিতে চাহেন না, অথচ সত্য কথা বলিতে গেলে সরস্বতীর কৃত্রিম পোষ্যপুত্রেরা ক্রোধের বিষে জর্জ্জরিত হইতে থাকেন।

পথনির্দ্দেশ

বৈশাখে ভারতী চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। 'ভারতী'র সহিত আমার সম্বন্ধ অনেক দিনের, এজন্য সম্পাদকমহাশয়-কর্ত্তৃক ভারতীর পূর্ব্বস্মৃতি সম্বন্ধে কিছু লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। যে-বয়সে শৈশব ও বাল্যের কথা অস্পষ্ট হইয়া আসে আমি এখন বয়সের সেই সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ভারতী যখন পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয়ের সম্পাদকতার অধীনে ছিল, তখনকার কথা সুস্পষ্ট মনে পড়িতেছে না। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব প্রথম-হইতেই ভারতীর গ্রাহক ছিলেন; ইহার প্রচ্ছদ-পটে পদ্মবনের পদ্মাসনে আসীনা যে বীণাপাণির ছবিটা থাকিত তাহা বেশ মনে পড়িতেছে। সে সময়ে বোধ হয় আমি নূতন বাঙ্গলা পড়িতে শিখিয়াছি। কাগজ আসিলেই আমার পিতৃব্যমহাশয় তাহা দখল করিয়া বসিতেন, কেমন করিয়া কাগজখানি তাঁহার হাত হইতে লইব আমি তাহারি সুযোগ খুঁজিতাম; কাগজ হাতে পাইলে তাহা অনর্গল পড়িয়া যাইতাম। তখন আমার বয়স হয় ত আট বা দশ,—বলা বাহুল্য পড়িয়া কিছুই বুঝিতাম না। বেশ মনে পড়ে, সে সময়ে "তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক" নামে একটা দার্শনিক প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে ভারতীতে প্রকাশিত হইত, সেটাও আমার পঠিতব্য ছিল। কবিতা উপন্যাস কিছুই বাদ পড়িত না। কিন্তু কোন প্রবন্ধেরই অর্থ বুঝিতাম না। তখন মাসিক-পত্র বেশি ছিল না, ভাল বই হাতে পাইতাম না; দ্বিপ্রহরে মায়ের কাছ হইতে কৃত্তিবাসের "রামায়ণ" লইয়া "কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ" প্রভৃতি সরস অংশগুলি বটতলার সেই ছবির সহিত মিলাইয়া পড়িতাম, কিন্তু ইহাতে তৃপ্তি হইত না; বোধ হয় এইজন্যই ছাপানো বাংলা পুঁথি পাইলে আদ্যন্ত না পড়িয়া ছাড়িতাম না।

এই সময়ের একদিনের ঘটনা বেশ মনে পড়িতেছে। ভারতীতে তখন প্রায়ই কবিতা বাহির হইত, কে লিখিতেন তাহা মনে নাই। হঠাৎ একদিন খেয়াল হইল কবিতা লিখিব। চার-পাঁচ মাসের ভারতী একত্র করিলাম; এক কবিতায় দুই ছত্র আর-এক কবিতায় চারি ছত্র লইয়া এবং তাহাদের কথা ওলট্-পালট্ করিয়া কবিতা রচনা করিলাম। আমিই পরিবারস্থ বালক-বালিকাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলাম, যাহারা বয়সে ছোট তাহাদিগকে এই কবিতা শুনাইতে ইচ্ছা হইল না। দুই পয়সার টিকিট সঙ্গে দিয়া সেটি ভারতীর সম্পাদক-মহাশয়ের নিকটে পাঠাইয়া দিলাম। সম্পাদকমহাশয় যে এই অমূল্য কবিতা কাগজে ছাপাইবেন, ইহাতে আমার একটুও সন্দেহ ছিল না; সেজন্য বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক দিন পরে যখন "স্থানাভাব" এই সম্পাদকীয় মন্তব্য-সহ তাহা আবার আমার হাতে ফিরিয়া আসিল তখন বড় দুঃখ পাইয়াছিলাম। আমি যে এই কাণ্ড করিয়াছি, আমার অভিভাবকেরাও

তাহা জানিতেন না। ডাকঘর বাড়ীর কাছে ছিল না। ডাক-পিওন প্রতিদিনই চিঠি বিলি করিবার জন্য আমাদের বাড়ীতে আসিত, অনেক খোসামোদ করিয়া কবিতাটি তাহারি হাতে দিয়া ডাকে পাঠাইয়াছিলাম। এই দুর্ঘটনার পর আর কবিতা লেখার চেষ্টা করি নাই।

ইহার অনেক পরে যখন আমরা বেশ বড় হইয়াছি, তখন "দেওঘরে ভূতের অত্যাচার" বা এই রকমের একটা কিছু প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটি রাজনারায়ণবাবুর লেখা। ইহা লইয়া আমাদের পরিবার-মধ্যে যে একটা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার মনে পড়িতেছে। সেই ভারতীখানি প্রায় মাসখানেক ধরিয়া সকলের হাতে-হাতে ঘুরিয়াছিল; যাঁহারা ভূতে অবিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহারাও বোধ হয় একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

নিজের নামটা ছাপার অক্ষরে দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? এক সময়ে এই ইচ্ছাটা আমাকে বড়ই পাইয়া বসিয়াছিল। তখন "বালক" প্রকাশিত হইতেছে, আমরা তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। সুহৃদ্বর অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র তখন আমার সহপাঠী। সত্যেন্দ্রের একখানি "বালক" আসিত। সে যেদিন কাগজখানি কলেজে আনিত, সব কাজ ফেলিয়া সেদিন "বালক" পড়িতেই আমরা সময় কাটাইয়া দিতাম। "বালকে" কতকগুলি ভৌগোলিক হেঁয়ালি প্রকাশিত হইত এবং উত্তর-দাতাদের নাম কাগজে ছাপানো হইত। একদিন দেখিলাম সত্যেন্দ্রের নাম কাগজে ছাপা হইয়াছে। বড় ইচ্ছা হইল, নিজের নামটাও কাগজে উঠে। কতকগুলি হেঁয়ালির উত্তর করিয়া পাঠাইলাম; পরের মাসে কাগজে নাম ছাপা হইল, সেদিন খুব আনন্দ পাইয়াছিলাম। ইহার পরে ভারতীতে প্রকাশিত অনেক হেঁয়ালির উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়াছি, নিজের নাম কাগজে বার বার ছাপা হইয়াছে।

আমরা যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনগর কলেজে এফ, এ, পড়িতে আরম্ভ করি, তখন বন্ধু শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র কুমার রায় আমাদের সহপাঠী ছিলেন। দীনেন্দ্র তখন বেশ ভাল বাংলা লিখিতে পারিতেন, হঠাৎ একদিন দেখিলাম "দে-পাড়ার মেলা" নামে দীনেন্দ্রকুমারের একটা রচনা ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। দে-পাড়া কৃষ্ণনগরেরই নিকটবর্ত্তী একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম,—বৈশাখী পূর্ণিমায় সেখানে নৃসিংহ দেবের পূজার মেলা হয়; দীনেন্দ্র তাঁহার রচনায় ঐ মেলারই বর্ণনা করিয়াছেন। কতবার নুসিংহদেবের মেলা দেখিতে গিয়াছি কত লোকের মুখে তাহার কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এমন সুন্দর বিবরণ কেহ এমন ভাবে বলিতে পারেন নাই। খুব বিস্মিত হইলাম, বোধ হয় একটু হিংসাও হইল। দীনেন্দ্রকে প্রশংসা করিলাম, সে আরও মাসিক-পত্র হইতে তাহার রচনা আমাকে দেখাইল। যে একখানি পোষ্টকার্ডে "পদ্যমালা" নামক পুস্তকখানির সমস্ত কবিতা সে নিজের হাতে লিখিয়াছিল, তাহাও আমাকে দেখাইল। খুব তারিফ্ করিলাম। সেদিন হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম আমিও একজন লেখক

হইব। কিন্তু লিখিব কি? দীনেন্দ্রের মত আমি কবি ছিলাম না, এবং ভাষার উপরেও আমার অধিকার ছিল না। সময়ই বা কোথায়? কলেজের পড়া মুখস্থ করিতেই সময় যাইত। কাজেই চেষ্টা শীঘ্র সার্থক হইল না। বোধ হয় ইহারি বৎসর-খানেক পরে, "সূর্য্য" সম্বন্ধে একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ কোন-গতিকে রচনা করিয়া ভারতীতে পাঠাইয়া দিলাম, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হইল না। ইহাতে দমিলাম না,—পুরানো ইংলিশম্যান্ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান ঘাঁটিয়া "কৃত্রিম রেশম" সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ খাড়া করিলাম। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত লইয়া তখন খুব আন্দোলন চলিতেছিল। প্রবন্ধটি ভারতীতে প্রকাশিত হইল,—দেখিলাম সম্পাদিকা-মহাশয়া অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া লেখাটি ছাপাইয়াছেন। ইহাই আমার প্রথম রচনা। তার পরে "অঙ্গারক শর্করা," "অঘোরপন্থী," ও "ফোনোগ্রাফ" প্রভৃতি অনেক লেখা একে-একে ভারতীতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। গল্প স্বেচ্ছায় লিখি নাই, "বিপ্রলব্ধ" নামক একটা গল্পও ভারতীতে বাহির হইয়া গেল।

ইহাই ভারতী-সম্পর্কে আমার সাহিত্য-চর্চ্চার সূচনা। এই সময়ে পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী এবং শ্রীমতী সরলা দেবী আমাকে সদুপদেশ দিয়া যে-সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কথা জীবনে ভুলিব না,—ভারতীর আশ্রয়ে সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ না করিলে, সূচনাতেই আমাকে এই পথ ত্যাগ করিতে হইত। মাতা যেমন শিশু পুত্রের অক্ষর-পরিচয়ের সাহায্য করেন, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ঠিক সেইপ্রকারেই আমাকে লেখার সাহায্য করিয়াছেন। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু-মহাশয়ের আবিষ্কার সম্বন্ধে আমি একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছি। ইহার মূলেও ভারতীর সম্পাদিকাদিগের সদুপদেশ বর্ত্তমান। বসু-মহাশয় যখন কলিকাতায় বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছিলেন, তখন বোধ হয় আমি কৃষ্ণনগর কলেজে বি, এ, পড়ি। তাঁহার বৈদ্যুতিক গবেষণার কথা আমরা জানিতাম না। শ্রীমতী সরলা দেবীই বসুমহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার আবিষ্কারের মুদ্রিত বিবরণী সংগ্রহ করিয়া আমার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং সেই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম এবং সেগুলি ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই আমি বসু-মহাশয়ের আবিষ্কারগুলির সহিত পরিচিত হইয়া আসিতেছি।

সাহিত্যিকদিগের মধ্যে একা আমাকেই যে "ভারতী" পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে তাহা নয়। আজকালকার অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক ভারতীর নিকটে ঋণী। শুনিয়াছি পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁহার পুত্রকন্যাদের বলিয়া থাকেন,—"কেবল তোরাই আমার পুত্রকন্যা নয়, আমার পুত্রকন্যা সাহিত্যিকের মধ্যেও অনেক আছে।" তাঁহার সাহিত্যিক সন্তানবর্গের মধ্যে আমিও স্নেহলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

নূরজহান

[সমালোচনা]

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সহৃদয়তাপূর্ণ বদান্যতাগুণে পুরাতন বর্দ্ধমানের এক নিভৃত পল্লীনিহিত একটি জরাজীর্ণ মুসলমান-সমাধির সংস্কার সাধিত হইয়াছে। একটি সুবৃহৎ সরোবর-তীরে এই পুরাতন সমাধি অবস্থিত, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে পুরাকালে যে সকল অট্টালিকাদি বর্ত্তমান ছিল, তাহার যৎসামান্য চিহ্নমাত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সমাধিটির সঙ্গে যে সকল জনশ্রুতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহা বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। তাহা ধীরে ধীরে বঙ্গসাহিত্যে সমাদর লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বহুদিন পূর্ব্বে পাবনা-জেলার তাঁতিবন্দনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত শ্রীগোবিন্দ চৌধুরী-মহাশয় তাহাকে কাব্যাকারে গ্রথিত করিয়াছিলেন। তখন আমাদের দেশে ইতিহাসের আদর প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই বলিয়া সে কাব্যের কথা অনেকেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি বঙ্গরঙ্গমঞ্চে সে অতীত ঘটনাবলী অভিনীত হইতেছে, এবং একাধিক লেখক গল্প-প্রবন্ধেও তাহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহা এখন নূরজহানের কাহিনী নামে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যের হিসাবে সে কাহিনী যেমন চিত্তাকর্ষক, ইতিহাসের হিসাবেও তাহা সেইরূপ শিক্ষাপ্রদ।

'বাঙ্গলার বেগম'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের হিসাবে সেই



শের আফ্‌কনের সমাধি

অতীত কাহিনী অবলম্বন করিয়া, একখানি সচিত্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থের নাম—নূরজহান।* ঐতিহাসিক নিখিলনাথ তাহার 'ভূমিকা' লিখিয়া দিয়াছেন;—বর্ষীয়ান জলধর ও স্বনামখ্যাত অধ্যাপক যদুনাথ এই নবীন গ্রন্থকারকে "রচনাকালে নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন" অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ "গ্রন্থাদি সাহায্য করিয়া উৎসাহান্বিত করিয়াছেন।" এরূপ গ্রন্থ যে উৎসাহ লাভের যোগ্য,তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

নূরজহানের ইতিহাস বহু বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ। তাহাকে জীবনচরিত না বলিয়া, ইতিহাস বলাই সঙ্গত। কারণ ভারতবর্ষের বিচিত্র ইতিহাসের একটি বিস্ময়পূর্ণ অধ্যায় কেবল নূরজহানের জীবন-কাহিনীতেই পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাহার সহিত একসময়ে বাঙ্গালাদেশের যাহা-কিছু সম্পর্ক ছিল, তাহার নীরব সাক্ষীরূপে বর্দ্ধমানের মুসলমান-সমাধি অদ্যাপি বর্ত্তমান। গ্রন্থকার কোন্ কোন্ পুরাতন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া রচনা-কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, গ্রন্থ-শেষে একটি "প্রমাণ-পঞ্জী" সংগ্রহ করিয়া, তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থ ক্ষুদ্র হইলেও, 'প্রমাণ-পঞ্জী' ক্ষুদ্র নহে। যাঁহারা অধিক কথা জানিতে চাহিবেন, তাঁহারা "প্রমাণ-পঞ্জীতে" উল্লিখিত বিবিধ গ্রন্থে তাহার সন্ধানলাভ করিতে পারিবেন।

মোগল বাদশাহ পুণ্যশ্লোক অকবর শাহ শাসন-নীতি গুণের সমাদর করিতে জানিতেন; —ন্যায়বিচারের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিতেন। ইতিহাসে ইহার অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নূরজহানের কাহিনীতেও ইহার উদাহরণ দেদীপ্যমান।

পারস্যদেশের খোরাশান প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা গিয়াসুদ্দীন ভাগ্যবিপর্য্যয়ে দেশত্যাগ করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদি সমভিব্যাহারে ভাগ্যান্বেষনার্থ ভারতবর্ষাভিমুখে আসিবার সময়ে কান্দাহারের নিকটবর্ত্তী কান্তার মধ্যে কপর্দ্দকহীন গিয়াসের গর্ভভার-মন্থরা প্রিয়তমার গর্ভে নূরজহানের জন্ম হয়। বালিকার পিতা ও ভ্রাতা বাদশাহ অকবর শাহের কৃপায় উচ্চপদ লাভ করিয়া, মোগল রাজধানীতে বাস করিবার সময়ে, তাঁহাদের স্নেহের পুত্তলী মেহেরুন্নিসার অপরূপ রূপ-লাবণ্যে শাহজাদা সেলিম আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। ন্যায়পরায়ণ অকবর শাহ ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার আশায়, যুবক যুবতীকে পৃথক করিবার অভিপ্রায়ে, মেহেরুন্নিসাকে শের অফ্‌কন্ নামক এক বীরপুরুষের সহিত বিবাহ দিয়া, নবদম্পতীকে বর্দ্ধমানের "জাগির" দান করিয়াছিলেন। এইখানে মেহেরুন্নিসা সংসার পাতিয়া জীবন যাপন করিতেছিলেন।

"সলিমের হৃদয়ে বরবর্ণিনী মেহেরের চিত্র প্রস্তরাঙ্কিত মূর্ত্তির ন্যায় সর্ব্বদা দৃঢ়াঙ্কিত ছিল; —দূরত্ব বা কালের ব্যবধান তাহাকে ম্লান করিতে পারে নাই।" অকবর শাহের পরলোকগমনের পর শাহজাদা সেলিম জহাঙ্গীর নাম-ধারণে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, মেহেরুন্নিসাকে হস্তগত করিবার

* নূরজাহান্—মানসী প্রেসে মুদ্রিত ও মিত্র-কোম্পানী (কর্ণওয়ালিশ বিল্‌ডিংস, কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸০ আনা।

উপায় অন্বেষণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শের অফ্‌কন্ নিহত হইলেন, মেহের মোগল রাজ-প্রাসাদে আনীতা হইলেন,—

"এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোক যাহা করিতে পারে, যাহা করিয়া থাকে, তিনি তাহাই করিলেন;—তিনি সম্রাটের নিকট স্বামি-হত্যার বিচার প্রার্থনা করিলেন।" বিচার হইল না;—চারি বৎসর পরে,—সম্রাটের সহিত মেহেরের বিবাহ হইয়া গেল;—তখন হইতে তিনি "নূরজহান্"-নামে ভারতের অধীশ্বরী হইলেন।

এই সময় হইতে নূরজহানের কথা বলিতে হইলে, জহাঙ্গীরের রাজত্বের কথা বলিতে হয়। সে রাজত্বের সমুদয় রাজকার্য্যের ভার ক্রমে ক্রমে নূরজহানের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছিল। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"ইহা কি রূপের মোহ, না গুণের প্রতি সম্মান? ঐতিহাসিক এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ।"

রূপের মোহ থাকিলেই গুণের প্রতি সম্মান নষ্ট হইতে পারে না—এক্ষেত্রে দুইটি চিত্ত-বৃত্তিই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। নূরজহান্‌ও তাঁহার কার্য্যকলাপে তাঁহাকে প্রতিভাশালিনী শাসনকর্ত্রীরূপে প্রকাশিত করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার অতি সংক্ষেপে তাঁহার কার্য্যকলাপের পরিচয় প্রদান করিয়া গ্রন্থশেষ করিয়াছেন। অল্প পরিসরের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশ করা কঠিন হইলেও, লেখক সেই কঠিন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া, রচনা-ক্ষমতার যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসা লাভের যোগ্য। অলমতি বিস্তরেণ

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

দুই সন্ধ্যা

ললিত সকালবেলা স্ত্রীর মৃতদেহ দাহ করিয়া আসিয়া দোকান খুলিয়া বসিল।

মনোহারীর দোকান। আজ চার দিন দোকান খোলা হয় নাই;—স্ত্রীর রোগশয্যার পাশে বসিয়া সময় গিয়াছে,—দোকান কি করিয়া খোলে?

দোকানের এক অংশে ঝাঁপ লাগাইয়া তারা স্বামী-স্ত্রীতে বাস করিত—পাশে একটু জায়গা ছিল সেইখানে তোলা উনুনে রান্না-বান্না হইত।

এই দোকানটি ললিতের শ্বশুরের ছিল। আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ললিত কলিকাতা সহরে নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে যখন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, গ্রামের হরি-কাকার সঙ্গে চাকরির চেষ্টায় আসিয়া চারিদিক আঁধার দেখিতেছিল,—কোথায় একটু মাথা-গুঁজিয়া থাকে, কেই-বা দুমুঠা খাইতে দেয়, সেই সময় এই দোকানের মালিক নিতাই তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিল।

নিতাই বৃদ্ধ,—ভক্ত বৈষ্ণবের মত তার চাল-চলন। সে তার মেয়েটিকে লইয়া এই দোকানে বাস করিত। বুড়া মানুষ;

একা দোকান চালাইতে পারে না, সে মনে মনে একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজিতেছিল। ললিতকে দেখিয়া তার মনে হইল ছেলেটি চালাক, এবং অমন সুন্দর চেহারা, মিষ্টি চাহনি যার সে কখনো নেমকহারামি করিতে পারে না। তার উপর সে যখন শুনিল ললিত বৈষ্ণবের ছেলে তখন সে একেবারে গলিয়া গেল।

পাঁচ টাকা মাহিনায় ললিতের চাকরি হইল। ঐ অল্প উপার্জ্জনে তো বাসা ভাড়া করিয়া কলিকাতায় থাকা চলে না, কাজেই নিতাই তাকে দোকান-ঘরেই রাখিবার বন্দোবস্ত করিল। রাত্রে সে সেইখানেই শুইয়া থাকিত। এবং হাঁড়িতে চাল দিবার সময় বেশী এক কুন্‌কের বরাদ্দ হইল।

নিতাই-বৈষ্ণবের মনে মনে বড় সাধ ছিল শ্রীবৃন্দাবনের ধূলায় পড়িয়া সে একবার গড়াগড়ি দেয় এবং যদি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা হয় ত ঐ ধূলার মধ্যেই মরিয়া জীবন এবং মরণ উভয়কেই সার্থক করিয়া তোলে। কিন্তু পথের কাঁটা ছিল কন্যা রাধামতী। তাকে কোথায় রাখিয়া যায়? সঙ্গে লইলে তো সেই মায়ার বন্ধনেই জড়াইয়া থাকিবে!

ললিত যখন এক-বৎসর তার দোকানে কাটাইল তখন সে তার ঘরের ছেলের মতো হইয়া গেছে। ললিতকে নিতাইয়ের গোড়া-থেকেই ভালো লাগিয়াছিল এবং সে ভালো-লাগাটা দিন দিন বাড়িয়াছিল বই কমে নাই। প্রথম প্রথম সে ললিতের দিকে খুব খর দৃষ্টি রাখিয়াছিল কিন্তু কিছু দিন যাইতেই তার মনে হইল এতটা দৃষ্টি রাখিবার দরকার নাই—তার চেয়ে সেই দৃষ্টিটা যদি শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে সমর্পণ করা যায় ত দৃষ্টিরও মাহাত্ম্য বাড়ে এবং এই চর্ম্ম-চক্ষের দৃষ্টি লইয়া অন্ধের মতো অন্ধকারে—সংসারের ঘানি-গাছে আর ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না।

শ্রীবৃন্দাবনের দিকে মন যখন ছুটিয়াছে তখন তার পথও সেই বৃন্দাবনবিহারী তৈরী করিয়াছেন। এই ত তাঁর লীলা! ভক্তের জন্য তিনি ত কোল-পাতিয়া বসিয়াই আছেন। নিতাই হঠাৎ একদিন এই সত্যটা লাভ করিল। ললিতকে কে তার কাছে পাঠাইল? কেনই বা সে আসিল? চাকরির চেষ্টায় সে এখানে না আসিয়া অন্যত্র ত যাইতে পারিত—কলিকাতায় ত দোকানের অভাব নাই। এই রহস্যের মধ্যে নিতাই শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানের ইঙ্গিত দেখিতে পাইল—যে আহ্বানে যমুনা উজানে বহিয়া যায়, যে আহ্বানে গোপিকারা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে।

নিতাই বুঝিল বাঁশির ডাক তার কানে আসিয়া লাগিয়াছে, মন তার উতলা হইয়া উঠিল, সে বৃন্দাবনে ছুটিয়া যাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। পথের যে বাধা ছিল এখন ত তার উপায় হইয়াছে, আর ভাবনা কিসের! সে আর ভাবনা-চিন্তা করিল না; চিন্তামণি যখন চিন্তা করিয়া সব ঠিক করিয়া দিয়াছেন তখন তার আর ভাবনা কিসের? সে স্থির করিয়া ফেলিল ললিতের হাতেই কন্যাটিকে সমর্পণ করিয়া সে বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবে।

ললিত প্রস্তাবটা শুনিয়া প্রথমে চমকাইয়া উঠিয়াছিল; এমন ঘটনা তার কল্পনাতেও

কখনো আসে নাই। সে ভয়ে-ভয়ে ছিল বুড়াটা মরিয়া গেলে তার অবস্থা কি হইবে! এই ভাবনায় অনেক রাত্রে তার ভালো করিয়া ঘুমই হইত না। কলিকাতা সহরকে তার মহাসমুদ্র মনে হইত। দুই দিন মাত্র চাকরির ধান্দায় ঘুরিয়া সে যেন এর কূল-কিনারা দেখিতে পায় নাই;—অগাধ জলের মধ্যে মানুষ যেমন স্থির হইয়া দাঁড়াইবার অবলম্বন পায় না, কলিকাতার মধ্যে ঘুরিয়া তার ঠিক তেমনি অবস্থা হইয়াছিল—এক-একটা প্রকাণ্ড ঢেউয়ের মতো ভয়ের ধাক্কা, দুশ্চিন্তার ধাক্কা কেবলই ঘাড়ের উপর পড়িয়া নাকানি-চোবানি খাওয়াইয়াছিল। বুড়া মরিয়া গেলে পাছে আবার সেইরূপ হয় মনে মনে অত্যন্ত আতঙ্ক ছিল।

এই মনোহর দ্রব্যসম্ভারে সাজানো মনোহারী দোকানখানি ছিল বিবাহের যৌতুক। এ প্রলোভন এড়ানো ললিতের পক্ষে শক্ত ছিল। এই মনোহারী দোকানখানি চোখের সাম্‌নে একটি নিশ্চিন্ত জীবনের সুখস্বপ্ন সৃজন করিয়া ললিতকে তন্ময় করিয়া দিল। বুড়ার কথায় সে এতটুকু আপত্তির আভাস পর্য্যন্ত তুলিতে পারিল না।

যথানিয়মে বিবাহ হইয়া গেল।

নিতাই যেদিন বৃন্দাবন যাত্রা করিল ললিত ও রাধামতী তাহাকে ষ্টেশনে তুলিয়া দিয়া আসিল। রাধামতীর চোখের জল আর থামেনা,—ললিত হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে গাড়ি ছাড়িয়া দিলে সে রাধামতীর হাত ধরিয়া তাকে ফিরাইয়া আনিল।

ললিত যেখানে ভৃত্য ছিল সেখানে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিল। ছেলেবেলায় সে এইরূপ একটা গল্প শুনিয়াছিল—এবং মনে মনে সেই গল্পের নায়কের প্রতি তার হিংসা হইয়াছিল। আজ সেই নায়কের সহিত তার নিজের অবস্থার সাদৃশ্য দেখিয়া সে ভারি আনন্দ ও আমোদ বোধ করিতে লাগিল। রাধামতী প্রথম-প্রথম কয়েকদিন বাপের শোকে মন-মরা হইয়া ছিল; তার সে ভাব ক্রমে ক্রমে দূর হইতে লাগিল। সে চিরজন্মের পরিচিত সে মনের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, তার পরিবর্ত্তে এক নবপরিচিত আসিয়া সামনেটা দখল করিয়া বসিল।

দোকানের আয় মন্দ ছিলনা—দুটি প্রাণীর পক্ষে যথেষ্ট।

ললিত সাম্‌নে বসিয়া দোকানের বেচা-কেনা করিত, রাধামতী ঝাঁপের আড়ালে গৃহ-কর্ম্ম করিত। কিছুকাল পূর্ব্বে আর একটি দম্পতি ঠিক এমনি করিয়া এইখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল,—তাহারা আজ কোথায়? তখন রাধাই বা কোথায় ছিল, ললিতই বা কোথায় ছিল!

এই দম্পতির জীবন একটানা স্রোতের মতন—দিনের পর দিন সমানভাবে কাটিয়া যায়। প্রভাতের আলো প্রতিদিন সেই অন্ধকার ঘরখানির কাছে একবার একটু হাসিমুখে আসিয়া দাঁড়ায় এবং সন্ধ্যার সময় এই নবদম্পতিকে আড়াল করিয়া একটি কালো পর্দা টানিয়া চলিয়া যায়। এদের সেই জীবনস্রোতে বিশেষ কোনো চঞ্চলতা ছিলনা—কেবল মধ্যে একদিন বৃদ্ধ নিতাইয়ের মৃত্যুসংবাদ আসিয়া দুজনকেই একবার নাড়া দিয়া গিয়াছিল।

তারপর এই তিনবৎসর পরে ললিত বড়-রকমের ধাক্কা খাইল স্ত্রীর পীড়ায়! ইতিমধ্যে একটু-আধটু গোলমাল গিয়াছে বটে,—দোকানে ধার পড়িয়া দুর্ভাবনা উঁকি মারিয়াছে, কিছু কিছু লোকসান হইয়া মন খারাপ হইয়াছে কিন্তু ভবিষ্যতের আশা সে আঘাতগুলিকে তেমন-করিয়া গায়ে বিঁধিতে দেয় নাই। কিন্তু এইবার একাদিক্রমে তিন মাস স্ত্রীর পীড়ায় সে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। হাতে যা-কিছু সঞ্চয় ছিল একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেছে—এমন কি মহাজনের কাছে দেনা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। এত করিয়াও স্ত্রীর যদি একটু সুরাহা হইত ত সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিত কিন্তু তারও কোনো আশা দেখা যায় না।

এদিকে মহাজন তাগাদা দিতেছে, ঘর-ভাড়া প্রায় চার মাসের বাকি পড়িয়াছে—বাড়িওলার দরোয়ান রোজ আসিয়া যাচ্ছে-তাই করিয়া যায়, দোকানের যে-সব জিনিষ ফুরাইয়াছে তাহা আর পূর্ণ করা হইতেছে না,—অর্থ নাই, স্ত্রীকে একলা ফেলিয়া যাইবারও যো নাই—কাজেই দোকানের বিক্রি কমিয়াছে। ললিতের অবস্থা একেবারে নাজেহাল। চতুর্দ্দিক হইতে সে বিব্রত। পাঁচবৎসর পূর্ব্বে যে নিরাশ্রয়তার তুফানে পড়িয়া সে দিশেহারা হইয়াছিল—এবং এই দোকানঘরটিতে কূল পাইয়া হাঁফ-ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, তার মনে হইতে লাগিল, এই ছোট্ট ঘর-খানির ভিতরকার তুফান তার চেয়ে বড় কম নয়—বরং এ আরো ভয়ানক! * * *

গতরাত্রে তার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। তখন এমন অবস্থা যে সৎকার করিবার মতো অর্থটুকুও ঘরে নাই। মৃত স্ত্রীর হাত হইতে রূপার চুড়ি কয়গাছি খুলিয়া সে-অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

এই চার দিন তার কোথা-দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়াছে সে মনে করিতে পারে না। আজ স্ত্রীর দাহকার্য্য শেষ করিয়া সে যখন দোকান খুলিয়া বসিল তখনও শোকের ধাক্কা সে ভালো করিয়া বুঝিতে পারে নাই। বরং ভিতরে ভিতরে সে একটা নিশ্চিন্ততা বোধ করিতেছিল।

চার দিন দোকান খোলা হয় নাই। জিনিষপত্রে ধূলা জমিয়াছে! সে অন্যমনস্কে সেই ধূলা ছাড়িতে লাগিল। বেলা তখন প্রায় বারোটা—এই সময় প্রতিদিন সে খাইতে যাইত;—রাধামতী ঝাঁপের পিছন হইতে টোকা-মারিয়া জানাইয়া দিত খাবার তৈরি। জিনিষ ঝাড়িতে ঝাড়িতে হঠাৎ ঝাঁপের গায়ে একটা শব্দে সে অন্যমনস্কে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর তার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। একটা টিক-টিকি ঝাঁপের উপর দিয়া দৌড়িয়া গেল।

সে ফিরিয়া তামাক সাজিতে বসিল। তামাক-সাজা শেষ হইলে মনে হইল—যাই ভিতর হইতে একটু আগুন লইয়া আসি; ঝাঁপের কাছ-বরাবর গিয়া সে ফিরিয়া আসিল। এমন সময় এক খরিদ্দার হাজির। খরিদ্দার দেখিয়া ললিতের মনটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি খরিদ্দারের চাওয়া জিনিষটি তুলিয়া ধরিল। দাম ঠিক করিয়া সে একটা টাকা



বাহির করিল। টাকার পয়সা চাই, ললিত হাতবাক্সটা টানিয়া আনিল। কিন্তু চাবি কোথায়? ওঃ চাবিটা ত আনা হয় নাই; রাধার কাছে আছে বটে! সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া চাবি আনিতে গেল—ঝাঁপের কাছে গিয়া যেন একটা ধাক্কা খাইল। ফিরিয়া আসিয়া শুষ্কমুখে বলিল—"টাকার পয়সা তো নেই, আপনার কাছে কি খুচরা হবে না?" খরিদ্দার বলিল—"না!" ললিত তার মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। খরিদ্দার খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিল, তারপর জিনিষটি রাখিয়া চলিয়া গেল। ললিত অনেকক্ষণ শূন্য-দৃষ্টিতে তার চলিয়া-যাওয়ার দিকে চাহিয়া রহিল। আজ চারদিন পরে একটিমাত্র খরিদ্দার—তাও ফিরিয়া গেল।

সে হিসাবের খাতাখানা টানিয়া বাহির করিয়া দেখিতে বসিল। হঠাৎ একবার মনে হইল ভয়ানক তৃষ্ণা পাইয়াছে—কিন্তু দোকানঘরের মধ্যে জলের কলসী খুঁজিয়া পাইল না। ওঃ সেটা যে—।

দেয়ালে ঠেসান্ দিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে ললিতের তন্দ্রা আসিতেছিল। বোধ হয় সে একটু ঘুমাইয়াও পড়িয়াছিল। হঠাৎ একটা গোলমালে সে চমকিয়া উঠিল। দোকানের সামনে রাস্তার উপর কয়েকটা লোক হল্লা করিতেছে—বাড়িওলার দরোয়ান-টাও সেখানে আছে। দরোয়ানকে দেখিয়া তার বুকটা একবার ধড়াস্ করিয়া উঠিল। সে উঠিতে পারিল না, অবসন্নভাবে বসিয়া রহিল। লোকগুলা একেবারে তার দোকানের উপর উঠিয়া আসিল। দরোয়ানটা একবার চীৎকার করিয়া উঠিল—"ঐ সেই শালা!" তারা দোকানের জিনিষপত্র ঘাঁটিয়া, নামাইয়া ওলট-পালট করিয়া একাকার করিতে লাগিল। লোকে যেমন নাটক-অভিনয় দেখে ললিত তেমনি করিয়া বসিয়া সব দেখিতে লাগিল। সে যেন কেমন-তর হইয়া গিয়াছিল; তার কে কিছু বলিবার আছে, করিবার আছে এমন কোনো উত্তেজনা তার মনের মধ্যে উঠিতেছিল না। তবে তারা যখন ঝাঁপ ঠেলিয়া অন্দরে প্রবেশ করিতে যায় তখন সে একবার চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল বটে কিন্তু পরক্ষণেই আবার ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

দোকানের চারিদিকে একটা গোলমাল চলিতেছিল,—ললিতের কানে আসিয়া লাগিতেছিল কিন্তু মনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল না। এমনি করিতে করিতে শীতের অকাল-সন্ধ্যা আসিয়া দেখা দিল। একজন জমাদার আসিয়া ললিতকে বলিল—"এখান থেকে বেরো!" ললিত তার দিকে হতভম্বের মত চাহিয়া বলিল—"অ্যাঁ!" সে ধমক দিয়া বলিল—"এখান থেকে বেরো!" ললিত আমতা-আমতা করিয়া বলিল—"কোথা যাবো?" একজন পিছন হইতে চীৎকার করিল—"যমের বাড়ি!" তারপর ললিতকে হাত ধরিয়া দোকান-ঘর হইতে বাহির করিতে লাগিল। ললিত বলিল—"আমার জিনিষপত্র?" জমাদার বলিল—"ওসব ক্রোক হয়েছে, নিলাম হবে!" ললিত তেমনি কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—"নিলেম হবে কেন?" একজন বলিল—"ন্যাকা! ঘরের ভাড়া দিসনি -জানিসনে!" ললিতের যেন ভোলা-

কথা মনে পড়িয়া গেল, সে শুধু বলিল—"ও!" সে ধীরে ধীরে দোকান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তখন শীতের সন্ধ্যা আকাশে কুয়াসার জাল ছড়াইয়া দিয়াছে। রাস্তায় নামিয়া ললিতের মনে হইতে লাগিল যে এমনি এক সন্ধ্যায় এই ঘরটিতে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

চিত্র-পরিচয়

"আর্ম্মাডা" ধ্বংসের পরে রাজ্ঞী এলিজাবেথের শোভাযাত্রা

রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ড ও স্পেনে বহুবর্ষব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। স্পেন নানারূপে ইংলণ্ডকে পরাভূত ও রাজ্ঞী এলিজাবেথকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিল। অবশেষে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে স্পেন এক সুবৃহৎ রণতরী-বাহিনী গঠিত করিয়া ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। "অপরাজেয়" বা "আর্ম্মাডা" (Armada) নামে এই বাহিনী অভিহিতা হয়। জুলাই মাসের ১৯শে তারিখে আর্ম্মাডা ইংলিশ চ্যানেলে উপনীত হয়। প্রায় এক সপ্তাহের যুদ্ধের পরে ক্ষুদ্র ইংরাজ-বাহিনী এই দুর্জ্জয় আর্ম্মাডা-পরাজয়ে সক্ষম হয়। এই অপ্রত্যাশিত জয়লাভে রাজ্ঞী ও ইংরাজজাতি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে এই জলযুদ্ধে পরাজিত হইলে ইংলণ্ডের স্বাধীনতা হারাইবার বিশেষ ভয় ছিল। যুদ্ধজয়ান্তে রাজ্ঞী এলিজাবেথ পারিষদ-বেষ্টিত হইয়া গির্জ্জায় গমন করিতেছেন, ইহাই চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সমালোচনা

কয়েকটি কবিতা। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল দাসবর্ম্মা, বি, এ প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। কয়েকটি খণ্ড কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেকগুলি কবিতার মধ্যে সত্যকার কবিত্ব আছে। ভাব বিচিত্র, সুন্দর; ভাষা সহজ, স্বচ্ছ; ছন্দেও লীলা-মাধুর্য্য আছে। এই লেখকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়।

আশাচন্দ্র শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা কর্ত্তৃক মাতৃনিকেতন হইতে প্রকাশিত। ঢাকা, ইষ্ট বেঙ্গল প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসে মুদ্রিত। গ্রন্থের কোন নির্দ্দিষ্ট মূল্য নাই—আয় "শ্রীকেশব মাতৃভাণ্ডারের অনাথ বালক বালিকা, অসহায় বিধবা ও সাধু-সেবার্থ উৎসর্গীকৃত।" এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ৺কেশবচন্দ্র সেন-মহাশয়ের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ভাষার কোন আড়ম্বর নাই, পাণ্ডিত্য-সমাবেশের প্রয়াস নাই অথচ তথ্যে পরিপূর্ণ। গ্রন্থখানি সুপাঠ্য।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত

N. C. Maitra Family Library
Narayan Chandra Maitra
Barnagore P.O.
Calcutta
10-7-16.



ভারতী

৪০শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩২৩ [৩য় সংখ্যা

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বঙ্গসাহিত্যের পুনরুদ্দীপনা হয়। এই সময়ে বিদ্যাসাগর-মহাশয় জীবিত—ভূদেব, মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, চন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র কলম ধরিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তখন স্ফুটনোন্মুখ। বঙ্গকুলকামিনীগণও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রধানা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী। এই সকল লেখকদিগের মধ্যে দুই-চারিজন বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় সমবেত হইলে তাঁহাদের মধ্যে কিরূপ কথোপকথন হইত, কেহ যদি তাহা বিবৃত করিতে পারিত, তাহা হইলে উহা যে বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে সাদরে পঠিত হইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কথোপকথনে দেশী ও বিদেশী কাব্য ও নানাশাস্ত্রের আলোচনা এবং নূতন পুস্তকাদির সমালোচনাও হইত। ভাটপাড়ার মহামহোপাধ্যায়গণ উপস্থিত থাকিলে চুটকি-বিচারও চলিত। আবার এই কথোপকথনের মধ্যে শান্তিপুরের একটা ভূত কিরূপ সমারোহে তাহার বাপের শ্রাদ্ধ করিয়াছিল, সে গল্পও থাকিত; দীনবন্ধুর গল্প এবং নানাপ্রকার রহস্যের কথাও থাকিত। আমি কখনও এই কথোপকথন-বিষয়ে কিছু লিখিবার চেষ্টা করি নাই। যদি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী লিখিতে বসিতাম, তাহা হইলে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু সে সময় আমার অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন বঙ্কিম-প্রসঙ্গ দুই-চারিটা প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা কেবল তাঁহার জীবনের ঘটনা অবলম্বনে মাত্র।

কথিত আছে যে প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদিগের জীবনী লিখিত হয়, প্রধানতঃ লোকশিক্ষার জন্য। হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আমি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের দুই একটা ঘটনা যাহা লিখিয়াছি, তাহা কোন

উদ্দেশ্য লইয়া লিখি নাই। এ বয়সে সে সব কথার আলোচনায় নিজে তৃপ্তি পাই, তাই লিখি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয়, বন্ধু ও পাঠকগণের সে সকল প্রসঙ্গ ভাল লাগিতে পারে, এইজন্য লিখি।

বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ্যক্রমে বাল্যকাল হইতে বিদ্যোৎসাহী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহবাসেই থাকিতেন। পিতৃদেব তাঁহার অসামান্য প্রতিভা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্ ও সতর্ক ছিলেন। শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে শিক্ষা পান। পিতৃদেব তখন ঐ স্থানে ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে বাঙ্গালা বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে একটি হাই স্কুল ছিল। টিড্ নামে একজন বিলাতী সাহেব উহার হেডমাষ্টার ছিলেন। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সহিত বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ঐ স্কুলে যাইতেন। একদিন ঐ সাহেব ক্লাশ-পরিদর্শনে আসিয়া তাঁহার পরিচয় লইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র অনুজের কথা বলিবার সময় তাঁহার যে এক বেলার মধ্যে বর্ণপরিচয় হইয়াছিল, সে কথার উল্লেখ করেন। টিড্ সাহেব শুনিয়া প্রীত হইলেন এবং পরে তাঁহার অনুরোধেই অতি শৈশবে ইংরাজি শিক্ষার জন্য পিতৃদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। বৎসরান্তে পরীক্ষার ফলে সাহেব তাঁহাকে ডবল প্রোমোশন দিতে চাহিলেন, কিন্তু পিতৃদেবের আপত্তিতে তাহা ঘটিল না। বঙ্কিমচন্দ্রকে বৈকালে টিড্ সাহেবের বিবি লোক পাঠাইয়া লইয়া যাইতেন। আমাদের বাসার সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র মাঠে স্কুল ছিল। ঐ স্কুল-বাটীতেই তাঁহাদের বাসা ছিল। এখন সেখানে স্কুল নাই, সে মাঠে সরকারী বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিদিন বৈকালে ঐ স্থানে যাইতেন। এই সময়ে মলেট সাহেব নামে একজন হালুবরি সিভিলিয়ান মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। টিড্ সাহেবের বিবির সহিত তাঁহার বিবির বিশেষ প্রণয় ছিল। টিড্ সাহেবের বিবি তাঁহার ছেলেদের ও বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া প্রতিদিন বৈকালে ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে যাইতেন। মলেট সাহেবের বাটী আমাদের বাসার উত্তরে, মধ্যে কেবল একটা মাত্র উচ্চ প্রাচীরের ব্যবধান। শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র বসিয়া বিবিদের সহিত গল্প করিতেন, ও তাঁহাদের ছেলেরা মাঠে দৌড়াদৌড়ি করিত। বঙ্কিমচন্দ্র দৌড়াদৌড়ি করিতে পারিতেন না, সেজন্য কখনও বলিষ্ঠও ছিলেন না।

এইরূপ প্রায় তিনবৎসর কাল বৈকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের বাটীতে যাতায়াত করিতেন। হঠাৎ একটা ঘটনায় যাতায়াত বন্ধ হইল। একদিন সন্ধ্যার সময় মলেট সাহেবের কুঠির মাঠে টেবিল-চেয়ার পড়িল, বিবিরা চা প্রস্তুত করিতে উঠিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে কুঠির ভিতর হইতে একজন অপরিচিত সাহেব আসিয়া ছেলেদের ডাকিয়া লইয়া চা খাইতে গেলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকেন নাই। বালক বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলেন; পরে আর ঐ কুঠিতে যান নাই—টিড সাহেবের কুঠিতে গিয়াছিলেন বটে। ইহার দিনকয়েক পরেই পিতৃদেব কলিকাতার আলিপুরে বদলি হইলেন। এই

সময় মলেট সাহেবের সহিত পিতৃদেবের দেখা হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কুঠিতে যাতায়াত বন্ধ করিয়াছেন বলিয়া সাহেব আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

এইরূপে তিনবৎসর বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বিলাতী পরিবারের সংস্রবে আসায় তাহার কোন ফল ফলিয়াছিল কি না, তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই।

মেদিনীপুর ত্যাগ করিবার প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বের কথা আমার মনে পড়ে। মেদিনীপুর হইতে আসিয়া আমরা কাঁঠাল পাড়ায় বাস করিতে লাগিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজের নূতন Session খুলিলে, তথায় ভর্ত্তি হইবেন, স্থির হইল। তাঁহার জন্য গৃহে একজন প্রাইভেট্ টিউটর নিযুক্ত হইল।

কাঁঠালপাড়ায় আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গালা কবিতা শিখিলেন। আমাদের জ্যেষ্ঠাগ্রজের বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর বিস্তর ভদ্রলোক আসিতেন। তন্মধ্যে একজন সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। যেটি ভাল লাগিত, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন এবং ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে শ্লোকের ব্যাখ্যা করাইয়া লইতেন। আর বাঙ্গালা কবিতাগুলি—যাহা সর্ব্বদা আবৃত্তি করিতেন, তাহা কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচিত। তখন তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ হয় নাই বটে, কিন্তু আমাদের বাটীতে "প্রভাকর" ও "সাধুরঞ্জন" পত্রিকা আসিত; উহার মধ্যে যে কবিতাগুলি ভাল লাগিত, বঙ্কিমচন্দ্র সে-সমস্তই কণ্ঠস্থ করিতেন।

একালে যেমন recitationএর একটা হুজুগ উঠিয়াছে, পুরস্কারের জন্য ছাত্রেরা ঘরে ঘরে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করিতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে অনেকগুলি শ্লোক ও কবিতা তেমনি আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার আবৃত্তির সময়াসময় ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র সুলেখক বলিয়া সাধারণে পরিচিত, কিন্তু তিনি যে একজন উৎকৃষ্ট পাঠক ছিলেন, তাহা অনেকে জানেন না। অমিত্রাক্ষর ছন্দের নূতন সৃষ্টি হইলে উহার নামে আমার গায়ে জ্বর আসিত, কিন্তু যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে "মেঘনাদ বধ" কাব্য পাঠ করিতে শুনিলাম, সেইদিন হইতে আমি এই কাব্যের গোঁড়া হইলাম। কতবার উহা পড়িয়াছি, তাহার ঠিক নাই! বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণে পড়িতাম। তিনি যখন পুস্তক পাঠ করিতেন, সকলে নিঃশব্দে শুনিতেন। বাল্যকালে তিনি যখন কবিতা বা শ্লোক আবৃত্তি করিতেন, তখন আশে-পাশে লোক দাঁড়াইয়া শুনিত। একদিন তিনি তাঁহার পড়িবার ঘরে বসিয়া "পদাঙ্কদূতে"র "গোপীভর্ত্তুর্বিরহবিধুরা-কচিৎইন্দুবরাক্ষি" ইত্যাদি শ্লোকটির আবৃত্তি করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঐ ঘরে অনেক গুলি পণ্ডিত প্রবেশ করিলেন। তন্মধ্যে দেশবিখ্যাত পরমপূজ্য পণ্ডিত ৺হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ছিলেন। ইঁহারা পিতৃদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সুন্দর আবৃত্তি শুনিয়া তাঁহারা তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি এই পড়িবার ঘরে থাকিতাম, পড়ি না পড়ি, একখানি পুস্তক হাতে লইয়া বসিয়া থাকিতাম, আর সময়-সময় ঢুলিতাম,

বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় ঢুলিতে ঢুলিতে ঐ স্থানেই ঘুমাইয়া পড়িতাম। তর্কচূড়ামণি মহাশয় একজন প্রতিভাবান্ ও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বোধ হয় ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভিন্ন তাঁহার তুল্য পণ্ডিত বাঙ্গালা দেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে বসাইলেন ও তর্কচূড়ামণি-মহাশয়ের অনুরোধে শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিলেন। ইহার পর হইতে চূড়ামণি মহাশয় মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘরে আসিতেন, ও মহাভারতের অনেক কথা শুনাইতেন। তাঁহারই নিকট "নলোপাখ্যান" ও "শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান" আমি প্রথম শুনি। আমার ধারণা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা চূড়ামণি-মহাশয়ের প্রতিভাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, নতুবা এই অসাধারণ পণ্ডিত বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে শিক্ষা দিবার জন্য এত চেষ্টিত হইবেন কেন? বঙ্কিমচন্দ্রকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য তর্কচূড়ামণি মহাশয় পিতৃদেবের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু বালক দুইটা ভাষা একসঙ্গে শিখিতে পারিবে না, এই উত্তরে নিরস্ত হইয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের একটা কবিতা বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে সর্ব্বদা শুনিতাম, "বিনাইয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়, সাপিনী তাপিনীতাপে বিবরে লুকায়।" যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের ছন্দবন্ধের বড় প্রশংসা করিতেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বের বড় করিতেন না। দুর্গেশনন্দিনীর আসমানির রূপবর্ণনা পাঠ করিলে সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার এই মত চিরস্থায়ী ছিল কি না জানি না, কেন না তাঁহার মতামত চিরদিনই পরিবর্ত্তনশীল ছিল, সেইজন্য তাঁহার গ্রন্থগুলি প্রতি সংস্করণে প্রচুর পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইত। এমন কি তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে "ইন্দিরা" উপন্যাসটি rewrite করিবেন এমন ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

জয়দেবের "ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী" কবিতাটি তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। কি বাল্যে, কি কৈশোরে, কি যৌবনে, এই কবিতাটি তাঁহার মুখে শুনিতাম, যখন নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিতেন, বাহিরের লোক কেহ ঘরে থাকিত না, তখন উহা আওড়াইতেন। ঐ কবিতাটি যে তাঁহার প্রিয় ছিল, তাহার স্মৃতি "আনন্দ-মঠে" রাখিয়া গিয়াছেন, যথা :—

"ধীর সমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী।
মা কুরু ধনুর্দ্ধর গমনবিলম্বন অতিবিধুরা সুকুমারী।"

আর একটি গীত তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। বাল্যকালে আপনি এই গীতটিতে মাতিয়া ছিলেন, পরে আনন্দমঠের সন্তানদিগকেও এই গীতে মাতাইয়াছিলেন। একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে এই গীত তিনি প্রথম শুনিলেন। মাঘমাসের—প্রথমেই এক রাত্রিশেষে এক বৈষ্ণব খঞ্জনি বাজাইয়া সদর রাস্তায় এই গানটি গাহিতেছিল, আমি তখন জাগ্রত —মধুর কণ্ঠে এই রাত্রে কে গীত গাহিতেছে শুনিয়া অগ্রজকে উঠাইলাম; গান শুনা যাইতেছিল না, অগ্রজ একটা জানালা খুলিয়া দিলে গীতটি শুনিতে পাইলাম—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দসৌরে।" বৈষ্ণব এই গীতটি গাহিতে গাহিতে ঠাকুর বাটীর দিকে চলিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র "হরে

মুরারে মধুকৈটভারে" আওড়াইতে আওড়াইতে জানালা বন্ধ করিলেন। পর রাত্রে ঠিক ঐ সময়ে আসিয়া বৈষ্ণব সেই গীতটিই গাহিল! এইরূপ কয়েক রাত্রি ধরিয়াই তিনি গানটি শুনিলেন। ইহার পর অষ্টপ্রহর এই গীতটি তাঁহার মুখে শুনিতাম।

দোলের পূর্ব্বরাত্রে আমাদের ঠাকুর বাড়ীতে বড় ধূম হইত, নেড়াপোড়া হইত, অনেক বাজি পুড়িত, রাত্রে যাত্রা অথবা কীর্ত্তন হইত। এই উপলক্ষ্যে অনেক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইতেন, ইতরলোকের ত কথাই ছিল না! মেদিনীপুর হইতে আসিবার পর প্রথম দোলযাত্রার এই দিন আমার বিশেষ স্মরণ আছে। ফাল্গুনের পূর্ণিমা রাত্রি—মধুযামিনী—বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিনই স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিতে ভালবাসিতেন, আজ রাত্রে তাঁহার ভারি স্ফূর্ত্তি,—কখনও অর্জ্জুনা পুষ্করিণীর ধারে, কখনও গঙ্গাতীরে, কখনও বা এখানে-ওখানে বেড়াইতেছেন—অবশেষে ঠাকুর-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরবাড়ী লোকারণ্য, ভিড় ঠেলিয়া মন্দির-মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। কীর্ত্তন হইবে, চারিদিকে আলো জ্বলিতেছে। একস্থানে অনেকগুলি ভাটপাড়ার পণ্ডিত পৃথগাসনে বসিয়া আছেন। তন্মধ্যে হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিবামাত্র তিনি ডাকিয়া কাছে বসাইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে বসিয়া বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণের অনেক কথা শুনাইতে লাগিলেন। এই উপলক্ষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নটি এই যে, যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য আপনি কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, যে শ্রীকৃষ্ণের নাম ইতর-ভদ্র মেয়ে-পুরুষ সকলেই জপ করিতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ কি ষোলশ' গোপিনীর ভর্ত্তা ছিলেন? তিনি গোপিনীদিগের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন?—বঙ্কিমচন্দ্র ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশ্ন শুনিবামাত্র সমবেত পণ্ডিত ও ভদ্রলোকগণ স্তম্ভিত হইলেন। চূড়ামণি-মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে আদর করিতে করিতে বলিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাকে পরে দিব, এক্ষণে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে না, তবে এইমাত্র জানিয়া রাখ যে শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ-চরিত্র।

এই প্রশ্নে কি প্রাচীন, কি যুবা সকলেই সে রাত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন, কেন না সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত! তাঁহারা জানিতেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া লীলাখেলা করিয়া ছিলেন! ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে সামান্য ঘটনা, সামান্য কথা বহুদিন ধরিয়া আন্দোলিত হইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথা লইয়া কিছুদিন বিস্তর আন্দোলন চলিয়াছিল। সেইজন্যই কথাটা আমার স্মরণ আছে। আক্ষেপের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্রের পরম বন্ধু চূড়ামণি-মহাশয় ইহার অল্পকাল পরেই স্বর্গারোহণ করিলেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কালো ছায়া

(গল্প)

যাহা থাকিলে মানুষকে সুন্দর বলা যায় সুকুমারের তাহার অভাব ছিল না। বেশ লম্বা, রং ফর্সা, চোখদুটি বড়বড়, কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, নাকটি টিকলো। কিন্তু তাহার শরীরের মধ্যে কিসের একটা গুরুতর অভাব ছিল যাহাতে তাহাকে অত্যন্ত কুশ্রী এবং কেমন-এক-রকম দেখাইত; —এ সব থাকিয়াও না থাকার সমান হইয়াছিল।

সুকুমারের এই চেহারা আমার কাছে প্রহেলিকার মতো ঠেকিত। আমি অনেক দিন এই প্রহেলিকা ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু পারি নাই। চোখের সাম্‌নে তাহার দেহের যে দোষ ধরা পড়িত তাহা অতিক্রম করিয়াও এমন-একটা-কি ছিল যাহা তাহার চেহারাকে অমন-ধারা অদ্ভুত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সেটা যে কি তাহা বলা বড় শক্ত।

প্রথমেই আমার চোখে যেটা তার সব-চেয়ে বড় দোষ ধরা পড়িয়াছিল তাহা এই যে, সে অত্যন্ত রোগা। দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের যে ছবি দেখিয়াছি তার পাশে সুকুমারকে অনায়াসে দাঁড় করাইয়া দেওয়া যায়—মোটেই বেমানান হয় না। এই অতি-ক্ষীণতা যে তাহার দেহের সৌন্দর্য্যকে গিলিয়া ধরিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। চোখ-দুটি বড়-বড় বটে—কিন্তু তারই নীচে যে ডোবর তাহাতে ডুবিয়া থাকাতে সে চোখের কোনো মাধুর্য্যই প্রকাশ পাইত না; সে চোখ যদি ভাসিতে পাইত আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তার জোড়া মেলা ভার। নাকটি টিকলো—কিন্তু তার দুপাশের গাল এমন ভাঙিয়া পড়িয়াছে যে মনে হয় একটা সরল রেখা যেন শূন্যে ঝুলিতেছে। মাথার চুল কোঁকড়া—কিন্তু দেহের তুলনায় মাথাটা এমনি বড় যে সে কুঞ্চিত কেশ মাথার শোভা না হইয়া ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু সুকুমারকে ভালো করিয়া দেখিলে বোধ হয়, শুধু এই রুগ্নতা নয়, কুশ্রীতার আরও-একটু কিছু কারণ ভিতরে আছে।

সুকুমারের সঙ্গে আমরা এক মেসেই থাকিতাম। সে কোন্-এক মার্চ্চেণ্ট অফিসে কাজ করিত। আমাদের মেসে সবাই বিবাহিত, কেবল একমাত্র সুকুমারেরই বিবাহ হয় নাই। এ সম্বন্ধে মেসের সকলেই কৌতূহলী হইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিত। সে বলিত, সামান্য রোজগার, বিবাহ করিয়া সংসার পুষিব কি করিয়া! অন্যেরা বলিত তাহারাই বা কি এমন নবাব খাঞ্জা খাঁ, তবু ত একরকম-করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। সুকুমার এ-কথার কোনো উত্তর করিত না, চুপ করিয়া থাকিত। আর কেহ লক্ষ্য করিত কি না জানি না, আমি বুঝিতাম সুকুমারের এই-

খানটায় একটা ব্যথা আছে। বিবাহের প্রসঙ্গে তাহার মুখে এমন-একটা বেদনা ঘনীভূত হইয়া আসিত যাহা তাহার সেই ক্ষীণ শরীরের সমস্তটাতে ছড়াইয়া পড়িয়াও শেষ হইত না। মনে হইত সহের অতিরিক্ত বেদনা তাহাকে আঘাত দিয়াছে।

সেই জন্য মেসের আর-সবাই তাহাকে লইয়া মজা করিতে থাকিলেও আমি পারিতাম না; আমি তার জন্য একটা সমবেদনা অনুভব করিতাম।

এক-একটা মানুষের ভিতরে কি থাকে যাহাতে অন্যের পরিহাসের প্রবৃত্তি উস্কাইয়া দেয়। সুকুমারও সেই রকম লোক। কিন্তু তার এই গুণ ছিল যে, তাহাকে লইয়া পরিহাস করিলে সে চটিয়া উঠিত না; বোধ হয় চটিয়া-ওঠার মতো তেজ তার রক্তের মধ্যে ছিল না। কিম্বা সে নিজের প্রতি এত উদাসীন যে মান-অপমান তার গায়ে লাগিত না। আমি কিন্তু তাহা ভাবিতাম না; আমি ভাবিতাম, সেই ক্ষীণজীবী মানুষটি অপমানের বিষ রাগের আগুনে ছাই করিয়া দিতে না পারিয়া নিতান্ত অসহায়ভাবে সেই বিষের জ্বালা নীরবে সহ্য করে। আমার দেখিয়া মায়া হইত। আমি তাহার পক্ষ লইতাম, কিন্তু অতগুলির বিপক্ষে একা পারিয়া উঠিব কেন? তাহাকে লাঞ্ছনার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিতাম না। বেশী ঘাঁটাইলে লাঞ্ছনার মাত্রা বাড়িবে বলিয়া আমিও অনেক সময় চুপ করিয়া থাকিতাম। একদিন সুকুমারকে গোপনে ডাকিয়া বলিলাম —"তুমি এ মেস ছেড়ে অন্যত্র যাও।" সে কোনো উত্তর করিল না, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। তার পর আবার যখন ঐ একই কথা বলিলাম তখন সে তার দৃষ্টি দিয়া আমাকে এমন করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল যেমন ভীত শিশু তার মাকে আঁকড়াইয়া ধরে। আমি বুঝিলাম সে বলিতে চাহে, অন্য মেসের লোক যে এর-চেয়ে ভালো ব্যবহার করিবে এমন ভরসা তার নাই,—এখানে একজনও যে দরদী লোক আছে এই ঢের!

আমি যে তার দিকে টানিয়া কথা বলি এর জন্যে একটা কৃতজ্ঞতা তার মুখে-চোখে উথলিয়া উঠিত কিন্তু মুখ-ফুটিয়া সে কিছু বলিত না। সে আর কাহারও ঘরে যাইত না; রোজ সন্ধ্যাবেলা চুপটি করিয়া আমার ঘরে আসিয়া বসিত। তার এমনি ভাব যে মনে হইত যেন এ-সংসারে তার প্রবেশ-অধিকার নাই—সে চুরি করিয়া আসিয়াছে।

আমি তার কাছে অনেক-রকম কথা পাড়িতাম। সে অল্পই উত্তর দিত; মধ্যে মধ্যে হঠাৎ-কখনো তার সেই চাহনির নীরবতার ভিতর হইতে একটু-আধটু উত্তরের আভাস ফুটিয়া উঠিত। তার মুখ ছিল বোবা, সেই জন্য তার চোখ বোধ হয় কথা কহিবার চেষ্টা করিত। তার সেই চোখের ভাষা আমার কাছে যেন সহজ হইয়া আসিতেছিল।

সে একটু সকাল-সকাল অফিস হইতে ফিরিত। আমার দেরী হইত। আমি প্রতিদিন দেখিতাম, আমার লিখিবার টেবিলের পাশে, প্রদীপের ঘোলাটে আলোয় দেয়ালে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া সে বসিয়া আছে। পলকহীন নিরর্থক

দৃষ্টি ;—অমন চাহনি আমি কারো দেখি নাই! সে চাহনির কোনো কাজ নাই, কোনো উৎসাহ নাই, কোনো উপলক্ষ্য নাই ;—সে চাহনি যেন একেবারে মরা! আমার ঘরে প্রবেশ করিবার শব্দে তার কিছুমাত্র চাঞ্চল্য দেখিতাম না, সে যেমন স্থির ছিল তেমনি বসিয়া থাকিত ; চাহনিরও কোনো পরিবর্ত্তন হইত না। তখন তার সেই চোখের দিকে চাহিতে আমার কেমন অস্বস্তি হইত। ঘরের সেই নিস্তব্ধতায়, প্রদীপের সেই স্বল্প আলোর অস্পষ্টতায় আমার মনে হইত এ যেন মরা-মানুষের সঙ্গে ঘর-করা। তাই শব্দ দিয়া প্রাণের সাড়া জাগাইবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি কথা পাড়িয়া ফেলিতাম।

সে আমার পাশের ঘরেই শুইত। আমাদের ঘরের সামনে একটা ছোট্ট বারান্দা। হঠাৎ এক-একদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া আমার গা-টা ছাঁৎ করিয়া উঠিত,—ঐ যেন একটা প্রেত বারান্দার অন্ধকারের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ;—এম্‌নি চলা যে সন্দেহ হইত মাটিতে পা পড়িতেছে কি না—যেন শূন্যের উপর দিয়া চলিয়াছে—সে চলার কোনো শব্দ নাই, কোনো ভার নাই।

মেসের সকলেরই বাড়ি হইতে চিঠি আসিত। সেই চিঠি আশ্রয় করিয়া কত হর্ষ-শোকের ছোটো-বড় তুফান মেসের উপর দিয়া বহিয়া যাইত। এক-একদিন এক-একখানা চিঠি লইয়া এমন কাণ্ড ঘটিত যে মেসসুদ্ধ অস্থির হইয়া উঠিত। বাহিরের জগতের সঙ্গে আমাদের মেসের যে কোনো সম্পর্ক আছে সচরাচর এমন বোধ হইত না—বাহিরের জগত যে ছন্দে বা তালে চলিতেছে আমাদের মেসের গতির সঙ্গে তার কোনো যোগ ছিল না ; হঠাৎ এক-একখানা চিঠি আসিয়া এই অবরুদ্ধতার বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া যাইত। সেইজন্য চিঠি-আসাটা আমাদের মেসে সামান্য ব্যাপার ছিল না ;—তার সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যে একটা তুমুল তোলাপাড়া চলিত তাহা ভুলিবার নহে। কারো বাড়ির অসুখের খবর আসিলে তখন মেসের অন্ধকার ঘরগুলো যেন আরো অন্ধকার হইয়া আসিত এবং নবপরিণীত বান্ধবের প্রেমলিপি লইয়া যে কাণ্ডটা ঘটিত তাহাতে পিনাল-কোডের ধারা অনুসারে মকদ্দমা চলিতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্য্য, সুকুমারের কখনো কোনো চিঠি আসিতে দেখি নাই। তারই আপিসে হরিদাস কাজ করে, সে বলে আপিসেও তার চিঠি আসে না। এই জীবটির কি জগতের কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই? এ জগতের কি কোনো বন্ধন ইহাকে জড়াইয়া ধরে নাই? এ কি অন্য জায়গার মানুষ না কি! সত্য বলিতে কি, সন্ধ্যাবেলা তার মুখের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া আমার মনে হইত এ যেন এখানকার কেউ নয়—প্রেতলোক হইতে নামিয়া আসিয়াছে। যেন একটা প্রেত কোন্-একটা মরা-মানুষের দেহ আশ্রয় করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—হঠাৎ কোন্‌দিন এই দেহ ফেলিয়া পালাইবে।

জানিনা এই ভাবটা আমার মনে কেমন করিয়া কোন্ দিন প্রথম প্রবেশ করে—কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহা যে আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। থাকিয়া-

থাকিয়া আমার মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিত—এক-একসময় এ সন্দেহ এমন ঘনাইয়া আসিত যে সুকুমারকে মানুষ বলিয়া আমার মন কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিত না।

কি ভয়ানক! একটা জীবন্ত মানুষকে প্রেত বলিয়া ভাবিতেছি এ-কথা যে কাহারো সামনে বলাও যায় না। অথচ এই অস্পষ্ট চিন্তাটা নিজের মনের মধ্যে ঘুরপাক খাইয়া-খাইয়া ক্রমেই দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল।

আমি খুঁটিয়া-খুঁটিয়া সুকুমারের আত্মীয়-স্বজন-সম্বন্ধে নানাপ্রশ্ন নানাভাবে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিতাম কিন্তু কোনো উত্তরই পাইতাম না ; মুখ ত কিছু বলিতই না, চোখও এমন নিভিয়া আসিত যে সেখান হইতে উত্তরের কিছুমাত্র আভাসও দেখা যাইত না। আর সে-সময় সে এমন করিয়া চাহিত যে সে-চোখের দিকে চোখ রাখিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিত ;—সেই মরা চাহনি! আমার প্রশ্নের উৎসাহ দমিয়া আসিত ; আর জের টানা চলিত না।

যতই দিন যাইতে লাগিল সুকুমারকে লইয়া একটা অস্বস্তি আমার বাড়িতে লাগিল ; অথচ সুকুমারের প্রতি একটা টানও আমার ছিল, আমি তাকে ত্যাগ করিতে পারিতাম না। তার সেই অসহায়তা, সেই নীরবতা আমাকে এমন করিয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল যে মনে হইত তাকে অবহেলা করা নিষ্ঠুরতা।

দিনের বেলায় সুকুমারকে লইয়া কোনো গোল বাধিত না ; কিন্তু ঐ সন্ধ্যাবেলাটা সে যে কেমন-একরকম হইয়া আসিয়া আমার ঘরে বসিত তাতেই আমার সব গোলমাল হইয়া যাইত। এই-রকম একটা মানুষের সঙ্গে পাশাপাশি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করিয়া বসিয়া থাকাটা যে কি ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী না হইলে কেহ বুঝিবেন না। আমার তো আর-কিছু করিবার জো ছিল না ; সে আশপাশের বাতাসটাকে এমন-একটা মন-মরা ভাব দিয়া ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিত যে, সে আবহাওয়ার মধ্যে কিছু করিবার উৎসাহ একেবারেই থাকেনা। কাজেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম। নিস্তব্ধতা ক্রমেই গভীর হইয়া আসিত ; মনে হইত যেন একটা শব্দহীন অন্ধকার প্রকাণ্ড গহ্বরের মধ্যে অসাড় হইয়া পড়িয়া আছি। আর বাতির আলো কি কিছুতেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে না! ঘরের সেই ঘোলাটে আলো যেন ক্রমেই চোখের উপর ম্লান হইয়া আসিত—আর দেয়ালের গায়ে তার দেহের সেই প্রকাণ্ড কালো ছায়াটা যেন বিশ্বের সমস্ত অন্ধকার আকর্ষণ করিয়া পুষ্ট ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। পাশ থেকে একটা ঠাণ্ডা নিশ্বাস গায়ে আসিয়া লাগিত। সামনে সেই মানুষের কালো ছায়া আর পাশে সেই ছায়ার মানুষ—এমনি করিয়া সময় কাটানো উঃ সে ভয়ানক!

আর না পারিয়া আমি একদিন ঘর ছাড়িয়া সমস্ত সন্ধ্যাটা এবং খানিকটা রাত্রি বাহিরে কাটাইয়াছিলাম। কিন্তু সমস্ত ক্ষণটা তার জন্য আমার মন-কেমন করিয়াছিল। বাহিরের বাতাসে, রাস্তার আলোয় আমার ঘরের ভিতরকার সেই অস্বস্তিটাকে অত্যন্ত ছেলেমানুষী বলিয়া মনে হইতে লাগিল—আমি আপনার-মনে একটা ফুৎকার দিয়া উঠিলাম!

তখনি ফিরিয়া গিয়া তার কাছে বসিবার জন্য মন ছটফট করিতে লাগিল! কিন্তু ঘরে ফিরিয়া আবার কেমন সন্দেহ হইল—এ কি প্রেত-মায়ার আকর্ষণ না কি!

সন্ধ্যাবেলায় মেসের অন্য ঘরে তাস-পাশার আড্ডা বসিত। আমাদের ঘরে কেহ আসিত না। ঐ সব খেলা আমি জানি না, কাজেই সে আড্ডায় গিয়া বসিবার আমার কোনো আকর্ষণ ছিল না। আমি চুপ করিয়া নিজের ঘরে বসিয়া থাকিতাম, শেষে যখন ঠাকুর আসিয়া খাবারের খবর দিত তখন চট করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতাম। ছায়ার মত সে ধীরে ধীরে আমার পিছন পিছন আসিত।

অফিসের সাহেবের কাছে একদিন অপমানিত হইয়া আসিয়া আমি অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হইয়া বসিয়াছিলাম। পিছন হইতে আসিয়া সে নিঃশব্দে আমার পিঠে ধীরে ধীরে হাত রাখিল। উঃ সে কী শীতল স্পর্শ! মনে হইল পাঁচআঙুলসুদ্ধ একখানা বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা হাত আমার দেহের উপর হইতে নামিয়া গিয়া একেবারে পাঁজরার ভিতরে গিয়া ঠেকিল! আমার সমস্ত রক্ত যেন হিম হইয়া আসিল। মানুষের হাত এত ঠাণ্ডা! উঃ সে এত ঠাণ্ডা যে তার শীতলতা আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া সে আমার ঘরে বসিয়াছিল। আমি দেয়ালে তার ছায়াটার দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলাম। মিট-মিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। তখন বৈশাখ মাস। সামনের জানলাটা খোলা। আকাশ অত্যন্ত ঘোলা; —একটা গুমটে ভাব সমস্ত আকাশখানাকে থমথমে করিয়া রাখিয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। জানলার ফাঁক দিয়া কয়েকটা নারিকেল গাছের মাথা দেখা যাইতেছিল। সেগুলা একেবারে স্থির—পাতার উপর একটুও কাঁপন নাই। মনে হইতেছিল, কতকগুলো ধূমকেতুর ছায়া যেন অন্ধকারের গায়ে ল্যাজ ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস আসিয়া ঘরটাকে কাঁপাইয়া দিল। সঙ্গে-সঙ্গে সে কেমন-একটা বিকট শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখি সমস্ত স্থির—চোখের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়ে না। বাতাসে প্রদীপ নিভিয়া গেছে। আমি সেই অন্ধকারের মধ্যে হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া রহিলাম। হঠাৎ আমার মনে হইল, সেই প্রেতটা এইবার মানুষের দেহ ছাড়িয়া পালাইয়াছে—শূন্য-দেহ পড়িয়া আছে। আমি তার গায়ে হাত দিলাম—সমস্ত ঠাণ্ডা। আমার বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হইতে লাগিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে মনে হইতে লাগিল প্রেতটা আমার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া মজা দেখিয়া হাসিতেছে। হাসির একটা চাপা শব্দ যেন কানে আসিয়া লাগিল। বাহিরে বৃষ্টি নামিয়াছে, নারিকেল গাছের মাথাগুলা ফুলিয়া উঠিয়াছে—সেখান হইতে কাহারা যেন ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি ও অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল; দেয়ালের গায়ে সেই প্রতিদিনকার পরিচিত কালো ছায়াটা হঠাৎ একবার জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। আমি একটা ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সেই

চীৎকারে পাশের ঘর হইতে সবাই ছুটিয়া আসিল। তারপর তাকে ধরা-ধরি করিয়া বিছানায় শোয়াইল। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল—আহা লোকটা মরিল গা! কিন্তু ডাক্তার আসিয়া বলিল,—না জীবিত আছে, হঠাৎ মানসিক উত্তেজনায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

আমিই তার সেবার ভার লইলাম। দুই দিন, দুই রাত্রি সে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিল। তিন-দিনের দিন জ্ঞান হইল। প্রথম চোখ চাহিয়াই আমাকে দেখিয়া তার সেই মরা চাহনিটা একবার একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আমি অফিস কামাই করিয়া তার শুশ্রূষা করিতেছিলাম। দিনরাত তার কাছাকাছি থাকিতাম। যখন যা দরকার হইত উঠিয়া আনিয়া দিতাম। তার অবাক দৃষ্টি আমার সেই চলাফেরার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকিত। মুখের কাছে ঔষধের গ্লাস ধরিলে সে বিস্ময়ের সহিত আমার মুখের পানে চোখ তুলিয়া চাহিত—অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত আমার হাত হইতে ঔষধ লইত। দ্বিতীয় দিনে সে অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—"আপনি আমার জন্যে এত কষ্ট করচেন কেন? আপনি যান।" আমি সে কথা কানে তুলিলাম না। পরের দিন সে একটু বিরক্তির ভাব দেখাইল—আমার প্রত্যেক কাজে খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল; হঠাৎ একবার ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—"যান; আমি আরাম হয়েছি—আপনাকে আর দরকার নেই।" আমি দেখিলাম, সেইটুকু পরিশ্রমেই সে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি তাকে শোয়াইয়া দিলাম। সে অনেকক্ষণ চোখ মুদিয়া পড়িয়া রহিল। তারপর চোখ খুলিয়া আমার দিকে চাহিল—সে দৃষ্টি লজ্জায় ভরা।

দুই দিন বেশ চলিল, তৃতীয় দিনে আবার তার বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল—সে কিছুতেই আমাকে তার কাজ করিতে দিবে না, কাছে গেলেই অত্যন্ত বিরক্তির সহিত মুখ ফিরাইয়া লয়, যা করিতে বলি কিছুতেই করে না। আমার কাছ হইতে এতটুকু সাহায্য লইবে না—সে এমনি ভাব দেখাইতে লাগিল। কেবলই বলে,—"সরে যান্, সরে যান।" একবার সে আমায় ধমক দিয়া উঠিল—"কেন আপনি আমাকে এমন করে বিরক্ত করচেন?" সন্ধ্যার সময় হাতে ওষুধের গ্লাস দিলাম, ঔষধ খাইল না, সেই গ্লাস লইয়া আমাকে ছুঁড়িয়া মারিল। আমি অবাক হইয়া তার দিকে চাহিলাম, সে তাড়াতাড়ি হাত-দিয়া চোখ ঢাকিয়া ফেলিল। আমি ভাবিলাম, আমার একটু সরিয়া যাওয়া ভালো—নয়ত বেশি উত্তেজিত হইলে আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িতে পারে। আমি ধীরে ধীরে ঘর হইতে চলিয়া গেলাম, কাছাকাছি থাকিয়া নজর রাখিতে লাগিলাম। তার পর অনেক রাত্রে আসিয়া তার পাশটিতে বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। সে তখন ঘুমাইতেছিল।

গভীর রাত্রে হঠাৎ কাহার স্পর্শে চমকাইয়া উঠিলাম। অন্ধকারে ভালো দেখিতে পাইতেছিলাম না, মনে হইল

একটা ছায়া যেন আমার পায়ের কাছে ঘুরিতেছে। আমি উঠিতে যাইতেছি এমন সময় কে আমার পা চাপিয়া ধরিল। সে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—"ক্ষমা করুন।" এক ফোঁটা জল আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িল! আমি শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলাম—"করেন কি! করেন কি! —পা ছাড়ুন।" সে বলিল—"ক্ষমা করুন।"

এখন হইতে তার সহিত আমার সম্বন্ধ অনেকটা সহজ হইয়া আসিল। এই কয়েকদিনে তার হৃদয় যে দোলা খাইয়াছে তাহাতে যেন তার অন্তরের সেই গুমটের প্রথম-পর্দ্দাটা উড়িয়া গেছে। আমারও মনের ভ্রম ধীরে ধীরে ঘুচিতেছিল—এখন তাহাকে অনেকটা মানুষ বলিয়াই মনে হয়। সে একটু-একটু করিয়া আমার কাছে তার মন খুলিতেছিল;—কিন্তু এখনও তার সব কথা ভালো করিয়া ধরিতে পারি না। সে কতকটা বলে, কতকটা হাওয়ায় ছড়াইয়া দেয়—সেই জন্য স্পষ্ট করিয়া সব বোঝা যায় না। যাহা হউক, একটা ছায়ার মানুষের কাছে যে হৃদয়ের একটুখানি সাড়া পাওয়া গেল তাহাতে যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

ক্রমেই আমাদের আলাপ একটু-একটু করিয়া জমিতে লাগিল। যতই তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম ততই আমার সেই পূর্ব্বেকার সন্দেহ অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা তার কাছে আমার সেই কথাটা বলিয়া ফেলিলাম। সে মুখটা সাদা করিয়া বলিল—"আপনার সন্দেহ ত মিছে নয়। সত্যিই আমার প্রাণ অনেক দিন হল এক ঝড়ে উড়ে গেছে—কেবল দেহটা পড়ে আছে!" সত্যি? আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। মনে হইল ঘরের সেই সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারের উপর একটার পর-একটা করিয়া অন্ধকারের পর্দ্দা আসিয়া পড়িতেছে—বাহিরে একটা অন্ধকারের ঘূর্ণি উড়িয়া চলিয়াছে—তাহার মধ্যে কত যে অদ্ভুত জিনিষ ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটিতেছে বলিতে পারি না।* * * হঠাৎ সে দেশলাই জ্বালিয়া চুরুট ধরাইল। তাহারই শব্দে ও আলোয় আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম।

তার ভিতরকার খবর সে কিছুতেই দিতে চাহিত না।—মনে হইত যেন সেখানকার কোনো খবরই নাই। আমার সহিত সে যে একটা মনের সম্পর্ক পাতাইয়া ফেলিয়াছে, আত্মীয়তার সেই আস্বাদ তার জীবনে যেন এই প্রথম। সে যেন এই সবেমাত্র তার জীবনের একটা বন্ধন লাভ করিল;—এতদিন পৃথিবীতে তার জীবনের কোনো মূল-শিকড় গাড়া ছিল না। সে উৎসাহের সঙ্গে আমার কত খবর লইত, কিন্তু তার নিজের খবরের বেলায় সব শূন্য! এমন মানুষ কোথাও দেখি নাই যে পৃথিবী হইতে একেবারে আল্‌গা!

হয় ত আমার বুঝিবার ভুল। হয় ত তার অতীত তার মন হইতে একেবারে মুছিয়া গেছে কিম্বা তাহা এমন শোকদুঃখের কঠিন শিলায় চাপা পড়িয়া আছে যে তার ভিতরকার খবর বাহিরে আসে না।

কিন্তু কথায় বলে পাথরেরও ক্ষয় আছে,—পাথরও গলে। এক-একদিন মনে হইত যেন তার জীবনের একটা সূত্র ধরিতে

পারিয়াছি। একটা কথার ইঙ্গিতে, মুখের একটু বিষণ্ণতায়, চোখের সজলতায় সে তার জীবনের এক-একটি টুকরো অন্যমনস্কে ছড়াইয়া ফেলিত। অন্য কারো কাছে হয় ত তার কোনো অর্থ ছিল না, মূল্য ছিল না,—কেহ হয় ত সে দিকে লক্ষ্যই করিত না, কিন্তু এই দুর্জ্ঞেয় মানুষটিকে জানিবার জন্য আমার একটা কৌতূহল—শুধু কৌতূহল নয়, একটা আবেগ ছিল বলিয়া সেই টুকরোগুলি আমাকে এড়াইতে পারিত না; তার জীবন-ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার অস্পষ্ট অসম্বদ্ধ লাইনগুলি আমার মনের মধ্যে গাঁথিয়া যাইত। কিন্তু কখনো তার জীবনের একটা ধারাবাহিকতা পাই নাই; পাইলে আমার এই কাহিনীটিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিতাম।

মহা মুস্কিল! কোথা হইতে আরম্ভ করি? সে তো তার জীবনের গল্প বলে নাই যে গল্পের মতো সাজাইয়া তার কথাগুলি প্রকাশ করিব। কাজেই আমাকে একটু ছোড়ভঙ্গ হইয়া চলিতে হইবে।

ছেলেবেলায় লোকে বলিত সে মা-বাপ-খেকো ছেলে।.....

যিনি তাকে মানুষ করিতেন তাঁকে সে মাসি বলিয়া ডাকিত। মাসি প্রায়ই রাগিয়া বলিতেন—"ছেলেটা মা-বাপকে খেয়েছে, এইবার আমায়ও খাবে!".....

পাড়ার ছেলেরা কেমন দাদা, দিদি বলিয়া ডাকিত; তার ভারি ইচ্ছা হইত সেও কাউকে অমনি করিয়া ডাকে, কিন্তু ডাকিবার মতো লোক খুঁজিয়া পাইত না।.....

সুকুমার ছেলেবেলায় ভারি দুষ্টু ছিল। সে একটি মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া, তাকে মারিয়া-ধরিয়া একাকার করিত। কিন্তু মেয়েটি কখনো তার সঙ্গে আড়ি করে নাই। সে সুকুমারকে দাদা বলিত।.....

একবার পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে সুকুমারের মারামারি হয়। কাহারো সঙ্গে তার বনিত না। সকলে একজোট হইয়া তাকে বেদম মারিয়াছিল। সুকুমারের কপাল কাটিয়া রক্তপাত হয়—সে দাগ এখনও আছে। রক্ত দেখিয়া সবাই পালায়;—সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকে। তালদিঘির পারে কেয়াবনের ধারে সে যে কতক্ষণ পড়িয়াছিল জানে না। সন্ধ্যা হইয়া গেছে। কেয়াবনে সাপ থাকে। কেন যে তাকে সাপে কামড়ায় নাই—আশ্চর্য্য! কেহ তার খবর লয় নাই;—সে উঠিয়া দেখে, মেয়েটি একা তাকে দিঘির ধারে খুঁজিতেছে।

মাসি কপাল কাটা দেখিয়া অগ্নিমূর্ত্তি! তিনি বলিলেন—"হতভাগা ছেলেটা এমনি করে একদিন মরবে!".....

আর-একদিন দেশলাই লইয়া খেলিতে খেলিতে সে চণ্ডীমণ্ডপে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। অনেক কষ্টে সে আগুন নেভে। আগুন যখন খুব জ্বলিতেছে তখন মাসি বলিয়াছিলেন—"যা হতভাগা, তুই ঐ আগুনে পুড়ে মর! আমার হাড় জুড়ুক।"

মাসি ছিলেন গরীব। ঐ আগুনে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব যায়। তাতে তাঁদের খাওয়া পরার ভারি কষ্ট। একদিন তিনি সুকুমারের কাছে এক-গাদা ছাই লইয়া আসিয়া

বলিলেন—"যেমন পুড়িয়ে সব ছাই করেছিস —তেমনি এই ছাই খা!" সুকুমার রাগিয়া এক-থাবা ছাই মুখে পুরিয়াছিল।.....

একদিন মাসির উপর রাগ করিয়া সুকুমার সমস্ত দিন তালদিঘির পাড়ে এক পেয়ারা গাছের মাথায় চড়িয়া বসিয়াছিল। মেয়েটি তাকে বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য কত সাধাসাধি করিল কিন্তু সে কিছুতেই নামিল না। মেয়েটি তখন গাছে উঠিয়া তার হাতে-পায়ে ধরিতে যায়—সে এক লাথি মারিয়া তাকে ফেলিয়া দিয়াছিল। তার পর মেয়েটি যখন আর নড়ে না, তখন সে তাড়াতাড়ি গাছ হইতে নামিয়া মেয়েটিকে ধরিয়া তুলিল। সুকুমার বলিল—"বল্ কোথায় লেগেছে!" সে বলিল—"না লাগেনি।" সুকুমার বলিল—"বল শিগ্‌গির, নইলে মার খাবি!" সে তখন হাঁটু দেখাইল। সেখানটা কাটিয়া একাকার হইয়াছে। সুকুমার তাড়াতাড়ি দিঘি হইতে কাপড় ভিজাইয়া জল আনিল, কাপড় ছিঁড়িয়া একটা পটি বাঁধিয়া দিল। মেয়েটি বলিল —"সুকুমার দা, বাড়ি চল।" সুকুমার তখন আর দ্বিরুক্তি করিল না; তার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

মাসি বলিলেন—খোঁড়াচ্চিস কেন? কি হয়েছে রে!" মেয়েটি বলিল—"পড়ে গেছি খুড়ি!" খুড়ি বলিয়া উঠিলেন—"তুই ঐ দজ্জালটার সঙ্গে মিশে ধিঙ্গি হয়ে উঠেছিস; —খবরদার ওর সঙ্গে বেড়াস্‌নি!"

ঐ কথায় সুকুমারের ভারি রাগ হইয়াছিল। সে দুই দিন তার সঙ্গে খেলা করে নাই। মেয়েটি তাতে কাঁদিয়াছিল!.....

সুকুমার পাঠশালায় দুষ্টুমি করিত, ভালো করিয়া পড়াশুনা করিত না, তাইতে গুরুমশায় একদিন আচ্ছা করিয়া বেত দিয়াছিলেন। সেদিন বেতের মাত্রা একটু বেশি হইয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। মাসি বলিলেন—"বেশ হয়েছে! যেমন কুকুর তেমনি মুগুর!" মেয়েটি সেই ফুলো গুলোর উপর ধীরে ধীরে হাত দিয়া-দিয়া বলিল —"উঃ বাবারে এত ফুলে উঠেছে! তুমি দুষ্টুমি কর কেন ভাই!".....

সুকুমার নদীতে সাঁতার দিত। মেয়েটিকে ডাকিত—"দেখবি আয়!" সুকুমার সোঁ-সোঁ করিয়া চলিয়া যাইত, মেয়েটি তীরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিত—"সুকুমার দা, আর যেওনা, আর যেওনা!" সুকুমার শুনিত না, সে আরো গভীর জলে চলিয়া যাইত। শেষে উঠিয়া আসিয়া ধমক দিয়া বলিত—"তুই অমন করিস কেন?" সে বলিত—"না তুমি যেওনা, আমার বড় ভয় করে!".....

মেয়েটির মা বিধবা। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"আমার রাণীর সঙ্গে সুকুর বিয়ে দেব।" মাসি এ-কথায় তেমন কান পাতিতেন না। বলিতেন—"তাহলে ও রাণীর হাড়-মাস জ্বালিয়ে খাবে।".....

একবার বিজয়ার দিন রাণী আসিয়া সুকুমারকে প্রণাম করিল। সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল—"প্রণাম করলি কেন রে!" রাণী মুখ-চোখ লাল করিয়া বলিল—"মা যে বল্লেন!" সুকুমার সেদিন জলে পড়িয়া প্রতিমার অনেক রাংতা জোগাড় করিয়াছিল;—তার সঙ্গে কেহ পারিত না, সে কাড়াকাড়ি করিয়া প্রতিমার মুকুটটা ছিনাইয়া লইয়াছিল। দুর্গার মুকুট রাণীর বড় ভালো লাগিত। রাণী সেদিন প্রণাম করিবার পর সুকুমার তার মাথায় সেই মুকুট পরাইয়া দিয়া বলিল—"এই নে এটা তোকে দিলুম।"

রাণী সেই মুকুট-মাথায় বাড়িতে দৌড়িয়া গেল। তার মা, খুড়ী চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওরে কি অলুক্ষণে কাণ্ড! করেছিস কি! খোল্, খোল্, মা-দুর্গার মুকুট কি মাথায় পরতে আছে!" রাণী ভয়ে মুকুট খুলিয়া ফেলিল। সুকুমার বলিত—"পর না!" সে কিন্তু আর পরে নাই—ঘরের কুলুঙ্গিতে সেটা তুলিয়া রাখিয়াছিল।

রাণীর মা সেদিন সুকুমারকে বলিয়াছিলেন —"তুমি যদি বাছা সত্যিকার মুকুট রাণীকে পরাতে পার তবে ত বুঝি!".....

এমনি করিয়া সুকুমারের টুকরা-টুকরা কাহিনী আমার সংগ্রহ হইতে লাগিল। প্রথম-প্রথম কিছুই ধরিতে পারিতাম না, এক-একটা কথা শুধু কানে আসিয়া লাগিত; আবার দুই দিন পরে এমন-একটা আভাস পাইতাম যাহাতে সেই কথাটি একটা সম্পূর্ণ মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিত। আমি এই কথাগুলি যে পদ্ধতিতে লাভ করিয়াছিলাম তার একটু বিশেষত্ব ছিল, তার রসাস্বাদনের আনন্দ আলাদা রকমের। আমি ঠিক সে জিনিষ দিতে পারিব না। শুধু সাদা কথাগুলা পর-পর সাজাইয়া দেওয়াতে উহার উপর যে রহস্যের একটি আবরণ ছিল যাহাতে চিত্তকে ঔৎসুক্যে টানিয়া লইয়া যায় তাহা নষ্ট হইয়াছে। সুকুমারের সহিত কথা কহিতে কহিতে আমার মনে হইত আমি যেন একটা অসীম রহস্যপূর্ণ অন্ধকার গুহার

মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি, এক-একবার একটা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে তার সমস্তটা নয়, খানিকটা অতি তাড়াতাড়ি আমার চোখের উপর আসিয়া পড়িতেছে; আবার সমস্ত অন্ধকার।

সুকুমার যে সেদিন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল তার কারণ সে বলে, আকাশে সেদিনকার ঝড়ের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া সে কেমনতর হইয়া গেল।

সুকুমারের জীবনে একটা ঝড়ের কাহিনী আছে। এ কাহিনীটি সে একদিনমাত্র বলিয়াছিল—আর কখনো শুনি নাই। কিন্তু সেই একদিনের শোনাতেই আমার মনে তাহা ছবির মতো আঁকিয়া গেছে।

কোন্-এক কুটুম্ববাড়ি নিমন্ত্রণ ছিল—বোধ হয় বিবাহের নিমন্ত্রণ। বৈশাখ মাস। দুপুর-বেলা। নৌকা ঠিক। সকলে গিয়া নৌকায় উঠিল। সন্ধ্যা-নাগাদ্ নৌকা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবে। নৌকায় ছিলেন মাসি, রাণী আর রাণীর মা। পুরুষের মধ্যে সুকুমার। মাসি ও রাণীর মা দুইজনেই বিধবা—তাঁদের সাজসজ্জার কোনো পারিপাট্য ছিল না। সাজিয়াছিল রাণী। একখানি নীলাম্বরী সাড়ি, কপালে একটি রাঙা টিপ, হাতে কয়েকগাছি চুড়ি আর পায়ে মল,—ইহাতেই রাণীকে একেবারে রাণীর মতো দেখাইতেছিল। তার নীলাম্বরী সাড়িখানি বৈশাখের খর রৌদ্রের উপর একটা স্নিগ্ধতা ঢালিয়া দিতেছিল। গ্রাম্যপথের দুপুর বেলাকার নিস্তব্ধতার উপরে মলের ঝুম্‌ঝুম শব্দ বাতাসের গায়ে ঢেউ তুলিয়া আম-বনের ওপারে গিয়া ক্ষীণ সুরে মিলাইয়া যাইতেছিল।

কপালের সেই রাঙা টিপটির উপর প্রজাপতির মতো ডানা ছড়াইয়া সূর্য্যের রশ্মিরেখা আসিয়া পড়িতেছিল। এমন সুন্দর রাণীকে আর কোনো দিন দেখায় নাই।

স্থির জলে নৌকা চলিতেছে। সুকুমার মাঝিদের হাত হইতে একখানা দাঁড় লইয়া নৌকা বাহিতেছিল। রাণী ছইয়ের কিনারাটিতে বসিয়া একদৃষ্টে সুকুমারের দাঁড়-টানা দেখিতেছিল। মাসি, রাণীর মা ছইয়ের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন।

চতুর্দ্দিকে বৈশাখ-মধ্যাহ্নের অলসতা; —নৌকা ধীর-মন্থর গতিতে চলিয়াছে। সব নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে জলচর পাখীদের কাকলি আর নৌকার ছিপ্ ছিপ্ শব্দ যেন বিশ্বের তন্দ্রা আকর্ষণ করিয়া আনিতেছিল। রাণী হাতের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ একখণ্ড পশ্চিমে মেঘ উঠিয়া নদীর জল আঁধার করিয়া তুলিল। একবার একটা ফুরফুরে হাওয়া গায়ে আসিয়া লাগিল, তারপরেই একটা দম্‌কা। তারপর দমকার উপর দম্‌কা! মাঝিরা ভীত হইয়া উঠিল। তীরের দিকে নৌকা ভিড়াইবার চেষ্টা করিল —কিন্তু নৌকার মুখ ফেরায় কার সাধ্য!

বৃষ্টি নামিল। নদী ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছে! মনে হইতে লাগিল সমস্ত নদীটাকে কে যেন উনুনে চড়াইয়া ফুটাইতেছে। বৃষ্টির জল নদীতে পড়িবার অবসর পাইতেছে না—ঝড়ের ঝাপটে জলের ফোঁটা ধুনিয়া গিয়া উড়িয়া চলিয়াছে,—সব যেন জলের ধূলায় ধূলাময়! গাছের মাথা হইতে পাখীগুলোকে কে যেন মারিয়া আনিয়া নদীর উপর আছড়াইতেছে —তাদের মৃতদেহ জলের খরস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। নৌকার মধ্যে কারো মুখে কোনো কথা নাই! প্রকৃতির প্রলয়-নৃত্যের দৃশ্যে সবাই হতভম্ব।

হঠাৎ কি হইল—কেমন-একটা ঘূর্ণি হাওয়ায় নৌকা ডুবিয়া গেল।

ঝড়ের মধ্যে মানুষের গলার শব্দ উঠিল—"সুকুমার দা!"

সুকুমার তখন জলে পড়িয়াছে। কার হাত আসিয়া তার গলা জড়াইল। হাতের চুড়িতে সে বুঝিল রাণী!

সুকুমার এতক্ষণ সাঁতার দিতেছিল, রাণীর ভারে সে ডুবিতে লাগিল। সজ্ঞানে মৃত্যুকে এমন মুখোমুখি দেখা, সে কত ভয়ানক! সে উপরে ঠেলিয়া উঠিবার জন্য ছট্‌ফট করিতে লাগিল—কিন্তু জলের মধ্যে কেবলই ঘুরপাক! প্রাণ যায়-যায়! রাণী কিছুতেই ছাড়ে না। তার বাহুর বন্ধন ক্রমেই চাপিয়া বসে। সুকুমারের মনে হইল, এ কি আপদ আসিয়া জুটিল; সে এক-ঝটকায় রাণীকে ঠেলিয়া দিয়া নিজে ভাসিয়া উঠিল। জলের স্রোত তাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। যখন কূলে গিয়া ঠেকিল তখন একেবারে মরার মত। তারপর কতক্ষণ পরে যখন চোখ মেলিয়া চতুর্দ্দিকে আকুলভাবে চাহিল তখন মনে হইল, যে চোখের জানলা দিয়া সে এতদিন পৃথিবীকে দেখিতেছিল এ যেন সে জানলা নয়— এ যেন কোন্ অপরিচিত ঘরের অপরিচিত জানলা।—কোথায় রাণী, কোথায় কে!

সুকুমার বলে, সে বড় স্বার্থপর। নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সে রাণীকে হত্যা করিয়াছে। একসঙ্গে ডুবিয়া মরিলে ক্ষতি কি ছিল? সে যে তার বুকের কাছে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। সেইখানে তাকে ঠেলিয়া তাকে সে একেবারে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া দিল। সে কী নিষ্ঠুর! এই ত জীবনের সুখ, এই সুখের জন্য রাণীর গলা টিপিয়া মারিতে তার এতটুকু হাত কাঁপে নাই।

প্রাণের মায়া—প্রাণের মায়া তার বড় রাণী! নইলে সে এমন করিবে কেন! কিন্তু সেই-প্রাণই ত জল থেকে রক্ষা পাইয়া যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছিল। সে-প্রাণের মায়ায় ত তার বাঁচিবার কোনো আশা ছিল না—তার কামড়ের দাগ সে এখনো বহন করিতেছে। সে বলে, ভগবান চোখে-আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, যে-প্রাণের প্রতি তার এত মমতা সে প্রাণ এক-ফুঁয়ে নিভাইয়া দেওয়া যায়! কিন্তু তাহা ত তিনি নিভিতে দিলেন না! বড়-যে বাঁচিবার সাধ ছিল তাই তিনি বাঁচিয়া-থাকার মজা দেখাইলেন!……

কথার মুখেই সে হঠাৎ আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইত। আমরা তখন সন্ধ্যাবেলাটা বারান্দায় বসিতাম। সে ধীরে ধীরে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া তার সেই নির্দ্দিষ্ট জায়গায় গিয়া চুপ করিয়া বসিত। আমি ঘরে গিয়া দেখিতাম তার দেহের সেই দীর্ঘ কালো ছায়াটা দেয়াল জুড়িয়া বসিয়া আছে। তখন তার চোখের দিকে চাহিয়া মনে হইত তার সেই চোখের গহ্বর দিয়া কে যেন উঁকি মারিতেছে!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

পর্য্যায়

নারীসুলভ অপচয়ের অপ্রবৃত্তি আমাকে এই পাতা কয়খানি ব্যবহার করতে প্রবৃত্ত করলে। তা না হলে নূতন বৎসরে হাল-খাতা খোলাই সনাতন প্রথা। কিন্তু তাও ঠিক নয়,—নূতন আর পুরাতনের মধ্যে একটা পূর্ণচ্ছেদ পড়ে না ত, তাই সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবস্থার আবশ্যক হয় না! পুরাতন যে পদ লিখে আস্‌ছিল তাতে "সেমিকোলন" দিয়েছে, "ফুল-ষ্টপ" নয়; তাই জের টেনেই চলেছি। নূতন কখনো আসে কি? কালের চিরন্তন গ্রন্থে, ঋতু-পর্য্যায়ের অধ্যায়ে অধ্যায়ে, সেই পুরাতনেরি পুনরাবৃত্তি চলে। যে ছন্দ, যে গাথা, যে গীত ও গীতিকা আমরা পড়ে আসি, তার কত কথা এক-পাতায় সমাপ্ত না হয়ে অন্য খানিতে এসে পড়ে, আমরা একটানা পড়েই চলি;—শেষ কোথায়? কালের এই ঋক-সাম-যজু-অথর্ব্ব, এই দর্শন আর গান, নিবেদন আর উৎসর্গ আমরা গ্রীষ্মের তীব্র আলোকে, বসন্তের গানে, বর্ষার বৃষ্টি-ধারায় ও মেঘধূমে, বিদ্যুতের হোমশিখায়, আর শরতের স্বর্ণ ধান্যসম্ভারে দেখতে পাই।

গ্রীষ্ম পঞ্চতপার উগ্র আলোকে আমাদের মনে ঋক-মন্ত্রের উদ্বোধন করে, আমরা তখন কেবলি দ্রষ্টা হই। আকাশের নীলিমা অজস্র আলোয় উদ্ভাসিত, অপার দৃষ্টিতে পূর্ণ, দীর্ঘদিনের উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে শ্যামা বসুন্ধরার নিষ্পলকনেত্রে অন্তবিহীন দর্শনের সাধনা চলে, আর জলধির আলোক-উদ্দীপ্ত অক্ষৌহিণী ঊর্ম্মিমালা অশেষ ছন্দে অবিরত ঋক-মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে। বসন্তে তরু-লতার আন্দোলন, নিরন্তর ছন্দোগতি, আমাদের মনে সুরের আনন্দ সঞ্চার করে, দ্বিজ-সম্প্রদায় সাম-গাথায় ঋতুরাজের আহ্বান গায়, সঙ্গীতের সঙ্গ-সুখে চরাচরের মন পরিপূর্ণ করে। বর্ষায় দেখি, নিখিল বিশ্ব যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করলে; জলধি তার ধূপ-বাষ্প আকাশে প্রেরণ করে, দৈবী আলোক তাতে বিদ্যুতের উদ্দীপনা সঞ্চার করে, প্রচুর ধারা-বর্ষণের সূচনা হয়,—সে আমাদের যজ্ঞফল, দেবতার প্রসাদ। আর শরতে কর্ম্মফলের নিবেদন,—দেবোদ্দেশে বর্ষের অন্তিমে নবান্নের ব্যবস্থা, অগ্রহায়ণের প্রারম্ভ!

এই চারি বেদের আচার-বিধি আমাদের জীবনের কাল-ভেদেও দেখতে পাই। শৈশবে আমরা সামবেদী, তখন গানের উপরেই থাকি, ছন্দের উদ্বেলিত গতিতে আমরা চলি, উদাত্ত-অনুদাত্তের উদার-পাদক্ষেপে তরঙ্গ-গতিতে অগ্রসর হই, উত্থান-পতনের উপদ্রবে বারম্বার প্রবুদ্ধ হতে থাকি। যৌবনে আমরা ঋকদ্রষ্টা ঋষি, তাই বলে মুনি নই। কতই দেখি আর কতই দেখার আশায় উৎফুল্ল! নবীন চেতনার জাগরণে আমাদের নয়ন-মনে নূতন দৃষ্টি খুলে যায়, দেখি আর দেখাই! এ যে রচনায় নরনারী উভয়েরি সমান অধিকার কি আনন্দেরি সেই জাগরণ! আকাশ, ধরণী আলোক আর ছায়া, পত্র পুষ্প তৃণবল্লরী সবাই আপনাদের বুক অবারিত করে দিয়ে তাকে করে দেখে নেবার জন্যে, আমাদের কেবলি ডাকে! তখন আমাদের চোখে যে অঞ্জন আনন্দ রেখা টেনে দেয়, তার উপকরণ পোড়ান ঘুঁটের কালো কালি নয়,—সোণা-গলান তরল আলো! সে দৃষ্টিতে অদৃষ্টদেবী এসে পরশমণি বুলিয়ে দিয়ে যান, তাই যেখানেই তাকে ছোঁয়াই সেইখানেই সোনার স্বপন জেগে ওঠে। তারপর প্রৌঢ়ে আসে যজুর পালা,—নিবেদন আর আবেদন, মন্ত্রপাঠ আর তন্ত্র উদ্ভাবন! যখন প্রায় শেষ হয়ে এল, তখনি আমরা "দাও" আর "দাও-এর বুলি আরম্ভ করি। যৌবন তার ভরা ভাণ্ডার হতে কেবলই দান করে, সে পূর্ণ;—তেজে দীপ্তিতে, কামনা আর বাসনার আবেগে পরিপূর্ণ; অবারিত তার দানপ্রবৃত্তি, তখন আর সঞ্চয় করবার কথা মনেই আসে না। প্রবীণ হয়ে হিসাবের খাতা খুলি, ব্যয়ের বিধানে মনোনিবেশ হয়, আয়ের কথা মনে আসে। তখনি দেবতার কাছে প্রার্থনার পর্য্যায় আরম্ভ হয়। আমি তোমায় বলি দিয়েছি, তুমি আমায় ধন দাও। "ভার্য্যাং মনোরমাং" হতে কিই-বা আমরা না চেয়ে থাকি? তারপরে শেষকালে জরার জড়তায় যখন আমরা স্থবির হতে চলেছি তখনই অথর্ব্বর সাধনা করি! এইত গেল অভ্রান্ত চতুর্ব্বেদবিধি চতুর্ব্বর্গ ফলের মূল!

নীতির দিক দিয়ে দেখলেও আমাদের এই

জীবনের চারকাল চারটি নীতির বিধানেই চলে! শৈশবে আমরা সামপন্থার পথিক। তখন সবই সমান, ছোটবড় উঁচুনীচু ভদ্র ইতর কিছুই মানিনে। উদারনৈতিক আমরা অবাধ পথে, সমতলের রাজ্যে বিচরণ করি। যৌবন দান দিতে জানে; প্রৌঢ় জানেন ভেদের প্রথা ভাল করে। শৈশবে যে অভেদ-বুদ্ধি ছিল, তা যৌবনের অভিজ্ঞতায়, "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"—এই বিজ্ঞ বাক্যের ব্যর্থতায় ভেদজ্ঞানে পরিণত হয়। যা অভিন্ন ছিল, কালমাহাত্ম্যে দেখি তা সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে; বৈরাগ্য এসে কাণে কাণে বলে, কা তব কান্তা ইত্যাদি ইত্যাদি; বীতরাগ বানপ্রস্থের বন্দোবস্ত করতে বসে, সংসার অসার বোধ হয়, আর বেচারা বৃদ্ধ সাম দান, ভেদ সবেরই দণ্ড ভোগ করে। সাম্য যখন বৈষম্যে পরিণত হয়, দান যখন ঋণের বিভীষিকায় বিব্রত; ভেদ যখন ছেদন করতে বসে, তখন কালের দণ্ড, অঙ্কুশ আর কুঠার বার্দ্ধক্যের ক্ষীণ পরিসরের মধ্যেই দণ্ডে দণ্ডে শুক্ত ও প্রবল হয়ে এসে পড়ে! ধূলিসাৎ হতে তার আর বিলম্ব হয় না। তার কুব্জ দেহ আর ন্যুব্জ পৃষ্ঠ দণ্ডের অবলম্বনে বিচরণ করে; সে দরিদ্র তখন দণ্ডী।

১লা বৈশাখ ১৩২৩।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বৈজ্ঞানিক প্রতিভা

এক-ফোঁটা জলে অসংখ্য জীবাণু ইতস্তত বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে—অবশ্য আহারের সন্ধানেই তাহাদের এই সঞ্চরণ। কিন্তু কথাটা এই যে, জীবাণুদের এই নড়া-চড়ার মধ্যে তাহাদের নিজেদের কোন স্বাধীন ইচ্ছা আছে, না সম্পূর্ণ দৈব-ঘটনার বশেই ইহা সম্পাদিত হইতেছে? যদি প্রথমটা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে এই জীবাণুদের মন বলিয়া একটা-কিছু আছে সে-কথাও মানিয়া লইতে হয়। যে সঞ্চরণের কোনো উদ্দেশ্য নাই, তাহাতে কোন্ দিকে যাই, না-যাই সে জ্ঞান থাকার কোন আবশ্যক করে না। কিন্তু মনের প্রধান ধর্ম্ম না কি এই যে, মন যাহার, সে যেদিকে গিয়া প্রচুর খাদ্য পাইয়াছে, কিম্বা যেদিকে গিয়া পায় নাই, তাহা ভুলিতে দেয় না,—তাহা পূর্ব্বাভিজ্ঞাত বিষয় সঞ্চিত করিয়া রাখে—যে পথ অনুসরণ করিলে বেশী ফল পাওয়ার সম্ভাবনা সেই পথটি চিনাইয়া দেয়। এই যে আণুবীক্ষণিক জীবাণুগুলি, ইহাদের নড়াচড়ার মধ্যে যে কোনো উদ্দেশ্য নাই, অনেক সময় এমন বোধ হয় না। যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া গেল—যেদিকে যাইতেছিল, সেদিক হইতে সহসা ফিরিয়া আসিল; কথা নাই, বার্ত্তা নাই, হঠাৎ গতির বেগ বৃদ্ধি করিল—এ সকলের কি কোনই অর্থ নাই? এ সকল দেখিয়া এই মনে হয় যে ইহারা জ্ঞাতসারেই (consciously) খাদ্যের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যেদিকে তাহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই,

জ্ঞাতসারেই সেদিক পরিত্যাগ করিয়া, যেদিকে তাহার সন্ধান পাইয়াছে, সেদিকে প্রবল বেগে ধাবিত হইতেছে।

জীব-রাজ্যে আরও-একটু উর্দ্ধে উঠিলে আমরা মক্ষিকা পিপীলিকা প্রভৃতিকে খাদ্যের সন্ধানে সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারেই চারিদিকে বিচরণ করিতে দেখি।—এখানে হইল না, অন্যত্র ছুটিল, সেখানে হইল না, অন্যত্র যাইল। সত্য কথা বলিতে কি, সমস্ত জীবজগৎটা সুধু "try, try, try again" নীতি অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে টিঁকিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু এই সব নিম্ন-শ্রেণীর জীবদের গতিবিধি দেখিয়া তাহাদের বুদ্ধি যে বেশি আছে এমন ত মনে হয় না। পিপীলিকা খুবই পরিশ্রমী জীব, কিন্তু বুদ্ধির অল্পতা বশত বেচারাকে অনেক-সময় বৃথা খাটিয়া মরিতে হয়। চলিতে চলিতে সম্মুখে একটা তৃণদণ্ড পথরোধ করিলে সে সেটাকে উল্লঙ্ঘন করিবে তবু পাশ-কাটাইয়া যাইবে না। ঐরূপ করিলে যে বাধাটা অতি সহজেই অতিক্রম করিতে পারা যায়, সে কথা তাহার মনেই আসে না। চিনির গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া বোল্‌তা খোলা জানালা দিয়া অনায়াসেই ঘরে প্রবেশ করে কিন্তু বাহির হইবার সময় আর পথ খুঁজিয়া পায় না। কুকুরকে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে হইলে যেমন-তেমন একটা গেরো দিলেই চলে। কারণ যদিও ইচ্ছা করিলে সে অনায়াসেই সে গেরো দাঁত দিয়া খুলিতে পারে কিন্তু তাহা করে না;—বিধাতা তাহার ঘটে অতটুকু বুদ্ধি দেন নাই। ঘোড়া এমন কি বানরকে পর্য্যন্ত ঐরূপে সহজে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে; কিন্তু বনমানুষকে পারা যায় না। কি করিয়া গেরো খুলিতে হয়, সে কৌশল তাহার দিব্য জানা আছে।

নিম্নশ্রেণীর জীবদের যা-কিছু বুদ্ধিবৃত্তি তাহা কেবল আসন্ন প্রয়োজনীয় পদার্থের অনুসন্ধানেই নিযুক্ত হয় এবং সেইটি পাইলেই তাহারা সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত থাকে। প্রত্যক্ষ ঘটনাসমূহের বিচার ও পরীক্ষা করিয়া, প্রয়োজনীয় পদার্থের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে কাজটা যে অনেক সহজসাধ্য হয় একথা তাহাদের মনেই হয় না। মানুষের মধ্যে অনেকেরই বেলায় ঐ একই অবস্থা লক্ষিত হয়। অধিকাংশ মানুষকেই সুধু খাদ্যের সন্ধানেই ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। এখানে হইল না অন্যত্র গেল, সেখানে হইল না আর একস্থানে গেল। যে পথে গিয়া সে সফলতা লাভ করে সেটি যেমন সে ভুলে না, তেমনি যে পথে গিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই সেটিও সে মনে করিয়া রাখে।

এমনি করিয়া সাধারণ মানুষ পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতার সাহায্যে তার গন্তব্য স্থির করে। কিন্তু এপথে কেন ফল হইল, ওপথে কেন হইল না—এসকল সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিতে তাহার কোন প্রবৃত্তি হয় না। ঘটনাসমূহকে শ্রেণীবিন্যাস (generalise) করিবার ইচ্ছা তাহার মনে একবারও উদিত হয় না। বিবিধ সমস্যার যে একই সমাধান থাকিতে পারে, সে-কথা তাহার কল্পনাতেও আসে না। যিনি এ-সকল করিতে

পারেন তিনি আর তখন সাধারণ মানুষ থাকেন না; তিনি তখন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক হইয়া দাঁড়ান। খুব প্রাচীন-কালে, যখন বিজ্ঞানের জন্ম হয় নাই, সে সময় বিবিধ-আকারের প্রস্তরখণ্ড লোকে না দেখিয়াছিল এমন নয়, হয়ত উহাদের মধ্যে বিশেষ-কোন-এক আকারের পাথর সংগ্রহ করিয়া লোকে তাহার দ্বারা নিজেদের বাসগৃহও নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে। তাহার পর তাহাদের মধ্যে এমন-একটি মহা-পুরুষের আবির্ভাব হইল যাঁহার মনে আকার-বিষয়ে সাধারণভাবে পর্য্যালোচনা করিবার ইচ্ছা জন্মাইল—ইহারই ফলে জ্যামিতি-বিজ্ঞানের জন্ম হইল। আগুনের সঙ্গে সকলেরই পরিচয় ছিল, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা দাহন-ক্রিয়া সম্বন্ধে সাধারণভাবে পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম ততদিন রসায়ন-বিজ্ঞানের জন্ম হইতে পারে নাই।

কুকুর যে গেরোটা খুলিয়া আপনাকে বন্ধন-মুক্ত করে না, তাহার কারণ, সে-কথাটা তার মনেই হয় না। এ ভাবটা যদি তাহার মনে উঠিত, তাহা হইলে সে অবলীলাক্রমে দাঁতের সাহায্যে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিত। তেমনি ভিন্ন ভিন্ন আকারের পাথর সকলেই দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু বিভিন্ন আকারকে শ্রেণীবিন্যাস (generalisation) করার ভাব ও ইচ্ছা কাহারো মনে উদিত না হওয়ায় তাহাদের দ্বারা জ্যামিতি আবিষ্কার সম্ভব হয় নাই। নইলে এই আবিষ্কারের পথে যে তাহাদের ক্ষমতার অভাব ছিল তাহা নহে। অনেক অসাধারণ ক্রিয়া অনেকের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারিত যদি তাহারা সে-বিষয়ে ভাবিতে পারিত। কত কোটি কোটি নরনারী এবং হাজার হাজার জ্ঞানী ব্যক্তি আকাশে গ্রহ-তারকাদির উদয় ও অস্ত দেখিয়াছেন কিন্তু ইহাদের কাহারো মনে এ-কথাটা উদিত হয় নাই যে এই-যে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ, ইহা চাক্ষুষ পরিভ্রমণ হইলেও যথার্থ পরিভ্রমণ নয়;—এই দৃঢ় পৃথিবী যাহার উপর আমরা দাঁড়াইয়া আছি—যাহাকে সম্পূর্ণ গতিহীন বলিয়া মনে হইতেছে—এই পৃথিবীই ইহাদের বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে আর আমাদের মনে হইতেছে পৃথিবী স্থিরই আছে, গ্রহ তারকাদিই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। কোপারনিকসের (Copernicus) মনে যেদিন এই ভাবটির প্রথম উদয় হইল, সেদিন না-জানি কি অসাধারণ প্রতিভার বিদ্যুৎই না স্ফূরিত হইয়াছিল! কোপার-নিকসে পর কত-শত জ্যোতির্ব্বিদের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে কিন্তু ইহাদের মধ্যে এক নিউটন ছাড়া আর কাহারও মনে স্বপ্নেও এ কথা উদিত হয় নাই যে, যে শক্তিবলে ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়ে, সেই একই শক্তি আকাশে গ্রহনক্ষত্রাদিকে পরস্পর আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু ভাবের উদ্ভব হইলেই যে সব হইল তাহা নয়। ভাবটির উপকারিতা সম্বন্ধে মনের মধ্যে দৃঢ় জ্ঞান ও বিশ্বাস জন্মান আবশ্যক। এরূপ জ্ঞান ও বিশ্বাস সকলের পক্ষে সম্ভব নয়; যাহাদের মনের এতটা উদারতা আছে যে, তাহারা সকল জিনিষকেই

ন্যায্য ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে পারে কেবল তাহাদেরই পক্ষে সম্ভব। সাধারণ ব্যক্তির মনে ভাবটির উদয় হইলেও সে তাহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারে না—চেষ্টা করিলেও পারে না। শ্রেণী-বিন্যাস ব্যাপারে তাহার কোন স্বার্থ নাই, —কেননা ইহাতে অর্থাগম, ক্ষমতালাভ কি তাহার মনের মত যশোপার্জ্জনের সম্ভাবনা নাই। তাহাদের সকল চেষ্টা, সকল উদ্যম নিজের কিংবা পরিবারের কিম্বা বড়-জোর দেশের কল্যাণ-সাধনেই নিয়োজিত হয়। যদি ভাগ্যক্রমে তাহার খুব উচ্চ-দরের স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে সে ক্ষমতা ঐ সকল উদ্দেশ্য-সাধনেই সে ব্যয় করিতে থাকে। ইহার ফলে সে হয় ত ধনপতি, সেনাপতি বা রাজনৈতিক হইয়া উঠিতে পারে; কিন্তু তাহাতে সাধারণ ভাবে মানুষের কোন কল্যাণ সাধিত হয় না বরঞ্চ অনেক সময়েই ফল উল্টা হইতে দেখা গিয়াছে।

তাহা হইলে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে —প্রকৃত মহত্ত্ব ও গৌরব কোথায় আছে? প্রকৃত মহৎ কোন্ জিনিষটা—সেইটা জানাই মহত্ত্বের প্রথম লক্ষণ। সংসারে কাজের লোক কাজ করিয়া যায়, কিন্তু কোনটা সব-চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ, সেটা ঠিক করা তাহাদের অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। মানুষ নিজের মানসিক শক্তি অনুসারে জীবনের কার্য্য ঠিক করিয়া লয়। যে ব্যক্তির মানসিক শক্তি খুবই নিম্ন অঙ্গের, সে ব্যক্তি জীবনের আমোদ-প্রমোদকেই জীবনের সার ভাবে। ইহা অপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের শক্তি যাহাদের, তাহারা ধন বা যশ, কিম্বা ধন যশ এই দুই লাভ করা সেই জীবনের কর্ত্তব্য মনে করিয়া বসে। ইহার অপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের মন যাহাদের তাহারা দেশ-সেবাকেই কর্ত্তব্য মনে করিয়া থাকে। ইহার অপেক্ষাও যাহাদের শক্তি বেশী তাহারা বিশ্বমানবের কল্যাণ-সাধনকেই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া থাকে। স্বার্থ-চিন্তা তাহাদের মনে স্থান লাভ করিতে পারে না। অনেক সময় প্রশ্ন উঠে—কবি বড়, না বৈজ্ঞানিক বড়, না যথার্থ বীর বড়। সেক্‌স্‌পীয়ের বড়, না নিউটন বড়, না বোনাপার্ট বড়? ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহার ঠিক উত্তর দেওয়া একরূপ অসম্ভব। কিন্তু বিশ্ব-হিতের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে প্রশ্নটার উত্তর অন্যরূপ দাঁড়ায়। সত্য বলিতে কি, বোনাপার্টের যা-কিছু কাজ, সবই তাঁহার নিজের জন্য আর কতকটা তাঁহার প্রিয় ফরাসী দেশের জন্য। তাঁহার অমানুষিক সাহস ও বীরত্ব সমস্ত জগতকে সন্ত্রস্ত ও ও চমৎকৃত করিয়াছিল এবং বর্ত্তমান যুগে সমর-বিষয়ে এত বড় কর্ম্মী যে আর দ্বিতীয়টি জন্মান নাই—এ সকলই সত্য। তিনি যে একজন অসীম প্রতিভাশালী পুরুষ তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু নেপোলিয়ানের যা-কিছু সে সবই ত তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হইয়াছে। এখন আছে সুধু একটা নাম আর একটা গল্প। অমন নাম আর গল্প সেক্‌সপীয়র তাঁহার কল্পনার সাহায্যে অনেক সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে হ্যাম্‌লেট্, ওথেলো প্রভৃতি নামে আমাদের

মনের উপর যেমন ভাবের উদয় হয়, বোনাপার্টের নামে তাহার বেশী আর বড় একটা কিছু হয় না। কিন্তু সেক্‌সপীয়ার কি করিয়াছেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা যাক্। তিনি আমাদের সম্মুখে একখানি মুকুর ধরিয়া রাখিয়াছেন, ইহাতে আমরা বিশ্বমানবের প্রকৃতি নিয়ত প্রতি-ফলিত হইতে দেখিতেছি। তিনি আমাদের যাহা দিয়াছেন, তাহা নেপোলিয়ান প্রদত্ত জিনিসের চেয়ে উচ্চ অঙ্গের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

একজন বড় কবি, আর-একজন বড় বৈজ্ঞানিকের কাজের ধারা অনেকটা একই রকমের। বিজ্ঞান-প্রতিভা ও কবিপ্রতিভা যমজ-ভগিনী বলিলেই হয়। সেক্‌সপীয়র যেমন মানবচরিত্রের সর্ব্বপ্রকার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া চির অমর হইয়া আছেন, নিউটনও তেমনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অজ্ঞাত রহস্য প্রকাশ করিয়া চির-অমরতা লাভ করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি বিশ্বমানবের হিতের জন্য কার্য্য করেন তাঁহারা সকলেই সেক্‌স্‌পীয়ার নিউটনের মত আমাদের ভক্তির পাত্র সন্দেহ নাই। এই সকল মহাপুরুষদের হৃদয়ে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের মত সহসা একটা নূতন ভাবের উদয় হয়। কিন্তু হৃদয়ে একটা original ideaর উদয় হইলেই যে বড় লোক হয় তাহা নয়; ইহা যে বিশ্বমানবের পক্ষে হিতকর সে সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস ও জ্ঞান থাকারও আবশ্যক। তাহার পর ideaটাকে আকার দিবার, তাহাকে বাস্তবে পরিণত করিবার মত ক্ষমতা ও যোগ্যতার আবশ্যক। কোন একটা নূতন বিষয়ের যখন আবিষ্কার হয়, তখন সেটা খুবই সহজ ও সাধারণ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু যতক্ষণ তাহা ভাবে মাত্র আবদ্ধ থাকে যতক্ষণ তাহা শৈলচূড়ার মত দুর্গম।

তাহা হইলে দেখা গেল—বৈজ্ঞানিক হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে চাই ভাবের প্রেরণা, তাহার পর ভাবটার উপকারিতা ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস ও উপলব্ধি এবং তার পর ভাবটাকে কার্য্যে পরিণত করিবার মত একাগ্রতা ও সামর্থ্য। এ সকলের উপর আর একটা জিনিস চাই সেটি হইতেছে শুভক্ষণের উদয়। শুভক্ষণ ব্যক্তিগত সাধনার জিনিস নয়—ইহা অনেকটা দৈবাধীন ঘটনা। নিউটন্, সেক্‌সপীয়র ও নেপোলিয়ানের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে হয়ত কত শত নিউটন্, সেক্‌সপীয়র ও নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন, কেবল শুভক্ষণের অভাবে তাঁহারা আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। খুব বড় রকমের একটা আবিষ্কার যখন হয়, তখন অনেকেই অবজ্ঞা ভরে বলিয়া থাকেন—"ও অবস্থায় সে না হইলে আর একজন ইহা করিত।" এ কথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মীদের পক্ষে খাটে বটে—মহৎ কর্ম্মীদের পক্ষে নহে। রাষ্ট্রবিপ্লব পৃথিবীতে অনেকবারই ত হইয়াছে, নেপোলিয়ান ত একবারের বেশী জন্মাইলেন না। অতএব দেখা যাইতেছে, সুযোগটাকে গ্রহণ করিবার জন্য ব্যক্তিগত ক্ষমতার একান্ত আবশ্যক।

যে সকল অবস্থা ও ঘটনার সমাবেশে প্রতিভার স্ফূরণ হয়, তাহা নিতান্তই বিরল; বিরল বলিয়াই ত মানব জাতি অতি ধীরে

ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। জাতীয় ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রতিভাবান পুরুষের উদয়ের বিশেষ বিশেষ যুগ আছে। হয়ত কোন জাতির মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া কোন একটা বিজ্ঞান, কি কোন নূতন শিল্পকলার উদ্ভব হয় নাই কিন্তু সহসা এমন একটা যুগ দেখা দিল, যে-সময় সেই জাতির মধ্যে বিদ্যার বিবিধ শাখা-প্রশাখায় নানাপ্রকার প্রতিভাশালীর আবির্ভাব হইল। জাতীয় বৃক্ষে প্রতিভাবান পুরুষদের অভ্যুদয় বৃক্ষের পুষ্পোদ্গমের মত। সাধারণ মানুষ সেই বৃক্ষের পত্রস্বরূপ। পত্রের দ্বারা বৃক্ষের সাধারণ উদ্দেশ্য সাধিত হয় বটে কিন্তু বৃক্ষে ফুল ধরে তাহার গৌরবের জন্য, তাহাকে ফলবান করিবার জন্য। উর্ব্বরদেশ, প্রচুর খনিজ সম্পদ, ব্যবসায়ের সুবিধা ও বিস্তার জাতীয় সম্পদের পরিচায়ক বটে কিন্তু ইহার অপেক্ষা বড় মূলধন হইতেছে সেই জাতির প্রতিভাবান পুরুষোৎপাদন ক্ষমতা। জাতীয় ইতিহাস ত সেই জাতির ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রকম প্রতিভাবানের ইতিহাস বলিলেই হয়। পৃথিবীতে এমন দুর্ভাগ্য জাতিও আছে যাহাদের মধ্যে কস্মিনকালেও একজন প্রতিভাবানের অভ্যুদয় হয় নাই। এরূপ জাতির পৃথিবীর ইতিহাসে কোনই স্থান থাকিতে পারে না।

বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ও আবিষ্কারের জন্য কেবলই যে প্রতিভার আবশ্যক তাহা নহে। ইহার জন্য আরও এক শ্রেণীর লোকের আবশ্যক। ইহাঁদের কাজ শুধু ঘটনাসমূহ ও পরীক্ষাফল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা। এ কাজের জন্য অবশ্য খুব অসাধারণ ক্ষমতার আবশ্যক করে না, কিন্তু ইহার জন্য যে পরিমাণ উৎসাহ, ধীরতা ও স্বার্থ-হীনতার প্রয়োজন, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। যে ব্যক্তি নিজের লাভালাভ বিষয় চিন্তা করে, তাহার দ্বারা ইহা সম্ভব হইতে পারে না। এই সকল ধীর, নিঃস্বার্থ কর্ম্মী পুরুষদের কাজের উপরই ভবিষ্যতের বড় বড় আবিষ্কার নির্ভর করিয়া থাকে। জাতীয় উন্নতি সম্পাদনের জন্য এইরূপ শ্রমশীল সহিষ্ণু কর্ম্মী পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া একান্ত আবশ্যক। যে জাতির মধ্যে এইরূপ পুরুষের সংখ্যা যত অধিক, তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা তত বেশী।

তাহা হইলে বৈজ্ঞানিকদের দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক হইতেছে —ঘটনার পর্য্যবেক্ষক (observer of facts; দ্বিতীয় হইতেছে—সমস্যার মীমাংসক (solver of problems)। বলা বাহুল্য অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এই শেষোক্ত শ্রেণীর দ্বারাই জগতে সর্ব্ব প্রকার তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান ক্ষেত্রে ভাব ও পর্য্যবেক্ষণ দুইয়েরই আবশ্যক বটে, ইহার কোনটাই বাদ দিবার জো নাই; তবে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইলে, পর্য্যবেক্ষণ অপেক্ষা ভাবেরই যে প্রাধান্য বেশী তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

লম্ব্রসো সংখ্যা-তালিকার সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে প্রতিভা ও বাতুলতায় বড় নিকট সম্বন্ধ। কিন্তু তিনি

যদি এমন বলিতেন যে, প্রতিভা হইতে বাতুলতা জন্মাইতে পারে, বাতুলতা হইতে প্রতিভা জন্মাইতে পারে না, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার কথাটা আরও সঙ্গত হইত। প্রতিভা বড় সর্ব্বনেশে জিনিস। ইহার অত্যাচার বড় ভীষণ অত্যাচার। ইহা অল্পে তুষ্ট হইতে জানে না। প্রতিভা-শালীর কাজের যেন শেষ নাই। প্রতিভাশালীর ভাগ্যে কদাচিৎ শান্তি ঘটিতে দেখা যায়। বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহার গন্তব্য স্থানটিতে উপস্থিত হইতে পারিলেও, দুর্ভাগ্যক্রমে, সে-স্থানটিও তাঁহার পক্ষে সুখকর ও প্রাণারাম হইতে পারে না। বন্ধুবর্গ তাঁহার সফলতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন, সমালোচকবৃন্দ ওটা কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন; মূর্খের দল তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্ব লইয়া ঠাট্টা-তামাসা করে, প্রতিদ্বন্দ্বীরা ঈর্ষা করে, আর সাধারণ জনমানব ত বিষয়টা চিন্তার মধ্যেই আনা আবশ্যক বিবেচনা করে না। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার দৃষ্টান্ত অনেক মিলে। সক্রেটিসের প্রতি বিষের ব্যবস্থা, ব্রুনোর প্রতি অগ্নির ব্যবস্থা; গ্যালিলিয়ো ও কলম্বেসর প্রতি কারাবাসের বাবস্থা; জেনারের প্রতি সমস্ত জগতের বিরুদ্ধাচরণ —এ সকল ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে সকল মহানুভব প্রতিভাশালী পুরুষ তাঁহাদের আবিষ্কারের দ্বারা জগতের পরম মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, জগৎ চিরকালই তাঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছে। অন্নাভাবে আশ্রয়াভাবে ইহাদের কতজনকেই না, অকালে দেহ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। দেবী বাগ্‌দেবী যাঁহাদের কৃপা করেন, লক্ষ্মী তাঁহাদের চিরকালই অকৃপা করিয়া আসিতেছেন, কথাটা বৈজ্ঞানিকদের প্রতি যেমন খাটে এমন আর কাহারও পক্ষে নহে। কেননা, বিজ্ঞান তাহার একনিষ্ঠ ভক্তকে সুধু সিদ্ধিলাভের আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই দেয় না। তাহার আবিষ্কৃত তত্ত্ব সাধারণের জিনিষ হইয়া পড়ে। লোকে তাহা নানা কাজে লাগাইয়া বিলক্ষণ উপার্জ্জন করে, মূল আবিষ্কারকের কথাটি কহিবার জো থাকে না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

স্বেচ্ছাচারী

৮

সকাল হইয়াছে। শশিভূষণের শ্বশ্রূঠাকুরাণী চিন্ময়ী দাসী শয্যায় শায়িতা। তিনি একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেই বিন্দু দাসী তাড়াতাড়ি তাঁহার পিঠের দিকে আর একটা বালিস আগাইয়া দিল। তিনি পূর্ব্বদিকের জানালাটা খুলিয়া দিতে বলিলেন। দাসী জানালা খুলিলে হঠাৎ চিন্ময়ীর দৃষ্টি একটা ইজি-চেয়ারে-শায়িত শশিভূষণের উপর পতিত হইল। শশিভূষণ সারারাত্রি

জাগিয়া ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার নিদ্রিত মুখের উপর প্রভাতের আলো আসিয়া পড়িবামাত্র সে জাগিয়া উঠিয়া বসিল। প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, আপনি কাপড় ছেড়ে জপটা সেরে নিন, ওষুধ খাবার সময় হয়েছে।"

চিন্ময়ী হাসিয়া বলিলেন, "রোগীর আবার জপ-তপ! নিজের শরীরের বিষয় ছাড়া এ সময়ে কি আর অন্য চিন্তা আসে, বাবা? বিন্দু, গঙ্গাজল আর কাপড়খানা আন্ ত মা।"

বিন্দু প্রার্থিত বস্তু অগ্রসর করিয়া দিলে শশিভূষণ মুখ ধুইবার জন্য বাহিরে আসিয়া ডাকিল, "সরোজ!" সরোজ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিল, "এ কি শশিদা, তুমি কৈ তিনটের সময় আমায় ডাকনি?" শশিভূষণ কলতলায় মুখ ধুইতে ধুইতে বলিল, "যাঁহা বাহান্ন তাঁহা পয়ষট্টি! তিনটে পর্য্যন্তই যদি জাগলুম, তাহলে পাঁচটাই বা কি দোষ করলে?"

সরোজ কহিল, "না শশি দা, এ তোমার ভারী অন্যায়!"

শশিভূষণ কহিল, "কিছু অন্যায় হয়নি ভাই। সমস্ত দিনটা পড়ে আছে, যত ইচ্ছা জেগে থেকো। আর কথাতেই বলে, অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন! ও তোমার পক্ষে দুই সমান। তুমি মার কাছে যাও। আমাকে বাসায় ফিরতে হবে, তারপর কলেজ আছে।"

শ্বশ্রূঠাকুরাণী-সম্বন্ধে বিন্দি দাসী ও সরোজকে সমস্ত উপদেশ দিয়া শশিভূষণ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে সরোজ বলিল, "দাঁড়াও, তোমার চা'টা করে দি।" শশী বলিল, "চা খেতে গেলে দেরী হয়ে যাবে।" সরোজ ছাড়িল না, তাড়াতাড়ি তাহার জন্য চা চড়াইয়া দিয়া বলিল, "কার্ত্তিকবাবু বলছিলেন, তিনিও তোমার সঙ্গে এসে রাত জাগতে ইচ্ছুক।"

শশিভূষণ কহিল, "অর্থাৎ যেটুকু সময় তোমার কাছে কাটে! তোমার গন্ধটুকু শব্দটুকুও ওর কাছে এখন লোভনীয় কি না!"

সরোজের মুখখানি শশীর এই বিদ্রূপে হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্য লজ্জারুণ রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই একটা অতি করুণ বিষণ্ণতার ছায়াপাতে মনোহর শোভা ধারণ করিল। শশিভূষণ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "সরোজ, সাবধান ভাই, আমার ভয় হচ্চে—"

সরোজ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "কোন ভয় নেই শশিদা, অন্ধের রাতও নেই, দিনও নেই। দিন এলেও তার জন্য আসে না, রাত এলেও তার জন্য আসে না।"

শশিভূষণ হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া সরোজের মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিল, "সরোজ, সূর্য্য উঠলেই সরোজ প্রস্ফুটিত হয়, তা জানি, তবু যে আমার সরোজকে কেউ কৃপা করে দয়া দেখাবার জন্য ভালবাসবে, তোমার এ রকম অপমান আমি কিছুতেই সইব না! তুমি দয়ার পাত্রী নও, দয়ার ঢের ওপরে যা, সেই পূজাই তোমার প্রাপ্য! তাই তোমায় সাবধান করছি।"

সরোজ চায়ের বাটি হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার হাত কাঁপিয়া চা একটু পড়িয়া গেল। শশিভূষণ তাহার

হাত হইতে চায়ের বাটিটা গ্রহণ করিয়া বলিল, "সরোজ, আমার কথায় রাগ করলে?"

সরোজ কহিল, "আমি অন্ধ! আমার আবার রাগ-দ্বেষ লজ্জা-ভয় কি শশিদা?"

শশিভূষণ কহিল, "তোমার এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হতে পারলুম না।"

সরোজ কহিল, "কেমন করে হবে? মিছিমিছি কাউকে কষ্ট দিলে কি কারও সুখ হয়?"

শশিভূষণ কহিল, "আমায় ক্ষমা কর বোন, আমি তোমার ভালর জন্যই বলছিলুম। কার্ত্তিককে আর অগ্রসর হতে দিয়ো না। সে বিবাহ-পণে বদ্ধ। সর্ব্বানন্দর কাছে যা শুনেছি, তাতে বুঝেছি যে কালিকা কাকার মেয়েটী তারই আশা-পথ চেয়ে বসে আছে। কালিকা কাকাও বহুদিন থেকে কার্ত্তিকের উপর আশা-ভরসা—"

সরোজ কহিল, "থাম তুমি, এবার সত্যিই আমি রাগ করব। কেন তুমি এ সব কথা বলছ? ভগবান আমায় দৃষ্টি-হারা করে পথের এক পাশ দিয়ে চলবার মাত্র অধিকার দিয়েছেন; আমি কি পথের সেই একধার ছাড়া আর বেশী-কিছু চেয়েছি? তুমি আমায় দয়া করে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছ, তাই আমার চলা হচ্চে, নইলে কোথায় এক পাশে পড়ে থাকতুম, কেউ আমার খোঁজও রাখত না। তোমার উপদেশ ছাড়া, তোমার হাতের নির্দ্দেশ ছাড়া, অবলম্বন ছাড়া যদি এক পা চলি, সেই দিন তুমি আমায় ঠেলে ফেলে চলে যেয়ো।"

শশিভূষণ সন্তুষ্ট মনে চলিয়া গেল। কিন্তু সরোজের মনে সে যে ব্যথা দিয়া গেল তাহার অনুভব সেই দিনকার প্রভাতের সমস্ত আনন্দটুকুকে তীব্র তিক্ত রসে পরিণত করিয়া তুলিল। সরোজ ধীরে ধীরে একটা গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া তাহার অন্ধ নয়ন বিস্ফারিত করিয়া দিল। তাহার সমস্ত দেহ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার অন্তরাত্মা হইতে যেন একটা ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল —আলো—আলো! হে লোক-চক্ষু, হে সর্ব্ব-প্রকাশ, হে স্বপ্রকাশ, তুমি তাহার কাছে এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রকাশিত হও। তাহার এই সমস্ত দেহ একটী চক্ষুতে পরিণত হইয়া সর্ব্বরূপের কারণ-স্বরূপ তোমার রূপকে এক মুহূর্ত্তের জন্য অন্তরে গ্রহণ করিয়া তারপর পদ্মের মত মুদিত হইয়া যাক্। একবার—একটী বার মাত্র তোমার কিরণের আঘাতে তাহার এই চিরান্ধকারময়ী রাত্রি এক মুহূর্ত্তের জন্য অস্তগমন করুক! তারপর আসুক রাত্রি, আসুক অন্ধকার, তাহার আর কোন ক্ষোভ থাকিবে না!

হে প্রভাত, জীবন-প্রভাতে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া মধ্যাহ্ন আসিবার পূর্ব্বে চিররাত্রে পরিণত হইলে! ক্ষণেকের জন্য আমার চক্ষে ফুটিয়াছিলে, তারপর—আদিহীন অন্তহীন অপার অন্ধকার সাগরের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দিয়া চলিয়া গেলে! যে পথে সহস্র যাত্রী চলিয়াছে, সেই পথেই চলিতে হইবে; অথচ তাহাদের পথের আলো পথকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু আমার নিকটে সেই পথই, তাহার দূরত্ব, তাহার বিস্তৃতি, তাহার অসংখ্য যাত্রীর

সমাবেশ সমস্ত সঙ্গে লইয়া চির-অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে! যাক্, অন্ধের কিবা রাত্রি, কিবা দিন—দুই সমান! অন্ধের চলাও যা, না চলাও তাই। কেবল এইটুকু চাই, যেন পথের একধারে আমার একটু স্থান থাকে! হে অনন্তের যাত্রীর দল, অন্ধ বলিয়া আমায় ঠেলিয়া পদ-দলিত করিয়া যাইয়ো না। তোমরা যখন দেখিতে পাও, তখন এই অন্ধ যাত্রীকে এড়াইয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়ো। আমায় পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যাও, কোন দুঃখ নাই, কিন্তু দয়া করিয়া আমায় ধূলায় লুটাইয়া দিয়া যাইয়ো না। আমি ধীরেই চলি আর দাঁড়াইয়াই থাকি, আমি যেন দুই পায়ের উপর সোজা হইয়া থাকিতে পাই! হে আমার অন্ধকারের অন্ধ দেবতা, তোমার এই ক্ষুদ্র সেবিকাকে তোমার মৌন নীরবতার মধ্যে স্থির, নিশ্চল, উন্নত রাখিয়ো, ইহার অধিক আর কিছু চাহি না।

* * *

দ্বিপ্রহরে চিন্ময়ীকে ঔষধ পান করাইয়া সরোজ সুকুমারীকে ডাকিয়া লইয়া পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করিল। সুকুমারী কিন্তু কিছুতেই পাঠে মন দিল না, কারণ সর্ব্বদাদা বলিয়াছিল, যতদিন না মার অসুখ সারে, ততদিন তাহাদের ছুটী। সরোজ বিরক্ত হইয়া বলিল, "তা হবে না সুকু, মা এখন চিররোগীর মত হয়ে পড়লেন। তিনিই আমায় বকছিলেন। আর বিশেষ একদিন অবহেলা করলে তারপর দিন আরও মুস্কিলে পড়বে। যাদের চোখ নেই, তাদের যখন আঙুল দিয়ে পড়তে হয়, তখন স্পর্শটাকে প্রতিদিন সজাগ রাখতে হবে, নইলে কিছুতেই এগুতে পারা যাবে না।"

সুকুমারী কহিল, "তার কি দরকার! আমি ত একবার ছুঁয়েই বুঝতে পারি যে এটা আমার কোন্ পুতুল, এটা আমার কি জিনিষ! তবে অক্ষরের বেলায় রোজ রোজ হাত বুলুতে হবে কেন?"

সরোজ কহিল, "পুতুলটার ওপর তুমি যতখানি মন দিতে পার, ততখানি মন পড়ার ওপর দিতে পার না, তাই রোজ রোজ পড়ার দরকার।"

সুকুমারী অগত্যা একখানা মোটা কার্ড বোর্ড লইয়া তাহার তোলা অক্ষরে লিখিত বর্ণমালার উপর অঙ্গুলি বুলাইতে আরম্ভ করিল। সরোজ সুকুমারীর হাতের উপর আঙুল রাখিয়া তাহার হাতের গতি-অনুসরণ এবং ভুল হইলে তাহা সংশোধন করিয়া দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বিরক্ত হইয়া সুকুমারী বলিল, "আচ্ছা সরোজ দিদি, যাদের চোখ আছে, তারা পড়ে কি করে?"

সরোজ কহিল, "চোখ দিয়ে।"

সুকুমারী কহিল, "আচ্ছা, তারা আঙুল দিয়ে কি করে? আমাদের মত পড়ে?"

সরোজ কহিল, "না, তারা আঙুল দিয়ে লেখে, তবে শুনেছি, পড়তেও পারে। তারা হাতের অনুভব দিয়ে চোখের অনুভবকে পড়ে।"

সুকুমারী বুঝিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "হাতের অনুভব দিয়ে চোখের অনুভব কি করে পড়ে? চোখের অনুভব আবার কি রকম?"

সরোজ মহাবিপদে পড়িল, এ কথা কি করিয়া সে তাহাকে বুঝাইবে? সে বলিল, "তুমি বড় হও, তারপর বুঝিয়ে দেব, এখন তুমি বুঝতে পারবে না।" কিন্তু সে যে বলিয়াছে, 'চক্ষুষ্মানে হাতের অনুভব দিয়া হাতের অনুভব পড়ে না, হাতের অনুভব দিয়া চোখের অনুভব পড়ে' এই কথা কয়টী সে কতকটা আত্মগত ভাবেই বলিয়াছিল, বালিকাকে উদ্দেশ করিয়া নয়। সে আজ সমস্ত দিন ধরিয়া ঐ কথাই ভাবিয়াছে। তাহার ক্রমাগতই মনে হইয়াছে যে চক্ষুষ্মানে কখনই স্পর্শের যথার্থ অনুভব পায় না, তাহাদের সমস্ত অনুভবই দৃষ্টির ভাষায় ঘটিয়া থাকে। অন্ধের কি যে ভাষা, কি যে অনুভব, তাহা তাহারা কিরূপে জানিবে? তাহারা আপনার অনুসারেই পরকে দেখে, পরের কার্য্যের বিচার করে। হায়, অন্ধের অনুভব যে অন্ধ নয়, কিরূপে সে তাহা অনুভব করিবে? এমন কি কেহ নাই যে অন্ধকে অন্ধেরই মত অনুভব করিবে? চক্ষুর প্রকাশকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া কেবল অন্তরের প্রকাশকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিবে? এমন কে আছে যে, সমস্ত বহির্মুখী দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়া তাহাদের অন্তরের মধ্যে অনুভবানন্দ-স্বরূপ আপনাকে প্রকাশিত করিবে? যদি এমন কেহ থাক, এস, সরোজ তাহারই অপেক্ষায় তাহার বহিঃপ্রকাশহীন অন্তঃসরোজ পাতিয়া বসিয়া আছে!

সরোজ সুকুমারীকে সাহায্য করিতে করিতে অনুভব করিল, কে যেন সোপান অতিক্রম করিয়া উপরে আসিল এবং ক্রমশ পাঠ-কক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। সুকুমারী পাঠ ত্যাগ করিয়া বলিল, "কে?" সরোজের মুখ সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ক্ষণেকের জন্য। পরক্ষণেই সে গম্ভীর মুখে বলিল, "কার্ত্তিক বাবু, ওখানে দাঁড়িয়ে রৈলেন কেন? ভিতরে আসুন।"

কার্ত্তিক প্রবেশ করিয়া একটা বেঞ্চে বসিয়া বলিল, "আমি কার্ত্তিক কেবল নামে, আমার যদি ময়ূর থাকত, তাহলে বোধ হয় আপনি আমার আগমন মোটেই টের পেতেন না। তা না হয়ে জুতোর ওপরই আমার আগমন-ঘোষণার দামামা বাঁধা রয়েছে। আজ আপনাকে আশ্চর্য্য করে দেবার জন্য এই দুপুরেই চলে এলুম।"

সুকুমারী কহিল, "কার্ত্তিকদা, আমার পড়তে ভাল লাগছে না, তবু সরোদি ছাড়বে না।"

কার্ত্তিক কহিল, "যারা মাষ্টার হয়, তাদের ঐটে বড় দোষ। পড়তে ভাল লাগছে না তবু তারা পড়াবেই, বসে থাকতে ভাল লাগছে না তবু তারা বসিয়ে রাখবে, কাজ করতে ভাল লাগছে না তবু তারা বলবে, কাজ কর, কর্ত্তব্য কর, নইলে ক্ষতি হবে। সুকু, আমারও পড়তে ভাল লাগছিল না, তাই আমি পালিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। কিন্তু তুমি ছোট্ট কি না, তাই তোমার পালাবার জো নেই, এ অত্যাচার সইতে হচ্চে। কি করবে, বল, পরাধীন হওয়ার ঐটেই মস্ত দোষ।"

সরোজ কহিল, "নিজেকে বড় হয়েছি মনে করা, কর্ত্তব্যের চাইতে ওপরে উঠেছি

মনে করা, স্বাধীন হয়েছি মনে করা একটা মস্ত অহঙ্কার। আর অহঙ্কারই পতনের পূর্ব্ব লক্ষণ!"

কার্ত্তিক কহিল, "তা হবে! যে চারি দিক দিয়ে বদ্ধ,—ঘরের কোণে বদ্ধ, পরের সাহায্যের দ্বারা বদ্ধ, নিজের দৃষ্টিহীনতার দরুণ বদ্ধ, সে কেমন করে বুঝবে যে মাঝে মাঝে ছাড়া পেতে, সকল বাধা থেকে, দৃষ্টির বাধা, জ্ঞানের বাধা, কর্ত্তব্যের বাধা, সব রকম বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছে হয়। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, যা বুঝিনে, যা জানবার কোন উপায় নেই, যা একেবারে দৃষ্টির পূর্ব্বের অন্ধকারের মত সম্পূর্ণ অবোধ্য, অপ্রজ্ঞাত, সেই নিতান্তই অজানার মধ্যে আপনাকে হারাতে ইচ্ছে করে। যার বহির্দৃষ্টি নেই—"

সরোজ বাধা দিয়া কহিল, "তার অন্তর্দৃষ্টি থাকতে পারে না, সে বাইরে-ভেতরে উভয় দিকেই অন্ধ, কেমন? কার্ত্তিকবাবু, হেঁয়ালিতে কথা বলতে কবে থেকে শিখলেন? আর দীন দুঃখী অন্ধদের অন্ধতা নিয়ে নিষ্ঠুরের মত বিদ্রূপ করতেই বা কে আপনাকে অধিকার দিলে? দুপুর বেলায়, সমস্ত কর্ত্তব্য ফেলে রেখে অন্ধদের নিয়ে খেলা করতেই বা কে আপনাকে বলেছিল? আপনি মনে করছেন যে, আমি কিছুই বুঝতে পারব না? কিন্তু নিজের বিষয় অতখানি অহঙ্কার রাখবেন না, কার্ত্তিকবাবু। আমরা অন্ধ বলে এতখানি অন্ধ নই! আমি অন্ধ বলে যে একেবারে দেখতে পাইনে, তাও নয়! আমার বাইরে চোখ নেই বটে, কিন্তু যিনি সবারই পক্ষে চক্ষু-স্বরূপ, তিনি সর্ব্বদাই আমার অন্তরের মধ্যে চক্ষু হয়ে বসে আছেন। আপনি মনে করে এখানে একজন অসহায় অন্ধ নারীর কাছে আসেন, সে ভাবটা আমার অন্তরের চক্ষু স্পষ্ট দেখতে পায়। বাহিরে চোখে যা ধরা পড়ে না, ভেতরের চোখের কাছে তা খুব স্পষ্ট।"

কার্ত্তিক স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার সমস্ত অভিমান, সমস্ত দর্প এক নিমেষে মন্ত্রমুগ্ধ বিষদন্তভগ্ন সর্পের মত মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। কার্ত্তিক আর কোন কথা বলিতে পারিল না। এমন কি সেই বিস্ফারিত অন্ধ নয়নের দিকে ভাল করিয়া চাহিতেও পারিল না;—তাহার বোধ হইল, যেন ঐ অন্ধ নয়ন হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিতেছে। কিন্তু কি তাহার অপরাধ? কি অপরাধে সে এই অন্ধ নারীর অন্তরস্থ তৃতীয় নয়নের বহ্নিতে এমনভাবে দগ্ধ হইতে লাগিল?

সুকুমারী তাহাদের কথাবার্ত্তার অর্থগ্রহণ করিতে না পারিয়া বলিল, "কি হল সরোদি, তুমি কাঁপছ কেন?"

সরোজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কিছু না সুকু, চল, আমরা মার কাছে যাই, মাকে ওষুধ খাওয়াতে হবে।"

কার্ত্তিকও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি পাপে আমায় এত বড় দণ্ড দিলে?"

সরোজ কহিল, "কি পাপে? আপনি এত বড় অন্ধ যে, নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না, অথচ ঐ দুটো চোখের এতখানি গর্ব্ব করেন! নিজের দিকে চেয়ে চেয়ে আপনি এতখানি অন্ধ হয়ে গিয়েছেন যে, আপনার সমস্তই যে

মন্ত্রে টের পেতে পারে, এটুকু পর্য্যন্ত আপনি বুঝতে পারেন না! আমি কি একটা খেলার পুতুল যে দুদণ্ড খেলা করবার জন্য আমার কাছে আপনি ছুটে আসবেন, আর আমি তাই সহ্য করব?"

কার্ত্তিক কহিল, "খেলা! আমি তোমায় নিয়ে খেলা করতে আসি! তোমার কাছে আসি বলে আমার ইহকাল পরকাল দুইই যেতে বসেছে! আমার দেবতার মত পিতা —তিনি আমায় ত্যাগ করতে উদ্যত, আমার পরম-হিতৈষী পিতৃতুল্য কালিকাবাবু আমার জন্য কাঁদছেন, আর হয়তো শৈলজাও আমার জন্য পথ চেয়ে বসে আছে। তোমার ঐ অবাধ্য অন্ধ নয়ন দিয়ে তুমি আমায়—"

সরোজ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "এতেও বুঝতে পারছেন না, আপনি কতখানি অন্ধ! আপনার উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতা যে আমার চাইতেও আপনাকে অন্ধ করেছে। যে নিজের জন্য সকল হিতৈষী বন্ধু আত্মীয়ের ভালবাসাকে তুচ্ছ করতে পারে, সে মানুষ নয়। আপনার নিজের অন্তরের দিকে ভাল করে না চেয়ে এই মন নিয়ে কি করে রোজ আমার কাছে আসতেন—আর আমিই বা কি করে সব বুঝে সব জেনেও আপনাকে সহ্য করেছি, এইটেই আমার ভারী আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে! কিন্তু আর না, আর আমি আপনাকে কাছে আসতে দেব না। যে নিজের বাপ-মার নয়, বন্ধুর নয়, আত্মীয়ের নয়, এমন কি প্রাণ-দিয়ে-ভালবাসারও নয়, সে কোন্ সাহসে অসহায় পরনির্ভরশীল অন্ধের কাছে আসে?"

কার্ত্তিক অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "সরোজ, ক্ষমা কর। আর আমি এখানে আসব না। কিন্তু ঠিক জেনো যে তুমি আমার পক্ষে যত দুর্ল্লভ হয়ে উঠছ, ততই আমায় নির্দ্দয় ভাবে আকর্ষণ করছ। তুমি না চাইতে আমি আপনাকে দিয়েছি, এই আমার অপরাধ! তুমি লভ্য নও, তুমি নিতান্তই অন্ধকারের মত অবোধ্য, তাই তোমার এতখানি শক্তি! তোমায় বুঝতে পারি না তাই আসি। বুঝতে পারলে হয়তো আসতুম না। তুমি আমায় চাও না, তাই তুমি আমায় টানছ। যাক্, আবার কি বলতে কি বলব! আমি চলে যাচ্ছি, তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য কর। কর্ত্তব্যই তোমাদের কাছে যখন বড়, তখন আমার মত কর্ত্তব্যহীন বন্ধনহীন সংসার-থেকে-সম্পূর্ণ-বিচ্ছিন্ন জীব তোমার নিয়মে-বাঁধা জগতের মধ্যে বিপ্লব বাধাতে আর আসবে না।"

কার্ত্তিক চলিয়া গেল। সুকুমারী সরোজের হাত ধরিয়া টানিল। কিন্তু সরোজ বেঞ্চ খানার উপর অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইল। সুকুমারী বলিল, "এস সরোদি, মার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে যে।"

সরোজ ভাবিল, ঠিক্, ওষুধ খাবার সময় হয়েছে! ওষুধ তেতোই হয়! প্রকাশ্যে বলিল, "বিন্দুকে ডেকে দাও, ওষুধ খাওয়াক্। আমি একটু পরে ওঁর খাবার তৈরি করে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি যাও সুকু, খেলা করগে।"

সুকুমারী চলিয়া গেল, কিন্তু সরোজ উঠিল না। তাহার অন্তরের অন্ধকার

ঘনতর হইয়া আসিয়াছে। যে আলো আসিতে চাহিতেছিল, সবলে সেই আলোর প্রবেশ-দ্বার সে আজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সে চির-অন্ধকারের জীব, কাজ কি তার ক্ষণিকের আলোয়? কিন্তু মন যে কিছুতেই থামিতে চায় না! ঐ যে পদ-শব্দ ক্রমেই দূরে মিলাইয়া গেল, তাহার অশ্রুত ধ্বনির পিছনে অ-বদ্ধ মনটা কেবলই যে ছুটিতে চাহিতেছে! আর একবার মাত্র—একটীবার ঐ অতি-পরিচিত পদধ্বনি শুনিবার জন্য যে তাহার অন্তরের নির্ব্বাক অন্ধকার গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে! কেহ ত অন্ধের পানে আর অমন করিয়া চাহিয়া হৃদয়ের আলো লইয়া অন্ধকার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিবে না! জগতে তাহাকে অমন প্রাণ দিয়া চাহিবে, এত বড় হতভাগা ত আর একটাও এ সংসারে পাওয়া যাইবে না! তবে সে ঐ একটী মাত্র হতভাগ্যকে কেন এমন করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিল?

আলো আসিতে আসিতে অর্দ্ধ পথে তাহারই ফুৎকারে নিবিয়া গেল! হায় আলো,—হায় অন্ধকারের চির-প্রার্থিত বস্তু, হায় আঁধার ঘরের কুড়াইয়া-পাওয়া মাণিক, তোমায় চাহি না,—এইটাই তুমি বুঝিয়া গেলে? হায় অন্ধতা, তুমি কি এমনি অন্ধকার যে তোমার কিছুই সে কখনও বুঝিতে পারিবে না? তুমি কি চির-দিনই মৌন নির্ব্বাক থাকিয়া যাইবে?

৯

শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন পুত্রের পত্রের উত্তর পাঠাইয়া মনোরমা দেবীকে বলিয়া দিলেন, সে দিন হইতে কার্ত্তিকের নাম যেন তাঁহার গৃহে আর না লওয়া হয়। মনোরা দেবীর মনে হইল সংসারের যত-কিছু কাজ-কর্ম্ম ছিল, সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে—এখন একটা মস্ত ছুটির দিন আসিয়াছে। আর কাহারও জন্য কিছু করিতে হইবে না, কাহারও আশায় বসিয়া থাকিতে হইবে না, আশা-আশঙ্কা-উদ্বেগাদির দায় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি গৃহ-দেবতার সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন। বাড়ীর সর্ব্বকর্ম্মের দাসী—লক্ষ্মীরা মা বারম্বার ঠাকুর-ঘরের দ্বার হইতে ফিরিয়া গিয়াছে। ঠাকুর বাড়ীর ব্রাহ্মণ দরোয়ান মা ঠাকুরাণীর রন্ধনের জন্য জল তুলিয়া দিয়া গিয়াছে, এমন কি দেওয়ান-গৃহিণী নিস্তারিণী দেবীর দাসী ক্ষেমীও নানা অছিলায় আসিয়া বারম্বার শুনাইয়া দিয়া গিয়াছে, এ সমস্তই শঙ্করানন্দের অভিশাপের ফল,—তবুও মনোরমা দেবী উঠিলেন না। সমস্ত সংসার ব্যাপিয়া একটা বিরাট জড়তা, গুরুভার আলস্য চাপিয়া বসিয়াছে। পত্নীর অবস্থা দেখিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এমন করলে ত চলবে না মনোরমা। আমরা আহারাদি ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু ছাত্রেরা কি দোষ করেছে? তাদের দুবেলা দু মুঠো যদি না দিতে পার তা হলে তাদের বিদায় দিতে হয়। তুমি কি আমায় পৈতৃক বৃত্তি লোপ করাতে চাও?"

মনোরমা দেবী না উঠিয়া বলিলেন, "আর কার জন্য ও-সব? সব উঠিয়ে দাও।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কি! পুত্রের অপরাধে পিতৃ-পিতামহের নাম লোপ করব? তার পূর্ব্বে বরং তোমাকেও ত্যাগ করতে পারি!"

মনোরমা দেবী কহিলেন, "যে স্ত্রী এত বড় পিতৃদ্রোহী সন্তানের জননী, তাকে যে স্ত্রী বলে এতদিন স্বীকার করেছ, এই তার পক্ষে যথেষ্ট, এখন তাকে বিদায় দাও, কিম্বা সংসারের পেট-ভাতায় দাসী করে রাখ, দুই সমান।"

শিবচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরবে পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কত বড় আত্মধিক্কারে যে মনোরমা দেবী ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন, তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তিনি তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষ্য করে আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলাম না, মনোরমা। যে সন্তান তার পিতার এত বড় অপমান করলে, যে সন্তান তার বাপের এত বড় ধর্ম্মচ্যুতির কারণ-স্বরূপ হল, তার জন্য দুঃখ করাই দুঃখের অপমান! তুমি ওঠো, তুমি এমনভাবে অন্নজল ত্যাগ করে থাকলে গৃহদেবতা ক্রুদ্ধ হবেন। সংসারে থাকতে হলে অনেক রকম দুঃখ সইতে হয়, তা বলে ধর্ম্ম-ত্যাগ কর্ত্তব্য-ত্যাগ করবার অধিকার কারও নেই। ওঠো মনোরমা।"

স্বামীর কাতর অনুনয়ে মনোরমা দেবী আজ তিন দিনের পর কাঁদিয়া ফেলিলেন। আজ তিন দিন হইতে যে অশ্রু অবরুদ্ধ হইয়া অন্তর্লীন অগ্নির মত তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছিল, সেই অশ্রু প্রবাহিত হইয়া বুক ভাসাইয়া দিল। অপমানিত মাতৃ-হৃদয় যে অশ্রুকে ঘৃণায় চাপিয়া রাখিয়াছিল, আজ আর তাহা বাঁধন মানিল না। মনোরমা দেবী দেবতার সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন, "আমায় নাও, দেবতা।"

ন্যায়রত্নের গৃহের সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া কালিকামোহন তাঁহার কন্যাকে মনোরমা দেবীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। শৈলজা আসিয়া মনোরমার পদতলে প্রণাম করিবামাত্র তিনি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শৈলজাও তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার মত একটী কথাও খুঁজিয়া না পাইয়া কেবল মনোরমা দেবীর অশ্রুতে অশ্রু মিশাইয়া বসিয়া রহিল। এইরূপে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া পরে অশ্রু মুছিয়া সে বলিল, "মা, আপনি ব্যস্ত হবেন না, বাবা বলেছেন, সমস্তই আবার ঠিক হয়ে যাবে।"

মনোরমা দেবী তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, "যে অন্ধ তার হাতের কাছে এত বড় মাণিক থাকতে আলেয়ার পেছনে ছোটে, তার জন্য আশা করাও আশার অপমান! যাও মা, আমাদের আশা আর করো না। তোমার বাবাকে বলো, সেই মহাপাপিষ্ঠের আশা তিনি আর না করেন। অযোগ্য পাত্রের জন্য এমন কন্যাকে অবিবাহিত রাখা অন্যায়। আমাদের পাপে তোমরা কেন কষ্ট ভোগ কর?"

শৈলজা অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে বলিল, "তা হয় না মা, বাবা বলেন, বামুনের মেয়ের বাগ্‌দত্তা হওয়া যা, বিয়ে হওয়াও তাই।"

মনোরমা দেবী কহিলেন, "শাস্ত্রে কি আছে জানিনে, কিন্তু তাই বলে মেয়েকে জলে ফেলে দিতে বলতে পারিনে ত। এর

পরও যদি তোমার বাবা সেই লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেন, তাহলে যে তোমায় জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে। যার এমন বাপ কেউ নয়, সর্ব্বানন্দর মত বন্ধু কেউ নয়, তোমার বাবার মত এত বড় হিতৈষীও কেউ নয়, সে কি জীবনে কখনও কারও হবে? তাকে আপন করা কারও সাধ্য নয়।"

শৈলজা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তবু তিনি আপনাদেরই সন্তান, সেটা-ত মিথ্যা নয়। একবার যদি ক্ষণিকের মোহে তাঁর একটা ভুল হয়ে থাকে, তাই বলে কি তাঁকে আপনারা একেবারেই ত্যাগ করবেন? আপনারা ত্যাগ করলে তাঁর যে আর কোন উপায় থাকবে না।"

মনোরমা শৈলজার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ পরম স্নেহে চাহিয়া রহিলেন, পরে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া কতকটা আত্মগতভাবে বলিলেন, "আশা আছে—আশা আছে—এই তুমিই আমার একমাত্র আশা!" শৈলজা লজ্জিত হইয়া বলিল, "এখন তাহলে আসি, মা একা আছেন।"

শৈলজা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

* * *

এদিকে নিস্তারিণী দেবী দেওয়ান দুর্গা-শঙ্করকে ধরিয়া বসিলেন, এই সময়ে মণিশঙ্করের সহিত শৈলজার বিবাহের চেষ্টা কর। দুর্গাশঙ্কর বলিলেন, "কেন, শৈলজার অপরাধ? কার্ত্তিকের উপর তার বাপ রাগ করেছে বলে কি শৈলজার আর সৎপাত্র জুটবে না?"

এই উত্তরের ফলে দুর্গাশঙ্করবাবুকে সে দিনটি যেরূপ অশান্তিতে কাটাইতে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন; এবং পরে যে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিয়া নিস্তারিণী দেবীর কথানুযায়ী কার্য্য করিতে হইয়াছিল, সে কথা বলা বাহুল্য।

সন্ধ্যার পর তিনি টোলে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট অতি লজ্জিতভাবে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন, "দেওয়ানজী, আপনি অমন করে এসে বসলেন যে, আমায় সান্ত্বনা দিতে এসেছেন?" দেওয়ান লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, তা নয়, আমিই কোন প্রার্থনা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "প্রার্থনা! আমার কাছে? কি প্রার্থনা, বলুন।"

দেওয়ানজী কহিলেন, "কিন্তু বলতে ভয় হচ্চে, পাছে আপনি রাগ করেন!"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "রাগ করব! এমন কি প্রার্থনা? বলুন, সাধ্যাতীত না হলে নিশ্চয় তা পূরণ করবার চেষ্টা করব।"

দেওয়ানজী কহিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার এইটুকু কথাই যথেষ্ট। আমি প্রার্থনা করছি যে আমার মণির সঙ্গে শৈলজার বিবাহের সম্বন্ধ করে দিন।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "আপনার মণির সঙ্গে? কি ভয়ঙ্কর! শৈলজার কোষ্ঠীতে কি সৎপাত্র জোট্‌বার মোটেই আশা নেই! আপনিই বলুন, মণির মত পাত্রের সঙ্গে—আপনার যদি কোন কন্যা থাকত—তার বিয়ে দিতে পারতেন?"

দেওয়ানজী কহিলেন, "কিন্তু আমি পিতা।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "তেমনি শৈলজাও কোন পিতার সন্তান। আমি বললেও তিনি জেনে-শুনে কেমন করে এমন অসৎপাত্রে মেয়ে দেবেন?"

দেওয়ানজী কহিলেন, "সৎপাত্রও যেমন পিতৃদ্রোহী কুসন্তান হতে পারে, অসৎপাত্রও তেমনি সঙ্গ সময় ও অবসরের গুণে সৎপাত্র হতে পারে।"

শিবচন্দ্র আহত হইয়া বলিলেন, "দেওয়ানজী, এ আঘাত আমার প্রাপ্য বটে; আপনি ঠিকই করেছেন। আমার যেমন অহঙ্কার তেমনি তার উপযুক্ত প্রতিফল দিয়েছেন। আচ্ছা, বেশ আমি চেষ্টা করব, যথাসাধ্য চেষ্টা করব, যাতে মণির সঙ্গে শৈলজার বিয়ে হয়। কিন্তু—"

দেওয়ানজী কহিলেন, "কিন্তুর বিষয় আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, ন্যায়রত্ন মশায়, কিন্তুর বিষয় আমার সমস্তই জানা আছে। আমি পিতা বলে এত বড় অন্ধ নই যে আমার ঐ বর্ব্বর সন্তানের কোন্ জায়গায় 'কিন্তু' আছে, তা দেখতে পাইনে। কিন্তু তবু আমি ওর জন্মদাতা, ওর পাপের ভাগ আমাকেও কতক বইতে হচ্চে এবং হবেও। তবু ওকে ত্যাগ করতে পারিনে। আপনার মত ন্যায়ের তুলা-দণ্ড ধরে কোন পিতাই বসে থাকতে পারে না। বাপ যখন পুত্রের জন্ম দিয়েছে, তখন পুত্রকে ধূলোমাটী-শুদ্ধ প্রাণপণে কোলের মধ্যে ধরে' পরের আঘাত থেকে তাকে বাঁচাতে সে বাধ্য! ভগবান যেমন ন্যায়-অন্যায়, বস্তু-অবস্তুর বিচার করবার ক্ষমতা মানুষকে দিয়েছেন, তেমনি একটা অন্ধ প্রবৃত্তিও তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন, সেটার নাম স্নেহ। ভগবান যেমন ধূলো দিয়ে রাস্তার কঠোরতা বন্ধুরতা ঢেকেছেন, তেমনি স্নেহ দিয়ে সংসারের ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বন্ধুরতাও কতকটা দূর করেছেন। ধূলোয় চোখ অন্ধ করে দেবে, পথ দেখতে দেবে না, তবু তাকে ছাড়বার জো নেই, ঝাড়বার উপায়ও নেই। ঝাড়লে সে ধূলো আরও নাকে-মুখে ঢুকবে।"

দেওয়ানজী ন্যায়রত্নকে নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেলেন। শিবচন্দ্র প্রতিনমস্কার বিস্মৃত হইয়া শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠিক! ধূলা ঝাড়িতে গেলে আরও নাক-মুখ দিয়া সে প্রবেশ করে! তা করে বটে! শিবচন্দ্র প্রাণে-প্রাণে তাহা অনুভব করিতেছেন! হায় ধূলা, হায় পথ-ভুলানো, সব-ভুলানো অন্ধ-করা ধূলা, তোর হাত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ নাই!

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা

ভারতীয় মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচার-ব্যবহার

যে দ্বিতীয় ধর্ম্ম ভারতে সংরক্ষিত হইয়াছে তাহা "ইস্‌লাম"। শেষবারের আদম সুমারি-অনুসারে, ঐ ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ৬২ লক্ষ। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে, কাশ্মীরে প্রত্যেক দশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে,--৭০৫১ জন; সিন্ধুদেশে ৭৭১৩ জন; পঞ্জাবে ৪১৭০ জন; কোটায় ৩২৮৫ জন, বাঙ্গলায় ৩২৮৫ জন মুসলমান, (প্রাচ্যখণ্ডের বুনো জাতের মধ্যেও ইসলাম-ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছে); এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে কেবলমাত্র ৬৩১ জন ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ৮০৫ জন মুসলমান গণনায় ধৃত হইয়াছে।

ইস্‌লামের ৬২ সম্প্রদায়ের মধ্যে সব সম্প্রদায়ের লোকই ভারতে আছে; তবে, শুধু চারি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-সংখ্যার বিশেষরূপ আধিক্য ও প্রাধান্য লক্ষিত হয়; একদিকে শিয়াসম্প্রদায়ের লোক; অপর দিকে সুন্নিসম্প্রদায়ের লোক; আবার এই সুন্নিসম্প্রদায় তিনটি বিশেষ আকারে পরিচিতঃ—প্রাচীনতন্ত্রী, ওহাবী, ও ফেরাজি। কিন্তু বস্তুত, অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান প্রাচীনতন্ত্রী সুন্নি-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

কোরাণের অদৃষ্টবাদ, সুফীদিগের নিষ্ক্রিয় ধ্যান-বাদ, ভারতীয় মুসলমানদিগের উপর একটা শোচনীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; শিক্ষালাভের দিকে তাহাদের চেষ্টা নাই; শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যে তাহাদের তেমন-বেশী উদ্যম নাই; তাহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে কদাচিৎ যোগ দেয়।

সাধারণভাবে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধিসত্ত্বেও, ইস্‌লাম অবনতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইস্‌লামের অনুবর্ত্তিগণ বিজ্ঞানচর্চ্চায় বিমুখ (যে বিজ্ঞানশাস্ত্রে আরবেরাই প্রথম পথপ্রদর্শক ছিল) এবং সাহিত্য-বিভাগেও উহাদের রচিত কোন চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের আইনসংক্রান্ত ও ধর্ম্মতত্ত্বসংক্রান্ত গ্রন্থগুলি—প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের অলস ভাষ্য মাত্র। সাম্প্রদায়িক বাদানুবাদের মধ্যে, কোন উদারভাবের বিকাশ নাই, কোন নূতন কথা নাই।

সমস্ত সাধারণ মুসলমানের মধ্যে, চাষা ও নগরবাসীর পার্থক্য লক্ষ্য করা আবশ্যক। নগরবাসী মুসলমানেরা, উপবাস ও দৈনিক ভজনাসংক্রান্ত সমস্ত আদেশ পালন করে; পৌত্তলিকতা হইতে আপনাদিগকে বাঁচাইয়া চলে; ইহার বিপরীতে, উহাদের ধর্ম্মোন্মত্ততা খুব বেশী; উহাদের সংখ্যা অধিক্য হওয়ায়, উহারা হিন্দুদিগকে নিশ্চয়ই আক্রমণ করিত; কেবল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনে আক্রমণ করিতে পারে না।

লাহোরে, গ্রীষ্মকালের রাত্রে উহাদের যেরূপ প্রার্থনা হয়, M. Rudyard Kipling তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

মিনারেটের উপর হইতে, চন্দ্রালোকে, "ভীষণ নৈশ নগরটি" দেখা যাইতেছে।

"চন্দ্রের ছায়া ও আলোকের মধ্যে হাজার হাজার লোক নিদ্রা যাইতেছে—এই দৃশ্যটি চিত্র করিতে গেলে একজন Doré-র দরকার; বর্ণনা করিতে গেলে, একজন Zola-র দরকার। গৃহের ছাদগুলা, পুরুষ, রমণী ও বালকবৃন্দে ভারাক্রান্ত; আকাশ অস্পষ্ট কোলাহলে পরিপূর্ণ। ভীষণ নৈশ নগরটি সমস্তই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কি করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিব?—এখনো যে উহাদের শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছে—ইহাই আশ্চর্য্য···আলোকের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত নগর, সমস্ত ময়দান—(কোথাও কোথাও প্রাচীরের বাহিরে, রাভী-নদীর এক প্রান্তে) মনে হইতেছে যেন—চন্দ্রকে নির্দ্দয়রূপে নিঃশেষে ভোগ করিতেছে। চন্দ্রের উপর উহাদের একটুও যেন মায়া-দয়া নাই; একটা হাল্‌কা মেঘে চাঁদ ঢাকিয়া গেল। রাত্রে যে-সহরকে, যে সকল অধিবাসী লোককে সাদা কালো রেখায় স্পষ্ট দেখা যায়—সেই সহর ও সহরের অধিবাসী লোক ক্রম-ঘনায়মান অন্ধকারে একেবারে যেন মুছিয়া গিয়াছে··· প্রাঙ্গণে কাহার যেন পদশব্দ শুনা যায়। মুয়েজ্জিন্। মুয়েজ্জিন্ অন্তর্হিত হইল। তার পর ষাঁড়ের গর্জ্জনের মত একটা গর্জ্জন; মুয়েজ্জিন্ মিনারেটের চূড়ায় এই মাত্র উঠিয়াছে। শব্দটা যাহাতে রাভীর তীর পর্য্যন্ত পৌছায় (রাভীর জল কমিয়া গিয়াছে) এইরূপ ভাবে সে চীৎকার করিতেছে। মেঘটা চলিয়া গেল। ঐ দেখ স্বচ্ছ আকাশের গায়ে মুয়েজ্জিনের ছায়া-চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছেঃ —দুই হাত কাণে লগ্ন; ফুসফুসের প্রয়াসে, বিশাল বক্ষদেশ ফুলিয়া উঠিতেছে। "আল্লা-হো-আক্‌বর"। একবার চীৎকারটা থামিল;—তখনই আবার "স্বর্ণ-মন্দিরে"র দিকে, আর এক মুয়েজ্জিন উহারই আবৃত্তি করিলঃ—"আল্লা-হো-আক্‌বর"। আরও এক-বার, আরও একবার—সব শুদ্ধ চারি বার। এরই মধ্যে ১০।১২ জন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেঃ —"আমি সাক্ষ্য দিতেছি; এক ঈশ্বর বই দুই ঈশ্বর নাই—তিনিই ঈশ্বর"। এই চীৎকারের কি মাহাত্ম্য! এই গভীর রাত্রে কত শত লোককে তাহাদের শয্যা হইতে ছিনিয়া আনিয়াছে!···নগরের সকল মুয়ে-জ্জিনেরাই এইরূপ আহ্বান পাঠাইতেছে, আহ্বানের হাঁক দিতেছে; ছাদের উপর লোকেরা নতজানু হইতে আরম্ভ করিয়াছে। একটা দীর্ঘ বিরাম,—একটা শেষ হাঁক্; "লা-ইলাহা-ইল্লালা", তার পর চারিদিক নিস্তব্ধ···"

সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামে ধর্ম্মটা আরও কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মান্ধ ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানেরা, পশ্চিম সীমাপ্রান্তের যুদ্ধপ্রিয় জাতিরা, কুক্কুর-স্পর্শবৎ হিন্দুর স্পর্শ হইতে দূরে পলায়ন করে। উহারা মুল্লাকে যাদুকর বলিয়া জানে। উহাদের নিকট ইসলাম ধর্ম্মের এইরূপ পরিণতি হইয়াছে।

"বাল্লুচি"দিগের সম্বন্ধে Sir Herbert Edwards এই কথা লিখিয়াছেনঃ—

তাহাদের নিকট গোলাগুলির সোঁ সোঁ শব্দ, নগ্ন তলোয়ারের বিজ্‌লি-চমক্ ভয়ের বিষয় নহে; শোণিত তাহাদের নিকট শুধু একটা লাল তরল পদার্থমাত্র; একটা

শসা কাটাও যা, একটা মাথা কাটাও তা ;—গুরুত্বে কোনটাই কম বেশী নহে। কিন্তু আরবী ধরণের কোন অভিশম্পাৎ···কোন ক্রোধান্ধ সাধুর থুৎকার বড়ই ভীষণ; "হাজি",—যিনি উষ্ট্র ও মেষের গাত্রে চর্ম্মরোগ আনয়ন করেন সেই হাজির যাদুমন্ত্রের নিকট, তলোয়ার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে, জানুদ্বয় কাঁপিতে থাকে। (১)

এমন কি, ভারতের মধ্যেও—বিশেষত যেখানে মুসলমানের সংখ্যা কম,—ইস্‌লাম ধর্ম্ম এরূপ কলুষিত ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাকে আর চেনা যায় না। তাহাদের মধ্যে না-আছে উপবাস, না-আছে প্রার্থনা-মন্ত্রপাঠ। আছে শুধু বলিদান, শোভাযাত্রা, মৃত পীরপয়গম্বরের দেহাবশেষের পূজা-অর্চ্চনা; মুসলমান পীরদিগের আস্তানায় কখন-বা তীর্থযাত্রা (যাঁহাদের দেহ হইতে অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হয়); কখন বা হিন্দুদের মন্দিরেও তীর্থযাত্রা। যে সকল গ্রামে হিন্দুর বসতি নাই সেখানেও ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তি আছে; এই সকল বিগ্রহের পূজা-অর্চ্চনা, ও গার্হস্থ্য ক্রিয়া-কলাপের জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়া থাকে।

হিন্দুদের দৃষ্টান্তে, মুসলমানেরাও আপনাদের মধ্যে জাত গড়িয়া তুলিয়াছে, কিন্তু উহাদের নিয়মগুলা ততটা কড়াকড় নহে এবং বিভিন্ন জাতের লোকদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। যে সকল প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা সমধিক সেই সকল প্রদেশ ছাড়া অন্য সর্ব্বত্র মুসলমানদের ধর্ম্মে মত্ততা লোপ পাইয়াছে। অনেক সময়ে, হিন্দু-মুসলমান একই গ্রামে বাস করে এবং সদ্ভাবে বাস করে। ঐ সকল মুসলমানের মধ্যে তেমন ধর্ম্মোৎসাহ নাই; নীচ জাতির লোক ছাড়া, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের বন্য জাতির লোক ছাড়া তাহারা আর কাহাকেও বড় একটা মুসলমান করিতে চেষ্টা করে না। (২)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

(১) পঞ্জাবের Census Report.

(২) পঞ্জাবের Census Report-এ, Ibbetson লিখিয়াছেন :—

"এই পরিচ্ছদের আরম্ভে অবশ্য কতকটা অত্যুক্তির সহিত বলিয়াছিলাম যে, হিন্দুধর্ম্মের সহিত জাতের বন্ধনটা খুবই শিথিল এবং হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, উহাতে জাতের কোন হানি হয় না। আমার এই কথাটা এখন কি পরিমাণে বদলান উচিত তাহারই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইব। পূর্ব্বপূর্ব্ব প্যারাগ্রাফে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি,—উচ্চশ্রেণীদিগের মধ্যে আভিজাত্যের অহঙ্কার, নীচ শ্রেণীদিগের মধ্যে কতকগুলি ব্যবসায়ের প্রতি অবজ্ঞা—এই দুইটি মুখ্য উপাদান সকল সমাজেই সামাজিক পদমর্য্যাদা প্রদান করিয়া থাকে। বর্ণভেদপ্রণালীকে পরিপুষ্ট করিতে গিয়া, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আর কিছুই করে নাই, কেবল কতকগুলা বিধি ও নিষেধের দ্বারা, বিবিধ ব্যবসায়ের কুলক্রমিকতা ও পদমর্য্যাদা দৃঢ়ীকৃত করিয়াছে মাত্র...আমার মতে, এই একমাত্র বন্ধন-সূত্রেই বর্ণভেদ-প্রণালী, হিন্দুধর্ম্মের সহিত আবদ্ধ; এবং ইহা স্বতই প্রতীতি হইবে, কোন সামাজিক প্রণালীর মধ্যে, কতকগুলা বিধিনিষেধ ও কুসংস্কার বদ্ধমূল হইলে, কেবল ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন সেই সমস্তের প্রকৃতিতে ও ক্রিয়াফলে বলপূর্ব্বক কোন পরিবর্ত্তন আনিতে পারে না। বস্তুত, পঞ্জাবের পূর্ব্বাংশে, ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের দরুণ ধর্ম্মান্তরিত ব্যক্তির জাতের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। রাজপুত মুসলমান, গুজর মুসলমান, জাট মুসলমান,—সামাজিক পদমর্য্যাদার হিসাবে, শাখাজাতির হিসাবে, রাষ্ট্রনীতির হিসাবে, রাষ্ট্র হিসাবে, তাহারা রাজপুতই রহিয়া গিয়াছে, গুজরই রহিয়া গিয়াছে, জাটই রহিয়া গিয়াছে; তাহাদের হিন্দু ভাইদিগের মত সর্ব্বাংশেই সমান। উহাদের সামাজিক প্রথাদি পরিবর্ত্তিত হয় নাই, শাখাজাতি-সংক্রান্ত নিষেধ-বিধির কঠোরতা কিছুমাত্র কমে নাই, বিবাহ ও কুলক্রমিকতার নিয়মের কিছুমাত্র বদল হয় নাই।"

যশোহর

বড় ইচ্ছা ছিল, এই সম্মেলন উপলক্ষে একবার যশোহর দর্শন করিয়া আসি। অল্পদিন হইল যশোহর খুলনা দুইটি স্বতন্ত্র জেলা হইয়াছে। পূর্ব্বে খুলনা যশোহরের অন্তর্গত ছিল। খুলনাতেই আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণের নিবাস। খুলনার অন্তর্গত পয়গ্রামে লক্ষ্মণসেনের সুহৃদ্‌কবি ধোয়ীর পৌত্র হিঙ্গু আসিয়া বাস করেন। হিঙ্গু আমাদের পূর্ব্বপুরুষ। পিতৃপুরুষের নিবাসভূমি এই উপলক্ষে দেখিয়া আসিব সংকল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় শারীরিক অসুস্থতার জন্য পারিলাম না।

সম্প্রতি কয়েকটি প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরিতেছে, আমি তাহাদের সমাধান করিতে পারি নাই।

বঙ্গের বৈদ্যকায়স্থগণের কুলীনদের আদি নিবাস যশোহর। ব্রাহ্মণ কুলীনগণেরও অনেকেরই আদি-স্থান যশোহর। কুলীন সমাজকে এখানে কে আহ্বান করিয়া আনিলেন? কোন্ রাজশক্তির প্রভাবে তাঁহারা যশোহর খুলনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন? তাঁহারা কি আকর্ষণে গঙ্গাতীর ত্যাগ করিয়া ভৈরব-তীর আশ্রয় করিলেন?

যশোহর-খুলনার ইতিহাস প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আমি সতীশবাবুকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি চিন্তা করিবার প্রতীক্ষা না করিয়া বলিয়াছিলেন, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দ্বারা কুলীনসমাজ এই প্রদেশে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে বলিলাম, আমার পূর্ব্বপুরুষ হিঙ্গু যখন পয়গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন, সেই সময় হইতে প্রায় ৭০০ শত বৎসর অতীত হইয়াছে, এবং আমাদের বৈদ্যগণের অনেকের পূর্ব্বপুরুষই প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে রাঢ় দেশ ত্যাগ করিয়া খুলনায় বাস স্থাপন করিয়াছেন, তখন সতীশবাবু নীরব হইয়া ভাবিতে বসিলেন।

প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক কবি রাম-কৃষ্ণের 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে লিখিত আছে সেনহাটী গ্রাম লক্ষ্মণ সেন পত্তন করেন। এই কথা মহাকোষ বিশ্বকোষে লিপিবদ্ধ আছে।

এই কথা যদি সত্য হয়, তবে সেনহাটী ও তৎপার্শ্বস্থ গ্রামগুলিতে সমস্ত বঙ্গীয় কুলীন বৈদ্যগণের সংশ্রবের একটি সূত্র

খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক কাশী ও কুশলী এই দুই ভ্রাতার মধ্যে কুশলী সেনহাটীতে আগমন করেন। সমস্ত বঙ্গজ বৈশ্যসমাজের শীর্ষস্থানীয় কুলীনগণ সেনহাটীতে লক্ষ্মণসেনের সময় বসতি স্থাপন করেন; ইহাঁদিগকে লইয়া লক্ষ্মণসেন সেনহাটী পত্তন করেন। সেনহাটী গ্রামের নিকটবর্ত্তী "সেনের বাজার" সম্বন্ধে প্রাচীন কিংবদন্তী এই যে এই বাজারটিও লক্ষ্মণ সেনের প্রতিষ্ঠিত। সেনহাটীর চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির নাম সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় এতদ্দেশে একদা কোন রাজচক্রবর্ত্তী বাস করিয়াছিলেন। কোন সামরিক গৌরব সেনহাটীর নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিকে বিজয়-চিহ্নিত করিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। কিন্তু 'দেবভাগ,' 'ঘাটভোগ,' 'পিঠাভোগ' প্রভৃতি নাম দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে এই দেশে বড় বড় দেবমন্দিরের দেবতাদিগের ভোগের জন্য বহুবিধ গ্রাম এককালে কোন রাজা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এক সময়ে আমি এ বিষয়টির চর্চ্চা করিয়া বহু গ্রামের নাম পাইয়াছিলাম যাহা দ্বারা আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে কোন ভোগ-সুখ-বিমুখ শান্তি-প্রিয় রাজচক্রবর্ত্তী কুলীন ও পণ্ডিতগোষ্ঠী পরিবৃত হইয়া সেনহাটীর নিকটে বাস করিয়াছিলেন। সেই গ্রামের তালিকাটি আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি, আজ আমার এই প্রবন্ধটি দ্বারা শুধু সকলকে পুনরায় এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি মাত্র।

স্থানীয় প্রাচীন লোকদিগের মুখে আমি শুনিয়াছি সেনহাটীর পার্শ্ববর্ত্তী বহু ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণসেনের নিকট হইতে ভূমিদান পাইয়াছিলেন। সেই সকল ভূমিদান-পত্রের কিছু কিছু চেষ্টা করিলে এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন, লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ হইতে বিতাড়িত হইয়া "সাখ্‌নাট" নামক স্থানে প্রস্থান করেন। এই সাখনাট শব্দের সঙ্গে সেনহাট বা তন্নিকটবর্ত্তী সেখহাট গ্রামের নাম-সাদৃশ্য কিছু আছে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু আমার মনে হয়, লক্ষ্মণসেন জীবনের চরম-দশায় হৃতরাজ্য ও বিতাড়িত হইয়া স্বজনবর্গের সহিত খুলনায় অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, "বারেন্দ্র কায়স্থ, বৈদ্য, বৈদিক ব্রাহ্মণ। বল্লাল-মর্য্যাদা না লইল তিনজন॥" বল্লাল ইহাঁদিগকে মর্য্যাদা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। উত্তরকালে যখন রাজধানী শ্রীহীনা হইল, তখন লক্ষ্মণসেন সমস্ত জাতির কুলীনদিগকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তাঁহাদের কুল অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এই নিয়ম করিয়া তাঁহাদের প্রীতি-আকর্ষণ করিলেন। বল্লালের সময় যে কৌলীন্য-মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, লক্ষ্মণসেন এই ভাবে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। যে উৎস হইতে বঙ্গীয় প্রধান সামাজিকগণের কুলগঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই সেনবংশীয়কে আশ্রয় করিয়াই তাহা বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইল। যখন বিপৎকালে লক্ষ্মণসেন কুলীন-সম্প্রদায়কে এই মহাবর প্রদান করিয়া আহ্বান করিলেন, তখন তাঁহারা রাজচক্রবর্ত্তীর ছত্রের নীচে একত্র

হইয়া যশোহরে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই যশোহর আদি বঙ্গ। সে সভা জয়দেব, উমাপতি, ধোয়ী, শরণ, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি কবি-কাকলীতে মুখরিত ছিল, সেই সভা নবগুণসম্পন্ন পণ্ডিত ও চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণ উজ্জ্বল করিলেন। লক্ষ্মণসেন মহাবীর ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আমরা বীর বলিয়া চিনি নাই। তাঁহার সভা "ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলনকোমল" রাধাকৃষ্ণ-লীলার কুঞ্জসদৃশ ছিল, তাহা হইতে পবনদূত প্রেরিত হইয়া প্রেমকথা দিগঙ্গনাদিগকে শুনাইয়া আসিত, তাহা বঙ্গের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের পবিত্র তীর্থ ছিল, কারণ আমাদিগের আদিপুরুষ নবগুণসম্পন্ন কুলীনগণের পদরজঃপাতে তাহা পবিত্র হইয়াছিল।

এই জন্যই যশোহর কুলীনগণের আদিস্থান, বিক্রমপুর নহে। বঙ্গসমাজের গৌরব যশোহর, বিক্রমপুর নহে।

সেনহাটী গ্রামের বিজয়তলায় অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নে যে চণ্ডী পড়িয়া আছেন, উহাই কি লক্ষ্মণসেনের পিতামহ বিজয়সেনের প্রতিষ্ঠিত চণ্ডী? কথিত আছে, উহাঁর জন্য মন্দির গড়িলে তাহা তখনই ফাটিয়া যায়; এই ভয়ে কেহ উহার মন্দির গড়ে না। কিন্তু এখন আর ফাটিয়া যাইবে না,—মন্দির-প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইলেই এই প্রসিদ্ধা দেবীকে ধ্বংস করিবার জন্য মুসলমানেরা চেষ্টা পাইতেন, এই জন্যই এই প্রবাদের সৃষ্টি!*

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

ছন্নছাড়া

(১২)

একদিন বিকেলে, আমি দেখে অবাক হলুম যে, যিনি সান্ধ্য-উপাসনা করলেন তিনি আমাদের সেই বুড়ো পাদ্রী নন। ইনি একজন লম্বা, সুশ্রী লোক। গান গাইলেন —চড়া গলায়, কিন্তু হেঁচকা দিয়ে-দিয়ে। সে দিন সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটা কেবল তাঁরই কথা হতে লাগল। মাদ্‌লিন বল্লে, লোকটি সুপুরুষ বটে! মারি এমে বল্লেন, মনে হয় ওঁর গলার স্বর অল্প-বয়সী লোকের মত কিন্তু দেখেচ, কথা উচ্চারণ করেন ঠিক বুড়ো মানুষের মতন। কিন্তু চেহারায় একটা মহত্ত্ব আছে।

দু-তিন দিন পরে তিনি আমাদের দেখতে এলেন। আমি দেখলুম, তাঁর ঘাড়ের চার-পাশে সাদা সাদা চুল,—একটু-একটু কোঁকড়ানো। চোখ আর ভুরু কালো কুচকুচে। তিনি সকলকার নাম জানতে চাইলেন। মারি এমে আমার হয়ে কথা কইলেন। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বল্লেন—"এই আমাদের মারি ক্লেয়ার!" ইস্‌মেরির পালা আসতে তার দিকে চেয়ে

* যশোহর সম্মিলনে পঠিত।

তিনি আশ্চর্য্য হলেন। তাকে তিনি ঘুরে দাঁড়াতে বল্লেন এবং কি-রকম করে সে চলে তাই দেখলেন। তিনি বল্লেন, তাকে দেখায় তিন-বছরের মেয়ের মতন! মারি এমেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মেয়েটির বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে?" ইস্‌মেরি অমনি ধাঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লে—"ঐ মেয়েগুলোর মতো আমি বোকা নই।" তাই শুনে তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন। আমি দেখলুম তাঁর দাঁতগুলি সাদা ধবধবে। যখন তিনি কথা কইছিলেন সামনের দিকে একটা ঝোঁক দিচ্ছিলেন—যেন তাঁর কথাগুলোকে পাকড়াও করতে চান;—সেগুলো যেন তাঁর অজ্ঞাতসারে মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। মারি এমে তাঁকে উঠোনের দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন; সাধারণত তিনি ঘরের দরজার বেশী কোনো অতিথিকে এগিয়ে দেন না। তিনি ঘরে ফিরে এসে নিজের ডেস্কটিতে বসলেন এবং খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে, কারুর দিকে না চেয়ে বলে উঠলেন—"বাস্তবিক শ্রদ্ধা করবার মত মানুষ বটে!"

আমাদের নূতন পাদ্রীটি উপাসনা-ঘরের পাশে ছোট্ট বাড়িটিতে থাকতেন। রোজ সন্ধ্যাবেলা তিনি গাছ-দিয়ে-খিলেন-করা পথটিতে বেড়াতেন। কখনো-কখনো আমাদের খেলবার মাঠে এসে উপস্থিত হতেন—আমরা যখন খেল্‌তুম। তিনি অনেকখানি নীচু হয়ে মারি এমেকে নমস্কার করে যেতেন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি আমাদের দেখতে আসতেন। চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে পড়ে এবং পায়ের উপর পা ঝুলিয়ে বসতেন। আমাদের কত গল্প শোনাতেন। তাঁকে আমাদের ভারি ভালো লাগত। তাঁর হাসি দেখে মারি এমে বলতেন যে, তিনি একেবারে মন-খুলে হাসেন।

কখনো-কখনো মারি এমের অসুখ হত। তখন তিনি তাঁর ঘরে গিয়ে দেখা করতেন। আমরা দেখতুম, মাদ্‌লিন চা-দানি আর দুটো চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে চলে গেল। তার মুখ তখন লাল আর সে যেন ভারি ব্যস্ত।

তারপর গ্রীষ্মকাল চলে যেতে তিনি রাত্রে খাবার পর আমাদের কাছে আসতেন—অনেকক্ষণ আমাদের সঙ্গে কাটাতেন। নটা বাজলে তিনি উঠতেন; মারি এমে সঙ্গে করে তাঁকে বড় ফটকটা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতেন।

(১৩)

তিনি এক-বছর আমাদের কাছে ছিলেন। আমরা যে-সব দোষ করতুম তা খুলে বল্‌বার যে নিয়ম ছিল সেটা আমি তাঁর সামনে কিছুতেই সড়গড় করে নিতে পারিনি। তিনি কেমন-একরকম করে আমার দিকে চাইতেন আর মিটি-মিটি হাসতেন তাতে আমার মনে হত যেন আমার সব দোষ তিনি জানতে পেরেছেন। আমাদের এই দোষ কবুল করবার একটা নির্দ্দিষ্ট দিন ছিল। সে দিন আমরা সবাই এক-এক করে গিয়ে তাঁর কাছে নিজেদের দোষের কথা বলে আসতুম। আমার পালা যখন এল-এল—আর একজন, কি দুজনমাত্র বাকি, তখন আমি কাঁপতে

থাকতুম। আমার বুক্ ধ্বক্ ধ্বক্ করত—পেটটা সেঁটে ধরত—আমি ভালো করে নিশ্বাস ফেল্‌তে পারতুম না। তারপর যখন আমার পালা এসে পড়ত, আমি দাঁড়িয়ে উঠতুম, কিন্তু আমার পা থর্‌থর্ করে কাঁপতে থাকত। আমার মাথা ভোঁ-ভোঁ করত—গাল দুটো ঠাণ্ডা হিম হয়ে আসত। দোষ কবুল করবার সেই নির্দ্দিষ্ট জায়গাটায় আমি থপ্ করে হাঁটু-গেড়ে বসে পড়তুম। তাঁর গলার স্বর—মনে হত যদিও সে স্বর অনেক দূর থেকে আসছে, তাইতেই কিন্তু আমি সাহস পেতুম। তবুও আমি কেমন ভেব্‌ড়ে থাকতুম—তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমায় কবুল করিয়ে নিতেন। তা না করলে আমার অর্দ্ধেক কথা মনেই পড়ত না। তার পর সব চুকে গেলে তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করতেন। আমার ভারি ইচ্ছে হত একটা যা-তা নাম বলে দি, কিন্তু কোন্ সাহসে বলি তাই ভাবতে ভাবতে আমার আসল নামটাই মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ত।

আমাদের ব্রত নেবার সময় ঘনিয়ে আসছিল। মে মাসে তার দিন, কিন্তু এখন-থেকেই তার আয়োজন চলছে। মারি এমে কয়েকটা নূতন গান রচনা করেছিলেন—তার মধ্যে একটা ছিল, সেটা অনেকটা পাদ্রীমহাশয়েরই স্তুতি।

উৎসবের প্রায় দিন-পনেরো আগে অন্য মেয়েদের কাছ থেকে আমাদের তফাৎ করে দেওয়া হল। আমরা সমস্ত দিন কেবল প্রার্থনা করতুম। মাদ্‌লিনের উপর ভার ছিল দেখতে আমাদের প্রার্থনায় যেন কোনো ব্যাঘাত না হয়। কিন্তু সে নিজেই গোল করত—আমাদের কারুর না কারুর সঙ্গে তার ঝগড়া লেগেই থাকত। আমার যে ব্রতসঙ্গী ছিল তার নাম সোফি। সে একটি ছোট্ট মেয়ে। আমরা দুজনে ঝগড়া-ঝাঁটির ভিতর থাকতুম না;—আমরা কেবল গভীর বিষয়ের আলোচনা করতুম। আমি তাকে প্রায়ই বলতুম যে, আমি ঐ দোষ-কবুল করাটা দুচক্ষে দেখতে পারি না, আর এই ব্রতের ভাবনায় আমার এত ভয় হচ্ছে যে আমি হয়ত কি-করতে কি করে ফেলব! সে ছিল ভালো মেয়ে, সে অবাক হত,—আমার এত ভয় কিসের! তার বিশ্বাস ছিল, আমার মনে ভক্তি নেই; সে লক্ষ্য করত, আমি প্রার্থনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি। মরণকে তার বড় ভয় ছিল। মরণের কথা সে আমার কাছে চুপি-চুপি ফিস্-ফিস্ করে বল্‌ত—এবং বল্‌তে বল্‌তে ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। তার চোখ দুটি ছিল সবুজ—এবং তার চুলগুলি এমন সুন্দর ছিল যে মারি এমে সেগুলো অন্য মেয়েদের মতো ছোটো-করে ছাঁটতে দিতেন না।

শেষকালে সেই ব্রতের দিন এসে পড়ল। আমার দোষ-কবুল-করা বেশ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। মনে হল যেন স্নান করে উঠলুম্—মনের মধ্যে ভারি একটু শুচিতা অনুভব করতে লাগলুম। কিন্তু আমায় যখন সেই প্রসাদী বাতাসাখানা দিলে তখন আমি এমন কাঁপছিলুম, যে তার খানিকটা আমার দাঁতে লেগে গেল। আমার গা কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করছিল—মনে হল চোখের

সামনে একখানা কালো পর্দ্দা পড়ে গেল। আমার বোধ হতে লাগল, আমি যেন শুনতে পাচ্ছি মারি এমে বলছেন—"তুমি অমন করছ কেন?" তার পর, এটাও বুঝতে পারছিলুম তিনি আমাকে সঙ্গে করে বেদীর কাছ পর্য্যন্ত নিয়ে গেলেন, আমার হাতে ছোট একটি বাতি দিয়ে বল্লেন—"দেখো, শক্ত করে ধোরো!"

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ, আমি ঢোক গিলতে পারছিলুম না; বোধ হল একটা তরল জিনিষ আমার মুখ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা করে গলায় ভিতর চুঁয়ে পড়ছে। আমি ভয়ে একেবারে সিঁটকে গেলুম। কারণ মাদ্‌লিন বলে দিয়েছিল যে আমরা যদি বাতাসাটাকে দাঁত দিয়ে কাটি তাহলে ক্রাইষ্টের রক্ত আমাদের মুখ দিয়ে বেয়ে পড়বে—কেউ তা থামাতে পারবে না। মারি এমে আমার মুখটা হাত দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে চুপি চুপি বল্লেন—"লক্ষ্মী আমার, ঠাণ্ডা হয়ে থাক।" অম্‌নি আমার সেই কাঠ গলা নরম হয়ে এল—আমি বাতাসাটা গিলে ফেল্লুম। তার পর এতক্ষণে আমার সাহস হল কাপড়ের দিকে দেখতে—রক্তে সেটা কি রকম ভেসে গেছে। কিন্তু রক্তের চিহ্ন কোথাও দেখতে পেলুম না—কেবল দেখলুম, ছোট্ট একটি ছাই-রঙের দাগ—জলের একটি ফোঁটার মত। আমি রুমালখানা বার করে ঠোঁট মুছলুম, মুখ মুছলুম কিন্তু রক্তের দাগ দেখলুম না। তবুও আমার ভয় সম্পূর্ণ গেল না। তারপর আমাদের সবাই যখন গাইবার জন্য দাঁড়িয়ে উঠল আমিও তাদের সঙ্গে গাইবার চেষ্টা করলুম।

বৈকালে যখন পাদ্রীমহাশয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন মারি এমে তাঁকে বল্লেন যে, আজকের উৎসবের সময় আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম। তিনি হাত দিয়ে আমার দাড়িটি ধরলেন, তাঁর দিকে আমার মুখটি তুলে ধরে আমার চোখের উপর চোখ রেখে হাসতে লাগলেন, আর বল্লেন, আমি বড় ভীতু মেয়ে!

(১৪)

এর পর থেকে আমরা পড়ার ক্লাসে আর যেতুম না। বন্ জিস্তিন আমাদের শেলাই শেখাত। আমরা চাষা মেয়েদের জন্য টুপি তৈরী করতুম। কাজ তেমন শক্ত নয়; জিনিষটা নতুন বলে আমার খুব উৎসাহ হতে লাগল—আমি সেলাই নিয়ে মেতে থাকতুম। জিস্তিন বলত, আমি একজন ভালো দর্জ্জি হতে পারব। মারি এমে আমার গালে চুমু খেয়ে বলতেন—তা ঠিক, যদি কুঁড়েমিটা যায়!

কিন্তু গোটাকত টুপি করেই আমার সব উৎসাহ একেবারে জল হয়ে এল। একই রকম কাজ বার বার করে আমার তাতে অরুচি জন্মে গেল। সে আমার আর ভালো লাগত না—আমি কিছুতেই তাতে মন দিতে পারতুম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যেত আমি চুপ-হয়ে বসে থাকতুম;—কেবল চেয়ে চেয়ে দেখতুম আর-সবাই কি করছে। মারি রেনো সেলাইয়ের সময় একটি কথাও কইত না। তার ফোঁড়-গুলি এত সূক্ষ্ম ও এত কাছাকাছি হত যে খুব ভালো চোখ না হলে নজরে আসত না। ইস্‌মেরি সেলাই করতে করতে

গান গাইত—তাকে কেউ বকত না। এক-একটা মেয়ে ঘাড় নীচু করে কপাল কুঁচকে একমনে সেলাই করে যেত—তাদের আঙুলের ডগাগুলি ভিজে-ভিজে দেখাত আর ছুঁচের মুখ থেকে পুট্ পুট্ পুট্ শব্দ উঠত। কেউ কেউ খুব ধীরে ধীরে, অতি সাবধানে সেলাই করেই চলত—তাতে তাদের শ্রান্তি ছিল না, বিরক্তিও ছিল না। প্রত্যেক ফোঁড়টি তারা সেলাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে-মনে গুণে যেত। এইরকম করে সেলাই করাটা আমার সব-চেয়ে ভালো বোধ হত। কেন যে আমিও ঐরকম করি না তার জন্যে নিজেকে মনে মনে তিরস্কার করতুম। কয়েক-মিনিটের জন্যে আমি তাদের অনুকরণ করতে লেগে যেতুম। কিন্তু কোথাও থেকে একটু শব্দ হলেই বাস, আমার হাত থেমে যেত—আমি উস্‌খুস্ করতুম—চারদিকে কোথায় কি হচ্ছে তাই দেখতুম। মাদ্‌লিন বলত, আমি কেবলই সোঁক্-সোঁক্ করে বেড়াই—আর এমন ছুঁচের কথা ভাবি যা আপনা-থেকেই সেলাই করে! বাস্তবিক অনেক দিন ধরে আমার মনে হত ঘরের ঐ কোণ থেকে ফস্ করে একটা বুড়ি বেরিয়ে আমার হাতের সেলাই চুপিচুপি সেরে দিয়ে চলে যাবে—কেউ দেখতে পাবে না। আমি তারই আশা-পথ চেয়ে বসে থাকতুম। মারি এমে প্রত্যহ তিরস্কার করতেন—শেষকালে তিনি এলে-গেলেন, তাঁর তিরস্কার আমার গায়ে লাগত না। তিনি ভেবে পেতেন না কেমন করে আমায় কাজে মন দেওয়াবেন। একদিন তিনি ঠিক করলেন যে আমাকে দিনে দুবার চীৎকার করে পড়তে হবে। তাতে আমার এত আনন্দ হল যে বলতে পারি না। কখন্ পড়ার সময় আসে তার জন্যে আমি হাঁ করে বসে থাকতুম—আর বই মুড়ে ফেলবার সময় আমার আর দুঃখের অন্ত থাকত না।

(১৫)

আমার পড়া সাঙ্গ হলে মারি এমে কোলেৎকে গান গাইতে বলতেন। সে ছিল খোঁড়া। একই গান সে বারবার গাইত কিন্তু তার গলাটি ছিল এমনি মিষ্টি যে একগান একশবার শুনতে বিরক্তি হত না। কাজ করতে-করতেই সে গান গাইত আর তাল দিত ছুঁচের সঙ্গে। জিস্তিন্ আমাদের সবাইকার নাড়িনক্ষত্র জানত। সে বলত, কোলেৎ যখন আসে তখন সে এতটুকু মেয়ে—তার দুপা ভাঙা!

কোলেৎ দুহাতে দুটো ছড়ি নিয়ে—অনেক কষ্টে হাঁটত—খোঁড়ারা যে লক্‌ড়ি ব্যবহার করে সে তা নিত না;—তার লজ্জা হত, তাহলে তাকে বুড়ির মত দেখাবে! আমি আবৃত্তি করবার সময় দেখতুম সে একলাটি বেঞ্চে বসে আছে—পিছন দিকে হেলান দিয়ে—লম্বা হয়ে পড়ে। তার চোখের তারা দুটো এত বড় ছিল যে, তার চোখের সাদাটা দেখাই যেত না। তার সঙ্গে মেশবার আমার ভারি ইচ্ছে হত—মনে হত তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করি। কিন্তু তাকে ভারি গুমরে বলে বোধ হত। আমি যদি কখনো তার একটু-আধটু কাজ করে দিয়েছি সে অমনি বলে উঠেছে—"খুকী, তোমায় ধন্য-বাদ।" খুকী! আমি যে মোটে বারো

বছরের সেইটে জানিয়ে দেওয়া হল। তার ভারি অহঙ্কার।

মাদ্‌লিন আমাকে হেঁয়ালির মতো কেমন অস্পষ্টভাবে বলত যে, কোলেতের সঙ্গে আড়ালে কথা কইবার আমাদের কারো হুকুম নেই। আমি যদি বলতুম, কেন? অমনি সে একটা এমন গোলমেলে জটপাকানো কাহিনী খুলতে আরম্ভ করত যার মাথামুণ্ড কিচ্ছু বুঝতে পারতুম না। আমি প্রশ্ন করতুম। সে এমন সব কথা ব্যবহার করত যার মানে আমি জানিনা। সে বলত যে আমার মত ছোট মেয়ের কোলেতের সঙ্গে একা থাকা উচিত নয়। আমি কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারতুম না,—কেন নয়? আমি দেখতুম, যখনই কোনো মেয়ে তার হাত ধরে তাকে একটু নিয়ে যাচ্ছে অমনি চারদিক থেকে অন্য মেয়েরা এসে হাসি গল্প জুড়ে দিলে। আমার মনে হত, কেউ তার বন্ধু নেই। তারজন্যে আমার কেমন মায়া করত—তার প্রতি আমার ভারি একটা টান হত। একদিন দেখলুম, সে একলাটি রয়েছে। আমি তাকে বল্লুম, এস আমার হাত ধরে একটু বেড়াবে। আমি তার সামনে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম; জানতুম সে আমার কথা ঠেলতে পারবে না। সে আমার মুখের দিকে একবার চাইলে, তারপর বল্লে—"জান, হুকুম নেই!" আমি বল্লুম—"হাঁ, জানি।" সে আবার আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—"তোমার শাস্তির ভয় নেই!" আমি ঘাড় নেড়ে বল্লুম—"না!" আমার কেমন কান্না আসতে লাগল,—গলার ভিতরটা আঁট হয়ে এল। আমি তাকে ধরে-ধরে তুল্লুম। সে এক হাতে লাঠির উপর ঝুঁকে পড়ে আমার ঘাড়ে সমস্ত ভরটা দিলে। আমি বুঝতে পারলুম তার চলাটা কি কষ্টের। আমরা যতক্ষণ বেড়ালুম সে একটি কথাও কইলে না। তারপর তাকে যখন তার সেই বেঞ্চিতে ফিরিয়ে এনে বসিয়ে দিলুম তখন সে শুধু বল্লে—"মারি ক্লেয়ার, ধন্যবাদ!" কোলেতের সঙ্গে আমায় বেড়াতে দেখে জিস্তিন্ আকাশের দিকে হাত-তুলে একবার ক্রুশের চিহ্ন করলে আর সেই-অনেকদূর থেকে মাদ্‌লিন আমার দিকে কিল উঁচিয়ে চীৎকার করে উঠল!

(১৬)

সন্ধ্যার সময় বুঝতে পারলুম, মারি এমে জানতে পেরেছেন যে, আমি কি করেছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি কোনো কথাই তুল্লেন না। পরদিন ছুটির সময় আমাকে তিনি তাঁর কাছে টেনে নিলেন; দুই হাত দিয়ে আমার মাথাটা ধরে আমার উপর ঝুঁকে পড়লেন। তিনি একটি কথাও বল্লেন না, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি যেন আমার অন্তরের ভিতরে ডুবে গেল। আমার মনে হতে লাগল তাঁর দৃষ্টি আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে ধরেছে। আমার বোধ হল একটি স্নিগ্ধ উত্তাপ চতুর্দ্দিক থেকে আমায় আচ্ছন্ন করছে—তার কী আরাম! আমার কপালের উপর তিনি একটি চুমু খেলেন—অনেকক্ষণ ধরে। তারপরে আমার দিকে হেসে চেয়ে বলে উঠলেন—"এই আমার পদ্ম-রাণী!" সে সময় তাঁকে এমন চমৎকার সুন্দর দেখাচ্ছিল আর তাঁর চোখের ভিতর

এত-রকম রং খেলছিল যে আমি আর থাকতে পারলুম না, আমিও বলে উঠলুম—"তুমিও তো মা, ফুলের রাণী!" তিনি একটা অগ্রাহ্যের সঙ্গে বল্লেন—"তা বলে আর পদ্মের দলে নেই!" খানিকক্ষণ পরে তিনি একটু রূঢ়স্বরে হঠাৎ বলে উঠলেন—"ইস্‌মেরির সঙ্গে বুঝি আর তোমার ভাব নেই?" আমি বল্লুম—"হাঁ, আছে!" তিনি বল্লেন—"সত্যি নাকি? তবে কোলেৎ?" আমি বল্লুম—"তাকে আমার বড় ভালো লাগে।" তিনি বলে উঠলেন—"তোমার সবাইকেই ভালো লাগে।"

(১৭)

আমি রোজই প্রায় কোলেতকে ধরে-নিয়ে বেড়াতুম। সে আমার সঙ্গে বেশি কথা কইত না—অল্পস্বল্প যা বলত তা অন্য মেয়েদের কথা। আমি যখন তার পাশে বসতুম সে কেমন-একরকম করে আমার দিকে চাইত। সে বলত, তার মনে হয় আমি একটা অদ্ভুত-রকমের মেয়ে। একদিন সে আমায় জিজ্ঞাসা করলে যে তাকে দেখতে সুন্দর বলে মনে হয় কি না। এই প্রশ্ন তুলতেই আমার মনে হল মারি এমে একদিন বলে-ছিলেন যে, গায়ের তিলের মতো সে কালো। আমি কিন্তু দেখতুম তার কপালটি চওড়া, বড় বড় দুটি চোখ, মুখখানি ছোট; —কিন্তু বেশ চাঁচা-ছোলা। কি জানি কেন, যখনই তার দিকে চাইতুম আমার মনে হত যেন একটা খুব গভীর, অন্ধকার, গরম জলভরা কুয়ো দেখচি!

সত্যি বলতে কি, তাকে আমার সুন্দরী বলে মনে হত না। কিন্তু সে কথা তার মুখের উপর ত বলা যায় না—সে যে খোঁড়া। আমি বলতুম, তার গায়ের রংটা যদি আর-একটু ফর্সা হত তাহলে তাকে ঢের ভালো দেখতে হত।

একটু একটু করে তার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে আসছিল। সে বলত, আর-কিছুদিন বাদে সে এখান থেকে চলে গিয়ে নিনার মতো বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার কর্ব্বে। নিনা তার ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে প্রতি রবিবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসত। কোলেৎ আমার হাত ধরে বলে উঠত—"আমারও বিয়ে হবে—নিশ্চয় হবে, বুঝলে!" বলেই সে সমস্ত শরীরটা ছড়িয়ে দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ত। এক-এক সময়ে সে এমনি কাঁদতে থাকত যে আমি কি বল্‌ব খুঁজে পেতুম না। তার সেই বাঁকা-চোরা দোমড়ানো পা দুখানার দিকে চেয়ে-চেয়ে সে কাতরস্বরে গেঙিয়ে উঠত—"একটা অলৌকিক কিছু না ঘটলে আমার আর উপায় নেই!"

হঠাৎ একটা কথা আমার মাথায় খেলে গেল—দেবী মেরি ত এই অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়ে তুলতে পারেন! কোলেৎ বল্লে, ঠিক কথা! সে আশ্চর্য্য হল যে, এতদিন এ কথাটি তার মনে আসেনি কেন! আর এ ত খুব ন্যায্য কথা যে আর-সবাইয়ের পা যেমন তারও পা তেমনি হবে! কোলেৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল, এখনি উপায় করা চাই। সে বল্লে, এর জন্যে যে নয় দিন প্রার্থনা দরকার তাতে কয়েক-জন মেয়ে চাই, সবাইকে সংযম করে শুদ্ধ

হতে হবে—স্বর্গের দেবীর কাছ থেকে দয়া ভিক্ষার জন্য এই নয় দিন অনবরত প্রার্থনা করতে হবে। কিন্তু সব চুপিচুপি হওয়া চাই;—কেউ যেন না জানতে পারে। ঠিক হল সোফি আমাদের দলে থাকবে—কারণ সে বড় ভক্তিমতী, আর তাছাড়া দুচার জন বড় মেয়েদেরও সে দলে আনতে পারবে। দুদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে গেল। কোলেৎ এই নয়দিন উপবাস করবে। দশদিনের দিন—সেদিন রবিবার পড়েছিল—সে যেমন পূজো দিতে যায় তেমনি যাবে। পূজোর সময় এই সংকল্প গ্রহণ করবে—"মাগো, আমার সন্তানদের তোমার দাস করে দেব।"

তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে স্তোত্র গাইবে—আমরা সকলে তাতে যোগ দেব।

নয় দিন ধরে আমি একমনে প্রার্থনা করলুম—এমনতর প্রার্থনা এর আগে কখনো করিনি। রোজ যে প্রার্থনা করতুম তা আমার কাছে অত্যন্ত ক্ষীণ মনে হতে লাগল। আমি ভার্জ্জিন দেবীর প্রার্থনা আবৃত্তি করতে লাগলুম—ভালো ভালো স্তোত্র সব খুঁজে বার করে তাই এক-শ বার পাঠ করতে লাগলুম—তাতে আমার ক্লান্তি ছিল না, বিরক্তি ছিল না। "কোলেৎকে পূর্ণাঙ্গী করে দাও!"—এই ছিল আমার আকুল প্রার্থনা। প্রথম-দিন প্রার্থনার সময় আমি এতক্ষণ হাঁটু গেড়ে বসেছিলুম যে শেষে মারি এমে আমায় বকতে লাগলেন। পরস্পর ইসারা করে আমরা সব কথা চালাচালি করতে লাগলুম; কেউ তা বুঝতে পারত না। এই রকম করে নয় দিন কেটে গেল। কেউ কিছু জানতে পারলে না।

(১৮)

পূজোর সময় যখন কোলেৎ এল তখন তাকে ভারি ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। গাল তার চড়িয়ে গেছে—সে চোখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। আমার মনে হতে লাগল, এইবার তার সমস্ত দুঃখ শেষ হয়ে এসেছে। আমার ভারি আনন্দ হল। আমার সামনেই ছিল ভার্জ্জিনের ছবি—তাঁর সাদা ধবধবে কাপড় লুটিয়ে পড়েছে—আমার দিকে চেয়ে যেন তিনি হাসছিলেন। আমার সমস্ত অন্তরের বিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে আমার হৃদয় বলে উঠল—"কোলেৎ নিশ্চয় পূর্ণাঙ্গী হয়ে উঠবে।" আমার কপাল যেন ফেটে পড়ছিল। আর মন যাতে একাগ্র হয়ে থাকে তার জন্যে প্রাণপণে নিজেকে শক্ত করে রাখছিলুম। আর কেবলি বলছিলুম—"ওগো দয়াময়ী, কোলেৎকে পূর্ণাঙ্গী করে দাও—কোলেৎকে ভালো করে দাও!"

কোলেৎ ধীরে ধীরে বেদীর কাছে গেল। তার লাঠিটা মেজের টালির উপর ঠক্-ঠক্ করতে লাগল। কোলেৎ যখন হাঁটু পেতে বসল, যে মেয়েটি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল সে তার লাঠিটা হাতে করে ফিরে এল—তার বিশ্বাস এ লাঠিআর দরকার হবে না।

কোলেৎ দাঁড়িয়ে উঠতে গেল—পারলে না, হাঁটু পেতে বসে পড়ল। সে একবার লাঠিটার জন্যে হাৎড়ালে; যখন পেলেনা, আবার নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে। পারলে না। টেবিলটার গায়ে

ঝুলে পড়ে—সে পাশের একজনকে আঁকড়ে ধরলে। তার কাঁধ দুটো এদিক-ওদিক করে দুলতে লাগল—শেষে যাকে ধরেছিল তাকে সুদ্ধ নিয়ে মাটির উপর পড়ল। আমরা দুজনে ছুটে গেলুম। কোলেৎকে টেনে-হিঁচড়ে তার বেঞ্চিতে নিয়ে বসিয়ে দিলুম। কিন্তু তখনও আশা ছেড়েও আমার কেমন আশা হচ্ছিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপাসনা চলছিল একটা আশা ভিতরে ভিতরে জাগছিল।

যত শীঘ্র পারলুম কোলেতের কাছে ছুটে গেলুম। দেখলুম বড় মেয়েরা ঘিরে দাঁড়িয়ে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। কেউ বলছে, তোমার জীবন ভগবানকেই উৎসর্গ কর। কোলেৎ কাঁদছিল—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নয়—ধীরে ধীরে। সে চুপ করে বসেছিল—চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ছিল। সে মাথাটা নীচু করে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছিল—চোখের জল সেই হাতের উপর এসে পড়ছিল। আমি তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে রইলুম। সে যখন আমার দিকে চোখ তুললে, আমি বল্লুম—"খোঁড়া হলেই বা! খোঁড়ার কি আর বিয়ে হয় না?"

কোলেতের এই দুঃখের কাহিনী সবাই শুনলে। সবাই এত অভিভূত হল যে কয়েকদিনের জন্য হুটোপটি খেলা বন্ধ হয়ে গেল। ইস্‌মেরি যখন আমাকে ঐ কথা বলতে এল তখন সে ভেবেছিল না-জানি কতবড় একটা গূঢ় সংবাদ আমায় দিচ্ছে। সোফি বল্লে—"দেবীর বিধান আমাদের মাথায় করে নেওয়া উচিত। তিনি যা করবেন তা ভালোর জন্যেই—কোলেতের কিসে ভালো-মন্দ তা আমাদের চেয়ে তিনি বেশী জানেন!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

আঁচোল

তনু তোমায় দেহ-ঘেরা বসনের এক প্রান্ত—
তোমার ছোট আঁচোল সে-যে এমন কে তা জান্‌ত!
ভেবেছিলাম দানে আমার ভর্‌ব তাহা ভর্‌ব.
ভয় জাগে আজ টুটেই-বা যায় আমার সকল গর্ব্ব।
তরুণ ছিল প্রভাত তবে অরুণ ছিল আলো,
মধুর মুখে করুণ আঁখি লাগ্‌ল সে কি ভালো!
নয়ন মেলে দেখি তুমি আমার গৃহদ্বারে,
আঁচোলখানি পেতে আছ দাঁড়িয়ে একটি ধারে।

সলাজ তব সরল মুখে একটি নাহি বাণী,—
সকল কথা জানাল অই আকুল আঁচোলখানি।
ফুল যে তখন ঢালছিল প্রাণ বিমল উষার বায়,
অমন আঁচোল না ভরে' কি অমনি ফেরা যায়?
ছোট্ট সে-যে আঁচোলখানি কতই-বা তায় ধরবে?
—আমার হেলফেলার দানে নিমেষে তা ভরবে।
হায়গো মিছে আশা! আমি যতই আনি ঢালি,
তোমার ছোট আঁচোলখানি রয়গো তবু খালি।
ফিরিয়ে দিতে চায়না যে প্রাণ; বুঝছি আমি বেশ—
তোমার ছোট আঁচোল কিছু রাখবে না মোর শেষ!
যা-হয় হবে মিছে কেন দাঁড়িয়ে আছ দ্বারে?
ঘরে এসো ভরা-ভাঁড়ার ঢালবো একেবারে!
তুমি এসে দাঁড়ালে যেই হেরি অবাক্ মানি,—
এমন ভরা ভাঁড়ার যে মোর স্বপ্নে নাহি জানি!
তোমার মেলা আঁচোল সে-যে কি গুণ হেন ধরে,—
নেবার ছলে চুপে-চুপে ভাঁড়ার যে মোর ভরে।
আঁচোল বলে ভিখারিণী,—চক্ষে জাগে রাণী;
আঁচোল যা পায় চোখ্ বুঝি দেয় হাজার-গুণে আনি।
অপরূপ যে সব অপরূপ ভিখারিণী রাণী!—
তোমায় হেরি অবাক্ মানি, ওগো অবাক্ মানি!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

বিচরণ

আমাদের সেখানে আর এ-পাহাড়ের ঋতু-পর্য্যায়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বসন্ত এখানে এসে-যায়—শীতের আগেই, দিক্-বিদিকে ফুলের মেলা বসিয়ে দিয়ে। আমাদের সেখানে যখন ফুলেদের বাসর-জাগবার পালা এখানে তখন তুষারের বিছানায় ঘুমিয়ে গেছে সব ফুলগুলি। সেখানে বসন্ত দেখা দেয় শীতের আসরে শিউলি-ফুল ছড়িয়ে; এখানে শীত আসে বসন্তের সভায় সাদা চাদর টান্‌তে-টান্‌তে ফুল মাড়িয়ে।

শীত গলে-পড়ছে বর্ষায়, বর্ষা ফুটে-

উঠছে বসন্তে, বসন্ত ক্ষীণ হতে-হতে শরতের জ্যোৎস্নার মধ্যে-দিয়ে ঝিক্‌মিক্ করতে-করতে তুষারের শুভ্রতায় গিয়ে শেষ হচ্ছে; —এখানের ছন্দটা এইরূপ।

এখানে এসে অবধি হিমালয়কে একবার দেখে নেবার জন্যে উঁকি দিচ্ছি—এখানে ওখানে, সকালে সন্ধ্যায়। কিন্তু অচল সে, কুয়াশার ভিতরে কোথায় যে চলে গেছে, সপ্তাহ ধরে তার সন্ধানই পাচ্ছি না।

এ যেন একটা নিহারিকার গর্ভে বাস করছি! দিন এখানে আস্‌ছে—উত্তাপহীন অনুজ্জ্বল; রাত আস্‌ছে—অঞ্জনশিলার মত হিম অন্ধকার।

আমার চারিদিকে সবেমাত্র দশবিশ হাত পৃথিবী—গুটিকতক ফুল-পাতা নিয়ে,—যেন অগোচরের কোলে একটুকরো জগৎ; আর আমরা যেন এক-ঝাঁক দিশেহারা পাখি এইখানটায় আশ্রয় নিয়েছি। আমাদের কাছে চারিদিক এখনো অপরিচিত রয়েছে। শিল্পী এখনো যেন তাঁর রং-তুলির কাজ সুরু করেননি,—সবেমাত্র কুয়াশার শুভ্রতার গায়ে পার্ব্বত্য দৃশ্যের আমেজ একটু-একটু দেগে রেখেছেন—অসম্পূর্ণ, অপরিস্ফুট।

এই-যে পরিচয়ের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে কুয়াশার যবনিকাটি দুল্‌ছে—এপারে-ওপারে বিচ্ছেদের সূক্ষ্ম ব্যবধান—একে সরিয়ে যেদিন শুভদৃষ্টি হবে সেদিন অন্তর গিয়ে মিলবে বাহিরে, বাহির এসে লাগবে অন্তরে! এই কথাটাই একগোছা সবুজ-পাতা আমার জানলার কাচের বাহিরে কেবলি ঘা-দিয়ে-দিয়ে জানাচ্ছে কাচের এপারে ঘরের বন্দী প্রকাণ্ড একটা পতঙ্গকে। অজানার দিক থেকে একটির-পর-একটি দূত,—চঞ্চল একটি নীল পাখি, ছোট একটি মৌমাছি—তরুলতার কানে-কানে, অপরাজিতার ঘোমটা একটু খুলে এই কথাই জানিয়ে যাচ্ছে—দিনের মধ্যে শতবার।

আজকের সন্ধ্যাটি শীতাতুর কালো হরিণের মতো পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো—অন্ধকারের দিকে মুখ করে। কলঙ্ক-ধরা একখানা কাঁসরের মতো গভীর রাত্রিটাকে কালো ডানার ঝাপটায় বাজিয়ে তুলে মস্ত-একটা ঝড় আজ মাথার উপরে ক্রমান্বয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে—যেন দিশেহারা পাগল পাখি।

রাত্রিশেষে বর্ষা দিকবধূর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। আকাশের নীল চোখে সরু একটি কাজল-রেখার কোণে একটু-খানি অরুণ আভা দেখা যাচ্ছে; আর যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল দেখছি ধূসরের অচল ঢেউ দিকের শেষ-সীমা পর্য্যন্ত;—আর রংও নেই, রূপও নাই! এই অবিচিত্রতার মধ্যে একটি মাত্র পাহাড়ি-ফুলের কুঁড়ি, বসন্তের নববধূ সে, আলোর প্রতীক্ষা করছে! প্রজাপতির পাখার চেয়ে সুকুমার এর পাব্‌ড়িগুলি; এত ছোট, এত কচি—একেই ঘিরে আজ প্রভাতের সমস্ত সুর। সুদূর গিরি-শিখরে, মেঘলহরীর তীরে, বনের পাখির কণ্ঠে, নিহারের যবনিকা ঠেলে বাহিরে ছুটে এসেছে পর্ব্বতের কলভাষী দুরন্ত শিশু—এই-যে জলধারা এর ঝরে-পড়ার মধ্যে!

কাঁচা-সোনার একটিমাত্র আভা, বসন্ত-বাউরীর বুকের পালকের অফুট বাসন্তী আভা, সকালের আকাশে বিকীর্ণ হয়ে গেল। এই আলোর উপরে সব-প্রথম তুষার,

আজ সে-সোনার পটে যেন কাজলের লেখার মতো কালো হয়ে ফুটে উঠল।

এই কালো বরফের নিষ্কলঙ্ক ললাট! এইখানে বসন্ত-দিনের—তরুণ দিনের—প্রথম আশীর্ব্বাদ পড়েছে; সে একটিমাত্র আলোর করকা! আর তারি আভা তুষারের সহস্র-ধারায় হিমালয়ের অন্ধকার আলো করে গড়িয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে ফুল-ফোটার ছন্দটি ধরে।

আমার এ-বাগানখানি পাহাড়কে আঁকড়ে-ধরে শূন্যের উপরে ঝুলে রয়েছে। এখানে একঝাড় পাহাড়ি-মল্লিকা, এক-ঝাঁক পাখি আর আমি! এইখানটিতে তুষারের বাতাস নিয়ত গাছের ফুল, পাখির গান ফুটিয়ে তুলছে। আমার গান নেই। সকাল-সন্ধ্যায় একখানা পাথরের মত নিশ্চল নির্ব্বাক আমাকে, বাতাস আর আলো শুধুই স্পর্শ করে যাচ্ছে।

আমাদের যারা অনেকবার পাহাড়ে এসেছে এবং যারা নূতন আগন্তুক তাদের দেখি ওঠা-নামা, চলা-ফেরার অন্ত নেই। যেখানে ইংরাজি বাদ্য, গোরার নাচ সেই-সকল মেলাতেই এরা ত্রিসন্ধ্যা যোগ দিয়ে ঘুরছে, কেবলি ঘুরছে,—হয় ঘোড়ার পিঠে, নয়তো নিজের পায়ে দুইজোড়া চাকা বেঁধে! মাড়োয়ারী রাজার ফরাসী-ধরণের বৈঠকখানার চূড়োয় বাতাসের ধনুকে চড়ানো ঐ লোহার তীরটার মতো, এরা দেখি, শূন্যকে বিঁধে-বিঁধেই কেবলি ঘুরছে বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে,—ছুটেও চলছে না, উড়েও যাচ্ছে না!

আমার চলার গণ্ডীটাও যে খুব বড় তা নয়। একটি পাহাড়ের যে-পিঠে সূর্য্য উদয় হন, আর যে-পিঠে তিনি অস্তে যান এইটুকুমাত্র প্রদক্ষিণ করে উঁচু-নীচু একটা পথ। এই পথ-দিয়ে কাঁটা-দেওয়া একটা মস্ত লাঠি নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি—পাথর কুড়িয়ে, গাছ সংগ্রহ করে—মাসের মধ্যে ত্রিশ না হোক, উনত্রিশ দিন তো বটেই; এই পথটিতেই—সকালের আলোয়, সন্ধ্যায় ছায়ায়, দিবা দ্বিপ্রহরে, রাত্রের অন্ধকারে। এইখানে পাথরের গায়ে কচি স্যাওলার নূতন সবুজ, কেলুবনের ফাঁকে নীল-আকাশের চাঁদ, একটি নির্ঝরের শীর্ণ ধারা আর পর্ব্বত ছেয়ে দুর্গম বনের নিবিড় রহস্য, প্রাতঃসন্ধ্যায় ভ্রমরের গুঞ্জন, সায়ং-সন্ধ্যায় পাখিদের গানের শেষে অন্ধকারের সেই ঝিম্‌ঝিম্—যা শুনছি, কি বোধ কচ্ছি বলা কঠিন।

এই পথের একটা জায়গায় একখানা প্রকাণ্ড সাইন্‌বোর্ড, তাতে লেখা আছে —"সাধারণ সড়ক্ নয়, অনধিকার প্রবেশ দণ্ডিত হইবে!" পর্ব্বতের কোলে এই 'সাইন্'টা আমাকে প্রথমদিন বড়ই ভয় দিয়েছিল, কিন্তু সন্ধানে জানলেম যারা এই মেয়াদের ভয় দিয়ে সারা পাহাড় ঘিরে নিতে চেয়েছিল তাদের মেয়াদ অনেকদিনই ফুরিয়েছে। পথটা এখন আর অনন্যসাধারণ নেই এবং সাধারণেও এই পথটার আশা অনেকদিন ছেড়ে দিয়ে, একধাপ নীচে স্কুলবাড়ি, কুয়োখানা প্রভৃতির গা-ঘেঁসে আর-একটা ঘুরুনে রাস্তা -সারকুলার রোড—ক্লবঘর ব্যাণ্ডষ্টাণ্ড ও বাজার পর্য্যন্ত জিলাপির পাকের ধরণে রচনা করে নিয়েছে—সুতরাং এ রাস্তাটার ভবিষ্যতে পথ-হয়ে-ওঠবারও

কোনো আশা নেই। এ বিপথ হয়েই রয়ে গেল,—মানুষের কাজে লেগে পথ-হয়ে-ওঠা এর ভাগ্যে আর ঘটলো না।

অনেকদিনের আনাগোনায় এই বিপথটার একটা মানচিত্র আমার মনে আঁকা হয়ে গেছে। পাহাড়ের পশ্চিম-গা বেয়ে প্রথমটা সে ঠিক পশ্চিম-মুখে সুন্দর বাঁক নিতে-নিতে সহস্রধারার উপত্যকার দিকে কাৎ হয়ে চলেছে। ঠিক যেখানটি-থেকে সূর্য্যাস্তের নীচে সন্ধ্যার বেগুনি আঁধার চিরে নদী একটি রূপোর তারের মত দেখা যায় সেখানটিতে পৌঁছে পথ স্তূপাকার পাথরের উপর হঠাৎ লম্ফ দিয়ে অকস্মাৎ আবার পূবে মোড় নিয়ে পর্ব্বতের একটা উত্তর ঢালু বেয়ে ছুটে নেমেছে; একটু-দূর গিয়েই হঠাৎ পর্ব্বতের পূবের দেয়াল ঘেঁসে আবার পশ্চিমে দৌড়; সেখানে একদল মহিষ চোখ-রাঙিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখেই পাহাড়ের একটা গড়ানে ভাঙন দিয়ে সে দ্রুত নেমে গিয়ে সোজা আকাশের দিকে উঠেই সহসা মোড়-নিয়ে পর্ব্বতের পূর্ব্ব গায়ে দিগন্ত-জোড়া হিমালয়ের সম্মুখে দেবদারু-বনের ছায়ায় এসে লুকিয়ে পড়েছে; এই দিকটাতে সে শৈবাল-কোমল নির্ঝর-শীতল পর্ব্বতের বাঁকে-বাঁকে একলাটি খেলা করতে করতে পর্ব্বতের পূব-পিঠে আর-একটা গলির মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে; এখানে টিন্-মোড়া দোকান-ঘরে দর্জ্জি কোট সেলাই কচ্ছেন, রাস্তার একপাশে কাদের একগাড়ি জ্বালানী কাঠ খরিদ্দারের অপেক্ষায় পড়ে আছে, হতভাগা চেহারার দুখানা ভাঙা ডাণ্ডি আড্ডার দাওয়ার বাহিরে চড়ায় বাধা পান্‌সির মতো কাৎ-হয়ে পড়েছে। এই পর্য্যন্তই বিপথের দৌড়; বাকি যেটুকু অতিক্রম করে আমাদের বাসায় উঠে যেতে হয় সেটা বিপথ না হলেও বিপদ যে তার আর সন্দেহ নেই! মানুষ সেটাকে পর্ব্বত-শিখর পর্য্যন্ত এমন তিন-চারটে বিশ্রী মোচড় দিয়ে টেনে তুলেছে যে সেখানে কোনো যানও যান্‌না, পাও চান্‌না যে চলি।

বিপথের শেষে পথের এই মোড়টা যেন ইস্কুল-মাষ্টার, নয়তো ধর্ম্মপ্রচারক! তার বুলিই হচ্ছে—'এইবার পথে এসো!' নয়তো সে বলছে—'বিপথ হইতে পথে আইস।' এই যে রোড—সেণ্টভিন্‌সেণ্ট বা তপস্বী ভিন্‌সেণ্ট মহোদয়ের রাস্তা—এখানে নিরালা একটুও নেই;—মানুষের সকৌতুক তীক্ষ্ণদৃষ্টির চোর-কাঁটা এখানে আমার মতো বিপথের পথিকদের জন্য শরশয্যা রচনা করে রেখেছে। পেন্‌সন্-ভোগী এক কাবুলী আমিরের নূতন বয়ঃপ্রাপ্ত দুইচারি বংশধর—যাদের মাথায় শিখ-পাগড়ি, গায়ে সাহেবি কোট ও পায়ে যোধপুরী পাজামা ও ডসনের বুট, তারা আজ কদিন ধরে আমার লম্বা চোগা ও গোর্খা টুপিটার উপরে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করছে এবং দুইবেলা আমার গা-ঘেঁসেই বলাবলি করে চলেছে—"আজব টোপি, আজব চোগা!" আজবের মধ্যে আমার দুটিমাত্র পদার্থ—দুটিই তিব্বতীয় এবং শীতের সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু আজবের সংগ্রহ এ গরীবের চেয়ে আমীর-পুত্র-কয়টির অনেক বেশি ছিল সুতরাং যুদ্ধে আমারই হার লেখা গেল। এক মেমসাহেব শিলাতলে বসে মসুরী-ভ্রমণের নোট নিচ্চেন। তিনিও

দেখলাম আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই চট্ করে খাতায় কি-এক লাইন টুকে নিলেন। তাঁর সে নোট ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দুই-একজন নিকট বন্ধুছাড়া আর কারু হাতে পড়ছেনা। যাই হোক, এইরকম সব ছোট-খাট উৎপাত এড়াতে মানুষের পথে আমি চোগা ছেড়ে একটা প্রকাণ্ড সোলাটুপি ও তদুপযুক্ত চাঁদনীর কোট-প্যাণ্ট পরিধান করে বিচরণ করে বেড়াই। তাতে মানুষেরা আমায় আর তাড়া দিচ্ছেনা বটে কিন্তু মানুষের উল্টোপিঠের জীব যারা তারা আমাকে তরুশাখার উপর থেকে একটা আয়না দেখিয়ে ইঙ্গিত করতে ছাড়েনা। সুতরাং বলার জ্বালায় আমার চলা দুর্ঘট হয়েছে—কি পথে, কি বিপথে। অথচ ডাক্তার পরামর্শ দিচ্ছেন চলবারই।

পথে যাই, কি বিপথে; চলি, কি না চলি!—এই দোটানার মধ্যে যখন আমি ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় কোনো-রকমে পথ-বিপথ দুইয়েরই মান রেখে দিনযাপন করছি,—সেই-সময় দেখি পর্ব্বত একেবারে আপাদমস্তক ফুলের সাজ পোরে সহসা বসন্তের বাসর জমিয়ে বসেছেন। "ফুলন ফুলত ভার ভার!" যত পাতা তত ফুল! যেখানে যত ধরা ছিল—পাথরের বুকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়—সূর্য্যের উদয়-অস্তের যত রং, আজ তারা ফুল হয়ে বাহিরে এসেছে! ঋতুরাজের বাঁশীর ডাকে পৃথিবীর সমস্ত সবুজ রংটা দেখছি বিপুল হিল্লোলে মেঘ অতিক্রম করে গিরিশিখর পর্য্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে! মেঘের বুক থেকে ইন্দ্রধনুর ফোয়ারা সাতরঙের পিচকারি আকাশে ছিটিয়ে দিচ্ছে; আর সন্ধ্যার কুঙ্কুম, সকালের হলুদে হিমালয়ের সাদা আর গেরুয়া বসনের দুই পিঠই দুইবেলা রঙের প্লাবনে ডুবিয়ে দিয়ে বইছে উত্তর তীরের বসন্ত বাতাস।

বসন্তের সঙ্গে অকস্মাৎ পরিচয়ের আনন্দটা আমার পথ-বিপথ দুটোরই ভাবনা ঘুচিয়ে দিয়েছে। আমি আজকাল যখন যে সাজটা হাতের কাছে পাই সেই বেশেই ঋতুরাজের দরবারে ত্রিসন্ধ্যা হাজির দিচ্ছি—একেবারে নির্ভয়ে।

ইনি এই পর্ব্বতের এক নামজাদা মহিলা আর্টিষ্ট! আজ কদিন ধরে আমার যাবার-আসবার পথ-আগ্‌লে হিমালয়ের একটা দৃশ্য-পট লিখতে বসেছেন। সমস্ত উত্তরদিক জুড়ে তুষারের উপরে সন্ধ্যা মুঠো-মুঠো ইন্দ্রধনুচূর্ণ ছড়িয়ে আল্‌পনা টেনে যাচ্ছেন,—মনেই ধরা যায় না সে এমন বিচিত্র—একটুক্‌রো সাদা কাগজে এরি নকল নিচ্ছেন আমাদের এই মহিলা আর্টিষ্ট!

উপহাসকে সেদিন আর পুরু পাহাড়ি-চোগার মধ্যে ঢেকে রাখা গেলনা। সে একটা অকাল বাদলের আকার ধরে বাতাসে, কুয়াসায় ও জলের ঝাপ্‌টায় চিত্র-কারিণীর রং তুলি কাগজপত্র উড়িয়ে নিয়ে অবশেষে তাঁর অতি-আবশ্যকীয় রং-মেশাবার জল-পাত্রটি পর্য্যন্ত উল্টে দিয়ে, দুরন্ত একটা পাহাড়ি ছাগলের পিছনে-পিছনে পলায়ন করলে একেবারে গিরিশৃঙ্গে।

এই দলের এক আর্টিষ্টের কতকগুলো

ছবি নিয়ে একটা লোক কোন্-একটা পাহাড়ে শিল্প-প্রদর্শনী খুলেছে! যিনি কবি যিনি কর্ম্মী তিনি ঐ নীল আকাশ-পটে আলো-অন্ধকারের টান্ দিয়ে ছবি সৃষ্টি করছেন, আর আমরা যারা কবিও নই, শিল্পীও নই, ঐ আসল ছবিগুলো দেখে একটা একটা জাল দলিল প্রস্তুত করে নিজেদের নামের মোহরটা খুব বড় করেই তাতে লাগিয়ে দিচ্ছি—নির্লজ্জভাবে।

মানুষ সে মানুষই, বিধাতা তো নয় যে, তার সৃষ্টিটা বিধাতারই সমান করে তুলতে হবে? মানুষের শিল্প মানুষকে আগাগোড়া স্বীকার করে বিশহাত দশমুণ্ডু অথবা বিধাতার গড়া নরনারীমূর্ত্তির চেয়ে সুন্দর হয়ে যদি দেখা দেয় দিক্, তার মধ্যে প্রবঞ্চনার পাপ তো ফুটে ওঠে না! কিন্তু তুষারপর্ব্বত না হয়েও যেটা তুষারের ভ্রম জন্মে দিয়ে চলে যেতে চায় সেটাকে আমরা কি বলব? সে যে বিধাতা এবং মানুষ দুয়েরই সৃষ্টির বাহিরে থেকে দুজনকেই অপমান করতে থাকে!

আমার এ বাগানে ফুল আর ধরছেনা। প্রতিবেশী সাহেব-সুবার ছেলেমেয়েরা—তাদের আঁচল নেই—খড়ের টুপি ভরে ফুল লুট করে নিয়ে চলেছে। আমাদের গয়লা-মালী, তার অনেক যত্নের এ-ফুল। ওই শিশু-পঙ্গপালের বিরুদ্ধে সে আমার কাছে নালিশ জানায় বটে কিন্তু ফুলের মোকদ্দমা তার দিনের পর দিন মুলতুবিই থাকে।

সেদিন এই গয়লার একটা কালো বাছুর খাদ্যাখাদ্য বিচার না করেই নিতান্ত ছেলেমানুষি-বশত সাহেবদের বাগানের একটা ফুলগাছ সমূলে নিঃশেষ করে ধরা গেছে। সাহেবের চৌকিদার বাছুরকে থানায় দিতে চলেছে। পথে বেচারা অবোধ জীব মানুষের এই আইনের বিরুদ্ধে বিষম আপত্তি জানাচ্ছে এবং দেখছি তার বড় বড় দুটো চোখ চারিদিককে কেবলি প্রশ্ন করছে সকাতরে—কি তার অপরাধ জান্‌তে। গোরু বাছুরের উপরে চৌকিদারের একটা শ্রদ্ধা অনুমান করেই যেন সাহেব পুলিশের উপর একখানি জবাবি চিঠি দিয়েছিলেন। সুতরাং উৎকোচ দিয়ে যে নিরপরাধ জন্তুটিকে খালাস করে দিই এমন উপায়ও ছিল না। তখন গয়লাকে তার বাছুরের হয়ে ত্রুটি স্বীকার করে মার্জ্জনা-ভিক্ষা করতে পাঠিয়ে দিয়ে ফুলের দুটা মোকদ্দমা একই দিনে নিষ্পত্তি করলেম। এমনি করেই নির্ব্বিবাদে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ফুল-ফোটার দিন অবসান হল।

যে পর্ব্বতটাকে ঘিরে চঞ্চল হরিণ-শিশুর মতো আমার চলার পথটি নৃত্য করে খেলা করে চলেছে তারি মেরুদণ্ডের ঠিক উপরে সজারুর কাঁটার মত ঘন দুই সারি দেবদারু। শরতের বাতাস এখান থেকে শব্দের একটা জাল নীল-আকাশে দিবারাত্রি নিক্ষেপ করছে। একদিকে হিমালয়, আর-একদিকে সহস্রধারার উপত্যকা—যেখানে সূর্য্য-উদয় এবং যেখানে সূর্য্যের অস্তগমন—এ দুই দিকই আমি দেখি এইখানটিতে বসে।

ফুলের রাজত্ব শেষ হয়েছে। আকাশের চোখে রঙের নেশা আর তেমন করে লাগে না; সূর্য্যের আলোতে ঝরা-পাতার কস্ ধরেছে, তুষারের সাদা দিনে-দিনে

নীল-আকাশে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—চাঁদের আলোর সঙ্গে সঙ্গে।

হিমালয়ের দিনগুলিতে বিজয়ার সুর লেগেছে। এই সুর লোহার কসের মত পাথরের গায়ে, ঘাসের সবুজে, সন্ধ্যার সিঁদুরে মিশিয়ে গিয়ে দিনান্তেরও পরপারে রাত্রির অনেকদূর পর্য্যন্ত আকাশের গায়ে গেরুয়ার টান্-দিয়ে-দিয়ে বাজছে। দিন যেন আর যায় না! শরতের চাঁদনী-রাতের তীরেও নীলাকাশের বিরহী নীলকণ্ঠ আপনার একটিমাত্র সুরে বেদনার নিশ্বাস টান্‌ছে শুনি—উঃ উঃ!

আজ আমাদের সে-দেশে নবমীর নিশি প্রভাত হল। এখানে শরতের সাদা মেঘের দুখানা ডানা নীল-আকাশে ছড়িয়ে আজকের দিনটি যেন কৈলাসের তুষারে-গড়া একটি শ্বেত-ময়ূরের মতো কার ফিরে আসার পথ চেয়ে পর্ব্বতের চারিদিকে কেবলি উড়ে বেড়াচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় দেখছি ঠিক সহস্রধারার উপত্যকার মুখে—পর্ব্বতের পশ্চিম গায়ে তৃণে-গুল্মে, লতায়-পাতায়, পাথরের গায়ে, পথের ধূলায়, ফুলের মতো, আবীরের মতো, মাণিকের আভার মতো একটা আলো জ্বল্‌জ্বল্ করছে; মনে হচ্ছে যেন তুষারের হৃদয়-রক্ত গলে এসে হিমালয়ের এই পশ্চিম-দুয়ারের সোপানে আল্‌পনার মত ছড়িয়ে পড়েছে। এরি উপর দিয়ে দেখছি, সন্ধ্যাতারার মত একটি বন-বিহঙ্গী, আলোয়-গড়া মোনাল পাখি সে, চলে গেল পায়ে-পায়ে গিরি-শিখর অতিক্রম করে—চাঁদনী-রাতের প্রাণের ভিতরে। আজ দেখলেম তুষারের শিখরে চাঁদ উঠছে আলোর একটা সুকোমলচ্ছটা আকাশে বিকীর্ণ করে। হিমালয়ের আর-সমস্তটা আজ অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। ঘরে এসে দেখছি এ-পাহাড়ের এক ভিখারী আমার জন্যে তার শরতকালের উপহারটি রেখে গেছে—একগোছা সোনালি কুশ আর কাশ! সুদূর পাহাড়ের কোন্ নিরালা পথের ধারে এরা নত হয়ে পড়েছিল, চলে যেতে কার সোনার আঁচল উড়ে উড়ে এদের স্পর্শ করে কনক-চূর্ণের বিভূতি দিয়ে এদের সাজিয়ে গেছে!

ভেঙে-পড়া দেবদারুর নির্য্যাস-গন্ধ দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়ে আজকাল বরফের হাওয়া বইতে আরম্ভ হয়েছে। পথ-দিয়ে ক্রমাগত কম্বল-পরা পাহাড়ির দল কাঠের বোঝা, ভালুকের আর বনবেড়ালের ছাল নিয়ে, গহন বন থেকে 'মোনালপাখির' সোনার পাখা, মৌচাকের সোনালি মধু চুরি করে ঘরে ঘরে ফেরি দিচ্ছে। কোনো দিকে কুয়াসার লেশমাত্র নেই, দিনরাত্রি সমান পরিষ্কার। কেলুগাছের ফলন্ত শাখায় প্রশাখায় গিরি-মাটির একটা রং লেগেছে।

পার্ব্বতী রুক্ষ রক্ত-বাস আপনার সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে কঙ্কালিনী বেশে দেখা দিয়েছেন। অনেক দূরের একটা পাহাড়; তার গায়ে একটি-একটি গাছ দ্বিপ্রহরে চাকা-চাকা কালো দাগ ফেলেছে;—যেন প্রকাণ্ড একখানা বাঘছাল রৌদ্রে বিছানো; এরি উপরে চির-তুষারের ধবল মূর্ত্তি সারাদিন সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটির-পর-একটি গিরিচূড়া হিমে সাদা করে দিয়ে শীত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে দেখতে পাচ্ছি। পর্ব্বতে পর্ব্বতে মানুষের জ্বালানো

দীপমালা থেকে দু-দশটা করে আলোর ফুলকি প্রতিদিনই দেখছি খসে পড়ছে, আর নীল-আকাশে দীপালী উৎসব ক্রমেই দেখছি নিবে উঠছে। এখানকার হাট ভাঙবার পালা সুরু হয়েছে, পূজোর ছুটির যাত্রীরা দলে দলে ঘোড়াতে ডাণ্ডিতে ক্রমে পর্ব্বত খালি করে দিয়ে নেমে চলেছে। মানুষের সুনন্দিন জীবনের সমস্তটা দৈন্য এবং অশোভনতা—দেশি-বিদেশি নির্ব্বিশেষে—তার কুলীর ঝুড়ি, আধপোড়া হাঁড়ি, ছিট্‌মোড়া ময়লা বিছানা, দড়ি-বাঁধা বাক্স, কড়ি-বাঁধা হুঁকা, হলুদের ছোপধরা চিনের বাসন নিয়ে ঘর ছেড়ে আজ রাস্তায় বেরিয়েছে এবং ময়লা জলের একটা নালার মতো পাহাড়ের গা-বেয়ে নেমে চলেছে।

এই যে কটা ঋতুর মধ্যে দিয়ে শীতের আগে পর্য্যন্ত এই পাহাড়ে লক্ষ লক্ষ পাখি এল—বাসা বাঁধ্‌লে, সংসার পাতলে, বাস করলে—আবার চলে গেল দূরদূরান্তরে, আকাশ-পথে দলে দলে; কি সুন্দর, কি স্বাধীন এদের গতিবিধি! আর মানুষ যে জলে-স্থলে-আকাশে আপনার রাজত্ব বিস্তার করে তার যাওয়ায় কি অশোভনতা! সিন্ধবাদের বিকটাকার বুড়োটার মত সে আপনার সঞ্চিত কাজের বাজের মূল্যবান অথচ মূল্যহীন আসবাবের আবর্জ্জনাকে বয়ে চলেছে দেখছি—বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে। পাখি চলে গেল, সে তার বাসার একটি কুটোও নিয়ে গেল না; আর মানুষ যেতে চাচ্ছে আস্তাবলের খড়-কুটোটা এবং আস্তাকুঁড়ের ভাঙা ঝুড়িটা, এমন-কি রাস্তার কাঁকরগুলো পর্য্যন্ত সংগ্রহ করে মোট বেঁধে নিয়ে।

প্রথমে এসে পর্ব্বতেপর্ব্বতে পথ-হারিয়ে আমি প্রায়ই অন্যের বাগানে অনধিকার প্রবেশ করে লজ্জিত হয়েছি, এখন সে-ভয় গিয়েছে। প্রায় অধিকাংশ বাড়িরই ফাটক বন্ধ এবং পর্ব্বতের গভীর থেকে গভীরতম প্রদেশের পথ একেবারে খোলা হয়ে গেছে। আমি সেখানে অবাধে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছি। চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্তের মধ্যে দিয়ে ছবির পর ছবি, কিন্নরীর ঝাঁকের মতো চিত্র-বিচিত্র আলোর পাখনা মেলে, এ কয় দিন আমার অন্তরের বাহিরে সকালে-সন্ধ্যায় দিনে-রাতে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। এদের ধরতে গিয়ে দেখি, এদের সমস্ত শ্রী লজ্জাবতী লতার মতো আমার আঙুলের পরশে ম্লান হয়ে গেল। শীত এসেছে। হিমের অভিযানের পূর্ব্ব থেকেই গাছগুলো তাদের পাতার অনাবশ্যক বাহুল্য ঝেড়ে-ঝুড়ে আপনাদের সমস্ত শক্তি ভিতরে-ভিতরে সঞ্চয় করে বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে। বসন্তে ফুলের ভারে এরা নুয়ে পড়েছিল দেখেছি, আর আজ দুদিন পরে বরফের পীড়ন সুদীর্ঘ শীতের দিন-রাত্রিতে বহন করবে এরাই অনায়াসে,—ফুলেরই মতো পাতারই মত! পর্ব্বতের সক্ষম সহিষ্ণু সন্তান এরা, পাথরের বুকের ভিতরকার স্নেহ এদের বড় করে তুলেছে,—অটুট এদের প্রাণ!

আর মানুষ যাদের যত্নে বাড়িয়েছে সেই-সব ক্ষীণপ্রাণ গাছদের মালিরা দেখছি আজকাল তুষারের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য কাচ-মোড়া গরম ঘরে নিয়ে তুলছে—শুকনো ঘাসের রক্ষাকবচ তাদের সর্ব্বাঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে।

এখানকার পাহাড়িগুলো মোটেই পাহাড়ি নয়, তারা আসলে চাষী ;—যখন ক্ষেতের কাজ নেই, ডাণ্ডিতে এসে কাঁধ দেয়। এরা পাহাড়ের পথগুলো চেনে কিন্তু পাহাড়কে চেনে না, বরফকে এরা ভয় করে। পর্ব্বত যেখানে ক্ষেতের উপরে নদীর জলে আপনার ছায়া ফেলেছে সেখান থেকে উঠে এসেছে এরা ; আবার সেইখানেই ফিরে যেতে চায়। আজ কদিন ক্রমাগত এরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে বরফ পড়ল-বোলে! কাল আমাদের যেতে হবে; কালো মেঘের ভ্রূ-কুটি বিস্তার করে একটা ঝড় দূর পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে আজ আমাদের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছে। দিনের আলো নিষ্প্রভ, ধূসর আকাশ দুর্ব্বহ হিমের ভারে যেন নুয়ে পড়েছে। আমি পর্ব্বতের চূড়ায় একটা বন্ধ-বাড়ির বাগানে একলা উঠে এসেছি ;—ঠাণ্ডা দিনটির ভিতর দিয়ে একটানা বরফের হাওয়া মুখে এসে লাগ্‌ছে। একেবারে ছায়ার মতো ঝাপ্‌সা কালো-কালো পাহাড় গুলোর উপরেই আজ তুষারের সাদা ঢেউ যেন এগিয়ে এসে লেগেছে—চোখের সাম্‌নেই দাঁড়িয়েছে যেন! এ বাগানটা যাদের তারা চলে গেছে ; টিনের ঘরে তালা দিয়ে বাগানের যত ফুলগাছ সব রেখে গেছে। এদের বুড়ো মালী একটা কেলুগাছের তলায় কতকগুলো চারাগাছের উপরে খড়ের ঝাঁপ আড়াল দিচ্ছিল। সে আমাকে তার কাজ ফেলে বাগান দেখাতে লাগলো। কাচের ঘরে সাহেবের যত মূল্যবান সৌখিন ফুলের গাছ, জাল-দিয়ে-ঘেরা ; টেনিস্ খেলার একটা চাতাল, এর উপরে একহাত বরফ সেবারে পড়েছিল ; এইটে মেম-সাহেবের চা-পানের মণ্ডপ ; এই রাস্তা দিয়ে সাহেবের ঘোড়া পর্ব্বতের উপর আস্‌তে পারে, ওখানে সাহেবের কাছারির তাম্বু পড়ে, বাড়ির এই-দিকটা পুরানো আর ঐ-দিকটা সাহেব অনেক ব্যয়ে নূতন করে বানিয়েছে ইত্যাদি অনেক দেখিয়ে মালী আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে এসে বল্লে, ঐযে ভাঙা বাংলাটা ঐটেই যে এ-বাগান প্রথম বানিয়েছিল তার ; ওদিকে আরো অনেকটা বাগান ছিল বরফে ধ্বসিয়ে দিয়েছে ; আমি ছোটবেলায় সেই বাগান দেখেছি। মালী যেদিকে দেখালে সেদিকে তুষার-পর্ব্বত পর্য্যন্ত নির্ম্মল একটী শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। এরি ধারটিতে সেই ভাঙা বাংলা ; ভাঙনের গা-বেয়ে একটি গোলাপ-লতা ভাঙা ঘরখানার চালের উপর দিয়ে একেবারে তুষার-পর্ব্বতের দিকে ঢলে পড়েছে—ফুলের একটা উৎস! এর কাঁটায় কাঁটায় ফুল, গাঁটে গাঁটে ফুল,—পর্ব্বতের শিখরে এ যেন একটা ফুলের স্বপ্ন! বসন্তের বুল্‌বুল্ নয়, তুষারের সাদা পাখি একে ডেকেছে—শূন্যতার ঐ ওপার থেকে!

* * * *

অবরোহণ

চলা বলা সব বন্ধ করে যা-কিছু কুড়োবার কুড়িয়ে, যা-কিছু গুড়োবার গুড়িয়ে বসেছি। পাহাড়ের নীচে থেকে কুলীর সর্দ্দার চিৎকার করে ডাক্‌ছে—'ফাল্‌তো ফাল্‌তো, হারেরে বেগার কুলী!'

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চল্‌তি ভাষা

বাংলা সাহিত্য চলে এতে অনেকের আপত্তি দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ তাঁরা বলচেন, সাহিত্যের বাহন ভাষা যেন চল্‌তি না হয়।

শুধু ভাষা কেন, অনেক বিষয়েই এই চলা-জিনিষটায় বাধা-দেওয়া আমাদের স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে। সমাজে যারা অচল তাদের চলতে দিয়োনা ; দেশ-ছেড়ে সমুদ্র-পারে কাউকে যেতে দিয়োনা—এমনিতর যত যে চলার উপর নিষেধ আছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সেই জন্য মনে হয়, ভাষা চল্‌তি হবে—এতে আমাদের দেশের আপত্তি হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু যে জিনিষটা চলে তার একটা বেগ থাকে—সে ধাক্কা দেয়—অর্থাৎ তার আশপাশে যা চলে না তাকে আঘাত করে তবে সে চলে এবং সেই আঘাতে অচলতা শিথিল হতে থাকে।

বিলাত-যাত্রাটা ঐ-রকম করে আমাদের সমাজে চলে যাচ্ছে। প্রথম-প্রথম এর বিরুদ্ধে আপত্তির গলার জোর যতটা ছিল এখন তা ক্ষীণ হয়ে আসছে। বরং কোনো কোনো সমাজ-সভা আপত্তির কারণ আর খুঁজে পাচ্চেন না। তার মানে এই যে, যেটা চলচে সে ধাক্কা দিয়ে-দিয়ে অচলতাটাকে চলার স্রোতের মুখে এনে ফেল্‌চে।

প্রথম যখন বিলাত যাবার কথা ওঠে তখন অচলতা বলে উঠেছিল, যাচ্ছ যাও, কিন্তু আমাদের এই গণ্ডীর মধ্যে তোমার প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, অচলতা নিজের পাথরের দেয়ালে নিজে সিঁধ-কেটে তাদের গলিয়ে নিচ্ছে।

তার কারণ এই যে, প্রয়োজনীয়তার একটা তাগিদ আছে। যতক্ষণ মানুষের ভিতর এতটুকু প্রাণ থাকে ততক্ষণ সেই প্রয়োজন তাকে স্থির থাকতে দেয় না—তার দাবি মেটানো চাই। প্রয়োজন জিনিষটা ভালো নয় বলে তাকে গাল-মন্দ পাড়তে পারি কিন্তু সে তাতে মরে না।

সেই জন্য দেখতে পাই, শাস্ত্রে খুব কঠোর বিধান থাকলেও এবং তাই নিয়ে আমরা মহা আস্ফালন করলেও ছত্রিশজাতের সঙ্গে একত্রে রেলগাড়িতে না গেলে এবং জল না খেলে এখন আমাদের উপায় নেই। এবং মহা-হিন্দুকুলোদ্ভবের সন্তানকে বিদ্যালয়ে এমন ছেলের সঙ্গে একাসনে বসতে হয় যার ছায়া মাড়ালে শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে। যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা না করেও এখন ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় রাখা চলে ;—দাস্যবৃত্তি প্রভৃতি ইতর কর্ম্মে তা পতিত হয় না।

* *
*

ভাষার ভিতরেও একটা প্রয়োজনের তাগিদ আছে। সে তার স্ফূর্ত্তির জন্যে চারদিকে হাত বাড়াচ্ছে। তাকে যদি তুমি ঘরে বন্ধ রাখতে চাও, সে শুনবে কেন? সে বলবে, তা হলে তো আমি মর্‌লুম! আমি বেঁচে আছি—আমার

এই চাই! তা সে তোমার ব্যাকরণ না দেয় জোর করে নেব।

এই জোর তার যার প্রাণের বেগ আছে। আমাদের ভাষা এখন প্রাণবন্ত। সেই জন্য সে চুপ করে থাকতে পারে না;—সে চলবেই, তাকে চল্‌তি হতেই হবে। তাকে যদি বল—চোলোনা। সে বলবে, রোসো আগে মরি! তার পর যা হয় হবে।

আমাদের সমাজের মধ্যে যেমন, ভাষার মধ্যেও তেমনি একটা অচলতা আছে। সে বলছে চল্‌তিটাকে আমাদের পংক্তিতে বসতে দেব না। কিন্তু এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে ঐ সমাজটার মতো সেও নিজের ঘরে সিঁধ-কেটে চল্‌তিটাকে একটু-একটু করে টেনে নিচ্ছে। তার মুখে নিজেদের মুখোস পরিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে বটে কিন্তু সে মুখোস ক্ষণে ক্ষণে খসে পড়ছে। এই ছিদ্র যখন একবার পেয়েছে তখন চল্‌তি ভাষা তারই মধ্য দিয়ে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে নেবে। দেয়ালের সিঁধটা তখন এত-বড় হয়ে উঠবে যে দেয়ালের চিহ্নমাত্র থাকবে না।

এখন যাঁরা চল্‌তি ভাষার বিরুদ্ধে আপত্তি করে প্রবন্ধ লিখছেন তাঁদের ভাষার ভিতর থেকেও ঐ অর্ব্বাচিনগুলো একটা বিদ্রূপের হাসি হাস্‌তে-হাসতে ছুটে চলেছে দেখতে পাই—তাদের আনন্দের নৃত্য দেখে কে! তাদের কচি-গলার কলরোল বৃদ্ধের গাম্ভীর্য্যটাকে কোথায় তলিয়ে দিচ্ছে তার ঠিক নেই।

* *
*

সাহিত্য কার ইঙ্গিতে চলে এক-একজন প্রতিভাবান এসে সারথি হ তাঁরাই সাহিত্যকে গতি দান করেন এঁদের দ্বারাই সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি হয়; বাকি লোক তাঁর অনুকরণ বা অনুসর করে।

যিনি সাহিত্যের মহারথী তিনি হাঁকিয়ে চল্লে সেই রথের চাপে সাহিত্যে রাস্তা আপনি তৈরি হয়ে ওঠে। সে কল্‌কাতার মধ্যেই চলুক, কি ঢাকায় চলু তাতে কিছু আসে-যায় না। আজকে দিনে কল্‌কাতার রাজপথে সাহিত্যের মহার আকাশে ধ্বজা উড়িয়ে চলেছেন—সম বাংলা দেশ সেই দিকে অবাক হয়ে চে আছে। এমন যদি কোনো দিন আ যখন ঢাকার পথে এমনিতর করে রথ ঢাকা ঘর্ঘর শব্দে চলতে থাকবে তখন সম বাংলা দেশ ঢাকার দিকেই অবাক ফেরাবে;—সেই রথের আগে তার হৃদয়ে শ্রদ্ধার নমস্কার আপনি অবনত হয়ে পড়বে তুমি বাঁধা-পথ তৈরি করতে চাচ্চ—সে বাঁধা-পথে যে সাহিত্যের মহারথী র চালাবেন এমন সুবোধ বালক তিনি নন তাঁর কাজই যে ওই যে তাঁকে নতুন প দেখাতে হবে।

বর্ত্তমান সাহিত্য-রথী যে-পথ তৈ করে দিচ্ছেন, সে-পথে তোমার-আমার মতে সামান্য কারবারিকে চলতেই হবে। পূর্ব্ব অঞ্চল পশ্চিমের প্রতি অভিমান করে ব থাকলে চলবে না। এখন ঐ এক রাস্তা কারণ আর-সব পথ অন্ধকারে ঢেকে আসছে—অব্যবহারে মরে আসছে;

পথ অচেনা অজানা হয়ে পড়েছে। তার গতি থেমে গেছে—তাকে ছাড়িয়ে চলবার ডাক আমরা শুনতে পেয়েছি। কাজেই যে-পথ তৈরি-হতে-হতে চলেছে সে-পথের যাত্রী আমাদের হতেই হবে। তার বিরুদ্ধে চীৎকার কয়ে গলা ভাঙতে পারি, আর-কিছু পারব না। সারথির রথের চাকার চাপে-চাপে সাহিত্যের পথ তৈরি হতে হতেই চলবে।

* *
*

সাহিত্যের ভাষা চল্‌তি না হয়ে যে উপায় নেই। যে জীবনকে অবলম্বন করে সাহিত্য, সেই জীবন যে স্রোতের মতো বহে চলেছে। চলবার মুখে সে নূতনকে লাভ করছে। সে ত গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে সূর্য্যস্তোত্র আবৃত্তি করচে না যে, তার মুখস্থ বুলি আউড়ে গেলেই চলবে। সে যে-নূতনকে পাচ্ছে তার আনন্দ ব্যক্ত করবার জন্যে তাকে চেষ্টা করতে হচ্ছে। সেই চেষ্টার মুখে নূতন শব্দ, নূতন ঝঙ্কার, নূতন সুর ধ্বনিত হয়ে উঠে তার মনের নূতন সজীবতাকে প্রকাশ করছে। এমনি করে সে সৃষ্টি করছে। এই সৃষ্টিই ত সাহিত্য।

পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের জীবন যেখানে ছিল সেখানে আর নেই—সেই কালকে অতিক্রম করে সে চলে এসেছে। ক্রমাগতই নূতনের পথে আমরা চলেছি—সঙ্গে সঙ্গে ভাষা আমাদের চলেছে। এই চলার পথে আমাদের জীবন থেকে যেমন অনেক জিনিষ ঝরে পড়েছে—তেমনি ভাষা থেকেও ঝরেছে। এখনও অবশ্য ঢের পুরাতন জিনিষ আছে বটে। কিন্তু তাদের প্রাণ আছে বলেই তারা আমাদের সঙ্গে দৌড়ে চলতে পারছে। যেদিন পথের মধ্যে মুখ-থুবড়ি খেয়ে মরবে সেদিন সেখানেই সে পড়ে থাকবে—জীবন্ত যারা তারা এগিয়ে চলে যাবে। এমনি করে ভাষার অনেক শব্দ, অনেক আচার অতীতের কবরে চাপা পড়ে আছে—তারা আর আমাদের জীবনের সঙ্গী নয়, সেইজন্য সাহিত্যেরও সঙ্গী নয়।

যারা অবশ্য অচল তাদের সঙ্গে পুরাতনের বন্ধুত্ব অটল হয়ে থাকে। কারণ তারা কেউই চলচে না—দুজনেই এক-জায়গায় মুখোমুখি করে দাঁড়িয়ে আছে। নতুন তাদের কাছে ভয়ানক!

* *
*

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে পুরাতন সাহিত্য কি একেবারে ব্যর্থ? পুরাতনকে ছাড়তে-ছাড়তে এমন জায়গায় আমরা এসে পৌঁছব যেখানে পুরাতন আমাদের কাছে একেবারে অপরিচিত হয়ে পড়বে? একেবারে ব্যর্থ না হোক, অপরিচিত যে হয়ে পড়ে তার প্রমাণ ত হাতে-হাতে। বাংলার প্রাচীন পদাবলী হেঁয়ালির মতো হয়ে আসছে। তবে কি আমরা প্রাচীন সাহিত্য থেকে রস পাই না? পাই। কিন্তু সে কেমন করে? না, সেই প্রাচীন সাহিত্যকে আমাদের আয়ত্ত করতে হয়। তার শব্দকোষ, তার ব্যাকরণ আমাদের জানতে হয়, তবে তার কাছে আমরা ঘেঁসতে পারি। এই ব্যাকরণ, এই শব্দ-কোষ সেই-পথ তৈরি করে দেয় যার

ভিতর দিয়ে আমরা প্রাচীন সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ করে তার শিল্প-সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করি। ব্যাকরণের স্বার্থকতা ঐ-খানেই। নইলে চল্‌তি ভাষা ব্যাকরণের কোনো ধার ধারে না। ব্যাকরণ না পড়েও তুমি চল্‌তি ভাষা শিখতে পার। কিন্তু যে ভাষা চলচে না তার জন্যে তোমার ব্যাকরণ চাই। সেই ব্যাকরণের বাতি হাতে করে অপরিচিত রাজ্যে আমরা প্রবেশ করি—তার শোভাসম্পদ দেখি। একথা সব দেশের সব সাহিত্য সম্বন্ধেই খাটে। অত কথায় কাজ কি, আধুনিক বাংলা এখন এমন জায়গায় পৌঁছেচে যেখান থেকে প্রাচীন বাংলার দিকে ফিরতে গেলে ঐ বাতির আলো দরকার হয়ে পড়বে।

* *
*

প্রাচীন সাহিত্য যতই সম্পদশালী হোক আমাদের কাছে সে কতকটা মরা। কারণ সে পিছনে পড়ে আছে—আমাদের সঙ্গে চলচে না। তার ভিতরে যে জীবন আছে, যে মানুষ আছে, যে শব্দ আছে সুর আছে, যে চিত্র আছে তার কোনো পরিচয় আমাদের আধুনিক জীবনে নেই। সেই জন্যে বলতে হয়, প্রাচীন সাহিত্যের রস আমরা যতই উপভোগ করি না কেন সেকালের রসিকদের মতো যে নয় তা ঠিক। কোথায় এখন সেই শান্তশ্রী তপোবন? সেই আশ্রম? সেই মুনিঋষি? সেই ঋষিকন্যা? সেই রাজা, রাজসভা, বিদূষক? তারা ত এখন কল্পনায়। যে আবহাওয়ার মধ্যে এই সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে সে হাওয়া এখন সেই। তার ছায়া এখন আমাদের ভাষায় তর্জ্জমা করে তবে তার আনন্দ পাই। তার প্রত্যেক শব্দটি অনুবাদ করে নিতে হয়; তার টীকা, তার ভাষ্য চাই। এতে করে আসল জিনিষটি নিশ্চয় পাই না। এ অনেকটা তেমনি, যেমন-করে ইংরাজি সাহিত্য থেকে আমরা রস পাই। তাদের নাইটিংগেলের গান কখনো শুনিনি, তাদের জেস্‌মিনের গন্ধ কখনো নাকে পাইনি, তবু তাদের কবিতা থেকে যে আনন্দ পাই সে আনন্দ কতকটা কোকিলের গান, কতকটা জুঁইয়ের গন্ধ থেকে চয়ন করি। সে আনন্দ যে ঠিক ইংরাজ-পাঠকের আনন্দ নয় তা বলতেই হবে। অবশ্য আমাদের নিজের দেশের জিনিষকে, তা পুরাতন হলেও, আমরা বিদেশী জিনিষের চেয়ে বেশী করে উপভোগ করতে পারি—কারণ তার সঙ্গে আমাদের নাড়ির যোগ আছে।

তা ছাড়া সাহিত্যে এমন কতকগুলি মূল জিনিষ থাকে যা চিরন্তন। তারই জন্যে সব দেশের, সব কালের সাহিত্যের রস উপভোগ করতে আমাদের বাধে না। মানুষ চিরকাল প্রেমের মোহিনী শক্তিতে বাঁধা পড়েছে। যেখানে সে প্রেমের রূপ দেখে, আত্মহারা হয়, আনন্দ পায়। মানুষের জীবনের ভিতর, তার সমাজের ভিতর এমনিতর কয়েকটি চিরন্তন সম্পদ আছে যা কোনো দেশ-কালের দ্বারা আবদ্ধ নয়, —যার রূপ কালে কালে কিম্বা দেশবিভেদে পরিবর্ত্তিত হলেও সে ভিতরে একই থাকে। তার ঘাত-প্রতিঘাতে বিশ্বের মানুষ উঠছে

পড়ছে,—তার দ্বন্দে ছন্দে আনন্দে, তার ভয়ে বিস্ময়ে, তার আশায় নেশায় মানুষ চলচে-ছুটছে, ভাঙচে-গড়ছে, দিচ্চে-নিচ্চে। তারই রূপ মানুষ সাহিত্যে প্রতিফলিত করে,—কারণ সাহিত্যে মানুষ নিজের কথাই বলে। সেই রূপের রসে মানুষ মুগ্ধ হয়। সেইজন্য একদিকে সাহিত্য প্রাচীন হলেও তার একটা নবীনতা চিরদিন থাকে। কিন্তু সে নবীনতা ভাবের,—ভাষার নয়। ভাষা চিরদিন চলতে থাকে। যখন তার কথা ফুরিয়ে যায় তখনই সে থেমে পড়ে। যার কিছু বলবার নেই সেই ভাষাকে থামতে বলে,—চল্‌তি হতে মানা করে।

প্রাণশক্তির বিকাশ

প্রাণ-শব্দের মূলার্থদ্বারাই বায়ু যে ইহার প্রকৃত আশ্রয় তাহা বুঝিতে পারা যায়—কারণ বায়ুবাচক 'অনিল' শব্দ ও 'প্রাণ' শব্দের একই অন্ ধাতু মূল দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ু সমস্ত জীবনের প্রাণতত্ত্ব বলিয়াই ইহার এক নাম 'জগৎ-প্রাণ' হইয়াছে, যথা—"সমীরমারুতমরুজ্জগৎপ্রাণসমীরণাঃ॥" বায়ু এইরূপে জীবনের অবলম্বন হওয়ায় একদিকে "প্রাণধারণ" দ্বারা যেমন আমরা জীবিত থাকা বুঝি—তেমনই "প্রাণবিয়োগের" দ্বারা মরিয়া যাওয়া বুঝিয়া থাকি।

শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারাই আমাদের প্রাণবায়ুর কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। সুতরাং শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গেই যে প্রাণের সম্বন্ধ তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই প্রকারে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে প্রাণের সম্বন্ধ হইতে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থার মধ্যেই যে প্রাণশক্তি-বিকাশের আভাষ দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা অনুমান করিতে পারি। বস্তুতঃ প্রাণিতত্ত্বের আলোচনা করিলে ভিন্ন ভিন্ন জীব-বিকাশে শ্বাসপ্রশ্বাসের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাই পরিদৃষ্ট হয়। মনুষ্যাদি উচ্চশ্রেণীর জীবে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসের যে ব্যবস্থা দেখিতে পাই—সে ব্যবস্থা প্রথম হইতেই হয় নাই; ক্রমবিকাশের নিয়মেই ঘটিয়াছে।

কীট পতঙ্গ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীতে মনুষ্যদিগের ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বতন্ত্র যন্ত্র বিদ্যমান দেখা যায় না। ইহাদিগের দেহের বহিরাবরণের দ্বারা বা দেহস্থিত রন্ধ্র-বিশেষের সহিত সংযুক্ত শাখাপ্রশাখাযুক্ত শিরাদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। (১) ইহার পরই মৎস্যজাতির কান্‌কোর ন্যায়

(১) "Zoophytes, it is true, have no special respiratory organs, but then the air is admitted freely to all parts of the body. The same is the case with insects, and they possess, in addition, an express provision for introducing the air into the system. In them cavities, or stigmata, are found which communicate

শ্বাসযন্ত্রের বিকাশ হইয়া থাকে। ইহাকেই শ্বাস-যন্ত্রের প্রথম বিকাশ বলা যায়। তাহা হইলেও ইহা শ্বাসযন্ত্রের বহির্ব্বিকাশমাত্র. শ্বাসযন্ত্রের অন্তর্ব্বিকাশ প্রথম সরীসৃপ জাতীয় জীবেই লক্ষিত হয়। কিন্তু ইহারা নাসিকা দ্বারা বায়ু গ্রহণ না করিয়া মুখের দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের শ্বাস-যন্ত্র যেমন অসম্পূর্ণ, হৃদ্‌যন্ত্রও সেইরূপ। তাহাতেই ইহাদের প্রাণশক্তির বিকাশ অসম্যক্ দেখা যায়। (২)

সরীসৃপের পর পক্ষিজাতির শ্বাসযন্ত্র। সরীসৃপের ন্যায় যেমন ইহাদিগের ফুস্‌ফুসের দ্বারা বায়ুগ্রহণের ব্যবস্থা আছে—পতঙ্গ দিগের ন্যায়ও তেমনই ইহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা বায়ুগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। (৩)

স্তন্যপায়ী-প্রাণীদিগের শ্বাসযন্ত্রকেই শ্বাস-যন্ত্রের শেষ বিকাশ মনে করা যাইতে পারে। ইহাদিগের মধ্যেও মনুষ্যের শ্বাস-যন্ত্রই সর্ব্বশেষ বিকাশ। কারণ অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদিগের শ্বাসযন্ত্র বক্ষঃস্থলে অবস্থিত হইলেও মনুষ্যের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া চলিতে না পারায় ইহাদের বক্ষঃস্থলের কুঞ্চন হেতু শ্বাসযন্ত্রের কুঞ্চন হওয়া সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। কিন্তু মনুষ্যজাতি দণ্ডায়মান হইয়া চলিতে পারায়—ইহাদের বক্ষঃস্থলের প্রশস্ততা হইতে শ্বাসযন্ত্রও প্রসারিত হইবার অবসর পায়। এই প্রকারে মনুষ্য জাতিতে শ্বাসযন্ত্রের পূর্ণতা হইতে প্রাণশক্তিরও যে পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে তাহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে। পরমায়ু প্রাণশক্তির অন্যতর পরিমাপক। পরমায়ু দ্বারা বিচার করিলেও কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যে সমস্ত জীবের মধ্যে শ্বাসযন্ত্রের বিকাশ হয় নাই তাহাদিগের আয়ুষ্কাল বিশেষরূপে পরিমিত দেখা যায়। মশকাদির জীবন এক দিনও নহে। কোন কোন পতঙ্গ ঊর্দ্ধপক্ষে সাত

---

freely with the atmosphere. These stigmata open into canals which lead into the two tracheae (or wind-pipes) that traverse the sides of the body and which are connected with each other by several tubes running across the body. From these tracheae branch off others, which with their subdivisions reach all parts of the system." The National Encyclopœdia—Respiration.

(২) Reptiles are furnished with lungs that communicate with the mouth. They do not inhale the air, like animals, but swallow it. As they have but one heart, only part of the blood which circulates through the body becomes arterialized, hence their cold blood and the imperfect development of their vitality.

The National Encyclopœdia.

(৩) The air which enters by the trachea, not only passes into the lungs, but by means of the bronchial tubes passes into the air-cells disposed over various parts of the body, which communicate with the interior of the bones. * * * In principle they resemble the air-cells of insects, and undoubtedly serve the same purposes." Th National Encyclopœdia.

বৎসর মাত্র আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তদঙ্গের পর মৎস্যসরীসৃপাদিকে অপেক্ষাকৃত বহুগুণ দীর্ঘায়ু দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন মৎস্য ২০০।২৫০ বৎসরেরও অধিককাল পর্য্যন্ত বাঁচে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহাদের তুলনায় স্তন্যপায়ীদিগের জীবন আরও সুদীর্ঘ দেখিতে পাওয়া যায়। হস্তী ৩০০ বৎসর পর্য্যন্তও বাঁচিয়াছে বলিয়া জানা যায়। মনুষ্যের জীবন এতদপেক্ষাও দীর্ঘতর ছিল বলিয়া শাস্ত্রাদিতে বিবরণ দেখা যায়। নোয়া (Noah) সাড়ে নয় শত বৎসর জীবিত ছিলেন বাইবেলে এইরূপ উল্লেখ আছে। আমাদের পুরাণেও দ্বাপর যুগে মনুষ্যের সহস্র বৎসর পরমায়ুর উল্লেখ দেখা যায়। আধুনিক কালেও কাশীধামস্থিত আমাদের মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর বয়স ৩০০ বৎসরের ঊর্দ্ধ ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।

মনুষ্যের পূর্ব্বের দীর্ঘ পরমায়ু বর্ত্তমানে হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ার ইহাই আমাদের নিকট স্বাভাবিক কারণ বলিয়া মনে হয় যে উচ্চ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য আয়ুঃক্ষয়কর নূতন নূতন বহু কর্ত্তব্য প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রাণিসাধারণ আহার-বিহার প্রভৃতি যে সমস্ত কার্য্য মনুষ্যকে করিতে হইত এক্ষণে তাহাকে তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক কার্য্য করিতে হয়। অপর প্রাণীদিগের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক প্রাণ-শক্তি অর্জ্জনের দ্বারাই মনুষ্য পশু-সাধারণ ভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই প্রকারেই শারীরিক, মানসিক, নৈতিক প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই মনুষ্য অপর প্রাণী সকল হইতে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

বর্ত্তমানের এই বিশিষ্ট সভ্যভাব সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধনের জন্য মনুষ্যের যে শক্তি ব্যয়িত হওয়ার প্রয়োজন হয়—তাহাতে আয়ুঃক্ষয় অবশ্যম্ভাবীই হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে কার্য্যের মাত্রা বাড়িয়া আয়ুর মাত্রা কমিয়া গিয়াছে। তাহাতেই এক্ষণে সময়ের দ্বারা জীবনের বিচার না হইয়া কার্য্যের দ্বারা জীবনের বিচার হয়। ইহাই প্রকাশ করিবার জন্য কবি বলিতেছেন :—

"In small proportions we just beauties see,'
And in short measures life may perfect be."

B. Johnson.

যে সমস্ত পশু মনুষ্যের সভ্যজীবনের সহচর হইয়াছে—তাহাদিগের আয়ুও পূর্ব্বোক্ত সভ্যতার প্রভাবেই খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে।

কেবল কার্য্যের ভারই যে আয়ুঃক্ষয়ের কারণ তাহা নহে, কৃত্রিম জীবনও আয়ুঃ-ক্ষয়ের কারণ। মনুষ্যদিগকে যেমন বর্ত্তমানে বহু প্রকারে কৃত্রিম জীবন যাপন করিতে হয়—তাহাদিগের পালিত জন্তুদিগকেও তদ্রূপ কৃত্রিম জীবন যাপন করিতে হয়। এই কারণেই মনুষ্য জাতির আয়ুঃ-পরিমাণ যেমন হ্রাস পাইয়াছে—মনুষ্যজাতি-পালিত পশুজাতির আয়ুঃ-পরিমাণও তদনুপাতে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও মনুষ্যের আয়ুঃপরিমাণই যে অধিক, নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদে তাহার প্রমাণ পাই।

"নরাগজা বিশেশয়। তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়।
বাইশ বল্‌দা তের ছাগ্‌লা। তার অর্দ্ধ বরা পাগ্‌লা॥"

"মানুষ ও হাতী একশত বিশ বৎসর বাঁচে। ঘোড়া তার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ষাট্ বৎসর বাঁচে। বলদ বাইশ বৎসর, ছাগল তের বৎসর ও শূকর তার অর্দ্ধেক বাঁচে।"

আমাদের শ্বাসযন্ত্রেই যে কেবল প্রাণবায়ু প্রবহমান হয় তাহা নহে, আমাদের নাড়ী নামক স্নায়ুজালের মধ্যেও প্রাণবায়ু প্রবহমান হইয়া থাকে। এই স্নায়ুজাল সর্ব্বদেহে পরিব্যাপ্ত থাকায় ইহাদের মধ্য দিয়া সর্ব্বদেহেই বায়ুপ্রবাহ সঞ্চালিত হয়। স্নায়ুসকল বায়ু হইতে যে পুষ্টি প্রাপ্ত হয় তাহাই আমাদিগের প্রাণশক্তিরূপে পরিণত হয়। তাহাতেই স্নায়ুশক্তি আমাদের প্রকৃত প্রাণশক্তি হইয়াছে। এই জন্যই স্নায়ুর শক্তি পরাহত হইলে আমাদের আর কোন কার্য্যই সম্ভবপর হয় না। বায়ু হইতে স্নায়ুশক্তি উদ্ভূত হয় বলিয়াই আমাদের ঋষিগণ বায়ুকে অন্তর্নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য যোগরূপ উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই যোগরূপ উপায়ে ঋষিগণ যে অলৌকিক শক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—তাহাই "যোগবল" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই যোগবল এরূপ দিব্যপ্রাণশক্তি যে ইহার দ্বারা ঋষিগণ মৃত্যুঞ্জয়ী পর্য্যন্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

পূরক, কুম্ভক, রেচক প্রভৃতি শ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া যোগেরই অঙ্গবিশেষ। যোগশাস্ত্রে ইহাদিগকে "প্রাণায়াম" নামে অভিহিত করা হয়। প্রাণের (জীবনের) আয়াম (দৈর্ঘ্য) সাধক বলিয়াই 'প্রাণায়াম' নাম হইয়াছে। জীবনের উপর ইহার প্রভাব শাস্ত্রে এইরূপে বিবৃত হইয়াছে :—

সর্ব্বপাপহরং প্রোক্তং প্রাণায়ামং দ্বিজন্মনাম্।
ততস্তস্যধিকং নাস্তি তপঃ পরমপাবনম্॥
নিরোধাজ্জায়তে বায়ুস্তস্মাদগ্নিস্ততোজলম্।
ত্রিভিঃ শরীরং সকলং প্রাণায়ামেন শুধ্যতি।
আকেশাদানখাগ্রাচ্চ তপস্তপ্যেৎ সুদারুণম্।
আত্মানং শোধয়েদ্‌যস্তু প্রাণায়ামৈঃ পুনঃপুনঃ।"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত অগ্নিপুরাণম্।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানে সম্প্রতি এই প্রাণায়াম প্রক্রিয়ার উপকারিতা কেবল যে স্বীকৃত হইতেছে তাহা নহে, ইহার অনুশীলনও হইতেছে।

এই প্রকারে কেবল শ্বাসযন্ত্র নহে, স্নায়ুমণ্ডলীও প্রাণশক্তির আধার হইয়াছে। মনুষ্যেই স্নায়ুর পরিণামের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাণশক্তির চরম বিকাশ যে মনুষ্যে হইয়াছে এতদ্দ্বারা আমরা তাহারই প্রমাণ পাইতেছি।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনাসকল হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে মনুষ্য যোগাভ্যাসের দ্বারা অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া যেমন ঈশ্বরত্বের অধিকারী হইতে পারে—প্রাণায়াম-অনুশীলনের দ্বারা শ্বাসবায়ুকে আয়ত্ত করিয়া তেমন আবার অমরত্বের অধিকারীও হইতে পারে। অতএব মনুষ্যে জীবনী-শক্তি যেমন শেষ সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে—জীবিতকালও তেমন শেষ-সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি। এইরূপেই প্রাণ শক্তির বিকাশ মনুষ্য জাতিতে আসিয়া বিশ্রান্ত হইয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অপরিমেয়

বেদনায়
প্রদোষ প্রবাল রূপ ম্লান হয়ে যায়
গৈরিকের করুণ আভায়,
কত অশ্রু শিশিরের অজস্র পতনে
গোধূলির স্বর্ণরাগ নিবে অযতনে,
অন্ধ-করা অন্ধকার চৌদিকে ঘনায়,
কত ধীরে কত বেদনায়!

কত করুণায়,
আঁধার ভেদিয়া ধীরে আকাশের গায়
গ্রহ-তারা ঘেরিয়া দাঁড়ায়,
ওঠে ছায়াপথ দূরে ছায়ার মাঝারে;
চন্দ্রালোকে চলে দৃষ্টি আঁধারের পারে,
কাতর কম্পিত প্রাণ ঊর্দ্ধপানে চায়
কার লাগি, কোন্ কামনায়?

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

রোঁদার শিল্প-চাতুর্য্য

Paul Gsell নামে এক ভক্তকে রোঁদা জ্ঞাসা করিলেন, "বাতির আলোয় তুমি কখন কোন প্রাচীন মূর্ত্তি দেখিয়াছ?"

"না।"

"তবে, আমি তোমাকে আশ্চর্য্য করিয়া ব। দিনের আলোতে ভাস্কর্য্য-কলার পূর্ণতাটুকু বেশ ফুটিয়া ওঠে বটে, কিন্তু তির আলোয় তাতে এক নূতনতর শ্রী খা যায়।"

রোঁদার শিল্পশালায় বিখ্যাত Venus Medicia একটি নকল প্রতিমূর্ত্তি ল। সেই মূর্ত্তির খুব কাছে একটা আলো রিয়া তিনি বলিলেন, "কি দেখিতেছ?"

সেই আলোকোজ্জ্বল মূর্ত্তিটির দিকে চাহিয়া ল প্রথম দৃষ্টিতেই এক আকস্মিক বিস্ময়ে ভিভূত হইয়া গেলেন।

আলোকপাতে মার্ব্বেলের উপর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অসংখ্য টোল ফুটিয়া উঠিল!—এমন যে হইতে পারে, পল তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

"মনোযোগের সহিত দেখ"—বলিয়া, রোঁদা আস্তে-আস্তে ভেনাসের মূর্ত্তিটি ঘুরাইয়া দিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য! মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে এমন-যে বন্ধুরতা আছে, দিনের বেলাতেও তাহা নজরে পড়ে না। প্রথম দৃষ্টিতে যাহা সহজ-সরল বলিয়া মনে হইতেছিল, এখন-যেন তাহারই মধ্যে বিচিত্র জটিলতার সৃষ্টি হইল।

রোঁদা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এ কি আশ্চর্য্য নয়? ঐ দেখ উরুর সঙ্গে যেখানে দেহের যোগ হইয়াছে, ঐ নত জায়গাটি কি-রকম ঢেউ-খেলানো!.....

নিতম্বের বঙ্কিম রেখাগুলি মানুষের মনে কত-না বাসনা জাগায়……আবার— এদিকে, কোমরের উপরের টোলগুলি— আহা, কি চমৎকার!”

ভক্তের উৎসাহে রোঁদা মৃদুস্বরে কথাগুলি বলিলেন,— মূর্ত্তির উপরে তিনি ঝুকিয়া ছিলেন—যেন তিনি তাহাকে প্রাণে-প্রাণে ভালবাসেন।

“এযে সত্যিকার রক্ত-মাংস! এ ত পাথর-দিয়া-গড়া নয়, চুম্বনে আদর-সোহাগে গড়া!—” প্রতিমার উপরে হঠাৎ হাত রাখিয়া রোঁদা বলিলেন, “এর গায়ে হাত দিতে গেলে মনে হয়—এ দেহেও যেন জীবনের উত্তাপ আছে!”

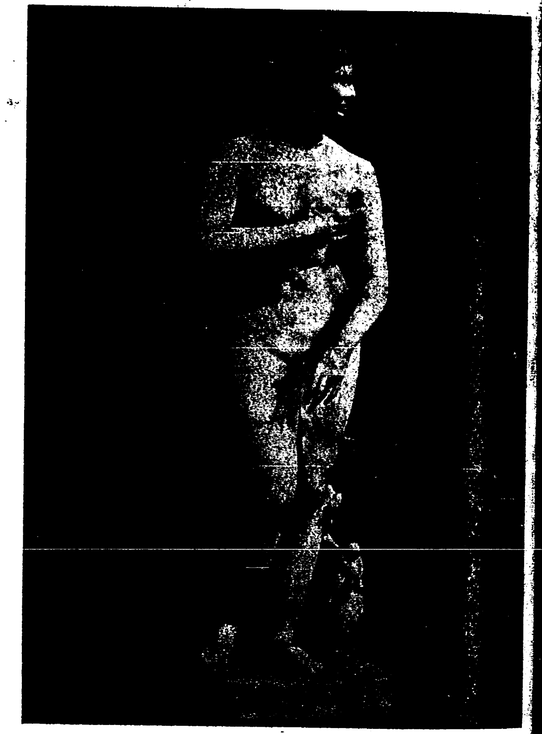

মেডিসি ভেনাস

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া, তিনি আবার বলিতে লাগিলেন;—

“শিল্প-বিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের মত-সম্বন্ধে এখন তোমার কি মনে হয়? তাঁরা বলেন, গ্রীক আর্টে রক্ত-মাংসকে পার্থিব বলিয়া ঘৃণা করা হইত—কারণ, প্রাচীন শিল্পীরা যখন আদর্শকে ফুটাইতে যাইতেন, তখন তাহার বাস্তবতার হাজার খুঁটিনাটি মানিতে চাহিতেন না!

প্রাচীন শিল্পীরা নাকি সরল, নির্দ্দোষ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতিকে শিক্ষা দিতেন—ইহাই এখন প্রমাণ করিতে চাওয়া হয়!—গ্রীকদের চিত্ত ছিল যুক্তিসিদ্ধ। সুতরাং, তাঁহারা যে প্রত্যেক পদার্থের সারাংশটুকু বাছিয়া লইতে পারিতেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহারা মানব-আদর্শের প্রধান ও বিশেষ লক্ষণগুলিই গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু কখনও বাস্তবতার খুঁটিনাটিগুলি অবহেলা করিতেন না। —তাঁহারা কখনও মিথ্যা পদ্ধতির ধার ধারিতেন না। প্রকৃতিকে তাঁহারা সম্মান করিতেন—তাঁহাকে যেমন দেখিতেন, তেমনি দেখাইতেন। তাঁহাদের সকল কাজেই বাস্তবতার পূজা আছে। বাস্তবকে তাঁহারা দেখিতে পারিতেন না, এ-কথা মনে-করাও পাগলামি। এত স্নেহে, এত আদরে, এত আবেগে আর কোন দেশের লোক মানবের

দেহ-রূপ ফুটাইতে পারে নাই। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষাই মিথ্যা—প্রাচীন গ্রীক আর্ট নয়।

লোকে মনে করে, ভাস্করের সঙ্গে বর্ণের কোন সংশ্রব নাই—বর্ণ হচ্ছে চিত্র-কলার নিজস্ব। এ ধারণা ভুল।”

একটি প্রাচীন মূর্ত্তির উপরে আলো তুলিয়া ধরিয়া রোঁদা বলিলেন, “মূর্ত্তির বুকের উপর কেমন উজ্জ্বল আলো ও দেহের ভাঁজে ভাঁজে কেমন গভীর ছায়া পড়িয়াছে দেখ! এখানে কি শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের মিলন-সাধন হয় নাই? শক্তিধর ভাস্কর হইতে গেলে চিত্রকরের মতই বর্ণজ্ঞান থাকা চাই। কারণ, প্রতিমার উপরে তাঁহাকে আলো-ছায়ার বর্ণলীলা ফুটাইতে হয়! বর্ণজ্ঞান না থাকিলে ভাল সজীব মূর্ত্তি গড়িতে পারা যায় না।”



লৌহযুগ

“লৌহযুগ” ও Saint-Jean-Baptiste নামে রোঁদার গঠিত দুটি মূর্ত্তি আছে।— মূর্ত্তিদুটি একেবারে জীবন্ত—দেখিলেই মনে হয়, তারা যেন নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইতেছে!

Paul Gsell-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে রোঁদা বলিলেন, “হ্যাঁ, এই মূর্ত্তি-দুটিতে আর্টের অনুকরণ-শক্তির বিকাশ যে কতটা হইতে পারে, আমি তাহাই বিশেষরূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি; অবশ্য, আমার এমন মূর্ত্তি আরও অনেক আছে, যাদের মধ্যে সজীবতার অভাব দেখা যায় না। যেমন “ক্যালের নাগরিকগণ,” “ব্যালষ্যাক্” ও “চলন্ত মানুষ” প্রভৃতি।

এমন-কি, আমার গড়া যে-সব মূর্ত্তিতে ক্রিয়ার আভাস অল্প, তাহাদের ভিতরেও আমি কিছু-কিছু গতির সূচনা দিতে চেষ্টা করিয়াছি। একেবারে-অচল মূর্ত্তি আমি বড়-একটা গড়ি নাই।

জীবনের অভাবে আর্ট কি বাঁচিতে পারে? ভাস্কর যদি আমাদের কাছে সুখ ও দুঃখ বা অন্য-কোন বৃত্তির বিকাশ দেখাইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে জীবন্ত মূর্ত্তি গড়িতেই হইবে—তবেই আমাদের প্রাণে ভাবের প্রেরণা আসিবে। নহিলে, একখণ্ড জড় প্রস্তরের সুখ-দুঃখে কিসের জন্য আমরা বিচলিত হইব? ভাল গঠন-ক্ষমতা ও গতির লীলাই হচ্ছে ভাস্কর্য্যের প্রাণ।”

Paul Gsell বলিলেন, “আচার্য্য, আপনার ‘লৌহ-যুগের’ মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, সে-যেন জাগিয়া নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে হাত তুলিতেছে; আপনার “সেণ্টজনে”র মূর্ত্তি যেন বিশ্বে সত্যপ্রচারের জন্য পাদপীঠ

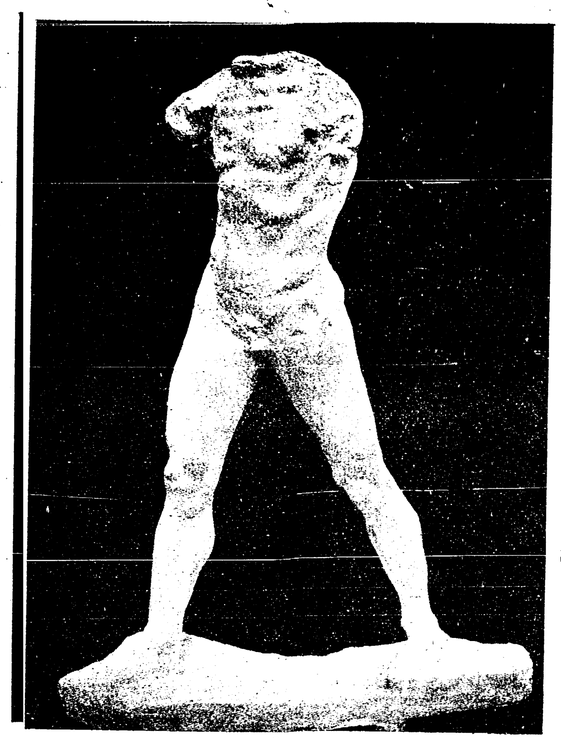

চলন্ত মানুষ

হইতে নামিতে উদ্যত! জড়ের মধ্যে এমন গতির সূচনা দেখিলে বোধ হয় শিল্প-বিজ্ঞানে বুঝি কোন যাদু আছে! আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী ওস্তাদ-শিল্পীদের কার্য্যও আমি দেখিয়াছি। যেমন Rudeএর গঠিত Maréchal Ney ও Marseillaise। আচ্ছা, কি-করিয়া এমন আশ্চর্য্য সম্ভব হয়—অচলকে কোন্ মন্ত্রে সচলের মত দেখানো যায়?"

রোঁদা উত্তর দিলেন, "অচলকে সচল করার চেয়ে এ-সব কথা বুঝাইয়া দেওয়া ঢের-বেশী শক্ত। তবে তুমি যখন আমাকে একেবারেই যাদুকর ঠাওরাইয়া বসিলে, তখন আমিও যত-দূর পারি বুঝাইয়া, মান বাঁচাইবার চেষ্টা করিব!

সর্ব্বপ্রথমে একটা কথা বুঝিতে হইবে। গতি হচ্ছে, এক ভঙ্গী হইতে অন্য ভঙ্গীতে পরিবর্ত্তন।

এই সাদাসিধা কথাটি সমস্ত গুপ্তরহস্যের মূল।

শিল্পী এই ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন দেখান। তাঁহার কার্য্যে এর-আগে প্রথম কি ভঙ্গী ছিল, সেটির কতক-কতক দেখি এবং এর-পরে কি হইবে তারও কতকটা দেখিতে পাই। একটা দৃষ্টান্ত দি।

'মার্শাল নে'র মূর্ত্তির কাছ-দিয়া এবার তুমি যখন যাইবে, বিশেষরূপে মূর্ত্তিটিকে লক্ষ্য করিও। দেখিবে, মূর্ত্তির যে হাত তরোয়ালের খাপ্ ধরিয়া আছে, সেই হাতখানি ও পা-দুটি ঠিক তখনকার ভঙ্গীতে আছে—যখন তিনি অসি কোষমুক্ত করিয়াছিলেন। তারপর দেহ। তরবারি খুলিবার সময়ে মূর্ত্তির দেহ নিশ্চয়ই বামদিকে একটু হেলিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে ভঙ্গী বদ্‌লাইয়া দেহ এখন সরল,—বক্ষ উন্নত, এবং মস্তক সৈন্যদলের দিকে ফিরিতেছে—আক্রমণের আদেশ দিবার জন্য; উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত দক্ষিণ হস্ত তরবারি ঘুরাইতেছে।

এখন, ভাবিয়া দেখ। এই মূর্ত্তিতে যে গতি আছে, তাহা এর-আগে যে ভঙ্গী



সেনাপতি নে

ছিল, সেই প্রথম ভঙ্গীরই পরিবর্ত্তনমাত্র! প্রথম ভঙ্গী কি? না, সেনাপতি যখন অসি কোষমুক্ত করিয়াছিলেন; আর, দ্বিতীয় ভঙ্গী তখনকার—যখন তিনি উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হস্তে বিপক্ষের দিকে বেগে ধাবমান।"

রোঁদার "লৌহযুগ" নামক মূর্ত্তিতেও পাথরে গতি ফুটাইবার এই কৌশল দেখা যায়। যুবকের পদদ্বয় যেন এখনও অর্দ্ধসুপ্ত শিথিল ও কম্পমান; কিন্তু মূর্ত্তিটির দেহের উপরদিকে যতই চাওয়া যাইবে, মনে হইবে, তাহার ভঙ্গী যেন ক্রমেই দৃঢ় ও স্থির হইয়া আসিতেছে! তাহার পার্শ্বাস্থিগুলি চামড়া ঠেলিয়া উঠিতেছে, বুক ফুলিয়া উঠিতেছে, মুখ আকাশের দিকে ফিরানো, হাতদুটি নিদ্রার আলস্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রসারিত। এই মূর্ত্তিতে সুপ্তি হইতে জাগরণের ভাবটি বেশ স্পষ্ট পাওয়া যায়।

"লৌহযুগে" জাগরণের মাধুর্য্য-টুকু তখনই স্পষ্ট হইয়া উঠে, যখন ইহার ভিতরের গুপ্ত অর্থ টি বুঝিতে পারা যায়। এই পিত্তল-মূর্ত্তির আসল ভাব কি? প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানবের বিবেক যখন সবে পরিস্ফুট হইতেছে, তখন পাশবতা ও জড়তার পরাজয় এবং বিচার-শক্তি ও জ্ঞানের জয়-ঘোষণাই "লৌহযুগে" নিপুণভাবে দেখান হইয়াছে।

রোঁদা বলিতেছেন, "যদি চলন্ত



সেণ্ট জন

মানুষের ফটো তোলা যায়, তবে মনে হইবে, তাহা যেন অচল। আমার "সেণ্টজনে"র মূর্ত্তি দুই পা-ই মাটির উপরে রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঠিক এম্‌নি ভঙ্গীতে কোন লোকের ফটো তুলিলে দেখা যাইত, "সেণ্টজনে"র মত তাহার উভয় চরণই এমন সম্পূর্ণভাবে ভূমিসংলগ্ন নাই। হয় সেই মূর্ত্তির পিছনের পা-টি, মাটি ছাড়িয়া উঠিয়া সামনের পায়ের দিকে আসিতে থাকিত, নয় তাহার পিছনের পা মাটিতে ও সামনের পা উঠানো থাকিত।

এই কারণেই ফটোগ্রাফে কোন চলন্ত লোককে দেখিলে মনে হয়, সে-যেন হঠাৎ পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির ঠিক্‌ঠাক্ নকল করিয়াও ফটোগ্রাফে এখানে সত্য নাই এবং জীবন ফুটাইতে পারিয়াছেন বলিয়াই শিল্পী এখানে বিজ্ঞানকে হারাইয়া দিয়াছেন।"

* * * *

Paul Gsell রোঁদাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, প্রাচীন ভাস্কর্য্যে রমণী-মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য দেখিয়া আপনার কি মনে হয় না যে, একালের মেয়েরা সেকালের তুলনায় রূপহীন হইয়া পড়িয়াছেন?"

"না।"

"কিন্তু গ্রীক ভাস্করের গড়া "ভেনাসে"র মূর্ত্তিগুলি কি-রকম নিখুঁত—"

"হাঁ, সেকালের শিল্পীদের আসল চোখ ছিল, আর একালের শিল্পীরা অন্ধ। গ্রীক রমণীরা রূপবতী বটে কিন্তু সে রূপের যথার্থ প্রকাশ ছিল ভাস্করদের প্রাণে—যাঁহারা তাহাদের মূর্ত্তি গড়িতেন।

ঠিক গ্রীক ভাস্করের প্রতিমার [illegible] রূপবতী রমণীর অভাব একালেও নাই



অঙ্গহীন রমণী-মূর্ত্তি

সত্য বলিতে-কি—পৃথিবীর সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই এক-একরূপ নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে। প্যারিতে একবার কাম্বোডিয়া হইতে একদল নর্ত্তকী আসিয়াছিল,—অত্যন্ত আনন্দের সহিত আমি তাহাদের মূর্ত্তি গড়িয়াছিলাম—তাহাদের ছোট ছোট দেহের বিবিধ অঙ্গ-ভঙ্গীতে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ছিল। জাপানী অভিনেত্রী হানাকোর মূর্ত্তিকেও আদর্শ রাখিয়া আমি কাজ করিয়াছি। এই প্রাচ্য রূপসীর সঙ্গে প্রতীচ্য রূপসীর কিছুই মেলে না বটে,—কিন্তু আপনার অসাধারণ সবল সৌন্দর্য্যে এই জাপানী অভিনেত্রী কি সুন্দরী!

কথা কি জান,—সৌন্দর্য্য আছে সর্ব্বত্র। রূপের অভাব বলিয়াই যে আমাদের চোখে রূপসীর চেহারা পড়ে না—তাহা নয়; আমাদের চোখই আসল রূপ দেখিতে জানে

[illegible]। সৌন্দর্য্যই হচ্ছে স্বভাব। প্রকৃতিতে, মানব-দেহে যতটা স্বভাব আছে, এমন আর কিছুতে নয়। শক্তি-সৌন্দর্য্যে রমণী-তনু



অঙ্গহীন রমণী-মূর্ত্তি

কত সময় কত রকমের ছবির আভাস দেয়। কখনও তাহা ফুলের মত;—আনত দেহ যেন বৃন্ত, পীবর বক্ষ, মস্তক ও সমুজ্জ্বল কেশমালা যেন বিকসিত দল। কখনও তাহা নমনীয় লতার মত এবং কখনও-বা সরল-সতেজ চারাগাছের মত। রমণীর দেহ যখন পিছনের দিকে নুইয়া পড়ে, তখন তাহা ধনুকের মত,—যে ধনুকে মদন তাঁহার অদৃশ্য শর যোজনা করেন।

মানবের দেহ হচ্ছে, আত্মার দর্পণ এবং আসল সৌন্দর্য্যের বিকাশ সেই আত্মা হইতেই। নর-দেহের ভিতরে যে রূপের প্রদীপ জ্বলে, বাহিরের আকৃতিগত সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আমরা তাহারই বেশী আদর করি,—কারণ সেই অন্তর্গূঢ় প্রদীপের শিখাতেই মানুষের সমস্ত দেহ সমুজ্জ্বল হইয়া ওঠে।"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

ভালো-মন্দ

বৈশাখের ভারতীতে রবীন্দ্রনাথ "এখন ও তখন" প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এই উপদেশটি অমূল্য—সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্ প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিয়ো না, কাহারো হিংসা করিয়ো না, কাহাকেও গালি দিয়ো না প্রভৃতি নিষেধসূচক বিধানগুলি কেহ যদি সমর্থন করেন ত তাঁর মুখের-উপর কিছু বলা চলে না। কারণ সেগুলিকে মানিয়া চলা মানব-সভ্যতার অঙ্গ হইয়া গেছে। তাহা পালন করিতে পারি আর না-পারি, তার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে আমাদের আত্মমর্য্যাদায় বাধে। কিন্তু এমনিতর কথাতেই আমাদের কেহ-কেহ দেখিতেছি মুখ বাঁকাইতেছেন।

* *
*

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—বাংলা সাহিত্যকে পাকা-বয়সের সাহিত্য বলা যায় না, এখন ইহাকে ঘের দিয়া বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে; ইহার জন্য চাই স্নেহ।

রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি ঠিক যেন শিশুর উপর মা-বাপের দরদের কথা। তাঁর অন্তরে বাংলা সাহিত্য-শিশুর প্রতি মঙ্গল-কামনার ব্যথা আছে বলিয়াই তাঁর মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হইয়াছে।— তাঁর যে নাড়ির টান আছে! বাংলা সাহিত্যের সেবায় তিনি যে অকাতরে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন তাহা ত জাজ্বল্যমান। উহার প্রতি তাঁর স্নেহ স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া এই স্নেহকে তিনি ছোটো করিয়া দেখেন নাই—তিনি যে স্নেহের কথা বলিয়াছেন তাহা আস্কারা-দিয়া মাথায় তোলা নহে। তিনি বলেন—"স্নেহের লক্ষণ এই যে, তাহা বর্ত্তমানের অসম্পূর্ণতাকে বড় করে না, তাহা ভবিষ্যতের আশার প্রতিই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করে।"

এই স্নেহ না থাকিলে কোনো জিনিষকে ছোটো হইতে বড় করিয়া তোলা যায় না।

* *
*

এখন কথা উঠিয়াছে বাংলা সাহিত্যকে কি সত্য-সত্য শিশু বলা যায়? লোকে সন্দেহ করিতেছে, রবীন্দ্রনাথের কথা ঠিক নহে—তিনি বুড়ো-ধাড়ি ছেলেকে আদর দিয়া তার মাথা খাইতে চান।

যাঁরা এরূপ বলিতেছেন তাঁদের যুক্তির প্রধান কথা এই যে, বাংলা সাহিত্যের জন্ম অনেক দিন হইয়াছে। কিন্তু দিন গণিয়া কি সাহিত্যের পরিণতি সাব্যস্ত করা যায়? মানুষেরই যায় না তা সাহিত্য তো দূরের কথা। চল্‌তি-কথায় শোনা যায় কোনো কোনো বংশের লোক আশি-বছরে সাবালক হয়। সেটা একেবারে মিছা কথা নয়। অনেক মানুষের বয়স আশি হইয়াছে দেখা যায়; -তার চুল পাকিয়াছে, হাড় পাকিয়াছে, কিন্তু বুদ্ধি পাকে নাই;—আট বছরে যেমন ছিল—আশি বছরেও তেমন আছে। তেমন লোককে বলিতে হয় বয়স হয় নাই। সাহিত্য সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে;—শুধু বছর গণিয়া তার পরিণতি নির্ণয় করা চলে না; পরিণতির যে রূপ আছে তাহা সে লাভ করিয়াছে কি না বিচার করিতে হয়।

* *
*

বাংলা সাহিত্যের পরিণতির রূপ কোথায়?—সে বৈচিত্র্য কোথায়? নানা শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হইয়া দেশের আকাশকে তো এখনো সে আচ্ছন্ন করে নাই। ইহার সমস্ত অঙ্গ তো পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট হয় নাই—অধিকাংশ ডালপালা এই সবেমাত্র বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার ঘনপল্লবচ্ছায়ে দেশের সকল বিহঙ্গরাজ তো এখনও নীড় বাঁধিতে আসেন নাই। মহা মহীরুহে পরিণত হইবার এখনও এর অনেক বিলম্ব।

দুই-একজন মহাপুরুষের শক্তিতে ইহার এক-এক-জায়গাকার বাড় যেন যাদুমন্ত্রে হঠাৎ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গেছে, তাহাতে দেশবিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু অনেক অংশ যে এখনও কচি। সমগ্র বাংলা সাহিত্যকে চোখের সামনে ধরিলে ইহার যে রূপ বাহির হইয়া পড়ে তাহা যে পরিণতির রূপ নয় বেশ বোঝা যায়।

মাসে মাসে যে রাশি-রাশি প্রবন্ধ, ঝুড়ি-ঝুড়ি বই বাহির হইতেছে তার অধিকাংশ কি? যাঁরা পাকা সাহিত্যের রস গ্রহণ করিয়া সে রসে রসিয়াছেন তাঁদের হাতে এ-সমস্ত রচনা ধরিয়া দিলে তাঁরা বলেন, এ ছেলেখেলা! সাহিত্যে কোনো কথা বলিতে তো আমাদের আটকায় না, কেমন করিয়া বলিতেছি তার দিকেও লক্ষ্য নাই;—কথা ফুটিয়াছে সেই আনন্দে কথা কহিয়া চলি। ইহাই তো ছেলেমানুষীর লক্ষণ। এই প্রগল্‌ভতা বয়স হইলে তবে কাটে।

* *
*

সব-দেশেই সাহিত্যের নানা স্তর থাকে,—সব রচনাই যে প্রথম-শ্রেণীর হয় তাহা নহে। কিন্তু সাহিত্য যেখানে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে সেখানে এক-জায়গায় এমন-একটা বাঁধ থাকে যার নীচে সে আর গড়াইয়া পড়ে না—অর্থাৎ তার একটা standard থাকে। কিন্তু আমাদের বাংলা সাহিত্যে কি অমনিতর একটা বাঁধের চেহারা কোথাও সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে? আমাদের সাহিত্য, খুব চিন্তাশীল প্রবন্ধ হইতে স্কুলের ভাষা-শিক্ষানবীশের রচনা পর্য্যন্ত গোগ্রাসে গিলিতেছে।

মাসিক-সাহিত্য যদি খুলিয়া দেখা যায় তবে কি চোখে পড়ে? নিজের মনের মূল হইতে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে, নিজের স্বার্থকতার তাগিদে ফুটিয়া উঠিয়াছে—এমনতর রচনা কয়টা দেখিতে পাই? অধিকাংশই ত ধার-করা মাল। তাও আবার ছেঁড়া বস্তা, ভাঙা ঝাঁকাতে বোঝাই করিয়া বাজারে পাঠাই। কোনো-খান থেকে একটা নূতন কথা শুনিলে সেইটা মহা উৎসাহের সহিত অনবরত আবৃত্তি করিতে থাকি।

এ সবই অপরিণতির লক্ষণ;—ছেলে-মানুষের চঞ্চলতা। কিন্তু এরও একটা দরকার আছে। এই রকম স্বাভাবিকতার পথ দিয়াই পরিণতি আসে।

শিশু অস্ফুট ভাষায় কথা বলে, সে আবোল-তাবোল বকে; সে-সব কথা প্রবীণের কাছে নিরর্থক বলিয়া তাকে যদি দাব্‌ড়ি দিয়া ক্রমাগতই থামাইয়া দেওয়া যায় এবং সে যদি তা শোনে, তাহা হইলে চাই-কি সে-শিশু খুব গম্ভীর হইয়া উঠিতে পারে;—দেখিলে মনে হইবে ঠিক যেন প্রবীণ, কিন্তু তেমন প্রবীণকে লইয়া কি মানুষের সমাজ টিঁকিবে?

আমাদের সাহিত্যে ঐরূপ শিশু-প্রবীণ তৈরি হইয়াছে; তাঁহাদের গাম্ভীর্য্যকে আমরা হয় ত বাহবা দিতেছি কিন্তু বিশ্বের প্রবীণ-সভায় তাঁহাদের অবস্থাটা কিরূপ তাহা সহজেই অনুমেয়।

শিশুকে আচ্ছা-করিয়া কাণ-মলা দিয়া তার সব বক্‌বকানি থামাইয়া দেওয়া যায় —সে জোর প্রবীণের হাতে আছে। কিন্তু তার সদ্ব্যবহার কি শিশুর কান-মলিয়া বেড়ানো? কোনো প্রবীণ যদি ছেলের প্রগল্‌ভতার জন্য তার কান মলিয়া-মলিয়া তাকে বোবা করিয়া তোলেন তাহা হইলে সে প্রবীণের বিজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"ছোট ছেলের

কান মলিতে পারি বলিয়াই তার কান মলা যে মস্ত একটা বাহাদুরি এই বর্ব্বরতা আমাদের মনে যেন না থাকে।”

* *
*

শিশুকেও শ্রদ্ধা করিতে হয়—শ্রদ্ধার রসে মানুষ হইলে তবে সে শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিতে পারে। গোড়া-থেকেই তাকে যদি অবহেলা কর—তার কোনো মূল্য দেখিতে না পাও তবে তার জীবনের যে কোনো মূল্য আছে তা প্রমাণ করিবার সে অবসরই পাইবে না। মহৎকে মানুষ শ্রদ্ধা করে; কিন্তু সেই মহৎ সৃষ্টি হয় মহত্ত্বের সম্ভাবনাকে শ্রদ্ধা করিয়া।

রবীন্দ্রনাথ তাই আমাদের সাহিত্য-শিশুটিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিবার উপদেশ দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—“যে শক্তি আমাদের মাতৃ-ভূমির কোলের শিশু, যাহা তাঁহাকে একদিন বিশ্বসভায় রাজমুকুট পরাইবে, তাহাকে অনেক যত্নে, অনেক স্নেহে সমস্ত আঘাত বাঁচাইয়া মানুষ করিতে হইবে,—সমস্ত অপরিণতি সত্ত্বেও তাহাকে শ্রদ্ধা করিবার ক্ষমতা আমাদের থাকা চাই।”

*
* *

এখন কথা উঠিতে পারে, তবে কি এমনি করিয়া বাংলা সাহিত্যটা কেবলই শিশুর কলরোলে ভরিতে থাকিবে?

শিশুর অসম্বদ্ধ কথা চিরস্থায়ী হয় না। সে-কলরোল ভাষার স্রোতকে ডাকিয়া আনে। সেটা একটা পথ মাত্র—তাহা চরম নহে। সমস্ত বিশ্ব-জুড়িয়া কত-কোটী শিশু যে কলরোল করিতেছে তার ঠিক নাই, তাই বলিয়া বিশ্বের ভাষা যে অসম্বদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে তাহা ত নহে।

আর তাছাড়া আমাদের সাহিত্যে কোন্‌গুলা আসল জিনিস, কোন্‌গুলা ঝুটা তাহা বুঝিবার মতো বেশি সমঝদারের অভাব দেখা যাইতেছে। সমঝদারদের মধ্যেও শিশু-প্রকৃতির অসদ্ভাব নাই—তাঁহাদের যে সমালোচনা তার মধ্যেও ছেলেমানুষী চূড়ান্ত আছে। এ-সব সমালোচনায় কাজ কিছু হয় না—হট্টগোল বাড়ে মাত্র। সমালোচক-নাম গ্রহণ করিলেই যে বিজ্ঞতা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া যায় এমন নহে। সমালোচনার শক্তিও সাহিত্যের মতো পুষ্ট হইবার অপেক্ষা রাখে।

* *
*

বঙ্গসাহিত্যের হিতাকাঙ্ক্ষীরা চীৎকার করিয়া উঠিবেন “যেটা মন্দ সেটাকে মন্দ বলিব না!”

মন্দকে গাল-পাড়িয়া হয়ত তার মুখ-বন্ধ করিতে পার কিন্তু তাতেই যে ভালো আবির্ভূত হইবেন এমন কোনো কথা নাই। মন্দটা না থাকিলেই যে ভালো থাকে এমন নয়;—ভালোকে উপার্জ্জন করিতে হয়। মন্দকে যদি দেখাইবার দরকার থাকে তবে তার সত্য-রূপ প্রকাশ করিয়া দাও। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—“ভালোর গুণগান-দ্বারাই আমরা মন্দকে সত্যরূপে দেখিতে পাই।”

মানুষের মধ্যে ভালোকে জাগাইয়া তোলাই আসল কাজ, কারণ সেটা একটা

ভালো—একটা positive জিনিষ; মন্দটা তার দিক—সেটা negative। সাহিত্যের করিবার এই positiveকে লইয়া। তারই চর্চ্চা দরকার। আমাদের সত্যকার সাহিত্য-হিতৈষীর কাজ সেই সাধনার পথে বাতি ধরা—চোখের সামনে ভালোর আদর্শ মূর্ত্তিকে দেখাইয়া দেওয়া। কাঁচা সাহিত্যে ভালোর প্রতিষ্ঠা করার এই উপায়।

পদ্মের পাপড়ি

উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে

যখন বিবেচনা করি যে, এ প্রদেশে ইউরোপীয় সভ্যতা আসিয়া কি বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে, যখন বিবেচনা করি যে ইউরোপীয়দিগের গুণসকল আমাদিগের দ্বারা অনুকৃত না হইয়া দোষসকল অনুকৃত হইতেছে এবং যে লোকযাত্রা-নির্ব্বাহ-প্রণালী সকলের উপযুক্ত, এদেশে তাহা আরোপিত হইয়া কি অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তখন আমার মনে হয় যে, উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্যই এইরূপ হইতেছে।

যখন দেখি যে, যৎকালে নিদাঘ-তাপের আতিশয্যে সমস্ত প্রকৃতি অবসন্ন, সমস্ত প্রাণী আকুল, মনুষ্যেরা ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, তখন কোন অঙ্গ-বঙ্গ ইংরাজী-পরিচ্ছদ আঁটিয়া কষ্টেসৃষ্টে ধারণ করিতেছেন, তথাপি তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন না, তখন মনে হয় যে উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্যই এরূপ হইতেছে।

যখন দেখি যে আমাদের দেশের ইংরাজী-বিশেরা আমাদিগের জাতির যেন কোন সুখাদ্য নাই এই জন্য ইংরাজী অর্দ্ধপক্ক আমপ্রায় মাংস ও “সজীব” পণির ভক্ষণে রত হইতেছে, যখন দেখি যে লোকে খানা খাইয়া তাহা গোপন করিবার চেষ্টায় কপট ব্যবহার করিতেছে, যখন দেখি বাঙ্গালী, হোটেলে আহার করিয়া হোটেলস্থ ইংরাজ অভ্যাগতদিগের হাস্যাস্পদ হইতেছে, যখন দেখি যে, বাঙ্গালীরা ইংরাজী প্রণালী-অনুসারে আহারে বসিয়া ইংরাজী শিষ্টাচারের কতই নিরমভঙ্গ করিয়া থাকে, যখন দেখি যে, যাহাদিগের পেটে ইংরাজী A অক্ষর নাই, তাহারা তাহাদিগের অজ্ঞাত ইংরাজী আহার-দ্রব্য অঙ্গুলী দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া “এটা দেও ওটা দেও” বলে, যখন দেখি যে, তাহারা ইংরাজী শব্দ good health অজ্ঞাত থাকা প্রযুক্ত good hell বলিয়া মদ্যপান করে, তখন মনে হয় যে, উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে তজ্জন্যই এইরূপ হইতেছে।

যখন দেখি যে, লোকে স্বদেশীয় ভাষা অপেক্ষা বিদেশীর ভাষা অনুশীলনের প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করিতেছে; ঐ

ভাষা আয়ত্ত করিবার মানসে অনেক বৎসর ক্ষেপণ করিতেছে, তথাপি প্রকৃতরূপে আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না; যখন দেখি যে, বাঙ্গালী ইংরাজের মত ইংরাজী লিখিতে ও কহিতে পারগ হইবার দুরাকাঙ্ক্ষায় কি কষ্ট না পাইতেছে; যখন দেখি যে, বিদেশীয় ভাষার কোন শব্দ-উচ্চারণে অশুদ্ধ প্রয়োগ ধৃত হইলে যেন কত অপকর্ম্ম করিয়াছে মনে করিয়া লোকে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়; অথচ বাঙ্গালায় অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা শ্লাঘার বিষয় মনে করে; যখন দেখি যে, লোকে ইংরাজী ভাষায় অসংখ্য ভুল করিয়াও তাহাতে সামান্য পত্র লিখিবে তথাচ দেশীয় ভাষায় উহা লিখিবে না; যখন দেখি যে, ভট্টাচার্য্য-মহাশয়েরা পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সঙ্গে দশটা ইংরাজী শব্দ মিশাইয়া কথা কহেন, যখন শুনি যে, তাঁহারা আপনাদিগের ছাত্রকে বাঙ্গালায় দরজা দিতে না বলিয়া ইংরাজীতে 'give the door' বলেন; যখন বিবেচনা করি যে, এ-বিড়ম্বনার কারণ কি; তখন মনে হয় যে, উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে তজ্জন্যই এইরূপ হইতেছে।

যখন দেখি, সন্তানদিগকে ইংরাজী বিদ্যা শিখাইবার জন্য লোকে অতিশয় আগ্রহ-বিশিষ্ট, ও তাহাদিগকে তৎপাঠে প্রবৃত্ত করাইয়া এত পরিশ্রম করাইতেছে যে, তাহাদিগের আর আহারের অবকাশ নাই, শারীরিক স্বাস্থ্য ও উন্নতির প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ নাই; যখন দেখি, বিদেশীয় ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য কলেজের ছাত্রেরা এত পরিশ্রম করিতেছে যে, তদ্দ্বারা তাহাদি দৃষ্টি ক্ষীণ হইতেছে, মস্তক ঘুরিতে তথাপি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না নিবৃত্ত হইলেও চলে না; যখন বিবেচনা ক এ বিপদের কারণ কি, তখন মনে যে, উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘা আসিয়া পড়িয়াছে তজ্জন্যই এইরূপ হইতে

যখন স্মরণ করি যে, সেকালের লো অল্প অর্থে কিরূপ প্রফুল্লচিত্তে ক কাটাইতেন, যখন বিবেচনা করি যে, এ আমাদিগের অবাস্তব অভাব ও প্রয়োজ কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, যখন বিবেচনা ক যে, জিনিষ-পত্র ক্রমে কিরূপ মহার্ঘ হই উঠিতেছে, যখন দেখি যে, উপজীবিকা উদ্বেগে লোকের হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হই যাইতেছে, ও ভবিষ্যতে কি হইবে ভাবনায় আকুল হইতেছে, যখন বিবে করি যে, আমরা ত একরূপে কাটাইল ছেলে-পুলের দশা ইহার পর কি হই যখন বিবেচনা করি যে, এ মহান বিপ কারণ কি, তখন মনে হয় যে, উ বোঝা হতভাগ্য বুদোর ঘাড়ে আ পড়িয়াছে তজ্জন্যই এরূপ হইতেছে।

উদো যদি চেষ্টা করে বুদোর বো কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করিতে পারে কি সেদিকে মনোযোগ নাই। বরং তাহা সেই বোঝা আহ্লাদপূর্ব্বক বহন করাই ইচ্ছুক দেখা যায়। বুদো চেষ্টা করি অনুকরণের স্রোত অনেক পরিমাণে রো করিয়া সমাজের সারবত্তা ও নিজের কু রক্ষা করিতে পারে কিন্তু সেদিকে মনো নাই। উদোর ন্যায় পরিশ্রম, অধ্যবসা

হস-সম্পন্ন হইলে এবং তাহাদিগের ন্যায় শীয় শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিসাধন রিলে উদোর যে বোঝা বুদোর ঘাড়ে ড়িয়াছে, তাহা অনেক লাঘব হইতে পারে, কিন্তু সেদিকে বুদোর মনোযোগ নাই। এইজন্যই দেশ ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে।

বঃ—

কাব্য ও দুর্নীতি

একশ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা নীতির উত্তেজক বলিয়া কাব্যের প্রতি ষ আরোপণ করেন। তাঁহারা বলেন ব্যের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, হার দ্বারা যে ফল হয় তাহা নীতি-দ্ধ। এ মতটি ইয়ুরোপে সময় সময় ক উত্তোলন করিয়াছে। St Augustine লেন, কাব্যে অনেক কল্পনা-প্রসূত থ্যা কথা আছে, সুতরাং উহা মিথ্যার াদিপুরুষ সয়তানের মদিরাস্বরূপ। এ যুক্তির রুদ্ধে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, বে এ কথাটা অরিজেনের মুখ-নিঃসৃত হইলে রো ভাল হইত। কাব্য-জাত মিথ্যা নের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়ে কিন্তু াহাতে মনের উর্ব্বরতার অনেক বৃদ্ধি হয়। অপর একশ্রেণীর নীতিবেত্তারা অন্য ারণে কাব্যের নীতি-বিরোধ প্রমাণ করিতে হেন। তাঁহারা বলেন, কাব্যের দ্বারা নোবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া কার্য্য-রিতার দিকে উন্মুখ হইয়া উঠে কিন্তু ান্তবিক পক্ষে কোন কার্য্যেই তাহার রিসমাপ্তি হয় না। এইরূপে উত্তেজিত নোবৃত্তি উপযুক্ত উদ্‌যাপনে বঞ্চিত হইয়া মে নিজের কার্য্যকারিতা হারায়। তখন তাহার ফল হয় এই যে বাস্তব কোন ব্যবহার কিম্বা ঘটনাতেও মনোবৃত্তি আর তাহার নিয়োজিত কার্য্য করিতে চাহে না। একটা অন্যায় আচরণ দেখিলে আর আমাদের ক্রোধের উদ্রেক হয় না এবং ক্রোধ তাহার নিয়োজিত কার্য্য করে না, অর্থাৎ অন্যায়াচারীকে শাস্তি দেয় না। কাব্যে কোন একটা অন্যায় আচরণ দেখিলে আমাদের ক্রোধ হয় বটে কিন্তু তাহাতে অন্যায়াচারীর শাস্তি হয় না। সুতরাং ক্রমে ক্রমে এমন হইয়া পড়ে যে বাস্তব জীবনে অন্যায়াচরণ দেখিলে আমাদের ক্রোধ আর উত্তেজিত হয় না; আমরা অবিবাদে একজনের উপর অত্যাচার দেখিয়া অত্যাচারীর অপ্রত্যক্ষ ভাবে সহায়তা করি। এরূপ ফল উৎপন্ন করিলে কাব্য যে নীতি-বিরোধী সে বিষয়ে আর বিসম্বাদ থাকে না।

সম্প্রতি একটি বাঙ্গালা পুস্তকে দেখিলাম পেলির এই মতটি বিয়োগান্ত কাব্যের সম্বন্ধে খাটান হইয়াছে। বলা বাহুল্য উক্ত মত কেবলমাত্র যে বিয়োগান্ত কাব্য সম্বন্ধেই খাটে এমন নহে, মিলনান্ত কাব্যেও ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। মনে কর, আমরা

কাব্যে পড়িলাম যে, এক ব্যক্তি আপনার প্রাণ-সঙ্কটেও আমাদের মমতাভাজন এক পাত্রের উপকার করিল, তাহাতে তাহার প্রতি আমাদের যে কৃতজ্ঞতার উদ্রেক হয়, তাহা আমাদের প্রকাশ করিবার উপায় নাই। এইরূপ অনেকবার হইলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে, বাস্তব জীবনের উপকার পাইলেও আমাদের কৃতজ্ঞতার উদয় হইবে না। এককথায় সাধারণতঃ সকল কাব্যের প্রতিই এই দোষ অর্পিত হইতে পারে। একজন সমালোচক এই পুস্তকের সমালোচনায় উক্ত মতের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দিয়াছেন। আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই যে, পাকা ভিত্তির উপর মিথ্যা দাঁড়াইয়া এবং কাঁচা ভিত্তির উপর সত্য দাঁড়াইয়া,—উপস্থিত মত ও তাহার সমালোচনাই তাহার এক প্রমাণ। সুতরাং এ বিষয়ে দুইএকটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

কাব্যে বর্ণিত ঘটনা গল্পমাত্র এই জ্ঞানের উপরেই আমাদের কাব্য-রসাস্বাদিনী শক্তি নির্ভর করে; যে ঘটনা আমরা বাস্তব জীবনে দেখিলে শোকে অভিভূত হই, কাব্যে তাহাই পড়িয়া আমরা সুখ উপভোগ করি। দুঃস্বপ্ন দেখিবার সময় যদি আমাদের মনে হয় যে ইহা কেবল স্বপ্নমাত্র তাহা হইলে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না বরঞ্চ অনেক সময় ভাল লাগে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাস্তব জীবনে যে পরিমাণে আমাদের মনোবৃত্তি উত্তেজিত হয় কাব্যে ততদূর হয় না; সুতরাং কাব্যপাঠে আমাদের মনোবৃত্তি উত্তেজনামান যন্ত্রের কার্য্যকারিতা ডি পর্য্যন্ত উঠে না। যদি উঠিত তবে দুঃখ কাব্য পাঠ কখনই সুখকর হইত না বরং তাহা যন্ত্রণার নিদান হইয়া উঠি এরূপ অবস্থায় কাব্যালোচনায় মনোবৃত্তি কার্য্যকালে অকর্ম্মণ্য হইবার কোন সম্ভা নাই। যদি কাব্যালোচনায় কতক পরিমা উত্তেজিত মনোবৃত্তিকে বশীকরণ শি পাই তাহা হইলে কাব্য আমাদের উপকা ব্যতীত অপকারী নহে। সকল সম মনোবৃত্তি কার্য্যে পরিণত হওয়া, অসত অবস্থায় যাহাইউক, বর্ত্তমান সভ্যতা অবস্থায় অপ্রার্থিত। যদি মনোবৃত্তি বশীকর পূর্ব্বোক্ত নীতিবেত্তাদের মতে দুর্নীতি হ তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দোষ প বর্ত্তমান সভ্যতার ঘাড়ে। যদি কাব্য পূর্ব্বো নীতিবেত্তাদিগের মতানুসারে মনোবৃত্তি উপর কার্য্য করে, তাহা হইলে কাব্য শুধু নীতি-গর্হিত ফল উৎপন্ন করে এ নহে। তাহা হইলে অনায়াসেই কাব্যে নীতি-সংরক্ষণ কার্য্যেও নিযুক্ত করা যাইত পারে। একটি সুন্দরী কুলরমণীকে দেখিয়া মাত্র মনে কুচিন্তাকে স্থান দেওয়া একটি নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নীতি বেত্তাদের মতানুসারে ঐরূপ কুচিন্ত উদ্রেকোপযোগী কাব্য পাঠ করিলে ক্রম ওরূপ অবস্থায় আর কুচিন্তা উদিত হই না। সুতরাং কাব্যের দ্বারা যদি ভা মনোবৃত্তি ক্রমে ভোঁতা হইয়া যায় ত কাব্যের দ্বারা মন্দ মনোবৃত্তিরও ক্রম ক্রমে বিষদাঁত ভাঙ্গা যাইতে পারে।

আসল কথাটা এই, অন্যান্য চারুশিল্পে

ন্যায় কাব্য একটী চিত্ততোষিণী বিদ্যা। ইহা মূলতঃ নীতিরক্ষকও নহে নীতিভক্ষকও নহে। তবে পৃথিবীর অপর সকল বিষয়ের ন্যায় ইহা দুর্নীতও হইতে পারে সুনীতও হইতে পারে। কিন্তু এটা বিশেষরূপ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কাব্যের উদ্দেশ্য সুরুচি ও সুপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদের আমোদ দেওয়া; যে কাব্য আমোদ না দিয়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধন করে তাহা অপর বিষয়ে খুব উৎকৃষ্ট হইলেও কাব্যাংশে নিকৃষ্ট।

একখানি কাব্যের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দোষ দুর্নীতি। একখানি কাব্যের যত অধিক সংখ্যক লোকের নিকট পরিচিত ও সমাদৃত হওয়া সম্ভব ও তাহার যেরূপ দীর্ঘজীবন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে তাহাতে দুর্নীত কাব্য হইতে ভয়ানক অনিষ্ট উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। দুর্নীতি দুই কারণে দূষনীয়। প্রথমতঃ দুর্নীতির কার্য্যের দ্বারা প্রত্যক্ষ পক্ষে সমাজের অনিষ্ট সাধিত হয় আর দ্বিতীয়তঃ, দুর্নীত কার্য্যে অন্য লোককে আকৃষ্ট করিয়া সমাজের অনিষ্টকারী একটা ভয়ঙ্কর রক্তবীজ সৃষ্টি করে। দুর্নীত কার্য্যের দ্বারা প্রত্যক্ষ পক্ষে যত অনিষ্ট হয় পরোক্ষে তদপেক্ষা অনেকগুণ বেশী। প্রথমোক্তরূপ অনিষ্ট সাধিত হইবার পর তবে জানিতে পারা যায় সুতরাং তাহা দুর্ণিবার্য্য, দ্বিতীয় প্রকার অনিষ্ট কাল-সাপেক্ষ সুতরাং তাহার প্রতিবিধান সম্ভব ও সকলেই তাহার নিরাকরণে বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। স্পৃহনীয় বস্তুর সংস্রববশতঃ দুর্নীত কার্য্য বিশেষরূপ সংক্রামক হইয়া পড়ে, সেই জন্য দুর্নীত কাব্য বিশেষরূপ অনিষ্টকর ও দণ্ডার্হ। দুর্নীতি অপেক্ষা কাব্যের আর গুরুতর দোষ হইতে পারে না; কাজেই এই অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া কোন কাব্য বিচারালয়ে আনীত হইলে অনেক বুঝিয়া-সুঝিয়া আমাদের মত দেওয়া উচিত। চুরির আসামীকে বিচারের সময় জজ-সাহেব যত বিবেচনা করিয়া কাজ করেন খুনের মকদ্দমা নিষ্পত্তির সময় তাহার সহস্রগুণ অধিক সতর্ক হইয়া কার্য্য করা তাঁহার উচিত। ইহার অন্যথা হইলে অনেক কুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তি দেখাইয়া গ্রন্থরচনা করিলে হতভাগ্য গ্রন্থকারকে কেহ বা নাস্তিক কেহ বা দুর্নীত বলিয়া অবজ্ঞা করিবার ভান করেন। সামান্য বিষয়ে মতভেদ হইলেও যেরূপ গালাগালি হইয়া থাকে, বোধ করি কাহারো অবিদিত নাই। কাজেই একজন গ্রন্থকারের নামে এই দোষ আরোপিত হইলে তাহাকে অস্পৃশ্য মনে না করিয়া তাহার যথার্থ দোষগুণ বিচার করিয়া আমাদের মতস্থির করা উচিত।

বস্তুতঃ পক্ষে সচরাচর ভাষায় ব্যবহৃত "দুর্নীত" শব্দের বিশেষ কোন আকৃতি নাই। উহা অনেকটা গ্রীক দেবতা প্রোটিয়ুসের ন্যায়। তুমি একটা কিছু মনে করিয়া তাহাকে ধরিতে গেলে সে অমনি আর একটা আকার ধরিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তবে এই একটা বুঝিতে পারা যায় যে কাহারো কোন একটা বদ্ধমূল কুসংস্কারের বিরোধী হইলেই তাহার নিকট তাহা দুর্নীত।

ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেও এইরূপ, গ্রন্থমাত্রের পক্ষেও এইরূপ।

যে গ্রন্থ লোককে নীতি-পথ হইতে বিচ্যুত করিবার অভিপ্রায় রচিত তাহা দুর্নীত। এখানে "অভিপ্রায়ে" কথার ব্যবহারের কারণ বলিতে হইবে।

সৌন্দর্য্য-লিপ্সা উত্তেজিত করা এক, এবং ইন্দ্রিয়-লিপ্সা উত্তেজিত করা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক সময়ে সৌন্দর্য্যের সহিত ইন্দ্রিয়-লিপ্সা জড়িত হইয়া থাকে। একজন কবি আমাদের সৌন্দর্য্য-লিপ্সা উত্তেজিত না করিয়াও ইন্দ্রিয়-লালসা উদ্রেক করিতে পারেন, এবং আর একজন কবি যখন আমাদের সৌন্দর্য্য-লালসা চরিতার্থ করিতে যত্নশীল হন, তখন আমাদের কল্পনার দোষে আমাদের মনে আনুসঙ্গিকরূপে ইন্দ্রিয়-লিপ্সা জাগ্রত হইতেও পারে। এক্ষণে নীতি-পরায়ণ পাঠকদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, উপরোক্ত উভয় কবিই কি তাঁহাদের চক্ষে দণ্ডার্হ? প্রথমোক্ত কবির কাব্য হইতে কুফল ব্যতীত আর কিছুই উৎপন্ন হয় না, তিনি সুমিষ্ট খাদ্যের প্রলোভন দেখাইয়া অপাচ্য দ্রব্য ভক্ষণ করান্, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত কবির উদ্দেশ্য অতি প্রশংসনীয়। মনে কর, মনুষ্য-শরীরের পরিমাণ-সামঞ্জস্য ও তাহার সুঠাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত অবয়ব-সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে যদি গ্রীক ভাস্কর ফিডিয়স্ তাঁহার সজীবপ্রভ প্রস্তরমূর্ত্তি-সমূহকে উলঙ্গ করিয়া গঠিত করিয়া থাকেন, ও তাহাতে করিয়া যদি কোন মাংসপিণ্ডের কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-লালসাই উদ্দীপ্ত হয়, তবে উভয়ের মধ্যে দণ্ডার্হ কে? —শিল্পী না দর্শক? ভাস্কর-বিদ্যায় অতুলনীয় গ্রীক ফিডিয়স্ কিম্বা পলিক্লীনিস্ রচিত উলঙ্গ প্রস্তর-মূর্ত্তির একটি ভগ্নাংশমাত্র পাইলেও তাহা সৌন্দর্য্য-উপাসক ইয়ুরোপের অত্যন্ত আদরের সামগ্রী হইয়া পড়ে। এবং ঐ সকল উলঙ্গ প্রস্তরমূর্ত্তির অনুকরণ সমূহই দর্শকদের বিশুদ্ধ আনন্দবর্দ্ধনের জন্যই য়ুরোপের প্রকাশ্য স্থানে রক্ষিত হয়; এমন কি লণ্ডনের য়ুনিবর্সিটি কলেজে—যে স্থানে স্ত্রী-পুরুষে একত্র হইয়া বিদ্যানুশীলন করেন, যে স্থানে বৃদ্ধ অধ্যাপক ও অল্পবয়স শিষ্যগণ একত্রে শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকেন—সেখানেও সর্ব্বত্রেই ওইরূপ উলঙ্গ প্রস্তরমূর্ত্তি দর্শকদের সৌন্দর্য্য-প্রীতি চরিতার্থ করে। কিন্তু প্যারিসের জঘন্য স্থানসমূহে যে সকল চিত্র ও প্রস্তরমূর্ত্তি রক্ষিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য কদর্য্য বলিয়াই তাহা নিন্দনীয়। যে গ্রন্থ হইতে কুফল উৎপন্ন হয় তাহাই যে দুর্নীত, এমন নয়। গোলাপ ফুল হইতে মাকড়সা গরল সংগ্রহ করে কিন্তু সেইজন্য গরলাধার বলিয়া কেহ গোলাপকে ত্যজ্য মনে করিবেন না। বলিংব্রুক দুইটি Puritan ধর্ম্মোপদেশ পড়িয়া নাস্তিকতায় দীক্ষিত হন কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ উক্ত ধর্ম্মোপদেষ্টাকে নাস্তিকতা শিক্ষা দেওয়ার দোষে দোষী করিবেন না। একজন যদি যথার্থ মনের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বেশ্যাবৃত্তির প্রয়োজনীয়তার সাপক্ষে এমন গ্রন্থরচনা করেন যে তাহা পরিবার-মণ্ডলীতে পাঠ করিলে সকলে কানে হাত দিবেন, তথাপি তাহা দুর্নীত নয়, কেন না তাহার অভিপ্রায় মানুষকে কুপথে লইয়া

যাওয়া নহে। শারীর-তত্ত্ব-বিদ্যায় এমন অনেক কথা আছে যে তাহা লোকের সামনে উচ্চারণ করা অসম্ভব, কিন্তু তাহা বলিয়া কি শরীর-তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ দুর্নীত? পৃথিবীর প্রাচীন কবিরা কিছু খোলা-খুলি কথা কহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সেজন্য দুর্নীত আখ্যা পাইতে পারেন না। লরেন্স ষ্টার্ণ নিজের গ্রন্থের দুর্নীতি সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন প্রাচীন কবিদের বিষয়ে তাহা খুব খাটে। একদিন ষ্টার্ণ একজন ভদ্র মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি আমার Tristram Shandy পড়িয়াছেন?" ভদ্রমহিলা উত্তর করিলেন, "না, মহাশয়, আমি পড়ি নাই; আর সত্য কথা বলিতে কি, আমি শুনিয়াছি যে উহা স্ত্রীলোকের অপাঠ্য।" ইহাতে ষ্টার্ণ বলিলেন, "Madam, he is like your little heir playing on the carpet. At times he shows a good deal of his person which is generally hidden—but in perfect innocence."

আসল কথাটা এই যে—গ্রন্থের আলোচিত বিষয়ের উপর তাহার নীতি নির্ভর করে না, রচনা-প্রণালীর উপর করে। পাঠকের মনে দুর্নীত ভাব উৎপন্ন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হইলে নিশ্চয়ই গ্রন্থ দুর্নীত।

আর যদি গ্রন্থকারের অপর কোন উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় তবে সে গ্রন্থ দুর্নীত নহে। গ্রন্থকারের মনের ভিতরকার উদ্দেশ্য অন্তর্যামীই জানিতে পারেন, তবে গ্রন্থে যে উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত থাকে আমরা তাহারই কথা কহিতেছি। আলোচ্য গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন সূত্র হইতে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তাহা লইয়া কোলাহল করা অনাবশ্যক।

রেজ্‌কি

পুরুষের পক্ষে যেমন বিদ্যাবুদ্ধি, স্ত্রীলোকের পক্ষে তেমনি রূপগুণ, দুই একত্রে থাকলে ত কথাই নেই, সোনায় সোহাগা; কিন্তু একটিমাত্র বেছে নিতে হইলে শেষটাই নইলে নয়।

*
* *

নদী যেমন তটশালিনী বলেই সুন্দর, কবিতা যেমন ছন্দোবদ্ধ বলেই মধুর,—মনুষ্য-জীবনও তেমনি কাজে-কর্ত্তব্যে, নিয়মে-আইনে, বাধা-বিঘ্নে সহস্ররূপে প্রতিহত ও সংযত বলে'ই তার যা'-কিছু দর ও আদর।

*
* *

সবল ও দুর্ব্বল প্রকৃতির প্রধান প্রভেদ এই যে, সবল প্রকৃতি বাইরের ঘটনাস্রোতকে স্বেচ্ছানুসারে নিয়মিত করবার চেষ্টা করে, এবং দুর্ব্বল প্রকৃতি সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়।

* * *

কি হতে পারত তার সঙ্গে নিজের বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা না করে', সচরাচর কি হয়ে থাকে তার সঙ্গে তুলনা করলে পৃথিবীতে বিলাপ-পরিতাপের অংশ অনেক পরিমাণে কমে যায়।

* * *

সত্য এক, মিথ্যা অনেক; এবং এ-স্থলেও অনেক সময়ে অধিকাংশেরই জয় হয়।

* * *

দার্জ্জিলিঙের বর্ষা রেমিটেণ্ট জ্বরের মত; —কমে বাড়ে, কিন্তু ছাড়ে না!

* * *

বড়লোক সমাজ-রূপ জমির বুটি বা ফুলস্বরূপ। ফুল যেমন জমির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে বটে, আবার সেই জমিই ফুলের ভিত্তি বা আশ্রয়,—তেমনি এই পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

* * *

খাদ্যসামগ্রী যেমন পাক করলে তবে শরীরের পরিপাক করবার উপযোগী হয়, জীবনের সহজ সত্যগুলিও অনেক সময়ে তেমনি ক্ষমতাবান মানুষের মস্তিষ্করূপ পাকশালা হতে উপদেশ বা গ্রন্থাকারে নির্গত হলে পর তবে আমাদের সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

* * *

চিঠি একপ্রকার ছাঁকনির কাজ করে। অর্দ্ধঘণ্টা এবং অর্দ্ধতোলার সীমার মধ্যে মনোভাব ব্যক্ত করতে বাধ্য হলে অনেক বাজে ও বাহুল্য কথা আপনিই বাদ পড়ে' যায়।

* * *

উপনয়নকে যদি দ্বিতীয় জন্ম বলা যায় ত সন্ন্যাসকে প্রথম মৃত্যু বলা যেতে পারে।

* * *

যে সুস্পষ্টরূপে ভাবে সে-ই লেখক, এবং যে সুস্পষ্টরূপে বোঝে সে-ই যথার্থ সমালোচক।

* * *

যা'-কিছু আছে তা'ত সত্য। কিন্তু যা'-কিছু নেই, অথচ হতে পারত,—কত অগঠিত ভুবন, কত অকল্পিত নিয়ম, কত অচিন্ত্য জীব,—সে সব কি এবং কই? যা'-কিছু আছে তা' ছাড়া আর কিছু কোথায়ও নেই, এ কল্পনাটি আমার কাছে মাঝে মাঝে যেরূপ অদ্ভুত-আশ্চর্য্য মনে হয়, এমন আর কারো কখনো মনে হয় কি না কে জানে। ক্ষুদ্র মানবের কল্পনা জিনিষটা কি এতই সৃষ্টিছাড়া যে বিশ্বও তার সীমা দিতে পারে না?

* * *

অধীন ব্যক্তির পরসেবা দাসত্ব, এবং স্বাধীন ব্যক্তির পরসেবা দেবত্ব বলে' গণ্য হয়;—ইহাপেক্ষা স্বাধীনতার মহত্তর সুযশ কি হতে পারে?

* * *

মানুষ বিপদে পড়লে প্রথমে পরের দোষ দেয়, পরে বিধাতার দোষ দেয়, তারপরে অদৃষ্টের দোষ দেয়,—সবশেষে নিজের বুদ্ধি বা চরিত্রের দোষ দেয়, যদি নিতান্ত উদারচেতা হয়। কিন্তু দোষের এত ভাগীদার জুটিয়েও যে দুঃখের বোঝা সবটাই নিজের বইতে হয়,—এই বড় আক্ষেপের বিষয়।

* * *

প্রবৃত্তি ভগবদ্দত্ত, নিবৃত্তি মানুষের ইচ্ছাকৃত, কাজেই প্রথমোক্তের প্রভাব বেশি হবে তার আর আশ্চর্য্য কি?

* * *

পরের দ্রব্য না বলে' নেওয়াকে সাধারণতঃ বলে চুরি। কিন্তু যা-কিছু অপরকে দিতে পারতাম অথচ দিই নাই, —সে-প্রকার চুরির জন্য স্বতন্ত্র ধারা ও কারা আবশ্যক নয় কি?

* * *

জীবনের সুযাত্রার পক্ষে হয় ধনসম্পদ নয় মনঃসম্পদ,—দুইয়ের মধ্যে একটি থাকা অতীব আবশ্যক।

* * *

প্রকৃত ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কি সুলভ, কেমন বিনি-পয়সায় পাওয়া যায়! প্রকৃত প্রেম স্নেহ সকলি তাই। ভগবানের দান অনায়াসলব্ধ এবং অমূল্য। কেবল মানুষের কারুকার্য্যই মানুষের পক্ষে কষ্টকল্পিত, কষ্টসাধ্য ও কষ্টোপার্জ্জিত।

* * *

প্রশ্নঃ—তোমার শরীর এত কাহিল কেন?

উত্তরঃ—অনুরোধে এত ঢেঁকি গিলি যে, হজম করে' উঠতে পারিনে!

* * *

অনুরোধ এড়াবার সব-চেয়ে সহজ উপায় সেটি রক্ষা করা।

* * *

বড় বড় স্বার্থত্যাগের মহত্ত্বগুণেই সে কষ্টকে কষ্ট বলে' মনে হয় না। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য ক্ষুদ্র ত্যাগস্বীকার প্রসন্নভাবে লঘুচিত্তে করতে পারাই শক্ত ব্যাপার; কারণ জিত্‌লে মান নেই, অথচ হারলে অপমান,—অন্ততঃ নিজের কাছে।

* * *

আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা আইন দ্বারা রহিত করলে অনেকেরই দায়ে পড়ে' মুখ বন্ধ হয়!

* * *

যে মন্দ, সে অপরকে বেশি বা সমান মন্দ প্রমাণ করতে, এবং যে ভাল সে অপরকে নিজের তুলনায় কত মন্দ ব্যাখ্যা করতে সর্ব্বদাই এত ব্যস্ত যে, পরনিন্দার মৌরশী-পাট্টা অনিবার্য্য!

* * *

পাড়াপ্রতিবেশীর কথা থেকে অর্দ্ধাংশ বিয়োগপূর্ব্বক বাকিটুকু দুই দিয়ে ভাগ করলে তবে তার যোগ ও গুণের পরিমাণ মরে' গিয়ে সত্যের কাছাকাছি এসে পৌঁছায়।

* * *

ছেলেপিলে যদি হাতের পাঁচ আঙুলের মত হয় ত সেই পাঞ্জা দিয়ে মানুষ যেমন বাস্তবকে ধারণা করতে পারে এমন আর কিছুতে পারে না।

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

রাজা

আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা।
তাই সে যখন তলব করে খাজানা
মনে করি পালিয়ে গিয়ে দেব তারে ফাঁকি,
রাখব দেনা বাকি।

যেখানেতেই পালাই আমি গোপনে
দিনে কাজের আড়ালেতে, রাতে স্বপনে,
তলব তারি আসে
নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

তাই জেনেছি, আমি তাহার নইক অজানা।
তাই জেনেছি ঋণের দায়ে
ডাইনে বাঁয়ে
বিকিয়ে বাসা নাইক আমার ঠিকানা।
তাই ভেবেছি জীবনমরণে
যা আছে সব চুকিয়ে দেব চরণে।
তাহার পরে
নিজের জোরে
নিজেরি স্বত্বে
মিলবে আমার আপন বাসা তাঁহার রাজত্বে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্মৃতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম যে আমার আমিত্ব (egotism) পূর্ব্বপ্রকাশিত "স্মৃতি"র বহু স্থানে রূপসীর সুন্দর মুখমণ্ডলে দুষ্ট ব্রণের মত কুৎসিতভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কি করি? ভারতী-স্মৃতির সহিত আমার স্মৃতিটুকু ভেলভেট কোটের ভিতরে দরজির সূতার মত জড়িত। গোলাপের চাষ করিতে গেলে গোলাপের কাঁটাকে বাদ দিলে চলে না। হোতা যখন "অগ্নিমীলে যজ্ঞস্য হোতারং" প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উজ্জ্বল অগ্নিদেবকে আহ্বান করিয়া বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন সেই জবাপুষ্পবর্ণ হুতাশনের চারিদিকে আরব্য-উপন্যাসের দৈত্যের মত রাশি রাশি ধূম-দৈত্য ক্রীড়া করে—এরূপ দৌরাত্ম্য অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য।

আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত "স্মৃতি"র রচনা-ভঙ্গী আমার নিজের মনঃপূত হয় নাই। কিন্তু শুনিতেছি ইহা কাহারো কাহারো ভাল লাগিয়াছে। ইহার কারণ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি;—অশেষগুণসম্পন্না শ্রীমতী স্বর্ণ-কুমারী দেবীর গুণ-কীর্ত্তনে আমার ন-গণ্য রচনাও মহিমান্বিত হইয়াছে। অতি-তুচ্ছ শঙ্খও ভক্ত পূজারির অধর-স্পর্শে মন্ত্র-পূত হয়।

আস্তাকুড়েও শিউলি ফুল ফুটিলে প্রকৃতি দেবী আনন্দে হাসিয়া উঠেন। অতি-তুচ্ছ কাল কাচও যদি পদ্মরাগ, মরকত, ইন্দ্রনীলের সন্নিধিতে থাকে, প্রতিফলিত বর্ণের শোভায় অপূর্ব্ব-শ্রী-সম্পদ ধারণ করে।

কথায় বলে "সৎসঙ্গে কাশীবাস—অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ"। এ কথা অযথার্থ নহে।

সঙ্গাসঙ্গগুণের তত্ত্বদর্শী কোনো একটি highly original খান্‌সামার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-কলাপের কথা এ-স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। খানাসামা-পুঙ্গবের নিকটে দুইটি অতি-যত্নে রক্ষিত শিশি ছিল—একটি সুরভি গোলাপী আতরে পূর্ণ ও আর একটি দুর্গন্ধময় আরকে পরিপূর্ণ। সাহেব জেলার উচ্চপদাধিষ্ঠিত হাকিম—এ জন্য দলে দলে "সেলাম বন্দগী" করিবার জন্য অসংখ্য লোক সাহেবের বাংলায় হাজির হইত। যাহারা খানসামা-মহোদয়কে বক্‌সিস্ দিত, তাহাদের বসিবার চেয়ারগুলি সাহেবের অজ্ঞাতে গোলাপী আতরে ভুর্ ভুর্ করিত। বলা বাহুল্য, সাহেব তাহাদিগকে সুপ্রসন্নচিত্তে অভিবাদন করিতেন। আর যাহারা খানসামার দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণাস্বরূপ রজতমুদ্রা প্রদান করিত না, চতুর খান্‌সামা তাহাদিগের জন্য অন্যপ্রকার ব্যবস্থা করিত। সাহেব তাহাদিগের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতেন না। তাহাদিগের সাক্ষাতেই বিরক্তিব্যঞ্জক শব্দে নিজ নাসিকা-রন্ধ্র রুমাল দিয়া ঢাকিতেন। তাহারা চলিয়া গেলে, মহা খাপ্পা হইয়া সাহেব বিকট স্বরে চীৎকার করিতেন—"বড়া বদ্‌বু! বড়া বদ্‌বু।" প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন মৌলিক খান্‌সামা সাহেবকে বুঝাইয়া দিত, "উহারা কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত।" বলা বাহুল্য, তাহারা আর সাহেবের দরবারে হাজরি দিতে পাইত না। অতএব সঙ্গের গুণ অনির্ব্বচনীয়।

* * *

পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর শরীরে অহঙ্কারের নামগন্ধ নাই। তিনি রাজকন্যা; দেবতুল্য নানাগুণালঙ্কৃত জানকীনাথের প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী, বাংলাদেশের প্রসিদ্ধা লেখিকা, ইংরাজিভাষায় পারদর্শিনী, তথাপি তাঁহার ব্যবহারে আমি কোন দিন বিন্দুমাত্র অ-বিনয় দেখি নাই। অন্য কেহ হইলে, হয় তো মদদর্পে মাটিতে তাহার পা পড়িত না। এই বরেন্যা নারীর সহিত আমার বহু-বহু পত্র-বিনিময় হইয়াছে। আশ্চর্য্য! কোনো পত্রের কোনো স্থলেই বড়াইর ছায়া নাই। ইহা কি কম শ্লাঘার কথা। আমাদের দেশে কথায় বলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে জ্যাঠা হয়। কিন্তু সরল শিশুপ্রকৃতি স্বর্ণ-কুমারীর চরিত্রে জ্যাঠামির লেশমাত্র দেখি নাই।

কোনো অসহিষ্ণু সমালোচক বলিয়াছেন —"পুরুষ জ্যাঠা সহ্য হয়—মেয়ে জ্যাঠা সহ্য হয় না।" এই নারী-অবমাননা দেখিয়া ভক্ত মিরাবাইর কথা মনে পড়ে। যখন মীরাবাই শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, সে-সময়ে বৃন্দাবন-বাসীদিগের মধ্যে বৈষ্ণবকুলতিলক প্রভুপাদ জীব গোস্বামীর খুব নাম। ভক্তদর্শন অভিলাষে মীরাবাই প্রভু জীব গোস্বামীর কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া গান ধরেন—

"মেরে গিরধর্ গোপাল—
দূস্‌রা ন কোই!

সন্তন দিঠ বৈঠ বৈঠ লোকলাজ খোই।
অশ্রুনজল সিঁচ সিঁচ প্রেম-বেল বোই,
অব্ তো বেল ফয়ল গই জানে সব কোই।
যাঁকে শির মোর্ মুকুট মেরো পতি সোই—
শঙ্খ চক্র গদা পদম্ কণ্ঠমাল্ সোই।"

সেই সুমধুর অদ্ভুত গীত শুনিয়া সকলেই মোহিত হইল, কিন্তু প্রভু জীব গোস্বামী অচল, অটল!—তাঁহার কুঞ্জে স্ত্রী-মূর্ত্তির প্রবেশ নিষেধ! প্রত্যাখ্যাতা হইয়া, মধুর গর্জ্জনে মীরাবাই বলিলেন—"এই বৃন্দাবনে বৃন্দাবনের রাজা গোবিন্দজীউ ছাড়া আর পুরুষ কোথায়? তুমিও তো নারী।"

পুরুষত্ব-অভিমানী পূর্ব্বোক্ত মনুষ্য-পুঙ্গবের longitude and latitude on the map of Bengal আমি জানি না। দেখা হইলে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া অবশ্যই বলিতাম, "হে পুরুষ-মুখস্-ধারিণী নারি! তুমি পুরুষ-জ্যাঠার কথা কি বলিতেছ? এই বাংলামুল্লুকে নারী ছাড়া পুরুষ কোথায়?"

* * *

যখন আমাদের দুইজনের মধ্যে পত্র-লেখালেখি আরম্ভ হয়, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রথম-পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমার স্বামী-মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া আপনাকে পত্র লিখিতেছি। আজি হইতে আপনি আমার ভ্রাতা।"

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে এই স্বাধ্বী স্বামিদেবতার অনুজ্ঞা-ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই করিতেন না।

ইহা হইতে ইহাও সুন্দররূপে উপলব্ধি হয় যে, যাঁহারা বলেন এই পরিবারের মধ্যে "পর্দ্দা" নাই, তাঁহারা মহাভ্রান্ত। ইঁহাদের মধ্যে যে পর্দ্দা আছে তাহাই আর্য্যভূমির আসল খাঁটি পর্দ্দা। এ পর্দ্দা এখনও দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে আছে। এ পর্দ্দার অভ্যন্তরে মুক্তবায়ু আছে—এখানে নিশ্বাস রোধকারী বদ্ধবায়ু নাই। এই পর্দ্দার অভ্যন্তরে সুনীল অনন্তবিস্তার আকাশ, উত্তাল তরঙ্গরঙ্গময় মহাসমুদ্র, শাল-তাল-তমাল পরিপূর্ণ শ্যামল বনভূমি, তুঙ্গ-শৃঙ্গময় তুষারধবল হিমাদ্রি, ঝির্ ঝির্ শব্দ-ময়ী লীলাময়ী গিরিনির্ঝরিণী আছে—ম্যালেরিয়ার বীজপূর্ণ পানাপুকুর নাই। সচরাচর হিন্দুঘরে যে পর্দ্দা আছে তাহা বিজাতীয়, বিদেশী আমদানি—দেশীয় নহে। সে পর্দ্দা গান্ধারীর মুখস্—চীননারীর চরণযুগলের লোহশৃঙ্খল—হিন্দুস্থানী সুন্দরী-বৃন্দের পদকোকনদে কাঁসার "পঙ্গরী"। শুনিতে পাই যে আফ্রিকার মরুখণ্ডে উষ্ট্রপক্ষী শিকারীর ভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে অবশেষে তপ্ত বালুকারাশির ভিতর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে। আধুনিক পর্দ্দা এই মূঢ় উষ্ট্রপক্ষীর নিরাপদ নির্জ্জনবাস।

স্বর্ণকুমারী দেবীর অনুমোদিত স্ত্রী-স্বাধীনতায় উচ্ছৃঙ্খলতার নাম-গন্ধ নাই। এই দেবী কর্ম্মযোগিনী। গীতোক্ত কর্ম্মযোগ—যাহাতে কামনার লেশমাত্রও নাই—তাঁহার আদর্শ। তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ম্মজীবনের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কতিপয় ছত্র সম্পূর্ণ প্রযুজ্য—

"ব্যস্ত গৃহকাজে,
ছুটিতেছ চতুর্দ্দিকে! জান না বন্ধন,
মূর্ত্তিমতী স্বাধীনতা! পাগলিনী-সাজে,
হাসিয়া করিছ কাজ! যেন মেঘমাঝে
শ্রাবণের সৌদামিনী! বিমুক্ত হরিণী
যেন বনমাঝে! তটিনী যেন রঙ্গিণী!
উধাও, অধীর, তব নারী-মূর্ত্তি রাজে!
হে নারি! অবন্ধনের অন্তর-অন্তরে
তবু কি বন্ধন! তবু কি শোভা-শৃঙ্খলা
তোমার এ উচ্ছৃঙ্খল অশোভা-ভিতরে।
চঞ্চলারে বাঁধিয়াছ অয়ি সুমঙ্গলা!
সুশাসিত, নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র-মাঝে,
রাজ্ঞী হয়ে তোমার ও নারী-মূর্ত্তি রাজে।"

* * *

বঙ্গ-সাহিত্য-কণ্ঠ-কৌস্তভ শ্রীমতী গিরীন্দ্র-মোহিনীর সহিত স্বর্ণকুমারী দেবীর "মিলন" পাতাইয়াছিলেন। এ "মিলন"-ইতিহাসেরও ছবি পূজনীয়া দিদি মধুর উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া আমার কাছে পাঠাইয়া ছিলেন। সে চিত্র র‍্যাফেলের ম্যাডোনা অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নহে। কবি-শ্রেষ্ঠা গিরীন্দ্রমোহিনীকে আমি "মা" বলি। তাঁহার সম্বন্ধে আমার বহু বহু কথা বলিবার আছে। "স্বর্ণায়ণ" শেষ হইলেই "রবীন্দ্রায়ণ" ও "গিরীন্দ্রায়ণ" আরম্ভ করিব।

স্বর্ণকুমারী দেবী আমাকে লিখিয়াছিলেন, "যেমন আপনাকে আমি নিয়মিত পত্র লিখি, আরও দুইজনকে নিয়মিত পত্র দিই। তাঁহাদের নাম—গিরীন্দ্রমোহিনী ও সরোজ-কুমারী।"

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী M. D-র নাম কে না শুনিয়াছেন? ইনি বঙ্গ-সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী M. D-র সহিত আমার সুমধুর সুবাদ আছে। ইনি নিজের সম্বন্ধে যাহা যাহা না জানেন

তাহা পর্য্যন্ত আমি জানি। ইনি যখন দেড় বৎসরের শিশু তখন কুকুরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কাশীর কালভৈরবের অনুকরণ করিতেন ও কবিজনসুলভ দিব্য-দৃষ্টিপ্রভাবে সেই সামান্য সারমেয়ের কদাকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দেবেন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার লীলাভিরাম আস্ফালন দেখিয়া হর্ষবিহ্বল-চিত্তে অট্ট অট্ট হাস্য করিতেন, তখন আমিও আনন্দে করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিতাম।

সহৃদয় পাঠক-মহাশয়! কবি-ভগ্নী সরোজ-কুমারীর নামের শেষের M. D. অক্ষর-দুটি মার্কিন দেশের bogus title "Doctor of Medicine"-বোধক নহে। আমি সরল চিত্তে বলিতে পারি, অক্ষরযুগল Maha (মহা) ও dusta (দুষ্ট) শব্দযুগল-বাচক নহে। একদা আমি এই মহিয়সী নারীর সম্বলপুরের ভবনে হঠাৎ গিয়া উপস্থিত হই। ইনি ও ইঁহার সহধর্ম্মী স্বামিমহাশয় (সম্বলপুরের সুবিখ্যাত গভর্ণমেণ্ট-প্লীডর্ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সেন এম এ, বি এল্ মহাশয়) আমাকে গুরুপুত্র নির্ব্বিশেষে যত্ন করেন। কিন্তু একটা অদ্ভুত আজগুবি ব্যাপার দেখিয়া আমি যার-পর-নাই বিস্মিত হইয়াছিলাম। "সরোজ, পাকা পেঁপে খেতে ইচ্ছা কর্‌চে।" মহাশয়, বলিব কি? মুখের কথা না খসিতে খসিতে একথাল সুরসাল পেঁপে আসিয়া উপস্থিত! "সরোজ, একপেয়ালা গরম চা খেতে ইচ্ছা কর্‌চে।" আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! চক্ষের নিমিষে একটা প্লেটে মাখম্-মিছরি প্রভৃতি পরিবেষ্টিত মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের মত উষ্ণ এক পেয়ালা চা আসিয়া হাজির! আমি

মনে মনে ভাবিলাম, "মহাভারত-বর্ণিতা দ্রৌপদীর সহিত আমি ইঁহার অন্য-কিছু সাদৃশ্য তো খুঁজিয়া পাইতেছি না। তবে ইনি দ্রৌপদীর "হাতা" কোথায় পাইলেন?

মহাশয়, সেই দিন হইতেই ইনি আমার কল্পনা-চক্ষে M. D.—মহিমময়ী দ্রৌপদী।

ক্রমশঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

অশ্রু

ক

আমাদের বাড়ী পাশাপাশি। উপমাদের সঙ্গে আমাদের বেশ-একটু ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তার যোগ ছিল। উপমার সঙ্গে ছেলেবেলায় কত খেলাই খেলেছি—যদিও সে আমার চেয়ে বছর-পাঁচেক বয়সে ছোট। সুতরাং, বাল্যের ভালবাসা যে যৌবনের প্রেমে পরিণত হবে, এ-আর আশ্চর্য্য কি?

উপমার বাবা সুরেনবাবু নব্যতন্ত্রের হিন্দু। মেয়ের বিয়ের জন্য তাঁর স্ত্রী যথেষ্ট মুখরা হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর 'মাথার টনক্' নড়াতে পারেন-নি। মেয়ে বড় হবে, লেখাপড়া শিখ্‌বে, তবেই বিয়ের কথা—এই ছিল তাঁর পণ।

প্রথম যেদিন তার কাছে আত্মপ্রকাশ করি, সেদিন সে কিছুই বলে-নি; কিন্তু তার প্রসন্ন নতদৃষ্টি ও রক্ত কপোলে হৃদয়ের মৌন সম্মতি পেয়েছিলাম। বাগানের গোলাপগাছ থেকে একটি আধ্-ফোটা ফুল তুলে তার এলো খোঁপায় গুঁজে দিলাম—আমার প্রাণের পুলকই ফুলের পাপ্‌ড়িগুলিকে যেন রঙ্গিন করে তুলেছিল। ……উপমা আমার একখানি হাত দুহাতে নিজের মুঠোর ভিতর নিয়ে কোলে করে বসে রইল। আমরা কেউ কিছু বল্‌লাম না—বকুলশাখার কানে-কানে বাতাস মৃদু গুঞ্জনে যে কথা বল্‌ছিল, সারাসন্ধ্যা সেইখানে বসে বসে আমরা তাই সুধু শুন্‌তে লাগ্‌লুম।

খ

এ-কথা কত লুকানো!

জান্‌তাম, আমার আইন-পড়া সাঙ্গ না-হলে বাবা কখনই এ-বিবাহে মত দেবেন না। বিশেষ সে-সময়ে আমার বাবা ফিটের ব্যামোয় বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন। সুতরাং তখনকার মত আমার প্রাণের কথা আমার প্রাণেই চাপা রইল।

রোজ সন্ধ্যাবেলায় আমি উপমাদের বাড়ীতে চা খেতে যাই—এটি আমার অনেক দিনের অভ্যাস।

সেদিনও নিয়মমত গেলাম।

টেবিলের একধারে বসে সুরেনবাবু খবরের কাগজ পড়্‌ছিলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে বস্‌লুম। উপমা চকিত চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে, একটু হেসে চায়ের পেয়ালায় দুধ ঢাল্‌তে লাগ্‌ল। উপমার চোখের এই দৃষ্টিতে এখন আমি এক নূতন ভাষা দেখি—চারিদিকে লোক জন থাক্‌লেও সে ভাষা আমি ছাড়া আর

কেউ পড়্‌তে পারত না—সে ভাষা যে কেবল আমারই জন্য!

বাইরে পায়ের শব্দ হোল। সুরেনবাবু খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বল্লেন, "উপা, বোধহয় নরেন আস্‌ছে।"

নরেন উপমার দাদা।

নরেন ঘরের ভিতরে এল—তার পিছনে সাহেবী পোষাক-পরা আর-একজন লোক। হঠাৎ এক অচেনা লোক দেখে উপমা একটু জড়সড় হয়ে আমার কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল।

নরেন বল্লে, "উপা, লজ্জা করিস্‌নে, এ আমার বন্ধু অজিত। বাবা, আমার মুখে অজিতের কথা শুনেছেন ত?"

সুরেনবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "এস বাবা, এস! নরেনের বন্ধু বলে তোমাকে আর আপনি বল্লুম না। বোসো—ঐ চেয়ারে বোসো। উপা, আর দু-পেয়ালা চা তৈরি কর্‌ত মা!

অজিত হেসে বল্‌লে, "কোর্টের ফের্‌তা আস্‌ছি, নরেন আর আমাকে বাড়ী গিয়ে খোলস্ ছাড়্‌বার অবকাশ দেয়-নি। আশা করি দাঁড়কাকের এ ময়ূরপুচ্ছকে আপনারা সকলে ক্ষমা কর্‌বেন।"—টুপী হাতে করে অজিত আমার সামনের চেয়ারে বসে পড়্‌ল।

এই অজিতের কথা আজ ক-দিন ধরেই শুন্‌ছি। অজিত, খুব বড়লোকের এক মাত্র সন্তান। কল্‌কাতায় বি-এ পাশ করে বিলাতে গিয়ে সে ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছে। দেখ্‌তেও সে বেশ সুপুরুষ। নরেন কাল বল্‌ছিল, অজিতের সঙ্গে উপমার বিয়ে হলে বেশ হয়। কথাটা তীরের ফলার মত আমার বুকে গিয়ে বিঁধেছিল বটে,—কিন্তু ভেবেছিলুম সে সুধু কথার কথা।

আজ আমার চায়ের পেয়ালায় কে-যেন নিম-পাতার রস ঢেলে দিয়েছে! কোন রকমে চা-পান কর্‌তে কর্‌তে ভাবতে লাগলুম, নরেন যখন অজিতকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, ব্যাপারটা তখন আর হাল্‌কা ভেবে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। উপমা যে এখন আমার দেহের সঙ্গে রক্তের মত মিশে আছে,—সে পরের হবে, এ-যে ভাবতেও পারি-না। উপমাকে এখন যেদিন ভুল্‌ব—সেদিন আমি নিজেকেও হয়ত ভুলে যাব!

ভাবছি, হঠাৎ আমার বেয়ারা ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে খবর দিলে, বাবার আবার ফিট হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়্‌লুম।

গ

বাবার এবারকার পীড়া কিছু গুরুতর। ডাক্তার বল্লেন, কলকাতার গরম বাবার সহ্য হচ্ছে না, এঁকে দু-একদিনের মধ্যেই দার্জ্জিলিঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত, নইলে অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মা ধরে বসলেন, কাল্‌কেই দার্জ্জিলিঙ্গ যাব। স্থির হোল, দার্জ্জিলিঙ্গে আমার এক মামা আছেন, আপাতত সেইখানে গিয়েই উঠ্‌ব।

বল্‌তে-কি, এ-সময়ে আমার মন কলকাতা থেকে কিছুতেই নড়্‌তে চাইছিল-না, কিন্তু উপায় নেই—এ যে কর্ত্তব্য!

সকালে উঠে তাড়াতাড়ি উপমাদের বাড়ী ছুটলাম।

ঢুক্‌তেই দেখি, উপমা বাগানে দাঁড়িয়ে ফুল তুল্‌ছে।

আমি তার কাছে গিয়ে বল্‌লাম, "উপা, বাবার ব্যামোর বড় বাড়াবাড়ি—তাঁকে নিয়ে আমরা দার্জ্জিলিঙ্গ যাচ্ছি।"

"কবে, প্রভাত-দা?"

"আজই।"

"—আজই! সেকি, যাবার আগে মা-বাবা দেখতে পাবেন-না?"

"কেন উপা, তোমার বাবা আর মা কোথায়?"

"তাঁরা শ্রীরামপুরে কাকার বাড়ী গেছেন। কাল আসবেন।"

আমি হতাশভাবে বল্‌লাম, "তোমার বাবার সঙ্গে আজ আমার দেখা হওয়ার যে বড় দরকার ছিল উপা!"

"কেন প্রভাত-দা?"

"—আমার হাতে তোমাকে দিতে তাঁর কোন আপত্তি আছে কিনা, যাবার আগে সে-কথা জেনে যেতাম।"

উপমার গালদুটি রাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল। ঘাড় হেঁট করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে বল্লে, "তোমরা চলে যাচ্ছ, এইবেলা আমি সকলকার সঙ্গে দেখা করে আসি।"

নরম কাঁধের উপর এলানো চুল দুলিয়ে উপমা চলে যেতে উদ্যত হোল,—আমি আবেগভরে তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে গাঢ়স্বরে বল্‌লাম, "দাঁড়াও উপমা, অনেক দিন তোমায় দেখ্‌ব-না, একবার ভাল করে দেখে-নি!"

উপমা একবার চকিতের জন্য পূর্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল,—পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে লজ্জায় নুয়ে ফুলে ডালার দিকে চেয়ে থম্‌কে দাঁড়াল।

গাছের ফাঁক্ দিয়ে সোনার মত এক ঝলক রোদ্ এসে উপমার মুখের এক দিকটি আলোয়-আলো করে তুল্‌ল—সে মূর্ত্তি যেন গ্রীক ভাস্করের উপাস্য প্রতিমা!

ঘ

দার্জ্জিলিঙ্গে এসে বাবার রোগ কম্‌ল না—কিন্তু নানান্ উপসর্গ বাড়তে লাগ্‌ল।

আমাদের মনের আনন্দই প্রকৃতিতে প্রাণসঞ্চার করে।—সে আনন্দ আমার ছিল না। তাই উপত্যকায় মেঘের মেলা, তুষার-পটে আলোর খেলা, শৈল-কোলে ঝরণার লীলা—এ-সব চোখ-দিয়ে দেখ্‌তাম মাত্র, মন-দিয়ে গ্রহণ কর্‌তে পারতাম না;—সবই যেন অর্থহীন চিত্রের মত!

সুধু বাবার অসুখই এত অশান্তির কারণ নয়;—নিয়তি সকল দিক থেকেই আমাকে কাবু কর্‌বার ফিকিরে আছে।

জীবনের এই ভাগটা শিশুর পক্ষে দ্বিতীয় ভাগের মত আমাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে,—একে বাদ দেওয়াও চলে না, মনে রাখাও কষ্টকর। এ দুর্দ্দিনের কথা ভুলে মেতে কত-না চেষ্টা করেছি—কিন্তু পারি-নি, কিছুতেই পারি-নি! এ যেন আগুনের আখরের মত আমার বুকের ভিতরটা দাগী করে রেখেছে!

.....তাকে দেবী বলেই জানতাম। না,—জানতাম কেন, এখনো তাই বলেই জানি, তাই বলেই পূজা করি। ভ্রম-প্রমাদের জীবনে হয়ত সে ক্ষণিকের ভুল করে ফেলেছিল। কিন্তু কার অভিশাপে

ক্ষণিকের সে ভুল আমার অদৃষ্টে চিরস্থায়ী হয়ে রইল?

দার্জ্জিলিঙ্গে আসবার পরে, কল্‌কাতা থেকে প্রথম চিঠি পাই উপমার। আমরা কে কেমন আছি জিজ্ঞাসা করে সব-শেষ লাইনে সে লিখেছিল:—"প্রভাত-দাদা, তোমার জন্যে আমার মন-কেমন করে।"

সর্ব্বশেষের সামান্য এই একটি লাইনকে তোমরা কেউ অসামান্য বলে ভাববে-না হয়ত। আমি কিন্তু সেই লাইনটিকে ইষ্ট-মন্ত্রের মত মনে-মনে কতবার—কতদিন যে জপ করেছি, তা-আর বলা যায় না। প্রেম যে সামান্যকে অসামান্য করে তোলে!

আজও সে লাইন—সেই একটিমাত্র লাইন আমার জীবনকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। "প্রভাত-দাদা, তোমার জন্যে আমার মন-কেমন করে।"—উপমার শেষ-পত্রের এই শেষ-পংক্তিটি স্মরণীয়। কারণ, তারপর উপমার জীবনে যেদিন এসেছে, সে-দিনের কথা আর আমার অধিকারে নেই—সে তখন অন্যের ধর্ম্মপত্নী!

চিঠি লেখবার সময় সত্যই কি তার মন-কেমন করেছিল? এখনো মাঝে মাঝে কথাটা ভাবি। একটা ইতর প্রাণীর সঙ্গে থাক্‌লেও যে তার উপরে মায়া পড়ে,—আর আমি হচ্ছি তার বাল্যসাথী,—কত কাল থেকে একসঙ্গে আছি, আমার উপরে কি তার মায়া পড়ে-নি? এ-আর বিচিত্র কি? কিন্তু আমার এ প্রাণ ত তার মায়ার কাঙ্গাল ছিল না—সে যে চেয়েছিল, প্রেম! উপমাও ত তা জান্‌ত!

আবার, আর-এক হতেও পারে। হয়ত, আমার জীবন তার নির্দ্দয়তায় নিস্ফল হয়ে যাবে বলে, আমার হতভাগ্যের কথা ভেবে তার মনে অনুতাপের ক্ষণিক দয়া হয়েছিল। তাই কি? উপমার এ মন-কেমন-করা কি প্রথম শিকারীর করুণার মত? না, না,—আর ভাব্‌তে পারি-না। এযে নিজের দেহেই ছুরি চালিয়ে শব-ব্যবচ্ছেদ শিক্ষা হচ্ছে। এ ব্যাপার যতই বিশ্লেষণ কর্‌ব, আমার আত্মা ততই রক্তাক্ত হয়ে উঠ্‌বে!

ধনীর সন্তান অজিতের অর্থের মোহেই হোক্, আর তার বাপ-মার ইচ্ছা বা আদেশেই হোক্,—উপমা যখন আমাকে ত্যাগ করেছে, তখন আর কারণ-চিন্তা করে লাভ কি? অকালে, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও চাতক যখন বাদলের ধারা পাবে না, তখন তার পক্ষে কান্না-থামানোই হচ্ছে, উচিতকার্য্য।

* * *

উপমার চিঠি সামনে রেখে সেদিনও মেঘের প্রাসাদ তৈরি কর্‌ছিলাম, এমন-সময়ে সুরেনবাবুর এক পত্র এসে আমার সুখের মেঘে আগুণ ধরিয়ে দিলে। সেই পত্রেই প্রথম জানলুম, অজিতের সঙ্গে উপমার বিবাহ।

আমার তখনকার মনের অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা নিস্ফল; কারণ, সে ত আমি পার্‌ব-না! কল্পনায় পরের মানস-ভাব হয়ত ফুটানো যায়, কিন্তু নিজে যা প্রাণে-প্রাণে অনুভব করছি, সে কঠিন বাস্তবকে ভাষায় ঠিক প্রকাশ করা যায় কিনা, তাতে আমার সন্দেহ আছে। অন্তত আমার সে শক্তি নেই।

জীবনে ধিক্কার এল,—নারীর প্রতি ঘৃণা হোল। সারা সন্ধ্যা কেমন-যেন আচ্ছন্নের মত চুপ করে বসে রইলুম,—যখন সাড় হোল তখন রাত্রি হয়েছে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি,—আমার বুক ছাপিয়ে অনন্ত কালিমা যেন বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। চন্দ্রশূন্য আকাশ, মাথার উপরে যেন-এক কালিমাখা বিরাট কটাহের মত উপ্টে রয়েছে। আমার মনে হতে লাগল, পৃথিবীতে শত শত অভাগার প্রাণে প্রাণে অহরহ যে দুঃখের চিতা জ্বল্‌ছে, তারই শিখার ধূমে আকাশ অত অন্ধকার!.....

উপমার চিঠিখানা হাতেই ছিল,—সেখানা বাতির আলোয় ধর্‌লুম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কিন্তু ছাই হয়েও চিঠিখানা একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেল-না,—বেঁকে-চুরে দুম্‌ড়ে গেল মাত্র। মাথা হেঁট করে তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম। ছোট-ছোট চেনা হাতের লেখায় তখনো পড়া যাচ্ছে, 'প্রভাত-দাদা, তোমার জন্যে আমার মন-কেমন করে!' —করে নাকি? করুক্! বিদ্রূপের স্বরে আপনমনে হেসে উঠে, পত্র-ভস্ম সবলে মুঠোয় চেপে ধরলুম, মুড়্-মুড়্ করে একটা শব্দ হোল—সে-যেন কার অতি-মৃদু আর্ত্তনাদ! যখন মুঠো খুল্‌লুম, হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়া এসে ছাইগুলোকে এক-ঝাপ্‌টায় নিঃশেষে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

*
* *

মনের যখন এমনি অবস্থা, বাবার অসুখ তখন চরমে উঠ্‌ল।

সুরেন-বাবুর আর-এক পত্র পেলুম, উপমার বিয়ের নিমন্ত্রণ! তার দু-চারদিন পরেই বাবাকে নিয়ে কল্‌কাতায় রওনা হলুম।

মনে আছে, উপমাদের বাড়ীতে যেদিন সানায়ে সাহানা বাজ্‌চে, আমাদের বাড়ীতে সেদিন কান্নার রোল উঠেছে!

৬

কল্‌কাতা আমার বিষ হয়ে উঠেছিল। ওকালতী পাশ করেই তাই পশ্চিমে চলে এসেছি। ছোট ভায়ের সঙ্গে মা কল্‌কাতাতেই আছেন।

বছর-দুই কেটে গেছে। এর মধ্যে মনের উন্নতি যত-না হোক্,—আর্থিক উন্নতি কিছু-কিছু হয়েছে।

মা প্রতি পত্রেই কান্না ধরেছেন, এইবার আমাকে বিয়ে কর্‌তে হবে। কিন্তু সে-কথা আমি কানে তুলিনি।

ইতিমধ্যে মার চিঠিতে উপমার খবরও পেয়েছি। তার জীবন সুখের নয়। অজিত মাতাল আর লম্পট। উপমার গায়ে হাত তুল্‌তেও সে পিছপাও নয়।

নিয়তি!

আমার কথা কি আর তার মনে আছে? বোধহয়, না। নইলে, বিয়ের পর থেকে সে আমার কোন খোঁজখবর নেয়-নি কেন? ভাল স্বামী না পেলেও সে টাকা ত পেয়েছে বটে! উপমা এখন বিলাসিনী ধনীর ঘরণী। সেখানে আমি কে?

থাক্ ও কথা। অতীতের চিতাভস্ম কুড়িয়ে, কি আর হবে?

এদিকে মা হতাশ হয়ে উঠ্‌ছেন।

পত্রে তিনি লিখেছেন, যাদের নিয়ে বয়সে তাঁর সংসারধর্ম্ম, তারা যদি সংসারী হয়, তবে তিনিও আর সংসারের ভার নেবেন না—কাশী চলে যাবেন।—চিঠির ভাষা কালি দেখে বুঝলাম, লিখ্‌তে লিখ্‌তে মা কেঁদেছেন। মনে কেমন একটা ঘা লাগ্‌ল।—অভাগিনী বিধবা জননী আমার! না ভেবে-চিন্তেই উত্তর দিলাম—আমি বিয়ে কর্‌ব।

চ

দেশে ফির্‌ছি।

একেলে বিয়ের বাজারে রোজগারী উকীল-বর ভারি আক্রা—একরাশ পুঁটিমাছের ভিতরে দশ-সেরী একটি কাত্‌লার মত। সুতরাং, আমাকে কেন্‌বার খরিদ্দারের অভাব হয়-নি।

মত দিয়েছি বলে এখন অনুতাপ হচ্ছে। পরিচিতকে যে আপন করতে পারলে-না, অপরিচিতকে সে কি আর আপন কর্‌তে পারবে?

ট্রেণ একটা বড় জংশনে এসে দাঁড়াল। কল্‌কাতা থেকেও একখানা যাত্রী-গাড়ী এসে ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছিল।

এখন বড়দিনের ছুটি। পশ্চিমে, কল্‌কাতার গাড়ীতে এ-সময় অনেক চেনা মুখ নজরে পড়ে। ও-গাড়ীতে কোন আত্মীয়-বন্ধু আছেন কিনা দেখবার জন্যে কামরা থেকে নেমে পড়্‌লুম।

চেনা মুখ আছে বৈকি! দু-চার পা যেতে-না-যেতেই যাকে দেখলুম,—তাকে দেখবার আশা মোটেই করি-নি। একখানি সেকেণ্ডক্লাশ রিজার্ভ গাড়ীতে, জানালায় মুখ বাড়িয়ে, ঠিক আমার সামনেই বসে আছে—উপমা!

থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌লুম,—উপমাও আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছে!

আমাকে দেখেই সে কেঁপে উঠ্‌ল। তারপর ঘাড় হেঁট করে পাথরের মত বসে রইল। যেন-সে ফাঁশীর হুকুম পেয়েছে!

আমার মনের ভিতর সমস্ত অতীত একচমকে বিদ্যুতের মত খেলে গেল। সেই উপমা!

উঃ, কি বিবর্ণ তার মুখ, কি বিশীর্ণ তার দেহ, কি বিষণ্ণ তার ভাব! সেই রূপে-নিরুপমা উপমা, কেমন করে এমন বিষাদ-প্রতিমা হোল?—এযে জীবন্ত শব!

কতক্ষণ যে অবাক-আড়ষ্ট হয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তা আমার মনে নেই। উপমা আমার প্রাণে যে দাগা দিয়েছিল, আমার সমস্তকেই যে ব্যর্থ করে দিয়েছিল, আজ তার এই দীনমূর্ত্তি দেখে সে-সব কথা একেবারে ভুলে গেলাম—ষ্টেশনের সেই ব্যস্ত জনতা, সেই কর্কশ কোলাহল ডুবিয়ে আমার স্মৃতির পটে সেই-একদিনের সোনার ছবি জেগে উঠল, যেদিন তার পাশে বসে, তার হাতে হাত রেখে বকুল-শাখায় বসন্ত-বাতাসের অশ্রান্ত গানে এক নূতন রাগিনীর আভাস পেয়েছিলাম!

কলকাতার গাড়ীর বাঁশী বেজে উঠল, সে তীক্ষ্ণ ধ্বনি যেন ধারালো অস্ত্রের মত আমার প্রাণটা খান্-খান্ করে দিলে। আমি চম্‌কে উঠলুম—উপমাও চম্‌কে উঠল।

গাড়ী ছেড়ে দিলে।

উপমা যেন প্রাণপণে চোখ তুলে আমার

দিকে চেয়ে রইল,—সে চোখে কোন্ ভাব ছিল, মন তা বুঝেছে, আমার মুখ তা বলতে পারবে-না!

আকাশের রোদ উপমার মুখে এসে পড়্‌ল—তার পাণ্ডুর কপোলে কি ও চক্‌চক্ করছে? অশ্রু!

উপমা কাঁদছে!

* * *

কল্‌কাতার টিকিট ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। বিবাহ? এ-জীবনে নয়।

তার চোখের জলে মনের সকল মলিনতা ধুয়ে গেছে। জীবনে তাকে আর-কখনো দেখি-নি; কিন্তু আমার হৃদয়-মরু সজল করে, আজীবন জেগে থাক্‌বে, সেই এক ফোঁটা অশ্রুজল!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

মাসকাবারী

আর্টের আধ্যাত্মিকতা

জ্যৈষ্ঠের "নারায়ণে" শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের "আর্টের আধ্যাত্মিকতা" নামে একটি চমৎকার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ:—পিউরিটানগণ কাব্য সঙ্গীত বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আধুনিক জগতেও কাব্যে সঙ্গীতে চিত্রে ভাস্কর্য্যে আমরা চাহিতেছি Idealism, অর্থাৎ যাহা উচ্চভাবের উদ্বোধক—যাহা অধ্যাত্মরোধের সহায়, ধর্ম্ম-জীবনের উদ্দীপক। প্রথমেই আমরা বলিতে চাই চারুকলা বা আর্টের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। ভগবৎ-উপলব্ধিতে এক রস, রমণী-সম্ভোগে আর এক রস। শিল্পী এই দুই বিষয়ের যে কোনটি লইয়া এক রসপূর্ণ সৃষ্টি করিতে পারেন। রমণী-সম্ভোগের চিত্র ধর্ম্মজীবনের পক্ষে হানিকর হইতে পারে, কিন্তু শুধু রসসৃষ্টির দিক দিয়া দেখিলে তাহার মূল্য যে কম হইবে এমন বাধ্যবাধকতা আছে কি? ভগবানের বহুমূর্ত্তি—কে যে কতভাবে দেখিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মানুষের মহত্ত্ব, উদারতা, অতীন্দ্রিয়তার মধ্যে ভগবান আছেন, আবার মানুষের ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, ইন্দ্রিয়পরতার মধ্যেও সেই একই ভগবান। সাধু চাহেন প্রথমটি। শিল্পী কিন্তু দুইটিকেই সমানভাবে সত্য-রসপূর্ণ করিয়া দেখাইতে পারেন। সাধু ও শিল্পীর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এক নহে। সাধু ও সংস্কারক জগৎকে মানুষকে একটা বিশেষ আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চাহেন। সতীধর্ম্ম, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি এইরূপ এক-একটি আদর্শ। শিল্পী কিন্তু বলেন পাপ না চাহিতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া উহার প্রতি অন্ধদৃষ্টি হইব কেন? পুণ্যবান হইয়াও পাপের মধ্যে কি খেলা কি উদ্দেশ্য কি তত্ত্ব তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে বিরত থাকিব কেন? জগতে আদর্শ-প্রতিষ্ঠাকল্পে শিল্পী তাঁহার শিল্পকে নিয়োজিত

করেন না। কোন্ আদর্শ কোন্ যুগে ফুটিয়া উঠিয়া জগতের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে সেই অনুসারে শিল্পী তাঁহার প্রতিভা পরিচালিত করেন না। আর্ট দেশকালের অতীত। শিল্পী দেখেন শুধু চিরন্তন সত্য, উদাসীনভাবে ধ্যান করেন পাপ-পুণ্যে, ক্ষুদ্রে-বৃহতে, অন্যের মধ্যে কল্যের মধ্যে ভগবানের বিচিত্র সত্তা। প্রকৃত অধ্যাত্মের সঙ্গে আর্টের কোন বিরোধ নাই। যোগীর আত্মা কোথায়? তাঁহার যোগে। ভোগীর আত্মা কোথায়? তাঁহার ভোগে। যোগীর যোগীত্ব, ভোগীর ভোগীত্ব, দেবের দেবত্ব, পশুর পশুত্ব প্রকটিত করিতে পারিলেই, শিল্পীর শিল্পের পরাকাষ্ঠা। এই হিসাবে শিল্পীই প্রকৃত আধ্যাত্মবাদী। অসুন্দর কাহাকে বলি? অসুন্দর তাহাই যাহা বস্তুর বাহিরের চেহারাটা শুধু দেখায়, বস্তুর অন্তরের রহস্যটি যাহা বুঝাইয়া দিতে পারে না। ফটোগ্রাফ কুৎসিত, তাহা নগ্ননারীরই হউক আর সাধু পুরুষেরই হউক। কারণ ফটোগ্রাফে নগ্ননারীই দেখি, নগ্ননারীত্ব দেখি না, সাধুপুরুষের জটাবল্কল দেখি কিন্তু সাধুত্বের ব্যাখ্যা পাই না। কবি যিনি, দ্রষ্টা যিনি, তিনি সৃষ্টি করেন সিদ্ধ অবস্থার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া। এ ভাব ভাল-মন্দ শুদ্ধ-অশুদ্ধ মঙ্গল-অমঙ্গলের অতীত। আচরণ, উদাহরণ, শিক্ষা, ব্যাখ্যার সাহায্যে সাধু ধর্ম্মের সহিত, অধ্যাত্মের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে চাহেন, শিল্পী কিন্তু চাহেন শুধু ভাবের মধ্য দিয়া। ম্যাডোনার ছবিই তুমি অঙ্কিত কর, আর বারনারীরই ছবি অঙ্কিত কর, তোমার বিষয়টির কোন প্রকৃতি-গত দোষ নাই। প্রশ্ন শুধু, সত্য ভাবটিকে পাইয়াছ কি? আর্টের প্রভাব-প্রসার সূক্ষ্ম। আমরা চাই স্থূলপ্রভাব—লাঠ্যৌষধি না হইলে আমাদের চৈতন্য হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্র নীতি-শাস্ত্রের তাই সৃষ্টি হইয়াছে। আর্টের মধ্যেও তাই নীতিবাদ প্রভৃতি মতবাদ প্রবেশ করাইতে চাহিতেছ। কিন্তু মানুষের সূক্ষ্ম যে অন্তরের প্রকৃতি, তাহার আধ্যাত্মসত্তা কোনদিনই নীতি দ্বারা প্রবুদ্ধ হইবে না। আর্ট হইতেছে দৃষ্টি—revelation। এই দৃষ্টি বস্তুর অন্তরতম রহস্যের সহিত সাক্ষাৎ-ভাবেই আমাদের এক সহজ পরিচয় স্থাপন করিয়া দেয়। প্রকৃতপক্ষে আর্ট ও ধর্ম্মের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই। আত্মার সহিত পরিচিত হওয়াই যদি ধর্ম্মের লক্ষ্য, আর্টেরও তবে উহাই লক্ষ্য।"

*
* *

নিধু গুপ্ত

"নারায়ণে" "নিধু গুপ্ত" নামক প্রবন্ধের লেখক লিখিতেছেন—"এ যুগের শ্রেষ্ঠ গীত-রচয়িতা * * রবীন্দ্রনাথও তাঁহার (নিধু গুপ্তের) ও অন্যান্য কবি-ওয়ালার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।"

লেখক বলিতে চান, নিধু গুপ্তের—

১। "আমারি মনের দুঃখ চিরদিন মনে রহিল,
ফুকারি কাঁদিতে নারি বিচ্ছেদে প্রাণ দহিল।"

২। "আমি মাত্র এই চাই, মরি তাহে ক্ষতি নাই
তুমি আমার সুখে থেকো, এ দেহে সকলি সবে।"

৩। "মনপুর হতে আমার হারায়েছে মন"

প্রভৃতি লাইনের নকল করিয়াই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

১। "হলোনা হলোনা সই
মরমে মরম লুকানো রহিল বলা হ'ল না ;
বলি বলি বলি তারে কত মনে করিনু
হলোনা হলোনা সই।"

২। তুমি যাহে সুখী হও তাই কর সখা,
আমি সুখী হব বলে যেন হেস না।
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভাল।"

৩। হৃদয় আমার হারিয়েছে"—প্রভৃতি।

এ অত্যন্ত ভুয়ো কথা—যতই জোর গলায় বল, ইহা টিঁকিবে না। রবীন্দ্রনাথ নিধুগুপ্তের প্রভাব "অতিক্রম" করিতে পারেন নাই—একথা মানিতে হইলে রবীন্দ্রের রবীন্দ্রত্বকেই অস্বীকার করিতে হয়। প্রতিভাকে অস্বীকার করিয়া বাহাদুরি দেখাইবার চেষ্টা করিতে পার কিন্তু প্রতিভার আলো কিছুতেই ঢাকা পড়ে না। জগতে এর দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বিচার করিতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে খণ্ডভাবে দেখিলে তো চলিবে না, তাঁহাকে সমগ্রভাবে দেখা চাই। তিনি যদি কেবলমাত্র গোটা-কয়েক বিরহ বা মিলনের টপ্পা লিখিয়া ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলে চাই-কি এমন কথা তোলা চলিত। কিন্তু তাঁহার শক্তি যে বহুমুখী। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তো কোনো গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই—তাহা নব-নব বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া অসীমতার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। কাজেই অপরের কথা দূরে থাক, তিনি নিজেকেই নিজে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। লেখক যে লাইনগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা ত রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বস্ব নহে—এবং সেগুলিও যে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান তাহাও নয়। কাজেই সেগুলি লইয়া রবীন্দ্রনাথকে বিচার করা চলে না।

আর তা ছাড়া, সকল মানুষের মধ্যে কতকগুলা সাধারণ ভাব আছে—সেগুলোর মূল-কথা লইয়া সাহিত্যের বিচার হয় না। ব্যক্তিবিশেষের ভিতর দিয়া কোন্ আকারে তাহা ফুটিয়াছে তাহাই দেখিতে হয়। নইলে মূলভাব লইয়া আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় সাহিত্যের আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত গোটা-কয়েক সূত্র ছাড়া বেশি-কিছু সৃষ্টি হয় নাই। কয়েকটা মাত্র সূক্ষ্ম রেখা দ্বারা বিশ্বের সমস্ত প্রতিভাকে বাঁধিয়া ফেলা যায়।

*
* *

ভাষা বিভ্রাট

বৈশাখের "উপাসনা"য় "ভাষা বিভ্রাট" নামে একটি লেখা বাহির হইয়াছে। লেখক এই রচনাটিতে শুধু ভাষা নহে, ভাবেরও বিভ্রাট ঘটাইয়া প্রবন্ধটির নাম সার্থক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

'উপাসনা'র লেখক একস্থানে বলিতেছেন, "নবীনগণ নিজ নিজ নবীনতার জন্য এবং নব নব ভাবের আমদানির দরুণ ভাষাকে সরলতা ও ভাবহীনতার দিকেই টানিয়া লইয়াছেন।" —এই নব-আবিষ্কৃত তথ্যের অর্থ খুজিয়া পাওয়া শক্ত। "নব নব ভাবের আমদানি" যখন হইতেছেই, তখন ভাষায় আবার "ভাব-হীনতা" থাকিবে কি-করিয়া? এ উক্তির টীকা করিতে পারেন, কে এমন মল্লিনাথ আছেন?

"পদ্য আপন ছন্দ আপন গতির তালকে বাঁচাইতে গিয়া ভাষার আসরের ফরাসের বাহিরে পা ফেলিলে কেহ তেমন দোষ

দিবে না। কিন্তু গদ্যের সে ক্ষমতা নাই। তাহার আসরের বাহিরে যাইবার জো নাই, সাজ পরিবর্ত্তনের জো নাই এবং বিষয়, সময়, তাল, মান সর্ব্ব বিষয়েই তাহাকে বাঁধা নিয়মে চলিতে হইবে।"—এ কি পিনাল-কোডের ধারা বাঁধিয়া সাহিত্য চালাইবার ব্যবস্থা? গদ্য "সর্ব্ববিষয়েই" বাঁধা নিয়মে চলে এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার তো কোথাও দেখি নাই। গদ্য যদি চিরকাল বাঁধা নিয়মে চলিয়া আসিয়া থাকে ত তার রূপ পরিবর্ত্তন হয় কেমন করিয়া?

অবশ্য বন্ধন যে একেবারে নাই তাহা নহে। সাহিত্য বলুন, শিল্প বলুন রূপের দিক দিয়া সকলেরই একটা বন্ধন আছে বটে কিন্তু ভাবের দিক দিয়া যে স্বাধীনতা তাহা ঐ রূপের খোলস হইতে উহা-দিগকে মুক্তি দিয়া নূতন রূপ দান করে। সেইজন্য এক রূপের বন্ধনটাই যে চিরস্থায়ী তাহা নহে। তা যদি না হইত তাহা হইলে জগতের সমস্ত চিন্তা মাত্র-কয়েকটা বাঁধা রূপের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হইত;—থাকিত কেবল কয়েকটা বুক্‌নির ছাঁচ;—সাহিত্যে শিল্পে এত বৈচিত্র্য আসিত না। আর, নিয়মকে বড় করিলে ত চলিবে না, কারণ সৃষ্টি আগে, পরে নিয়ম—এ ত জানা কথা। নিয়ম শুধু সৃষ্টির রহস্যকে প্রকাশ করে মাত্র—সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে না। সাহিত্য ত সৃষ্টিরই কাজ। কলে ফেলিয়া যদি এক-মার্কা মারা সাহিত্য তৈরি করিতে চাও তবে একেবারে ঠিকঠাক বাঁধা-নিয়মে কল চালাইতে পার।

লেখক নিজে যে নিয়মের কথা তুলিয়াছেন প্রবন্ধের মধ্যে তিনি সে নিয়ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। যে বাঁধা-নিয়মে বাংলা ভাষা আগে চলিত ঠিক সে নিয়মে তাঁর ভাষা চলে নাই। তাঁর ভাষা শুধু ফরাসের বাহিরে নয়, ফরাস ছাড়িয়া দেশ-বিদেশে ছুটাছুটি করিয়া হাঁপাইয়াছে। তিনি এমন সব অদ্ভুত বাক্য সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা বাংলার বাঁধা-নিয়মের মধ্যে কিছুতেই আসে না। এমনটা কেন হইল? ইহার মধ্যে অক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু অক্ষমতাটাই সব নয়।

আর একটা কথা লেখক বলিয়াছেন, "গুরুচণ্ডালি দোষ গদ্যে যতটা কাণে ঠেকিবে পদ্যে ততটা নয়।"—কথ্য বা লেখ্য ভাষায় এবং গদ্যে বা পদ্যে—গুরুচণ্ডালি দোষ সর্ব্বত্রই নিন্দার বিষয়। এ দোষ গদ্যে যাঁর কাণে ঠেকে না, তাঁর কাণে কোনো দোষ আছে নিশ্চয়।

লেখক ভাষার স্বাধীনতার পক্ষপাতী নহেন অথচ তিনি শব্দ সম্বন্ধে এতটা স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন যে বলিবার নয়। কথায় কথায় ইংরাজি বুকনি যথা—"Direct descendant, upstart, provincialism, conscious, conclusion draw, cultured, ইত্যাদি!

*
* *

ষ্ট্রাইন্‌ডবার্গ

জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত অজিত-কুমার চক্রবর্ত্তীর "আধুনিক কাব্যের প্রকৃতি" নামে সুলিখিত প্রবন্ধের একস্থলে আছে—"এখনকার সামাজিক জীবনের পাঁক ইব-সেনের সামাজিক নাট্যগুলিতে প্রচুর উঠিয়া

আসিয়াছে বটে; কিন্তু সেইসঙ্গে সেই নাট্যগুলির মধ্যে পূর্ণতর সমাজ শতদলের ভাবী বিকাশের একটা অস্ফুট আভাসও যেন আছে। ষ্ট্রাইন্‌ডবার্গ প্রভৃতির মধ্যে সেই আভাসটুকু বাদ পড়ায় এবং পাঁকের পরিমাণ বেশী জমিয়া উঠায় তাঁহারা পাঠকদিগকে রাশীকৃত অর্থহীন তথ্যের তলায় চাপা দিয়া শ্বাসরোধ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এইজন্য এই সকল লেখককে অবনতিশীল শ্রেণীর মধ্যে ধরা হইয়া থাকে।"

এত সহজে ষ্ট্রাইন্‌ডবার্গের প্রতিভাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় কিনা, ভাবিবার কথা। "অস্ফুট আভাসও যেন আছে"—এই সংশয়পূর্ণ উক্তিটির জন্য ষ্ট্রাইন্‌ডবার্গকে খাটো করা যায় কি? আমাদের বিশ্বাস, "সমাজ শতদলের ভাবী বিকাশের একটা আভাস"—ষ্ট্রাইন্‌ণ্ডবার্গের রচনায় "অস্ফুট"ত নয়ই, বরং প্রস্ফুটই বলিতে হইবে। ইব্‌সেনের মত ষ্ট্রাইন্‌ড্‌বার্গের লেখাতেও "সামাজিক জীবনের পাঁক" আছে বটে, কিন্তু সে পাঁক হইতে শতদলও উঠিয়াছে। Father ও There are Crimes and Crimes প্রভৃতি নাটকে ষ্ট্রাইন্‌ড্‌বার্গ যে খালি পাঁক্ ঘাঁটিয়াছেন, এ-কথা কেহই বলিতে পারেন না। পরন্তু, শেষোক্ত নাটকখানিতে বাস্তব আর্টের সহিত আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব্ব মিলন দেখা যায়। বিখ্যাত সমালোচক অষ্টিন হ্যারিসনের মতে "In Father and The Dance of Death he reached Ibsen at his highest"। Father সম্বন্ধে তিনি বলেন, "In its essentials, it is a moral Play"। প্রবন্ধের গোড়াতেই অজিতবাবু যে "অতীন্দ্রিয় প্রাণে"র কথা বলিয়াছেন, ষ্ট্রাইন্‌ডবার্গে তাহারও অভাব নাই। "The Mystical in Art" বলিতে যাহা বুঝায়, ষ্ট্রাইন্‌ডবার্গের লেখায় তাহার বিকাশও যথেষ্ট। Symbolistic Play বা রূপক নাট্য ষ্ট্রাইন্‌ডবার্গ যত-বেশী লিখিয়াছেন তত বেশী আর-কিছু নয়। সেগুলি গুণ্‌তিতে উনিশখানি; এবং ইহার অনেকগুলিতেই বাস্তবতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার ও অতীন্দ্রিয়তার বিচিত্র ইন্দ্রজাল আছে।

* * *

সাহিত্যের ভাষা ও চলতি কথা

জ্যৈষ্ঠের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন-চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ, এম, আর, এ-এস্ রচিত "সাহিত্যিক ভাষা ও চলিত কথা" নামে একটি লেখা বাহির হইয়াছে। লেখকের মূল বক্তব্য এই যে, তিনি সাহিত্যিক ভাষায় চল্‌তি কথার পক্ষপাতী নন। প্রবন্ধের আরম্ভে তিনি বলিতেছেন, —"একজন মূর্খ কৃষকের ক্ষেত্রের বিবরণ ও বাগ্মীবর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের বক্তৃতা যে এক নহে, তাহা কে-না জানে।" —লেখক গোড়াতেই গলদ করিয়া বসিয়াছেন। কারণ, যাঁহারা চল্‌তি ভাষা চালাইতে চান, তাঁহারা "মূর্খ কৃষকে"র ভাষা অবলম্বন করেন না। তবে চাষার ভাষাতেও তাঁহারা লিখিতেন বটে,—যদি তাহা বিজ্ঞানসম্মত হইত,— যদি তাহাতে আর্ট থাকিত, সঙ্গতি থাকিত, সর্ব্ববিধ ভাবপ্রকাশের বাধা না ঘটিত। চাষার

ভাষা অশিক্ষিতের শৃঙ্খলাহীন ভাষা,—সেই জন্যই তাহা অচল। কিন্তু প্রতিভা থাকিলে চাষার ভাষা হইতেও শ্রেষ্ঠ কবিত্ব সৃষ্টি হইতে পারে,—এর প্রমাণ কৃষক-কবি বার্‌নস্। তাঁহার ভাষা চাষার ভাষা হইলেও তাঁহাকে চাষাড়ে বলিয়া কেহ নাক বাঁকান না। সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙ্গলার অসংখ্য গ্রাম্য কবির লেখা পড়িলেও এ সত্যটি বেশ বোঝা যায়। লেখক বলিতেছেন, "আস্‌তে আজ্ঞা হউক স্থলে আস্‌তে হুকুম হোক বলিলে চমৎকার ভদ্রতা প্রকাশ পাইবে কি? 'কুশল', 'মঙ্গল', 'প্রণাম' কথার ঠিক চলিত কথায় অনুবাদই হয় না।"—সকলের আগে লেখকের এটুকু মনে-রাখা দরকার যে, অনেক সংস্কৃত কথা চল্‌তি হইয়া গেছে এবং চল্‌তি ভাষা মানে সংস্কৃতের অনুবাদ নয়। চলিত কথায় সংস্কৃতের বাংলা অনুবাদ যেমন অদ্ভুত শোনায়, চল্‌তি কথাকেও সংস্কৃতের ছাঁচে ফেলিলে তেমনি অদ্ভুত শোনায়। "মাথা খাও সেখানে যেয়ো না" না-বলিয়া যদি "মস্তক ভক্ষণ কর তথায় গমন করিও না" বলা হয়, কিম্বা "সে এখন আমার হাতে" না বলিয়া "সে অধুনা আমার হস্তে" "তার কপাল ভাঙিয়াছে"র পরিবর্ত্তে "তাহার ললাট-দেশ ভঙ্গ হইয়াছে" বলিলে কেমন শোনায়? চল্‌তি কথাকে সংস্কৃতে তর্জ্জমা করিয়া অনেক স্থলে শুদ্ধ ভাষা তৈরি করা হয়। বাজারে তাহাই খাঁটি মাল বলিয়া চলিতেছে। যাঁহারা চল্‌তি ভাষার পক্ষপাতী তাঁদের ঐখানেই বিশেষ আপত্তি। তাঁরা চান বাংলা ভাষার অকৃত্রিম, স্বভাব-সুন্দর সহজ-সরল রূপ। বাংলার ঐ সহজ রূপ মুখে যে ভাষা চলে তার মধ্যেই আছে।

"যখন লোকের ভাষায় শিল্প সৃষ্টি করিতে হয়, তখন চলিত কথায় তাহার চলে না, তখন নানাভাবে চলিত-কথাকে বাড়াইয়া কমাইয়া, নূতন করিয়া কুটিল আড়ম্বরপূর্ণ, কৃত্রিম ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।"—কিন্তু এ দোষ কাহাদের? যাঁরা চলতি ভাষায় পক্ষপাতী তাঁরা এ দোষ ততটা করেন না যতটা করেন আমাদের সাধুভাষীরা। কারণ তাঁরাই ত সরল চল্‌তিটাকে সভ্য করিবার জন্য তার ঘাড়ে আড়ম্বরের বোঝা চাপাইয়া তাকে কৃত্রিম রূপ দান করিতেছেন। আর একথা কি বলিবার দরকার আছে যে, কুটিলতায়, কৃত্রিমতায় ও আড়ম্বরে আসল শিল্পসৃষ্টি হওয়া অসম্ভব?

লেখক তারপর বলিতেছেন চল্‌তি ভাষা শিশুর ভাষা—"শিশুর কথা মিষ্ট হইলেও বিজ্ঞের কথার সঙ্গে উচ্চাসন পাইবে না।" এ এমন ছেলে-মানুষী কথা যে এর জবাব দিতে লজ্জা হয়। শিশুর ভাষা অস্ফুট ভাষা। মন যাঁর পরিণত তাঁর ভাষাও পরিণত। যে বয়সে শিশু নয় এমন লোকের মুখেও শিশুর ভাষা শোনা যায়। ভাষা কার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে তা লইয়া বিচার করিলে চলে না; কোন্ মন হইতে উঠিতেছে তাহাই দেখিতে হয়। মানুষ শিশু-অবস্থা হইতে যখন পরিণত অবস্থায় পৌঁছায় তখন যে সে শৈশবের ভাষা ছাড়িয়া দেয় তাহা ত নহে— সেই ভাষাই তার নিজের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তখন পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে।

তখনও সে চল্‌তি ভাষাতেই কথা কয়; বিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছি বলিয়া অভিধান খুঁজিয়া শব্দ চয়ন করিতে বসে না—গম্ভীর ভাবে সাধু ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করে না। তা যদি কেহ করে ত লোকের কাছে সে হাস্যাস্পদ হয়।

"চলিত কথায় উৎকৃষ্ট ধ্বনি হইতে পারে না।"—এ যুক্তির প্রমাণ কি? রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি" ও "খেয়া" প্রভৃতি কাব্য-পুস্তকে এবং "ঘরে-বাইরে" নামে উপন্যাসে কি ধ্বনির অভাব আছে? Irish Ballads and Songs-এ এবং বাংলার অধিকাংশ সঙ্গীত-সাহিত্যে চল্‌তি কথারই বেশী চলন দেখি,—কিন্তু এগুলির ভিতরেও "শ্রুতির ছন্দ বা rhyme নষ্ট হইয়া যায়" নাই। বারন্‌সের কবিতাও তথাকথিত "সাধু ভাষায় রচিত" নয়, অথচ সমালোচকে বলেন, "The words are almost always so apt and full of life at once so natural expressive, and so graceful and musical in their animated simplicity that, were the matter ever so trivial, they would of themselves trun it into poetry."

* *
*

সমালোচনা

হেঁয়ালি। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য, ২৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। সুকবি বিজয়-চন্দ্রের বাছাই-করা প্রায় শতাধিক খণ্ড কবিতা ও গান এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে; কয়েকটি পুরাতন কবিতাও স্থান পাইয়াছে। নূতন কবিতাগুলি কবির "দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইবার পরে এবং একেবারে অন্ধত্বলাভের পরে রচিত।" কবিতাগুলির স্নিগ্ধ ভাব ও সরল মধুর ঝঙ্কার সহজেই মনকে মুগ্ধ করে। কবিতাগুলি ছন্দে-ভাবে বিচিত্র,—নানা রসে রসালো। গ্রন্থের নাম 'হেঁয়ালি' হইলেও কোথাও অস্পষ্টতা-দোষ নাই—মুক্ত স্বচ্ছ প্রবাহে ভাবের স্রোত অবাধে বহিয়া গিয়াছে। কবিত্ব ও কৌতুকের অপূর্ব্ব সমাবেশে গ্রন্থখানি শিক্ষিত পাঠকের পক্ষে উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে। গ্রন্থে কবির রচিত কয়েকটি সংস্কৃত কবিতাও স্থান লাভ করিয়াছে। ছাপা-কাগজ ভাল।

গ্রহ-নক্ষত্র। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা। গ্রন্থখানি জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক—ছেলেদের জন্য লিখিত। এমন সরল সহজ ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে যে বৈজ্ঞানিক দুরূহ তত্ত্বগুলি অল্প-বয়স্ক ছাত্রেরাও কাহারও সাহায্য-ব্যতিরেকে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। পাঠ্যগ্রন্থের বিভীষিকার ছায়া বিষয়টিকে কোথাও এতটুকু ম্লান বা দুর্ব্বোধ করে নাই। গ্রন্থখানি উপকথার গল্পের ন্যায়ই অপূর্ব্ব কৌতূহলোদ্দীপক, এবং তাহারই মত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বিজ্ঞানের এই দুরূহ বিষয়গুলি এমন সহজে বুঝাইবার ক্ষমতা থাকা সামান্য গুণ নহে

বইকার সে ক্ষমতার অধিকারী। গ্রন্থে অসংখ্য চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে; বিষয়গুলি বুঝাইবার পক্ষে সেগুলির সার্থকতা যথেষ্ট। ছেলেদের জন্য লিখিত হইলেও এ গ্রন্থ-পাঠে বয়স্ক পাঠকও উপকৃত হইবেন, প্রচুর শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিবেন। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই প্রভৃতি উৎকৃষ্ট।

গয়া-কাহিনী। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, সিটিবুক সোসাইটি, ৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্বর্ণপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। 'গয়ার ইতিহাস' ও রহস্য-বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থখানি তিনভাগে বিভক্ত—প্রথমভাগে 'পৌরাণিকী কথা', দ্বিতীয়ভাগে 'ইতিহাসে গয়া ও গয়ালী', এবং পরিশিষ্টে 'গঙ্গাধরের স্তব', ও 'গয়াকৃত্যের' বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় এই গ্রন্থের 'ভূমিকা' লিখিয়া দিয়াছেন। 'ভূমিকা'য় হিন্দুর শ্রাদ্ধতত্ত্বের আলোচনাটুকু সুনিপুণ; সংক্ষিপ্ত হইলেও সুন্দর। ঐতিহাসিক আলোচনায় গ্রন্থকার এ-দেশের ও বিদেশের সুধী-বৃন্দের মতাদি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের হাতেই সে সকলের আলোচনার ভার অর্পণ করিয়াছেন, নিজে কোন মত নির্দ্দেশ করেন নাই। গ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশটুকু কৌতূহলোদ্দীপক—নানা তথ্যের সমাবেশে তাহা পূর্ণ। গয়ার মানচিত্র, বিষ্ণুপাদ মন্দির, অক্ষয়বট, ব্রহ্মযোনি, রামশিলা, বুদ্ধগয়ার মন্দির প্রভৃতির চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থে দুইটি ত্রুটি লক্ষ্য করিলাম,—এক—ভাষা সর্ব্বত্র সরল হয় নাই, আর—এত বড় গ্রন্থে লেখকের স্বাধীন চিন্তা-শক্তির কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। সুতরাং সাহিত্য-হিসাবে এ গ্রন্থের যে বিশেষ মূল্য আছে, এমন কথা বলিতে পারি না।

রিক্তা। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীসতীশচন্দ্র নাগ, টাউন ক্লব, খুলনা। কলিকাতা, মানসী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ; গ্রন্থের ললাট-পটে শ্রীযুক্ত জলধর সেনের এক 'পরিচয়-পত্র' আঁটা আছে। পরিচয়-পত্রের শেষাংশ এইরূপ- "ইনি (কবি) কলেজে পড়েন, অবকাশ-সময়ে কবিতা লেখেন, হয়ত বা আরও কিছু লেখেন। বাঙ্গালী পাঠকবর্গ তাঁহার এই কবিতা পুস্তকখানি ক্রয় করিলে তাঁহার খরচার টাকাগুলি ঘরে উঠিবার পথ হয়; আর কবিযশঃ—সেটা ভাগ্য-সাপেক্ষ।" ইহার উপর আবার 'সংগ্রাহকের' এক 'নিবেদন' আছে। এত ছাপ আঁটা থাকা সত্ত্বেও আমরা এই কবিতাগুলির ভাবে, ভাষায় বা ছন্দে কোন বিশেষত্ব দেখিলাম না। পঙ্গু ছন্দ, আড়ষ্ট ভাব ও নির্জ্জীব ভাষাই চোখে পড়িল। সেই মামুলি ভালবাসা' আর 'প্রভু আমি অধম'—ইহারই ধূয়া চলিয়াছে।

প্রাচীন মুদ্রা। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটি উপাদেয়। ভূমিকাটি পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায়, ঐতিহাসিক উপাদান-সংগ্রহে মুদ্রাতত্ত্ব কতখানি সহায়তা করে। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "মুদ্রার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইলেও তদ্বারা যে রাজার নামে উহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল, তাঁহার অস্তিত্বজ্ঞাপন ব্যতীত অপর কিছু প্রমাণ করিতেছে বলা যায় না। কিন্তু যে সকল দেশে প্রাচীনকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় নাই, যে সকল দেশে জনপ্রবাদ, বিদেশীয় পর্য্যটকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রাচীন শিলালিপি বা তাম্রশাসন এবং সাহিত্যের উপরে নির্ভর করিয়া লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করিতে হয়, সে সকল দেশে প্রাচীন মুদ্রা ইতিহাস-রচনার একটি প্রধান উপকরণ।" এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভকাল হইতে উত্তরপথে ও দক্ষিণপথে মুসলমান বিজয়কাল অবধি প্রাচীনমুদ্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সে বিবরণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় ইতিহাসের প্রত্যেক যুগের ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের মুদ্রার বিবরণ এ গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রমাণ-প্রয়োগে সংগ্রহকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, খৃঃ পূঃ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে মুদ্রার প্রচলন ছিল;

বিদেশীয় মুদ্রার প্রচলনও সে সময় দেখা যায়। ছাঁচে ও ঢালাই করিয়া, দুই ভাবেই মুদ্রাঙ্কন হইত। যতদূর জানা গিয়াছে, ভারতে সর্ব্বপ্রাচীন মুদ্রার আকার ছিল চতুষ্কোণ—পরে তাহা গোলাকারে দাঁড়াইয়াছিল। রৌপ্য, তাম্র ও সুবর্ণ ধাতুই মুদ্রা-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইত। গ্রন্থখানি আগাগোড়া কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। প্রাচীন ইতিহাসের এই অভিনব বিভাগের আলোচনা দ্বারা সংগ্রহকার ভারতীয় ভাষার একটি গুরুতর অভাব মোচন করিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষা, অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা সবিশেষ প্রশংসনীয়। গ্রন্থে প্রাচীন মুদ্রাদির বহু প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে—তবে চিত্র-সূচীর সহিত একটি নির্ঘণ্ট (Index) দিলে আরও ভাল হইত। সূচী-বর্ণিত মুদ্রাগুলি কোন্ সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারই সংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র নির্ঘণ্টে বা চিত্র-সূচীর সঙ্গে দেওয়া থাকিলে পাঠকদের সুবিধা হইত। যাহা হৌক, বিদেশীয় ভাষায় ভারতীর মুদ্রার বিবরণী সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি বর্ত্তমান থাকিলেও ভারতীয় কোন ভাষাতেই এরূপ কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং ভারতীয় ভাষায় রচিত—বিশেষ বাঙ্‌লা ভাষায়—মুদ্রাতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় এই প্রথম গ্রন্থখানি যে সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংগ্রহকার আশা দিয়াছেন, 'প্রাচীনমুদ্রা'—দ্বিতীয় ভাগে, মুসলমান-আমলের মুদ্রার বিবরণ তিনি প্রদান করিবেন। আমরা সাগ্রহে দ্বিতীয় ভাগের প্রতীক্ষায় রহিলাম। গ্রন্থের ছাপা কাগজ প্রভৃতি ভালই হইয়াছে এবং বিষয় প্রভৃতির তুলনায় মূল্যও অধিক নহে।

বেসুর বীণ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীসত্যচরণ নাথ, নৈহাটি-শ্রীরামপুর খুলনা। কলিকাতা মানসী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ; কয়েকটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলির ভাব স্পষ্ট, সহজ;—ভাষা সরল। কবিত্বেরও পরিচয় পাইলাম।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র—মূল্য ১।০ শ্রীহেমলতা সরকার প্রণীত। এই ৫০০ পৃষ্ঠার জীবন-চরিতখানির ছাপা ও কাগজ ভাল। গ্রন্থে যাঁহার জীবন-চরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে তিনি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন; গ্রন্থ-কর্ত্রী অতি সাবধানে স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্রের জীবনী-কথা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং অতি সরল ও সুমার্জ্জিত ভাষায় এই জীবন-কাহিনী সকলের সুখপাঠ্য করিয়াছেন। এ যুগের সাহিত্য-সেবকদের নিকট এ গ্রন্থখানি বড়ই উপাদেয় হইবে; কারণ মিত্র মহাশয়ের বংশ-কথা-প্রসঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন সময়ের ঐতিহাসিক কথা অনেক পরিমাণে বিবৃত হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ বংশের উৎপত্তি ও প্রসার দেখাইতে গিয়া পূর্ব্বাঞ্চলের সমগ্র কায়স্থ সমাজের ইতিহাসের একটা অংশ যে-ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে ঐতিহাসিকেরা নিশ্চয়ই এই গ্রন্থ খানিকে আদর করিবেন। মিত্র মহাশয়ের কর্ম্মক্ষেত্র পূর্ব্বাঞ্চলেই ছিল বলিয়া তাঁহার সাধুতা ও বদান্যতার কথা তেমন সুপ্রচারিত নহে। কিন্তু গ্রন্থে ঐ গুণগুলির পরিচয় পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখিতে পাইতেছি যে, বঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলে যে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, সামাজিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে, ও লোকসেবার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মূলে সর্ব্বত্রই স্বর্গীয় ব্রজসুন্দরের পরিশ্রম, উদ্যোগ, দান ও ধর্ম্মপ্রাণতা রহিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ব্বাঞ্চলের যত সাধু অনুষ্ঠান হইয়াছে তাহার অনুষ্ঠাতা এই ব্রজসুন্দর এবং যত লোক উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের সকলেয় সহায় ও বন্ধু এই ব্রজসুন্দর। পূর্ব্ববঙ্গের সকল নামজাদা কৃতী পুরুষই যাঁহাকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন, সেই মহাপুরুষের কীর্ত্তি-কাহিনী সকলের কাছে উপস্থাপিত করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী আমাদের সাহিত্য ও সমাজের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত

N. C. Maitras Family's Library
Narayan Chandra Maitra
Bonhoogh
Barnagore P. O.
Calcutta
20-3-

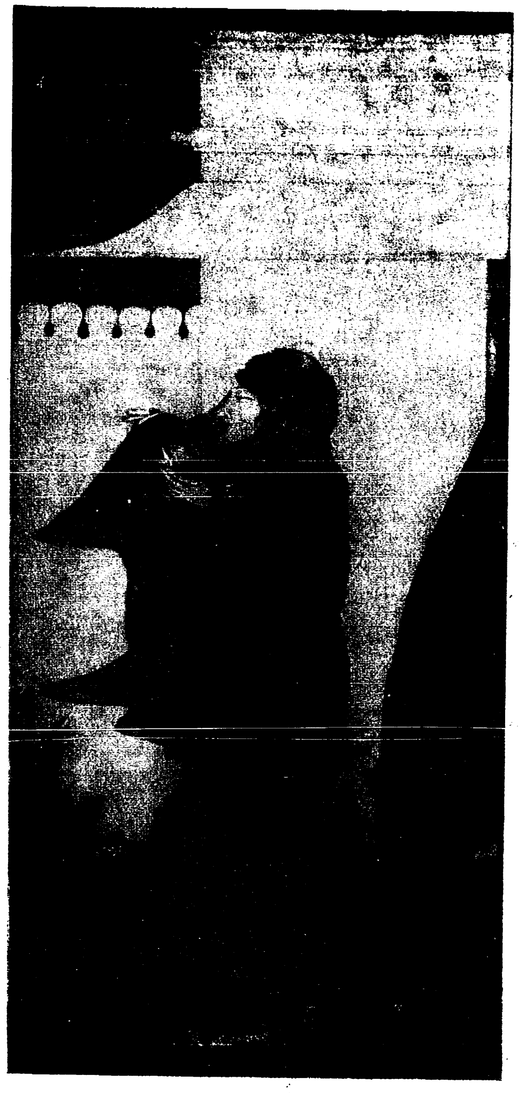

দীপ-শিখা
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার অঙ্কিত চিত্র হইতে

৪০শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩২৩ [৪র্থ সংখ্যা

ভারতী

চিত্রাবলী

১

মায়াবতী

কুমায়ুন প্রদেশে হিমালয়ের শীর্ষে বিবেকানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠিত একটি আশ্রম। ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনস্থল। এখানে প্রাচ্য সন্ন্যাসীরা পশ্চিমে বেদান্ত প্রচারের জন্য প্রস্তুত হন এবং পাশ্চাত্য জিজ্ঞাসুরা প্রাচ্য সাধু বনিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। ইহা একটি ইংরেজ দম্পতীর অর্থে পরিচালিত হইতেছে। সাহেবের দেহাবসান হইয়াছে। তাঁহার সন্তানহীনা বৃদ্ধা পত্নী এই আশ্রমবাসী সকলের জননী-স্বরূপিনী হইয়া দয়ামায়া নিয়ম ও শৃঙ্খলায় ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বিরাজমানা রহিয়াছেন।

এ আশ্রমটি রেলপথ হইতে শত ক্রোশ ব্যবধানে, ভীষণ অরণ্যে পরিবেষ্টিত। তিন মাইল দূরে একটি গ্রাম্য পোষ্টাফিস আছে। তিন মাইলের মধ্যে কোন লোকালয় নাই। সামনের পাহাড়ে একটুখানি ছপ্পরে দূরাগত গোয়ালারা গরু-মহিষ লইয়া থাকে। সকালে বিকালে মাঝে মাঝে সেখান হইতে ধোঁয়া উঠিতে দেখা যায়। সেই ধোঁয়াটুকু বড় মিষ্ট। তাহা হইতে শুধুই "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" নহে—"পর্ব্বতো লোকবান্ ধূমাৎ" ইহাও অনুমিত হয়। ধোঁয়াটুকু মনুষ্য আবাসের ইঙ্গিতকারী, নিতান্ত দীন-দুঃখী পাহাড়ীদের একমাত্র সুখ ও আরামের নিশানা।

এখানকার পাহাড়ী আকাশ সারাদিন একটা শব্দে ছাইয়া থাকে। এ অঞ্চলে মহিষের গলায় যে একটা প্রকাণ্ড তামার ঘণ্টা বাঁধা রহে, অনেক দূর-দূরান্তর হইতে সেই ঘণ্টারব শিখরে শিখরে অনুরণিত হয়। গোয়ালারা ঘণ্টারব অনুসরণ করিয়া

দূরগত বিপথগামী পশুকে বাঘ-ভাল্লুকের গ্রাস হইতে বাঁচাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে গোষ্ঠে ফিরাইয়া আনে। পথে আসিতে অচেনা অজানা নির্জ্জন গিরি-প্রান্তরে এই ঘণ্টা-রব মনে ভারি বিষণ্ণতা আনিয়াছিল। কিন্তু এই পরিচিত পার্ব্বত্য প্রদেশে এখন ইহা একটা স্নিগ্ধতা একটা সজনতার ভাব লইয়া আসে।

এখানে বসিয়া বসিয়া মেঘের জন্ম দেখা যায়। প্রথমে একটা ছোট স্রোতস্বতীর উপরে একটুখানি শিশু-মেঘ চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখে। ক্রমে সে বড় ও হৃষ্টপুষ্ট হইতে থাকে। পাহাড়ের এ ধারে সবুজ গাছ-পাতার গায়ে গায়ে ভাসিয়া ভাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। ক্রমে কটা রঙ হইয়া আকাশের গায়ে মিলাইয়া পাহাড়ের ওধারে গিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

আপাততঃ এখানে দুজন পাশ্চাত্য পুরুষ আছেন—অমৃতানন্দ ও ম্যাকনেল, দুজনেই ভিন্ন ভিন্ন রকমে পাশ্চাত্য গুণের আদর্শ ধরিয়া দেখাইতেছেন। জ্ঞানী অমৃতানন্দ তত্ত্ব-জ্ঞানামৃতের আস্বাদ পাইয়াছেন, তারই লিপ্সু, তাতেই নিমগ্ন। অসাধারণ অধ্যবসায় ও একাগ্রতা সহকারে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা, বেদান্ত উপনিষদাদি অধ্যয়ন ও মিতাহারে নিয়মিত সময়ে ধ্যান-ধারণাদি সাধনায় তাঁহার জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত নিয়ত রহিয়াছে।

এদিকে কর্ম্মী ম্যাকনেল রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, খালাসীদের মত নীল কাপড়ে, মোটা পুরাণ শততালি-দেওয়া বুট পায়ে, ছাতা মাথায় সারা বাগান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও মালীদের দ্বারা বীজ বোয়াইতেছে, কোথাও গাছের গোড়া খোদাইতেছে, কোথাও আগাছা উপড়াইতে কোথাও সম্বৎসরের ফল পাড়িয়া উঠাইতেছে,কোথাও ছাদ মেরামৎ করিতে কোথাও ছুতোরের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কাট তৈরি করিতেছে, বেড়া লাগাইতেছে,বর্ষায় সাঁকো ফের গাঁথাইতেছে। কাজের নাই, অক্লান্ত অধ্যবসায়েরও সীমা না এ দেশী ভাষা জানে না, ভাষা শিখি জন্য অমৃতানন্দের মত কোন প্রযত্নও করে নিজের মতে নিজের প্রথায় নিজের ক করিয়া যায়। ৬টা বাজিতেই আশ্রম হই নীচের পাহাড়ে আসিয়া চাকর-মহলে টিনের ছাদের উপর বাড়ি মারিয়া শব্দ করে "Get up, get up—you! Himto You—Udia! you—get up here—get up"—এই করিয়া করিয়া ঘু চাকরদের উঠাইয়া দেয়। তারপর তা লইয়া সারাটা দিন তুর্কি নাচন নাচায়, তা তমোরসাশ্রিত প্রকৃতি হইতে নিজের র প্রভাবে যতটা কাজ আদায় করিয়া ল যাইতে পারে, তাহা লয়। তাদের স সঙ্গে নিজে খাটে, হাসে, রঙ্গ-তামাসা কর কখন থেকে থেকে বসিয়া পড়িয়া তা মত করিয়া বলে—"শিব শিব শিব," আ কপালের ঘাম পোঁছে। কখন তাহা সাহেবের ভাষায় সাহেবকে বলে—"Thi not good!" আর মহা হাস্য-কৌতুকে আদান-প্রদান চলে।

অমৃতানন্দ এখানকার সন্ন্যাসীদের নিক রাজযোগ শিক্ষা করিতেছেন, আর ম্যাকনে এই আশ্রমের সর্ব্বসাধারণকে কর্ম্মযোগ শি দিতেছে।

এই আশ্রমবাসী সকলেরই জন্য স্বাধ্যায় -বিশেষভাবে বেদান্তাধ্যায়—ও সাধন নিত্য- র্ম্মরূপে অবধারিত।

সমস্ত সৃষ্টিকে যে একমাত্র সৎ-চিৎ- ানন্দতে পর্য্যবসিত করিয়া ফেলা, গুটাইয়া লা—আর কোন বিভাজ্য উপাদান বাকী াকিতে না দেওয়া, তাও শুধুই গায়ের ারে নয়, কিন্তু এমন নিক্তির ওজনে লচেরা সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরীক্ষায় ফেলিয়া দিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই—এর চেয়ে বৃহৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর কি ইতে পারে? স্থূল-সূক্ষ্ম সমস্ত লইয়া এই বিজ্ঞান, শুধু এক-একটা স্থূল বিষয় অবলম্বন করিয়া নয়, সমগ্রের উপর এই বিজ্ঞান, অংশের উপর নয়। মায়াবতীতে সেই মহাবিজ্ঞানের অনুশীলনের পথ খোলা রহিয়াছে।

সেকালের সব উপাখ্যানেই দেখিতে াই তপস্যার পন্থা হইতেছে ধারণা ও মাধি, এবং তাহার ফল হইতেছে ব্রহ্ম জ্ঞান। ধ্রুব বিমাতার নিষ্ঠুর বাক্যে পীড়িত ইয়া ভগবান্‌কে খুঁজিতে গেলেন। নারদ তাঁকে ভগবান্‌কে পাওয়ার পন্থা বলিয়া দিলেন ঐ আসন, ধারণা ও ধ্যান। ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে যোগ চাই, যোগের ফলে আত্মজ্ঞান অর্থাৎ মুক্তি। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে, পরস্পর পরস্পরের অঙ্গীভূত, এক অন্যতে অনস্যূত হইয়া রহিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মও আছে—প্রকৃতি-প্রভাবে যতটুকু বা যতখানি কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইবে সঙ্গে সঙ্গে তাও কর্ম্মযোগরূপে অনাসক্তভাবে করিতে থাকিবে, নয়ত

যাঁহা যাঁহা কর্ম্ম কিও লালচ লগ্‌
তাঁহা তাঁহা আপ বাঁধাও॥

সমস্ত হিন্দুধর্ম্মই এই, সমস্ত বেদ-বেদান্ত উপনিষদ পুরাণ ইতিহাস সর্ব্বত্রই এই একই শিক্ষা, একই কথা। জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগের চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া, সামলিয়া সামলিয়া অগ্রসর হইতে হইবে—তবেই কাম্যস্থান মুক্তিতে পৌঁছান যাইবে। মায়াবতী-আশ্রমে এই চৌঘুড়ি চালান হইতেছে। যে বিজ্ঞান পরম বিজ্ঞান, সেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের রিসার্চ এখানে চলিতেছে।

কেল্লাগুলা প্রায়ই পাহাড়ের উপরে স্থাপিত হয়। শত্রুর সেখানে ওঠা শক্ত, নীচে হইতে উপরের সব কার্য্যকলাপ দেখাও শক্ত। কিন্তু যারা উপরে থাকে, তারা নীচের সব ব্যাপার অনায়াসে দেখিতে পায়, উপর হইতে কামান দাগিয়া নীচের যেখানে সেখানে গোলা-চালানও সহজ হয়। তেমনি-উচু ভাবের উপর দাঁড়াইয়া থাকিলে, সমতলস্থ লোকদের ভাবের সঙ্গে নিজেকে মিশাইয়া না ফেলিলে বেশী ফলোপধায়ী কাজ করা যায়। উপর হইতে যে কামান দাগিবে সে দূরদর্শী হইবে, আর তার কাজের ফলও দূরগামী হইবে। তাই নিরাপদ হইতে হইলে ভাবের উচ্চতার উপর দুর্গ বানাইয়া বাস করা চাই, সেখান হইতে কাজ-চালান চাই। এই আশ্রমের নিবৃত্তিধর্ম্মী জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্ন ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরা সংসারী লোকদের প্রবৃত্তিমূলক কাজে লাগাম ধারণের কৌশল শিখাইতেছেন—যোগঃ কর্ম্মেষু কৌশলং।

সম্মুখে ভারতবর্ষের সীমান্ত, তুষার

পর্ব্বতমালা। এই কঠিন, স্থির, অতি অসহ্য-শীতল তুষারাদ্রি হিমাদ্রি লঙ্ঘন করিতে পারিলে তবে ভারতভূমির বাহিরে পদ-ক্ষেপণ হইবে। এই তুষার-প্রাচীরের পরপারে নব নব জাতি, নবসভ্যতা, তাহাদের পিতৃপিতামহাগত নবভাবের সমুচ্চয়। ইহার এপারে ব্রহ্মঘোষ, অতীতের শতসহস্র ব্রহ্মবাদীর উচ্চারিত নাদের প্রতিধ্বনি। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যখন জনকরাজার সভায় গিয়াছিলেন, কতশত ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমস্ত উপনিষদে কত অসংখ্যেয় ব্রহ্মবিদ্যার্থীর নাম পাওয়া যায়। সেই বিদ্যার আকাঙ্ক্ষা এই পুণ্য আশ্রমে আজও বলবতী, তাহাই এখানকার জীবনের জীবন।

* *
*

২

কামনাদেবীর পীঠ

ভাইসরয় গিয়াছিলেন শীকারে। আজ চারদিন পরে শিমলায় ফিরিলেন। অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় তোপের পর তোপ-সেলামীতে আজ সিমলানগরবাসী সে সম্বাদ অবগত হইল। তোপ গুণিতে লাগিলাম—এক, দুই, তিন, চার·····এগার পর্য্যন্ত। তারপর আর মনোযোগ রহিল না—কি জানি, সংখ্যা আরও কতদূর অগ্রগর হইল, বুঝি সতেরোই হইবে।

মগ্ন ছিলাম প্রাচীন ভারতের ধ্যানে। প্রাচীন সভ্যতা, আমাদের পিতৃপুরুষ, তাঁহাদের লক্ষ্য ও চরম আদর্শ, ভাগবতপুরাণের লিখন, এই সকলের অনুশীলনে। খাতায় টোক দশবৎসর পূর্ব্বের নিজের ভারতবর্ষস্তুতি পা করিতেছিলাম—"মানচিত্রে ভারতবর্ষের উত্ত প্রদেশ যেরূপভাবে অসমরেখান্বিত দে যায় সম্মুখে প্রত্যক্ষে সেই রেখা তরঙ্গায়িত ভূমি বিরাজিত। হে মম নয়নাগ্রে উদ্ভাসি পুণ্যভূমি মাতৃভূমি—নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোস্তুতে সর্ব্বত এব। তোমার অগ্রে নমস্কার, তোমার পৃষ্ঠভাগে নমস্কার, তোমা পশ্চাতে নমস্কার, তোমার সকল দিকেই নমস্কার।"

এমন সময় তোপসেলামী আরম্ভ হইল। আমি নমস্কার করিতেছি হিমালয়কিরীটী ভারতবর্ষকে, ভারতবর্ষ সেই কিরীট নত করিয়া নমস্কার করিতেছে কাহাকে? নব সভ্যতা ও তাহার আধার ও সংরক্ষক এক নূতন অভ্যুদয়প্রাপ্ত নবজাতিকে।

হিমালয়ের শীর্ষে শিমলানগরী বামবাহু ছোট শিমলা পর্য্যন্ত প্রলম্বিত করিয়া প্রজাগণের ঘনসন্নিবিষ্ট আবাসগৃহ সকল বক্ষে পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে স্তরে স্তরে ধারণ করিয়া আছে। আর প্রসারিত দক্ষিণবাহু ঊর্দ্ধে উঠাইয়া হাতের তেলোখানির উপর রাজপ্রতিনিধির সুরম্য প্রাসাদ নভস্তলে ধরিয়া রহিয়াছে। প্রাসাদ-চূড়ায় লালপতাকা যখন বাতাসে দোদুল্যমান রহে তখন জানা যায় রাজপ্রতিনিধি শিমলায় বিরাজমান, আর ধ্বজাহীন প্রাসাদ প্রতিনিধির শিমলা সহরে অনুপস্থিতি বিজ্ঞাপিত করে। এই প্রাসাদই শিমলার মর্ম্মস্থল। এই প্রাসাদের গুণেই শিমলা শিমলা। শিমলার স্পন্দন, প্রাণন ও মনন, সঞ্চরণ ও বিচরণ সবই এই

প্রাসাদের তালে। ভাইস্‌রিগ্যাল কৌন্সিলের ইংরেজ মেম্বর, নন্-ওফিশ্যাল দেশী মেম্বরেরা, ফরেন-অফিস, হোম-ডিপার্টমেণ্ট, রেলওয়েবোর্ড—সবই এক-একটি স্বতন্ত্র জ্যোতিষ্ক হইলেও, তাহাদের স্ব স্ব অক্ষগতি থাকিলেও, সকলেই এই ভাইস্‌রিগ্যাল সূর্য্য প্রদক্ষিণে বাধ্য। কোথায় বা প্রাচীন ভারতবর্ষ আর তাহার বেদনির্ঘোষ আর কোথায় এই শিমলায় অত্যুজ্জ্বল বর্ণে অতি সুস্পষ্টরূপে বিভাসিত, পাশ্চাত্যসভ্যতা।

এ কামনাদেবীর পীঠস্থান। ভাইস্‌রিগ্যাল লজেরও উচ্চে যে পাহাড় 'প্রস্পেক্ট হিল' নামে অভিহিত হয়, যাহাকে পাহাড়ীরা 'করেড়ু' বলে, তাহার শিখরে যে মন্দির অধিষ্ঠিত আছে তাহা কামনাদেবীর মন্দির। এই শৈলাবাসে দেবী সর্ব্বোচ্চ শিখর হইতে সকলের হৃদয়ে মায়াজাল বিস্তার করিতেছেন। শিমলায় যে-ই আসে সে-ই প্রায় কামনার বশবর্ত্তী হইয়া আসে। কিম্বা শুধু কার্য্য-গতিকে বা কেবলমাত্র হাওয়াবদলের জন্য আসিয়া পড়িলেও লোককে কামনা পাইয়া বসে। এখানে নবীন ইন্দ্র চন্দ্র যম বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের অধিষ্ঠান। তাঁহাদেরই কাহারো না কাহারো নিকট কোন না কোন কামনাপূর্ত্তির অভিপ্রায়ে মর্ত্ত্যজনের সমাগম হইয়া থাকে। যে দেশ বলিয়াছে—

অন্ধ-তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে
ততোভূয় ইবতে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ

—দেবতাগণের পূজা যে করে সে গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়,—সেই দেশে দেবতা-পূজার ও তজ্জনিত অন্ধতম ক্লেশপ্রাপ্তির চরমস্থান এই শিমলাশৈল। সবচেয়ে খারাপ কামনা এখানকার সাহেবিয়ানার। "এবার মরে সাহেব হব"—এর জন্যও তর সয়না। এ জন্মেই সাহেব-মেম হবার ষোলআনা কামনা কামড়িয়া ধরে।

বদ্রি কেদারনাথে ভ্রমিয়া শঙ্করাচার্য্য হইবার সখ চাপিয়া উঠিতে পারে, নেপালে গিয়া সম্রাট অশোক বনিবার দুরাশা হৃদয়ে জাগিতে পারে, কাশ্মীরের কন্দরে ফিরিয়া রাজা কনিষ্কের পদাঙ্কানুসরণের প্রবৃত্তি জাগিতে পারে, কিন্তু শিমলায় কালা কৌন্সিলির* চূড়ান্ত লক্ষ্য—একটি আস্ত এস-পি-সিংহ বা আলি ইমাম। বড় বড় সাহেবেরা সদা-সর্ব্বদা আমার বাড়ীতে খানা খাইবে, বাবা-লোকেরা মেম-গভর্ণেস পরি-রক্ষিত হইয়া বেড়াইবে, বড় বড় দেশীয় লোকেরা বড় সাহেবের তুল্য আমাকে সম্মান করিবে। আর তা যদি না হইতে পারে অন্ততঃ ননঅফিশ্যাল ডিনারে ইভনিং স্যুট পরিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাইব, পঞ্জাব-লাটের পার্টিতে ফ্রক কোটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জাহির করিয়া আসিব, রায়সাহেব, রায় বাহাদুর, সি-আই-ই, হাইকোর্টের জজশিপ—কিছু-না-কিছু একটা জুটিয়া যাইবে, নিদেন ছেলেটার জন্য একটা বড় চাকুরী। কোথায় দেশময় স্বাবলম্বন প্রচারের সংকল্প, কোথায় স্বাধীন জীবিকার স্বপ্ন—আর কোথায় কামনা হইতে কামনান্তরে পড়িয়া ফাঁদে-পড়া পাখীর মত ধড়ফড়ানি।

---

* ভাইস্‌রিগ্যাল কৌন্সিলের দেশী মেম্বরকে পাহাড়ীরা এই নামে অভিহিত করে।

ধন্যা দেবি তুমি শিমলাশিখর-বাসিনি!
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতীহিসা
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রচচ্ছতি।

জ্ঞানিগণের চিত্তও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মহামায়া তুমি মোহে নিক্ষেপ করিতেছ।

আমার বাড়ীটা করেড়ু-চক্রের পথে, ঠিক কামনাদেবীর পাদতলে। চিরাগের নীচে যেমন অন্ধকার, কামনার পদতলে তেমনি নিষ্কামতা থাকিতে পারে কি? তা যদি হয় তবে দাও দেবি এ মোহজাল ভাঙ্গিয়া—ঐ ভাইসরিগ্যাল লজের মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়া দাও।

হে ভারতবর্ষ, নবপ্রভাবের প্রতি তোমার তোপসেলামী সত্ত্বেও তোমাকে আমার নমস্কার। তোমার অগ্রেও নমস্কার, তোমার পশ্চাতেও নমস্কার। তুমি কাহা যা ছিলে তাহাকেও নমস্কার, ভবিষ্যদ্গর্ভে তুমি আজ যা আছ তাহাকেও নমস্কার। তোমার বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াই আমার মুক্তি।

শ্রীসরলা দেবী।

একা

নিরন্তর একা আমি শ্রান্ত উদাসীন,
দিনের সহস্র আলো অবসাদে ক্ষীণ
আজি মোর নয়ন-সম্মুখে,
পুষ্পসম পরিপূর্ণ সুখে
আরতো জাগে না দৃষ্টি প্রভাত-সময়,
কীটে কাটা কোরকের বন্ধ আঁখি অন্ধকারময়!

নভ হতে কাকলির যে ঝরণা ঝরে,
তাহার বারতা নাই আমার অন্তরে,
সে পরশে জাগে নাক আর
বক্ষোলীন গানের ঝঙ্কার
ঊষার প্রত্যক্ষদান, জাগরণ সুখ,
আজি এ জীবন হতে অকস্মাৎ একান্ত বিমুখ!

নাই গতি, নাই গীতি, বর্ণ গন্ধ শেষ—
অন্ধ নয়নের পরে নিষ্ফল নিমেষ,
স্পন্দমান বক্ষের উপরে,
মৃত্যু শুধু নিঃশব্দে সঞ্চরে,
দিগন্ত ভরিয়া গেছে যুগান্তের মেঘে,
প্রলয়ে নিলীন পৃথ্বী আজি আর কিছু নাই জেগে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

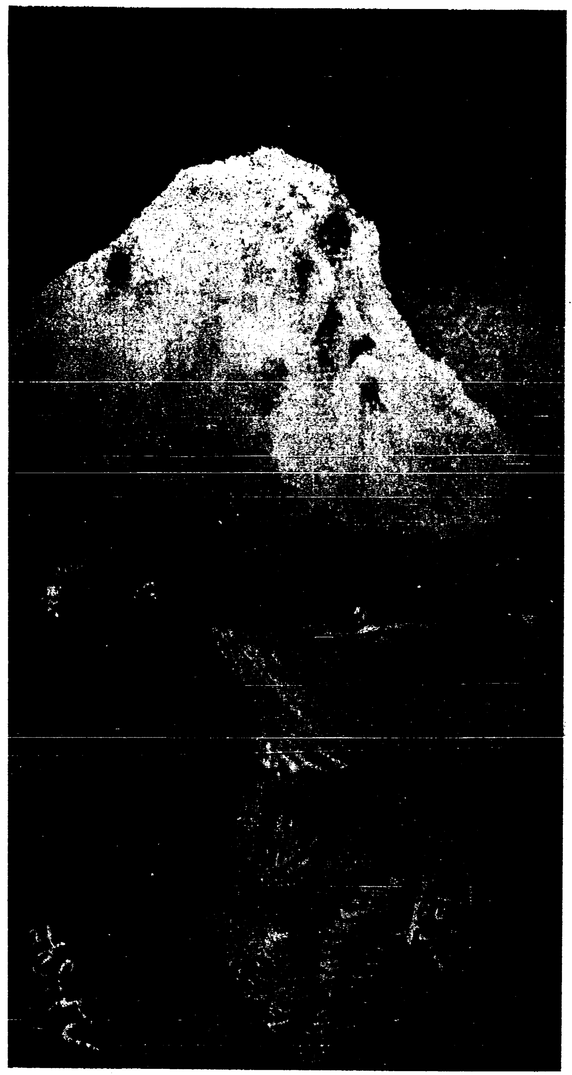

শীত (ফাল্গুনী)
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

১০

বন্ধন! চারিদিকেই বন্ধন! কর্ত্তব্যের বন্ধন, উচ্চ আশার বন্ধন, ধর্ম্মের বন্ধন, ক্ষুধা-তৃষ্ণার বন্ধন, এমন কি স্নেহেরও বন্ধন! স্বাধীনতার নাম-গন্ধ এ জগতে নাই! এক পা এদিক-ওদিক ফেলিবার জো নাই, ফেলিলেই চারিদিক হইতে চীৎকার, ক্রুদ্ধ অভিশাপ, অথবা কাতর ক্রন্দন! যিনি গুরু, তিনি বলিতেছেন, ইহাই কর, আর কিছু করিতে পারিবে না; যিনি ধর্ম্মোপদেষ্টা, তিনি বলিতেছেন, ইহাই কর্ত্তব্য, অন্য কিছু করিলে পাপ হইবে; যিনি ভালবাসেন, তিনি বলিতেছেন, ইহাই কর; আর কিছু করিলে আমার কষ্ট হইবে, আমি কাঁদিব। অথচ কেহই একবার ভাবিয়া দেখিবেন না, আমার কি প্রয়োজন, আমি কি চাই! আমার ক্ষুধিত হৃদয় যাহার জন্য কাঁদিতেছে, তাহার দিকে চাহিবারও আমার অধিকার নাই, চাহিলেই হয় রক্ত চক্ষুর অগ্নিবর্ষণ, নয় কর্ত্তব্যের সিংহনাদ,—অথবা স্নেহের করুণ আর্ত্তস্বর! কার্ত্তিক অতিষ্ঠ হইয়া ভাবিল, এই বন্ধনের মূলোচ্ছেদ করিতেই হইবে!

বাহির হইতে টানাটানি করিলে সমস্ত বন্ধনগুলি একজোটে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিবে। কিন্তু একে একে প্রত্যেক বন্ধনের মূলদেশ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের দ্বারা আক্রমণ করিতে পারিলে হয়তো সে মুক্তিলাভ করিতে পারে। অতএব এখন হইতে তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য হইল, সেই তীক্ষ্ণধার অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা প্রয়োগ করা।

কার্ত্তিক তাহার পিতার পত্রের অতি বিনীত উত্তর লিখিয়া সর্ব্বানন্দ ও শশিভূষণের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। শশিভূষণ তাহা পাঠ করিয়া চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু সর্ব্বানন্দ কিছুক্ষণ কার্ত্তিকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে গীতার একটা শ্লোক আবৃত্তি করিল—

"সঙ্গাৎ সংযাতে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্যতি॥"

কার্ত্তিক বলিল, "অর্থাৎ আমি নাশের দিকে যাচ্ছি। তোমাদের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হয়েছে, তবু কেন নাশের দিকে যাব?"

শশিভূষণ কহিল, "অর্থাৎ এত বড় মিথ্যা চিঠি যখন তুমি লিখতে পেরেছ, তখন তোমার বুদ্ধিনাশ না হোক সম্মোহ পর্য্যন্ত হয়েছে। সম্মোহের পর যে যে অবস্থা শাস্ত্রে লেখা আছে, তাই দেখবার জন্য আমরা প্রস্তুত রইলুম। এখন যাও যেদিকে খুসি, আমরা আমাদের কাজ করি। আর তুমি বিরক্ত করতে এস না।"

কার্ত্তিক কহিল, "অর্থাৎ তোমরা আমায় ত্যাগ করলে।"

শশিভূষণ কহিল, "কিরে সর্ব্বা? তোর সে শ্লোকটা কি, সেই 'বোরগক্ষতা'—?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমার অপরাধটা কি যে তোমরা এত বড় শাস্তি দিচ্ছ? সংসারে

যে যা চায় সে তা পায় না, তাই বলে কি মানুষ কিছু চাইবেও না? এতবড় পরাধীনতা কি নিষ্ঠুরতা নয়? তোমাদের এতবড় নির্দ্দয়তার কি কোন শাস্তি কেউ দেবে না? এমন কি কেউ নেই—"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কৈ আর আছে! থাকলে আর তোমার মত স্বার্থসেবী আত্ম-পরায়ণ জীবের কোন শাস্তি হয় না?"

কার্ত্তিক কহিল, "আরও শাস্তি চাই! আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা করছি, জগতে সব-চাইতে বড় যা শাস্তি আমি তাই নেব। আমি বুঝেছি, সবাই যা চায়, আমি তা চাই না; এই আমার অপরাধ, সবাই যা করে আমি তা করি-নে, এই আমার অপরাধ। আর সব চেয়ে অমার্জ্জনীয় অপরাধ এই যে আমি কারও পাকা ধানে মৈ দিই নি, আপনার সামান্য একটু কামনা নিয়ে জগতের একপাশে সরে থাকতে চেয়ে ছিলুম। কিন্তু তা হতে পেল না, কারণ আমি পরাধীন!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "না, সব-চাইতে যা বড় অপরাধ, সেইটেই তুমি বললে না, তোমার সর্ব্বাধম অপরাধ এই যে তুমি স্বেচ্ছাচারী। নিয়মের সংসারে থেকে যে নিজেকে অনিয়মের অধীন করে তোলে, তাকে সংসার কখনই মার্জ্জনা করবে না।"

শশিভূষণ কহিল, "সংসারে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি যে, জগতে যে বস্তু সব-চেয়ে ভাল, তাই যদি আবার কোন কারণে খারাপ হয় তাহলে তার মত খারাপ আর কিছু হতে পারে না; ভাল বস্তু নষ্ট হলে তার দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হতে হয়। কার্ত্তিক, তো বাবাকে যখন তুমি ঠকাবার চেষ্টা ক তখনই বুঝেছি যে তোমার আর নেই। বাপকে যদি ঠকাও তাহলে কোন্ পাপের ভয় তোমায় ঠেকিয়ে রাখবে

কার্ত্তিক কহিল, "এই চিঠিতে বা চোখে যে ধুলো দেবার চেষ্টা করেছি, বা তুমি কেমন করে জানলে? যদিই-বা কারও চোখে ধুলো দি, তিনি ইচ্ছা করলে চোখ ঢাকতেও পারে তোমরা ত রয়েছ, তাঁদের সাবধান দাও না কেন! লিখে পাঠাও যে কার্ আর আপনাদের স্নেহের উপযুক্ত নে এখন তার চরিত্র, তার সুবুদ্ধি সমস্তই এ পচে উঠেছে যে তার দুর্গন্ধে তোমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছ?"

শশিভূষণ কহিল, "স্নেহ জিনিষটা চি দিনই নিম্নগামী। যে যত নীচ, যার চরি যত অধঃপতিত, স্নেহপরায়ণ মানুষের, সা লোকের স্নেহ ততই তার দিকে ছু চলতে থাকে। তুমি যত নেমে যা তোমার বাপ মা আর কালিকাবাবুর স্নে ততই তোমার দিকে ছুটে চলবে। প্রমা চাও, এই চিঠিখানা পাঠিয়ে দু'দি অপেক্ষা কর, দেখবে, তাঁরা তোমার স দোষ ক্ষমা করে আবার তোমায় তেম ভালবাসছেন। কিন্তু যদি তুমি মানুষ হ তাহলে তোমার সব কথা খুলে লেখা উচিত! তুমি কি হয়েছ সব কথা প্রকাশ করে বল, তারপরও যদি তাঁরা তোমায় গ্রহণ করেন তাহলে আত্ম-সমর্পণ করবে।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি কি হয়েছি,—

দোষ তোমরা দেখতে পেয়েছ, স্পষ্ট বল, তারপর আমি সেই কথা সত্য আর মিথ্যা হোক কালিকাবাবুকে খে দেব।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "লিখে দাও যে তুমি মনে ভয়ঙ্কর এক মতলব এঁটে আছ। অকারণে কতকগুলি দোষের উপর প্রতিশোধ নেবার মতলব রেছ।"

কার্ত্তিক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "প্রতিশোধ মি নেবই, তবে তাতে কার যে বেশী পকার হবে, আমার, কি অন্যের, তা বলতে রি নে। যাক্, তোমাদের কথাই খলুম। এই আমি এখনি চিঠি লিখে ছি—ঐ সব কথাই লিখব।"

কার্ত্তিক আর একখানা পত্রে সর্ব্বানন্দ শশিভূষণ যে সব কথা বলিল, সমস্তই লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল। শশিভূষণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এ রকম সয়তান আর একটীও দেখিনি। আগেকার কালে শুনেছি ডাকাতের দল খবর পাঠিয়ে ডাকাতি করত, এখনকার কালেও যে তা হতে পারে তা জানতুম না। কালিকাবাবুর হয়েছে এগুলেও নির্ব্বংশ, পেছুলেও নির্ব্বংশ! এমন চিঠি পেয়ে তিনি ত এখনি তেড়ে এসে বলবেন, বাবা কার্ত্তিক, তুমি যাই হও তোমায় আমি ছাড়তে পারব না।"

কার্ত্তিক সত্যই এইবার হাসিয়া ফেলিল; হাসিয়া বলিল, "তাহলে আমিই বা কি করি! আমারও যে আগে গেলে বাঘে খায়, পিছে গেলে ভূতে পায়! তোমরা যা বলছ, তাই করছি, তবু মন পাচ্ছিনে!"

শশিভূষণ কহিল, "আমাদের বিরুদ্ধেও কোন মতলব-টতলব আছে না কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "তা আমি যখন মতলব নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি, তখন তোমাদের বিরুদ্ধেও কিছু আছে বৈ কি! আর যদিই বা না থাকে, তবু ত আর তোমরা আমায় বিশ্বাস করবে না। যাই হোক, তুমি আমার একটা উপকার কর—আমার বিষয় যা-যা ধারণা তোমাদের হয়েছে, সমস্ত খোলসা করে কালিকাবাবুকে লিখে দাও। তারপর যা থাকে আমার ভাগ্যে, তাই হবে।"

কার্ত্তিক চলিয়া গেলে শশিভূষণ সর্ব্বানন্দকে বলিল, "সর্ব্ব, কার্ত্তিক যা বলছে, তাই করব?"

সর্ব্বানন্দ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "না ঠাকুরদা, আমি কোন্ প্রাণে তা করতে বলব? কার্ত্তিক যাই হোক আমার ভাই। মার পেটের ভাইয়ের চেয়েও ঢের বেশী। ও যে আমায় কত ভালবাসে, তা তুমি কি করে জানবে, ঠাকুরদা? কত দিন কত মাস কত বৎসর এক সঙ্গে শোয়া বসা—এক চিন্তা, এক ধ্যান, এক জ্ঞান! রোগে ও আমার সেবক, ভালবাসায় ও আমার সব-চেয়ে প্রিয়তম বন্ধু, হিতেচ্ছায় ও আমার মার পেটের ভাইয়ের চেয়েও বড়। ওকে কি আমি ত্যাগ করতে পারি? মরি যদি ত এক সঙ্গে মরব, পড়ি যদি ত এক সঙ্গে পড়ব; তবু ওকে ছাড়তে পারব না। আমার জীবনে সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য ওকে ভালবাসা। ছেলেবেলা থেকে ও আমার যা, তা আমিই জানি, আর ভগবান জানেন!"

শশিভূষণ কহিল, "কিন্তু তবু কালিকা কাকার মেয়ে যদি ওকে বিবাহ করে শেষ অসুখী হয়? কার্ত্তিকের ভাব দেখে বোধ হচ্চে যে মনে মনে ও কি একটা ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করেছে। ওর চরিত্র যতদূর বুঝেছি তাতে এই বলতে পারি যে, ও যদি একবার মন্দর দিকে বেঁকে, তাহলে অধঃপাতের চরম সীমায় না পৌঁছে থামবে না। সেইজন্য মনে হচ্চে, আমাদের কর্ত্তব্য এ বিবাহে বাধা দেওয়া।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তাই যদি কর্ত্তব্য বলে তোমার বোধ হয়ে থাকে, তাহ'লে ও যখন সরোজকে এমন করে প্রাণ দিয়ে চাচ্ছে, তখন সরোজের কাছে যাবার পথই বা ওর পক্ষে বন্ধ করে দাও কেন?"

শশিভূষণ কহিল, "কি জান ভাই, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতাকে আমি কিছুতেই ভাল বাসা বলে স্বীকার করতে চাইনে। কার্ত্তিকের মত অতখানি শক্তি অতখানি তেজ কি সামান্য একটা অন্ধ নারীর ভালবাসায় আবদ্ধ থাকতে পারে? যদি কার্ত্তিক সরোজকে পেত, তাহলে ফলে এই হত যে সরোজের জীবনও বিফল হয়ে যেত, আর কার্ত্তিকও শীঘ্র অবসন্ন হয়ে নূতনতর উত্তেজনার জন্য ছুটে বেরিয়ে পড়ত।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হতে পারলুম না। তুমি হয়তো মিছি-মিছি দুটো জীবনকে বিফল করে দিলে! তারপর যদি কার্ত্তিকের সঙ্গে শৈলজার বিবাহ ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা কর, তাহলে হয়তো আরও একটা জীবন বিফল করে দেবে। আমার মতে তুমি আর এ বিষয়ে কিছু করো না। ভগবানের যা [illegible] তাই হোক।"

শশিভূষণ এ কথার আর কোন প্রতি[illegible] করিল না।

১১

পুত্রের কাতর প্রার্থনাপূর্ণ পত্র পা[illegible] শিবচন্দ্রের অন্তর-বাহির সুগভীর বেদ[illegible] কম্পিত হইয়া উঠিল। কার্ত্তিক তা[illegible] সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাহার অজ্ঞ[illegible] সমস্ত গোপন কথা প্রকাশ করিয়া প[illegible] লিখিয়াছে, "আমার মনের এইরূপ অব[illegible] জানিয়া-শুনিয়াও যদি বাবু আমার হা[illegible] তাঁহার কন্যাদান করিতে উদ্যত হন, তা[illegible] হইলে অগত্যা বিবাহ করিতে আমি বাধ্য[illegible] ইহা ছাড়া আপনার সঙ্গে কলিকা[illegible] আসিবার পূর্ব্বে যে কথা হয়, তাহা[illegible] বুঝিয়াছিলাম, শৈলজার সঙ্গে আমার বিবা[illegible] আপনার তত অভিপ্রেত নয়। তখন যদি বুঝিতাম যে, আপনিও বাবুর মতেই [illegible] দিয়াছেন, এমন-কি চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষ্য করি[illegible] বাবুর কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করি[illegible] স্বীকার করিয়াছেন, তাহা হইলে আমি এতদূর নীচ প্রকৃতির নই যে আপনি বাক্য দান করিয়াছেন জানিয়াও শৈলজাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইব। যাহাই হউক, এখন আপনিই আমার বিচারক। আমি আপনার অধম পুত্র; এ-রকম অবস্থাতেও যদি আপনি শৈলজাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, লিখিবেন, আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আপনার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিব। আমারও একটা সঙ্কল্প ছিল, যে সর্ব্বদাদার সঙ্গে

[illegible]লজার বিবাহ দিব, কারণ সে শৈলজাকে [illegible]ত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখে; এমন-কি [illegible]মি এইরূপ হওয়ার দরুণ ক্রুদ্ধ হইয়া [illegible]ও আমায় ত্যাগ করিতে বসিয়াছে। [illegible]রিদিক হইতে এমনভাবে পরিত্যক্ত হইয়া [illegible]মি বাঁচিব কিরূপে? আপনি আমায় [illegible]াগ করিয়াছেন, মার কোলেও আমার [illegible]ান নাই, সর্ব্বদাদাও আমার সঙ্গ ত্যাগ [illegible]রিল। আমি ভগবানের নিকট নিশ্চয়ই [illegible]রুতর অপরাধী;—কিন্তু কি যে আমার [illegible]পরাধ, তাহা জানিতে পারিতেছি না, ইহাই [illegible]আমার ক্ষোভ। তথাপি আমার অপরাধ [illegible]াকুক আর নাই থাকুক, আমি আপনারই। [illegible]পুত্র যত দোষী হোক, পিতা তাহাকে [illegible]কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। [illegible]আপনি যদি আমায় ত্যাগ করেন, তাহা [illegible]হইলে আমার আর দাঁড়াইবার স্থান কোথায়?

শিবচন্দ্র পত্র পড়িয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিলেন, এবং অজ্ঞাতে তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া আসিল। পুত্র দোষী হোক আর নির্দ্দোষ হোক, এমনভাবে আত্মসমর্পণ করিলে তাহাকে কোলে না তুলিয়া লইয়া কি থাকা যায়? শিবচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া পত্র-হস্তে কালিকাবাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন।

কালিকাবাবুর কয়দিন হইতে ক্রমাগত জ্বর হইতেছিল। নানা চিন্তায় ইদানীং তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে। তথাপি অক্লান্তকর্ম্মী কালিকাবাবু তাঁহার বিপুল জমিদারী ও বৈষয়িক কার্য্য সমস্তই প্রত্যহ নিয়মিতরূপে পরিদর্শন করিতেছিলেন।

জমিদারী কাছারির কাজ দেখিতে দেখিতে কার্ত্তিকের পত্র পাইয়া তিনি হাতে লইয়া অন্যমনস্কভাবে ভাবিতেছিলেন, এখন খুলিবেন কি না। কি জানি, কেন, এ পত্র খুলিতে আজ কিছুতেই তাঁহার সাহস হইতেছিল না। দুই চারিবার নাড়িয়া চাড়িয়া তিনি উহা ডেস্কের মধ্যে রাখিয়া অন্য কার্য্যে মন দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময় পত্র-হস্তে ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই স্থানে উপস্থিত হইলে তিনি কাছারি ছাড়িয়া পাশের ঘরে গিয়া একটা চেয়ারে বসিলেন। শিবচন্দ্রও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

শিবচন্দ্র তাঁহার পত্রখানা কালিকাবাবুর হস্তে দিলেন। কালিকাবাবু আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, "এমন ছেলেকেও আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে মর্ম্ম-পীড়িত করেছিলেন? ছিঃ! দাঁড়ান, আমাকেও সে আজ পত্র দিয়েছে, দেখি, তাতেই বা সে কি লিখেছে।" তিনি তখন স্বয়ং তাঁহার সেই পত্রখানা আনিয়া পাঠ করিলেন, সেখানি পূর্ব্ব পত্রেরই অনুরূপ। উপরন্তু কার্ত্তিকের সম্বন্ধে সর্ব্বানন্দ ও শশিভূষণ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট লেখা আছে। কার্ত্তিক কোন কথা গোপন করে নাই।

কালিকাবাবু পত্র পড়িয়া বলিলেন, "এখন আপনার মত কি?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "এমন অবস্থায় কি করে বলতে পারি যে, আপনি এই কার্ত্তিককে আপনার কন্যাদান করুন। সে ত স্পষ্টই বলেছে যে, সে অন্য-গত-চিত্ত; এ-অবস্থায় আমি ত কোন রকমেই

বলতে পারছি না যে, এই অনুপযুক্ত পাত্রে আপনি আপনার কন্যা সমর্পণ করুন।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "অনুপযুক্ত! কি বলছেন আপনি? এতখানি সরলতার কি কোন মাহাত্ম্য নেই? কার্ত্তিক ত কোন কথা গোপন করেনি, এমন-কি এই দেখুন, আমায় যে পত্র দিয়েছে, তাতে সে লিখেছে, সর্ব্বানন্দ আর শশিভূষণের মতে কার্ত্তিক বদমতলবি, স্বেচ্ছাচারী, আত্ম-সুখপরায়ণ! এমন-কি এই পত্রে সে যে সরলতা দেখিয়েছে তাও তাদের মতে ভাণ মাত্র! ওর সমস্তই মিথ্যা, এই কথা তারা বলতে চায়। যে সাহস করে এ-সবও লিখতে পারে, তাকে সন্দেহ করবার কারণ আমি ত খুঁজে পাই না।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "ওর যখন প্রয়োজন যে আপনি ওকে ত্যাগ করুন, তখন ও কেন, মিথ্যে হোক সত্যি হোক, নিজেকে দোষী করে পত্র লিখবে না? ওর ত এই প্রয়োজন যে আপনি ওকে এই বিবাহের দায় থেকে মুক্তি দেন।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কৈ ও ত মুক্তি চায় নি! ও ত স্পষ্ট বলেছে যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ পুত্রকন্যা জগতে পাওয়া যায় না, তাই বলে বাপ-মা তাকে ত্যাগ করলে সে ত নষ্টের দিকে যাবেই। সবাই ত্যাগ করেছে বলে বাপ-মার তাকে ত্যাগ করা উচিত নয়, এমন-কি যাতে আবার সে ঠিক পথে চলতে পারে, তাই তাঁদের করা উচিত।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "তবে কেন সে লিখলে যে তার কি দোষ, সে তা জানে না? তার মতে সে কোন দোষই করেনি। আমি তাকে যেমন চিনি, এমন বোধ হয় কেউ চেনে না। আমি জানি, যদি সে ঠিক বুঝে থাকে যে তার অন্যায় হয়েছে, তাহলে সে এখনি ছুটে এসে আমাদের কাছে মাপ চাইবে। এমন করে দূরে থেকে পত্রের দ্বারা কাজ সারবার চেষ্টা করত না। এ পত্র ভাণ মাত্র যদিও সে কথা বিশ্বাস করতে আমার মন চাইছে না, তবুও পুত্র-স্নেহে অন্ধ হয়ে আমি কেমন করে বলি যে আপনি সমস্ত বিষয় বিচার না করেই এই পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করুন?"

কালিকাবাবু কহিলেন, "ন্যায়রত্ন মশায়, আপনার মত ন্যায়পরায়ণ লোকের কি এত বড় খল-স্বভাব পুত্র হতে পারে? না, আমি বলছি, এ পত্র ভাণ নয়। সে আমার কবল থেকে মুক্তি চাইতে পারে, কিন্তু এ পত্র ভাণ নয়। সে স্পষ্টই তার নিজের বিষয়ে পরের যা ধারণা তাও লিখেছে। এখনো সে বালক মাত্র, তবে মনের এখন যে গতি, দু'দিন পরে তা থাকবে না, এই আমার ধ্রুব বিশ্বাস। তাহলেও ব্যাপার যখন এই রকম দাঁড়িয়েছে, তখন শৈলজার গর্ভধারিণীর কি মত হবে, সেটা এখন জানা প্রয়োজন। আর শৈলজার মনের কথাও যখন জানি, তখন তার মত নেওয়াও প্রয়োজন। তাকে যখন এতদিন পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রেখেছি, এবং সেও যখন ভাল-মন্দ বুঝতে শিখেছে, তখন তার মতটাও ফেলবার নয়।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "এই অবকাশে আমিও আমার একটা কর্ত্তব্য সেরে নি। আমি

দেওয়ানজীর কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছি যে, তাঁর পুত্রের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহের বন্ধ করব। সেই জন্য বলছি যে, যদিও আপনার কন্যা বাক্‌দত্তা হয়ে রয়েছেন, তথাপি ঐ অন্য-পূর্ব্বা কন্যাকেও তিনি পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করতে রাজী আছেন। আর যদি বলেন যে মণিশঙ্করের মত পাত্রে কি করে কন্যাদান করবেন, তাতে আমি এই বলতে চাই যে, যদি ভাল পাত্র মন্দ হয়ে যেতে পারে, তাহলে মন্দই বা ভাল না হতে পারবে কেন? আজ মণিশঙ্কর অপাত্র, হয়তো বিবাহের পর তার মতি-গতি বদলাতে পারে।"

কালিকাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার কর্ত্তব্য আপনি করেছেন। এখন তাঁকে বলবেন যে তাঁর এই অনুগ্রহের জন্য চিরবাধিত হলুম। কিন্তু তাঁর পুত্রকে আমি কন্যা দিতে পারব না। হয়তো ন্যায়ের তর্কে তাঁর পুত্র পাত্র হতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের নামে যে অধর্ম্মের কাজ করছে, তাকে কন্যাদান চিরদিনই অধর্ম্ম। অবশ্য এ কথাও তাঁকে বলবেন যে তাঁর এই অনুপযুক্ত প্রস্তাবের জন্য আমি তাঁর উপর কিছুমাত্র শ্রদ্ধাহীন হইনি। কারণ পিতা মাত্রেই পুত্রের মঙ্গল কামনা করে থাকে। বিশেষত দেওয়ানজী আমার চির-হিতৈষী। তাঁর উপর চিরদিনই আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তবে মণিকে কন্যাদান করতে পারব না।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "আমরা হয়তো মণিশঙ্করকে চিরদিনই ভুল বুঝে আসছি। কে জানে, ওর মধ্যেও হয়তো অনেক ভাল জিনিষ আছে, সময় আর অবসরের গুণে সেগুলি প্রকাশ পেলেও পেতে পারে। যাই হোক, আপনি এ বিষয় চিন্তা করে দেখবেন। কার্ত্তিকের প্রতি স্নেহাধিক্যে অন্যের প্রতি অযথা অন্যায় করবেন না। আর আপনি আমার কাছে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তা থেকে আপনাকে আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দিলুম!"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কিন্তু আমি দিলুম না, এটা স্মরণ রাখবেন। আমি দেব-দ্বিজের সাক্ষাতে যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তা থেকে সহজে চ্যুত হব না। তবে সবই যখন ভগবানের ইচ্ছায় ঘটে, তখন আমার আর অহঙ্কার করে বলবার কিছু নেই।"

শিবচন্দ্র চলিয়া গেলে কালিকাবাবু সেই দিনের জমিদারী সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন; এবং মধ্যাহ্নকৃত্য-সমাপনান্তে শয়ন-কক্ষে পত্নী ইন্দিরা দেবীকে ডাকিয়া আনিয়া কার্ত্তিকের পত্রদ্বয় পাঠ করিতে দিলেন। ইন্দিরা দেবী পত্র পড়িয়া বলিলেন, "এখন উপায়?"

কালিকাবাবু বলিলেন, "এখন তোমার মত কি? শৈলজা আমার একার নয়, তোমারও। শৈলজার ভাল-মন্দ কেবল আমার উপর নয়, তোমার উপরও সমান-ভাবে নির্ভর করছে। তুমি বুঝে বল যে, বাক্‌দত্তা কন্যাকে অন্য কোন পাত্রে এ অবস্থায় আমার দেওয়া উচিত কি না। একদিকে আমার দেব-সাক্ষাতে শপথ, আর একদিকে মেয়ের ভবিষ্যৎ মঙ্গল। কার্ত্তিকের মনের অবস্থা জেনেও যদি তাকে

অসৎপাত্র জ্ঞান না কর, অনুপযুক্ত না মনে কর, তা হলে কোন কথাই নেই, কার্ত্তিকের সঙ্গেই বিবাহ হবে। কিন্তু যদি তাকে অসৎপাত্র বলে সাব্যস্ত কর, তা হলে আমার ধর্ম্মচ্যুতিকে গণনার মধ্যেও এনো না।"

ইন্দিরা কহিলেন, "এ চিঠি পড়ে কেমন করে কার্ত্তিককে অসৎপাত্র বলব? সে তো কিছুই গোপন করে নি। তবে মেয়ের ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখ! সে যদি সতীর কন্যা হয়, যদি কায়মনোবাক্যে আমি তোমায় ভক্তি করে থাকি, তা হলে শৈলজা কখনই অসুখী হবে না। যে সুখী হব মনে করে, তাকে জগতের কোন দুঃখই বিচলিত করতে পারে না। সব রকম ক্ষতিই সে হাসি-মুখে সইতে পারে।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "বাঁচলুম ইন্দু, তোমার আশ্বাস পেয়ে আমি বাঁচলুম! না, আর আমার কোন দ্বিধা নেই। তবে একবার শৈলর মতটা জানা দরকার! কারণ সে এখন বড় হয়েছে, তাকে এই পত্র দেখিয়ে তার মত জেনে এসে আমায় বল।"

ইন্দিরা দেবী হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ক্ষেপেছ! সে আবার কি বলবে? সে জানে যে তার বিয়ে হয়েছে, এখন একটা লোকাচার-রক্ষার জন্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন শুধু বাকী। তবু তার মত জানছি।"

ইন্দিরা দেবী পত্র দুইখানি লইয়া চলিয়া গেলেন।

কালিকাবাবু বিমূঢ়ভাবে প্রতীক্ষার পর স্ত্রীকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি বল্‌লে সে?"

"বল্‌বে আবার কি! যা তোমায় গেলুম, তাই। মেয়ে অভিমানে ফুঁপিয়ে অস্থির যে তোমরাও কি না আ নিজের একটা আলাদা মতের প্রতি কর! আমি কি তোমাদের মেয়ে ন আমি কি পরের পেটের মেয়ে?"

কালিকাবাবু চিন্তিত মুখে বলিলেন, যে আরও ভাবনার কথা! যোগ্য সন্তা যদি এমন করে বাপ-মার উপর নি রাখে, তাহলে মা-বাপের দায়িত্ব ঢের বেড়ে যায়! তাই বল্‌ছি, একটু ভাবে যদি—"

"ওগো না গো, না, কেন মিছে ও ভাব্‌ছ? নিজের মেয়েকে কি জন্ম থে জানি না! আমাদের ইচ্ছাই যে চিরদিন মনে ঢুকে ওর ইচ্ছার আকারে বেরি এসেছে। এর চেয়ে আর স্পষ্ট করে কি বল্‌বে? আমি যখন বলছি, তখ স্বচ্ছন্দে তুমি এ কথায় নির্ভর করতে পার। আমি যে নিজের মনেই বুঝছি কার্ত্তিক ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করা কথা মনে ভাবতেই পারবে না।"

কালিকাবাবু একটা নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেলিয়া শয়ন করিলেন।

১২

প্রভাতে উঠিয়া সরোজ তাহার অতি প্রিয় ফুলগাছগুলির ফুলের উপর হাত বুলাইতেছিল। শীতের প্রভাতে বেলী যুঁই ইত্যাদি অন্তর্হিত হইয়াছিল বটে, তবু গাঁদা একাই সমস্ত ফুলের অভাব পূর্ণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভায় সমস্ত বারান্দা আলো করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।

অতীত স্থানে স্থানে নানাজাতীয় গোলাপ ভায়-গন্ধে বর্ষাভব সমস্ত পুষ্পের স্থান ধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছিল। স্তই গন্ধময়, সমস্তই কোমল স্পর্শময়, র্ব্বাপরি সমস্তই শোভাময়! কিন্তু অন্ধের ক্ষে এই পুষ্পরাশির যাহা পরিপূর্ণ প্রকাশ -সৌন্দর্য্যের প্রকাশ, তাহাই অস্তিত্বহীন! রোজ স্পর্শ করিতে করিতে পুষ্পের সেই হপূর্ব্বদৃষ্ট শোভাময় প্রকাশকে স্মরণ রিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তাহার ন্তর এখন স্পর্শময়, স্পর্শই এখন তাহার াছে একমাত্র প্রকাশ! মৌন ফুলগুলি কবল স্পর্শের ভাষায় কথা কহিতেছে। র্শনের অভাব-জনিত দুঃখ স্পর্শের সুখে মিলাইয়া যাইতেছে। সরোজ একবার এ টব হইতে একটি, ও টব হইতে একটি এমনি করিয়া অনেকগুলি ফুলে আপনার অঞ্চল ভরিয়া ফেলিয়া উপরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় বাহিরের দরজায় পরিচিত শব্দ শুনিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

শশিভূষণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার-সংলগ্ন চিঠির বাক্সের তালা খুলিয়া কয়েক খানা পত্র বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। সরোজ অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার কার চিঠি পেলে?"

শশী অন্যমনস্কভাবে বলিল, "যাক্, বাঁচা গেল।"

সরোজ কহিল, "কার চিঠি পেয়ে ও কথা বলছ?"

শশিভূষণ কহিল, "তোমার শনির। শনিরাজকে রোহিণী ভেদ করে যেতে দিই নি, চিরকালের জন্য ওঁর গতি সরিয়ে দিয়েছি, এর জন্য এই দশরথকে ধন্যবাদ দাও। এঃ, আজ যে অনেক ফুল তুলে ফেলেছ! যাক্, ভালই হয়েছে, শনির পূজো পাঠিয়ে দাও,—গ্রহরাজ কাঁচা-খেকো দেবতা!"

সরোজ হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কার কথা বলছ, খুলে না বললে আমি কি করে বুঝব?"

শশী কহিল, "ঠিকই বুঝেছ, সরোজ। প্রকাশ করে বলা বাহুল্যমাত্র।"

সরোজ আর একটা গাঁদা তুলিয়া বলিল, "কি লিখেছেন তিনি?"

শশিভূষণ আর একখানা চিঠি খুলিতে খুলিতে বিরক্তভাবে বলিল, "লিখবে আর কি! লিখেছে, 'কাল আমার বিয়ে হয়ে গেছে, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। এখন এই দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করে যেয়ো। ১৮ই বৌভাতে তোমায় সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করলুম।' সবান্ধবটার মানে বুঝেছ? এত বড় নিষ্ঠুর! আমার ইচ্ছে করছে, এই চিঠিখানা ছিঁড়ে ওর মুখের ওপর ফেলে দিতে পারতুম, তাহলে রাগ কতক যেত। তার ওপর ভঙ্গী দেখেছ? আমার বাসার ঠিকানায় চিঠি দেয়নি, এই বাড়ীর ঠিকানায় দিয়েছে, অর্থাৎ যাতে এ চিঠির মর্ম্ম তোমার কানেও পৌঁছোয়! কি কাপুরুষের মত নিষ্ঠুরতা!"

শশিভূষণ পত্রখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া একটা টবের উপর ফেলিয়া দিয়া উপরে চলিয়া গেল। আর সরোজ! অন্ধ, আলোক-বর্জ্জিতা, প্রকাশ-শক্তি-হীনা সরোজ

একটা দেওয়াল ধরিয়া সেই চির-পরিচিত পথ দিয়া উপরে যাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। যে পথে সে দৃষ্টিবান লোকেরই মত অতি দ্রুত সর্ব্বদা চলা-ফেরা করিতেছে, সেই পথেই আজ সে পথ-হারা! সমস্ত স্পর্শশক্তি স্পর্শের স্মৃতি নিমেষ-মধ্যে তাহার অন্তর হইতে লুপ্ত হইয়া গেল।

এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে স্পর্শের সুখে স্পর্শের আতিশয্যে দৃষ্টির প্রকাশকেও অবজ্ঞা করিতেছিল; কিন্তু মুহূর্ত্তে তাহার অন্তর সেই স্পর্শের জন্যই হাহাকার করিয়া উঠিল। একবার ঐ পত্রাংশগুলি সে স্পর্শ করিবে না? জীবনে একটীবার মাত্র সেই হস্ত-লিখিত পত্রের এতটুকু অংশকে স্পর্শ করিয়া তাঁহারই স্পর্শ সে অনুভব করিবে না? সরোজ ত কিছুই চায় না। দর্শন তাহার পক্ষে নাই, শ্রবণ তাহার পক্ষে এখন দুরাশা, যে স্পর্শ তাহার একমাত্র সম্বল, সেই স্পর্শের যোগেও সেই বাঞ্ছিত স্পর্শকে সে কখনও অনুভব করিতে পায় নাই। কিন্তু ঐ যে অনাদরে অপমানিতভাবে পতিত পত্রাংশগুলি সেই বাঞ্ছিত স্পর্শ বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহাকে শশিভূষণ না হয় ঘৃণায় ফেলিয়া দিল, কিন্তু চির-বুভুক্ষিত তাহার অঙ্গুলি-নির্দ্দেশগুলি কি বলিয়া উহাদের ফেলিয়া চলিয়া যাইবে? সরোজ আর অগ্রসর হইতে পারিল না—ফিরিয়া দাঁড়াইল। অমনি কোথা হইতে সমস্ত স্পর্শশক্তি ফিরিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিল। পুনর্লব্ধ শক্তিতে যেখানে সেই পত্রখণ্ডগুলি পড়িয়াছিল, অনুমান করিয়া লইয়া সে সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর স্থিরভাবে কান পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, কেহ কাছাকা নড়িতেছে-চড়িতেছে কি না। শেষে মনে হইল, নিকটে কেহ নাই, তখন সন্তর্পণে সে হাতড়াইতে আরম্ভ কর হায়, হায়, এক টুকরা কাগজও তা হস্ত স্পর্শ করিতেছে না। একখণ্ড, ক্ষুদ্রই হোক, কিছু তাহাতে লেখা থা আর নাই থাকুক, সেই পত্রের এক পাইলেই সরোজ বর্ত্তাইয়া যায়! দাও ঠা দাও দেবতা, সেই পত্রের এক টু তাহাকেও দাও!

পাইয়াছি! পাইয়াছি! ওরে মৌন মূ তোরা চীৎকার করিস্‌নে কেন, এতক্ষ কেন চেঁচাইয়া বলিসনে, এই যে আম তোমার হারানো ধন, এই যে আমর পাইয়াছি, ওরে পাইয়াছি। হোক ছো হোক তুচ্ছ, তবু পাইয়াছি। সেই স্প ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ আমার এই উ জগতকে স্পর্শের রসে ভরাইয়া ফেলিয়াছে পাইয়াছি! ওরে অন্ধকার হৃদয়, শান্ত একেবারে হারায় নাই। আলো আসিয়াছে যায় নাই, একেবারে চির-অতীতের মধ্যে অস্ত যায় নাই—পাইয়াছি!

সরোজ সেই কাগজখণ্ডকে তাহা সমস্ত শরীর দিয়া স্পর্শ করিল; শে মাথায় ঠেকাইল; তার পর ধীরে ধীরে কানের কাছে লইয়া গেল।

কথা কও! আমার চক্ষু নাই! তু কি বলিয়াছ, কি বলিতেছ, আমি চক্ষু দিয়া বুঝিতে পারিতেছি না! আমার স্পর্শ আছে, কিন্তু তার কাছে তুমি আজ মূক; স্প দিয়া কিছুই শুনিতে পাই না যে! কথা

! বল, কি বলিতেছ? আমি তোমায় সরাইয়া দিয়াছি? সেই অভিমানে আজ তুমি মূক হইয়া অন্ধের নিকট য়াছ? অন্ধের উপর প্রতিশোধ লইতে আজ মূকের মূর্ত্তিতে আসিয়াছ! ম ত শুনিতে পাই, তাই কি তুমি ও পরিত্যাগ করিলে? এত বড় শোধ! আমি অন্ধ! তুমি মৌন! ম যে শুনিতে চাহিতেছি, কিন্তু তুমি বলিবে না? কথা কও, কথা কও, র সমস্ত অন্ধকার জগৎ ভরিয়া ,—তুমি একটীবার মাত্র কথা কও! সহসা কাহার পদ-শব্দ শুনিয়া সরোজ াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সেই জের টুকরাটুকুকে আবরণে ঢাকিয়া নার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। কিন্তু এতই উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়াছিল যে তাহার তে আর একজনও যে সন্তর্পণে সেই প্রবেশ করিল, সে শব্দ সে অনুভবও তে পারিল না। তাহার অন্তরে এই মুহূর্ত্তের জন্য যেন জগতের সমস্ত শব্দ হইয়া গিয়াছিল। একটীমাত্র পরিচিত র আশায় সে তাহার সমস্ত অন্তর্জগতকে কয় মুহূর্ত্তের জন্য শব্দহীন করিয়া য়াছিল।

সরোজ অতি সন্তর্পণে সেই কাগজখানি হার মাথার শিয়রের একটী কুলুঙ্গীতে খিল, তার পর জোড়-করে তাহাকে াম করিয়া অঞ্চলস্থ সমস্ত ফুলগুলি হার উপর ঢালিয়া দিয়া দুই হাতের মধ্যে লুকাইয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। শশিভূষণ তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে তীর-বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "শশিদা, দয়া কর, আর এক মিনিট আমায় সময় দাও।"

শশী অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "বোন, এক মিনিট কেন, চির-জীবনের জন্যই ত ওকে দিতে পারতুম! হায়, হায়, এ আমি কি করলুম! আমি ত তোমায় বুঝতে পারি নি, সরোজ! সেই হতভাগা তোমায় এ কি করে গিয়েছে! সে যে আমার সরোজের সমস্ত দলগুলি ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিয়ে গিয়েছে, তা ত' আমি জানতে পারিনি। হতভাগিনী, তাহলে তাকে অমন করে নিষ্ঠুরের মত তাড়িয়ে দিলে কেন? যে অন্ধ, সে কি নিজের প্রতিও অন্ধ!"

শশিভূষণ অতি যত্নে অতি ভক্তি-ভরে সেই ফুলগুলি সরাইয়া সেই কাগজের টুকরা-টুকু বাহির করিয়া কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল; পরে গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হায়, অন্ধের পূজাও ঠিক জায়গায় পৌছায় না! সরোজ, এ কি কাগজ তুমি এনেছ? এ ত কার্ত্তিকের সে চিঠি নয়, এ যে একখানা বাজে কাগজের টুকরো!"

সরোজ কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। পূজা পৌছিল না! পূজা বৃথা হইল! অন্ধ আমি, তাই কি দেবতাও অন্ধ হইলেন! হতভাগিনীর হাতখানি ধরিয়া কি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার পায়ের কাছে লইয়া যাইতে পারিলে না? হায় অন্ধতা! হায় অন্ধকারের অন্ধ দেবতা!

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

কীট-পতঙ্গের জীবনের কার্য্য

প্রত্যেক শাস্ত্রেরই ইতিহাসে এমন দুই-একটা কালের চিহ্ন আছে, যখন বড় বড় পণ্ডিতকেও কোনো বিশেষ সিদ্ধান্তের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতে দেখা যায়। তখন তাঁহাদের ভালো-মন্দ বিচার-শক্তি অন্তর্দ্ধান করে; কোনো গতিকে গোঁজামিল দিয়া নিজেদের সিদ্ধান্তকে দাঁড় করাইয়া রাখাই তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য হয়।

অল্পদিন হইল প্রাণিতত্ত্বের ইতিহাসে ঐ প্রকার একটা যুগ চলিয়া গিয়াছে। মানুষ যে বুদ্ধির বলে ভালো-মন্দ বিচার করে, ভবিষ্যতের চিন্তা করে, আত্মোন্নতির দিকে মনোযোগী হয়; সমাজের কল্যাণ কামনা করিয়া চলে,—প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ তখন মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইতর প্রাণিগণ এমন-কি মশা-মাছি পর্য্যন্ত, সেই উচ্চবুদ্ধি অল্পাধিক লাভ করিয়াছে। তখন কোন্ সার্কাসের কোন্ ঘোড়াটা চালকের ইঙ্গিত বুঝিয়া সাদা ও কালো রঙের তফাৎ বুঝিতেছে, পশুশালার কোন্ বন-মানুষটা কি প্রকার সঙ্কেত করিয়া প্রাতে এক পেয়ালা চা চাহিতেছে,—এই রকম তথ্য-সংগ্রহই প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের কাজ ছিল। তাঁহাদের ধারণা ছিল, প্রত্যেক প্রাণীই মানুষের ন্যায় কতক সংস্কারজ, কতক অভ্যাসানুযায়ী ও স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান লইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করে; অনুসন্ধান করিলেই সেই সকল জ্ঞানের লক্ষণ পাওয়া যায়। তাই তাঁহারা এই সকল তথ্য-সংগ্রহে ব্যস্ত থাকিতেন। শেষাশেষি তাঁহা মশা-মাছি এবং গো-মহিষের মনস্তত্ত্ব প লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ক্রিয়ার পিছনে পিছনেই প্রতিক্রি দেখা দেয়। কীটপতঙ্গ ও পশুপক্ষী মনুষ্যসুলভ গুণের অনুসন্ধানের প্রবল চে পর, আজকাল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে এখন প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ, প্রাচীনদিগের গবেষণ কথাবার্ত্তা চাপা দিয়া, ইতর প্রাণীদিগ স্বাধীন-বুদ্ধিবর্জ্জিত এক-একটা যন্ত্র বলি প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন আমাদের কারখানার নির্জ্জীব কলে বাষ্প বিদ্যুৎ প্রভৃতির শক্তি আশ্রয় করি সেগুলিকে যেমন সজীব প্রাণীর ন্যায় চালন করে, ইঁহাদের মতে ইতর প্রাণীর দে যন্ত্রেও সেই প্রকার বাহিরের তাপ ও আলো প্রভৃতির শক্তি কার্য্য করিয়া তাহা জীবনের লক্ষণ দেখায়। অর্থাৎ প্রাণী প্রাণিত্ব এবং কারখানা ঘরের কলে চঞ্চলতা, গোড়ায় একই ব্যাপার,—ইহা ইঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে গরু ঘোড়া ছাগল ইত্যাদি উচ্চ শ্রেণী ইতর প্রাণীকে তাঁহারা কলের কোঠা আজও ফেলিতে পারেন নাই,—কীটপত প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণী যে, প্রকৃতই যন্ত্রব চলা-ফেরা করে, তাহার অনেক প্রমা সংগ্রহ করিয়াছেন।

প্রাণীদিগকে আমরা আজকাল মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই, হঠাৎ একদিন বিধাতার

ছায় তাহারা সেই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া য়ে নাই। জীবসৃষ্টির প্রথমে কি-রকম ানি না, এক-কোষময় জীবের সৃষ্টি ইয়াছিল। এই প্রাথমিক প্রাণীদের স্ত্রীপুং-ভেদ ছিল না, হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছল না, মস্তিষ্ক ও পাকাশয় প্রভৃতি দূহযন্ত্রও ছিল না। জড়বৎ তাহারা জলে াসিয়া বেড়াইত; গায়ে কোনো খাদ্যদ্রব্য ঠেকিলে তাহার রস শোষণ করিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করিত। এই এক-কোষময় প্রাণীই আধুনিক বহুকোষময় বিচিত্র প্রাণীদের জনক। মানুষ গরু ছাগল কুকুর প্রভৃতি সকল প্রাণীই তাহারি উন্নত মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আমাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগাইতেছে।

আদিম প্রাণীর সন্ততিবর্গ এত উন্নত হইলেও, আজও তাহাদিগকে এক-কোষ অবস্থায় জলে ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ আধুনিক নিকৃষ্ট প্রাণীদের জীবনের কার্য্য অনুসন্ধান করিতে গিয়া এই প্রাথমিক প্রাণীদিগকে লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা দেখিয়াছিলেন, বাহিরের তাপ ও আলোক প্রভৃতির উত্তেজনায় দেহগুলিকে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করা ইহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য। ইহাদের বুদ্ধি বা বিচারশক্তি নাই,—বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া না দিয়া ইহারা একবারে থাকিতেই পারে না। পণ্ডিতগণ প্রাণীর এই শ্রেণীর কার্য্যগুলিকে Reflex Action অর্থাৎ অনিচ্ছা-সঞ্চলন নাম দিয়াছেন। ইহা কেবল আদিম প্রাণি-দেহেরই ধর্ম্ম নয়। জটিল দেহ-যন্ত্রবিশিষ্ট মানুষেও ইহা দেখা যায়। গলায় ভাত বাধিলে যখন আমরা কাশিতে আরম্ভ করি, বা চোখের কাছ দিয়া ঢিল চলিয়া গেলে যখন আমরা তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করি, তখন বিপদের সম্ভাবনা মনে করিয়া এই কার্য্য ভাবিয়া-চিন্তিয়া করি না। শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ বন্ধ হইলে কাশি আপনা হইতেই আসে; চোখে ঢিলের আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা হইলে চোখ্ আপনিই বুজিয়া আসে। এই সকল কার্য্যের উপর মানুষের কর্ত্তৃত্ব নাই। শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ এগুলিকেও অনিচ্ছা-সঞ্চলনের কোঠায় ফেলিয়া থাকেন। তবে আদিম প্রাণী যেমন সহজ-ভাবে বাহিরের উত্তেজনায় সঞ্চলন দেখায়, মানুষের দেহের ন্যায় জটিল যন্ত্র সে প্রকারে সাড়া দেয় না। মানুষের মস্তিষ্ক আছে; বহুপ্রকারের স্নায়ুমণ্ডলী আছে, তার উপরে আবার মংসপেশী। একটা বিপদের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, এই সকলগুলিই নাড়া পায় এবং তাহারি সমবেত ফলে চোখ্ বুজিয়া আসে বা হাঁচি ও কাশির সূত্রপাত হয়।

কেবল প্রাণিজগতে নয়, উদ্ভিদ্‌দিগের মধ্যেও ঐ প্রকার সঞ্চরণ দেখা যায়। উদ্ভিদের মস্তিষ্ক নাই, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান নাই, কিন্তু তবুও ইহারা কি প্রকারে আলোকের দিকে পাতাগুলিকে উঁচু করিয়া ধরে এবং লতা-গাছগুলি যে দিকে আলো সেই দিকে কেমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, ইহা আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্‌গণ এই সকল ব্যাপারকেও অনিচ্ছা-সঞ্চলনের কোঠায় ফেলিয়া থাকেন। এই ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক নাম Tropism; কিন্তু গোড়ায় খবর লইতে গেলে প্রাণী ও

উদ্ভিদের অনিচ্ছা-সঞ্চলনের একই কারণ দেখা যায়। বাহিরের তাপ আলোক এবং নানা প্রকার আঘাত ও উত্তেজনা উভয়েরই দেহে কাজ করিয়া সঞ্চলন দেখায়।

আধুনিক প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের পূর্ব্বোক্ত অনিচ্ছাসঞ্চলনের মূল কথাটি ধরিয়া কীট-পতঙ্গাদি নিকৃষ্ট প্রাণীর জীবনের অনেক কার্য্যের ব্যাখ্যা দিতেছেন।

ঘরের জানালায় টবে যে লতা-গাছটিকে রাখা গিয়াছে, সেটি কেন আলোর দিকে হেলিয়া পড়ে, এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক পণ্ডিতই একবাক্যে বলেন,—লতার ডালগুলির যে অর্দ্ধেক ঘরের দিকে থাকে, তাহা অপর অর্দ্ধেকের তুলনায় কিছু কম আলো পায়। আলোর উত্তেজনা উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। কাজেই লতার ডালের যে-অংশে জানালার তীব্র আলো পড়ে, তাহার বৃদ্ধি মৃদু হইয়া আসে;—বৃদ্ধি অধিক হয় কেবল ঘরের দিকের ছায়াময় অংশেরই। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, আলোকপাতের তারতম্যে একই ডালের এক পিঠ অপর পিঠের তুলনায় অধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই অবস্থায় ডালের আকৃতি কিপ্রকার হইবে, পাঠক চিন্তা করিয়া দেখুন। একটি অখণ্ড জিনিসের এক পিঠ বৃদ্ধি পাইয়া প্রসারিত হইতেছে এবং আর এক পিঠের বৃদ্ধি বন্ধ থাকে বলিয়া তাহা তুলনায় সঙ্কুচিত হইতেছে। এই অবস্থায় ধনুকের মত বাঁকিয়া আলোর দিকে ঘাড় উঁচু করা ব্যতীত লতার আর অন্য উপায় থাকে না। বাহিরের উত্তেজনায় বুদ্ধিমান প্রাণীর মত চলাফেরার ইহাই একমাত্র উদাহরণ নয়,—গাছ-পালার পাতা ও শিকড়কে অনিষ্টকর জিনিস হইতে দূরে থাকিতে দেখা যায়, সন্ধ্যার সময়ে অনেক গাছের পাতা ও ফুলকে বুজিয়া আসিতে দেখা যায়। হঠাৎ এই সকল কাজ দেখিলে মনে হয়, যেন উদ্ভিদের বুদ্ধি আছে, তাই তাহারা নিজেদের ইষ্টানিষ্ট বুঝিয়া চলে। কিন্তু তলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, বাহিরের উত্তেজনা তাহাদের দেহের জড়বৎ কোষের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া ঐ সকল কাজ দেখায়।

বর্ষার রাত্রিতে প্রদীপের কাছে দলে দলে পোকা আসিয়া কিপ্রকারে বিরক্ত করে এবং শেষে নিজেরা পুড়িয়া মরে, তাহার পরিচয় পাঠককে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেন, পোকারা আলোতে খেলা করিতে ভালবাসে; কোন্‌টি ভালো এবং কোন্‌টি মন্দ এই জ্ঞান তাহাদের আছে; তাই তাহারা আলোর দিকে ছুটে, কিন্তু শেষে নিজেদের মূর্খতার জন্যই পুড়িয়া মরে। আধুনিক পণ্ডিতেরা একথা মানিতেছেন না। তাঁহারা বলেন, যে প্রকারে অন্ধকার ঘরের লতা আলোর দিকে ছুটিয়া যায়, কতকটা সেই প্রকারেই পোকা দীপশিখার দিকে ছুটিয়া ভাগ্যদোষে পুড়িয়া মরে। লতা যেমন বাহিরের আলো দ্বারাই চালিত হয়, পোকাও সেইপ্রকারে আলোর প্রভাবে প্রদীপের দিকে ছুটাছুটি করিয়া পুড়িয়া মরে। ইঁহারা বলেন, প্রত্যেক পোকারই জোড়া জোড়া চোখ থাকে; প্রদীপের আলো সাধারণতঃ উহাদের একটা চোখের উপরে কার্য্য করিয়া তাহাতে কোন প্রকারে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সুরু

করিয়া দেয় এবং ইহার ফলে পোকার দেহাঙ্গের স্নায়ুজাল ও পেশীসমূহ এমন উত্তেজিত হইয়া পড়ে যে, তাহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তখন আলোর দিকে না ছুটিয়া থাকিতে পারে না। দেহের একটা দিক্ উত্তেজিত এবং আর-একটা দিক্ শান্ত, এইপ্রকার বিসদৃশ অবস্থা তাহাদের পক্ষে পীড়াজনক। এইজন্যই দুই পিঠকে সমান উত্তেজিত করিবার জন্য উহারা আলোর দিকে ছুটিয়া যায়; ইহাতে পীড়ার শান্তি হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আগুনের তাপে দগ্ধীভূত হইয়া তাহারা শান্তি ভোগ করিবার সুযোগ পায় না।

কীটপতঙ্গ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণী যে কেবল আলোর দিকেই ছুটিয়া চলে তাহা নয়। আলো দেখিলে অন্ধকার খোঁজে বা গর্ত্তের মধ্যে আশ্রয় লয়, এপ্রকার প্রাণীও অনেক আছে। কেঁচো এবং অনেক শুঁয়ো পোকা জাতীয় প্রাণী এই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা আলো দেখিলেই পলায়। কেঁচো কখনই দিনে গর্ত্তের বাহির হয় না, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তাহারা দলে দলে বাহির হইয়া গর্ত্তের চারিদিকে বেড়ায়। ইতর প্রাণীদের এই আলোক-আতঙ্ককে পণ্ডিতেরা Negative Heliotropism নাম দিয়াছেন। নামটি যত বড় হউক না কেন, ব্যাপারটি কিন্তু ক্ষুদ্র। আলোকপাতে এই সকল প্রাণীরও দেহের একার্দ্ধ, অপরার্দ্ধের তুলনায় বিসদৃশ হইয়া দাঁড়ায়;—দুই অর্দ্ধের অবস্থা সমান করিবার জন্য উহারা অন্ধকার খোঁজে।

সমুদ্র হইতে একটু দূরবর্ত্তী স্থানে ডিম্ব হইতে যে সকল কচ্ছপ সদ্য বহির্গত হয়, তাহাদের ব্যবহারে একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। পক্ষিমাতা তাহার শাবকগুলিকে যে প্রকার যত্নে আহার করায় ও উড়িতে শেখায়, কচ্ছপ-মাতা তাহার শিশুসন্তানদিগের জন্য সে প্রকার যত্ন লয় না। ডিম্ব-প্রসব করিয়া নিরাপদ স্থানে বালুর মধ্যে ঢাকিয়া রাখিয়া দিলেই জননীর কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায়। শিশুরা ডিম্ব হইতে বহির্গত হইয়া নিজেদের চেষ্টা নিজেরাই করে। পক্ষিরাজ গরুড় ডিম হইতে বাহির হইয়াই আহারের চেষ্টায় যেমম ত্রিভুবন কম্পিত করিয়াছিল, ইহারা জন্মিয়াই সেপ্রকারে আহারের চেষ্টা করে না। জন্মগ্রহণের পরমুহূর্ত্তেই ঘাড় উঁচু করিয়া চারিদিক্‌টা দেখিয়া লয় এবং তখন যদি সমুদ্রের নীল জল চোখে পড়ে, তবে সমুদ্রের দিকেই ছুটিয়া চলে। জন্মের পর-ক্ষণেই ইহারা কিপ্রকারে সমুদ্র চিনিয়া লইয়া জলে লম্ফ প্রদান করে, প্রাণিবিদ্‌গণ তাহার গবেষণা করিয়াছেন। ইহাতেও দেখা গিয়াছে, কচ্ছপ-শিশু নিজের প্রবৃত্তির বশে সমুদ্রের দিকে চলে না। বাহিরের উত্তেজনা তাহাদের দেহে এমন কতকগুলি কার্য্য করিতে থাকে, যাহাতে তাহারা সমুদ্রের দিকে না চলিয়া থাকিতে পারে না।

লাল নীল প্রভৃতি নানাপ্রকার রঙ্ প্রাণীর চক্ষে পড়িয়া যে বিচিত্র কার্য্যের সূচনা করে, তাহা আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। লাল ফুলটিকে শিশু হাত বাড়াইয়া ধরিতে যায়; লাল রঙের কাপড় দেখিলে গরু-বাছুর ভয় পাইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করে। সবুজ বা বেগুনী রঙের

কাপড় গরুর সম্মুখে ধরিলে সে গ্রাহ্যই করে না। বেগুনী বা নীল রঙের ফুল শিশুর প্রিয় নয়। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ সদ্যজাত কচ্ছপ লইয়া পরীক্ষায় দেখিয়াছেন,—ইহাদের সম্মুখে লাল সবুজ পীত বা বেগুনী রঙের জিনিস রাখিলে সেগুলি ইহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না; কিন্তু নীল রঙের জিনিস দূরে রাখিলেও তাহার দিকে ছুটিয়া চলে। এইপ্রকার পরীক্ষায় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, জন্মগ্রহণ করিয়াই যখন কচ্ছপ-শিশু সমুদ্রের দিকে ছুট দেয়, তখন সমুদ্রের জলের দিকে সে স্বেচ্ছায় যায় না; সমুদ্রই নীল জল সম্মুখে বিস্তৃত রাখিয়া কচ্ছপকে জলে টানিয়া আনে। আকাশে ঢিল ছুড়িলে তাহা যেমন পৃথিবীর টানে মাটিতে পড়ে;—এই টানও যেন সেইপ্রকার; ইহাতে প্রবৃত্তি ইচ্ছা বা অনিচ্ছার গন্ধ নাই।

প্রাণি-বিজ্ঞানে Differential Sensctiveness বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। নামটা যত লম্বা বিষয়টা কিন্তু তত নয়। ইহার স্থূল অর্থ "ছায়া ও আলোক-বোধ"। কয়েকজাতীয় দিবাচর কীটপতঙ্গের মধ্যেই ইহা লক্ষ্য করা যায়। আলোয় চলিতে চলিতে যখন ছায়ায় আসিয়া পড়ে, তখন তাহাদের গতিরোধ হয়। ছায়া অতিক্রম করিয়া যাওয়া সাধ্যে কুলায় না,—তখন তাহারা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আলোর মধ্যেই বিচরণ আরম্ভ করে। প্রাণীদিগের এই কার্য্যেরও কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাণিবিদ্‌গণ বলেন, এই শ্রেণীর প্রাণিগণ যখন আলোর মধ্যে চলাফেরা করে তখন আলোক দ্বারা তাহাদের দেহের কোষগুলি পূর্ণমাত্রায় রাসায়নিক কার্য্য চলিতে থাকে কিন্তু ছায়ায় আসিলেই তাহা কমিয়া আসে তার পরে রাসায়নিক কার্য্যের এই বা কমা দেহে এমন এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করে যে, তাহাতে পেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া দেহটিকে ছায়া হইতে টানিয়া আনিয়া ফেলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের ছায়া-ভীতির মূলে তাহাদের প্রবৃত্তির বা বিবেচনা শক্তির সম্বন্ধ নাই। গলায় দড়া বঁধিয়া টানিলে গরু-বাছুর যেমন টানের দিকে ছুটিয়া চলে —এই ব্যাপারটাও যেন সেই প্রকার।

পতঙ্গদিগের জীবনের ইতিহাস বড় অদ্ভুত। আজ যে প্রজাপতিটিকে ফুলে ফুলে বসিয়া মধু খাইতে দেখিতেছি, তাহা প্রথমে প্রজাপতির আকারে জন্মে নাই। মাতৃগর্ভ হইতে ডিম্বাকারে উহা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তার পরে ডিম হইতে বাহির হইয়া কিছুদিন শুঁয়ো পোকার আকারে গাছের কচি পাতা খাইয়া বেড়াইয়াছিল, এবং শেষে কয়েক সপ্তাহ গুঁটির মধ্যে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া পরে গুঁটি কাটিয়া প্রজাপতি হইয়া ছিল। কয়েক জাতীয় প্রজাপতির দেহে বিভিন্ন অবস্থায় একই উত্তেজনার বিভিন্ন প্রকার কাজ দেখা গিয়াছে। শুঁয়ো পোকার অবস্থায় ইহারা আলোকে বাহির হয় না, কিন্তু প্রজাপতির আকার পাইলেই যে-দিকে আলো সে-দিকে ছুটিয়া চলে। আবার এমনও কতকগুলি প্রজাপতি দেখা গিয়াছে, যাহারা কেবল ডিম্বপ্রসবের সময়েই আলোক-প্রীতি দেখায়।

প্রাণিবিদ্‌গণ পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারগুলিরও কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, রসের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ঐ সকল প্রজাপতির দৈহিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটে। কাজেই শিশু-প্রজাপতি আলোকের উত্তেজনায় যে প্রকারে সাড়া দিত, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা আর সে প্রকারে সাড়া দিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে প্রজাপতিদিগের ডিন্ ফুলে ফুলে ভ্রমণেরও একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। গায়ে রঙ মাখিয়া ফুলগুলি গাছে গাছে দাঁড়াইয়া থাকে, পথিক প্রজাপতির একটা চক্ষুতে সেই রঙ্ এমন কতকগুলি রাসায়নিক কাজের সূচনা করে যে, তখন সে ফুলের উপরে আছাড় খাইয়া পড়িয়া দুই চক্ষুকে শান্ত না করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ফুলের বিচিত্র বর্ণ দেখিয়া প্রজাপতি ফুলের নিকটে স্বেচ্ছায় যায় না, ফুলের বর্ণই প্রজাপতিকে টানিয়া ফুলের উপরে বসায়—এবং এই নিরাশ্রয় স্বল্পায়ু অতিথিটিকে উদরপূর্ণ করিয়া মধু খাওয়ায়।

কাঁকড়া-জাতীয় কয়েকটি প্রাণীর চাল-চলন বড়ই বিচিত্র। ইহাদের মধ্যে এক জাতি (Gemmarns) কখনই আলোকে বাহির হয় না। নদীর তীরবর্ত্তী যে-সকল স্থানে সূর্য্যালোক পড়ে না, সেই সকল স্থানের জলেই উহারা বাস করে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, জলে যদি অতি অল্প মাত্রায় অম্ল-পদার্থ মিশানো হয়, তবে মুহূর্ত্তমধ্যে ইহাদের আলোকভীতি দূর হইয়া যায়। তখন ইহারা যে দিকে আলো কেবল সেই দিকেই ছুটিয়া চলে। আর এক জাতীয় কাঁকড়ায় ইহারি ঠিক্ বিপরীত কার্য্য প্রকাশ। সাধারণতঃ ইহারা আলোক ও অন্ধকার উভয়ই ভালবাসে; কিন্তু যদি জলে কিছু অঙ্গারক বাষ্প মিশাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহারা আলোক ছাড়িয়া কখনই অন্ধকারে যাইতে চাহে না। প্রাণিবিদ্‌গণ এই সকল ব্যাপারের ব্যাখ্যানে বলেন, আলোক-পাতে ইহাদের চক্ষুস্থিত যে সকল পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে, অম্ল বা অঙ্গারক-বাষ্পের যোগে তাহার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হয়; তাই কখনো ইহারা আলোকভীতি এবং কখনো আলোক-প্রীতি দেখায়। কিন্তু এই ভীতি বা প্রীতির গোড়ায় তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছার লেশ মাত্র নাই। তাহারা যন্ত্রবৎ কার্য্য করে। রাত্রিতে নদীর কিনারায় মশালের তীব্র আলো জ্বালিয়া মাছ শিকার করিবার এক উপায় আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, মাছগুলি ভয়ানক মূর্খ, তাই আলো দেখিয়াই তাহারা নদীর কিনারায় আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়, আলোক-পাতে কয়েকজাতীয় মাছের চক্ষুতে এমন রাসায়নিক কার্য্যের সূচনা হয় যে, তাহারা কলের পুতুলের মতো আলোর কাছে আসিয়া জটলা করিতে থাকে।

প্রাণিদেহে বাহিরের শক্তির প্রভাব-সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কয়েকটি স্থূল উদাহরণ দেওয়া হইল। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ সুকৌশলে এবং বহু গবেষণায় এ-সম্বন্ধে আরো অনেক খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের সকল কার্য্যই যে যন্ত্রবৎ

চলে, তাহা ইঁহারা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। একই প্রকার উত্তেজনায় প্রাণিদেহের স্নায়ু ও পেশী একই প্রকারে সাড়া দিতে দিতে যে শেষে অভ্যাসের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া যায়, ইহা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। তা'র পরে "সংস্কার" (Instinct) বলিয়া যে একটা ব্যাপার আজন্ম প্রাণীর উপরে কার্য্য করে, তাহাকেও অস্বীকার করিলে চলিতেছে প্রাচীন পণ্ডিতগণ সংস্কারের আধি বড়ই বিস্তৃত রাখিয়াছিলেন। প্রাণি-জী যে-সকল কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ হইত, সেগুলিকে তাঁহারা সংস্কারের ভিতরে টানিয়া গোঁজামিল দি পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারগুলি সংস্কারের ছোটো করিয়া আনিয়াছে বলিয়া মনে

শ্রীজগদানন্দ রায়।

ডাক্তারির ঝক্‌মারি

এল্, এম্, এস্ পাশ করিয়া বাড়ীতে গিয়া বসিতেই গ্রামে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। গ্রামের মধ্যে আমার এত হিতৈষী ও অনুরাগী বন্ধু ছিল আগে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমাদের গ্রামেও চিরন্তন দলাদলির অভাব ছিল না। আজ এক দলের প্রধানের পুত্র হইয়াও বিপক্ষদলের প্রধান চাটুয্যে-মশায়ের সঘন আশীর্ব্বাদ শুনিয়া মনে হইল, আমি অসাধ্য সাধন করিয়াছি।

কাছাকাছি দশবার-খানা গ্রামে পাশ-করা ডাক্তার ছিল না। সপ্ততিবর্ষবয়স্ক রামতারণ কবিরাজের বটিকা, কষায়ের উপর দিয়াই রোগীর যাহোক-একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাইত। কবিরাজ-মহাশয় পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যাবলে চিকিৎসা করিতেন। এ-জন্মে তাঁহাকে কেহ কবিরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিতে দেখে নাই। তাঁহার পিতা কবিরাজ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর কতকগুলি বটিকা ও চূর্ণ প্রভৃতির উত্তরাধিকারী হইয়াই তাঁ জন্মান্তরলব্ধ কবিরাজী জ্ঞান স্মৃতিপথে আ হইল। সেই দিন হইতেই তিনি কবিরা পঞ্জিকার ঔষধের বিজ্ঞাপনগুলি তাঁ Materia Medicaর কাজ করিত।

তাহা হইলে কি হয়, কবিরাজ-মহাশ হাতযশের কথা দশখানা গ্রামে প্রচা হইয়া পড়িয়াছিল। এমন লোক ছিল যে, একবার-না-একবার তুলসীপাতার মধু প্রভৃতি দিয়া কবিরাজ-মহাশয়ের না খাইয়াছে। আমাদের গ্রামে ধন্বন্তরি ছিলেন।

এ-হেন কবিরাজ-মহাশয়ের অন্নদি হইল এক প্রতিদ্বন্দী জুটিয়াছিল। গ্রামে অখিলচন্দ্র হাজরা কলিকাতায় এ সওদাগরের আফিসে চাকরী করিতেন তাঁহার পুত্র নিবারণচন্দ্র হাজরা পিতার আ এপ্রেন্টিশরূপে মাস-ছয়েক কাজ করি ছিল। পরে কি কারণে প্রকাশ না

ক্ষ হইতে তাড়িত হইয়া কলিকাতা য়া গ্রামে পলাইয়া আসে। আসিবার র বার আনা মূল্যে একখানা "হোমিও-থি চিকিৎসা" ও একটা গৃহচিকিৎসার ধের বাক্স কিনিয়া আনিয়াছিল। কে নিত তাহার মধ্যে এত প্রতিভা গুপ্ত ল? সর্দ্দি, কাশী, পেট-কামড়ানি আরাম রিয়া সে অল্পদিনেই খুব নাম-ডাক রিয়া ফেলিল। তাহার ঔষধ সস্তা ও বনে কোন ক্লেশ নাই দেখিয়া কবিরাজ-াশয়ের অনেক রোগী তাঁহাকে পরিত্যাগ রিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই প্‌শোষে কবিরাজ-মহাশয় আজকাল হার রোগীগণের নিকট মন্তব্য প্রকাশ রিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, "একি আর ারোক মিশান' কলের জল পেয়েছ নাকি! চারপয়সায় পাবে?"

এ-হেন দুইজন চিকিৎসক থাকিতেও ামার গ্রামে আসিয়া চিকিৎসা করিবার শেষ আগ্রহ হইবার কারণ ছিল না। স্ত পাশ হইতেই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-ান্ধব, পরিচিত-অপরিচিতের এত অনুরোধ-র্থনা পাইতে লাগিলাম যে, তাহার এক ানা রোগী পাইলেই আমি জুড়ী-গাড়ী াকাইতে পারিতাম। মনে ভাবিলাম, খা যাক্, ব্যাপারখানাই কি?

বাড়ীর সামনে মস্ত বৈঠকখানা ছিল। ঘরখানি ডিস্‌পেন্‌সারিতে পরিণত হইল। নেক টাকার ঔষধ কিনিলাম। চেয়ার, বিল প্রভৃতি আসবাব হইতে কম্পাউণ্ডারের দাঢাকা ঘরটি পর্য্যন্ত কিছুই বাকি হিল না। তখন এত-বড় ডাক্তার হইয়া পড়িয়াছি ভাবিতাম যে খুড়ামহাশয় যখন তাঁহার প্রিয় ভাগিনেয়টিকে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ঘুচাইয়া যাত্রার দল হইতে ছাড়াইয়া কেবল আমার হিতার্থ কম্পাউণ্ডার করিয়া দিতে চাহিলেন, তখন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান ত করিলামই, অধিকন্তু তাঁহার সুযোগ্য ভাগিনেয়টির গুণ-সম্বন্ধে এমন দু'-একটি 'হিতং মনোহারি চ' বাক্য প্রয়োগ করিলাম, যাহা খুড়ামহাশয়ের কর্ণে এর আগে কখনও প্রবেশ করে নাই।

আমাদের পরিবারটি অতি বৃহৎ ছিল। জ্ঞাতি-কুটুম্ব আত্মীয়-স্বজন অসংখ্য। গ্রামের মধ্যে বিশ-ত্রিশঘরের কম নহে। আমি ডাক্তারি আরম্ভ করিবামাত্র ইঁহারা তাঁহাদেরই প্রশংসিত ধন্বন্তরি-কল্প কবিরাজ ও সুলভ-চিকিৎসক নিবারণ বাবাজীকে বরখাস্ত করিয়া আমার রোগীরূপে দেখা দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বকার 'যমের হাত হতে ছিনিয়ে আন্‌তে পারে' কবিরাজ এখন 'হাতুড়ে' ও নিবারণ-বাবাজী "Vagabond" উপাধি লাভ করিল। মনে ভাবিলাম, আর ভাবনা কি? এত পসার আমার!

সকালে উঠিয়া ডাক্তারখানায় বসিতে গিয়া দেখি একঘর লোক। ঘরে ঢুকিতেই পিসামহাশয় বলিলেন, "এই যে গিরিশ! এখনি বাবা একবার যেতে হবে। খোকার বড় অসুখ। মাথার যন্ত্রণায় গেল।"

আমি বলিলাম, "কি হয়েছে?"

পি। কি জানি বাবা! চল একবার। বলে মাথার যন্ত্রণা। ছট্‌ফট্ কচ্ছে। আমরা তার কি বুঝব? আমরা ডাকিনি,

কব্‌রেজ-ম'শাই বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি নিজেই খবর নিতে উঠে-ছিলেন। তাঁর সামনেই পড়ে গেল। তা তিনি বলেন কি? না, ও কিছু নয়। একটু ঘুমুলেই সেরে যাবে। ছেলে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কচ্ছে, আর কব্‌রেজ বল্লে কি না, ও কিছু নয়! দেখ দিকি বাবা কাণ্ডটা! এই সব গোবদ্দির হাতে এতদিন গ্রামের লোকের প্রাণটা নির্ভর কর্‌ত।"

বৃদ্ধ ঘোষাল-মহাশয় এতক্ষণ এক-পার্শ্বে চুপচাপ বসিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ কাশিতে কাশিতে বলিয়া উঠিলেন, "যা বলেছ দাদা! গোবদ্দি বলে গোবদ্দি! আমার এই একটু হাঁপানি, এ আজ দশবছরে সারাতে পাল্লে না। চিকিৎসা করাতে করাতে আমার জমীজমা বন্ধক পড়্‌ল। আর বাবাজীর আমার ওষুধের কেমন জোর! কালকের দিনটে খেয়েই এমনি ঘুমিয়েছি যে কোথা দিয়ে গোটা রাতটা কেটে গেল তা টেরই পাইনি। তা বাবাজি, আজকে আমার ব্যবস্থা তা'হলে কি হবে?"

আমি বলিলাম, "আজকে ঐ ওষুধটাই চলুক।"

পিসামহাশয় ভাবিলেন, আবার কেহ ধরিলেই বিপদ্। তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল বাবা তাহলে।"

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পথে বাহির হইলাম। পথে ঘোষাল-মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া পিসামহাশয় বলিলেন, "কেন শোন ও বুড়োর কথা। ওর মান্ধাতার আমলের হাঁপানি। শিবের অসাধ্য ব্যারাম। ও কি কখন ভাল হয়? আর জমীজমা বেচে চিকিৎসা করার কথা যা বল্লে ও সব ডাহা মিথ্যে। কেবল চালের লাউ-কুমড়ো আর সজ্‌নের ডাঁটা খাইয়ে কব্‌রেজের ঠেঙে ওষুধ আদায় করেছে। তুমি বাবা ছেলেমানুষ, ও-সব ভাঁওতায় ভুল না।"

এইরূপ 'জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা' দ্বারা আমার চক্ষুরুন্মীলনের প্রয়াস পাইতে পাইতে পিসামহাশয় তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। রোগী নামে 'খোকা' হইলেও বাস্তবিক 'খোকা' নহে। প্রায় বিশবৎসর বয়স্ক বলিষ্ঠ যুবা। গ্রামের আখ্‌ড়ায় কুস্তী লড়ে। বিছানার উপর চুপ্ করিয়া শুইয়াছিল। মাথায় একটা কাপড় বাঁধা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে?"

সে বলিল, "বড্ড মাথাটা ধরেছে।"

পরীক্ষায় বুঝিলাম, রোগ কিছুই নহে, সামান্য মাথা-ধরা মাত্র। কিন্তু ধন্বন্তরির উপর টেক্কা মারিবার দুর্ব্বলতা দূর করিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আচ্ছা, আমি ডাক্তারখানায় গিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

কিন্তু পিসামহাশয় শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সে কি বাবা! এখনি যাবে কি? এখন তোমায় ছাড়ছি না।"

পিসীমা পাশের ঘর হইতে আসিয়া কান্না জুড়িয়া দিলেন, তাঁহার এই একটি সন্তান, ভগবানের কি সে দিকে দৃষ্টি নাই!

এ-সব অকাট্য যুক্তির আর উত্তর নাই। মনটা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। আজ সকালে পাণিগ্রামে একটা ডাক ছিল। গেলেই চারটাকা পাওয়া যাইত। এদিকে একঘর রোগীও ডাক্তারখানায় বসিয়া আছে।

তাহাদের প্রেস্‌কিপ্‌সন্ দিলে কিছু-টাকার ঔষধ বিক্রয়ও হইবে। এখানে থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই। রোগ কিছুই নহে—অর্থের আশাও ছাড়িয়া দিলাম। আত্মীয়স্থলে ত ভিজিট পাওয়াই যাইবে না।

পিসামহাশয় বলিলেন, "তা'হলে বাবা, ওষুধটা লিখে দাও। চট্ করে আনিয়ে নিই।"

ঔষধ লিখিয়া দিলে চাকর ডিস্‌পেন্‌সারির দিকে ছুটিল। আমি নিরুপায়। চুপ্‌চাপ রোগীর শিয়রে বসিয়া। রোগী একবার "উঃ, আঃ" করে, আর পিসীমা অমনি অস্থির হইয়া উঠেন। বলেন, "মাথাটা একটু টিপে দাওনা বাবা।" তখন এক হাতে পাখা লইয়া রোগীকে বাতাস করিতে ও অপরহাতে তাহার মাথা টিপিয়া দিতে লাগিলাম।

পিসীমার এইবার ফুরসৎ হইল। এতক্ষণ তাঁহাকেই মাথা টিপিতে ও বাতাস করিতে হইতেছিল। এইবার মেঝেয় বসিয়া তিনি তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর কথা পাড়িলেন। তাঁহার সইয়ের সন্তান হওয়ার পর চুল উঠিয়া যাইতেছে, কি তেল মাখিলে তাহা বন্ধ হয়, তাঁহার ভাসুরের কন্যাটির মাঝে মাঝে পেট কামড়ায়, তাহা কিরূপে সারান' যাইতে পারে, তাঁহার খুড়শ্বাশুড়ির একটি পুত্র বড় রোগা, একটু সালসা-টালসা খাওয়াইলে কোনও উপকার হয় কি না, এইরূপ বহু রোগীর রোগের Symptom শুদ্ধ এরূপ বর্ণনা করিয়া গেলেন যে, আমি অন্যমনস্কে 'হুঁ, হাঁ' করিয়া কোনরকমে যাহা মনে আসিল তাহাই ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। মনে করিলাম, গোল মিটিল! কোথায় কে রোগী, এখান হইতে তাহার কি চিকিৎসা হইবে?

কিন্তু পিসীমা বলিলেন, "তা'হলে বাবা ডাক্তারখানায় গিয়ে ওষুধগুলি পাঠিয়ে দিও। আহা, তাদের বড় কষ্ট রে বড় কষ্ট। কেই বা দেখে? তোকে কত আশীর্ব্বাদ কর্‌বে।" আমি ত একেবারে থ! একবার বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, রোগী না দেখিয়া চিকিৎসা করি কিরূপে? কিন্তু সে-সব আপত্তি টিকিল না। পিসীমা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তুই একটু জল দিলেও সেরে যাবে বাবা। আমার কথা ঠেলিস্‌নি।"

এইরূপ তিনচার ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া খোকার মাথাধরা সারিলে আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলাম। ডাক্তারখানায় আসিয়া দেখি, অর্দ্ধেক রোগী চলিয়া গিয়াছে। দুইটা জরুরি ডাক আসিয়াছিল, আমায় না পাইয়া কবিরাজ-মহাশয় ও নিবারণচন্দ্রকে লইয়া গিয়াছে!

তাহার পর দিন-তিনেক পিসীমার রোগীদিগের জন্য ঔষধ পাঠাইবার অনবরত তাগাদা আসিতে লাগিল, শেষে বিরক্ত হইয়া কয়েকটা ঔষধ পাঠাইলাম। ঔষধের দাম ত' পাইলামই না,—তার উপর ডাক-মাশুল ও প্যাকিং খরচাটাও ঘর হইতে দিতে হইল। পিসামহাশয় চালাক লোক, আগে হইতেই বলিয়া দিয়াছিলেন, "বাবা, ওষুধপত্র প্যাক করা ত আমরা জানি না। শেষটা ভেঙ্গে-টেঙ্গে যাবে। পাঠাবার বন্দোবস্তটা তুমিই ক'রো। খরচ যা লাগে আমি দেব।"

কিন্তু খরচ ত তিনি দিলেনই না, অধিকন্তু কিছুদিন বাদে "তোমার ওষুধে বড্ড উপকার হয়েছে বাবা, আর এক-এক শিশি পাঠাও" বলিয়া অনুরোধ হইল। শেষে এই অজ্ঞাত রোগীদের ঔষধ সরবরাহ করা এত ভয়ানক হইয়া উঠিল যে, একদিন মরিয়া হইয়া সংকল্প করিয়াছিলাম, "দিই খানিকটা ষ্ট্রিক্‌নিন পাঠিয়ে—একেবারে আরাম হয়ে যাক্।"

পিসামহাশয়ের পর খুড়া, কাকা, জেঠা, ঠাকুরদাদা প্রভৃতি কতরকম সম্পর্কের কতরকম আত্মীয়ের তলব পড়িতে লাগিল। আমার পসারও খুব জমিয়া উঠিল। ভিন্ন গ্রামের রোগী ডাকিতে আসিলে দেখাই ত পায় না। গ্রামের লোককেও অনেক চেষ্টা করিয়া তবে আমায় লইয়া যাইতে হয়। আমি দিনরাতই আত্মীয়দের কাহারও না কাহারও বাড়ীতে আটকা পড়িয়া আছি। কাহারও পেট কামড়াইল ডাক গিরিশকে, কাহারও অম্বলের ঢেঁকুর উঠিয়াছে ডাক গিরিশকে, কাহারও ছেলে বড় কাঁদুনে বোধহয় ক্রিমি হইয়াছে—ডাক গিরিশকে! আমারও তখন বড়-বেশী চক্ষুলজ্জা ছিল। ভিজিট্ ত মুখ ফুটিয়া চাহিতেই পারিতাম না। ঘরের পয়সা দিয়া যে-সকল ঔষধ কিনিয়াছিলাম ও আত্মীয়দের যাহা ব্যবস্থা করিতাম, তাহার মূল্যও চাহিতে পারিতাম না।

সুতরাং পসারের ফলে একদিকে যেমন বাহিরের ডাকগুলি হারাইয়া উপার্জ্জনহীন হইতে লাগিলাম, অপরদিকে তেমনি আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণে ঔষধের আলমারিগুলি ক্রমেই শূন্যগর্ভ হইয়া আসিতে লাগিল। তখন সাদা কাগজের বড় দরকার হইয়া পড়িল। খালি শিশিগুলির গায়ে জড়াইয়া গালার মোহর লাগাইয়া আলমারীতে সাজাইয়া রাখিতে হইত।

যাহারা পয়সা দেয় এমন রোগী হাত-ছাড়া না হওয়াতে কবিরাজ-মহাশয় ও নিবারণ-বাবাজী আমার উপর বিশেষ অপ্রসন্ন হইলেন না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। বাড়ীতে সদরে বড়দাদা ও অন্দরে পরিবারের তিরস্কারে দিনের মধ্যে দশবার মনে পড়িত—

"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"।

দাদার তিরস্কারটা তত গায়ে লাগিত না, কারণ দিনের বেলায় খাওয়ার সময় ছাড়া আমাকে আর বাড়ীতে দেখাই যাইত না, আমার রোগীদের এতই আকর্ষণ ছিল। কিন্তু খাওয়ার সময়টি ঠিক্ ছিল। রোগীরা আমার স্বাস্থ্যের দিকে খুব দৃষ্টি রাখিত। এত আত্মীয় রোগী থাকিতেও কখনও কাহারও বাড়ীতে খাওয়া আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। রোগীরা খাওয়ার সময় হইলেই শশব্যস্তে আমাকে বলিত, "এইবার যাও বাবা! আহা বেলা হ'লো, নিজের শরীরের ওপর একটু দৃষ্টি রেখ' বাবা! আর দেরী ক'রো না,—যাও।" কিন্তু আমার শরীরের প্রতি রোগীদের এই মমতা দাদা অন্যরকমে বুঝিতেন। বলিতেন, "একটু চোখের চামড়াও কি নেই! এত আত্মীয়তা সবই মুখে! একমুঠো ভাত কোনদিন খাওয়াতে পাল্লে না। ঠিক খাওয়ার সময়টি হলেই তাড়িয়ে দেয় আবার আঁচান হ'তে না হ'তেই ফের ডাক্‌তে আসে।"

আমি বলিতাম, "বাড়ীতে রোগী, আমার খাওয়ার ব্যবস্থা কর্‌বে কি করে?"

দাদা বলিতেন, "আরে রেখে দে তোর রুগী! তোকে নেহাৎ ভালমানুষ পেয়েছে, তাই দিনরাত বাজে কাজে বসিয়ে রেখেছে। অত চক্ষুলজ্জা কল্লে কি ব্যবসা চলে? ভাল ভাল ঘরগুলো সব হাতছাড়া হ'তে চলেছে। শিবুলার জমীদারবাড়ী থেকে দু'-তিনদিন ডাক্‌তে এসে ফিরে গেছে। সে খবর রাখিস?"

ব্যবসার যে ক্ষতি হইতেছে তাহা আমারও বুঝিতে বাকি ছিল না। কিন্তু করি কি? দাদার তিরস্কারটা নির্ব্বিবাদে হজম করিয়া বসিয়া রহিলাম।

কিন্তু পরিবারের বাক্যবাণ অত সহজে উড়াইয়া দিতে পারা গেল না। কারণ, দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত দিনের মধ্যে হয়ত একবার। বেশীমাত্রায় তিরস্কার আরম্ভ হইলে, বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেই সব গোল চুকিয়া যাইত! কিন্তু শয়নমন্দিরে গৃহিণীর গর্জ্জনে নিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। একে সমস্ত দিনের বেগার খাটুনি, তার উপর নিশীথে বক্তৃতা শ্রবণে মেজাজটা শীঘ্রই খিট্‌খিটে হইয়া উঠিল। শেষে একদিন চোখা চোখা দুইচারিটি বোলচাল দিতেই পত্নীর কান্নার জলে বালিস ভিজিয়া গেল। ভয় হইল, ভিজা বালিসে শুইয়া পাছে সর্দ্দি হয়। দিন-দুই পরে জ্যেষ্ঠ শ্যালক আসিয়া হাজির, শ্বাশুড়ীঠাকুরাণীর বড় ব্যারাম, আমার স্ত্রীকে লইয়া যাইবে। বোলচালের জের যে এতদূর গড়াইবে কে তাহা জানিত? যাহাই হউক, স্ত্রী চলিয়া গেলেন। আমিও দিনকতক নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইয়া বাঁচিলাম।

কিন্তু মানুষের সহেরও একটা সীমা আছে। আমার আত্মীয়েরা ক্রমে সে সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে লাগিলেন। হয়ত খুড়ামহাশয়ের জামাই আসিয়াছে। চাকর দৌড়িয়া আমার ডিস্‌পেন্‌সারিতে আসিল, "বাবু একটু পিপারমেণ্ট চাচ্ছেন, জামাই-বাবুর পানে দিতে হ'বে।" পিসামহাশয়ের চাকর আসিয়া বলিল, "খোকাবাবুর কাঁচের দোয়াত ভেঙ্গে গেছে, একটু প্ল্যাষ্টার অফ্ প্যারিস্ চাই।"

আমার সেদিন আর সহ্য হইল না। জনকতক রোগী বসিয়াছিল। তাহাদের সামনেই বলিলাম, "আর এই টেবিলটা আর চেয়ার-কখানা চাই না? বেশ বৈঠকখানা সাজান হবে। আর আলমারী গুলোও নিয়ে যেতে ব'ল। খোকার বৌ হ'লে পুতুল সাজিয়ে রাখবে।" সমবেত রোগীগণ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। চাকর-দুইজন পলাইয়া গেল।

একটু পরে ঠাকুরদাদা (কি সম্পর্কে ঠাকুরদাদা, তাহা সর্ব্বজ্ঞ ভগবান ভিন্ন মানুষের বলা অসম্ভব) আসিলেন। বলিলেন, "ওহে নাতি, সাবু ত ভাই কেউ রাঁধ্‌তে পাচ্ছে না। একবার দেখিয়ে না দিলে ত হয় না।"

আমি বলিলাম "বটে? রোগীর বিছানা-টিছানা ঝাড়তে পারে ত? রোগীর বিছানা ঝাড়া সোজা কাজ নয়, একজন বহুদর্শী ডাক্তারের দরকার। আর ডাক্তারখানার ঝাঁটা না হ'লে সুবিধা হবে না। তা

আমিই ঝাঁটা নিয়ে যাচ্ছি। রোগীর বিষ আচ্ছা করে ঝাড়িয়ে দিয়ে আস্‌ব এখন।”

একঘর লোক সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ঠাকুরদাদা একেবারে হতভম্ব। এমন কথা যে আমার মুখ দিয়া বাহির হইবে, এটা বোধহয় সকলেরই স্বপ্নের অগোচর ছিল।

যাক্, কয়েকটা কথা বলিয়া ফেলিয়া আমার মনটা হাল্‌কা হইয়া গেল। ভাবিলাম, আর কি, চক্ষুলজ্জা ত কাটাইয়াছি। এইবার একবার দেখি।

সেদিন আর কোথাও বাহির হইলাম না। সমস্ত দিন বসিয়া কতটাকার ঔষধ আত্মীয়েরা হজম করিয়াছে তাহার হিসাব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম, প্রায় আড়াই হাজার টাকা পাওনা। কম্পাউণ্ডারের দ্বারা প্রত্যেকের নামে পৃথক্ পৃথক্ বিল্ করিয়া পাঠাইলাম ও সেই সঙ্গে জানাইয়া দিলাম যে, ভিজিটের টাকার জোগাড় না করিয়া কেহ যেন আর আমায় ডাকিতে না আসে।

এই ব্যবস্থার আশ্চর্য্য ফল দেখা গেল। পরদিন হইতেই আর জেঠা, খুড়া, কাকা, ঠাকুরদাদার কাহারও টিকি দেখা গেল না। অনেকগুলি রোগী চট্‌পট্ সারিয়া উঠিল। পূর্ব্বদিনে যাহাদের শয্যাশায়ী দেখিয়াছিলাম, পরদিনে তাহাদের জনকতককে নদীর ধারে সিগারেট ফুঁকিয়া খোষমেজাজে বেড়াইতে দেখিলাম। ভাবিলাম, বেশ হইয়াছে, এবার কিছু রোজগার করা যাক্।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পরদিন হইতে আর-একটাও ডাক আসিল না। মনে করিলাম, দিন-কতক যাক্, নিশ্চ আসিবে। কিন্তু এক সপ্তাহ অতীত হ গেল। কোনও ডাক আসিল না।

একদিন দাদা ডাকিয়া বলিলেন, “হ্যাঁ এ-সব কি শুন্‌ছি? তোর নাকি খারাপ হয়েছে? খুড়া কাল জমী বাবুর নায়েবকে বল্‌ছিল, ‘গিরিশকে যাওয়া মিছে। ওর মাথা খারাপ গেছে। রোগী দেখ্‌লে মার্‌তে ডাক্‌তে গেলে গালাগাল দেয়। আর রাত ব'সে ব'সে কেবল মিথ্যে কতকগু বিল লিখ্‌ছে। মনে কেমন ধারণা গেছে, বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা তার পাওনা

শুনিয়া ত আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গে সেইদিন সন্ধ্যার সময় বেড়াইয়া ফিরিতে দেখি কবিরাজ-মহাশয়ের ঘরে বি মজ্‌লিস্। আমার আত্মীয়-স্বজনের অনেকেই ও গ্রামের মাতব্বর-মণ্ডলী সকলে সেখানে হাজির। আমারই নাম হইতে শুনিলাম। একটু আড়ি পাতিতে হইল ষড়যন্ত্রটা কি শুনি!

ঠাকুরদাদা বলিতেছেন, “আর বলে কেন কব্‌রেজ ম'শাই! একেবারে উন্ম পাগল হয়েছে। আমায় বলে কি ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবে। কি করি বল আপনার লোক, সম্পর্কে নাতি বোলে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। নইলে অন্য কেউ হ'লে দেখে নিতুম একবার। আমার কথায় বিশ্বাস না-হয় এই চাটুয্যে-ম'শাই ঘোষাল-ম'শাই আর গাঙ্গুলীদাদাকেই না হয় জিজ্ঞাসা করুন। ওঁরাও ত সেখানে বসেছিলেন।”

গাঙ্গুলিম'শায় বলিলেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ, টা সত্যি বটে। আমরা ত শুনে বাক্ হয়ে গেলুম। আপনার লোক, সে বড়, তায় সম্পর্কে ঠাকুরদাদা। তাকে না মুখের ওপর এ কথাটা বল্লে! লই বা পাগল!”

চাটুয্যে-মশাই বলিলেন, “ও-সব ইংরেজী ড়ার ফল,—বুঝেছেন কি না! এই ন্যেই—বুঝেছেন কি না—আমার ছেলেটিকে রেজী স্কুলে দিই নি। শুভঙ্করী শিখে ামস্তাগিরি করে খায় সেও ভাল,—বুঝেছেন না—তবু আমার ইংরেজী-পড়া ছেলে াই নি। কোন্‌দিন বাপকেই—বুঝেছেন না—জুতোর ঠোক্কর দিয়ে বস্‌বে।”

খুড়ামহাশয় বলিলেন, “তা এখন করা য় কি? চিকিৎসার না-হয় কোনও াবনা নেই। আমাদের বহুদর্শী কবরেজ ম'শাই থাক্‌তে ও-সব অর্ব্বাচীন ছোঁড়াদের ারা কি আর ভাল চিকিৎসা হত! তবে আপনার লোক, তাই চক্ষুলজ্জার খাতিরে গিরিশকে না দেখিয়ে আর কব্‌রেজ ম'শাইকে ডাক্‌তে পারি নি। বিশেষ গিরিশ যে রকম করে ধরেছিল—বল্‌ত ‘খুড়োমশাই, আপনাদের ভরসাতেই এ গ্রামে আছি।’ তা আমি আমার যতদূর সাধ্য, গিরিশের রোগী যোগাড় করে দিয়েছি। আমাদের গোষ্ঠীর কেউ গিরিশকে ভিন্ন অন্য কাউকে ডাকে নি। কিন্তু পাগলের হাতে ত আর চিকিৎসা করান যায় না। সেদিন ওষুধ আন্‌তে পাঠিয়েছিলুম, চাকরকে বলে দিয়েছে ‘আরও জনকতক লোক নিয়ে আস্‌গে যা। তুই একলা চেয়ার, টেবিল, আলমারী নিয়ে যাবি কি করে?’ একেবারে বদ্ধ পাগল কব্‌রেজ ম'শাই, বদ্ধ পাগল।”

কবিরাজ-মশাই এতক্ষণ অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে তামাক টানিতেছিলেন। এইবার মুখ হইতে অনেকখানি ধূম বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন, “একটু হিমসাগর তৈল মাসখানেক মাথায় মালিস কর্‌লেই সব সেরে যাবে। আমার কাছে যা মস্‌লা আছে তা আজ-কালকার দিনে আর কোথাও পাওয়া যায় না। যদি বলেন ত মাসখানেকের উপযোগী তেল তৈরী করে দিই।”

পিসাম'শায় বলিলেন, “আপনি কাল সকালে গিরিশের দাদার সঙ্গে দেখা করে একটা ব্যবস্থা করুন। আহা, ছোক্‌রা লেখাপড়া শিখে শেষটা এমন হ'ল!”

আমি আর দাঁড়াইলাম না। দাঁড়াইলে বোধ হয় আর আত্মসংবরণ করিতে পারিতাম না। রাগে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। ‘দশচক্রে ভগবান ভূত’ হন শুনিয়াছিলাম, ইহারা যথার্থই আমায় পাগল বানাইল।

দাদাকে সকল কথা বলিলাম। দাদা বলিলেন, “তুই হুগ্‌লীতে গিয়ে ডিস্‌পেন্‌সারি খোল্। এখানে আর সুবিধে হবে না।”

একবার মনটা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই নীচ লোকগুলোর ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইব? কিন্তু উপায়ও দেখিতে পাইলাম না। উপার্জ্জনের পথ ত করিতে হইবে।

হুগ্‌লীতে যাইবার সকল বন্দোবস্ত হইয়া গেল। যেদিন গ্রাম ছাড়িব, সেইদিন সকালবেলা গ্রামের জনকতক মাতব্বর, কবিরাজ-মহাশয় ও নিবারণ বাবাজী আসিয়া হাজির। আত্মীয়রা কেহ দেখা দেন নাই,

বোধহয়, পাছে টাকার তাগাদা করি এই ভয়ে।

কবিরাজ-মহাশয় বলিলেন, "বাবাজী নাকি হুগ্‌লীতে যাচ্ছ?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ। মাথাটা খারাপ হয়েছে কিনা, দিনকতক চিকিৎসা করাতে হ'বে। হুগ্‌লীতে বিরজা কব্‌রেজের হিমসাগর তেলের মত ওষুধ আজকাল আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

কবিরাজ-ম'শাই একটু যেন দমিয়া গিয়া বলিলেন, "বায়ুর প্রকোপটা একটু কম যাতে থাকে তাই ক'রো বাবাজী। সুশ্রুত বলেন—

'কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী।'

অর্থাৎ, বায়ুর প্রকোপে মাথা খারাপ হ'লে উদরে হরীতকী দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।"

আমি না হাসিয়া খুব গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "আজ্ঞে, যা বলেছেন!—

চরকসংহিতাতেও পড়েছিলুম—

"ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

কবিরাজ-মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন, "ঠিক্, ঠিক্! বাবাজীর আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রও পড়া আছে দেখ্‌ছি।"

আমি সবিনয়ে বলিলাম, "আজ্ঞে, অ
স্বল্প,—আপনাদের মত কি আর পড়েছি

দাদা আসিয়া বলিলেন, "ওঠ গিরি
বেলা হয়ে যাচ্ছে।"

আমি উঠিলাম। যাইবার সময় কবিরা
মহাশয়কে বলিলাম, "দেখুন কব্‌রেজ-ম'শা
সূচিকাভরণে আজকাল বড্ড উপকার হচ্ছে
বড় বড় ডাক্তাররা পর্য্যন্ত কবিরা
সূচিকাভরণ চালাচ্ছেন। আপনিও ব্যবহা
করে দেখ্‌বেন। জ্বরবিকারে গোটা-চারে
বড়ি দিলেই একেবারে আরাম। কি
বেশ টাট্‌কা বিষ যোগাড় করা চাই নৈলে
ফল হবে না। কেবল চুপিচুপি আপনাকে
বলে গেলুম। গ্রামের সবাই প্রায় আমার
আত্মীয়। তাই ওদের ভালটা আগে দেখ্‌তে
হয়। আর দেখ বাবাজী, (নিবারণের
দিকে ফিরিয়া) হোমিওপ্যাথি 'Cobra'
(কব্‌রা)-ও সূচিকাভরণের কাজ করে
কিছু বেশী পয়সা দিয়েও 'কব্‌রা' টা আনিও
আমায় লিখ্‌লে আমি হুগ্‌লী থেকে টাট্‌কা
ওষুধ কিনে পাঠিয়ে দেব।"

বলিয়া আমি গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী
ছাড়িয়া দিল। দেখিলাম আমাদের বুড়ো
চাকর বেণী ডিস্পেন্সরী-ঘরে চাবি
লাগাইতেছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

মোদ্দা কথা

যাঁহারা বাংলা সাহিত্যে গল্প লিখে থাকেন
াঁদের দিকে নাক-সিঁটকে কেউ কেউ
লচেন যে ও-সব মাথা-মুণ্ড লিখে হচ্ছে
ক? ওতে দুনিয়ার কি কোনো উপকার
বে? সাহিত্য-সংসারে একদল লোভী
লোক আছেন যাঁরা সব-জিনিষ থেকেই
উপকার আদায় করবার লোভ কিছুতেই
সম্বরণ করতে পারেন না। যা পাচ্ছেন
তাই নিয়ে তাঁদের মন খুসী হয় না, তাঁদের
নারো-কিছু চাই।

মানুষ সংসারে চলাচল করে বেড়ায়
রকম করে। এক হচ্ছে হিসেবের খাতা
কে নিয়ে, আর-এক হচ্ছে ঠিক তার
উল্টো—বেহিসেবী চালে। মানুষের ভিতর
এই যে দুটো ভূত—একটা হিসেবী আর
একটা বেহিসেবী, এরা কেউ কাউকে রেয়াৎ
করে চলেনা। তা যদি চলত—কিম্বা মাত্র-
একটা ভূত যদি থাকত তাহলে দুনিয়ায়
এত গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠত না;—ঘড়ির
কাঁটার মতো সব ঠিক-ঠিক চলে যেত।
একখানা পাকা হিসেবের খাতা বেঁধে নিতে
পারলে তারই সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে জীবনটা
বেশ নির্ব্বিবাদে কাটিয়ে দেওয়া যেত—
হিসেব-মতো সব পেতুম, হিসেব-মতো দিতুম,
কোনো গোল থাকত না। কিন্তু তা তো হবার
জো নেই; বেহিসেবীটা ঝড়ের মতো এসে
হিসেবের খাতা ছিঁড়ে-খুঁড়ে তার পাতা উড়িয়ে
কি যে করে দেয় তাইতে সব গোলমাল হয়ে
যায়—অত যে হিসেবপত্র সে-সব কিছুই ঠিক
থাকে না।

হিসেবীটা আমাদের কানে-কানে ফোসলায় এতখানি জমা কর, এতটুকু খরচ কর; ওদিকে যেগ্নোনা ভারি লোক্‌সান, এই পথটা লাভের পথ; এই শস্ত যদি বপন কর, এত ফল পাবে, ঐ লোকটার সঙ্গে যদি কারবার কর, ও তোমায় ঠকাবে; এই-খানে তোমার ভয়, এইখানে সংশয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু বেহিসেবীটা অত-কথা বলে না, সে এসে হিড়হিড় করে টানে, বলে এস, এস;—চলে-চল। কোথায় যাবরে বাপু? কেনরে বাপু?—এ সব কথা জিজ্ঞাসা করবার অবসরই দেয় না। কোথায় থাকে তখন হিসেবের খাতা—লাভ-লোক-সানের কথা!

এই হিসেবীটা যে মন্দ তা বলচি না, এর দ্বারা জগতে উপকার হয়েছে—মানুষ কি কোরে বেশ নিশ্চিন্তে থাকে এর সেই চেষ্টা। এ মানুষকে অঙ্ক কসতে শিখিয়ে বলচে, বিজ্ঞান শিখিয়ে বলচে—দেখ, এই রকম যদি কর এর ফল এই হবেই, এর নড়চড় কিছুতেই হবে না। এমন করে কানে-ধরে সব শিখিয়ে দিচ্ছে যে কেউ যে ধাপ্পা দিয়ে ভুল বুঝিয়ে যাবে তার জো নেই—হিসেবের সঙ্গে তখনি গর-মিল হয়ে তা ধরা পড়ে যাবে।

কিন্তু বেহিসেবী এ-সবের কিছু ধার ধারে না—তার কোনো মতলবই নেই ;—সে হিসেব করে না, সে কেবল একটা করে ফেলে। নিজের গায়ের কাপড়খানা, কি নিজের পাতের ভাত সে আর-একজনকে দিয়ে ফেল্লে, কারুর জন্যে হয়ত প্রাণটাই বিসর্জ্জন দিলে, নিজের কোনো লাভ নেই এমন-একটা কাজে বিস্তর টাকা খরচ করে ফতুর হয়ে পথে-পথে বেড়াতে লাগল, যাকে ভালোবেসে কোনো ফল নেই তাকেই ভালোবেসে ফেল্লে,যা পাওয়া যাবে না—তারই পিছন-পিছন চিরজীবন ছুটে শেষটা পথের মধ্যেই মরে পড়ল। এমনিতর কত যে অনাসৃষ্টি ব্যাপার সে সৃষ্টি করে তার ঠিক নেই। হিসেবের খাতার মধ্যে তাকে আনা যায় না—তার জমাখরচও চলে না।

হিসেবীটার কাজই হচ্ছে কিনা সব-কিছুকে হিসাবের মধ্যে আনা ; সেইজন্যে সে বেহিসেবীকে একেবারে বাতিল করে তার হাল ছেড়ে দিতে পারচে না। সে বড় পাকা লোক, সে অনবরত খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করচে ঐটের ভিতর থেকেও কিছু লাভ আদায় করা যায় কিনা। কিন্তু বেহিসেবীটাকে হিসাবের মধ্যে ফেল্লে সে যেন কেমনতর হয়ে যায়—তার আর সে-রূপ থাকে না, তেজ থাকে না, মানুষের মন-কাড়বার শক্তি কমে আসে। সে তখন কাঁদলে লোকে বলে মায়া-কান্না কাঁদচে, কাউকে ভালোবাসলে বলে ও ডাইনির ভালোবাসা, প্রাণ দিলে বলে নাম-কেনবার জন্যে অমনটা করলে। হিসেবীর কাজের ভিতর যে উদ্দেশ্য বলে একটা জিনিষ থাকে সেইটে ঐ বেহিসেবীর সমস্ত রস একেবারে জ করে দেয়।

জগতসংসারে এই হিসেবী আর বেহিসে দুটোরই নাম-যশ খুব। দুজনেরই উপাস আছে, স্তাবক আছে। দুজনেরই মহিমা কীর্ত্তন খুব চলচে। এ ছাড়া আর এক দল আছেন তাঁরা থাকেন মাঝামাঝি,— হিসেবীকে রাখেন, বেহিসেবীকেও চা আবার বেহিসেবীর কাছ থেকেও কি লাভ আদায় করবার মতলব রাখেন এঁরাই হচ্ছেন একটু অতিরিক্ত লোভী এঁরাই সব-কিছুর কাছ থেকে হিসাব মতে লাভ পাবার দাবী নিয়ে চীৎকার করেন।

* * *

মানুষের মধ্যে এই যে সব ঝঞ্ঝট, এর ধাক্কা সাহিত্যে, শিল্পে—মানুষের সব রচনার উপর এসে পড়েছে কোনো জায়গায় হিসেব-খতিয়ে লাভ-লোকসান দেখে কাজ চলছে, কোনোখানে বেহিসেবীর হুটোপাটি চলচে, আবার কোথাও বা অতি বুদ্ধিমানেরা হিসেবী, বেহিসেবী ও হিসেবী-বেহিসেবীকে নিয়ে জগতে লাভের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে মহৎ উপকার করবার চেষ্টায় আছেন। এই সব-কটা শ্রেণীরই এক-একটা নাম দিয়ে বাজারে মহা হৈ-চৈ চলছে। যাঁরা বেহিসেবী রকমে সাহিত্য লিখচেন, শিল্প সৃষ্টি করচেন—হিসেবী তাঁদের উপর চোখ রাঙাচ্চেন, বলচেন, তোমরা আমাদের হিসেব সব গোল করে দিচ্চ, আমরা এতটা লাভ জমিয়ে এনেছিলুম, তোমরা তা মাটি করে দিলে। তারা

ংকার করে জগৎসংসারের লোককে বলচে সাবধান, সাবধান! তারা অঙ্ক কসে—াগ রিয়োগ গুণ ভাগ করে বলচে এই রখ আমরা যা বলচি তা একেবারে নির্ভুল। বেহিসেবী কিন্তু সে কথায় কান দিচ্চে না।

কিন্তু ঐ কটা দল কি সমস্ত বিশ্ব জুড়ে আছে? তা ত নয়। ওদের বাইরে একটু জায়গা আছে যেখান-থেকে আর-একটা বিচার চলছে। সেটা এই যে, যে যা তাকে তাই বলে মেনে নিয়েই বিচার করা। আমগাছ আমই দেয়, কাঁটাল দেয় না, তাতে হয় ত মানুষের লোকসান হচ্চে, তাই নিয়ে ঝগড়া না করে আমের রস-বিচার করাটাই ঠিক বলে একদল রসিক মেনে নিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, এঁরাই পাকা রসিক—কারণ এঁরা রস উপভোগ করে সেই রসের মাধুর্য্য বণ্টন করচেন—রস নিয়ে শুক্‌নো তর্ক করচেন না।

কেউ হয়ত চোখ রাঙিয়ে বলে উঠবেন, তোমরা মূর্খ তাই তর্ক করতে ভয় পাচ্ছ। আমরা তাদের এই জবাব দেব—আচ্ছা বেশ, তোমরা ততক্ষণ তর্ক কর—আমরা যে রসের ভাঁড় হাতে পেয়েছি তাতেই মন ডুবিয়ে রাখি।

* * *

আচ্ছা, মানুষে গল্প শুন্‌তেই বা চায় কেন আর গল্প বলতেই বা এত ব্যস্ত কেন? কেউ কেউ বলেন, গল্প শোনবার মানুষের একটা স্বাভাবিক ক্ষুধা আছে—যেমন তার অন্নের ক্ষুধা, জলের পিপাসা। তাহলে এর পরের কথা হবে এই যে, মানুষ গল্প শুন্‌তে চায় বলেই মানুষ গল্প তৈরি করে। কিন্তু এতে করে কি প্রশ্নের ঠিক মীমাংসাটা হল?

খুব আদিম কালের মানুষের সৃষ্টি-করা গল্পগুলো যদি তলিয়ে দেখা যায় তাহ'লে এই মনে হয় যে, মানুষ মনের দু-রকম তাগাদায় গল্প বলেছে। এক হচ্ছে এই যে, তার প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার লড়ালড়ির ব্যাপারে তাকে যে-সব অসম-সাহসিক কাজ করতে হয়েছে—যে বিপদে পড়তে হয়েছে, বিপদ কাটাতে হয়েছে কিম্বা তাইতে মরতে হয়েচে অথবা এমন-একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখেচে যাতে তার মনকে খুব নাড়া দিয়েছে অর্থাৎ সে নিজে যা করেছে বা দেখেছে সেই-সব তাকে এমন একটা প্রেরণা দিয়েছে যে সে তা বলে তবে যেন নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। ঐ-সব কথা বলবার আগ্রহটা তাদের এত বেশি ছিল যে, যখন ভালো করে ভাষা ফোটেনি তখন থেকেই নানা-রকম ইসারায় তাদের অন্ধকার গুহার মধ্যে যেখানে একটু জায়গা পেয়েছে সেইখানেই ঐ-সব কথা এঁকে এঁকে রেখেছে। তাদের সেই প্রথম জীবনের নূতন অভিজ্ঞতা—নূতন সংশয়, নূতন আনন্দ যা পেয়েছে যেমন-করে পেরেছে প্রকাশ করে তবে ছেড়েছে। কারণ প্রকাশ করাটাই হচ্ছে সত্যকার পাওয়া।

ঐ তো গেল একটা কথা। আর একটা কথা হচ্ছে এই যে, শুধু বাস্তব জীবনে নয়, কল্পনায় যা দেখেছে তার কথাও তারা বলেছে। নতুন চোখ মেলে, মন খুলে এই বিশ্বের প্রতি যখন তারা চেয়ে দেখেছিল তখন এই বিশ্বের বিচিত্র আশ্চর্য্যরূপ, এর

গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এর পীড়ন, এর অত্যাচার, এর স্নেহ চারদিক থেকে তাদের ছেঁকে ধরেছিল। তারই উত্তেজনায় আর নতুন প্রাণের আবেগে তারা পৃথিবীকে লুঠ-করে নেবার জন্যে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু পদে পদে তাদের ঠেকতে হয়েছে—বিশ্বের শক্তি এই চঞ্চল শিশুগুলিকে ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়েছে। ছুটে যাবার পথে প্রকাণ্ড পাহাড় এসে পথ-আগলে দাঁড়িয়েছে, নদী সমুদ্র এসে পথকে খণ্ডিত করে দিয়েছে। যাবো আর নেবো এমনটা হয় নি। এই সব ধাক্কায় তাদের অন্তরে নব নব ভাবের উদয় হয়েছে—কখনো ভাবনা এসে, কখনো ভয় এসে, কখনো সংশয় এসে তাদের চুলের মুঠি ধরে নাড়া দিয়ে গেছে। বিশ্বের একটা অসীম দুর্জ্ঞেয়তা তাদের চারদিক থেকে আচ্ছন্ন করেছে। প্রকৃতির কারণ দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু কার্য্য এসে তাদের সঙ্গে লড়াই দিচ্ছে। তখন তাদের ভয় একটা পাহাড়ের মূর্ত্তি ধরে কিম্বা হিংস্র জন্তুর আকার ধরে মনের মধ্যে বিরাজ করেচে। পাহাড়কে তারা ভয় বলে দেখছে—ভয়ের ছবি আঁকতে হলে তারা পাহাড়কেই এঁকেচে। তার পর, তারা প্রতি পদে ঠেকে শিখেছে যে বিশ্বের যা দেখচি এই সব নয়, —আরো আছে, আরো আছে, আরো আছে! কারণ যখনই তারা একটা জিনিষকে বাগে এনে মনে করেছে এর শেষ করে ফেল্লুম তখনই তার ভিতর থেকে নূতন বেরিয়ে এসে তার চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে—তার সঙ্গে আবার তাকে লড়তে হয়েছে। এমনি করে দুর্জ্ঞেয়তার অন্ত না পেয়ে তার বিশ্বাস হয়েছে—আরো আছে। বাস্তবের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই আরো-আছের বিশ্বাস মিলে তার কল্পনাকে জাগিয়ে তুলেছে। এই কল্পনাকে লাভ করে সে যেন আর একটা নূতন জগতের পরিচয় লাভ করলে—তাকে যে পেলে। এই পাওয়ার গল্প তখন সে বলতে আরম্ভ করলে। তখন যে বাস্তব জীবনের গল্প একেবারে থেমে গেল তা নয়। ক্রমে কল্পনার সঙ্গে বাস্তব মিশল, বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশল, এবং ক্রমে হয় ত কল্পনাও বাস্তব হয়ে দাঁড়াতে লাগল।

* * *

মানুষ তখন যে জন্যে গল্প বলেছে আমার মনে হয় এখনকার মানুষ ঠিক সেই জন্যেই গল্প বলে। এখনও মানুষের কাছে পৃথিবী পুরাতন হয়ে আসে নি—এখনও সেই দুর্জ্ঞেয়তার মায়া তাকে প্রতি দিন আচ্ছন্ন করচে—সে এখনো বিস্মিত হচ্ছে, এখনো ভয় পাচ্ছে, এখনও বাধা দেখচে। তবে অবশ্য বলবার কথা, বলবার ধরণ এখন আলাদা হয়ে গেছে—কারণ সে জীবন এখন নেই। এখন অনেক মোটা জিনিষ ঝরে গিয়ে সূক্ষ্মের দিকেই মানুষের মন যাচ্ছে।

মানুষের মন-থেকে এখনও কল্পনার জগত সরে যায় নি—একেবারে আজগুবি কল্পনাকে সে আমোল দিতে পারচে না বটে কিন্তু সে সম্ভাবনাকে অস্বীকার করচে না। সেই জন্যে গল্পের স্রোত বেড়েই চলেছে। ঠিক যে-মানুষটি চোখের সামনে দেখা যায় তার কথা না বলেও

যে-মানুষটি হতে-পারে এমন মানুষকে সৃষ্টি করে তার কাহিনীও বলা হচ্ছে। তার জন্যে তাকে নিন্দা করলে চলবে না; কারণ সে সৃষ্টি করচে—যা সম্ভাবনায় আছে তাকে সম্ভব করে তুলছে—এই সম্ভাবনার মানুষটি রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে নিশ্চয় একদিন দেখা দেবেন। দুনিয়ায় এমন-তর যে ঘটেনি তা নয়।

এই সম্ভাবনাকে মানুষ অস্বীকার করছে না বলেই তার চলার পথ খোলা আছে। তার জ্ঞানের কাজ, বিজ্ঞানের কাজ, তার সাহিত্য, শিল্প থেমে যায়নি। কোনো সমালোচক যদি এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতে বলেন তাহলে জানব সে মানুষের মহা শত্রু।

* * *

মানুষ এমনি করে সাহিত্য শিল্প জ্ঞান বিজ্ঞান সৃষ্টি করে চলেছে। তার সৃষ্টির ফল নিয়ে খাতাঞ্জির দল বড়-বড় হিসেবের খাতা খুলে মনুষ্য-জাতির লাভ-লোকসানের হিসেব কস্‌চেন। সেটাকে আমি মন্দ বলি না। সেটার হয়ত দরকার আছে। কিন্তু সৃষ্টির তাৎপর্য্যই যে তাই এ কথা আমি মানি না। মানুষ এই পৃথিবী থেকে যে রস পেয়েছে সেই রস সে অন্য-আকারে ফিরিয়ে দিয়েছে—তাইতে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন গাছ মাটি-থেকে রস নিয়ে ফলের মধ্যে দিয়ে সেই রস পৃথিবীতে বিতরণ করে। সেই ফল বেচে হয় ত মালির লাভ হতে পারে কিন্তু গাছ যে সে-জন্যে ফল দেয়নি এটা ঠিক। তেমনি সাহিত্য-বাগানের মালিরা যদি পারেন সাহিত্যের ফল থেকে দুপয়সা লাভ করুন তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু যদি বলা হয় ঐ লাভের জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তাহলে বলতেই হবে তা নয়। সাহিত্য জন্মগ্রহণ করেছে রস আত্মসাৎ করে এবং তার কাজই হচ্ছে রস বিতরণ করা। তাহলে বলতে হয়, সাহিত্যের বিচার হিসাবের খাতা দেখিয়ে নয়—জগতে কি উপকার হল, না হল, তা খতিয়ে নয়, —তার রস বিচার করে।

খোলা জানালায়

জানালা খুলে বসে আছি, তার নীচের ঝিলমিলগুলিও তোলা আছে। দেখতে পাচ্ছি সম্মুখের সবুজ মাঠ, তাও বারন্দার সিঁড়ির ব্যবধানে মাঝে মাঝে খণ্ডিত, ছোট ছোট গাছপালার হেলাদোলা, পাশের বাড়ীর ছাদের মাথা, দোতলার খোলা জানালার দুধারের দুই রং, একদিকে ধূসর অন্যদিকে সবুজ—ছাদের কার্ণিশ হতে তারি উপর আমাদের বাঙ্গালী বাড়ীর বিশেষ নিদর্শন, একখানি রাঙা-পেড়ে গঙ্গাজলী ডুরে শাড়ী কেবলি উড়ে এসে পড়ছে, নেতিয়ে পড়ে, উঠে আবার উড়ছে, কখনো তার ভঙ্গী উদ্যত-ফণা ফণিনীর মত ইঙ্গিতে গৃহিণীর অপ্রতিহত প্রভাব ব্যক্ত করছে।—

আবার কখনো-বা বাতাসের তাড়নায় ঘূর্ণীপাকের মত কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছে, সাদা আর রাঙার পাকে জড়িয়ে দড়ার মত হয়ে যাচ্ছে, তিনি যে এই সংসারে মায়ার কি নাগপাশে জড়িয়ে আছেন, তাই যেন জানাচ্ছে। আরো দূরে দেখতে পাচ্ছি বড় বড় উঁচু গাছের মাথা, কোনটি ছত্রাকার, কোনটি ফোয়ারার উচ্ছ্বাসের মত উপরে উঠে, নীচের দিকে গোল হয়ে ঘিরে ঝরে পড়ছে। একটি আমগাছের মাথার আত-পত্রে নূতন সবুজ আর কচি রাঙা পাতার বাহার! তারি পাশে অশ্বত্থগাছে অসংখ্য পাতা, সবে গজিয়েছে, কচি দুর্ব্বার মত একটুখানি পীতাভ হরিত; তারা কেবলি নাচছে! ছোটছেলে পা-জড়' করে যেমন লাফিয়ে ওঠে, কিম্বা কলের পুতুলের কল টিপলে সে যেমন চট করে চোখ খোলে, তেম্নি হঠাৎ গতি, এ পাতা যখন উল্টে পড়ে তখন সেই পুতুলের খোলা চোখের মত চকিত সাদা দেখা যায়! তারপর মস্ত একটা গাছের মাথা, তার পাতার চুলের উড়ে-পড়া, দোলা, ছড়িয়ে যাওয়া, কিছুই ভিন্ন করে দেখতে পাচ্ছিনে, সব নেপ্‌টে আছে, আমাদের হাল-ফেশানের "পাতা-কাটা" কেশ-সজ্জার মত;—একটি বড় ডাল এধারে ওধারে ধীরে ধীরে দুলছে, কে-যেন বড় লজ্জা করে ঘাড় নাড়াচ্ছে, বলছে "না, না, দোহাই তোমার"!

এর পরই পৃথিবীর সম্পর্ক ঘুচল, শুধু আকাশ দেখতে পাচ্ছি, মেঘে মেঘে ছয়লাপ; নীল যে কোথায় ছিল তার আর কোন নাগালই পাওয়া যাচ্ছে-না। কিন্তু এই ধূসর মেঘগুলির রং গাদা-করা ছাই ঢিপির মত নয়, এর মধ্যে বেশ এ তেজ আছ, ইস্‌পাতের মত, তীক্ষ্ণ আলো সম্ভাবনা সঙ্গোপনে পোষণ করে রেখেছে দিগন্তের নুয়ে-পড়া অংশ বেয়ে মেঘ কেব উঠে আস্‌ছে, রাশি রাশি, সারি সারি ধূসর আর ধবল। কখনো আবার বাতাসে প্রবল আবেগে একেবারে সব পরদা উড়ে উঠছে, তখনই আকাশের সুনীল চোখে স্বচ্ছ চাহনি আর তারি উপর আলো হাসি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই আলো লীলা, খোলা চোখের চাহনি চকিতে মিলিয়ে যাচ্ছে, ধূসরের পরদা সরসরিয়ে নেমে আসছে; আলোর আশা গেলেও তা স্মৃতিটুকু ত ফুরোচ্ছে-না। একটি চিল আবর্ত্তের মত ঘুরতে-ঘুরতে শূন্যপথে অবর্ত্তমান আশ্রয়ের প্রত্যাশায় উঠছে কেবলি উঠছে। ডানাদুটি তার যতদূর সম্ভব সটান করে ছড়িয়ে দিয়েছে, আগ্রহে আর অন্ত নাই, কিন্তু এই নিরুদ্দেশ যাত্রা শেষ যখন আর দেখতে পাবে না, তখন তার নেমে-আসা, নিঃশেষিত-আলো উল্কা পিণ্ডের খসে-পড়ার মতই হবে। কা কখনো একা, কখনো সঙ্গীর সঙ্গে উড়ে চলেছে, উপরের দিকে নয়, কখনো পূর্ব্ব হতে পশ্চিমে, কখনো-বা উত্তর হতে দক্ষিণে, বাতাসের সমুদ্রের বুকে সাঁতার দিয়ে চলেছে, তাদের পাখার আন্দোলন হাতছানি দিয়ে আহ্বান-সঙ্কেতের মত! তারা পৃথিবীর গাছপালার মাথার উপরে খুব যে বেশীদূর ছাড়িয়ে যাচ্ছে তা নয়, উড়ছে আবার গাছের আগায় এসে বসে

ছে! এদের কাক-চক্ষু আকাশের নীলে না, কিন্তু সে দৃষ্টি পৃথিবীর মুখের দিকেই ত; আর ঐ চিলের চক্ষুদুটি আগুনের দল স্ফুলিঙ্গের মত,—উড়ে ওঠা আর সে পড়াই যার ব্যবসায়। ভুঁয়ে-চরা াখীদের আজ খবর নাই, তারা আকাশের াবগতিক, গম্ভীর দৃষ্টি, বাতাসের পালাই-ালাই ভঙ্গী, এলোমেলো চলাফেরা, আর থিবীর অন্ধকার মুখ দেখে, ঘর ছেড়ে বেরোনটা উচিত মনে করেনি। চটুল চড়াই ছাদের কার্ণিশের নীচে হতে, বারান্দার কোণার বাসা হতে চট করে এক-একবার নেমে, কিছু খুঁটে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তবু কিন্তু কোকিলের ডাকের বিরাম নাই, সেই রাঙা-আঁখি বিরহী পাখীটির পক্ষে কি আলো-করা, কি মেঘলা দিন দুইই সমান। তার মনের চিরক্রন্দন তো কিছুতেই শান্তি মানতে চায়-না। বাতাস গাছপালার পাতায় পাতায় যে মর্ম্মরধ্বনি সঞ্চার করে যাচ্ছে, তাও অফুরাণ। পৃথিবীর বুকে শিকড়ের শিকল দিয়ে বাঁধা এই যে স্থাবর, এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অঙ্গুলির সব ভঙ্গিমাই, হাওয়ায় উড়ে-চলা পতঙ্গ, পাখী আর মেঘের মত! পরাধীন শৃঙ্খলায়ত্তের মনের মধ্যে ছাড়া পাবার, স্বৈর বিচরণের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা—অভিশপ্তের অকাল মুক্তি-প্রয়াসের মত, কেবলি ব্যর্থ হাহাকারে আর নিরন্তর দীর্ঘনিশ্বাসে আপনাকে ব্যক্ত করছে!

এতক্ষণ যে মেঘমালা কেবলি উড়ে উঠছিল, এখন তারা স্থির হয়ে আপনাদের স্তূপে আর স্তম্ভে পরিণত করেছে, বাতাস তাদের আর টলাতে পারছে না। তাদের দুর্ভেদ্য পর্ব্বতশ্রেণী মনে করতে বাধা নাই, বিদ্যুৎ হঠাৎ চমকে উঠে তীক্ষ্ণ অঙ্গুলি দিয়ে চিরে চিরে ফাটল ফুটিয়ে দিয়ে গেল, সেখানে ফাঁকে ফাঁকে ধূসরের নিবিড়তা লঘু হয়ে এল, মনে হচ্ছে বহুদূর হতে পাহাড়ের গা বেয়ে ক্ষীণ জলধারা বয়ে আসছে; গিরিরাজের স্বর্ণ উপবীতের মত!

মেঘ উড়ে চলে বটে কিন্তু একা থাক্‌তে চায়-না, যেখানেই একজনের দেখা পাওয়া গেল, অম্নি সঙ্গে-সঙ্গে আরো দশজন এসে জমে যায়, এরা গলাগলি করে চলে, এদের মধ্যে বড়-একটি উদার হৃদ্যতার ভাব আছে, কোন ব্যবধানই রাখে না, মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। পাখীরাও ঝাঁক বেঁধে একত্রে উড়ে চলে বটে, কিন্তু তাদের ডানার ব্যবধান এক হতে দেয় না। এদের বাষ্পের ডানা স্পর্শমাত্রে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে, কোন বাধাই রাখে না, এমন-কি আকারেরও নয়, যার সঙ্গে মিল্‌তে চায় তার সঙ্গে শুধু অর্দ্ধাঙ্গ নয়, একেবারে সর্ব্বাঙ্গে অভিন্ন হয়। জানি, মেঘ আকাশের পথেই, বাতাসে ভর করে উড়ে আসে, তবু যখন দূর দিগ্বলয়ের সীমা হতে তাদের আস্‌তে দেখি, তখন বোধ হয় কোন অতল ফুঁড়েই উঠে আস্‌ছে—এরা যে সমুদ্রের বাষ্প হ'তে জন্মগ্রহণ করেছে সেইটি আভাষে প্রকাশ করে বোধ হয়। আকাশ-লোকের এই কামচারীদের কখনোই নিঃসঙ্গ দেখা যায় না, তাই শরতের বারিহীন, শুভ্র, লঘু, একক, এক-একখানি মেঘকে অপার আলো আর অন্তহীন

নীলিমার বুকে ভেসে যেতে দেখেও কেমন দুঃখ হয়। অমন আনন্দের মধ্যেও সে যেন উদাস হয়ে, অন্যমনস্ক ভাবে চলে।

স্তম্ভ এবং স্তূপ দাঁড়ায় না, বাতাসের বার বার ঠেলা পেয়ে টলতে আরম্ভ করেছে —ভেঙে পড়ে আর-কি! এরা যদি ইষ্টক প্রস্তরের নির্ম্মাণ হত, তাহলে চারিদিক ছেয়ে চূণ-বালির ধূসর রাবিশ ঝরতে আরম্ভ করত, কিন্তু এরা যে বাতাসের আবেগে উড়ে-আসা বাষ্পের প্রয়াস, উত্তাপের অভিমান, যখন ভাঙন ধরল তখন চা[ধারে বৃষ্টিধারার বর্ষণ আরম্ভ হল, যে ঝাপসা হয়ে এল, এ অশ্রুজলের অভি[আমার খোলা জানালা দিয়ে, ছোট্ট খানির ভিতর প্লাবন বহিয়ে দিলে। তো স্থির হয়ে বসে ছবি-আঁকা নয়, বিনিয়ে-বিনিয়ে কথা কওয়াও হল সেই সঙ্গে সব দুয়ার-জানালা করে অন্ধকারের অধিকার প্রচার হয়ে গেল অতএব দেখাও শেষ!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

গ্রেফ্‌তার

(গল্প)

আষাঢ় মাস। সারারাত্রি বর্ষণের পর ভোরের দিকে আকাশ বেশ ধরিয়া গিয়াছে। পথে এক-হাঁটু জল ভাঙ্গিয়া লোক চলিতে সুরু করিয়াছে।

বেনেটোলায় এক মেসের কক্ষে তক্তা-পোষে বিছানার উপর কুমুদ চৌধুরী বসিয়াছিল। ঘরের কোণে ছোট একটা টেবিল, টেবিলের পাশে চেয়ার। চেয়ারের গায়ে একটা আধ-ভিজা পাঞ্জাবি শুকাইতেছে। টেবিলের উপর কালি-কলম, কেতাব-কাগজ হইতে আরম্ভ করিয়া—টুথ পাউডারের কৌটা, সাবানের বাক্স, আর্শি-চিরুণি এবং 'হাওয়াগাড়ী' সিগারেটের খোলা প্যাকেট অবধি—সবই বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো। টেবিলের কিছুদূরে আর-একখানা তক্তাপোষে বিছানা পাতা —সে বিছানায় শুইয়া সতীশ। তাহার তখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই।

কুমুদের চোখ দুইটা লাল—দেখিলে মনে হয়, কাল রাত্রি-জাগরণ গিয়াছে। কুমুদ উদাসভাবে খোলা জানালার পানে চাহিয়াছিল। জানালা দিয়া রাস্তা দেখা যাইতেছিল।

কুমুদের বাড়ী রাজসাহীতে। আইনের প্রথম পরীক্ষা দিবার জন্য সে কলিকাতায় আসিয়াছে। কলিকাতায় তাহার জানা অপর কোন আস্তানা না থাকায় সে আসিয়া সতীশের মেসে উঠিয়াছিল। সতীশের সহিত তাহার পাঁচ বৎসরের আলাপ। রাজসাহী কলেজে দুইজনে একসঙ্গে আই, এস্, সি পড়িত—এখন সতীশ মেডিকেল কলেজের ছাত্র।

কাল কুমুদের পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। রাত্রে সতীশের সহিত সে থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল—রাত্রি সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত থিয়েটারে থাকিয়া অবশেষে অসহ্য বোধ হইলে, দুই বন্ধুতে অতিকষ্টে একটাকায় একখানা থার্ড ক্লাস গাড়ী ভাড়া করিয়া বাসায় ফিরিয়াছে। আজই কুমুদের বাড়ী ফিরিবার কথা। সেখান হইতে শ্বশুরবাড়ী গিয়া আবার স্ত্রীকে আনিতে হইবে। সম্মুখে অম্বুবাচী —অম্বুবাচী কাটিলে তার পর সাতদিন আর কোথাও যাত্রা করিতে নাই। গত ফাল্গুন মাসে তাহার বিবাহ হইয়াছে—স্ত্রীর সহিত বিবাহের পর আর দেখা হয় নাই—তবে কয়মাসে চিঠির মারফত দুইজনের মধ্যে প্রণয়টুকু খুবই গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। শেষ পত্রে স্ত্রী নীহার লিখিয়াছে, "তোমার এগ্‌জামিন হয়ে গেলেই যদি এখানে না আস, তাহলে আড়ি—আড়ি—আড়ি!"

বসিয়া বসিয়া কুমুদ সেই কথাই ভাবিতেছিল। তাহার ভারী হাসি পাইল। নীহার নেহাৎ ছেলেমানুষ! মনটা তাহার অত্যন্ত সরল! সে ভাবে, সে-ই শুধু কুমুদকে দেখিবার জন্য অস্থির! কুমুদের যেন সেদিকে মোটে আগ্রহই নাই! পাগল! সে ত জানে না, কতকাল আশায় আশায় কাটাইয়া কত দীর্ঘ দিনের বিরহ-তপের শেষে কুমুদ নীহারকে পাইয়াছে! কত সাধের ধন সে! কুমুদ একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া টেবিলের উপর হইতে গতরাত্রের থিয়েটারের প্রোগ্রামখানা টানিয়া সেটার উপর চোখ বুলাইতে লাগিল।

এমন সময় সতীশ ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিল, গাঢ়স্বরে কহিল, "কতক্ষণ উঠেছ হে?"

কুমুদ কহিল, "এই উঠছি।"

সতীশ জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, রাস্তার পানে চাহিয়া কহিল, "যাক্, বৃষ্টি ধরেছে তাহলে। কিন্তু পথে—ওঃ, এখনো যে বেশ জল জমে রয়েছে!"

কুমুদ কহিল, "তাইত ভাবছি, বাজার-টাজার কতকগুলো আবার করতে আছে! আজই দার্জ্জিলিং মেলে আমায় বেরুতে হবে—কি করে যে কি হয়!"

সতীশ তাচ্ছল্যের ভাবে কহিল, "কোন ভাবনা নেই। চল না, এই চা খেয়েই বেরিয়ে পড়া যাক্। এখান থেকে গাড়ী করে প্রথমেই মিউনিসিপাল মার্কেটে গিয়ে কাজ সারা! ততক্ষণে চাঁদনির দোকানগুলোও খুলে যাবে; ব্যস্—কত জিনিষ কিনবে, কেনো না! কলকেতার সহরে আবার জিনিস কেনবার ভাবনা!"

কুমুদ একটু চিন্তিত স্বরে কহিল, "আবার না বৃষ্টি নামে!"

সতীশ কহিল, "না হে না, রোদ উঠেছে —আকাশ পরিষ্কার হয়েছে! হাঁ, তোমার ফর্দ্দটা তাহলে ঠিক করে রাখো।"

কুমুদ কহিল, "সে ঠিকই আছে। তারপর ফিরে এসে সব গুছিয়ে ফেললেই হবে।"

সতীশ তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "তোমার কোন ভাবনা নেই হে। সব হয়ে যাবে।"

মাথা একটু নীচু করিয়া কুমুদ কহিল, "ক'খানা বাঙলা বই আবার কেনবার ইচ্ছে আছে।"

সতীশ কহিল, "বেশ ত—ফেরবার মুখে ট্রাম থেকে নয় সুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়েই একদম নামা যাবে!" তার পর একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, "এগুলো অন্ হার ম্যাজেষ্টিস্ সার্ভিস, বুঝি! ভালো কথা, আজ তোমার চিঠিগুলি দেখতে হচ্ছে।"

ঈষৎ লজ্জামিশ্রিত স্বরে কুমুদ কহিল, "তার আর কি!"

"তাহলে নাও, মুখ-হাত ধোও—আমি চায়ের জোগাড় দেখি" বলিয়া সতীশ ষ্টোভ্ জ্বালিতে বসিল।

২

সতীশের ঘরেই প্রত্যহ চায়ের আসর বসে। একে একে ক্রমে আরও পাঁচ-সাতটি যুবক আসিয়া সতীশের ঘরের তক্তাপোষ দুইখানি অধিকার করিয়া বসিল।

চা খাইতে খাইতে জিতেন দাস কুমুদকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আজই তাহলে আপনি বাড়ী চলেছেন?"

কুমুদ তাহার পল্লী-সুলভ সরল সুরে কহিল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"দার্জ্জিলিং মেলে?"

কুমুদ কহিল, "হ্যাঁ। ঐটেতেই সুবিধে কি না!"

তিনকড়ি কহিল, "কিন্তু দুদিন আরো থেকে গেলে হত না, মশায়?"

সতীশ কহিল, "তোমার মত নাম-কাটা সেপাই নয় ত! নতুন বিয়ে হয়েছে এই সে দিন, এগ্‌জামিনের পাঁচিল ভাঙ্‌ল—আর উনি বলেন, দুদিন থেকে গেলে হত না, মশায়!"

তিনকড়ি হাসিয়া কহিল, "তাহলে ক চাইছি।"

জিতেন দাস কহিল, "আপনা রাজসাহীর বার্ কেমন? আমরা গেলে হয়-টয়?"

জিতেন সত্য ল পাশ করিয়া পু কোর্টে বাহির হইতেছে। পসার যত আর না হৌক, তাহার টিপ্পনীর জ্বালায় সকলে অস্থির। হুল ফুটাইবার এমন সু পাইয়া নিয়োগী কহিল, "তোমার এ এমন চলছে, বল, তুমি আবার রাজ ছুটবে কি দুঃখে?"

জিতেন অপ্রতিভভাবে কহিল, "না, কথার কথা বলছি!"

নিয়োগী কহিল, "তার চেয়ে কুমুদবা আপনি বরং পাশ-টাশ করে এখানে পুলিশ কোর্টে বেরুবেন। জিতেনের জুনি করে যা পাবেন, তা অন্যের পর্ব্বত

ব্যঙ্গের মর্ম্ম বুঝিয়া জিতেন কথার স্রো ফিরাইল, কহিল, "কাল থিয়েটার দেখলে কেমন, বলুন।"

কুমুদ সলজ্জ হাসির সহিত কহিল, "ম নয়।"

এমন সময়ে যোগেশ একখানা খবরে কাগজ হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিল, ও জিতে দাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ওহে জিতেন, তোমার একটা কেশ্ 'থাণ্ডারে' রিপোর্ট হয়েছে যে—"

জিতেন কাগজখানা দেখিয়াই ব্যাপার বুঝিয়াছিল। দালালের বিস্তর মন জোগাইয়া কাল কোর্টে সে একটা কেশ্ পাইয়াছিল এবং মেশে 'থাণ্ডার' লওয়া হয় বলিয়া রিপোর্টারকে

জের ব্যয়ে টিফিন খাওয়াইয়া থাণ্ডারের জন্য হার রিপোর্টটাও সে লিখাইয়া দিয়াছিল। ন্তু মুখে সে এমন ভাব দেখাইল, যেন হাতে তাহার মোটেই হাত নাই; আর বই এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। সে কহিল, কোন্ কেশ্‌টা রিপোর্ট করলে?"

নিয়োগী কহিল, "কাল ক'টা কেশ্ করেছ?"

জিতেন অম্লান বদনে কহিল, "কাল একটু heavy file ছিল।"

তিনকড়ি কহিল, "পড়ই না চেঁচিয়ে—"

যোগেশ পড়িতে লাগিল,

A LENIENT JUDGMENT!

One week for a lota!

One Abdul was placed before the Chief Presidency Magistrate for trial on a charge of having committed theft in respect of a brass *lota* belonging to one Ganga Kahar. He was caught red-handed. Babu Jitendrakumar Das, Pleader appeared for the accused. The learned pleader admitted the charge and prayed for mercy. The Magistrate convicted the accused to undergo one week's rigorous imprisonment."

ঘরশুদ্ধ সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিয়োগী কহিল "এই! আমি ভেবেছিলুম, জিতেন দাস আমাদের মস্ত কি ল' পয়েণ্ট argue করেছে, তারই রিপোর্ট বেরিয়েছে!"

জিতেন লোকটার সহ্যগুণ অদ্ভুত। কিন্তু সব বিষয়েরই একটা সীমা আছে! আজিকার বিদ্রূপ সে সীমা পার হইয়াছিল। তাহার প্রসার-প্রতিপত্তি লইয়া মেসে ঠাট্টা-বিদ্রূপ প্রায়ই সকলেই করিয়া থাকে এবং সে-ও ঔদাসীন্যের অটল বর্ম্মে চির দিনই আপনাকে দুর্ভেদ্য রাখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ এ বিদ্রূপে সে বিচলিত হইল। একজন অপরিচিত যুবার সম্মুখে—বিশেষ যে আইন-পরীক্ষার্থীরূপে দুইদিনের জন্য মেসে আসিয়াছে—তাহার সম্মুখে আইন-ব্যবসায়-ঘটিত এ বিদ্রূপ নিতান্তই অপমানসূচক বলিয়া তাহার মনে হইল। সে রাগিয়া বলিল, "খবরের কাগজের কেশের রিপোর্টে কবে আর ল' পয়েণ্ট বেরিয়েছে, শুনি! ও ত আর ল' রিপোর্ট্‌স্ নয়।"

চায়ের পেয়ালা রাখিয়া রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে জিতেন সিগারেট্ ধরাইল।

৩

হাসির রোল তখনও থামে নাই—কুমুদও সে কৌতুক মৃদু হাস্যে উপভোগ করিতেছে, এমন সময় এক বিঘ্ন ঘটিল। গম্ভীর মুখে এক আগন্তুক সেই কক্ষের দ্বারে আবির্ভূত হইলেন। আগন্তুক সকলেরই অপরিচিত; তাঁহার পিছনে আবার মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধা এক পুলিশের জমাদার।

দিন-কালের কথা মনে করিয়া যুবকের দল ঈষৎ বিচলিত হইল। জিতেনই সাহস করিয়া প্রথমে কথা কহিল। সে কহিল, "কি চান মশায়?"

আগন্তুক চারিধারটা একবার চকিত দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "এটা ত মেশ?"

তিনকড়ি কহিল, "হাঁ।"

আগন্তুক কহিলেন, "এ মেশে কুমুদনাথ চৌধুরী বলে সম্প্রতি কেউ এসেছেন?" কুমুদের বুকটা মুহূর্ত্তের জন্য স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সকলেই বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিল। কুমুদ কহিল, "আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী।"

"আপনার বাড়ী রাজসাহীতে?"

"হাঁ।"

"আপনি প্রিলিমিনারী ল' এগ্‌জামিন দিতে এখানে এসেছেন?"

"হাঁ।"

"আপনার পিতার নাম অচিন্ত্যনাথ চৌধুরী?"

"হাঁ।"

"আপনি বিবাহ করেচেন হিঙ্কিংড়ের ভুবন সান্যালের মেয়েকে?"

কুমুদের মুখ ক্রমেই শুকাইয়া আসিতেছিল। তাহার সম্বন্ধে এত সংবাদ এ পুলিশের লোক রাখিতে গেল কেন? বুকে কে যেন মুগুরের ঘা মারিল। শেষ প্রশ্নের উত্তরে কোনমতে "হাঁ" বলিয়া সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। সতীশ পাথরের মত নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছিল। বিস্ময়ে ভয়ে আর-সকলের চৈতন্য-লোপের উপক্রম হইয়াছিল। জিতেন শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কুমুদকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। এই শান্ত ভালমানুষ ছোকরাটির মধ্যে এতখানি রহস্য লুকানো ছিল! আশ্চর্য্য!

আগন্তুক কহিলেন, "আপনাকে তবে সব কথা খুলেই বলি। আমি পুলিশের লোক, অর্থাৎ সি, আই, ডির ইনস্পেক্টর। গবেশগঞ্জের ডাকাতি মামলার সঙ্গে আপনার নাম পাওয়া গেছে। আমরা তাই আপনাকে খুঁজছি—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কুমুদের চোখ ছল-ছল করিয়া উঠিল—জড়িত স্বরে সে কহিল, "কিন্তু গবেশগঞ্জ কোথায়, তা আমি জানিনে মশায়।"

আগন্তুক হাসিয়া কহিলেন, "আগে শুনুন সব, তারপর বুঝে জবাব দেবেন। বিস্তর খোঁজের পর শেষ খবর পাওয়া গেল আপনি এখানে আছেন। তাই বড় সাহেবের হুকুমে এখানে এসেছি—আপনাকে এখন আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

"কোথায় যেতে হবে?"

"আপাতত বড় সাহেবের কাছে।"

"তার পর?"

"তার পর কি, সে বড় সাহেবই জানেন। তিনি যা হুকুম করবেন, তাই হবে।"

মেস-শুদ্ধ সকলের মুখ শুকাইয়া গেল। সকাল বেলায় এ কি বিভ্রাট! জিতেন দাস আইন-কানুন জানে, ব্যবসায়ে উকিল—সে রাগিয়া গেল সতীশের উপর। দেখ দেখি, কোথা হইতে এক বন্ধুকে আনিয়া বাসায় তুলিল, এক পোলিটিকাল কেশের আসামী! এখন তাহার সঙ্গে এই পোলিটিকাল কেশে পড়িয়া সকলকেই সাত ঘাটের জল খাইয়া ফিরিতে হইবে। ফিরিতে পাইবে, তাহারই বা ঠিক কি! কে জানে, কোথা হইতে কোন্ আসামী কি এক মিথ্যা জালে জড়াইয়া দিবে! সে সন্তর্পণে ঘর হইতে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। আগন্তুক তাহা বুঝিয়া অত্যন্ত বিনয়ের সহিত কহিলেন,

"আপনারা কেউ সরে যাবেন না। তাহলে আমায় অভদ্রতার অপরাধে অপরাধী হতে হবে।"

জিতেন অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আজ্ঞে না, আমি যাইনি কোথাও—একটা সিগারেট ধরাচ্ছিলুম।"

"সিগারেট! তা এই নিন্ না, আমিই দিচ্ছি।" আগন্তুক রৌপ্য-নির্ম্মিত সুদৃশ্য কেশ হইতে সিগারেট বাহির করিয়া জিতেনের হাতে দিয়া কহিলেন, "দেশলাই চাই?"

"না, দেশলাই আছে।" বিজয়-গর্ব্বে জিতেনের মুখ সস্মিত হইয়া উঠিল। এত লোক থাকিতে পুলিশ তাহাকেই সিগারেট দিয়া খাতির করিয়াছে! সে উকিল কি না! কিন্তু এ গর্ব্ব অধিকক্ষণ টিঁকিল না। ইনস্পেক্টর বাবুটি সকলের সম্মুখেই কেশ ধরিয়া সবিনয়ে কহিলেন, "আপনারা কেউ যাচ্ছে করেন?" কুমুদকেও এ প্রশ্ন করা হইল।

সতীশ নিষ্ফল ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ইনস্পেক্টরের পানে চাহিল। ভাবিল, লোকটা পাকা পুলিশ! মুখে কি চমৎকার ভদ্রতাই দেখাইতে পারে! আসিয়াছে ত এক নিরপরাধ যুবাকে গ্রেফ্‌তার করিতে, তাহাকে আবার সিগারেট দেওয়াটুকু আছে! ইহাকেই না বলে, মিছরির ছুরি!

সকলেই ধন্যবাদের সহিত সিগারেট উপহার প্রত্যাখ্যান করিলে ইনস্পেক্টর বাবু কহিলেন, "এখন আমি কুমুদবাবুর বাক্স তোরঙ্গ সার্চ্চ করতে চাই। আপনাদের মধ্যে দুজনকে সে সার্চ্চে সাক্ষী থাকতে হবে। আপনি রাজী আছেন?" বলিয়া তিনি সতীশের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। সতীশ বলিলেন, "মাপ করবেন।"

"আপনারা?"

কেহই সম্মত হইল না। ইনস্পেক্টর বাবু হাসিয়া কহিলেন, "দেখুন, এতে কোন গোল নেই! আর আপনারা রাজী না হলে আমায় অগত্যা বাইরে থেকে লোক আনতে হবে। আপনারা এই সব সার্চ্চে সাক্ষী হতে চান্ না, কাজেই বাধ্য হয়ে আমাদের বাইরে থেকে লোক আনতে হয়—আর আসামীর উকিল এই নিয়ে মহা-আস্ফালনে এই point-এ আমাদের জেরা করেন! অথচ দেখুন, সাধ করে কি আমাদের বাইরের লোক ধরতে যেতে হয়!"

জিতেন খুব মুরুব্বির ভঙ্গীতে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সকলে অবাক হইয়া গেল। এই বিপদেও উহার মুখে হাসি আসে! আশ্চর্য্য! জিতেন কহিল, "এতে আর দোষ কি! আচ্ছা, আমি রাজী আছি। নিন্ মশায়, করুন সার্চ্চ। তোমরা আর-একজন কেউ এসো না হে! সতীশ, তুমিই এসো—আমি বলছি, এতে কোন ভয় নেই। আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো।"

ইনস্পেক্টর বাবুর উপর যত-কিছু আক্রোশ ছিল, সে সমস্ত জিতেনের উপর বর্ষণ করিয়া তীব্র স্বরে সতীশ কহিল, "সাক্ষী দিয়ে পয়সা-রোজগারের মতলব যার থাকে, স্বচ্ছন্দে সে গিয়ে সার্চ্চ লিষ্টে সই করুক্। আমার অত পয়সার খাঁকতি হয় নি!"

ইনস্পেক্টর বাবু কহিলেন, "নিন, তাহলে আপনিই একজন সাক্ষী হোন, আর

একজনকে আমার জমাদার বাইরে থেকে ডেকে আনুক, না হয়!"

জমাদার লোক ডাকিতে গেলে ইনস্পেক্টর বাবু একখানা ছোট পকেট বুক বাহির করিয়া মেশে কে-কে আছে, কিজ্ঞাসা করিয়া সকলের নাম তাহাতে লিখিয়া লইলেন। লোক আসিলে কুমুদের ট্রাঙ্ক খোলা হইল। ভিতরে ছিল, কয়েকখানা কাপড়, জামা, উড়ানি, এসেন্সের শিশি, ফুলেল তেলের বোতল, আর্শি, চিরুণি, Ancient Law, Jurisprudence, Roman Law প্রভৃতি কয়খানা আইনের কেতাব, রবিবাবুর গানের বহি একখানা ও একতাড়া চিঠি। ইনস্পেক্টর বাবু চিঠির তাড়া লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কুমুদ সজল নেত্রে কহিল, "ওগুলো মশায়, প্রাইভেট্—আমার স্ত্রীর চিঠি!"

ইনস্পেক্টর কহিলেন, "সবগুলোই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কখানা আছে?"

"খান পঞ্চাশেক হবে।"

"পঞ্চাশখানাই স্ত্রীর চিঠি!" ইনস্পেক্টর বাবুর ঠোঁটের কোণে অল্প হাসি ফুটিল। হাসিয়া তিনি কহিলেন, "আপনার বিবাহ হয়েছে কদ্দিন?"

এ প্রশ্নে কুমুদের মনখানা ঝড়ের ধাক্কায় জীর্ণ গৃহের মতই একেবারে ভূমে লুটাইয়া পড়িল। এ প্রশ্নে চকিতে তাহার নীহারের মুখ মনে পড়িল। আহা, অভাগিনী বালিকা! বড় আশা করিয়া সে বসিয়া আছে—কবে কুমুদকে দেখিবে! এ দেখা কবে হইবে? সারা জীবনে আর হইবে কি! কে জানে, কোথা হইতে কি প্রমাণ আসিয়া নয়কে হয় করিয়া দিবে! দুইজনের মধ্যে দারুণ ব্যবধান ঘটাইয়া তুলিবে! হয় ত এ জীবনে মোটেই আর দেখা হইবে না। তাই যদি কথাটা শুনিলে ইঁহার মনে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি জাগে, ইহাই ভাবিয়া কুমুদ কহিল, "পাঁচ মাস।"

"পাঁচ মাসে পঞ্চাশখানা চিঠি! বলেন কি! আপনি ত তাহলে ভারী ভাগ্যবান দেখ্‌চি!" ইনস্পেক্টরের বিদ্রূপে সকলে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে জ্বালা বাহিরে ফুটাইবার উপায় নাই—দায়ে পড়িয়া গায়েই মারিতে হইল। বইগুলা তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিয়া ইনস্পেক্টর বাবু 'গান' বহিখানি ও চিঠির তাড়াটি সঙ্গে লইলেন, কহিলেন, "এই দুটো শুধু বড় সাহেবের কাছে দাখিল করব। বাকী এ সব ট্রাঙ্কেই থাকুক।" বলিয়া সমস্ত দ্রব্য যথাস্থানে রাখিয়া ট্রাঙ্কে চাবি দিয়া চাবিটা তিনি কুমুদকে ফিরাইয়া দিলেন, ও সার্চ্চ-লিষ্টে সাক্ষীর সহি লইয়া কুমুদকে বলিলেন, "এখন কুমুদবাবু, আপনাকে সাফ কথা বলছি। আপনাকে নিয়ে যেতে হবে, বড় সাহেবের হুকুম, সুতরাং আপনাকে আমি এ্যারেষ্ট করলুম। আপনি ভদ্রলোক, আপনার মর্য্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ হয়, তেমন কিছু করবার আমার ইচ্ছা নেই। আমি পুলিশ হলেও মানুষ। আপনি নিজে থেকে আসতে রাজী হন ত আসুন,—বাইরে সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী হাজির, কেউ আপনার গায়ে হাতও দেবে না, আপনি গাড়ীতে এসে বসুন। আর যদি না আসেন ত আমায় পাকাপাকি রকমেই গ্রেফ্‌তার করতে হবে। প্রয়োজন

লে হাতে হাতকড়ি লাগাবারও হুকুম ছে।"

কুমুদ কহিল, "চলুন, আমি যাচ্ছি।"

ইনস্পেক্টর বাবু সকলের দিকে চাহিয়া হিলেন, "আপনাদের বোধ হয় এতে কান আপত্তি নেই?"

উকিল জিতেন কহিল, "আপত্তি করে ৩৫৩ ধারায় পড়ব শেষে!"

ইনস্পেক্টর কহিলেন, "আপনি ভুল রছেন—৩৫৩ ধারা হবে আমায় প্রহার লে। আর কাজে বাধা দিলে হয়, ১৮৬ ারা। তাহলে আসি মশায়, নমস্কার! হয়ত াবার দেখা হতে পারে—আপনাদের নাম- লো নিয়েছি ত? হাঁ, ঠিক আছে! আপনিই তীশবাবু না? মেডিকেল কলেজে পড়েন —কুমুদবাবুর বাল্যবন্ধু?"

সতীশ কহিল, "হাঁ, যদি আপত্তি না াকে, আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?"

"মাপ করবেন—এখন সঙ্গে নিতে পারছি না। তবে হুকুম হলে আপনি পরে এঁর জন্য জামিন দাঁড়িয়ে এঁকে খালাস করে আনতে পারেন।"

যাইবার সময় কুমুদ ম্লান মুখে সকলের পানে চাহিল—সকলের মুখেই বিষাদের করুণ ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহা দেখিয়া কুমুদের বুকটা হু-হু করিয়া উঠিল। মেশ ছাড়িয়া কোথায় কোন্ নিরুদ্দেশ পথের যাত্রী হইতে চলিয়াছে সে! কোনমতে সকলকে উদ্দেশ করিয়া সে বলিল, "আপনারা আমার খবরটা নেবেন, মশায়। আমি কিছুই জানি না। সতীশ, আমায় বাঁচাবার ভার তোমার উপর। ভগবান জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নই। গবেশগঞ্জ কোথায়, তাই আমি জানি না।"

বলির ছাগশিশুর ন্যায়ই কাঁপিতে কাঁপিতে কুমুদ ইনস্পেক্টরের সহিত বাহির হইয়া গেল।

৪

তখন মেসের ঘরে যুক্তি-তর্কের প্রবল একটা আন্দোলন ছুটিল। যোগেশ কহিল, "এ কি ভোজবাজী! ভদ্রলোক কোথায় এগ্‌জামিন দিয়ে দেশে ফিরবেন, না, কি এ!"

সতীশ কহিল, "আমি কিন্তু বুক ঠুকে বলতে পারি, কুমুদের কোন দোষ নেই। ও-রকম নিরীহ ভালমানুষ আমি আর দুটি দেখি নি। ও করবে ডাকাতি!"

তিনকড়ি কহিল, "নিশ্চয়ই এ কোন শত্রুর কাজ।"

মোহিত কহিল, "জিতেনবাবু, আচ্ছা, এ যে ধরে নিয়ে গেল, এ কোন্ আইনের কোন্ ধারায়?"

জিতেন বাহিরের পানে চাহিয়াছিল; আইন-ঘটিত প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া অন্যমনস্ক-ভাবে কহিল, "মানে গিয়ে একটা ধারা আছে বটে! ঐ যে যেটাতে বলছে, পোলিটিক্যাল কেশ্-মাত্রেই অর্থাৎ পোলিটিক্যাল ব্যাপার আর কি!"

যোগেশ কহিল, "কিছুই বুঝতে পারলুম না। যাক্, মোদ্দা ওকে যে নিয়ে গেল, কৈ ওয়ারেণ্ট দেখালে না ত! ওয়ারেণ্ট না হলে একজনকে এভাবে কখনো গ্রেফ্‌তার করতে পারে?"

কথাটা সকলেরই মনে বিদ্যুতের মত চকিতে খেলিয়া গেল। তিনকড়ি কহিল,

"তাই ত, কি বল হে জিতেন, ওয়ারেণ্ট না থাকলে ধরতে পারে না,—সত্যিই ত! ও লোকটা ওয়ারেণ্ট দেখালে না, কিছু না, খামকা নিয়ে গেল! এ ত তাহলে illegal arrest."

জিতেনের তাক্ লাগিয়া গিয়াছিল! তাইত, ইহারা ঠিকই ধরিয়াছে ত! এটুকু তাহার মাথাতেই আসে নাই! আসিলে, আহা,—

যোগেশ কহিল, "ওয়ারেণ্টটা কেউ দেখতেও চাইলে না! কি হে জিতেন, তুমি না একজন উকিল এখানে ছিলে! তোমার এ ভুল হল কি করে?"

জিতেন দেখিল, এটুকুকে ভুল বলিয়া মানিলে তাহার আইন-জ্ঞান সম্বন্ধে ইহাদের মনে একটা বিশ্রী ধারণা জন্মিবে! অথচ ইনস্পেক্টর যখন ওয়ায়েণ্ট দেখায় নাই, তখন বিনা-ওয়ারেণ্টে ধরিবার নিশ্চয়ই তাহার ক্ষমতা আছে! সে ত আর বে-আইনী কাজ করিয়া চাকরি খোয়াইতে পারে না! তাছাড়া ঠিক—এ যে পোলিটিক্যাল, ব্যাপার! সে কহিল, "আহা, বুঝছ না—এ হল পোলিটিক্যাল কেশ—এতে ওয়ারেণ্ট দরকার করে না!"

নিয়োগী কহিল, "নাঃ, ওয়ারেণ্ট দরকার করে না! This is common sense, sir. পোলিটিক্যাল কেশেও ওয়ারেণ্ট চাই! না হলে যে-সে এসে অমনি একজনকে ধরে নিয়ে চলে যাবে! ইংরেজের আইনের মুল্লুকে এ কখনো হতেই পারে না!"

সতীশ কহিল, "আমরা বেকুব বনে দিব্যি বসে রইলুম ত! ওয়ারেণ্টখানা দেখতেও চাইলুম না!"

নিয়োগী কহিল, "এ বিপদে বেকুব ব কিছু ত আর আশ্চর্য্য নয়! কিন্তু জিতেন ছিল কি করতে! ও না পুলিশকোর্টে উকিল!"

উকিলের মুখ তখন এতটুকু হইয়া গিয়াছি —ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সকলের পা একবার তাকাইয়া সে মাথা নামাইল মুখে তাহার কোন কথা ফুটিল না।

তিনকড়ি কহিল, "তারপর গবেশগঞ্জ এমন নামও ত কখনো শুনিনি। তু শুনেছ, যোগেশ? তুমি ত খবরের কাগজে পোকা, এ ডাকাতির কথা নিশ্চয়ই কখন পড়ে থাকবে!"

মোহিত কহিল, "যাক, যা হয়ে গে তার ত আর চারা নেই। বাজে ক রাখো এখন। ভদ্রলোক যখন আমাদে আশ্রয়ে এসেছিলেন, তখন আমাদের প্রাণ প চেষ্টা করা উচিত, যাতে উনি খালাস পান।"

যোগেশ কহিল, "তাহলে লালবাজা যাওয়া যাক, চল। জিতেন, তুমি এক কা কর, তুমি তাহলে কুমুদবাবুর উকিল হ দাঁড়াও।"

জিতেন কহিল, "দুশো বার আমার দাঁড়া উচিত, বিশেষ উনি যখন কিছুকাল-বা member of the same profession হতে চলেছেন। কিন্তু আমার এক ম বিপদ হয়েছে। আজ শেয়ালদা কো আমার একটা খুব সিরিয়স্ কেশ আছে clear case—দালাল-টালাল নেই—আ টাকা ফীও দিয়ে গেছে। তারা আমার জ ও দিকে হাঁ করে বসে থাকবে,— এ না হয়েছে মুস্কিল!"

নিয়োগী কহিল, "কুছ্ পরোয়া নেই! মায় কিছু করতে হবে না, তুমি শুধু শ কোর্টের কোন বড় উকিলের কাছে মাদের নিয়ে চল। আমরা চাঁদা করে তাঁর দেব—যত টাকা লাগে। তিনিই এ শে দাঁড়াবেন।"

জিতেন কহিল, "চল, এখনই যাচ্ছি। আর করা যাবে—আমিও নয় ধাঁ করে বার শেয়ালদায় গিয়ে তাদের টাকা কটা রিয়ে দিয়ে দোসরা উকিলের জোগাড় রতে বলে আসব'খন।"

নিয়োগী কহিল, "না, না, কোথাকার ! তার জন্যে শুধু-শুধু তোমায় আট াকা লোকসান করতে হবে না।"

সকলে চট্-পট্ উঠিয়া পড়িয়া উকিলের দ্দেশ্যে বাহির হইল।

৫

কুমুদের গাড়ী বেনেটোলা ছাড়িয়া ারিসন রোড পার হইয়া সার্কুলার রোড রিয়া বরাবর দক্ষিণ মুখে চলিল। গাড়ীতে সিয়া সে বাহিরের পানে চাহিয়াছিল; জল নেত্রে চারিধার ঝাপ্‌সা দেখিতেছিল। বুকের উপর কারা-কক্ষের ভীষণ অন্ধকার ারী পাথরের মতই আঁটিয়া বসিয়াছিল। সে অন্ধকারের ভারে নিশ্বাস তাহার বন্ধ ইয়া আসিতেছিল। মনের মধ্যে দুশ্চিন্তার াগর ভীম গর্জ্জনে নাচিতেছিল। পথের এক ারে ফুটপাথ। ফুটপাথের উপর রেলওয়ে াইন—লাইনে মালগাড়ীতে ময়লা বোঝাই ইতেছে! কুমুদ ভাবিল, ঐ ময়লা-গাড়ীর গাড়োয়ানগুলাও কত সুখী! তাহাদের লঘু চ্ছ মনের উপর কোনরূপ দুশ্চিন্তার পাথর ত কেহ চাপিয়া ধরে নাই! সে যদি কুমুদ না হইয়া ঐ ময়লা গাড়ীরই গাড়োয়ান হইত—আহা, তাহা হইলে কি স্বাধীন স্বচ্ছন্দ অব্যাহত গতিতে এখন সে চলিতে ফিরিতে পারিত। কিন্তু সে গাড়োয়ান নয়, সে কুমুদ —তাই সে বন্দী, পুলিশের হাতে বন্দী! সম্পূর্ণ এক অজানা অপরাধের কলঙ্কে তাহার সমস্ত জীবন কালিমাখা কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছে! হায় নীহার, পুণ্যবতী সাধ্বী সতী, তোমার অমল পুণ্য-বিভায় কি এ কলঙ্কের কালি মুছিবে না—এ বিপদ হইতে মুক্তি-লাভ ঘটিবে না!

কুমুদের মনে ভাবনার আর অন্ত ছিল না! কিন্তু ভাবিয়া কি ফল! কঠোর সত্য নির্ম্মমভাবে তাহাকে পীড়ন করিতেছিল। মুক্তি নাই, মুক্তি নাই, ওরে কিছুতেই মুক্তি নাই!

গাড়ী আসিয়া ক্রমে এক সুসজ্জিত গৃহের গাড়ী-বারান্দায় ঢুকিল। ফটক হইতে লাল কাঁকর-ফেলা পথ গাড়ী-বারান্দার মধ্য দিয়া বাঁকিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। দুইধারে বিচিত্র ক্রোটন ও ভার্বীনার ঝাড়। মাঝে মাঝে সূর্য্যমুখী, ক্যানা প্রভৃতি বিবিধ ফুলের গাছে অজস্র ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। গাড়ী থামিলে ইনস্পেক্টর বাবু গাড়ী হইতে নামিলেন, কুমুদকেও নামিতে বলিলেন; কুমুদ নামিলে তাহাকে ভিতরে লইয়া গিয়া প্রশস্ত এক কক্ষে বসিতে বলিলেন। ঘরের মধ্যে পা দিতেই কুমুদের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল —বুকের মধ্যে কে যেন অসংখ্য কামান দাগিল! ম্যাটিং-করা ঘর সোফা-কৌচে সজ্জিত—মাঝখানে শ্বেত পাথরের টেবিল।

দ্বারের মাথায় একটা বন্দুক। সজ্জার কেতা দস্তরমত বিলাতী ধরণের।

ইনস্পেক্টর বাবু বলিলেন, "আপনি এই চেয়ারে বসুন। বড় সাহেব এখনই আসবেন।"

কুমুদ এবার কাঁদিয়া ফেলিল—কাঁদিয়াই কহিল, "কিন্তু যথার্থ বলছি আমি, গবেশগঞ্জ কোথায়, তা আমি জানিও না—সেখানে কবে ডাকাতি হয়েছে, তাও বলতে পারি না। এগ্‌জামিনের জন্য আজ দু'মাস খবরের কাগজ অবধি উল্টে দেখিনি। আমায় দয়া করে ছেড়ে দিন। আমি যথার্থ কোন দোষে দোষী নই।"

ইনস্পেক্টর বাবু নরম সুরেই বলিলেন, "সে কথা আমায় বলে কোন ফল নেই। আমি হুকুমের চাকর মাত্র। হুকুম তামিল করাই আমার কাজ। বড় সাহেবের হুকুমে আপনাকে এখানে এনেছি। আপনার সম্বন্ধে তাঁর ব্যবস্থাই আমায় মাথা পেতে নিতে হবে। আপনি তাঁকেই সব খুলে বলবেন। তিনি ছেড়ে দিতে বলেন, এখনই আপনাকে ছেড়ে দেব। কেন মিথ্যে ধরে রাখব? আমার কি লাভ এতে, বলুন না! ঐ যে বাঁ-ধারের দোরে সবুজ পর্দ্দা দেখচেন, ঐটে হলগে বড় সাহেবের ঘর—তিনি এখনই আসবেন,তাঁকেই সব বলবেন। এখন একটু বসুন। এই ডান দিকে আমার অফিস—আমি এখন অফিসে চললুম, বিস্তর কাগজ-পত্র দেখে-শুনে ঠিক করবার আছে।"

ইনস্পেক্টর চলিয়া গেলে কুমুদ ভাবিল, পাষাণ, পাষাণ ইহারা! মিথ্যা ইহাদের কাছে হৃদয়-ব্যথা জানানো! পরের জন্য ইহারা ভাবিতেও জানে না—প্রাণে পাষাণ গাঁথিয়া কাগজ দেখিয়াই শুধু কাজ করি যায়—মানুষ দেখিয়া কাজ করে না তবে কি ফল, ইহাদের কাছে আবে নিবেদনে!

তাহার শুধু বার বার মনে পড়িতেছি নীহারের কথা! এ নির্ম্মম আঘাত নীহা প্রাণে ভয়ঙ্কর বাজিবে! আহা, বালি আধ-ফোটা হৃদয়-ফুলটি এ আঘাতে একে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে! কত আশায় লিখিয়াছিল, "এগজামিনের পরই আ চাই।" হায়রে সরলা বালিকা,—তো সব আশা আজ নিয়তির এক নি ফুৎকারে ছিঁড়িয়া গেল! কুমুদের ম ঘুরিতে লাগিল। সে আর ভাবিতে পা না। চোখে বাণ ডাকিয়াছিল, দুই হা মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। ভাব যে এদিকে কূল নাই, কিনারা নাই! কত সে ভাবিবে!

এমন সময় স্বপ্নে যেন এক বীণার বাজিয়া উঠিল, "কুমুদ—" কুমুদের হইল, না, সে মাথা তুলিবে না—চো খুলিবে না! এ সত্যের নির্ম্মমতার মা বাজুক, স্বপ্নের বীণা আবার বাজুক! এ আরামের সুর—বড় মধুর!

আবার সুর বাজিল, "কুমুদ—"

কুমুদ ভাবিল, আবার! তবে ত এ নয়! সে স্পষ্ট শুনিয়াছে! সে মা তুলিল। মাথা তুলিয়া যাহা দেখিল, তাহা তাহার সর্ব্বশরীর ঝিম-ঝিম করিয়া উঠি সে কি পাগল, না, কোন নেশা করিয়াছে

কুমুদ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে, তাহ সম্মুখে অদূরে দাঁড়াইয়া এক কিশোরী! রূ

বিদ্যুৎ খেলিতেছে—মুখে স্বর্গীয় দীপ্তি, চোখে রাজ্যের করুণা যেন মাখানো! সে অবাক হইয়া গেল। সে যে বড় সাহেবের রুদ্র মূর্ত্তি রক্ত আঁখিরই কল্পনা করিতেছিল—তাহার পরিবর্ত্তে এ কি! বাঙালীর ঘরের সুন্দরী কিশোরী! কাল রাত্রে থিয়েটারে সে এক রোমাঞ্চকারী নাটকের অভিনয়ে দেখিয়াছিল—শেষ দৃশ্যে নায়ককে বধ্যভূমিতে আনা হইয়াছে; ঘাতকের খড়্গ নায়কের মাথার উপর উদ্যত—রাজা স্বয়ং প্রশ্ন করিলেন, "বন্দী, এখনো বলিতে চাও, তুমি রাজকন্যাকে ভালবাস?" নায়ক অচপল স্বরে উত্তর দিল, "বাসি মহারাজ! এই মরণের তীরে দাঁড়াইয়া বলিতেছি, রাজকন্যাকে প্রাণ দিয়াও ভালবাসি।" অমনি নেপথ্যে বংশী-ধ্বনি হইল এবং চকিতে ঘড়-ঘড় করিয়া বধ্যভূমির 'সিন্' সরিয়া গিয়া তাহার স্থলে রাজ-কন্যার প্রমোদ-কুঞ্জ দেখা দিল। সেখানে বেদীর উপর অলস শয়ানে শায়িতা রূপসী রাজকন্যা—আর চারিধারে ফুল গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া অসংখ্য সজ্জিতা সখী! ঘাতকের হাতের অস্ত্র হাতেই থামিয়া রহিল এবং সখীর দল সমস্বরে মিলনের গান ধরিয়া দিল। এ ব্যাপারে তাহার কাল রাত্রের থিয়েটারের সেই পট-পরিবর্ত্তনের দৃশ্যই মনে পড়িতেছিল। কোথায় গারদ-ঘরের ভীষণ অন্ধকার—না, সজ্জিত কক্ষে বঙ্গসুন্দরীর ব্রীড়াময় মুখচ্ছবি!

সে ভাবিল, এ আর কিছুই নয়—পুলিশের চাল! রূপের ফাঁদ পাতিয়া নির্দ্দোষ নিরপরাধ বন্দীকে ভাল করিয়া জড়াইয়া ফেলিবার মতলব এ! ইংরাজী উপন্যাসে নারী-গোয়েন্দার কথা সে বিস্তর পড়িয়াছে, এখানেও যে বাঙালীর মেয়ে সি-আই-ডিতে ঢুকিবে, সে আর এমন-কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কিশোরী নিশ্চয় এই ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে! নহিলে অপরিচিত যুবার সম্মুখে বাঙালীর মেয়ে- বিশেষ এমন সুন্দরী কিশোরী—কোথায় আর এমন অসঙ্কোচে বাহির হইয়া থাকে!

কিশোরী কহিল, "আমায় তুমি চেনো না, তার মানে তোমার বিয়েয় আমি যেতে পারিনি। খোকা তখন সবে দেড় মাসের। আমি হচ্ছি নীহারের দিদি, বুঝলে—আমার নাম সুবালা।"

সুবালা! শ্যালিকা সুবালা! নাঃ—ইহাদের অসাধ্য কাজ নাই! কিন্তু নীহারের নামটা না হয় চিঠি হইতে জানিতে পারে,—সুবালা—শ্যালিকা সুবালার নাম কেমন করিয়া পুলিশে জানিল! চিঠিতে কৈ এ নামের এতটুকু উল্লেখও ত কোথাও নাই! তা ছাড়া সুবালাকে কুমুদ নিজে কখনও চক্ষে দেখে নাই, নীহারের কাছে নামটাই শুধু শুনিয়াছিল। তাহার বিবাহের সময় সুবালা আসিতে পারে নাই সত্য এবং সে শুনিয়াছে, ছেলে হইয়াছে বলিয়াই সে আসিতে পারে নাই। সে সংবাদও পুলিশ রাখিয়াছে? আশ্চর্য্য! সি-আই-ডি পুলিশ যাদু জানে!

কুমুদ কোন উত্তর না দিয়া নত শিরেই বসিয়া রহিল। সে ভাবিল, না, এ ফাঁদে পড়া হইবে না! ভারী হুঁসিয়ার থাকিতে হইবে! কিশোরী কহিল, "তোমার এগজামিন কেমন হল?"

কুমুদের সর্ব্বাঙ্গে কে যেন কাঁটার চাবুক

মারিল। সে একবার কিশোরীর পানে চাহিল। কিশোরীর সহাস প্রফুল্ল মুখে দিব্য সরলতা—কোথাও এতটুকু সঙ্কোচ নাই। সে ভাবিল, হায়, এমন রূপেও কপটতার কালি মাখাইতে পারে! আত্মীয়তার কি চমৎকার ভাণ এ! সে কহিল, "আমায় আপনারা মাপ করবেন—যথার্থ বলছি, আমি কিছু জানি না। গবেশগঞ্জর নামও কখনও আমি কানে শুনিনি।"

"গবেশগঞ্জ!" কিশোরী কহিল, "গবেশ গঞ্জ আবার কি!"

"সেই যে, আপনারা বলছেন, যেখানে ডাকাতি হয়েছে।"

"ডাকাতি!" কিশোরী বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কহিল, "ডাকাতি আবার কি! আমায় তুমি চিনতে পারছ না—আমায় না হয় না দেখতে পার,—কিন্তু আমার নামও কি কখনও শোন নি? আমি যে তোমার শালী!"

কুমুদ কহিল, "কিন্তু আপনি থানায় এলেন কি করে?"

"থানা কোথায়! এটা ত থানা নয়। ওঁকে আর থানায় থাকতে হয় না। উনি যে এখন সি-আই-ডিতে বদলি হয়েছেন—এটা ওঁর বাসা।"

অকূলের মাঝে কুমুদ যেন একটু কূলের সন্ধান পাইতেছিল। তাহার ভায়রা-ভাইয়ের সম্বন্ধে সে শুনিয়াছিল, পুলিশে তিনি কাজ করেন। কিন্তু বেঙ্গল পুলিশ কি কলিকাতা পুলিশ তাহার কোন তত্ত্ব লয় নাই! তাই ত—এ কথাটা একবারও তাহার মনে পড়ে নাই যে! তবে কি ব্যাপারখানা আগাগোড়াই—

এমন সময় ইনস্পেক্টর বাবু সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, হাসিয়া কহিলেন, "বড় সাহেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হল আপনার? ইনিই আমার বড় সাহেব। আশ্চর্য্য হবেন না। এঁরই হুকুমে আপনাকে এখানে আনা হয়েছে। হুজুর, আসামীর ট্রাঙ্কে এই মাল পাওয়া গেছে—এই থেকেই এঁকে সনাক্ত করতে পারবেন যে ইনিই আসল কুমুদনাথ চৌধুরী, জাল নন্। আপনার ভগ্নী নীহার এঁরই হাতে প্রাণ-মন সমর্পণ করেছেন; চিঠিতেও আগাগোড়া তা কবুল করেছেন—এবং সে একখানা চিঠিতে নয়, অমন পঞ্চাশ-খানায়!" বলিয়া তিনি রবিবাবুর গানের বহিখানি ও নীহারের লেখা চিঠির তাড়া সুবালার হাতে তুলিয়া দিলেন।

সুবালা কহিল, "ডাকাতি-টাকাতি এ-সব কি?"

"ওঃ—এর মধ্যে একটু রহস্য আছে—" বলিয়া ইনস্পেক্টর সন্তোষকুমার সংক্ষেপে ব্যাপার বুঝাইয়া দিলে সুবালা কহিল, "পরশু খোকার ভাত। তোমার বাড়ীতে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, তা সেখান থেকে কাল রাত্রে জবাব এসেছে, তুমি এগজামিন দিতে এখানে এসেছ—বেনেটোলায় তোমার কে বন্ধু আছেন, সতীশবাবু, তাঁরই মেশে উঠেছ! তাই এঁকে পাঠিয়েছিলুম, তোমায় আনবার জন্য। উনি যে এ-রকম ফন্দী খাটিয়ে নিয়ে আসবেন, তা কি করে জানব বল ভাই! ওঁর রসিকতাই অমনি মারাত্মক রকমের, আমি ত হাড়ে-নাড়ে জ্বল্‌ছি! তা যাক,

ন কিছুদিন এখানে তোমায় থাকতে হবে —এগজামিন ত হয়ে গেছে! অসুবিধেও ছু হবে না,—নীহারও কাল এখানে এসেছে। আর বাবা কাল আসবেন।"

কুমুদের একবার মনে হইল, সে স্বপ্ন দেখিতেছে না কি? নীহার আসিয়াছে! কৌতূহলী দৃষ্টিতে একবার সে চারিধারে চাহিয়া দেখিল। সুবালা সরিয়া গিয়া পর্দ্দার আড়াল হইতে চুড়ি-বালা-পরা সুন্দর সুগোল একখানি ছোট হাত টানিয়া বাহির করিল, হাসিয়া কহিল, "এ হাত কার, চেনো?" বলিয়া তখনই আপাদ-মস্তক লজ্জায় জড়িতা এক বালিকাকে কুমুদের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিল। সন্তোষ কহিল, "শুধু হাত কেন, গোটা মানুষটাকে দেখেই না হয় সন্দেহ-ভঞ্জন কর। কি জানি, থানা-পুলিশ বলে মনে যখন একবার সন্দেহ হয়েছে, তখন রীতিমত সব দেখে-শুনে নেওয়া ভাল।"

কুমুদ অবাক হইয়া গিয়াছিল। তাই ত এ যে ইন্দ্রজাল! সলজ্জে সে মুখ নামাইল। সন্তোষ বলিল, "আমি তাহলে তোমার বন্ধুদের চিঠি পাঠাচ্ছি হে—তাঁদের নামগুলি পকেট-জাত করেছি। তাঁরা ওদিকে ভাবনায় লালবাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বোধ হয়—আর জমাদারকেও পাঠাই তোমার জিনিষপত্র আনতে! ওবেলায় নিজেও একবার যাব'খন—এবেলায় তাড়া আছে, ঘটে উঠবে না। যে-রকম ভয় দেখিয়ে এসেছি, তাতে নিজের গিয়েই মাপ চাওয়া উচিত!"

* * *

দশটা বাজে। মেশে সকলে স্নান সারিয়া উকিলবাবুকে লইয়া লালবাজারে যাইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় জমাদার আসিয়া সতীশের হাতে একটা প্যাকেট দিল। সতীশ জমাদারকে দেখিয়া ভয় পাইয়া ছিল,—আবার কি ব্যাপার! কম্পিত হস্তে সে প্যাকেট ছিঁড়িয়া ফেলিল—একখানা সাদা কাগজে কয় ছত্র লেখা—তাহাতে সন্তোষ পরিচয় দিয়া ব্যাপার বুঝাইয়া ক্ষমা চাহিয়াছে এবং মেশের বন্ধুদের প্রত্যেককে শনিবার রাত্রে আপনার বালিগঞ্জের গৃহে পুত্রের অন্ন-প্রাশনের ভোজে উপস্থিত থাকিয়া শুভকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছে। সতীশ চীৎকার করিয়া ডাকিল, "নেউগী, ওহে, এদিকে এসো, ধড়াচূড়ো খুলে ফেলো, এধারে দেখে যাও,—a pleasant comedy, after all."

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক ভারতের সভ্যতা

খৃষ্টধর্ম্ম

ভারতের ধর্ম্মগুলির সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। য়ুরোপ, ভারতের মর্ম্ম-ভাবটিকে নবীকৃত করিতেও পারে নাই, ভারতের ধর্ম্মভক্তদিগকেও ছিনাইয়া আনিয়া স্বধর্ম্মভুক্ত করিতে পারে নাই। পঞ্চম শতাব্দী হইতে, নেস্‌টোরীয় খৃষ্টসম্প্রদায় ভারতে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছে। ভারতে উহাদের গির্জা

এখনো বর্ত্তমান আছে। ষোড়শ শতাব্দী হইতে পোর্টুগীরা কতকটা প্ররোচনা ও কতকটা বাহুবলের দ্বারা "ক্যাথলিক" ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছে। ফরাসী ধর্ম্মপ্রচারকেরা খুব পুরাতন ও বহুসংখ্যক; পরিশেষে, সকল সম্প্রদায়েরই প্রটেষ্টাণ্টরা, গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে, হিন্দু ও মুসলমানদিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়াছে। তথাপি ত্রিশকোটি ভারত-বাসীর মধ্যে, শুধু ২০ লক্ষ দেশীয় খৃষ্টান। তন্মধ্যে ১২ লক্ষ ক্যাথলিক, প্রায় ৬ লক্ষ প্রটেষ্টাণ্ট ও ২ লক্ষ "জ্যাকোবাইট্"।

এই নিষ্ফলতার অনেকগুলি কারণ আছে।

প্রথমতঃ ভারতের বর্ণভেদ। যে ব্যক্তি একাকী খৃষ্টান হয়, সে জাত হইতে বহিষ্কৃত হয়; যে পরিবার হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে পরিবার স্বকীয় বংশমর্য্যাদা ও সামাজিক বিশেষাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। যে-সকল নীচবর্ণের লোক হিন্দুসমাজে অবজ্ঞার পাত্র, বিজেতাদিগের ধর্ম্মগ্রহণ করা তাহারাই স্বকীয় স্বার্থের অনুকূল বলিয়া মনে করে; দুর্ভিক্ষের সময়, দুর্দ্দশায় পড়িয়া অনেকে খৃষ্টান হয়। করমণ্ডল-উপকূলে, কতকগুলা ঘৃণিত জাতি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে এবং আপনাদের মধ্যে কতকগুলা জাত গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সাধারণত, খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকেরা বর্ণভেদ-প্রথার প্রতি বড়-একটা অনুকূল নহে।

দ্বিতীয় কারণ যাহা খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারের কতকটা প্রতিবন্ধক হইয়াছে—তাহা হিন্দু-ধর্ম্মের সর্ব্বগ্রাহিতা। যে জাতি তেত্রিশ-কোটি দেবতার পূজা করে, তাহারা স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক নিজ দেবালয়ে খৃষ্টকেও স্থান দিবে, কুমারী-মেরীকেও স্থান দিবে, "সেণ্ট"দিগকেও স্থান দিবে; এমন কি উহারা উহাদিগকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মনে করিবে। উহারা এই কথাটা বুঝিতে পারে না যে কোন নূতন দেবতার পূজা আরম্ভ করিলে পুরাতন দেবতাদিগের পূজা বাদ দিতে হইবে।

শিক্ষিত হিন্দুরা এই একই মনোভাব প্রকারান্তরে প্রকাশ করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে ভাণ্ডরকার এইরূপ বলেনঃ—"খৃষ্টান পাদ্রিদিগকে আমি এইরূপ উত্তর দিব। তাঁহারা এমন-একটা ধর্ম্ম আমাদিগকে দিতে চান যাহা তাঁহাদের মতে সর্ব্বাংশে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাণী, ঈশ্বরের একমাত্র প্রত্যাদেশ……কিন্তু না, খৃষ্টধর্ম্মই মানবজাতির একমাত্র ধর্ম্ম নহে; এই পৃথিবীতে, হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইস্‌লাম-ধর্ম্ম প্রভৃতি কত ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে! আমরা-কি বলিব এই সমস্ত মায়া-বিভ্রম? এ শুধু সমস্ত ধর্ম্মের প্রতিপক্ষগণের জল্পনা। কারণ একমাত্র ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম,—একথা কোন্ ধর্ম্ম-বিশেষের বলিবার অধিকার আছে? প্রত্যেক ধর্ম্মেই সত্যের অংশ আছে, প্রত্যেক ধর্ম্মেই ভ্রমের অংশ আছে; অন্যান্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান হইতেই আমরা এই ভ্রম আবিষ্কার করিতে পারি ও নিরাকৃত করিতে সমর্থ হই। সকল ধর্ম্মই ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত; কিন্তু সকল ধর্ম্মেই, দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ জগৎপিতার অনুপ্রাণিত সত্যের সহিত মিথ্যা মিশাইয়া দিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ঈশ্বর তাঁহার

মানুষের উপর অজস্র বর্ষণ করিতেছেন; কিন্তু আমরা বলিয়া থাকি,—"প্রকৃত সত্য যাহা তাহা মানুষকে জানাইবার জন্য ঈশ্বর শত বৎসর হইতে অপেক্ষা করিতে-ছিলেন; এক্ষণে শুধু একটিমাত্র জাতি সেই সত্য জানিতে পারিয়াছে।" তাহা কখনই নহে, ঐ ধর্ম্ম সত্য-সত্যই মানুষের একটা প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু হয়, তাহা হইলে গোড়া হইতেই তিনি মানুষের নিকট সেই ধর্ম্ম প্রকাশ করিবেন; মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই ঈশ্বর এমন-করিয়া তাহা রোপণ করিয়া দিবেন যে সে নিজের ছায়ার মত সর্ব্বত্রই তাহা সঙ্গে-সঙ্গে লইয়া যাইবে। মানুষ যেখানেই যায়, ধর্ম্মও ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করে। মানবজাতির ন্যায় ধর্ম্মও সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। মানুষ, ইতিহাসের কোন এক বিশেষ যুগে ভগবৎ-প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয় নাই। এই প্রত্যাদেশ, মানব-বুদ্ধির উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গেই আরম্ভ হইয়াছে, ঐ প্রত্যাদেশ কালক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং চিরকালই পরিপুষ্ট হইবে। ঈশ্বর সকল সময়েই আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে আছেন। যতই আমাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইবে, ততই তিনি সত্যকে পূর্ণভাবে আমাদের নিকট প্রকাশ করিবেন।"

হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ স্বামী এই ভাবেই শিকাগোর কংগ্রেসে নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন:—

"ধর্ম্মের ঐক্য-সম্বন্ধে কত কথাই না বলা হইয়াছে! আমার নিজের মতটা এইখানে আমি ব্যাখ্যা করিব। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যদি কেহ, কোন ধর্ম্মের প্রচারের সফলতা হইতে, এবং অন্যান্য ধর্ম্মের উচ্ছেদ হইতে, এই ঐক্যলাভের আশা করেন, তবে আমি তাঁহাকে বলিব;—"ভাই, তোমার এই আশা একটি অসম্ভব আশা।" একজন খৃষ্টান হিন্দু হইয়া যাক্, ইহাই কি আমার মনের বাসনা? ভগবান আমাকে এই দুর্বাসনা হইতে রক্ষা করুন। একটি বীজ মৃত্তিকার মধ্যে নিহিত হইয়াছে; উহা বায়ু পৃথ্বী ও জলের দ্বারা পরিবেষ্টিত। উহা কি বায়ু পৃথ্বী বা জলে পরিণত হয়? না,—উহা একটি বৃক্ষে পরিণত হয়; এবং ঐ বৃক্ষ, বায়ু পৃথ্বী ও জলকে আত্মসাৎ করে, এবং শেষে উহাই ঐ বৃক্ষের উপাদান-বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও এইরূপ। খৃষ্টান, হিন্দু বা বৌদ্ধ হইবে না; হিন্দু, বৌদ্ধও, খৃষ্টান হইবে না। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মকে আত্মসাৎ করিবে, অথচ নিজের বিশেষত্ব বজায় রাখিবে, উন্নতির নিজস্ব নিয়ম অনুসরণ করিয়া পরিপুষ্ট হইবে।"

আর একটি কারণ, পাদ্রিদিগের চেষ্টাকে আটকাইয়া রাখে। গভর্ণমেণ্ট উদাসীন; কোন স্কুলে, কোন কলেজে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না; যে-সকল দার্শনিক ও য়ুরোপীয় লেখককর্ত্তৃক শিক্ষিত হিন্দুরা অনুপ্রাণিত হয়, তাহারা সমস্ত প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মকে প্রত্যাখ্যান করে। অতএব ভারতকে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করা একটা অসম্ভব কার্য্য। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রভাব, অবশ্য দেশপ্রচলিত ধর্ম্মগুলির মধ্যে সুনীতি প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইবে; ইহারই মধ্যে ত ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাব,

শিক্ষিত লোকদিগের বিশ্বাসকে পরিশোধিত করিয়াছে।

য়ুরোপীয়দিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু যুবকেরা জাপানীদিগের ন্যায় প্রামাণিক-বাস্তব-বাদের (Positivism) দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে নাই, বরং উহারা এমন-এক দর্শন-তন্ত্রের দিকে ঝুঁকিয়াছে যাহা কখন-বা শেলিংএর বিশ্ব-ব্রহ্মবাদকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কখন-বা শপেন্‌হৌয়েরের নৈরাশ্য-রঞ্জিত ভাব-বাদকে স্মরণ করাইয়া দেয়। যদি কখন ভারত ও জাপান চিন্তাশীল লেখক উৎপাদন করিতে এবং বিশ্বমানবের নৈতিক উন্নতির উ একটা বিশেষ ক্রিয়া প্রকটিত কি সমর্থ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতেই বলি পারা যায়, ঐ উভয় দেশের প্রব বিপরীত-গামী হইবে; সুতরাং উহারা সঙ্গে সমান আধিপত্য সম্ভোগ করিবে কিন্তু নব্যভারতের এইরূপ ক্রিয়া প্রক করিবার সামর্থ্য লাভ করা দীর্ঘক সাপেক্ষ। নব্যভারতের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ধা এক্ষণে সংশয়, বিস্ময় ও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পদ্মের পাপড়ি

কাব্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন

য়ুরোপের সাহিত্যে মহাকাব্য লিখিবার কাল চলিয়া গিয়াছে। কোন কবি মহাকাব্য লিখেন না, অনেক পাঠক মহাকাব্য পড়েন না, অনেকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলিয়া পড়েন, অনেকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পড়েন। অনেক সমালোচক দুঃখ করিতেছেন, এখন আর মহাকাব্য লিখা হয় না, কবিত্বের যুগ চলিয়া গিয়াছে। অনেক পণ্ডিতের মত এই যে, সভ্যতার পাড়ে যতই চর পড়িবে, কবিত্বের পাড়ে ততই ভাঙ্গন ধরিবে! প্রমাণ কি? না, সভ্যতার অপরিণত অবস্থায় মহাকাব্য লেখা হইয়াছে, এখন আর মহাকাব্য লেখা হয় না। তাঁহাদের মতে, বোধ করি এমন সময় আসিবে, যখন কোন কাব্যই লেখা হইবে না।

এত তাড়াতাড়ি কবিতাকে গঙ্গাযা করিবার উদ্যোগ করিতে হইবে না তাহার নাড়ী বেশ চলিতেছে। কেন বৃত্তান্ত, সমস্ত ভাল করিয়া পর্য্যালোচ করা উচিত।

সভ্যতার সমস্ত অঙ্গে যেরূপ পরিব আরম্ভ হইয়াছে, কবিতার অঙ্গেও যে রূপ পরিবর্ত্তন হইবে, ইহাই সম্ভবপর বলি বোধ হয়। কবিতা সভ্যতা-ছাড়া এক আকাশ-কুসুম নহে। কবিতা নিতান্ত আসমানদার নহে। তাহার সমস্ত ঘর-বাড়ি আস্‌মানে নহে। তাহার জমিদারীও য আছে।

সভ্যতার একটা লক্ষণ এই যে, দেশে সভ্য অবস্থায় একজন ব্যক্তিই সর্ব্বেসর্ব্বা

দেশ বলিলেই একজন বা দুইজন ায় না, শাসনতন্ত্র বলিলে একজন বা জন বোঝায় না। ব্যক্তি নাম্মিয়া িতেছে ও মণ্ডলী বিস্তৃত হইতেছে। ন লক্ষলোকের সমষ্টি একজন ব্যক্তি । এখন শাসনতন্ত্র আলোচনা করিতে লে একটি রাজার খেয়াল, শিক্ষা ও াভাব আলোচনা করিলে চলিবে না; ন অনেকটা দেখিতে হইবে, অনেককে খিতে হইবে। এখন যদি তুমি একটা র একটা অংশমাত্র দেখিয়া বল যে, ত খুব অল্প কাজই করিতেছে, তাহা লে তুমি ভ্রমে পড়িবে। সে যন্ত্রের ল অঙ্গই পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

এখনকার সভ্যসমাজে যদি তুমি কিছু নিতে চাও, একজনের দিকে চাহিও না। কটা দেখিলে চলিবে না; দশটাকে মনে ন তেরিজ কষিয়া একটাতে পরিণত র। কবিতাও সে নিয়মের বহির্ভূত নহে। ত্য দেশের কবিতা এখন যদি তুমি ালোচনা করিতে চাও, তবে একটা কাব্য, কটি কবির দিকে চাহিও না। তাহা লে বলিবে "এ কি হইল? এ ত ষ্ট হইল না! এদেশে কি তবে এই বিতা?" বিরক্ত হইয়া হয়ত প্রাচীন াহিত্য অন্বেষণ করিতে যাইবে। যদি াভারত, কি রামায়ণ, কি গ্রিসীয় একটা ান মহাকাব্য নজরে পড়ে, তবে বলিবে র্য্যাপ্ত হইয়াছে, প্রচুর হইয়াছে!" এক াভারত বা এক রামায়ণ পড়িলেই তুমি াচীন সাহিত্যের সমস্ত ভাবটি পাইলে। ন্তু এখন সেদিন গিয়াছে। এখন একখানা কবিতার বইকে আলাদা করিয়া পড়িলে পাঠের অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়। মনে কর ইংলণ্ড। ইংলণ্ডে যত কবি আছে সকলকেই এক বলিয়া ধরিতে হইবে। একজন কবির কাব্যে এক প্রকারের মনোভাব অথবা এক রঙের বিভিন্ন মনোভাব সকল দেখিতে পাইলে, কিন্তু তাহা একটা সর্গ মাত্র; দ্বিতীয় কবির কাব্যে যখন আর এক শ্রেণীর মনোভাব বা আর এক রঙের বিভিন্ন মনোভাব সকল দেখিতে পাইলে, তখন তাহাকে দ্বিতীয় সর্গ মনে করিয়া লইতে হইবে। ইংলণ্ডে যে কবিতা-পাঠকশ্রেণী আছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে এক একটা মহাকাব্য রচিত হইতেছে। তাঁহারা বিভিন্ন কবির বিভিন্ন সর্গগুলি মনের মধ্যে একত্রে বাঁধাইয়া রাখিতেছেন। ইংলণ্ডের সাহিত্যে একটা বিশাল মহাকাব্য রচিত হইতেছে, অনেক দিন হইতে অনেক কবি তাহার একটু একটু করিয়া লিখিয়া আসিতেছেন। পাঠকেরাই এই মহাকাব্যের বেদব্যাস। তাঁহারা মনের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া সন্নিবেশ করিয়া তাহাকে একত্বে পরিণত করিতেছেন। যে কেহ ইহার একটি মাত্র অংশ দেখেন অথবা সকল অংশগুলিকে আলাদা করিয়া দেখেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রমে পড়েন। তাঁহারা বলেন, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য অগ্রসর হইতেছে না। তাঁহারা কি করেন? না, একটি সাধারণ তন্ত্রের শাসন-প্রণালীর প্রতিনিধিগণের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করিয়া দেখেন। দেখেন রাজার মত প্রভূত ক্ষমতা কাহারো হস্তে নাই, রাজার মত একাধিপত্য কেহ করিতে পায় না ও

তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, "দেশের রাজ্য-প্রণালী ক্রমশই অবনত হইয়া আসিতেছে। সভ্যতা বাড়িতেছে বটে কিন্তু রাজ্যতন্ত্রের উন্নতি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। বরঞ্চ উল্টা।" কিন্তু সভ্যতা বাড়িতেছে বলিলেই বুঝা যায় যে, জ্ঞানও বাড়িতেছে কবিতাও বাড়িতেছে।

রাজ্যতন্ত্র যখন খুব জটিল ও বিস্তৃত হয়, তখন সাধারণ তন্ত্রের বিশেষ আবশ্যকতা বাড়ে। যত দিন ছোটখাট সোজাসুজি রকম থাকে, ততদিন সাধারণ তন্ত্রের ন্যায় অতবড় বিস্তৃত রাজ্য-প্রণালীর তেমন আবশ্যকতা থাকে না। এক রাজায় আর যখন চলে না, তখন সে রাজার দিন ফুরায়। য়ুরোপে তাহাই হইয়া আসিয়াছে। কবিতার রাজ্যও অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে। বৃহত্তম অনুভাব হইতে অতি সূক্ষ্মতম অনুভাব, জটিলতম অনুভাব হইতে অতি বিশদতম অনুভাব সকল কবিতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এখনকার কবিতায় এমন সকল ছায়া-শরীরী মৃদুস্পর্শ কল্পনা খেলায়, যাহা পুরাতন লোকদের মনেই আসিত না ও সাধারণ লোকেরা ধরিতে ছুঁইতে পারে না; এমন সকল গূঢ়তম তত্ত্ব কবিতায় নিহিত থাকে যাহা সাধারণত সকলে কবিতার অতীত বলিয়া মনে করে। প্রাচীন কালে কবিতায় কেবল নলিনী মালতী মল্লিকা যুঁথি জাতি প্রভৃতি কতকগুলি বাগানের ফুল ফুটিত, আর কোন ফুলকে যেন কেহ কবিতার উপযুক্ত বলিয়াই মনে করিত না, আজকাল কবিতায় অতি ক্ষুদ্র-কায়া, সাধারণতঃ চক্ষুর অগোচর, তৃণের মধ্যে প্রস্ফুটিত সামান্য বনফুলটি প ফুটে। এক কথায়—যাহাকে লোকে, অ হইয়াছে বলিয়াই হউক বা চক্ষুর দো হউক, অতি সামান্য বলিয়া দেখে, একেবারে দেখেই না, এখনকার ক তাহার অতি বৃহৎ গূঢ়ভাব খুলিয়া দে আবার যাহাকে অতি বৃহৎ, অতি অন বলিয়া লোকে ছুঁইতে ভয় করে, এখন কবিতায় তাহাকেও আয়ত্তের মধ্যে আ দেয়। অতএব এখনকার উপযোগী মহাক একজনে লিখিতে পারে না, একজনে লি না।

এখন শ্রম-বিভাগের কাল। সভ্য প্রধান ভিত্তিভূমি শ্রমবিভাগ। কবিতা শ্রমবিভাগ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রমবিভা আবশ্যক হইয়াছে।

গীতিকাব্য এবং খণ্ডকাব্যের মহাকাব্যের প্রধান প্রভেদ কি? মহাকাব্যে নানা ঘটনায়, নানা চরিত্রের বিভিন্ন অনুভাব সকল বর্ণিত হইয়া গীতিকাব্য ও খণ্ডকাব্যে একটি কি চরিত্র, একটি কি দুইটি ঘটনা, একটি দুইটি অনুভাব মাত্র ঘনীভূত হইতে থা তাহার মধ্যে অনেকগুলি আবার ক নিজের ভাব নিজের কথা মাত্র। প্রায় দেখা যায়, যে সময় মহাকাব্যের স সে সময় খণ্ডকাব্যের সময় নহে। বাল্মী ব্যাসের সময় কালিদাস জন্মগ্রহণ ক নাই। মহাকাব্যে যে সকল অনুভাব এ বর্ণিত হয়, তাহাদের তত গাঢ়তা থাকি পারে না। তাহা হইলে মহাকাব্য র শিল্প-নৈপুণ্যের ব্যাঘাত করে। তা

স্ত অনুভাবের একটা সামঞ্জস্য রাখা বশ্যক, নহিলে সহসা পরিমাণ-বহির্ভূত ইয়া পড়ে। একপ্রকার বিশেষ প্রণালীর াপত্য আছে, যাহাতে থামগুলা মোটামোটা প্রকাণ্ড হয়, অলঙ্কার নাই, ছোট-ছোট কিছুই নাই, সাদাসিধে অথচ প্রকাণ্ড। হাকাব্যে সেইরূপ। তাহাতে অনুভাবের সকল রকম খেলা থাকিতে পারে না। তাহাতে সহজে যে সকল সরল মোটা-মোটা অনুভাবগুলি আসিতে পারে, সেইগুলিই থাকে। আর সেই সহজ বড় বড় অনুভাব গুলিই প্রাচীন লোকদের ও প্রাচীন কবিদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁহাদের অনুভাবগুলি সরল, পরিষ্কার, উপরে ভাসমান, তাহাদের দ্বিত্ব নাই, জটিলতা নাই। যখন জটিল, লীলাময়, গাঢ়, বিচিত্র, বেগবান মনোবৃত্তি সকল সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত, ঘটনাবৈচিত্র্যের সহিত, অবস্থার জটিলতার সহিত হৃদয়ে জন্মিতে থাকে, তখন আর মহাকাব্যে পোষায় না। তখনকার উপযোগী মহাকাব্য লিখিয়া উঠাও একজনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং তখন খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য আবশ্যক হয়। গীতিকাব্য মহাকাব্যের পূর্ব্বেও ছিল কি না সে কথা পরে আলোচিত হইবে। এক মহাকাব্যের মধ্যে সংক্ষেপে, অপরিস্ফুটভাবে অনেক গীতিকাব্য থাকে, অনেক কবি সেইগুলিকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। শকুন্তলা, উত্তর-রাম-চরিত প্রভৃতি তাহার উদাহরণ-স্থল। গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য যখন এতদূর বিস্তৃত হইয়া উঠে, যে, মহাকাব্যের অল্পায়তন স্থানে তাহারা ভাল স্ফূর্ত্তি পায় না, তখন তাহারা পৃথক হইয়া পড়ে। অতএব ইহাতে কবিতার অশুভ আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই।

প্রথমে সৌরজগৎ একটি বাষ্পচক্র ছিল মাত্র, পরে তাহা হইতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহ-উপগ্রহ সকল সৃজিত হইল। এখনকার মতন তখন বৈচিত্র্য ছিল না। আমাদের এই বিচিত্রতাময় খণ্ড ও গীতিকাব্য সমূহের বীজ মাত্র সেই সৌর মহাকাব্যের মধ্যে ছিল। কিন্তু তাহাই বলিয়া আমাদের মত বসন্ত বর্ষা ছিল না; কানন, পর্ব্বত, ছিল না; পশু পক্ষী পতঙ্গ ছিল না; সকলেরই মূল কারণ মাত্র ছিল। এখন বিচ্ছিন্ন হইয়া সৌরজগৎ পরিপূর্ণতর হইয়াছে। ইহার কোন অংশ সেই মহা সৌরচক্রের সমান নহে বলিয়া কেহ যেন না বলেন যে, জগৎ ক্রমশই অসম্পূর্ণতর হইয়া আসিয়াছে। এখন সৌর জগতের মহত্ত্ব অনুধাবন করিতে হইলে এই বিচ্ছিন্ন, অথচ আকর্ষণ-সূত্রে বদ্ধ মহারাজ্যতন্ত্রকে একত্র করিয়া দেখিতে হইবে; তাহা হইলে আর কাহারো সন্দেহ থাকিবে না যে, এখনকার সৌরজগৎ পরিস্ফুটতর উন্নততর। জগতেরও উন্নতি-পর্য্যায়ের মধ্যে শ্রম-বিভাগ আছে। সৌর-জগতের কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, পৃথক পৃথক হইয়া কাজের ভাগ না করিলে কোন মতেই চলে না। যদি আধুনিক বিজ্ঞান-রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়াও কিয়দ্দূর যাওয়া যায়, যদি এই একত্র-সম্মিলিত বাষ্পরাশিগত অবস্থার পূর্ব্বেও আর কোন অবস্থা থাকে এমন অনুমান করা যায়, তবে তাহা নানা স্বতন্ত্র আদি ভূত সমূহের অস্ফুটভাবে পৃথক ভাবে বিশৃঙ্খল

সঙ্করণ, পরস্পর সংঘর্ষ। যাহাকে ইংরাজিতে chaos বলিয়া থাকে। প্রথমে বিশৃঙ্খল পার্থক্য, পরে একত্র সম্মিলন, ও তাহার পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিচ্ছেদ। আমাদের বুদ্ধির রাজ্যেও এই নিয়ম। প্রথমে কতকগুলা বিশৃঙ্খল পৃথক সত্য, পরে তাহাদের এক শ্রেণীবদ্ধ করা, ও তৎপরে তাহাদের পরিস্ফুট বিভাগ। সমাজেও এই নিয়ম। প্রথমে বিশৃঙ্খল পৃথক পৃথক ব্যক্তি, পরে তাহাদের এক শাসনে দৃঢ়রূপে একত্রীকরণ, তাহার পরে প্রত্যেক ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত ও যথোপযুক্ত পরিমাণে সুশৃঙ্খল স্বাতন্ত্র্য, সুসংযত স্বাধীনতা। কবিতাতেও এ নিয়ম খাটে। প্রথমে ছাড়াছাড়া বিশৃঙ্খল অস্ফুট গীতোচ্ছ্বাস, পরে পুঞ্জীভূত মহাকাব্য, তাহার পরে বিচ্ছিন্ন পরিস্ফুট গীতসমূহ। সৌর জগতকে যে ভাবে দেখা আবশ্যক, উন্নততর সাহিত্যের কবিতাকেও সেইভাবে দেখা কর্ত্তব্য। নহিলে ভ্রমে পড়িতে হয়।

সভ্যতার জোয়ারের মুখে সমস্ত সমাজ তীরের মত অগ্রসর হইতেছে; কেবল কবিতাই যে উজান বাহিয়া হঠিতেছে এমন কেহ না মনে করেন। এখন ব্যক্তির (individual) গুরুত্ব লোপ পাইতেছে বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে সংসার খাট হইয়া আসিতেছে। কারণ Tennyson বলিতেছেন —"The individual withers and the world is more and more."

একদল পণ্ডিত বলেন যে যতদিন অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব থাকে ততদিন কবিতার শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব সভ্যতার দিবসালোকে কবিতা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। আচ্ছা, তাহাই মানিলাম। মনে কর কবি নিশাচর পক্ষী। কিন্তু কথা হইতেছে যে, জ্ঞানের অনুশীলন যতই হইতেছে অজ্ঞানের অন্ধকার ততই বাড়িতেছে, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন? বিজ্ঞানের আলো আর কি করেন কেবল "makes the darkness visible". বিজ্ঞান প্রত্যহ অন্ধকার আবিষ্কার করিতেছেন। অন্ধকারের মানচিত্র ক্রমেই বাড়িতেছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিক কলম্বস্ সমূহ নূতন নূতন অন্ধকারের মহাদেশ বাহির করিতেছেন। নিশাচরী কবিতার পক্ষে এমন সুখের সময় আর কি হইতে পারে! সে রহস্য-প্রিয়। কিন্তু এত রহস্য কি আর কোন কালে ছিল? এখন একটা রহস্যের আবরণ খুলিতে গিয়া দশটা রহস্য বাহির হইয়া পড়িতেছে। বিধাতা রহস্য দিয়া রহস্য আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। একটা রহস্যের রক্তবীজকে হত্যা করিতে গিয়া তাহার প্রত্যেক লক্ষ লক্ষ রক্তবিন্দুতে লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ জন্মিতেছে। মহাদেব রহস্য-রাক্ষসকে এইরূপ বর দিয়া রাখিয়াছেন, সে তাঁহার বরে অমর।

যেমন, এমন ঘোরতর অজ্ঞ কেহ কেহ আছে, যে, নিজের অজ্ঞতার বিষয়েও অজ্ঞ, তেমনি প্রাচীন অজ্ঞানের সময় আমরা রহস্যকে রহস্য বলিয়াই জানিতাম না। অজ্ঞানতার একটা বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, সে রহস্যের একটা কল্পিত আকার, আয়তন, ইতিহাস, ঠিকুজি, কুষ্ঠি পর্য্যন্ত তৈরি করিয়া ফেলে, এবং তাহাই সত্য বলিয়া মনে করে। অর্থাৎ প্রাচীন কবিরা রহস্যের

[illegible]তাকে সেবা করিতেন। এখনকার [illegible]বিরা জ্ঞানের অস্ত্রে তাহার আকার [illegible]নতন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাকে আরো [illegible]স্য করিয়া তুলিতেছেন। এই নিমিত্ত [illegible]াচীন কালের অজ্ঞান অবস্থা কবিতার [illegible]ক্ষে তেমন উপযোগী ছিল না। [illegible]পৌরাণিক সৃষ্টিসমূহ দেখিলে আমাদের [illegible]থার প্রমাণ হইবে। বহুকাল চলিয়া [illegible]াসিয়া এখন তাহা আমাদের হৃদয়ের [illegible]ধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এখন [illegible]াহা কবিতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ [illegible]এখন তাহাতে আমাদের মনে নানা ভাবের [illegible]দ্রেক করে। কিন্তু পাঠকেরা যদি ভাবিয়া [illegible]দেখেন, যে, এখনকার কোন কবি যথার্থ [illegible]ত্য মনে করিয়া, যেরূপ তাঁহার খেয়ালে [illegible]য় সেইরূপ করিয়া, ঊষা বা সন্ধ্যার একটা [illegible]ড়ন বাঁধিয়া দেন, সকল লোকেই যদি তাহাই সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লয়, তাহা হইলে কবিতার রাজ্য কি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে! কত লোকে সন্ধ্যা ও ঊষাকে কল্পনায় কত ভাবে, কত আকারে দেখে, আর এক সময় একরকম দেখে, আর এক সময়ে আর একরকমে দেখে, কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ করিলে তাহাদের সকলেরই কল্পনার মধ্যে একটা বিশেষ ছাঁচ তৈরি করিয়া রাখা হয়, ঊষা ও সন্ধ্যা যখনি তাহার মধ্যে গিয়া পড়ে তখনি একটা বিশেষ আকার ধারণ করিয়া বাহির হয়।

যতই জ্ঞান বাড়িতেছে ততই কবিতার রাজ্য বাড়িতেছে। কবিতা যতই বাড়িতেছে কবিতায় ততই শ্রম-বিভাগের আবশ্যক হইতেছে, ততই খণ্ডকাব্য গীতিকাব্যের সৃষ্টি হইতেছে।

রেলগাড়ি

সাহিত্যের রেলগাড়িতে ভাবগণ বা ভাবুকগণ আরোহী। যশের এঞ্জিনে কালের রাস্তায় চলিতেছে। যে যত মূল্য দিয়াছে, সে তত উচ্চ-শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে, কেহ ফার্ষ্ট ক্লাশে, কেহ সেকেণ্ড, কেহ থার্ড ক্লাসে। যে যত মূল্য দিয়াছে সে সেই পরিমাণে দূরে যাইতে পারিবে। কোন্ কালে বাল্মীকি ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট লইয়া গাড়ীতে চড়িয়াছেন, এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার ষ্টেষণ ফুরায় নাই। আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টি যতদূর চলে ততদূর চালনা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে অলঙ্কার দিয়া এইরূপ বলিতে পারি, যে, যেখানে কালের Terminus— যাহার উর্দ্ধে আর ষ্টেষন নাই, যে ষ্টেষনে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র আসিয়া থামিবে, সেই ষ্টেষণে যাইবার টিকিট তিনি ক্রয় করিয়াছেন। গাড়ির গার্ড পাঠক-সম্প্রদায়, সমালোচক। ইঁহারা যে নিজেদের কাজ যথেষ্ট মনোযোগ দিয়া করেন না, তাই সকলেই জানেন। আরোহীদের প্রতি সর্ব্বদাই বিশেষ অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। কত শত ভাব তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া গোলেমালে

প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া পড়ে; সকলেই তাহাকে খাতির করে, সেলাম করে, অভ্যর্থনা করে। এমন দু-এক ষ্টেষণ গিয়া কেহ কেহ ধরা পড়ে, গার্ড্ তৎক্ষণাৎ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বাহির করে, তাহার যথোপযুক্ত গাড়িতে উঠাইয়া দেয়; কেহ কেহ এমন কত ষ্টেষণ পার হইয়া যায় কেহ খোঁজ লয় না। ইহাতে কেবল মাত্র অমনোযোগিতা, কিন্তু গার্ডেরা ইহা অপেক্ষাও অন্যায় কাজ করিয়া থাকেন; আলাপ থাকিলে, বন্ধুতা থাকিলে অনেক থার্ড্ ক্লাশকে ফার্ষ্ট ক্লাশে চড়াইয়া দেন। এমন ত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, নালিশ করি কাহার কাছে? যিনি দোষী, তিনিই বিচারক। কত শত মুখচোরা, ভীরুস্বভাব, সঙ্কোচ-পরায়ণ বেচারী ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট কিনিয়া, ভিড়ে, গোলেমালে, ঠেলাঠেলিতে শশব্যস্ত হইয়া থার্ডক্লাশে উঠিয়া পড়েন, কতশত ষ্টেষণ পার হইয়া সহসা গার্ডের নজরে পড়েন ও তাঁহারা উপযুক্ত শ্রেণীতে স্থান পান। এই সকল বেবন্দোবস্ত কোন কালে যে দূর হইবে, এমন ভরসা হয় না। সকল বিষয়েই দেখ, জগতে মূল্য দিয়া তাহার উপযুক্ত সামগ্রী খুব কম লোকেই পাইয়াছে; হয় দোকানদার তাহাকে ঠকাইয়াছে, নয়, সে দোকানদারকে ঠকাইয়াছে। এ সকল কেবল অসাবধানতার ফল। যত দিন রেলগাড়ি থাকিবে ততদিন শত শত ফার্ষ্টক্লাশের আরোহী থার্ডক্লাশে চড়িবে, ইহা নিবারণের উপায় দেখিতেছি না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটা আমার দুঃখ আছে। রেলোয়ের কর্ম্মচারীগণ বিনা টিকিটে সেকেণ্ড্ক্লাসে ভ্রমণ করিতে পারেন। তাঁহারা চিরদিন পরের টিকি সমালোচনা করিয়াই কালযাপন করিয়াছে নিজে একখানি টিকিটও ক্রয় করেন নাই ইহা কি সত্য নয়, যে, তিনি নি আপনাকে যত বড় ব্যক্তিই মনে করুন না যতক্ষণে না তিনি ট্যাঁকের পয়সায় টিকি কিনিবেন, ততক্ষণে তিনি চতুর্থ শ্রেণী আরোহী অপেক্ষাও অল্প সম্মান পাইবা যোগ্য। কিন্তু এই সমালোচকবর্গ যে, বি পয়সায় দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট-ক্রেতাদিগে সমতুল্য সম্মান পাইয়া থাকেন, ও অহঙ্কা এতখানি ফুঁপিয়া উঠেন যে, পাঁচটা আরোহী জায়গা একা জুড়িয়া বসেন, ইহা সর্ব্বতো ভাবে ন্যায়-বিরুদ্ধ। অনেকে বিনা টিকি অসঙ্কোচে গাড়ীতে চড়িয়া বসেন; তা দেখিয়া সকলেই মনে করে, অবশ্য ইহা কাছে টিকিট আছে, কেহ সন্দেহও ক না, জিজ্ঞাসাও করে না। গার্ড দেখি তাঁহার পাকাদাড়ি, পাকাচুল; অনেক দি হইতে ফার্ষ্টক্লাশে চড়িয়া আসিতেছেন; তাঁহা টিকিটের কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্তিও হই না, সাহসও হইল না কাহারো বা হীরা আংটি, ঘড়ির চেন, জরির তাজ দেখিল,— আর টিকিট দেখিল না। সাহিত্য-রেলোয়ে কোম্পানিতে এইরূপ বহুবিধ অনিয়ম ঘটিতেছে; আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি, যতবড় লোকই হউন্ না কেন টিকিট নিতান্ত মনোযোগ সহকারে আলোচনা না করিয়া কাহাকেও ছাড়া উচিত নহে। কিন্তু অত পরিশ্রম করে কে? আবার, অধিক কড়াকড় করিলেও নিন্দা হয়।

যাঁহারা টিকিট কিনিয়া ট্রেণ মিস্ করেন, হাদের জন্য বড় মায়া করে। তাঁহারা ক সময়ে অসেন নাই। সময়-মাফিক াসিয়াছিল বলিয়া কত থার্ড ক্লাসের লোক াড়িতে উঠিল, এমন কি, কত লোক কিট না কিনিয়াও গাড়িতে উঠিল; সময়ে আসিয়াছেন বলিয়া কত ফার্ষ্টক্লাসের াক পড়িয়া রহিলেন। যাহা হউক্ হাদের জন্য ভবিষ্যৎ আছে, দ্বিতীয় ট্রেণ াসিলে তাঁহারা চড়িতে পাইবেন। কিন্তু হাদের অনেকে বিরক্ত, ক্ষুব্ধ হইয়া বাড়িতে রিয়া যান, ষ্টেসনে অপেক্ষা করেন না। ইরূপে কত প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি বিরক্ত ইয়া তাঁহাদের টিকিট ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন, কেটে পয়সা আনিয়া টিকিট ক্রয় করেন াই, তাঁহাদের সংখ্যা গণনা কে করিবে? ফ্রি যে ট্রেণে গার্ড ছিলেন, বাইরণ যে ট্রেণে আরোহী ছিলেন, সেই ট্রেণ ধরিবার ন্য ওয়ার্ডস্বার্থ ও যেলী ষ্টেশনে উপস্থিত ইলেন, কিন্তু তখন গাড়ি দ্রুতবেগে লিয়াছে; তাঁহারা ট্রেণ মিস্ করিলেন; িতীয় ট্রেণ আসিলে পর তাঁহারা স্থান াইলেন। আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্যে াম্প্রতি যে ট্রেণ চলিতেছে, অনেক বড় বড় ব্যক্তি সে ট্রেণটা মিস্ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেন নিরাশ হইতেছেন? দশ মিনিট সবুর করুন্, আর একখানা ট্রেণ এল ব'লে! বঙ্গীয় সাহিত্য-ট্রেণে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাশে আরোহী নিতান্তই কম, অন্যান্য ক্লাশে অত্যন্ত ভিড়। এই নিমিত্ত গার্ডেরা বাছিয়া বাছিয়া দুই এক জনকে ফার্ষ্ট ক্লাশে বসিতে দেয়। তাহারা যদিও ফার্ষ্ট ক্লাশে বসিয়াছে, তথাপি গার্ড্ জানে যে তাহারা থার্ড ক্লাশের আরোহী। তাহাদের বলে, বাঙ্গলার মিল্টন, বাঙ্গলার বাইরণ্, বাঙ্গলার ফসেট্ ইত্যাদি, অথচ মনে মনে সকলেই জানে যে, তাহারা মিল্টন, বাইরণ, ফসেটের সমতুল্য নহে; অনুগ্রহ করিয়া এক ক্লাশে বসিতে দিয়াছে মাত্র। কিন্তু এমন করিবার আবশ্যক কি? ইহাতে বুদ্ধিমান লোকের নিতান্ত সঙ্কোচ জন্মিবার কথা। তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই ত ভাল হয়!

বঙ্গীয় সাহিত্য-কোম্পানীতে খুচরা, টুকরা মাল-বোঝাই গোটাকতক মাল গাড়ি অর্থাৎ খবরের কাগজ, একরকম বেশ চলিতেছে। কিন্তু ভাব-আরোহীদিগের জন্য আরোহী-শকট অর্থাৎ মাসিক প্রবন্ধ-পত্র ভাল চলিতেছে না। গাড়ি চলিবার জন্য এঞ্জিনে শ্বেতবর্ণ খনিজ কয়লার আবশ্যক। কোথায় পাইবে বল! সাহিত্য-এঞ্জিন কেন, দেশে সহস্র এঞ্জিন বেকার পড়িয়া আছে, ভারতবর্ষের রাজা-গঞ্জে রাণী-গঞ্জে কয়লা যে নাই, এমন নহে, কিন্তু এত গভীর অকালে নিহিত যে, সহস্র মাথা খুঁড়িলেও পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আর এক, উত্তমের কয়লা আছে, তাহাও বাঙ্গলা দেশে এমন বিরল ও বাঙ্গলার কয়লায় এত অধিক ধোঁয়া হয় ও এত কম আগুন জ্বলে যে, দুই পা গিয়াই গাড়ি চলে না। আমারও কলমের কয়লা ফুরাইয়া গিয়াছে, এইখানেই চলা বন্ধ করিয়াছে; ষ্টেশন যদিও দূরে আছে, কথা যদিও বাকী আছে, কিন্তু আর লিখিতে পারিতেছি না, কয়লা নিভিয়া গিয়াছে।

ছন্নছাড়া

(১৯)

কোলেতের কথা মারি এমে জানতে পেরেছেন কিনা তাই শোনবার জন্যে মনটা ভারি ব্যস্ত হয়ে রইল। কিন্তু বিকেলের আগে তাঁর সঙ্গে আর দেখা হল না। বিকেলে আমরা বেড়াতে বেরুলুম। তাঁকে মোটেই বিমর্ষ দেখলুম না, বরং ভাবটা খুসি-খুসি। সে-সময় তাঁকে এমন চমৎকার দেখাচ্ছিল যে তেমন কখনো দেখিনি। তাঁর সমস্ত মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে বেড়াচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল ভিতর-থেকে কি-যেন তাঁকে ঠেলে-ঠেলে তুল্‌চে। এমন-করে চলতে তাঁকে কখনো দেখিনি। তাঁর মাথার কাপড়টা ঘাড়ের কাছে একটু এলিয়ে পড়েছিল এবং গলার খানিকটা খুলে গিয়ে ছিল। আমাদের দিকে তাঁর নজর ছিল না। কোনো-কিছুতেই তাঁর দৃষ্টি ছিল না—কিন্তু তবু মনে হচ্ছিল তিনি কি যেন দেখচেন। থেকে-থেকে একটা হাসির রেখা তাঁর মুখে ফুটে উঠছিল—বোধ হচ্ছিল কে যেন তাঁর অন্তরের ভিতর থেকে তাঁর সঙ্গে কথা কইচে।

সন্ধ্যাবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি গাছতলায় সেই পুরোনো বেঞ্চিটার উপরে গিয়ে বসলেন। পাদ্রিমশায়ও গাছের দিকে পিঠ করে তাঁর পাশে বসেছিলেন। দু জনেই গম্ভীর। আমি ভাবলুম, তাঁরা নিশ্চয় কোলেৎ সম্বন্ধে কথা কইচেন তাই একটু দূরে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলু যেন কি-একটা কথার জবাব দিয়ে এমে বল্লেন—"হাঁ, আমার তখন পনে বছর বয়স।" পাদ্রীমশায় বলে উঠ —"পনেরো বছর বয়সে তোমার জীব কোনো লক্ষ্যই ছিল না।" মারি কি উত্তর করলেন শুনতে পেলুম পাদ্রীমশায় বলে যেতে লাগলেন—"বি সে-বয়সে সম্ভবযোগ্য সব-কিছুই জীবনের হতে পারত। একটি মিষ্টি কথা কিম্বা এত তাচ্ছিল্য সমস্ত জীবনটাকে ওলটপা করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।" খানিকক্ষণ চি আর কিছু বল্লেন না, তার পর নীচু গ বল্লেন—"দোষ তোমার বাপ-মায়ের।" এমে বল্লেন—"আমার কোনো ক্ষোভ নেই তারপর অনেকক্ষণ ধরে তাঁরা কেউ এ কথাও বল্লেন না। সব চুপ-চাপ। মা এমে একটা আঙুল তুলে যেন তাঁর ম কথাগুলো দেগে দিতে চান এইভাবে পা মশায়কে বলে উঠলেন—"সর্ব্বত্র—সক সময়ে, সকল বাধা সত্ত্বেও।" পাদ্রীমহা তাঁর হাতখানা সামনের দিকে বাড়িয়ে দি হেসে উঠে পুনরাবৃত্তি কল্লেন—"সর্ব্বত্র—সক সময়, সকল বাধা সত্ত্বেও!"

হঠাৎ বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠল; পাদ্রীমশায় গাছে ঢাকা সেই সরু পথ দি ধীরে ধীরে চলে গেলেন। আমি অনে ক্ষণ ধরে তাঁদের মুখে শোনা ঐ কথা নি মনে মনে তোলাপাড়া করতে লাগলুম—কি

লেতের কাহিনীর সঙ্গে মোটেই তার খাওয়াতে পারলুম না।

(২০)

অলৌকিক ঘটনার দ্বারা মুক্তি পাবার নো আশা কোলেতের ছিল না, কিন্তু ও সে এখানে মন-টেঁকাতে পারছিল যখন দেখলে তার বয়সী সব মেয়েরা ক একে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে তখন যেন মরিয়া হয়ে উঠল। সে কোনো ম, কোনো শাসন মানতে চাইত না,— া-অর্চ্চনার সময় সে উপস্থিত থাকত না, ল উপাসনার সময় হাজির হত—কারণ ন তার গান গাইবার পালা। গানের ক তা'র ভারি ঝোঁক ছিল। আমি কাছে-কাছে থেকে তাকে সান্ত্বনা ম। সে একদিন আমায় বুঝিয়ে দিয়েছিল বিয়ে মানেই ভালোবাসা।

(২১)

মারি এমের শরীর তেমন ভালো যাচ্ছিল শেষে তিনি অসুখে পড়লেন। মাদ্‌লিন যত্নের সঙ্গে তাঁর শুশ্রূষা করতে ল—কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের প্রতি ব্যবহার ভয়ানক কড়া হয়ে উঠল। শষ করে আমাকেই সে বিষ-নজরে ত। আমার যখন সেলাই ভালো ত না, চুপ করে বসে থাকতুম, সে ার কাছে এসে নাক-সিঁটকে ত—"বিবি-সাহেবের সেলাই করতে যদি ত্তি থাকে ত একটা ঝাঁটা নিয়ে ঘর- ট দিতে পারেন।" একদিন রবিবার াসনার সময় হঠাৎ তার খেয়াল হল আমাকে র সিঁড়ি সাফ করাবে। তখন শীতকাল। একটা ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস অলিগলির ভিতর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আমায় গায়ে এসে লাগতে লাগল। শরীরটাকে গরম করবার জন্যে আমি খুব জোরে-জোরে ঝাঁটা ঘষতে লাগলুম। উপাসনার ঘর থেকে হার্ম্মোনিয়মের শব্দ আসছিল। থেকে থেকে মাদ্‌লিনের খরখরে গলার চীৎকার ও পাদ্রীসাহেবের ঘড়ঘড়ে আওয়াজ পাচ্ছিলুম। উপাসনার কোথায় কখন কি হচ্ছে গান শুনে-শুনে আমি সব ধরতে পারছিলুম। হঠাৎ কোলেতের গলা সবাইকে ছাড়িয়ে উঠল। সে গলার যেমন জোর তেমনি তা নিখুঁত। সে সুর ফুলে ফুলে উঠতে লাগল—হার্ম্মোনিয়মের শব্দ কোথায় তলিয়ে গেল—সমস্ত শব্দকেই ছাপিয়ে উঠল। তার পর মনে হল যেন সেই সুর বাড়ির উপর দিয়ে, সারি সারি গাছের মাথা দিয়ে, গির্জ্জের চুড়ো ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেল। আমার সমস্ত শরীর ছম্‌ছম্ করতে লাগল। তার পর সেই সুর যখন আবার পৃথিবীর উপর নেমে এল, কাঁপতে কাঁপতে গির্জ্জের মধ্যে প্রবেশ করলে এবং আবার হার্ম্মোনিয়মের সুরের মধ্যে গিয়ে মিশিয়ে গেল, আমি কেঁদে ফেল্লুম—ছেলেমানুষে যেমন করে কাঁদে সে তেমনি কান্না! তার পর মাদ্‌লিনের সেই সরু খন্‌খনে গলার সুর আর-সবাইয়ের সুরকে ফুঁড়ে আসতে লাগল। আমি খুব জোরে-জোরে ঘস্‌ঘস্ শব্দে ঝাঁটা ঘসতে লাগলুম—যেন আমার সেই ঝাঁটা দিয়ে ঐ কর্কশ সুরটাকে আঁচড়ে আঁচড়ে ছিন্নভিন্ন করে দেব।

(২২)

সে দিন মারি এমে আমাকে তাঁর

কাছে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। দুমাস তিনি বিছানায় পড়ে; সেই সবেমাত্র একটু ভালো হয়েছেন। দেখলুম, তাঁর চোখের আভা একেবারেই নেই। তাই দেখে আমার মনে হল ঠিক যেন একটা রামধনু আকাশের গায়ে মিলিয়ে এসেচে। কোথায় কি হচ্ছে তারই গল্প আমার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি শুনতে লাগলেন—এবং আমার কথার মধ্যে মধ্যে হাসবার চেষ্টা করলেন। আমি দেখলুম সে হাসিতে মুখের একটামাত্র দিক হাসচে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, অসুখের সময় তাঁকে আমি চীৎকার করতে শুনেছি কি না। আমি বল্লুম—"ওঃ! শুনেছি বই কি।" তিনি মাঝরাত্রে এমন চেঁচিয়েছিলেন যে আমাদের ঘরসুদ্ধ সকলে জেগে উঠল। মাদ্‌লিন ছুটোছুটি করতে লাগল এবং তার জল-ছিটকানোর শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম। অমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, মারি এমের হয়েছে কি? সে ছুটোছুটি করে আমাদের পাশ দিয়ে যাবার মুখে বলে গেল—"বাত হয়েছে।" আমার মনে পড়ল বন্ জিস্তিনকে একবার বাতে ধরেছিল। সে কিন্তু এমন বিদ্‌কুটে চীৎকার করেনি।- আমি ভাবতে লাগলুম মারি এমের পা বন্ জিস্তিনের মতো ফুলে তিন- ডবল হয়ে উঠল কি না। ক্রমেই তাঁর সেই চীৎকার ভয়ানক হয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ একবার এমন হল যে মনে হল বুঝি সে [illegible]নি বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে এল। তারপর [illegible]নি গোঁ-গোঁ করে কাতরাতে লাগলেন [illegible] কিছু নয়। খানিকক্ষণ পরে [illegible]বনোর কানে-কানে কি বল্লে—রেনো কাপড় পরে নীচে [illegible] গেল। তারপর পাদ্রীকে সঙ্গে করে [illegible] এল। পাদ্রীমহাশয় ঝড়ের মতো [illegible] এমের ঘরে প্রবেশ করলেন, সঙ্গে-[illegible] মাদ্‌লিন দরজা বন্ধ করে দিলে। [illegible] বেশীক্ষণ থাকলেন না। কিন্তু দেখলুম যে তাড়াতাড়ি এসেছিলেন তেমনি আস্তে আস্তে ফিরে গেলেন। কাঁধ দুটোর মধ্যে মাথাটা খুব-করে ঝুঁকিয়ে দিয়ে, ডান-হাতে গাঁ[illegible] জোব্বাটা বাঁ-হাতের উপর দিয়ে ধরে' তি[illegible] যেতে লাগলেন—যেন কি-একটা বহুমূ[illegible] জিনিষ বহে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি মনে-ম[illegible] ভাবলুম বোধ হয় দৈবী তেল তিনি নি[illegible] গেলেন, আমার মনে কেমন ভয় হতে লাগল [illegible]—সাহস হলনা কাউকে জিজ্ঞাসা ক[illegible] মারি এমে মারা গেলেন না কি। সেদি[illegible] মাদ্‌লিনের কাপড় আঁকড়ে ধরতে [illegible] আমাকে যে ধাক্কাটা মেরেছিল আমি [illegible] কখনো ভুলব না। ধাক্কা মেরে সে আমা[illegible] সটান ফেলে দিলে এবং ছুটে যেতে-যে[illegible] চুপি-চুপি বলে গেল—"ভালো আছেন। তার পর মারি এমে যখন একেবারে ভা[illegible] হয়ে উঠলেন তখন মাদ্‌লিনের ব্যবহার[illegible] ভালো হয়ে এ'ল—আগের মতোই স[illegible] চলতে লাগল।

(২৩)

সেলাইয়ের উপর আমার একেবারে বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল, মারি এমে তাইতে ভারি বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। সে কথা আমার সামনে তিনি পাদ্রীমহাশয়ের বোনের কাছে বলতেন। পাদ্রীমহাশয়ের বোন বুড়ী—বিয়ে হয়নি; লম্বা মুখ,

[illegible] বড় ঘোলাটে চোখ। আমরা [illegible]কে মাক্সিমিলিয়েন্ বলে ডাকতুম। [illegible]রি এমে তাঁর কাছে বলতেন যে আমার [illegible]বিষ্যৎ-সম্বন্ধে তাঁর বড় ভাবনা হয়। তিনি [illegible]তেন, আমি খুব সহজে শিখ্‌তে পারি বটে [illegible]ন্তু কোনো-রকম সেলাইয়ের কাজেই আমার [illegible]টুকু রুচি নেই;—পড়াশুনায় আমার ঝোঁক [illegible]ছে বলে তাঁর মনে হয়। তিনি অনেক খোঁজ [illegible]রছেন আমার এমন-কেউ আত্মীয় আছে [illegible] না যে আমার ভার নিতে পারে, [illegible]ন্তু এক বুড়ী ছাড়া আর-কোনো [illegible]ত্মীয়ের সন্ধান পাননি, সে আমার দিদির [illegible]র নিয়েছে, কিন্তু আমায় নিতে চায়নি। [illegible]ক্সিমিলিয়েন্ বল্লেন, তাঁর দর্জ্জীর দোকানে [illegible]মায় নিতে তিনি রাজী আছেন। [illegible] প্রস্তাব পাদ্রীমশায়ের খুব ভালো লাগল। [illegible]নি উৎসাহের সঙ্গে বল্লেন যে তাহলে [illegible]প্তাহে দুবার করে তিনি নিজে সেখানে [illegible]য়ে আমায় পড়িয়ে আসবেন। তাতে [illegible]রি এমের এত আনন্দ হল যে কি করে [illegible]দের কাছে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাবেন [illegible]জে পেলেন না। পাদ্রীমহাশয়কে একটা [illegible]জে' রোমে যেতে হচ্ছে, সেখান থেকে [illegible]তিনি ফিরে এলেই আমি ম্যাক্সমিলিয়েনের [illegible]ঙ্গে চলে যাবো এই স্থির হল। ইতিমধ্যে [illegible]রি এমে আমার সব জিনিষপত্র গুছিয়ে [illegible]খবেন আর মাক্সিমিলিয়েন্ গুরু-মায়ের কাছ [illegible]থেকে আমার বিদায়ের অনুমতি নিয়ে [illegible]সবেন। গুরুমায়ের নাম উঠতে আমার [illegible]কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। আমি যখন [illegible]রি এমে ও পাদ্রীমহাশয়ের পাশে বেঞ্চিতে [illegible]সে থাকতুম তিনি সামনে দিয়ে যাবার সময় আমার উপর যে রূঢ় কটাক্ষ করে যেতেন সে আমি ভুলতে পারব না। মাক্সি-মিলিয়েন্‌কে তিনি কি জবাব দেন তাই শোনবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে রইলুম। সপ্তাহ-খানেক হল পাদ্রীমহাশয় চলে গেছেন, মারি এমে সে সময় রোজই আমার যে নতুন কাজ হল তার কথা পাড়তেন। বলতেন, রবিবারে রবিবারে আমাদের দেখা হবে। কত যে উপদেশ দিতেন ঠিক নেই, ক্রমাগত বলতেন, ভালো হয়ে থেকো, শরীরের যত্ন নিয়ো।

(২৪)

গুরু-মা একদিন সকালে আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর ঘরে গিয়ে দেখলুম একখানা প্রকাণ্ড লাল চৌকির উপর তিনি বসে আছেন। তাঁর সম্বন্ধে মেয়েরা যে সব ভুতুড়ে গল্প বলে আমার তাই মনে পড়তে লাগল। চারিদিকে লাল, তার মধ্যে কালো পোষাকমোড়া তাঁর চেহারা দেখে আমার মনে হল যেন অন্ধকার কুটুরির মধ্যে প্রকাণ্ড একটা আফিম-ফুল ফুটে উঠেছে। তিনি খানিকক্ষণ ধরে চোখ-পিট্-পিট্ করতে লাগলেন। মুখের উপর একটা হাসি ছিল কিন্তু সে যেন অবজ্ঞার হাসি। আমার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল; কিন্তু আমি স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম। নাক-সিঁটকে ভুরু-কুঁচকে তিনি বল্লেন—"তোমায় ডেকেছি কেন জান?" আমি বল্লুম, বোধ হয় মাক্সিমিলিয়েন্ সম্বন্ধে কিছু বলবেন তাই। তিনি আবার নাক-সিঁটকে বল্লেন—"হুঁ, সেই কথাই বটে।" তিনি বল্লেন—"দেখ বাপু তোমার চোখ-ফোটা দরকার

হয়েছে। আমরা ঠিক করেছি তোমাকে সোলোঞ্চর এক চাষার বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।" চোখের পাতা অর্দ্ধেক বুজে কথার ঠোকর-মেরে-মেরে তিনি বল্লেন—"তোমায় রাখালের কাজ করতে হবে, বুঝলে?" তারপর ঠেস্ দিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন—"অর্থাৎ ভেড়া চরাতে হবে!" আমি বল্লুম—"তা বেশত!" তিনি নিজের শরীরটাকে গুটিয়ে নিয়ে খাড়া হয়ে বসে বল্লেন—"ভেড়া-চরানো কাকে বলে জানো?" আমি বল্লুম—"হাঁ, ভেড়া-চরানো দেখেছি।" তাঁর হল্‌দে মুখ-খানা আমার দিকে ঝুঁকিয়ে এনে তিনি বল্লেন—"তোমায় নিজের হাতে গোয়াল মুক্ত করতে হবে! তার ভারি দুর্গন্ধ! চাষার বাড়ির কাজ-কর্ম্ম দেখা, গোরুর দুধ-দোওয়া, শূয়োর ঘাঁটা—এ সবই তোমার করতে হবে!" তিনি প্রত্যেক কথাটির উপর জোর দিয়ে দিয়ে বলছিলেন,—তাঁর সন্দেহ হচ্ছিল পাছে আমি তাঁর কথার তাৎপর্য্য না বুঝতে পেরে থাকি। আমি আবার উত্তর করলুম—"আচ্ছা, তাই করব!" তিনি চৌকির হাতা ধরে খাড়া হয়ে উঠলেন, আমার উপর তাঁর তাক্ষ্ণ দৃষ্টিটা গেঁথে রেখে বলতে লাগলেন—"তোমার মনে অভিমান নেই!" আমি একটু হেসে বল্লুম—"না।" তিনি ভারি আশ্চর্য্য হলেন দেখলুম; আমাকে তখনও মিটি-মিটি হাসতে দেখে তাঁর গলার স্বর নরম হয়ে এল, তিনি বল্লেন—"তাই না কি বাছা! আমার বিশ্বাস ছিল তুমি ভারী অভিমানী।" তিনি চৌকির গায়ে আবার হেলে পড়লেন, চোখের পাতা দিয়ে দৃষ্টি ঢেকে তিনি এক-ঘেয়ে সুরে—যেমন করে প্রার্থনা বলে যান তেমনি করে গড়গড় করে বলে যেতে লাগলেন যে আমার মনিবের হুকুম যেন আমি অমান্য না করি, ধর্ম্মকর্ম্মের কর্ত্তব্য যেন না ভুলি, সেণ্টজন ভোজ যে দিন হবে তার আগের দিন এক চাষার স্ত্রী এসে আমায় নিয়ে যাবে ইত্যাদি।

আমি তাঁর ঘর থেকে মনের যে কি-রকম ভাব নিয়ে বেরিয়ে এলুম তা প্রকাশ করে বলতে পারি না। কিন্তু মারি এমের মনে কষ্ট দিতে আমার ভারি সঙ্কোচ হতে লাগল। কেমন করে তাঁকে বলব? তিনি আমার অপেক্ষায় পথেই দাঁড়িয়েছিলেন। ছুটে এসে আমার কাঁধ দুটো ধরে, আমার মুখের কাছে হেঁট হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হল?" তাঁকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। আমি বল্লুম—"তাঁর ইচ্ছা আমায় রাখালের কাজে দেওয়া হয়!" তিনি কথাটা বুঝতে পাল্লেন না, কপাল কুঁচকে বল্লেন—"রাখালের কাজ? সে কি?" আমি বলে গেলুম—"হাঁ, এক চাষার বাড়িতে আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে—আমায় সেখানে দুধ দুইতে হবে-শূয়োর ঘাঁটতে হবে।" মারি এমে এমন জোরে ঠেলে সরিয়ে দিলেন যে দেয়ালে আমার মাথা ঠুকে গেল। তিনি দরজার দিকে ছুটে গেলেন। মনে হল তিনি গুরুমায়ের ঘরে যাচ্ছেন; কিন্তু তিনি সটান বেরিয়ে গেলেন; আবার ফিরে এসে পথ-ঘরটায় ঘন ঘন পায়চারি করতে লাগলেন। হাতের মুঠো তাঁর শক্ত হয়ে উঠল এবং থেকে-থেকে মাটির উপর পায়ের চাপড় পড়তে লাগল। তিনি টেনে টেনে

শ্বাস ফেলতে লাগলেন। অবশেষে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, হাত দুটো ঝুলে পড়ল—যেন একেবারে অবসন্ন। তিনি স্বরে কথা বলতে লাগলেন যে মনে হল সে স্বর অনেক দূর থেকে আসছে;—তিনি বলে উঠলেন—"এ তার প্রতিহিংসা। এমনি করে সে শোধ তুলচে!" তিনি আমার কাছে এগিয়ে এলেন, আদর করে আমার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি একবার বল্লেও না যে আমি যাবো না? মাক্সিমিলিয়েনের কাছে যাবার জন্যে একটা প্রার্থনাও জানালে না?" আমি ঘাড় নাড়লুম; গুরু-মা আমায় যে-সব কথা বলেছেন আমি অবিকল তাই বলে যেতে লাগলুম। তিনি চুপ করে শুনতে লাগলেন। তার পর বল্লেন, যেন এ সব কথা আমি মেয়েদের কাছে না বলি! তিনি বল্লেন, কোন ভাবনা নেই, পাদ্রীমশায় ফিরে এলেই এ-সব গোল চুকে যাবে।

(২৫)

পরের রবিবার আমরা উপাসনায় যাবার জন্যে সার-বন্দি হচ্ছি এমন সময় মাদ্‌লিন পাগলের মতো হয়ে ছুটতে ছুটতে ঘরের মধ্যে এল। হাত-দুটো উপর দিকে উঁচু করে তুলে চীৎকার করে উঠল—"ওগো পাদ্রীমশায় মারা গেছেন গো!"—বলে তার সামনের টেবিলটার উপরে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমাদের সকলকার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল, আমরা তার কাছে ছুটে গেলুম, সে পড়ে-পড়ে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। ব্যাপারটা সব জানবার জন্যে আমরা ছটফট করতে লাগলুম কিন্তু সে কেবল টেবিলটার উপর আছড়ে আছড়ে পড়ে বলতে লাগল—"তিনি আর নেই—আর নেই!" আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম। আমার কোনো দুঃখ হচ্ছে কি না বুঝতে পারলুম না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপাসনা চলছিল মাদ্‌লিনের সেই গলার স্বর আমার কানে ঘণ্টার শব্দের মতো বেজে বেজে উঠছিল। সেদিন আমাদের বেড়ানো বন্ধ রইল। ছোটো ছোটো মেয়েরা পর্য্যন্ত কেউ টুঁ শব্দ করলে না। আমি মারি এমেকে দেখতে গেলুম—তিনি সেদিন উপাসনায় আসেন নি; মারি রেনো আমায় বল্লে তাঁর শরীর কিন্তু ভালো আছে। জল-খাবার ঘরে তাঁর খোজ পেলুম। দেখলুম তাঁর নিজের সেই উঁচু জায়গাটিতে তিনি বসে আছেন,—টেবিলের উপর তাঁর মাথাটি ঝুঁকে রয়েছে, হাতদুখানি চেয়ারের গায়ে ঝুলে পড়েছে। আমি একটু দূরে চুপটি করে বসে রইলুম। কিন্তু যেমন দেখলুম তিনি কেঁদে উঠলেন অমনি আমার বুকের ভিতর থেকে কান্না ঠেলে বেরিয়ে এল। আমি দু হাত দিয়ে চোখ ঢেকে কাঁদতে লাগলুম। কিন্তু বেশীক্ষণ কাঁদতে পারলুম না;—মনে হতে লাগল যতটা দুঃখ হওয়া উচিত আমার ততটা দুঃখ হচ্ছে না। আমার কাঁদবার ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু আমি চোখ দিয়ে এক-ফোঁটা জল বার করতে পারছিলুম না। আমার ভারি লজ্জা হতে লাগল; কারণ আমি জানতুম কেউ মরে গেলে তার জন্যে কান্নাকাটি করা উচিত। আমি লজ্জায় মুখ-থেকে হাত সরাতে পারছিলুমনা; ভয় হচ্ছিল, মারি এমে যদি দেখেন আমার চোখে জল নেই তা'হলে তিনি ভাববেন আমি কী নিষ্ঠুর!

আমি বসে বসে তাঁর কান্না শুনছিলুম। সেই কান্নার শব্দ শীতকালের বাতাসের ঝাপটার মতো কানে এসে লাগছিল। সে শব্দ কেবলই উঁচু থেকে নীচু এবং নীচু থেকে উঁচু হয়ে-হয়ে উঠছিল—মনে হচ্ছিল তিনি যেন গানের একটা সুর বসাচ্ছেন। হঠাৎ সে-শব্দ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে ছিঁড়ে গেল এবং তার গভীর রেশ কাঁপতে কাঁপতে আকাশে মিলিয়ে গেল। খাবার আসবার কিছু আগে মাদ্‌লিন সেই ঘরে এল—সে এসে মারি এমেকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল, হাত দিয়ে তাঁকে ভালো করে ঘিরে ধরলে—খুব সাবধানে নিয়ে যেতে লাগল। রাত্রে সে আমাদের বল্লে যে পাদ্রী-মহাশয় রোমে মারা গেছেন—তাঁকে ফিরিয়ে আনা হবে তাঁর আত্মীয়দের কাছে গোর দেবার জন্যে।

(২৬)

পরদিন মারি এমে আগের মতোই আমাদের সব খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন, আর কান্নাকাটি করলেন না; কিন্তু আমাদের-কাউকে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে দিলেন না। তিনি মাটির দিকে চোখ নীচু করে বেড়াতে লাগলেন—আমার মনে হতে লাগল, আমাকে যেন আর তাঁর মনে নেই। আমার আর একদিন মাত্র বাকি। গুরুমা বলেছিলেন কাল আমায় নিতে আসবে;—পরশু সেণ্টজন ভোজ। সন্ধ্যা বেলা প্রার্থনার শেষে মারি এমে যখন বল্লেন—"হে ভগবান, যারা নির্ব্বাসিত এবং যারা কারারুদ্ধ তাদের প্রতি তোমার করুণা বর্ষিত হোক!" সেই সময় তিনি উচ্চ কণ্ঠে এই কথাগুলিও বল্লেন—"তোমাদের যে সঙ্গী এখান থেকে বিদায় নিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়তে চল্‌ল, এস তার জন্যে প্রার্থনা জানাই।" আমি তখনই বুঝলুম আমার কথাই হচ্ছে, এবং আমার মনে হতে লাগল নির্ব্বাসিত এবং কারারুদ্ধের মতোই আমি কৃপার পাত্রী! সে-রাত্রে আমি কিছুতেই ঘুমুতে পারলুম না। কো যাচ্ছি একথা জানতুম কিন্তু কেমন জায়গায় যাচ্ছি তা জানতুম না। সোলোঞ্জ জায়গাটা কি-রকম আমার কিছু জানা ছিল না। আমার মনে হচ্ছিল, যেন সে জায়গাটা অনেক—অনেক দূরে; সেখানে শু বড় বড় মাঠ, তাতে কেবল রাশি রাশি ফুল! কল্পনার চোখে দেখছিলুম আমি ভেড়া চরাচ্ছি—একপাল সাদা ধবধবে ভেড়া ঘু বেড়াচ্চে—আমার দুপাশে দুই কুকুর, ভেড়া গুলো ছুটকে না যায় তার জন্য আমা ইসারার অপেক্ষায় আমার মুখ চেয়ে আছে এ-কথা মারি এমেকে বলবার আমার সাহ হয় নি বটে, কিন্তু দর্জ্জির দোকানে ব থাকার চেয়ে ঐ খোলা মাঠে ভেড়া-চরানে আমার তখন বেশ লাগছিল। ইস্‌মে আমার পাশে নাক ডাকাচ্ছিল, সে শব্দে চমক ভেঙে আমার মন আমা সঙ্গীদের কাছে আবার ফিরে এল।

রাত্রিটি এমন উজ্জ্বল যে আমি ঘরে প্রত্যেক বিছানাটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম আমি এক এক করে সব বিছানার উপ দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে যেতে লাগলুম; যাদের আমি ভালোবাসি তাদের কা খানিক-খানিক করে থামতে লাগলুম

আমার ওধারে আমার বন্ধু সোফি—
র সেই চমৎকার চুলের গোছা বালিসের
পর ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানটা যেন আলো
য়ে উঠেছে। খানিকটা ওধারে আমাদের
ভিমানিনী সেমিনো আর তার যমজ বোন
—যাকে আমরা "বোকা" বলে ডাকি।
ভিমানিনী সেমিনোর কপাল ছিল চওড়া,
ালায়েম সাদা ধবধবে আর তার চাহনিটি
ারি মিষ্টি। তার ঘাড়ে কোনো দোষ
ড়লে সে কখনো বলত না যে সেটা মিছে,
সে শুধু কাঁধটা দোলাতে থাকত এবং একটা
লার সঙ্গে নিজের চারিদিকে চাইত।
ারি এমে বলতেন, তার কপালটি যেমন
ভ্র, তার অন্তরটিও তেমনি শুভ্র! তার
বোন "বোকা" তার চেয়ে প্রায় দেড়া লম্বা।
তার চুল ছিল মোটা মোটা, সেগুলো তার
ুকুর উপর এসে ঠেকত। ঘরের একেবারে
ও-কিনারায় কোলেতের বিছানা। সে এখনও
জানে যে আমি মাক্সিমিলিয়েনের কাছেই যাচ্ছি।
তার দৃঢ় বিশ্বাস শীঘ্রই আমার বিয়ে-থা
য়ে যাবে। সে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে
যে আমার বিয়ে হয়ে গেলেই তাকে
ধান থেকে আমার কাছে নিয়ে যেতে
বে। আমি অনেকক্ষণ-ধরে তার কথা
াবলুম। তার পর জানলার দিকে আমার
জর পড়ল—যে গাছতলায় আমি বসতুম
দেখানকার ঘন গাছের ছায়া আমার
দিকে ঝুঁকে এসে পড়েছে; মনে হল তারা
আমাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে এসেছে;
আমার মুখের একটু হাসি তাদের দিলুম।
গাছের ওধারে হাঁসপাতাল ঘর,—এমনি
দেখাচ্চে যেন নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে,—
তার ছোট ছোট জানলাগুলো রুগ্ন চোখের মতো বোধ হচ্ছে। আমি অনেকক্ষণ ধরে সেই হাঁসপাতালের দিকে চেয়ে চেয়ে সিষ্টর আগাতার কথা ভাবতে লাগলুম। তাঁকে দেখতে এমনি জলজলে আর স্বভাবটি এমনি মিষ্টি যে তিনি যখন ছোট ছোট মেয়েদের ধমকাতেন তারা হেসে উঠত। তিনি আমাদের চিকিৎসা করতেন। আমরা-কেউ তাঁর কাছে আঙুলের ঘা নিয়ে গেলে তিনি মজার মজার গল্প বলতে আরম্ভ করতেন এবং কে পেটুক আর কার সাজসজ্জার ঝোঁক তাই বুঝে কাউকে কেক্, কাউকে ফিতে দেবেন বলতেন। তিনি ভাণ করতে থাকতেন যেন ঐ জিনিষগুলো খুঁজচেন, আমরা ব্যস্ত হয়ে যখন তাই দেখতে থাকতুম, তিনি ধাঁ করে আঙুলের উপর ছুরি ফুটিয়ে, ধোয়া-মোছা শেষ করে বেঁধে ফেলতেন। আমার মনে পড়ে আমার পায়ে একবার ঘা হয়ে কিছুতে সারেনা। একদিন সকালে সিষ্টর আগাতা গম্ভীরভাবে আমায় বল্লেন—"দেখ মারি ক্লেয়ার, আজ তোমার পায়ে একটা দৈব জিনিষ আমি লাগিয়ে দেব, যদি তিন দিনের মধ্যে আরাম না হয় তাহ'লে তোমার পা কেটে ফেলতে হবে।" তিনদিন আমি খুব সাবধানে রইলুম। পাছে দৈব জিনিষে কোনো ব্যাঘাত পড়ে সেই ভয়ে আমি তিন দিন আর চলাফেরা করলুম না। আমি ভেবেছিলুম নিশ্চয় ঐ দৈব জিনিষ সত্যিকার ক্রুশ কিম্বা ভার্জ্জিনদেবীর মাথার কাপড়ের একটু টুকরো হবে। তিন দিনের দিন আমার পা সম্পূর্ণ সেরে গেল। তার পর আমি যখন

তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম ঐ দৈব জিনিষটা কি, তিনি হেসে উঠলেন, বল্লেন, আমি ভারি বোকা এবং মলমের কৌটটা দেখিয়ে বল্লেন এই সেই দৈব জিনিষ!

(২৭)

যখন শুতে গেলুম তখন রাত্রি অনেক। সকাল হতেই মনে হতে লাগল সেই চাষার স্ত্রী এই এল বলে। ইচ্ছে হচ্ছিল সে আসুক কিন্তু সে যে আসছে তার জন্যে ভয়ও হচ্ছিল। আমাদের খাওয়া শেষ হতেই এক দাসী এসে জিজ্ঞেস করলে আমি যাবার জন্যে তৈরি কি না। মারি এমে বল্লেন—"এই এখুনি হল বলে!" বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আমাকে তার সঙ্গে যেতে বল্লেন। তিনি নিজের হাতে আমায় কাপড় পরিয়ে দিয়ে আমাকে একটা পুঁটুলি দিলেন। তার পর তিনি হঠাৎ বলে উঠ —"তাঁকে কাল নিয়ে আসবে কিন্তু তখন থাকবে না।" তার পর আ চোখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লেন—"আ কাছে শপথ কর রোজ রাত্রে তাঁর জন্যে প্রা করবে।" আমি বল্লুম—"আচ্ছা।" তি আমায় সজোরে তাঁর কাছে টেনে নি আমাকে ঠেসে বুকের মধ্যে চেপে ধরলে তার পর ছেড়ে দিয়ে নিজের ঘরের দি ছুটে গেলেন। শুনলুম তিনি বলতে বল যাচ্ছেন—"হে ভগবান, এ কী শাস্তি!" আ একাই উঠোনটা পার হয়ে গেলুম—চাষা স্ত্রী আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল—ে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সংস্কৃত ভূত ও দেশী পেত্নী

১। ভূতের কাণ্ড

আমাদের বন্ধু কানাই কি উপায়ে তাহার নিজের নামটি আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহার একটা ব্যাকরণ-ঘটিত ইতিহাস পাওয়া যায়। কানাই বেচারার অন্ন-প্রাশনের সময়ে তাহার বাপ তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'জ্যোতি'। জ্যোতি যখন গ্রামের পাঠশালা ছাড়িয়া সহরের ইংরেজি স্কুলে ঢুকিল, তখন সেই স্কুল বা বিদ্যালয়ের কাব্যতীর্থ পণ্ডিত-মহাশয় জ্যোতিকে 'জ্যোতিস্ চন্দ্র' করিয়া তুলিলেন এবং বালকেরা তাহাকে 'জ্যোতিশ্' নামে ডাকিতে আরম্ভ করিল। পণ্ডিত-মহাশয়ের ব্যাকরণের প্রতি প্রখর দৃষ্টি ছিল; তিনি যখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে বালকেরা 'জ্যোতিস্' বলিয়া ডাকিবার সময় মনে মনে 'শ' কল্পনা করে, তখন তিনি নামটার ব্যাকরণ-ঘটিত সকল পরিবর্ত্তন বুঝাইয়া দিলেন। জ্যোতি বেচারা দেখিল যে তাহার নামটা নিতান্ত নেড়া-মুড়া থাকিবার সময়েও 'স' যুক্ত 'জ্যোতিস্' হইবে, 'চন্দ্র' যোগ হইলে 'জ্যোতিশ্' হইবে এবং তাহার নামে কেবল তাহার উপাধি 'ঠাকুর'টুকু জুড়িলে 'জ্যোতিষ্ ঠাকুর' হইবে। এত শিক্ষার পর যদি তাহার

া হয়, তাহা হইলে 'জ্যোতিষ্' বিদ্বান্ য়াছে, এইরূপ নাকি বলিতে হইবে। ণ্ডিত-মহাশয় যখন তাহার কোমল নামটিকে, ী, তালু ও দন্তে পিষিতেছিলেন জ্যোতি ন একটা অভিসন্ধি ফাঁদিয়া সকল সন্ধি াপ করিয়া দিল; সে তাহার ঠাকুরমার ওয়া আটপৌরে নামটিকে পোষাকী রিয়া 'কানাই' নাম চালাইল। কানাই-র শিরে বিসর্জ্জনীয়ের ফোঁটার বৈচিত্র্য ংবা রেফের টীকি চলে না দেখিয়া ণ্ডিত-মহাশয় ব্যাকরণ বন্ধ করিলেন।

মাগধী প্রাকৃতের মেয়ে, যে দ্রবীড় তির দেশের তেলে-জলে পুষ্ট হইয়া াঙ্গলা ভাষা হইয়াছে, সে যে কেবল সখ রিয়াই পাণিণি-সেক্‌রার গড়া দুই-চারি-ানি গহনা পরে, এখন সে কথা তাহার রূপ খিয়া পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতে চাহেন া। পণ্ডিতেরা যদি শ্রীহর্ষের দময়ন্তীকে লিয়া বঙ্কিমের কাল ভ্রমরকে আদর রেন, তবে ভ্রমর শব্দে যেন স্ত্রী-প্রত্যয় া খোঁজেন। আমাদের ঘরের সুন্দর মেয়ে ংস্কৃতের সুন্দরী কন্যা নহেন। পণ্ডিতদের ষ্টি পড়িলেই বাঙ্গলা ভাষা যখন অং বং করিয়া নাকী সুরে কথা কহিয়া প্রলাপ কিতে বসে, তখন নিশ্চয়ই তাহাকে ভূতে পায়। বঙ্কিমচন্দ্রের দলের শেষ প্রতিনিধি হরপ্রসাদ ভূত তাড়াইবার অনেক উদ্যোগ করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ শব্দ-তত্ত্বের মন্ত্র আওড়াইয়া অনেক সাধনা করিয়াছেন; তবুও এই ভূতের উৎপাত কমিতেছে না। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, 'সবুজপাতা' না বলিয়া 'সবুজপত্র' বলেন বটে কিন্তু তিনি এই ভূতের একটি ওঝা! আমি প্রমাণ দিতেছি যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাড়ে এই ভূত চাপিয়াছে; ওঝারা কি করিবেন ভাবিয়া দেখুন।

কয়েক বৎসরের বাঙ্গলা পরীক্ষার প্রশ্ন-কাগজে বালকদিগকে যে সকল কথার ভুল শুধ্‌রাইতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিচয় দিব। পরীক্ষকের বিচারের ভুল শব্দগুলির পাশে বন্ধনী দিয়া, তাঁহার উদ্দিষ্ট শুদ্ধ প্রয়োগগুলিও বসান গেল, যথা:—মন-কষ্ট (মনঃকষ্ট), মহিমাময় (মহিমময়), দেশবাসীগণ (—বাসিগণ)। বাঙ্গলায় যে 'মনস্' শব্দ নাই, আমাদের প্রাকৃত 'মনে' যে কোন বিসর্জ্জনীয়ের দাগ পড়ে না, তাহা পরীক্ষকেরা মানেন না। বাঙ্গলায় নূতন করিয়া সন্ধির নিয়মে শব্দ না গড়িয়া অনেক আস্ত যুক্ত শব্দ সংস্কৃতের ভাণ্ডার হইতে আনিয়াছি; সংস্কৃত হইতেই 'মনস্তাপ' পাইয়াছি, 'মনোহর'ও পাইয়াছি। পণ্ডিতেরা বলিতে চান, যে 'মনস্' প্রভৃতি বিসর্গ, বা বিসর্জ্জনীয় যুক্ত শব্দের সঙ্গে বাঙ্গলা কথা মিলিলে কোন গোল হইবে না, কিন্তু সংস্কৃত কথা জুড়িলেই সন্ধির নিয়ম পালিতে হইবে, কারণ বাঙ্গলা কথায় সন্ধি হয় না। একটা ধূয়া শুনিতে পাই বটে যে বাঙ্গলা কথায় সন্ধি হয় না, কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। বাঙ্গলা 'মশা' ও সংস্কৃত 'অরি'তে মিলিয়া যে মশারি হইয়াছে, সাহিত্যের দরবারেও তাহা সঙ্গে লইতে অনুরুদ্ধ হইয়া থাকি; মোকদ্দমাদি না চালাইলে আইন, আদালত বন্ধ হয়; গোলালু সকলেরই গ্রাহ্য হইয়াছে; কথায়

কথা জুড়িলে, স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণের সময় যে স্বর-সঙ্কোচ ঘটে, উহাই সন্ধি। বাঙ্গলার প্রকৃত-সিদ্ধ উচ্চারণ 'জগৎ' ও 'বন্ধু' একত্রে জগবন্ধু হয়; কিন্তু এরূপ স্থলে সন্ধিযোগ না করাই দস্তুর হইয়াছে। সংস্কৃত কথার সহিত সংস্কৃত জুড়িয়াও আমরা সকল সময়ে সন্ধি জুড়ি না; 'চোর' খাঁটি সংস্কৃত, অথচ আমাদের 'মনচোরটিকে' প্রাকৃত রূপেই পাই। প্রাচীন প্রাকৃতেও 'মনস্' ছিল না বলিয়া সহজ রকমেই 'মন্মথ' দেখা দিয়াছিল; পণ্ডিতেরা উহাকে আগ্রহ করিয়া টানিয়া লইয়াছেন এবং 'মনস' দিয়া মিলাইতে না পারিয়া, গোঁজামিল দিয়া বিশেষ সূত্র গড়িয়াছেন। বিসর্গটা কোনরকমে 'দুঃখ' প্রভৃতির মাঝখানেই বাঁচিয়া আছে; বাঙ্গলায় যে 'নিশ্বাস' টানি, তাহার মধ্যে আর উহার উগ্রতা স্থান পায় না। বাঙ্গলায় 'মহিমা-ই' শব্দ, 'বাসী-ই' শব্দ; উহাদের প্রপিতামহের কুলের সংবাদ লইলে, উহারা আর কুলীন হইতে পারিবে না। দেশী শব্দের উচ্চারণের নিয়মে, পাড়া-গাঁয়ের রামায়ণে যখন 'রামের মহিমে' পর্য্যন্ত চলিয়াছে তখন উহার মুক্তির জন্য দেবতার কাছে 'মহিম্নস্তব' পড়িলে কিছু লাভ হইবে না। ঘসিয়া মাজিয়া বাঙ্গলা কথার আদিম সংস্কৃত রূপ ফুটাইবার চেষ্টাকে পাগ্‌লামি বলা চলে। এ কথাও যেন আমাদের মনে থাকে, যে—'গুলি' 'রা' প্রভৃতির মত বাঙ্গলা ভাষায় 'গণ' বহুবচনের চিহ্নমাত্র।

কোন্ শব্দ সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে বলিয়াই সে বাঙ্গলা ভাষার নিয়মের বাহিরে থাকিবে এবং তাহার জন্য প্রতি পংক্তিতে বিশেষ আসন দিতে হইবে এ আবদার চলিবে না। অনেক প্রাকৃত শব্দ লইয়া সংস্কৃত যেরূপ লীলা-খেলা করিয়াছেন, আমাদের ভাষা যদি সংস্কৃত শব্দগুলি লইয়া তেমন ই কিছু করে, তবে সেটা লীলা-খেলা না হইয়া পাপ হইবে কেন? পূর্ব্বে কয়েকবার ঠিক এই বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছি। নূতন করিয়া আবার কথা উঠিয়াছে বলিয়া কয়েকটা নূতন দৃষ্টান্ত দিব। প্রাচীন 'ক্রীড়' হইতে প্রাকৃতে 'কীল' ও 'কেল' হইয়াছিল; এবং 'কেল' হইতে আকার 'খেল' হইয়াছিল। প্রাচীন প্রাকৃতের 'জ্যুৎকীলনম্' অর্থাৎ 'দ্যূতক্রীড়া' বা জুয়াখেলা কথায়, 'কীল' ও 'কেল' ঠিক 'খেলা' অর্থেই পাওয়া যায়; কিন্তু এক সময়ে 'কেল-টি' বিলাসের খেলায় দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া দ্বিতীয় অপভ্রংশের 'খেল' খেলা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছিল। পরে দেখা গেল, যে সংস্কৃতেও 'কেলী' চলিতেছে এবং চক্ষের কটাক্ষের খেলাকে 'খেলন' বলিয়া কবিতায় লিখিত হইতেছে। 'খেলৎখঞ্জ' প্রভৃতি প্রয়োগ অনেক রচনায় পাওয়া যায়। যে সকল সংস্কৃত শব্দ আমাদের ভাষায় আসিয়া পড়িয়াছে, সে গুলিকে বাঙ্গলার প্রত্যয় দিয়া সাজাইলে দোষ হইবে কেন? সংস্কৃত শব্দগুলিকে যখন 'পণ্ডিতাঃ' 'পণ্ডিতং' প্রভৃতি রূপ ছাড়িয়া, বাঙ্গলা বিভক্তি লইয়া 'পণ্ডিতেরা' 'পণ্ডিতকে' রূপে সাজিতেই হইবে, তখন কয়েকটি তদ্ধিত-প্রত্যয়ের বেলায় সংস্কৃতগিরি করিতে গেলে চলিবে কেন? যেখানে লোকে টাকা থাকিলে

ড়মানুষী' করে, সেখানে বিদ্যা থাকিলে পণ্ডিতী' করে। 'পাণ্ডিত্য' চলুক, ক্ষতি াই; কিন্তু 'পণ্ডিতি' বন্ধ করিতে পারিবে । 'বাবু' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'বাব্বী' হইবে লিয়া, দীনবন্ধুর নিমচাঁদ, অটলকে তামাসা রিয়া শিখাইয়াছিলেন। বাবুর স্ত্রীলিঙ্গে বহু শ্চিমে, মহারাষ্ট্রে ও মধ্যদেশে 'বাবী' হয়; এবং ঐ 'বাবী' উচ্চারণে 'বাঈ' হইয়া াকে। বেহার দেশের কোন শ্রেণীর য়োগের ফলে, বাঙ্গলায় 'বাঈ' শব্দ পবিত্র হে। পশ্চিম অঞ্চলে ও ওড়িষ্যার পশ্চিম-াগে অনেক স্ত্রীলোককে নাম ধরিয়া না াকিয়া তাহাদের স্বামীর নামে স্ত্রীপ্রত্যয় রিয়া ডাকিবার প্রথা আছে; এই নিয়মে াধুর স্ত্রী, 'সাধোবানি' নাম পায়। এস্থলে সাধোধানি' না বলিয়া 'সাধ্বী' বলিলে, ীলোকের গুণবিশেষের কথাই বলা হইবে। এ প্রয়োগ বাঙ্গলায় থাকিলে প্রসন্ন-গোয়ালিনীর নাম লইয়া স্বয়ং কমলা-কান্তও লালিকা চালাইতে পারিতেন না। মাতঙ্গী দশমহাবিদ্যাতি' থাকিবেন, কিন্তু শতবিদ্যা হইলেও বাঙ্গলার ঘরে 'মাতঙ্গিনী' রূপই দেখিতে পাইব। আমাদের 'ইনী' সংস্কৃতের কেহ নন। নূতন শব্দ রচনার প্রয়োজন হইলে যদি সংস্কৃতের আশ্রয় লইয়া কিছু গড়িতে হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সংস্কৃত নিয়ম পালন না করিলে নিতান্ত দোষ হইবে, 'বাধ্যবোধ' করার অর্থে 'বাধিত' লিখিলে অতিশয় মূর্খতা প্রকাশ পাইবে। যদি 'পীড়ন' অর্থ সূচিত না করিয়া বাঙ্গলায় 'বাধ' প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কথা ছিল না।

পেত্নীর কাণ্ড

যাহা সত্যই প্রাচীন বা অতীত অর্থাৎ ভূত, তাহার জন্য ওঝার ব্যবস্থা চলে, কিন্তু দেশী পেত্নী তাড়াইতে হইলে দেশী-রকমের তুক্-তাক্ করিবার রীতি আছে। কবি দীনবন্ধুর কুড়ারাম, দাতাকর্ণ পর্য্যন্ত পড়িয়া ও ইজ্জাতাছার লিখিতে শিখিয়াই, কানফোঁড়া খাতায় যে সাহিত্য রচনা করিয়াছিল তাহাও সনাতন বলিয়া আদর পাইবে কি? যে পুঁথি নকলের চাকরি বজায় রাখিবার জন্য কোন প্রকারে 'ও', 'ঙ', 'ঞ' প্রভৃতির গায়ে আ-কার, ই-কার বসাইয়া লেখার দায় সারিত, তাহার প্রবর্ত্তিত রীতির ত অপঘাত-মৃত্যু হইয়াছিল জানি, ঐ মৃত রীতির পেত্নী এখন জমিদারি কাছারির শেওড়া গাছ এবং আদালতের ধারের অশ্বত্থ গাছ হইতেও তাড়া খাইতেছে, অথচ আমাদের সাহিত্যের মণ্ডপে কেহ কেহ তাহাকে আবাহন করিতে চান।

স্বর ও ব্যঞ্জনে প্রভেদ ঘুচাইয়া, দু-একটা স্বরবর্ণের গায়ে আ-কার য-ফলা প্রভৃতি লাগাইয়া, জোঁকের গায়ে জোঁক বসাইবার দরকার কি? অনুস্বারকে অনুনাসিকের প্রধান রূপ বলিয়া ধরিলে, উহার পাঁচটি প্রতিনিধি পাই; যেখানে অনুস্বার হইবার কথা সেখানে সেই অনুস্বার 'ক' বর্গে যুক্ত হইলে 'ঙ' হয়, 'চ' বর্গে যুক্ত হইলে 'ঞ' হয়, 'ট' বর্গে 'ণ' হয়, 'ত' বর্গে 'ন' হয় এবং 'প' বর্গে 'ম' হয়। 'ন' এবং 'ম' স্বাধীন ব্যঞ্জন বর্ণও বটে, এবং অনুনাসিকের চিহ্নও বটে। 'ন', স্থান-

বিশেষের উচ্চারণে 'ণ' হইলে, 'ণ'টি একটি স্বতন্ত্র বর্ণ হয়; খাঁটি দেশী বাঙ্গলা শব্দে এই 'ণ' এর কোন ব্যবহার নাই। 'ঙ' এবং 'ঞ', 'ক' ও 'চ' বর্গের দুইটি অনুনাসিক মাত্র হইলেও, এই সাম্য ও স্বাধীনতার দিনে, কেহ কেহ উহাদিগকে স্বাধীন বর্ণরূপে ব্যবহার করিতে চাহিতেছেন। এখানে প্রয়োজনের তাড়না নাই, কেবল নূতন কিছু করার ঝোঁক আছে। আমাদের প্রাচীন মাগধী প্রাকৃত অর্থাৎ পালি ভাষার উচ্চারণ বুঝাইবার গোলে পড়িয়া লঙ্কাদ্বীপে 'ঞ' অক্ষরের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 'প্রজ্ঞা' শব্দটি বৈদিক যুগে 'প্রজ্ঞ-আ' রূপে উচ্চারিত হইত; কালে এদেশে উহার উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছিল 'প্রগ্‌গাঁ'। ভারতবর্ষের প্রচলিত উচ্চারণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া প্রাচীন উচ্চারণ বুঝিবার জন্য লঙ্কায় খুব বেশী 'ঞ' চালাইতে হইয়াছিল। কুড়ারামের রীতির আদর্শকে সমর্থন করিবার জন্য, লঙ্কার রীতি প্রদর্শিত হইবে কি? কেবল লঙ্কার জোরে 'ঞ' অক্ষরকে স্বাধীন ব্যঞ্জন করিলে উহা অসহ্য বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে।

সাহিত্যে যাহা অগ্রাহ্য, যাহা vulgar, তাহার একটা সাধারণ নাম, সাহিত্য-প্রসিদ্ধ কুড়ারামের নাম হইতে সংগ্রহ করিয়া, 'কুড়ারামি' বলা যাইতে পারে। যাহা পণ্ডিতি ধরণে উপহাসজনক যাহা pedantic, তাহাকে বিদ্যাদিগ্‌গজের নামে 'দিগ্‌গজি' বলিলে বেশ হয়। ইহাতে ভাব-প্রকাশের জন্য সকলের পরিচিত শব্দ পাওয়া যাইবে, এবং 'কুড়ারামি' ও 'দিগ্‌গজি' বলিলে, ভূত-পেত্নীরা লজ্জা পাইয়া পলাইবে। ওঝারা এই মন্ত্রদুইটিকে গ্রহণ করিবেন কি না, জানিতে চাই।

পুনশ্চ।—এই প্রবন্ধটি লিখিবার পরে স্যার রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা বানান' প্রবন্ধটি বৈশাখের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া, দুই একটা কথা পুনশ্চ দিয়া লিখিতেছি। আমার প্রবন্ধে লিখিয়াছি যে খাঁটি দেশী শব্দের জন্য 'ণ' এর কোন ব্যবহার থাকিতে পারে না, ঐ অক্ষরটি যে 'ন' এর স্থল-বিশেষের পরিবর্ত্তিত রূপমাত্র, তাহাও বলিয়াছি। আমি অভ্যাসের ফলে সর্ব্বদাই অপভ্রংশ শব্দগুলিকে মূল সংস্কৃতের কতকটা অনুরূপ করিয়া বাণান করিয়া থাকি, এ বিষয়ে স্যার রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য গ্রহণীয় মনে করিতেছি। সোণা, বাণান প্রভৃতিতে 'ণ' ব্যবহারের বাস্তবিকই কোন প্রয়োজন নাই। যেগুলি খাঁটি দেশী শব্দ, অর্থাৎ সংস্কৃত ও প্রাচীন প্রাকৃতের সহিত যাহাদের কোন সম্পর্ক নাই, সেগুলির জন্য আরও কয়েকটি অক্ষর সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। বাঙ্গলা ভাষায় দীর্ঘ বর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ নাই, এবং টান ও ঝোঁকের খাতিরে হ্রস্বকেও দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হয়; কাজেই ঈ' ও 'ঊ' কোনও ব্যবহারে লাগিতে পারে না। 'ঋ' অক্ষরের কোন ব্যবহার নাই, এবং সম্ভবতঃ সংস্কৃতের 'ঐ' এবং 'ঔ' দেশী শব্দে ব্যবহৃত হইতে পারে না; বাংলা উচ্চারণে 'ঐ' এবং 'ঔ' অক্ষর দুইটি ঠিক সংস্কৃত ধরণে উচ্চারিত না হইয়া, 'অই' ও 'অউ' রূপে উচ্চারিত হয় বটে, কিন্তু উপযুক্ত অক্ষর থাকিতে অযথা সংস্কৃত অক্ষরের ভুল উচ্চারণ প্রচলিত করা উচিত নয়।

বিদেশের Student প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গলায় লিখিবার সময় 'S' অক্ষরটির দন্ত্য উচ্চারণ বজায় রাখিতে পারি না; কারণ 'ট' অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হইলেই সংস্কৃতের নিয়মে 'ষ' বসাইতে হয়। ইহা ছাড়া দেশী শব্দের জন্য 'ষ' খুঁজিতে হয় না। ওড়িয়ায় যেমন সকল উচ্চারণেই 'স', বাঙ্গলায় তেমনি সকল দেশী শব্দের উচ্চারণই 'শ' হইয়া থাকে; দেশী শব্দে কেবল 'শ'ই ব্যবহৃত হইতে পারে।

বঙ্গ শব্দটি যখন প্রত্নতত্ত্বের মধ্যেই লুকাইয়া নাই; কবিতায় এবং মুখের কথাতেও যখন উহার ব্যবহার আছে, তখন বাঙ্গলাকে বঙ্গ শব্দ হইতে ভিন্ন ভাবে চিত্রিত করা উচিত নয়। 'বাঙ্গলা' লিখিলে আমাদের প্রাকৃতিক উচ্চারণে যখন মাত্রা বাড়িয়া যায় না, তখন কবিতার জন্যও 'বাংলা' লিখিবার প্রয়োজন নাই। প্রাচীন কালের আর্য্যেরা যে দেশকে সাধু করিয়া 'বঙ্গ' নাম দিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ অনার্য্যেরা সে দেশকে এবং আপনাদের জাতিকে 'বংলং' বলিত; সেই ঐতিহ্যেই 'বাঙ্গলা' শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে; ঠিক 'বঙ্গ' হইতে 'বাঙ্গলা' হইয়াছে মনে হয় না। এই প্রত্নতত্ত্ব 'বাংলা' বাণানেরই অনুকূলে। কিন্তু 'বঙ্গ' ও বাঙ্গলা যখন চিরকাল চলিয়াছে এবং এবং উহাতে কবিতার জন্য প্রার্থনীয় উচ্চারণে বাধা পড়ে না, তখন একএকজন এক এক পন্থা অবলম্বন না করিলেই ভাল হয় না কি?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

শিল্পের স্বরূপ

Paul বলিলেন, "সাহিত্য-শিল্পী ও নাট্য-শিল্পীর মত চিত্রকর বা ভাস্কর কি একই গতির (movement) ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার বৈচিত্র্য এক জায়গায় ফুটাইতে পারেন? আমার বিশ্বাস, এখানে কলমের কালোয়াত্‌-দের কাছে আপনারা হার মানিতে বাধ্য।"

রোঁদা জবাব দিলেন, "যতটা ভাবিতেছ, আমাদের অসুবিধা ততটা বেশী নয়। সময়ে-অসময়ে আমরা একই চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে একসঙ্গে অনেকগুলি ক্রমিক দৃশ্য অঙ্কন বা খোদন করিতে পারি।"

"—কিন্তু এ ত মান্ধাতার আমোলের ছেলে-ভুলানো প্রথা। আপনি বোধ হয় সেই-সব প্রাচীন পটের কথা বলিতেছেন, যেগুলিতে এক-এক ব্যক্তির জীবনের নানা ঘটনা, নানা দৃশ্যে পাশাপাশি আঁকিয়া দেখান হইয়াছে?"

"—বড় বড় ওস্তাদ-শিল্পী এই প্রথা অবলম্বন করিলেও, আমি এমন ধারা সেকেলে ছেলে-মানুষী পছন্দ করি না। কেবল মুহূর্ত্তের ভঙ্গী লইয়াই আর্টিষ্টের কারবার নয়,—নাটকীয় কলায় তিনি সম্পূর্ণতা দিতেও পারেন। তবে, কোন-একটি সমগ্র কার্য্যের চিত্র আঁকিতে গেলে তাঁহাকে

পাত্র-পাত্রী-সন্নিবেশের কায়দা জানিতে হইবে। প্রথমে দেখান চাই, ঐ কাজ আরম্ভ করিয়াছে কে, বা কাহারা? তার পর, কাহাদের দ্বারা কাজ-করান হইতেছে? সর্ব্বশেষে, কাহাদের সাহায্যে উক্ত কার্য্য সম্পূর্ণ হইল? একটি দৃষ্টান্তে আমার বক্তব্য বুঝাইয়া দি, শোন।

Rudeএর Marseillaiseএর মূর্ত্তিগুলি দেখ।

সকলের উপরে স্বাধীনতার মূর্ত্তি; বক্ষে বর্ম্ম পরিয়া মুক্তপক্ষে বায়ু আন্দোলিত করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিতেছেন, 'নাগরিকগণ! অস্ত্র ধর!'—তাঁহার উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত বাম বাহু সাহসীগণকে আহ্বান করিতেছে এবং দক্ষিণ হস্তের নগ্ন অসি শত্রুপক্ষের দিকে প্রসারিত। ইনিই হইতেছেন কার্য্য-কারিণী শক্তি—ইঁহারই আদেশে সকল কার্য্য সাধিত হয়। ইঁহার উভয় চরণ পরস্পর-বিযুক্ত,—যেন, ইনি সবেগে ধাবমান। ইঁহার দিকে চাহিলেই মনে হয়, সকলেই যেন ইঁহার আদেশ মানিতে বাধ্য।

তারপর, দ্বিতীয় দৃশ্য।—দেখ, স্বাধীনতার আহ্বানে যোদ্ধারা ছুটিয়া আসিতেছেন। এক ব্যক্তি, কেশরী-কেশর-শোভিত শিরস্ত্রাণ শূন্যে আন্দোলন করিয়া দেবীকে যেন অভিবাদন জানাইতেছেন। পাশেই তাঁহার পুত্র কোষ-বদ্ধ তরবারি মুষ্টিমধ্যে ধরিয়া, যেন বিনতি করিয়া বলিতেছে, 'পিতা, আমি ত দুর্ব্বল নই—শিশুর মত কেন পিছনে পড়িয়া থাকিব? আমিও আপনার সঙ্গ লইতে চাই!'—সস্নেহ গর্ব্বভরে পুত্রের দিকে চাহিয়া বীর পিতা যেন বলিতেছেন,—'এস!'

তৃতীয় দৃশ্য।—এক বৃদ্ধ বীরপুরুষ, আপন অস্ত্রভারে নুইয়া পড়িয়াছেন,—তথাপি রণোৎসাহে মত্ত হইতে লালায়িত;—কার ধমনীতে যাহার একবিন্দুও রক্ত আছে, আ কি সে অলস আমোদে ঘরের কোণে বসি থাকিতে পারে? আর এক বৃদ্ধ বিজয়কাম করিতে করিতে এবং সকলকে উপদেশ দি দিতে সৈন্যদলের অনুগমন করিতেছেন।

চতুর্থ দৃশ্য।—একজন ধনুকধারী, আপনা বলিষ্ঠ পেশীসতেজ দেহ লইয়া সম্মুখে ঝুঁকি পড়িয়াছে; আর-এক ব্যক্তি রণ-শিঙ্গা আবেগ-গম্ভীর ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনি করিয়া তুলিতেছে। পবনে পতাকা উড়িতে এবং বর্ষার সূচাগ্র ফলকগুলি উর্দ্ধে উত্থি —যুদ্ধের নিদর্শন দেওয়া হইয়াছে—সংগ্রা আরম্ভ হইল!"

রোঁদার Burghers of Calais "ক্যালের নাগরিকগণ" নামে বিখ্যা ঐতিহাসিক ভাস্কর্য্য-কার্য্যেও, একস্থানে এই ধারাবাহিক দৃশ্যমালা প্রদর্শিত হইয়াছে ক্যালের আত্মত্যাগী নাগরিকগণের মর্ম্মস্পর্শ কাহিনী বোধ করি, সকলেরই জানা আছে।

ক্যালে-অবরোধে বিজয়ী ইংরাজ এই আজ্ঞা প্রচার করেন যে, যদি সহরের ছয়জন নামজাদা বাসিন্দা মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করেন, তাহাহইলে সমস্ত নাগরিককে হত্যা করা হইবে না। Eustache de Saint-Pierre প্রমুখ ছয়জন নাগরিক এই সর্ত্তমত আত্মদানে অগ্রসর হইলেন। রোঁদার শিল্পকার্য্যে আমরা দেখিতে পাই, "ক্যালের নাগরিকগণ" সমগ্র দেশবাসীর প্রতিনিধিরূপে শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে যাইতেছেন।



মার্সেইয়েজ

এই ছয়টি মূর্ত্তিতে মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতির ছবি ঠিকমত ফুটিয়াছে। নাগরিকদের কেহ অবরোধে অনাহার-কৃশ, কিন্তু কাপুরুষ নন; কেহ স্বদেশের হতভাগ্যের কথা ভাবিয়া দুঃখে ম্রিয়মান; কেহ কম সাহসী—তাড়াতাড়ি সব চুকাইয়া দিতে সকলের আগে-আগে চলিয়াছেন; কেহ আত্মদানে ভীত নন, কিন্তু আপনার অসহায় স্ত্রী-পুত্রের ভাবনায় অস্থির ও হতাশ; কেহ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া ভীত—স্বপ্নাচ্ছন্নের মত তিনি কোনরকমে আপনাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন এবং কেহ-বা অল্প-বয়সী, দুর্ভাবনায় বিকৃতমুখ—হয়ত আপন প্রণয়িনীর প্রিয়মুখস্মরণে কাতর; কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্য সম্মুখে, অতএব যাইতেই হইবে—সব ছাড়িয়া যাইতেই হইবে!

* *
*

রোঁদা পেন্সিলে নক্সা আঁকিয়াছেন অগুন্তি। নগ্নমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার অনেকগুলি

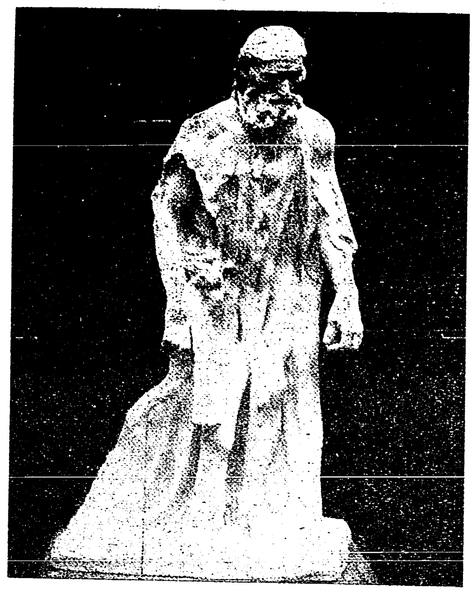

সেণ্ট পিয়ের
(ক্যালের নাগরিকগণের একটি মূর্ত্তি)

আঁকা। ছবিগুলিতে নিপুণ হাতে পেন্সিলের এক-একটি টানে মানুষের এক-একটি সমগ্র দেহ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাল করিয়া আঁকিতে গেলে, পাছে ততক্ষণে আদর্শের দেহভঙ্গী বদ্‌লাইয়া যায় এ-সকল চিত্রে সেজন্য শিল্পীর ব্যাকুলতার প্রমাণ আছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তমান দৈহিক নানা ভঙ্গী এই-সব নক্সাতে যেঁাদা শীঘ্রহস্তে ধরিয়া রাখিয়াছেন। সেগুলিতে সুধু বর্ণ ও রেখার লীলা নাই—গতি ও প্রাণের স্ফূর্ত্তিও আছে।

সাধারণ দর্শক হয়ত এ ছবিগুলির অসম্পূর্ণতা দেখিয়া তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিবেন,—কিন্তু মাজিয়া-ঘষিয়া সযত্নে-সমাপ্ত রেখা-চিত্রের চাইতে রূপে-গুণে এগুলি যে কতটা উঁচুদরের, সমজদার ছাড়া আর কেউ তা সহজে বুঝিবেন না।

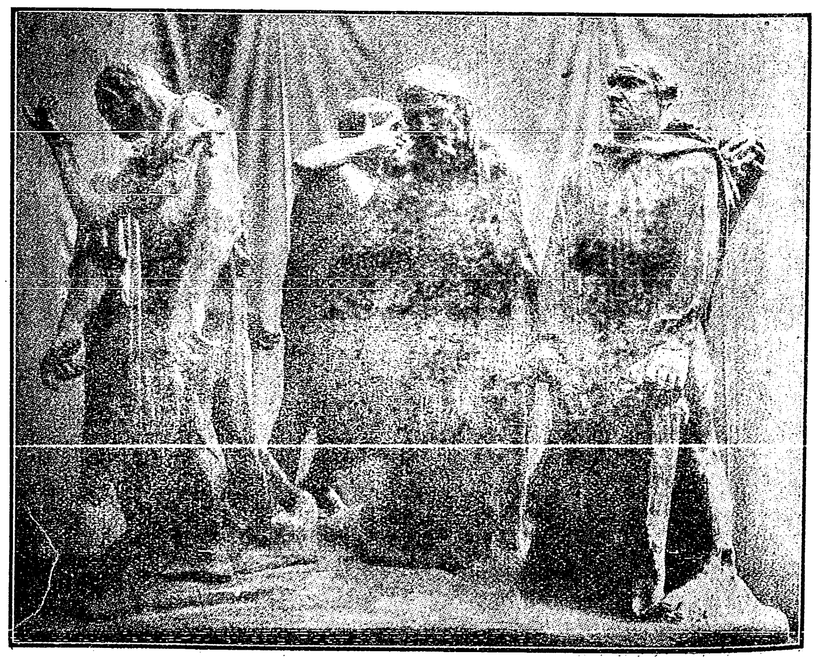

ক্যালের নাগরিকগণ

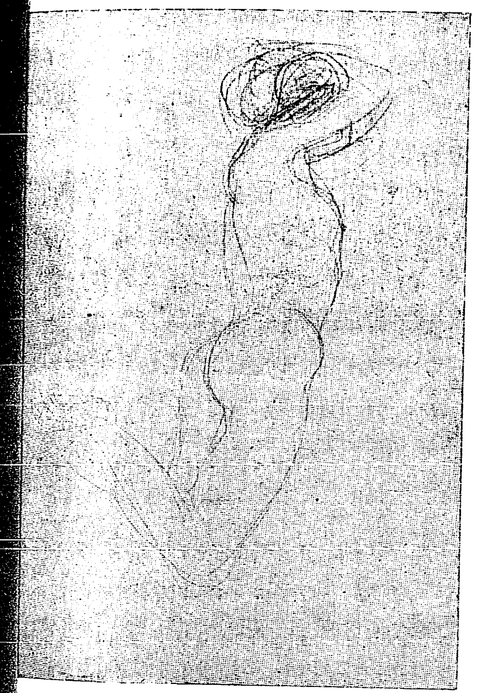

রোঁদার নক্সা

রোঁদা বলিতেছেন, "তিলোত্তমা নহিলে যে সাধারণের মন মজে না—এ-কথাটা খুবই খাঁটি। শিল্পী যদি বাজে খুঁটিনাটি ছাড়িয়া একেবারে ধ্রুব সত্যের সমগ্রতা লইয়া আপন কাজে ভাবের ছাপ্ দেন, অবোধ লোকেরা তবে অবুঝের মত হাঁ করিয়া থাকিবে। অকপট পর্য্যবেক্ষণে যে বাস্তবতার সরলতা ফুটিয়া ওঠে, লোকে ত তা বোঝে না—তারা চায় থিয়েটারী ঢং—কৃত্রিমতা!

লোকের এ ভুল ধারণা যে, নক্সার (Drawing) মধ্যে সৌন্দর্য্য আছে। তা ত নয়! নক্সা যে ভাবের বিকাশ দেখায়, যে সত্য প্রকাশ করে, আসল সৌন্দর্য্যের আধার আছে সেইখানেই। সুন্দর কি? ভাব ও সত্য।

চিত্রে-ভাস্কর্য্যে যেমন নক্সা, সাহিত্যে তেমনি লিখন-ভঙ্গী আছে। চেষ্টাকৃত লিখন-ভঙ্গী ভাল নয়। যে বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইতেছে, যে আবেগ প্রকাশ করা হইতেছে অন্য সব দিক হইতে নিবৃত্ত করিয়া পাঠকের চিত্তকে যে লিখন-ভঙ্গী কেবল তাহাদেরই প্রতি কেন্দ্রীভূত করিতে পারে, শ্রেষ্ঠ বলা যায় সুধু সেই লিখন-ভঙ্গীকে।

যে শিল্পী আপন নক্সা লইয়াই আড়ম্বর প্রকাশ করেন, যে লেখক আপন লিখন-ভঙ্গীর দিকেই লোকের প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লালায়িত, তাঁহাদের মধ্যে কোন পদার্থ নাই। এ কেমন? না, সৈনিক যেন লাল-টুক্‌টুকে জামা পরিয়া দেমাকে-ডগমগ—কিন্তু লড়ায়ে যাইতে নারাজ; চাষা যেন আপনার লাঙ্গলখানাকে কেবল মাজিয়া-ঘষিয়া চক্‌চকে করিতেই ব্যস্ত,—কিন্তু তা-দিয়া মাটি চষিতে প্রস্তুত নয়!

সুন্দর রচনা-ভঙ্গী, সুন্দর নক্সা বা সুন্দর বর্ণ বলিয়া একটা-কিছু নাই। কোন নক্সা বা রচনা-ভঙ্গী, যথার্থ সুন্দর হইলেও, বিশেষ করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য-বোধের অবকাশ তোমার থাকে না; কারণ, তাহার মধ্য দিয়া যে ভাব অভিব্যক্ত হয়, তোমার চিত্ত তাহাতেই মুগ্ধ ও মগ্ন হইয়া থাকে। একজন প্রতিভাধর লেখক বা শিল্পীর রচনায় যখন অপূর্ব্ব সত্য, প্রগাঢ় ভাব ও গভীর কল্পনা আত্মপ্রকাশ

করে,—তখন বুঝিতে পারা যায় যে, সেই লিখন-ভঙ্গী অথবা নক্সা ও বর্ণ নিশ্চয়ই সুন্দর;—কিন্তু এ-সব গুণ সুধু সত্যেরই প্রতিচ্ছায়ামাত্র।

র‍্যাফেলের নক্সার সুখ্যাতি করে সবাই এবং সে সুখ্যাতিও নিরর্থক বলি না। কিন্তু কেবল নক্সা ও রেখা-সন্নিবেশের কৌশলের জন্য তাঁহাকে বাহবা দেওয়া ঠিক নয়। তাঁহার নক্সা যে অর্থ প্রকাশ করে সুখ্যাতি করিতে হইবে তাহাকেই। র‍্যাফেলের হৃদয়-



মাইকেল এঞ্জিলোর নক্সা

মধ্যে যে অগাধ প্রেম ছিল—যাহা নির্ঝর ধারার মত বিশ্বপ্রকৃতির উপরে ঝরিয়া পড়িত, র‍্যাফেলের নক্সায় তাহারই অপূর্ব্ব মধুর বিকাশ দেখা যায়। যাঁহারা র‍্যাফেলের প্রাণ পান নাই, অথচ তাঁহার নক্সার নির্খুঁত রেখা ও পাত্রপাত্রীর ভঙ্গিমার নকল করেন, তাঁহারা অবুঝ ও আনাড়ির কাজ করেন।

মাইকেল এঞ্জিলোর নক্সায় সুধু তাহার রীতি, তাহার পাত্রপাত্রীর দেহে মাংসপেশীর নিপুণ সমাবেশ দেখিয়া আহা-মরি করিলে চলিবে না,—দেখিতে হইবে তন্মধ্যে প্রকাশিত ভাব ও কল্পনার দুর্ব্বার বেগ ও তেজ। এটুকু না-বুঝিয়াই যাহারা এঞ্জিলোর নক্সার নকল করিতে বসিয়া যায়, তাহারা সুধু দর্শকের মাঝে হাস্যাস্পদ হয়।

জগতে, ললিতকলার এমন কোন নিদর্শন বোধহয় নাই, যাহা সুধু রেখা ও বর্ণের সমাবেশে আমাদের নয়ন-মনকে মুগ্ধ করিতে পারে। তা-বলিয়া মনে করিয়ো না যে, রেখা ও বর্ণকে আমি অবহেলা করিতে বলিতেছি। নক্সায় যে শিল্পীর হাতের কায়দা নাই, তিনি ভাব ও কল্পনার রাশ কিছুতেই সামলাইতে পারিবেন না। এরূপ শিল্পী নির্ব্বোধ ঘোড়-সওয়ারের মত, যে ঘোড়াকে চালাইতে চায় কিন্তু দানা-পানি দেয় না।

বর্ণ ও রেখার রহস্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, কারণ, তাহাই হইতেছে চাবির ঘরের তালা-চাবির মত। এদিকে-পটু শিল্পী যখন লোকের মর্ম্মস্পর্শী ছবি আঁকিয়াছি বলিয়া আত্মপ্রসাদে ফুলিয়া ওঠে আসলে হয়ত তখন তাহার অক্ষমতা দেখিয়া দর্শকেরা হাসি সামলাইতে পারে না। ছবিতে মানুষের হাত যদি বেখাপ্পাগোছের ছোট-খাটো হয়, পা যদি বেজায় ট্যাড়া-বাঁকা হয়, পারিপ্রেক্ষিত যদি ঠিক্‌ঠাক্‌ না হয়, দর্শকের মন তবে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবেই। —আদত্‌ কথা হচ্ছে এই, বিজ্ঞানই হচ্ছে শিল্পের প্রাণ।

সুধু রেখা লইয়া যাহাদের আড়ম্বর, রঙের উপরে রঙ্গ লেপিয়া যাহাদের বাহাদুরি; অথবা লেখায় বড়-বড় লম্বা-চওড়া শব্দ বসান যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের আদর মুদীর দোকানে, অসভ্যের বৈঠকে। সহজ সরলতার সহিত রেখা টানিতে, রং দিতে ও লিখিতে পারাই হচ্ছে সব-চেয়ে শক্ত কাজ।

* *
*

রোঁদা ও পল একদিন শিল্পশালা দর্শন করিতে গিয়াছেন। সেখানে বিখ্যাত ভাস্কর Houdon-এর গঠিত নামজাদা লোকের কতগুলি আবক্ষ মূর্ত্তি সাজান ছিল।

ভল্‌টেয়ারের মূর্ত্তির সুমুখে দাঁড়াইয়া রোঁদা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি আশ্চর্য্য! এ যে মূর্ত্তিমন্ত দ্বেষ-হিংসা! দেখ! ইঁহার বক্রদৃষ্টি যেন-কোন শত্রুর ধরণ-ধারণ লক্ষ্য করিতেছে। এঁর সূক্ষ্মাগ্র নাসা যেন শৃগালের মত;—কোথায় দোষ, কোথায় ত্রুটি ইনি যেন তাহারই ঘ্রাণ লইতেছেন। দেখিলেই মনে হয়, এঁর নাক যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। আর ঐ মুখ—ও যেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ভরা; মনে হয় মূর্ত্তির ওষ্ঠাধর হইতেও যেন অস্পষ্টস্বরে ব্যঙ্গবাণী বাহির হইতেছে!

ভলটেয়ারের এই রুগ্ন, অপুরুষোচিত ও জীবন্ত মূর্ত্তিটি দেখিলেই বুঝা যায়, ইহা কোন সুচতুর বৃদ্ধ জল্লকের চেহারা।"



ভলটেয়ার

খানিকক্ষণ ভাবিয়া রোঁদা বলিলেন, "মূর্ত্তির চোখদুটি কি অপূর্ব্ব, কি স্বচ্ছ! এই আশ্চর্য্য চোখের কথা যখন-তখন আমার মনে পড়ে। Houdonএর সকল মূর্ত্তির উপরেই ঠিক এই কথা বলা চলে। এমন

স্বচ্ছ, জীবন্ত চোখ গড়িতে আর কাহাকেও দেখি না। Houdon যত মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, সকলেরই চোখের ভাব কতটা আলাদা বল দেখি! Houdon চোখ দেখিয়া প্রাণ বুঝিতেন,—চোখ তাঁহার কাছে কোন কথাই ঢাকিতে পারিত না। সুতরাং আদর্শের সঙ্গে এ-সব মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য আছে কিনা, এটা জানিতে যাওয়া বাহুল্যমাত্র।"

—এইখানে রোঁদাকে বাধা দিয়া পল বলিলেন, "তাহাহইলে, আদর্শের সঙ্গে প্রতিমূর্ত্তির সাদৃশ্য থাকা আপনি দরকার মনে করেন?"

—"নিশ্চয়ই। খুব দরকার।"

—"কিন্তু অনেক শিল্পী বলেন, ঠিক আদর্শের মত দেখিতে না হইলেও প্রতিমূর্ত্তি ভাল হইতে পারে। Henner একবার এক মহিলার ছবি আঁকিয়াছিলেন। কিন্তু মহিলাটি সে ছবি দেখিয়া আপত্তি করেন যে, ছবির সঙ্গে তাঁহার চেহারার মিল নাই। Henner তাঁহার গ্রাম্যভাষায় উত্তর দিলেন, "ঠাকরুণ, তুমি মরে গেলে তোমার ছেলেপুলেরা এই ভেবেই খুসি হবে যে, তারা Henner-এর আঁকা একখানি চমৎকার ছবি পেয়েছে; এ ছবিতে তোমার চেহারা ঠিক হয়েছে কিনা, এ-কথা নিয়ে তারা খুব কমই মাথা ঘামাবে!"

রোঁদা বলিলেন, "হতে পারে Henner এমন কথা বলিয়াছিলেন! কিন্তু এ সুধু কথার-কথা মাত্র—তাঁর মনের আসল ভাব নিশ্চয়ই এমনধারা ছিল না। কারণ, Hennerএর মত একজন প্রতিভাবান শিল্পী যে আর্ট-সম্বন্ধে এরূপ ভুল ধারণা পোষণ করিতেন, এ আমি বিশ্বাস করি না।

কিন্তু সব-প্রথমে আমাদের বুঝিতে হইবে, প্রতিমূর্ত্তিতে কিরূপ সারূপ্য থাকা দরকার।

যদি কোন শিল্পী ফটোগ্রাফীর মত কেবল বাহিরের চেহারার হুবহু নকল করিয়া যান, অথচ ভিতরের ভাবের কোন ধার-না-ধারেন, তবে তাঁহার প্রশংসা হইবে না। যাঁহার মূর্ত্তি অঙ্কিত বা গঠিত হইতেছে, প্রতিমূর্ত্তিতে তাঁহার চরিত্র-সাদৃশ্য থাকা চাই;—দরকার সুধু এইটুকু; বাহিরের চেহারার আড়ালে চিত্রকর বা ভাস্করের অন্বেষ্য,—চরিত্র-সাদৃশ্য এককথায়, প্রতিমূর্ত্তির সমস্ত অবয়ব ভাবাভিরাম হওয়া উচিত।"

—"আচ্ছা, এমন-কি কখনো-কখনো দেখা যায় না যে, বাহিরের চেহারার সঙ্গে স্বভাবের বেমিল হইয়াছে?"

—"তা কখনো হয় না। আপাতদৃষ্টি মাত্র যাহাদের সম্বল, মুখ দেখিয়া তাহারাই ঠকিয়া যায়—স্বভাবের আন্দাজ করিতে পারে না। কপটতার মুখোস খুলিয়া সত্য আবিষ্কার করা—এ হচ্ছে শিল্পীরই কাজ।

প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কন বা গঠন করিতে গেলে যতটা মর্ম্মবোধের আবশ্যক,—ললিতকলায় আর কোন কাজে ততটা নয়। সময়ে-সময়ে একটা কথা শুনি, শিল্পকর্ম্মে মানসিক শক্তির চেয়ে নাকি হস্ত-নৈপুণ্যের সার্থকতা বেশী। তুমি যদি কোন ভাল আবক্ষ মূর্ত্তি পরীক্ষা কর, তবে বুঝিবে এ উক্তি কতটা মিথ্যা! দৃষ্টান্তস্বরূপ Houdonএর মূর্ত্তিগুলিই

দেখ। এগুলির এক-একটি যেন লিখিত জীবনচরিতের এক-একটি পরিচ্ছেদ। কাল, বংশ, জীবিকা ও ব্যক্তিগত চরিত্র—প্রতিমূর্ত্তিগুলি হইতে এ-সমস্তই জানা যায়।

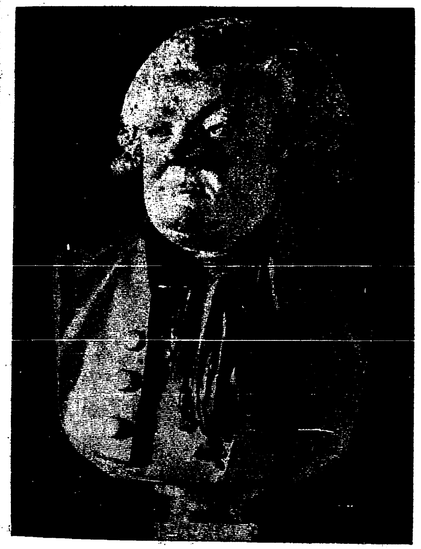

মিরাবো

মিরাবোঁর মূর্ত্তির কথাই ধর। হঠ-প্রকৃতি,—মাথার পরচুলা উস্কখুস্ক, কাপড়-চোপড় এলমেল; বিদ্রোহের ঝটিকায় এই ভীষণস্বভাবের লোকটি যেন নিশ্বসিয়া নিশ্বসিয়া উঠিতেছে—যে-কোন মুহূর্ত্তে এ সিংহের মত গর্জ্জিয়া উঠিতে পারে!

বংশ।—ভাব-ভঙ্গি প্রভুত্বসূচক, ভ্রূদুটি সুবঙ্কিম, উদ্ধত ললাট; এ-সবই, লোকটির কুলীনবংশের প্রমাণ। কিন্তু বসন্তের ব্রণ-চিহ্নিত গণ্ড ও দুই স্কন্ধের মধ্যদেশে প্রবিষ্ট কণ্ঠ, ইঁহার প্রজাতান্ত্রিক চিত্তের পরিচয় দিতেছে।

জীবিকা:—বিচারপতি; নিজের বাক্য সকলের কর্ণগোচর করিবার জন্য মুখ যেন বাহির হইয়া আছে। ইঁহার মস্তক উন্নত; কারণ, সাধারণত অধিকাংশ বক্তার মত ইনিও খর্ব্বাকৃতি। ঢেঙ্গা না হইলেও এ ধরণের লোকের কোমর আর বুক বেশ পুরন্ত হইয়া থাকে। মূর্ত্তির চক্ষুদুটি কোনও বিশেষ ব্যক্তির প্রতি স্থির হইয়া নাই,—তাহারা যেন এক বিরাট জনতার উপরে ইতস্তত ঘুরিতেছে। দৃষ্টি অনিশ্চিত, কিন্তু গর্ব্বিত।

ব্যক্তিগত চরিত্র: দেখ, ঠোঁটদুটিতে ইন্দ্রিয়াশক্তির ছাপ আছে; চিবুক ভাঁজ-করা, নাসারন্ধ্র যেন কম্পমান; ইনি লম্পট এবং জীবনকে উপভোগ করিতে অভিলাষী; স্বভাবের এ-সব দোষ মূর্ত্তিতে একেবারে স্পষ্ট।

Houdonএর সকল মূর্ত্তি হইতেই এইরূপ চরিত্র-চিত্র দেওয়া যায়।"

পল বলিলেন, "অপরের মনের ভিতরে এমন গভীরভাবে ঢুকিতে পারা ভারি শক্ত।"

—"হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু শিল্পীর পক্ষে আসল মুস্কিল হইতেছে, তাঁহার মক্কেল—যাহার মূর্ত্তি তিনি গড়েন। প্রতিমূর্ত্তিতে যাহারা আপনাদের চেহারার সাদৃশ্য চায়, শিল্পীকে বিশেষ করিয়া তাহারাই বিষম ফ্যাসাদে ফেলিয়া থাকে। নিজেকে ঠিক নিজের মতই দেখে, এমন লোক খুব কম; আবার, যে আপনার স্বরূপ বোঝে, সেও চায় না যে শিল্পী তাকে ঠিক তেমনি ভাবেই ফুটাইয়া তুলেন। মানী চায়, ছবিতে যেন তার মানের পরিচয় থাকে—চরিত্র

ফুটুক-না-ফুটুক, সেদিকে তার কোনই মাথা-ব্যথা নাই।

এইজন্যই অনেক সামান্য পটুয়াও বেজায় নাম কিনিয়াছে। তাহারা তাহাদের মক্কেলের যে ছবি আঁকিয়াছে, স্বভাবের সঙ্গে তার কিছুই সম্পর্ক নাই—তাতে আছে শুধু সোনার ঘড়ী, হীরার আংটি, জরির জুতা! এ-সব শিল্পীর আদরও খুব; কারণ, তা কারুর স্বরূপ না দেখাইয়া জাঁকজমক শোভা-সম্পদের দিকটাই ভাল করিয়া দেখায়। প্রতিমূর্ত্তিতে যত আড়ম্বর থাকিবে, তাহা যতই সাজানগুজানো পুতুলের মত দেখাইবে মক্কেলেরা ততই খুসী হইয়া শিল্পীকে বেশীরক বখ্‌শীষ দিবে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

মাতৃভাষা কি পেত্নী ভাষা?

ভূতকালের ভাষাকে ভূত বল্‌লে প্রভূত রসিকতা হয় কিনা জানিনি, তবে আভিধানিক অর্থে অন্তত কথাটা সার্থক হয়। কিন্তু যা' প্রকৃত মাতৃভাষা,—যা' মাতৃজাতির কাছ থেকে কোটি কোটি বঙ্গসন্তান পীযূষের সঙ্গে আজো প্রত্যহ গ্রহণ করচে, এক-হিসাবে 'ধিয়ো য়ো ন প্রচোদয়াৎ, যা' আমাদের প্রত্যেকের বুদ্ধিবৃত্তিকে লালন করছে সেই মাতৃস্থানীয়া মাতৃরূপিণী দেশভাষাকে পেত্নীভাষা বল্‌লে এক-রকম নিজের মায়েরই অপমান করা হয়।

যিনি স্বদেশের ভাষা-বিজ্ঞান আলোচনা করতে বসেছেন, তাঁকে মাতৃজাতির পায়ের কাছে বসে ভাষা শিখতে হবে, তথাকথিত ইতর-সাধারণের কথা কানে তুলতে হবে, অর্থাৎ স্ত্রী-শূদ্রের কাছেই সাক্‌রেদি করতে হবে; কারণ ত্রয়ী তাদের শ্রুতিগোচর হয়নি এবং ওঙ্কার, অনুস্বার ও বিসর্গের তিন তিন প্যাঁচে কান একেবারে বিগ্‌ড়ে যায়নি। এই-রকম করতে পারলে তবেই বাংলা ভাষার যথার্থ ভিতরকার সূত্রগুলি ধরা পড়বে। নইলে যাঁরা গোঁফ-কামিয়ে মা সেজেছেন সেই টুলো সরস্বতীদের মা-সরস্বতী মনে ক'রে তাঁদের ভাষাকে মাতৃভাষার মন্দিরে ঘুণী নাড়তে দিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

কারণ যত্ব-নত্ব-ওয়ালারা খাঁটি বাংলার পুতনা-স্বরূপ। ওঁরা মা সেজে এসেছেন বটে, কিন্তু স্তন্য বলে যা' সাত-কোটি বাঙালীর মুখে দিতে উদ্যত হয়েছেন তা একেবারে বিষ। কারণ তা কথ্য ভাষা নয়, একেবারে অকথ্য, দুরুচ্চার্য্য; তা চল্‌তি নয়, একেবারে অচল; তা রীতিমত ব্যাভার করলে মিউজিয়মে জায়গা হবে,—লোকালয়ে নয়। ওঁদের খাঁটি বাংলার অক্ষর-পরিচয় পর্য্যন্ত হয়নি, অথচ ওঁরা ব্যাকরণের সম্বন্ধে অনর্গল কলমবাজী ও গলাবাজী করে চলেচেন। অথচ যে-সংস্কৃতের সঙ্গে যোগ রাখবার জন্যে কচি ছেলেদের ঘাড়ে হ্রস্ব-দীর্ঘ

-নত্বের বোঝা চাপাচ্চেন, সেই সংস্কৃত যখন চারণ করচেন, তখন হিমালয় থেকে সারিকা পর্য্যন্ত টিট্‌কারী দিয়ে হো-হো-শব্দে হেসে উঠচে। এর কারণ, গোড়ায় গলদ থেকে যাচ্চে। সংস্কৃতের তদ্ভব ও তৎসম শব্দগুলি লেখ্‌বার বেলায় মাছি-মারা কেরানীর মত নকল করা হচ্ছে অথচ বল্‌বার বেলা বাংলার বাগ্‌দেবতা বাঙালীর ছেলের বাগ্‌যন্ত্রকে যেমনটি করেচেন ঠিক তারই বশে চলতে হচ্ছে। তব্‌লায় সেতারের গৎ বাজানো যাচ্ছে না। অথচ যদি আমরা উচ্চারণের অনুযায়ী বানান লেখবার ও পড়বার অভ্যাস করতুম তো সংস্কৃতও সহজে ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারা যেত, বাংলাও ফাঁক ছেড়ে বাঁচত।

বাংলা সংস্কৃতে যে প্রভেদের অন্ত নেই, যাঁরা একটু মনোযোগ দিয়ে দুটো ভাষা আলোচনা করেছেন, তাঁরাই এ-কথা স্বীকার করবেন। প্রথম স্বর-ব্যঞ্জনের কথাটা নেড়ে-চেড়ে দেখা যাক্। একটু ধীরভাবে বিচার করলেই দেখতে পাওয়া যায় যে, বাংলায় এমন স্বর নেই যা হসন্ত অর্থাৎ ব্যঞ্জনরূপে ব্যাভার না হয়েছে। কৃত্তিবাস থেকে, এমন কি শূন্যপুরাণ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত এমন লেখক কেউ হন নি যিনি বাংলা স্বরের বর্ণসঙ্কর মূর্ত্তি না দেখিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ গোটাকত এইখানে বল্‌ছি—

"আপন ইচ্ছাএ্‌ যাএ্‌ বোড়া জেথা লএ্‌ মন।"
—উত্তরকাণ্ড (কৃত্তিবাস)।

"জাহা সঙরনে হারাইল-ধন পাএ্‌ লোকে।"
—ঐ।

"হাথে হাথ মোচড়ে ওষ্ঠ কামড়াঅ্‌ দন্তে।"
—ঐ।

"চউদিকে জঅ্‌ জঅ্‌ কোলাহল হঅ্‌"
—শূন্যপুরাণ।

"বাজাআ্‌ জঅ্‌ ঢাক মেঘের মত ডাক
—শূন্যপুরাণ।

"ব্রহ্মা বিষ্টু মহেশ্বর জাহার তনএ্‌"
—ঐ।

বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দও এর স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির প্রথম তিন তিন চরণে চার চার মাত্রা (Syllable)। মাত্রাবৃত্ত বাংলা ছন্দে মাত্রা=স্বরযুক্ত বর্ণ + তৎপরস্থিত হসন্ত বর্ণ; যেমন—

মাতৃধনের | অংশ গেলে |
কার্ কাছে মা | যাব |
পিতৃধনে | অংশী হ'লে |
ছাই্ আছে তাই্ | পাব |
—ঈশ্বর গুপ্ত

এর মাত্রা ভাগ করলে এই রকম দাঁড়ায়—

মাৎ+ঋ+ধ+নের্। অং+শ+গে+লে।
কার্+কা+ছে+মা | যা+ব — —।
পিৎ+ঋ+ধ+নে | অং+শী+হ+লে |
ছাই্+আ+ছে+তাই্—পা+ব — —।

এতেও 'ছাই' ও 'তাই' শব্দের ই স্পষ্টই হসন্ত বা ব্যঞ্জন-ভাবাত্মক।

আরও দেখুন—

ছোট বউ্‌লো | রান্না চড়া।
বড় বউ্ ব- | ড়ালের ঝি।
—প্রাচীন ছড়া।

রাই্ উঠেছেন | রাই্ উঠেছেন |
বুড়ি গঙ্গার | ঘাটে
কার হাতে রে | শাঁখা সিঁদুর |
দাও্ গে রায়ের | হাতে
—ব্রতকথা।

যে রত্ন নাই্ | রত্নাকরে
ঘরে বসে | পেই্ছি করে
পদ্মযোনির | হৃৎপদ্মের ধন
—দাশুরায়।

হায় কি হ'ল | হেম নবীনের্ |
নাই্ক জারি | জুরি
—হেমচন্দ্র।

রুদ্র ওগো | দুঃখে সুখে |
এই্ কথাটি | বাজল বুকে |
তোমার প্রেমে — আঘাত আছে |
নাই্ক অব | -হেলা |
—রবীন্দ্রনাথ।

গীতার মতন | নাই্ক শাস্ত্র |
গীতার পুণ্যে বাঁচি |
—দ্বিজেন্দ্রলাল।

যে দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া গেল তার সকল গুলিরই হসন্ত-চিহ্নিত স্বরের প্রতি নজর করলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে। যেমন শেষ-দৃষ্টান্তটির গীতার 'র' এবং 'নাইক'শব্দের 'ই' দুই তুল্যমূল্য, দুইএরি এক ওজন, দুই হসন্ত। আমাদের এই হসন্ত স্বর চাওয়ায় আছে, পাওয়ায় আছে; লুকো-ছাপা হয়ে কেবল যে ঝিউড়ি বউড়ির দলে ভিড়ে আছে তা নয়, একেবারে খাঁ দেউড়িতে রয়েছে। এমন কি গোলা রেউড়ীর সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ফিরছে যজ্ঞিবাড়ীতে কেওড়া জলের সঙ্গে মিশে হাজা হাজার ভদ্রলোকের পিপাসা দূর করছে।

যখন "আমি খাই্" বা "তুমি খাও্" "সে খাএ্"* তখন ঐ বর্ণমালার বর্ণসঙ্ক গুলো আমাদের জাত মারবার জ আমাদের পাত ছুঁয়ে নিতান্ত ন্যাওটোভা বসে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলা স্বর-ব্যঞ্জনে বড় একটা প্রভেদ নেই। স্বর অক্লেশে ব্যঞ্জনের মত ব্যাভার হ'য়ে থাকে আর শুধু বাংলাতেই বা কেন, সিন্ধী কাশ্মিরী, মৈথিলী ও দ্রবিড় ভাষাতেও শেষের 'ই' 'উ' 'ও' হসন্ত-রূপেই অর্দ্ধো চ্চারিত হ'য়ে থাকে। বাংলাতে অধিকন্তু সময়ে-সময়ে মাঝের 'ই' 'ও' প্রভৃতিও হসন্ত হয়। যেমন "সেঁউ্তি"র 'উ' 'মাইতি'র 'ই' 'আও্তা'র 'ও' ইত্যাদি। সংস্কৃত-ভাঙা এতগুলো প্রাদেশিক ভাষাতে যে এই বর্ণসঙ্করের পশার বেড়েছে, বিদেশী হ'লেও পণ্ডিত গ্রিয়ার্সন্ তা জানেন। কিন্তু আমাদের পুন্‌কে-পাণিনি বা হবু-বোপদেবেরা সে খবর রাখেন বলে বোধ হয় না। এখন, বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জনের যদি বিশেষ-কোনো পার্থক্য না-ই থাকে, তবে তথাকথিত স্বরবর্ণে ব্যঞ্জনের ফলা না বিঁধব কেন? পাই্কারী শব্দটা যদি কেউ পাইকারী লেখে বা বানান করবার সময় 'প'-এ আকার 'ই'তে কফলা আ-কার,

* খায়-এর য় আধুনিক উৎপাত। উত্তম ও মধ্যম পুরুষে যখন হসন্ত স্বর এখনও চলচে তখন প্রথম পুরুষে আপত্তি কিসের?

ই' এ দীর্ঘ ঈ বলে তাতে ক্ষতি কি? আর স্বরবর্ণে আকার লাগানো? সেতো আমাদের সনাতন রীতি। অকারের গায়ে আকারের মাত্রা লাগিয়ে আমরা আকারের সৃষ্টি করেছি অথচ বাংলা অ একেবারে সংস্কৃত অ নয়। তা'ছাড়া হিব্রুর মতন বাংলা যদি স্বর অস্বীকার করে তাতেই বা কি? স্বরের বদলে যদি স্বর-তন্মাত্র "কামেৎ" "শুরেক" "ফতা" "কস্‌রা" বা "জবর" "জের"এর মত 'ি' 'ু'র নোক্তা লাগালেই চলে, ত চলুক না। এ বিষয়ে প্রকৃতই যদি বাংলা, শেমিটিক্ ভাষার অনুরূপ হয় তবে সংস্কৃতের সামগানে তা ঢাক্‌লে চল্‌বে না।

এইবার 'ঙ' 'ঞ'-র কথা। ছেলেবেলায় শুনেছিলুম = "ক খ গ ঘ আনো গুরু মশায়ের টিকি ধরে" ইত্যাদি ইত্যাদি। 'আনো' না হোক আমাদের 'ঙ'-টি যে জিহ্বামূলীয় ন এবং ঞটি তালব্য ন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং দন্ত্য ন এবং মূর্দ্ধন্য ণ যখন স্বাধীন তখন তালব্য ন (ঞ) আর জিহ্বা-মূলীয় ন (ঙ) স্বাধীনভাবে ব্যাভার না হবে কেন? বিশেষত ছন্দে যখন গোলোযোগের সম্ভাবনা ঘটে তখন 'ঙ' এবং 'ঙ্গ'-টা উচ্চারণের অনুযায়ী আলাদা ক'রে রাখাই উচিত, গাঙে আর গঙ্গায় একাকার হ'লে পরকালে মহা মুস্কিল।

আসামে 'ঙ'র ব্যাভার আছে। 'ডাগর' না লিখে অসমীয়া ভাষায় 'ডাঙর' লেখা হয়। আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু স্থানাভাব। বাংলা বৈষ্ণব কবির "শাঙন" রাতির সঙ্গে কোন্ কাব্য-রসিকের পরিচয় নেই?

আর 'ঞ'র জন্যেই বা লঙ্কা ডিঙোতে হবে কেন তা তো বুঝ্‌লুম না। ক্রিয়ার শেষে প্রাচীনকালের বাংলা ভাষার মতন নেপালি-ভাষায় এখনো 'য়'র জায়গায় বিকল্পে 'ঞ' লেখা হয়ে থাকে। ভূস্বর্গ কাশ্মীরে তো 'ঞ'র ছড়াছড়ি। যাঁরা কাশ্মীরী কবি রাজদানের "শিব-পরিণয়" পড়েছেন তাঁরা সকলেই একথা জানেন। আর ঐ কাব্য যখন কোল্‌কেতার এসিয়াটিক সোসাইটি থেকেও ছাপা হয়েছে তখন প্রত্নতাত্ত্বিক মশায়দের তো আগে জানা উচিত।

তবে, প্রত্নতত্ত্ব বেশীদিন আলোচনা করলে, বোধ হয় আর-কিছু নতুন আলোচনা করবার ফুরসুৎ থাকে না, কারণ তখন চারদিকেই প্রত্ন, চারদিকেই পেত্নী ব'লে ভ্রম হতে থাকে, এমন-কি যা সব-চেয়ে প্রাণের দ্বারা ওতঃপ্রোত, যা লক্ষ জিহ্বাকে অহরহ স্পন্দিত করছে সেই জীবন্ত মাতৃ-ভাষাকেও পেত্নী ভাষা বলে মনে হয়। আর 'হয়ে' 'ক'রে' প্রভৃতি প্রত্যেক ক্রিয়ার পিছনে 'ইয়া' 'ইয়া' লেজুড় জুড়ে নিজেদের ক্রিয়াবান পুরুষ বলে ঘোষণা করবার প্রবৃত্তি হয়। লঘু ক্রিয়ার জন্যেও বহ্বারম্ভ করতে হয়। সর্ব্বনামের বুকের পাঁজরে অকারণে সর্ব্বনাশের হাহা-কার ধ্বনিত করে তুলতে হয়, 'যার' 'তার' জায়গায় 'যাহার' 'তাহার' লিখে খামকা পুঁথি বাড়ানো অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। কারণ ঘোরালো না হলে, ঐতিহ্যের পেট না ভরলে, মোটকথা রচনা শব্দাড়ম্বরে মনুমেণ্টাল্ না হলে আমাদের পাণ্ডিত্যাভিমানী মনুসন্তানদের কিছুতেই মন ওঠে না।

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

মাসকাবারী

নারী-সম্মান

আষাঢ়ের মানসীতে সুকবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয় প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, Chivalry ব্যাপারটা বিদেশের আমদানি নয়, ভারতেও আগে তাহার অভাব ছিল না। কথাটা লইয়া সাহিত্যে আগেও অনেক নাড়াচাড়া হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে, ধরিতে গেলে একমাত্র রাজপুত-জাতির মধ্যেই য়ুরোপীয় Chivalryর মত উচ্চ ভাব ছিল। কিন্তু যতীন্দ্রবাবু তাহা দেখাইতে পারেন নাই। তাছাড়া, ভারতের অতীত কালে যে-শ্রেণীর নারী-সম্মান বর্ত্তমান ছিল, তাহা ঠিক Chivalryর মত নয়,—তাহার আদর্শ আরও উচ্চ। য়ুরোপের সঙ্গে সকল সময়ে ভারতের তুলনা করা, আমাদের একটা মারাত্মক বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; য়ুরোপের দোষ-গুণই কি ভারতের দোষ-গুণের মাপকাটি,—য়ুরোপই কি ভারতের আদর্শ? যে Chivalryর কথা লইয়া য়ুরোপে-ভারতে তুলনা করা হয়, সেই Chivalryর আদর্শই য়ুরোপে যতটা কাল্পনিক ছিল ততটা বাস্তবিক ছিল না। এ-কথা অনেক পাশ্চাত্য লেখকের মুখেই শুনিতে পাই। যেমন, জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিতেছেন:—"The practice of chivalry fell even more sadly short of its theoretic standard than practice generally falls below theory." (Subjection of women.)

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেব
—বড় জোর কথা"—তাতে সন্দেহ ক
না; কিন্তু 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' নারী-মর্য্যা
চরম মন্ত্র"—এ উক্তির তলায় ত কিছু
ট্যাঁরাসই দিতে পারিলাম না। 'গী
গোবিন্দে'র ঐ এক লাইন পড়িয়াই না
মর্য্যাদায় পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হই
কোন হেতু নাই; কারণ, সম্পূর্ণ শ্লো
এই:—

"স্মর-গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডণং
দেহি পদপল্লবমুদারং।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদন-কদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারং॥"

এ ত রতি-পূজার চরম মন্ত্র!—"নারী
মর্য্যাদার চরম মন্ত্র" যদি ইহাই হয়, অ
এমন সম্মানে যে-কোন মহিলা লজ্জায় মু
ঢাকিবেন। এখানে নারীর যৌবনের সম্মা
থাকিলেও তাঁহার নারীত্বের কোনই মর্য্যা
নাই; তবে যতীন্দ্রবাবু যদি আধ্যাত্মি
ব্যাখ্যা ফাঁদিয়া বসেন,—সে আলাদা কথা।

"সৌন্দর্য্য যাহার শক্তি, কোমলত
যাহার কান্তি, সজ্জা যাহার সম্পদ, মনে
হরণ যাহার মনোবৃত্তি এবং অশ্রু যাহা
আয়ুধ" যতীন্দ্রবাবুর মতে, তিনিই "নারী
দেবতা"।—পাঠক দেখিবেন, যিনি নারী
সম্মান-প্রতিষ্ঠার জন্য কলম ধরিয়াছেন, তিনি
নারীকে রতি-রূপেই আঁকিয়াছেন, অন্নপূর্ণা
রূপে আঁকেন নাই। এ বাঙ্গলা দেশে
নারী-সম্মানের কথা তুলিলে পত্নীপূজার
কথাই বুঝি সহজে মনে আসে—মাতৃপূজ

কেউ জানে না। এখন যিনি নারী-সম্মানের ওকালতি করিতেছেন তাঁরও শ্রদ্ধাবৃত্তির দৌড় ঐ পর্য্যন্ত; কিন্তু সেকালের সবাই এ তন্ত্রের নয়! তখনকার মহানির্ব্বানতন্ত্র বলিতেছেন, "ন ভার্য্যান্তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।"

যতীন্দ্রবাবু "নারী-সম্মানে"র আর-এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বৃন্দাবনে দোল-লীলার সময়ে 'লাঠ্‌মার হোলী' নামে এক উৎসব আছে। লেখক উৎসব-প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "পুরুষেরা কেহ বা কোন রমণীর অঙ্গে ফাগ দিতেছে, কেহ বা কোন তন্বঙ্গীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বসন্ত-লীলারসমধুর গ্রাম্য গীতাংশ গাহিয়া কুঙ্কুম ছুঁড়িয়া মারিতেছে, অমনি সে কোপিনী ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বিদ্রূপ রোগের সুকঠিন 'লাঠ্যৌষধে'র ব্যবস্থা করিতেছে। * * * পুরুষের প্রাণবিয়োগও ঘটিতেছে, তথাপি চিরপ্রথাগত নারীমর্য্যাদারীতির অমর্য্যাদা ঘটিতেছে না।"—এই কি নারী-মর্য্যাদার চিত্র? বৃন্দাবনে হোলীর 'গ্রাম্যগীত' আমরা শুনিয়াছি;—সে গান এত অশ্লীল যে, বলিয়া বুঝানো অসম্ভব। বৃন্দাবনের হোলীর গানে রমণীর রমণীত্বে যে বিষম কলঙ্ক মাখানো হয়, এ-যুগে যমুনার বিশীর্ণ ধারায় তাহার ছাপ্ উঠিবে না।

তারপর, "আনন্দের এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে, প্রতিদ্বন্দী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে দুর্ব্বল পক্ষকেই জয়ের যাবতীয় সুবিধা-সুযোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে।"—অতএব, নারীর কি সম্মান!

কিন্তু, যতীন্দ্রবাবু কি এটুকু বুঝেন নাই, এরূপ সুবিধা দেওয়ায় দুর্ব্বল পক্ষের প্রতি সবলের যতটা অনুগ্রহ জাহির হইয়াছে, ততটা মর্য্যাদা দেখানো হয় নাই? খেলা-ধূলায় সবল অনেকসময়ে দুর্ব্বলকে সাধ-করিয়া জিতিতে দেয়, চলিত কথায় যাকে আমরা বলি 'বেলেখেলা'! আবার, শিশুর হাতে আমরা যে সখ-করিয়া মার খাইয়া থাকি, তাতে কি শিশুর শক্তির মর্য্যাদা বাড়িয়া যায়?

দুঃখের বিষয়, যতীন্দ্রবাবু "নারী-সম্মান" লিখিতে বসিয়া মহিলার প্রতি সম্মানের পরিচয় যত-না দিয়াছেন অপমানের পরিমাণ তার-চেয়ে ঢের বেশী করিয়া ফেলিয়াছেন।

* *
*

কবিতার প্রাণ

"ঢাকা-রিভিউ ও সম্মিলনে"র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রাণপণে "কবিতার প্রাণ" আবিষ্কার করিতে গিয়া পাঠকের প্রাণান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। প্রাচীন ও আধুনিক অনেক কবির কাব্য লইয়া তিনি যে-সব কথা বলিয়াছেন, তাহা সমালোচনা নয়—অপগণ্ডের গণ্ডগোল মাত্র! লেখক একস্থানে বলিতেছেন:—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল"

এই কবিতাটী শিশুপাঠ্য হইলেও এমন মনোরম সরল ও সুন্দর কবিতা এপর্য্যন্তও রচিত হয় নাই।"

ছেলেবেলায় পাঠশালে আমরা এর চেয়েও "মনোরম সরল ও সুন্দর কবিতা" 'শিশুশিক্ষা'র প্রথমভাগে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে; যোগেন্দ্রবাবু এরই মধ্যে ভুলিয়া গেলেন! যথা—

"কাল কাক, ভাল নাক,
পান খায়, গান গায়,
শিকি চাই, টিকি নাই"—প্রভৃতি।

এখন ভাষার কথা। "সে শিষ্য দুইজন কে তাঁহাদের নাম আপনাদিগকে বলিবার কৌতূহল অনাবশ্যক, তাঁহারা আর কেহই নহেন আমি বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর কথা বলিতেছিলাম।"—আশা করি, "সম্মিলনে"র আগামী সংখ্যায় এই বিষম ধাঁধাটির উত্তর বাহির হইবে।

তারপর, অলঙ্কৃত ভাষার বিড়ম্বনা। "তখন নিদ্রিত দুঃখমগ্ন শোকাকুল বঙ্গবাসী দেখিতে পাইল"—প্রভৃতি। 'বঙ্গবাসী' যে ঘুমাইয়াও চোখ খুলিয়া দেখিতে পায়, বাঙ্গালী হইয়াও এ অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। লেখাটির আগাগোড়া এমনি ভাব ও ভাষার বিভ্রাটে ভরা। ভেড়ার লোম কত আর বাছিব?

যাঁহাদের কাব্যজ্ঞানের দৌড় "পাখী সব করে রব" পর্য্যন্ত এবং যাঁহাদের ভাষায় এখনও 'হাতমক্স' শেষ হয় নাই, তাঁহারাও যদি সাহিত্যের উপরে এমন করিয়া দৃষ্টি দেন, তবে বাঙ্গালী পাঠকের জন্য স্বস্ত্যয়ন করা দরকার!

* *
*

ছোটগল্প

আষাঢ় মাসের ভারতবর্ষে একটি ছোট গল্প পড়িলাম। গল্পটি একজন বিখ্যাত প্রবীণ লেখকের লেখা। তাহার আখ্যান-ভাগ এই :—

(১)

পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুতে রমেশ চারিদি অন্ধকার দেখিল। সংসারে বিধবা বৌদিদি, তাহ স্ত্রী লক্ষ্মী ও পুত্র নারায়ণ। বড় ভাই রোজগা ছিলেন, যা আনিতেন তাতেই সংসার চলিত রমেশ লেখাপড়া ভালরকম শিখে নাই.—সে বেকা বসিয়া থাকিত। সংসারের ভার এখন তারই ঘা পড়িল। শুধু তাই নয়—বসতবাড়ী তৈয়ারি করি যে পাঁচহাজার টাকা ধার হইয়াছিল, তার দু হাজার টাকা এখনো শুধিতে বাকী আছে।

লক্ষ্মী বলিল, "আমার ভাবনা হয়েছে, দিদি আমাদের ফেলে বাপের বাড়ী না যান। তিনি বড় মানুষের মেয়ে, তাঁর কি এত কষ্ট সহ্য হবে। মাসে মাসে তিনি যা হাতখরচ বাপের বাড়ী থেকে পেতেন, তার একটি পয়সাও ত তোমরা দুই ভাই বেটায় রাখতে দেও নাই। দিদি যদি একটু শক্ত হতেন, তাহলে কি তুমি এমন হতে পারতে! আমি কতদিন এই কথা দিদিকে বলেছি; তিনি হারাধন (রমেশকে তার বৌদিদি এই নামে ডাকিতেন) বল্‌তেই অজ্ঞান। এখন যে সবই গেল।"

(২)

বৌদিদির ভাই মোহিতবাবু রমেশকে পরামর্শ দিলেন, বসতবাড়ী বিক্রী করিয়া ধার শোধ করিতে। বৌদিদি স্বামীর ভিটা-বিক্রয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, "যদি না খেয়ে মরতে হয়, তাতেও রাজী আছি; আমি এই বাড়ীর মাটি কামড়ে পড়ে থাকব। আমি তোমাদের বাড়ী যাব না। আমার গয়না বেচে ধার শোধ দাও।"

মোহিতবাবু বলিলেন, "ওসব কথা আর বলিসনে কমলা! তোর দাদা দুই হাজার টাকা দিয়ে ধার শোধ দিতে পারে।"—মোহিতবাবু মস্ত এটর্ণী। রমেশকে তিনি নিজের আফিসে একটি কাজও দিতে স্বীকার করিলেন।

(৩)

সেইদিন রাত্রেই রমেশের চার-বছরের ছেলে নারায়ণ হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া ভয়ানক চীৎকার করিয়া

উঠিল। তারপর অজ্ঞান হইয়া গেল। ডাক্তারেরা কিছুতেই তার জ্ঞানসঞ্চার করিতে না পারিয়া বলিল, জীবনের আশা আর নাই।

রমেশের বৌদিদি স্বামীকে ডাকিতে লাগিলেন, "তুমিই আমার দেবতা। আমার প্রার্থনা শোন! আমার প্রার্থনা, নারায়ণকে নিয়ে যেতে পারবে না —নিয়ে যেতে পারবে না।"

লেখক বলিতেছেন,—

"তাহার পর যাহা হইল, তাহা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয় স্বতই অবনত হয়—আর সতীর মহিমা, বিধবার প্রার্থনার বল দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।"

বিধবার মৃত স্বামী আসিয়া একখণ্ড শিকড় দিয়া অদৃশ্য হইলেন। সেই শিকড় খাইয়া খোকা বাঁচিয়া গেল।

খোকা বাঁচিল, অতএব গল্পও ফুরাইল।

এই লেখাটি পড়িয়া ছোটগল্প-সম্বন্ধে যে দু-চার কথা মনে আসিয়াছে, এখানে তাহাই বলিতে চাই।

ছোটগল্পের লেখক আছেন প্রধানত দু-রকম। এক, যাঁরা সৃষ্টি করেন; আর এক, যাঁরা শুধু ঘটনা-বিবৃতি করেন।

সৃষ্টি করা যাঁহাদের কাজ তাঁহাদের গল্পের মানুষগুলি নিজের চরিত্র-প্রভাবে অগ্রসর হইতে থাকে; যে ঘটনা তাহাদের সামনে আসিয়া পড়ে তাহার গতি ঐ চরিত্রের অনুযায়ী হয় কিম্বা তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপযোগী ঘটনা সৃষ্টি করে। লেখকের দৃষ্টি থাকে যেন ঘটনা ও চরিত্রের সামঞ্জস্য নষ্ট না হয়। এইরূপে ঘটনার বিকাশ গল্পের মধ্য হইতেই হয় বলিয়া সে ঘটনাকে অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। নইলে বাহির হইতে ঘটনা চাপাইয়া দিলে পাঠকের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিবেই। সেই জন্য অলৌকিক কাণ্ড কিম্বা দৈবমহিমা সেখানে স্থান পায় না। এ-শ্রেণীর লেখকেরা জানেন, দৈব—দৈবমাত্র। কেবল দৈবের উপরে যাঁহারা চরিত্র-বিকাশের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহারা কখনই উঁচুদরের লেখক নন। কারণ, দৈব-সহায়তায় যে চরিত্রের বিকাশ, তাহাতে চরিত্রের মাহাত্ম্য ও লেখকের বাহাদুরী কোথায়?

ঘটনা-বর্ণনা করা যাঁহাদের কাজ তাঁহাদের কাছে ঘটনাই সর্ব্বস্ব। তেমন-করিয়া ঘটনা সৃষ্টি করিতে পারিলে অবশ্য কৃতিত্ব আছে, কিন্তু সৃষ্টি করা ত ইঁহাদের কাজ নয়, গড়গড় করিয়া বলিয়া যাওয়া ইঁহাদের উদ্দেশ্য। সেইজন্য তাঁহাদের বলিবার মুখে অনেক সময় সম্ভব-অসম্ভব বাধে না। কেহ যদি আপত্তি তোলেন যে, এমন ঘটনা অসম্ভব, তাঁহারা জবাব দেন যে সেই ঘটনা তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সাক্ষী-সাবুদ ডাকিয়া ত গল্পের রসগ্রহণ করা চলে না। গল্পের যা ঘটনা বা ইতিহাস, তার প্রমাণ গল্পের মধ্যেই থাকা চাই; তাহা এমন করিয়া সাজানো চাই যাহাতে পাঠকের মনে সংশয় না জাগিতে পারে। দৈবশক্তিতে বিশ্বাস কিম্বা ঐরূপ কোন জিনিষের উপর বরাত দেওয়া চলে না। অথবা যিনি গল্প লিখিতেছেন তিনি সাধু ব্যক্তি, তিনি কি মিথ্যা বলিবেন?—এ যুক্তিও খাটে না। গল্প পড়িবার সময় বাহিরে কি ঘটে না-ঘটে তা বিচার করিয়া দেখিবার তত দরকার নাই,—গল্পের আবহাওয়ার মধ্যে

সেরূপ ঘটনা সম্ভব কি না তাহাই বিচার্য্য। এই বিচারশক্তির অভাবে আমাদের অনেক গল্প-রচনায় কেবল পণ্ডশ্রম হয়। সেগুলা গল্প নামেরই যোগ্য হয় না—খবরের কাগজের উপযুক্ত রিপোর্ট হইতে পারে। গল্পসাহিত্যের আসরে তাহাদের কোন স্থান নাই।

এই ধরণের লেখকদের কাছে কেবলমাত্র ঘটনাই ভরসা বলিয়া অনেকসময়ে ইঁহাদের গল্পের স্বাভাবিক শৃঙ্খলা ও ধারা বজায় থাকে না। লেখকেরা যখন আর স্বাভাবিক ঘটনায় গল্পলিখিত পাত্র-পাত্রীদের চরিত্রবিকাশ করিতে অপারগ হন, তখন তাঁহারা বাধ্য হইয়া যা-তা আজ্‌গুবি একটা-কোন ব্যাপার আনিয়া গল্প জমাইবার উদ্যোগ করেন। উপরের গল্পটি তাহার প্রমাণ। লেখক, বিধবার আদর্শ চরিত্র আঁকিতে চান। কিন্তু, গোড়া থেকেই ঘটনার পর ঘটনা আনিয়া যখন দেখিলেন, পুঁথি বাড়িয়া যাইতেছে অথচ কিছুই হইতেছে না, তখন ভূত-প্রেত, ছেলের হঠাৎ অসুখ ও শিকড় প্রভৃতি নানান কাণ্ডের দরকার হইল।

সতী ডাকিলেই যে মৃত পতি শিকড়-হাতে ফিরিয়া আসিবেন, এ রূপকথায় সাজে; —কিন্তু এই দৈবঘটনার উপরেই যখন এই গল্পের সমস্ত গল্পত্ব নির্ভর করিতেছে, তখন তাহা না ঘটাইলে চলে কৈ!

সাহিত্য-সমাজে চিরকালই Creation বা সৃষ্টির আদর বেশী—Narration বা ঘটনা-বিবৃতির পসার তেমন নাই। যাঁহারা পরিণত, শিক্ষিত মনের খোরাক যোগাইতে চান, তাঁহারা সৃষ্টি করিয়া আপনাদের "নব-নব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধি"র পরিচয় দেন। ইঁহাদের সৃষ্ট চরিত্র-বিকাশের মুখে, স্বাভাবিক নি যে-সকল ঘটনা ঘটে, সে-সকল ঘটনা না ঘ আর উপায়ান্তর নাই, তাহা অবশ্যম্ভাবী। দিকে, যাঁহারা কোন নূতন চরিত্রের বি না দিয়া, কেবল ঘটনার পর ঘট বিবরণ দিয়া যাইবেন এবং দৈব সহা হইলেই যাঁহাদের সমস্ত গল্পত্ব পণ্ড হ যাইবে, তাঁহারাও পাঠক পাইবেন বটে,— কিন্তু সে পাঠশালার দশম-শ্রেণী গাছতলায় এবং ধানেব ক্ষেতে!

দৈব-ঔষধ, দৈব-মাদুলী যখন পঞ্জিকা বিজ্ঞাপনে বাহির হয়, তখন তা মানায় ভাল কিন্তু গল্প-সাহিত্যের মধ্যে তাহা জা করিলে লেখককে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

তারপর, আর এক কথা। উপরে গল্পটিতে লেখক দেখাইতে চান, বিধবা চরিত্র-মহিমা। এক্ষেত্রে তাঁহার কর্ত্তব্য বিধবার চরিত্র-বিকাশের পক্ষে যতটু দরকার,—কেবল ততটুকুই দেখানো। কি গল্পের প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগটি তিনি এ ছড়াইয়া লিখিয়াছেন ও বক্তব্যের অতিরি এত কথা বলিয়াছেন যে, সেই অতি-বিস্তৃতি ও অবান্তর কথাগুলির কোন সার্থকত আমরা খুঁজিয়া পাই নাই।

ছোটগল্প লেখার কায়দা আলাদা। বদ্ধ গবাক্ষের ছিদ্রপথে ঘরের মধ্যে সূর্য্যের রশ্মি আসিলে, সে আলোক-রেখা যেমন আশপাশ সব অন্ধকার রাখিয়া—কেবল যতটুকু যায় ততটুকু উজ্জ্বল করিয়া তুলে, ছোটগল্প-লেখকও তেমনি মূল-চরিত্রের বিকাশপক্ষে যেটুকু দরকার, সেটুকু ছাড়া আর-কিছু দেখাইতে পারিবেন না। আলোচ্য

র লেখক, রমেশের জন্য নিজে ভাবিয়াছেন ং মোহিতবাবুকেও ভাবাইয়াছেন; াবার, শেষে বেকার রমেশ যে চাকরি ইল সে-কথা বলিয়াও সকলকে নিশ্চিন্ত রিয়াছেন। অথচ বিধবা কমলার চরিত্র-কাশের পক্ষে এ-কথাগুলি কোনই াহায্য করে নাই। আমরা একটি ষ্টান্ত দিলাম মাত্র;—এ-ছাড়া এমনি কারণ প্রসঙ্গ আরও কয়েক স্থানে আছে।

দ্রোণাচার্য্যের আদেশে ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন যখন লক্ষ্যস্থির করিয়াছিলেন, তখন তিনি শাখাসীন পক্ষীর চক্ষু ছাড়া আর কিছু দেখিতে পান নাই। ছোটগল্প-লেখকের দৃষ্টিও এমনি তীক্ষ্ণ, অমোঘ ও লক্ষ্যবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

* * *

সমালোচনা

পল্লী-স্বাস্থ্য। শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু প্রণীত কাশক, শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বসু, ২৫নং মহেন্দ্র বসু ন, কলিকাতা। কলেজ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ার আনা মাত্র। "পল্লীগ্রামে নানা অসুবিধার মধ্যে াস করিয়া কিরূপে স্বাস্থ্য-রক্ষা করিতে পারা যায়, ৎসম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় ইঙ্গিতমাত্র এই ন্থে সূচিত হইয়াছে।" পল্লীসংস্কার-সম্বন্ধে আজ-াল চারিদিকে আন্দোলন দেখা দিলেও এ পর্য্যন্ত ন-দিকে কাজ কিছু আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া আমা-দের জানা নাই। গ্রন্থকারের এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা-খানিকে অবলম্বন করিয়া সে কাজ আরম্ভ হোক, ইহাই বক্তব্য। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি যে-সকল ব্যাধি মহামারীরূপে আবির্ভূত হইয়া পল্লী-গ্রামগুলিকে উজাড় করিয়া দিতেছে, সে সকল ব্যাধি প্রতিষেধ-সাপেক্ষ। সতর্কভাবে এসম্বন্ধে কতকগুলি সহজ নিয়ম পালন করিলে এ সকল ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িয়া মহামারীর মূর্ত্তি ধরিতে পারে না—এ গ্রন্থে সেই সকল মোটামুটি সহজ নিয়মগুলিরই উল্লেখ ও আলোচনা আছে; ম্যালেরিয়ার হাত হইতে মুক্তি পাইবার পক্ষে কতকগুলি সহজ উপায়ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থকার 'নিবেদনে' বলিয়াছেন, "দেশে ড্রেনেজের সুব্যবস্থা না হইলে ম্যালেরিয়া নিবারিত হইবে না, ইহা মনে করিয়া যাঁহারা নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি ও বিবেচনার প্রশংসা করিতে পারা যায় না। ড্রেনেজ ব্যতীত এমন অনেক সহজসাধ্য উপায় আছে, যাহা যথারীতি অবলম্বন করিলে আমরা ঐ রোগের অত্যাচার হইতে একেবারে না হোক, অনেকাংশে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারি।" সেই সকল সহজ উপায় এই গ্রন্থে সুন্দর সহজ ও সরল ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিয়া আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের আরম্ভে পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান দুরবস্থা ও তৎসম্বন্ধে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য আলোচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন, "দেশের সাধারণ লোককে বশীভূত করিবার একমাত্র উপায় তাহাদিগকে ভালবাসা। মুখে 'ভালবাসি' বলিলে হইবে না, 'কাজে' ভাল বাসিতে হইবে।" স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথাগুলি দেশের নিরক্ষর জনসাধারণকে বুঝাইবার ভার দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উপর। তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়া বিদেশে পড়িয়া থাকিলে দেশের স্বাস্থ্য কি করিয়া ভাল হইবে? কাজেই নিরক্ষর জনসাধারণ স্বাস্থ্য-রক্ষার বিধি-বিধানে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া মহামারীর অত্যাচারে প্রাণ হারাইতেছে—দেশও জনহীন লক্ষ্মীছাড়া হইয়া উঠিতেছে। এ সম্বন্ধে শুধু বক্তৃতা দিয়া বেড়াইলে বা মাসিকে প্রবন্ধ ছাপাইলে—ভাষার জোরে ত আর গ্রাম বাঁচিবে

না—হাতে-কলমে লাগা চাই। তারপর গ্রন্থকার প্রথমেই পানীয় জল ও খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পচা ডোবা ও কুয়ার জলই পল্লীগ্রামের লোক পান করিয়া থাকে। সে দূষিত জল ছাড়া উপায় নাই—এবং সে জল পান করিয়া সদ্য রোগের কবলে পড়িয়া গ্রামবাসী মারা ত পড়িবেই—জল পরিষ্কার করিবার উপায় জানা থাকিলে এ বিপদ ঘটিতে পারে না। যে ডোবায় তাহারা স্নান করে, কাপড় কাচে, বাসন মাজে, হয় তাহারই জল তাহারা পান করে, নয় কূপ হইতে জল লইয়া পান করে—অথচ এইসকল স্থানেরই ময়লা জল জমির মধ্য দিয়া কূপে প্রবেশ করিতেছে—আবার কিছুদূরে গোশালার ও পায়খানার ময়লা জল নর্দ্দামা বহিয়া আসিয়া অন্তঃপ্রবাহ দ্বারা কূপের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।' কি করিয়া পানীয় জল ভাল রাখা যায়, সে-সম্বন্ধে লেখক বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন—এবং সে উপায়ও তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাও আয়াস বা বহু-ব্যয়সাধ্যও নহে। গ্রন্থকার বিশেষজ্ঞ—তাঁহার মতে জল পরিষ্কার করিবার দুইটি অত্যন্ত-সহজ উপায়—জল ছাঁকা এবং ফুটাইয়া লওয়া। জল ছাঁকিবার পক্ষে কাপড় বা অন্য ছাঁকনি অপেক্ষা মোটাবালি ও কাঁকরই প্রশস্ত। তবে গ্রামে কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে শুধু ছাঁকনির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, এ কথাও গ্রন্থকার বলিয়াছেন। সে সময়—লেখক বলিয়াছেন, "জল যতই দূষিত হোক না কেন, উহার মধ্যে কলেরা প্রভৃতি যে কোন সংক্রামক রোগের বীজ সংমিশ্রিত থাকুক না কেন, উহাকে যদি কিছুক্ষণ ভাল করিয়া ফুটাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে উহার সংক্রামকতা দোষ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এরূপ জল নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে পান করা যাইতে পারে।" কলেরা রোগ দূষিত জল বা জলমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিয়াই উৎপন্ন হয়। গ্রন্থকার বলেন, "পার্সাঙ্গানেট অব্ পটাস্ (Permanganate of Potash) নামক একপ্রকার বিশোধক ঔষধ জলে মিশ্রিত করিলে জলের সংক্রামকতা-দোষ নষ্ট হইয়া যায়; এইজন্য কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় "পুষরিণী কূপের জলে এই পদার্থ মিশ্রিত করিয়া দিলে আ কারণ থাকে না। তবে এ দ্রব্যের মূল্য বেশী—সকল স্থানে পাওয়া যায় না। ব্যবহার করিতে ইহার মাত্রা পরিমিত হওয়া আবশ্যক—চিকিৎ হস্তেই ইহার সুব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা। সা লোকের পক্ষে জল ফুটান অপেক্ষা জলকে নি করিবার সহজ উপায় আর নাই।" গ্রন্থকার ব ছেন, "পল্লীগ্রামের সকলে যদি বারমাস পানী উত্তমরূপে ফুটাইয়া পরে শীতল করিয়া ব করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চিতরূপে ব পারি অর্দ্ধেক রোগ গ্রাম হইতে দূরীভূত খাদ্য-সম্বন্ধে তাঁহার ব্যবস্থা, অতিভোজন করিতে হইবে—কিঞ্চিৎ ক্ষুধা রাখিয়া ভোজন শরীর ভাল থাকে। বাসি ভাত ও বাসি ত পল্লীগ্রামের দরিদ্র পরিবারের পক্ষে ফেলিয়া সম্ভব নহে—তাহা দোষের নিশ্চয়ই—তবে উত্ত পুনরায় তাহা গরম করিয়া খাইলে তত দো না। গ্রীষ্মকালে বাসি তরকারি বিকৃত যায়—তাহা ভোজন করা উচিত নয়। সদ্য অন্নব্যঞ্জনই স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে প্রশস্ত। নির্ম স্বাস্থ্যরক্ষার আর-একটি প্রধান সহায়। বা বায়ু-সঞ্চালনের রীতিমত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজ দরিদ্র পল্লীবাসীর উপযোগী বাসগৃহ নির্ম কৌশলও লেখক বিবৃত করিয়াছেন—ঘর হওয়া প্রয়োজন এবং অর্থাভাবে গৃহে বা জানালা রাখিতে পারে না, তাহাদের উচিত দেওয়ালের মধ্যভাগ মাটি দিয়া না বুজাইয়া বাঁশের জাপরি বসানো। শীতকালে এই গুণ-চট দিয়া ঢাকিয়া দিলে ঠাণ্ডা আসিবে না বায়ু-সঞ্চালনেরও ব্যাঘাত ঘটে না। বাটীর নিকট স্থানে ময়লা বা জঞ্জাল জড় করিয়া রাখা নহে। ইহাতে গৃহের বায়ু দূষিত হয়, পুষ্করি জল নষ্ট হয় এবং মশার উপদ্রব বাড়ে। হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি—ম্যালেরিয়া তাড়া হইলে, মশার উৎপাত বন্ধ করা দরকার।

...সাফ করিতে হইবে—এবং মশারি ব্যবহার ...ত হইবে। জলা জমিতেই মশার উৎপত্তি—পচা ...ডোবা, বাটীর নিকটে যাহাতে থাকিতে না ...তাহার ব্যবস্থা করিলে মশার উৎপাত বন্ধ ...। এইরূপ মোটামুটি সহজ নিয়মগুলি পালন ...লে পল্লীর যথেষ্ট উন্নতি ঘটিবে—তবে, ...র অশিক্ষিত গ্রামবাসীর সহিত গ্রামের শিক্ষিত-...দায়ের আন্তরিক যোগ থাকা প্রয়োজন—তাহা-...কে এই সকল বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া, এ বিষয়ে ...য়া করা—অর্থাৎ ভাইয়ের মত তাহাদিগের সহিত ...লিয়া-মিশিয়া সংস্কার-ভার হাতে লইতে হইবে—...দিলে যাহাদের জ্ঞানের বল নাই, অর্থের বল নাই, ...দ্বারা কি করিয়া পল্লী-সংস্কার করিবে! এই গ্রন্থ-...টি পল্লীর ঘরে ঘরে গৃহপঞ্জিকার মত রক্ষিত ...ক—যাহাতে সাধারণের কোন অসুবিধা না হয় ...দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিচক্ষণ গ্রন্থকার-মহাশয় ...র মূল্য যথাসম্ভব সামান্যই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ...আনা মাত্র ব্যয় করিয়া এই গ্রন্থ ঘরে রাখিলে ...ও শারীরিক যন্ত্রণা ও মনস্তাপের হাত হইতে ...বাসী মুক্তিলাভ ত করিবেনই—এমন কি বহুমূল্য ...জন-প্রাণও রক্ষা পাইবার বিলক্ষণ আশা আছে।

কোরক। শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মিত্র প্রণীত। কলিকাতা, নিউ আর্য্যমিশন প্রেসে, শ্রীসুখময় মিত্র দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এখানি কবিতা-গ্রন্থ—কয়েকটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। লেখক 'নিবেদনে' লিখিয়াছেন, "কবিতা মুদ্রিত করাইয়া জনসাধারণের সমক্ষে বহিষ্করণ-রূপ অসমসাহসিকের কার্য্যে আমার এই প্রথম উদ্যম। এবংবিধ গুরুকার্য্যে যোগ্যত্ব এবং ফলাফলের বিষয় পূর্ব্বে সম্যক পর্য্যালোচনা না করিয়া অগ্রসর হইলে, পরে যেরূপ সকলের হাস্যাস্পদ হইতে হয়, আমাকে যে ঠিক তদ্রূপ হইতে হইবে, সেবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ রাখি না। তবে উপায়। * * * * * হেমবাবু হেম-বাবুরই ন্যায় এবং বঙ্কিমবাবু বঙ্কিমবাবুরই ন্যায় পরীক্ষিত হইবেন। আমার ন্যায় তরুণ এবং ক্ষুদ্র লেখককে পরীক্ষা করিতে হইলে সম্মানার্হ পণ্ডিত-গণকে কৃপাপরবশ হইয়া উচ্চ আসন পরিত্যাগ করিতে হইবে; কেননা, আমি তাঁহাদিগের কৃপা-প্রার্থী।" তারপর কবিতা আরম্ভ হইয়াছে—

"তব অমর বীণার মঞ্জু রাগিণী
ঝঙ্কে, তাহারি প্রাণ—"

'ঝঙ্কে' শুনিয়াও অগ্রসর হইলাম—তার পরই 'প্রণয়ের অরি প্রলয়ের ভেরী' আর 'বেদনা'!

দুই-খই। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ সাহা প্রণীত। কলিকাতা, মানসী প্রেসে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র। দেখিয়া প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, এখানিও কবিতা-গ্রন্থ—কিন্তু লেখক নিজেই ছাপ আঁটিয়া দিয়াছেন, "গান।" 'ফেলিয়ে'—'লুকায়ে' প্রভৃতি মিল ঘটাইয়া 'গান' জমাইবার আশা দুরাশা বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

কর্ম্মক্ষেত্র। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, ডি, লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল, আই, এম, এস্ (অবসর-প্রাপ্ত) প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীশ্রীকালী ঘোষ, ৫৬নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় অস্পৃশ্য জাতির সমাজে গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। আমাদের মধ্যে শতকরা ৮৭জন হিন্দুকে অর্থাৎ দুইশত লক্ষের মধ্যে ১৭০ লক্ষ হিন্দুকে ইতর অর্থাৎ পৃথক করিয়া রাখি এবং পৃথক থাকি—তাহাদের কপালে 'অস্পৃশ্য' ছাপ আঁটিয়া দিয়াছি। তাহাদের সুখ-দুঃখ, শুভাশুভের কোন সংবাদই রাখি না, তাহাদিগকে হীন পশুর চেয়েও হীনতর করিয়া রাখিয়াছি। ইহাতে নিজেদের মনুষ্যত্ব ত হারাইয়াছিই—এমন কি আমাদের জাতিও এই পাপে লোপ পাইতে বসিয়াছে। দেশের কাজে তাহাদের ডাকি না—তাহাদিগকে হারাইয়া বলহীন হইয়া মরণের প্রতীক্ষা করিতেছি। এ পুস্তিকায় ইহারই আলোচনা আছে।

আশ্রমে। শ্রীযুক্ত নিতাইচন্দ্র শীল প্রণীত। চুঁচুড়া সান্‌রাইজ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য তিন আনা। ক্ষুদ্র কবিতা-গ্রন্থ। বিশেষত্বহীন রচনা।

স্তবক। শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী প্রণীত।

কলিকাতা, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি ছোট গল্পের বই। 'পদচিহ্ন', 'অভিসার', 'হাজি', 'অকর্ম্মণ্য' প্রভৃতি দশটি ছোট গল্প এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। 'পদচিহ্ন', "অভিসার" ও 'হারু খুড়ার বিপদ' গল্প তিনটিতে আমরা ছোটগল্পের একটু সাড়া পাইয়াছি। কিন্তু ভাষার দোষে ও আড়ম্বরের বাহুল্যে ছোটগল্পের প্রাণটুকুই চাপা পড়িয়াছে। 'অভিসার' গল্পে এ দোষ অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু 'পদচিহ্ন' গল্পে—'বলিতে পার?'—এই প্রশ্নের ছড়াছড়িতে বিরক্তি ধরে। 'অকর্ম্মণ্য', 'শাসন-প্রণালী,' 'শুভযাত্রা' প্রভৃতি অপর গল্পগুলি সম্পূর্ণ বিশেষত্বহীন। গ্রন্থে কয়েকখানি ছবি আছে; ছাপা কাগজ ও বাঁধাই ভালো।

মাধবী। শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত। চট্টগ্রাম ছনহরা, যতীশ লাইব্রেরী হইতে শ্রীমণীন্দ্র বিনোদ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, ঘোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা-পুস্তক—খণ্ডকবিতার সমষ্টি। গ্রন্থের ললাট-পটে 'শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র, বি, এল' এক পরিচয়-পত্র আঁটিয়া দিয়াছেন। সে পত্রে কটমট ভাষায় স্তুতির মাত্রা যতখানি ঠাসা যাইতে পারে, আছে। কবিতাগুলিতে পূর্ব্বতন কবিগণের ভাবের ছায়া বহু স্থলেই লক্ষিত হইল—ছন্দে বৈচিত্র্য থাকিলেও প্রাণ নাই। বহুস্থলে মিলেরও দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। কবিতাগুলিতে কোথাও কোন বিশেষত্ব দেখিলাম না।

মন্দির। কিরণচাঁদ দরবেশ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীনলিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩নং পটল ডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রিয়-প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। আচার্য্যপ্রবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই গ্রন্থের ছোট একটু 'ভূমিকা' লিখিয়া দিয়াছেন। এখানি কবিতা-গ্রন্থ—খণ্ড কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি আধ্যাত্মিক—তবে দুর্ব্বোধ বা অস্পষ্ট নহে। রামেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "ভাষায় ও ছন্দে রবীন্দ্রনাথের [illegible] সর্ব্বত্র বিদ্যমান। * * ভাষার উপর তাঁহার [illegible] আছে। তিনি ভাষাকে ইচ্ছামত খেলা[illegible] পারিয়াছেন। তাঁহার ভাষা বেগে চলিয়াছে, [illegible] চলিয়াছে, স্থানে স্থানে কূল পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।" [illegible] কথায় আমরাও সায় দিতে পারি। [illegible] অনেকগুলি কবিতা আমাদের ভাল লাগিয়াছে; তবে কবিত্বের চেয়ে তত্ত্বকথার মাত্রাই ফুটিয়াছে বেশী।

হামির। ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রী[illegible] দয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীপ্রিয়নাথ [illegible] গুপ্ত, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। কালি[illegible] প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এই গ্রন্থ[illegible] প্রারম্ভে 'কয়েকটি কথায়' লেখক বলিয়াছেন, "উপন্যাস ইতিহাস নহে।" তাঁহারই কথায় প্রতিধ্বনি তুলি[illegible] আমরা বলি, 'ইতিহাস উপন্যাস নহে।' এই গ্রন্থে লেখক গড়্-গড়্ করিয়া ইতিহাসের যেটুকু বিষয় সংক্ষেপে দিয়া গিয়াছেন, ঐতিহাসিক তথ্য-হিসাবে সেটুকুর সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই—[illegible] যেখানে উপন্যাস দেখা দিয়াছে, সেখানেই [illegible] জুটিয়াছে বিস্তর। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ কোথাও নাই, তাহা ছাড়া কোন চরিত্রই উপন্যাস-হিসাবে বিকাশ লাভ [illegible] নাই। চিতোর দেখিয়া হামিরের প্রকাণ্ড 'স্বগত-উক্তি' নিতান্তই থিয়েটারী ঢংয়ের হইয়াছে। শাহা [illegible] শিবানীর রসিকতার প্রয়াস নেহাৎ মামুলি—গঙ্গা[illegible] প্রসাদ, বিদ্যাদিগ্‌গজ-দিগ্বিজয় ও মাণিকলালের [illegible] সংস্করণ; তবে তাহাদের প্রাণ আছে,—গণেশ বেচারা নির্জ্জীব; শুধু পটে আঁকা জীব। অবান্তর ব্যাপারের বহুল বর্ণনায় উপন্যাসখানি আচ্ছন্ন। উপন্যাসের আসল রসটুকুরই ইহাতে অভাব দেখিলাম। প্রশংসার মধ্যে বলিতে পারি, লেখকের ভাষা মন্দ নহে—সরল, আড়ম্বরহীন। এ গ্রন্থকে ঐতিহাসিক 'আখ্যান' মাত্র বলিতে পারি, উপন্যাস-হিসাবে রচনাটি ব্যর্থ হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

N.C. Maitra Family's Library
Narayan Chandra Maitra
Bonhooghly
Barnafore P.O.



দুজনে

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দে অঙ্কিত

ভারতী

৩০শ বর্ষ]　　ভাদ্র, ১৩২৩　　[৫ম সংখ্যা

বর্ত্তমান যুদ্ধে লিপ্ত দেশ

(১) অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরি

ছোটবড় আঠারটি দেশ লইয়া বর্ত্তমান ষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে। ই সাম্রাজ্যের বিস্তার অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রজাশক্তির বিকাশের ফলে হয় নাই। ষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরির আয়তন-বৃদ্ধি বেশীর ভাগ বিবাহিক সম্বন্ধের ফলে ঘটিয়াছে। বহেমিয়া, াঙ্গেরি প্রভৃতি রাজ্য বিবাহের যৌতুকস্বরূপ ষ্ট্রীয়ার হাতে আসিয়াছিল। তাই, এককালে ষ্ট্রীয়াকে বিদ্রূপ করিয়া বলা হইত, "আর কলে যুদ্ধ করিয়া মরুক, কিন্তু তুমি, হে াগ্যবতী অষ্ট্রীয়া, শুধু বিবাহ করিতে াক।" এই কারণে অনেকে অষ্ট্রীয়াকে ইউরোপের "শ্বাশুড়ী-মা" বলিয়াও অভিহিত করিয়াছিলেন।

বিবাহের দ্বারা অষ্ট্রীয়ার আয়তন-বৃদ্ধি ইয়াছে বটে, কিন্তু শক্তিবৃদ্ধি হয় নাই। অষ্ট্রীয়ার আঠারোটি প্রদেশে এগারোটি বিভিন্নজাতীয় লোক বাস করে। এই এগারটি জাতির ভিতর আবার পাঁচটি জাতি গোঁড়া ন্যাশনেলিষ্ট; দেশের আর সকল জাতির সহিত ইহাদের সর্ব্বদাই বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতেছে। অষ্ট্রীয়াতে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রায় সকল স্তরই দৃষ্টিগোচর হয়। ভিয়েনা-অঞ্চলের বৈজ্ঞানিক এবং উচ্চশিক্ষিত জার্ম্মান, টাইরলের সরল এবং সাহসী পাহাড়ী, হাঙ্গেরির জিপ্‌সি, বজনিয়ার মুসলমান, ট্র্যান্‌সিল্‌ভেনিয়ার প্রাচীন রোমান ঔপনিবেশিকদিগের বংশধর—রোমানিয়ানগণ, বহেমিয়ার উন্নতীশীল জেক্, গ্যালিসিয়ার রক্ষণশীল ইহুদি ও ভাগ্যহীন পোল এবং সর্ব্বশেষে মাগিয়ার। তুর্ক এবং রুশদেশের ফিন্ জাতি ব্যতীত ইউরোপে এই মাগিয়ারদের জাত-ভাই আর কেহ নাই। এই সব জাতি ছাড়া অষ্ট্রীয়াতে ইতালিয়ান্, সার্ভিয়ান্ প্রভৃতি বহু জাতি আছে। এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, অষ্ট্রীয়ায় এক অষ্ট্রীয়ান ব্যতীত আর সকল জাতিই বাস করে। প্রকৃতপক্ষে অষ্ট্রীয়ান নামে কোন জাতি নাই। তবে অষ্ট্রীয়ার জার্ম্মান-

দিগকে মোটামুটি অষ্ট্রীয়ান বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, কারণ ইহারাই প্রাচীন টিউটনিক সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। ইহাদের সংখ্যা অষ্ট্রীয়ার সমগ্র অধিবাসীদের সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। ইহারা সকল বিষয়ে অষ্ট্রীয়ার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা উন্নত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সর্ব্বদা বিবাদ-বিসম্বাদ স্বত্বেও এই-সব জাতি এতকাল যাবৎ একত্রে এবং এক রাজার অধীনে বাস করিয়া আসিতেছে। অনেক দিন পূর্ব্বে সার্ভিয়ার পররাষ্ট্র-সচীব বলিয়াছিলেন, অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী কোন জাতির স্বদেশ নহে, ইহা অনেকগুলি জাতির কারাগার মাত্র। কথাটা খুব সত্য, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত কোন জাতিই এই কারাগার হইতে পলাইবার চেষ্টা করে নাই। কোন কোন জাতি বারম্বার স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু তাহারা হাঙ্গেরিয়ান্‌দের ন্যায় অষ্ট্রীয়ার ভিতরে থাকিয়াই স্বাধীন হইতে চায়, অষ্ট্রীয়াকে ত্যাগ করিতে চায় না। তাহার প্রধান কারণ, বৃদ্ধসম্রাট ফ্রান্স জোসেফকে অষ্ট্রীয়ার সকল জাতিই সমানভাবে ভক্তি করিয়া থাকে। তাঁহার জীবনের দুঃখময় ইতিহাস পাঠ করিলে, তাঁহার প্রতি সকলেরই সহানুভূতি হয়।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে আঠার বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার পিতৃব্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁহার রাজ্যের সকল দেশেই ঘোরতর বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিতেছিল। তাঁহার সিংহাসন আরোহণ করিবার কয়েক মাস পূর্ব্বে—২৪শে ফেব্রুয়ারীতে ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের খবর পাইয়া সমস্ত দেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভিয়েনার অধিবাসীরা চিরকাল সৌখীন ও আমোদপ্রিয় বলিয়া পরিচিত তাহারা কখনো রাজনীতির ধার ধারিত না কিন্তু ভিয়েনাতেও, লুই ফিলিপের পতনের খবর আসিয়া পৌঁছিবার পর রাজধানীর অবস্থা ষোড়শ লুইয়ের জীবনের শেষ দিনে প্যারী নগরীর অবস্থার অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৩ই মার্চ্চ সমগ্র ভিয়েনা নগরী বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বহেমিয়া, হাঙ্গেরি, ইতালি প্রভৃতি দেশও বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। ফ্রান্স জোসেফ এই বিপ্লবের সময় অষ্ট্রীয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর এই বিপ্লবাগ্নি নির্ব্বাপণ করিতে কাটিয়া যায়। হাঙ্গেরির বিদ্রোহ দমন করিতে অষ্ট্রীয়ান গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেগ পাইতে হইয়াছিল। হাঙ্গেরিয়ানরা চিরকালই রণকুশল। তাহারা যুদ্ধের পর যুদ্ধে অষ্ট্রীয়ানদিগকে হারাইতে থাকে এবং অবশেষে ফ্রান্স জোসেফকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সুবিখ্যাত দেশ-হিতৈষী কসুথকে হাঙ্গেরির শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করে। এই বিপদের সময় ফ্রান্স জোসেফ রুশিয়ার জার নিকোলাসের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহারই সাহায্যে হাঙ্গেরির বিদ্রোহ দমন করেন। কসুথ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া তুরস্কের সুলতানের আশ্রয় লয়েন এবং অবশেষে আমেরিকায় গিয়া বাস করিতে থাকেন। তখন অষ্ট্রীয়ানরা হাঙ্গেরিয়ানদের উপর যে-প্রকার পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল —তার তুলনা বোধ হয় বর্ত্তমান যুদ্ধেও খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইবে। হাঙ্গেরিয়ান

বাহিনীর সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে জোর করিয়া অষ্ট্রীয়ান সেনাদলে সাধারণ সৈনিকরূপে ভর্ত্তি করান এবং একসঙ্গে এগারজন হাঙ্গেরিয়ান সেনাপতিকে ফাঁসী-কাঠে ঝুলান হয়। এঁদের ভিতর একজন যুদ্ধে আহত হইয়া শয্যাগত ছিলেন। তাঁহার একখানি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং স্কন্ধেও গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল; তবুও তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া ফাঁসী-কাঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়।

এর পর অষ্ট্রীয়ান গবর্ণমেণ্ট বিশবৎসরকাল হাঙ্গেরিয়ানদের উপর নানারূপ উপদ্রব করেন এবং তাহাদিগকে জার্ম্মান-ভাবাপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেন; কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গেরিকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হন। ফ্রান্স জোসেফ্ ঐ বৎসরই বুধাপেস্তে আসিয়া হাঙ্গেরির রাজারূপে অভিষিক্ত হন। অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরি তখন হইতে "যুক্তরাজত্ব" নামে পরিচিত।

ফ্রান্স জোসেফকে তাঁহার রাজ্যের আরও বহুবিধ দুর্দ্দশা দেখিতে হইয়াছে। সিংহাসনে আরোহণ করিবার কয়েক বৎসর পরেই রাজ্যের ইতালীয় প্রদেশগুলি প্রায় সমস্তই তাঁহার হাত-ছাড়া হইয়া যায়। তারপর প্রুশিয়ার হস্তে তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যসামন্ত ধ্বংস হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মান রাজ্যগুলির ভিতর অষ্ট্রীয়ার বহুকালের নেতৃত্ব নষ্ট হয়। এর উপরে তাঁহাকে অনেক পারিবারিক দুঃখ-কষ্টও ভোগ করিতে হইয়াছে। আততায়ীর হস্তে দুই-একবার তাঁহার নিজের প্রাণ-সংশয়ও ঘটিয়াছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র যুবরাজ রুডল্‌ফের শোচনীয় পরিণামের কথা সকলেরই জানা আছে। যুবরাজ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন কি আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, আজ পর্য্যন্ত তাহা ঠিক জানা যায় নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ্ সুইট্‌জারল্যাণ্ডে বিপ্লববাদীদের হাতে প্রাণ হারান। ফ্রান্স যোসেফের ভ্রাতা মাক্সিমিলিয়ান মেক্সিকো দেশের সম্রাট্ ছিলেন। ঐ দেশে বিপ্লব ঘোষণা হইবার পর প্রজাতান্ত্রিকদের আদেশে তাঁহাকে গুলি করিয়া মারা হয়। মাক্সিমিলিয়ানের স্ত্রী এখনো জীবিত আছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি শোকে পাগল হইয়া যান এবং এখনো সেই অবস্থায়ই আছেন। ফ্রান্স জোসেফের দুঃখের মাত্রা ইহাতেও পূর্ণ হয় নাই; দুইবৎসর হইল তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যুবরাজ ফার্দিনান্দকে একজন সার্ভিয়ান আততায়ী গুলি করিয়া মারে এবং তাহার দরুণই ইউরোপ আজ এই কুরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সম্রাটের বয়স এখন ছিয়াশী বৎসর। আটষট্টি বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র ইউরোপব্যাপী এক মহাবিপ্লবের সময় তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল এবং হয়ত এই আর-এক মহাবিপ্লবের ভিতরেই তাঁহার রাজত্বের অবসান হইবে। তাঁহার প্রতি তাঁহার রাজ্যের সকল জাতির সমান সহানুভূতি আছে এবং এই ব্যক্তিগত সহানুভূতিই অষ্ট্রীয়ার বিভিন্ন জাতিদের এতদিন একত্র রাখিতে পারিয়াছে। ইহা

ছাড়া অন্যান্য জাতির জানে যে অষ্ট্রীয়ার বাহিরে আসিয়া স্বাধীন হইলে তাহাদের স্বাধীনতা ক্ষণস্থায়ী হইবে। একাকী হইয়া পড়িলে পরাক্রান্ত প্রতিবেশীদিগের কোন একটীর রাজ্য-লিপ্সার চাপে পড়িয়া চিরদিনের জন্য নিজেদের অস্তিত্ব হারাইবে। তাই গবর্ণমেণ্টের সহিত সর্ব্বদা বিবাদ করিলেও এইসকল জাতি অষ্ট্রীয়া হইতে পৃথক থাকিতে চায় না।

জার্ম্মানরাই অষ্ট্রীয়ার রাজার জাতি এবং কিছুকাল পূর্ব্বে জার্ম্মানভাষাই অষ্ট্রীয়ার রাজ-ভাষা বলিয়া গণ্য হইত। রাজকীয় এবং দেশের যাবতীয় কাজকর্ম্ম জার্ম্মান ভাষাতেই সম্পাদিত হইত। আমাদের দেশে যেমন ইংরাজী না জানিলে গবর্ণমেণ্টের অধীনে কাজ মিলে না, সেইরূপ অষ্ট্রীয়াতেও কিছু-কাল পূর্ব্বে জার্ম্মান না জানিলে গবর্ণমেণ্টের কাজকর্ম্ম মিলিত না। তখন সকলে মনে করিত যে, কালে অষ্ট্রীয়াতে জার্ম্মান ব্যতীত আর কোন ভাষা থাকিবে না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে জেক্ এবং পোলদের ভিতর জাতীয় ভাব জাগিয়া উঠে এবং ক্রমে তাহা অন্যান্য জাতির ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই জাতীয় আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ভাষা-সংস্কার। জার্ম্মান ভাষা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া মাতৃভাষার উন্নতিসাধন করিতে হইবে ইহাই অষ্ট্রীয়ার বিভিন্ন জাতিদের মূলমন্ত্র। তাই প্রথমে ভাষা নিয়া জার্ম্মানদের সঙ্গে ইহাদের বিবাদ আরম্ভ হয়। গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মান হইলেও এ-বিষয়ে দুই-একটি জাতি ব্যতীত সকল জাতিকেই সমানভাবে সাহায্য করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়াছেন, দুই-এক ভাষা ব্যতীত অষ্ট্রীয়ার আর সকল ভা জার্ম্মান ভাষার সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হই এবং প্রধান প্রধান জাতিরা সকলে নিজেদের ভাষায় সরকারী কাজকর্মে ব্যবহার করিতে পারিবে। ইহা গবর্ণমেণ্টের অনেক কাজ বাড়িয়াছে। রা কর্ম্মচারীদিগকে দেশের প্রধান ভাষাগুলি শি করিতে হয়। তাহার উপর বিভিন্ন জাতিদে জন্য গবর্ণমেণ্টকে পৃথক পৃথক স্কুল, কলে ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইয়াছে অষ্ট্রীয়ার জার্ম্মানরা ইহাতে গবর্ণমেণ্টে উপর যার-পর-নাই বিরক্ত হইয়াছে; কার ইহাতে তাহাদের "প্যান্-জার্ম্মান" আন্দোল বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। হাঙ্গেরিয়ানদে নিকট জার্ম্মানরা আগেই পরাজি হইয়াছিল, কিন্তু ইদানিং এই ভাষা-যু জেক্, পোল, এমন-কি ষ্টাইরিয়া এ কারিন্থিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইয়া জার্ম্মানদের দু একবার পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছে এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া জার্ম্মানদের ক্ষো ও বিদ্বেষ আরো বাড়িয়া গিয়াছে। "প্যান জার্ম্মান" আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য জার্ম্মানি এবং অষ্ট্রীয়ার টিউটনিক জাতিদে এক সাম্রাজ্যের অধীনে আনা নহে; রু দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা (বুয়ার) হলাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের সম টিউটনিক জাতিদের একত্র করাও এ আন্দোলনের লক্ষ্য। Pan-Germanism আর এক উদ্দেশ্য, সালোনিকা পর্য্য

বলকান দেশে এবং কন্‌ষ্টান্তিনোপল ও বাগ্‌দাদের রাস্তা দিয়া পারস্য-উপসাগর পর্য্যন্ত দূরস্থ-দেশে জার্ম্মান অধিকার বিস্তার করা। কারণ, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যে-সমস্ত জার্ম্মান গমন করে, তাহারা শীঘ্রই স্বদেশকে ভুলিয়া যায় এবং নিজেদের জাতীয়তা হারাইয়া ফেলে। কিন্তু এসিয়া-মাইনর প্রভৃতি দেশে জার্ম্মান-উপনিবেশ স্থাপিত হইলে,—উপনিবেশিকরা চিরকালই জার্ম্মান থাকিবে—নিজেদের জাতীয়তা হারাইবে না। বাগ্‌দাদ-রেলওয়ে এই উদ্দেশ্যেই স্থাপন করা হইয়াছিল এবং ইহাকেই জার্ম্মানরা গর্ব্ব করিয়া বলিত, "Drang nach Osten",—অর্থাৎ পূর্ব্বের দিকে চাপ দেওয়া। যুদ্ধের পূর্ব্বে একমাত্র এসিয়া-মাইনরেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার জার্ম্মান বাস করিত। ইদানিং অষ্ট্রীয়ায় জেক্, মাগীয়ার এবং ইতালিয়ানদের সহিত জার্ম্মানদের বিবাদের ফলে এই "প্যান-জার্ম্মান" আন্দোলন একটু নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই বিবাদের ফলে এখন অষ্ট্রীয়ার অধিকাংশ জার্ম্মানই জার্ম্মানিকে তাহাদের স্বদেশ বলিয়া মনে করে। অষ্ট্রীয়ার অনেক জার্ম্মান, প্রুসিয়ান অপেক্ষাও হোহেন্‌জলার্ণ বংশের অধিক ভক্ত। বিস্মার্কই তাহাদের জাতীয় আদর্শ বীরপুরুষ এবং সিডানের বাৎসরিক জয়োৎসবই তাহাদের জাতীয় উৎসব। মাঝখানে বহেমিয়া না থাকিলে বিস্মার্ক নিশ্চয়ই অষ্ট্রীয়ার জার্ম্মান অংশকে প্রুশিয়ার অধিকারভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। অবশ্য, অষ্ট্রীয়ার দক্ষিণে জার্ম্মানদের সহিত প্রুশিয়ানদের চরিত্রের কোন সামঞ্জস্য নাই। অষ্ট্রীয়ার দক্ষিণে জার্ম্মানরা অতিশয় ভদ্র, মধুরপ্রকৃতি এবং অতিথিবৎসল। ইহারা একটু আরামপ্রিয়, তাই প্রুশিয়ানদের ন্যায় অতটা মারামারি-হাঙ্গামা পছন্দ করে না।

অষ্ট্রীয়ায় "প্যান-জার্ম্মান" আন্দোলনের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার নিমিত্ত "প্যান-স্লাভ" আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু "প্যান-জার্ম্মান"দের ন্যায় "প্যান-স্লাভ"দের কোন বাঁধা-ধরা কার্য্যপ্রণালী নাই। রুষিয়ার "প্যান-স্লাভ-"দের ন্যায় ইহারাও সমগ্র স্লাভ জাতির ভিতর ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিতে চায়। ইহা ব্যতীত ইহাদের অন্য কোন উচ্চ লক্ষ্য নাই। অষ্ট্রীয়ার স্লাভদের সংখ্যা অন্যান্য সকল জাতির অপেক্ষা অধিক। কিন্তু ইহাদের ভিতর চিরদিন দলাদলি চলিতেছে এবং ইহাই ইহাদিগের দুর্ব্বলতার কারণ। একসময় "প্যান-স্লাভ"দের লক্ষ্য ছিল, অষ্ট্রীয়াতে রুষিয়ার অধীনে এক স্লাভ সাম্রাজ্য স্থাপন করা; কিন্তু জাপানের হাতে রুষিয়ার পরাজয় হইবার পর এই আশা ত্যাগ করা হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পর আবার কি হইবে, বলা যায় না।

অষ্ট্রীয়ার স্লাভনিক জাতিদের ভিতর জেক্‌রা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। বিদ্যা-বুদ্ধিতে ইহারা ইউরোপের কোন জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। জার্ম্মানদের সহিত ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরোধ এবং ইহারা "প্যান-জার্ম্মান" আন্দোলনের প্রবল শত্রু। হাঙ্গেরির ন্যায় বহেমিয়াও স্বাধীন হয় এবং সম্রাট প্রাগ নগরে আসিয়া বহেমিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন, ইহাই তাহাদের

ইচ্ছা। তাহাদের আন্দোলনের দরুণ গবর্ণমেণ্ট ১৮৯৭ খৃঃ জেক্ ভাষা, বহেমিয়ার সরকারী ভাষা বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হয়েন। তখন হইতেই জার্ম্মানদের সহিত ইহাদের ঘোরতর বিরোধ আরম্ভ হয়। এই বিবাদের ফলে ইহাদের মধ্যে অনেকবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুধু রাস্তায় নয়, অনেকবার পার্লিয়ামেণ্ট-গৃহেও হইয়াছে এবং উভয় পক্ষের এই দলাদলির দরুণ অনেকবার পার্লিয়ামেণ্টের কাজ-কর্ম্ম বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জেকদের অত্যাচারে ভিয়েনার বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল; তখন জার্ম্মানরা লিঞ্জ নগরে কুবেলিকের প্রসিদ্ধ কন্সর্ট-হল ধ্বংস করিয়া এর প্রতিশোধ লয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে জেক্‌রা প্রায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। তখন গবর্ণমেণ্ট বহেমিয়ার রাজধানী প্রাগ নগরে সামরিক আইন ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সব বিবাদে মোটের উপর জেক্‌রাই লাভ করিয়াছে বেশী এবং বর্ত্তমানে বহেমিয়ার অনেক স্থানে জার্ম্মান ভাষাকেও সম্পূর্ণ বয়কট করা হইয়াছে। প্রাগ নগরের সমুদয় রাস্তার নাম জেক্ ভাষায় লিখিত,—আগে সকল রাস্তারই জার্ম্মান নাম ছিল। এমন-কি, প্রাগে কাহারও বাড়ীর সাম্‌নে জার্ম্মান ভাষায় লিখিত সাইনবোর্ড লাগাইবারও হুকুম নাই। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কিছুদিনের জন্য আমি প্রাগে গিয়াছিলাম। আমি পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর Baron von Kranz-bergএর বাড়ীতে থাকিতাম। বাড়ী থেকে বাহির হইতে গেলেই Baroness von Kranzberg রোজ আমাকে সাবধান করি দিতেন, যেন রাস্তায় কাহারও সহিত জার্ম্মা ভাষায় কথা না বলি। রাস্তায় পুলিশ জার্ম্মান ভাষায় কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উ মিলিত না—অথচ সকল পুলিশ-কর্ম্মচারী জার্ম্মান ভাষা জানিত। আমি একদি প্রাগের প্রসিদ্ধ রাস্তা ফার্দিনা ষ্ট্রীটের কোন বাড়ীতে একজন মজুরে দ্বারা একটা পার্শেল পাঠাইতেছিলাম পার্শেলের উপরে রাস্তার নাম জার্ম্মান ভা ফার্দ্দিনান্দ ষ্ট্রীট লিখা ছিল বলিয়া মজুর তাহা লইয়া যাইতে কিছুতেই রা হইল না। অবশেষে জার্ম্মান নাম কাটি জেক ভাষায় রাস্তার নাম লিখি দিলে সে পার্শেল লইয়া গেল। জার্ম্মা ভাষার প্রতি এই বিদ্বেষ শুধু মধ্য এব নিম্নশ্রেণীর স্লাভদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়; উচ্চ শ্রেণীর স্লাভদের মধ্যে এই ভাষা-বিদ্বে নাই। তাহারা প্রায় সকলেই দেশে প্রধান প্রধান ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে।

জার্ম্মানরা স্লাভদের এই ভাষা-বিদ্বে প্রথম প্রথম উপেক্ষার চক্ষে দেখিত। তাহারা জানিত যে, উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত জার্ম্মান ভাষা ভিন্ন ইহাদের উপায় নাই। বাস্তবিকও পোল এবং জেক্ ভাষা ব্যতীত অষ্ট্রীয়ার অন্যান্য স্লাভানিক ভাষায় উচ্চশিক্ষার উপযোগী কোন পুস্তক ছিল না। অষ্ট্রীয়ার কোন কোন স্লাভানিক ভাষা কত দরিদ্র তাহা দেখাইবার নিমিত্ত কার্নিওলার উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে সুভাক্ ভাষায় শিক্ষা প্রদানের যেদিন প্রস্তাব করা হয়, সেই দিন Count Aueroperg পার্লিয়ামেণ্ট-সভায়

প্রাগ সুভাক্ সাহিত্য সঙ্গে লইয়া উপস্থিত য়াছিলেন। চেষ্টায় তাহাদের সাহিত্যের ই দারিদ্র্য অনেকটা ঘুচিয়া গিয়াছে এবং র্ত্তমানে কার্নিওলার উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়েও ভাক্ ভাষায় শিক্ষাপ্রদান করা হইয়া থাকে। াগ সহরে অনেক দিন হইল, জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে একটি জেক্ বিশ্ব-দ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে ার্ম্মানরা আরো বিরক্ত হইয়াছে, কারণ াগের বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা াচীন বিশ্ববিদ্যালয় এবং এককালে ইহা ার্ম্মান সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল।

জেক্ ব্যতীত হাঙ্গেরিয়ানদের সঙ্গেও ষা লইয়া জার্ম্মানদের বিবাদ চলিতেছে। াঙ্গেরি অষ্ট্রীয়ার একটি স্বাধীন রাজ্য। াজস্ব এবং সৈনিক বিভাগ ছাড়া আর ব বিভাগই অষ্ট্রীয়া হইতে পৃথক। াঙ্গেরির পৃথক পার্লিয়ামেণ্ট-সভা আছে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গেরির পার্লিয়ামেণ্ট সৈনিক-বিভাগে জার্ম্মান ভাষার পরিবর্ত্তে হাঙ্গেরিয়ান ভাষা চালাইবার প্রস্তাব করেন। অষ্ট্রীয়ান পার্লিয়ামেণ্টের অনুরোধে সম্রাট ইহাতে মত না দেওয়ায় হাঙ্গেরিয়ান পার্লিয়ামেণ্ট কর দেওয়া এবং সৈন্য-চালান করা বন্ধ করিয়া দেন। এই গোলমাল সমানে পাঁচ বৎসর কাল চলিতে থাকে এবং অবশেষে সম্রাটের চেষ্টায় মিটমাট হইয়া যায়। অষ্ট্রীয়া এবং হাঙ্গেরির মধ্যে বিবাদ হইলে তাহা আপোষে মিটাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে এবং হাঙ্গেরিকে পৃথক মাশুলের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ভাষা নিয়া বিবাদ এখনো থামে নাই।

অষ্ট্রীয়ার ইতালিয়ানরাও গবর্ণমেণ্টের উপর সন্তুষ্ট নয়। ইহাদেরও প্রধান অনুযোগ, ভাষা। জেক্ পোল প্রভৃতি জাতির নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কিন্তু ইতালিয়ানদের জন্য গবর্ণমেণ্ট এ-পর্য্যন্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন নাই। উচ্চ-শিক্ষার নিমিত্ত ইতালিয়ানদের মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে হয়। দক্ষিণ Tyrol, Treist এবং Istriaর অধিকাংশ অধিবাসী ইতালিয়ান। তাহারা ইতালির সহিত মিলিতে চায়। ইতালির "Irredentist"রা ইহাদের পৃষ্ঠপোষক। এই "Irredentist"দের প্ররোচনায় Tyrol এবং Treist-এ অনেকবার দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধের পরে হয়ত ইহাদের আশা পূর্ণ হইবে।

অষ্ট্রীয়ার পোলদের অবস্থা রুষিয়া এবং জার্ম্মানির পোলদের অপেক্ষা অনেক ভাল। জার্ম্মানির পোলদের নিজের ভাষায় কথা বলিবার অধিকার নাই। রুষিয়াতে তাদের দশা এতটা খারাপ না হইলেও ওয়ার্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ে পোল ভাষার স্থান নাই। অষ্ট্রীয়াতে এ-পর্য্যন্ত পোলদের প্রতি কোন অত্যাচার করা হয় নাই। অষ্ট্রীয়ার পোলদের অধিকার জার্ম্মানদের সমান এবং তাহাদের জন্য গবর্ণমেণ্ট পৃথক স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি ও বীরত্বে তাহারা ইউরোপের অনেক জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কোন জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। ইউরোপে ইহাদের ন্যায় মধুরস্বভাব জাতি আর দুটি নাই। কিন্তু ইহারা আজ দুইশত বৎসর পরাধীন। অষ্ট্রীয়া, জার্ম্মানি এবং

রুষিয়া এই তিন দেশে মিলিয়া নিজেদের মধ্যে পোল্যাণ্ড দেশটিকে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। দেশের অভিজাত-সম্প্রদায়ের চরিত্রহীনতা এবং হ্যাপস্‌বার্গ ও বুরবোঁ বংশের চক্রান্ত হতভাগ্য পোল্যাণ্ডের পতনের কারণ হইয়াছিল। অষ্ট্রীয়ান গবর্ণমেণ্টের সদ্‌ব্যবহারের দরুণ অষ্ট্রীয়ার পোলরা এত দিন তুষ্ট ছিল, কিন্তু ইদানিং অষ্ট্রীয়ার মিত্র জার্ম্মানির হাতে তাহাদের স্বজাতিদের দুর্দ্দশা দেখিয়া পোলরা গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে জার্ম্মান-অধিকৃত রুশ-পোল্যাণ্ডের অবস্থা বেল্‌জিয়ামের অনুরূপ, কিম্বা বেলজিয়াম অপেক্ষাও খারাপ। এই যুদ্ধের ফলে যদি পোল্যাণ্ড আজ দুইশত বৎসর পরে তাহার লুপ্ত স্বাধীনতা আবার ফিরিয়া পায়, তাহা হইলে এই লোকক্ষয় অনেকটা সার্থক হইবে।

অষ্ট্রীয়ার বিভিন্ন জাতিদের নিজের ভিতর এবং গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে চিরদিন বিবাদ থাকা সত্ত্বেও ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের জুবিলি-উৎসবে সকল জাতিই সমান উৎসাহে যোগদান করিয়াছিল। সম্রাটের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি এই উৎসাহের কারণ। সম্রাটের জুবিলি ব্যতীত ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়াতে আর-একটী স্মরণযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। বহুকাল ধরিয়া রুষিয়া এবং অষ্ট্রীয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত তুরস্কের ক্রমিক অবনতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল; তুরস্কের পতন হইলেই উভয়ে দেশ ভাগ করিয়া লইবে এই ছিল তাহাদের অভিপ্রায়। উভয়েরই স্বার্থ এক; তাই উভয়েই মিলিয়া সুলতানের কাছে তাঁহার রাজ্যের উন্নতির নিমিত্ত, বিশেষতঃ মাসিডনিয়া অধিবাসীদিগের উন্নতির নিমিত্ত নানারূপ সংস্কারের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবের একটিও সুলতান কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত হয়—ইহা প্রস্তাবকারীদেরও উদ্দেশ্য ছিল না; তুরস্ক সংস্কৃত হইয়া ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় শক্তিশালী হইয়া উঠুক, ইহা অষ্ট্রীয়ার কিম্বা রুষিয়ার মনের কথা নহে। সুতরাং অপর কেহ তুরস্কে কার্য্যকরী সংস্কারের প্রস্তাব করিলে ইঁহারা উভয়ে তুরস্কের অখণ্ডতার দোহাই দিয়া প্রস্তাবিত সংস্কারে বাধা দিতেন। এদিকে কিন্তু উভয়েই স্বার্থসাধনের জন্য রেলওয়ে প্রভৃতির সাহায্যে তুরস্কের অখণ্ডতা নষ্ট করিবার নিমিত্ত গোপনে মন্ত্রণা করিতেন। কিন্তু ইঁহাদের এই-সব ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে নবীন তুর্কীদের বিদ্রোহ বাঁধিয়া উঠে। এই বিপ্লব কিরূপ নৈপুণ্য এবং ধীরতার সহিত চালিত হইয়াছিল—তাহা সকলেরই জানা আছে। সকলেই ভাবিয়াছিল এবার তুরস্কের বাস্তবিক সুদিন আসিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তুরস্কের উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের কৃতকার্য্যতা স্থায়ী হইল না। তুরস্কে বিদ্রোহের খবর পাইয়া অষ্ট্রীয়া ও রুষিয়া উভয়েই হতাশ হইলেন। তুরস্ক নবপ্রাণে বলী হইয়া উঠিল—আর ত তুরস্ককে লুট করা যাইবে না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে! এইভাবে হতাশ হইয়া উভয় শক্তিই আবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সেই ষড়যন্ত্রের ভিতরকার খবর কেউ জানেনা। তবে

ইহা মাত্র প্রকাশ যে, অষ্ট্রীয়ার পররাষ্ট্র-সচীবের সঙ্গে রুষিয়া এবং ইতালির পররাষ্ট্র-সচীবদের অনেকবার গোপনে মন্ত্রণা হইয়াছিল। ইতালি বল্‌গোলি আক্রমণ করিলে ইঁহারা কেহ বাধা দিবেন না—বোধ হয় তখনই এই বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এর কিছুদিন পরে সেপ্টেম্বর মাসে বুলগেরিয়ার করদরাজা ফার্দিনান্দ, ভিয়েনা নগরে আসেন এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে খুব আদর-যত্ন করেন। ফার্দিনান্দ, জাতিতে পূরা জর্ম্মাণ। ৫ই অক্টোবর অষ্ট্রীয়ার মন্ত্রণায় ফার্দিনান্দ, বুলগেরিয়াকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করেন এবং নিজে "জার" উপাধি গ্রহণ করেন ও সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব-রুমেলিয়ার জন্য তুরস্ককে কর দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। ঠিক এর পরের দিন অষ্ট্রীয়া তুরস্কের দুইটি প্রদেশ—বস্‌নিয়া ও হার্জেগভনিয়া অষ্ট্রীয়া-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলেন। অষ্ট্রীয়ার এই সব কার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল, তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব নষ্ট করা—অন্ততঃ তাহাদের কার্য্যে বাধা দেওয়া এবং তুরস্কে আবার সুলতানের কলুষিত রাজ্যশাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা। যাহা হউক তুরস্কের সঙ্গে তখন যুদ্ধ বাধিল না, কারণ তুরস্ক এই অপমান নীরবে সহ্য করিল। বস্‌নিয়া ও হার্জেগভনিয়া বার্লিন-সন্ধির ফলে নামে মাত্র তুরস্কের অধীনে ছিল এবং বুলগেরিয়াতেও তুরস্কের অধিকার শুধু কাগজ-পত্রেই ছিল। ইংরাজের ভয়ে Baron von Achrenthal আর বেশী-কিছু করিতে পারিলেন না। ইংরাজ চিরদিনই তুরস্কের বন্ধু ছিলেন। বস্‌নিয়া ও হার্জেগভনিয়া অষ্ট্রীয়া কাড়িয়া লইবার পর সার এডওয়ার্ড গ্রে তুরস্কের উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের প্রতি ইংলণ্ডের সহানুভূতি প্রকাশে ঘোষণা করেন এবং তার দরুণ অষ্ট্রীয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। এই ব্যাপারে অষ্ট্রীয়ার প্রতি সার্ভিয়া এবং মণ্টেনিগ্রোর বিদ্বেষ আরো বাড়িয়া উঠে। বস্‌নিয়া ও হার্জেগভনিয়ায় বিশলক্ষ সার্ভিয়ান বাস করে। ইহাদের অনেকে ধর্ম্মে মুসলমান হইলেও জাতিতে স্লাভ। অষ্ট্রীয়ার এই রাজ্য-সংযোজনে সার্ভিয়ান জাতিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়া বস্‌নিয়া ও হার্জেগভনিয়াকে নিজস্ব শাসনপ্রণালী দিয়াছেন এবং বিরানব্বই জন মেম্বর লইয়া একটি ব্যবস্থাপক-সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন, অষ্ট্রীয়াতে স্লাভ আধিপত্য বিস্তার করাই এই রাজ্য-সংযোজনের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তাহা কতদূর সত্য বলা যায় না। খুব সম্ভব, পূর্ব্বাঞ্চলে জার্ম্মান অধিকার বিস্তার করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। বস্‌নিয়া ও হার্জেগভনিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে তাহাই মনে হয়। যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দুই প্রদেশকে জার্ম্মান-ভাবাপন্ন করিবার বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছে। এই দুই প্রদেশের প্রায় সমস্ত রাজকর্ম্মচারীই জার্ম্মান। দেশের জঙ্গল কাটিবার কিম্বা খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিবার অধিকার জার্ম্মান কণ্ট্রাক্টর ভিন্ন আর কাহারও নাই। অনেক স্লাভনিক বিদ্যালয় উঠাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে জার্ম্মান বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। জার্ম্মান সংবাদপত্র ভিন্ন

দেশের অন্য সব সংবাদপত্রের মতামতের স্বাধীনতার উপর কড়া নজর রাখা হইয়াছে। এই সব কারণে বস্‌নিয়া ও হার্জেগভনিয়ার অধিবাসীরা—মুসলমান এবং ক্রিশ্চান—সকলেই অসন্তুষ্ট।

এইরূপে অষ্ট্রিয়ার সকল জাতিই গবর্ণমেণ্টের উপর অসন্তুষ্ট। যুদ্ধের পূর্ব্বে অনেকে বলিতেন যে, বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যু হইলেই অষ্ট্রিয়ায় রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ হইবে। বর্ত্তমানে অনেকে বলেন, এই যুদ্ধের পর আর অষ্ট্রিয়ার অস্তিত্ব থাকিবে না এবং থাকিবারও প্রয়োজন নাই। কার কথা সত্য হইবে, বলা যায় না। তবে ইহা মনে রাখা উচিত যে এই প্রাচীন সাম্রাজ্য চিরদিন সকলের কা পরাজিত হইয়াও আজ পর্য্যন্ত সজীব আ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সকল বি ইউরোপের মধ্যে একটি প্রধান দেশ ব গণ্য হইতেছে। অষ্ট্রিয়াই এককালে "প রোমান-সাম্রাজ্য" বলিয়া পরিচিত ছি এবং অষ্ট্রিয়ার অধিপতিরাই ইউরোপের দি একপক্ষে সীজারের উত্তরাধিকারী এ অপরপক্ষে ঈশ্বরের পার্থিব শক্তির প্রতিনি বলিয়া গণ্য হইতেন।

শ্রীউপেন্দ্র চৌধুরী

খান-তিনেক চিঠি

(১)

ভাই দিদি! আজ কতদিন পরে তোমায় চিঠি লিখছি। তুমি যেদিন শ্বশুরবাড়ী গেলে, সে প্রায় আজ বছরখানেক হতে চল্‌ল। এর মধ্যে মাসীমার কাছে তোমার খবর মাঝে মাঝে পেয়েছি বটে, কিন্তু আমার কোনও খবর তোমায় দিতে পারি নি। এ ক'মাসে আমার উপর দিয়ে যে কত ঝড় বয়ে গেছে, কত যে সহ্য করতে হয়েছে, সে আর কত বলব! একটু নিশ্চিন্ত হয়েই তোমাকে সাধ্যমত সে সব বিষয় শোনাতে বসেছি! কারণ আমার এ দুঃখের কাহিনী তুমি ছাড়া জগতে আর কে শোনবার লোক আছে?

তুমি ত দেখেই গিয়েছিলে এদিকে মার শরীর দিন দিন কি রকম ভেঙ্গে পড়ছিল রোজ রাত্রে তাঁর জ্বর হতে আরম্ভ হয়েছি কিন্তু তিনি ত কারো কথা শোনবার লো ছিলেন না! তারই ওপর সকালে মা চল্‌ত ভাত ত খেতেনই। আমি যখন পীড়াপীড়ি করতাম, তখন বলতেন 'আমা ও বাতিকের জ্বর, ওতে নাওয়া-খাও বন্ধ করলে চলে না।' আমি কি এ জানি, তাই বুঝতাম। কিন্তু বেশী দি এ-ভাবে গেল না। দু-তিন মাসের মধ্যেই শয্যাগত হয়ে পড়লেন। হাত, পা, মুখ ফু উঠ্‌ল।

গ্রামে আমাদের ডাক্তার-কবিরাজের যেমন দুর্দ্দশা, আর আমাদের অবস্থা তেমনি; কাজেই বুঝতেই পারছ, যে মা

কিৎসার ব্যবস্থা কেমন হ'ল। দিন দিন র অবস্থা খারাপ হয়ে পড়তে লাগল। আমি ত চারিদিক অন্ধকার দেখলাম।

একদিন সন্ধ্যার পর মার মাথার কাছে সে আছি, এমন সময়ে তিনি বল্লেন, "আমার দিন ফুরিয়ে এল; তা সেজন্যে আমার খ নেই, এখন তোমার একটা হিল্লে করে য়ে যেতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে রতে পারি।"

এ কথা শুনে আমি কেঁদে ফেললুম, লুম, "মা! তুমি এ সব কথা বল না। মি গেলে আমার গতি কি হবে? আমি কোথায় দাঁড়াব তাহলে?"

মা বল্লেন, "সেই ত আমার ভাবনা ! এতদিন আমি ছিলাম, এক রকম করে চলে যাচ্ছিল, এখন তোমায় ার হাতে দিয়ে যাব, এই ভেবে-ভেবেই রতে বসেও ত আমার স্বস্তি নেই। তাই নেক ভেবে-চিন্তে হারুর মাকে ডেকে সেদিন জামাইয়ের কাছে পাঠিয়েছিলুম। আজ সে ফিরে এসেছে। বিকেলে যখন তুমি ঘাটে গিয়েছিলে, তখন সে এসে আমায় বলে গেল, জামাই বলেছেন দু-এক দিনের মধ্যেই এখানে আসবেন। এতদিনের পর আমার এ অসময়ে তাঁর দয়া হয়েছে। এলে, তাঁর হাতে তোমায় সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

মার কথা শুনে আমার মনে তখন অন্য ভাবনার উদয় হ'ল। স্বামী? আমার স্বামী আসবেন? জ্ঞান হয়ে মার কাছে এইটুকু শুনেছিলাম যে সাতবছর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল। মা দরিদ্র, কুলীন জামাতার মর্য্যাদা রক্ষা করা তাঁর সামর্থে কুলায় না—কাজেই তিনি বিয়ের পর আর এ-মুখো হন্‌নি। সে কথা আমার বিন্দু-মাত্রও মনে নেই। এতদিন মনে করবার জন্য কোন আগ্রহও হয়নি। কিন্তু আজ মার কথা শুনে স্বামী যে কেমন—তাঁর চেহারাটি কি-রকম,—এ সব মনে করতে অনেক চেষ্টা করলুম কিন্তু বিশেষ কিছু মনে হল না। আর, সাতবছর বয়সে যাকে বিয়ে করে রেখে গেছেন, আজ তার আঠারবছর বয়স হল, এ-পর্য্যন্ত একদিনের জন্য যিনি বিবাহিতা স্ত্রীর একটা কোনও খোঁজ পর্য্যন্ত নেন-নি, তাঁর উপরে যে বিশেষ শ্রদ্ধা হল, তাও নয়। তবু আমি মার কথার কোন উত্তর দিলুম না।

তার পরে তিন-চার দিন কেটে গেল। একদিন আমি ঘরের সব কাজকর্ম্ম সেরে বিকেলে ঘাটে জল আনতে গিয়েছি, মা তখন একলা শুয়েছিলেন, ফিরে এসে দরজার কাছ থেকে শুনলুম, ঘরের ভিতর পুরুষের ভারী গলায় কে কথা কইচে, আমি চমকে উঠলুম। তবে কি যাঁর আসবার কথা ছিল, তিনিই এসেছেন? আমি তখনি ঘরে না ঢুকে দরজার আড়াল থেকে ঘরের ভিতর চেয়ে দেখি মার বিছানার পাশে একজন পুরুষ বসে আছেন। তাঁর বয়স প্রায় পঁয়ষট্টির কাছাকাছি, কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে মনে হয়, যেন আরও বেশী বয়স হয়েছে। বার্দ্ধক্যের ভারে শরীর যেন নুয়ে পড়েছে। তিনি সুশ্রী কি কুৎসিত সেটা দেখবার আর ইচ্ছা হল না। আমার বুকের ভিতরটা তখন কাঁপছিল,

কেবলি মনে হচ্ছিল ইনিই কি আমার স্বামী?

বেশীক্ষণ সন্দেহে থাকতে হল না। ঘরে ঢুকতেই মা বল্লেন, "অমিয়া! এদিকে এস! ইনি তোমার স্বামী! প্রণাম কর!"

আমি নিঃশব্দে মার আজ্ঞা পালন করলুম। মা তখন আমার হাত ধরে তাঁর জামাইয়ের হাতে দিলেন ও সজল নয়নে বল্লেন, "বাবা! দুঃখিনীর ধন তোমার হাতে সঁপে দিলুম, ওকে একটু যত্ন কর। এতদিন যে দেখ নি, খোঁজ করনি, তাতে কোন ক্ষতি হয় নি, কিন্তু আজ তুমি ছাড়া সংসারে আর ওর কেউ নেই!"

মার জামাই যে এ কথার উত্তরে বিড়বিড় করে কি বল্লেন আমি তা কিছু বুঝতে পারলুম না। বুঝতে ইচ্ছাও ছিল না। মা আমাকে বললেন, "যাও! মুখ হাত ধোবার জল দাও। দিয়ে ওঁর জল-খাবারের যোগাড় কর!" আমি হাঁপ ছেড়ে তখনি সেখান থেকে পালিয়ে এলুম।

আমি নিঃশব্দে সংসারের কাজ আর মার সেবা করি আর অবসর পেলে নিজের বইগুলি পড়ে সময় কাটাই। স্বামী আমার সঙ্গে পরিচয় করবার কোন চেষ্টা করেন না। বরং তাঁর মার সঙ্গে যে সব কথা হত তা শুনে আমার সন্দেহ হত যে তিনি আমার জন্য যত আসুন আর নাই আসুন, মার কোথায় কি সম্পত্তি আছে, কি করে আমাদের দিন চলে, এই সব জানবার জন্যই তাঁর বেশী আগ্রহ! আমার উপরে যে একেবারেই তাঁর কোন লক্ষ্য ছিল না, তা বলতে পারি নি। আমি স্পষ্টই বুঝতে পারতুম, আমার চাল-চলন, আমার প্রত্যে কাজকর্ম্ম তিনি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দেখছেন!

একদিন আমি আড়াল থেকে শু তিনি মাকে বলছেন, "আমাদের গৃহস্থঘ মেয়েরা রাঁধবে, বাড়বে, কাজকর্ম্ম কর সংসার দেখবে, এই ত আমরা জা আপনার মেয়ে ত দেখি সবই উল্টো চব্বিশ ঘণ্টাই ফিটফাট! মাথার চু এদিক হতে ওদিকে যায় না, সর্ব্বক্ষণ পরি পরিচ্ছন্ন, কাপড়-সেমিজ ভিন্ন পরা হয় এর উপর ত রাতদিন বই হাতে করে থাকে দেখতে পাই! আমাদের গরীবে ঘরে এমন নভেল-পড়া বিবি নিয়ে কি করে চল্‌বে?"

মা এ কথা শুনে অসন্তুষ্ট হয়ে বল্লে "বাছা! তুমি আমার মেয়ের পরিচয় জা না তাই এ কথা বল্লে। আমার নিজে মেয়ে বলে বল্‌ছি না—কিন্তু এমন শ মেয়ে তুমি আর সহজে দেখতে পাবে না আগে তাকে নিয়ে ঘর কর তারপ আমার কথা বুঝতে পার্ব্বে। এই ত তু এখানে কদিন এসেছ—ঘর-সংসার গৃহস্থালী কাজ কে করছে, কে এ সংসার চালাচ্ছে তা ত দেখতেই পাচ্ছ? রাতদিন রান্নাবান্না বাসন মাজা, ঝাঁটপাট, কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, জল তোলা, কাপড় কাচা, এত সব কাজ করেও যদি সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে তাহলে সেটা তার গুণের পরিচয় না হয়ে দোষ হয়ে দাঁড়াল? আর পড়া-শোনার কথা যদি বল, ও ছেলেবেলা থেকে আমাদের পড়সী অনাথবাবুর মেয়ের সঙ্গে মানু

য়েছে। তিনি নিজে শিক্ষিত লোক—য়েদের লেখাপড়া শেখাতে বড় ভাল াসেন! তিনি তাঁর নিজের মেয়ের সঙ্গে রাবর ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন! তাঁর ত্নে ও চেষ্টায় ও এখন বেশ ভালরকম াঙ্গলা ও ইংরাজী শিখেছে! তাঁর স্ত্রীর াছে নানারকম শিল্পকাজ সেলাইয়ের কাজ শিখেছে। আমার কাছে মানুষ হলে কি ার এমন হতে পারত? অন্যে যখন দয়া করে ভালবেসে তাকে শেখাতে চাইলেন, আমি তাতে বাধা দিইনি। কারণ ওগুলো য দোষের কাজ তা আমার ধারণা ছিল না।"

মার কথা শুনে তাঁর জামাই আর কিছু বল্লেন না। কিন্তু আমার এ রকম লেখা-পড়ার কথা শুনে তিনি যে বিষম বিরক্ত য়েছেন তা বেশ বুঝতে পারলুম। ভয়ে ও নিরাশায় আমার বুকের ভিতর কেঁপে ঠল। এই স্বামী! এই লোকের অধীনে আমায় চিরকাল কাটাতে হবে! আমার ভবিষ্যৎ যে কি অন্ধকার, আজ তা কতকটা বুঝতে পেরে আমি শিউরে উঠলুম।

তাঁর আসবার প্রায় হপ্তাখানেক পরে একদিন মার অবস্থা খারাপ বোধ হতে াগল। নিশ্বাস জোরে জোরে পড়তে াগল। অসংলগ্ন কথাও দু-একটা বলতে াগলেন। আমি ত ভয়ে আকুল হয়ে সারা রাত তাঁকে নিয়ে জেগে বসে রইলাম। তাঁর জামাই নিজের বিছানায় বসে বসে আফিঙ্গের নেশায় ঝিমুতে লাগলেন।

সকালবেলা পাড়ার লোকে খবর পেয়ে এসে তাঁকে ধরাধরি করে তুলসীতলায় নিয়ে গেল। বেলা দশটার সময় সব শেষ হল। সংসারে আমি অনাথা!

যেদিন মার চতুর্থী হয়ে গেল সেদিন আমার স্বামী বল্‌লেন, "আমি কাজ-কর্ম্মের ক্ষতি করে আর এখানে বসে থাকতে পারি না। কাল সকালে বাড়ী যেতে হবে, সব ঠিকঠাক করে নাও।"

গ্রাম ছেড়ে আসতে আমার মর্ম্মান্তিক যাতনা হচ্ছিল। ছোটবেলাকার কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি, মার কত কথা মনে হয়ে আমার যে কি কষ্ট হয়েছিল, তা বলতে পারি না। কিন্তু আমি মনের দুঃখ মনেই চেপে মুখটি বুঁজে তাঁর সঙ্গে তাঁর গ্রামে গেলুম।

আমাকে বাড়ী এনে স্বামী বললেন, "আমি এখানকার জমীদার-সরকারে আট টাকা মাইনের মুহুরীগিরি করি। আমার স্ত্রী যে চব্বিশ ঘণ্টা জ্যাকেট-সেমিজ পরে বই হাতে করে বসে থাকবে, সে আমি সইতে পারব না। তোমার মার কাছে যা করেছ সে সব ভুলে যাও। এই আমার ঘরকন্না দেখে নাও—কাজকর্ম্ম কর, খাও দাও থাক, আমার মত গরীব লোকের ঘরে এর চেয়ে বেশী আর কিছু হতে পারবে না।"

এ কথার কোন জবাব দেওয়া আবশ্যক-বোধ করলাম না। সেই থেকে স্বামীর ঘর করছি। তুমি এ-কথা জেনে বোধহয় খুব সুখী হবে। এতক্ষণ নিজের কথাই সাত-কাহন করলুম। এইবার একটু তোমার খবর নেওয়া যাক্। তুমি কেমন আছ? তোমার খোকা কেমন? তাকে

আমার স্নেহচুম্বন দিও। উকীলবাবু কেমন আছেন? তাঁর কাজ-কর্ম্ম কেমন চলছে, লিখো। তোমার চিঠি পেলে আর যা লেখবার আছে, লিখবো। আজ তবে আসি। ইতি—

তোমার স্নেহের অমিয়া

(২)

ভাই দিদি! তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমরা সকলে ভাল আছ জেনে সুখী হলুম। আমি কেমন আছি জিজ্ঞাসা করেছ, কিন্তু আমার আর থাকাথাকি কি ভাই? দিন কাটাতে হয়, কোনমতে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। সুখ-দুঃখের কথা আমায় জিজ্ঞাসা কোর না। তবে আমাদের অবস্থার কতক পরিবর্ত্তন হয়েছে বটে, কিসে কি হল, তা তোমায় লিখছি।

তোমায় আগে লিখেছিলেম যে, আমি শ্বশুরবাড়ী এসে স্বামীর ঘরকন্না করছি। তাঁর মনে বোধ হয় ভাবনা ছিল যে, এই লেখা-পড়া-জানা নভেল-পড়া স্ত্রী নিয়ে তাঁর ঘরকন্না কি করে চলবে! কিন্তু যখন দেখলেন আমি গাঁয়ের আর-আর মেয়েদেরই মত দিবারাত্রি সংসারের কাজেই মন ঢেলে রেখেছি, পড়াশুনার ধার দিয়েও যাই না, বিশেষ কারও সঙ্গে মিশি না, তখন তিনি আমার উপর কতকটা তুষ্ট হয়েছেন বলে বোধ হল। মিথ্যা বলব না—আমার সঙ্গে তিনি কোন কঠোর ব্যবহার করেন-নি। তবে, তিনি কেবল আমার সেবাটুকু গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন, আমিও সেই কর্ত্তব্যটুকু শেষ করেই নিশ্চিন্ত ছিলাম।

গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে প্রথম প্রথম মেশবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কে জানি না আমার সঙ্গে কেউ ভাল করে মিশল না। আমি কাছে গেলে ভাল করে কথা কয় না, অথচ আমাকে দেখে এ-ওর গা-টেপাটিপি করে আর চাপা হাসির ঘটা পড়ে যায়, তাও বুঝতে পারি। একদিন এই সব ব্যাপার দেখে আমি কিছু না বলে চলে আসছি, শুনলুম একজন আমাকে শুনিয়ে বলছে, "দেখেছিস্ কি রকম জাঁক! আমরা যেন ওঁর সমযুগ্যিই নই! কথা না কয়ে চলে যাওয়া হল! কিসের যে এত গরব, তাও ত জানি নে!"

আর একজন বল্লে, "রূপের! রূপের! এ আর বুঝতে পারিস নে! রূপের দেমাকে মট্ মট্ কচ্ছেন! তবু যদি আট টাকা মাইনের মুহুরীর বাঁদী না হতেন।"

এই সমালোচনা শোনবার পর থেকে আমি আর কারও কাছে যাই না। আপনার মনে কাজ-কর্ম্ম করি, আর ঘরে পড়ে থাকি। যা-হোক, একরকম নির্ব্বিবাদে দিন কাটছিল।

একদিন হঠাৎ স্বামী রক্তআমাশা রোগে পড়লেন। একে তাঁর জরাজীর্ণ শরীর, তার উপর আফিঙ্গ খেতেন, রোগটা বেশ চেপে ধরল। প্রথম দুতিন দিন সামান্য টাটকা-টোটকা ওষুধ খেলেন, তাতে কিছুই হল না, দিন দিন বড় কাতর হয়ে পড়লেন। চার দিনের দিন সকালবেলা জমীদার-বাড়ী থেকে একজন পাইক এল। স্বামী চার দিন কাজে যান নি কেন, তাই জানবার জন্য দেওয়ানজী

তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি পাইককে ডেকে নিজের অবস্থা সব বলে তারপর বলে দিলেন, "একবার ছোটবাবুকে আমার অসুখের কথা জানিয়ে বলবি যে তিনি ত কত গরীব-দুঃখীর ঘরে গিয়ে তাদের চিকিৎসা করে প্রাণ দিয়েছেন, যদি আমার ওপর দয়া করে একবার আমায় দেখে যান, তবেই যদি এ যাত্রা বাঁচি, নিয়ত পয়সা খরচ করে চিকিৎসা করাবার শক্তিও আমার নেই, আর আমায় বাঁচাতেও হবে না।" এই কথা বারবার বলে তাকে কিছু পয়সা জল খেতে দিয়ে বিদায় করলেন। সে ত চলে গেল। স্বামী আমাকে তখন বল্লেন, "আমাদের জমীদারের বড় ছেলে শরৎবাবু কলকাতা থেকে চারটে পাশ দিয়ে এসেছেন। গ্রামের গরীব দুঃখী প্রজারা অনেক সময় রোগ হলে বিনা চিকিৎসায় বা হাতুড়ে কবিরাজের হাতে পড়ে বিঘোরে মরে, সেইজন্য তিনি ডাক্তারী পড়েছেন। দরকার হলে রোগীর ঘরে গিয়ে তাদের চিকিৎসা করেন, অসমর্থ রোগীর ওষুধ-পথ্যের খরচ সব নিজেই দেন। এছাড়া গ্রামের উন্নতির জন্য যে কত চেষ্টা করেছেন সে আর কি বলব! যাতে গ্রামে ম্যালেরিয়া না হতে পায় সে জন্য চারিদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার ব্যবস্থা, যত সব পাঁক-পড়া মজাপুকুর ঝালিয়ে পরিষ্কার জলের বন্দোবস্ত, ছেলেদের পড়বার জন্য গ্রামে স্কুল, এ সব করেছেন। তাঁর চেষ্টায় গ্রামে একটা লাইব্রেরী আর একটা দাতব্য ঔষধালয় হয়েছে। এইবার শুনছি মেয়েদের জন্য তিনি একটা স্কুল করবার চেষ্টা কচ্ছেন। তাঁর গুণের কথা আর কত বলব? যদি একবার আমার অসুখের কথা তাঁর কাণে ওঠে ত দেখবে তখনি নিজে এসে উপস্থিত হবেন।"

আমি নীরবে সব শুনলাম। যদিও জমীদার-পুত্রকে চিনি না, জানি না, তবু তাঁর গুণের কথা শুনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার বুকটি ভরে গেল।

তার পরদিন সকালে আমি যখন ঘরে ঝাঁট দিচ্ছি তখন বাইরে থেকে আমার স্বামীকে কে একজন ডাকলে। তার পরেই দেখি এক যুবাপুরুষ ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন। আমি ত তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টেনে থতমত খেয়ে সরে দাঁড়ালাম। তিনিও আমায় দেখে অপ্রস্তুত হয়ে বাইরে চলে গেলেন। আগের দিনের পাইক এসে আমার স্বামীকে বল্‌লে, ছোটবাবু এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বামী ত উঠতে পারেন না,—শশব্যস্ত হয়ে তাকে বললেন, তাঁকে ঘরের ভিতর নিয়ে এস। পাইক চলে গেল। স্বামী আমায় বললেন, শীঘ্র একখানা ভাল আসন দাও। আসনের মধ্যে ত ঘরে দুখানা পিঁড়া,—কাজেই আমি আমার নিজের হাতে বোনা একখানা আসন বের করে জলচৌকির উপর পেতে দিয়ে সরে দাঁড়ালেম। শরৎবাবু ঘরে এসে আমার স্বামীকে বললেন, "আমি জানতাম ঘরে আপনি একলাই থাকেন। তাই একেবারে এসে ঘরে ঢুকেছিলাম।" বলে আরও মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনি কে?" স্বামী সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিয়ে আমার এখানে আসবার কথা সব বললেন। শরৎবাবু

আর একবার বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন।

তারপরে তিনি রোগীকে মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করলেন। যা যা জানবার ছিল জিজ্ঞাসা করে দেখে শুনে শেষে বল্লেন, "আপনার রোগ সারতে কিছু সময় লাগবে, কারণ এখন অত্যন্ত বেড়ে গেছে। আমি রোজ সকালে এসে আপনাকে দেখে যাব। আর ঔষধ-পথ্য যা দরকার, এই পাইক সব দিয়ে যাবে। আপনার কোন চিন্তা নাই।"

শরৎবাবু চিকিৎসা করতে লাগলেন। প্রায় দুই হপ্তা পরে আমার স্বামী দুটি অন্ন পথ্য পেলেন। কিন্তু তিনি এত দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন যে, আবার যে আগের মত খেটে খেতে পারবেন সে আশা আর করতে পারলেন না। তাঁর কোন বিষয়-সম্পত্তি ছিল না। সামান্য যা উপার্জ্জন ছিল, তাইতে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চলত, সঞ্চিতও কিছু ছিল না। অন্নচিন্তায় তিনি কাতর হয়ে পড়লেন।

আমি কোনদিন তাঁর সঙ্গে যেচে কথা বলি-নি। তাঁকে কাতর দেখে একটা কথা আমার মনে আসত, কিন্তু আমি নিজ হতে মুখ ফুটে কিছু বললাম না। শরৎবাবু এখন আর রোজ আসেন না। দু-চার দিন অন্তর এসে খোঁজ-খবর নিয়ে যান। ক্রমেই অভাব আমাদের সংসারে বেড়ে উঠতে লাগল।

একদিন সব কাজকর্ম্ম সেরে আমি চুপ করে বসে আছি, এমনসময়ে আমার স্বামী বললেন, "দিন চলবার ত আর কোন উপায় দেখছি না। শেষটা কি এই বয়সে অনাহারে মরতে হবে না কি, ত বুঝতে পারছি না। শরীরও ত একবা অশক্ত হয়ে পড়ল। আমি ত মনে ম ভাবছি এবার যেদিন শরৎবাবু আসবে তাঁকে একবার অবস্থাটা খুলে বলব, যা আমাদের একটা কিছু উপায় হয়। বল?"

আমি কিছু উত্তর দিলুম না; ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করতে হবে, এ ব মনে হবা মাত্র ঘৃণায় সর্ব্বশরীর সঙ্কুচি হয়ে উঠল।

স্বামী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, "কই তুমি যে কিছু বল্লে না?"

তখন আমি বল্লাম, "তুমি যা ভাল বুঝ তাই করবে, আমি আর তাতে কি বল বল? তবে, যদি আমার মত জিজ্ঞাসা ক তাহলে বলি, যে নিজের পরিশ্রমে যদি একবেলা দুমুঠো শাকান্ন খেয়ে জীবনধার করতে হয়, সেও ভাল, তবু পরের গলগ্র হয়ে ভিক্ষান্নে বেঁচে থাকা আমি ঘৃণা করি আমি গরীবের মেয়ে, তবু এটুকু আত্মসম্মা আমার আছে।"

স্বামী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বল্লেন, "সে কথা সত্য বটে, কি পরিশ্রম করবার শক্তি কৈ? যতদিন ত ছিল, ততদিন কি এ কথা বলেছি?"

আমি বল্লাম, "তোমার নেই, আমার ত আছে?"

তিনি এ কথায় বিস্মিত হয়ে বল্লেন, "তুমি স্ত্রীলোক, তোমার দ্বারা কি কা হবে?"

আমি একটু উত্তেজিত ভাবে বল্লাম, স্ত্রীলোক বলে কি আমি কিছুই করতে পারি না? কিছু না পারি যদি, ত লোকের বাড়ী রেঁধেও ত নিজের পেট চালাতে পারি! মা মাইনে পাই তাতে তোমার খরচ চলতে পারে? ভিক্ষার চেয়ে সে কি ভাল নয়? কিন্তু তাও করতে হবে না। তুমি না সেদিন বলছিলে যে গ্রামে মেয়েদের স্কুল নেই? তোমার যদি মত হয়, আমি সেই স্কুলে কাজ নিয়ে মেয়েদের পড়াতে পারি, সেলাই শিখাতে পারি।"

তিনি অনেকক্ষণ কি ভাবলেন। বোধ হয় মেয়েদের লেখাপড়া শেখার প্রতি তাঁর চিরদিনের যে বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা ছিল, দারুণ অভাব ও অন্নচিন্তায় পড়ে ক্রমে সেটা অন্তর্হিত হয়ে আসছিল। বহুক্ষণ পরে তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন, "আমি এতদিন তোমায় চিনতে পারি নি। যাক্, শরৎবাবু এলে আমি তোমার কথা তাঁকে বলব।"

দু-এক দিনের মধ্যেই শরৎবাবু এলেন। স্বামীর শারীরিক কুশলাদি জানবার পর তিনি বসলে, স্বামী তাঁকে আমাদের সাংসারিক অবস্থার কথা জানালেন। তিনি অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বললেন, "এ কথা আপনি এতদিন ত আমাকে কিছুই বলেন নি! আপনি আমাদের এতদিন পুরাণ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, আপনি যদি এখন অশক্ত হন, ত আপনার সব ভার আমাদেরই—"

স্বামী বল্লেন, "আপনার অসীম দয়া! কিন্তু এ ব্যবস্থায় আমার স্ত্রী সম্মত নয়। সে বলে আমার খাটবার ক্ষমতা থাকতে এ-ভাবে পরের গলগ্রহ হয়ে থাকা বড় ঘৃণা ও লজ্জার কথা!"

আমি ঘরেই ছিলাম; দেখলাম এ কথা শুনে তাঁর চোখে বিস্ময় ও আনন্দের আভা ফুটে উঠল। তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে ওঁর কি ইচ্ছা আমাকে খুলে বলুন! উনি তবে কি করতে চান? কি ভাবে আমার সাহায্য পেতে চান উনি?"

স্বামী তখন আমার কথা সব তাঁকে খুলে বল্লেন। শরৎবাবু এ কথা শুনে অনেকক্ষণ স্তব্ধ থেকে শেষে বল্লেন, "দেখুন! আজ আপনার কথা শুনে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হয়েছি, তা আর কি বলব? আমি অনেকদিন থেকে মেয়েদের জন্যে একটি স্কুল খুলতে চেষ্টা করছি। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক গ্রামের অনেকেই মেয়ে পাঠাতে রাজি হয়েছেন। স্কুল-বাড়ীও ঠিক করে রেখেছি। কেবল উপযুক্ত একজন শিক্ষয়িত্রী এখন পর্য্যন্ত ঠিক করতে পারি-নি বলে স্কুল খুলতে পাচ্ছি না। কলকাতা থেকে আনতে গেলে টাকা অনেক বেশী পড়ে। স্কুলের এই প্রথম অবস্থায় সেটা সুবিধাজনক নয়। উনি যদি এখন এ ভার নেন তাহলে যে শুধু আপনার সুবিধা তা নয়, আমারও যে কি উপকার করা হয় সে আর মুখে কি বলব? কারণ এটি আমার বহুদিনের কামনা ছিল। তা হলে আজ আমি আসি। শীঘ্রই সব ঠিক করে আপনাকে জানাব।"

তিনি উঠে দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে আবার বল্লেন, "যেদিন আপনাকে

আমি প্রথমে দেখেছিলাম, সেইদিনই আমার মনে ধারণা জন্মেছিল যে, আপনার স্থান সাধারণ স্ত্রীলোকদের চেয়ে অনেক উঁচুতে! আজ আপনার পরিচয় ভাল করে পেয়ে আমার সে ধারণা আরও দৃঢ় হল! বেশী আর কি বল্‌ব, যদি আপনার আদর্শে আমাদের এই গ্রামের মেয়েরা উন্নত হতে পারে, তবেই বুঝব আমার এতদিনের সব পরিশ্রম সফল হয়েছে!"

আমি শুধু নীরবে নমস্কার করলাম। প্রতি-নমস্কার করে তিনি প্রফুল্লচিত্তে চলে গেলেন।

এখন আমরা স্কুলবাড়ীতেই থাকি। স্কুলের ঝি আমার সব কাজকর্ম্ম করে দেয়। এখনও বেশী মেয়ে জড় হয়-নি। ছোট বড় সবশুদ্ধ পনেরটি। এদের পড়িয়ে সেলাই শিখিয়ে, আমার বেশ একরকমে দিন কাটছে। আমাদের সব অভাব দূর হয়েছে। তবে, স্বামীর শরীর দিন দিন বড় অপটু হয়ে পড়্‌ছে।

তোমাদের সব খবর দিও। খোকা কেমন আছে? সে এখন কথা বলতে পারে কি? আমার ভালবাসা জানাবে ও স্নেহের চুম্বন খোকাবাবুকে দেবে! আজ এই পর্য্যন্ত—ইতি

তোমার স্নেহের বোন—অমিয়া।

(৩)

ভাই দিদি! এবার তোমার চিঠির উত্তর দিতে অনেক দেরি হয়ে গেল। হয়ত তুমি মনে মনে এজন্য রাগ করেছ, কিন্তু কেন যে আজ তিন-চার মাস তোমার খবর নিতে পারি-নি, তা জানলে আর তুমি আমার দোষ দেবে না।

প্রথমেই একটা খবর দিচ্ছি, আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর শরীর মোটেই ভাল ছিল না, বয়সও হয়েছিল, বিশেষ সেই রক্তআমাশয়ের পর থেকে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন, তার উপর জ্বর হল, সে ধাক্কা আর সামলাতে পারলেন না। মার মৃত্যুর পর এতদিন তিনিই আমার অভিভাবক ছিলেন। আজ তিনিও চলে গেলেন। সংসারে আজ আমি একবারে একলা!

আমি এখনও আগের মত স্কুলে কাজ করি, মেয়েদের নিয়ে কোনমতে দিন কাটাই। মেয়েরা সকলে আমাকে খুব ভালবাসে। যদি এই রকমেই এখানে আমার সারাজীবনটা কেটে যেত, তাহলে তার চেয়ে প্রার্থনীয় আমার আর কিছুই ছিল না। কিন্তু আমার অদৃষ্টের লিখন অন্যরূপ—কাজেই তা হল না। আমার এখানকার বাস উঠতে বসেছে! শরৎবাবু মাঝে মাঝে স্কুল দেখতে আসতেন, আমি পড়ান ছাড়া স্কুলের আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র সবই রাখতাম, কাজেই স্কুল সংক্রান্ত কাজে দরকার হলেই তিনি আমার কাছে আসতেন, হিসাবপত্র দেখতেন। এতে অবশ্য দূষণীয় কিছুই ছিল না, কিন্তু তা হলে কি হবে—এই উপলক্ষ্য করেই আমার কলঙ্ককাহিনী গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ল।

গ্রামের লোকে—বিশেষ মেয়েরা কোন-দিনই আমার ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, তবে এতদিন কেউ কোন কথা বলতে পারত না। স্বামীর মৃত্যুর পর আমার নামের সঙ্গে শরৎবাবুর নাম যোগ করে চারিদিকে একটি বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হল। পল্লীনারীরা ঘাটে যাবার পথে দলে দলে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে যে কত ঠাট্টা-টিটকারী আরম্ভ করলে, সে আর তোমায় লিখে কি জানাব?

কেউ বলে, "প্রথম থেকেই আমি জানি যে ও ছুঁড়ী কম নয়! লেখাপড়া শিখে ফাজিল হয়ে কার মাথা খাবে, ও-সব চরিত্তিরের লোকের রাতদিন সেই চেষ্টা! কেন, একথা আমি কি আগেই তোদের বলি-নি?"

অন্যে বললে, "ওই জন্যেই ত ওর সঙ্গে মিশলুম না! ওসব রীতের লোকের সঙ্গে কি আমাদের পোষায়? গেরস্তর মেয়ে ঘর-সংসারের কাজ করবে, রাঁধবে-বাড়বে—সবাইকার সেবা-যত্ন করবে—এই ত জানি; —ওমা! এ—তা—না,—দিনরাত পটের বিবির মত সেজে কেতাব নিয়ে বসে আছেন! আর, এই সব কাণ্ড! আজকাল কি গাঁয়ে আর আগের মত শাসন আছে? এখন সব নিজে-নিজেই কত্তা! কেউ কারো শাসন মানে না! আগে পাড়া ঘরে এমন হলে মাথা মুড়িয়ে গাঁয়ের বার করে দিত না!"

আর একজন বল্লে, "তা ধরেছে বেশ মাতব্বর লোককে! কবে বিয়ে হয় দেখ না!"

পিছন থেকে অন্য একজন ফোঁশ্ করে উঠল—"আরে রেখে দে তোর বিয়ে! বিয়ে হলে বাপের ত্যজপুত্তুর হতে হবে সে খবর রাখিস কিছু? তবে হ্যাঁ! নিকে হতে পারে বটে!"

এইরকম সমস্ত দিন ধরে যে কত কুৎসিত কল্পনা-জল্পনা চলতে লাগল সে আর কি বলব? আমি ত একেবারে ঘৃণায় লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে গেলুম,—এরা বলে কি? আমি ত কখনো স্বপ্নেও এরকম অসম্ভব আশা মনে আনি নি! আমার দোষ কি? সংসারে আমার মত একটা অসহায়া নিরাশ্রয় স্ত্রীলোক—একপাশে পড়ে দুমুঠো অন্ন করে খাচ্ছে, তাতে কেন এরা এমন করে বাদ সাধে? আমি ত মনে-জ্ঞানে কখন কারুর কোন ক্ষতি করি-নি? আর, এ-সব কথা যদি তাঁর কানে উঠে থাকে? একথা মনে আসবামাত্র লজ্জায় আমার সর্ব্বশরীর সঙ্কুচিত হয়ে উঠল! ছি! ছি! আমি তাহলে কি করে তাঁর কাছে মুখ দেখাব?

ক্রমেই দেখলুম, স্কুলে মেয়ের সংখ্যা কমতে লাগল। সব-চেয়ে বড় মেয়েদুটীই প্রথমে স্কুল ছেড়ে দিলে। তাদের না দেখে আমি অন্য মেয়েদের কাছে খোঁজ করলুম —শুনলুম আর তারা স্কুলে আসবে না। কারণ জিজ্ঞাসা করায় একটি মেয়ে বল্লে, "সে কথা আমি আপনার কাছে বলতে পার্ব্ব না।" আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম।

একে একে সব মেয়েদের আসা বন্ধ হতে লাগল। স্কুলের ঝি বাড়ী বাড়ী গিয়ে সাধ্য-সাধনা করেও কারুকে আনতে পারলে না। সকলের বাড়ী থেকে বলে পাঠালে, জমীদারবাবুর ভয়েও কেউ আমার মত মন্দ স্ত্রীলোকের কাছে নিজের মেয়ে ছেড়ে দিতে

পারে না। তিনি বড়লোক যা করেন, তাই শোভা পায়, তা-বলে সকলের ঘরে ত তা চলবে না।

স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। আমার যে তখন মনের কি অবস্থা তা তোমায় আর কি জানাব? নিজের লজ্জা ও অপমানের ত কথাই নেই, তার উপর কাজটি যদি যায়, তবে আমি কোথায় দাঁড়াব? সব-চেয়ে এই ভাবনাই প্রবল হয়ে দাঁড়াল।

সেদিন সন্ধ্যের সময় একলাটি বসে নিজের দুরদৃষ্টের কথা ভাবছি, হঠাৎ শরৎ-বাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। তিনি এমন সময়ে কখন আসতেন না—আমি মনে করলুম, তবে বুঝি বিশেষ কোন কাজ আছে। তাঁকে বসতে বলে আমি নীরবে তাঁর কথা শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম। আজ আর তাঁর মুখের দিকে আমি চাইতে পারলুম না।

তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন, "এ সময়ে এসে ত আপনার কোন কাজের ক্ষতি করলুম না?"

আমি বললুম, "আজ তিন-চার দিন থেকে স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে—মেয়েরা কেউ আসে না। আমার হাতে কোন কাজ-কর্ম্মই নেই।"

তিনি বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, "স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে! একথা ত আমি জানতুম না!" খানিক নিস্তব্ধ থেকে তিনি আবার বললেন—"এই সব লোকদের উন্নতির জন্যেই আমি এতদিন নিজেকে উৎসর্গ করে রেখেছিলাম! যাক্ সেকথা—আমি আপনাকে যা বলতে এসেছি, আপনি তা শুনে আমার প্রতি হয়ত অসন্তুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু আজ আর সে কথা প্রকাশ ক ছাড়া উপায় নেই! গ্রামে আমাদে দুজনের নামে যে নিন্দা ও অপবাদ চল আপনি তা নিশ্চয়ই শুনেছেন। আপনা এ মিথ্যা কলঙ্ক থেকে মুক্ত করবার জ আমাদের বিবাহের প্রস্তাব করতে আ এসেছি। এখন, এ বিষয়ে আপনার ম মত—কোনরকম লজ্জা না করে আমা বলুন।"

তিনি থামলেন। আমি দাঁড়িয়েছিলু ধীরে ধীরে সেইখানে বসে পড়লুম। আমা সর্ব্বশরীর কাঁপছিল। একটি কথা আমা মুখ থেকে বেরুল না।

তিনি বলতে লাগলেন, "শুধু যে এ কুৎসা রটেছে বলে আমি এ কথা বলছি তা মনে করবেন না। যেদিন আপনাকে প্রথম দেখেছি সেইদিনই আমার ম আপনার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। এতদিন আমি সে কথা প্রকাশ করি-নি বাড়ীতে এতদিন মা ও বাবা বিয়ে করবা জন্যে আমাকে জ্বালাতন করেছেন। আমি সে সব কথা উড়িয়ে কাটিয়ে দিই। মনে ছিল যাঁকে ভালবাসি, যদি কখনো তাঁকে পাই, তবেই বিবাহ হবে, নয়ত চিরকাল এইরকমেই যাবে। আমি যা বলতে এসেছিলাম, তা বলা হল, এখন আপনার উত্তরের উপর আমার জীবনের সুখ-দুঃখ নির্ভর করছে।"

আমি আজ যে কথা শুনলুম—সে যে আমার আশার অতীত! আমার মত নগণ্যা হতভাগিনীকে তিনি ভালবেসেছেন! এ কথা যখন শুনলুম—তখনি যেন আমার

তের সকল ক্ষোভ সকল অপমানের জ্বালা ক মুহূর্ত্তে জুড়িয়ে গেল! মনে হল আমি তদিন যে কষ্ট যে লাঞ্ছনা সহ্য করেছি, াজ এই তার চরম পুরস্কার! কেমন ন একটা পুলকময় অবসাদে আমার র্ব্বশরীর অবশ হয়ে আসছিল! আমি তাঁর থার উত্তর দেব কি, বাক্যে-মনে তখন কেবারে নীরব-নিস্পন্দ হয়ে গেলুম।

শরৎবাবু আবার বল্লেন, "শিশুকালে আপনার যে বিবাহ হয়েছিল, সে গণ্য নয়। আর তাও যদি ধরা যায় ত, বিধবা-বিবাহও ত অশাস্ত্রীয় নয়! সে ত আজকাল কত জায়গায় হয়েছে! আপনি শিক্ষিতা, আপনার নে যে এ বিষয়ে কোন কুসংস্কার আছে, তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।"

আমি তখন চমকে উঠলুম! বিবাহ! না—না—এ কখনো হতে পারে না। বিস্তর আয়াসে মনের আবেগ দমন করে আমি বল্লুম, "আপনি আমার অসময়ের আশ্রয়দাতা প্রতিপালক, আমি যেখানেই থাকি আপনার দয়া কখনো ভুলতে পার্ব্ব না! কিন্তু আমি এ বিষয়ে নিতান্ত অযোগ্যা, আপনি প্রভু—আমি আশ্রিতা মাত্র, আপনার সঙ্গে আমার অন্য কোন সম্বন্ধ হতে পারে না, আমায় ক্ষমা করুন!"

শরৎবাবু বল্লেন, "এই কি আপনার মনের আসল কথা? না! এত সহজে আমি আপনার আশা ছাড়তে পার্ব না! আপনি যে সব কথা বল্লেন সে সবই নিরর্থক! আপনি আমার যোগ্য কি না সে বিচার ত আমি করেছি! এখন আমাকে আপনি যোগ্য বিবেচনা করেন কি না সেই কথা বলুন!"

তাঁর এ কথার উত্তর আমি দিতে পারলুম না। তাঁর প্রতি আমার মনের যে ভাব তা আমি জীবনে কারো কাছে প্রকাশ করতে পার্ব্ব না। কিন্তু তা-বলে তাঁর প্রস্তাবেও আমি কিছুতে রাজি হতে পারি না।

আমাকে নীরব দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, বল্লেন, "আমি এখনি আপনার শেষ উত্তর চাইনা। আপনি এ বিষয় ভাল করে ভেবে দেখবেন। আমি দুই-চারদিনের মধ্যে আবার আসব; কিন্তু আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ যে, শুধু আপনি আমাকে ভালবেসে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে পারবেন কিনা, এইটুকুই ভেবে দেখবেন। আমাদের দুজনের মধ্যে যে সামাজিক অসামঞ্জস্য আছে, কিম্বা এ বিবাহ হলে সমাজে কি-রকম বিপ্লব বাধতে পারে সে সব ভাববার কোন দরকার নেই। আজ-কার মত আমি আসি।"

তিনি চলে গেলেন। আমি বিছানায় পড়ে পড়ে অনেক ভেবে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করতে লাগলুম। সন্ধ্যার সময় স্কুলের চাকরি গেলে কোথায় দাঁড়াব, কি করে দিনপাত হবে, এই সব ভাবনায় আকুল হয়েছিলুম। এখন দেখছি মুখের একটি কথায় এক মুহূর্ত্তে আমার সব দুঃখ-দারিদ্র্য ঘুচে যায়! শুধু কি তাই? যে সৌভাগ্য আমি কখনো মনে মনে কল্পনায়ও আনতে সাহস করি-নি আজ তা অযাচিত ভাবে আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে, দারুণ পিপাসায় যার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে তার সামনে সুবাসিত সুশীতল পানীয় ধরলে

তার যে অবস্থা হয়, আমারও তখন সেই দশা! এ লোভ কি সহজে সামলান যায়? আমি এখন কি করব? তবে কি তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দেব? কিন্তু, আমি বিধবা, আমাকে গ্রহণ করলে তাঁকে অনেক অপযশ অনেক গ্লানি সহ্য করতে হবে। তিনি অবশ্য সবরকম ত্যাগস্বীকারেই প্রস্তুত আছেন, তাঁকে এ-সব কিছুতে টলাতে পারবে না, কিন্তু আমি কেমন করে জেনে শুনে তাঁর এ অধঃপতনের কারণ হব? না! না! আমাদের বিবাহ হতে পারে না! বিবাহে দরকারই বা কি? আমি আমার প্রেমের পুরস্কার পেয়েছি, তাতেই এখন আমার বুক ভরে রয়েছে—আর আমি লোকের নিন্দা, অপমান, কলঙ্ক কিছুরই ভয় রাখি না! এবার তিনি এলে তাঁকে সব বুঝিয়ে বোলবো। যদি তাতেও তিনি না বোঝেন, তখন অন্য উপায় স্থির করা যাবে।

তার পরদিন স্কুলের ঝি ঘাট থেকে নেয়ে এসে বল্লে, "মা! একটা কথা শুনে এলুম। শরৎবাবুর সঙ্গে তাঁর বাপের নাকি খুব ঝগড়া হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন 'যদি তুমি এ কাজ কর তাহলে আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই,—আমার বিষয়ের উপরও তোমার কোন দাবী থাকবে না।' জমীদার-গিন্নি ত আমায় ডেকে দশ কথা শুনিয়ে দিলে। সবাই তোমাকেই যাচ্ছেতাই গালাগালি কচ্ছে। তা মা! আমি ত সব দেখছি, তুমি ত কোন কথাই বল-নি, শরৎবাবু বিদ্বান লোক, তিনি কেন এমন অন্যায় কাজ করতে গেলেন?"

আমি তার কথার উত্তর দিলুম না! দেখলুম, গ্রামের পুরুষগুলি শুদ্ধ এই আন্দোল প্রবল উৎসাহে যোগ দিয়েছে। স্কুলবাড়ীর কা গ্রামের যত-সব নিষ্কর্ম্মা কুচরিত্রের লো যত-সব বখাটে ছোঁড়া একটা আড্ বসে সন্ধ্যেটা গান-বাজনা করে আ লোকের ঘরের নিন্দা-কুৎসা করে কাটায় এমন সব সঙ্কীর্ণ চরিত্রের লোক এ গ্রামে যখন আমি আশ্রয়হীন হয়ে পথে দাঁড়ি ছিলুম, একমুঠো অন্নের সংস্থান ছিল না তখন একটা মুখের কথা বলে খোঁজ নে লোক ছিল না, কিন্তু আজ আমার আশ্রয়টুকু ঘোচাবার জন্য এরা সকলে প মহা উৎসাহে লেগে গেছে! আমি থেকে শুনছি, সত্য মিথ্যা নানা অলঙ্কার দি এখানেও আমার চরিত্রের বর্ণনা চলেছে!

লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে জর্জ্জরিত হ কোনমতে সে রাত ও তার পরদিন কাটল। আমি আমার কর্ত্তব্য স্থি করেছিলাম। তাই এ দিন আমার ম কতকটা স্থির হয়েছিল।

বৈকালে আমি ঘরের জানালার ধা একলা বসেছিলাম। এ দুদিন স্কুল বন্ধ নি। আমার কোন কাজ ছিল না। আমি বসে বসে নিজের অদৃষ্টে বিষয় ভাবছিলাম; হঠাৎ দেখলাম, একখা টেলিগ্রাম হাতে করে শরৎবাবু এসে ঘ ঢুকলেন। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম সেই চিরহাস্যময় প্রফুল্ল মুখ আজ কি গম্ভীর,—কি বিষাদময়! কিছুক্ষণ আমরা কেহই কোন কথা বললাম না।

তারপরে তিনি বল্লেন, "কলকাতা থেকে আমার এক বন্ধু বিশেষ দরকারে গ

রি টেলিগ্রাম করেছেন। আমি কাল লে চলে যাচ্ছি, তাই এ কথা আপনাকে তে এলাম। ফিরতে বোধ হয় চার-পাঁচ ন দেরি হবে।"

আমি চুপ করেই থাকলাম। তিনিও নিক থেমে বল্লেন, "আমি যা বলে গিয়ে-লাম আজ কি তার উত্তর পাব?"

আমি আজ সব সঙ্কোচ ত্যাগ করে শ সহজভাবেই বল্লাম, "আমার ওপর পনার অসীম দয়া! কিন্তু বার বার মাকে আপনার অবাধ্য হতে হচ্ছে, মায় ক্ষমা কর্ব্বেন! আমি যেমন আছি মনি থাকতে পেলেই সুখী হব। এর য়ে বেশী উচ্চ আশা আমার নেই! মি বিধবা, সমাজে নিন্দিতা, আমাকে বাহ করলে আপনার যশ মান ঐশ্বর্য্য স্পদ সব ধূলিসাৎ হবে, সমাজে আপনাকে শেষ লাঞ্ছিত ও নিন্দিত হতে হবে! আমার াণ থাকতে আমি আপনার এ অধঃপতনের ারণ হতে পার্ব্ব না! আর আমার লবার কিছু নেই! এ প্রসঙ্গ এখানে শেষ হলেই আমি সুখী হব!"

শরৎবাবু বল্লেন, "আপনি যা বল্লেন এতে আপনার হৃদয়ের মহত্ত্বই প্রকাশ হল, কিন্তু আমি এ কথা শুন্‌তে আসি নি। আমার প্রশ্নের উত্তর কি, সেইটা জানতে শুধু এসেছি। আপনি শুধু বলুন, আমাকে ভালবেসে গ্রহণ করতে পারবেন কি?"

আমি এ দুদিন অনেক চেষ্টায় মন সংযত করেছিলাম, কিন্তু আর সহ্য করতে পারলাম না। এ কথার উত্তর যা, মুখে বলে আমি কি করে তা জানাব? তাঁর সম্মানরক্ষা করে পাশে দাঁড়াবার মত অদৃষ্ট ত আমার নয়! অশ্রু এসে আমার দৃষ্টি রোধ করল! হৃদয়ের রুদ্ধ যাতনা ও অপমান পুঞ্জীকৃত অশ্রুরাশিতে পরিণত হয়ে আমার সব চেষ্টা সব সংযম মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাসিয়ে দিল।

এ ভাবে কতক্ষণ কেটেছে মনে ছিল না, সহসা তিনি উঠে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমার একখানি হাত ধরে বললেন, "আমি বুঝেছি, তোমার মন আমার প্রতি বিমুখ নয়,—তোমার ঐ নীরব রোদনেই তোমার মনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। তবে বল! কেন তুমি আমায় ত্যাগ করবে?"

তাঁর সেই আবেগকম্পিত মৃদুস্বরে কি অনুরাগ প্রকাশ পাচ্ছিল, সে শুধু আমি নিজের অন্তরেই অনুভব করলুম, মুখে তা প্রকাশ করা যায় না! আমি মুগ্ধ হয়ে একবার তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, আমাদের চারিচক্ষের মিলন হল! তাঁর সে দৃষ্টিতে কি প্রেম! কি করুণা! আমার হাত তখনও তাঁর হাতের মধ্যে থর্ থর্ করে কাঁপছিল! মুহূর্ত্তের জন্য আমি সব ভুললাম! আমার সব প্রতিজ্ঞা সব সংকল্প বুঝি-বা ভেসে যায়!

তিনি আবার বল্লেন, "আমি তোমার মনের ভাব বুঝেছি, তোমার আপত্তির কারণও সব বুঝেছি। এখন আমি যা স্থির করেছি তা শোন! আমারই দোষে চারি-দিকে তোমার নামে যে কলঙ্ক রটেছে, সেই দেশব্যাপী অখ্যাতি ও কুৎসার স্রোতে তোমাকে ভাসিয়ে আমি যে সরে দাঁড়াব, তেমন কাপুরুষ আমি নই! বাবার সঙ্গেও

আমার এ কথা হয়েছে। আমি তাঁকে স্পষ্ট কথাই বলে দিয়েছি। তিনি আমায় বিষয় থেকে বঞ্চিত করবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন। তাতেই বা ক্ষতি কি? তাঁর বিষয়ের ওপর আমার কোন আসক্তি নেই। আমার নিজের উপার্জ্জন করে সংসার প্রতিপালন করবার ক্ষমতা আছে। তার পর লোকনিন্দা? সে ত আমি গ্রাহ্যই করি না। তাহলে আমাদের মিলনে আর কি বাধা আছে? জরুরি দরকার বলেই আমাকে যেতে হচ্ছে নয়ত এ সময়ে আমি যেতাম না। তোমার কাছে আমার মিনতি —আমার জন্যে অনেক সহ্য করেছ আর দু-চার দিন সহ্য কর। আমার তার চেয়ে বেশী দেরি হবে না!"

তিনি চলে গেলেন। আমি বিবশপ্রাণে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লাম। আড্ডা-ঘরের ছোঁড়ারা তাঁকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিল,—তারা হারমোনিয়ামে সুর দিয়ে গান ধরলে—

"দুজনে দেখা হল—মধুযামিনী রে!
কেহ কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে!"

আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, এখানে থাকলে আমি নিজের সংকল্প বজায় রাখতে পারব না। আমি যে কত দুর্ব্বল, আজ নিজেই তা টের পেয়েছি! কিন্তু তাঁর প্রস্তাবে আমি কোনমতেই সম্মত হতেও পারি না। আমি কে? সামান্য পথের ধূলা মাত্র! বায়ুতাড়িত তৃণের মত সংসারে আজ এখানে কাল ওখানে ভেসে বেড়াচ্ছি, আর, আমারই জন্য তাঁর মত মহৎ লোকের অধঃপতন? আজ যদি আমি তাঁর চক্ষে সামনে থেকে সরে যাই, অবশ্য প্রথম তাঁর কিছু কষ্ট হতে পারে! কি কালে যখন তাঁর এ মোহ কেটে যাবে তখন আবার তিনি সুখী হতে পারবেন তাঁর যশ মান সুখ সৌভাগ্য সবই বজায় থাকবে! তবে আমি কেন তাঁর জীবনের পথে দুষ্টগ্রহের মত দাঁড়াব? না! আমি এখানে থাকব না! কাল তিনি গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাবেন, এটা আমার পক্ষে বিশেষ সুবিধার কথা! আমিও কাল সময় বুঝে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাব!

তারপরে মনে হল, কিন্তু যাব যে তা, কোথায়? অনেক ভেবে-চিন্তেও কোন আত্মীয়-বন্ধুকে মনে করতে পারলাম না। তখন ভাবলুম, সে সব ভেবে কি? যেদিকে দু'চোখ যায় এখন বেরিয়ে পড়ি, তারপরে যেখানেই হোক্ আশ্রয় একটা জুটবেই! এই সংসারে এত লোকের ঠাঁই আছে, আর আমার কি হবে না?

এই কথাই ঠিক! কর্ত্তব্য স্থির করে আমি উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আড্ডাঘর থেকে তখনো গানের সুর বায়ুস্রোতে ভেসে আসছিল। তারা তখনো গাইছিল—

আর ত হল না দেখা—জগতে দোঁহে একা
চিরদিন ছাড়াছাড়ি—যমুনাতীরে—
মধুযামিনী রে!

আমি খানিক জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

...দের গান শুনলাম। তারপর তোমাকে এই ...ঠি লিখতে বসেছি। তাঁর নামেও এক-...নি চিঠি রেখে কাল যখন সময় বুঝব, ...খনি বেরিয়ে পড়ব। তুমি হয়ত এই ...ঠি পেয়ে আমার অবস্থা ভেবে কত কষ্ট ...াবে। তাই লিখছি, আমার কথা মনে ...রে বৃথা কষ্ট পেও না। আমি মন স্থির ...রেছি। আর আমার কষ্টবোধ নেই। ...ানি "ফুটেছি মরুর মাঝে, দুদিন পরে যাব ...রে!" এ ছাড়া আমার জীবনের পরিণতি ...ার কি হতে পারে? তা যদি না হবে, তাহলে কি মা আমার সাতবছর বয়সে বিয়ে দিয়ে এম্‌নি করে আমরা সারাজীবনটা নষ্ট করে দিতেন? যাক,—গত কথা ভেবে লাভ কি?

তাহলে আজকার মত আসি। যেখানেই থাকি তোমাকে কখনো ভুলব না। কোন জায়গায় একটু স্থির হয়ে বসেই আবার চিঠি লিখব। আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। ইতি

তোমার স্নেহের বোন্—অমিয়া।

সরোজকুমারী দেবী।

লজ্জার বিকাশ

লজ্জা আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তি বটে কিন্তু ইহা আমাদের সহজাত নহে। কারণ জন্মের সঙ্গে লজ্জার বিকাশ দূরের কথা, শৈশব উত্তীর্ণ হইলেও লজ্জার বিকাশ হইতে সময় লাগে। এই প্রকারে লজ্জার বিকাশ গৌণকল্পে হয় বলিয়া ইহা যেমন মনুষ্যের বিশেষ বিকাশ, তেমনই ইহা উচ্চবিকাশেরও লক্ষণ। বস্তুতঃ ক্রমবিকাশবাদের আবিষ্কর্ত্তা স্বনামখ্যাত ডারুইন্ সাহেবের অনুসন্ধানের ফলে কোন কোন অসভ্যজাতির মধ্যে লজ্জার বিকাশ এখনও হয় নাই বলিয়া যে জানিতে পারা গিয়াছে (১) তাহাতেও লজ্জা উচ্চবিকাশের লক্ষণ বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

মনোবৃত্তির পরিস্ফুরণই উচ্চবিকাশের লক্ষণ, বয়োবৃদ্ধির সমনুপাতেই এই স্ফুরণ হইয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে লজ্জার বিকাশ হওয়ায় ইহাকেও মানসিক পরিস্ফুরণেরই ফল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ডারুইন্ ইহার প্রকাশ সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত মতেরই আভাস পাওয়া যায়; যথা—

"But we cannot cause a blush as Dr. Burgess remarks, by any physical means, that is by any action on the body. It is the mind which must be affected."—The Expressions of the Emotions in Man and Animals." p 327.

"আমরা বাহ্য উপায় অর্থাৎ শরীরের উপর কোন কার্য্য-দ্বারা লজ্জা উৎপাদন

(১) "The Expressions of the Emotions in Man and Animals." Popular Edition (John Murray) 1904. p. 338.

করিতে পারি না। লজ্জা উৎপাদনের জন্য মনের উপর ক্রিয়ারই আবশ্যক।"

বাইবেলে মানবের আদি পিতামাতা আদম ও ইভের বৃত্তান্তে লজ্জা-উৎপত্তির যে আখ্যান পাওয়া যায় তাহাতে উপরিউক্ত মতের আশ্চর্য্য সমর্থনই রহিয়াছে। আদি মানবজননী ইভ্ সর্পের প্ররোচনায় জ্ঞানবৃক্ষের ফল নিজে ভক্ষণ করিলে ও আদি মানব-পিতা আদমকে ভক্ষণ করাইলেই তাঁহাদের মধ্যে প্রথম লজ্জার সঞ্চার হয়। এই লজ্জার প্রভাবে তাঁহারা পত্রের দ্বারা প্রথম গাত্রাবরণ প্রস্তুত করেন। এতদবসরে ঈশ্বর তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা লজ্জায় স্বর্গোদ্যানের বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হন। (২)

জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই যে লজ্জার আবির্ভাব হয় উদ্ধৃত বাইবেলের উপাখ্যানের তাহাই সারমর্ম্ম। লজ্জার বিকাশের সহিত যে একটি অন্তরালে থাকিবার ভাব ও ভয়ের ভাব সংমিশ্রিত থাকে, লজ্জা-বিকাশের এই মূলনিয়মও উদ্ধৃত বাইবেলের উপাখ্যান হইতেই প্রমাণিত হয়।

লজ্জার উৎপত্তি ও বিকাশের আলোচনা এই। এখন ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি? "অন্যের সংস্রবে সঙ্কোচভাব" ইহাই লজ্জার প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া মনে হয়। অন্যের দ্বারা লক্ষিত হইলেই এই সঙ্কোচভাবের উৎপত্তি হয়। ভয়বাচক যে 'বিলক্ষ' শব্দ পাওয়া যায় তাহা এই প্রকারে লক্ষিত হওয়া অর্থ প্রকাশ করে বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং লজ্জাভাবকে আমরা বিশেষরূপে সামাজিক বিকাশ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে পারি।

অন্যের দ্বারা লক্ষিত হইলেই যে আমাদের সঙ্কোচ-ভাবের উৎপত্তি হয়, তাহা নহে। কিন্তু তৎসঙ্গে আমাদের মনে জ্ঞানোন্মেষ হওয়ারও প্রয়োজন। জ্ঞানোন্মেষের দ্বারা আমাদের মনে আত্মপরভাব বিশেষরূপে জাগ্রত হইলে, তাহাতে পরসংস্রবভাব অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সঙ্কোচভাবের উৎপাদন করিয়া থাকে।

(২) 6. And when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes and a tree to be desired to make one wise she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also to her husband with her, and he did eat.

7. And the eyes of them forth were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig-leaves together and made themselves aprons.

8. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden.

9. And the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou?

10. And he said, I heard the voice in the garden, and I was afraid, because I was naked and I hid myself.—Genesis Chapter III,

শিশুদিগের মনে জ্ঞান মুকুলিত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকায় আত্মপরজ্ঞানও অপরিস্ফুট থাকে। তাহাতেই তাহারা অন্যের দ্বারা লক্ষিত হইয়াও সঙ্কোচভাবের কোন চিহ্ন প্রকাশ করে না। যেরূপ নিঃসঙ্কোচে ইহারা অন্যের প্রতি তাকাইয়া থাকে, বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে তদ্রূপ তাকাইয়া থাকা কখনই সম্ভবপর নহে। ডারুইন্ এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"Children at a very early age donot blush, nor do they show those other signs of self-consciousness which generally accompany blushing, and it is one of their chief charms that they think nothing about what others think of them. At this early age they will stare at a stranger with a fixed gaze and unblinking eyes as on an inanimate object, in a manner which we elders cannot imitate." Ibid p. 346.

যে-সকল অসভ্য জাতি জ্ঞানের নিম্নস্তরে অবস্থিত, পূর্ব্বোক্ত কারণেই তাহাদের মধ্যে সঙ্কোচভাব উদ্বুদ্ধ না হওয়ায়, লজ্জাভাবের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

অপর লোক, বিশেষতঃ অপরিচিত লোকের সাক্ষাতে সঙ্কোচভাব উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে অপ্রকাশ রাখিতে যে প্রবর্ত্তিত করে তাহাই লজ্জার প্রথম ভাব। বাইবেলে আদম ও ইভ্ যে ঈশ্বরকে দেখিয়া বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন, তাহা এই সঙ্কোচভাব হইতেই হইয়াছিল।

লজ্জাবতী লতাতে আমরা লজ্জার সঙ্কোচভাবের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তই দেখিতে পাই। স্পর্শমাত্রই ইহার পত্রসকল মুদ্রিত হইয়া ইহা যেন আপনাতেই আপনি লুক্কায়িত হইতে চায়। এই সঙ্কোচের ভাব হইতে লজ্জাবতীর আর-এক নাম "সঙ্কোচিনী" হইয়াছে।

অপরিচিত লোকের নিকট শিশুগণ লজ্জাবতীর ন্যায়ই ব্যবহার করে। লজ্জাবতী যেমন অন্যের স্পর্শে ঢলিয়া পড়ে, শিশুও তেমনি অপরিচিতের নিকট হইতে সরিয়া মায়ের অঞ্চলে মুখ ঢাকে বা মায়ের কোলে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুখ লুকায়। ডারুইন্ লিখিয়াছেন—

"We often see little children when shy or ashamed, turn away, and still standing up, bury their faces in their mother's gown, or they throw themselves face downwards on her lap." Ibid 341.

পাশ্চাত্য ভাষায় লজ্জার বাচক যে shame শব্দ প্রচলিত আছে তাহার মূলার্থ লুক্কায়িত হওয়ার ভাবই প্রকাশ করিয়া থাকে। ডারুইন্ 'shame' শব্দের মূলার্থ সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন—

"Mr. Wedgwood says ("Dict. of English Etymology" Vol. iii. 1865. p, 155), that the word 'shame' may well originate in the idea of shade or concealment, and may be illustrated by the Low German scheme, shade or shadow." Ibid p. 339.

প্রাগুপ্ত লুক্কায়িত ভাব ব্যতিরেকেও সঙ্কোচের অপর লক্ষণ পরিব্যক্ত হইতে দেখা যায়। লজ্জার বাচক সংস্কৃত 'মন্দাক্ষ' ও 'মন্দাস্য' শব্দে আমরা তাহার আভাস প্রাপ্ত হই। (৩) এখানে 'মন্দ' শব্দের অর্থ অল্প।

(৩) "অথ মন্দাক্ষ মন্দাস্যঃ লজ্জা লজ্জ্যাচ স্ত্রীত্রপা। ব্রীড়ো ব্রীড়া ব্রীড়নঞ্চ লজ্জা পর্য্যায় ঈরিতঃ।" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত—শব্দরত্নাবল্যাম্।

সুতরাং 'মন্দাক্ষ' ও 'মন্দাস্য' শব্দ দ্বারা যাহাতে চক্ষু ও মুখ অল্প অর্থাৎ সঙ্কুচিত হয় তাহাই বুঝায়। মুখ-মণ্ডলে লজ্জাজনিত যে রক্তিমাভা প্রকাশ পায় তাহাও সঙ্কোচ ভাবেরই ফল বলিয়া মনে হয়। 'সঙ্কোচ' শব্দ অভিধানে 'কুঙ্কুম' বুঝায়। কুঙ্কুমের রক্তবর্ণ বলিয়া সঙ্কোচজনিত রক্তিমাভার সহিত ইহার সাদৃশ্য হইতেই ইহার 'সঙ্কোচ' নাম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কুঙ্কুমের "সঙ্কোচ পিণ্ডন" নামের দ্বারা ইহাকে স্পষ্টরূপেই সঙ্কোচের রক্তিমাভ চিহ্নের সূচক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

নবদম্পতীর প্রথম প্রেমসম্মিলনে তাহাদের পরস্পরের প্রতি নবানুরাগের কটাক্ষপাতে যে মনোহর সঙ্কোচভাব প্রকটিত হয়, কালিদাস অজ-ইন্দুমতীর বিবাহ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে তাহার অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; যথা—

"তযোরপাঙ্গ প্রতিসারিতানি
ক্রিয়াসমাপত্তিনিবর্ত্তিতানি।
হ্রীযন্ত্রণামানশিরে মনোজ্ঞাম্।
অন্যোন্যলোলানি বিলোচনানি॥"

এ স্থলে মল্লিনাথ 'হ্রীযন্ত্রণাং হ্রিয়ানিমিত্তেন যন্ত্রণাং সঙ্কোচং' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্ধৃত শ্লোকের অনুবাদ এই—"নবদম্পতীর পরস্পরের দর্শনোৎসুক লোচন, অপাঙ্গগত হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাতান্তে পুনর্ব্বার প্রত্যাকৃষ্ট হইয়া মনোরম লজ্জাজনিত সঙ্কোচ অনুভব করিতে লাগিল।"

ভয়, ঘৃণা, তিরস্কার, পুরস্কার, আদর প্রভৃতি নানাবিধ বিরোধীভাবই সঙ্কোচের উৎপাদক হইয়া লজ্জার উদ্বোধক হয়। বাইবেলের উপাখ্যানে লজ্জার সহিত ভ[illegible] সম্বন্ধের প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। 'ল[illegible] সম্ভ্রম,' 'লজ্জাভয়' প্রভৃতি কথায়ও [illegible] এই উভয় ভাবের স্পষ্ট যোগ দেখিতে পা[illegible] কাহারও প্রতি অবজ্ঞাভাব প্রদর্শিত [illegible] তাহাতে স্বতঃই তাহার মনে একটি অ[illegible] ভাব জন্মে ইহাই সঙ্কোচভাব। দো[illegible] জন্যই তিরস্কার করা হইয়া থাকে। দো[illegible] জন্য নিজেকে খর্ব্ব বোধ করা সক[illegible] পক্ষে স্বাভাবিক। এইরূপ খর্ব্ব ভা[illegible] সঙ্কোচেরই ভাব। আদর ও প্রশংসা[illegible] বিশেষরূপে অন্যের লক্ষণীয় হওয়া[illegible] সঙ্কোচ-ভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

উপরিবর্ণিত বিভিন্ন সঙ্কোচ-ভাবসক[illegible] মধ্যে শেষোক্ত ভাবদুইটি প্রফুল্লভা[illegible] যোগের দ্বারা বিশেষ শোভন হইয়া থা[illegible] কপোলের রক্তিমাভায় এই শোভন [illegible] প্রকটিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথমো[illegible] ভাবত্রয়ে অপ্রফুল্ল ভাবের যোগের [illegible] এই শোভন ভাবের পরিবর্ত্তে অশো[illegible] বিচ্ছায়ভাবই কপোল-প্রদেশকে গ্রাস করি[illegible] থাকে। এই বিচ্ছায়ভাব প্রকাশ করিবা[illegible] জন্যই কবি বলিয়াছেন—'লজ্জারাহু মুখেলীন[illegible]

উপরে আমরা লজ্জাভাবের যে বিশ্লে[illegible] প্রদান করিয়াছি, তাহাতে পাশ্চাত্য ক্র[illegible] বিকাশবাদেরই অনুসরণ করিয়াছি। আমাদে[illegible] দর্শনে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা পাওয়া যা[illegible] না। কিন্তু কোন দার্শনিক আলোচনা [illegible] থাকিলেও লজ্জা-শব্দ ও ইহার বাচক অ[illegible] শব্দে পূর্ব্বোক্ত বিশ্লেষণের রহস্য অতি আশ্চ[illegible] ভাবেই নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ল[illegible] শব্দের মূল লজধাতুতে ভর্ৎসন, অন্তর্ধা[illegible]

[illegible]ন (দীপ্তি) প্রভৃতি অর্থের যোগ [illegible]ক্রমে অতি পরিষ্কারভাবেই প্রদর্শিত [illegible]ছে। লজ্জাবাচক হ্রীশব্দের মূলে ঘৃণা [illegible] ভয় উভয়ার্থেরই যোগ আছে বলিয়া [illegible] হয়; তাহাতেই হ্রীধাতু-উৎপন্ন 'হ্রিনীয়া' [illegible] 'লজ্জা' ও 'ঘৃণা' অর্থের প্রকাশক [illegible]মনই 'হ্রীকা' শব্দ 'ত্রাস' ও 'লজ্জা' [illegible]র প্রকাশক।

[illegible] লজ্জা শব্দের মূল ধাতু হইতেই 'লগ্ন' শব্দ [illegible]ত হয়। এই 'লগ্ন' শব্দের দ্বারা আমরা [illegible]র সঙ্কোচভাবের কতকটা ধারণা করিতে [illegible]রি। লজ্জাভাবের দ্বারা আমরা যেন [illegible]পনাতে আপনি বিলীন হইয়া থাকি, [illegible]' শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা [illegible]। রামায়ণে রাবণবধের পর সীতা [illegible]ন রামসমীপে আনীত হইয়াছিলেন, [illegible]ন তাঁহার যে সলজ্জভাবের বর্ণনা মহাকবি [illegible]ীকি দিয়াছেন, তাহাতে লজ্জার পূর্ব্বোক্ত [illegible]রূপ সঙ্কোচভাবটি উজ্জ্বলরূপেই পরিস্ফুট [illegible]য়াছে যথা—

[illegible] "লজ্জয়া অবলীয়ন্তী স্বেষু গাত্রেষু মৈথিলী।
বিভীষণেনানুগতা ভর্ত্তারং সাভ্যবর্ত্তত॥"

'মৈথিলী লজ্জাবশতঃ নিজদেহে লীন [illegible]য়াই যেন বিভীষণের সঙ্গে পতি রামচন্দ্রের [illegible]পে উপস্থিত হইলেন।'

লজ্জাতেই যে প্রথম দেহ আবৃত করা [illegible]বশ্যক হইয়াছিল, বাইবেলে আদম ও ইভের [illegible]-পরিধান-রচনাতেই তাহা বুঝিতে পারা [illegible]। লজ্জানিবারণ করা অর্থে যে 'cover [illegible]e's nakedness' এরূপ ইংরেজী বাক্য [illegible]চলিত দেখা যায়, তাহাতেও লজ্জার জন্যই আবরণের প্রয়োজন তাহা বুঝিতে পারা যায়। লজ্জার বাচক যে 'ব্রীড়া' শব্দ পাওয়া যায়, তাহার মূলে আবরণার্থক বৃ-ধাতুর যোগ আছে বলিয়াই আমাদের বোধ হয়।

লজ্জাশব্দেরই সহিত একমূল (লজি) 'লঞ্জ' শব্দ অভিধানে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ কচ্ছ। কচ্ছ, কোঁচা ও কাছা উভয়ই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং 'লঞ্জ' শব্দ হইতে প্রথম লজ্জাবরণ যে কোঁচা ও কাছার আকারে ছিল তাহাই আমরা বুঝিতে পারি। বর্ত্তমান পত্রপরিধানকারী অসভ্য জাতির (leaf-wearers) যে বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই, তাহাতে পত্রই যে সম্মুখে ও পশ্চাৎদিকে কোঁচা ও কাছার আকারে পরা হয়, তাহাই আমরা জানিতে পারি। 'লঞ্জ' যেমন 'কচ্ছ' বুঝায় তেমনই 'পুচ্ছ'ও বুঝায়। পুচ্ছদ্বারা কাছার কাজ হয় বলিয়াই ইহার এই নাম হইয়াছে। 'ল্যাজ' শব্দটী 'লঞ্জ'-শব্দেরই স্পষ্ট অপভ্রংশ।

লজ্জার মূলে যে সঙ্কোচভাবের কথা আমরা উপরে বলিয়াছি বিশেষ অনুধাবনার দ্বারা আমরা ইহার দ্বিবিধ প্রকৃতি দেখিতে পাই। এক শঙ্কা, অপর শালীনতা। শঙ্কাতে ভয়ের উপাদান বিদ্যমান, শালীনতায় অধৃষ্টতার উপাদান বিদ্যমান। 'শঙ্কা' ইংরেজীতে shyness এবং 'শালীনতা' ইংরেজীতে modesty। শালীনতা শব্দটী প্রণিধানের যোগ্য। শালা বা গৃহের যোগ্য এই অর্থে 'শালীন' শব্দ সাধিত হইয়া শালীনের ভাব এই অর্থেই শালীনতা সিদ্ধ হয়। 'শালা' শব্দের গৃহ অর্থ হইতে শালীন শব্দের অর্থ 'গৃহস্থ' হয়। সুতরাং শালীনতা গৃহস্থের ভাবকেই বুঝায়। ইহাতে গার্হস্থ্যজীবন

হইতেই যে বিশেষরূপে শালীনতার বিকাশ হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

এইপ্রকারে শঙ্কা ও শালীনতা লক্ষণযুক্ত লজ্জাকে আমরা সমাজের বিশেষ মার্জ্জিত বিকাশ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে পারি। এই লজ্জাভাবের দ্বারা লোকের আচার-ব্যবহার যেরূপ মার্জ্জিত হইয়াছে, তাহাদের নৈতিক চরিত্রও তদ্রূপ সুরুচিসম্পন্ন ও উন্নত হইয়াছে। এই কারণেই লজ্জাকে উচ্চবিকাশের পরিচায়ক বলিয়া মনে করা যায়।

লজ্জার দ্বারা আমাদের নৈতিক ভাব যেরূপ নিয়মিত ও মার্জ্জিত হয় ধর্ম্মভাবও তদ্রূপ নিয়মিত ও মার্জ্জিত হয়। লজ্জার সঙ্কোচভাব-হেতু আমরা প্রথমতঃ লোক-চক্ষুর গোচরে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে শঙ্কিত হই। ক্রমে এই সঙ্কোচ-ভাবটি এরূপই স্বাভাবিক সংস্কারে পরিণত হয় যে গোপনে বা মনে মনে অধর্ম্ম কার্য্য করিতেও শঙ্কা উপস্থিত হয়। তখন লোকের পরিবর্ত্তে আমরা নিজেরাই আমাদের কার্য্যের বিচারক হই এবং আমাদের কৃতদোষের জন্য নিজের নিকটেই লজ্জিত হই। ইহাকেই ইংরেজীতে "ashamed of one's own self" (নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হওয়া) বলে। আমাদের ধর্ম্মজীবন বা আধ্যাত্মিক জীবনের তখনই পূর্ণ পরিণতি হয়, যখন কোন কার্য্যের জন্য আমাদের নিজের নিকটেও আমাদিগকে অণুমাত্রও লজ্জিত অর্থাৎ সঙ্কুচিত বোধ করিতে না হয়। এই প্রকারে আমাদের আত্মা সর্ব্ববিষয়ে নিঃসঙ্কোচ হইতে পারিলেই পরমেশ্বরের নিকট নির্ভয়ে উপস্থিত হইতে পারে। যতক্ষণ আমা মধ্যে দোষ বা পাপের লেশমাত্রও ব থাকে, ততক্ষণ সঙ্কোচভাব বিদূরিত কোন-মতেই সম্ভবপর নহে। পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী,—তাঁহার কিছুই গোপন থাকিতে পারে না। নিঃসঙ্কোচে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের আমাদিগের সর্ব্বদোষবিনির্মুক্ত হওয়া একা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক গোপীগ "বস্ত্রহরণ" পূর্ব্বোক্ত রূপ নিঃসঙ্কোচভাবে রূপক বলিয়া মনে করা যাইতে পা যতক্ষণ গোপীসকল সঙ্কোচ-ভাব তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন, তত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ ক পারেন নাই—তাই তাঁহাদের 'বস্ত্রহরণ' সঙ্কোচভাব সম্পূর্ণরূপে বিদূরিতকরতঃ তাঁহা অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। "ঘৃণা ভয়, এই তিন থাকতে নয়" ধর্ম্মসাধ এই যে প্রবচন প্রচলিত আ তাহাতেও সঙ্কোচভাব নিবৃত্তিই সি প্রকৃত উপায়রূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে সাধকের আদর্শ মহাদেব যে 'দিগম্ব তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত রহস্যেরই প্রমাণ পা যায়। মহাদেবের আদর্শেই সন্ন্যাসী প্রভৃ সাধকগণ 'দিগম্বর' হইয়া থাকে। প্রকারে আদম ও ইভে আমরা যে স্বর্গী পবিত্র অনাবৃত সরলভাব দেখিতে পাইয়া ধর্ম্মসাধকেও আমরা সেই স্বর্গীয় অকলুষি নিঃসঙ্কোচভাবই দেখিতে পাই। এইরূপে বিবর্ত্তনের চক্র পূর্ণ হইতেছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্বেচ্ছাচারী

তৃতীয় খণ্ড

১

বিবাহের পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে লজার জীবনে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। হার সাধ্বী মাতার মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যে তা কালিকামোহনও সজ্ঞানে ৺গঙ্গালাভ রিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কার্ত্তিককে লিলেন, "বাবা কার্ত্তিক, আমার সমস্তই তামার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। আমার উইলে তামাকেই আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ই দিয়ে গেলুম। কেবল মার নামে স্বর্গীয় র্ত্তা যে মহাল আর নগদ টাকা দিয়ে ছেন, তার ব্যবস্থা তাঁর নিজের হাতেই ইল। তাঁর উপর তোমার কোন কর্ত্তৃত্ব াকবে না। তা ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ের পরই তোমার পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব। তুমি আমার ব-কীর্ত্তি পিতৃ-কীর্ত্তি বজায় রেখে সমস্তই যথেচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে পারবে। তবে শলর নামে আগে থেকে যে সম্পত্তি আছে, া তারই নামে থাকল। তুমি ছাড়া যখন ার আর কেউ রইল না, তখন সে বিষয়ে ার তোমায় কি উপদেশ দেব? সর্ব্বদা তামার পিতৃদেবের পরামর্শ নিয়ে কাজ রো, তাহলে কোন বিপদ হবে না।"

শৈলজা কালিকা বাবুর পায়ে হাত লাইতেছিল। কালিকা বাবুর কথায় সে াদিয়া ফেলিল। কালিকা বাবু বলিলেন, কেঁদো না, মা। স্বধর্ম্মে থেকে সংসারে র্ত্তব্য করে শেষে গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম বলতে বলতে হাসতে হাসতে যে যেতে পাচ্ছি, এ কি কম সুখের কথা! জীবনে যা প্রার্থনা করেছিলুম, তা সমস্তই পেয়েছি। ভগবান যাকে এতখানি দয়া দেখিয়েছেন, তার জন্য দুঃখ করা অন্যায়। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরাও যেন শেষে এমনি করে মা গঙ্গার চরণে আশ্রয় পাও! যেন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বলতে পার, 'ভগবান, তোমার অপূর্ব্ব করুণা!' ভগবানের রুদ্র মূর্ত্তি যেন তোমাদের কখনও না দেখতে হয়! জীবনে কখনও স্বধর্ম্মচ্যুত হয়ো না; তাহলে যত দুঃখই পাও না কেন, সবই তাঁর করুণা বলে মনে হবে, তা হলে তাঁর রক্ত চক্ষুর তলে তাঁর গভীর করুণাই স্পষ্ট অনুভব করবে।"

কালিকা বাবু বক্তব্য শেষ করিয়া নিমীলিত নেত্রে বলিলেন, "তারা শিব সুন্দরি!" কার্ত্তিক তাঁহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। শৈলজা স্পষ্ট দেখিল, স্বামীর নয়ন ও অধরের কোণে একটা হাসির রেখা ফুটিয়াছে। দেখিয়া শৈলজা অন্তরে শিহরিয়া উঠিল।

আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়াই সে অনুভব করিয়াছে, তাহার ও স্বামীর মধ্যে একটা অতি-সূক্ষ্ম অথচ দুর্ভেদ্য ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে। বাহিরে সে ব্যবধান কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই, কারণ কার্ত্তিকের ব্যবহার অত্যন্ত সরল এবং অমায়িক। সকলেই তাহার নিরহঙ্কার অথচ গম্ভীর

ব্যবহারে সন্তুষ্ট। শৈলজাও এমন কোন কথা বা কাজ স্মরণ করিয়া বলিতে পারে না, যাহাতে কার্ত্তিকের স্নেহহীনতা বা অন্য কোন অপ্রীতিকর ভাব এতটুকুও প্রকাশ পাইয়াছে। আজ দুই বৎসর তাহার এক পুত্র হইয়াছে। পুত্রটি যেমন হৃষ্টপুষ্ট, তেমনি সুন্দর! কার্ত্তিক যখন বিদেশে তাহার পাঠক্রিয়া-সমাধায় ব্যস্ত, তখন সে মাঝে মাঝে পুত্রের জন্য নানাবিধ খেলনা, এবং যেদিন পুত্র হওয়ার সংবাদ পায়, সে দিন প্রসূতির জন্য নানাবিধ সৌখীন দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। তাহার ব্যবহারে কোথায় যে ত্রুটি, সেটুকু শৈলজা কখনও স্পষ্ট ধরিতে পারে নাই; তবু তাহার অন্তঃস্থল হইতে একটা গভীর বিচ্ছেদের দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া নৈশ আকাশে মিলাইয়া যাইত। কার্ত্তিক যে অন্য-গত-চিত্ত, এ কথা ফুলশয্যার রাত্রেই সে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল; সেজন্য তাহার যে ত্রুটি হইবে, সে ত্রুটির জন্য ক্ষমাও সে চির-জীবনের জন্য লাভ করিয়াছিল। কার্ত্তিক যে আর-কাহাকেও মনে মনে ভালবাসে, এটা তত দুঃখের নয়, কারণ শৈলজা সে দুঃখকে গণনায় আনিয়া জীবনের মধ্যে জমা-খরচ মিলাইয়া একটা ঠিক দিয়া বসিয়াছিল! সে দুঃখের খরচ সুখের জমার চেয়ে অনেক কম,—তবে কিসের দুঃখ! কিসের ব্যবধান! কিসের বিচ্ছেদ! কার্ত্তিক ভালবাসিতে পারে, তাহার হৃদয়ে যে স্নেহের তরঙ্গ খেলে, ইহা জানিতে পারিলেও যে শৈলজা অত্যন্ত স্বস্তি অনুভব করে। শৈলজার মনে হয়, কার্ত্তিকের হৃদয় হইতে এই পরম পবিত্র মন্দাকিনী, স্নেহের সুরধুনী-ধারা শুকাইয়া গিয়াছে। সে ভালবাসিতেই পারে না! যদি তা হৃদয়ে ভালবাসিবার শক্তি সজাগ থা তাহা হইলে শৈলজার কোন ভয় না কারণ তাহার আশা আছে যে, ভগীর মত সাধনার দ্বারা সে সেই স্নেহ-মন্দাকিনী তাহার সংসারের উপর নামাইয়া আ পারিবে। যদি তাহা কোন বাধায় অব হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে তাহার দিয়াও সে বাধা সরাইয়া দিবে। কিন্ত তাহা শুকাইয়া গিয়া থাকে, তাহা হ সে কি করিবে? তাহার মনে কার্ত্তিকের চরিত্রে সবই আছে, প্রাণের মধ্যে যাহা থাকিলে মানুষ স থাকে, কেবল সেইটুকুরই যেন অ ঘটিয়াছে! কার্ত্তিকের যেন প্রাণ সে যেন সংসারের চোখে এখন মৃত!

* * *

মহাসমারোহে কালিকাবাবুর শ্রাদ্ধ সমা করিয়া, গভীর রাত্রে কার্ত্তিক তাহার শ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, শৈলজা ব বসিয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতেছে শয্যায় দুই বৎসরের শিশু দেবীপ্রসা নিদ্রিত। কার্ত্তিক ধীর-পদবিক্ষেপে শি শিয়রে যাইয়া তাহাকে চুম্বন করিল, প শৈলজার নিকটে আসিয়া বলিল, "শৈ তোমার মুখখানা তোল ত, আমি দেখ পাচ্ছি না।" শৈলজা দুই হাতে ঢাকিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কার্ত্তিক কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকি হঠাৎ শৈলজার মুখ হইতে হাত সরাই লইল এবং তাহাকে আলোর দিকে ফিরাই

া বলিল "শৈল, তোমার মুখে এত লা! আমি সইতে পারছি না। উঃ—" র্ত্তিক দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মেঝের র বসিয়া পড়িল। শৈলজা চোখ মুছিয়া ত হইয়া বলিল, "কি হল? তুমি অমন রছ কেন? শোও, আমি বাতাস করছি।" র্ত্তিক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সেই সঙ্গে মন উচ্চ রবে হাসিয়া উঠিল যে, সে সির শব্দ কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইয়া য়তলে কর্ম্ম-রত আত্মীয়-স্বজন, দাস-াসী সকলের কর্ণে পৌঁছিল। কি বিকট ন্মাদের ন্যায় হাস্য! শৈলজা পিতৃবিয়োগ-খ ভুলিয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি এক ানা পাখা লইয়া কার্ত্তিককে বাতাস করিতে ারম্ভ করিল। কার্ত্তিক নিমীলিত নেত্রে ন্মের মত হাতড়াইতে হাতড়াইতে খাটের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া শৈলজা ব্যস্ত হইয়া একজন দাসীকে ডাকিয়া বলিল, "শীগ্‌গির ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন্, উনি কি রকম কচ্ছেন।"

শৈলজা কার্ত্তিকের শয্যায় বসিয়া তাহার মাথায় গোলাপজল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কার্ত্তিক মুদিত নেত্রে বলিল, "গরিব বামুনের ছেলের এত ঐশ্বর্য্য সইবে কেন, শৈল! তাই বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, না?"

শৈলজা কাতর হইয়া বলিল, "কেন তুমি অমন করছ? কি হয়েছে,—তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বল।"

কার্ত্তিক কহিল, "কি আবার হবে? আমি আলো সইতে পারছি না।"

শৈল কহিল, "আলোটা কমিয়ে দিচ্ছি, না হয় নিবিয়ে দিচ্ছি।"

কার্ত্তিক আবার হাসিল। তেমনি বিকট হাসি! শৈলজা ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। শিশুও জাগ্রত হইয়া সে ক্রন্দনে সশব্দে যোগ দিল। শৈলজা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া কার্ত্তিকের মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "আর ভয় দেখিয়ো না, আমি যদি কোন দোষ করে থাকি—"

কার্ত্তিক কহিল, "দোষ! তোমার সব-চেয়ে দোষ যে তোমার মুখে একরাশ আলো জেলে নিয়ে তুমি আমায় তাড়া করে বেড়াচ্ছ। আমায় কয়েদ করে, আমার পালাবার পথ না রেখে, সেই আলো নিয়ে তাড়া করে বেড়াচ্ছ। অন্ধকার—আমি অন্ধকারকে চাই। আনতে পার জগৎ-জোড়া সব-ভুলানো, সব-ডুবানো অন্ধকার? যদি না পার, তাহলে কি হবে মিছে ডাক্তার ডেকে? আমার এ রোগ সারবে না। আমি পাগল হইনি, শৈল, কোন ভয় নেই। বাতাস করে কি হবে? আমার ভেতরটা হাঁপিয়ে উঠছে, বাইরের বাতাসে কি হবে?"

শৈলজা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি জানি যে তুমি আমায় বিয়ে করে সুখী হওনি—"

কার্ত্তিক কহিল, "সুখী হইনি? ভুল শৈল, তোমার ভুল! কিন্তু এ সুখের আলো আমার সইছে না। সুখ আমি চাইনে—আমি চাই দুঃখের অন্ধকার! চাই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দহীন মৃত্যুর মত অন্ধকার! তা ত তুমি আমায় দিতে পারবে না!"

শৈল কহিল, "আমি তোমায় বুঝতে

পারছি না। তুমি ত আমায় বিয়ে করে অবধি কষ্ট পাচ্ছ!"

কার্ত্তিক কহিল, "না শৈল, না, আমি খুব সুখী, অত্যন্ত সুখী। প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশী সুখ তুমি আমার হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছ। কিন্তু আমি যে সুখ চাইনে, শৈল!"

বাহিরে পদশব্দ হইতেই কার্ত্তিক উঠিয়া বসিল। শৈলজা সরিয়া গেল এবং ডাক্তার বাবু সেই কক্ষে নানাবিধ ঔষধ-সমেত প্রবেশ করিলেন। কার্ত্তিক স্বাভাবিক ভাবে হাসিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবু, আপনি পাগল! অত শিশি নিয়ে এলেন! ওতে ওষুধ পত্র বাছতেই যে সময় যাবে, রোগী দেখবেন কখন?"

ডাক্তার কহিল, "তুমি শোও কার্ত্তিক, শুয়ে, কি হয়েছে, বল।"

কার্ত্তিক কহিল, "কিচ্ছু হয়নি, আপনি ফিরে যান। সারাদিন খেটে-খুটে মাথাটা একটু ঘুরে উঠেছিল—শৈল পাগল, ব্যস্ত-বাগীশ, তাই আপনাকে আবার এত রাত্রে কষ্ট দিলে।"

বাড়ীর পুরাতন ডাক্তার বহুদিন হইতেই কার্ত্তিকের ধরণ-ধারণ জানিতেন। তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্র নন্; কার্ত্তিকের নাড়ী টিপিয়া বলিলেন, "কিছু ত হয়নি বলছ, এদিকে নাড়ী এত জোর কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "Pure excitement, শুধু, আর কিছু নয়! ঘুমোলেই সব সেরে যাবে।"

শৈলজা ডাক্তারকে ডাকিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "আপনি ওঁর কথা শুনবেন না, ওষুধ দিন।" শৈলজা তাহার নিকট সমস্তই বর্ণনা করিয়া বলিল, "কোন দিন ত এমন করেন না।" ডাক্তার বাবু তাঁহার কাঁচা-পাকা মাথাটি চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "তাইত কিছু ত বুঝতে পারছি না। যাই হোক তুমি এই ঘুমের ওষুধটা খাইয়ে দিয়ো, তাহলে ও ঘুমিয়ে পড়বে'খন।"

শৈল কহিল, "আপনি খাইয়ে দিন, আমার কথা শুনবেন না।"

কার্ত্তিক আবার সহজ হাস্যে শৈলজাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, "শুনব, শুনব। দিন ডাক্তার বাবু, কি ওষুধ দেবেন, দিন। আপনাদের জ্বালায় অস্থির হতে হল।"

কার্ত্তিক ঔষধ পান করিলে ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন। শৈলজা আসিয়া নিকটে বসিতেই কার্ত্তিক উঠিয়া বসিয়া শৈলজাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিল; তারপর শয়ন করিয়া বলিল, "মহারাণি, খাজনা ত দিলুম, এখন নিশ্চিন্ত হয়ে শোওগে। আমার কিছু হয় নি, তোমার সঙ্গে চালাকি করছিলুম, ভাবলুম, দেখি, একটু থিয়েটারী রকম করলে তুমি ভয় পাও কি না।"

শৈলজা তবু উঠিল না। তাহার শিশু পুত্র কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপনিই আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তবে ঘুমাইতে ঘুমাইতেও সে মাঝে মাঝে ফুঁপাইয়া উঠিতেছিল। কার্ত্তিক বলিল, "ছেলে ফোঁপাচ্ছে, তবু তুমি এখানে বসে থাকবে? তাহলে এস, আজ বিছানা অদল-বদল হোক। আমি দেবুর কাছে গিয়ে শুই, আর তুমি আমার জায়গা অধিকার করে শুয়ে থাকো।"

শৈলজা অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "যদি এক মিনিটের জন্যও তুমি আমি হতে, তাহলে আমার দুঃখ বুঝতে পারতে। তোমায় সুখী করতে না পেরে—"

কার্ত্তিক কহিল, "আবার ঝগড়া সুরু করলে! এখনি ত' সোলেনামায় সই করে দিলুম।"

শৈল কহিল, "কি করলে তুমি সুখী হও?"

কার্ত্তিক কহিল, "আবার! তা হলে আবার পাগল হব, তখন টের পাবে। আমি সুখী নই? শৈল, তুমি কি কিছু বুঝতে পার না? আমি বলছি, আমি খুব সুখী, খুব আনন্দে আছি। এখন যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোওগে।"

শৈল কহিল, "আজ আমি তোমায় ছেড়ে থাকব না।"

কার্ত্তিক কহিল, "বেশ! সুধায় অরুচি হয়?"

২

সমস্ত দিন অন্ধ বালক-বালিকাদের জন্য পরিশ্রম করিয়া সরোজ সন্ধ্যার পর সুকুমারীকে বলিল, "সুকু, আজও সমস্ত দিন সর্ব্ব-দা ত এলেন না, কি হয়েছে বলতে পার?" সুকুমারী ছাদের উপরকার সুশীতলা হইতে বলিল, "না সরো দি, তিনি কৈ কিছু ত বলে যান নি।"

সরোজদের গৃহের ছাদটি যেন একটি ক্ষুদ্র উদ্যান। সারি সারি টবে নানা জাতীয় বৃক্ষে থরে থরে বেশ যুঁই বেলি গন্ধরাজ রজনীগন্ধা প্রভৃতি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। সদ্য বারিবিন্দু-লাভের আনন্দে অসংখ্য ফুল তাহাদের গন্ধ-সম্পত্তি চারিদিকে বিলাইতেছে। উপরে নবমীর চন্দ্র হাসিতেছে —নিম্নে পুষ্পগুলি শোভায় গন্ধে সমস্ত স্থানটুকু ভরাইয়া ফেলিয়াছে। আর ইহাদের মাঝে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টি-হীনা বালিকা, আর এক দৃষ্টি-হীনা রমণী—অন্ধ প্রকৃতির সম্মুখে দুই অন্ধ প্রাণী! প্রাণীদুটি শব্দ বা স্পর্শের দ্বারা প্রকৃতিকে জানাইতেছে যে তাহারা আছে, প্রকৃতিও গন্ধের দ্বারা তাহাদের অন্তরে প্রবেশ-লাভের চেষ্টা করিতেছে।

সরোজ হস্তদ্বারা গাছগুলি স্পর্শ করিতে করিতে দুই তিনবার সমস্ত ছাদটি প্রদক্ষিণ করিল; যেন সব গাছগুলির সঙ্গেই তাহার স্পর্শযোগ রাখার প্রয়োজন, যেন প্রতি ফুলটিই তাহার জন্য প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হইয়া নূতন কোন গোপন সংবাদ দিবার জন্য তাহার স্পর্শের আশায় অপেক্ষা করে! কি জানি, যদি কাহারও নিকট হইতে কোন কথা শুনিতে ভুল হইয়া যায়, এইজন্য সরোজ প্রতিদিন প্রভাতে, সন্ধ্যায় তাহাদের সঙ্গে স্পর্শের ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া লয়।

সুকুমারী কিন্তু একটী ক্ষুদ্র দীপ জ্বালিয়া ছাদের এক কোণে যে তুলসীমঞ্চ আছে, তাহারই নিকটে বসিয়াছিল। সরোজের মত সে প্রতি সন্ধ্যায় এই ছাদটীতে আসে বটে, কিন্তু বেড়াইবার জন্য নয়,—সে আসে ঐ মঞ্চের কুলুঙ্গীতে প্রদীপ দিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য। সরোজের পক্ষে যেমন এই কৃত্রিম উদ্যানটির সমস্তটুকু

আছে, তাহার পক্ষে তেমনি কেবল ঐ কোণটুকুই আছে। সুকুমারী ঐ কোণটুকু হইতে সমস্ত গাছপালা সরাইয়া দিয়া একটী মাত্র তুলসী বৃক্ষকে স্বহস্তের জল-নিষেকে যথেষ্ট বড় করিয়া তুলিয়াছে, এবং নানা উপায়ে ঐ স্থানটুকুতে অন্ধকার সঞ্চিত করিয়া তাহার মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র দীপ জ্বালিয়া দিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষে চাহিয়া থাকে, তারপর ধীরে ধীরে প্রণাম করিয়া চলিয়া যায়।

শশিভূষণের শ্বশ্রূঠাকুরাণী চিন্ময়ী দেবী ছাদে আসিয়া ডাকিলেন, "সরোজ।"

অপর প্রান্ত হইতে সরোজ বলিল, "যাই মা।"

চিন্ময়ী বলিলেন, "আবার তোমার শরীর ভাল থাকছে না, তুমি হিমে আর থেকো না। সুকু—"

সুকু তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, "মা, সরোদিকে অত মেহন্নৎ করতে বারণ করে দাও। ওর সব কাজ এখন আমিই ত পারি, তবুও আমায় ও করতে দেবে না!"

সরোজ নিকটে আসিলে চিন্ময়ী বলিলেন, "আমি মনে করছি, আবার তোমায় কোথাও পাঠিয়ে দি।"

সরোজ কহিল, "আমি কি অফিশের কেরাণী মা, যে বৎসরান্তে আমায় ছুটি নিতেই হবে?"

চিন্ময়ী কহিলেন, "তুমি কেরাণীর চেয়েও বেশী কেরাণী, মা। তাদের পাঁচটার পর ছুটি, তোমার তাও নেই। শশী তোমায় এমনি করে মারছে যে বুঝতেও পারছে না, দিন দিন তুমি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছ, অথচ তোমা বললেও ত তুমি শুনবে না!"

সরোজ অন্যমনস্কভাবে একটা গাছে পাতা ছিঁড়িতে গিয়া হঠাৎ হাত সরাই লইয়া বলিল, "আমি—আমি এ বাড়ী ছে থাকলে, এই সব বন্ধুদের কাছ থেকে দূ থাকলে ভাল থাকিনে মা।" সরোজ অ যত্নে এক যূথিকার ঝাড়ের উপর ধী ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। চিন্ময়ী বি হইয়া বলিলেন, "তবে তুমি দিনকতক কাজ ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাক

সরোজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, " হলে কি নিয়ে থাকব?"

তাহার স্বরে এমন একটা গভীর ধ্বনিত হইল যে চিন্ময়ীর সম্মুখ হইতে স শোভা, সমস্ত গন্ধ নিমেষে কোথায় অন্ত হইয়া গেল। তিনিও নিশ্বাস ফে বলিলেন, "তবে আর আমি কি করব?

উভয়ে নীরব হইলে সুকুমারী বলি "চল, নীচে যাই।" তিন জনে ত দ্বিতলে নামিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে শশিভূষণ এবং তা দুইটি নিতান্ত অনুগত ছাত্র মণীশ ও জ্যো প্রসাদ কলরব করিতে করিতে উ উঠিয়া আসিল। মণীশ ও জ্যোতি এ সতেরো-আঠারো বৎসরের হইয়াছে, এখন তাহারা যাহা লইয়া তর্ক করিতেছি তাহা ঠিক বালকোচিত কলরব নহে। এবং এই কারণে শশিভূ তাহাদের তর্কে যোগ দিয়া জ্যোতিপ্রসা পক্ষ সমর্থন করিতেছিল।

তর্কটা চলিয়াছিল অন্ধের অক্ষর-শি

এক নূতন পদ্ধতি লইয়া। মণীশ বলিল, "তা আপনারা যাই বলুন, আমি ঠিক বাঙ্‌লা আর ইংরিজী অক্ষরের পক্ষপাতী। চেষ্টা করতে করতে আমাদের ক্ষমতা এতই বেড়ে যেতে পারে যে হয়তো পরে সাধারণ কালীর লেখাও আমরা ছুঁয়ে পড়তে পারব। কিন্তু আপনার ঐ নতুন "বিন্দু-পদ্ধতি" চললে সমস্ত ভাষার অক্ষরের সঙ্গেই আমাদের যোগ হবার আশা চির-দিনের জন্য চলে যাবে।"

জ্যোতি কহিল, "তবু লেখবার আর transcribe করবার যে একটা মস্ত সুবিধা এতে পাওয়া যাচ্ছে। তা-ছাড়া দশটা মাত্র বিন্দু নিয়ে তাদের কমিয়ে বাড়িয়ে নানারকমে সাজিয়ে যদি বর্ণমালার নতুন একটা আকৃতি সৃষ্টি করা যায়, তাতে সুবিধেই হবে। পুরোনো পদ্ধতিতে এক একটা অক্ষর এমন, যে, পাঁচ আঙ্গুলের মধ্যেও পাওয়া যায় না, হাত নাড়তে নাড়তে কতকটা সময় যায়। এই বিন্দু-পদ্ধতিতে অক্ষরগুলোকে অন্তত আঙ্গুলের ডগাটুকুর মধ্যে আবদ্ধ করে আনা যেতে পারবে। এতে বইগুলোও ছোট হয়ে আসবে, আর তা ছাড়া অক্ষর গুলো pointed হবার দরুণ অনুভবটাও শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ হবে। আমরা যে পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়েছি, তাতে আমাদের যত দিন লেগেছে, এতে বোধ হয় তার অর্দ্ধেক সময়ে সবাই তার চেয়ে ঢের বেশী শিখতে পারবে।"

শশী কহিল, "তা ছাড়া আর একটা জিনিষ তোরা দেখছিস্ না যে, এক transcriptionএর হায়রাণীটা এতে কতখানি কমবে। কেবল নিজের সুবিধাটুকু দেখলে ত চলবে না। point systemএ অন্ধদের দ্বারাও নির্ভয়ে এবং নির্জ্জনে transcribe করিয়ে নিতে পারা যাবে।"

সরোজ কিছুক্ষণ তাহাদের তর্ক মন দিয়া শুনিয়া বলিল, "আমি কিন্তু মণীশের দিকে। যদি কোন কালে আমরা কালী দিয়ে লেখা অক্ষর পড়তে নাও পারি, তা হলেও সেই আশায় আমি চির জীবন কাটাতে রাজী আছি। চক্ষু হারিয়ে সাধারণের সঙ্গে একটা মস্ত যোগ আমরা হারিয়েছি। যদি কোন দিন সাধারণ অক্ষরে লেখা কাগজ-পত্র পড়তে পারি, তাহলে আর এক রকমে সেই যোগটুকু ফিরে পাই এবং সেই আশাতেই বেঁচে থাকব, নইলে আর কিসের আশা করব?"

শশিভূষণ বসিয়া বলিল, "তোমাদের নতুন করে কিছু শেখাতে যাচ্ছি না। তোমরা যা শিখেছ, তাই নিয়ে নাড়াচাড়া কর। কিন্তু আমি যখন অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রিন্‌সিপাল, তখন আমার ছাত্রদের মঙ্গল আমায় দেখতে হবে ত। তুমি এখন হাতের-চেয়ে-আম বড় হয়ে গিয়েছ, তোমার উপর আর আমার হাত কি!"

সরোজ কহিল, "তবে কি তুমি আমার চাক্‌রিটা খাবার চেষ্টায় আছ। তা হলে তোমার চাকরির স্থায়িত্ব বিষয়েও কথা উঠবে।"

শশী কহিল, "তোমার চাকরি কে খায়, বোন? তোমার হল ইম্পিরিয়াল সার্ভিশ। তবে সর্ব্বানন্দ এই Systemটা চালাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে—"

সরোজ কহিল, "তাই তাঁর টিকিটি পর্য্যন্ত দেখবার জো নেই।"

শশী কহিল, "জো থাকলেও যে তুমি তা চেপে ধরছ না, এইটেই বড় দুঃখ, নইলে--"

সরোজ শশীর কথায় বাধা দিয়া বলিল, "শশিদা, তোমার যত বয়স বাড়ছে, ততই স্থান-কাল-পাত্রের জ্ঞান কমে আসছে। আমায় যদি এই রকম করে সকলের সামনে—"

শশিভূষণ উচ্চরবে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "স্থান ত আমাদের নিজেদেরই বাড়ী, কাল, রাত্রি প্রায় ন'টা, পাত্র দেখছি তুমি। এ তিনটের একটাও ত বুঝতে ভুল করছিনে। আর যে বললে, সকলের সামনে—সকলের মধ্যে তুমি, আমি—আর এ দুটো চেংড়া ত ফাও মাত্র। তবে অন্যায়টা কোথায় হল?"

সরোজ কহিল, "একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর! তুমি যে একাই একশ'। তোমার সামনে কোন কথা হলে তাইত সারা জগৎকে বলা হয়। ঢাকে কাটী দেওয়া যা, আর তোমাকে কিছু বলাও তাই। যাক্ ও কথা, যে কথা হচ্ছিল, তাই হোক।"

শশী কহিল, "তুমি যে মাঝে পড়ে আমাদের তর্কের মুণ্ডুপাত করলে। মণীশ, কি বলছিলে, বল। আমি থেই হারিয়ে ফেলেছি।"

মণীশ কহিল, "আমিও—"

জ্যোতি কহিল, "আর আমি—"

শশী কহিল, "অতএব তাড়াতাড়ি পেটে কিছু না দিলে আর বুদ্ধির গোড়ায় ধুনো এবং চায়ের বাষ্প না দিলে কিছুই হবে না।"

মণীশ ও জ্যোতি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে চলিয়া গেল। সরোজ সুকুমারীকে ডাকিয়া চা প্রস্তুত করিতে বলিয়া দিল; তারপর শশিভূষণকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কদিন থেকে সর্ব্বদাদাকে দেখছি নে কেন?"

শশী কহিল, "তুমি ক্রমাগত তাকে দাদা বল বলে সে রেগে চাকরিতে জবাব দিয়ে চলে গিয়েছে। সত্যি বলছি সরো, আর কেন? ঢের ত হল, এইবার ঠাণ্ডা হয়ে আমার এতদিনকার চেষ্টাটা সফল করে দাও।"

সরোজ কাতর কণ্ঠে বলিল, "শশি দা, দয়া কর, আমায় এ দায় থেকে মুক্তি দাও। সত্যি বলছি, তোমায় না সন্তুষ্ট করতে পেরে আমি অনুতাপে মরতে বসেছি। কিন্তু আমি পারছি না, আমি পারব না। সর্ব্বদাদাও তোমারই কথামত আমায় বিয়ে করে অভাগিনীর উপকার করতে চাচ্ছেন বটে, কিন্তু এ উপকার যে আমি চাইনে। তুমি এত বোঝো, এটুকু কেন বুঝছ না যে বিয়ে করবার হলে কোন্ দিন করে ফেলতুম। এই তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত যখন কেটে গেল, তখন আর কেন? আর কিসের জন্য? আমার মনের অবস্থা তুমি বুঝতে পারবে না। তোমাদের চোখ আছে, তোমরা এক রকম করে সব জিনিষ দেখ, আর আমাদের চোখ নেই, আমরা আর এক রকম করে দেখি। তবে এই বড় আশ্চর্য্য,

যে নিজে আজ পর্য্যন্ত অবিবাহিত থেকে অন্য স্ত্রীর উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করে থাকতে পারে, সে কেন বুঝতে পারে না যে—"

সরোজ বলিতে বলিতে থামিয়া গেল, লজ্জায় তাহার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। শশিভূষণ গম্ভীর মুখে বলিল, "যার আশায় বসে আছ, সে এখন বিবাহিত। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সে এখন সংসার গুছিয়ে তুলছে। তুমি যদি অন্তরে অন্তরে তাকে এমন ভাবে আকর্ষণ করতে থাক, তাহলে সে ধর্ম্মে মতি রেখে কি করে সংসারে চলবে? না সরোজ, এ তোমার অন্যায় হচ্চে--নিজের পক্ষে বটে, তার পক্ষেও বটে। সে যদি তোমায় ভুলতে চেষ্টা করে' প্রবৃত্তিকে দমন করে' স্নেহময়ী স্ত্রী নিয়ে সুখী হবার চেষ্টা করে, তাহলে তুমিই বা কেন একটা মোহে নিজেকে আবদ্ধ রাখবে? তুমি কেন—"

সরোজ কহিল, "না শশিদা, এ মোহ নয় —মোহ নয়—আমি তা পারব না। আমি অন্ধকারের জীব, এক মুহূর্ত্তের জন্য যে আলো এসেছিল, সে আলোকে ভুলতে আমি পারব না, তাকে অনাদর করতে পারব না। তাকে অপমান করে হতাদর করে তাড়িয়ে দিয়েছি, সেই স্মৃতি আমায় চিরদিন শত সহস্র বেত্রাঘাত করছে, তবু সেই স্মৃতিই আমার সম্বল। অন্ধকার জীবনের বিষয় আলোর জীব বুঝতে পারবে না। আমার কি নিয়ে দিন কাটে, তা তুমি কি করে বুঝবে—?"

সরোজ চলিয়া গেল। শশিভূষণ তাহার দাড়ির মধ্যে হাত চালাইতে চালাইতে মাথা নাড়িয়া আত্মগতভাবে বলিল, "সরোজ বোন, আমিও বুঝি।"

সুকুমারী চা লইয়া আসিলে শশিভূষণ বলিল, "সুকু মার আহ্নিক হয়েছে?"

সুকুমারী বলিল, "হয়েছে।"

শশিভূষণ তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "মা, আপনার বড় মেয়েটিকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করুন।"

চিন্ময়ী কহিলেন, "আমিও সেই কথা বলছিলুম, ওকে আজ। ওকে তুমি দুদিন ছুটী দাও।"

শশী কহিল, "দু'দিন কেন, চিরজীবনের জন্য ছুটী দিলুম। সর্ব্ব শিবরামপুর থেকে আসুক, আমি নতুন লোক দেখছি।"

চিন্ময়ী কহিলেন, "সে কি, সর্ব্বানন্দ এখানে নেই? তাই বাছা এ ক'দিন এখানে আসেনি, বটে? আহা, কার্ত্তিক কেমন আছে শশী?"

সরোজ নিকটেই ছিল। সে অন্যমনস্কের ভাণ করিয়া কি একটা কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। কিন্তু শশী তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, "সে সর্ব্বানন্দকে কি একটা চিঠি লিখেছে। তাই পেয়ে সে তখনই চলে গিয়েছে।"

চিন্ময়ী কহিলেন, "কি চিঠি তুমি দেখনি?"

শশী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "দেখেছি বটে, কিন্তু সে বিষয়ে কাওকে কিছু বলতে বারণ আছে।"

চিন্ময়ী কহিলেন, "কি এমন গোপন

কথা, শশি? কার্ত্তিকের কোন অমঙ্গল ঘটে নি ত?"

শশি কহিল, "ঠিক অমঙ্গল নয়, তবে সে বাঁদর নিজের অমঙ্গল ঘটাবার চেষ্টায় আছে। তাই সর্ব্বানন্দ তাকে সাবধান করতে গেছে। তবে এখনও ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই, আমরা যখন সময়ে খবর পেয়েছি, তখন সহজে কিছু ঘটতে দেব না। কিন্তু সবই ঈশ্বরের হাত।"

চিন্ময়ী রামায়ণ পড়িতেছিলেন, সেখানি মাথায় ঠেকাইয়া বন্ধ করিয়া বলিলেন, "যদি কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকে, আমাকেও বলতে পার, আমিও হয়তো কোন উপকার করতে পারি।"

শশী কহিল, "না মা, এ সব সামান্য ব্যাপারে আপনাকে কেন ব্যস্ত হতে হবে? আমরাই সব ঠিক করে নেব। সরোজ, আমি চললুম, তুমি কাল থেকে ছুটী ভোগ করতে সুরু কর।"

শশিভূষণ চলিয়া গেল; এবং সেই সঙ্গে সরোজের মনে অনেকখানি অশান্তি ও উৎকণ্ঠা জাগাইয়া দিয়া গেল। অমঙ্গল! তাঁহার অমঙ্গল! হায়, সে অন্ধ! সে নিরুপায়! কাহারও কোন উপকার সে করিতে পারে না!

৩

দেওয়ান দুর্গাশঙ্কর যখন পুত্রের অত্যধিক ধার্ম্মিকতায় প্রীত হইয়া সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া কাশী পালাইয়া গেলেন, তখন সহসা মণিশঙ্কর পরমহংস একদিনেই আপনার অবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল। সে তাহার গর্ভধারিণীর পরামর্শ-অনুসারে এবং মুহুর্মুহু যকৃত-ঘটিত ব্যাধির তাড়নে একদিন তাঁহার ভক্তসভায় বলিয়া বসিল, "জ্ঞানে ও কর্ম্মে মুক্তি নাই, ভক্তিতেই মুক্তি। সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।" ভক্তগণ সকলেই গুরুর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল, কারণ ভক্তিমার্গে পঞ্চমকারের অভাবই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়, অন্তত নব-গোস্বামী প্রভু মণিশঙ্করের আজকাল সেই পথ-অবলম্বন-ব্যতীত উপায়ান্তরও ছিল না। গলায় তুলসীর মালা, মস্তকে দীর্ঘ শিখা, এবং সর্ব্বোপরি চিতা-জাতীয় ব্যাঘ্রের ন্যায় অথবা ডেড্‌লেটার অফিসের চিঠির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে তিলকের ছাপ লাগাইয়া প্রভু পাদ গোস্বামী আজকাল তাহার স্বল্প-সংখ্যক অনুগত ভক্তগণের মধ্যে বসিয়া যে সমস্ত ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে, তাহাতে আমিষের কোনরূপ গন্ধ না থাকায় অবশিষ্ট ভক্তগণ যদিও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বটে, তথাপি মালপুয়া, ক্ষীর, ছানা, চিনি প্রভৃতি "মধ্বভাবে গুড়ং"এর নিতান্ত অভাব এখনও ঘটে নাই বলিয়া তাহারা এখনও নব বাবাজীকে ত্যাগ করিতে পারে নাই।

কিন্তু মণিশঙ্কর তাহার পূর্ব্ব আশ্রমে যে অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও ব্যাখ্যা-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল, বর্ত্তমান আশ্রমে তাহার সে শক্তি অটুট রহিয়াছে। পূর্ব্বাশ্রমে যেমন তন্ত্রাদির ব্যাখ্যায় নিজে অদ্ভুত উদ্ভাবনী-শক্তি দেখাইয়া সর্ব্বলোক নমস্য হইয়াছিল, বৈষ্ণব শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতে তাহার সেই শক্তি প্রকাশিত হইতেছে

[illegible] কি সাধারণের নিকট যে সমস্ত কথা [illegible]ই বৈষয়িক, সে সব কথার [illegible]ও সে ভক্তির গন্ধ পাইত এবং [illegible]র্ব্ব কৌশলে সেই সব কথার ভক্তি-[illegible]ক ব্যাখ্যা করিত।

একদিন তাঁহার কোন শিষ্য গুরুর উক্ত [illegible]ক্তির পরিচয় লইবার জন্য বলিল, "প্রভু, [illegible]ই শ্লোকটীর কি ভক্তিপক্ষে কোন ব্যাখ্যা [illegible]ত পারে?

কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে।
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে॥
কাঠায় কাঠায় গণ্ডা জান।
গণ্ডায় গণ্ডায় ধূল পরিমাণ॥"

বাবাজী শ্লোক শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে [illegible]াদ বচনে বলিল, "আহা, এ যে [illegible]ধুর!" শিষ্য অবাক হইয়া বলিল, [illegible]প্রভু, ব্যাখ্যা করে আমার হৃদয়কে শীতল [illegible]রুন।" প্রভু তৎক্ষণাৎ উক্ত শ্লোকের [illegible]ব্যাখ্যা করিল:—

"কুড়বা কুড়বা অর্থাৎ ক্রূর অক্রূর কুড়বা [illegible]জ্জে, অর্থাৎ সেই ক্রূর অক্রূর তিনি [illegible]ড়বাকে লইয়া যাইতেছেন। কুড়বা কি? [illegible] অর্থাৎ বেদ (প্রমাণ, যথা অন্নদামঙ্গলে [illegible]কথায় পঞ্চমুখ') অথবা কুটিল-হৃদয় [illegible]ষ; ড় কি না লাঙ্গলী বলরাম; (ড়লয়োর [illegible]তদ্ধাৎ) বা কিনা বায়ু অর্থাৎ ব্রজের [illegible]প্রাণ-বায়ু কুড়বাকে লইয়া যাইতেছেন [illegible]র্থে কৃষ্ণ-বলরামকে এবং সেই সঙ্গে [illegible]ব্রজের প্রাণ-বায়ুকে হরণ করিয়া লইয়া [illegible]াইতেছেন; ইহাই সঙ্কেতের দ্বারা সূচিত [illegible]ইতেছে। কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে [illegible]র্থাৎ কাঠের ন্যায় কঠিন-হৃদয় সেই অক্রূর কাঠায় কি না কাষ্ঠ-নির্ম্মিত রথে লিজ্জে লইতেছে। কাঠায় কাঠায় গণ্ডা জান অর্থাৎ সেই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত রথে একগণ্ডা অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, অক্রূর ও সারথি চারজন যাইতেছেন। আর গণ্ডায় গণ্ডায় ধূল পরিমাণ অর্থাৎ হতচেতনা কৃষ্ণগত-প্রাণা গোপিনীগণ গণ্ডায় গণ্ডায় ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন।"

অর্থ শুনিয়া শিষ্যগণ কাঁদিয়া আকুল হইল। সাধু মণিশঙ্কর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিল, এমন সময় নূতন জমিদার কার্ত্তিকচন্দ্র সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মণি, তোমার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা এখন রাখ। তোমার বাপকে ত এই শাস্ত্রের অস্ত্রেই তাড়ালে। কিন্তু তিনি পালাতে পালাতেও যে এক কামড় দিয়ে গিয়েছেন, তারই জ্বালায় ভেক নিয়েছ। এখন যদি নিজের মঙ্গল চাও ত আবার সংসার-ধর্ম্মে মন দিয়ে ভালমানুষের মত বিয়ে-থা কর। আমি তোমার বাপের কাজে তোমাকেই বাহাল করব মনস্থ করেছি।"

সাধুজীর মূর্চ্ছিতপ্রায় অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষু মুহূর্ত্তে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। আমতা-আমতা করিয়া সাধুজী বলিল, "আজ্ঞে—আমি ত বিষয় ত্যাগ করব, স্থির করেছি—কারণ—"

কার্ত্তিক কহিল, "কারণ তোমার সমস্ত বিষয়ই এখন তোমার পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের দেবোত্তর। বিষয়-বাসনা-ত্যাগের এর চাইতে গুরুতর কারণ থাকতেই পারে না, তুমি বুদ্ধিমানের মতই কাজ করেছ। কিন্তু যখন শ্বশুর-মশায় তাঁর বিষয় "জামাত্রোত্তর"

করেছেন, তখন তোমার মত নিষ্কাম দেবোত্তরজীবী অবিষয়ীকেই জামাইবাবুর বিশেষ প্রয়োজন। অতএব নির্ভয়ে ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞমুৎসৃজেৎ এই শাস্ত্র বাক্যানুসারে আমার দেওয়ানী খাসের প্রাজ্ঞ দেওয়ান মোহান্ত মহারাজ হতে পার। তোমার এতে মোহান্ত-গিরিরও অসুবিধা ঘটবে না, চাই-কি, জামাইবাবুও তোমার নিষ্কাম কর্ম্মের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারেন।"

মণি কহিল, "আজ্ঞে—"

কার্ত্তিক কহিল, "আজ্ঞে-টাজ্ঞে নয়—শোন, তোমার মা সেদিন আমাদের ওখানে গিয়ে অনেক কান্নাকাটি করছিলেন। তাঁর মতে তোমার পিতার দেওয়ানী কার্য্যে উত্তরাধিকার-সূত্রে তোমারই দখলি সত্ব জন্মেছে। তোমাকে উচ্ছেদ করা অসম্ভব। আমি তাঁর সঙ্গে আইনের তর্কে পরাস্ত হয়ে তোমার প্রাপ্য তোমায় ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছুক। তবে যদি তুমি পরম-বকই থাকতে চাও, সাধারণ মানুষের মত না হও, তা হলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যদি দেওয়ানী গ্রহণে ইচ্ছা থাকে, তাহলে দার-পরিগ্রহাদি সাধারণ জীবের জীবনের নিয়মগুলোও মেনে নাও।"

মণিশঙ্কর কোন কথা বলিল না; মাথা চুলকাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া কার্ত্তিক আবার বলিল, "তা হলে তুমি এ বিষয়ে যা ভাল বোঝো, একটা স্থির করে আমায় বলো, আমি এখন চল্‌লুম। "কার্ত্তিক চলিয়া গেলে মণিশঙ্কর আপনার বহির্বাস-কৌপীনাদির দিকে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল।

কার্ত্তিক তাহার পিতার টোলে গিয়া দেখিল, সর্ব্বানন্দ বসিয়া শিবচন্দ্র ন্যায়রত্নের সহিত কথা কহিতেছে। কার্ত্তিক বলিল, "আমি তোমায় আসতে লিখলুম, আ তুমি আমার কাছে না উঠে বাবার কা এলে যে।"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "তুমি আমায় আস দেখেও যখন কথা না কয়ে চলে গে তখন আর কি করে তোমার বাড়ী উঠি?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি যে কা যাচ্ছিলুম তাতে তুমি বাধা দিতে, তা তোমার সঙ্গে কথা বলবার আগেই তাড়াতা সে কাজ সেরে এলুম। তুমি যে চি পেয়েই রওনা হবে, তা জানতুম না নইলে আগেই সে কাজ সেরে রাখতুম।"

ন্যায়রত্ন কহিলেন, "কি কাজ, কার্ত্তিক?"

কার্ত্তিক কহিল, "আজ্ঞে, মণিশঙ্করকে তার বাপের কাজে বাহাল করলুম। সে সে কাজ নিতে স্বীকার হয়েছে।"

ন্যায়রত্ন কহিলেন, "মণিকে? কাজটা কিন্তু ভাল হল না।"

কার্ত্তিক কহিল, "ভাল-মন্দ ভগবানের হাতে। তার বাপ ঐ কাজে তাঁর সারা জীবন কাটিয়ে গেছেন, সরকারের যথেষ্ট উপকারও তিনি করে গেছেন। এখন তাঁর ছেলেকে ঐ কাজে বাহাল করে তাঁর উপকারের প্রত্যুপকার না করলে অকৃতজ্ঞের কাজ হবে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি তোমার এই যথেচ্ছাচারিত্বে বাধা দিতে এসেছি।"

ন্যায়রত্ন কহিলেন, "যথেচ্ছাচারিতা? সে কি সর্ব্ব?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "হাঁ, যথেচ্ছাচারিতাই ত। ও আমায় বারবার চিঠি দিয়েছে হয় আমি এসে ওর সমস্ত জমিদারীর নি, না হয়ত ও মণিশঙ্করকে এই জে লাগাবে। আমি আমার উপস্থিত জ ফেলে ওর অধীনে কাজ করতে ী হইনি, তাই ও আমার উপর রাগ র মণিকে বাহাল করতে চাইছে। কের চিঠিতে ও লিখেছে যে মণিকে াল করাই সাব্যস্ত। কি যে ওর মনে ছে, তা জানিনে, তবু ওকে এ কাজ তে নিষেধ করুন, না হলে—"

কার্ত্তিক কহিল, "নাহলে কি হবে, সর্ব্ব এ ত আমার পৈতৃক বিষয় নয়! স্বর্গীয় শ্বশুর মশায়ের উপকারী ভৃত্যের পকার করি, তাতে কি আমার খুবই রাধ হবে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "প্রত্যুপকার করতে ও, ত বসে বসে মাসিক কিছু বৃত্তি জন্যে বরাদ্দ করে দাও। তোমার য়ের ভার ওর হাতে তুমি দিতে পাবে । যার বাপ দেবোত্তর করে তার থেকে নিজের বিষয় রক্ষা করে ছেন, সেই লোককে কি করে তুমি াস করে দেওয়ানী দেবে?"

কার্ত্তিক কহিল, "অবিশ্বাসের কারণ ত নো কিছু ঘটেনি। কাজ হাতে পড়লে লেরই বুদ্ধি খুলে যায়। তার প্রমাণ দেখ, আমি। আমার ত কোন পুরুষে দারী ছিল না, তবু বিষয় হাতে য়ে কেমন চালাচ্ছি। মণি পাকা ষয়ীর সন্তান, ও ত বিষয়ী হয়েই জন্মেছে। ওর চেয়ে উপযুক্ত লোক পাব কোথায়?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "সর্ব্ব, আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে কলকেতা থেকে চলে এলে কেন? আমাকে লিখলেও ত' আমি এ-সব কথা কার্ত্তিককে বলতে পারতুম।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সব কথা আপনার সুমুখে বলা যায় না, খুড়ো-মশায়।"

কার্ত্তিক কহিল, "কেন বলা যাবে না? আমিই বলছি, আমি সর্ব্বদাদাকে আমার কাছে পাবার জন্য ওকে আমার সমস্ত এষ্টেটের দেওয়ানী নিতে অনুরোধ করে চিঠি লিখি। আমি ওর বিষ-দৃষ্টিতে পড়া অবধি কি উপায়ে ওকে আবার কাছে পাব, তাই ভাবছিলুম। দেওয়ানজী যখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে কাশী গেলেন, তখন একটা সুবিধে হল। কিন্তু এমনি আমার কপাল যে যাতে আমার এতটুকু সুবিধে হয়, তা সর্ব্ব-দা কখনই করবে না। তাই এখন এই উপায় অবলম্বন করেছি। মণির হাতে সব কাজের ভার দিলে বিষয় আমার নষ্ট হবার দিকেই যাবে, তখন যদি দয়া করে ও আমায় রক্ষা করতে আসে, এই আমার আশা।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার উপর আমার এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। তোমার চাকরি নেব যেদিন, সেদিন বুঝব যে, আমার বুদ্ধি লোপ হয়েছে।"

কার্ত্তিক কহিল, "তা জানি সর্ব্ব-দাদা। বামুনের ছেলে কুকুরের বৃত্তি গ্রহণ করতে

কখনই চাইবে না, বিশেষত আমার মত জামাই বাবুর অধীনে। যে শ্বশুরের নামে বিকুচ্ছে সে যে নিজেই কুকুর, কুকুরের অধীনে চাকরি কোন ভদ্র লোকের ছেলেরই নেওয়া উচিত নয়, তুমি ত ব্রাহ্মণ-সন্তান! আমি আগেই এ সব কথা জানতুম, তাই মণিকে দেওয়ান করবই ঠিক করেছিলুম। তোমায় ভয় দেখিয়ে যে একবার আনতে পেরেছি, এইটুকুই আমার লাভ। তুমি আমায় বাঁচাতে এসেছ, কিন্তু আমায় বাঁচাতে পারবে না। এখন কুকুরের অন্ন গ্রহণ করবার যদি ইচ্ছা থাকে ত এস। আর অতটা যদি দয়া করতে রাজী না হও, তবুও আমার জিত, কারণ তুমি আমাকে এখনও মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারনি, এটুকু আমি জানতে পারলুম।"

কার্ত্তিক হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, কিন্তু শিবচন্দ্র পুত্রের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া শিহরিয়া বলিলেন, "সর্ব্ব, কার্ত্তিক আমার এ কি হতে চলেছে? ওর মুখ দেখে ওর গর্ভধারিণী দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন। কালিকাবাবুর কথা রাখতে গিয়ে এ আমি কি করলুম?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিছু অন্যায় ক নি, খুড়োমশায়। সন্তান যদি পিতা-মা সদভিপ্রায় বুঝতে না পেরে মিছি নিজেকে নিজে নষ্ট করে ত তার জন্য দুঃখ করা উচিত নয়। কালিকাবাবুর শ্বশুর, শৈলজার মত স্ত্রী লাভ করেও মূর্খ আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করে, মঙ্গল কখনও নেই।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "বৌমা যে আ কতখানি গুণবতী, তা তুমি জান না, স এমন স্ত্রী লাভ করেও কার্ত্তিক অ হল!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সুখ-শান্তি যে চ না, দুঃখ-অশান্তিই যে চায়, তার ত করতে ভগবানও অক্ষম। যাক, খুড়োমশ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার দে একবিন্দু রক্ত থাকতে কার্ত্তিককে স নষ্ট হতে কখনই দেব না। তবে স ভগবানের হাত।"

শিবচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সর্ব্বান সঙ্গে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা

বর্ণভেদ

যেমন ধর্ম্মের মধ্যে, তেমনি বর্ণভেদ-প্রণালীর মধ্যেও, চাঞ্চল্য, প্রয়াস, ও ভাঙ্গা-গড়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

*
* *

প্রথমে আমরা আলোচনা করিব, য়ুরোপীয় প্রভাবের বাহিরে, ভারতীয় সমাজে

বিকাশেই এই প্রণালীটি কিরূপ ভাবে ড়িয়া উঠিয়াছে।

আমরা উহার মধ্যে চারিটি লক্ষণ খিতে পাই। যথা:—সংমিশ্রণ, রূপান্তর-হণ, মর্য্যাদা-সোপানের পরিবর্ত্তন, ও বিভাগে খণ্ড-বিভাগ।

(১)

সংমিশ্রণ (confusion)। এইগুলি র্ণভেদপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত, যথা:—

সামাজিক শ্রেণীসমূহ,
ব্যবসায়-সম্প্রদায় (Corporation),
গ্রাম্য-মণ্ডলী,
ধর্ম্ম-সম্প্রদায়,
দেশবাসী লোক ও বংশসমূহ,
যাযাবর অথবা বন্যজাতি।

এই বিভিন্ন উপাদানগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করায় সুবিধা আছে।

সংখ্যায় ১৪ লক্ষ—ব্রাহ্মণেরা, ২৭৪ মুখ্য জাতে বিভক্ত। নাম ছাড়া তাহাদের মধ্যে সাধারণত্ব আর কিছুই নাই।

মূলোৎপত্তি।—কেহ কেহ বাস্তবিকই পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ হইতে উৎপন্ন। আবার কেহ কেহ রাজার পদবী গ্রহণ করিয়াছে বা জোর-দখল করিয়াছে:—উহাদের মধ্যে অনেকেরই দেহে দ্রাবিড়ীয় শোণিত বহমান,, অথবা অনেকেই ভারতের নীচতম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

বাসভূমি।—হিন্দুস্থান ও পঞ্জাবের ব্রাহ্মণ-দিগের গর্ব্ব অতুলনীয়। এমন-কি নিম্নতর জাতের হিন্দুস্থানীরাও বাঙ্গালী ও মারাঠী ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা করে।

প্রাচীন আচার-ব্যবহারের প্রতি ভক্তি।—খুব উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা এখনো পর্য্যন্ত মনুর নিয়ম পালন করে, এমন-কি পূত অগ্নিকে রক্ষণ ও পোষণ করিয়া থাকে। আবুল-ফজল বলেন, নিকৃষ্ট পদবীর অন্য ব্রাহ্মণেরা,—বর্ব্বরের ন্যায়, ম্লেচ্ছের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

কর্ম্ম-ব্যবসায়।—আর্য্যশব্দার্থ-অনুসারে প্রধান যাজকের কর্ত্তব্যগুলি এইরূপ যথা:—উহাদের মধ্যে কেহ-কেহ নিজ বংশের প্রচলিত পূজা-অর্চ্চনায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়া থাকে। আবার কেহ-কেহ অন্যান্য জাতের, গ্রামের ও শাখাজাতির পৌরোহিত্য করে। এসিয়ার লোকদিগের কি-রকম পুরোহিত, তাহা বলি শোনো:—পতিত, অবজ্ঞাত—উহারা, শিব ও বিষ্ণুর মন্দিরে ঠাকুর-পূজার কাজ করিবার জন্য, নীচ জাতের লোকদিগের সঙ্গে মেলামেশা করে; অথচ, শাস্ত্র এই সকল কাজ করিতে উহাদিগকে নিষেধ করে। এইসব ব্রাহ্মণের মধ্যে কেহ-কেহ পূজা-অর্চ্চনায় ব্যাপৃত, কেহ-কেহ পৌরোহিত্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে; আবার কেহ-কেহ যাজক-বৃত্তি একেবারেই ত্যাগ করিয়াছে;—উহারা অন্য অ-পতিত ব্রাহ্মণের দ্বারা নিজ গৃহের পূজা-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে; আবার কতক-গুলি ব্রাহ্মণ, নিষিদ্ধ ব্যবসায়ে,—এমন-কি অতীব জঘন্য নীচ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। উহারা মাংস আহার করে; উহাদের কোন যাজকতার কাজ নাই; উহাদের প্রাচীন পদমর্য্যাদা শুধু উহাদের অধঃপতনকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

সম্মান লাভ।—চাষা-লোকেরা উচ্চশ্রেণীর

ব্রাহ্মণের পদতলে প্রণত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করে। এমন কতকগুলি অ-শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণও আছে যাহাদিগকে চাষারা তাহাদের গ্রামে প্রবেশ করিতে দেয় না (১)।

* *
*

ভারতবাসীর যে ১% অংশ লোক বাহিরে অবস্থিতি করে, সেই কৃষকজাতিই সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সামন্ততন্ত্র-প্রণালী উহাদিগকে দুই জাতে বিভক্ত করিয়াছে,—এক, অভিজাত-শ্রেণীর জাত; আর এক দাস-চাষা-শ্রেণীর জাত। আইনের দৃষ্টিতে, দাসত্ব রহিত হইয়াছে, কিন্তু পুরাতন শ্রেণীবিভাগটা কার্য্যত রহিয়া গিয়াছে।

অভিজাত শ্রেণীর জাত। প্রথম পংক্তিতে রাজপুতগণ (প্রধান ৮০ জাতের মধ্যে, এক কোটি রাজপুত সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে)। রাজপুতেরা অপনাদিগকে প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের বংশজ বলিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। উহার এক অংশ—ভারত-আক্রমণকারী শাখাজাতি সমূহ:—যথা,—শক, তুর্ক, আফগান, মোগল। অপর অংশ—সামন্ততন্ত্রগত অভিজাতবর্গ; ঐ সকল শাখা-জাতি রাজপুত নাম ধারণ করিয়াছে, অথবা রাজাদিগের নিকট হইতে ঐ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে (এখনো এই উভয় প্রণালী অনুসারেই রাজপুতেরা আভিজাত্য লাভ করিয়া থাকে)। অনেক বংশে বা পরিবারের মধ্যেও এইরূপ ঘটিতঃ যখন কোন বন্য লোক হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তখনই উহারা রাজপুত পদবী প্রাপ্ত হয়, ঐ শাখাটিও আবার এক নূতন জাতে—সাধারণত একটা নীচ জাতে পরিণত হয়। রাজপুতেরা ভৌমিক অভিজাতবর্গ; উহাদিগের রীতিনীতি, ও অন্ধসংস্কারাদি য়ুরোপীয় ভৌমিক অভিজাতবর্গকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

(১) Ibbetson নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি প্রদর্শন করেন। দিল্লির "ত্যাগ" বিভাগের ব্রাহ্মণেরা, উহাদের যাজক-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে (ত্যাগ দেনা); কারিগর "ধাতি"দের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ-সন্তান। দিল্লির "ধারুক্রা"রা—সেই-সব ব্রাহ্মণ যাহারা বিধবার বিবাহ বৈধ বলিয়া স্বীকার করে। "মহা" ব্রাহ্মনেরা অনেক গ্রামের চৌকাঠ মাড়াইতে পারে না; উহারা নিকটে আসিলে দেহ কলুষিত হয়।

M. Lyall রাজপুতদের সম্বন্ধে এইরূপ বলেন:—

"সমভূমি-প্রদেশের ন্যায়, পার্ব্বত্যভূমির লোকদের মধ্যেও বর্ণভেদপ্রণালী অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে। রাজা সম্মানের মূল-উৎস ছিলেন, অনেক সময়ে সম্মান লাভ তাঁহার ইচ্ছা ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিত। বৃদ্ধ লোকের মুখে শুনিয়াছি—এমন দৃষ্টান্ত আছে, যে স্থলে, কাজকর্ম্ম বা অর্থের বিনিময়ে, কোন রাজা একজন "গির্থ"কে "রথি"-পদবীতে, অথবা একজন "ঠাকুর"কে "রাজপুত" পদবীতে উন্নীত করিয়াছেন; এখনও, জায়গির্দ্দার রাজারা কোন দোষের দরুণ জাত্যন্তরিত লোকদিগকে জাতে তুলিয়া লইয়াছেন; এমন-কি ইহাই উহাদের একটা আয়ের পথ।"

Ibbetson আরো এই কথা বলেন যে, তরকারী উদ্ভিজ্জ রোপণ করার দরুণ হুসিয়ারপুরের "সংসার"-রাজপুতেরা পতিত হইয়াছে; কর্ণালের চৌহানেরা, রাজপুতেরা তন্তুবায়-বৃত্তি অবলম্বন করায়, "শেখ" হইয়া পড়িয়াছে... (Census of the panjab)

আদম-সুমারীতে প্রধান বলিয়া যে সকল জাতের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে ভোট-দিগের সংখ্যা—৬, ৬৪৪, ৭৩৩; গুজরদিগের সংখ্যা—২, ১৭১, ৬২৭; মারাঠাদিগের সংখ্যা—৩, ২২৪, ০৯৫; ভাবনদের সংখ্যা—১, ২২২, ৬৭৪; নাইরদিগের সংখ্যা—৯৮০, ৬৬০।

জাতিতত্ত্ববিৎদের মতে, জাটেরা শকদের বংশজ। পূর্ব্বকালে জাটশব্দে এক বংশ বুঝাইত; অধুনা এক কৃষকশ্রেণী বুঝায়; এই কৃষকশ্রেণী রাজপুত অপেক্ষা নিকৃষ্ট, কিন্তু দাস-চাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জাটেরা আমাদের "alieux"ভূম্যধিকারীদের অনুরূপ। গুজ্জরেরাও ঐরূপ; গুজ্জরদের হইতেই "গুজরাট" নামটা আসিয়াছে। এবং এই গুজ্জরেরা এক্ষণে উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মারাঠাজাতি গণতন্ত্র-প্রবণ, কিন্তু উহাদের মধ্যে জাতের সমস্ত সোপান-পরম্পরাই আছে। অধুনা মারাঠা নামে দাক্ষিণাত্যের অভিজাত শ্রেণী বুঝায়। যাহারা, না-অভিজাত শ্রেণীর লোক, না-মারাঠা,—তাহাদের মধ্যেও অনেকে ঐ নাম ধারণ করে।

বেহারের "বাব্বন"রা বিশুদ্ধ-শোণিত আর্য্যবংশীয় বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু কর-মণ্ডলের "নাইর"রা দ্রাবিড়ীয় জাতি হইতে উৎপন্ন এবং নাইর-রমণীদের মধ্যে বহুপতি-গ্রহণ প্রচলিত।

একদিকে যেমন কতকগুলি অভিজাত শ্রেণীর জাত, অপর দিকে তেমনি দাসত্ব-যুক্ত দাস-চাষার (Serf) জাত আছে। এই শ্রেণীর লোক, যথা:—"কুন্‌বি" বা "কুর্ম্মি" (১০, ৫৩১, ৩০০); উক্ত দুই নামে কৃষক বুঝায়; আবার কুর্ম্মি-শ্রেণী, বহু উপবিভাগে বিভক্ত; শুনা যায়, উহাদের ৫২ উপবিভাগ; কিন্তু সম্ভবত আরো বেশী। কতকগুলি জাত ধর্ম্মসম্প্রদায়-ভুক্ত, (যেমন "লিঙ্গায়ৎরা"), আর কতক-গুলি জাত ব্যবসায়-সঙ্ঘ-ভুক্ত, বিশেষ কোন গোত্রভুক্ত (clan), অথবা কোন শাখা-জাতিভুক্ত (tribe); যে গোত্র হইতে, যে গোষ্ঠী হইতে উৎপন্ন, সেই গোত্র বা গোষ্ঠী হইতে উহারা নাম পাইয়াছে। কৃষক-শ্রেণীর অনেকগুলি জাতের পদবী অপেক্ষাকৃত উচ্চ (উহারা নিজহাতে মাটি চষে না, উহারা লাঙ্গলী-চাষা নহে); আবার কতকগুলি জাত অস্পৃশ্য বলিয়া খ্যাত, যথা:—পূর্ব্ব-বাঙ্গলায় নমোশূদ্রেরা (১,৯৪৮, ০৫৮)।

*
* *

শাস্ত্র-প্রচারের যুগে যাদের তেমন মান ছিল না, সেই বণিকেরা (বেনিয়া, মহাজন অথবা বৈশ্য) (৩,১৮৬,৬৬৬) আজিকার দিনে সম্মানিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উহারা প্রাচীন প্রথাদির প্রতি খুব আসক্ত। উহারা উপবীত ধারণ করে, এবং আপনাদিগকে প্রাচীন বৈশ্যদিগের উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করে। উহাদের অসংখ্য জাত,—১৩টি প্রধান উপবিভাগে বিভক্ত। লিপিকর-জাত কায়স্থেরা (সংখ্যায় ২,২৩৯,৮১০) অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রভূত প্রভাব অর্জ্জন করিয়াছে।

কারিগর জাতের লোকেরা (২৮,৮৮২, ৫৫১) অধিকাংশই জাতিতত্ত্বঘটিত দল-

সমূহের অন্তর্ভূত; ইহারা কতকগুলি উপবিভাগে বা উপজাতে বিভক্ত। এই সকল উপজাতের নিয়ম ও অধিকারাদি, আমাদের প্রাচীন Corporation-সমূহকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

*
* *

গোটা হিন্দু সমাজটা যাহা লইয়া গঠিত সেই সকল জাতের নীচে,—বুনা, কাঠুরিয়া, শিকারী, ধীবর, দৈবজ্ঞ, কথক, কুস্তিগীর, নর্ত্তকী, বেশ্যা, চোর (২)—এই সকল শ্রেণী ধর্ত্তব্য।

২

উনবিংশ শতাব্দিতে বর্ণভেদ-প্রণালীর দ্বিতীয় লক্ষণটি আমরা লক্ষ্য করিয়াছি—বর্ণভেদের রূপান্তর-প্রাপ্তি বা আকার-গত পরিবর্ত্তন।

প্রাচীন ভারতে, আমাদের মনে হয়, বর্ণভেদপ্রণালী হিন্দুসমাজের বা পুরোহিত-সমাজের একটা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ছিল। ইহা হইতেই জাতের ধর্ম্মলক্ষণ; জাতের নিয়ম পালন না করা,—আর সমাজ হইতে স্বতঃবহিষ্কৃত হওয়া ও চির-নরক-ভোগের যোগ্যপাত্র হওয়া—একই কথা ছিল।

কালক্রমে, বর্ণভেদপ্রণালী উহার ধর্ম্ম-লক্ষণটা খোয়াইয়া ফেলিল। এমন-কি ভারতেও পুরোহিত-তন্ত্রটা ক্ষীণ হইয়া আসিল এবং সমাজ ধর্ম্মসমাজ হইতে পৌর-সমাজে পরিণত হইল। য়ুরোপীয়েরা এই ক্রম-বিকাশটা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। এসিয়িক ও য়ুরোপীয়, মুসলমান ও খৃষ্টান আধিপত্য হইতে ব্রাহ্মণেরা যে প্রভাব লাভ করিয়াছিল, সেই প্রভাব দেখিয়াই উহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। ভারত-আক্রমণকারী-দিগের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ হিন্দুদের পরস্পরের মধ্যে একটা নৈকট্য স্থাপিত হইয়াছিল; উত্তরাঞ্চলে, যখন উহাদের রাষ্ট্রীয় প্রধানেরা পরাভূত হয়, তখন উহাদের গুরু পুরোহিত-দিগকে অধিনায়কের ভার গ্রহণ করিবার জন্য উহারা অনুরোধ করে। তাছাড়া, পরাভূত, ও যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া, স্বকীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, উহারা সহিষ্ণুতাশ্রিত প্রতিরোধশক্তির আশ্রয় লইল:—উহারা নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস ও প্রাচীন প্রথাদিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল। এই জন্যই, যে-যে অঞ্চলে য়ুরোপীয় ও মুসলমানেরা অভিজাতবর্গকে বিনষ্ট করিয়াছে এবং যে-যে অঞ্চলে অভিজাতবর্গ স্বকীয় অধিকার বজায় রাখিয়াছে, সেই সেই অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের আর তেমন প্রভাব নাই। কোথাও উহারা রাজা-মহারাজাদিগের সামান্য ভৃত্য মাত্র, কোথাওবা উহারা উদ্ধত ও অত্যাচারী পুরোহিতরূপে অবস্থিত। তাই, ধর্ম্মসংক্রান্ত ঐতিহ্য-সমন্বিত হইলেও, বর্ণভেদপ্রণালীটা পৌরসমাজিক (civil) প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বন্য-জাতিদিগের মধ্যেও কতকগুলি জাত গড়িয়া উঠিয়াছে; তন্মধ্যে কতকগুলি হিন্দুসমাজ হইতে স্বতন্ত্র; এবং কতকগুলি হিন্দুসমাজের

(২) আদম সুমারীর সংখ্যা-তালিকায়, চোরের জাতগুলাকে, শীকারী, চাঁচ-বিনানীয়া, ভবঘুরে, ভিক্ষু এইরূপ বলা হইয়াছে; কিন্তু আসলে উহারাই চোরের জাত। পঞ্জাবের "মীনা" ও "হাণী"রাও এইরূপ (Ibbetson)

অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু উহারা নিজের গাছ-পাথর-পূজাপদ্ধতি ও প্রাচীন প্রথাদি বজায় রাখিয়াছে। এইরূপ, মুসলমান, শিখ ও হিন্দুদিগের মধ্যেও কতকগুলি জাত গড়িয়া উঠিয়াছে। পঞ্জাবে,—হিন্দু ও মুসলমান; শিখদের মধ্যে, কতকগুলি রাজপুতের জাত, জাঙ্গরের জাত, জাটের জাত রহিয়াছে; একজন হিন্দু রাজপুত, জাত না খোয়াইয়াও, মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে।

*
* *

জাতের মধ্যে ধর্ম্মপ্রভাব ক্ষীণ হইলেও, তাহার বিপরীতে অন্যান্য প্রভাবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যথা;—বাসস্থানের প্রভাব, বংশের প্রভাব, ব্যবসায়ের প্রভাব।

বাসস্থান।—বড় বড় শ্রেণী, যথা:—ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বেনিয়া, কায়স্থ ইত্যাদি কতকগুলি স্থানীয় জাতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল জাতের মধ্যে কোন প্রকার আদানপ্রদানের সম্বন্ধ নাই।

বংশ।—কতকগুলি জাত,—গোত্র ও শাখা-বংশ বই আর কিছুই নহে। অন্য অনেক জাতের ভিতর, তদন্তর্ভূত ব্যক্তিরা উৎপত্তির এক সাধারণ মূল-স্থান স্বীকার করিয়া থাকে। শোণিত-সম্পর্কে ও আচার-ব্যবহারে ভিন্ন হইলে, শুধু এক সাধারণ ব্যবসায়ের দরুণ উহাদের নৈকট্য প্রতিপন্ন হয় না।

ব্যবসায়।—কারিগর-শ্রেণীর ও বণিকশ্রেণীর সকল জাতই বিশেষ-বিশেষ ব্যবসায়সম্প্রদায়-রূপে (Guild) গড়িয়া উঠিয়াছে। উহাদের একচেটিয়া অধিকার খুব কড়াভাবে রক্ষিত হয়। কোন ব্যবসায়-সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে হইলে সেই ব্যবসায়ের সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া চাই। কোন এক সম্প্রদায়ের লোক স্বকীয় ব্যবসায় পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, ব্যবসায়ের হাতিয়ার বা যন্ত্রগুলিও পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। প্রত্যেক দলের এক-এক দল-পতি ও "পঞ্চায়ৎ" নামক নির্ব্বাচনমূলক সভা আছে (৩)। এই সকল সভা—খাটুনীর নির্দ্দিষ্ট কাল ও বেতন-সম্বন্ধে শ্রমজীবিদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া, এবং উহাদের নিয়োগকারীদিগের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে সকলপ্রকার প্রশ্নের সমাধান করিয়া, নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। উহাদের নিষ্পত্তির পর আর পুনর্বিচার নাই; কেহ ইহার বিরোধী হইলে, তাহার অর্থদণ্ড হয়, অথবা জাত হইতেও বহিষ্কৃত হইয়া স্বজাতের ব্যবসায়-অধিকার হইতে বিচ্যুত হয়।

কতকগুলি কঠোর নিয়মের দ্বারা জাতের অখণ্ডতা রক্ষিত হইয়া থাকে। স্বজাতের বাহিরে কেহ বিবাহ করিতে পারে না। স্বজাতের বাহিরের লোকের বাড়ীতে যাতায়াত কিংবা আহারাদি করা নিষিদ্ধ। তথাপি অনেক জাতের মধ্যে এরূপ একটা রফা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, যাহার দ্বারা বিবাহের অধিকার স্বীকৃত হয়।

অন্য কতকগুলি নিয়মের দ্বারা জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়। কোন কোন জাতের

(৩) প্রকৃত ভারতীয় ধরণের এইরূপ নির্ব্বাচিত সভা মাত্রেরই যে পাঁচ জন করিয়া সভ্য—"পঞ্চায়েৎ" এই নামে তাহা প্রকাশ পায়। কিন্তু আসলে সভ্য-সংখ্যার ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে।

লোক ছাড়া, অপর জাতের লোকের হাত হইতে খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করা যায় না। কোন অস্পৃশ্য ব্যক্তির ছায়া মাড়াইলেও, রাজপুত বা ব্রাহ্মণের খাদ্য অশুচি হয়।

তাছাড়া, অন্য কতকগুলি আচার ব্যবহার,—জাতের উচ্চ সামাজিক মর্য্যাদা প্রতিপন্ন করে। প্রথমেই ত বিধবাদিগকে পুনর্ব্বিবাহ করিতে নিষেধ করা হয়। তার পর, রমণীরা অন্তঃপুরে বদ্ধ হইয়া থাকিতে বাধ্য। কোন কোন জাতের ভিতর, কন্যামাত্রেরই, জাত্যংশে উচ্চতর পুরুষের সহিত বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

আর কতকগুলি অবশ্য-প্রতিপাল্য নিয়ম আছে—যাহার প্রকৃতিগত লক্ষণ বিশেষভাবে ধর্ম্মসম্বন্ধীয়। যথা—সমুদ্রযাত্রার নিষেধ, মদ্যমাংস আহারের নিষেধ, বিশেষতঃ গোমাংস আহারের নিষেধ।

যে কেহ জাতের নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহার হয় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, না সে, জাত হইতে বহিষ্কৃত হয়। অনেক সময় ব্রাহ্মণেরা দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করে এবং অনেকসময় দলপতির অধ্যক্ষতাধীনে পঞ্চায়েৎ এই দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করে। যে লোক জাতি হইতে বহিষ্কৃত হয়, তাহার এক প্রকার সামাজিক মৃত্যু ঘটিয়া থাকে; স্বজাতের লোকেরা তাহা হইতে বিমুখ হয়, অনেক সময় অন্য জাতের লোকেরাও বিমুখ হয়। কখন-কখন তাহার স্ত্রী ও সন্তানেরাও তাহাকে পরিত্যাগ করে (৪)।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪) আমি M. Senart-এর গ্রন্থ হইতে একটা অংশ উদ্ধৃত করিব ("ভারতের বর্ণভেদ" পৃ-৭৬) ঃ—"যে শ্রেণী ও যে অঞ্চলের লোক, তদনুসারে প্রধানেরা বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়; যথা—মিহতর, চৌধুরী, নায়ক, পটেল, পর্গনাইট, সর্দ্দার ইত্যাদি। সাধারণতঃ উহাদের কাজ কুলানুক্রমিক...প্রধানেরা কতকগুলি সম্মানের অধিকার ও কতকগুলি বৈষয়িক সুবিধা সম্ভোগ করে...নিজ নিজ বিভাগে, প্রধানেরা সমস্ত উৎসবের অধ্যক্ষতা করে...উহারা প্রাচীন ব্যক্তিদিগের এক সভার দ্বারা পরিবৃত হয়, সেই সভায় জাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকেন। এই সভাকে যে চিরস্থায়ী হইতেই হইবে এমন কোন কথা নাই;—অমুক অমুক বিশেষ কাজের উপলক্ষে এই সভা আহূত হইতে পারে... মনে হয় এই সভার নিষ্পত্তি প্রায়ই "কায়েম" হয় না। শেষ নিষ্পত্তি পঞ্চায়েৎ-এর দ্বারাই হইয়া থাকে।" ইংরেজ-আধিপত্যের পূর্ব্বে, এই সকল পঞ্চায়েৎ-সভা, মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে পারিত; কোন কোন জাতের মধ্যে, প্রধানদের এই অধিকার ছিল বলিয়া বোধ হয়। Senart (পৃ-৪৬)

বহিষ্করণের অনুষ্ঠানটা একটু গূঢ় অর্থসূচক ঃ—জাত্যন্তরিত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা একপ্রকার সামাজিক মৃত্যু। যদি জাত্যন্তরিত ব্যক্তি পুরুষ হয়, তাহা হইলে তাহার স্ত্রী ও সন্তানাদি বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না, এবং সেই হতভাগ্যের পরিত্যক্ত জাতের মধ্যে তাহাদের স্থান বজায় থাকে না। তাই কোম্পানীর আমলে, যখন কোম্পানী এই বিখ্যাত অধিকার সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতেন না, তখন কোন হিন্দু খৃষ্টান হইলে, সে জাত হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, স্ত্রীপুত্রাদি হইতেও বঞ্চিত হইত।

ছবির সাজসজ্জা

আজকাল বাঙ্গলা দেশে ছবির কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িয়াছে। ছবি না থাকিলে মাসিকপত্রের গ্রাহক হয় না, গল্পের বই বিক্রী হয় না, এমন কি কাব্য ও গীতাও আদর পায় না। চিত্রকলা খুব ভাল জিনিষ, তবে আমাদের দেশে আজকাল যে সকল ছবির ছড়াছড়ি, তাহাতে কলাবিদ্যার কোনও চর্চ্চা হইতেছে কি না,—ও হইলেও তাহা কি পরিমাণে, সে কথা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

আজকাল বইয়ের মধ্যে কাট্‌তি হয় শিশুপাঠ্য গ্রন্থ ও গল্পের বই। এগুলি সকলই আজকাল চিত্রযুক্ত হইয়া বাহির হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকেও সচিত্র করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বন করিয়াই সাধারণতঃ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচিত হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাস ও গল্পেরও আজকাল অসদ্ভাব নাই। মাসিকপত্রাদিতেও ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক যুগের চিত্র দেওয়া হইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের যে সকল উপন্যাসের ঘটনা ইতিহাসের সহিত সম্পর্কিত, সেগুলিরও সচিত্র সংস্করণ হইতেছে। আজ আমরা এই পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চিত্রগুলি সম্বন্ধেই দুই চারি কথা বলিব। দেখা যাক্, এই সকল চিত্র কিরূপভাবে অঙ্কিত হইতেছে। চিত্রশিল্পীগণ যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন কি না ও প্রকৃতপক্ষে বর্ষাগমে শিলীন্ধ্র-উদ্‌গমের ন্যায় এই অজস্র চিত্রের আবির্ভাবে বাঙ্গালীর চিত্রকলা কিয়ৎ-পরিমাণেও উন্নত হইতেছে কি না, এই আলোচনায় তাহাও বুঝা যাইবে।

যে সকল চিত্রকর কেবল প্রাকৃতিক দৃশ্য বা সম-সাময়িক নরনারী বা প্রাণী অঙ্কিত করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক চিত্রকরকে অধিকতর সাবধান ও পরিশ্রমী হইতে হইবে। সুন্দর নিসর্গদৃশ্য দেখিয়া তাহা পটে তুলিতে পারা যায়, যে নরনারী বা পশুপক্ষী আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি, হাবভাব, ও পোষাক-পরিচ্ছদ অঙ্কিত করাও বিশেষ কঠিন নয়। অবশ্য, যাহা আমরা দেখিতেছি অবিকল তাহাই অঙ্কন, চিত্রকলার চরম উদ্দেশ্য নহে। তাহা আলোক-চিত্র-গ্রহণকারীদের কার্য্য হইতে পারে, প্রকৃত চিত্রকলা এই অবিকল নকলের চেয়ে আরও বেশী-কিছু দিতে চায়। বিভিন্ন স্থলের সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া তাহার মধ্য হইতে কোনও চিত্রের উপযোগী করিতে ঐ সকল উপাদানে যে ছবিটি শিল্পী নূতন করিয়া কল্পনায় গঠিত করেন, তাহা আলোক-চিত্রের মত প্রকৃতির অনুকরণ নহে। এইরূপ সমসাময়িক মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া যে সুখ, দুঃখ, ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি মানসিক অবস্থাজাত বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিয়া কাল্পনিক কোনও ঘটনা চিত্রিত হয়, তাহাও অবিকল স্বভাবের

অনুকরণ নহে। কল্পনা ও নিসর্গের অনুকরণ, এই উভয়ের মিশ্রণেই শিল্পী নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অবশ্য, জগতে যেরূপ ঘটে তাহা দেখিয়াই শিল্পীর কল্পনা জাগ্রৎ হয়। এমন কি মাইকেল এঞ্জেলো খোদিত ঈশ্বরও বৃদ্ধ মানব দেহধারী ও ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টির চিত্রতেও মানব-মুখেরই ন্যায় ঈশ্বরের মুখে রেখা বিকাশ পাইয়াছে ও মানবের ন্যায় তর্জ্জনী সঞ্চালনে জগৎ সৃষ্ট হইতেছে।

ঐতিহাসিক চিত্রকরকে কিন্তু আরও কিছু করিতে হইবে। তিনি যে যুগের চিত্র অঙ্কিত করিতে যাইতেছেন, সেই যুগের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, গৃহ প্রভৃতির জ্ঞান থাকা তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক। মানবদেহ সকল যুগেই এবং সকল দেশেই প্রায় সমান হইলেও যুগগত ও দেশগত কিছু-না-কিছু বর্ণ-বৈষম্য বা গঠন-বৈলক্ষণ্য থাকে। ঐতিহাসিক চিত্রেও নিপুণভাবে এই বৈষম্য ও বৈলক্ষণ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহার পর যে যুগে তাঁহার চিত্রের ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন, সেই যুগের পোষাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, কেশ বাঁধিবার ধরণ, অস্ত্র-শস্ত্র, পাদুকা ও ছত্র প্রভৃতি অবিকল দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলটিকেও সেই যুগের অনুরূপ করিয়া অঙ্কিত করিতে হইবে। নহিলে বিশেষজ্ঞের চক্ষে যে তাঁহার চিত্র আস্বাভাবিক ও হাস্য-জনক হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

উদাহরণ না দিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে না; তাই পৌরাণিক ঘটনার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে কোন্ কোন্ দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত, তাহা সকলের-জানা একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছি।

ধরা যাক্, ভ্রমর কর্ত্তৃক শকুন্তলার পীড়ন অঙ্কিত করিতে হইবে। কালিদাস কল্পনায় এই চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন ও নিজ অভিজ্ঞান-শকুন্তলে এই চিত্রের খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত বর্ণণা করিয়া গিয়াছেন। কালিদাস যদি চিত্রকর হইতেন তাহা হইলে তিনি এই চিত্রখানিকে কিরূপে অঙ্কিত করিতেন তাহাই আমরা দেখিব।

চিত্রের Back-ground হইত স্রোতোবহা মালিনী নদী, তাহার সৈকতে হংসমিথুন নিষণ্ণ। দূরে হিমালয়, তাহার পাদমূলে হরিণ বসিয়া আছে। সম্মুখদিকে তপোবন। বৃক্ষের শাখায় আর্দ্র বল্কল শুষ্ক করিবার জন্য বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার তলে একটা হরিণী, হরিণের শৃঙ্গে নিজ বামনয়ন কণ্ডূয়ন করিতেছে। (১)

যদি কোনও আধুনিক চিত্রকর বৃহদাকারে এই চিত্রটি অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলে তপোবনের আরও কয়েকটি জিনিষও পূর্ব্বোদ্ধৃত বর্ণনার সঙ্গে

(১) "কার্য্যা সৈকতলীন হংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী
পাদান্তামভিতো নিষণ্ণহরিণাঃ গৌরীগুরোঃপাবনাঃ।
শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্ণির্ম্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ॥
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্॥ [৬ষ্ঠ অঙ্ক]

যোগ করিতে পারেন। এগুলিও কালিদাস-বর্ণিত। তিনি দেখাইতে পারেন, তপোবনের মধ্য দিয়া একটি পথ চলিয়া গিয়াছে। তাহার উপর দিয়া ঋষিগণ স্নানান্তে চলিয়া গিয়াছেন। এখনও তাঁহাদের আর্দ্র-বল্কলচ্যুত জলবিন্দুর চিহ্ন পথের উপর দেখা যাইতেছে। বৃক্ষগুলির তলে নীবাররাশি ছড়ান। বৃক্ষের কোটরে শুক-পক্ষীর নীড়। শুকমুখভ্রষ্ট হইয়া নীবার ধান্য-কণিকাগুলি বৃক্ষতলে পতিত হইয়াছে। দুই-চারিটি শিলাখণ্ড ইতস্তত পড়িয়া আছে। সেগুলি দ্বারা মুনিগণ ইঙ্গুদীফল চূর্ণ করিয়া তৈল বাহির করিয়া লইয়াছেন, রাত্রিতে ঐ তৈলে প্রদীপ জ্বলিবে। তৈললিপ্ত হওয়াতে শিলা-খণ্ডগুলি চিক্কণ। (২)

যে স্থলটিতে সকলে দাঁড়াইয়া, তাহা সমতল। (৩) একটি আম্র-বৃক্ষতলে শকুন্তলা দাঁড়াইয়া, জলসেক করাতে বৃক্ষের আলবালগুলি স্নিগ্ধ হইয়াছে। আম্রবৃক্ষ জড়াইয়া নব মালিকালতা উঠিয়াছে, শকুন্তলার শান্ত ও চকিত ভাব। ললাট ও কপোলে স্বেদ-বিন্দু দেখা দিয়াছে; কবরী শিথিল, তাহা হইতে দুই-একটি কুসুম ঝরিয়া পড়িয়াছে। রক্তোৎপলের ন্যায় প্রসারিত অঙ্গুলি দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া ভ্রমরের দিকে চকিত ভাবে তিনি চাহিয়া আছেন। (৪)

শকুন্তলার পরিধান বল্কল। একখানি কটিদেশে জড়িত, অপরখানি দ্বারা দেহের ঊর্দ্ধভাগ আবৃত। কর্ণে শিরীষকুসুমের অলঙ্কার, তাহার কেশর গণ্ড পর্য্যন্ত লম্বিত। বক্ষে শরচ্চন্দ্রের কিরণের ন্যায় ধবল মৃণালের হার। (৫)

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার বল্কল পরিধান। অনুসূয়া, প্রিয়ম্বদা ও শকুন্তলার তিনটি কলস। শকুন্তলার ঘটটি মাটিতে পড়িয়া আছে।

রাজার ধনু বা আভরণ নাই। বিনীত বেশে আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয় বলিয়া

(২) "নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদাঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ
বিশ্বাসোপসমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগ
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দ-রেখাঙ্কিতাঃ॥" [১ম অঙ্ক]

(৩) "খলই বিঅ মে দিট্ঠি নিণুণ্ণঅ পাদে সেন্থু।" [৬ষ্ঠ অঙ্ক]

(৪) "তক্কেমি জা এসা সিভিলকেসবন্ধুব্বন্তকুসুমেণ কেসগুণ উব্ভিন্নস্সেঅবিন্দুণাবঅণেণ বিসেসদো ওণরিআহিং বাহাহিং অবসেঅ-সিণিজ-তরুণপল্লবস্স চুঅপাঅবস্স পাসে..." [৬ষ্ঠ অঙ্ক]
"রওকুঅলঅপল্লঅ সোহিণা অগ্গহত্থেণ মুহং"

(৫) "ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী।" [১ম অঙ্ক]
"কৃতং ন কর্ণার্পিতবন্ধনং সখে
শিরীষমাসগুবিলম্বিকেশরম্।
ন বা শরচ্চন্দ্রমরীচি কোমলং
মৃণালসূত্রং রচিতং স্তনান্তরে॥" [৬ষ্ঠ অঙ্ক]

ধনু ও আভরণ সারথির হাতে দিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন। (৬)

এখন দেখা যাক্, বাঙ্গালী চিত্রকরের তুলিকায় কলিদাসের এই কল্পনাচিত্রখানি কিরূপভাবে ফুটিয়াছে।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় (ভাদ্র, ১৩২০) 'দৃষ্টি-বিভ্রম' নামে পূর্ব্ববর্ণিত চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা তিনজনেই এক একখানি সাড়ী পরিয়া আছে। সখীদের লাল কাপড়, শকুন্তলার সাদা কাপড়। চিত্রে যেভাবে শকুন্তলা ও সখীদের এক-একখানি সাড়ী পরান হইয়াছে, প্রাচীন যুগে ওরূপ ভাবে কেহ সাড়ী পরিত না। সেকালে রমণীগণ দুখানি বস্ত্রে দেহ আবৃত করিত,—দুখানি বল্কলের কথা কালিদাসও স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। যেখানি দেহের উর্দ্ধভাগ জড়াইয়া ছিল তাহা বক্ষের কাছে দৃঢ় করিয়া বাঁধা হইয়াছিল বলিয়া শকুন্তলা তাহা শিথিল করিয়া দিতে বলিয়াছিল। (৭) শুধু বল্কলের বেলায় নয়, শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা করিবার সময়ও ক্ষৌম বস্ত্রযুগল দ্বারা দেহ আবৃত করিয়াছিল। (৮) কালিদাস যে যুগে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' রচনা করিয়াছিলেন, এই যুগল বস্ত্র পরিধান সেই যুগের বিশেষত্ব ধরিলেও, প্রাচীনতা হিসাবে সাড়ী পরান অপেক্ষা ঐ যুগলবস্ত্র পরানই যে প্রাচীন চিত্রে অধিকতর উপযোগী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কালিদাস অপেক্ষা প্রাচীন ভারতে পরিচ্ছদের অভিজ্ঞতা বর্ত্তমান চিত্রকরের হইতেই পারে না, তাহা বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না।

এখন দুষ্মন্তের পরিচ্ছদটা কিরূপ দেখা যাক্। নাগরা জুতা, মোজা, হাফ্‌প্যা চাপকান, কোমর ও মাথায় পালক পাগড়ী। চাপকানের হাত আধকাটা, তা তলায় লাল রঙ্গের এক জামা দে যাইতেছে। রাজার কোমরে তরবা ঝুলিতেছে। তাহার খাপ লাল রংয়ে চাপকানের উপরে মুক্তার মালা চাপকানের কিনারায় জরির কাজ করা স্কন্ধদেশে জরির কাজ করা পান দে যাইতেছে। এই কি প্রাচীন ভারতে রাজবেশ?

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' দুষ্মন্তের পোষাকে বর্ণনা নাই বটে, কিন্তু প্রাচীন খোদিতমূর্ত্তি গ্রন্থাদি হইতে সেকালের রাজাদের পরিধা কি থাকিত তাহা জানা কঠিন নহে। কি যে পরিচ্ছদ চিত্রে দেওয়া হইয়াছে তা কি কোন অংশে প্রাচীন যুগের উপযোগী মুসলমান যুগে যে পাগড়ী ও চাপকা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার সহিত ইংরাজ ফ্যাসনের মোজা ও হাফ্‌প্যাণ্ট যোগ কর হইয়াছে। একটু দেশী ভাব দেখানর জ মুক্তার মালা গলায় দেওয়া হইয়াছে।

(৬) "বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম। ইদং তাবদ্ গৃহ্যতাম্। [সূতায় আভরণাদি ধনুশ্চোপনীয় অর্পয়তি।"] [১ম অঙ্ক]

(৭) "সহি অনসূএ, অদিপিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅংবদাএ নিঅন্তিদ ম্হি।" [১ম অঙ্ক]

(৮) "পরিহেস্থ সংপদং খোমজুঅলম্" [৪র্থ অঙ্ক]

চিত্রকর 'বিনীতবেশে তপোবনে প্রবেশ করিতে হয়' কালিদাসের এ কথা মানেন নাই। দুষ্মন্তের আভরণ ও তরবারি রাখিয়াছে। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত রাজোচিত আভরণাদি খুলিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি যে রাজা এ কথা গোপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু এ চিত্রের দুষ্মন্তকে দেখিলে কলকেও তাঁহাকে রাজা বলিয়া চিনাইয়া দিবে। যাক্ সে কথা। আমাদের বক্তব্য এই যে, এই কতক-হিন্দু, কতক-মুসলমানী, কতক-সাহেবী ঢংয়ের পোষাক চিত্রকর কি করিয়া দুষ্মন্তকে পরাইলেন? এই চিত্রকরের অঙ্কিত আর-একখানি চিত্র ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে জয়দেবের সমকালীন এক রাজার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। দুষ্মন্ত ও সেই রাজার পরিচ্ছদের কোনও প্রভেদ নাই। চিত্রকর বোধ হয় রাজা হইলেই একরকম পোষাক পরাইয়া থাকেন। তা সে মোগল বাদসাই হউক, দুষ্মন্তই হউক আর আমাদের দেশের আধুনিক খেতাবধারী রাজাই হউন, তাহাতে কিছুই আসে-যায় না।

আমাদের দেশে যাঁহারা মাসিকপত্র পাঠ করেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই এ-সকল দোষ ধরিবার শক্তি নাই। প্রাচীন যুগের রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির সহিত পরিচয়ও তাঁহাদের অল্প। তাই এ-সকল অদ্ভুত ছবি রং-চংয়ে করিয়া ছাপাইয়া দিলে তাঁহাদের তৃপ্তি বই অসন্তোষ জন্মে না। কিন্তু এই চিত্রের পিছনে একখানি মোটরকার ও রাজার হস্তে বন্দুক আঁকিলে যেমন হাস্যজনক হয়, বিশেষজ্ঞের চক্ষে রাজার এই পোষাকও তেমনি উপহাসের জিনিষ।

অবশ্য একটা কথা উঠিতে পারে যে, চিত্রকরকে তাহা হইলে প্রাচীন সাহিত্য ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ হইতে হইবে। আমরাও বলি, তাহা যথার্থ। বিলাতে চিত্রকরদের সহায়তার জন্য কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রাচীন যুগের নরনারীর পরিচ্ছদাদির সচিত্র বর্ণনা চিত্রসহ দেওয়া আছে। নাট্যশালার অভিনেতা বা চিত্রকর এই সকল গ্রন্থের সাহায্যে যে কোনও যুগের যে কোনও ব্যক্তি সাজিতে বা আঁকিতে পারেন। আমাদের দেশে এ শ্রেণীর গ্রন্থ নাই তাহা স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া চিত্রকরগণ যে যাহা ইচ্ছা আঁকিয়া দিবেন তাহাও সঙ্গত নহে। যাঁহাদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহারা সমসাময়িক যুগের নরনারী বা ঘটনার চিত্র অঙ্কিত করুন, প্রাকৃতিক দৃশ্য বা পশু-পক্ষী অঙ্কিত করুন, ঐতিহাসিক বা প্রাচীন যুগের চিত্রাঙ্কণে তাঁহাদের পক্ষে অগ্রসর না হওয়াই মঙ্গল।

এখন ঐ চিত্রখানির ভাবভঙ্গী ও মূর্ত্তিগুলিকে সাজানর বিষয় কিছু বলি। কালিদাসের নাটকে আছে, নবমালিকায় সলিল সিঞ্চন করিলে একটি ভ্রমর উড়িয়া শকুন্তলার মুখের দিকে ধাবিত হয়। (৯) শকুন্তলা মুখের উপর হাত দিয়া চকিতভাবে দাঁড়াইলেন। (১০) আমাদের আলোচ্য চিত্রে

(৯) "অম্মো সলিলসেঅ-সংভমুগ্‌গদোণোমালিঅং উজ্‌ঝিঅ বঅণং মে মহুঅরো অহিবট্টই।" [১ম অঙ্ক]

(১০) "অগ্‌গহত্থেণ মুহং ওবারিঅ।" [৬ষ্ঠ অঙ্ক]

এ ভঙ্গীটি ধরা হয় নাই। চিত্রে শকুন্তলার এক হাত প্রায় ললাটের নিকট ও অপর হস্তে কলম। যদি এইমাত্র ভ্রমর উড়িয়াছে এমনধারাই হয় (কলমের ভঙ্গী দেখিয়া তাহাই বোধ হইতেছে), তাহা হইলে শকুন্তলা যে নবমালিকায় সলিলসেক করিতেছিল তাহার সম্মুখেই সে দাঁড়াইয়া থাকিবে; আলোচ্য চিত্রে চূতবেষ্টনকারী 'বনজ্যোৎস্না' নামক নবমালিকা দেখিতে পাই না। শকুন্তলার নিকটেও চূতবৃক্ষ বা ঐ লতা নাই।

আভরণের মধ্যে কালিদাসবর্ণিত মৃণালের হার বা শিরীষকুসুমের কর্ণাভরণ আলোচ্য চিত্রে অঙ্কিত হয় নাই। তাহার পরিবর্ত্তে চিত্রকর শকুন্তলা ও সখীদের হাতে ফুলের বালা ও খোঁপায় ফুলের মালা দিয়া সাজাইয়াছেন। কালিদাসের 'শিথিল কেশ-পাশে'র কিছুমাত্র লক্ষণ শকুন্তলার আঁটা খোঁপায় দেখা যাইতেছে না।

চিত্রটির তলে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে:—

"যতো যতঃ ষট্চরণোঽহ ভিবর্ত্ততে
ততস্ততঃ প্রেরিতবামলোচনা।
বিবর্ত্তিতভ্রূরিয়মদ্য শিক্ষতে
ভয়াদকামাপি হি দৃষ্টিবিভ্রমম্॥"

অর্থাৎ 'যেখানে যেখানে মধুকর যাইতেছে, সেইখানেই শকুন্তলা দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। অদ্য এই দৃষ্টিক্ষেপজনিত ভ্রূবিক্ষেপে শকুন্তলার কটাক্ষপাত শিক্ষা হইতেছে!"

এই শ্লোকের শেষ শব্দটি লইয়া চিত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে 'দৃষ্টিবিভ্রম।' চিত্রকর যে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' বর্ণিত চিত্রটি আঁকিতে যত্ন করিয়াছেন, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছে তাহা এক মুহূর্ত্তের অবস্থা বর্ণনা করিতেছে না; কয়েক মুহূর্ত্তের অবস্থা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই হিসাবে নামকরণটিও বিশেষ সমীচীন হইয়াছে মনে করি না।

কেবল চিত্রকলার দিক দিয়া দেখিতে গেলে আর-একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। কোন মূর্ত্তির পরিচ্ছদ অঙ্কিত করিতে হইলে কেবল পোষাকটি আঁকিলে শিখিলেই চলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে দেহের গঠনটিও পরিচ্ছদের নিম্ন দিয়া ফুটাইতে হইবে; কারণ যেরূপ পরিচ্ছদই হউক না, দেহের গঠন-অনুসারে তাহার বিশেষ ভাঁজ হইবে। কেবল একটা পোষাক আঁকিয়া তাহাতে ভাঁজ আঁকিয়া দিলে দেহের ভঙ্গী বুঝায় না। শকুন্তলার নিকটেই যে সখী অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার সাড়ীর নিম্নদেশের ভাঁজ যে কতদূর অসঙ্গত, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

আমরা এই একটিমাত্র চিত্র বিশদরূপে সমালোচনা করিয়া দেখাইলাম যে, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চিত্রকরকে অতিমাত্র সাবধানতার সহিত নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত চিত্রটি আঁকিবার জন্য সমস্ত উপাদান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' বর্ণিত থাকা স্বত্বেও চিত্রকর তাহার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। অথচ তিনি কালিদাসের নাটকেরই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া নাটকে প্রযুক্ত একটি শব্দে চিত্রের নামকরণ করিয়াছেন ও 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র কাল্পনিক চিত্রটিই পটে আঁকিয়াছেন বলিয়া

জানাইয়াছেন। যেখানে উপাদানের এত প্রাচুর্য্য, সেখানেই এত গলদ্, আর যেখানে সে সুবিধা নাই, সেখানে চিত্রকরের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহাও 'কণ্বমুনির আশ্রমে দুষ্মন্ত' নামে একখানি চিত্র আঁকিয়াছেন। (মানসী, বৈশাখ, ১৩১৮) তাহাতে শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার পরিধানে লাল সাড়ী, রাজার পরিধানে নাগরা, পায়জামা, চাপকান ও পাগড়ী। চাপকানের উপর মুক্তার মালা। কটিদেশে তরবারি। 'ভারতবর্ষে'র চিত্রে রাজার পোষাকের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছি, এই চিত্রের রাজার পোষাক-সম্বন্ধেও অবিকল তাহাই প্রযুক্ত হইতে পারে। এই মুসলমানী আমলের পোষাক আমাদের চক্ষে অতি বিসদৃশ ঠেকে।

ভবানীবাবু চিত্রে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'-বর্ণিত অবস্থা অঙ্কিত করেন নাই। ভবানীবাবুর চিত্রে দেখি, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা কলস হস্তে দাঁড়াইয়া, শকুন্তলা আনতমুখী। রাজা যেন সর্ব্বপ্রথম আত্ম-প্রকাশ করিলেন, এই ভাব। যেস্থলে ইঁহারা দাঁড়াইয়া, সেখানে লতা বা বৃক্ষ নাই। হঠাৎ জলসেচন করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, এ ভাব হইলে সম্মুখে বৃক্ষ বা লতা বর্ত্তমান থাকিলেই যুক্তিযুক্ত হইত। প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়ার কলস-ধারণের ভঙ্গী দেখিয়া কিন্তু মনে হয় যে, রাজা যেন হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা সবেমাত্র জলসেচনে নিবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু সামনে যে-প্রকারে অনেকটা ফাঁকা জায়গা অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে এই ভঙ্গীটি ঠিক খাপ খাইতেছে না। দুষ্মন্তও যে হঠাৎ কোন আবরণের অন্তরাল হইতে বাহির হইলেন, তাহাও মনে হয় না। নিকটে বৃক্ষাদি অঙ্কিত না হওয়াতে এ সম্ভাবনাও মনে উঠে না।

পায়জামা, চাপকান পরা প্রাচীন রাজার চিত্র ভবানীবাবু আরও আঁকিয়াছেন। 'দশরথ ও কৈকেয়ী' চিত্রে (মানসী, ফাল্গুন, ১৩১৮) তিনি কোমরে ছোরা-গোঁজা, সাদা চাপকান-পরা দশরথ আঁকিয়াছেন।

আমরা এমন কথা বলি না যে, কোন গ্রন্থ-উল্লিখিত অবিকল বর্ণনা নকল না করিলে চিত্র হইবে না। চিত্রকর গ্রন্থে অবর্ণিত অবস্থা-বিশেষ কল্পনা করিয়া নিজ প্রতিভার নিদর্শন দেখাইতে পারেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু যখন চিত্রকর কোনও বিশেষ ঘটনার বা কোনও কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থলের উল্লেখ করিয়া চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, তখন তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতার পথ রুদ্ধ হয়। সেই হেতু উপরোক্ত চিত্রগুলি দোষযুক্ত হইয়াছে।

আরও একটা কথা। কাল্পনিক অবস্থা চিত্রিত করিলেও তাহা সম্ভবপর হওয়া দরকার। দশরথ বা দুষ্মন্তের হাফ্‌প্যাণ্ট বা চাপকান আঁকিলে চলিবে না। ঐতিহাসিক চিত্রে এ ত্রুটি অমার্জ্জনীয়। 'বুদ্ধের বৈরাগ্য' নামে একখানি চিত্র ১৩২০ সালের চৈত্রের 'মানসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে পর্ব্বতশিখরের উপর বুদ্ধ ও সারথি দণ্ডায়মান। এই চিত্র যদি সারথির নিকট রত্নালঙ্কারাদি অর্পণ করিয়া বুদ্ধের

প্রস্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার আলেখ্য হয়, তাহা হইলে কোন কিংবদন্তী বা ইতিহাস-বর্ণিত অবস্থার সহিত ইহার মিল হয় না। দক্ষ শিল্পীর হাতে অঙ্কিত হইলে সাধারণ পথে অবস্থান কল্পিত হইলেও পর্ব্বতস্থলী অপেক্ষা কিছু কম হৃদয়গ্রাহী হইত না। সারথি যখন নিকটে, তখন আস্ব বা রথ পরিত্যাগ করিয়াই বুদ্ধ আসিয়াছেন। পর্ব্বতে তাহার সম্ভাবনা নাই। বুদ্ধের জন্ম-স্থান ও প্রথম জীবনের যে ইতিহাস আমরা পাইয়াছি তাহাতে পর্ব্বত-শৃঙ্গারোহণ কোথাও নাই। কাল্পনিক অবস্থা চিত্রিত করিলে যদি চিত্রের কোনও নূতন সৌন্দর্য্য বিকাশ পায় তাহা হইলে সে অবস্থা আমরা স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলেও একটা সম্ভব-অসম্ভবের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 'চৈতক'-পৃষ্ঠে প্রতাপসিংহের সমুদ্র-সন্তরণ ত আর চিত্রিত হইতে পারে না।

সুতরাং, ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক চিত্রকরগণের কল্পনার গতি সীমাবদ্ধ। বিশেষ যুগের গৃহাদি, পোষাক-পরিচ্ছদ, বিশেষ স্থান প্রভৃতির মধ্যেই তাঁহাদিগকে কল্পনার বিকাশ দেখাইতে হইবে। অবিরাম কল্পনার প্রসার হইতেই পারে না। আমরা দুই-একটিমাত্র উদাহরণ দিয়াছি বটে, কিন্তু যে-কোনও পাঠক আধুনিক ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক চিত্রগুলি দেখিলেই এই হিসাবে তাহাদের বহু দোষ ও অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাইবেন।

এই দোষ দূর করিতে হইলে প্রথম আমাদেরই সতর্ক হইতে হইবে। ছবি রং-চংয়ে হইলেই বাহবা দিলে চলিবে না, কলাবিদ্যার দিক হইতে তাহার সমালোচনা করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, সেরূপ উপযুক্ত সমালোচক বাঙ্গলায় অল্পই আছেন। যাঁহারা আছেন তাঁহারা এদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না। আমরা এই প্রবন্ধে যে সমালোচনা করিলাম তাহা কলাবিদ্যার দিক দিয়া নহে। যে-সকল দোষ-ত্রুটি, কলাবিদ্যায় অনভিজ্ঞ সাধারণ পাঠকেও সহজে ধরিতে পারেন, সেইগুলি মাত্র দেখাইলাম। বড়ই আক্ষেপের কথা, এই ত্রুটিগুলি পর্য্যন্ত আধুনিক চিত্রকরগণের চক্ষে পড়ে না। সাধারণের কঠোর সমালোচনা ব্যতীত এ দোষ দূর হইবার অন্য উপায় নাই।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

লেখার কথা

এদেশে একদল নূতন লিখিয়ে উঠিয়াছেন, যাঁরা লেখাকে আর্ট বলিয়া মানেন না, বা মানিতে চান না।

এঁরা যে সুধুই আর্টের সঙ্গে লেখার সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছেন, তা নয়;—আরও বেশীদূর আগাইয়া গিয়াছেন। অনেক লেখক আছেন, যাঁরা নিজেদের যুক্তির ভিতরে ফাঁক দেখিলে, সেই ফাঁক ভরাট করিবার জন্য গুটিকত বড় বড় লিখিয়ের নাম ও মত বসাইয়া দেন। তাঁদের নামের

ারেই অনেক সময়ে এঁরা তরিয়া যান। ই নূতন দলের লেখকরাও ঠিক তাই রিতেছেন। কিছুদিন হইল, এ-দলের এক খক মত জাহির করিয়াছিলেন, টলষ্টয় ডোষ্টোএভ্স্কি প্রমুখ রুশ-লেখকেরা াকি ভাষাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবলই াব লইয়া কারবার করিতেন! ভাষাকে াটিয়া ভাবের আভাস দেওয়া কেমন? া, শূন্যে ক্ষেত বানাইয়া তাতে ফসলের াগান করা!

আর, টলষ্টয় প্রভৃতি লেখকের যে াষার দিকে দৃষ্টি ছিল না, তার প্রমাণ ? তাঁদের নিজেদের লেখায় এর কোন মাণ নাই। অনুবাদ পড়িয়াই যতটুকু ঝিয়াছি, তাতে বেশ জানা যায়, টলষ্টয় মুখ রুশ-লেখকদের ভাষায় যাচ্ছেতাই ী, বেসুরো ঝঙ্কার ও বেতালা ছন্দের াত্যন্ত অভাব।

শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন:—"সাহিত্যে এখন রচনাকৌশল, াক্যবিন্যাস, অলঙ্কারের চরম হইয়াছে। াহিত্যে কেন রূপের সমাদর থাকিবে? াহিত্যে এখন ভাবের আদর বাড়াইতে ইবে।"

জগতের কোন সাহিত্যে কেহই কোনদিন জোরগলায় এ-কথা বলিতে পারিবেন না যে,—"সাহিত্যে এখন রচনা-কৌশল, বাক্যবিন্যাস, অলঙ্কারের চরম হইয়াছে।" কারণ, যার ভবিষ্যৎ আছে তার চরম কোথায়? যে সাহিত্য এ-কথা বলিবে, নিশ্চয় বুঝিব, তার মরণ আসন্ন। কেননা, অভিধানে লেখে চরম কথার অর্থ, অন্তিমকাল। সাহিত্য জিনিষটা যেমন কতকগুলা চাকচিক্যময় বাক্যের সমষ্টি নয়, তেমনি সেটা সুধু ভাবের ধোঁয়াও নয়। রচনা-কৌশল, অলঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা গঠিত ও সজ্জিত সাহিত্যের দেহটাকে চিতার আগুনে পোড়াইয়া, তার উচ্ছৃঙ্খল প্রেতের উদ্দাম নৃত্য-শব্দে কি সাহিত্য মুখরিত করিতে হইবে? ভাষার 'রচনা-কৌশল' কিম্বা 'অলঙ্কার' ত একটা খাপছাড়া জিনিষ নহে—ভাষার ভার-বৃদ্ধি করিবার জন্য ত তাদের সৃষ্টি নয়—ভাবকে প্রস্ফুটিত করাই তাদের কাজ। ভাব যেখানে গভীর বা গম্ভীর, তরল বা সরল, সেখানে তার উপযোগী যে প্রকাশ-নৈপুণ্য তাহাই রচনা-কৌশল। অবশ্য, অলঙ্কার প্রভৃতির যে অপব্যবহার হয় না, তাহা নহে। কিন্তু তার জন্য অলঙ্কারের দোষ নাই—দোষ অপব্যবহারের।

এটাত জানা কথা যে, একই ভাব যুগে যুগে নানারূপ ধরিয়া দেখা দিতেছে। নব নব রূপে সে মানুষের মন ভুলাইতেছে। তাইত সাহিত্যে এত বৈচিত্র, এত নিত্য-নূতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নব নব রূপ, নব নব রসের সৃষ্টি করে বলিয়াইত সাহিত্য এত রসালো। সেইজন্য দেখা যায়, যুগে যুগে সাহিত্যের 'রচনা-কৌশল' নূতনতর, 'বাক্য-বিন্যাস' নূতনতর, 'অলঙ্কার' নূতনতর। সাহিত্যের এ ধারা নদীর ধারার মত চিরদিনই নূতন জলের যোগান্ পায়; নূতন জল যেদিন থেকে বন্ধ হয়, নদীর ধারাও সেদিন থেকেই রুদ্ধ হইয়া যায়। "রচনা-কৌশল, বাক্যবিন্যাস অলঙ্কারে" যেদিন আর নবীনতা থাকিবে না—এক ধরা-বাঁধা

পুরানো রীতিই যেদিন হইতে তাহাদের ভিতরে মাথা চাগাইয়া থাকিবে, বদ্ধ নদীর মত সাহিত্যও সেই দিন হইতে শুকাইয়া যাইতে সুরু করিবে। এর প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যেই দেখুন না কেন,—হাতে পাঁজী মঙ্গলবার!

"সাহিত্যে কেন রূপের সমাদর থাকিবে?" এ প্রশ্ন শুনিয়া মনে হয়, আমাদের গ্রাজুয়েট্ লেখকদের মাথায় একজামিনে পাশ হইবার বুদ্ধি যতটা বেশী, সহজ-বুদ্ধির পরিমাণ ঠিক ততটাই অল্প! সাহিত্য যে জীবনের অনুচর, —জীবন আগে-আগে যে পথে চলে, তার পাছে-পাছে সাহিত্যও চলে সেই পথেই। সুতরাং জীবনে যা দেখি, সাহিত্যেও তা দেখিব না কেন? যার রূপ নাই তার আকর্ষণ কোথায়? রূপ আমাদের মনকে টানে, সেই টানে আমরা গুণ বুঝিবার সুবিধা পাই। নির্গুণ রূপ ভাল নয় বটে, কিন্তু কুরূপ গুণও অনেক-সময়ে অকেজো হইয়া পড়িয়া থাকে। অত কথার দরকার কি,—জগতে প্রথমশ্রেণীর ভাল লেখক ক-জন এমন জন্মিয়াছেন,—যাঁহাদের ভাষা রূপবতী নয়?

"সাহিত্যে এখন ভাবের আদর বাড়াইতে হইবে।"—বেশ কথা, আমরাও তাই বলি। ভাব যে সাহিত্যের সর্ব্বস্ব, কে তা না মানে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যিনি 'রচনা-কৌশল' জানেন না, 'বাক্যবিন্যাসে' অপারগ, কোন্ যাদুমন্ত্রে তিনি ভাবের বিচিত্র বিকাশ দেখাইবেন? শিশু যতদিন-না 'বাক্যবিন্যাস' করিতে শিখে, ততদিন কি সে একটা-খুব সামান্য মনের ভাবও প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে? 'বাক্যবিন্যাসে'র অভাবে শিশু যে তার ক্ষুদ্র মনের সামান্য ভাবও প্রকাশ করিতে অক্ষম, সাহিত্য তখন কি-করিয়া অসীম প্রতিভাধরের হৃদ্‌গুপ্ত, সাধারণ বুদ্ধির অগম্য, ভাবের লীলাকমল বিকশিত করিয়া তুলিবে?

গানে যেমন স্বরগ্রাম-সাধনা, ছবিতে যেমন 'ড্রয়িং'-শেখা দরকার, সাহিত্যে তেমনি রচনাকৌশল ও বাক্যবিন্যাসের প্রণালী আয়ত্ত করিতে হয়। সুতরাং যে-সকল মূর্খ-পণ্ডিত চীৎকার করিয়া বলেন, 'আমরা লিখ্‌ছি ভাবের জন্যে, আমাদের লেখায় তোমরা ভাষা দেখো-না' —সাহিত্যসমাজে তাঁহাদের স্থান নাই, তাঁহাদের স্থান পাগলা-গারদে। কারণ সেটার মত আবোল-তাবোল বকিবার নিরাপদ জায়গা আর নাই।

লেখাকে আর্ট বলিয়া না-মানার দরুণ বাঙ্গলাসাহিত্যে আজ আস্তাকুড়ের জঞ্জাল ক্রমেই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। এত যে ভাবের অভাব, এত যে আবোল-তাবোল বকা, এত যে পুনরুক্তি ও যথেচ্ছাচার,—এ-সকলেরই মূলীভূত কারণ হচ্ছে, লেখার কায়দা না জানা। বেশীর ভাগ লেখক এখানে সখের লেখক,—সাধনা না করিয়াই তাঁহারা সাধক হইতে চান। রচনাকৌশলের অভাবে তাঁহাদের লেখায় কোন নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গী থাকে না; বাক্যবিন্যাস করিতে জানেন-না,—তাঁহাদের ভাষায় তাই সংযমের নিয়ম, শক্তি ও স্ফূর্ত্তি থাকে না; সৌন্দর্য্যের বোধ নাই,—তাঁহাদের রচনায় তাই ধ্বনির গুরু-ভেদ, ছন্দের মাধুরী ও সুরের ঝঙ্কার

...কে না। যাঁহাদের এ-সব জ্ঞান নাই, ...হারা কি-করিয়া বুঝিবেন, কোথায় কিরূপ ...-সন্নিবেশ করিলে পাঠকের মনে কি-...ম ভাবের সঞ্চার হয়! মনের ভাবকে ...যুক্ত আকার দেওয়াই সাহিত্যের আসল ...জ। সব জিনিষের মত ভাবেরও একটা ...মবিকাশ আছে। অসঙ্গত শব্দে, ...নরুক্তিতে ও বিশৃঙ্খলতায় লেখায় কখনও ...াবের মূর্ত্তিও ফুটে না, ভাবের ক্রমবিকাশও ...র না। ভাষা খেলে ঠিক ওস্তাদের হাতে ...ণার মত! তোমার অপটু অঙ্গুলিপ্রহারে ...ণা সুধু এলমেল আর্ত্তনাদ করিবে, আর ...স্তাদের হাতে পড়িলে সেই বীণাই হাসিবে-...সাইবে, কাঁদিবে-কাঁদাইবে: কারণ, তিনি ...নেন যে, কখন্ কোন্-কোন্ তারে ঘা ...রিলে বীণায় বাজিয়া উঠিবে আনন্দের ...ভরবী বা বিষাদের বেহাগ!

আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের আসরে ...মন দু-চারজন লেখকের দেখা পাইয়াছি, ...াহারা হয়ত ভাবিতে জানেন, কিন্তু প্রকাশ ...রিতে জানেন না। সাহিত্য-ক্ষেত্রে ...াঁহাদের স্থান কোথায় দিব, আমরা তা জানি ...া। কারণ, আমরা বুঝি প্রকাশ করাই ...চ্ছে সাহিত্যের কাজ। এঁদের চেয়ে ...াহাদের ভাবিবার ক্ষমতা কম, প্রকাশ-...ক্তির জন্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহাদেরও ...একটা স্থান আছে। লেখার আর্ট জানা ...াকার দরুণ তাঁহারা পুরানো কথাকেও ...তনতর শ্রী-ছাঁদ দিয়া, সাধারণ ভাবকেও ...স-সাধারণ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারেন ...লিয়া তাঁহারা যেটুকু করেন সেটুকু ...াহিত্যেরই কাজ। তাঁহাদের আমরা আসন দিতে রাজি আছি, কিন্তু ঐ ভাবুকদের জন্য আমরা ভাবিয়া কোন কূলকিনারা পাই না। আসল কথা, ঐ শ্রেণীর লেখকদের কাছে ভাব জিনিষটা এখনো বিদ্রোহী ঘোড়ার মত। নানা পুঁথি হইতে হয়ত তাঁহারা অনেক বিচিত্র ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নিজের করিয়া লইতে পারেন নাই। ভাবের মূর্ত্তি অন্তরে সুস্পষ্ট হইল বাহিরে তার প্রকাশ তদনুরূপ হইবেই। মোট কথা এই, প্রকাশ যত সুন্দর ও শোভন হইবে, সাহিত্যে তার আদর তত বেশী। এই প্রকাশ-গুণের উপর সাহিত্যের মরণ-বাঁচন নির্ভর করে;—দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

সাহিত্যক্ষেত্রে যখন লিপিকুশলতা ও ভাবুকতার মুক্তবেণী যুক্ত হইয়া যায়, আসল সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয় তখন। এই অপূর্ব্ব মিলনেই প্রতিভার পরিচয়,—যেমন মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। এঁদের ভিতরে এ-দুটি গুণ ঠিক সমান-সমান মিশ খাইয়াছে, তাই এঁরা আর-সকলের অগ্রগণ্য।

সত্যানুগামিতা, মৌলিকতা, পূর্ণতা ও অপক্ষপাতিতা—ভাল আর্টিষ্টের কাজে এ লক্ষণগুলি স্পষ্টাস্পষ্টি পাওয়া যায়। আমরা যা-করি-তা-করি,—কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি করিব না—এই হচ্ছে আর্টের প্রথম কথা।

তারপর—মৌলিকতা। যে লেখায় পরস্বের ছাপ্ যত কম,—সে লেখা তত ভাল। অন্যের চেয়ে আমার নিজস্ব ভঙ্গীটি হয়ত খারাপ হইতে পারে,—কিন্তু তবুও এ ভঙ্গী আমারই—এতে আমারই ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে এবং এ ভঙ্গীতে আমারই স্বাধীন হৃদয়ের প্রকাশ আছে—এ কথা ত কেউ

না-মানিতে পারিবে না! লেখকের এই আত্মপ্রকাশের দিক থেকেই তাঁর গুণাগুণের বিচার। কারণ, আত্মপ্রকাশের মধ্যেই সাহিত্যের সৃষ্টি।

পূর্ণতা :—আমার যা বলিবার আছে, তাহার একটি পরিপূর্ণ রূপ দিতে হইবে। মাঝখানের গুটিকয় ফুল ছিঁড়িয়া লইলেই, ফুলের মালার অখণ্ড রূপটি যেমন নষ্ট হইয়া যায়,—তেমনি লেখার আরম্ভ ও সমাপ্তির মধ্যগত ধারাটি যদি কোথাও ব্যাহত হয়, তাহাহইলে সব মাটি!

অপক্ষপাতিতা :—ভাব, ভাষা, লিখন-ভঙ্গী বা কোন শব্দ-বিশেষের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক দিলে শিল্পীর শিল্পত্ব খর্ব্ব হয়। সকলেরই প্রকাশ ঠিক স্বাভাবিক নিয়মে, সুসঙ্গত-ভাবে হওয়া দরকার—তাহাদের মধ্যে চেষ্টার পরিচয় জাহির হইলেই সর্ব্বনাশ। ভাল কালোয়াত বলি তাঁকেই—যিনি বাহিরে কোন আড়ম্বর না-করিয়া সহজে রসিক মানুষকে আকর্ষণ করিতে পারেন। আর্ট হচ্ছে ফল্গু-ধারার মত;—তপনতাপতপ্ত বালুকারাশিকে ফল্গু যেমন ভিতরে-ভিতরে স্নিগ্ধ করে, অথচ বাহিরে আপন অস্তিত্ব জানিতে দেয় না!

লেখায় আগে দেখিতে হইবে সৌন্দর্য্য;—ভাবের শ্রী, রূপের শ্রী, সুরের শ্রী। এই সৌন্দর্য্যের প্রতি নির্ব্বাসন-দণ্ড দিয়া সাহিত্যের মধ্যে যে-সব গাড়ল কাণ-কাটার কান-খোঁজার মত হৈ-হৈ রবে অকারণ ব্যাকরণ খুঁজিয়া মরে,—সে বেচারাদের দেখিলে রাগের চাইতে মনে দয়া হয় বেশী। যাঁরা সবে কলম ধরিয়াছেন, ভাষাকে এখনও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, রচনা-শী যাঁহাদের দুরস্ত হয় নাই,—ব্যাকর খুঁটিনাটি তাঁহাদেরই বেশী দরকার হই পারে; কারণ, অশিক্ষিতকে স্বেচ্ছাচারি অবকাশ দিলে সাহিত্যকে অসার ক তোলা হয়। সাহিত্যের স্বাভাবিক ধার ব্যাকরণের সাহায্যে নিয়মিত হয়। সুত ব্যাকরণকে তুড়ি মারিয়া উড়ানো চলে ব্যাকরণ মানা ভাল—কিন্তু তার প্রতি অ ভক্তি ভাল নয়। শ্রুতি-স্মৃতির বিরো যেমন শ্রুতিই মাননীয়—ব্যাকরণ ও সৌন্দর্য্যে বিরোধে তেমনি সৌন্দর্য্যের বাণীকে বড় বলিয়া মানিতে হইবে কেননা শক্তিধরের স্বাধীনতায় একটা যে শৃঙ্খ ও সৌন্দর্য্য থাকে, ভাষায় সেইটিই হচ্ছে বড় জিনিষ। প্রতিভাবানের ভাষা পা ব্যাকরণের বেড়ী পরে না—সাহিত্যে এর অগুণ্ডি নজির আছে। প্রতিভাবান প্রতিপদে ব্যাকরণকে অনুসরণ করেন না,—ব্যাকরণই অনেক সময় তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলে। কারণ তাঁহাদের রচনা-রীতির মধ্যে যে একটা সামঞ্জস্য, একটা শৃঙ্খলা পাওয়া যায়, ব্যাকরণের জন্ম তাহার মধ্যেই। কতগুলি ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ কথার মারপ্যাঁচ লইয়াই ব্যস্ত থাকিলে তাহাতে ব্যাকরণের উদাহরণ যোগানো হয় বটে কিন্তু তাহাতে সৌন্দর্য্য আহরণ হয় কি না সন্দেহ। সেইজন্য সৌন্দর্য্যকে ঠেলিয়া ব্যাকরণকে আগাইয়া দেওয়া, অরসিকের পক্ষেই শোভা পায়।

পণ্ডিতেরা প্রকাণ্ড একটা অশুদ্ধ শব্দের 'লিষ্ট' করিয়া যখন-তখন চোখ রাঙ্গান, "খবর্দ্দার! 'ইতিপূর্ব্বে' লিখ

'সৃজন' লিখ না, 'সক্ষম' লিখ না—ত্যাদি, ইত্যাদি!" খুব ভাল লেখাতেও দি ঐ-ধরণের কোন শব্দ পাওয়া যায়, া অমনি নাক সিঁটকাইয়া বলেন, "এঃ! ব্যাকরণ জানে না, তার লেখা আবার ড়ব কি?"—এদিকে লেখক হয়ত জানিয়া-নিয়াই যে 'সৃজনে'র জায়গায় 'সর্জ্জন' খিয়া পড়ুয়ার মন-চম্‌কাইতে চান নাই, ারা সে খবর রাখেন না। যা বেশী াকে বোঝে, তাতে সৌন্দর্য্যবোধও শীঘ্র য়; ব্যাকরণ-মতে বেঠিক হইলেও সে-ব শব্দকে ভাষা থেকে কেউ তাড়াইতে ারিবেন না; কারণ ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ হজবোধ্য শব্দগুলি লেখকের কলমের মুখে ায়ের জোরেই আর-সবাইকে ঠেলিয়া বাহির য় এবং পাঠকের মনও এই বিদ্রোহীদের াদর করিয়া ডাকিয়া নেয়—এবং ইহাদের ক্ষুরধারে পণ্ডিতের মত একেবারে খণ্ডিত ইয়া যায়! এই-যে অনেক পণ্ডিত "কায়া" লে "কায়," "রহস্য"কে "কৌতুক" অর্থে ব্যবহার করা ভ্রম বলিয়া কেবল "গোপনীয়" র্থে, "সন্ত্রান্ত"কে "ভ্রান্তিযুক্ত" বা "পাগল" র্থে, "তাচ্ছীল্য"কে উপহাসার্থে ব্যবহার না রিয়া "তৎপরতা" অর্থে চালাইবার ব্যবস্থা য়াছেন, কিন্তু এ ব্যবস্থায় কি লেখক ার কি পাঠক—কেহই কি কান াতিয়াছেন? বাঙ্গলা সাহিত্যে অনেক ব্যাকরণ-বিশারদ পণ্ডিত-লেখক আছেন; প্রায়ই দেখা যায়, তাঁদের ভাষা শুদ্ধ হইলেও ভাল নয়। সৌন্দর্য্যের উপরে ব্যাকরণকে আসন দিয়া বিধি-নিষেধের নাগপাশে ভাষাকে এঁরা এমনভাবে বাঁধিয়া ফেলেন যে, সে ভাষা না-পারে ইচ্ছামত চলিতে-ফিরিতে, না-পারে গলা-ছাড়িয়া গান গায়িতে, না-পারে আপন জীবনের স্ফূর্ত্তির পরিচয় দিতে! এ ভাষা সন্ধি-সমাসের বিধানই দেয়, রূপের নিদান দেখাইতে পারে না।

আর-এক দলের লিখিয়ে আছেন, যাঁরা ভাষা-বেচারীর বুকে চাপান শতবার-ব্যবহার-করা উপমা-বিশেষণের জগদ্দল পাথর, তার সর্ব্বাঙ্গে পরান হিন্দুস্থানী রমণীর মত রাশী-কৃত অলঙ্কার, তার উপরে দেন লম্বাচওড়া দুরূহ শব্দের ঘেরাটোপ;—এ-রকম ভাষায় শিক্ষানবিসের কাঁচাহাত জাহির হয় যতটা—ততটা আর কিছুই নহে। এমন ভাষায় লেখা যেমন সহজ, পাঠকের পক্ষে বুঝিয়া-ওঠাও তেমনি শক্ত। যিনি যত ছোট ছোট সোজা কথায় বড় বড় ভাব ফুটাইতে পারিবেন, তিনি তত উঁচুদরের শিল্পী। ভাষার সব-চেয়ে বড় গয়না যে সহজ-সরলতা—এ-কথা অনেকেই অনেকবার বলিয়াছেন। সুতরাং আমাদের আর কথা না-বাড়াইলেও চলে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মাতালের মাতলামি

(প্রলাপ চিত্র)

আমি মাতাল ;—রূপের মাতাল নই, রূপিয়ারও মাতাল নই ;—আমি মদের মাতাল। ভক্তি-রসের অমৃত-সুধা পান করে কিম্বা কবিত্বের ফেনা খেয়ে ভাবে ভোর হয়ে আমি সূক্ষ্ম মাতলামি করিনা ; আমি বাস্তব জগতের খাঁটি বস্তু পান করে নেশা জমাই। আমার নেশা হাল্‌কা হাওয়ার মতো ফুরফুর করে আকাশের গায়ে উড়ে বেড়ায় না ; সে নেশা—এই যে কঠিন বস্তুময় ধরিত্রী—যাকে হাতে করে ধরা যায়, পায়ে থেঁৎলানো যায়, তারই শক্ত বুকের উপরে আমায় আছড়ে-আছড়ে ফেলে ;—যেখানে বুক দিয়ে পড়ি, সে কোনো কবির কল্পনা নয়, শিল্পীর স্বপ্ন নয় ;—সে মাটি, মাটি, মাটি ! তাই ত মাটি আমাদের এত আদরের জিনিষ—আমাদের হৃদয়ের দেবতা ! তাই ত মাটির গুণগান স্তবস্তুতি করতে আমরা যেমন পারি, আর-কেউ পারে না। কোনো-কোনো কবি ইনিয়ে-বিনিয়ে মাটির গৌরব-গাথা রচনা করেছেন বটে, কিন্তু তোমরা যাকে ঘৃণা করে বল মাটি, সে তাই হয়েছে—সে আসল মাটি নয়।

মাগো মাটি, সন্তানকে আশ্রয় দেবার জন্য তোমার মতো কে এমন দিবারাত্র বুক পেতে আছে ! তুমি না থাকলে আমার মতো মাতাল শূন্যের উপর ঝপ্ করে পড়ে কোন্ শূন্যতলে তলিয়ে যেত কে বলতে পারে ! তার পর, তোমার এই অধম সন্তানদের জন্য কত আয়োজনই না তুমি করেছ,—দিবার ভোজনের থালা মুখের সামনে ধরেই আছ তোমার শ্রেষ্ঠ দান, ধান। কিন্তু কি ব দুঃখের কথা মা, লোভী লোকগুলো ধান থেকে অন্ন পাকিয়ে গোগ্রাসে গিলছে —তারা বোধ হয় ভাবে ধান্য থেকে অন্নই হয় ; মূঢ়রা জানেনা ধানের সা হচ্ছে সুরা। তাই ভাবি, মানুষে সারগ্রাহিতা কত কম ! যার সুরা-জ্ঞান নে তার সার-জ্ঞান কোথায় ?

মাগো, আমরা সুরাগ্রাহী কয়েকটি মাত তোমার সুসন্তান—দিবরাত্র তোমার মুখ চে আছি, তুমি বিনে আমাদের গতি কৈ ! কা তোমাকে ছেড়ে উঠলে আমরা ঠিক থাক পারি না। সাধে কি আকাশকে গাল পাড়ি ঐ আকাশের সংস্পর্শে যে আমাদের মাথা ঘু যায়। তাই তোমায় আঁকড়ে পড়ে থাক এত ভালোবাসি। তোমার বুকের উ দিবারাত্র কান-পেতে পড়ে আছি বলে তো তোমার বুকের কথা আমরা এ জানি ! ওরা কি জানে ! ওঁরা হলেন আবা কবি !

তবে দাও মাগো, গ্রামে গ্রামে পথে প মদের ভাঁটি খুলে—অজ্ঞান মানুষগুলো খেয়ে মাতাল হোক্, তোমার বুকে এ পড়ুক,—তোমায় চিনুক, তোমার বুকে কথা শুনুক।

বৃথা সব তোমাদের সাহিত্য—তোমা

র ! ওর মধ্যে সার নেই—ও একেবারে ো জিনিষ। ও জিনিষ পচলেও মাটি হবে । ও শুধু রঙিন ফানুসের মতো আকাশের য়ে হাওয়ার তালে দুলে বেড়ায়। অমন ন ফানুস নেশার ঝোঁকে আপনা-আপনি াদের মগজে কত যে গজিয়ে ওঠে কে র খবর রাখে। তোমাদের ঐ ফুরফুরে নিষ নিয়ে হবে কি ? ভরপুর নেশার কে টাউরে পড়বার সময় ওটাকে জড়িয়ে র যে টাল সামলাবো সেটুকু ভরও সইবে —অতটুকু ভারও নেই। ছোঃ ! তবে তোমরা বাহাদুরি করচ ! রচনা কর দেখি মাটির মতো একটা জিনিষ—যা চিরদিন আছে এবং থাকবে—যা সহজ—যাকে তে কষ্ট হয় না—বোঝাতেও কষ্ট হয় —যাকে দেখলেই মানুষ চিনতে পারে— পণ্ডিতই হোক, আর চাষাই হোক, ধনীই হোক, আর দরিদ্রই হোক ! র বুঝি তোমাদের বাহাদুরি ! নইলে ফুরফুর করচ !

তাই পায়ে ধরে বলচি ভাই—কারণ িয়ে উঠে হাত ধরবার শক্তি এখন নেই— এখনও ঢের বাকি রয়েছে ; তোমরা কিছু করতে চাও, বাঁশি বাজিয়ে, গান , সময় ফুঁকে দিয়ো না—তোমাদের মিহি গলার মিহি সুরে মিহি ভাষায় ছু হবে না ! দেখচ না দেশ নিদ্রিত ! ই গলা বন্ধ কর ; অনবরত চিঁহি-শব্দে থেকে নিদ্রা একেবারে দূর করে ও। ঐ দেখ যাদের চোখে ঘুম নেই রাও এখন হতভম্ব হয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে। রা দেখচে না, আহা, জননী ধরিত্রীর বুকের অনেকখানিটা এখনো খালি পড়ে আছে ; মায়ের সেই তাপিত বুক শীতল করবার উপায় কর,—দাওয়াই দাও। কাজ কর। গড়িয়ে পড়।

তাই বলি, এস ভাই চাষা, এস ভাই কামার-কুমোর, এস ভাই তিলি-তাম্‌লি, তোমরা মাটির সন্তান, তোমরা কাজের লোক, এস তোমরা যে যার মদের গেলাস, তাড়ির ভাঁড় ভরপুর করে নিয়ে এস। তোমাদের হাতের ঐ চিন্‌চিনে সুধা আমার মুখে,—দেশের মুখে সিঞ্চন কর। তোমাদের ঐ বিদুরের খুদ নিয়ে, এস আমিও তোমাদের সঙ্গে মিলে দেশের লোকের সঙ্গে এক-হয়ে মাটির উপর একবার জড়াজড়ি করে গড়াগড়ি খাই !

(খানিক পরে)

মদ খাই বলে তোমরা আমার নিন্দা কর। এতে তোমাদের নিজেদেরই হীনতা প্রকাশ করচ। জানোনা, কথায় বলে—চাষা জানে কি মদের স্বাদ ! মদের মর্ম্ম তোমরা কি বুঝবে ? কিন্তু তোমাদের কথা দিয়েই তোমাদের বুঝিয়ে দেব যে মদ জিনিষটা জগতে অনুপম। তোমরা বল জগতের বড় আদর্শ হচ্ছে এই যে, উচ্চনীচ ভেদাভেদ দূর হোক ! আচ্ছা বেশ, কিন্তু তা কি তোমরা কেউ করতে পেরেছ ? কিন্তু দেখ আমরা মাতালরা সেই অসাধ্য সাধন করেছি,—মদের গ্লাসে আমাদের জাতি বিচার নেই, উচ্চনীচ ভেদাভেদ নেই—সব একাকার। যে ব্যাটা মাতালের এখনও নিষ্ঠেটুকু আছে, জানবে সে এখনও ঘোর মাতাল হতে

পারেনি—তার সাধনা চলছে। এক মাতাল ছাড়া তোমাদের ঐ মহান্ আদর্শ কেউ গ্রহণ করতে পারেনি! মদ খাও তোমরাও পারবে। তারপর তোমরা মৌখিক বিনয় দেখিয়ে বল—আমি ধূলির অধম দাসানুদাস। কিন্তু কাজে তা দেখাতে পার? আমরা তা পেরেছি! ধূলোয় যখন পড়ে থাকি—তখন ধূলোই বা কে আর আমিই বা কে! আর দাসের দাস যে বলচ সে কথা যদি প্রমাণ করবার দরকার থাকে তো স্বাক্ষী-সাবুদ ডেকে আদালতে তা প্রমাণ করতে রাজি আছি। দাসের হুকুমেই তো আমি চলি, বলি; সেই তো আমার মান, আমার গর্ব্ব! ব্যস আর কি চাও?

তোমাদের কতবার বলব, মদ খাচ্চ না বলেই তোমাদের দ্বারা আসল সাহিত্য গড়ে উঠছে না। মদ খাচ্ছনা বলেই দেশের সঙ্গে—দেশের মানুষের সঙ্গে আসল পরিচয় হচ্ছেনা। সেইজন্য তোমাদের ভাবে উচ্চনীচ-জ্ঞান থেকে যাচ্ছে, তোমাদের ভাষায় শ্লীলঅশ্লীল বিচার রয়েছে, তোমাদের ব্যবহারে স্থানবিশেষ এবং মানুষ-বিশেষের প্রতি শুচিবাই রয়েছে, 'বস্তু'র প্রতি তোমাদের অবহেলা—কাজেই বস্তুজ্ঞান নেই—সেইজন্য সাহিত্যও বাস্তবিক হচ্ছে না। সব-চেয়ে বড় দোষ তোমাদের ঐ ভদ্রয়ানা—যাকে বল চক্ষুলজ্জা! এই চক্ষুলজ্জায় তোমাদের চোখ ঢাকা থাকে বলে দেশের অনেক জিনিষের সঙ্গে তোমাদের চাক্ষুষ পরিচয় হয় না। মদ খাও সব দোষ কেটে যাবে।—মন তোমাদের স্বাধীন হবে, তাহ'লে যা খুসি চিন্তা করতে বাধবে না; গতি অবাধ হবে —তাহ'লে অস্থান-কুস্থান বিচার থাকবে ভাষার স্ফূর্ত্তি হবে—নেশার ঝোঁকে তা মুখে যখন যা আসে তাই বলতে বা লি আটকাবে না। তবেই তোমাদের আসল সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারবে। নই মিছে ঘ্যান্-ঘ্যান্ করে আমাদের চটিয়ে দিতে এস না। দোস্‌রা পথ দে

(আরো পরে)

ফুঃ! ফুঃ!—এই ফুঁয়ে তোমাদের সাহিত্য, শিল্প উড়িয়ে দিলুম,—দেখলে তোমাদের লেখায় ভার নেই, সে ভারী —কাজেই সে ফুঁয়ের মুখে উড়ে যায়। শোলার চেয়ে হাল্‌কা জিনিষের জন্যে তো সারা জীবনটা প্রাণপাত করলে—আর সে আমার একমিনিটের এক ফুঁয়ে উড়ে গেল; দেখলে ত? কিছু করতে পারলে? তোমা কবিশেখরই আসুন, আর কবিসম্রাটই আ কিম্বা শিল্পাচার্য্যই আসুন এই ফুৎকারের কেউ টিঁকবে না—পষ্ট কথা বলে দি ফুঃ! ফুঃ! ফু-উ-উঃ! যাক্, সব গেল!

তোমাদের ঐ সাহিত্য আমি ত বুঝি, হাওয়ার ঢেউ—গায়ে-মুখে লাগে কিন্তু ধরে পাই না। যা হাতে না পাই তা আবার পাওয়া? ও কেবল উড়ে-উড়ে বেড়ায়, মাটিতে চেপে বসে না, তাই নাগা পাই না। জ্ঞান বিজ্ঞানের শেষ কথা হ এই যে, সবেরই পরিণতি হচ্ছে মাটি। বলি তোমাদের ঐ সাহিত্যকে মাটি কর উপায় এখন-থেকে কর। তা করছনা ওর পরিণতি হচ্ছে না।

শুনচি বটে তোমাদের ঐ হাওয়া পেরিয়ে দেশ-বিদেশে ঝড় তুলেছে—

কিন্তু—এই ফুঃ, ফুঃ! লোকে বলচে—বড় সেখান-থেকে রাশীকৃত সোনার মোহর নিয়ে এনেছে। হুঁ! সোনার মোহর দিয়ে নড়ানো যায় না বটে! কারণ সেটা ! (মাথা চুলকাইয়া) আর অত ভাবনা ভাবতে পারি-নে! কিন্তু বাবা বলে রাখচি ও সব ফক্কিকারী!

তাই বলি তোরা মানুষ হ—মানুষ হ! প্রজাপতির রূপ ধরে সূর্য্যকিরণে ডানা মেলে—বিচিত্র বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে উড়ে-বেড়িয়ে বেকি! কারণ প্রজাপতি মধু খেতে পারে কিন্তু মদ খায় না। মদ খেতে গেলে মানুষ হওয়া চাই। তাই বলি তোরা মানুষ হ! মানুষ হ!—এবং মদ খেয়ে দেশের মাটির উপর পড়ে-থেকে দেশের সঙ্গে পরিচয় করে নে;—দেশের কথা শুনে নে! আর ঐ লাল-নীল পরী-কাহিনী রচনা করিস্‌নে—যাকে চর্ম্ম-চক্ষে কেউ কখনো দেখলে না তার জন্যে এত মাথা-ব্যথা কেন?—তার চেয়ে আমার মতো মদের মুখে প্রলাপ চিত্রের কালচিত্তির তৈরি কর্—আর কেউ বাহবা না দেয় আমরা মাতালের দল নিশ্চয় বাহবা দেব।.....

কি বলতে আরম্ভ করেছিলুম—কথার মুখে সব ঘুলিয়ে গেল। হাঁ হাঁ, আমি মাতাল! মাতালের মাতলামির একটা কাহিনী বলতে আরম্ভ করেছিলাম বটে। কিন্তু গোড়া-থেকে বলে রাখচি—এর মধ্যে কল্পনা নেই—এ একেবারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা!

অমাবস্যার রাত্রি! ঘুটঘুটে অন্ধকার! মাতাল পথে···রাস্তায় গ্যাস কিন্তু তবু অন্ধকার···চোখের মধ্যে তখন যে গ্যাস জলছে তার কাছে রাস্তার গ্যাস লাগে কোথায়।

অনেক রাত্রি। মদের দোকান বন্ধ। হায় ইংরেজ, এ তোমার কি আইন! মাতালের প্রতি তোমার এ নিষ্ঠুরাচরণ কেন? কি অপরাধে তারা অপরাধী!.....

মাতাল পথে পথে ঘুরতে লাগল··· তখন তার নেশা জমাট কিন্তু তবু পিপাসা, —বড় পিপাসা—মদের পিপাসা! কিন্তু কোথায় মদ? মাতাল মনের দুঃখে গান ধরলে—

"অভাগা যেখানে যায়
সাগর শুকায়ে যায়!"

মাতাল কেঁদে ফেল্লে—হায় মদের সাগর শুকিয়ে গেল! তবে হবে কি? তবে উপায় কি? এ যে বড় পিপাসা! বুক যে ফেটে গেল।—কলজে ছিঁড়ে গেল।.....

কি করুণ দৃশ্য! পথে পথে মদের আশায় ছুটে বেড়ানো—কিন্তু হায় কোথাও মদ নেই···শুঁড়ির-পো তখন নাক ডাকিয়ে নিদ্রা!···অদৃষ্টদেবীর এ কি ক্রূর পরিহাস! কে বলে অদৃষ্ট অদৃষ্ট! ঐ দেখ অদৃষ্ট ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি নিয়ে চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে! ভ্রান্ত মানব এই রাত্রে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত তাই তাকে দেখতে পাচ্চে না। মাতালের মতো এই মাঝ-রাত্রে পথে এসে দাঁড়াক দেখি, তাকে দেখতে পাবে।.....

আর সহে না···মাতাল অবসন্ন···সে রাস্তার উপর শুয়ে পড়ল···অমাবস্যার চাঁদের মতো কালাচাঁদ পাহারাওয়ালা (তখন শীতকাল—পাহারাওয়ালার সর্ব্বাঙ্গ কালো

লম্বা কোটে মোড়া) হাজির !···দুই রুলের গুঁতো !···বাবারে ! আবার অদৃষ্টের পরিহাস ! পাহারাওলা মাতাল হয়ে মাতাল তো পাহারাওলা হতে পারত আর ঐ রুলের গুঁতো ত মাতালের পিঠে না পড়ে পাহারাওলার পিঠে পড়তে পারত। তা কেন হল না ? কে বলব কেন হল না !

সংসারে মাতাল কে নয় ? কেউ ধনের মাতাল, কেউ মানের মাতাল, কেউ জ্ঞানের মাতাল, কেউ বিজ্ঞানের মাতাল। এই রাত্রে সহর-ভরা তো সারি-সারি মাতাল শুয়ে রয়েছে, তবে মদের মাতালের উপর এত অত্যাচার কেন বাবা ! পাহারাওলা মূর্খ। সে অত-শত বোঝে না, সে গুঁতোর পর গুঁতো দিতে লাগল। দুনিয়ার সবাই কাপুরুষ ! এই অত্যাচারের প্রতীকারের জন্য কারুর ঘুম ভাঙল না···কেউ সেই নিশীথ রাত্রে উঠে বসে একটা কবিতা লিখলে না, কেউ প্রবন্ধ রচনা করলে না —কেউ গান বাঁধলে না ! তবে দেশের সাহিত্য সৃষ্টি হবে কেমন করে ? দেশের এই কান্না যদি তাতে না রইল তবে বৃথা সে গান—বৃথা সে গল্প !

গুঁতোর পর গুঁতো চলতে লাগল। তবে—জয় গুঁতোরই জয় !

তারপর ? তারপর তারপর করে কতদূর যাব বাপু। এদিকে যে নেশা ছুটে আসছে —গলা শুকিয়ে আসছে। তার উপায় করচ কি ?

দেখবে আমার এই গল্পটি কেমন dramatic করে শেষ করব ? আমি বুঝতে পারছি তোমরা অধীর হয়ে উঠছ ঐ মাতালটি কে তাই জানবার জন্যে। পাঠকের মন-বুঝে গল্প বলাই ত বাহাদুরি। তোমরা ভাবছ, আহা কে ঐ ভদ্রসন্তান মাঝ-রাত্রে রাস্তায় পড়ে—রুলের গুঁতোয় জর্জ্জরিত। শুনবে সে কে ? সে আমি—সে আমি।

শ্রীমাতাল।

পলায়নপর ও পলায়নের পর

বঙ্কিম লিখিয়াছেন, সপ্তদশ অশ্বারোহী যে বঙ্গজয় করিয়াছিল মুসলমান-ঐতিহাসিকের এ মিথ্যা কথা কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। বোধ হয় তাহার পর হইতে কোন আধুনিক বাঙ্গালীই এ কথা মানিতে আর প্রস্তুত নয়।

সপ্তদশ অশ্বারোহী দ্বারা বঙ্গদেশ বলে জিত না হইয়া, কিরূপে ছলে গৃহীত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল বঙ্কিম তাঁহার অমর লেখনীতে তাহা চিত্রিত করিয়া দেখাইয়া-ছেন। চিত্রশেষে বলিয়াছেন :—

"ষোড়শ সহচর লইয়া মর্কটাকার বখ্-তিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল।

ষষ্টিবৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজউদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার

কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে ? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্ত্তাস্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত ? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান্ হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।"

বঙ্কিম যেদিন ইহা বলিয়াছিলেন সে দিনকার পক্ষে এ কথাটা ভারি নূতন কথা ও সাহসিক কথা ছিল।

বহুশতাব্দী-যাবৎ মুসলমানকর্ত্তাদের রটিত কথায় যে বিষয়ে সংস্কার মজ্জাগত হইয়া যায়, তার উপর মেকলে-আদি নূতন কর্ত্তাদের সমান কৃপাবারি বর্ষণে যাহা উৎপাটিত না হইয়া, বরঞ্চ আরও প্রবলভাবে বদ্ধমূল জাতীয় ধারণা হইয়া গিয়াছিল, সেই আত্মগ্লানির পাহাড়ের বিরুদ্ধে প্রথম সংশয়-গোলাক্ষেপণ বঙ্কিমেরই কীর্ত্তি।

কিন্তু তখনকার বাঙ্গালীর জাতীয় রক্ত এই আত্ম-অপমান বিষে এতই ভরা ছিল যে মণ মণ বিষ পাম্প্ করিয়া উঠাইয়া ফেলিলেও এক-আধ-ছটাক যে বাকী রহিয়া গিয়াছিল তাহা "মৃণালিনী"-লেখক বঙ্কিমের নিজেরই দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। তাই তিনি "মৃণালিনী"তে মানিয়াছেন—

"মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।"

"আনন্দমঠে"র সময় তিনি এই বিষের জেরটুকু ধরিয়া ফেলিয়াছেন, তাই বন্দে মাতরং-এ সন্ন্যাসীরা গাহিতেছে—"কে বলে মা তুমি অবলে !" এবং 'সীতারাম'-প্রভৃতির চরিত্রচিত্র-দ্বারা ঐতিহাসিক গোটা বীর মানুষগুলাকে লোকের সাম্‌নে ফেলিয়া 'বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা'—এই আদিম ভ্রান্তির সংশোধন করিয়াছেন।

"মৃণালিনী"তে বঙ্কিম সপ্তদশ অশ্বা-রোহীর তথা-কথিত বঙ্গবিজয়গর্ব্বের অলীকতা নিপুণ তুলিতে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু বঙ্গের শেষ-হিন্দু-রাজা লক্ষণ সেনের উপর অঙ্গুলিস্পর্শ করেন নাই। তাঁহাকে মুসল-মান ঐতিহাসিক যেমনটি আঁকিয়া গিয়াছে তেমনিটিই রাখিয়া দিয়াছেন। এক-পুরুষের সমাজ-সংস্কারকের মত তিনি কতকগুলি সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, বাকীগুলি পরবর্ত্তী পুরুষের জন্য রহিয়া গিয়াছে।

হারজিৎ রাজনিয়তি। হারিলেই রাজা কাপুরুষ হয় না, এবং জিতিলেই জেতা বীরপুরুষ হয় না। যে বখ্‌তিয়ার খিলিজি মিত্রভাবে ষোড়শ অনুচরসহ প্রবেশ করিয়া নিঃশঙ্ক, নিরস্ত্র, সৈন্যসজ্জাশূন্য নগরীকে ছলে অধিকার করিয়া আপনাকে বীর বলিয়া ইতিহাসে লিখাইয়া গিয়াছে, নিজগৌরব বাড়াইবার জন্য লক্ষণসেনকে কাপুরুষতার গাঢ়তম বর্ণে চিত্রিত করা তাহারই যে কাজ নয় তাহা কে বলিতে পারে ?

বৃদ্ধ বা বিলাসী হইলেও যুদ্ধের আহ্বানে বীরের ধমনীতে রক্ত নাচিয়া উঠে। আমি একজন শতপত্নী-পরিবৃত বিলাসমগ্ন রাজপুত রাজাকে দেখিয়াছি, সম্বাদপত্রে য়ুরোপের যুদ্ধ-ঘোষণা বার্ত্তা পড়িবামাত্র দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীরে যেন এক নূতন বৈদ্যুতী ভরিয়া গেল। যিনি একমিনিট পূর্ব্বে প্রেয়সীরাণীর অঞ্চল ছাড়িয়া হিতৈষী মিত্রগণের পরামর্শে

রাজকার্য্য-উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষেরই এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ পাত্রমিত্রগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—"চল য়ুরোপ যাই, সমরানলে ঝাঁপাই।" যে সকল পাত্রমিত্রও মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে বিলাস ও আরামেচ্ছায় আড়ষ্ট হইয়াছিল—নিমেষে খাড়া হইয়া কহিল—"ওর কেয়া? চলো, চলো চলে!" যেন তাহাদের কটিতে বদ্ধকোষে তরবারি ঝন্‌ঝনিয়া উঠিল। আমি ইন্দ্রজালের মত এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম।

কেহ খিড়কি দ্বার দিয়া পালাইলেও অবশ্যম্ভাবিরূপে যোদ্ধৃভাবশূন্য না হইলেও হইতে পারে। কাশ্মীরের ইতিহাসে পাওয়া যায়, কতশত রাজা কতশতবার অপ্রস্তুত অবস্থায় শত্রুসম্পাতে খিড়কি দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়া আবার সদলবলে সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশপূর্ব্বক রাজ্য পুনর্লাভ করিয়াছেন।

আজ য়ুরোপের যুদ্ধেও তাহাই হইতেছে। কখনও বা কোনপক্ষ দুর্য্যোগ দেখিয়া পিছু হটিতেছে, আবার সেই পক্ষই সুযোগ বুঝিয়া আগে কদম বাড়াইতেছে।

সেনবংশের গৌরবরবি বঙ্গাকাশে আর উদীয়মান্ হয় নাই, সেইজন্য পলায়নপর শেষ-সেনরাজার নামে শত্রুপক্ষ যে কিছু কলঙ্ক লাগাইয়াছে তাহাই টিঁকিয়া গিয়াছে ও বিশ্বাসস্মন্য হইয়াছে। কিন্তু দেখা চাই ষষ্টিবৎসর পরবর্ত্তী মুসলমান ঐতিহাসিকের সাক্ষ্য ছাড়া আর-কোন সমসাময়িক সাক্ষ্য লক্ষ্মণসেনের বিরুদ্ধে পাওয়া যায় কি না।

১৩১৭ সনের চৈত্র মাসের ভারতীতে লক্ষ্মণসেন শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক দেখাইতেছেন—

"লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব তিরভুক্তি বা ত্রিহুত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। * * * তথা লক্ষ্মণসেনের দানশীলতা সম্বন্ধে এক মনোহ শ্লোক প্রচলিত আছে। চক্রবাক আপন বধূকে কহিতেছে, "প্রিয়ে, আর আমাদিগকে বিরহ যাতনায় অধীর হইতে হইবে না, কারণ আর অল্পদিবস গত হইলেই সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির বিনাশ হইয়া যাইবে"। চক্রবাকী কহিল "তাহাও কি সম্ভব? আমাদিগের কি এরূপ সুখের দিন আসিবে?" চক্রবাক কহিল "আসিবে বৈ কি! কনক-গিরি অস্তাচলই যে লোপ পাইতেছে, তাহা হইলে সূর্য্যদেব আর কি করিয়া অস্তমিত হইবেন?" চক্রবাকী ঔৎসুক্যের সহিত কহিল "সে কেমন, সে কেমন?" চক্রবাক উত্তর করিল "বীর লক্ষ্মণসেন যেরূপ উন্মুক্ত হস্তে দানরত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি ক্রমে ক্রমে সমুদায় কনকগিরিই নিঃশেষিত করিয়া ফেলিলেন। যথা

কতিপয় দিবসৈ র্ক্ষয়ং প্রয়ায়াৎ
কনকগিরিঃ কৃত বাসরাবসানঃ।
ইতিমুদ মুপযাতি চক্রবাকী
বিতরতি লক্ষ্মণসেন দেব বীরে॥

ত্রিহুতে লক্ষ্মণসেনের অব্দ অধুনাও প্রচলিত। উহাকে সংক্ষেপে লসং বলে পণ্ডিতগণ এখনও এই অব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।"

বঙ্গের বাহিরে লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে এতাদৃশ কিম্বদন্তীর অনুসরণ করিতে করিতে আরও কিছু সম্বাদ পাওয়া যাইতে পারে যাহাতে তাঁহার কাপুরুষতার কলঙ্ক অপনয়ন হইতে পারে।

সেনরাজকলঙ্ক লক্ষ্মণসেন বাঙ্গালীর কলঙ্কস্বরূপ ইতিহাসে খোদিত হইয়াছে। সে কলঙ্কমূর্ত্তি আমরা তিষ্ঠিতে দিব কিনা তাহা এখন আমাদের বিচার্য্য।

অতীতে যে কার্য্য কৃত হইয়াছে, শত্রু-হস্তে যে দাগ লাগান গিয়াছে তাহাকে অকৃত করিতে হইবে, সে দাগ মুছিয়া সাফ করিতে হইবে, এই এক কথা। আর দ্বিতীয় কথা এই যে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে আমরা নিজ হস্তে এমন আর কিছু করিব না যাতে সে দাগ না মুছিয়া তার উপর আরও কালী লেপা হয়।

পঞ্চনদের তীর হইতে মধ্যে মধ্যে বঙ্গমাতার ক্রোড়ে আকস্মিক প্রত্যাবৃতার চোখে একবার একখানা বিসদৃশ চিত্র ঠেকিয়া গেল। দেখি ঘরে ঘরে সেই চিত্র। প্রত্যেক চিত্রকলাপ্রেমিক বা প্রেমিককল্প ড্যাশনেবল্ গৃহস্থের ড্রইংরুমে সেই চিত্র—অন্যান্য চিত্রসমূহের সঙ্গে বাঁধান, নির্লজ্জভাবে গায়ে গায় লাগান। তাহা পূজনীয় অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের জনৈক শিষ্যের অঙ্কিতই পলায়নপর, ভীরু, কুব্জপৃষ্ঠ, বৃদ্ধ, বিবস্ত্র বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেনের মিন্‌হাজ-বর্ণিত কল্পমূর্ত্তি।

দুদিন গেলে সে ছবির দিকে আমি আর তাকাইতে পারিতাম না। প্রতিগৃহে পদার্পণ করিয়া সুসজ্জিত দেওয়ালের দিকে চাহিতে ভয় করিত পাছে সেই বিভীষিকা চোখে পড়ে।

বাঙ্গলার নূতন আর্টসোসাইটির প্রতি সানুনয় প্রার্থনা, এই জাতীয়কলঙ্ক চিরস্থায়ী-কারী, জাতিহৃদয়বিদ্ধকারী এ চিত্র তাঁহারা চিত্রপট হইতে মুছিয়া ফেলুন। বাঙ্গালীর মানসপটে এ চিত্রের কল্পনা স্থান পাইবার যোগ্য নহে, বাঙ্গালীর গৃহভূষণ ইহা নহে, বঙ্গের শ্রেষ্ঠতম শিল্পীদের অমর তুলিকা এমন আত্ম-অপমানজনক কলুষিত কাজে নিযুক্ত হইবার দুর্ভাগ্য কেন স্বীকার করিয়াছে?

পলায়নপর রাজার বা রাজবংশের উত্তরচরিত তাহার অন্তর্নিহিত প্রকৃতির পরিচায়ক।

বিশ্বাসহন্তা বখ্‌তিয়ার খিলিজির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত লক্ষ্মণসেন পলায়ন করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু পলায়নের পর তিনি বা তাঁর বংশধরেরা কি করিলেন তাহা অনুসন্ধেয়।

পঞ্জাব-ইতিহাসের পৃষ্ঠার মধ্যে সেই সন্ধান লুক্কায়িত আছে। বাঙ্গালীর হৃত-সম্মান উদ্ধারকারী সেই পৃষ্ঠাগুলি আহরণ করিয়া আগামীবারে 'ভারতী'র পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিব।

শ্রীসরলা দেবী।

আর্টের আদর্শ

প্রতিমূর্ত্তি-সম্বন্ধে রোঁদার অভিমত আগেই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এ-প্রসঙ্গ এখনও শেষ হয় নাই। তিনি বলিতেছেন :—"মক্কেলমাত্রই যে সত্যভীত, তাহা নহে। দৃষ্টান্ত চাহিলে পঞ্চদশ শতাব্দীর অনেক বড়লোকের নাম করা যায়। তাঁহারা, আপনাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইলেই তুষ্ট হইতেন এবং শিল্পীদের কঠোর সরলতা ভালবাসিতেন। সেকালের অনেক চিত্রকর, রাজা-মহারাজার ছবি আঁকিবার সময়ে কুশ্রী চেহারাকে কখনও সুশ্রী করিয়া তুলিতেন না; নিজেদের স্বরূপ দেখিয়া সেকালের রাজারাও কখনও শিল্পীদের উপরে বিরূপ হইতেন না।

একালের লোকেরাই সত্যকে ভয় করে ও মিথ্যাকে ভালবাসে।

সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ, মূর্ত্তি গড়িতে বা আঁকিতে গেলে মক্কেলের সঙ্গে শিল্পীদের কি-রকম যুঝিতে হয়! কিন্তু তা-বলিয়া হতাশ হইবারও কোন হেতু দেখিনা,—শিল্পীরা নিজেদের সত্যপথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন কেন? এতে যদি বে-আক্কেল মক্কেলেরা খাপ্পা হইয়া ছবি ফিরাইয়া দেন, —তথাস্তু; কারণ, ছবি যখন বাস্তবিকই ভাল হয়, তখনই তাহা মক্কেলদের মনের-মত হইতে পারে না!"

পল বলিলেন, "আচার্য্য! আপনার ব্যবসায়ের যে-সব অগ্নিপরীক্ষার কথা শুনিলাম, তার মধ্যে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ, যে-সব মক্কেল জড়ভরতের মত, যে-সব নির্ব্বোধের মুখে ভাল-মন্দ কোনরকম ভাবের লেশমাত্র নাই, তাদের লইয়া আপনাদের ত আচ্ছা-মুস্কিলে পড়িতে হয়?"

রোঁদা হাসিয়া বলিলেন, "এতে আর মুস্কিলের কি আছে?—'প্রকৃতি সর্ব্বদাই সুন্দরী'—তুমি কি আমার এই মূলমন্ত্রটি ভুলিয়া গেলে? প্রকৃতি যা দেখান, আমরা তাই বুঝিতে চেষ্টা করি মাত্র। তুমি ভাবহীন মুখের কথা বলিতেছ ত? কিন্তু শিল্পী যে এমনধারা মুখ কস্মিন্‌কালেও দেখিতে পান না! তাঁর কাছে সকল মুখেরই সমান আদর। নীরস মুখ, মূর্খের হাবড়াই ভাব, চিত্রার্পিত হইলে একটা দেখিবার-মত জিনিষ হইয়া উঠে। এমন-কি, যে মুখ একেবারে অনর্থক, তাহাও প্রাণের লীলায় সুমধুর,—অতএব, শ্রেষ্ঠশিল্পের মধ্যে গণনীয়।"

কয়েকদিন পরের কথা। শিল্পশালায় বসিয়া পল, রোঁদার গড়া কতগুলি সুগঠিত মূর্ত্তি দেখিতেছিলেন।

সেখানে ভিক্টর হুগোর ধ্যানমগ্ন প্রস্তর-মূর্ত্তিটিও রক্ষিত ছিল। তাঁহার কপাল কোঁচ্‌কানো, এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো; মাথার চুল উস্কখুস্ক ও এলমেল,—সেগুলি অগ্নির কতগুলি উর্দ্ধমুখী শ্বেতশিখার মত! এ-যেন আধুনিক গীতিকাব্যের শরীরী মূর্ত্তি!

রোঁদা বলিলেন, "ভিক্টর হুগোর কাছে



ভিক্টর হুগো

[illegible] ভয়ে-ভয়ে যখন তাঁহাকে জানাইলাম [illegible], আমি তাঁহার মূর্ত্তি গড়িতে চাই, ঠিক [illegible]-সময়টিতে তিনি এক বদ্ শিল্পীর [illegible]য় পড়িয়া হয়রান্ হইয়াছিলেন। সে-[illegible]ক্তি একটি যাচ্ছেতাই মূর্ত্তি গড়িতে গিয়া [illegible]কে আটত্রিশবার আদর্শরূপে বসাইয়া [illegible]হার প্রাণান্ত করিয়া, তবে ছাড়িয়াছিল। [illegible]তরাং আমার বাসনা শুনিয়া হুগো ভুরু [illegible]কাইয়া বলিলেন, "আমি তোমার কাজে [illegible]া দিতে চাই না বটে, তবে, আগে [illegible]কতেই এ-কথা বলে রাখছি যে, তোমার আদর্শ হয়ে আমি কোন বিশেষ ভঙ্গীতে বসে থাক্‌তে পারব না। তোমাকে নিজেই, নিজের সুবিধামত বন্দোবস্ত করে নিতে হবে।"

প্রথম-প্রথম আসিয়া, কাজের সুধিবার জন্য আমি পেন্সিল-দিয়া হুগোর অগুন্তি নক্সা চট্‌পট্ আঁকিয়া ফেলিলাম। তারপর একতাল মাটি সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম। ভিক্টর হুগো, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া বেশীর ভাগ সময়ই গল্পগুজবে কাটাইয়া দিতেন। আমি একপাশে দাঁড়াইয়া

মনোযোগের সহিত এই মহাকবির ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিতাম; তাঁহার একটা-কোন বিশেষ ভঙ্গী দেখিলেই একছুটে বারান্দায় গিয়া, কাদার তালে সেই সদ্যঃদৃষ্ট ভঙ্গীর ছাঁচ তুলিয়া ফেলিতাম। এম্‌নি করিয়া আমাকে দিনে-দিনে ধীরে-ধীরে হুগোর মূর্ত্তি গড়িতে হয়। সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ, কতটা বাধা-বিঘ্ন এড়াইয়া কি কষ্টেই আমাকে কাজ করিতে হইত!

* * *

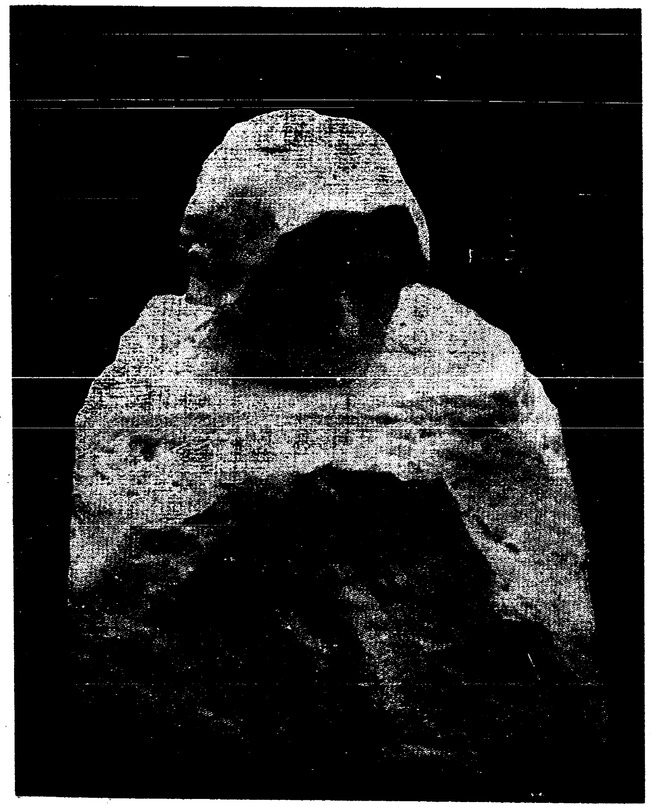

ভাবনা

রোঁদার শিল্পশালায় একটি মূর্ত্তির সা[illegible] গিয়া, পল দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া তাহা দে[illegible] লাগিলেন।

মূর্ত্তিটি রমণীর; তাহার সঙ্কুচিত [illegible] যেন কোন গোপন যাতনার আগুণে পু[illegible] খাক্ হইতেছে। তাহার মাথাটি হেঁট [illegible] চোখদুটি মুদিত, ওষ্ঠাধর যুক্ত। র[illegible] মুখে যদি প্রাণের যাতনার ছাপ্ না থা[illegible] তাহাহইলে সকলেই মনে করিত, [illegible] ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মূর্ত্তির মধ্যে সব[illegible] আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, তার [illegible] নাই, পা-ও [illegible] হয়ত, গঠনকালে [illegible] পছন্দসৈ না-হও[illegible] তিনি বিরক্ত [illegible] তাহার হাত-পা ভ[illegible] দিয়াছেন।

পল দুঃখিত[illegible] বলিলেন, "[illegible] এমন চমৎ[illegible] মূর্ত্তিটিও অসম্পূর্ণ [illegible] আছে!"

রোঁদা আশ্চর্য্য [illegible] কহিলেন, "বল [illegible] আমি যে ইচ্ছা ক[illegible] মূর্ত্তি অসম্পূর্ণ রাখি[illegible] এও তুমি বুঝিতে প[illegible] না? এ মূর্ত্তিতে [illegible] ভাবনাকে ফুটানো [illegible] য়াছে! তাইত [illegible] হাতও নাই, পা-ও [illegible] —এ কাজও ক[illegible]

[illegible]চলিয়াও বেড়ায় না। ভাবনার পরিণাম [illegible]ড়তায়!"

[illegible]এতক্ষণে পল, মূর্ত্তিটির গূঢ় অর্থ বুঝিতে [illegible]লেন। উচ্চ-আদর্শের সাধনায় যাহা [illegible] হইয়াছে, অসীমকে সসীমের মধ্যে [illegible] করিতে না-পারিয়া যাহা বেদনায় [illegible]ল হইয়া উঠিয়াছে—এ হচ্ছে সেই [illegible]-পূরণে অক্ষম মানব-বুদ্ধিরই মূর্ত্তিমান [illegible]ন!

[illegible]পল কহিলেন, "আপনার শিল্পকার্য্যে [illegible]সত্য সৌন্দর্য্য থাকে, সাহিত্য-সমাজে [illegible]র যথেষ্ট সুখ্যাতি হইয়াছে। কিন্তু [illegible]ন-কোন সমালোচক বলিয়া থাকেন, [illegible]তকলায় এতটা দার্শনিকতা ভাল নয়।"

রোঁদা তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, "যে বিজ্ঞানে [illegible]র জীবন্ত হইয়া উঠে, আমি যদি সত্য-[illegible]ই তাহাতে অনভিজ্ঞ হই, সমালোচকেরা [illegible] একবার কেন—একশ'বার আমার [illegible] ধরিতে পারে। কিন্তু আমার গড়া [illegible] যদি নিখুঁৎ ও জলজ্যান্ত হয়, তবে [illegible]রা কেন আমাকে দোষ দেয়? আকৃতির [illegible] আমি যদি অর্থসংযোগ করি, [illegible] তাতে বাধা দিবার শক্তি আছে [illegible]র? ভাল আর্টিষ্ট যে সুধুই নিপুণ [illegible]রিকর হইবেন, তাঁর কাজে যে বুদ্ধির [illegible]কাশ, মহৎভাবের আভাস থাকিবে না, [illegible] মনে করা মস্ত ভুল। সাহিত্যেই বল [illegible]র ভাস্কর্য্যেই বল, উচ্চচিন্তার আদর [illegible]য়েই সমান; সাধারণের আনন্দ আর লাভ [illegible]ইলেই এখানে কাজের সার্থকতা—কবি [illegible] ভাস্করে এখানে একাকার—একপ্রাণ। [illegible]ত্র, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত ও সাহিত্যের পরস্পর-সম্পর্ক বড়ই ঘনিষ্ঠ—আমরা এখনও তাহার সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারি নাই; প্রকৃতি যে আলোকপাত করেন, তাহারই মধ্যে তাহারা মানবের সকল মানসভাবের অভিব্যক্তি দেখায়। একব্যক্তি আমার 'ভিক্টর হুগো'র সমলোচনকালে বলিয়াছিলেন, 'ইহা ভাস্কর্য্য নহে—শরীরী সঙ্গীত!'—সমালোচকের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক্,—তাই যেন হয়! কাব্যের বা সঙ্গীতের যে ধর্ম্ম, ভাস্কর্য্যে তাহা দেখিলে চঞ্চল হইবার কোন আবশ্যক নাই।

তবে, সাহিত্য ও শিল্পের ভিতরে যে একেবারেই তফাৎ নাই, তাও নয়।

প্রথমেই দেখ, মূর্ত্তি না গড়িয়াই সাহিত্য ভাবের আভাস দিতে পারে। সাহিত্য সুধু বলিয়াই ক্ষান্ত,—"গভীর ভাবনার পরিণাম জড়তা।" অথচ দেখ, এই সত্যটুকুই বুঝাইতে একখানা পাথরের উপরে আমাকে এক ভাবনাবিভোরা অঙ্গহীনা রমণী-মূর্ত্তি গড়িতে হইয়াছে। এখানে শিল্পের চেয়ে সাহিত্যের সুবিধা বেশী।

দ্বিতীয় ভেদ।—সাহিত্য যে গল্প বলে, তাহার আরম্ভ, মধ্য ও শেষ আছে। নানা ঘটনা একসূত্রে বাঁধিয়া সাহিত্য তাহা-হইতে একটি পরিণাম ঠিক করিয়া নেয়। শিল্পে কিন্তু ভিন্নরীতি। কোন কার্য্যের একটি বৈ দুটি দৃশ্য সে একসঙ্গে দেখাইতে পারে না। এই কারণেই যে-সব শিল্পী বিনাবিচারে সাহিত্যের মধ্য হইতে আপনাদের বিষয়-নির্ব্বাচন করেন, তাঁহারা ঠিক কাজ করেন না।

দেখ, Delaroche, "Children of Edward" নামে একখানি ছবি আঁকিয়াছেন।

এডোয়ার্ডের সন্তানেরা পরস্পরকে আঁকড়াইয়া আছে। কিন্তু এই ছবিখানির বিষয় তাহারা বুঝিবে না,—যাহারা জানে-না যে, এরা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, এখন কারাগারে বন্দী এবং ভাড়াটে গুণ্ডা তাহাদের হত্যা করিবে। বিখ্যাত চিত্রকর Delacroix, বাইরণের কাব্য হইতে 'Don Juan's Shipwreck' নামে ছবি আঁকিয়াছেন। তাহাতে দেখি, ঝটিকাসংক্ষুব্ধ সাগরে একখানি তরঙ্গচঞ্চল তরণীতে বসিয়া নাবিকেরা একটি টুপীর ভিতর হইতে কাগজের টুক্‌রা তুলিয়া লইতেছে। যাহারা বাইরণের কাব্য পড়ে নাই, তাহারা বুঝিতে পারিবে না যে, এই অভাগা জীবগুলি অনাহারে পাগল হইয়া গিয়াছে এবং কোন্ সঙ্গী হত হইয়া আর-সকলের আহার্য্যে পরিণত হইবে, তাহাই নির্দ্ধারণের জন্য তাহারা লটারি করিয়া দেখিতেছে, কাহার নাম আগে উঠে!

এই দুই শিল্পী সাহিত্য হইতে চিত্রবস্তু সংগ্রহ করিয়া ভারি ভ্রমে পড়িয়াছেন। তাঁহাদের ছবির ভিতর থেকেই তাহার আসল অর্থ বুঝা যায় না।"

রোঁদা যখন কথা কহিতেছিলেন, পল তখন ফিরিয়া দেখিলেন, ঘরের ভিতরে Ugolinএর মূর্ত্তি রহিয়াছে।

উগোলিনের অনাহার-মৃত সন্তানেরা কারাগৃহের কক্ষতলে পড়িয়া আছে। তাহাদের নিরাহার-ক্ষিপ্ত পিতা এখনও জীবিত বটে, কিন্তু অসহনীয় ক্ষুৎপিপাসায় হিংস্র জন্তুতে পরিণত। তিনি দুই হাতে ও হাঁটুতে ভর্ দিয়া ছেলেদের আড়ষ্ট মৃত



উগোলিন

দেহের উপরে গিয়া পড়িয়াছেন। মাংস-ভক্ষণের জন্য তিনি তাহাদের দেহের উপরে হুমড়ি খাইয়া আছেন বটে,—কিন্তু, তাঁহার মুখটি অন্যদিকে ফিরানো। প্রেমপ্রবণ পিতৃত্বের সঙ্গে, মানবত্বের সঙ্গে, উগোলিনের হৃদয়ের মধ্যে তখন পশুত্বের সংগ্রাম চলিতেছে। এর চেয়ে মর্ম্মভেদী আর কিছুই হইতে পারে না।

পল কহিলেন, "আপনি যে দোষের কথা বলিলেন, আপনার 'উগোলিন'ও সেই দোষের আর-একটি দৃষ্টান্ত হইতে পারে। কারণ 'উগোলিনে'র অর্থ বুঝিতে হইলে আগে Divine Comedy পড়া দরকার।

রোঁদা বলিলেন, "দান্তের সর্ব্বজন-পরিচিত মহাকাব্য হইতে বিষয়-নির্ব্বাচন করিয়াছেন বলিয়া শিল্পীর এখানে ততটা দোষ হয় নাই। কিন্তু, আমার মতে শিল্পের অর্থ শিল্পের মধ্যেই প্রকাশিত হওয়া উচিত। সাহিত্যের সাহায্য না লইয়াও শিল্প স্বাধীন-ভাবেই চিন্তা ও কল্পনার লীলা ফুটাইতে পারে। আমি নিজেও সাধারণত এই নিয়মটি মানিয়া চলি।"

পল শিল্পশালার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, অধিকাংশ মূর্ত্তিই মৌনভাষায় রোঁদার কথাই সপ্রমাণ করিতেছে।

একদিকে রহিয়াছে Illusion, doughter of Icarns (ভ্রান্তি), নামে মূর্ত্তি। এটি একটি যুবতী পরীর প্রতিমা। ডানা মেলিয়া শূন্যে উড়িতে-উড়িতে ঝড়ের ঝাপ্‌টায় সে মাটির দিকে নিক্ষিপ্ত হইল; পড়িতে-পড়িতে একটি পাহাড়ের ধাক্কা লাগিয়া তাহার সুশ্রী মুখখানি একেবারে

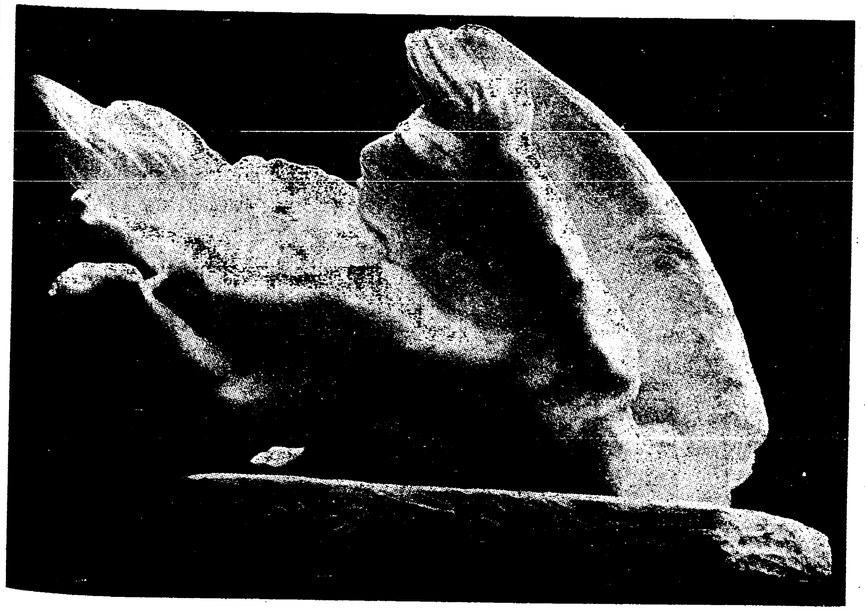

ভ্রান্তি

ছেঁচিয়া গেল। কিন্তু তাহার অক্ষত পক্ষ এখনও বাতাসে ঝট্‌পট্‌ করিতেছে। সে যে অমরী;—সে আবার উঠিবে, আবার উড়িবে, আবার পড়িবে,—এমনি চিরদিন, চিরকাল!—এ হচ্ছে ভ্রান্তির—মায়ার রূপক, —এর অশ্রান্ত আশা, অনন্ত নিরাশা!

রোঁদা বলিতে লাগিলেন, "মনকে মুগ্ধ করে বলিয়াই একখানি সুচারু নিসর্গ-চিত্রের আসল আদর নয়; দর্শকের মনে তাহা যে ভাব জাগায়, তার জন্যই তাহার সমাদর। নিপুণভাবে টানা রেখা এবং বর্ণরঞ্জনের জন্যই তুমি বিচলিত হও না,—তাহাদের মধ্যে যে অর্থ থাকে, তুমি অভিভূত হও তাহাতেই। নিসর্গ-চিত্রের বিখ্যাত শিল্পীরা প্রকৃতির নানাদৃশ্যে নানাভাব, নানাঅর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রকৃতির অবস্থা-হিসাবে সে-সকল ভাবও কখনও গম্ভীর, কখনও তরল,—কখনও শান্ত, কখনও রুদ্র!

ভাল চিত্রকর জানেন, বিশ্ব প্রকৃতি চেতনাময়ী। ঐ বিরাট আকাশে এমন-একখানিও মেঘ নাই, ঐ তৃণশ্যামল ভূমিতে এমন-একটিও অঙ্কুর নাই—যাহার মধ্যে বিশ্ববিসারী মহাশক্তির গুপ্ত অর্থ না লুকানো আছে!



পিতলের হাত

ভাল ভাল শিল্প-কাজগুলি দেখ। এই বিশ্বনিখিলে কলাবিদেরা আপন হৃদয় দিয়া যে ভাবের ধারা দেখিয়াছেন, তাহারই প্রকাশে শিল্পের এই-সব নিদর্শন মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিভা-বান কলাবিদের হৃদয় এতটা গভীর ও ভাব-গ্রাহী যে, সকল বিষয়েই সে আপনার এই বিশেষ-ত্বের শীলমোহর মারিয়া দেয়। কেবল অখণ্ডে নয়—খণ্ডের মধ্য দিয়াও তাঁহাদের মনোভাব প্রকাশ পায়। শ্রেষ্ঠ-একটি শিল্পকার্য্যের যে-কোন একটি ক্ষুদ্র

অংশেও, তুমি তাহার স্রষ্টার মানস-ভাবের পরিচয় পাইবে।"

রোঁদা পিতলের যে হাত গড়িয়াছেন, তাহাতে খণ্ডকে অবলম্বন করিয়াই শিল্পীর প্রাণের ভাব বিকাশলাভ করিয়াছে।

এখানে পল বলিলেন, "আচার্য্য, শিল্পীরা যে গভীর ভাব প্রকাশ করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক সংশয়ী এ-কথাও ত বলিয়া থাকে যে, শিল্পীরা ছবি আঁকিবার সময়ে যে ভাব কল্পনাও করেন নাই,—সেই ভাবই পরে জোর-করিয়া তাঁহাদের ছবির উপরে চাপাইয়া দেওয়া হয়। আপনার কথায় এটুকু বেশ বুঝিতে পারি, অন্তত আপনার হাত মনের দ্বারা চালিত, কিন্তু সকল শিল্পীর হাতই কি তাই?—তাঁহারা কি কেবল সহজাত-সংস্কারের (instinct) দ্বারাই কাজ করিয়া যান না? তাঁহারা কি সত্যসত্যই শিল্পের মধ্যে চিন্তার সমাবেশ করিয়া থাকেন? চিত্রে-ভাস্কর্য্যে যে ভাবটিকে আমরা প্রশংসা করিয়া থাকি, শিল্পীরা আঁকিবার বা গড়িবার সময়ে কি ঠিক সেই বিশেষ ভাবটিকেই পরিষ্কাররূপে ধারণা করিতে পারেন?

রোঁদা সাহাস্যে বলিলেন, "কতকগুলি উর্ব্বর-মস্তিষ্ক লোক আছে বটে, শিল্পের উপরে যাহারা অকল্পিত অপরূপ ভাব আরোপ করে। কিন্তু তাদের কথা আমরা ধরিতেছি না। কার্য্যকালে ওস্তাদ-শিল্পীরা যে সম্পূর্ণরূপেই সচেতন থাকেন, এতে আর কোনই সন্দেহ নাই।"—এইখানে মাথাটি ঘুরাইয়া তিনি বলিলেন, "তুমি যে অবিশ্বাসীদের কথা বলিলে, তারা যদি বুঝিত, মনে-মনে প্রবলভাবে শিল্পী যাহা ভাবেন ও অনুভব করেন, সেই ভাব ও অনুভূতিকে পটের উপরে সামান্যরূপে ফুটাইয়া তুলিতেও কতটা শক্তির দরকার, তাহাহইলে এমন সন্দেহ কিছুতেই তারা করিত না যে,—শিল্পে যে ভাব বিকসিত হইয়াছে, তাহা সচেতন শিল্পীর স্বেচ্ছাকল্পিত নহে।"—একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, "তাহাই শ্রেষ্ঠ শিল্প,—যাহাতে ভাবশূন্য আকৃতি, রেখা ও বর্ণ নাই—যাহার সমস্ত অংশই ভাবের রসে সুরসাল ও প্রাণের লীলায় সুমধুর!

*
* *

নবেম্বর মাসের কন্‌কনে শীত। রোঁদা তাঁহার Mendon এর বাড়ীতে, একদিন সকালে চুপচাপ বসিয়াছিলেন। তাঁহার পরনে আট্‌পৌরে কাপড়। তাঁহার মাথার চুলগুলি উস্কখুস্ক, পায়ে চটিজুতা। রোঁদা বসিয়া বসিয়া আগুন পোহাইতেছিলেন।

রোঁদার সুমুখেই, দেওয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড একটি ক্রুশবদ্ধ যীশুখৃষ্টের মূর্ত্তি। পল সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়াছিলেন। মূর্ত্তিটি যেমন চমৎকার, তেমনি স্বাভাবিক; —এত স্বাভাবিক যে, দেখিলে মন বিমর্ষ হইয়া পড়ে।

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আপনি ধর্ম্ম মানেন ত?"

রোঁদা বলিলেন, "বিশেষ কতগুলি বিধি-সংহিতা যে মানিয়া চলে, তুমি যদি তাকেই ধার্ম্মিক বলিতে চাও, তবে সে-হিসাবে আমি অধার্ম্মিক।

কিন্তু কতকগুলি বাঁধা বুলির চর্ব্বিত-চর্ব্বণকে আমি ধর্ম্ম বলিয়া মানিতে রাজি নই। জীব-নিখিলকে যাহা রক্ষা করে, বিশ্বের তাবৎ পদার্থকে যাহা বিধিবদ্ধ করে, সেই অজ্ঞাত শক্তির সৌন্দর্য্য প্রকাশ করাই হচ্ছে, ধর্ম্ম। বিশ্বে ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত যাহা-কিছু;—সেই বিরাট পদার্থ, যাহা আমাদের দৃষ্টি—এমন-কি আমাদের মানসনেত্রও যাহা দেখিতে পায় না,—তাহারই ধারণা করিতে পারার নাম, ধর্ম্ম। অসীমের দিকে, চিরন্তনের দিকে, অগাধ জ্ঞান ও প্রেমের দিকে আমাদের বিবেকনত মনের গতিই হচ্ছে ধর্ম্ম। এই হিসাবেই আমি ধার্ম্মিক।" চুল্লীর কম্পমান অগ্নিশিখার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া, রোঁদা আবার বলিলেন, —"ধর্ম্ম যদি পৃথিবীতে না থাকিত, তবে আমাকে তাহা আবিষ্কার করিতে হইত। মনে-প্রাণে যিনি খাঁটি কলাবিদ, মানুষের মধ্যে তিনি মহাধার্ম্মিক।

সাধারণ বিশ্বাস এই যে, বাহ্যইন্দ্রিয়ই শিল্পীর সর্ব্বস্ব,—তাই বহিঃপ্রকৃতিই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। কলাবিদ্ কি শিশু? যে, শিশু যেমন রঙ্গচঙ্গে পুতুল পাইলেই খুসি হয়, তিনিও তেমনি কতকগুলি জিনিষের বাহিরের গড়ন বা পরিবর্ত্তমান বর্ণলীলা দেখিয়াই উল্লসিত হইয়া উঠিবেন? লোকে শিল্পীকে চিনিতে পারে নাই। রেখা ও বর্ণ শিল্পীর কাছে গোপন সত্যের বহিঃস্ফুট চিহ্নমাত্র।

প্রত্যেক শিল্পী, নিজের স্বভাবমত প্রকৃতিকে রুদ্র বা শান্ত—যে-কোন ভাবে অভিষিক্ত করিয়া তুলেন। নিসর্গ-চিত্রের পটুয়া আরও-বেশী আগাইয়া যান। কেবল জীব-জন্তুর মধ্যেই তিনি বিশ্ব-আত্মার প্রতিচ্ছায়া দেখেন না, তরুদলে, বনজঙ্গলে, উপত্যকায় ও পর্ব্বতমালায় পর্য্যন্ত তিনি বিশ্ব-আত্মার আভাস পান। অন্যলোকের কাছে গাছ-পাথর সুধু গাছ-পাথর মাত্র, তাঁহার কাছে সেই গাছ-পাথরই মানুষের মুখের মত জীবন্ত। আরসির মত সরসী-জলে, মখ্‌মলের মত নরম ঘাসে-ভরা মাঠ-ময়দানে, বনস্পতির কাণ্ডদেশে শিল্পী Corot দেখিয়াছিলেন বিশ্বব্যাপী করুণার ঝরণা। আবার, উহাদেরই ভিতরে শিল্পী Milletএর চোখে পড়িয়াছিল, জ্বালা-যন্ত্রণা ও সর্ব্বত্যাগী বৈরাগ্য!

ত্রিভুবনের সর্ব্বত্রই শিল্পী শুনেন, তাঁহার আত্মার উত্তরে বিশ্ব-আত্মার বাণী ধ্বনিয়া উঠিতেছে। তবে, বল দেখি পল, শিল্পীর চেয়ে ধার্ম্মিক আর কে আছেন?

সকল ওস্তাদ-শিল্পীর কার্য্যই অতীন্দ্রিয় রহস্যে ভরা। প্রকৃতির সামনে প্রতিভাবানের প্রাণে যে অনুভূতি জাগে, সত্য বটে শিল্পীরা তাহাই অভিব্যক্ত করেন; প্রকৃতিতে নরপ্রাণ যে নির্ম্মলতা, যে মোহন-শ্রী দেখে, সে-সমস্তই তাঁহারাও দেখান, ইহাও ঠিক; কিন্তু আমাদের জ্ঞেয় পৃথিবীকে যে বিরাট অজ্ঞেয়তা আবরণ করিয়া আছে, তাহার সহিতও তাঁহাদের হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত চলে। যাহা আমাদের প্রত্যক্ষ, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-মনের গোচর, আমরা কেবল তাহাই অনুভব ও কল্পনা করিতে পারি। তাছাড়া আর-সমস্তই অসীম আঁধারে অদৃশ্য। এমন-কি, যে-সব পদার্থ আমাদের কাছে দৃশ্যমান

হওয়া উচিত, আমরা তাহাদিগকে কল্পনা করিতে পারি না বলিয়া সেগুলিও আমাদের গোচরীভূত হয় না। কিন্তু তীক্ষ্ণনেত্র শিল্পীর চোখে ধূলা দিয়া কিছুতেই তাহারা এড়াইয়া যাইতে পারে না।"

রোঁদা স্তব্ধ হইলেন। পল, ভিক্টর হুগোর কয়টি লাইন আবৃত্তি করিলেন:—

"আমরা নিখিল পদার্থের একটি দিক বৈ দেখিতে পাই না—অন্যদিকটি অন্ধকার ও রহস্য-সাগরে নিমগ্ন। মানুষ কারণ না-জানিয়া কর্ম্মফলে দুঃখভোগ করে। যাহা-কিছু তাহার কাছে স্বপ্রকাশ, সে-সমস্তই অনাবশ্যক, সঙ্কীর্ণ ও চলচঞ্চল।"

রোঁদা হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "আমার চেয়ে ভাল-করিয়া কবি কথাগুলি বলিতে পারিয়াছেন।

প্রতি শিল্পকার্য্যেই এই গুপ্তরহস্য আছে। লিওনার্ডো ডা ভিন্সির সকল চিত্রই এমনি রহস্যে ভরা।

Milletএর The Gleaners (উঞ্ছজীবী) নামে ছবিখানি দেখ। সে বিধির অর্থ কি, যে বিধিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া এই হতভাগ্য জীবগুলি দুনিয়ায় কেবল কষ্ট ভুগিতে বাঁচিয়া আছে? এই চিরন্তন প্রলোভনের অর্থ কি, যাহাতে মজিয়া, হাজার যাতনা পাইয়াও জীবনকে ইহারা ভালবাসে? হায়, এ কি নিষ্ঠুর সমস্যা!

শিল্পে এই রহস্যের আবরণ কেবল যে খৃষ্টিয় ললিতকলায় দেখা যায়, তাহা নয়। প্রাচীন রোম বা গ্রীসের শিল্পসৃষ্টির পূর্ব্বেও—"ভাগ্যদেবীত্রয়ে"র পূর্ব্বেও মানুষের চারু কলায় রহস্যের এই কুহেলিকা আসিয়া পড়িয়াছিল।



উঞ্ছজীবী



ভাগ্যদেবীত্রয়

"ভাগ্যদেবীত্রয়ে" দেখি, তিনটি রমণী পাশাপাশি বসিয়া আছেন। তাঁহাদের ভঙ্গী এমন মহিমময়, এমন শান্ত-স্থির যে দেখিলেই মনে হয়, তাঁহারা যেন আপনা-আপনির ভিতরে আমাদের-অজ্ঞাত এক গুরুতর বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন। তাঁহাদের উপরে বিপুল রহস্যের যবনিকা এবং জগৎধাত্রী, অশরীরী ও চিরন্তন মহাশক্তির ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে;—তাঁহারা সেই মহাশক্তিরই স্বর্গীয় দূত!

জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রাচীরের দিকে সকল শিল্পাচার্য্যই অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রাচীরে আহত হইয়া হতাশপ্রাণে ফিরিয়া আসিয়াছেন; আর, যাঁহাদের কল্পনার প্রসার অধিক, কেবল তাঁহারাই প্রাচীরের আড়াল হইতে চিরগোপন নন্দনকাননের সুমধুর বিহগ-বিরাব শুনিতে পাইয়াছেন।"

পল অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ললিত-কলা-সম্বন্ধে শিল্পাচার্য্যের এই মূল্যবান উপদেশগুলি শুনিতেছিলেন। রোঁদা স্তব্ধ হইলে পল বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি অন্য-অন্য শিল্পীর কথা অনেক বলিলেন, কিন্তু আপনার নিজের কথা কি? আপনার শিল্পকার্য্যেও অতীন্দ্রিয় ভাবের প্রভাব ত বড় অল্প নয়! আপনার গড়া খুব ছোটখাট মূর্ত্তিতেও অব্যক্তের আকুলতা দেখা যায়!"

পলের প্রতি ব্যঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রোঁদা বলিলেন, "প্রিয়বন্ধু, আমার কাজে আমি যদি বিশেষ কতগুলি ভাবের বিকাশ দেখাইয়া থাকি, তবে আমার পক্ষে তাহার ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া অনাবশ্যক; কারণ, আমি কবি নই—ভাস্করমাত্র; আমার দেওয়া যা ভাব, মূর্ত্তির দিকে চাহিলে সহজেই তা বুঝা যাইবে। আর, সে-সব ভাব যদি দুর্ব্বোধ হয়, তবে জানিও, আমি নিজেও তাদের প্রাণে-প্রাণে অনুভব করি নাই; সুতরাং সে-স্থলে আমার দ্বারা কোন ব্যাখ্যাও সম্ভব বলিয়া মনে করি না।"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

ছন্নছাড়া

দুয়ের অধ্যায়

(১)

মাথা-ঢাকা একখানা গাড়িতে কতকগুলো পুরোনো ঝুড়ির মধ্যিখানে আমাকে গুঁজে বসিয়ে দিলে। তার পর, গাড়ির ঘোড়াটা যখন চাষার বাড়ির সামনে এসে আপনার-থেকেই দাঁড়িয়ে পড়ল তখন বেশ রাত হয়েছে।

চাষা বাড়ি-থেকে বেরিয়ে এল,—হাতে তার লণ্ঠন,—উঁচু-করে তুলে ধরা; তার আলোতে কেবল তার পায়ের কাঠের জুতোর ডগাটুকু দেখা যাচ্ছিল। সে এসে আমাদের নাবিয়ে নিলে; আমার মুখের কাছে একবার আলোটা তুলে ধরেই একটু পিছিয়ে গেল, বল্লে—"বাঃ বেশ ক্ষুদে দাসীটি ত!"

চাষার স্ত্রী আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গেল,—সেখানো দুটো বিছানা; আমার বিছানা কোন্‌টি তা দেখিয়ে দিলে; বল্লে—"কাল তোমায় সমস্তদিন এখানকার রাখালটার সঙ্গে এ-বাড়িতে একলাটি থাকতে হবে;—আমরা সবাই সেণ্ট-জন-ভোজে চলে যাবো।"—সকালবেলা ঘুম-থেকে উঠতেই রাখাল আমায় গোয়াল-ঘরে নিয়ে গেল—জাব্‌না দেবার জন্যে। সে আমাকে ভেড়ার খোঁয়াড়টা দেখিয়ে দিলে। বল্লে, বুড়ী বিবিশ্‌-এর বদ্‌লি আমাকে ঐ ভেড়া দেখতে হবে। সে আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, প্রাত-বছর ভেড়ার ছেনাগুলোকে তাদের মায়ের কাছ-থেকে সরিয়ে নিয়ে আলাদা রাখা হয়, সেই জন্যে তাদের দেখাশুনো করতে একজন আলাদা লোকের দরকার। সে আরো বল্লে যে, এই যে গোলাবাড়ি এর নাম "ভিল্‌ভিয়েই।" এখানে সবাই বেশ সুখে আছে; কারণ মনিব সিল্‌ভ্যাঁ এবং তাঁর পত্নী পোলিন্‌ দুজনেই লোক বড় ভালো।

যখন তার গোরু-বাছুর সব দেখা হল সে বাদামতলায় গিয়ে তার পাশে আমায় বসতে বল্লে। সেখানে বসে আমরা গলির ব্যাঁক যেখানে বড়-রাস্তায় মিশেছে সেই পর্য্যন্ত এবং গোলাবাড়ির আগাগোড়া দেখতে পাচ্ছিলুম। বাড়িটার আকার চৌকোণা, মধ্যিখানে উঠোনে গোবরের ডাঁই, সেখান থেকে একটা ভাপ উঠে আধা-শুকনো ঘাসের গন্ধর সঙ্গে মিশছিল। সমস্ত বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ।

আমি বসে-বসে চারিদিক দেখছিলুম। লম্বা লম্বা দেবদারু গাছ আর চাষের ক্ষেত ছাড়া আর-কিছু নজরে পড়ছিল না। আমার মনে হতে লাগল, অনেক-দূরের একটা নতুন দেশে হঠাৎ যেন উড়ে-এসে পড়েছি! এখানেই চিরদিন আমায় থাকতে হবে—এই রাখালের সঙ্গে, আর ঐ গোয়ালের মধ্যে যে গোরু বাছুর ভেড়া আছে তাদের সঙ্গে! সেদিন ভারি গরম। ঘুমে আমার সমস্ত শরীর জড় হয়ে আসছিল, কিন্তু আন্‌খা জায়গার একটা ভয় ছিল বলে চোখ-বুজতে পারছিলুম না। নানা রঙের মাছি মুখের সামনে ভন্‌ভন্‌-শব্দে উড়ে বেড়াচ্ছিল। রাখালটা গাছের গুল্ম নিয়ে ঝুড়ি বুন্‌ছিল; আর আমাদের পায়ের কাছে পড়ে কুকুরগুলো ঘুম দিচ্ছিল।

সূর্য্য যখন ডুবু-ডুবু ঠিক সেই সময় গলির ব্যাঁক থেকে চাষার গাড়ি মোড় নিলে দেখা গেল। গাড়ির মধ্যে পাঁচ জন লোক—দু জন পুরুষ, তিন জন মেয়ে। আমাদের সামনে দিয়ে যাবার সময় চাষার স্ত্রী আমার পানে চেয়ে একটু হাসলে, আর অন্য সবাই আমাকে দেখবার জন্যে ঝুঁকে পড়ল। একটু পরেই নিস্তব্ধ গোলাবাড়িটা সরগরম হয়ে উঠল। দেরী হয়ে গেছে বলে সেদিন আর রান্না-বান্না হল না,—আমরা সবাই এক-এক বাটি দুধ আর একটু করে রুটি খেয়ে নিলুম।

(২)

পরের দিন চাষার স্ত্রী আমাকে একটা লম্বা জামা পরতে দিলে। আমি বুড়ী বিবিশ্‌-এর সঙ্গে ভেড়া-চরানো শিখতে বেরিয়ে পড়লুম। বুড়ী বিবিশ্‌ এবং তার কুকুর কাস্তিল্‌—দুজনে দুজনের এমন অনুরূপ যে আমার মনে হত ওরা যেন জ্ঞাতি। দেখতে দুজনকে প্রায় সমবয়সী এবং দুজনের চোখ অনেকটা এক রঙের। ভেড়াগুলো যেমনি দল থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়ত অমনি বিবিশ্‌ বলে উঠত—"কাস্তিল্‌! হাঁক দে, হাঁক দে!" কথাগুলো সে ভয়ানক তাড়াতাড়ি বলে যেত এবং কাস্তিল্‌ ডেকে না উঠলেও ভেড়াগুলো তখনি সারবন্দি হয়ে পড়ত। তার গলার স্বরের সঙ্গে তার কুকুরের ডাকের এমনি মিল ছিল।

যখন শস্য-কাটার ধুম পড়ল আমার মনে হতে লাগল যে কাজ করচি তা যেন ভারি আশ্চর্য্য, রহস্যময়—যেন আমার চারিদিকে একটা প্রহেলিকা চলেছে। লোকেরা সব জড়ো হয়ে শস্য কেটে স্তূপাকার করছে,—কেউ আছড়াচ্ছে, কেউ আঁটি বাঁধছে, কেউ সেগুলো গাদা করছে; থেকে থেকে তাদের গলার চীৎকার উঠছে। এক একসময় আমার মনে হত, সেই চীৎকার যেন আকাশ থেকে এল। আমি অমনি তাড়াতাড়ি উপর পানে চেয়ে দেখতুম, মনে হত বুঝি ঐ সোনার শস্যভরা রথ মাথার উপর দিয়ে আকাশ-পথে চলে গেল!

রাত্রের খাবার আমরা সবাই একসঙ্গে বসে খেতুম। লম্বা টেবিলের পাশে যার যেখানে খুসী বসে যেত; চাষার স্ত্রী আমাদের প্লেট কানায়-কানায় ভর্ত্তি করে দিত। যাদের বয়স কম তারা ক্ষিদের চোটে চট্‌পট্‌ চিবিয়ে যেত আর যারা বুড়ো তারা ধীরে-সুস্থে একটু-একটু-করে মুখে তুলত—যেন সে কি মহামূল্য সামগ্রী! সবাই চুপ-চাপ খেয়ে যেত; তাদের কালো হাতের উপর পোড়া রুটির টুকরোগুলো সাদা দেখাত। খাওয়া শেষ হলে বুড়োর দল চাষবাসের কথা পাড়ত, ছোকরার দল মার্ত্তিন্‌ বলে যে মেয়েটি ভেড়া চরায় তাকে নিয়ে মজা করত। সে সকলকার ঠাট্টার জবাব দিত এবং নিজেও আশ-মিটিয়ে বিদ্রূপ করত। কিন্তু কোনো পুরুষ যদি তার দিকে হাত বাড়াত সে অমনি লাফিয়ে সরে যেত—কখ্‌খনো ধরা দিত না। আমার দিকে কেউ খেয়াল করত না। একটু দূরে কতকগুলো কাঠের গুঁড়ি জড়ো করা ছিল আমি তার উপর একলাটি বসে থাকতুম,—বসে বসে তাদের সকলকে দেখতুম। কর্ত্তা সিল্‌ভ্যাঁর তামাটে রঙের বড়-বড় চোখ; সেই চোখ দিয়ে সে এক-এক-করে থেমে-থেমে সকলকার মুখের দিকে চাইত। তার গলা কখনো বেশী উঠত না—কথা কইবার সময় টেবিলের উপর হাত ঝুঁকিয়ে রাখত। তার স্ত্রীর স্বর ছিল গম্ভীর-চিন্তাযুক্ত। যেন কি একটা বিপদ আসচে এই আশঙ্কাই সর্ব্বদা মনে জাগছে। মুখে হাসি বড় দেখা যেত না-সবায়ের হাসিতে ঘর ফেটে গেলেও তার মুখ গোমড়া!

বুড়ি বিবিশ্‌ খালি ভাবত আমার ঘুম পেয়েছে। সে কেবল আমার কাপড় ধরে টানত,—আমায় বিছানায় তুলে নিয়ে যেত। তার বিছানা ছিল ঠিক আমার পাশেই। সে কাপড় ছাড়তে-ছাড়তে বিড়-বিড় করে ভগবানের নাম করত এবং আমার কাপড় ছাড়া হল কি না সে-খোঁজ না নিয়েই আলোটা নিবিয়ে দিত

(৩)

ফসলের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যেতেই বিবিশ্‌ তার কুকুরকে সঙ্গে দিয়ে আমায় মাঠে একলা ছেড়ে দিলে। তার কুকুরটা আমাকে মোটেই গ্রাহ্য করত না; সে সুবিধে পেলেই আমাকে ছেড়ে বিবিশের কাছে গোলাবাড়িতে পালিয়ে যেত। আমি ভেড়াগুলোকে নিয়ে ভারি মুস্কিলে পড়তুম;—কিছুতেই তাদের ঠিক রাখতে পারতুম না। যে যেম্‌নে পেত পালিয়ে যেত। এই সময় মারি এমের সঙ্গে আমার নিজের অবস্থার তুলনা মনে উঠত; তিনি প্রায়ই বলতেন তাঁর সেই মেয়ের পালটিকে সাম্‌লে রাখা দায়। কিন্তু দেখতুম তিনি ত বেশ সহজেই সামলাতে পারতেন;—ঘণ্টায় একটা ঘা মারলেই আমরা সবাই জড়ো হতুম এবং গলার সুর একটু কড়া করলেই আমাদের সব গোল থেমে যেত। কিন্তু আমি যতই চীৎকার করে গলা ফাটাই না, যতই চাবুকের শব্দ করি না, একটা ভেড়াও আমার কথা শোনে না। কাজেই আমাকে ভেড়া-তাড়ানো কুকুরের মতো ভেড়ার সঙ্গে ছুটে-ছুটে বেড়াতে হত। একদিন সন্ধ্যা বেলা দুটো ভেড়া গেল হারিয়ে। রোজ সন্ধ্যাবেলা তাদের খোঁয়াড়ে পোরবার সময় আমি দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের গুনে তুলতুম। সেদিন গুনে দেখি দুটো কম। আমি খোঁয়াড়ের মধ্যে গিয়ে আবার গুনতে লাগলুম;—কিলবিল করছে ভেড়া, সে কি গোনা যায়! যত-বারই গুনি দেখি সংখ্যা বেড়েই যায়, কাজেই হতাশ হয়ে বেরিয়ে

এলুম। শেষে মনে মনে ভেবে দেখলুম নিশ্চয় প্রথমবার গুনে তোলবার সময় আমার ভুল হয়েছে। কাউকে কিছু বল্লুম না।

পরদিন সকালে তাদের বার করবার সময় আর-একবার গুনে দেখলুম। সত্যিই দুটো কম। আমার বড় ভয় হতে লাগল। সমস্তদিন মাঠে-মাঠে আমি তাদের খুঁজে বেড়াতে লাগলুম, সন্ধ্যার সময় দেখলুম, তাদের আর পাওয়া গেলনা; তখন চাষার স্ত্রীকে বল্লুম। কয়েকদিন ধরে আমরা সবাই মিলে চতুর্দ্দিকে তাদের খোঁজ করতে লাগলুম;—খোঁজার একশেষ হল কিন্তু কোনো ফল হল না। প্রথমে চাষা, তারপর তার স্ত্রী আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বলতে লাগল—"বল্, কোনো লোক এসে তোর কাছ-থেকে ভেড়া-দুটো নিয়ে গেছে কি না!" তারা বল্লে, আমার কোনো ভয় নেই,—সত্যি কথা বল্লে তারা কিচ্ছু বলবে না। আমি বারবার বল্‌তে লাগলুম যে ভেড়া-দুটো কোথায় গেল আমি কিচ্ছু জানিনা,—কিন্তু বুঝলুম বলে কোনো লাভ হলনা, কারণ তারা আমার কথা বিশ্বাস করলে না।

এরপর থেকে আমি ভয়ে-ভয়ে মাঠে যেতুম—কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে, আশে-পাশে সব লোক লুকিয়ে থাকে যারা ভেড়া চুরি করে নিয়ে যায়। আমি থেকে-থেকে কেবলই চমকে উঠতুম—ঐ বুঝি ঝোপের আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে। তারপর, অল্পদিনের মধ্যেই আমি চোখ-বুলিয়ে ভেড়া গুনে নিতে অভ্যস্থ হয়ে গেলুম—দেখলেই বুঝতে পারতুম সবাই একসঙ্গে আছে, কি, কেউ ছটকে পড়ছে!—একমিনিটও লাগত না।

(৪)

শরৎকাল এসে পড়তেই আমার মন ভারি চঞ্চল হয়ে উঠল। মারি এমের জন্যে আমার বড় মন-কেমন করত। তাঁকে আমার এমনি দেখবার ইচ্ছে হত যে আমি চোখ-বুজে বসে ভাবতুম যে ঐ তিনি পথ বেয়ে আসছেন। ভাবতে ভাবতে সত্যই তাঁর পায়ের শব্দ, ঘাসের উপর তাঁর কাপড়ের খস্‌খসানি স্পষ্ট শুনতে পেতুম। যখন মনে হত তিনি আমার খুব কাছে এসে পড়েছেন আমি চোখ খুলতুম,—অমনি তিনি অন্তর্দ্ধান করতেন। অনেকদিন ধরে মনে মনে ইচ্ছে ছিল তাঁকে একখানি চিঠি লিখি, কিন্তু কাগজ কলম চাইবার সাহস হত না। চাষার স্ত্রী নিজে লিখতে জানত না; সেখানে কারুর চিঠিও আসতে দেখতুম না। একদিন সকালে সাহস করে মুখ-ফুটে সিল্‌ভ্যাঁকে বল্লুম—"আজ আমাকে একবার সহরে নিয়ে চলুন না।" সিল্‌ভ্যাঁ কোনো জবাব করলে না; তার সেই বড় বড় চোখ মেলে আমার পানে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর বল্লে—"যারা ভেড়ার বাচ্ছা পালন করে, বাচ্ছাদের একলা রেখে তাদের কোথাও যেতে নেই।" সে বল্লে যে, আমাকে গ্রামের গির্জ্জেয় নিয়ে যেতে তার আপত্তি নেই; কিন্তু সহরে যাওয়া কিছুতেই হবে না। এই কথা শুনে আমি একেবারে নিস্পন্দ হয়ে গেলুম।—মনে হল, যেন একটা মহা অশুভ সংবাদ শুনলুম। যত-বারই ঐ কথা ভাবতে লাগলুম ততবার কেবল মারি এমেকে আমার মনে পড়তে লাগল। মনে হতে লাগল, তিনি যেন

একটি মহামূল্য দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী; দৈবাৎ চাষা সেট একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ভেঙে ফেল্লে!

পরের শনিবার চাষা ও তার স্ত্রী সকাল-বেলা সহরে চলে গেল; প্রত্যেকবার দেখতুম ফিরতে সন্ধ্যে হত; কিন্তু এবার দেখলুম একজন ভেড়া-কেনবার খরিদ্দার সঙ্গে করে বিকেলের মধ্যেই তারা ফিরে এল। আমার ধারণাই ছিলনা যে সহরে গিয়ে এত শীঘ্র ফেরা যায়। আমার মনে হল, তবে ত আমিও একদিন দুপুরবেলা ভেড়ার পাল মাঠে ছেড়ে চট্ করে একবার মারি এমের সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসতে পারি! কিন্তু দেখলুম, সে সুবিধে নয়, তাই রাত্রিবেলায় যাওয়া স্থির করলুম। ভাবলুম, চাষার গাড়ির ঐ ঘোড়াটা যতক্ষণে যায় নিশ্চয় তার চেয়ে বেশী সময় আমার লাগবেনা; তাহলে মাঝরাত্রে বেরিয়ে, ভোর বেলায় ভেড়ার পাল মাঠে বার করবার সময়ের মধ্যেই ঠিক এসে পৌছতে পারব।

সে-রাত্রে আর কাপড় ছাড়লুম না—সবসুদ্ধ শুয়ে পড়লুম। বড় ঘড়িটায় যখন ঢং ঢং করে বারোটা বাজল, হাতে জুতো নিয়ে পা-টিপে-টিপে বেরিয়ে পড়লুম; একটা গাড়ির গায়ে ঠেসান দিয়ে জুতোর ফিঁতে বেঁধে নিলুম, তারপর একেবারে দৌড়! একদমে গোলাবাড়ির সীমানা পেরিয়ে এলুম। দেখলুম, রাত তত অন্ধকার নয়; কিন্তু জোর বাতাস বইচে; কালো কালো মেঘগুলো চাঁদের নীচে আকাশের গায়ে পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠছে। বড়-রাস্তায় গিয়ে উঠতে অনেকখানি পথ; মধ্যে একটা সাঁকো পার হতে হয়—সেটা মেরামতের অভাবে অমজবুত হয়ে আছে। বর্ষার জলে ছোট্ট নদীটি মোটা হয়ে ফুলে উঠেছে;—তার জলের ঝাপ্‌টা সাঁকোর পচা কাঠের ফাঁক দিয়ে চল্‌কে উঠেছে। আমার কেমন ভয় করতে লাগল;—হাওয়া এবং জল এই দুটোয় মিলে কেমন-একটা-ভীষণ ঝঙ্কার দিয়ে উঠছিল—তেমন শব্দ আমি জীবনে কখনও শুনিনি। কিন্তু ভয়কে আজ মানব না। আমি উর্দ্ধশ্বাসে সাঁকো পেরিয়ে গেলুম।

বড়-রাস্তায় পড়তে যতটা সময় লাগবে ভেবেছিলুম তার চেয়ে কম সময়ে পৌছে গেলুম। বাঁ-দিকের রাস্তাটা নিলুম—কারণ দেখতুম চাষা ঐ-দিক দিয়েই বাজারে যায়। কিছুদূর যেতেই দেখি রাস্তা দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে। এইবার কোন্ দিকে যেতে হবে জানতুম না। একবার এ-রাস্তায় খানিকটা, আবার ও-রাস্তায় খানিকটা—এমনি করে ছুটোছুটি করতে লাগলুম। শেষে মনে হল, বাঁয়ের রাস্তাটাই ঠিক হওয়া সম্ভব। আমি সেই পথই নিলুম। হাঁকু-পাকু করে যে সময়টা নষ্ট হয়েছে সেটা পুষিয়ে নেবার জন্যে আমি খুব তাড়াতাড়ি চলতে লাগলুম।

দূরে দেখলুম, প্রকাণ্ড একটা কালো জমাট অন্ধকার—সমস্ত গ্রামখানাকে গিলে রয়েছে। সেটা আমার দিকে ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল! মুহূর্ত্তের জন্য একবার মনে হল ফিরে পালাই। একটা কুকুর ডেকে উঠল, সেই শব্দে যেন সাহস এল; সেই-মুহূর্ত্তে দেখতে পেলুম আমার সাম্‌নের সেই কালো দৈত্যটা একটা বন তার মধ্যে

দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। বনের মধ্যে প্রবেশ করতেই হাওয়া ভয়ানক এলোমেলো হয়ে উঠল—থেকে-থেকে দমক দিতে লাগল। সেই ঘুরঘুট্টে অন্ধকারে, গাছে-গাছে ঠোকাঠুকি, ডালে-ডালে জড়াজড়ি হয়ে চারিদিকে কেবল কড়-কড় শব্দ উঠতে লাগল। বাতাসের চাপে বড় বড় গাছগুলো মাথা নুইয়ে গোঁ-গোঁ করতে লাগল। চারদিক থেকে অনবরত মড়-মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়বার শব্দ শুনতে লাগলুম।

হঠাৎ পিছনে কার পায়ের শব্দ শুন্‌লুম, কে আমার কাঁধে একবার হাত দিলে। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে চাইলুম, কিন্তু কেউ কোথাও নেই! সন্দেহ গেলনা;—নিশ্চয় আমার কাঁধে কেউ হাত দিয়েছে! তার ভুল নেই! পায়ের শব্দও তখনো শোনা যাচ্ছিল!—কে যেন অদৃশ্য হয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে! আমি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলুম—এমন জোরে ছুটছিলুম যে আমার পা মাটিতে পড়চে কি না বুঝতে পারছিলুম না।

আমার পায়ের ঠোক্কর লেগে পাথরগুলো ছিট্‌কে উঠছিল; পিছন থেকে তার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম—শিলাবৃষ্টির মতো। মনে তখন কেবল এক-কথা জাগছিল—দৌড়, দৌড়,—যে-পর্য্যন্ত-না বন-থেকে বেরুতে পারি কেবল দৌড়!

অবশেষে একটা ফাঁকা জায়গা পেলুম—বন সরিয়ে সেখানে ক্ষেত হয়েছে। ঘোলাটে চাঁদের একটুখানি আলো সেখানে পেলুম। ঝড়ের বাতাস গাদা-গাদা গাছের পাতা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে একবার উপরে তুলচে, আবার নীচে এনে ফেলেচে,—তার পর চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্চে।

একটুখানি দম নেওয়া দরকার। কিন্তু তখনো বড় বড় গাছগুলো বিকট শব্দে দোল খাচ্ছে। তাদের ছায়া কালো-কালো প্রকাণ্ড জানোয়ারের মতো একবার পথের উপর এসে শুয়ে পড়ছে আবার গাছের পিছনে সরে গিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছে। এক-একটা ছায়ার চেহারা যেন আমার জানা। কিন্তু এদের অধিকাংশই এমন-করে আমার সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল যেন পথ আগলে আমায় কিছুতেই যেতে দেবে না। গোটাকতক ছায়া আমায় এমন ভয় দেখাতে লাগল যে আমি ছুটে লাফ দিয়ে তবে তাদের ডিঙিয়ে গেলুম—মনে হচ্ছিল তারা বুঝি আমার পা কামড়ে ধরবে!

বাতাসের বেগ একটু কমে এল—বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। ক্ষেতের অপর পারে আমায় যেতে হবে। রাস্তা খানিকদূর গিয়ে আবার বনের মধ্যে মিশে গেছে। সেইখানে এসে আমি একটা দেয়াল দেখতে পেলুম। একটু যেতেই বুঝলুম সেটা একটা বাড়ি। না ভেবে-চিন্তে দরজায় গিয়ে ধাক্কা মারলুম। ঝড় না থামা পর্য্যন্ত এইখানে থাকবার জন্যে একটু আশ্রয় চাইব। আবার ধাক্কা দিলুম। শুনলুম কারা একবার নড়ে উঠল; ভাবলুম নিশ্চয় এইবার দরজা খুলে দেবে, কিন্তু দেখি একতলার একটা জানলা মাত্র খোলা হল। একটা লোক, কাণ-ঢাকা টুপি-পরা, বলে উঠল—"কে রে!" আমি বল্লুম—"আমি!" "কে তুই!" "একটি ছোট মেয়ে।" লোকটা অবাক

হল; বল্লে—"ছোট মেয়ে?" জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাবি? কোত্থেকে আস্‌চিস? কি দরকার?" এত খোঁজ-খবর যে নেবে সে-কথা আমার মনেই হয়নি। আমি বল্লুম—"ঐ গোলাবাড়ি থেকে আসছি।" তারপর একটা মিছে-কথা বল্লুম। বল্লুম—"আমার মায়ের বড় অসুখ, তাই তাঁকে দেখতে যাচ্ছি।" বলে বৃষ্টির জন্যে একটু জায়গা চাইলুম। সে বল্লে—"আচ্ছা, দাঁড়া!" বলে আর-একজন কার সঙ্গে কি কথা কইলে, তার পর জানলার ধারে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, আমার সঙ্গে আর-কেউ আছে কি না। বল্লে—"তোর বয়স কত?" আমি বল্লুম—"তেরো বছর!" সে বল্লে—"তোর ত আচ্ছা সাহস! এতটুকু মেয়ে এই-রাত্রে ঝড়বৃষ্টিতে একলা বনে বেরিয়েছিস।" বলে সে জানলা দিয়ে ঝুঁকে খানিক দাঁড়িয়ে আমার মুখ দেখবার চেষ্টা করলে; তারপর এধার-ওধার-করে মাথা ঘুরিয়ে বনের অন্ধকারের ভিতরটা ঘাড় বাড়িয়ে একবার দেখে নিলে; তার পর আমায় পরামর্শ দিলে আরো-কিছু দূর এগিয়ে যাবার জন্যে। বল্লে, বনের ওপারে গ্রাম আছে, সেখানে কারুর বাড়িতে আমি কাপড় শুকিয়ে নিতে পারব।

আমি সেই-রাত্রে আবার চলতে লাগলুম। চাঁদ তখন একেবারে ডুবে গেছে; গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। অনেকখানি হেঁটে তবে গ্রাম দেখতে পেলুম। সমস্ত বাড়ি বন্ধ। এমন অন্ধকার যে বাড়িগুলো নজরেই পড়ে না। কেবল একজন কামার তখনো জেগে ছিল। আমি তার বাড়ির কাছে পৌঁছে, সিঁড়ির ধাপ দুটো উঠে গেলুম—ভাবলুম ঐখানে একটু জিরিয়ে নেব। সেই কামার দেখলুম একটা প্রকাণ্ড লোহার বাট গন-গনে কয়লার আগুনে তাতাতে দিয়েছে। হাপরের সঙ্গে তার হাত যখন খাড়া হয়ে উঠছিল, তাকে দেখাচ্ছিল যেন একটা দৈত্য! তারপর হাপর যতবার নেমে আসছিল ততবারই ফট্‌ফট্-শব্দে আগুনের ফুল্‌কি চার-দিকে ছিটিয়ে পড়ছিল। তারই আবছায়া আলোয় ঘরের দেয়ালটা থেকে-থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, তাইতে দেখতে পাচ্ছিলুম সেই দেয়ালের গায়ে কাস্তে, করাৎ ও নানারকমের ছোরা ছুরি ঝুলছে। লোকটার কপালটা কুঁচকে রয়েছে; সে একদৃষ্টে আগুনের দিকে চেয়ে আছে। আমি ভয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না; চুপি-চুপি পালিয়ে গেলুম।

যখন ভোরের আলো বেশ স্পষ্ট হয়ে এল তখন বুঝতে পারলুম সহর আর বেশী দূর নয়। মারি এমের সঙ্গে যে-সব জায়গায় বেড়াতে আসতুম সেগুলো চিন্‌তে পারলুম। আমি তখন খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিলুম—কোনো-রকমে পাদুখানাকে টেনে নিয়ে চলেছিলুম,—এমনি পায়ে ব্যথা হয়ে-ছিল। আমি তখন ভয়ানক শ্রান্ত;—রাস্তার দুধারে যে পাথরের ডাঁই তার উপর গিয়ে একেবারে থুবড়ি-খেয়ে বসে পড়বনা—এইটুকু মনের জোর ছাড়া আর-কিছুর শক্তি তখন ছিল না।

অত্যন্ত ব্যস্তভাবে একখানা গাড়ি ছুটে-আসার ঘড়ঘড় শব্দে আমি ফিরে চাইলুম। একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে

গেলুম,—বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল। সেই লাল ঘোড়া আর চাষার সেই কালো দাড়ি দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলুম। সে একেবারে আমার গা-ঘেঁসে এসে ঘোড়া থামালে; গাড়ি থেকে হেঁট হয়ে আমার কোমরবন্ধ ধরে চট্-করে আমায় তুলে নিয়ে তার পাশে বসালে এবং গাড়ির মুখ ফিরিয়েই ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। বনের মধ্যে এসে পড়তে তবে সিল্‌ভ্যাঁ ঘোড়ার বেগ কমিয়ে আনলে। তখন আমার দিকে ফিরে চেয়ে বল্লে—"ভাগ্যিস্ আমি তোমায় দেখতে পেলুম, নইলে দুই পাহারাওলা দুইধারে ঘিরে তোমায় ধরে নিয়ে আসত।" আমি কোনো উত্তর করলুম না দেখে সে আবার বল্লে—"যে-সব ছোটো মেয়েরা পালায় তাদের ধরবার জন্যে পাহারাওলা আছে—জান!" আমি বল্লুম—"আমি মারি এমেকে দেখতে যাব।" সে বল্লে—"কেন, আমাদের কাছে থাকতে কি তোমার কোনো কষ্ট হচ্ছে?" আমি বল্লুম—"আমি মারি এমের কাছে যাবো।" সে এমনি করে চেয়ে রইল যেন আমার কথা বুঝতে পারলে না; নানা-রকম প্রশ্ন করতে লাগল; তার পর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে গোলাবাড়ির প্রত্যেক লোকের নাম করে-করে আমায় জিজ্ঞাসা করলে যে, সবাই আমায় ভালোবাসে কিনা। আমি বারবার সেই একই কথা বলতে লাগলুম—"মারি এমের কাছে যাবো!" অবশেষে তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল, সে সোজা হয়ে বসে বল্লে—"কি একগুঁয়ে মেয়ে!" আমি তার মুখের উপর বল্লুম—"মারি এমের কাছে না নিয়ে গেলে আমি আবার পালিয়ে আসব।" উত্তরের অপেক্ষায় আমি তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম; স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, সে কি উত্তর দেবে খুঁজে পাচ্ছে না। খানিকক্ষণ সে চুপ করে রইল, খানিকক্ষণ কি ভাবলে, তারপর আমার গায়ে হাত দিয়ে বল্লে—"লক্ষ্মীটি, স্থির হয়ে শোনো আমি কি বলি।" বলে সে যা বল্লে তাতে এই বুঝলুম যে, আমার আঠারো বছর বয়স পর্য্যন্ত আমাকে তার কাছে কাছে রাখবে বলে সে কথা দিয়েছে;—তার মধ্যে আমার একদম সহরে যাবার যো নেই। আরো বুঝলুম যে, গুরু-মা আমাকে নিয়ে যা-খুসি করতে পারেন; আমি যদি ফের পালিয়ে আসি তাহলে আমাকে চাবি-বন্ধ রাখবার ব্যবস্থা হবে। চাষা বল্লে, আমি ছেলেবেলায় যে আশ্রমে ছিলুম তার কথা যেন ভুলে যাই; এখন তার প্রতি এবং তার স্ত্রীর প্রতিই যেন আমার সমস্ত অনুরাগ গিয়ে পড়ে—কারণ আমি যাতে সুখী হই তাদের সেই কামনা। আমার কান্না পেতে লাগল—অনেক কষ্টে সে কান্না চেপে রাখলুম। চাষা আমার হাত ধরে বল্লে—"চল, মনে কোনো দুঃখ রেখো না। আমাদের তুমি আপনার বলে ভেবো;—কি বল?" আমি তার হাতের উপর হাত রাখলুম, সে আমার হাতখানাকে জোরে চেপে ধরলে। আমি বল্লুম,—"আমি ত পর ভাবচি না।" চাষা অমনি ফটাস্ করে চাবুকের এক শব্দ করলে। অবিলম্বে আমরা বন পেরিয়ে গেলুম। তখনও বৃষ্টি পড়ছে কিন্তু খুব পাতলা—কুয়াশার মতো। ক্ষেতগুলো সব খাঁ-খাঁ করছে—জনমানব নেই! খানিকদূর যেতে দেখলুম রাস্তার পাশে একটা ক্ষেতে একটা লোক আমাদের দিকে হাত-নাড়তে-নাড়তে আসচে। প্রথমটা আমার মনে হল সে যেন আমাকে ভয় দেখাচ্চে, তারপর সে যখন খুব কাছে এল দেখলুম বাঁ-হাতে তার কি রয়েছে, আর ডান-হাতটা কেবল উঠছে আর পড়ছে—যেন কাস্তে চালাচ্চে। আমি হতভম্ব হয়ে সিল্‌ভ্যাঁর মুখের দিকে চাইলুম। যেন একটা প্রশ্নের জবাব দিচ্চে এই ভাবে সে বল্লে—"ও বীজ বুনচে।" কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা গোলাবাড়িতে এসে পৌঁছুলুম। চাষার স্ত্রী আমাদের অপেক্ষায় দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখে তার মুখের হাঁ সে খুল্লে—যেন অনেকক্ষণ সে নিশ্বাস নেয় নি; তার সেই গম্ভীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখ মুহূর্ত্তের জন্য একবার নিরুদ্বিগ্ন হল। আমি তার পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে ঘর থেকে আমার সেই লম্বা জামাটা নিয়ে একেবারে খোঁয়াড়ের দিকে দৌড়ুলুম। ভেড়াগুলো একটার ঘাড়ে একটা পড়তে-পড়তে হুহু করে বেরিয়ে এল। তাদের মাঠে যাবার সময় তখন অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

অভিভাষণ না অতিভাষণ?

[২]

সম্প্রতি বাংলা দেশের খেতাবী রাজা-মহারাজেরা একটু-আধটু কেতাবী কস্‌রৎ সুরু করেছেন। এ খুবই আহ্লাদের কথা। বর্ত্তমান যুগে কুলি-মজুরেরাও যখন আত্ম-প্রকাশের জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে, তখন হুজুরেরা যে হবেন তার আর বিচিত্র কি? আর লিখ্‌তে-লিখ্‌তেই তো সরে, অতএব লিখে যান্, ক্রমে চাই কি, পড়ার যোগ্য লেখাও হয়তো একদিন লিখ্‌তে পার্‌বেন। এখন নেবে পড়েছেন ভালোই করেছেন; —জলে না নাব্‌লে কি কখনো সাঁতার শেখা যায়? অবশ্য এতে-ক'রে এখনকার লেখা সম্বন্ধে গুরু-স্থানীয়দের একটু বিপদ আছে। যাঁরা নব্য বঙ্গকে কলম ধরতে শিখিয়েছেন, আনাড়িদের হাতে তাঁদের একটু-আধটু কলমের খোঁচা সহ্য করতে হবে। তা' যাঁরা সাঁতার শিখিয়ে থাকেন, তাঁদেরও এই দশা;—আনাড়ি সাক্‌রেদের বে-কায়দা রকমের অঙ্গবিক্ষেপে চোট-খাওয়া তাঁদের অঙ্গের ভূষণ। হাত-পা-ছোড়া যখন সাঁতারের অঙ্গ, আর ওস্তাদকেও যখন সঙ্গে-সঙ্গেই থাক্‌তে হয়, তখন সময়-বিশেষে হাতটা পাটা গায়ে এসে লাগ্‌লে—এমন কি জোরে লাগলেও—আনাড়ি বলে মাপ করতে হয়,—রাগ করতে নেই। তবে সাক্‌রেদ যদি নেহাৎ বে-আদব হয় অর্থাৎ গুরু-মারা বিদ্যে জাহির করে তবে ডুবিয়ে না মারা হোক, এক-আধবার চুবিয়ে ধরা মন্দ নয়।

গ্যালো-ব'শেখের 'সাহিত্য-সংহিতায়' কাশিম বাজারের খেতাবী মহারাজের স্বাক্ষরে বে-কায়দা চিত্ত-বিক্ষেপের একটি অপূর্ব্ব নমুনা ছাপা হয়েছে। রচনাটির নাম "সভাপতির অভিভাষণ"। তা' না হয়ে আনাড়ির অতিভাষণ হলেই ঠিক হত। কারণ এ-লেখায় প্রবীণ কাশিমবাজারের চিন্তাশক্তির বা রসবোধের কোনো পরিচয়ই নেই;—থাকবার মধ্যে আছে শুধু অনভ্যাসের হাঁসফাঁসানি আর অকারণ উষ্মার কস্‌কসানি। তাঁর এই অতিভাষণ পড়লে খালি এই কথাটাই আগে মনে হয় যে, তাঁর হরিনাম কীর্ত্তন করবার এখনো অধিকার হয় নি; তিনি বছর-বছর মচ্ছব দিয়ে মিথ্যে টাকা খরচ করচেন,—তিনি অমানীও নন্, মানদও নন্। তরুর সহিষ্ণুতা তাঁর নেই, তৃণের বিনয়ও না। অন্ততো এই অতিভাষণ যদি তাঁর নিজের লেখা হয়, তবে রচনায় রচয়িতার যে মনের ফোটো উঠেছে তা মোটেই বৈষ্ণবের ছবি বলে কারো ভ্রম হবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নেই।

[২]

মহারাজের উষ্মার প্রথম চোট্‌টা পড়েছে কল্‌কেতার একদল লেখকের উপর। এই লেখকেরা অকথ্য ভাষা ত্যাগ ক'রে কথ্য ভাষায় বই লিখ্‌তে সুরু করেছেন—এই তাঁদের অপরাধ! তাঁদের ভাষা চল্‌তি ভাষা,—অচল নয়। যা আপনার তেজে চল্‌ছে এবং কোটি কোটি লোককে চালাচ্চে সেই চল্‌তি ভাষা। যে ভাষা পরমহংসের মানস-যজ্ঞের চরু ঘরে-ঘরে বিতরণ করছে, যে ভাষা বিবেকানন্দের বীরবাণী শমীশাখার মতন আপনার বুকে অনায়াসে ধারণ করতে পেরেছে, যে ভাষা রবীন্দ্রনাথের স্পর্শে পারিজাতের ফুল ফুটিয়ে বিশ্ব-দেবতার চরণ বন্দনা করেছে, এ সেই চল্‌তি ভাষা। এই ভাষায় গিরিশচন্দ্রপ্রমুখ নাট্যকারেরা শত-শত নাটক রচনা করেছেন, আর সেই সকল নাটক পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর বঙ্গের জেলায় জেলায় নগরে-নগরে গ্রামে-গ্রামে আজ অভিনয় হচ্চে; কই কারো তো বুঝতে অসুবিধা হচ্চে না; বেশ মশ্‌গুল্ হয়ে সব শুন্‌ছে। এ ভাষা হাসতে জানে, হাসাতে জানে, তার সাক্ষী "হুতোম," তার সাক্ষী "বুড়োশালিক," তার সাক্ষী "সধবার একাদশী"। এ ভাষা রং ফলাতে জানে, তার সাক্ষী "রাজকাহিনী" "ক্ষীরের পুতুল" "নালক"। এ ভাষা মন-গলাতে জানে, তার সাক্ষী একদিকে "ভাঙা বাগান জোগান দেওয়া ভার" অন্যদিকে "মন হারালি কাজের গোড়া" "নাম রেখেছি হরিবোলা"। এ ভাষা মাতাতে জানে, তার সাক্ষী "পরিব্রাজক" "ভাববার কথা"। এ ভাষা ভাবাতে জানে, তার সাক্ষী সতেরো মহল "শান্তিনিকেতন"। অন্দরে এ "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা" শোনায়, বাইরে এ "হিমালয়ের" দুর্গম পথে সেথোর কাজ করে। "ঘরে-বাইরে" এই চল্‌তি ভাষার সমান প্রতিপত্তি।

দক্ষিণ-দেশী এই মধুর ভাষা দক্ষিণে হাওয়ার মতন বাংলা সাহিত্যের কুঞ্জে কুঞ্জে কুঁড়ি ধরিয়েছে, ফুল ফুটিয়েছে। দর্শনের গভীর তত্ত্বকে এ সরস করেছে, শিল্পের সূক্ষ্ম তত্ত্ব এ পরিষ্কার ক'রে প্রকাশ করেছে। গানে, কবিতায়, নাটকে,

গল্পে, নক্সায়, উপন্যাসে এর ক্ষমতার তুলনা নেই। দক্ষিণ-বাংলার এই চল্‌তি ভাষা—একে প্রাকৃত বলে নাক-সেঁট্‌কালে চল্‌বে না—এ মধুর, এর মনোহরণের ক্ষমতা আছে; এ উদার, এর গ্রহণ করবার শক্তি আছে, আপনার ক'রে নেবার সামর্থ্য আছে। এ বাঙালীর শিক্ষা-সাধনের কেন্দ্রের ভাষা, এ বাংলাদেশের রাজধানীর ভাষা। প্রাকৃত হলেও, এ আমাদের একাধারে সৌরসেনী এবং মহারাষ্ট্রী। এ আবার গানেরও ভাষা, সুতরাং মাগধীও বটে। বাংলার অন্য বিভাগে যদি তেমন-কোনো গুণাঢ্য জন্মগ্রহণ করেন তবে বঙ্গীয় পৈশাচীটাও না-হয় আমরা মেনে নেব। নৈলে শুধু বৃহৎকথার সমষ্টিতে যে পৈশাচী তৈরী হচ্ছে, সেটাকে দীর্ঘকর্ণ ভিন্ন কেউ বেশী দিন কানে তুল্‌বে না। পূর্ব্ব বা উত্তর বঙ্গে কোনো কালে যদি মিস্ট্রাল্ বা রবার্ট বার্ণসের মতন কবির উদয় হয়; তবে আমরা সাগ্রহে আমাদের গ্রেট-বেঙ্গলের পাড়াগেঁয়ে প্রভেন্সাল্ বা খচমচ স্কচ্ ভাষাটাও আয়ত্ত ক'রে নেব।

তারপর বাংলার মুসলমানদের কথা। এঁদের দিল্লীওয়ালা মুরুব্বিরা যখন হাফিজ সাদির ভাষাকে তালাক্ দিয়ে সুবিধার খাতিরে বাজারে' উর্দ্দু ভাষাকে আমল দিয়েছেন, তখন এঁদের কাছে "হইতেছে" বা "হবার লাগ্‌ছে" প্রভৃতি দিগ্‌গজ লম্বা কথার বদলে "হচ্চে" লেখাটা সুবিধার হিসাবেই গ্রাহ্য হবে।

ভাষার গতি পাহাড়ে'-নদীর মতন। নদী যেমন পৈঠায় পৈঠায় নাব্‌তে থাকে এবং স্তরে স্তরে নূতন ক'রে ঢেউয়ের লীলা দেখিয়ে চলে, ভাষাও তেম্‌নি যুগে-যুগে চেহারা বদ্‌লে নূতন-নূতন সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে চল্‌তে থাকে। কেতাবের যে অচল-ঠাট পিছনে বরফ হ'য়ে জমাট হ'য়ে আছে, সেখান থেকেও ওকে খোরাক সংগ্রহ করতে হয় সত্য বটে কিন্তু ওর প্রধান অবলম্বন হচ্চে মেঘের জন্মদাতা সমুদ্র;—সকলের নীচে যার জায়গা, চঞ্চলতা যার প্রধান লক্ষণ সেই লক্ষ জিহ্বার স্পন্দনে ওতঃ-প্রোত প্রাকৃতজনের ভাষা। আদিতেও সে, অন্তেও সেই।

ভাষার পরিবর্ত্তন হচ্ছে, এ সবাই জানে; নইলে বেদের ভাষা শ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত না-হ'য়ে আজো জ্যান্ত মানুষের মুখে-মুখে উক্তিই থেকে যেত। এ পরিবর্ত্তন একেবারে নিঃশব্দে হয় না। পুরোনো বঙ্গদর্শনের ফাইল উল্টে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারা যায় বিদ্যাসাগরী ভাষার উপর বঙ্কিমচন্দ্রী দল কি-রকম বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ ক'রে গেছেন। ঐ অস্ত্র-প্রয়োগের ফলে "হইবেক" "করিবেক" প্রভৃতির রেঢ়ো ক-কারটা দুচার-দিন ককিয়ে শেষে খসে গেল; কল্‌কেতারই জয়জয়কার। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রী ভাষাকে আরও সহজ করেছেন ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি;—তাঁরা বাংলা সংবাদপত্র জিনিসটা চালাতে গিয়ে দেখ্‌লেন যে, ও বস্তু জনসাধারণের বোধগম্য করতে হ'লে বিদ্যাসাগরী এমন-কি বঙ্কিমচন্দ্রীতেও চল্‌বে না। সুতরাং পাঁচজনের মুখ-চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রী পঞ্চানন্দীতে পরিণত হ'ল। কাজেই দেখা যাচ্ছে "অশিক্ষিতদের বোঝাবার চেষ্টা একটি

ভান মাত্র" নয়। এই-রকমে বছর-পঞ্চাশের ভিতর আমাদের মৃতুঞ্জয়ী বার-পাঁচ-সাত ভোল্ বদ্‌লেছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে যাঁরা এই সমস্ত অদল-বদল করেছেন তাঁরা কেউ অবিচ্ছিন্ন "উর্দ্ধগতির টানে" হ্যাঁচ্‌কা-হেঁচ্‌কি ক'রে ভাষার প্রাণ-ওষ্ঠাগত ক'রে তোলেন নি; "আদর্শে উপস্থিত" (!) হবার জন্যে অর্থাৎ ফিরি-ফির্‌তি মেঘে পরিণত করবার জন্যে গেলাস ভরা পিপাসার জল তাতিয়ে-তাতিয়ে বাষ্প ক'রে উড়িয়ে দ্যাননি। "বঙ্গদর্শন" "সাধনা" ও "সবুজপত্র" ভাষাকে ক্রমে সহজ করে এনেছে সত্য, কিন্তু তাই বলে ও-ব্যাপারটা ঐ সব কাগজের সম্পাদকদের "ভাষা ও ভাব দৈন্যের সূচক" একেবারেই নয়। কথাটা বুঝ্‌তে হ'লে একটু বুদ্ধি খরচ করা দরকার,—অবশ্য থাক্‌লে; নইলে পঞ্জিকার "অমুক রাশির জমা শূন্য, খরচ তিন"-এর মতন অবস্থায় পড়লে গা-ঢাকা হওয়াই মঙ্গল। কাগজ-পত্রে ফাজিল দেখানোটা মোটেই সুবিধা নয়।

[৩]

খেতাবী মহারাজের উষ্মার দ্বিতীয় চোট্ নবীনসম্প্রদায়ের নব্যভাবের উপরে। "স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ * * * তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্য কাড়াকাড়ি করে, কেননা সে পূজনীয় নয়; পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবী করে থাকে।" রবীন্দ্রনাথের একখানি উপন্যাসের চরিত্রবিশেষের এই উক্তি পড়েই ধীরোদাত্ত-গুণান্বিত মহারাজের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে। তিনি বল্‌ছেন এতে না কি পতিভক্তির অত্যুন্নত (!) আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে এবং এ অপরাধের নাকি মার্জ্জনা নেই। মহারাজের শ্রীমুখের রায় যদি সত্য হয় তাহ'লে বৈষ্ণব-কবি জয়দেবেরও মার্জ্জনা নেই; কারণ তিনি "দেহিপদপল্লবমুদারম্" লিখে—(১) পতিভক্তির অত্যুন্নত অশ্বডিম্বকে পদাঘাতে চূর্ণ করেছেন, (২) পতিভক্তির উল্টো পত্নীভক্তিয় প্রশ্রয় দিয়েছেন (৩) পুরুষোত্তমকে দিয়ে নারীর পায়ে ধরিয়েছেন, (৪) ভগবানকে মানুষের অধম প্রতিপন্ন করেছেন; কারণ মনু-শাসিত সনাতনধর্ম্মী মানুষ স্ত্রীর কাছে পূজো দাবী ক'রে থাকে, আর জয়দেব শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে স্ত্রীর (?) পাদপদ্ম মাথায় করিয়েছেন। বহরমপুরী এই রায় বাহাল হ'লে দেশের শাক্ত, বৈষ্ণব কেউ আর রেয়াৎ পাবে না, কারণ শাক্তের যিনি ইষ্টদেবী তিনি পতির বুকে পা রেখেছেন, আর বৈষ্ণবের জপের মন্ত্রে আগে রাধা, তার পরে কৃষ্ণ। বৈষ্ণবশাস্ত্র বল্‌ছেন এর উল্টো বল্লে না কি ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। বৈষ্ণব মহারাজের রায়-অনুসারে সুতরাং বৈষ্ণব শাস্ত্রও রসাতলে গেল। মহারাজের উক্তি মেনে নিলে দেশের শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবের শাস্ত্র এবং বৈষ্ণব-কবিদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ পদে আছেন। কারণ তিনি Sadism বা Masochism দুয়ের একটাকেও প্রশ্রয় দ্যান্‌নি; স্ত্রী-পুরুষের সমান প্রেমের সম্বন্ধই ঘোষণা করেছেন। মানুষের অন্তরবৃত্তির যা শ্রদ্ধেয়, যা স্থায়ী, যা রুচি ও ন্যায়সঙ্গত তারই জয়গান করেছেন। স্ত্রী বা পুরুষ কারো মর্য্যাদা খাটো করেন নি। এই ত কবির যথার্থ কাজ।

[৪]

এইতো গেল নব্যতন্ত্রের লেখকদের ভাষা আর ভাব সম্বন্ধে। এরপর রবীন্দ্রনাথের "বাইরে-বাইরে" সম্বন্ধে সাহিত্য-সভার বর্ত্তমান অভিভাষণকারী যা' বলেছেন তাতে মনে হয় তাঁর পক্ষে উক্ত কেতাব পড়া অন্ধের পক্ষে হস্তীদর্শনের ন্যায় হয়েছে। কারণ সমগ্র বইখানির যা তাৎপর্য্য তা তিনি ধরতে পারেন নি;—বুঝেছেন উল্টো। উল্টে নিজের বুদ্ধির দোষ লেখকের ঘাড়ে চাপিয়ে বেশ-একহাত মাতব্বরী ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু ঐ রকম ক'রে খণ্ডভাবে দেখ্‌লে রাম লক্ষ্মণ থেকে আরম্ভ ক'রে সকল চরিত্রই যে মলিন—সকল কাব্যই যে হেয়, তা প্রতিপন্ন করা যায়। ধরুন যেমন রামায়ণে রামের অভিষেকের দিন হঠাৎ বনবাসের হুকুম শুনে লক্ষ্মণ বল্‌ছেন—

"প্রোৎসাহিতোঽয়ং কৈকেয্যা
স দুষ্টো যদি নঃ পিতা।
অমিত্রভূতো নিঃশঙ্কং
বধ্যতাম্ বধ্যতামিতি ॥"

আরও দেখুন—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য
কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য
কার্য্যং ভবতি শাসনম্ ॥"

এই দুটি শ্লোক পড়ে কী বল্‌তে হবে? বাল্মীকি হিন্দু-সমাজকে গুরুজনের কান-মলে দিতে বল্‌ছেন? না পিতৃহত্যা করতে শেখাচ্ছেন?

আসল কথা, হুনর না থাক্‌লে জহরতের দালালি করতে নেই, খামকা ফোঁপর-দালালি করতে গেলে ফাঁপরে পড়তে হয়। সাহিত্য কাকে বলে আগে সে জ্ঞানটুকু অর্জ্জন ক'রে সাহিত্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করতে হয়।

সাহিত্য গুরুঠাকুরের তল্পীদার নয়, গ্রাম্য পঞ্চায়তের চৌকীদারও নয়। সমাজের বন্ধন কিসে অক্ষয় হবে বা দারোগার শাসন কিসে অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে—এসব কথা সাহিত্য ভুলেও ভাবতে যায় না; হৃদয়ের বন্ধন পাছে শিথিল হয়ে যায়, শুধু এই ভাবনায় তার চোখে ঘুম নেই। আদি-রস তার আস্থায়ী, শান্ত-রস তার আভোগ, বাৎসল্যে সে গদ্‌গদ, করুণায় সে আর্দ্র্য, রস-স্বরূপের সে প্রতিবিম্ব, রসসমুদ্রের সহস্রদল পদ্ম।

সাহিত্য সেই—"বহুরে যে করে এক, বিচিত্রেরে করে যে সরস।" সাহিত্য সেই যা বন্ধুভাবে মানুষের সঙ্গে রসালাপ করে! পাড়ার ডাংপিটে ছেলেটার সম্বন্ধে সে সব-সময়ে যে মন্দ বলে তা নয়, পুঁটলি-হস্ত পুরুতঠাকুরেরও সে সব-সময়ে মর্য্যাদা রেখে কথা কয় না। সাহিত্য ধ্রুবপদের ধ্রুবলোক নয়, খেয়ালের রং-মহল। কালকেতুর স্রষ্টা তাকে যেমনটি গড়তে চেয়েছেন সে তাই হয়েছে, কীচকের কবি কীচককে যেমনটি করেছেন সে তেমনি হয়েই আছে। সন্দীপের বিধাতা কালকেতুও গড়তে চান্‌নি, কীচকও আঁকতে চান্‌নি, তাই সন্দীপ কালকেতুও হয়নি, কীচকও হয়নি, সন্দীপ সন্দীপই হয়েছে। সেইজন্যে সাহিত্যে তার জায়গা আছে, নইলে সে কালকেতু হ'লে তাকে ফেলে দিতুম, কীচক হ'লেও

রাখতুম্ না। কারণ সাহিত্যের নোয়ার আর্কে (Noah's ark) একজাতের প্রাণী বা একই রকম জিনিষ একাধিক রাখবার জায়গা নেই।

এ সমস্তই সাহিত্যের গোড়াকার কথা, এ সমস্ত যাঁরা জানেন না তাঁদের পক্ষে সাহিত্য আলোচনা করতে যাওয়া বিড়ম্বনা, আর সমালোচনার আসরে তাল-ঠোকা ধৃষ্টতা। সাহিত্য-পরিষদের জন্যে ই পাঁজাই পোড়ান আর রসিক বৈষ্ণব মাল্‌পোই খাওয়ান, বিধাতা যাঁদের রস ছান্‌নি হাজার চেষ্টাতেও রসিক-সমা তাঁদের জায়গা হবে না। তাই ক বলেছেন—

"জড়মতি কি করিবে করি অধ্যয়ন?
কলপ মাখিলে বুড়া পায় কি যৌবন?"

শ্রীনবকুমার কবি

মাসকাবারী

হাসির গান

আষাঢ় মাসের "সবুজপত্রে" শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী-মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান লইয়া একটি উপভোগ্য ও মনোজ্ঞ রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদেরও বিশ্বাস দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার বিশেষত্ব তাঁহার হাসির গানেই বিশেষভাবে ফুটিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় গম্ভীর সমালোচকেরা তাঁহার সে-দিকটায় তেমন করিয়া দৃষ্টি দেন না—বোধ হয় তাঁহারা ভাবেন ও-কেবল হাসি-ঠাট্টা! এই হাসির মর্য্যাদা বুঝাইয়া দিয়া চৌধুরী-মহাশয় ভাল করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার উজ্জ্বল আলো, "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমি"র বাইরেও পড়েছে। তাঁর "দেশাত্মবোধে"র প্রকৃত এবং প্রকৃষ্ট পরিচয় তাঁর হাসির গানের ভিতরেই পাওয়া যায়। আমাদের নব শিক্ষার আলোকে, প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং বর্ত্তমান ইউরোপের তুলনায় আমাদে বর্ত্তমান হীনতাই প্রথমে নজরে পড়ে তাই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর হাসির গানে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তার না দেশপ্রীতি—দেশভক্তি নয়। যেখানেই প্রীতি আছে, সেখানে প্রিয় ব্যক্তির শুভকাম করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। আম যাকে ভালবাসি, তাকে আমরা দেহে, মনে চরিত্রে, সবল সুস্থ ও সুন্দর করে তুলতে চাই। এবং এর জন্য তার দোষ দেখিয়ে দিতে আমরা কুণ্ঠিত হইনে, তাকে ব্যঙ্গ দিতেও ভয় পাইনে। বিদ্রূপের হাসি সাহিত্য-জগৎকে উজ্জ্বল করে রেখেছে দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক গানের প্রাণ হচ্ছে এই বিদ্রূপের হাসি। দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদে জাতীয় দৈন্য এত মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে ছিলেন যে, তাঁর হাসি কান্নারই রূপান্তর মাত্র। দুই উপায়ে আত্মজ্ঞান উদ্রেক কর যেতে পারে—এক যুক্তিতর্কের সাহায্যে, আ

এক বিদ্রূপের দ্বারা। যিনি আমাদের মনের উপর জ্ঞানের আলো ফেলেন, তাঁর উপরেও আমাদের রাগ হয়,—আর যিনি হাসির আলো ফেলেন, তাঁর উপরে তার চাইতেও ঢের বেশী রাগ হয়, কেননা হাসির অন্তরে যে দাহিকাশক্তি আছে জ্ঞানের অন্তরে তা নেই। এ জাতীয় লেখকদের সমাজ প্রথমে শত্রু বলেই জ্ঞান করে। কেননা তাঁরাই যে সমাজের যথার্থ বন্ধু—সে সত্য আবিষ্কার করতে সময় লাগে। সুতরাং যে সমাজ রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন, সে সমাজের নিকট দ্বিজেন্দ্রলাল যে শুধু বাহবা ও করতালি লাভ করেছিলেন, এ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। তারপর দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ও কবিতা, কাব্য বলে গ্রাহ্য করবার অনেক বাধা ছিল। তাঁর ভাষা যেমন অপূর্ব্ব, তাঁর ছন্দবন্ধও তেমনি অপূর্ব্ব। রচনার যে ভঙ্গীটি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত নয়, যে ধরণের কথা আমাদের শোনা অভ্যেস নেই, তা উচ্চারণ করবামাত্র আমাদের কাণে বিসদৃশ লাগে। এত বাধাবিপত্তিসত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের গান বাঙ্গালী-সমাজের কাছে যে এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার একমাত্র কারণ তাতে রস ছিল। শাস্ত্রমতে হাস্য-রসও রস।

*
* *

পাঠোন্মত্ততা

দেখা যায় এদেশে লেখক ও পাঠকদের ভিতরে এমন একদল লোক আছেন, যাঁহাদের পড়িবার বাতিক বড়ই বিষম। পড়াশুনা করা কিছু মন্দকথা নয়—কিন্তু "গ্রন্থকীটে" পরিণত হইলে উল্টা-বিপত্তির খুবই সম্ভাবনা। এ-শ্রেণীর পাঠোন্মত্ত লোকদের জন্য সহযোগী "বিজ্ঞান" বেশ-একটি মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পাঠোন্মত্ততা যতক্ষণ পাঠকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ আমাদের ভয়ের ততটা কারণ থাকে না; কিন্তু যখন তাঁহারা লেখকরূপে আবির্ভূত হন তখনই আমরা মুস্কিলে পড়ি। কারণ তাঁহারা যে-সব রচনা সাহিত্যের দরবারে আনিয়া হাজির করেন তাহাতে অনেক-বই-পড়া পাণ্ডিত্যের খোসা পাওয়া যায় কিন্তু শাঁস মেলে না; তাহাতে দেখা যায় কেবল ভাবের বস্তা চাপাইয়া মানুষের ঘাড় ভাঙ্গিবার উদ্যোগ হইয়াছে—ঘাড়ের উপর যে মাথাটি আছে তার প্রতি লক্ষ্যই নাই। বঙ্গ-দেশের এই-সব গ্রন্থ-পেটুক অজীর্ণ রোগগ্রস্ত জবস্থব সাহিত্যিকেরা সুচিকিৎসার গুণে আরোগ্য লাভ করিলে আমরা রক্ষা পাইব—এই আশায় আশান্বিত হইয়া ঐ মুষ্টিযোগের সারাংশ এত আগ্রহের সহিত উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"যেরূপ অত্যধিক ভোজনে শরীরের পুষ্টি সাধিত হয় না, সেইরূপ অত্যধিক অধ্যয়নে মনের পূর্ণতা সম্পাদিত হয় না। অত্যধিক পাঠের ভয়ঙ্কর দোষ এই যে অধীত বিষয়গুলি মস্তিষ্ককে অত্যন্ত গোলমাল করিয়া দেয়, ফলে অধ্যয়ন না করিলে যে ফল হইত, অধ্যয়ন করিয়াও সেই ফল হয়;—অর্থাৎ অত্যধিক অধ্যয়নে মানব অন্তঃসারশূন্য হয়। যাহারা অত্যন্ত পঠনপ্রিয়, তাহাদের পঠন একটা নেশার মত হইয়া দাঁড়ায়, তাহারা

সমস্তই পাঠ করে, সেগুলি বুঝুক আর নাই বুঝুক, যাহা সে বুঝিয়াছে, তাহা মনে থাকুক আর নাই থাকুক। বৈজ্ঞানিক-ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় এইরূপ পাঠোন্মত্ততা একরূপ আলস্যবিশেষ। ইহাতে পাঠকদের বুদ্ধিবৃত্তি সমস্তই গ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। তাঁহাদের নিজেদের বিচার করিবার ক্ষমতা লুপ্ত হয় এবং শুকবৎ অধীত বিষয় উচ্চারণ করেন। চিকিৎসকগণ বলেন এরূপ পঠনের দোষ অনেক—স্নায়ুকেন্দ্র অসুস্থ হয়, স্মৃতিশক্তি ক্ষয়িত হয়, চিন্তাপ্রণালী বিশৃঙ্খলিত হইয়া উঠে। এই শ্রেণীর পাঠকেরা পরের চিন্তায় বাস করে, অথবা পরের আদর্শের ক্রীতদাসস্বরূপ হইয়া জীবন যাপন করে।"

*
* *

সাহিত্য ও ভাষা-সমস্যা

জ্যৈষ্ঠের 'নব্যভারতে' শ্রীযুক্ত অকিঞ্চন দাস নামক জনৈক লেখক "সাহিত্য ও ভাষা-সমস্যা" নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমাদের মাসিক-সাহিত্যক্ষেত্রে যে কতটা বেওকুবি ও বেয়াদবির আবাদ হইতেছে, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে এই লেখাটির একটুখানি তুলিয়া দিলাম :—

"রবীন্দ্রনাথের নভেলপাঠে অনেক সংসারে আজ বিধবা বিনোদিনীর ন্যায় অনেক চোখের বালির সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালীর এতাদৃশ অধঃপতনের কারণ কি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণ নহেন? এইজন্য সর্ব্বাগ্রে আমরা বঙ্গের সাহিত্যগুরু বঙ্কিম-চন্দ্রকেই অধিক দোষী এবং দায়ী মনে করি। বাঙ্গালার একমাত্র দীনেশবাবুই (শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন?) গল্প-রচনার আদর্শ রক্ষা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন (!)"

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ভাল-মন্দ দু-রকম স্বভাবের ছবি আঁকিয়াছেন; কিন্তু মক্ষিকারা যে মধু ফেলিয়া ব্রণের দিকে ছুটে,—তার উপরে তাঁদের ত কোন হাত নাই! সু ও কু'র দ্বন্দ্ব লইয়াই বিশ্বসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে —এ-দুটির একটিকে বাদ দিলে অন্যটির সার্থকতা থাকে না। রাবণ না থাকিলে রাম, দুর্য্যোধন না থাকিলে যুধিষ্ঠির ফুটিবার অবকাশ পাইতেন না। এখানে কেউ যদি রাবণ বা দুর্য্যোধনের কার্য্যকলাপে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের আদর্শ গ্রহণ করে, তবে সেজন্য কেহ কি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইবেন? বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কলম ধরিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালী-সমাজের স্ত্রীপুরুষ আদর্শ-চরিত্র ছিল এমন কোন প্রমাণ নাই। তারপর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে মহৎ চরিত্রেরও অসদ্ভাব নাই। যে যুক্তিবলে বাঙ্গালী-সমাজে হীনতা প্রবেশ করিতেছে বলা হইয়াছে, সেই যুক্তিবলেই সে-ক্ষেত্রে মহত্ব অধিষ্ঠিত হইতেছে এ কথা বলা চলিবে না কেন? কিন্তু এ-সব কথা বলা মিছে;—কেননা যুক্তিতে আর-সবাইকে আঁটিয়া উঠিতে পারা গেলেও নির্ব্বোধকে বোঝ মানাইবে কে?

*
* *

ঋষি রবীন্দ্রনাথ

১৩২০ সালের 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, রবীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনা করিয়া

তাঁহাকে 'ঋষি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এই সূত্রে এতকাল পরে জনৈক লেখকের তাঁহার নাম করিয়া কোন লাভ নাই, কারণ রসসাহিত্যে তিনি অজ্ঞাতকুলশীল) দ্বিতীয় রিপু এমনি চাগিয়া উঠিয়াছে যে, জ্যৈষ্ঠের 'সাহিত্যে' তিনি রবীন্দ্রনাথকে মনের সাধে যা-ইচ্ছা-তাই গালি দিয়া হাল-ফ্যাসানের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

কবিকে বহুস্থানে বহুবার ঋষি বলা হইয়াছে—এ কিছু নূতন নয়। এর জন্য কাহারও অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিবার কারণ নাই। ঋষি সত্যদর্শী, এই সত্যদর্শনের পরিচয় যাঁহার মধ্যে পাওয়া যাইবে তিনিই ঋষি;—তিনি কবিই হোন, বৈজ্ঞানিকই হোন্ বা আর-কিছুই হোন্। প্রাচীন কালের ইতিহাসে, সাহিত্যে এই জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির ঋষির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এবং এই ঋষিরা যে মানুষ ছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে তার প্রমাণ আছে। আমাদের সাধারণের একটা ধারণা, ঋষি বুঝি আমাদের মত হাত-পা-ওয়ালা মানুষ নন, তাঁহারা সুধু কল্পনার জীব, সেইজন্য কোন চাক্ষুষ ব্যক্তিকে ঋষি নাম দিলে তাঁহারা চমকাইয়া ওঠেন। এদিকে কিন্তু উপনিষদাদিতে সকল ঋষির আরাধ্য রস-স্বরূপ ব্রহ্মকে কবি বলা হইয়াছে। সুতরাং ঋষিত্ব কবিত্বের চেয়ে বড় বলিয়া মনে করা যায় না। সে ক্ষেত্রে কবিকে ঋষি বলিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না।

১৩০৭ সালের 'ভারতী'তে আচার্য্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী-মহাশয় "ঋষিত্ব ও কবিত্ব" নামে যে সুন্দর ও বিখ্যাত প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, কাগজ কালি ও সময়ের অপচয় না-করিয়া প্রবন্ধ লেখক যদি সেটি একবার পড়িয়া দেখিতেন, তবে তাঁহারও চোখ ফুটিত এবং "সাহিত্যে"রও কয়েকখানি পাতা ছাঁকা রাবিশে ভরিয়া উঠিত না। স্থানাভাবের জন্য আমরা এখানে আচার্য্য শিবনাথের দু-একটি সিদ্ধান্ত তুলিয়া দিলাম মাত্র;—সংশয়ীরা মূল-প্রবন্ধের যুক্তি পড়িয়া সন্দেহ-নিরসন করিতে পারেন :—

"সত্যের সাক্ষাৎকারটা বড় জিনিস। ইহাকেই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান বলা যায়। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম চিরদিনই ছিল, আজও রহিয়াছে, আর কেহ কখনও লক্ষ্য করে নাই, লক্ষ্য করিয়াছিলেন নিউটন, এজন্য তিনি একজন ঋষি। * * * সাক্ষাৎ দর্শন বিষয়ে ঋষি ও কবি—দুই সমান। তুমি আমি জগচ্ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অনেক সময়ে আহা! আহা! করি, কেন আহা আহা করি. জানিনা, কবি দেখাইয়া দেন যে সকলের মূলে একটা বাঁধা-বাঁধি রহিয়াছে, একটা প্রেমের খেলা রহিয়াছে। ঋষির কার্য্যের ফলের ন্যায় কবির কার্য্যের ফলও উদ্দীপনা;—যে সৌন্দর্য্যবোধ তোমার আমার সকলের অন্তরে অপ্রবুদ্ধ অবস্থাতে থাকে, তাহা প্রকৃত কবির সংস্পর্শে প্রস্ফুটিত হয়। * * * ঋষি ও কবি উভয়ের কার্য্য পরস্পরের এত সন্নিকট যে ঋষি একসময়ে কবি এবং কবি একসময়ে ঋষি।"

'সাহিত্যে'র লেখক রবীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনা করিয়া তাঁহার 'অ-ঋষিত্ব' প্রতিপন্ন করিবার জন্য সুধু প্রেমের কবিতা তুলিয়াছেন, কিন্তু 'নৈবেদ্য' 'খেয়া' 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য' 'শান্তিনিকেতন' প্রভৃতির দিকে তুলিয়াও ফিরিয়া চান নাই। কারণ সে দিকটা ভয়ের দিক—সেদিকে ফিরিয়া চাহিলে

লেখকের নিজের অবস্থা কাহিল হইয়া উঠিতে পারে। সেইজন্য বলিতে হয়, এই-সব সমালোচকের উদ্দেশ্য, আলোচনা করা নয়, —সুধু গাল পাড়া। যাঁহাদের শক্তির অভাব, গালাগালিই তাঁহাদের সম্বল। সমালোচন-বিজ্ঞানের প্রথমভাগও যদি সাহিত্যের এই ভূঁইফোঁড় লেখকের পড়া থাকিত, তবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লইয়া আনাড়ির মতন এমন একবগ্‌গা আলোচনা করিতে পারিতেন না।

এই স্বয়ং-হাস্যাস্পদ লেখক আবার ঠাট্টার হুল ফুটাইতেও জানেন! ইনি আবার ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন "যদি কেহ রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় বিষয়-দর্শন ও তাহার 'অরূপের রূপ দেখা' কথার কথামাত্র বলেন, তবে রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহাকে অরসিক বলিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। তোমার বাঁধা গান শ্যামের ভাল লাগিল না বলিয়া বুঝিতে হইবে শ্যামেরই সুরবোধ নাই!"

লেখকের ঘটে যদি 'সিকিছটাক বুদ্ধিও' থাকিত, তবে বুঝিতে পারিতেন, এখানে যার-তার কথা হইতেছে না—কথা হইতেছে প্রতিভার অবতার রবীন্দ্রনাথের। প্রতিভার আলো যার কাছে অন্ধকার,—সেত অন্ধ বটেই। রাম-শ্যামের লেখা লোকের ভাল না-লাগিতেও পারে, কিন্তু কালিদাস, ভবভূতি, মাইকেল, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে যাহারা উড়াইয়া দিতে চায়, তাহাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভদ্র বিশেষণ যদি-কিছু থাকে, তবে তাহা "অরসিক"।

পৃথিবী জুড়িয়া আজ যাঁহার নামে জয়ধ্বনি উঠিয়াছে, যখন দেখি আপনার দেশবাসী চারিদিক হইতে তাঁহাকেই অপদস্থ করিবার ফিকিরে আছে, তখন সপেনহয়রের ভাষায় বলিতে হয়, বাঙ্গলাদেশের "Public has no sense for excellence." আর, সেইজন্যই তাহারা ভালো কবিতা বুঝিতে না পারিলেও, আপনাদের বুদ্ধির দোষ না দিয়া, দোষী করে কবিকেই!

*
* *

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত

N. C. Maitra Family Library
Narayan Chandra Maitra

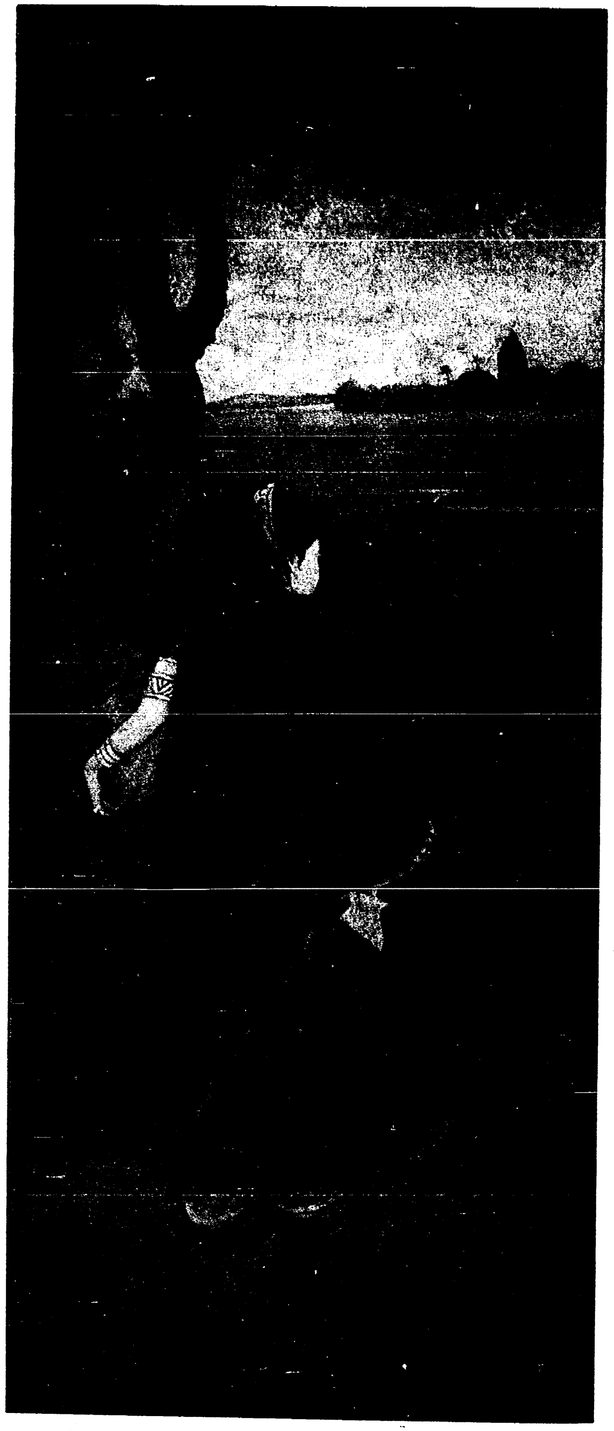

জল্‌কে
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দে অঙ্কিত

ভারতী

৪০শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩২৩ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

অতিপাণ্ডিত্যের উপদ্রব

ময়রার দোকানে যে রস তৈরী হয় তার একটি মাপকাঠি আছে, তার নাম ভাড়ু। কি-রকম রসে খাজা-গজা পাক করতে হয়, আর কি-রকম রসেই বা রসগোল্লা জীইয়ে রাখ্‌তে হয়, ভাড়ু তা সমস্ত জানে। কিন্তু কবি যার দোহ্না, রসিকের চিত্তরূপ কামধেনু যে রসের উৎস, আর রসাত্মক বাক্য যে বস্তুর দোহন-কার্য্যে বৎস-স্বরূপ, সে রসের কোনো বাইরের মাপকাঠি নেই। যাঁর যথার্থ চিত্তপ্রসাধন হয়েছে অথচ যাঁর অনুভূতি গভীর, যিনি মরমী অথচ মনীষী, কেবল তাঁরই অন্তর এখানে সাক্ষী। তিনিই বল্‌তে পারেন--কেবল তাঁরই অন্তঃকরণ বল্‌তে পারে—দোহাল যে-বাছুরটি সাম্‌নে ধরেছে সে জ্যান্ত, না মরা-বাছুরের খড়-পোরা ঠাট।

কিন্তু জগতে এ-রকম মণিকাঞ্চন যোগ দুর্লভ। যাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি চোখা-রকমের, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের রসবোধ ভোঁতা; আবার যাঁদের উপলব্ধি করবার সবিশেষ শক্তি আছে, তাঁদের হয়তো বিচক্ষণা নেই। তাই চণ্ডীদাস বলেছেন—

"রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহ ত রসিক নয়,
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয়।"

কবি চণ্ডীদাসের কালে যা' কোটির মধ্যে একটি হ'ত, কল-কারখানার কল্যাণে আমাদের কালে তা দেখ্‌ছি ক্রমে ছ্যা-ছ্যা হয়ে উঠল। তবে আসল জিনিসে আর কলের তৈরী নকলে যে-তফাৎ থাক্‌বার তা' অবশ্য থেকেই যাচ্চে। এখন আমরা সবাই—

"বড় কথা লিখি, বড় কথা কই,
জড় ক'রে নিয়ে পড়ি বড় বই;
এমনি করিয়া ক্রমে বড় হই,
কে পারে রাখিতে চেপে।"

চেপে কেউ রাখ্‌তে চায়ও না। তবে কষ্ট-ক্রিটিকদের দেঁতো রসিকতা আর গায়ে-পড়া সমালোচনার চাপ চুপ-করে' সয়ে যাওয়াও রক্ত-মাংসের শরীরে সম্ভব নয়। বোধহয় এম্‌নি-ধারা সঙিন অবস্থায় পড়েই কালিদাস বলেছিলেন—

"ইতর তাপ শতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।

[২]

পরের মতামত রসনাগ্রে লোফালুফি করে' আসর সরগরম করা আর পরচুলো মাথায় পরে মাথা গরম করা সমান কথা। যার হজমশক্তি নেই তার পক্ষে অতি-ভোজন যেমন দোষের, যার বিচারশক্তি নেই বা বিচক্ষণা নেই তার পক্ষে অতিরিক্ত লেখাপড়া করাও তেম্‌নি দোষের; কারণ

—"His head is like a stomach & intestines which let the food pass through them undigested. That is just why his teaching & writing is of so little use. For it is not upon undigested refuse that people can be nourished but solely upon the milk which secretes from the very blood itself."—Schopenhauer.

এঁরা গাছের মধ্যে ঘানি-গাছ সুতরাং যা প্রসব করেন তা প্রসূন হয় না। এঁদের মন যা চায়, মুখ তা চাইতে ভুল করে। চতুর্ব্বর্গের মধ্যে এঁরা মোক্ষ চাইতে গিয়ে ধর্ম্ম চেয়ে বসেন, বাৎসায়ন বাদরায়ণ বলে ভুল করে' হাঁকডাক করে' স্নান। আবার কান্তাস্থানীয়া কা সুন্দরীকে গুরুমহাশয়ের মতন কান-ম দিতে অনুরোধ করে কাব্যকুঞ্জবন পাঠশালা হট্টগোলে সরগরম করে তোলেন। এঁ জলেরও জাতিভেদ মেনে থাকেন, যেমন— (১) গঙ্গাজল (২) বরফজল (৩) গয়না বামুনের জল (৪) পাতঞ্জল (৫) প্রাঞ্জল আবার এঁদের হাতে প্রেমেরও অমনি দুর্দশা যেমন—(১) রামের প্রেম (২) রামীর প্রেম (৩) শ্যামের প্রেম (৪) স্বামীর প্রেম (৫) কীচকের প্রেম (৬) চোখে প্রেম ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমঝদার গুণীর গোলাম, কিন্তু বেসমঝদারের সে বালাই নেই। এঁরা রস গঙ্গাধর রবীন্দ্রনাথের রস-রচনার ভিতর থেকেও "বিকলা রসলক্ষণা রসাঃ" অর্থাৎ উপরস, অনুরস ও অপরসের নমুনা আবিষ্কার করবার স্পর্দ্ধা রাখেন, কিন্তু রসাভাস শব্দের পারিভাষিক অর্থ জানেন বলে বোধ হয় না। আর এও জানেন না যে—

"অমী প্রোক্তা রসাভিজ্ঞৈঃ
সর্ব্বেঽপি রসনাদ্রসাঃ।"

এঁদের মতে রস অনিত্য, দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-ভেদে রসেরও না কি ভোল ফেরে! আমরা এর চেয়ে আরও নূতন কথা বল্‌তে পারি। রসতত্ত্বের এর চেয়েও গূঢ়তর তথ্য আমরা আবিষ্কার করেছি, আপনারা অবহিত হ'ন। সে তত্ত্বটি হচ্ছে এই যে, রস—পবিত্র রস—হিন্দুর হ-কার যোগে যে রস 'হ'রষে পরিণত হয়

অথচ যত্ন-বিধানের স্বত্ব লোপ করেনা, তাই আবার নীচ চামারের অর্থাৎ কি-না চ-বর্গের সংস্পর্শে এলে ঘৃণিত চ-রস হয়। তখন রস ঝরে পড়ে না বটে, কিন্তু ধোঁয়া হ'য়ে উড়ে যায়।

[৩]

"দূর কর এ বিড়ম্বনা বিদ্রূপের ভাণ!" রস কি সত্যই অনিত্য? তাহ'লে জগদন্তরাত্মা জগন্নাথকে রসস্বরূপ বলে কেন? "রসো বৈ সঃ!" এ কি ধ্যান-রসিকের উপলব্ধির কথা নয়? এই কি রসতত্ত্বের শেষ-কথা নয়? ঋষিবাক্য বলে' এ-কথার সত্যতা অনেকেই মেনে নেবেন, কিন্তু আপত্তি উঠবে যে, সাহিত্যের শেষ-সীমান্তে তত্ত্বের রাজ্য সুতরাং এটা শেষ-কথা হলেও গোড়াকার কথা না হ'তেও পারে। মৃত্যুবাণ দিয়েই যে নাড়ী-কাটা হয়েছে তার কি মানে আছে? বেশ কথা, তা হ'লে সাহিত্যরাজ্যের চৌহদ্দিটা কি, সেইটেই আগে ঠিক করে' নেওয়া যাক। পূর্ব্বাপর বিচার করলে দেখা যায় যে, শিল্পের মতন সাহিত্যের গণ্ডী সুন্দরের এলাকার মধ্যেই আবদ্ধ। সাহিত্যের সত্য, রসের সত্য, অনুভবের সত্য—তত্ত্বের সত্য নয়, দর্শনের সত্য নয়। রাগরাগিণী যেমন কোনো নৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে নি, খাঁটি সুরের খেলায় যেমন সমাজ বা ধর্ম্মের ধূলো বা ধোঁয়া কিছুই নেই, তাহ'লেও তাতে চিত্তে রসের আবেশ হয়, খাঁটি সাহিত্যও তেম্‌নি।

সত্য আর কল্পনার সোনার বাসর সাহিত্য। সত্য এখানে বর হলেও চোর হয়ে আছে, কল্পনাসুন্দরীর সহচরীদেরই এখানে জয়জয়কার। সৌন্দর্য্যের এ খাস-মহল। তাই যা শুধুই সুন্দর বিশেষ-করে সেই হ'ল সাহিত্য। স্বয়ং সত্য রসের রংমহলে প্রবেশ করতে পায় তখনি, যখন সে আসে শুধু দর্পণ হাতে; যতক্ষণ তার হাতে তলোয়ার ততক্ষণ ঢোকবার হুকুম নেই। আইবুড়ো-সত্য যতবড়ই ডাংপিটে হোক এখানে তার ঘাড় হেঁট। এখন তার আর জুলুম-জবরদস্তি নেই; এখন সত্য সখিত্ব করবে —সুন্দরের সহযোগী হবে, সাহিত্যের বরাসন পাবে। যে আনন্দে 'জাতানি জীবন্তি' সত্য এখন সেই আনন্দের আবহাওয়া।

যে-রচনা রচনা-হিসাবে সুন্দর নয়, যে রচনায় ভদ্রাশ্রী বিরাজ না করে, তা তত্ত্বকথায় পূর্ণ হলেও তাকে ঠিক সাহিত্যের কোঠায় ফেলা চলে না। ভাবে যা অসংবদ্ধ, প্রকাশে অসুন্দর, সাহিত্য শুধু তাই বর্জ্জন করে; নইলে সামাজিক বিধি-বিধানের সঙ্গে বনিবনাও আছে কিনা রস-রচনার বিচারে সে বিচক্ষণা অবান্তর। সাহিত্য রসোদ্রেক করেই খালাস। সে রস মধুর কি অম্লমধুর তা বড় একটা বিচার করেনা। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা এ-বিষয়ে একটু বেশী উদার। তাঁরা সাহিত্যের সার যে কাব্য তাকে রসাত্মক বাক্য বলে বর্ণনা করেছেন। অথচ রসের গণনায় বীভৎসটাকেও বাদ দ্যান নি।

সুতরাং দেখা যাচ্চে রসোদ্রেক করাই রস-রচনার অর্থাৎ খাঁটি সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। সাহিত্যের একমাত্র কাজ জাগা-অবস্থার মানুষকে স্বপ্ন দেখানো, যার হাতে-

গলায় শিকল বাঁধা তার ডানা গজিয়ে দেওয়া। স্বপ্নে সামঞ্জস্য থাকে না, সাহিত্যের স্বপ্নে সামঞ্জস্য আছে এইটুকু তফাৎ। সাহিত্য সংসারও নয়, সপ্তলোকের সর্ব্বোচ্চ ধাম সত্যলোকও নয়; এ ভূলোকও নয়, আবার স্বর্গও নয়,—এ দ্যুলোক, যেখানে মেঘেরা মিছিমিছি যা-নয়-তারি আকার ধারণ করছে, হাতী মারবে না তবু সিংহের মতন কেশর ফোলাচ্চে, বপ্রক্রীড়া করবে না তবু মদমত্ত হাতীর মতন শুঁড় ওঁচাচ্চে। সূর্য্য-কিরণ যেখানে বাজে-খরচ হয়ে যাচ্চে, ঝড় যেখানে পাগলামি করছে, পাখীরা যেখানে পাখা-মেলে হাঁফ-ছেড়ে বাঁচচে, এ সেই আমাদের আব্‌হাওয়ার রাজ্য। এখানে, যে-সব ফুল ফোটে, তা শোজ্‌নে ফুল, মোচা বা ফুলকপির মতন ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে না, কেজো লোকের কোনো কাজে লাগে না। রস-রচনার খাতা আমাদের বাজে-খরচের খাতা। কাজের যেখানে শেষ হয়েছে, সাহিত্যের সেইখানে আরম্ভ, তাই সন্ধ্যার অবসর নইলে গান বা গল্প কিছুই জমে না; তাই পৃথিবীর সব-চেয়ে বড় গল্পের বইএর নাম "আলিফ্ লয়লা ও লয়লা" "হাজার-এক রাতের কাহিনী"।

এ জিনিসকে কাজে লাগানো আর সুন্দর গোলাপ-ফুলটিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ক্ষীরের হাঁড়িতে বা বাদাম-তক্তির বুকে তার পাপ্‌ড়ি বাজে-খরচ করা একই কথা, তাতে ক্ষীর-সন্দেশের ওজন এক-কাঁচ্চাও বাড়েনা অথচ ফুলটা না-হক মাঠে মারা যায়।

[৫]

রসের বহিরঙ্গ যেমনি হোক তার অনুভূতি বা উপলব্ধি সব দেশ এবং সকল কালে এক। যেমন বাৎসল্য-রসের বাইরের প্রকাশ আগে ছিল শিরশ্চুম্বন এখন অধর বা কপোল-চুম্বন, কাফ্রির দেশে নাকে-নাক-ঘষা, গরু-সমাজে বাছুরের গা-চাটা। এখন কাফ্রি আপনার কালো ছেলেটির নাকে-নাক-ঘষবার সময় অন্তরে যে-রস সম্ভোগ করে, আমরা কস্মিন্-কালেও ছেলের নাকে নাক না ঘষ্‌লেও শুধু চুমু খেয়েই ঠিক সেই রসেই আর্দ্র হয়ে উঠি। মালা সুতো-দিয়েই গাঁথ, আর কলার ছোটা-দিয়েই গাঁথ, যে গলায় পরবে তার মনে যে রসের উদ্রেক হবে তা অভিন্ন। নিমের তিতোও "বিশদয়ত্যাস্যং" কুইনিনের তিতোও তাই করে; সুতরাং রসের অনুভূতি দেশ-কাল-নির্ব্বিশেষে অভিন্ন।

[৬]

হঠাৎ-ক্রিটিকদের আরেকটি অদ্ভুত বিশ্বাস হচ্চে এই যে, সাহিত্য না কি যুগ ও জাতি-ধর্ম্মের অনুগমন করে' থাকে; তা যদি করত তা হ'লে সেই সেই জাতি যুগ বা ধর্ম্মের অস্তিম দশা ঘটলে তত্তৎ যুগের সাহিত্যও সহমরণে যেত। গ্রীক জাতির মৃত্যুর সঙ্গে "স্যাফোর গান" মারা যেত; আমরা আর তার একটুও রসগ্রহণ করতে পারতুম না। কিন্তু এখনো তা পারি; তার মানে মানুষ-জাতির ভাব-শরীরের বা হৃদয়-বৃত্তির বিশেষ-কোনো পরিবর্ত্তন হয় নি;—অন্ততঃ ঐতিহাসিক কালের ভিতর। তাই আজো "One touch of nature makes the whole world kin." তাই প্রাচীন

মিশরের পাঁচ-ছ হাজার বছরের পুরোনো প্রেমের গান আজও আমাদের মনে রসোদ্রেক করে, জানিনে তাদের বিয়ের রীতি কি-রকম ছিল, জানিনে সেই মিশর-কবি যাকে উদ্দেশ্য করে' লিখেছিলেন সেটি তাঁর স্বকীয়া কি পরকীয়া, জানিনে সমাজে তাঁদের কী গতি হ'য়েছিল, জান্‌বার দরকার আছে বলেও মনে করিনে। শুধু এইটুকু জানি, যে, যে লিখেছিল সে ভালোবাসা কাকে বলে তা' জান্‌ত আর তার ভালোবাসার রস আমাদের ভালোবাসার থেকে মোটেই ভিন্ন নয়।

আইসিস্ অসিরিস্ মরে গেছে কিন্তু ঐ সব কবরস্থ দেবতাদের ভক্তেরা তাঁদের লক্ষ্য করে' যে-সব ভক্তির উচ্ছ্বাস ভাষায় প্রকাশ করে গেছে তা আমাদের মনেও ভক্তি-রসের উদ্রেক করে;—যদিচ আইসিস্‌কেও আমরা মানিনে অসিরিসকেও গ্রাহ্য করিনে।

পাছপাদপে ছুরি দিয়ে ঘা দিলেও রস ছায়, কাঠি দিয়ে খোঁচা দিলেও ছায়, ধারালো খাপ্‌রার আঘাতেও ছায়; রসের কোনো তফাৎই হয় না; তৃষ্ণাও তাতে সমানই মেটে। কিন্তু যাঁরা হঠাৎ-ক্রিটিক, অতিপণ্ডিত তাঁরা এ স্বীকার করেন না। তাঁরা কেবল থাক বাড়াতেই ওস্তাদ।

"বৈশারদ্য তুবৈ নাস্তি
ভেদে বিচরতাং সদা
ভেদনিম্নাঃ পৃথগ্ বাদা
স্তস্মাত্তে কৃপণাঃ স্মৃতাঃ!"

[৭]

হঠাৎ-ক্রিটিকদের আবদার অনেক। এঁরা সরস্বতীর মরালকে দিয়ে গরুর গাড়ী টানাতে চান্। এঁরা সাহিত্যকে একবার যুগ ও সমাজের দ্বারা চালিত করতে চান্ পরমুহূর্ত্তেই যুগ ও সমাজের চালক করতে চান্। "নাও পর্ গাড়ী, ফের গাড়ী পর্ নাও!" এঁরা "নিত্যবস্তু" শব্দে যে কি বোঝেন তা এঁরাই জানেন। একবার সেটা হ'ল "বাস্তবের মানস আদর্শ" আর-একবার হ'ল খাঁটি সাহিত্যের বাইরেকার অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির তত্ত্বরাজ্য, একবার সেটা রসের বিশিষ্ট প্রকাশ—যেমন গেলাসের জলের আকার গেলাসের মতন, ঘটির জলের ঘটির মতন, একবার রসপ্রবাহিনীর ভাঙনে ধ্বস্-খাওয়া তটভূমি, একবার বিশ্বমানব-মনের অগাধ আনন্দ-সঙ্গম-তীর্থ, আর-একবার আরো কিছু ধোঁয়াটে ব্যাপার। এম্‌নি-ধারা পরস্পরবিসম্বাদী সব কথা খুব আড়ম্বরের সঙ্গে লিখে এঁরা বাহাদুরি দেখিয়ে থাকেন।

[৮]

কবি গেয়েছেন—

(ও কে) ধারণ করিবে রসগঙ্গা সাধন বিনে।

রসবোধের জন্য সাধনার দরকার, নইলে বাজে বকুনি বকে' হাস্যাস্পদ হ'তে হয়।

সাহিত্য মনের বাগান-বাড়ী, সেখানে স্বাধীনভাবে সকল-রকমেরই আলোচনা অল্পবিস্তর হ'য়ে থাকে। তাতে মাঝে মাঝে সমাজ চাইকি কানে-আঙুল দিতে পারেন, কিন্তু আঁৎকে উঠ্‌লে বাড়াবাড়ি হয়। ঋগ্বেদের যম ও যমীর আখ্যান থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্য্যন্ত অনেক ছবি ভারতবর্ষের সাহিত্যে আঁকা হ'য়েছে যা' ঠিক আদর্শ নামের যোগ্য নয়। অথচ সনাতন হিন্দু-

সমাজ হাজার হাজার বছর ধরে সেগুলিকে মাথায় করে রেখেছেন—অগ্নিসৎকার করেন-নি। তার মানে কি? আমাদের মনে হয় তার মানে এই যে, একালের মতন সেকালেও যাঁরা শিং-বাঁকাবার বাঁকিয়েছেন কিন্তু হীরার ধার ভাঙেনি। রামায়ণ মহাভারত তো ঘরে-ঘরে পড়া হ'য়ে থাকে কিন্তু "দেবরাজ-কুতূহলী" অহল্যাকে ক'জন মেয়ে অনুকরণ করেছে? দ্রৌপদীর দেখাদেখি পাঁচের উপর ছয়ের কামনাই বা কে করছে? তারপর, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতির কথা ধরবনা, কারণ সে-সব নাকি মুসলমানী অনুকরণ, কিন্তু কথা-সরিৎ-সাগরে বা বত্রিশ সিংহাসনে যে সমস্ত গল্প আছে তা অনেক লোকেই শুনেছে এবং অনেক লোকেই পড়ে থাকে। এই সব বইয়ের অনেকগুলি গল্প আদর্শস্থানীয় তো নয়ই, এমন-কি রুচিরোচনও নয়। তাই বলে কি—সাহিত্যে ঐ-সব আছে বলেই কি—সমাজে তার ঝুড়ি ঝুড়ি অনুকরণ হচ্ছে? তবে অকারণে নব্য-সাহিত্য দোষ দেওয়া হচ্ছে কেন? কুন্দনন্দিনী বিষ খাবার আগে কি কেউ বিষ খায়নি না বিনোদিনীর আগে আর-কোনো বি কাউকে ভালোবেসে ফেলে নি? তা' "বিষবৃক্ষ" বা "চোখের বালি" বা "বাইরে" এ সমস্ত বইএর আগাগোড়া পড়েছে তার তো লেখকের উদ্দেশ্য কোনো ভুল ধারণা থাক্‌তেই পারে এর মধ্যে কোনোখানিই মানুষের পবিত্র আদর্শকে খাটো করেনি। অধঃপাতে অতলে পড়তে-পড়তে মানুষ কি সাম্‌লাতে পারে এতে (বিশেষ-করে দুখানি বইতে) তো তাই দেখানো হয়েছে তবে—

Rire des gens d'esprit, c'est le privelege des sots.

গুণীজনে অকারণে ঠাট্টা।
হাঁদাটের ঐ হ'ল হক্‌দারী পাট্টা॥

এই হচ্চে আসল কথা।

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন

চৈতন চুট্‌কি

বাস্তু ভিটে যাকে বলি! সে কী আশ্চর্য্য কারখানা! পাখির ডিমের উপরের খোলার চেয়ে পাতলা, হাজার-হাজার বছরের পুরোনো চীনেমাটির তার দেওয়াল,—এমন হাল্‌কা এমন্ ঠুন্‌কো হয়ে গেছে যে, শব্দের রেশ, বাতাসের পরশ পেলে কাঁপতে থাকে,—মনে হয় এখনি বুঝি ফেটে চৌচীর হল। এই ঠুন্‌কো পাতলা চীনেমাটির আশ্চর্য্য বাড়ি পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়। এর মধ্যে হুজুরের চাকর-বাকর যারা কাজকর্ম্ম করে বেড়াচ্ছে তারা আস্তে উঠছে, আস্তে বসছে, আসতে চল্‌ছে, আস্তে বল্‌ছে—হুজুরের ভয়ে যত নাহোক্, পাছে কিছু তারা ভাঙে, পাছে তাদের সেই পুরোনো ঠুন্‌কো

জিনিষের কোথাও আঁচড় লাগে সেই জন্যেই তারা সর্ব্বদা সাবধানে আছে। শুনেছি একসময় একজন নতুন চাকর অসাবধানে কিংবা একটা চিনের পুতুলের একটু চটা উড়িয়ে ফেলেছিল, যখন তার মাথা-মুড়িয়ে গাল ঢালবার হুকুম হল তখন সে বল্লে—আমানের জন্যে দুঃখু করিনে; অমন পুতুলটা ভিত হয়ে গেল আমারি হাতে! প্রাণের চেয়ে পুতুলই তাদের ছিল বড়।

এই বাড়ির বাগান—সে আরো আশ্চর্য্য! এতবড় যে সে বাগানখানা তা সে বাগানের সর্দ্দার-মালীও বলতে পারে না। পবন সে গিয়ে মিলেছে মহাবনে, মহাবন সে মহাসমুদ্রের ভিতর পর্য্যন্ত নেমে গেছে ছাওয়ার মত হয়ে। এখানে এক-একটা বৃক্ষের গাছে যখন ফুল ধরে, ফল ফলে, তখন তাদের বোঁটায় মালীরা সোনার আর রূপোর ঘুঙুর বেঁধে দেয়, বাতাসে সেগুলি বাজ্‌তে থাকে, তবে জানা যায় বাগানে অমুকদিকে ফুল ফুটেছে, অমুকদিকে ফল ফলেছে;—এতবড় সে বাগান, এমন চমৎকার এমন সৌখীন বাগান।

এই বাগানের একটা দিক—সেদিকের খবর না-জানেন হুজুর, না-জানে তাঁর মালী; কেবল জানে দেশের যত লক্ষ্মীছাড়া আর তাদের রাণী—সে একটি কচি মেয়ে—নীচজাত। কেউ তাদের চায় না, তাই কেউ যেদিকে যায় না সেইদিকে তারা একলা আছে—একটা প্রকাণ্ড কল্পতরু হেলে পড়ে সমুদ্রের নীল জলের উপরে ছাওয়া দিয়েছে—তারি তলায়। ছোটজাত কাজেই রাজবাড়ীর সাততলার একটি তলাতেও তাদের জন্যে জায়গা নেই, দেশের লোকের পায়ের ধূলো-কাদা ধুয়ে নেবার জন্যে রাজার দেউড়িতে দুবেলা হাজির থাকবার হুকুমটাও না;—যদিও দেশসুদ্ধ সবাইকে তারাই কিন্তু বরাবর বছরে বছরে নিয়মিত বাগানের খাঁটি পদ্মমধু জুগিয়ে আস্‌ছে।

এই যে কল্পতরু যার পাতা কখনো খসেনা, ফুল কখনো ঝরেনা, এরি উপরে একটি পাখি! সে যে কি পাখি, কেমন পাখি তাতো বলা যায় না—কিন্তু তার গান—সে যে স্বর্গের কিন্নরীদের গানের চেয়ে মিষ্টি। সমুদ্রের এপারে গাইছে সে পাখি, সমুদ্রের ওপার পর্য্যন্ত তার সুর গিয়ে ঠেক্‌ছে—চাঁদনী রাতের আলোর মত বাতাসের ঢেউয়ের উপর দিয়ে! মাঝি মাঝ-সমুদ্রে জাহাজ থামিয়ে সে গান শুনে গেল, ওপারের লোক সমুদ্রের ধারে দিনের পর দিন কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে সে গান শুনে মস্‌গুল হয়ে রইল, আর সে গানের কত তারিফ করে তারা বই লিখলে, বর্ণনা দিলে, সবাইকে জানিয়ে দিলে সেই চমৎকার আশ্চর্য্য পাখির কথা; অথচ সেই ছোট মেয়েটি আর তার দলের লোক ছাড়া বাগানের মালিক যিনি তিনিও জানেন না, বাগানের মালী যারা তারাও জানেনা, হুজুরের সভাসদ পারিষদ লোক-লস্কর পরিবার-প্রজা কেউ জানেনা এই আশ্চর্য্য পাখির খবর—যার গানের কাছে সেই চমৎকার বাড়িখানা, সেই অদ্ভুত বাগানটাও কিছুই নয়!

চট-দিয়ে মোড়া গালামোহর-করা একরাশ বই আজ অনেক দিন হল বিদেশ

থেকে হুজুরের তাকিয়ার কাছেই পড়ে আছে—সময় নেই যে তিনি সেগুলো খুলে দেখেন। সেদিন বেলা দুপুরে একটা মশা হঠাৎ কানের কাছে হুল্ ফুটিয়ে হুজুরের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে, তাঁর হাতে কোনো কাজ নেই অথচ মশাটা বারেবারে ঘুমও ছুটিয়ে দিচ্ছে! হুজুর হাতের কাছে সেই চটমোড়া বইগুলো একে-একে খুলে দেখতে লাগলেন। বইগুলো তাঁর ঠুন্‌কো বাড়ির কারখানা, অদ্ভুত বাগানের বর্ণনায় ভরা। এর মধ্যে একখানা বই—তার মলাটের ছবিটায় তাঁর চোখ পড়ল—সোনার একটি ফুলের ডালে পাখি গাইছে। হুজুর সেই বইখানা খুলে পড়তে লাগলেন—"হুজুরের আশ্চর্য্য পাখীর গান!" যিনি প্রকাশক তিনি বিদেশের একজন বিখ্যাত ওস্তাদ। বইখানা পড়তে-পড়তে নাকের উপরে কচ্ছপের খোলা দিয়ে বাঁধানো মোতিয়া-বিন্দু চশমার বড় বড় গোল দুখানা পরকোলার ভিতর দিয়ে হুজুরের দুই চোখ বিস্ময়ে ক্রমে বড় হয়ে উঠছে বেশ দেখা গেল। বাড়ির প্রধান কর্ম্মচারী যিনি কাজের খবরের চেয়ে হুজুরের মেজাজ কখন কেমন তারি খবর ভালো করে রাখেন, তিনি আজ পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে দেখছিলেন। কর্ত্তার চোখ যতই খুল্‌তে দেখা গেল কর্ম্মচারীর দম্ ততই বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। আজ কর্ত্তা অনেকটা চোখ খুলেছেন; না-জানি আজ কপালে কি আছে এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে তত্ত্বাবধানিক যখন তিনশো-তেত্রিশ-কোটী দেবতার নাম জপছিলেন এবং দশ আঙুলে কচ্ছপ-মুদ্রা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কর্ত্তার নাকের উপরে কচ্ছপের খোলায় বাঁধানো চশমাটাকে শাপ দিচ্ছিলেন যেন ওর কাঁচদুখানা এখনি গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়—এমন সময় সত্যিই চশমাখানা খুলে কর্ত্তা ডাক্ দিলেন—কোথায়! কচ্ছপ-মুদ্রা দেখাতেই হুজুরের চশমা চোখের উপর থেকে সরে গেল, কর্ম্মচারী নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন! তিনশো-তেত্রিশ-কোটীকে একে-একে প্রণাম করবার তাঁর সময় হলনা, তিনি দরজার চৌকাঠে তিনবার মাথা ঠুকেই খালিপায়ে কর্ত্তার সাম্‌নে উপস্থিত হলেন। তখন কর্ত্তার চোখ আবার বারো-আনা বন্ধ হয়ে এসেছিল, তিনি বল্লেন—এই বইখানাতে আমার এ বাগানের একটা পাখির কথা লিখ্‌ছে, বল্‌ছে—আমাদের যতকিছু অদ্ভুত আসবাব আছে সেগুলো কিছুই নয় এই আশ্চর্য্য পাখির গানের কাছে। এ পাখির খবর কিছু রাখ!

তত্ত্বাবধানিক দেখলেন হুজুরের চোখ সম্পূর্ণ বন্ধ হতে আর লহমা-দুই বাকি; তখন তিনি সেই সময়টুকু কাটিয়ে দেবার জন্যে রয়ে-বসে জবাব দিচ্ছেন—হে প্রবলপ্রতাপ! ভবদীয় দাসানুদাসের নিবেদন এই যে—মহারাজ, রাজ্যের সংবাদ ও খবর অর্থাৎ যে খবর যথার্থ খবর—খবরের মত খবর, তা এ দাসের অবিদিত নাই। আজ্ঞাধীন সকল খবরই রাখে মহারাজ, কিন্তু এই কাল্পনিক পাখি, এর গানের ইতিহাস পুস্তক-প্রণেতার কল্পনা—যাকে পণ্ডিতেরা বলেন কবি-কল্পনা—সু-ত-রাং—।

হুজুরের চোখ তখন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে; তিনি বল্লেন—হুঁঃ কল্পনাই ব-টে—। তারপর আর তাঁর সাড়াশব্দ

ওয়া গেল না। পাখির খবরের দায় থেকে ার হয়ে কর্ম্মচারী পায়ে পায়ে সরে ড়েন এমনসময় সেই দুষ্টু মশা আর-বার হুজুরের কানে পোঁ করে ভেঁপু জিয়েছে! মন্ত্রী প্রায় দরজা পার য়েছিলেন কর্ত্তার নিদ্রাভঙ্গ হতেই তিনি য়োরের গোড়ায় পাপোঁছখানার উপরেই প্ করে বসে পড়েছেন! কর্ত্তা আর-এক-ার চশমা এঁটে কর্ম্মচারীর দিকে ফিরে ল্লেন—সব কথাই তুমি কল্পনা বলে উড়িয়ে িতে চাও! বিদেশের কেতাবে যখন এ াখির কথা উঠেছে তখন এটা মিথ্যে তে পারেনা, আমি জানি তারা কাজের মানুষ, াবোল্-তাবোল্ বাজে বকা তাদের কুষ্টিতে লেখেনি। এই পাখির গান আমার না শুন্‌লেই নয়, আজ সন্ধ্যার সময় তাকে আমার মজ্‌লিসে হাজির করবে, আমার ানের ওস্তাদ সবাইকেও নিমন্ত্রণ করবে—যাও।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম্ দিচ্ছে তত্ত্বাবধানিক ভাব্‌তে ভাব্‌তে চলেছেন কেমন করে পাখির সন্ধান করি, দেশের কেউ যার খবর জানেনা তাকে ধরা তো সহজ নয়! এমন-সময় হুজুর বল্লেন—আমার এ ঘরে মশার উৎপাত হয়েছে। আচায্যিদের দিয়ে মশা হবার কারণটার তদন্ত অবিলম্বে করবে—পাঁজিতে এ-বৎসর সকলপ্রকার মক্ষিকার কোঠায় শূন্য দেখ্‌ছি অথচ মশার জ্বালায় নিদ্রা হচ্ছেনা এরই বা অর্থ কি!

কর্ত্তার চোখ খোলবার মূলে এই 'মশা'। এই মশাবংশ নির্ম্মূল না হলে রক্ষা নেই এটা বেশ করে আচায্যিদের সম্‌ঝে দিয়ে প্রধান-কর্ম্মচারী সদ্দার-মালীকে পাখির সন্ধানে পাঠালেন। আজ এই দুটো বড় বড় কাজ সারতে তাঁর নাওয়া-খাওয়া হতে বেলা দুটো বাজলো। ইতিমধ্যে কর্ত্তার খানসামা তিনবার জেনে গেছে পাখি এল কি না!

তত্ত্বাবধানিক অতি গম্ভীর লোক। সকলের চেয়ে তিনি কম কথা বলেন, কম চলা চলেন। পাখি যে কি জানোয়ার এবং মশা যে কি পাখি এটা তাঁর জানবার কোনো দিন প্রয়োজনও হয়নি, সুবিধাও ছিলনা, —কাজের চিন্তায় তাঁকে এতই ব্যস্ত থাকতে হয়। লোকের দশটা প্রশ্নের উত্তর তিনি এ-পর্য্যন্ত মাত্র একটি চুট্—তাও সম্পূর্ণ পরিষ্কার উচ্চারণ না করেই—বলে এসেছেন, আর তাঁকে আজ কর্ত্তার খানসামার প্রত্যেক প্রশ্নের খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে উত্তর দিতে হচ্ছে! এদিকে মালী এসে জানালে পাখির কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছেনা। এই সব উৎপাতে হয়রান হয়ে কর্ম্মচারী যখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন এবং পাখি না হাজির করতে পারলে তাঁর মাথা কাটা যাবে একথা চুপিচুপি জানিয়ে উকিল ডেকে বিষয়-আশয়ের বন্দোবস্ত করে একটা উইল লেখবার উদ্যোগ কচ্ছেন তখন তাঁর উকিল একটু মাথা চুলকে বল্লেন—বলতে সাহস হয়না—একবার মজ্‌লিসি লোকদের নামের লিষ্টিখানা উল্টেপাল্টে দেখলে হতনা! যদি পাখি বলে কোনো-কেউ হুজুরে কোনোকালে নিমন্ত্রণ-পত্রের জন্য সওগাদ দিয়ে থাকে তবে সহজেই তার ঠিক-ঠিকানা পাওয়া যাবে।

উকিলের কথামত দপ্তরখানার নামের তালিকা ঘেঁটে দেখা গেল, তাতে পা'য়ের কোঠায় ও প'য়ের কোঠায় অনেকগুলো পা ও পদবীওয়ালা নাম কিন্তু 'পাখি' কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলনা! তারপর দেশের সভাসমিতি কমিটিজমিটি এ-সভা ও-সভা এ-সমাজ ও-সমাজের বাৎসরিক রিপোর্ট-গুলো আনিয়ে কর্ম্মচারী দেখলেন সেখানেও পাখির নামগন্ধ নেই। দেশের গণ্যমান্য বুধ-বৃহস্পতি সভার সদস্যমণ্ডলী বলে পাঠালেন—"তাঁদের কমিটির একখানি কীটদষ্ট প্রাচীন রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে যে, কর্ম্মচারী যাঁর সন্ধান কচ্চেন তাঁকে এই সভা থেকে একবার একটা সম্বর্দ্ধনা ও রূপার তাম্র-শাসন ও স্বর্ণলেখনী মায় মস্যাধার দেবার প্রস্তাব উঠেছিল এবং বাৎসরিক হিসাবনিকাশে সভা তার একটা চুম্বকও পাচ্ছেন কিন্তু উক্ত রিপোর্টের সন তারিখ ইত্যাদি এমনভাবে কীট-দষ্ট হয়েছে যে তার চিহ্নমাত্রও পাওয়া দুষ্কর! হুজুরের তহবিল থেকে কিঞ্চিৎ অর্থ-সাহায্য হলে কীট-ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারায় এই পুঁথির মাসপঞ্জী ইত্যাদি অংশ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, অন্ততঃ উক্ত পুঁথির জন্য একখান খেরুয়া বস্ত্র পেলেও আপাততঃ তাঁরা হুজুরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সুখী হতে পারেন।"

কর্ম্মচারী আশা করছিলেন দেশের সব সভাসমিতিগুলোর নজীর দেখিয়ে তিনি হুজুরের কাছে প্রমাণ করবেন—বিদেশীমাত্রেই মিথ্যা কথা বলেছেন, পাখি-সম্বন্ধে তাঁদের কল্পনা ও জল্পনার মূলে কোনো তথ্য—যাকে বলে 'বস্তু',—তা নেই; কিন্তু বুধ-বৃহস্পতি-কমিটির স্বর্ণ-লেখনী মায় মস্যাধার তাম্রশাসন! পাখিকে কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেওয়া বরং চলে কিন্তু সোনার মস্যাধার, রূপার তাম্রশাসন এরা যে বস্তু, এদের জন্য খাতায় জমাখরচ লেখা রয়েছে এর বিল আছে, ভাউচার আছে, রসীদ ষ্ট্যাম্প আছে —এগুলোকে তো ওড়ানো সহজ নয়!

এদিকে বেলা পাঁচটা হয়; ছয়টায় মজলিস। কর্ম্মচারী নিরুপায় হয়ে স-উকিল নিজেই একবার পাখির খবর করতে অগ্রসর হলেন। বলাবাহুল্য যাত্রার পূর্ব্বে কর্ম্মচারী উকিলের পরামর্শমত বুধসভাকে খুব ভয় দেখিয়ে একখানা চিঠি দিয়ে গেলেন যাতে ভবিষ্যতে রিপোর্টাদি বিষয়ে তাঁরা সতর্ক থাকেন এবং তাঁর দ্বিতীয় পত্র না-পাওয়া-পর্য্যন্ত এই পাখি সম্বন্ধে কোনো প্রকাশ্যসভায় কোনো আলোচনা না হয়—কেননা হুজুরের কানে তাঁদের এই অসাবধানতার কথা গেলে সভার বার্ষিকী ও চাঁদা ও অন্যান্য বাবদে খরচাদি সরকার হইতে বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

কর্ম্মচারী তাগা-তিলকাদি নানা ইষ্টি-রিষ্টি দিয়ে আপনাকে বেশ সুরক্ষিত করে নিয়ে তবে পাখির সন্ধানে বাড়ির সদর-দরজা পার হলেন, সঙ্গে সেই উকিল এবং হুজুরের সঙ্গীতাচার্য্য ও বুধ-বৃহস্পতি সভার জনকয়েক নামজাদা কবি ও লেখকবৃন্দ। মালীকে উকিল জেরা করে জানলেন যে বাগানের আর-সমস্ত অংশই সে তন্ন তন্ন করে দেখেছে—কেবল ওই দিকটা—যেটা পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশের মত—ওখানটা গিয়ে সন্ধান করতে সে সাহস পায়নি; কেননা সে জাতিতে উড়ে, ওদিকের

াওয়া গায়ে লেগেছে শুনলে তার জাত য়ে টানাটানি পড়বে। রাজার তাড়ায় র্ম্মচারীর জাতের কথা ভাববার সময় ছিল না, তিনি চুট্ বলেই সেই নিষিদ্ধ দিকটাতেই অগ্রসর হলেন। সঙ্গের সকলে াদরের আড়ালে নাকগুলিকে নিষিদ্ধ দিকের াওয়া থেকে ঢেকে নিয়ে কোনোরকমে াতি রক্ষা করে কর্ম্মচারীর অনুসরণ রলেন। কর্ম্মচারীর জাতি লোহার সিন্দুকে বসের ডবল তালার মধ্যে সুরক্ষিত ছিল, ার উপরে রাজ-আজ্ঞা সুতরাং তিনি নেকটা নির্ভয়ে ছিলেন।

এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দিকে তখন বসন্তের ুল ফুটেছিল, এত ফুল যে তার সৌরভ াদরের শত ভাঁজ দিয়েও ঠেকানো যায় া—কাজেই জাতি জাতীফুলের জাঁতি-কলে লির পাঁঠার মত আর্ত্তনাদ সুরু করেছে। র্ম্মচারী ধমক দিয়ে উঠলেন—চুট! তাঁর সেই জলদ গম্ভীরস্বরে একটা শুক্‌নো কুয়োর ঘুমন্ত ব্যাং হঠাৎ বর্ষার স্বপ্নে মক্ মক্ করে খানিকটা বকে উঠল, এবং দূর বনে একটা বাছুর কোনো আকস্মিক উৎপাতের আশঙ্কায় হাম্বা-রবে হরি-স্মরণ করতে থাকল।

কর্ম্মচারী ও তাঁর দলবল—এঁদের কারুর পাখির সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচয় মোটেই ছিল না। কিন্তু 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল'—এর মধ্যে থেকে যে সার বস্তুটুকু পাবার তা তাঁরা সকলেই পেয়ে-ছিলেন। ফুল যখন ফুটেছে তখন ওই হাম্বা ও মক্‌মক্ যে পাখিরই রব সে বিষয়ে তাঁরা এক-মত হয়ে ঐ দুটো জীবকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে চল্লেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা। উকিল সন্ধ্যাকালের রবগুলোকে পাখির রব বলে ধরা যায় কিনা এবং একটা পাখি দুটো জীব হয় কি ব'লে, এ-বিষয়েও একটু আপত্তি করায় 'অধিকন্তু ন দোষায়' এবং রাতি পোহানোটা যে প্রাচীন কবিদের মতে দিবানিদ্রার পরেই সায়ং-সন্ধ্যাটাকেই বলা হয় এটা বুধ-সভার কবি ও লেখকবৃন্দ সকলে মিলে সমস্ত পথটা তর্ক করে বোঝাতে বোঝাতে চল্লেন। এবং হুজুরের সঙ্গীতাচার্য্যগণ এই দুই জীবের রবে কোথায় ওড়ব, কোথায় বা খাড়ব ষড়জ গান্ধার মধ্যম ইত্যাদির বিচার করে এদের গান হনুমানের মতে সিদ্ধ ও শুদ্ধ বলেই স্থির করে নিলেন,—যদিও কোনো কোনো ওস্তাদ নন্দিকেশ্বরকে একেবারে ছেঁটে দিতে নারাজ ছিলেন।

এক পাখির স্থানে দুই নিয়ে যখন সদলে কর্ম্মচারী হুজুরের মজ্‌লিসে দেখা দিলেন তখন চারি দিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল, এবং দুই পাখির সঙ্গীতের শ্রোতা এত জমে গেল যে হুজুরের উঠোনে সকলের স্থান-সঙ্কুলান দুর্ঘট হয়ে পড়ল। কোনোমতে সকলকে তুষ্ট করে কর্ম্মচারী হুজুরে হাজির হয়েছেন। হুজুরের তাকিয়ার বামপার্শ্বে বাতি ও পুষ্পমাল্য ও তাম্বুলাদি, আর দক্ষিণে অধ্যাপক শাস্ত্রী ও তত্ত্ববাগীশের দল। মজ্‌লিস্ দেশের গণ্য-মান্য সঙ্গীত-সভা সঙ্ঘ ও সমিতির সদস্যে ভরা। এ-ছাড়া খবরের কাগজওয়ালারও শুভাগমন হয়েছিল। অধ্যাপক প্রথমে

স্বরচিত স্বস্তি-বাচন পত্রখানি পাঠ করলে পর কর্ম্মচারী নম্বর-এক বিহঙ্গকে হুজুরে দস্তরমত পেশ কল্লেন; হুজুরও তাঁকে যথাযথ আপ্যায়িত করে গানের জন্য ধরে পড়লেন। নম্বর-এক এতক্ষণ মাথা হেঁট করে ভালোমানুষটির মত অপেক্ষা করছিলেন, হুজুরের অভয় পেয়ে বরাবর অধ্যাপকদের নিকটে গিয়েই উপবেশন করলেন এবং তাঁদের হাতের কুশমুষ্টির দিকে মুখ বাড়িয়ে একটিমাত্র হাম্বা রব করেই ক্ষান্ত হলেন। এখানে হুজুরের দৃষ্টি কর্ম্মচারীর দিকে পড়বামাত্র তিনি দুই-নম্বরকে হাজির কল্লেন। মজ্‌লিসে প্রবেশ করেই নম্বর-দুই বাতির চারিদিকে ভ্রাম্যমান একটি মশাকে গ্রাস করে ফেল্লেন; এবং হুজুরকে একবার মক্‌মক্ শব্দে আশীর্ব্বাদ করেই আকাশের দিকে দুই চক্ষু পাকিয়ে পুষ্পমাল্যের থালার উপরে গম্ভীর মূর্ত্তি ধরে বসলেন।

সকলের মুখে কেমন-একটু নিরাশ ভাব দেখা গেল এবং মজলিসের বাহিরের লোক যারা নিমন্ত্রণ পায়নি তারা যেন একটু টিটকার দেবার উদ্যোগ করলে। সকলকারই মনে হচ্ছে পাখি-সম্বন্ধে কোথায় যেন একটু গোল রয়ে গেছে। হুজুর পর্য্যন্ত কেউ তাঁরা পাখিকে কখনো দেখেনও নি, দেখবার চেষ্টাও পান্‌নি। সুতরাং সবাই বিজ্ঞ হয়ে বসলেন এবং এই দুই জীবের সুর লয় তান নাদ নিনাদাদি সম্বন্ধে বিচার ও সুখ্যাতির চূড়ান্ত করে ও বিদেশীরা যে পাখির সুখ্যাতি করেছেন তাকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দিয়ে মজলিস্ ভঙ্গ কল্লেন। পণ্ডিত এই সময় কর্ম্মচারীর কানে গিয়ে পরামর্শ দিলেন—"ওহে এ দুটোকে হুজুরে কি বলে হাজির কল্লে? এর এক গোবৎস আর একটা কূপমণ্ডুক,—কোথে পুরুষে পাখি নয়! একটাকে গো-রক্ষিণী পাঠিয়ে দাও, আর-একটা নিয়ে দু মশাবংশ ধ্বংস কর গিয়ে।" কর্ম্মচা এতগুলো কথার জবাবে বল্লেন,—চুট!

মজলিসের দেউড়ির বাইরে সেই ক মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল। সে কর্ম্মচারীকে আ পাখির খবর দিতেই এসেছিল। কি পণ্ডিতের দুরবস্থা দেখে সে আর কর্ম্মচারী কাছে যেতে সাহসই পেলে না।

হুজুর ঘরে এসে মিথ্যার ঝুড়ি বিদে বইগুলোকে জালিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। কর্ম্মচারীর ঘর থেকেও সেদিন অনেক রাতে একটু কাগজ-পোড়া গন্ধ পাওয়া গিয়েছি আর বুধ-বৃহস্পতি-সভার পুথি-রক্ষক ওখান থেকে ঠিক তেমনি সময়েই পকে হাত দিয়ে হাসিমুখে বার হতে গিয়েছিল।

বিদেশীয় "সুরসিক-সভায়" হুজুরে মজলিসের বিবরণ এবং পাখির সম্বন্ধে উক্ত মজলিসের চূড়ান্ত মীমাংসার খব পৌঁছেছিল নিশ্চয়! কেননা হুজুরের বাড়ি হুজুর এমন-সব দেশীয় ছেলে-ছোকরা ও স্কুল-বয়ের দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে বুড়ো বুড়ো যত বিদেশীয় মহাপণ্ডিতেরা হুজুরকে একটা রং-চঙে টিনের পাখি প্রাইজ পাঠালেন তার পেটে একটা গ্রামোফোন ও মোহিনী ফ্লুট পোরা ছিল। শুভদিন দেখে দেশে যত লক্ষ্মী-ছেলেরা সেই পাখিটা নিয়ে ঘটা করে হুজুরকে একটা অভ্যর্থনা দিলে

ল এবং মজলিসের মধ্যিখানে এসে যন্ত্রটায় সে দম লাগিয়ে দূরে গিয়ে অপেক্ষা করে ইল। দু-চারটে মোটা গলা, দু-দশটা হি গলার গানের পর ফোন্‌টা একেবারে প করেই প্রকাণ্ড ঝড়ের মত একটা াসি সুরু কল্লে,—সে একেবারে বিলিতি াসি, তার চোটে হুজুরের পুরোনো মজলিস্-রের দেওয়াল, চটেফেটে চৌচীর হয়ে াওয়ার মুখে তাসের বাড়ির মত ভেঙে ড়ল—একেবারে হুজুর, তাঁর কর্ম্মচারী ও সদস্য-বৃন্দের ঘাড়ের উপরে! ঠুন্‌কো মাটির দেওয়াল, আঘাত মোটেই মারাত্মক হল না, কেবল সকলে বিষম ভয়-খেয়ে চীৎকার করতে লাগল—"'ওরে গোহত্যা কল্লেরে!" এই সময় সেই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দিক থেকে যত লক্ষ্মীছাড়া—তারা সেই ছোটজাতের মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে হুজুরের ভাঙা মজলিসে দল-বেঁধে দেখা দিলে। সেই মেয়ের গলায় পাখির গানের সুর হীরের সাত-নলী হারের মত ঝক্‌ঝক্ করছে!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিচ্ছদ-পরিচারিকা

(প্রসিদ্ধ ফরাসী-কবি Francois Coppée-র ফরাসী হইতে)

ওদেয়োঁ-থিয়েটারে আজ রাত্রে "প্রেমের প্রলয়" প্রথমেই অভিনীত হইবে। চারু-বেণী মারিনেটের ভূমিকা গ্রহণ করিবে। এখনো সে রঙ্গমঞ্চে আছে। এমনসময় ফাব্রেক পরী-রাণীর নির্দ্দিষ্ট সাজঘরে দরজায় ঘা না দিয়াই, দরজা একটু ফাঁক্ করিয়া বলিয়া উঠিল:—"কু কু"।

ফাব্রেকের দাড়ি সোনালী রঙের; চল্লিশ বৎসর বয়স সত্তেও তাহার মুখে নবীন যুবকের ভাব। সব প্রধান থিয়েটারেই তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। চারুবেণী একবার ঐ থিয়েটারে নায়িকার ভূমিকা অভিনয় করিতেছিল। নাটকের বদমায়েসটা নায়িকার সাজগোজের এলোমেলো অবস্থাতেই তাহার সহিত প্রেমালাপ করিতে চাহে। চারুবেণী বলিয়া উঠিল—"ছিছি, আমি মানা করচি আমার দিকে তাকিও না, ঐদিকে মুখ ফিরিয়ে থাক,—ছিছি পুরুষগুলোর কি আক্কেল! রোসো, আগে আমার মাথায় কাঁটাটা পরেনি"—এই বলিয়া সে যেরূপ অলীক লজ্জা ও কোপের ভাণ করিয়াছিল, এবং যেরূপ হাবভাবের অভিনয় করিয়াছিল, তাহাতে ফাব্রেকের বড়ই আমোদ বোধ হইয়াছিল। তাই সে পরী-রাণীর সহিত আজ আলাপ-পরিচয় করিতে তাহার সাজঘরে ঢুকিয়াছে।

কিন্তু তাহার সাজঘর খালি দেখিয়া ফাব্রেক একটু নিরাশ হইল। এই সময়ে অভিনেত্রীর পরিচ্ছদ-পরিচারিকা বৃদ্ধা "সৌরভী" একটা পর্দ্দার পিছন হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"আপনি যদি কষ্টস্বীকার করে' এখানে

বসেন * * * অভিনয় শেষ হল বলে'—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঠাকুরাণী এখানে আস্‌বেন।"

ফাব্রেক্ পায়ের উপর পা রাখিয়া ফুল-কাটা গদি-ওয়ালা একটা আরাম-চৌকীতে বসিয়া পড়িল। এবং হস্তস্থিত ছড়ির ডগা দিয়া বুটজুতায় ঘা মারিতে মারিতে নানা-প্রকার চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িল। এদিকে বৃদ্ধা পরিচারিকা টয়্‌লেট্-টেবিলের উপর ছোটখাটো জিনিসগুলা গুছাইয়া রাখিল।

সে যাই হোক্, পরী-রাণীর ঘরে সে কি কাজে আসিয়াছে? ভালবাসার খাতিরে নহে। কোনপ্রকার লালসা চরিতার্থের জন্যও নহে। একদিন যখন ফেব্রেক্ পরি-রাণীর খুব সাধ্যসাধনা করিতেছিল, পরী-রাণী বেশ ধীর বিবেচকের মত তাকে এই কথা বলে:—"আমার একটা কথা শুনুন, আপনি বড় ভদ্র। আমার চল্লিশ হাজার টাকা ধার আছে। আর আপনাদের ত আর সে দিন নেই—সেই "প্যালামা"র সুসময় * * * আপনার যত ইচ্ছে আমার সঙ্গে বোসে খোস্-গল্প করবেন, কিন্তু বন্ধুত্ব ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক থাক্‌বে না।" পরী-রাণী ন্যায্য কথাই বলিয়াছিল। তথাপি, রমণীর প্রতি পুরুষের যেরূপ একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, সেই নিঃস্বার্থ আকর্ষণের টানেই সে সর্ব্বদাই পরী-রাণীর নিকট আসিত। কেননা সে সুন্দরী অভিনেত্রীদের কথায়বার্ত্তায়, রসিকতায় বড়ই আমোদ পাইত। আসল কথা, কোনপ্রকারে সময় কাটানো চাই।

এইসব ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সেই পরিচারিকার দিকে তাহার নজর পড়িল; টয়্‌লেট-আয়নায় সেই ক্ষুদ্রকায় বৃদ্ধার মুখের যে ছায়া পড়িয়াছে, সেই মুখের ছায়া দেখিয়া হঠাৎ যেন তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইল। কি ধ্বংসাবশেষ! কি লোমহর্ষণ কদর্য্যতা! দেহযষ্টি ছড়িগাছার মত শুক্‌নো, গণ্ডদেশ শীতকালের আপেলের মত চোপ্‌সানো, বলি-রেখাচ্ছন্ন, মাথায় ছাইরঙের একটা পর-চুলো, মড়ার মত চোখ, একটা হলদে লম্বা দাঁত বেগুনীরঙের ঠোঁট কামড়াইয়া আছে—উঃ, দেখিলে ভয় হয়! কে বলিবে একসময় সে রমণী ছিল, হয়ত রূপসী রমণী,—অবশ্য কত ভালবাসাও পাইয়াছে। এখন উহার বয়স অন্ততঃ ৭০ হইবে। ফাব্রেকের হৃদয় খারাপ ছিলনা—এই শোচনীয় বৃদ্ধার শেষদশাতেও খাটুনী শেষ হয় নাই দেখিয়া তাহার দয়া হইল। কিন্তু ছেঁড়া-খোঁড়া কালোরঙের শোকবস্ত্র-পরিহিতা ডাইনী-বুড়ির মত উহার চেহারা দেখিয়া এই সৌখীন মেজাজের লোকটির কেমন একটা ঘৃণাও হইল। উহার মনে হইল, এইসব ভাল ভাল জরির ফিতা, এইসব খোদাই কাজ-করা রূপার সুন্দর জিনিস-গুলি, এইসব ঝিনুকের চিরুণী—এই সমস্ত বিলাস সামগ্রী, এইসব সুকুমার সুগন্ধের শিশিগুলি উহার স্পর্শে যেন মলিন হইয়া যাইতেছে।

হঠাৎ দ্বার খুলিল; পরী-রাণী ঘরে প্রবেশ করিল। কাণে একটি গোলাপ; যে নায়িকার ভূমিকা অভিনয় করিতেছিল সেই নায়িকার মনোহর জমকালো বেশ। পরী-রাণী সদ্য-উৎপাটিত কুসুমগুচ্ছের মত

তাজা; রূপ, যৌবন, রং-মাখান মুখের রং, ও সেইসঙ্গে প্রগল্‌ভতাও যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সে বলিয়া উঠিল:—

"আপনি এসেছেন? কি সৌভাগ্য! বেশ বেশ! আপনি ঠিক সময়ে এসেছেন; আসুন, একটু গল্পস্বল্প করা যাক্···ওরা এখনি আমাকে ও আমার সঙ্গিনীদিগকে এই থিয়েটারের সাজেই "গেইটি" থিয়েটারে নিয়ে যাবে—সেখানে আজ "বেনেফিট্ নাইটের" অভিনয়।···বসুন, বসুন।"

ইহার পূর্ব্বেই বৃদ্ধা পরিচারিকা পর্দ্দার পিছনে চলিয়া গিয়াছিল। খুব কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এবং পরী-রাণী তাহার চির-অভ্যাস-অনুসারে, থিয়েটার-মহলে ফাব্রেক কত রমণীর হৃদয় জয় করিয়াছে তাই লইয়া তাহাকে ঠাট্টামস্‌করা করিতে লাগিল। লোকে যে বলে আপনি '—'র প্রেমে পড়েছিলেন, সে কথা কি সত্যি? কিন্তু ফাব্রেক খুব সাবধানী লোক। বেফাঁস কথা তার মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হয়না। ফাব্রেক হাসিয়া রসিকতা করিয়া উহার প্রশ্নটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আসল কথার কিছুই উত্তর দিল না। পরী-রাণী একটু বিরক্ত হইল। দেখিল ফাব্রেকের পেটের কথা কিছুতেই বাহির করা যায় না।

অবশেষে ফাব্রেক্ পরী-রাণীকে একটু প্রসন্ন করিবার জন্য একটু হাসিতে হাসিতে বলিল:—

ভাল, পরী-রাণী তোমার এতই যখন শোন্‌বার আগ্রহ, তোমায় আমায় প্রথম ভালবাসার গল্পটা বলি।

—কোনো থিয়েটারের রমণী সেই ভালবাসার পাত্র?

—হাঁ, কিন্তু আগে থাক্‌তেই তোমাকে বলে রাখি, সে সমাজ-ছাড়া ছিলনা···আমার তখন ১৯ বৎসর বয়স, আইন পড়তে সবে আরম্ভ করেছি। তখন আমি নিতান্ত অবোধ সরল ও ভীরু ছিলেম!···একদিন সায়াহ্নে গব্লিন্ থিয়েটারে ঢুকে পড়লেম, সেখানে "প্রবাসী পথিক"-এর অভিনয় হচ্ছিল; সেখানকার প্রধান তরুণী অভিনেত্রীর অভিনয় দেখে তার প্রেমে একেবারে বজ্র মুগ্ধ হয়ে পড়লেম। তাকে সবাই "রজনী-গন্ধা" বলে ডাক্‌ত···যখন সে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলে, তখন থেকেই···আমি মনে-মনে ভাব্‌তে লাগলেম; সত্যই কি ওর অত অল্পবয়স? সত্যই কি ও রূপসী? এখন ত আমি বেশ জানি, একটু "কোল্ড্‌ক্রীম" ও দুটো গাম্‌ছার প্রয়োগেই অভিনেত্রীর রূপ ধুয়ে-মুছে যায়, আর তাদের প্রেমে পড়ে সাধারণতঃ সৈন্যশ্রেণীর কতকগুলি নির্ব্বোধ আনাড়ী সুবেদার, জমাদার অথবা সব-ডেপুটী। কিন্তু তখন রমণীর মধ্যে রজনী-গন্ধাই আমার একান্ত কামনার ধন ছিল; তার কথা ভাবা, তার স্বপ্ন দেখাই আমার জীবনের একমাত্র কাজ ছিল। যে-দিন যে-থিয়েটারে সে অভিনয় করত, আমি সেই থিয়েটারেই যেতেম, আর তাকে দেখে, তার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হতেম। ঐ থিয়েটারের দলটা এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াত। অবশেষে আমার সমস্ত আইনের বই বিক্রি করে ফেল্লেম···রজনীগন্ধার কৃপায়, প্রাচীন গ্রীকনাটকগুলার সঙ্গে আমার বেশ

একটু পরিচয় হয়ে গিয়েছিল—সেইসকল নাটকের নায়িকার ভূমিকা কি-সুন্দর সে অভিনয় করত!···ঐ একমাত্র রমণী যার উদ্দেশে আমি পদ্য-রচনা করেছিলেম;—পদ্যগুলো অতি-যাচ্ছে-তাই হলেও তার মধ্যে একটা অকপট আন্তরিকতা ছিল। কিন্তু সেইসব কবিতা তার কাছে পাঠাতে আমার সাহসে কুলোয়নি তারপর কলেজের ছুটি হলে, আমাদের নিজের গ্রামে—নিজের পরিবারের মধ্যে চলে এলেম। সেখানে গিয়ে, কেবল দিন গুণে ঘণ্টা গুণে সময় কাটাতেম। তারপর প্যারিসে ফিরে এলেম। ফিরে এসেই যে তিন থিয়েটারে রজনীগন্ধা অভিনয় করত সেইসব থিয়েটারে যাতায়াত করতে লাগ্‌লেম। কিন্তু আমার "পরাণ-পুতলী"র নাম ঐসব থিয়েটারে দেয়ালে-আঁটা কোন ছাপানো বিজ্ঞাপনে দেখ্‌তে পেলেম না। আমার মনের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার তাড়নায়, একটু সাহস করে, দরোয়ানের ঘরে ঢুকে দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেম, রজনীগন্ধার এই রঙ্গালয়ে অভিনয়ের কোন বন্দোবস্ত হয়েছে কি না, রজনীগন্ধার সম্বন্ধে সে কিছু জানে কিনা···পরী-রাণী, আমার কথা বিশ্বাস কর,—সে দিন আমি ভালবাসার কষ্ট যে-রকম অনুভব করেছিলেম এমন আর জীবনে কখন করি নি। কত দীর্ঘ মাসের পর তবে আপনাকে একটু আমি প্রকৃতিস্থ করতে পেরেছিলেম। অভিনেত্রী বলিল ঃ—

—এই শুধু? তার পর আর কিছু নেই? "আমার কথাটি ফুরোলো আর নটে গাছটি মুড়োল"?

—তা নয় ত কি।

—আপনি দেখ্‌ছি লোকের চোখে ধূ ধূলো দিতে পারেন। শুধু ছাত্রজীবনের ব বলেই সেরে দিলেন? তা হচ্চে না মশায়···

ঠিক্ এই সময়ে হঠাৎ অভিনেত্রী কাম্‌রার দাসী কামরার মধ্যে হুড়ু করিয়া ঢুকিয়া পড়িল।

"ঠাক্‌রণ, ঠাক্‌রণ,···ওঁরা সবাই গাড়ী উঠ্‌ছেন—শুধু আপনার জন্য অপে করচেন।"

সিঁড়ির উপর হইতে, থিয়েটারের একজ ম্যানেজার হাঁক্ দিয়া ডাকিল ঃ—"শ্রীমতী পরী-রাণী···শিগ্‌গির! দেরী হয়ে যাচ্চে।"

তারপর, একমিনিটের মধ্যেই, কাম্‌রা চাকরাণী, পরিচ্ছদ-পরিচারিকার হস্ত হইতে বোচ্‌কা-বুচ্‌কি গ্রহণ করিল; পরী-রা একটা ওড়না পরিয়া লইল; "মশা বিদায় হলেম।" চাক্‌রাণীর সঙ্গে পরী-রা প্রস্থান করিল।

ফাব্রেকও যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল এমন সময়, গৌরভী বুড়ী আস্তে আ নিকটে আসিল এবং তাহার কষ্টের মুখখা তুলিয়া ফ্যাব্রেকের পানে চাহিয়া রহিল সসংকোচে ভয়ে-ভয়ে সে গুনগুন করি বলিল ঃ—

"মশায়!"

—অ্যাঁ?···কি বাছা?···

—আপনার নিকট আমার একটি প্রার্থ আছে···দেখুন, আমি বড়ই শ্রান্ত। আমা স্বাস্থ্য একেবারেই গেছে। আমি এখ অতি কষ্টে আমার কাজ করছি···তাই কোন আতুরাশ্রমে আমি আশ্রয় নিতে চাই

ফাব্রেক অন্যমনস্কভাবে বলিল ঃ—

"আচ্ছা বেশ, পরে, আমাকে পত্রের া জানিও।

কিন্তু পরিচ্ছদ-পরিচারিকা সব কথা নো বলে নাই। "তারপর, মশায়, একটা া শুন্‌লে আমার উপর আপনার আর কটু বেশী দরদ হতে পারে···ঠাকরণের ে আপনি এইমাত্র যে কথা-বার্ত্তা ছিলেন, আমি সব শুনেছি।···তবে বলি, —আমিই সেই "রজনীগন্ধা"।

ফাব্রেক বিস্ময়সূচক একটা কথা বলিয়াই এক-পা পিছু হটিল। রজনীগন্ধা! কালো ছেঁড়া-কাপড়-পরা, ডাইনীর মত চেহারা এই সুন্দরী—রজনীগন্ধা!

বিচলিত ও আতঙ্কিত হইয়া ফাব্রেক লিয়া উঠিল ঃ—তোমার বয়স তবে কত বে?

বৃদ্ধার মুখে একটু করুণ হাসির রেখা দেখা দিল।

"আমাকে দেখ্‌লে যে-রকম মনে হয়, আমার ততটা বয়স নয়। সত্যি কথা বল্‌চি। আমি এত কষ্ট পেয়েছি···আমার এখন ৬২ বৎসর বয়স—সহরতলীতে আপনি যখন আমার অভিনয় দেখেছিলেন, তখন আমার বয়স ৪১ বৎসর···মনে হয় যেন সেদিনের কথা···রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীদের বয়স বড়-একটা জানা যায় না—তবু ত তার একটা সীমা আছে···যাই হোক্ আমার সেই বৎসরেই ওরা আমাকে জবাব দেয়—ওরা মনে করলে, আমি একটু বেশী বুড়ী হয়ে পড়েছি···আর তখন থেকেই আমার দুঃখকষ্ট আরম্ভ হয়···থিয়েটার ছাড়বার তিনমাস পরে, আমি বাড়ীওয়ালীর কাজ করতে লাগ্‌লেম। তার অনেকদিন পরে, আমার এক পুরোনো বন্ধু, যে এই থিয়েটারে বুড়ো সাজ্‌ত, সে আমার এই পরিচ্ছদ-পরিচারিকার কাজটি জুটিয়ে দেয়—কিন্তু আর আমার কাজ করবার শক্তি নেই—এখন আতুরাশ্রম ছাড়া আর আমার গতি নেই···এখন আমি আতুরাশ্রমের আশ্রয় চাই—আপনি পার্লেমেণ্ট সভার একজন প্রতিনিধি, আপনি যদি আতুরাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষকে···আমার আসল নাম "পেয়ারী"··· আর যখন একসময়ে আমার উপর আপনার একটু সুদৃষ্টি ছিল···"

এই কথা বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল—ভয় হইল পাছে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় ফাব্রেক অসন্তুষ্ট হন। পরিচারিকার সৌভাগ্য,—ফাব্রেকের হৃদয়টা ভাল ছিল। ঈষৎকম্পিত স্বরে ফাব্রেক বলিলেন ঃ—

"আমি যাব···কালই আমি যাব। তুমি নিশ্চিন্ত হও। আতুরাশ্রমের লোকদের বলে কয়ে যাতে তোমার একটা কিনারা হয়, আমি তা করব।" এই কথা বলিয়াই পকেটে হাত গুঁজিয়া ফাব্রেক আবার বলিল—"আপাতত তোমার খর্চ্চার জন্য কিছু···"

পরিচারিকা হাতযোড় করিয়া, একটু উন্নত গর্ব্বের সহিত অস্বীকারসূচক ভঙ্গী করিয়া এই কথা বলিল ঃ—

"আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ—আমি শুধু আতুরাশ্রমে যেতে চাই, আর কিছু না··· সেখানে আশ্রয় পেলে, আমি "শিল্পী-সমাজ"

থেকে যে বার্ষিক বৃত্তি পাই, তাতেই আমার বেশ চলে যাবে,—আমি খুব সুখে থাক্‌ব।"

ফাব্রেক যাইবার আগে খুব হৃদ্যতার সহিত পরিচারিকার সম্মুখে হাত বাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু পরিচারিকা যখন তাঁহার হাতে হাত রাখিল, তিনি একটু শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—২০ বৎসর পূর্ব্বে, যদি ঐ হাতের উপরে তাঁহার যৌবনকালের একটি সসঙ্কোচ চুম্বন স্থাপন করিতে পারিতেন তাহা হইলে আনন্দে তাঁহার অশ্রুপাত হইত।

থিয়েটারের সরু ঢাকা-বারাণ্ডা-প দিয়া যাইবার সময় তাঁর বুক্‌টা এক কাঁপিতে লাগিল। আর আজব স প্যারিসের আজব কাণ্ডের বিপুল অভিজ্ঞ সত্ত্বেও, যার উপর তাঁর প্রথম ভালবা পড়িয়াছিল, তার জন্য অতুরাশ্রমের এক শয্যা যোগাড় করিয়া দিতে হইবে ম করিয়া বিস্মিত হইলেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বেচ্ছাচারী

৪

সর্ব্বানন্দ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে শশিভূষণ তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিল, "কি করে এলে?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "তোমার লোকটিকে টাকা-কড়ি দিয়ে একটা ঘর ঠিক করে ওখানে বসিয়ে রেখে এলুম। কিন্তু আমার মনে হয় না যে ঐ রকম বোকা লোক কার্ত্তিকের সমস্ত কাজ-কর্ম্মে নজর রাখতে পারবে।"

শশিভূষণ কহিল, "বোঝো একবার ওর ক্ষমতা! তোমার চোখেও ধূলো দিয়েছে! তুমিও বুঝতে পারনি যে ও কেমন লোক। ঐ রকম লোকের দ্বারাই কার্য্যোদ্ধার হবে। কার্ত্তিক বুঝতেই পারবে না যে ওর উপর আমাদের দৃষ্টি আছে, অথচ কাজ বেশ হয়ে যাবে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিন্তু আমার ম হয়, কার্ত্তিক কিছুই গোপনে করবে না, ও সয়তানী খোলাখুলি রকমেরই হবে। বি আশয় বোধ হয় ও ওড়াবে না, কা এতটা নীচপ্রবৃত্তি ওর নয় যে, যে বিষয়ের ধর্ম্মত ট্রষ্টিমাত্র, তা উড়িয়ে পুড়িয়ে নীচে মত প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু খুড়োমশায়ে উপরও যখন ওর আক্রোশ হয়েছে, তখ আবার ওর দ্বারা সবই সম্ভব, মনে হয় কি আশ্চর্য্য, ঠাকুর্দ্দা, সাধারণ মানুষে য পেলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে, তা পেয়েও নিজেকে ও এতখানি অপমানিত জ্ঞান করছে!"

শশিভূষণ কহিল, "ওর কাছে নিজের ইচ্ছেটাই সব-চাইতে বড়। নিজেকে ও এত বড় করে চিরদিন দেখছে যে অনিচ্ছায় পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব পেলেও ওর মনস্তুষ্টি

না। যাক ও কথা, শৈলর সঙ্গে হয়েছিল?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কাল তার সঙ্গে দেখা ছিল।"

শশিভূষণ কহিল, "কি রকম দেখলে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "দেখলুম যা, তা আর কি হবে?"

শশিভূষণ কহিল, "তুমি কি বল্‌লে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি জিজ্ঞাসা কর-লুম, 'কেমন আছ, শৈল?' সে হেসে বল্‌লে, 'ভালই আছি।' কিন্তু সেই হাসিটুকু কান্নার চেয়েও বেদনায় ভরা। সেজন্য আমি স্পষ্টই বল্‌লুম, 'শৈল, তুমি আমায় সব কথা খুলে বল, আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।' প্রথমে সে ত কিছুই বলতে চায় না, শেষে অনেক সাধ্য-সাধ্যনায় বল্‌লে, 'আমার দুঃখ কাউকে বোঝানো যাবে না।' আমি বল্‌লুম, 'কেন যাবে না? তুমি বল, আমি বুঝব। কার্ত্তিক কি এত-দূর অধঃপাতে গেছে যে তোমাকেও সে কষ্ট দেয়?' শৈল তখন কেঁদে ফেলে বল্লে, 'অমন কথা আপনি বলবেন না। উনি প্রাণপণে আমায় সুখী করবার চেষ্টা করছেন। কখনও অনাদর করেন নি, বা একদিনের জন্যও আমায় একটা রুক্ষ কথা বলেন নি। সে বিষয়ে ওঁর কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু আমিই হতভাগিনী, তাই এমন স্বামী পেয়েও সুখী হতে পারছি না।' এতেই বুঝতে পারছ ঠাকুরদা, যে কার্ত্তিকের সয়তানী কি রকম সূক্ষ্ম ধরণের। বাইরে থেকে তার কিছুই বোঝবার জো নেই।"

শশী কহিল, "আর এতেই বুঝতে পারছ যে ওর সঙ্গে কি রকম সাবধানে চলতে হবে! ও-সব কথা যাক্—এখন এধারে এক মুস্কিলে পড়া গেছে যে, তোমার point systemএ শিখতে কেউ রাজী হয় না। ছেলেদের বাপ-মা-রাও সব বাধা দিচ্ছে, মাষ্টাররা বাধা দিচ্ছে, এমন কি সরোজ পর্য্যন্ত রেগে আগুন হয়ে গিয়েছে। এখন উপায় কি?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কারুর উপর পরখ না করলে ত কেউ ওটা নিতে চাইবে না। যেমন করে হোক একজনকে দিয়েও দেখতে হবে। আচ্ছা, সুকু, কি বলে?"

শশী কহিল, "ওর বয়স একটু বেশী হয়ে গিয়েছে না?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স বেশী নয়, ও বয়সে নতুন করে আরম্ভ করা চলে। ও যদি রাজী হয় ত আমি বলি তুমি নিজেই লেগে পড়।"

শশী কহিল, "তোমার system ভাই আমি নিজেই তেমন আয়ত্ত করতে পারি নি। যদি পরীক্ষা করতে হয় ত তুমিই কর। আমি আর নতুন করে আরম্ভ করতে পারিনে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "বেশ কথা, আমিই করব।"

সন্ধ্যার পর সরোজ ও সুকুমারীর নিকট এ প্রস্তাব উঠিলে, সরোজ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আহা, সুকু বেচারীর এ কূল ও কূল দু কূল নষ্ট করবে? একে ত বেচারী অতি-কষ্টে যা হোক কিছু শিখেছে, তার উপর নতুন করে আর একটা পদ্ধতির ভার ওর ওপর চাপিয়ো না, দোহাই তোমাদের

—ও বেচারী কিছু বলতেও পারবে না, অথচ তোমরা ওর জীবনের সমস্ত চেষ্টাটুকু ব্যর্থ করে দেবে। কেন? আর কোন ছোট ছেলে-মেয়ে কি অত বড় ইস্কুলের মধ্যে মিল্‌ল না, যে আমার সুকুকেই তোমাদের বৈজ্ঞানিক অত্যাচার সইতে হবে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তুমিও যদি সাধারণ অবুঝ লোকের মত বাধা দাও সরোজ, তাহলে আর আমাদের আশা নেই। আমি বলছি, সুকুর কোন ক্ষতি হবে না। ও যা শিখেছে, তাও ওকে ভুলতে দেব না, অথচ যদি ওর দ্বারা এই পদ্ধতিটা চালাতে পারি, তাতে সকলেরই উপকার হবে। আমি বলছি যে যদি এর জন্য আমায় দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করতে হয়, তা করতেও আমি প্রস্তুত আছি। এখন চাই কেবল তোমাদের সহকারিতা, আর উৎসাহ। কিন্তু তোমরা যদি এমনভাবে বেঁকে দাঁড়াও তাহলে আমরা করি কি?"

সরোজ কহিল, "গতানুগতিকভাবে চলাই সাধারণের পক্ষে নিরাপদ, বিশেষ অন্ধের পক্ষে অচেনা পথ মাড়াতেই নেই। আমার এ বিষয়ে যা মত, তা তোমাদের জানিয়ে দিলুম, এখন তোমাদের যা ইচ্ছে হয় তাই কর।"

সর্ব্বানন্দ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "নিরুপায়!"

সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই সুকুমারী তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমি আপনার নতুন পদ্ধতি শিখব। সরো দিদি, তুমি আর বাধা দিয়ো না; যা হয় আমার ভাগ্যেই হবে।"

সর্ব্বানন্দ সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সুকুমারীর অন্ধ নয়নের দিকে চাহিয়া বলিল, "সু বাঁচালে তুমি। তোমায় যে কি বলে কৃতজ্ঞ জানাব, তা ভেবে পাচ্ছি না। অ বলছি, তুমি আমার উপর নির্ভর এতে তোমার কোন ক্ষতি হবে আমি প্রাণপণ চেষ্টায় তোমায় এমন তুলব যে তুমি আমাদের ইস্কুলের সর্ব্ব ছাত্রী হবে।"

সুকুমারী কহিল, "আমি যাই তাতে কিছুই আসবে-যাবে না, কিন্তু আ নার যে প্রথম ছাত্রী আমিই হব, সেই আমার প্রধান গর্ব্বের জিনিষ হবে।"

সর্ব্বানন্দ পরমানন্দে সুকুমারীর মা হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। সুকুমা তাহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াই সরোজ বলিল, "ভগবানের কাছে প্রার্থ করি, তোমাদের এই মিলিত চেষ্ট ফল যেন অনাথ অন্ধদের পক্ষে প আলো নিয়ে আসে। আর—"

সরোকে হঠাৎ থামিতে দেখিয়া সর্ব্বান হাসিয়া বলিল,—"আর কি?"

সরোজ কহিল, "আর কি? যদি রা না কর ত বলি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "রাগ! কবে তু আমায় রাগ করতে দেখেছ?"

সরোজ কহিল, "কখনও না, তা বলছি, শিক্ষক-ছাত্রীর এই মিলন অক্ষ হোক। তোমরা জীবনের পথে এ থেকে দু'জনে মিলে এক হয়ে চল তোমাদের চেষ্টার একত্বের সঙ্গে মন, বুদ্ধি আত্মা সবই এক হোক!"

সুকুমারী তাহার সলজ্জ মুখ নত করিল। সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "তোমার ভুল হচ্ছে, আমি সুকুর হয়ে উপনিষদের ভাষায় বলি "ওঁ সহনাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।"

সর্ব্বানন্দ ভক্তিভরে "ওঁ হরি ওঁ" বলিয়া প্রণামান্তে প্রস্থান করিল। সরোজ হাস্য-মুখে সুকুমারীকে টানিয়া বুকের মধ্যে লইয়া বলিল, "সুকু, কাঁদছিস কেন, বোন?"

সুকুমারী অশ্রু-গদ্‌গদ স্বরে বলিল, "অন্ধকে নিয়ে এ রকম খেলা কি নিষ্ঠুরতা নয়?"

সরোজ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "সুকু, তোর হাতে ধরে বলছি, ভুল বুঝিস নে, সন্দেহ করিস নে। সন্দেহ করে ভুল বুঝে জগতে কত লোক যে মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছে, তার ঠিক নেই। এখন থেকে যে আনন্দ আসতে চায়, তাকে ভগবানের দান মনে করে নির্ব্বিচারে গ্রহণ কর্। আমি তোর বড় বোন, আমার কাছে লজ্জা কি? তুই আমার বুকের উপর কান পেতে শোন্, আমার মধ্যে কি হচ্চে। তাহলেই বুঝতে পারবি যে সন্দেহ করা কত বড় অপরাধ। আর সে অপরাধের শাস্তিও কত গভীর!"

সুকুমারী মুখ না তুলিয়া বলিল, "তুমি কাকে সন্দেহ করেছিলে সরো-দি?"

সরোজ কহিল, "সন্দেহ কাকে করেছিলুম? সব-চেয়ে সন্দেহ করেছিলুম আমি নিজেকে। যাক্, আর ও কথা নয়। এখন তোর কথা বল্?"

সুকু কহিল, "আমার ত কিছুই বলবার নেই।"

সরোজ কহিল, "তাই হোক বোন, তাই হোক, জীবনে যেন তোমার কিছুই বলবার না থাকে; যেন কারো কাছে জবাবদিহি করবার একটা ভার বহন করে তোমায় জীবন কাটাতে না হয়! তোমার জীবনে সবই যেন সহজ, সরল থাকে, স্পষ্ট থাকে!"

সরোজ ও সুকুমারী পরস্পরের দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া বসিয়া আছে, এমন সময় চিন্ময়ী প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "সুকু, তুই নাকি সব্ব'র নতুন ধরণের লেখা শিখতে রাজী হয়েছিস্?"

সুকুমারী সরিয়া বসিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা।"

চিন্ময়ী আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "আহা, সব্ব আমার ভারী খুসী হয়েছে। তুই দেখিস্ সরোজ, সব্ব নিশ্চয়ই সুকুকে এমন তৈরি করে তুলবে যে সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। এর জন্য তোকে শশী কত আশীর্ব্বাদ করছে।"

সরোজ কহিল, "শশিদা কখন এল?"

চিন্ময়ী কহিলেন, "আমার ঘরে অনেকক্ষণ থেকেই ও এসে বসে ছিল। তোর সঙ্গে তর্কের ভয়ে এখানে আসে নি। সব্ব যখন গিয়ে খবর দিলে, তখন সে লাফিয়ে উঠল। তারপর দুজনে ইংরিজিতে কি বলাবলি সুরু করে দিয়েছে। সব্ব আমায় বল্‌লে যে আজ তার এত আহ্লাদ হয়েছে, যে রাজ্য

পেলেও এমন হত না। সব্বর মত মানুষের কথা ঠেলে সরোজ তুই কি করে অমত করছিলি?"

সরোজ কহিল, "আর আমার মতামতে কি যাবে-আসবে মা? সুকু যখন নির্বিচারে আপনাকে সর্ব্ব-দার হাতে সঁপে দিয়েছে, তখন আমি বাধা দিলুম, আর না দিলুম, তাতে সুকুর কি? সুকু এখন যতদিন ইচ্ছে যা-ইচ্ছে শিখুক না, এখন সুকুর সব ভার সর্ব্ব-দার উপর।"

চিন্ময়ী কহিলেন, "আহা, সব্বর মত মানুষের উপর নির্ভর করবে না ত কার উপর করবে? ভালই করেছিস্ সুকু, দেখিস্, তোর খুব ভাল হবে।"

চিন্ময়ী মহানন্দে চলিয়া গেলেন। সুকুমারী মৃদু স্বরে বলিল, "সরো-দি, তুমি ভাই বড় দুষ্টু।"

৫

আকরে পদ্মরাগানাং জন্মঃ কাচমণেঃ কুতঃ? এই শাস্ত্র-বাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করিয়া যখন মণিশঙ্করের পৈতৃক বিষয়-বুদ্ধি শিবরামপুরের বিস্তৃত জমিদারীর প্রত্যেক অংশে অনুভূত হইতে লাগিল, তখন শৈল ব্যস্ত হইয়া স্বামীকে ধরিয়া বসিল যে মণিশঙ্করকে ছাড়াইয়া দেওয়া হোক; চারিদিক হইতে অত্যাচারের করুণ কাহিনী সে আর শুনিতে পারে না। কার্ত্তিক পূরাদস্তর জমিদারী চালে উত্তর দিল, জমিদারী রাখিতে হইলে এরূপ না করিলে চলিবে কেন? মণি যাহা করিতেছে, তাহা কার্ত্তিকের উপদেশানুসারেই করিতেছে। তাহাতে মণির কোন দোষ নাই।

শৈল কাঁদিয়া বলিল, "তা বলে গরীব বিধবার ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করা হবে, না, পূর্ব্বপুরুষরা যে-সব দেবোত্তর দি গিয়েছেন, পুকুর দিয়ে গিয়েছেন, সে-স কেড়ে নিতে হবে?"

কার্ত্তিক কহিল, "দেবতা স্বয়ং কি ভোগ করেন না, মানুষই ভোগ করে কতকগুলো বাজে লোক ভোগ করছি না হয়, আমরাই সেগুলো ভোগ করলুম দেবতার পক্ষে রামা যে শ্যামাও সে, কার্ত্তি যে শৈলও সে। আর ব্রহ্মোত্তর? ব্রাহ্ম আর গঙ্গা কলিতে লোপ পেয়েছে, অতএ ও সব দান অসিদ্ধ। কতকগুলো জোচ্চো ফাঁকি দিয়ে ভোগ করছিল, আমি তাদে জব্দ করে দিয়েছি মাত্র।"

শৈল কহিল, "তা হলে কোন্ দি তুমি বাবার ব্রহ্মোত্তরগুলোও কেড়ে নি ওঁকে টোল থেকে তাড়াবে বল?"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "তা রামা পক্ষে যা করব শ্যামার পক্ষেও তা করা উচিত বৈ কি!"

শৈল স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "জানিনা কি মতলবে তুমি আমার কাছে এ স কথা বল! এ কি আমার পরীক্ষার জ —না—কিন্তু যাই হোক্—তুমি মণি-দাকে না তাড়াও, অন্তত আমার জন্য যা-যা ও কেড়ে নিচ্ছে, তা ফিরিয়ে দাও। তুমি ন দাও ত আমি দেব।"

কার্ত্তিক কহিল, "তা হলে সে খরচ তোমার নিজের এষ্টেট থেকে হবে, আমি দেব না।"

শৈল কহিল, "কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি ত মণির কোন ষই দেখতে পাচ্ছি না।"

শৈল কহিল, "অন্যায় দেখতে পাচ্ছ মণি যা করছে, সবই ঠিক?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমার ত তাই মনে ।"

শৈল কহিল, "তুমি এত দূর অন্ধ হয়ে ছ!"

কার্ত্তিক কহিল, "সে কথা কি আজ নলে, শৈল? আমার দুটী চক্ষুই গিয়েছে, দুটো যা দেখছ, এ পাথরের।"

শৈলজা স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কি ই কার্ত্তিক, চিরদিন যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে হের মত যুদ্ধ করিতে উদ্যত ছিল! কি সেই মানুষ!

গভীর দুঃখে শৈলজা কাঁদিয়া ফেলিল। র্ত্তিক কিন্তু হাসিতে হাসিতে বলিল, ন্ধকারের ঘুরঘুরে পোকাকে আলোয় রে রাখবার চেষ্টা করলে সে ত এমনি রে চারদিকে গর্ত্ত খোঁড়বার চেষ্টা করবেই। র জন্য দুঃখ কেন করছ, শৈল? আমি ত লেছি, সুখ আমায় সয় না! তাই চারিদিকে খের হাহাকার জাগিয়ে তুলে তার মধ্যে ই মুদে বসে হাসবার চেষ্টা করছি।"

শৈল কহিল, "না, আমি তোমায় এত পাতে যেতে দেব না। যদি তোমায় ক্ষা করতে না পারি ত আমি কিসের তোমার স্ত্রী? কিসের আমার ভালবাসা?"

কার্ত্তিক কহিল, "ঠিক বলেছ শৈল, কিসের ভালবাসা? কিসের স্নেহ? সবই মোহ, সবই বন্ধন!"

শৈল কহিল, "তুমি মরণাধিক মরণের দিকে ছুটে চলেছ। কিন্তু কেন যে তোমার এ মতিচ্ছন্ন হয়েছে, তা বুঝতে পারছিনে।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমিই বুঝতে পারছিনে, তা তুমি! কিসের মোহে, কিসের আকর্ষণে আমার সমস্ত বুদ্ধি সয়তানীর দিকে ছুটে চলেছে, তা যদি বুঝতুম, তা হলে কি আমিই এমন হতে চাইতুম! আমি জানি না, তবু না জেনেই ছুটতে হচ্চে, এমনি আকর্ষণ পতনের, এমনি আকর্ষণ মৃত্যুর, এমনি আকর্ষণ অন্ধকারের!"

শৈল কহিল, "আমি প্রাণ দিয়েও তোমায় বাঁচাব।"

কার্ত্তিক কহিল, "প্রাণ দিয়েও তুমি রক্ষা করতে পারবে না।"

শৈল কহিল, "তবে কি দিয়ে তোমায় রক্ষা করব?"

কার্ত্তিক কহিল, "সেইটেই তোমায় আবিষ্কার করতে হবে। আমি সেই আশায় বসে আছি। যেদিন সেইটে তুমি ধরতে পারবে, সেদিন দেখবে, আবার আমার চোখ ফুটেছে।"

কার্ত্তিক চলিয়া গেল। আর শৈলজা আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিল না, কার্ত্তিক কি চায়! সে অনেক বার কার্ত্তিককে বলিয়াছে, যে যদি শৈলকে বিবাহ করিয়া সে অসুখী হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে কেন শৈলকে ত্যাগ করিয়া যাহাকে পাইলে সুখী হয়, তাহাকেই বিবাহ করে না? কিন্তু কার্ত্তিক যে তাহাতে রাজী নয়। তবে কার্ত্তিক কি চায়? কি পাইলে কার্ত্তিক আবার সুস্থ

হইবে, আবার পূর্ব্বভাব ফিরিয়া পাইবে? শৈলজা ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে আর-একটা এমন ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহাতে কার্ত্তিক শৈলর নিকট আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। ন্যায়রত্নের পত্নী মনোরমা দেবী বহু দিন হইতে রোগে ভুগিতে ছিলেন। শৈলজা নানা উপায়ে তাঁহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই সুস্থ হইলেন না, পুত্রের নিষ্ঠুর ব্যবহারে মার প্রাণ একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ক্রমশ তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন এবং পরিশেষে একদিন আর দেরী নাই বুঝিয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া শৈলকে বলিলেন, "বৌমা, আজ আমার শেষ দিন, আজ যদি একবার সে হতভাগাকে দেখতে পেতুম, তাহলে মনে আর কোন ক্ষোভ থাকত না।"

শৈলজা তাহার স্বামীকে বহু অনুনয়, বিনয় করিয়াও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকটে আনিতে পারে নাই। কিন্তু আজ সে দৃঢ় স্বরে বলিল, "মা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আজ তিনি আসবেন।" শৈল কার্ত্তিকের নিকটে গিয়া সব কথা বর্ণনা করিয়া বলিল, "আজ তোমায় তাঁর এই শেষ মুহূর্ত্তে যেতেই হবে। সর্ব্ব-দাদা তাঁর সব কাজ ফেলে যখন আজ পাঁচ দিন থেকে মার কাছে এসে বসে আছেন, তখন তুমি তাঁর একমাত্র সন্তান হয়ে মার কাছে তাঁর এ শেষ মুহূর্ত্তেও যাবে না? না, তুমি এত নীচ নও।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি যে অন্ধ, আমি যে কাকেও আর দেখতে পাচ্ছিনে, মা কাছে কেমন করে যাব?"

শৈল কহিল, "এস, আমি তোমার হা ধরে নিয়ে যাব। যদি তুমি অন্ধই হয়ে থা তবু আমার চক্ষুই তোমার চক্ষু হবে।"

কার্ত্তিক পরম স্নেহে আজ জীবনে প্রথম তাহার স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলি "আমার হাত ধরে তুমি কেমন ক সকলের সুমুখে রাস্তা দিয়ে যাবে?"

শৈল কহিল, "যার স্বামী অন্ধ, তা আবার লজ্জা কি! এস, আমি তোম হাত ধরে নিয়ে যাব।"

কার্ত্তিক সত্যই পত্নীর হস্ত অবল করিয়া নিমীলিত নেত্রে মাতৃ-সন্নিধা উপস্থিত হইল; গিয়া বলিল, "মা, তোমার ছেলে এত দিন পথ দেখতে পায়নি বলে কেউ তোমার কাছে আমায় পথ দেখি আনে নি বলে আসতে পারে নি। আ সে এসেছে। কি বলতে চাও, বল।"

কার্ত্তিকের মুখের দিকে চাহি মৃত্যুশয্যায় শায়িতা মা কাঁদিয়া উঠিলে কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "কাঁদছ কেন মা আমি ত সুস্থ সবল শরীরে বেঁচে রইলু ভয় কি, আমার ১০৮ বৎসর পরমায়ু কোষ্ঠী লেখা আছে।"

সর্ব্বানন্দ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "মার এ অবস্থা দেখেও যে সন্তান তাঁর শেষ সময় উপহাস করতে আসে—"

কার্ত্তিক কহিল, "তার শাস্তি আজী অন্ধতামিস্র নরকে বাস। ভয় কি স দা, তাই ত আমার হচ্ছে। মা, তুমি অভিশাপ দেবে, দাও।"

মাতা ক্ষীণ অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, আমার কাছে আয়, কার্ত্তিক—"

কার্ত্তিক বলিল, "কোথায় তুমি—আমি দেখতে পাচ্ছি নে।" শৈলজা তার হাত ধরিয়া শাশুড়ীর কাছে দিয়া দিল। মাতা পুত্রের বুকে হাত বলিলেন, "বাবা, এই শেষ সময় আশীর্ব্বাদ করতে চাচ্ছি, আমার আশীর্ব্বাদ নিবি নে?"

কার্ত্তিক কহিল, "মা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন চর্ম্ম চক্ষে আর না তোমায় দেখতে হয়।"

মনোরমা দেবী কহিলেন, "চোখ চেয়ে বল্ বাবা, তা হলেই দেখবি, সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। নিজের চোখ নিজে বন্ধ করে বলে কে তোকে চোখ দেবে, বল্? আমি আশীর্ব্বাদ করছি, আবার তুই সুস্থ হবি, আবার তুই আগেকার মত হবি।"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "মা, তোমার কথা কবে সফল হবে! কবে আবার আমি তোমারকে আমার সেই পুরোনো চোখে দেখতে পাব! কবে এই ভয়ঙ্কর বন্ধন, অন্ধকারের দিন কেটে যাবে!"

মনোরমা কহিলেন, "যে দিন তুই নিজের চোখে সব ঘোর কাটিয়ে ফেলবি।"

কার্ত্তিক কহিল, "তা পারব না মা, আমার হাত-পা বাঁধা। তোমরা যে বাঁধন বেঁধে দিয়েছ, তা যে বাপ-মায়ের বত্রিশ লোহার বন্ধন, কে তাকে ছিঁড়তে পারবে?"

মনোরমা দেবী উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "কি, আমরা তোকে যে বাঁধনে বেঁধে রেখেছি, তাতেই তোকে অন্ধ করেছি! ওরে সে বন্ধন যেন তোর অক্ষয় হয়!

ওরে অন্ধ, যে দিন বুঝতে পারবি যে কি আলো তোর চোখের সামনে ধরে দিয়েছি, সেই দিনই তোর সব ঘোর কেটে যাবে। তুই যদি নিজে চোখ বুজে থাকিস্, তাহলে কি করে সে আলো দেখতে পাবি?"

কার্ত্তিক কহিল, "মা, আমি আলো চাই নে, আমি যে অন্ধকারই চাই।"

মনোরমা কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় শিবচন্দ্র সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্,মনোরমা, হরি নাম কর, কি যা-তা এ সময় বকছ? নারায়ণ বল, হরি বল!" মনোরমা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, "মা দুর্গা, কোলে নে মা। গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম।"

শ্রীভগবানের মধুর নাম শ্রবণ করিতে করিতে পতি-পুত্রের সম্মুখে মনোরমা দেবী দেহ ত্যাগ করিলেন। শ্মশানে তাঁহার দেহ ভস্ম হইয়া গেলে কার্ত্তিক বিকট স্বরে হাসিয়া বলিল, "মা, এইবার তুমি আমার অন্ধকারের দেশে গিয়েছ, এবার থেকে সর্ব্বক্ষণ তুমি আমায় দেখতে পাবে। দেহ কিছুই না, ছাই যার অবশিষ্ট থাকে, তা নিয়ে কি হবে? তুমি ছাইয়ের দেহ ছেড়ে যে দেহ নিয়েছ, তাই তোমার যথার্থ দেহ।"

কার্ত্তিক পাগলের মত ছাই উড়াইয়া তাহারই এক অঞ্জলি এক-টুকরা ছিন্ন বস্ত্র-খণ্ডে বাঁধিয়া লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

৬

শশিভূষণ হঠাৎ সর্ব্বানন্দর পত্র পাইয়া অভিভূত হইয়া পড়িল। সর্ব্বানন্দ লিখিয়াছে, "ঠাকুরদা, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কার্ত্তিক আমাদের বুঝি-বা অন্ধ হইয়া যায়!

খুড়িমার মৃত্যুর দিন তাহার যে মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহা জীবনে ভুলিব না। এখানে আসিয়া শুনিলাম, সে কিছু দিন হইতে দিনে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকে, রাত্রে বাহির হইয়া সংসারের কাজ-কর্ম্ম দেখে। বৈষয়িক কোন গোলমাল এখনও দেখা দেয় নাই বটে, কিন্তু যাহার বিষয়, সে এরূপ হইলে পরে যে কি ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে? সে এতদিন পর্য্যন্ত তাহার মার সঙ্গে দেখাই করে নাই, কিন্তু খুড়িমার মৃত্যুকালে সে চক্ষু মুদিয়া শৈলর হাত ধরিয়া আসিয়া মার কাছে দাঁড়ায়। তখন-পর্য্যন্ত মনে করিতেছিলাম যে এ সমস্তই সয়তানী; কিন্তু খুড়িমার মুখাগ্নি করিয়া সে যখন বিকট হাস্য করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, তখন বুঝিলাম যে তাহার কিছুই কৃত্রিম নয়। সে যখন হাতড়াইতে হাতড়াইতে নদীতীর হইতে উপরে আসিয়া বসিল, তখন তাহার চোখের সমস্ত দীপ্তি নিবিয়া গিয়াছে। ইচ্ছা করিয়া কি মানুষ অন্ধ হইতে পারে? ভাই, তোমার ত এ বিষয়ে অনেক পড়াশুনা আছে, কোথাও কি পড়িয়াছ যে মানুষ কেবলমাত্র ইচ্ছা দ্বারা অন্ধতা আনয়ন করিতেছে—কোন ঔষধের দ্বারা নয়? কোন ঔষধের সাহায্যে যদি ইহা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে এই বেলা সাবধান হইতে হইবে। কিন্তু আমি সেদিন হইতে তাহার সমস্ত ঘর সমস্ত বাক্স-আলমারি-সিন্দুক পাতি-পাতি করিয়া খুঁজিয়াছি, যে লোকটী সর্ব্বদা তাহার নিকট থাকে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না যে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া সে অন্য কিছু করে। অথচ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে কার্ত্তিক দিবসে ক্ষীণদৃষ্টি, কিন্তু তাহার অন্য ভাব। পূর্ণ তেজে সে সমস্ত কাজ তখন দেখা-শুনা করে, কৃত্রিম আলোয় তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সে সুস্থ। কিন্তু দিন আসিলেই সে যেন জড় হইয়া একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। তাহাকে বাহিরে আনিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, সে বাহিরে আনিবার কথাতেই কাঁপিয়া থাকে। নিতান্ত বাধ্য হইয়া বাহির আসিলে সে যেমন ত্রস্তভাবে হাত চাপিয়া ধরে, তাহাতে ভয় হয় যেন সে প্রতিপদে ক্ষেপেই পড়িয়া যাইবার ভয় করিতেছে। এ কি হইল, ভাই? সে এ কি করিয়া বসিল! আমি যে আর তাকে এক মুহূর্ত্তও ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। ঠাকুরদা, কি করিব, কি উপায়ে কার্ত্তিকের চক্ষু দু'টী ফিরিয়া পাইব?"

শশিভূষণ পত্র পড়িয়া উত্তেজিতভাবে আপনার কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিল। সহসা পরক্ষণেই কি মনে করিয়া তাহার গোপন কক্ষের দ্বার খুলিয়া মৃতা পত্নীর তৈলচিত্রের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে ঠিক তাহা সেটি যাইতেছিল না বলিয়া সে দরজা-জানালা খুলিয়া দিল। তবু দেখা যায় না! শশিভূষণ নেত্র মার্জ্জনা করিয়া চাহিয়া দেখিল, মূর্ত্তি যেন হাসিতেছে। সে মনে মনে বলিল, অন্ধতার এ আকর্ষণ! আজ কত বৎসর হইল তুমি গিয়েছ, তবু তোমার ঐ অন্ধ নয়ন

আমায় বেঁধে রেখেছে। কি দৃঢ় বন্ধন! কি ভীষণ আকর্ষণ! চোখের আড়ালে রয়েছ, তবু তোমার এত শক্তি! তোমায় জন্মে আর পাব না, তাই কি তোমার টান এত দৃঢ়? মৃত্যুর আড়ালে যে তোমার অশ্রুত বাণী, তোমার অলক্ষ্য দৃষ্টি আমায় মরণ-বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। নড়বার-চড়বার শক্তি আর আমার নেই! তোমার পায়ের গোড়ায় থাকলে, বুকের অতি-কাছে থাকলে হয়তো তোমায় এমন করে চাইতুম না, হয়তো তোমায় অবজ্ঞাই করতুম। কিন্তু এখন তুমি অপ্রাপ্য, এখন তুমি দুর্ল্লভ, তাই তোমায় আশায় বসে আছি। পাব না, জানি, তবু পেতে চাই। এ এক অদ্ভুত প্রহেলিকা!

শশিভূষণ আবার সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিল; তারপর তাহার অন্ধ বিড়ালয়ে চলিয়া গেল। কিন্তু সেখানেও আজ সে কোন আনন্দ পাইল না। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, জগতের সমস্ত আলো যেন নিবিয়া অন্ধকারে মিশিয়া যাইতে চাহিতেছে। আর সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে একটী করুণ ধ্বনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, "আলো, ওগো আলো!"

শশিভূষণ উদাস মনে সমস্ত দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার পর শ্বশ্রূঠাকুরাণীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু দ্বারের কড়া ধরিয়া টানিতে গিয়া তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল; একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা তাহাকে আক্রমণ করিতেই সে সরিয়া গলির অপর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, উপরে কোনরূপ শব্দ হয় কি না। না, কোন ভীতি-জনক শব্দ নাই, সমস্তই শান্ত, সমস্তই আগেকার মত। শশিভূষণ সবলে সকল দ্বিধা দূর করিয়া কড়া ধরিয়া টানিয়া দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সমস্তই সেইরূপ আছে! সেই আলো, সেই ফুল, সেই শোভা, সেই গন্ধ! তবু যেন কোথায় কে কাঁদিতেছে! শশিভূষণ দ্রুত পাদক্ষেপে উপরে গিয়া দেখিল, সব একইভাবে চলিতেছে। সুকুমারী তাহার সন্ধ্যার কর্ম্ম সারিয়া চিন্ময়ীর নিকটে বসিয়া গল্প করিতেছে; সরোজ সেই একইভাবে উপরের ছাদে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শশিভূষণ উপরে সরোজের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সরোজ, আজ তুমি ভাল আছ ত?"

সরোজ বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন শশীদা, ও কথা জিজ্ঞাসা করলে কেন? তোমার গলার আওয়াজ এত ভয়ের মত শোনাল কেন? কি হয়েছে, শশীদা? সর্ব্বদার চিঠি পেয়েছ ত? ওঁর খুড়িমা কেমন আছেন?"

শশী কোন উত্তর দিল না দেখিয়া সরোজ তাহার হস্ত স্পর্শ করিল, তারপর কাতরভাবে বলিল "তুমি অমন করে এসে দাঁড়ালে কেন? বল, তোমার পায়ে পড়ি, কি হয়েছে, বল।"

শশী কহিল, "কিছু হয়নি সরোজ, কেবল কার্ত্তিক—তুমি আজ ভাল ছিলে ত? তোমার—"

সরোজ উদ্বিগ্নভাবে বলিল, "তাঁর কি হয়েছে, বল। আমি ভালই আছি।"

শশী কহিল, "আঃ, বাঁচলুম। এ তাহলে তার নিজের দোষ। তুমি তাকে কিছু কর নি, তুমি মনে মনে তাকে আকর্ষণ করে, তার চিন্তা করে তোমার অন্ধতা তাকে দাওনি? আঃ বাঁচলুম, সরোজ, তোমার কোন দোষ নেই জেনে বাঁচলুম আমি।"

সরোজ কহিল, "আমি যে তোমার একটা কথাও বুঝতে পারছি না। কে অন্ধ হয়েছে? তুমি পাগলের মত কি বলছ?"

শশী বলিল, "আমি আজ পাগলের মত হয়ে গিয়েছি, সরোজ। আজ আমার সারাদিন মনে হয়েছে যে তুমি তার জন্য কেঁদে কেঁদে তাকেও অন্ধ করে দিলে। কেন বলতে পারিনে, আমার আজ কেবলি মনে হয়েছে যে তুমিই কার্ত্তিকের এই অন্ধতার কারণ, তুমিই—"

সরোজ বাধা দিয়া কহিল, "চুপ কর, তিনি অন্ধ হয়েছেন, কি করে জানলে?"

শশী কহিল, "সর্ব্বর চিঠিতে জানলুম।"

সরোজ কহিল, "কি লিখেছেন তিনি?"

শশী পত্রের স্থূল মর্ম্ম তাহাকে জানাইল। সরোজ সমস্ত শুনিয়া বলিল, "শশিদা, আমায় নীচে নিয়ে চল।" শশিভূষণ সরোজের হাত ধরিয়া নিম্নতলে তাহার কক্ষে লইয়া গিয়া তাহাকে শয্যায় বসাইয়া দিল; তারপর তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কাছে চলিয়া গেল।

সরোজ কিন্তু কাঁদিল না, কাঠের মত শয্যার উপর বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সুকুমারী আসিয়া দ্বার হইতে বলিল, "মা তোমায় ডাকছেন, সরোদি।" সরোজ সে কথা শুনিতে পাইল না। তাহার নিকট হইতে কোন উত্তর পাইয়া সুকুমারী ভাবিল, সরোজ সে নাই। সে শশিভূষণের নিকটে গিয়া বলি "কৈ, সরোদি ত তার ঘরে নেই শশিভূষণ ব্যস্ত হইয়া সেই কক্ষে আসি দেখিল, সরোজ সেই একই ভাবে বসি আছে। শশী তাহার নিকটে গিয়া স্বরে ডাকিল, "সরোজ।" সরোজ নির্ব্বা নিস্পন্দ। শশিভূষণ ব্যস্ত হইয়া তাহা নাড়া দিয়া বলিল, "সরোজ, বোন, অ করে বসে রইলে যে!" সরোজ হ চীৎকার করিয়া বলিল, "ছেড়ে দাও, এ মুহূর্ত্তের জন্য আমায় মুক্তি দাও।" শশিভূ সরোজের সংজ্ঞাহীন দেহ শয্যায় শোয়াই দিল; এবং তাহার চীৎকারে চিন্ময়ী সুকুমারীর সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করি সরোজের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তার আসিল, নানারূপ সেবাশুশ্রূ চলিল, কিন্তু সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সরোজে ভাল করিয়া সংজ্ঞা হইল না। মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া সে বলে, 'আলো দাও, দৃ দাও' তারপর আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এইভাবে সারারাত্রি কাটাইয়া ভোরের দিকে সরোজ কতকটা সুস্থ হইল এবং দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত রোগের উপশম হইল। তাহাকে সুস্থভাবে ঘুমাইতে দেখিয়া শশিভূষণ বাহিরে চলিয়া গেল।

দ্বিপ্রহরে সুকুমারী সরোজকে ধরিয়া বসিল, "কি হয়েছিল, বলতেই হবে।"

সরোজ হাসিয়া বলিল, "কিচ্ছু হয়নি ভাই, শশীদা আমায় ভয় দেখিয়েছিল।"

সুকু বলিল, "ভয় দেখিয়েছিল! কিসের ?"

সরোজ কহিল, "তা না হয় নাই শুনলে।"

সুকু কহিল, "কেন, আমি শুনলে কি হানি হবে?"

সরোজ কহিল, "আর কারও হোক না ক, তোমার হতে পারে।"

সুকু কহিল, "আমার কি ক্ষতি হবে! বল, আমি শুনব।"

সরোজ কহিল, "না সুকু, তোমার শুনে জ নেই।"

সুকু কহিল, "তুমি যদি শুনতে পার ত মি শুনতে পাব না কেন? তোমার য়ে পড়ি, বল, তুমি কেন ভয় পেয়েছিলে?"

সরোজ কহিল, "শশীদা বলছিল, যে অন্ধ, যদি মনে-মনে কারও কথা বেশী চিন্তা রে, তা হলে সে লোকটিও না কি অন্ধ য়ে যেতে পারে। অন্ধতাও না কি কতকটা ঁয়াচে। কিন্তু ও-সব মিছে কথা, আমি ক্তার বাবুকে বেশ করে জিজ্ঞেস করে য়েছি যে অন্ধতা ছোঁয়াচেও নয়, আর ন্ধ যদি কাউকে চিন্তা করে, তাহলে সে লোকটিও যে অন্ধ হয়ে যাবে, তারও কোন ানে নেই। অন্তত ডাক্তারি শাস্ত্রে এমন টনার একটাও উদাহরণ নেই।"

সুকুমারী বলিল, "কিন্তু যা কখনও ঘটেনি, াও ত ঘটতে পারে। যদি শশীদার থাই সত্য হয়, তাহলে—"

সরোজ কহিল, "তাহলে কি সুকু?"

সুকুমারী বলিল, "তাহলে শশীদাদের আর ামাদের কাছে আসতে দেওয়া উচিত য় ত!"

সরোজ কহিল, "সব রোগেই টিকে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শশীদা অনেক দিন থেকে অন্ধ মানুষ ঘাঁটছেন; অন্ধ-রোগের টিকে ওঁর হয়ে গিয়েছে। এত দিন যখন ওঁর কিছু হয় নি, তখন ওঁর বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

সুকুমারী বলিল, "কিন্তু—আর যাঁরা অন্ধ ইস্কুলে কাজ করছেন?"

সরোজ কহিল, "তাঁরা ভগবানের উপর নির্ভর করে অনাথ-অন্ধদের উপকার করছেন। তাঁদের কিছুই হবে না, বিশেষতঃ তাঁরা দু-চার ঘণ্টা মাত্র অন্ধদের সঙ্গে থাকেন!"

সুকুমারী বলিল, "কিন্তু যিনি প্রায় সারাদিনই আমাদের কাছে থাকেন?"

সরোজ কহিল, "কোন ভয় নেই, সুকু, অন্ধতা ছোঁয়াচে নয়, আমি ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করেছি। শশীদাও বলেছে, সেও কোন বইয়ে এ-রকম কোন রোগের কথা পড়েনি।"

সুকুমারী বলিল, "তাহলে তুমি এত ভয় পেয়েছিলে কেন?"

সরোজ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে সুকুমারীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তোমার যেমন এমন একটা কথা আছে, যে কথা সকলকে বলতে পার না, সেই রকম আমারও একটা কথা আছে।"

সুকুমারী বলিল, "আমার ত কোন কথাই তোমার অজানা নেই; আর কারও কাছে গোপন থাকলেও তোমার কাছে ত আমি কিছুই গোপন করি নি, সরোদি, তবে তুমি কেন আমায় তোমার কথা বলবে না?"

সরোজ কলিল, "না সুকু, না, সে কথা শুনে কাজ নেই। তোমার কথার মধ্যে শুধু আনন্দ, শুধু সুখ, আমার কথার মধ্যে কেবলই দুঃখ।"

কিন্তু সুকুমারী ছাড়িল না; তখন সরোজ বাধ্য হইয়া সব কথা তাহাকে শুনাইল। সুকুমারী শুনিতে শুনিতে বলিল, "কার্ত্তিকদাকে আমার বেশ মনে আছে। কিন্তু তিনি ত দু'-তিন মাসের বেশী এখানে ছিলেন না, এরই মধ্যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল যে তার জের এখনও এমন ভাবে চলছে! আশ্চর্য্য! আর সে কথা আমরা কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাই নি! মাও বোধ হয় এর কিছু জানেন নি?"

সরোজ কহিল, "মা একা কেন? এমন যে ঘটতে পারে, তা আমিই নিজের কাছে স্বীকার করতুম না। কিন্তু সংসারে অঘটনও বিস্তর ঘটে। জানিনে, তিনি আমার মধ্যে কি পেয়েছিলেন যে, আজ এমন করে আমায় পাগল করে দেবার চেষ্টা করছেন। আমি তাঁরই ভয়ে অন্তরে-বাইরে আপনাকে গোপন করে রেখেছি। তবু দূর থেকে তিনি এক ভয়ানক আকর্ষণে আমায় টানছেন! সুকু, তুমি বুঝতে পারবে না যে আজ প্রায় ছ' বৎসর ধরে আমি অন্তরে অন্তরে কি আকর্ষণ এ অনুভব করেছি! তবু প্রাণ পণে সেই নীরব আকর্ষণের বিরুদ্ধেই আমি যুদ্ধ করে এসেছি। কেউ এ কথা বুঝতেই পারবে না, কেউ এ কথা হয়ত বিশ্বাসও করবে না। যেদিন তিনি আমার কাছ থেকে চলে যান, সে দিন বলে গিয়েছিলেন যে 'তুমি আমার পক্ষে যতই দুর্লভ হয়ে গেলে ততই তুমি আমায় বেঁধে ফেল্‌বে সে কথার মধ্যে কতখানি সত্য ছি কাল আমি তা স্পষ্ট অনুভব করেছি। লোকটির কতখানি শক্তি আছে, কাল এক নিমেষে বুঝেছি। তিনি এক নিমেষে আমার সমস্ত অস্তিত্বটাকে এমন জোরে নাড়া দিয়ে গেছেন যে সমস্ত রাত কেবলি আমার মনে হয়েছে তিনি আমার অন্তরের ঠিক মাঝখানটিতে বসে আমার প্রাণটাকে দু' হাতের মধ্যে চেপে ধরে পিষছেন। এত দূরে থেকে যিনি এতখানি শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন, জানি না, কাছে থাকলে তিনি আমায় কি করতেন! তাঁকে এখন আমার এত ভয় হয়েছে যে যদি পৃথিবীর অপর প্রান্তে যাই তবুও তিনি বোধ হয় মনে করলেই আমায় সেখান থেকে টেনে আনতে পারবেন! এখন আমার একমাত্র ভয়, কি করে নিজেকে আমি তাঁর কাছ থেকে রক্ষা করব, কি করে তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকব!"

সুকুমারী বলিল, "ওঃ, তাই বুঝি কাল তুমি মাঝে-মাঝে 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও' বলে চেঁচাচ্ছিলে। আমরা কেউ বুঝতেই পারিনি যে কেন ও কথা তুমি বলছিলে, আর কাকে উদ্দেশ করেই বা বলছিলে। আচ্ছা, তাহলে তুমি তাঁকে একদিনের জন্যও ভুলতে পারছ না কেন? যদি তাঁর কাছ থেকে পালাতেই চাও, তবে এ তোমার কিসের আকর্ষণ? তুমি তাঁকে চাও না, তবু তাঁর অন্ধ হবার আশঙ্কায় একেবারে এমন হয়ে গেলে কেন?"

সরোজ কহিল, "সুকু, যে ভালবাসা

কে এমন অশান্ত করে তোলে, সে ভালবাসাই নয়, রাক্ষসের ক্ষুধা। যে বাসনার তৃপ্তনায়, কামনায়, উত্তেজনায় মানুষ নিজেকে ন করে ছিঁড়ে-খুঁড়ে নষ্ট করতে চায়, যে মরণোন্মুখ রোগীর দুষ্ট ক্ষুধা! এ ত ভালবাসা নয়, এ যে ডাকাতের অত্যাচার!"

সুকুমারী বলিল, "না দিদি, এ তোমার মায়ায় সন্দেহ। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি কার্ত্তিক দাদার অত অপমান করো না। তিনি ত তোমার কাছে আর একদিনও আসেন নি, তিনি ত তোমার কাছে 'দাও, দাও' বলে ভিক্ষে চাইতে আসেন নি। তিনি নিজেকে অমিতব্যয়ীর মত বিলিয়ে দিচ্ছেন, এই তাঁর অপরাধ। তুমি বাইরে যতই ঔদাসীন্য দেখাও, তোমার কালকের ব্যাপারে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে তোমার অন্তরাত্মা জানে, কার্ত্তিকদা তোমায় তাঁর প্রাণ দিয়ে চাচ্ছেন,— তাই তুমি কাল এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে।"

সরোজ বলিল, "সুকু, তোর পায়ে পড়ি, তুই ও কথা বলিস্‌নে। তার চেয়ে বল্ যে তার সব মিথ্যে! সে আমায় চায় না, সে আমায় ডাকছে না, সে আমার জন্য জগৎ-সংসার অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছে না। সে কেবল একটা দুর্বৃত্ত ইচ্ছার বশে আমাকে তার পায়ের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে লুটিয়ে দেবার চেষ্টায় আছে। বল্ যে সমস্তই তার দুষ্টুমি, কেবল আমাকে হারাবার জন্য এই ভয়ঙ্কর মায়াজাল বিস্তার করেছে। বল্, ওর কিছুই সত্য নয়।"

সুকুমারী কাঁদিয়া বলিল, "না—কখনই না! এত ভালবাসা মিথ্যে নয়, মায়া নয়, মোহ নয়। এ জীবন্ত স্নেহ! এ স্নেহ, এ আকর্ষণ যে উপেক্ষা করে, সে প্রেমময় হরিকেও উপেক্ষা করে। এ স্নেহ যদি উপেক্ষা কর, তা হলে বলব, তুমি ভিতরে-বাইরে অন্ধ হয়েছ, তোমার ভিতরে-বাইরে অন্ধকার। আমি তা পারব না, সরোদি, আমি স্নেহকে বিশ্বাস করে নিঃসন্দেহে তাকে বুকে ধরে রাখব।"

ক্রমশ

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

বিশ্ব-সভার ছবি

(নাটিকা)

চরিত্র

বিনায়ক	... ...	চিত্রকর
কমল	... ...	ঐ শিষ্য
যুবা		
কারাধ্যক্ষ		
সুরথ	... ...	কারা-প্রহরী

বন্দীগণ, নর্ত্তকী ও প্রহরী

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—যমুনা-তীর। কাল—প্রভাত; সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। অদূরস্থ দেবালয় হইতে মৃদু বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতেছে।

বিনায়ক গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া আছে—সম্মুখে চিত্র-পট; বিনায়কের দৃষ্টি অসম্পূর্ণ চিত্র-পটে নিবদ্ধ; বিনায়কের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কমল। বিনায়ক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।]

বিনায়ক। সবই পণ্ডশ্রম, কমল। এ ছবি আর শেষ করতে পারব না। সারা-জীবনের কল্পনা আমার অধীর আশায় চেয়ে আছে। সে আশা সফল হল না!

কমল। কেন, এ ত প্রায় শেষ হয়েই এসেছে—শুধু ঐ-দুটি মূর্ত্তি আঁকতেই বাকী যা!

বিনায়ক। কিন্তু সেই দুটিই যে সব, কমল। আজ দশ বৎসর হল, এই ছবি আঁকতে আরম্ভ করেছি! দেশে দেশে এই পট নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি—কিন্তু এই দুটি মুখের আভাষ কোথাও পেলুম না। একটি মুখে স্বর্গের আলো ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে—আর-একটিতে নরকের ভীষণ অন্ধকার! একটিতে দেবত্বের প্রতিবিম্ব, আর-একটিতে পাপ তার ভীষণতা নিয়ে জেগে আছে! দশ বৎসর আমি ভাবছি—দশ বৎসর কেবলই মানুষ দেখে বেড়াচ্ছি—কিন্তু ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়ছি! আমার কল্পনা তার নির্ভরের আশ্রয় পাচ্ছে না!

কমল। তোমার কল্পনাও হার মানলে!

বিনায়ক। হাঁ। আমার কল্পনা রক্ত-মাংসের জীব খুঁজে বেড়াচ্ছে—একটা অবলম্বন খুঁজছে!

কমল। (নির্ব্বাকভাবে বিনায়কের পানে চাহিয়া রহিল)

বিনায়ক। আমার সমস্ত জীবন এক দারুণ নিঃসঙ্গতার মধ্যে কেটে এসেছে! সৌন্দর্য্যের সন্ধানে ছুটতে গিয়ে আমার যা কিছু প্রিয় ছিল, যে-কেউ আপনার ছিল, তার কিছুর পানে কারো পানে ফিরে চাই নি! সুখের গৃহ, প্রীতি, স্নেহ, নারীর প্রেম —কোন বাঁধনই আমায় ধরে রাখতে নি! তাই এখন ভয় হয় কমল, বা এই নিষ্ঠুর ত্যাগ আর নির্ম্মমতা শুধু নৈরাশ্যের পিছনেই আমি ছুটে চলে আমার সাধের ছবি—আমার সারা জীব সাধনা—এই "বিশ্ব-সভা" ছবি এমনি অস থেকে যাবে! মৃত্যুর জড়তা আমায় করবে! (ক্ষণকাল চল তরঙ্গ নদীর প চাহিয়া, সহসা) ও কে—কমল? ও আমারই কল্পনা ছায়ার মূর্ত্তি ধরে, উদয় হল—না, সত্যই মানুষ? ঐ যুবা—চেয়ে দেখ, স্নান সেরে ঐ পট্ট বস্ত্রে দীপ্ত শোভায় চারিধার উজ্জ্বল করে এদি আসছে? দেখতে পাচ্ছ? না, এ শুধু ক আমায় ছলনা করছে? এই মুখই আমি আজ দশ বৎসর খুঁজে বেড়াচ্ছি মুখে স্বর্গের জ্যোতি—চারিধারে গু রশ্মি! ও কি সত্যই মানুষ, না, এ আম মতিভ্রম?

কমল। এক তরুণ যুবা স্নান সে এদিকে আসছে বটে, বোধ হয়, দেবা যাবে।

বিনায়ক। তাহলে আমার ভুল ন ডাকো, ডাকো কমল, ঐ তরুণ যুবাকে আমি পেয়েছি, এতদিনকার সাধনা বুঝি স হবে, তাহলে!

(সদ্য-স্নাত এক তরুণ যুবা নিকটে আসিল)

কমল। এদিকে এস, যুবা। ভারতে শ্রেষ্ঠ শিল্পী বিনায়ক তোমার দর্শন-প্রার্থী।

যুবা। শিল্পী বিনায়ক!

কমল। এই তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

যুবা। (অভিবাদনান্তে) আপনার কী

ত। আমার সৌভাগ্য, এত বড় ক আজ চোখে দেখলুম!

নায়ক। তুমি কে যুবা?

ুবা। আমি ঐ দেবালয়ের পূজারী—

।

নায়ক। আমার এক বাসনা আছে, পূর্ণ করেন ত আমি ধন্য হই!

ুবা। ভূমিকার প্রয়োজন নেই। আমার যেটুকু সম্ভব হবে, তা করতে আমি ত আছি।

বিনায়ক। এই "বিশ্ব-সভা"—এই ছবি এঁকে শেষ করতে চাই। নানা নর-র মূর্ত্তি এঁকেছি—শুধু দুটি মুখের আভাষ নি, তাই এ ছবি আজও শেষ হয়নি। দশ বৎসর ধরে আঁকছি—কিন্তু কল্পনা এ র আভাষ দিতে পারছে না। আজ মার মুখে একটা আভাষ পাচ্ছি—ঐ , ঐ সরল প্রসন্নতাটুকু আমার এই আমি ফুটিয়ে তুলতে চাই। যদি আপনার ত্তি না থাকে—

যুবা। (মৃদু হাসিয়া) কোন আপত্তি ই! শিল্পী বিনায়কের পটে অমর হয়ে ব, এ ত পরম সৌভাগ্য আমার।

বিনায়ক। তাহলে কাল ঠিক এমন এখানে যেন আপনার দেখা পাই!

যুবা। তাই হবে।

(অভিবাদনান্তে প্রস্থান)

বিনায়ক। আশ্চর্য্য হয়েছি, কমল। যে র্ত্তে নৈরাশ্যে কাতর হয়ে পড়েছিলুম, সেই মুহূর্ত্তেই আশার কি এ আশ্বাস! ল, এই সময়! না, এই এক দিনের বিলম্ব মার অসহ্য বোধ হচ্ছে! একটা দিন, একটা রাত্রির দীর্ঘ ব্যবধান! অসহ্য, অসহ্য এ! কিন্তু উপায় নেই! এস, কমল, ঘরে যাই! (কমলের হাত ধরিয়া) আর একটা মুখ—কমল, তাহলেই আমার সাধ পূর্ণ হয়। পাপের ছায়ায় কালো সেই মুখ খানা—

কমল। সে আশাও ভগবান পূর্ণ করবেন, অধীর হবার প্রয়োজন নেই।

বিনায়ক। না, নৈরাশ্য কেটে গেছে—ঠিক বলেছ, সে আশাও পূর্ণ হবে—অধীর হবার প্রয়োজন নেই! এস কমল, আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে! আমার দশ বৎসরের সাধনা, কমল—

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দৃশ্য—অবন্তী; কারাগৃহের সম্মুখ। কাল, সন্ধ্যা। দশ বৎসর পরে। বিনায়ক; কারাধ্যক্ষ পরিক্রমণ করিতেছে।]

কারাধ্যক্ষ। আপনি দেশ-প্রসিদ্ধ শিল্পী—তাই মহারাজ আপনার অনুরোধ রক্ষা করেছেন।

বিনায়ক। মহারাজের জয় হোক্। তাঁর অনুগ্রহের সীমা নেই।

কারাধ্যক্ষ। সব-চেয়ে দুর্বৃত্ত বারো জন বন্দীকে আপনি দেখতে চান—তাদের কারো মুখে আপনার কাল্পনিক ছবির আভাষ যদি পান্—এই না আপনার কথা?

বিনায়ক। হাঁ।

কারাধ্যক্ষ। মহারাজ আদেশ দিয়েছেন, তাই হবে। আমিও প্রহরীদের বলেছি—

এখনই বন্দীদের আনা হবে। কিন্তু একটা কথা আছে! একে ত এরা ভীষণ দুর্বৃত্ত, —যদি ওদের মনে একটুও সন্দেহ হয় যে, তাদের ছবি নেওয়াবার জন্য এভাবে বাইরে আনা হচ্ছে, তাহলে রাগে তারা জ্বলে উঠবে, আপত্তিও করতে পারে—আর আপত্তি থাকলে ছবি নেওয়া দায় হবে।

বিনায়ক। ঠিক—তাহলে উপায়?

কারাধ্যক্ষ। এক কাজ করুন, আপনি। আমার পিছনে অন্তরাল থেকে লক্ষ্য করে যান—ওদেরও সন্দেহ হবে না—তার পর কোন মুখে আপনার কল্পিত আভাষ যদি পান ত আমায় ইঙ্গিত করবেন।

বিনায়ক। তাই হবে।

(অন্তরালে রহিল)

কারাধ্যক্ষ। (প্রহরীর প্রতি) সুরথ— (জনৈক প্রহরীর প্রবেশ) বারো জন বন্দী বেছে রেখেছ?

সুরথ। রেখেছি।

কারাধ্যক্ষ। এক-একজন করে নিয়ে এস—

সুরথ। (উচ্চৈঃস্বরে) বন্দী—(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) তোমরা বারোজন একে-একে বাহিরে এসো—

[শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীগণ ধীরে ধীরে বাহির হইতে লাগিল—পাঁচজন চলিয়া গেলে ষষ্ঠ বন্দী যেমন বাহিরে আসিল, অমনি বিনায়ক সরিয়া আসিয়া কারাধ্যক্ষকে ইঙ্গিত করিল]

বিনায়ক। এই লোক,—একে রাখুন। এই মুখ! ঠিক—বিশ্বাস-ভঙ্গের কালো ছায়া মুখে যেন লেপে আছে!

কারাধ্যক্ষ। (ষষ্ঠ বন্দীকে লক্ষ্য ক তুমি দাঁড়াও। সুরথ, ওদের নিয়ে (সুরথ অপর বন্দীগণকে লইয়া করিলে) তুমি দাঁড়াও। (বিনায়কের এই লোকটির মৃত্যু-দণ্ডের আদেশ হ কাল প্রাতে ঘাতকের হাতে এর প্রা হবে।

বিনায়ক। (চমকিয়া) কাল প্রাতে

কারাধ্যক্ষ। এখন আপনার কি প্রায়, বলুন।

বিনায়ক। আজ রাত্রেই তাহলে একটা আদ্‌রা আমি এঁকে নেব। ফলানো পরে হবে'খন।

কারাধ্যক্ষ। শোন বন্দী, ভারত-বি চিত্রশিল্পী বিনায়ক তোমার মৃত্যুর পূ তোমার ছবি আঁকতে চান।

বন্দী। বটে! শুনে বাধিত হ কিন্তু একটা কথা—আমার জীবনের উ তোমাদের অধিকার আছে—কেন না, তোমাদের আইন! কিন্তু আমার ছবি নি অপমান করা—? না, তোমাদের সে অধিক নেই—আমি তা হতে দেব না—আমা আপত্তি আছে।

বিনায়ক। বন্দী সত্য কথাই বলেছে তবে আমার আর-একটি নিবেদন আছে কাল প্রাতেই এর প্রাণদণ্ড হবে—জীবনে এই শেষ মুহূর্ত্তে যদি ওর শেষ সাধ কি থাকে, তা যদি পূর্ণ হতে দেন—তাহ (বন্দীর প্রতি) বন্দী, তোমার ছবি নি দেওয়ায় কোন আপত্তি থাকবে? ক তুমি কি চাও?

কারাধ্যক্ষ। এতে আমাদের আপত্তি নে

বন্দী। (উচ্চহাস্য করিয়া) কি চাই? ত অনেক জিনিষ! রূপসী নারী, পাত্র—আমি এ-সবের বড় ভক্ত! মস্‌গুল হয়ে থাকব—আর শিল্পী, তুমি ার ছবি এঁকে নেবে—বাঃ! এ ব্যবস্থায় ার আপত্তি নেই। নেশায় ভোর হয়ে রঙিন গানের সুরের ভিতর দিয়ে বনটা যদি শেষ করতে পারি, তাহলে আর রইল কি?

কারাধ্যক্ষ। (বিনায়কের প্রতি) বেশ, য়োজন করে দিচ্ছি। বন্দী, তুমি ভিতরে ও—

বন্দী। দেখো, ভুলে যেয়ো না, শিল্পী— বন্দী ভিতরে গেল)

কারাধ্যক্ষ। এত-বড় দুর্বৃত্ত বন্দী এ ারায় আর নেই। লোকটা খুনী। সামান্য টা মুদ্রার লোভে এ ওর দু'জন সঙ্গীকে ন করেছিল। কাল ওর সঙ্গে-সঙ্গে ধিবীর পাপের ভার কতক কমবে!

বিনায়ক। বলিনি, বিশ্বাস-ভঙ্গের কালো ায়া ও-মুখে লেপে আছে!

তৃতীয় দৃশ্য

[স্থান—কারা-কক্ষ। কাল—রাত্রির শেষ াম। সুরাপান-রত বন্দী উপবিষ্ট—একজন র্ত্তকী গানশেষে কোণে ঘুমে ঢুলিয়া ড়িয়াছে। বিনায়ক চিত্রাঙ্কন-রত।

বন্দী। (সুরে) "ঝর-ঝর-বাদল রাতি— এ-সখি—"

বিনায়ক। একটু মাথা তুলে বসো— া, ঠিক, ঐ—

বন্দী। আর পারা যায় না—মাথা খালি হয়ে গেছে। নেশা কেটে যাচ্ছে—ঐ সব পরীরা উড়ে পালাল! দাও, দাও, আর একপাত্র দাও—নইলে এই শুয়ে পড়লুম— হুঁ, পড়লুম শুয়ে।

বিনায়ক। এই নাও আর একপাত্র;— কিন্তু সোজা হয়ে বসতে হবে, আর-খানিক (পাত্রে সুরা দিল)

বন্দী। পাত্র দাও—যা বলবে, রাজী আছি! আমি তোমার দাসানুদাস, বাবাজী। আঃ, গান থামালে কেন, সখী? গাও, গাও—

বিনায়ক। চুপ কর। না হলে আর পাত্র ভরে দেব না—(ছবি আঁকিতে লাগিল)

বন্দী। দুঃখ ঢের ছিল, বাবাজী, কিন্তু বলি কাকে—শোনে কে? না হয় বন্দীই করেছ বাপু, তা বলে আধ-পেটা খাওয়াবে! আর এ কি বাবা—নেশা-বর্জ্জিত করে রাখবে! এ বন্দোবস্তে অতিথশালা চালিয়ে বাহাদুরী কিসের! আধপেটা খাইয়ে, নেশার ব্যবস্থা উঠিয়ে আমি এমন পাঁচশো কেন, পাঁচ-দুকুনে সাঁইত্রিশ-শো ভদ্দর লোককে পুষতে পারি। এতে আবার বাহাদুরী! ছ্যাঃ। কেমন বাবাজী, ছবি চলছে কেমন?

বিনায়ক। বেশ হচ্ছে।

বন্দী। আচ্ছা, গোল হলে আমায় বলো বাবাজী—কোন লজ্জা করো না। কি বলব, তুমি আর-জন্মে আমার বাপ ছিলে! এত উপকার করলে,—বল কি, পাত্র ভরে এত সেবা! ছবি ঠিক হচ্ছে ত, বাবাজী? দেখো, গোল হলে বলো, আমি ঠিক করে দেব। না, ঠাট্টা করছি না—ঠিক বলছি। মোদ্দা, বাবাজী, তুমি আমায় কিনে রাখলে—

চিরকালের জন্য কিনে রাখলে। এই পাত্র না পেলে মরেও জুড়ুতুম না, বাবাজী।

বিনায়ক। (পট রাখিয়া) এ-রকম হল। তোমার ছুটি। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলুম—এ ছবি তোমারই অনুগ্রহে শেষ করতে পারব বলে এখন মনে হচ্ছে। আঃ, আমার জীবনের সাধ মিট্‌ল তাহলে!

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। বন্দী, সকালের ঘড়ি বেজেছে—প্রস্তুত হও। ভগবানকে ডাকতে চাও যদি—

বন্দী। ভগবান! হুঁঃ—(পাত্র লইয়া) এই আমার ভগবান! তারপর, আমায় মারছ বটে, কিন্তু বাবা, এ মুখের জোড়া কোথাও পাবে না! সন্দেহ হয় যদি ত এই পটুয়া বাবাজীকে জিজ্ঞাসা কর—কেমন বাবাজী, কত দেশ-দেশান্তরে ঘুরেছ ত, কিন্তু এ ছাঁচ কোথাও মিলেছে? ওঃ খাতির কত! আরে বল বাবাজী, এ লোকটাকে বল একবার। এ মুখের—

(প্রহরীর প্রস্থান)

বিনায়ক। এ-রকম মুখ কোথাও দেখিনি বটে! এ মুখ—

বন্দী। (উচ্চ হাস্য করিয়া) কোথাও দেখনি, বাবাজী? কোথাও না?

বিনায়ক। না।

সুরথের প্রবেশ

সুরথ। বন্দী—

বন্দী। সময় হয়েছে? চল বাবা—মোদ্দা বাবাজী, চললুম ত—ছবিখানা কেমন আঁকলে, একবার দেখালে না?

বিনায়ক। এই যে দেখ (পট দেখাইল)

বন্দী। (ছবি দেখিয়া) বাবাজী, কখনও মথুরায় গেছলে?

বিনায়ক। মথুরায়! নিশ্চয়—ব ছিলুমও সেখানে। তবে আজ দশ মথুরা ছেড়েছি। আর যাইনি

বন্দী। ঠিক—দশ বৎসর মথুরা ছে না? আচ্ছা, সেই যমুনার ধারে একটি মন্দির ছিল, মনে পড়ে?

বিনায়ক। মনে পড়ে না! কি বন্দী—এই যে মুখ দেখছ—এই, স্বর্গের জ্যোতি ঢল-ঢল করছে, এ-মুখ মথুরার মন্দিরের পাশে বসে এঁকেছি যে-

বন্দী। কার মুখ এ?

বিনায়ক। মন্দিরের তরুণ পূজারী দীপ্ত শান্ত রাগে ভরা—আশ্চর্য্য বিভায়—

বন্দী। (নিজের মুখের দিকে নি করিয়া) আর এই মুখ—আমার মুখ?

বিনায়ক। (বিস্মিতভাবে চা একেবারে উল্টো! পাপের—

সুরথ। বন্দী, আর সময় নেই—

বন্দী। চল, যাই। (বিনায়কের প্র দুই মুখে আকাশ-পাতাল তফাত বাবা এই বলতে চাও,—না? হুঁঃ, বাবা চিনতে পারলে না? এ-দুই মুখ যে এ লোকের। আমিই সেই দশ ব আগেকার মথুরার মন্দিরের তরুণ পূজা

বিনায়ক। (সবিস্ময়ে) তুমি!

বন্দী। শুধু সঙ্গদোষে বাবাজী। সে কাহিনী, উপন্যাসের মত—বসে শোন মত—কিন্তু আর ত সময় নেই, বাবাজী—

বিনায়ক। তুমি—

বন্দী। চললুম, বাবাজী—কিন্তু যাবার আমায় চোখের জল ফেলালে তুমি, চোখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছল—যাক্, আর কেন!

(বন্দীকে লইয়া সুরথের প্রস্থান)

বিনায়ক। (সবিস্ময়ে পটের পানে য়া) ভগবান—এ কি দেখালে!

কারাধ্যক্ষের প্রবেশ

কারাধ্যক্ষ। পৃথিবীর পাপের ভার ই অনেকটা কম পড়বে। যাক্, জীবনে টা ভাল কাজ তবু করে গেল—সমস্ত ন তার শেষ মুহূর্ত্তে সার্থক, ধন্য হয়ে ল। ভারত-প্রসিদ্ধ শিল্পী বিনায়কের পটে একটা নরঘাতক অমরতা লাভ করে রইল! তারপর আপনার ছবি শেষ হল ত?

বিনায়ক। শেষ! না—শেষ হবেও না, কখনো। দেখলুম, বিশ্বশিল্পী তাঁর নিজের হাতের ছবি আঁকতে-আঁকতেও শেষ করতে পারলেন না—আর আমি ত সামান্য মানুষ! আমি এ দুর্ব্বল হাত নিয়ে "বিশ্ব-সভার" ছবি শেষ করব কেমন করে! এ ত শেষ হবার নয়!

[চিত্রপট সবলে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া তাহার উপর পা চাপিয়া দাঁড়াইল]

যবনিকা *

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শৈলপথে ও পরে

আমরা বৃহস্পতিবারে রওনা হয়ে ক্রবারে এখানে এসে পৌঁছেছি। গাড়ীতে ভিড় ছিল, কিন্তু সেই গাড়ী ছাড়া ধি আরোহীদের যে খাবার-ঘরের দিকে ওয়া-আসা আরম্ভ হল, তা আর গাড়ী মা পর্য্যন্ত শেষ হল না। গাড়ী ঘণ্টায় মাইল দৌড়চ্ছে, তারি দোল আর কানি খেতে-খেতে, কাঁপতে-কাঁপতে, তে-দুলতে, দরজা ধরে সামলে নিয়ে, নালা ধরে দাঁড়িয়ে, উঠে, পড়ে, ছোট- ছেলে-বুড়, স্ত্রী-পুরুষ, স্বদেশী-বিদেশী চিত্র বেশ-ভূষায় সজ্জিত আবালবৃদ্ধ-নিতা সকলে কেবলি যাচ্ছেন আর কেবলি আসছেন! বাহিরে খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, আলোর আকাশ ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে এল, দু-একটি করে' তারা জ্বলজ্বল করতে লাগল, তারপর দশমীর পূর্ণপ্রায় চাঁদ ধূসর আকাশকে আলোয় উদ্বোধন করে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন; চারিধারে নিস্তব্ধ প্রান্তর, একেবারে সেই দিগ্বলয়ের শেষ-রেখার অন্ধকারে মিশিয়ে গিয়েছে। উপরে আকাশ জ্যোৎস্নার পুণ্য প্রভায় উদ্ভাসিত, প্রশান্ত নীরব, আর মাঝ-পথে আমাদের এই বাষ্পরথ ধূম উদ্গীরণ করতে করতে,প্রবল শব্দে অত্যধিক ব্যস্ততার সহিত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে। তারি উপরে

* একখানি ইংরাজী নাটিকা-অবলম্বনে

বসে প্রহরেকের যাত্রী-সকল আহার্য্য ও পানীয়ের সৎকার করছেন! ক্ষুধানিবৃত্তি ও লোভের পরিতৃপ্তি;—মানব-জীবনের আদিম চেষ্টা এবং অন্তিম অধ্যবসায়।

সান্তাহারে গাড়ী ঠিক ছিল, আমাদের কোনই কষ্ট সহ্য করতে হয়নি, আমরা তিনটি সঙ্গী আপন-আপন স্থান অধিকার করে' বসে' প্রশান্তভাবে অপরাপর যাত্রীদের গাড়ী খুঁজে বেড়ান, ছুটোছুটি, বকাবকি, আগ্রহ, ব্যস্ততা আর হতাশের আক্ষেপ দেখতে লাগ্‌লাম। একজন রোমান কাথলিক পাদ্রি-সাহেবের ব্যবহার সব-চেয়ে চোখে খারাপ লাগল। তিনি তাঁর সর্ব্বাঙ্গ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীর পরিচ্ছদে আবৃত করেছেন, আপাদমস্তক সাক্ষ্য দিচ্ছে তিনি খৃষ্টের ধর্ম্মযাজক। আবক্ষ লম্বমান দীর্ঘ শ্মশ্রু, গলায় ক্রূশ ঝোলান, কিন্তু কি তাঁর অসংযম, ক্রুদ্ধ উগ্র বাক্য-ব্যবহার, উদ্ধত অঙ্গভঙ্গী, কুলীদের উপর আক্রোশ আর রেলবাবুদের প্রতি তম্বী! রেলের খানা-কামরায় এঁরই গতিবিধি অবিরল ছিল। পরদিন সকালে শিলিগুড়িতেও দেখলাম তাঁরি সাহায্যে প্রাতরাশের টেবিলে অনেক ভোজ্য এবং পানীয়ের সদ্গতি হ'ল। "আগুনের পরশমণি" এঁর যে কোথায় ছোঁয়ান হয়েছে তা আবিষ্কার করতে অধিক বুদ্ধি ব্যয় আবশ্যক হ'ল না। ইংরাজী পুস্তকে পাঠ করেছি, অন্তরের অধিবসতি জঠরেরই মধ্যে, এ চতুর তপস্বীটি এক প্রার্থনাতেই দুই বর লাভ করেছেন বোধ হ'ল!

শিলিগুড়ি হ'তে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত পথের দুইধারের উদ্ভিদশ্রেণী দেখলে মনে হয় যেন এখনও তারা তাদের "অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করেনি, সেই পরিপূর্ণ বয়সেই, "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় আছে! কি তাদের প্রচুর পল্লব, স্তবকাবনম্র অবস্থা!—এত ফুল, এত এমন শ্যামল শৈবালাচ্ছন্ন, স্নিগ্ধ, নধর অঙ্গলাবণ্য! গাছগুলি যত উঠুক না কেন, তাদের লতিকাসঙ্গিনী পাতায় ফুলে সুকুমার আলিঙ্গনে অবধি জড়িয়ে উঠেছে। ঘাসে ফুল, ফুল, বড় বড় গাছে ফুল, পরগা ফুল,—এ যেন "কুমার-সম্ভবের" বসন্ত!

ঝিঁঝি কত বিবিধ সুরেই তা বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজাচ্ছে; কারো আও নুপুর-নিক্কণের মত, কারো শব্দ ঘণ্টিকাধ্বনির সমান, কারো বাজখাঁ শুন্‌লে মনে হয় কেউ যেন তানপূ পাঁচটি তারের সুরের উপর এক অঙ্গুলি-সঞ্চালন করছে; কারো বাদ্ কিছুমাত্র বিশেষত্ব নাই, নিতান্তই প্রা —ছেলেদের খেল্‌বার কটকটের মত! প্র পতি কত বর্ণবিচিত্র ডানা মেলে হেলে সারি সারি উড়ে চলেছে—কিন্তু কারো কারো যে কোন জ্ঞাতিত্ব আছে বোধ না,—কুটুম্বিতা থাক্‌তে পারে! আ বর্ণে কেউ কারো সমকক্ষ নয়, ছোট মাঝারি, সাদা কালো রাঙা হলুদ গা আর কপিশ! কারো পাখায় জোড়া ময়ারের মত দুরোখা কাজ করা, কারো ডানা চন্দ্রকোণা শাড়ীর গঙ্গা-যমুনা পা মত দুই ধার দুই রঙের। উড়ছে

ভাবে, কেন না সৃজন-পর্য্যায়ের এক ধরই জীব!

এ পথ দেখে আমার আর একটি মনে হয়,—এ বনপর্ব্ব যেন অমিত্রা-ছন্দে লেখা। বিশ্বের আদিম ছন্দই । সৃষ্টি যখন হয়েছিল তখন জোড় ান ছিল না। ছন্দের যতিঃ সামলানই , তা আবার পদে পদে মিল হবে? র কোথা? তখন প্রবল ভাবাবেগ, ম ভূমিকম্প, অসহ্য অগ্ন্যুৎপাত, দুঃসহ নের পর্য্যায়, বড় বড় গাছ, প্রকাণ্ড , অদ্ভুত জীবজন্তু—সবাই আপনার মত! এই মেঘচুম্বী পর্ব্বতমালা, ভূতলশায়িনী ত্যকা, ছুটে-এসে-গড়িয়ে-পড়া ঝোরার , মেঘ স্পর্শ করবার জন্য উদ্বাহু শাল- ও মহাভুজ মহীরুহ-শ্রেণী, তারি পাশে মার শিশু তৃণদল,—যাদের পাতাগুলি ীর ছানার পালকের মত অতি নরম, -গজিয়ে-ওঠা অঙ্কুরের মত কচি সবুজ, রি ধারে পাথরের গায়ে, জড়িয়ে-ধরা চল শৈবাল—সবাই স্ব স্ব প্রধান। ছত্রে ত্র মিল নেই, কেউ দীর্ঘ কেউ বা হ্রস্ব। নো বা একছত্রের মধ্যেই দুই পদ, নো বা ছত্রের পর ছত্র অগ্রসর হয়ে ছে, পদের তখনও শেষ হয়নি। প্রকাণ্ড পশ্রেণীর যেমন প্রবীণ গম্ভীর্য্য আবার তৃণগুলির তেমনি নিরন্তর হেলে দুলে া অবিরাম বাল্য-চপলতা।

অপর্য্যাপ্ত পল্লবসম্ভার নিয়ে কোন গাছ কেবারে বিব্রত, আবার কোনটি বা তারি শে কোনরূপে একটুখানি স্থান করে ড়িয়ে আছে—নগ্ন, বজ্রাহত, শীর্ণ, কঙ্কাল-সার। উদ্ভিদরাজ্যে এ সাধারণ-তন্ত্রের দেশ। ধনী-দরিদ্রের এমন অপূর্ব্ব সান্নিধ্য, রাজ-বেশধারী ও নাগা সন্ন্যাসীর এমন অদ্ভুত সমাবেশ আর কোথাও আছে কি না জানিনে; অথচ আশ্চর্য্য এই, সবাই আপন সম্মান বজায় রেখে বেঁচে আছে,—কেউ কারো কাছে হীন হয়নি। তার অর্থ সবাই স্বাভাবিক, কোন চেষ্টা কোথাও নেই, কৃত্রিমতার কাপট্য কিছুই কদর্য্য করতে পারেনি। এখানে গোপন করবার, কিম্বা আড়ম্বর করে প্রকাশ করবার কোন প্রয়াস নেই। চোখ আর মন কোথাও পীড়িত হয়না। সবাই যা দেবার, তা' হরির লুটের মত সহজ আনন্দে ছড়িয়ে দেয়, তুমি কুড়িয়ে নিতে পারলে তোমার সুখ।

ছবি-হিসাবে দেখলে, এ দৃশ্যের শিল্প-চাতুর্য্য নেই,—কিছুই সূক্ষ্ম সুকুমার নয়, কারুকার্য্যে বহুযত্নে পরিস্ফুট করা হয়নি। এ পর্ব্বতমালা প্রকাণ্ড, এর তরঙ্গায়িত ভঙ্গী বিপুল, এর গায়ের গাছপালা একেবারে পল্লবের ভারে মূর্চ্ছাহতপ্রায়, এদের আন্দোলন ধীর,—উদ্যত বাহু হয়ে মেঘের মৃদঙ্গ রবে, সঙ্কীর্ত্তনের আবেগে নৃত্য করে উঠতে পারেনা। এরা যেন দশা ধরে আছে। এ যেন একটা বিশাল তৈল-চিত্রপট; কাছ হ'তে এর পুঞ্জ পুঞ্জ পল্লবের রং আলোছায়ার বৈচিত্র্যহীন একটা গাঢ় প্রলেপ বলে মনে হয়; কিন্তু একটু দূর হতে সরে দাঁড়িয়ে দেখলে, আকাশের প্রচ্ছদ-পটে এই বিপুল পর্ব্বত-কায় তার তুষার মুকুট, তার মেঘ-উত্তরীয়, তার ঘনবনরাজির অঙ্গচ্ছদ নিয়ে গিরিরাজ দেবতাত্মা হিমালয়ের পরি-

পূর্ণ গম্ভীর উদার মহান সৌন্দর্য্যে, মনকে আনন্দে অভিনন্দিত, গাম্ভীর্য্যের প্রভাবে অভিভূত করে।

* * * * * *

কুয়াশা এখানে তাপপীড়িত অধিত্যকা-বাসীর ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস, শান্তিকামীর একান্ত ব্যাকুল প্রার্থনা বহন করে নিয়ে, ধীরে ধীরে পর্ব্বত পথ অতিক্রম করে, ঊর্দ্ধে মেঘের স্বপ্নাতীত রাজ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার ঊর্দ্ধ হতে মেঘমালা দেবতার আশীর্ব্বাদ আনয়ন করে,' তাদের দিগন্তচারী বিপুল পক্ষের ছায়া বিস্তার করতে-করতে নেমে এসে, করুণার ধারা বর্ষণে আপনাদের নিঃশেষ করে দিয়ে তাদের তিরোধান হয়।

মেঘের মত খোস্-খেয়ালী ত আর কিছুই নেই, মাঝে মাঝে মাঝপথে এসে এম্নি ভিড় করে দাঁড়ায় যে, সূর্য্যদেব বারম্বার দ্রুত রশ্মি সঞ্চালন করেও অগ্রসর হতে পারেন না,—তাঁর উগ্র সপ্তাশ্ব প্রতিহত হয়ে কেবলি ফিরে ফিরে যায়।

দেবতাত্মা হিমালয়ের তিরস্করণী বিদ্যা জানা আছে, থেকে থেকে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন, তার আর সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছেনা। তখন সম্মুখে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ বিরাজ করছে, তার পরিবর্ত্তনশীল বাষ্প-বিকাশের অন্তরালে বাস্তব স্থাবর কিছু আছে বলে ধারণা করাই কঠিন, তখন চারিদিক অদৃশ্য, সম্মুখের গভীর অধিত্যকা নিবিড় অন্ধকারে পরিণত, সম্মুখে, পিছনে, পাশে, কিছুই দেখা যায়না, ঠিক যতটুকুর উপর আমরা আছি ততটুকুই যথাসর্ব্বস্ব বলে মেনে নিতে হয়।

মা যেমন পাশ ফিরে কাৎ হয়ে বুকের আড়ালে ছেলেকে বসিয়ে দেন, পাহাড়ের বুকের তেম্নি একটি আমাদের এ বাড়ীখানি আশ্রয় পেয়ে এর সম্মুখে অনেকদূর পর্য্যন্ত কিছু আর তিন ধারে পাহাড়ের এই এই বাড়ীর পূর্ব্বমুখী একটি ঘর আপা আমার অধিকারে আছে। কাঠের কাচের দরজা জানালা। এখানে শুয়ে এই তিন দিকের পাহাড়ের সব দেখতে পাই। পাহাড়ের ঢালু গায়ে ঝোপ চায়ের গাছ, থাকে-থাকে সাজ নীচে হতে উপরে উঠেছে। পাহাড়ের গা গাছ যেখানে আপনার বেড়ে-ওঠবার স্থান করে নিতে পেরেছে, সেখানে আর কোন কুণ্ঠা নেই, সেখানে অব্যাহত উন্নতি, দীর্ঘ সরল বাহুল্যবর্জি অঙ্গযষ্টি তীরের মত সোজা। বি সৈন্যদলের অগ্রগামী পতাকাবাহী দূ মত সগর্ব্বে সে তার পল্লবপুঞ্জ উ বহন করে রয়েছে। আবার যে-গা আপনাকে বড় করে তোলবার মত স্থান অধিকার করতে পারেনি, তাকে কল-কৌশল করে, বেড়ে উঠতে হয়েছে সে সোজা হয়ে উঠতে পারেনি, নুয়ে প পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছে, সে যেন গরুড়টি মূর্ত্তিমান বিনতানন্দন, নম্র হয়েই আ ডালপালা যে সমান করে সম্পূর্ণ ছ দেবে সে আরামটুকুও সে পায়নি।

এমনি একটি দরিদ্র খর্ব্ব পীচ গা আমার জানালার কাছে, পাহাড়ের গা কোনরূপে দিনাতিপাত করছে। তার কা

...বক, নিজেকে খানিকটে মুড়ে-রেখে ...এগোতে চেষ্টা করেছে, ডালপালার ...ই কনুই বার করা, বুকের দিকে ...আনা। কিন্তু তার ফল প্রচুর, ...ক ছেয়ে আছে, ছড়িয়ে পড়ছে ...ালের ঘরে চিরকালই ষষ্ঠীদেবীর ...মধিক—ঐশ্বর্য্যবানেরই হয় এক, নয় ...ামাপুত্রের বিধান)। এখন এই ফল ...র সময়, এই গাছটির ঝুঁকে-পড়া ...র কাছ হতে, পিঠে বুকে কোমরে ...দিকে এই সন্তানের দল ভিড় করে ...। কেউ-বা টক্‌টকে রাঙা, কেউ-কাঁচা সবুজ, কারো-বা গায়ে নতুন ...র সোণার বর্ণ সবে ধরতে আরম্ভ ...ছে। এই অপর্য্যাপ্ত ফলপুঞ্জের আঁকা-...ছোট-বড়, পরিপুষ্ট অপরিণত, গোল, ...াল, কুঁজো থেঁতলান, পোকায়-খাওয়া; ...ষ্টি, নানান আকারের ফলের মধ্যে ...সুন্দর পরিপূর্ণ লাবণ্যশ্রী নিটোল ...ঙ্গ-সৌষ্ঠব একটি ফল প্রতিদিনই আমার ...পড়ে। সে এই কাঙাল গাছটির ...ঘেঁসে আছে, সেখানে কাছাকাছি আর ...নেই। সেখানে তাকে দেখি আর ...হয়, সে যেন একদল ডানপিটে ...র মধ্যে একটিমাত্র শান্ত, শিষ্ট, সুন্দর ...শ্রীমতী মেয়ে, সাত ভাইয়ের একটি ...। এরও নিটোল অঙ্গে রং ধরতে আরম্ভ ...ছে, সবুজ আর নেই—সবটাই সোণালি ...উঠেছে—বোঁটার ঠোঁটের কাছের চিরটি ...কে গোলাপী, আর তার কপোলের ...যে বর্ণ প্রভাব বিস্তার করছে, তা ...য়—আভা; পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের লালিত্য,

এ দুই উপরে ফলান হয় নি, ভিতর হতে বিকাশ লাভ করে বাহিরে আভাষে জানান দিচ্ছে।—আমাদের দেশের "কনক-চম্পক-দাম-গৌরী"র গালে যেমন ঈষৎ লালের আমেজ দেখা যায় তেমনি। প্রতিদিন ফলটি আমি দেখি আর মনে করি, এ সম্পূর্ণ হয়ে উঠুক—সৌন্দর্য্যে, সুষমায়, স্বাদে, লাবণ্যে, তখন আমি একে তুলে নিয়ে এসে খাব। এ ফলের সংবাদ গোপনে রেখেছিলাম, স্বার্থপরের মত বাড়ীর আর-কাউকে বলিনি।

এখানে আমার একটি পরিচারিকা সংগ্রহ হয়েছে, পাহাড়ী মেয়ে, বয়স পনের কি ষোল, সবে কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পা দেবে' মনে করছে। এ যেন মূর্ত্তিমতী চঞ্চলতা, শৈলসুতা গিরি-নির্ঝরিণী, নেচে চলে, স্থির হতে জানে না; থেকে-থেকে গান গেয়ে ওঠে; এক কাজ হাতে নিয়ে, ফেলে রেখে, দশবার দৌড়ে আসে! এরও মুখখানি নিটোল ফলের মত; এতেও রং ধরতে আরম্ভ করেছে, বর্ণ-চোরা আম পাকতে আরম্ভ করলে যেমন রাঙা হয় তেমনি; কেননা এর গায়ের বর্ণ শ্যাম। একদিন দুপুরে সে আমার বিছানার পাশে বসে কাপড় কোঁচাচ্ছিল, হঠাৎ বলা-কওয়া নেই, কাপড় ফেলে একছুটে ঘরের বাহিরে দৌড়ে গেল—একলাফে পাহাড়ে উঠে পড়ল, তারপর গুঁড়িমেরে আমার পীচ গাছটির দিকে অগ্রসর হতে লাগল! আমি বিছানা হতে উঠে-বসে আগ্রহের সঙ্গে দেখতে লাগ্‌লাম; মনে হ'ল—"ঐরে নিয়ে নিলে"। "আমি নেব বলে মনে করে

আছি, কিন্তু নেবার কোন চেষ্টাই করিনি, আর এ দেখাবামাত্র ছুটে চলেছে, ব্যগ্র হাত বাড়িয়ে এখনি নেব আর কি! আসি যেমন "নন্দলাল"-বৃত্তি অবলম্বন করে আছি তদনুরূপ ফললাভেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে"—।

যাই হোক, একটু বাদেই বুঝতে পারলাম পার্ব্বতীর এ অভিমান ফলের জন্যে নয়, সে দুটি সোনা-পোকা উড়ে বেড়াতে দেখে তাই ধরতে গিয়েছিল; মুহূর্ত্তের মধ্যে সে দুটিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে, আ দুইহাতে ঘরের মধ্যে এসে পড়ল, হা কাজ পড়ে রইল, সোনালি পতঙ্গ-দুটি সে খেলায় মনোনিবেশ করলে। আ ফলটি আর নিজে হাতে পাড়বার ও অভিপ্রায় ত্যাগ করলাম। ঐ দেখার আমার যথেষ্ট। ফলটি যে আমি ছি এ কথা যখনি ভাবি, তখনই আমার আনন্দ হয়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ছন্নছাড়া

(৪)

চাষা আমায় যা বলেছিল, আমি সমস্ত দিন সেই-কথা মনে-মনে তোলাপাড়া করতে লাগলুম। মারি এমের সঙ্গে দেখা করতে দিতে গুরুমায়ের যে কিসের আপত্তি আমি বুঝতে পারলুম না। এতে মারি এমের কোনো হাত নেই আমি বেশ জানতুম, তাই মনে-মনে স্থির করলুম যে অপেক্ষা করব; ভাবলুম, এমন-একদিন নিশ্চয় আসবে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আর কেউ বাধা দিতে পাররে না। সেদিন রাত্রে শোবার সময় চাষার স্ত্রী আমার ঘরে এসে বিছানায় একখানা জেয়াদা কম্বল দিলে; বল্লে যে, এইবার থেকে তাকে আর মা-ঠাকরুণ বলে না ডেকে, তার নিজের নাম-ধরেই যেন ডাকি। সে আরো বল্লে যে, সে আর তার স্বামী আমাকে তাদের মেয়ের মতনই দেখে—এখানে থাকতে যাতে আ কষ্ট না হয় তার জন্যে তারা যথা করতে ত্রুটি করবে না।

পরের দিন সিল্‌ভ্যাঁ খাবার টে তার ভাইয়ের পাশে আমার জায়গা দিলে; আমাকে উদ্দেশ করে হাস্‌তে-হা তাকে বল্লে যে আমার কোনো অভাব থাকতে দেবেনা; কারণ আমাকে বড় করে তোলা চাই। চাষার ভাইয়ের ছিল ইউজেন্। সে নিজে কথা খুব কইত; অন্য যারা কথা কইত তা সকলকার দিকে সে চেয়ে-চেয়ে দেখত এ তার ছোট ছোট চোখ দুটি হাসিতে উঠত। তার বয়স ছিল ত্রিশ, কিন্তু বছরের বেশী তাকে দেখাত না। কোনো প্রশ্ন করলে তখনই তার এ জবাব সে দিয়ে ফেলত। তার পাশে ব

...র একটুও বাধো-বাধো ঠেকেনি। ...ল আমাকে ভালো করে জায়গা দেবার ...সে দেয়ালের গায়ে একেবারে ঘেঁসে ...ড়ে বসত। সিল্‌ভ্যাঁ যখন তাকে বলত ...ার দিকে একটু চোখ রাখতে, সে বলে ...ত—"তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।"

...সমস্ত জমি যখন চষা হয়ে গেল, মার্ত্তিন্ ...র ভেড়ার দল অনেকদূরের একটা গোচে ...র যেত। আমি আর রাখালটা মাঠ ...য়ে একটা বনের মধ্যে আমাদের ...ড়ার পাল নিয়ে যেতুম। সেখানে চারিদিকে ...বল ফার্ণ। আমার গায়ে পা-পর্য্যন্ত-লম্বা ...কটা পশমী জামা থাকত, কিন্তু তবুও ...মি শীতে কাঁপতুম। রাখালটা আগুন তৈরি ...ত। তারই ছাইয়ের উপর রেখে, আলু ...চেস্‌নাট সেঁকে আমরা দুজনে খেতুম। ...টুকু পারা যায় শীত বাঁচিয়ে চলবার ...ন্য কোন্ দিক থেকে হাওয়া আসচে তা ...মন করে বুঝতে হয়, সে আমায় শিখিয়ে ...ত। আমরা আগুনের ধারে বসে ...ক-পাগুলো গরম করে নিতে থাকতুম, ...আমাকে গান শোনাত। গানটা ছিল ...দা পানি ও লাল পানি" সম্বন্ধে। ...কাণ্ড গান—কুড়িটা কলি। তাতে ছিল ...াল-পানি ও সাদা পানির ঝগড়া; নিজের ...জের গুণ বর্ণনা করে এ ওর গাল ...ড়চে—বলচে, তুই মানুষকে অধঃপাতে ...দিস! আমি যতদূর বুঝতে পারতুম তাতে ...নে হত জলের কথাই ঠিক; কিন্তু রাখালটা ...ত মদের কথাও ভুল নয়। আমরা এক-...ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কথা ...তুম। সে তার নিজের দেশের কথা, নিজের বাড়ির কথা আমায় বলত। তার দেশ সোলোঞ্জ থেকে অনেক দূর। সে বলত যে ছেলেবেলা থেকেই সে রাখাল। সে যখন খুব ছোট, একটা ষাঁড় তাকে একবার গুঁতিয়ে ফেলে দিয়েছিল; তার জন্যে তাকে অনেক দিন বিছানায় পড়ে থাকতে হয়। তখন যন্ত্রণায় সে চীৎকার করে কাঁদত। যন্ত্রণা তার সেরে গেল বটে কিন্তু তারপর থেকে তার চেহারা, এখন যেমন দেখচি, অমনিধারা তেড়া-বাঁকা হয়ে গেল। সে অনেক চাষার কাছে চাকরি করেছে। তাদের সবাইকার নাম এক-এক করে আমায় বলত। তাদের মধ্যে কেউ ছিল ভালো, কেউ পাজি; কিন্তু এখানকার মনিবের মতো এমন চমৎকার লোক সে কোথাও দেখেনি। সে বলত, সিলভ্যাঁর গোরুগুলো মোটেই তাদের দেশের গোরুর মতন নয়—সেখানকার গোরুগুলো বেঁটে, আর তাদের শিং ছুঁচোলো। ভিল্‌ভিয়েইর গোরু ছিল বড়-বড়, মোটা-সোটা, জোরালো, এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পাকানো শিং-ওলা। এই গোরুগুলোকে সে ভারি ভালোবাসত; কিছু বলতে হলে সে তাদের নাম-ধরে ডাকত। সব-চেয়ে ভালোবাসত যেটিকে সেটি ছিল একটি সুন্দর ধবলী গাই। সিলভ্যাঁ সেটিকে সম্প্রতি কিনে এনেছিল। সে দিনরাত কেবল মুখটি উঁচু করে দূরের দিকে চেয়ে থাকত, তারপর কখনো-কখনো হঠাৎ একেবারে দৌড় দিত। রাখাল যেই বলে উঠত—"স্লাঁশ্! দাঁড়া! দৌড়স্‌নি!" সে অমনি থেমে পড়ত। কিন্তু একএক-সময় সে কথা শুনত না; তখন কুঁকুর

ফেলিয়ে দেওয়া হত। কুকুর গিয়ে ধরলেও সে কখনো-কখনো পালাবার চেষ্টা করে ছুট দিত। তারপর যখন কুকুরটা তার মুখের বাঁধনটা কামড়ে ধরত, সে আস্তে আস্তে গোয়াল-ঘরে ফিরে আসত। রাখালটা তার জন্যে মধ্যে-মধ্যে দুঃখ করে বলত, আহা! বেচারার যে কিসের দুঃখ তা ও মুখ-ফুটে বলতেও পারে না!

(৫)

ডিসেম্বর মাসে গোরুগুলোকে গোয়ালে বন্ধ রাখা হল। আমি ভাবলুম, ভেড়াগুলোকেও ঐ রকম রাখা হবে। কিন্তু চাষার ভাই আমাকে বল্লে যে সোলোঞ দেশ ভারি গরীব—এখানকার চাষাদের এমন সামর্থ্য নেই যে ভেড়াদের জন্যেও শীতের খাবার তারা পুঁজি করে রাখতে পারে। এখন আমায় একলা মাঠ-ভেঙে বনের মধ্যে ভেড়া চরাতে যেতে হত। পাখীরা সব চলে গেছে; চষা জমিগুলো কুয়াশার জালে ঢাকা পড়েছে; বন একেবারে নিস্তব্ধ।

এক-একদিন আমার এমনি একা বোধ হত যে ঠিক মনে হত যেন আমার চারপাশের পৃথিবী ধ্বসে পড়ে গেছে। হঠাৎ যখন একটা কাক কর্কশ সুরে ডাকতে-ডাকতে ঘোলাটে আকাশের গায়ের উপর দিয়ে উড়ে যেত, মনে হত তার সেই বিকৃত সুর যেন পৃথিবীর এই দুর্দিনের গান ফুকরে বেড়াচ্ছে। ভেড়াগুলোও এখন একেবারে ঠাণ্ডা। একজন খরিদ্দার এসে সব মদ্দগুলোকে কিনে নিয়ে গেছে, মাদিগুলো সঙ্গী হারিয়ে একা-একা কি করে খেলবে যেন ঠিক করতে পারছে তারা পরস্পরে খুব ঘেঁসাঘেঁসি করে বেড়াচ্চে, ঘাড়গুলো সব নীচু করেই এমন কি, যা সামান্য ঘাস আছে যখন খুঁটে বেড়াচ্চে না, তখনও মাথা নীচু। তাদের সেইরকম দেখে চেনা কয়েকটি মেয়ের কথা মনে প আমি তাদের কাছে গিয়ে গায়ে থাবড়া মুখ তুলে ধরতুম, কিন্তু তারা চোখ নামিয়ে নিত। তাদের চোখের তারা দেখতে ঠিক কাচের মতন অথচ এ আভা নেই।

একদিন এমন ঘন কুয়াশা হ আমি অবাক—পথ কোথায় খুঁজে না। হঠাৎ দেখলুম একটা অজানা বনের ধারে এসে পড়েছি। গাছের গুলো কুয়াশার মধ্যে মিশিয়ে গেছে গুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন লোম দিয়ে তাদের সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। গাছ গা থেকে সাদা সাদা ছায়া নেমে ঝরা-পাতার উপর দিয়ে ধীরে ধীরে স যাচ্ছিল। আমি ভেড়াগুলোকে সা মাঠের দিকে নিয়ে যাবার জন্যে অ ঠেলা দিচ্ছিলুম, তারা জড়াজড়ি কেবল তাল পাকাচ্ছিল—কেউ এ এগচ্ছিল না। ব্যাপার কি বো জন্যে আমি সাম্‌নে এগিয়ে গেলুম দেখলুম সেখানে সেই নদী—যেটি পা তলা দিয়ে বহে গেছে।

জল প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। মনে হল নদীটি যেন একখানি মোটা পশমী কম্বল আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাই দেখলুম, ভেড়াগুলোকে জড়ো করে রাস্তার ফিরিয়ে নিয়ে গেলুম। আমি যখন ঠাউরে দেখচি গোলাবাড়িটা কোথায় হবে সময় ভেড়াগুলো ছুটে-গিয়ে বন থেকে দুধারে বেড়া-দেওয়া একটা গলির মধ্যে পড়ল। কুয়াশা ক্রমেই আরো ঘন আসছিল, আমার মনে হতে লাগল, উঁচু পাঁচিল, তার মধ্যে দিয়ে আমি ছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না, ভেড়া যে দিকে নিয়ে যায় সেই দিকেই তে লাগলুম। হঠাৎ তারা গলিটা ছেড়ে দিকে ঘুরে পড়ল। আমি তাদের লুম। সাম্‌নেই দেখি একটা গির্জ্জে। র দরজা খোলা। দুধারে দুটি লাল ত জ্বলছে, তার আলোয় দেখা যাচ্ছে টা ছাই-রঙের গম্বুজ ওলা ছাদ; দু-সারি বড় থাম চলে গেছে; ওধারের কিনারায় ট ছোট শাসি-দেওয়া জানলা; তার র একটা আলো চিক্-চিক্ করছে। আমি ক-কষ্টে ভেড়াগুলোকে সাম্‌লাতে লুম—তারা যেন হুড়মুড় করে গির্জ্জের তর না ঢুকে পড়ে। তাদের ঠেলা দিতে য়ে দেখলুম, তাদের গা ছোটো ছোটো সাদা ায় ভর্ত্তি হয়ে গেছে; থেকে-থেকে রা গা-ঝাড়া দিচ্চে আর সেগুলো ঝুন্-ন্ করে শব্দ করে উঠছে। আমার ভারি বনা হতে লাগল—নিশ্চয় এতক্ষণে সিল্‌ভ্যাঁ মাদের দেরী দেখে অস্থির হয়ে উঠেছে। মি ভেবে দেখলুম, যে-পথ দিয়ে এসেছি, ই পথ দিয়ে ফিরে গেলে গোলাবাড়ি গির খুঁজে বের করতে পারব। পাছে বেশী গোলমাল হয় সেই-জন্য আস্তে আস্তে ভেড়াগুলোকে এক-করে আমি আবার তাদের গলির ভিতর চালিয়ে দিলুম। নিজে গলির ভিতর ঢুকতে যাচ্চি এমন-সময় ঠিক আমার মাথার উপর থেকে মানুষের গলার আওয়াজ পেলুম। সে বল্লে—"আহা, বেচারাদের ঘরে যেতে দাও।" এই ব'লে সে ভেড়াগুলোকে গির্জ্জের দিকে ফিরিয়ে দিলে। আমি তখনই চিন্‌তে পারলুম, সে ইউজেন্—সিল্‌ভ্যাঁর ভাই। একটা ভেড়ার গায়ে হাত-বুলিয়ে সে বল্লে—"বরফের এই দানাগুলি পড়ে কি চমৎকার দেখতে হয়েছে, দেখ! কিন্তু বেচারাদের এতে অসুখ হতে পারে।"

তাকে সেইখানে দেখে আমি একটুও আশ্চর্য্য হলুম না। আমি গির্জ্জেটার দিকে হাত-বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"ওটা কি?" সে বল্লে—"ও তোমার জন্যে! আমার ভয় হ'ল, হয়ত বাদাম-গাছের মধ্যে দিয়ে এই পথ তুমি খুঁজে পাবে না, তাই দু-ধারে লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিয়েছি।" মাথার ভিতর আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকবার পর আমি বুঝতে পারলুম যে, ঐ যে বহুকালের পুরোনো, ক্ষয়ে-যাওয়া কালো থাম, ওগুলো বাদাম গাছের গুঁড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। তারপর চিনতে পারলুম, ঐ যে শাসি-দেওয়া জানলা—যার ভিতরে আলো চিক্-চিক্ করছে, সেটা গোলাবাড়ীর রান্নাঘর। ইউজেন নিজেই ভেড়াগুলোকে গুনে তুল্লে। তার পর তাদের গরম-রাখবার জন্যে আমার সঙ্গে মিলে খড়-নিয়ে বিছানা তৈরি করতে লেগে

গেল। আমরা যখন খোঁয়াড় থেকে ফিরে আস্‌ছি, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে যে, যে-দুটো ভেড়া হারিয়ে গেছে তার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না বলেছি—সে কথা কি সত্যি? সে যে বিশ্বাস করতে পারলে আমি মিছে কথা বলেছি এইতে আমি লজ্জায় মরে গেলুম—আমার বুক-ফেটে কান্না এসে পড়ল। আমি কাঁদতে-কাঁদতে বল্লুম—"তারা যে কেমন করে কোথায় গেল, আমি কিচ্ছুই টের পাইনি!" সে তখন বল্লে যে তারা একটা নালার মধ্যে ডুবে মরেছে—সে খোঁজ পেয়েছে। আমি ভাবলুম সে নিশ্চয় আমায় খুব বক্‌বে—আমি কেন ভালো-করে তাদের উপর নজর রাখিনি; কিন্তু নরম সুরে সে বল্লে—"যাও, ঘরে গিয়ে গরম-হয়ে নাও-গে! সোলোঞ্চর সমস্ত বরফের গুঁড়ি তোমার চুলে এসে জড়ো হয়েছে!" আমি মনে-মনে স্থির করলুম, আমি নিজে গিয়ে নালাটা একবার দেখে আসব, কিন্তু রাত্রের মধ্যে এমন বরফ পড়ল যে পর-দিন আমরা কেউ আর মাঠে বেরুতেই পারলুম না।

বুড়ি বিবিশ্ বাড়ির যত ছেঁড়া কাপড় শেলাই করছিল—আমি তার সঙ্গে বসে গেলুম। মার্ত্তিন্ তার চরকায় সুতো কাটতে লাগল; আমি শেলাই করতে-করতে তাদের গান শোনাতে লাগলুম।

(৬)

সেদিন সন্ধ্যাবেলা যখন কাজে বসেছি কুকুরগুলো অনবরত চীৎকার করতে লাগল। মার্ত্তিন্‌কে তাদ্রি উদ্বিগ্ন দেখা গেল। সে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে কুকুরের ডাক শুনলে; তার পর চাষার দিকে চেয়ে বল্‌ যেরকম দুর্য্যোগ, এতে নেকড়ে কুকুরদের কাছে যাবার জন্যে দাঁড়াল এবং লণ্ঠন-হাতে সমস্ত ঘুরে এল। সমস্ত সপ্তাহ ধরে যখন বরফ পড়তে লাগল, তখন দেখি বি গোলাবাড়িতে এসে জুটেছে। এম্‌নি ক্ষিধের জ্বালা যে কিছুতে প্রাণে নেই। তারা গোয়ালে, খোঁয়াড়ে, —সর্ব্বত্র যেতে লাগল;—শস্যগুলো ফেলা-ছড়া করতে লাগল। অনেকগুলোকে চাষা গুলি করে আমরা তার কতকগুলো নিয়ে সব্‌জি রান্না করলুম। সবাই খেয়ে বল্লে কিন্তু কুকুরগুলো মুখে তুল্লে না।

(৭)

প্রথম যেদিন ভেড়া ও গোরু বার করে ছেড়ে দেওয়া হল, সেদিন তখ লম্বা পাইনগাছগুলো বরফে ভারাক্রা আছে। পাহাড়টারও চেহারা আগ কেবল সাদা। মনে হচ্ছিল, সেটা গোলা দিকে যেন এগিয়ে এসেছে। চারি এই সাদাতে আমার ধাঁধা লাগছিল। যেসব জিনিষ থাকে, সেখানে তারা কি না ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। ভয় হতে লাগল, হয় ত গোলাবাড়ির দিয়ে যে নীল ধোঁয়া পাকিয়ে-পাকিয়ে তা আর দেখতে পাবনা। ভেড়া খাবার কিছু পাচ্ছেনা—কেবল খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি তাদের বেশী পড়তে দিতুম না। তাদের দেখাত যেন চলন্ত বরফ। তাই পাছে তারা

...য় এইজন্যে খুব সাবধানে তাদের ...রাখতে হ'ত। আমি তাদের ...রে নিয়ে একটা বড়গোছের বনের ...এনে ফেল্লুম। দেখে মনে হল ...টা যেন তার ঘাড় থেকে বরফের ...ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে। ...ডালগুলো এক-একটা নাড়া দিয়ে ...বরফ ঝরিয়ে ফেলছে; যাদের শক্তি ...তারা হুমড়ি-খেয়ে পড়ে বরফ ...দিচ্ছে। এই বনের মধ্যে আমি আগে ...আসিনি। আমি শুনেছিলুম এটা একটা ...বন—মার্ত্তিন্ এইখানে মাঝে-মাঝে ...নিয়ে আসত। পাইন-গাছগুলো ...প্রকাণ্ড লম্বা, ফার্ণগুলোও খুব বড়-

...মি অনেকক্ষণ ধরে এক-ঝাড় ফার্ণের ...য়ে দাঁড়িয়েছিলুম। হঠাৎ মনে হল ...নড়ে উঠল—পায়ের চাপে শুক্‌নো ...ভেঙে গেলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি ...শব্দ শুনতে পেলুম। আমার ভয় ...লাগল। আমার মনে হল, ওখানে নিশ্চয় ...লুকিয়ে আছে। একটু পরেই আবার ...ম শব্দ—এবার আরো কাছে; ...কিছু নড়তে দেখলুম না। আমি ...খুব সাহস দিতে লাগলুম, ভাবতে ...নিশ্চয় খরগোস কিম্বা ঐরকম ...ছোট জানোয়ার আহারের চেষ্টায় ...। কিন্তু যতই মনকে প্রবোধ ...কেউ যে ওখানে আছে এ সন্দেহ ...গেল না। আমার ভারি ভয় করতে ...ভাবলুম, গোলাবাড়ির কাছাকাছি ...জায়গায় চলে যাই। ভেড়া-গুলোর দিকে চু-পা গেছি আর দেখি তারা জড়াজড়ি করে বন থেকে ছুটে পালাতে লাগল। তারা কিসের জন্যে ভয় খেলে বুঝতে না পেরে এদিক-ওদিক চাচ্ছি, এমন সময় দেখি, আমার খুব কাছেই, ভেড়ার পালের মধ্যে একটা হল্‌দে রঙের কুকুর পড়ে একটাকে মুখে-করে নিয়ে পালাচ্ছে। গোড়াতে আমার মনে হল—কাস্তিল্ বোধ হয় ক্ষেপে গেছে; কিন্তু ঠিক সেই-মুহূর্ত্তেই দেখলুম, সে আমার ঘাগরার উপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, একটা করুণস্বরে চীৎকার করে উঠল। তখন আমি বুঝতে পারলুম যে ওটা নেকড়ে। দেখলুম সে ভেড়া-টাকে নিয়ে ছুটে চলেছে—তার মধ্যিখানটা কামড়ে ধরে। দেখতে-দেখতে সে বেশ সহজে একটা পাহাড়ের ঢিবির উপর উঠে পড়ল, এবং যখন সে মাঠ ও বনের মধ্যিখানের খালটা ডিঙিয়ে লাফ মারলে তখন তার পিছনের পা-দুটো দেখালো যেন পাখীর ডানা! সে-সময় সে যদি গাছের মাথার উপর দিয়েও উড়ে যেত তাহলেও আমার আশ্চর্য্য বোধ হত না। আমি সেখানে অনেকক্ষণ একেবারে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—ভয়-ডর যেন ভুলে গিয়েছিলুম। তারপর আমার বোধ হতে লাগল সেই খানাটার দিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারছিনা। চোখের পাতা এমন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে মনে হতে লাগল আর কস্মিন-কালেও চোখ বুজতে পারব না। ইচ্ছে হতে লাগল খুব জোরে চীৎকার করি—গোলাবাড়ির লোকেরা যাতে শুনতে পায়; কিন্তু গলা

থেকে একটুও স্বর বেরুল না। ছুটে যাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু পা এমন থর-থর করে কাঁপতে লাগল যে ভিজে মাটিতে বসে পড়তে হল। কাস্তিল্ অনবরত চীৎকার করে যেতে লাগল—যেন তার একটা ভয়ানক যাতনা হচ্ছে; আর ভেড়াগুলো সব জড়াজড়ি করে কুণ্ডলী পাকিয়ে রইল।

তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েই আমি সিল্‌ভ্যাঁর খোঁজে ছুটে গেলুম। আমাকে দেখেই সে বুঝতে পারলে ব্যাপার কি। সে তার ভাইকে ডেকে নিয়ে দুজনে দুটো বন্দুক-হাতে বেড়িয়ে পড়ল; কোন্‌দিকে নেকড়েটা গেছে আমি দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করলুম। তারা দুজনেই সন্ধ্যা হলে তবে ফিরে এল; নেকড়ের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি। সেদিন সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটা ঐ নেকেড়ের কথা ছাড়া আমাদের আর-কোনো কথাই হল না। ইউজেন জানতে চাইলে নেকড়েটাকে দেখতে কেমন। আমি যখন বল্লুম তার গায়ের রং কাস্তিলের মতো হলদে, কিন্তু দেখতে তার চেয়ে ভালো, তখন বিবিশ্ রেগে উঠল।

(৮)

এইবার মার্ত্তিনের পালা। ভেড়াগুলো বের করে সবেমাত্র বেরিয়েছে—তখনো বাদাম-তলা পার হয়নি, আমরা শুন্‌তে পেলুম সে চীৎকার করে উঠল। বাড়ির সবাই ছুটে বেরিয়ে পড়লুম। আমিই সবপ্রথম তার কাছে গিয়ে পৌঁছলুম। গিয়ে দেখি সে হেঁট-হয়ে পড়ে একটা ভেড়াকে ধরে প্রাণপণে টানছে;— নেকড়ে সেটাকে মেরেছে, এখন নিয়ে পালাবার চেষ্টা। নেকড়েটা তার টুঁটি কামড়ে ছিল; মার্ত্তিন্ যত জোরে টানে, সেও জোর করে। মার্ত্তিনের কুকুরটা তার পা কাম্‌ড়ে ধরলে কিন্তু তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই; তারপর যখন সিল্‌ভ্যাঁ তার উপর সটান গুলি চালালে তখন একথাবা মাংস দাঁতে নিয়ে ডিগ্‌বাজি উল্টে পড়ল। মার্ত্তিনের চোখ যেন ঠি পড়ছিল; তার মুখ একেবারে সা মাথা-থেকে তার টুপিটা পিছলে পড়ে তার সেই লম্বা সিঁথেটা দেখে মনে হচ্ছিল একটা চওড়া রাস্তা—যার উপর লোকে নির্ভয়ে চলে যেতে পারে। তার মু স্বাভাবিক সেই তেজের ভাব বদলে একটা দারুণ বিষণ্ণতায় বিকৃত হয়ে এসেছি সে ক্রমাগত হাত খুলচে আর মুড়চে যেন দুহাতে তাল দিচ্ছিল। এতক্ষণ একটা বাদামগাছে হেলান-দিয়ে দাঁড়ি ছিল, এইবার ইউজিনের কাছে এ গেল। ইউজিন তখনো নেকড়েটার দি চেয়েছিল। সে তার পাশে খানিক দাঁড়ি সেই মরা নেকড়েটাকে দেখতে লা তারপরে বলে উঠল—"আহা, বেচা হয়ত কদ্দিন খেতে পায়নি!" গাড়িতে সেই নেকড়েটা আর ভেড়াটা তুলে গোলাবাড়িতে টেনে নিয়ে যাওয়া হ'ল কুকুরগুলো গাড়ি শুঁকতে-শুঁকতে সঙ্গে যেতে লাগল—মনে হল তারা ভয় পেয়েছে

তারপর কয়েকদিন ধরে রোজ চাষা আ তার ভাই—দুজনে কাছাকাছি যত জায়গা আছে সেখানে শিকার করতে বেরুত যেখানে ইউজেনের সঙ্গে দেখা হত



চতুষ্পাঠী
শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

রে আমায় দুটো মিষ্টি কথা বলে । সে বলত যে তাদের ঐ বন্দুকের াজে নেকড়েরা সব পালিয়েছে, এখানে বড়-একটা নেকড়ে দেখাও না—হঠাৎ আসে। সে আমায় ঐসব সাহস দিত বটে কিন্তু আমি আর সেই ায় যেতুম না। তার চেয়ে পাহাড়ের উপর া আমার ভালো বোধ হত—সেখানে ল ফার্ণ আর পালকওলা ডাঁটা।

(৯)

বসন্তকাল পড়তেই চাষার স্ত্রী আমাকে দোহা ও শূয়োরপালা শেখাতে লাগল। বলত, আমাকে সব কাজ শিখিয়ে সে রি করে তুলবে। গুরুমার কথা—সেই তিনি নাক-সিঁটকে বলেছিলেন আমাকে দুইতে হবে, শূয়োর ঘাঁটতে হবে—কথা আমি মনে না তুলে থাকতে রতুম না। তখনকার তাঁর কথার ীতে মনে হয়েছিল যে তিনি আমার ক্তির ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু এখানে এসব কাজে আমার আনন্দই হত। ভালো-করে দুধ পাবার জন্যে আমি গোরুর পেটের ধারে কপালটা ঠেস দিতুম, দেখতে-দেখতে আমার কেঁড়ে ভরে উঠত। দুধের উপরটা ফেনা হয়ে উঠত—তাতে কতরকম রং যে খেলত; সূর্য্যের আলো পড়ে এমন আশ্চর্য্য সুন্দর দেখাত যে চেয়ে-চেয়ে আমার ক্লান্তি আসত না।

শূয়োরগুলোকে পালন করতে আমার কখনো বিরক্তি ধরত না। সিদ্ধ আলু ও দই ছিল তাদের খাবার। আমি সেগুলো ভালো করে মেখে দেবার জন্যে ডাবার ভিতর হাত পুরে দিতুম এবং তাদের একেবারে খেতে আসতে না দিয়ে—একটু দেরী করিয়ে দিতুম। তাই দেখতে আমার বড় ভালো লাগত। তাদের ক্ষিধের সেই ছটফটানি আর নাকের ফস্‌ফসানিতে আমি ভারি আমোদ পেতুম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

শিশুর চরণ

ছোট ছোট রাঙা পায় চুমো খেতে সাধ যায়,
কোকনদ সম,
জিম চরণ দুটি— গৃহ সরোবরে ফুটি
দূর করে তম।
নবনীত সুকোমল শোভে রাঙা শতদল
ধবল শয্যায়,
কনক চম্পক-কলি সজ্জিত আঙুলগুলি
আনন্দ জাগায়!

সাদা-লালে মাখামাখি, বর্ণ ফলাইয়া, আঁখি
সচঞ্চল করে,
কভু বসি কভু শুয়ে খেলে শিশু নুয়ে নুয়ে
পদযুগ ধরে'!
আবার পূরিয়া মুখে লেহন করয়ে সুখে
খেলনা ভাবিয়া,
সে পদ-সরোজে তার চুমো দেয় বার বার
জনক হাসিয়া!

জননী হৃদয়ে তুলে স্তন্য যবে দেয় খুলে,
শিশু রাঙা পায়
কৌতুকে আঘাত করে উচ্ছ্বাস-আনন্দভরে
সোহাগে মাতায়!
প্রত্যেক আঘাতে পা'র সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার
পুলক-নিঝরে,
মায়ের অন্তর দিয়া, সুখ-উৎসে উ
চরণ বিহরে!
ভৃগুপদ-চিহ্ন বুকে, হরি রেখেছেন
পুরাণ-কথন,
আজি হেরি ধরা-মাঝে জননীর হৃদে
শিশুর চরণ!

শ্রীপ্রসন্নময়ী

উন্মাদ

আমাকে উঠিতে দেখিয়া শচীশ বলিল, "সে কি, এরি মধ্যে! এলে যখন, গারদটা দেখেই যাও একবার!"

আমি বলিলাম, "সে কথা মন্দ নয়,—চল।"

শচীশ আমার বাল্যবন্ধু। এখন পাগ্‌লা গারদের ডাক্তার। কার্য্যগতিকে এ-অঞ্চলে আসিয়া পড়াতে, অনেকদিন পরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

কত-রকমের পাগলই যে দেখিলাম! কেহ 'শিবনেত্র' হইয়া 'বোম্-ভোলানাথে'র মতই ধ্যানাসনে বসিয়া আছে, কেহ হাসিতেছে-কাঁদিতেছে, কেহ নাচিতেছে-গায়িতেছে, কেহ-বা চেঁচাইয়া আকাশ ফাটাইতেছে! একজন আমাকে গম্ভীরভাবে কাছে ডাকিয়া চুপিচুপি কাণে-কাণে বলিল, "আপনি যদি কারুকে কিছু না-বলেন, তাহলে একটি ভাল খবর দিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, কারুকে বলব-না—বলুন।"

পাগল বলিল, "আপনি কি রাতা
নবাব হতে চান?"

—"খুব চাই!"

—"শুনুন তবে। দেখ্‌বেন—কা
বল্‌বেন-না কিন্তু! আমি যখের
সন্ধান পেয়েছি। সাতঘড়া মোহর—
বাক্স হীরে-জহরৎ! কোথায়
আপনাকে বলে দেব।"

আমি বলিলাম—"বলুন।"

সে বলিল—"একি ফস্ করে
ফেলবার কথা! আসুন, আগে একটু
—বিশ্রাম করুন—তারপর ধীরে-সুস্থে
একে সব বলচি!"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আচ্ছা,
আর-একদিন এসে সব শোনা
আজ আর সময় নেই।"

আর-এক জায়গায় দেখিলাম, এ
লোক একখানা কাঁচ লইয়া জলে ডুবাইতে
শানে ঘষিতেছে আর মাঝে-মাঝে কাঁচ
একচোখ বুজিয়া দেখিতেছে।

আমি তাকে অনেক ডাকিলাম, সে একবার মুখও তুলিল না—আমার উত্তরে একটি টুঁ-শব্দও করিল না। শচীশ বুঝাইয়া দিল, "এঁর বিশ্বাস, ইনি বিজ্ঞান-রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত বেন। ওঁর ব্রত, ঐ কাঁচখানাকে মেজে-একেবারে খাঁটি হীরে করে ফেলা। দিন এ মহৎ ব্রত-উদ্‌যাপন না-হয়, এঁর ণ, ততদিন ইনি মৌনী থাক্‌বেন।"

আর-একজন আমাকে ডাকিয়া বড়ই খিতভাবে নালিশ জানাইল, "মশাই, এরা নিয়াসে'র ওপরে কি-রকম যাচ্ছেতাই বদস্তি করে, জানেন?"

আমি বলিলাম, "কি-রকম?"

সে তার মাথাটি ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া াইয়া বলিল, "দেখুন, মশাই দেখুন! আমার মাথার চুল খাটো করে ছেঁটে , আমার মানা মানে না। মাথায় রি-কাটা চুলই যদি না রইল, লোকে াকে তবে কবি বলে চিনবে কিসে, ন-ত?"

আমি হাসি চাপিয়া বলিলাম, "তা যা ছেন!"

পাগল খুসী হইয়া বলিল, "আপনাকে ক বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আরো ন, আমি কাগজ-কলম চাইলে এরা কিছুতেই দেয় না, উল্টে দাঁত বার রে হাসে। হায়, হায়, কাগজ-কলমই না রইল কবি তবে কেমন করে বিতা লিখ্‌বে—কেমন করে দুঃখিনী বঙ্গ-ায়ার মুখোজ্জ্বল কর্‌বে? এরা ভাবে আমি পাগল,—"

তার কথা শেষ হইতে-না-হইতেই আমি সরিয়া পড়িলাম।

পাগল কবি আমাকে ডাক্ দিয়া বলিল, "আ আমার কপাল! আপনিও ঐ দলে? মশাই, যাবেন না—যাবেন না! পাগলের সঙ্গে 'জিনিয়াসে'র কতটা যে সম্পর্ক, আগে সেটা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করে প্রাণ জল করে দি আসুন।"

শচীশ বলিল, "ইনি ভাবেন, কবিতা লিখ্‌লেই ডাল-ছেঁড়া পাকা আমের মত 'নোবেল-প্রাইজ' এঁর হস্তগত হবে। এঁর মনে দৃঢ় ধারণা, পাছে ইনি 'নোবেল-প্রাইজ' পেয়ে যান, সেই হিংসায় রবি-ঠাকুরই ষড়যন্ত্র করে এঁকে এখানে নির্ব্বাসিত করে রেখেছেন!"

বাস্তবিক,—এ-এক নতুন দুনিয়া, এখানে সমস্তই আজব ব্যাপার! সকলেই এখানে সুখী—কেননা, এদের বিশ্বে বাস্তব বলিয়া কোন-কিছু নাই। আপনাদের বাসনাকে এরা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যেমন-ইচ্ছা তেমনি করিয়া গড়িতেছে—যুক্তি, কারণ ও সহজ-জ্ঞানের কোন ধার ধারে-না বলিয়া 'অসম্ভব' কথাটি এদের অভিধান হইতে মুছিয়া গিয়াছে!

সামনেই একটি ঘর। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, ঘরে কেউ নাই; কিন্তু তার পরেই দেখিলাম, এককোণে আধা-অন্ধকারে আবছায়ার মত একটি মূর্ত্তি, একেবারে যেন দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া আছে। বিশীর্ণ তার দেহ—বিষণ্ণ তার মুখ!

আমাদের পায়ের শব্দে চমকিয়া, সে মুখ তুলিয়া চাহিল। শচীশকে দেখিয়া, তার

কোটরগত অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষুদুটি একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আস্তে-আস্তে বলিল, "কে, ডাক্তার?"

সে স্বর কি মানুষের? এমন অনৈসর্গিক স্বর আমি জীবনে আর-কখনো শুনি নাই!

শচীশ বলিল, "এখন কেমন আছেন?"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর পা-দুটো যেন কোন-মতে টানিয়া-টানিয়া আমাদের কাছে আসিয়া, শচীশের দিকে অস্থিচর্ম্মসার একখানা হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "দেখুন।"

এতক্ষণে ভাল-করিয়া লোকটার চেহারা দেখিয়া আমার গা শিহরিয়া উঠিল। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন শ্মশানের মড়াকে তুলিয়া আনিয়া ভুতুড়ে বিদ্যায় কে তাহাকে জীয়ন্ত করিয়া চলাইতেছে, ফিরাইতেছে! ওঃ, আর তার সেই বুকের ও কণ্ঠার হাড়গুলা! সেগুলার উপরে যেন মাংসের লেশমাত্র নাই—প্রতি নিশ্বাসেই ভয় হয়, উপরকার পাত্‌লা চামড়ার ঢাক্‌নি ফুঁড়িয়া এই মুহূর্ত্তেই তাহারা বুঝি বাহির হইয়া পড়িবে! আমি স্তম্ভিতনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া কাঠ্‌ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

শচীশ তাহার হাত ধরিয়া যতক্ষণ তার নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিল, ততক্ষণ সে উদ্বেগে ও আগ্রহে বিস্ফারিতচক্ষে শচীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শচীশ বলিল, "আপনার নাড়ীতে এখনো জ্বর আছে।"

কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়া সে বলিল, "বুকটা দেখ ত ডাক্তার!"

শচীশ তাহার বুকটা খানিকক্ষণ পরী করিয়া বলিল, "আপনার যক্ষ্মারোগ হয়েছে।"

রোগী একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলি আপনমনে মৃদুস্বরে বলিল, "আ বাঁচলুম!" তারপর সে আবার ঘরের কো গিয়া বসিয়া পড়িল।

বাহিরে আসিয়া শচীশকে জিজ্ঞা করিলাম, "কি ভয়ানক! এ কে শচীশ

শচীশ বলিল, "আশ্চর্য্য পাগল! বছরে আর ক-মাস এ-লোকটি অনেকটা স মানুষের মত থাকে; কিন্তু যতই ঘনিয়ে আসে, এর পাগলামিও তত বি হয়ে ওঠে। তখন ওর কাছে ঘেঁষে, সাধ্য!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যক্ষ্মা হয়েছে শুনে লোকটা অমন খুসী উঠ্‌ল যে?"

শচীশ হাসিয়া বলিল, "যক্ষ্মা-টক্ষ্মা কিচ্ছু হয়-নি। ও আমার মিছে কথা —"সেকি-হে?"

—"হ্যাঁ; আমি যদি বলতুম, 'আপ ভাল আছেন'—তাহলে ও রসাতল বাধিয়ে দিত। তারপর খাওয়া-দাওয়া ছে হয়ত উপোস করেই মরে যেত। এ যখন এখানে ডাক্তার হয়ে আসি, ত ওর হাল-চাল জানা না থাকাতে ভ মুস্কিলেই পড়া গিয়েছিল।"

আমি বিস্মিত স্বরে বলিলাম, "এ-র পাগলের কথা কখনো শুনি-নি।"

শচীশ বলিল, "ভদ্রবংশে লোকটির জ বেশ ভাল লেখাপড়াও জানে। ওর জীব

...অদ্ভুত। গেলবছরে ওর পাগলামি ...বেড়ে ওঠেনি, আমি তখন কৌতূহলী ...একদিন ওর পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। ...সে কিছু বললে-না বটে, কিন্তু ...তক পরে ওর হাতে-লেখা মস্ত এক ...পেলুম। তাতে ওর নিজের কথা ...খুলে লেখা ছিল।"

আমি আগ্রহের সহিত বলিলাম, "সে ...তুমি ছিঁড়ে ফেল-নি?"

—"না, সে ছিঁড়ে ফেলবার চিঠি নয়। ...-মিথ্যে জানিনা, কিন্তু সেই কাগজ-...নায় যা লেখা আছে, তা অতি ...নক ব্যাপার। হয়ত তাতে পাগলের ...পও কিছু-কিছু আছে। কারণ আমার ...স যে, চিঠিতে ও-লোকটি যে-সব ...র কথা বলেছে, সে ঘটনাগুলি ঘট্‌বার ...সেই ওর মাথায় পাগ্‌লামির ছিট্ ...ছিল। তুমি বোধ হয় জান, লোকে ...ন প্রথম পাগল হয়, তখন কোন-একটা ...শেষ বিষয়ে তার অস্বাভাবিক ঝোঁক্ ...ড়ে। সে অবস্থায় প্রথম-প্রথম সে কার্য্য-...রণের জ্ঞান হারায়-না। কিন্তু, তারপর ...ই ঝোঁক্‌টা ক্রমে যতই বেশী হয়ে উঠ্‌তে ...কে, উন্মাদ-রোগ ততই তার ঘাড়ে চেপে ...স। হয়ত এ-লোকটিরও সেই দশা হয়েছিল ...চিঠি পড়্‌লে তুমিও তা বুঝতে পারবে। ...মি কি সে চিঠি পড়্‌তে চাও? বিশ্বাস ...র না-কর, সে পড়্‌বার মত চিঠি ...ট!"

আমি বলিলাম, "পড়্‌ব বৈকি!"

* * *

শচীশের বৈঠকখানায় পাগলের পত্র লইয়া ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িলাম। চিঠিতে যা লেখা ছিল, তা এই:—

"ডাক্তার,

আমি যে পাগল, আমার এই পরিচয়ই কি যথেষ্ট নয়?—পাগলের কথায় কে বিশ্বাস করবে? তোমার গারদে কত লোক আছে, তাদের কেউ মনে করে 'আমি সম্রাট', কেউ মনে করে 'আমি কবি', কেউ মনে করে 'আমি দেবতা',—কিন্তু তোমরা জান, তারা সুধু পাগল,—খেয়ালের স্বপনে মস্‌গুল হয়ে আছে। তোমরা সে সম্রাটদের হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিয়েছ, কবিদের বাণীর কমলকানন থেকে নির্ব্বাসিত করেছ, দেবতাদের ফুল-চাল-কলা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছ। তাদের মুখের কথাকে তোমরা সম্রাটের হুকুম বা কাব্যের শ্লোক বা দেবতার অভিশাপ বলে ভ্রম কর না। তাদের কথা তোমরা তুড়ি মেরে স্রেফ্ উড়িয়ে দাও—আমার কথাতেই-বা তোমাদের বিশ্বাস হবে কেন? তবু আমার কথা কেন-যে তুমি জান্‌তে চেয়েছ তাই ভেবে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু, জানতে যখন চেয়েছ, আমি যতটা-পারি সব খুলে লিখ্‌ব। মনের কথা মনে চেপে রাখায় বড় কষ্ট। পাগলরা তা পারে-না বলেই তারা এত দিল-খোলা হয়। আমি এখনো পাগলের সব গুণে গুণী নই,—মনের কথা তাই মনেই চেপে রাখতে পারি। কিন্তু এ কথা-চাপ্‌বার চাপ মনকে আমার জাঁতাকলের মত পিষে ফেল্‌ছে—এতদিন তাই যা পারি-নি, আজ তা কর্‌ব। সব তোমাকে বল্‌ব। বিশ্বাস

কর ভালই,—না-কর পাগলামি বলে উড়িয়ে দিও। আমি সুধু বলে খালাস হতে চাই।

আর এক কথা। আমি পাগলা-গারদে আছি বটে, কিন্তু এখন ঠিক পাগল নই। তুমি ত জান, বর্ষাকালটায় উন্মাদ-রোগ এসে আমার ঘাড়ে চেপে বসে। কিন্তু অন্যসময়ে আমি আর পাগলামির স্বপ্ন দেখি না। এ-সময়টায় মনে হয়, আমি যেন সবে ঘুম থেকে জেগে উঠেছি; কেন মনে হয় জানিনা,—কিন্তু, মনে হয়। সবে ঘুম ভাঙ্গলে মানুষের দেহ যেমন একটা অলস জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, আমিও তেমনি আচ্ছন্ন হয়ে থাকি। পাগ্‌লামি না থাক্‌লেও আমি যে এই সময়টাতে একেবারে সহজ মানুষ হয়ে উঠ্‌তে পারি-না, তার মূলে, ঐ জড়তা! এ-সময়টায় আমি ভাব্‌তে পারি, সে ভাবনায় একটা কার্য্য-কারণের ধারা পাই—যে ধারা পাগলের চিন্তায় থাকে না। এইতেই বুঝি, এখন আমি পাগল নই।

ছেলেবেলাতেই বাপ-মা আমার মারা যান,—আমি মানুষ হয়েছি মামার-বাড়ীতে। শুনেছি বাবা মরবার আগেই পাগল হয়েছিলেন। আমার অতি-বৃদ্ধ পিতামহও পাগল ছিলেন। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের বংশে পাগলামির চর্চ্চা হচ্ছে পুরুষানুক্রমে। মামাদের দৌলতে আমি বি-এ পাশ দিয়ে বিয়ে করি। তারপর নিজেদের গ্রামে ফিরে গিয়ে সংসার পাতি। বাবার লোহার সিন্দুকে যা ছিল, তা নিয়ে বড়মানুষী কর্‌তে না পারলেও মোটা ভাত-কাপড়ের অকুলান হল না। বলে রাখা ভাল, মামারা ছাড়া আমার আর কে আত্মীয়-স্বজন ছিলেন না।

ক-বছর কাট্‌ল বেশ।

নির্ম্মলা অল্পবয়সেই পাকাগিন্নী উঠেছিল; তার যত্নে আমার গৃহস্থা সর্ব্বদাই লক্ষ্মী-শ্রী বিরাজ কর্‌ত। আমা আর-কোন দুঃখ ছিল না—কেবল এ সন্তানের অভাবে নির্ম্মলা মাঝে-ম মুখখানি ভার করে থাক্‌ত। তার মনে কেমন-করে একটা কুসংস্কার ব হয়ে গিয়েছিল,—যে রমণী বন্ধ্যা, পরলো তার সদ্গতি নেই!

নির্ম্মলা যে সুধু গুণে লক্ষ্মী ছিল, নয়; রূপেও সে ছিল সরস্বতীর ম যেমন মুখ, তেমনি রং, তেমনি গড়ন আমার মত গৃহস্থের সংসারে সে ভাঙ্গাঘরে চাঁদের আলো! তাকে আমিও কিছু বিব্রত হয়ে থাকতুম। তা বল্‌ছি।

নির্ম্মলার রূপের খ্যাতি সারা গাঁয়ে গিয়েছিল। পাড়ার কতকগুলো ব ছোঁড়াকে আমার বাড়ীর আনাচে-কা ঘুরে বেড়াতে দেখতুম। দু-চারখানা চিঠিও আমার বাড়ীর মধ্যে এসে পড়েছি অবশ্য, সে-সব চিঠির কথা আমি পেতুম না,—নির্ম্মলা নিজেই যদি সে এনে আমাকে না দেখাত।

ডাক্তার, স্পষ্ট কথা বল্‌তে স্ত্রীলোককে আমি তেমন ভাল দেখতুম না। নারী ঘরের লক্ষ্মী পারে,—কিন্তু লক্ষ্মীর মতই সে চঞ্চ কখন্ যে কার উপর সদয় হবে, কি

ও বলতে পারেন না। শক্ত পুরুষের ার না পড়লে রমণী কখনো ঠিক তে পারে না—এই ছিল আমার া। যে বাগানে মালীও নেই বেড়াও সে বাগানের ফুল যে আর-পাঁচজনে নেবে—এ ত জানা কথা। কামিনী-কে চোখে-চোখে রাখতে হয়,—নইলে, দিন দেখবে, হয়ত তোমার গলার মালা ন্তর গলায় দুল্‌ছে!

সুতরাং নির্ম্মলাকে আমি পৈ-পৈ করে া করে দিতুম, অন্দরের আড়াল থেকে যেন কোনমতে বাইরে না বেরিয়ে পড়ে। নির্ম্মলা কথা বড় বেশী কইত না—রে একবার 'আচ্ছা' বলেই অন্য কাজে যেত।

ঘরের দিকে এবং পরের দিকে—কেই আমার দৃষ্টি ছিল সমান সতর্ক। কালে থাকিলেও নারী রেখ সাবধানে"—া বোধ হয় কবি ঠেকে শিখেছিলেন, ননা, এর-চেয়ে খাঁটি কথা আর হতে ারে না।

একদিন ভিন্-গাঁ থেকে ফিরে আসছি; ড়ীর কাছে এসে দেখি, একটা ছোঁড়া াইরে থেকে দরজার ফাঁক্ দিয়ে আমার ড়ীর ভিতরপানে কি দেখছে। কি যে খছে, তা বুঝ্‌তে আমার দেরি হল না। ানে কথার চেয়ে গায়ের জোরের দাম বেশী। তএব, আমি ছুটে গিয়ে তার গণ্ডে এমন-ক প্রচণ্ড চড় কসিয়ে দিলাম যে, সামলাতে পেরে দড়াম করে সে মাটির উপরে ড়ে গেল। একেবারে অজ্ঞান! সেই জ্ঞানতা থেকে গ্রামের আর-আর সকলেই পরম জ্ঞানলাভ কর্‌লে;—কেননা এরপর হতে আর কারুকে আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায় উঁকিঝুঁকি মারতে দেখি-নি। আমিও জেনে রাখলুম, এ-লোকগুলোর রূপের প্রতি তৃষ্ণা যত, কিল-চড়ের প্রতি বিতৃষ্ণাও তত। এদের ফুল তোলবার সখ আছে বিলক্ষণ—কিন্তু কাঁটা দেখলেই হাত-গুটিয়ে পিছিয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়ার কত সাধু যে সুধু এই কাঁটার ভয়েই দায়ে-পড়ে সাধু,—তা ঠিক করে বলা দায়!

একদিন বিকালে বাড়ীর সুমুখে পাইচারি করছি,—হঠাৎ দেখলুম এ-দিকপানে একজন লোক আসছে।

লোকটি বয়সে যুবা, দেখতেও সুশ্রী। চোখে সোনার চশমা, হাতে বাঁধানো ছড়ি—পরণের কাপড়-চোপড় দেখলে বোঝা যায়, বাবুআনার দিকে লোকটির ঝোঁক আছে ষোল আনা। ছেলেবেলায় পরের বাড়ীতে পরের খেয়ে মানুষ হয়েছি, নিজে কখনো বাবু-আনার বায়না ধরবার সুবিধা পাই-নি। এইজন্যে কিনা জানি-না,—যারা বাবুআনা করত তারা ছিল আমার চোখের বিষ। কাজেই এই সভ্য-ভব্য নব্যবাবুটির প্রতি গোড়া থেকেই আমার মন চটে গেল।

লোকটা বরাবর আমার সুমুখে এসে দাঁড়াল। ছড়ি দিয়ে আমার বাড়ীটা দেখিয়ে সে বল্‌লে, "এ বাড়ীখানা কার মশাই?"

আমি শুষ্ক স্বরে বল্‌লুম, "মশায়ের সে খোঁজে দরকার?"

লোকটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লে,

"না, না,—এটা কি বিনয়বাবুর বাড়ী,—আমি তাঁকেই খুঁজচি।"

"মশায়ের আসা হচ্চে কোথা থেকে?"

"আমি সম্প্রতি এখানকার সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার হয়ে এসেছি।"

লোকটি পদস্থ বটে! কাজেই একটু নরম হয়ে বল্‌লুম, "আজ্ঞে, আমারই নাম বিনয়বাবু।"

আগন্তুক একবার আমার পা-থেকে মাথা পর্য্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বল্‌লে,"আপনিই নির্ম্মলার স্বামী? নমস্কার বিনয়বাবু, নমস্কার!"

হুঁ! 'বিনয়বাবু' বলতে এ ঠিক করে নিলে,—'নির্ম্মলার স্বামী'! অর্থাৎ পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, নির্ম্মলাকে এ চেনে এবং কান টান্‌লে মাথা আসে বলে, 'বিনয়বাবু'কে এ খুঁজছে নির্ম্মলারই খোঁজ পাবার জন্যে!

আগন্তুক বল্‌লে, "তাহলে বিনয়বাবু, বাড়ীর ভিতরে একবার দয়া করে বলে আস্‌ন-গে, যে ললিত এসেছে দেখা কর্‌তে।"

কে এ ললিত?—ভাবতে-ভাবতে অন্দরে গেলুম। নির্ম্মলা তখন বসে-বসে একটা বেড়ালের গলায় ঘুঙ্গুর পরাচ্ছিল।

আমি বল্‌লুম, "হ্যাঁগা, ললিত-নামে কারুকে তুমি চেন?"

নির্ম্মলা একবার চম্‌কে উঠ্‌ল। সে চম্‌কানি আমার চোখ এড়াল না।

বেড়ালটাকে ছেড়ে দিয়ে নির্ম্মলা বল্‌লে, "কেন গা?"

নির্ম্মলার মুখ-চোখের উপর নজর রেখে আমি বল্‌লুম, "ললিত বলে একটি লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কে সে?"

নির্ম্মলার মুখ প্রথমে কেমন-একরকম হয়ে গেল। তারপরেই সে কিন্তু খুব খুসী হয়ে উঠল। বল্‌লে, "ললিত এসেছে? যাও, যাও, ডেকে আন এখানে!"

আমি অটলভাবে বল্‌লুম, "যা জিজ্ঞেস করলুম তার জবাব কৈ? ললিত তোমার কে হয়?"

নির্ম্মলা একটু থতমত খেয়ে বল্‌লে, "ললিতের বাপের সঙ্গে আমার বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। ললিত আমাকে ছেলেবেলা থেকেই জানে।"

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর স্থিরস্বরে বল্‌লুম, "ললিত ছেলেবেলা থেকে তোমাকে যখন জানে, তখন এটাও বোধ হয় জানে যে, তুমি এখন পরস্ত্রী। সে তোমার আত্মীয় নয়, তার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়া অসম্ভব।"

নির্ম্মলা কাঠের পুতুলের মত ঘাড় হেঁট করে বসে রইল।

বাইরে গিয়ে ললিতকে বল্‌লুম, "আমার স্ত্রী এখন পাড়ায় নেমন্তন্নে গেছে।"

ললিত একবার আড়চোখে আমার দিকে চাইলে; বল্লে, "আচ্ছা, কাল আমি আবার আসব অখন।"

—"ললিতবাবু, কাল সে তার বোনের বাড়ী যাবে; তার সঙ্গে আপনার দেখা হল না বলে আমি দুঃখিত।"

সে বল্লে—"নির্ম্মলার বোন? সে কি রকম? সে ত এখানে থাকে না!"

আমি থতমত খেয়ে বল্লুম—"আপনার বোন নয়—দূর-সম্পর্ক!"

আমার দিকে ব্যঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করে আর-কিছু না বলে ললিত ছড়ি ঘোরাতে-ঘোরাতে চলে গেল। বেশ বুঝলুম, আমার কথার ভাব সে ধরেছে।

বাড়ীর দিকে ফিরবামাত্র দেখলুম, ছাদের এক-কোণে লুকিয়ে নির্ম্মলা দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে কেন সে?—ললিতকে দেখছিল?

মনে-মনে নিজের বুদ্ধিকে ধন্যবাদ দিলুম। ভাগ্যে পতঙ্গের সামনে আগুনকে আনি-নি!

নির্ম্মলার এক বোন ছিল, নাম কমলিনী। সে আজ এক বছর হল, বিধবা।

হঠাৎ একদিন খবর এল, কমলিনী কুলত্যাগ করেছে।

খবরটা শুনে আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হলুম না। এ ত স্বাভাবিক!

আরও সাবধান হলুম। কমলিনী যে রক্তে জন্মেছে, নির্ম্মলার দেহেও ত সেই রক্তই আছে!

অতএব.....

অতএব বাগানের মালীকে সতর্ক হতে হবে।

নির্ম্মলা মাঝে-মাঝে পাড়ার মেয়ে-মহলে তাস খেলতে যেত। আমি বারণ করে দিলুম, আমার হুকুম-ছাড়া সে যেন আর-কোথাও না যায়। নির্ম্মলা 'হাঁ-না' কিছুই বল্‌লে-না।

এম্‌নি সময় হঠাৎ আমাকে ঘুষ্‌ঘুষে জ্বরে ধর্‌লে। গাঁয়ে একজন বাঙ্গলায় পাশ-করা ডাক্তার ছিল, মাস-দু-এক তার চিকিৎসায় রইলুম। তার ওষুধে সুফলের চেয়ে কুফল হল বেশী। দিনে-দিনে আমি ক্রমেই কাহিল হয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লুম। তারপর জ্বরের সঙ্গে দেখা দিলে—খুক্‌খুকে কাশি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার পা টিপে দিতে-দিতে নির্ম্মলা মৃদুস্বরে বল্‌লে, "হ্যাঁ গা, এ ডাক্তারকে দিয়ে অসুখ যখন কম্‌ল না, অন্য ডাক্তার ডাক না!"

আমি বল্‌লুম, "গাঁয়ে আর ডাক্তার কৈ?"

নির্ম্মলা থেমে-থেমে বল্‌লে, "আচ্ছা, ললিতকে ডাক্‌লে হয় না? সে ত সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার, হাত-যশ না থাকলে সে অতবড় কাজ পেত না।"

আমি তীব্র তিক্ত স্বরে বলে উঠলুম, "না!"

আমার কণ্ঠস্বরে নির্ম্মলা বোধ হয় আঘাত পেয়েছিল। কারণ পা টিপ্‌তে-টিপ্‌তে তখনি সে একবার থেমে পড়্‌ল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে তবে সে আবার পা-টেপা সুরু করলে।

ললিত-ডাক্তারের কথা যে আমার মনে ছিল না, তা নয়। কিন্তু তার সুন্দর মুখকে আমি ভয় করি। নির্ম্মলা যে তাকে চায়,—সে কথা সেইদিনই বুঝেছি, যেদিন সে ছাদ-থেকে লুকিয়ে তাকে দেখ্‌ছিল! সুতরাং এটা আন্দাজ করা শক্ত নয়, যে, আমার এই অসুখের অছিলায় নির্ম্মলা ললিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চায়!.....

ডাক্তার, চিঠি পড়্‌তে-পড়্‌তে আমার

মনের ক্ষুদ্রতা দেখে নিশ্চয়ই তুমি বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ছ। নিশ্চয়ই ভাবছ যে, আমি কি নীচ—কি হীন স্বভাবের লোক! বাস্তবিক, আজ এই গারদে বসে, নিজের চরিত্র বিশ্লেষণ করে চিঠি লিখ্‌তে-লিখ্‌তে আপন-স্বভাবের জন্য আমি আপনিই লজ্জিত হয়ে উঠ্‌ছি।.....সন্দেহ-রোগটা আমার ধাতের সঙ্গে কেমন মিশে গিয়েছিল। এ রোগ যদি আমার না থাকত, তবে আজ কি আমাকে কেউ এই সুন্দর পৃথিবী থেকে, এই বিচিত্র সংসার থেকে, সেই বিমল প্রেমের আলিঙ্গন থেকে, সেই স্বাধীন উদ্দাম জীবন থেকে বঞ্চিত রাখতে পারত? ডাক্তার,—ডাক্তার, আমি লম্পট নই, মাতাল নই, অন্য কোন পাপে পাপী নই—কিন্তু এক সন্দিগ্ধ প্রকৃতির জন্যই আজ আমি সকল-হারা কাঙ্গাল, মানুষ হয়েও অমানুষ, জগতে থেকেও জীবন্মৃত!.....

থাক্—যা বলছিলুম—

ললিত-ডাক্তারকে ডাকা হল-না।

পরদিন আমার চিকিৎসা করতে এক কবিরাজ এলেন। কবিরাজ প্রাচীন বটে, কিন্তু অর্ব্বাচীন কি প্রবীণ সেটা জানতুম না।

তবে, তিনি যে স্পষ্টবক্তা এবং রোগীর কাছেও শিশুর মত সরল, তার পরিচয় পেলুম।

চোখ বুজে অনেকক্ষণ আমার নাড়ী-পরীক্ষা করে তিনি সুধু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বল্‌লেন,—"হুঁ।"

এই "হুঁ"র মানে কি? জিজ্ঞাসা করলুম, "জ্বর কতদিনে সারাতে পার্‌বেন?"

কবিরাজ মাথা তুলে ঢুলু-ঢুলু চোখে কড়িকাঠের দিকে তাকালেন,—অর্থাৎ, সারা না সারা—সমস্তই ভগবানের হাত।

একটু বিরক্ত হয়ে বল্‌লুম, "কব্‌ মশাই, সুধু ভগবানকে ডেকে যদি সারাতে হয়, তবে আপনাকে ডেকে কি?"

কবিরাজ বল্‌লেন, "আমরা নি মাত্র। বাবা, তোমার অসুখ কিছু গুরুত

—"অসুখটা কি?"

—"যক্ষ্মা!"

আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল।

দরজার কাছে ধুপ্ করে একটা হোল। সেখানে ঘোমটা দিয়ে নি দাঁড়িয়েছিল—চেয়ে দেখি, মাটীর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে!

যক্ষ্মা!

সারাদিন—সারাদিন বিছানায় অ হয়ে শুয়ে রইলুম,—মনে হতে লা অশরীরী মৃত্যু যেন এখনি এসে অ অপেক্ষায় দরজা আগ্‌লে বসে আ যক্ষ্মা! এই দুটি অক্ষরের সঙ্গে কি বি যন্ত্রণা গাঁথা আছে,—কি আতঙ্কের ভ মেশানো আছে! আজ আমি যেন পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবীর নই—এরি ম পৃথিবীর সঙ্গে আমার সকল সম্পর্ক ঘুচে গেল। ফাঁশীর হুকুম পেলে কয়ে মনে কি এমনিতর ভাবের উদয় হয়?

এতদিন, জ্বর হলেও আমি উঠে, ব নড়ে-চড়ে বেড়াতুম,—তাতে কোন হোত না। কিন্তু, ব্যাধির নাম শুনে প আমি একেবারে কাবু হয়ে পড়েছি;

কে যেন আমার বুকের উপর পাথর চাপিয়ে দিয়েছে,—উঠে সাধ্য কি!

নির্ম্মলা এসে আমার মুখে ওষুধ ঢেলে । উদাস চোখে তার দিকে তাকিয়ে ম। আজ তার মুখ মলিন, কেশে- কোন শ্রী নেই। কিন্তু এই বিষণ্ণতা মলিনতার মধ্যেই তার রূপের শিখা বেশী জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে।

আস্তে-আস্তে বল্লুম, "নির্ম্মল,—আমি আর দিন নই।"

অন্য কোন স্ত্রীলোক হয়ত এখানে কাঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ত। কিন্তু নির্ম্মলা বললে, "ভয় কি, তোমার কিচ্ছু হয়-নি।"

—"কিচ্ছু হয়-নি! এত সহজে তুমি ার এ রোগটাকে উড়িয়ে দিতে চাও? রো বেশী-কিছু হলে তোমার ও শিঁথের র কোথায় থাক্‌বে নির্ম্মল?"

নির্ম্মলা হঠাৎ পিছন ফিরে দাঁড়াল—রপর জানলাটা বন্ধ করে দিলে। আমি লুম, সে পিছন ফিরেছে মুখের ভাব কাবার জন্যে—জানলা বন্ধ করে দেওয়া মাত্র।

আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। নির্ম্মলার জানলাটা বিছানার উপরে লাফিয়ে উঠ্‌ল, রপর আরামে ঘুমোবার মতলবে আমার ক চড়ে বস্‌ল। নির্ম্মলা ছুটে এসে হঠাৎ ার বিড়ালকে এমন-এক চড় মারলে যে, য়েসের আশা ছেড়ে সে একলাফে আমার থেকে নেমে ল্যাজ তুলে সরে পড়্‌ল। াপারটা তোমাদের চোখে সামান্য ঠেক্‌বে কিন্তু আমার কাছে এ তুচ্ছ নয়। কারণ, 'পুসী'কে এর আগে নির্ম্মলার হাতে কখনো মার খেতে দেখি-নি!

নির্ম্মলাকে এইমাত্র কড়া কথা বলেছি বলে মনে একটা ঘা লাগল। গাঢ়স্বরে ডাকলুম, "নির্ম্মল!"

সে আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

—"বেড়ালটাকে তাড়িয়ে দিলে কেন?"

—"কোত্থেকে এসে নোংরা পায়ে বিছানায় উঠেছিল, তাই।"

—"কেন, আগেও ত সে গঙ্গাজলে পা না ধুয়েই বিছানায় উঠ্‌ত, তখন ত ওকে মারতেও না, তাড়াতেও না।"

নির্ম্মলা চুপ করে রইল।

—"সত্যি করে বল দেখি, পাছে আমার কষ্ট হয় বলেই তুমি ওকে মেরেছ কি না?"

সে কথা কইলে না।

"নির্ম্মল—"

"বল।"

"আমার কষ্টে তুমি কষ্ট পাও?"

নির্ম্মলা একবার আমার চোখে তার চোখ রেখেই নামিয়ে নিলে।

—"নির্ম্মল, শোন।"

—"কি?"

—"কাছে এস, আরো কাছে।"

—"বল।"

—"আমাকে তুমি ভালবাস?"

—নির্ম্মলার মুখে হঠাৎ একটি তরল হাসি খেলে গেল; তারপরেই,—বোধহয় আমার অসুখের কথা ভেবেই—তার সে হাসি থেমে গেল। বললে, "তোমার আজ হয়েছে কি, এত আবোল-তাবোল বক্‌ছ কেন?"

—"নির্ম্মল, তুমি কি আমার কথার উত্তর দেবে না? আমাকে ভালবাস? বল, বল!"

নির্ম্মলা খানিকক্ষণ অবাক-আশ্চর্য্য হয়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। তার-পর আস্তে-আস্তে মুখ নামিয়ে, আমার ঠোঁটের উপরে তার দুখানি তপ্ত ঠোঁট রেখে, দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধর্‌লে।

স্বামী হতে গেলে স্বভাবটা কিছু কর্কশ, কিছু গম্ভীর হওয়া চাই—এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু কেন জানিনা, সেদিন আমার মুখ থেকে গাম্ভীর্য্যের মুখোস কি-করে হঠাৎ খসে পড়েছিল। তার পরের দিন সকালে নিজের ছেলেমানুষীর কথা ভেবে নিজেই যে লজ্জা পেয়েছিলুম—আজও তা ভুলি-নি। সামান্য কারণেই কেন-যে প্রাণ চঞ্চল হয়, মুখ দিয়ে কেন-যে শিশুর হাল্‌কা কথা বেরিয়ে পড়ে, এ-এক মহা রহস্য!

কিন্তু তবু আজ আমার মনে হচ্ছে, সে-সময় সত্যই যদি ছেলেমানুষ থাক্‌তে পারতুম, আজ তাহলে আমাকে এই দুঃখের কাহিনী লিখতে হোত না!

পরদিন ভিন্নগ্রাম থেকে এক পাশ-করা ডাক্তার আনালুম। কারণ 'শতমারী'র বিষবড়ি খেয়ে মরার চেয়ে পাশকরা ডাক্তারের হাতে মরা ঢের ভাল।

ডাক্তারের মুখে এই-একটু ভরসা পেলুম যে, আমার রোগ এখনো সাংঘাতিক হয়ে ওঠে-নি। হয়ত, সেটা মিথ্যা-প্রবোধ!

চিকিৎসা চল্‌তে লাগল। ঘরে ওষুধের শিশি খুবই বাড়ল, কিন্তু রোগ এমনি সময় আর-এক ঘটনা ঘটল।

সেদিন ভর্‌সন্ধ্যায় বাদল নাম আষাঢ়ের প্রথম জলধারা। আমি উপর বালিসে পিঠ রেখে বসে জানলাটা একটুখানি ফাঁক্ করে গুমোট্-করা ঘরের মধ্যে ঝুরুঝুরু জলের ছাট্ এসে গায়ে আঃ, সে কি মিষ্টি! গাছের গাঁয়ের পথে, খানায়-ডোবায় বৃষ্টি যেন শিশুর মত খেলায় মেতে কচ্ছিল,—আর আমি আনমনে বর্ষার 'জলতরঙ্গে' বাদলের সেই সুর শুনছিলুম।

হঠাৎ নীচের পথে চোখ পড়ল আবছায়ায় স্পষ্ট বোঝা গেল না, মনে হোল, কে-একটা লোক যেন মাথায় দিয়ে আমার বাড়ীর ভিত পড়্‌ল।

প্রথমে ভাবলুম, ডাক্তার। কি ত—ডাক্তারের এখন আসবার কথা তায় এই বৃষ্টি! আচ্ছা, ডাক্তা এখানেই আসবেন, দেখা যাক্।

একে-একে পাঁচটি মিনিট কেটে না, ডাক্তার নয়; তবে, কে ও? চোখের ভ্রম? না, তাই-বা কি-করে

আস্তে-আস্তে বিছানা থেকে দরজাটা ফাঁক্ করে দেখলুম, নির্ম্মলা নেই। এ-সময় তার ত থাকবার কথা,—কোথায় গেল সে?

নিজের অসুখের কথা ভুলে পা টিপে-টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে,

ঘর পেরিয়ে এলুম,— নির্ম্মলা নেই।

দেখলুম, বৈঠকখানা থেকে রেখা বাইরে এসে পড়েছে। খুব চোরের মতন দরজার পাশে গিয়ে .....

তীরের মত একটা অচেনা আওয়াজ আমার কাণে এসে লাগ্‌ল। শুনছে,—

তখন বদ্ সঙ্গে মিশেছিলুম বাবা তাই তোমার সঙ্গে আমার চাইলেন না। নির্ম্মল, এখন মদ খাই না বটে, কিন্তু ..."

দিয়ে আমার স্ত্রী বল্‌লে, "ললিত, তুলো না। ছেলেবেলায় আমরা ভাই-বোনের মত একসঙ্গে তেমনি করে আর থাক্‌তে তুমি আমার ভাই, আমি ন।"

স্বর কি অস্বাভাবিক!

—সেই ডাক্তার ললিত, যে এক-স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আমি সন্দেহ করে তাড়িয়ে আমাকে লুকিয়ে তারই সঙ্গে কি কথা হচ্ছে!

দরজার দিকটা একবার দেখে "ললিত, শোন, আমার বেশী সময় টের্ পেলে আর রক্ষে রাখবেন আমাকে এখানে আসবার জন্যে কেন ছি, তা ত জান না?"

বল্‌লে, "না।"

"আমার স্বামীর বড় অসুখ।"

"কি অসুখ?"

নির্ম্মলা অল্পকথায় আমার রোগের বর্ণনা করলে।

ললিত বল্‌লে, "আমাকে কি করতে বল?"

—"ললিত, তুমি ডাক্তার। রোগের যে লক্ষণ বল্‌লুম, তা শুনে তোমার কি মনে হয়? এখানকার পাড়াগেঁয়ে ডাক্তার-কব্‌রেজ সব হাতুড়ে। তাদের বিশ্বাস নেই।"

—"মুখে শুনে কি রোগ-ধরা চলে নির্ম্মল?—রোগী দেখতে হবে।"

—"সে হবে না।"

—"কেন?"

নির্ম্মলা থেমে-থেমে বল্‌লে, "তুমি যে এখানে আস, সেটা উনি পছন্দ করেন না।"

"কেন?"

একটু ইতস্তত করে নির্ম্মলা বল্‌লে, "না, সে আমি বলতে পারব না।"

ললিত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষুব্ধস্বরে বল্‌লে, "থাক্, আর বলতে হবে না, বুঝেছি। কিন্তু রোগী না দেখে এত বড় রোগ ধরা অসম্ভব।"

নির্ম্মলা কাতরস্বরে বল্‌লে, "ললিত, ললিত, তবে আমার কি হবে?"

ললিত বললে, "একটা কথা বলি শোন। তোমার স্বামীর যদি সত্যই যক্ষ্মা হয়ে থাকে, তবে তুমি বাপের বাড়ী যাও।"

—"এ কি কথা ললিত!"

—"হ্যাঁ। অবশ্য, যাবার আগে রোগীর সেবার জন্যে একজন ভাল লোক ঠিক করে যেতে হবে।"

—"সে কি হয়?"

—"হতেই হবে। এ-সব রোগীর কাছে স্ত্রী থাক্‌লে রোগীরই অনিষ্ট!"

নির্ম্মলা কিছুক্ষণ ভেবে বল্‌লে, "ওঁকে যদি জান্‌তে, ললিত! আমাকে উনি এখান থেকে এক-পা নড়তে দেবেন না।—অনেক ক্ষণ হয়ে গেল, আর নয়। আজ আসি।"

আমি পা টিপে-টিপে আবার উপরে উঠলুম। তখনো বৃষ্টি পড়্‌ছিল—জলে আমার কাপড়-চোপড় অল্প-অল্প ভিজে গেল।

নির্ম্মলা ঘরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন আছ?"

কোন জবাব না দিয়ে পাশ ফিরে শুলুম। রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল।

নির্ম্মলা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল,—বোধ হয় ভাবছিল, আমি জবাব দিলুম না কেন!

হঠাৎ কি-দেখে সে আমার পায়ে আর কাপড়-চোপড়ে হাত দিলে। বেশ বুঝলুম, সে চমকে উঠল।

আমি মুখ ফিরিয়ে তার দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম।

নির্ম্মলা আমার দৃষ্টিতে যেন আহত হয়ে দু-পা পিছনে হটে গেল। তারপর উদ্বিগ্ন স্বরে বল্‌লে,—"তুমি—তুমি কি বাইরে গিয়েছিলে?"

যতটা-পারা-যায় গলাটা ভারি করে বললুম,—"হুঁ। তুমি মর। আমিও তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।"

মড়ার মত সাদা মুখে, ঘাড় হেঁট করে নির্ম্মলা ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গে
আমার দিকে আর চাইতেও পারলে

সে কি বুঝ্‌তে পেরেছে, আমার
ধূলো দেওয়া কত শক্ত?

বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগল

আমি ত মরবই! যে রোগে
কথায় বলে, তা 'শিবের অসাধ্য
সংসারের খাতা থেকে আমার নাম
গেল বলে।

আমি ম'লে নির্ম্মলার কি হবে!
কোথা থাকবে—কার কাছে? তার
নেই, মা নেই,—এক ভাই আছে,
গরীব আবার মাতাল। নির্ম্মলার এই
এই রূপ,—সংসারের বিষম পাকচক্রে
সে কি আর আপনাকে সামলাতে পা

তারপর,—ঐ ললিত! নির্ম্মলার
তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল—সে
নির্ম্মলাকে ভুলতে পারে-নি নিশ্চয়।
বেলা থেকে তারা দুজনে দুজনকে
তাদের মধ্যে এখনো একটা ভাল
টান থাকা খুবই স্বাভাবিক।
এখনো তাকে দেখ্‌তে চায়—এর
হাতে-হাতে পেয়েছি।

মাঝখান থেকে তাদের মেলা
বাধা দিচ্ছি—আমি। নির্ম্মলা
সত্যই আমাকে ভালবাসে—না,
কর্ত্তব্যের জন্যে যেটুকু করবার তা
এটা ঠিক জানি না; কিন্তু সে যে
ভয় করে, এ-কথা বেশ বোঝা যায়।

ললিত এখনি পরামর্শ দিচ্ছে,
একলা ফেলে নির্ম্মলা চলে যাক্‌।

কথা শুনত—যদি-না আমাকে ভয়
। আমি বেঁচে থাকতেই এই!

কমলিনী নির্ম্মলার বোন—এক রক্তে
র জন্ম। যতদিন সধবা ছিল, ততদিন
লিনীর নামে ত কিছুই শুনি-নি। বিধবা
কমলিনী বাপের বাড়ী গেল, তারপর
ঘুরতেই শুনলুম, সে কুলত্যাগ করে
ছেড়ে অকূলে ভেসেছে!

কমলিনীর জীবনে যা ঘটেছে, নির্ম্মলার
নেও তা ঘটবে না কেন?—বিশেষ,
লার সামনে আর-এক প্রলোভন আছে;
ত তার বাল্যবন্ধু, ললিতকে এখনো
দেখতে চায়, ললিতের সঙ্গে তার
র কথাও হয়েছিল, ললিত এখনো
য়ে করে-নি। ঐ সুপুরুষ ললিতকে
মি ভয় করি।.....

সে রাত্রে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কেবল নির্ম্মলা
র ললিতকে স্বপ্নে দেখতে লাগলুম।
রবার ঘুম ভেঙ্গে যেতে লাগল। শেষবারে
খলুম,—এই ঘরে, এই বিছানায় বিধবার
শে বসে আছে নির্ম্মলা, আর তার
য়ের তলায় ললিত! দরজার কাছে
মি অসহায়ের মত, ম্লান-কাতর চোখে
দের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।
মি তাদের দেখতে পাচ্ছি—তারা আমায়
খতে পাচ্ছে না। কারণ, আমি তখন
ত; দাঁড়িয়ে আছে,—সে আমার
তাত্মা!

এক-চমকে ঘুম ছুটে গেল। ঘর্ম্মাক্ত
হে, বিছানা থেকে লাফিয়ে মেঝেতে গিয়ে
ড়লুম। জানলার কাছে ছুটে গেলুম।
খনো বৃষ্টি পড়ছিল।

চীৎকার করে বলে উঠলুম, "এ হবে না, এ হবে না! নির্ম্মলা আমার—আমি তাকে ভালবাসি—মরে গিয়েও ভালবাস্‌ব! মরবার আগে আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব নির্ম্মল—নিয়ে যাব, নিয়ে যাব!"

অন্ধকারে হঠাৎ কে আমাকে দুহাতে প্রাণপণে জড়িয়ে ধর্‌লে। আমি বিহ্বলের মত বল্‌লুম,—"কে তুমি?"

—"ওগো, আমি—আমি—"

"—অ্যাঁ নির্ম্মল! শোন, আমি তোমাকে নিয়ে যাব—ছাড়্‌ব না!"

—"কি বল্‌ছ গো—ও কি বল্‌ছ! তোমার কি হয়েছে?"

তখন আমার চমক ভাঙ্গল। মাথাটা ঘুরে উঠ্‌ল—পা টল্‌তে লাগল। কোনরকমে নির্ম্মলার [illegible] মত মাটীর উপরে ধুপ্‌ করে বসে পড়লুম।

ডাক্তার, ডাক্তার, সেই রাত্রে আমার মাথার ভিতরে যে-রকম ভাব এসেছিল, এখনো ফি-বছরের যে-সময়টায় আমি পাগল হয়ে যাই, আমার মাথায় ঠিক তেমনিধারা ভাব আসে!

সে-রাত্রি থেকেই যে আমাকে এই উন্মাদ-রোগ আক্রমণ করে-নি তা কে বল্‌তে পারে?—

তুমি বল্‌তে পার, ডাক্তার?

ওঃ, সে স্বপ্নটা কি বাস্তব! লিখতে-লিখতে এখনো আমার চোখের উপর সেই দৃশ্য আগুনের রেখায় জেগে উঠ্‌ছে আর আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে। মনে হচ্ছে, আমি

বুঝি আবার এখনি পাগল হয়ে যাব! মাগো, এ কি যন্ত্রণা—কি যন্ত্রণা!

দু-চারদিন পরেই বুকে ব্যথা হয়ে নির্ম্মলা ভয়ানক জ্বরে পড়্‌ল। বাড়ীতে আমরা দুটি প্রাণী,—দুজনেই শয্যাশায়ী; কে যে কাকে দেখে তার ঠিক নেই। এ ক'দিন নির্ম্মলা নিজে-থেকে আমার সঙ্গে একটাও কথা বলে-নি। যখনি তাকে দেখেছি, তখনি মনে হয়েছে সে-যেন কি দুর্ভাবনা ভাবছে। আমি ডাক্‌লে বিমর্ষ মুখে আমার কাছে এসে দাঁড়াত, কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে সে অত্যন্ত নীরস একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিত, —যেন নিতান্ত দায়ে পড়েই।

তার এমনধারা ভাবভঙ্গি দেখে, আমার গা যেন জ্বলে যেত। আমি কি তার চক্ষুঃশূল? কেন, এমন-কি দোষে দোষী আমি?—ক্রমেই আমার রাগ বেড়ে উঠ্‌ছিল;—তার এই নির্লিপ্ত অবহেলার ভাব আমার রুগ্ন মাথাটাকে যেন বিগ্‌ড়ে দিচ্ছিল!

কি ভাবছে সে? কেন ভাবছে? কার জন্যে এ ভাবনা? মনে-মনে এমনি নানান্ প্রশ্ন জাগ্‌তে লাগল। সে কি আমাকে ঘৃণা করে? সে কি ললিতের কথা ভাব্‌ছে? আমাকে ছেড়ে পালাতে চায়?

ললিতকে মনে পড়লেই, সেই গুপ্ত-সাক্ষাৎ, সেই ভীষণ স্বপ্নদৃশ্য স্মরণ হয়—আর আমার মাথা যেন আগুনের মত গরম হয়ে ওঠে—আমি যেন পাগল হয়ে যাই।

এমন সময় নির্ম্মলা অসুখে পড়্‌ল। আমাকে যে ডাক্তার দেখ্‌ছিলেন, তিনি তাকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। দু-তিনদিন অসুখ ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌তে লাগল, ডাক্তার পর্য্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন; কিন্তু আমার একটুও ভয় বা ভাবনা হোল না।.....

ডাক্তার! তুমি কি বিশ্বাস কর্‌বে যে, নির্ম্মলার তখন মৃত্যু হলে, আমি খুসি হতুম! হ্যাঁ, সত্যি কথা। আমি মর্‌বই,—তবে সে কেন বাঁচবে? আমাকে স্বার্থপর ভাবছ? না, আমি তা নই। নির্ম্মলাকে আমি ভালবাসি,—প্রাণের মত ভালবাসি। সে ভালবাসার তল নেই, সীমা নেই, অন্ত নেই। কিন্তু বলেছি ত নারীর চঞ্চল মনকে আমি বিশ্বাস করি-না। তার উপর নির্ম্মলার বোন কমলিনী আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমি যদি মরি,—তবে তার নবীন, নধর, পুষ্পিত যৌবন নিয়ে, কুচক্রীর বিষাক্ত নিশ্বাসে নির্ম্মলা কি নির্ম্মল থাক্‌তে পারবে? পারবে না—পারবে না! আর একটা কথা শোন ডাক্তার।

নির্ম্মলা একদিন জ্বরের ঘোরে ভুল বক্‌ছিল। আমি মাঝে-মাঝে রোগশয্যা থেকে উঠে নির্ম্মলাকে দেখে আসতুম। কিন্তু সেদিন গিয়ে কি শুনলুম জান? শুন্‌লুম, নির্ম্মলা সকাতরে বল্‌ছে, "ললিত, সেদিনের কথা ভুলে যাও—তুমি বিয়ে কর, তাহলেই আমি সুখী হব—"তারপর সে চুপিচুপি বিড়্‌বিড়্ করে আরো কি-সব বলতে লাগল, আমি শুনতে পেলুম না। কিন্তু যা শুনেছি তাই শুনেই ঘরের ভিতর

আমার পা উঠ্‌ল না; আচ্ছন্নের মত আপন ঘরে এসে বিছানার উপর পড়ে পড়লুম।

ডাক্তার, রোগের ঘোরেও সে ললিতকে ভোলে-নি! তাই কামনা করছিলুম, নির্ম্মলা মরুক্—আমি মরবার আগে নির্ম্মলা মরুক! রোগে যদি তার মৃত্যু হোত,—তাহলে আজ জীবন শূন্য হয়ে গেলেও হয়ত আমি পাগল হয়ে যেতুম না।.....

আজ দুদিন নির্ম্মলা কতকটা সাম্‌লে উঠেছে; কিন্তু ভয় যায়-নি।

সেদিন বিকালবেলায় তার ঘরে গেলুম। ঢুকেই দেখি, নির্ম্মলা শুয়ে-শুয়ে একখানা চিঠি পড়ছে। চিঠি পড়তে-পড়তে সে এমনি তন্ময় হয়ে উঠেছিল যে, আমার পায়ের শব্দ মোটেই তার কানে ঢুকল না।

যখন একেবারে তার বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন সে মুখ তুলে আমাকে দেখেই চম্‌কে উঠল। তারপর, চিঠিখানা তাড়াতাড়ি কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেল্‌লে।

দেখলুম, তার চোখের কানায়-কানায় জল টলমল করছে। চিঠি পড়্‌তে-পড়্‌তে সে কাঁদছে!—কেন?

কুতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কার চিঠি নির্ম্মল?"

নির্ম্মলার মুখ পাঙ্গাশপানা হয়ে গেল। সে জবাব দিলে না।

আবার জিজ্ঞাসা করলুম, "কার চিঠি?"

নির্ম্মলা নিরুত্তর।

বিরক্তস্বরে আমি বল্লুম, "বলবে-না তাহলে?"

নির্ম্মলা মুখ বুজে পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

আর সইতে পারলুম না। রাগে কাঁপতে-কাঁপতে চড়া গলায় বল্লুম, "নির্ম্মলা, তুমি ঠাউরেচ কি, আমি কি তোমার গোলাম? তুমি লুকিয়ে পরের সঙ্গে দেখা কর্‌বে—জ্বরের ঘোরেও পরপুরুষের নাম করবে—আড়ালে পরের চিঠি পড়বে, আমার বাড়ীতে বসে আমারই কথা মানবে-না শুনবে-না,—আমার অসুখে কি তোমার ফূর্ত্তি বেড়েছে? আমি না-মরতে এই, ম'লে কি করবে? তার চেয়ে তুমিও মর, আমিও মরে জুড়োই!"

নির্ম্মলা পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হয়ে শয্যায় পড়ে রইল।

—"এখনো বল বল্‌ছি, কার চিঠি?"

নারীর এ কি স্পর্দ্ধা—তার এ নীরবতা অসহ্য!—আমার শিরায় শিরায় তপ্ত রক্ত ছুটতে লাগ্‌ল। সামনে একটা জলের কুঁজো ছিল, নিষ্ফল আক্রোশে সেটা তুলে নিয়ে দুম্ করে মেঝেতে আছ্‌ড়ে ফেল্লুম, সেটা সশব্দে ভেঙ্গে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেল; ক-টুক্‌রো ছিট্‌কে নির্ম্মলার গায়ের উপরেও গিয়ে পড়ল—তবু সে পাথরের মত নিসাড়-নিথর হয়ে রইল,—কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করল-না।

কোনমতেই না-পেরে-উঠে ব্যঙ্গের হাসি হেসে শেষটা আমি তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলাম, "বোঝা গেছে, এ সেই লম্পট ললিতের চিঠি। তোমার বোন বিধবা হয়ে কুলত্যাগ করেছে, তোমার বোধ হয় অত দেরিও সইচে-না; স্বামী বেঁচে থাকতেই তুমি

কুলে কালি দিতে চাও! কুলটার বংশে তোমার জন্ম—তুমিও—"

ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত চকিতে সোজা হয়ে নির্ম্মলা দাঁড়িয়ে উঠল—তার মাথার রুক্ষ এলমেল চুলগুলো ক্রুদ্ধ সাপের মত চারিদিকে ঠিক্‌রে-ঠিক্‌রে পড়ল—তার দুই চোখ স্থির বিদ্যুতের মত আমার চোখের উপর জ্বল্‌তে লাগ্‌ল—তার মাথা থেকে পা-পর্য্যন্ত থরথর্ করে কাঁপতে লাগল! কি-যেন সে বল্‌তে চায়—কিন্তু রাগের আবেগে তার কথা কণ্ঠের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে!

অনেক কষ্টে শেষটা সে একনিশ্বাসে দৃপ্তস্বরে বলে উঠল,—"কি! কুলটার বংশে আমার জন্ম—আমি কুলটা!"

নির্ম্মলাকে বরাবর নেতিয়ে-পড়া লজ্জাবতী লতার মত সঙ্কোচে জড়সড় দেখে আস্‌ছি,—আজ তার এ কি মূর্ত্তি—এ কি ভাব!—এ যে কখনো কল্পনাতেও ভাবতে পারি-নি। মুহূর্ত্তে এমন পরিবর্ত্তন কি সম্ভব!

আমি আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না-করে সে ঘর ছেড়ে চলে এলুম।

নিজের ঘরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লুম। মাথার ভিতরে তখন সমস্ত ওলট্-পালট্ হয়ে গিয়েছিল। খানিকক্ষণ হতভম্বের মত চুপচাপ বসে রইলুম।

তারপর, সব ঘটনা মনে-মনে একবার ভেবে নিলুম। নির্ম্মলার সুমুখ থেকে অমন করে পালিয়ে এলুম কেন? আমি কি কাপুরুষ! নির্ম্মলা দোষী হয়েও অনায়াসে আমাকে চোখ রাঙ্গালে—আর, আমি পালিয়ে এসে তার স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিলুম! ছিঃ, ধিক্ আমাকে! পুরুষ হয়ে নারীকে —নিজের স্ত্রীকে ভয়! গলায় দড়ি আমার!

আপনাকে-আপনি বারবার ধিক্কার দিতে লাগ্‌লুম। কিন্তু তাতেও মন উঠল না। আমি যে ভয় পাই-নি, আমি যে স্ত্রৈণ নই, আমি যে ইচ্ছে কর্‌লেই নির্ম্মলাকে পায়ের নীচে থেঁৎলাতে পারি,—এটা তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে, এ-ঘর থেকেই আমি হো-হো করে তাচ্ছল্যের উচ্চহাসি হেসে উঠলুম। ও-ঘর থেকে নির্ম্মলা কি আমার হাসি শুনতে পায়-নি? পেয়েছিল বৈ কি।

সেই চিঠির কথা মনে পড়ল। কার চিঠি? নিশ্চয়ই ললিতের। নৈলে চিঠিখানা অমন করে লুকোত না। পাছে না হলে চিঠি দেখাতে তার অত কিসের? আমার সুকথা-কুকথা কিছুই গ্রাহ্য কর্‌লে-না, চিঠিতে নিশ্চয়ই দুষ্য কথা আছে।

হ্যাঁ—চিঠি পড়তে-পড়তে সে কাঁদছিল আমার কড়াক্কড়িতে তার মনের ইচ্ছে পূর্ণ হচ্ছে না—সেইজন্যেই তার এ কান্না আর-কি! কান্না ত দুর্ব্বলেরই বল!—আর চিঠিখানা যে তার কত মনের মত হয়েছিল তাও বেশ বুঝতে পাচ্ছি। আমার পায়ের শব্দও তার তন্ময়তা ভাঙ্গতে পারে-নি!

ললিত, ললিত, নির্ম্মলা তোমাকে ভাবছিল! তোমাকে যদি এখন হাতে কাছে পাই, তবে নির্ম্মলার সামনে তোমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে, এই হাতে তোমার গলা টিপে ধরে, আস্তে আস্তে —ক্রমে ক্রমে—চেপে চেপে নিশ্বাস বন্ধ করে তোমাকে আমি মেরে ফেলি!

তোমাকে চোখের সামনে মরতে দেখে নির্ম্মলা কেঁদে উঠবে, আর তার কান্নার উত্তরে আমিও আকাশ ফাটিয়ে হেসে উঠব, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!……

হঠাৎ আমার হুঁস হোল—এ কি! বিছানার একটা বালিশ দু-হাতে চেপে ধরে সত্যি-সত্যিই আমি যে বিকটস্বরে হাস্‌ছি! আঁ:,—আমি কি পাগল হলুম—এ আমি করছি কি?

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। বাতাসের সঙ্গে যুঝে কোনই লাভ নেই। একটা কিছু করা চাই!

মরবার আগে আমাকে একটা কিনারা করতে হবেই-হবে। সেদিনের স্বপ্ন আমি এখনো ভুলি-নি। কিছু-না-করে আমি যদি আজ মরি, তবে কাল সেই স্বপ্নই সত্য হবে।

কিন্তু, কি করব—কি কর্‌তে পারি?…

একমনে ভাবতে লাগলুম—তেমন ভাবনা আর-কখনো ভাবি-নি।

ঝী এসে খবর দিলে, ডাক্তার-বাবুর লোক এসেছে। তাকে উপরে আনতে বললুম। যে এল সে ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার।

কম্পাউণ্ডার নির্ম্মলার জন্যে দুটো ওষুধ এনেছিল। সে বল্লে, একটা খাবার, আর-একটা বুকে মালিস করবার।

শিশিদুটো দেখলুম। মালিশের ওষুধের শিশিতে একখানা কাগজে বড়-বড় ইংরেজী হরফে লেখা রয়েছে—"বিষ।"

শিশিটা একমনে দেখতে-দেখতে কম্পাউণ্ডারকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"এ খেলে কি মানুষ মরে?"

—"মরে বৈ কি!"

খানিক ভেবে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "যদি সমস্তটা খায়?"

—"বারো ঘণ্টার মধ্যে মরে যেতে পারে।"

—"আচ্ছা, যাও।"

সেই রাত্রি—কালরাত্রি! ওঃ, কে-যেন ধারাল ছুরি দিয়ে ছেঁদা করে সে রাত্রির সমস্ত অন্ধকার আমার বুকের মধ্যে পুরে দিয়েছে। সে রাত্রি কি ভুলব—ভুলতে কি পারি?

ডাক্তার, সে-রকম রাতও কখনো দেখি-নি,—তেমন ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারও আর-কখনো দেখি-নি! খালি কি অন্ধকার? যেমন ঝুপ্‌ঝুপ্ বৃষ্টি—তেমনি হুহু-হুহু ঝড়! মড়মড় করে বড় বড় গাছের ডালগুলো ভেঙ্গে পড়ছে,—সেইসঙ্গে ক্রমাগত গুড়্‌গুড়্ করে বাজ ডাক্‌ছে আর ডাক্‌ছে! সে রাতে পৃথিবীকে মনে হচ্ছিল, যেন সুধু শব্দের পৃথিবী!

এক-পা এক-পা করে নির্ম্মলার ঘরের দিকে গেলুম। ঘরে ঢুকবা-মাত্র লক্ষ্য করলুম—নির্ম্মলা চুপ করে উপরপানে চেয়ে শুয়েছিল, আমাকে দেখেই চোখ মুদলে। আমার উপর তার এত ঘৃণা! মনে একটু-যে ইতস্তত ভাব ছিল, নির্ম্মলার রকম দেখে তাও ঘুচে গেল।

খাটের পাশে গিয়ে ইচ্ছে করেই নীরস, কর্কশ স্বরে বললুম, "কেমন আছ?"

সে আমার দিকে পিছন ফিরে শুল। আমিও তখন তার ভালমানুষী চাইছিলুম না—সে রাগ করে, তাই তামার ইচ্ছা!

আমি তেমনি স্বরে বললুম, "আমার এই অসুখ শরীর, কখন্ আছি কখন্ নেই, এই দুর্য্যোগে বিছানা ছেড়ে উঠে, আমি এলুম তোমার কাছে—আর, তোমার কিনা এই ব্যবহার! যে রক্তে কমলিনী জন্মেছে, সেই রক্তেই ত তোমার জন্ম! স্বামীকে তুমি ভক্তি কর্‌বে কেন! আমি ত ললিত নই!"

এই কথাগুলো বলব বলে আমি আগে-থাকতে অনেকক্ষণ ধরে মুখস্থ করে রেখে ছিলুম।

নির্ম্মলা বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে, দুহাতে প্রাণপণে মাথার বালিশটা চেপে ধরলে,—যেন সে অনেক—অনেক কষ্টে আপনাকে সামলে নিচ্ছে!

আমি আবার বল্‌লুম, "তুমি অসতী! তোমার মৃত্যুই ভাল!"

নির্ম্মলা শিউরে উঠল।

"শোন, যা বল্‌তে এসেছি। মাথার উপরে যে শিশিটা রইল, ওটা বিষ। খেলেই লোক মরে যায়। ওটা বিষ—ভয়ানক বিষ, বুঝলে?"

কে-এক পণ্ডিত বলেছিলেন, সঙ্গিন মুহূর্ত্তে কারুর মাথায় কোন কু-সঙ্কেত ঢুকিয়ে দিলে সেটা সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। সে-কথা আমি ভুলি-নি। আমি জানি, এইজন্যেই পৃথিবীতে অনেক মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে! এই মুহূর্ত্তে নির্ম্মলার আচ্ছন্ন দুর্ব্বল মস্তিষ্কের যে অবস্থা,—এখন কেমন করে কি ইঙ্গিত দিলে আমার কার্য্যোদ্ধার হবে,—আগে-থাক্‌তে তার প্রত্যেক কথাটি তন্ন-তন্ন করে আমি ভেবে রেখেছিলুম।.....

ঠক্ করে নির্ম্মলার শিয়রে ওষুধ শিশিটা রেখে দিলুম। দেখলুম, শিশি-রাখা শব্দে নির্ম্মলা চম্‌কে উঠ্‌ল।

আস্তে-আস্তে দরজা পর্য্যন্ত এসে, দাঁড়ালুম। তারপর, প্রত্যেক কথাটিতে জোর দিয়ে-দিয়ে কর্কশস্বরে আবার বল্‌লুম, "তুমি মলে আমি বাঁচি। কিন্তু শোন, ওটা খাবার ওষুধ নয়, মারাত্মক বিষ। খেয়োনা যেন—ভয়ানক বিষ—খেলে মর্‌বে!"

নির্ম্মলার ঘর থেকে বেরুতেই,—কে জানি-না, আমার প্রাণে কেমন-একটা আতঙ্ক হোল। ছুট্‌তে-ছুট্‌তে নিজের ঘরে এসে ঢুকে পড়্‌লুম। তাড়াতাড়ি দড়াম্ করে দরজাটা এঁটে বন্ধ করে দিলুম।

ঘরের এককোণে জবুথবু হয়ে বসে বসে কাঁপছি আর কাঁপছি। এত কাঁপুনি কেনরে বাপু—শীত নেই, গা কাঁপে কেন? ভয়ে? ইঃ, ভয়টা কিসের—আমি কি কাপুরুষ? যার মরবার ভয় নেই, যে মরবে নিশ্চয়, যে মরতে প্রস্তুত, তার আবার কিসের ভয়—কাকে ডরায় সে! কিন্তু গা কেন তবু কাঁপে, বুকের কাছটা থেকে-থেকে কেন দুদ্দুড় করে ওঠে?

ওকে—কে ও!—ঐ যে নড়্‌ছে, আমার পাশে-পাশে—নীরবে, নীরবে!—একলাফে দাঁড়িয়ে উঠলুম—সেও যে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল! হাঃ হাঃ, আরে দ্যুৎ! এ যে আমারি ছায়া! দাও পিদিমটা নিবিয়ে,—ছায়া আর পড়্‌বে না!

উঃ, কি অন্ধকার—কি অন্ধকার! এত

কারও পৃথিবীতে ছিল? এ কি পৃথিবীর কার,— না, নরকের? অন্ধকার যেন ছে ফির্‌ছে, এগিয়ে আস্‌ছে, পিছিয়ে ছে, জমাট হচ্ছে, তাল পাকাচ্ছে! ঐ শোঁ-শোঁ করে ঘরের মধ্যে কি এসে ক পড়ল, ও কি ঝড়ের হাঁক, না কারের দীর্ঘনিশ্বাস?

চুপ্—চুপ্! ঐ শোন, অন্ধকারে কে-ন যন্ত্রণায় কাত্‌রে কাত্‌রে কেঁদে উঠছে ? ঐযে—ঐযে! মাটীতে কাণ পেতে শোন—ও কান্না ঠিক তোমার বুকে এসে াগছে না কি? কে-যেন বলছে না কি ওগো বুক গেল গো—ওগো বুক—উহু-হু?"—হ্যাঁ, বলছে ত—বলছে ত! কৈ, —কেউ ত কাঁদছে না—হ্যাঁ, কাঁদছে বৈকি,—না, না, কাঁদছে না—ও তোমার ভ্রম! না—দেখে আসি, সত্যি হোক্ মিথ্যে হোক্—একবার দেখে আসি। এমন করে জড়ের মত এই অন্ধকারে হাত-পা গুটিয়ে কি বসে থাকা যায়?

এলমেল কতরকম ভাবনাই যে মাথার মধ্যে এল-গেল—কে তার ঠিক্ রাখে?

আস্তে-আস্তে একবার উঠে দরজার কাছে এগিয়ে গেলুম। দরজায় হাত দিতে-না-দিতে সমস্ত ঘরখানা বিদ্যুতের তীব্র আলোয় দপ্ করে একবার জ্বলে উঠল। তারপর—বজ্রের সে কি ভয়ানক শব্দ! সে শব্দে বাড়ীখানার ভিত্-পর্য্যন্ত যেন টল্‌মল্ করে নড়ে উঠল—সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়ের একটা প্রচণ্ড ঝাপটা দুম্‌দুম্ করে জানলাদুটো বন্ধ করে দিলে! কেমন-একটা ভয়ে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল—আমার পিছনে-পিছনে, আমার সামনে-সামনে, আমার আশে-পাশে—যেদিকে চাই সেইদিকে, যে দিকে যাই সেইদিকে— আকাশে বাতাসে, ঝড়ে বৃষ্টিতে, বিদ্যুতের আলোয় অন্ধকারের ভিতরে— কি-একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক যেন শূন্য-মূর্ত্তিতে ফুটে উঠছে, ওৎ পেতে, প্রকাণ্ড হাঁ করে আমাকে গোগ্রাসে গিলে ফেল্‌তে চেষ্টা করছে;—খানিক হামাগুড়ি দিয়ে, খানিক দেয়াল হাত্‌ড়ে-হাত্‌ড়ে টল্‌তে-টল্‌তে পিছিয়ে এসে আমি বিছানার উপর এলিয়ে ধপাস্ করে পড়ে গেলুম।

সত্যিসত্যি মনে হোল, পাশের ঘরে কে যেন কাঁদছে, কে-যেন যন্ত্রণায় ছটফট কর্‌ছে! সে কি কান্না—সে কি ছটফটানি! থেকে-থেকে আমি আঁৎকে আঁৎকে উঠতে লাগলুম! নিজের দেহকে যতটা পারি গুটিয়ে নিয়ে বিছানার চাদরখানায় সর্ব্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে, কুণ্ডলী পাকিয়ে বালিশে মুখ গুঁজড়ে পড়ে রৈলুম, দু-হাতে প্রাণপণে দু-কান চেপে ধরলুম, তবু সে কান্না থাম্‌ল না—থাম্‌ল না আমি বিকৃতস্বরে চীৎকার করে উঠলুম,—"নির্ম্মল, নির্ম্মল! কেঁদনা—আর কেঁদনা--সত্যি বলছি, তোমাকে ভালবাসি—তোমাকে ভালবাসি—তোমাকে ছেড়ে আমি থাক্‌তে পারব না—আমি ত মরবই—আজ না-হয় দুদিন পরে,—তাই তোমাকে—তাই তোমাকে—"

নাঃ! তবু ত কান্না থামে না—একি সর্ব্বনেশে কান্না গো!

আর সহ্য করতে পারলুম না—ধড়মড় করে উঠে ছুটে গিয়ে জানলা খুলে দিলুম। বাইরে মুখ বাড়াতেই ঝড়ের

অট্টহাস্যে সে-কান্নার শব্দ কোথায় মিলিয়ে গেল—ঝর্‌ঝর্ বৃষ্টির স্নিগ্ধ-শীতল জলধারায় আমার উত্তপ্ত শিরে যেন কার শান্ত আশীর্ব্বাদ এসে পড়ল।

সেইভাবে চোখ মুদে দাঁড়িয়ে রইলুম—কতক্ষণ, কে-জানে! যখন চোখ চাইলুম, তখন প্রাতঃসন্ধ্যার কোমল ছায়ালোকে নিদ্রোত্থিত পৃথিবী-পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কালকের রাতের ঘটনা স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগল। কিন্তু, সে স্বপ্ন কি কঠোর সত্য!

আমার দেহ রুগ্ন বটে, কিন্তু মনের উত্তেজনায় রোগের কোন লক্ষণ বুঝতে পাচ্ছিলুম না। এককথাই একশোবার মনে হচ্ছিল, নির্ম্মলা কি আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছে? সে কি সেই শিশির ওষুধ……

দু-তিনবার ঘর থেকে বেরুতে গেলুম,—কিন্তু পা উঠল না। কে জানে গিয়ে কি দেখব?…… তাই যদি সত্যিসত্যিই ঘটে থাকে, তবে সে দৃশ্য প্রাণ ধরে দেখতে পারব কি? সেই চিকণ রেশমী চুল,—ঘাড়ের উপর কপালের উপর যা এঁকে-বেঁকে কুঁকড়ে থাকত, সেই দুটি বড়-বড় টানা-টানা চোখ,—আমার চুম্বনে যারা আবেশে কাঁপতে-কাঁপতে পদ্মকোরকের মত মুদে থাকত, সেই দুটি কপোল—আমার স্পর্শে যাতে ধীরে-ধীরে গোলাপের রং ফুটে উঠ্‌ত,—সেই রূপের কুসুম যদি স্বর্গচ্যুত পারিজাতের মত পরিম্লান হয়ে গিয়ে থাকে—আমি কি তবে তা দেখতে পারব—পাষাণে বুক বেঁধে, শুষ্কনেত্রে, স্থিরভাবে?

কিন্তু, দেখতেই হবে—দেখতেই হবে। আমার এ লক্ষ্মীশূন্য সংসারে আমাকে আর বেশীদিন জ্বালা পোহাতে হবে না। আমি আর কতদিন? তবে—ভয় কি?

ঝী-বামুন তখনো আসে-নি, কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। আমার বাড়ীখানা যেন প্রেতপুরীর মত ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধ হয়ে আছে! সাহসে ভর করে নির্ম্মলার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম।

প্রথমেই চোখ পড়ল খাটের উপরকার তাকের দিকে। মালিশের শিশিটা সেখানে নেই!

খুব-জোরে দরজায় ঠেশ-দিয়ে দাঁড়ালুম—নইলে মাথা ঘুরে পড়ে যেতুম। বুকের ভিতরটা দুপদুপ করছিল—সে দুপদুপুনি বন্ধ করতে দু-হাতে বুকের কাছটা চেপে ধরলুম—কিন্তু সে আওয়াজ থাম্‌ল না।

বিছানার চাদরে মাথা থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢেকে, মেঝের উপরে স্থির হয়ে শুয়ে আছে—কে সে?—নির্ম্মলা! তার আর কিছু দেখতে পেলুম না—কেবল পা-দুখানি ছাড়া। ওঃ! এই কি সেই নির্ম্মলার পা? রক্তহীন—কালিমালিপ্ত—আড়ষ্ট,—আঙুলগুলো সামনের দিকে বেঁকে-বেঁকে দুম্‌ড়ে পড়েছে!

প্রাণ শিউরে উঠল—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠক-ঠক্ করে কাঁপতে লাগলুম।

যা দেখেছি, যথেষ্ট! চাদর খুলে ও মুখ কে দেখবে?—আমি? পারব-না—পারব-না! এত ভয়ানক,—মৃত্যু?—কে জানত!

মেঝের উপরে একখানা কাগজ পড়ে রয়েছে না? হ্যাঁ—নিশ্চয় সেই চিঠি! এ

ঠি এতক্ষণ প্রাণপণে যে আগ্‌লে ছিল, এখন কোথায়? তার প্রেতাত্মা কি রের একপাশে মলিনমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খনো আমার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করছে? ভয়ে-ভয়ে গুড়ি মেরে এক-পা এক-পা রে এগিয়ে চিঠিখানা তুলে নিলুম। ও কি ! নির্ম্মলার গায়ের চাদরখানা নড়ে কন? আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, াথার চুলগুলো যেন মাথার উপর খাড়া য়ে উঠল: বিস্ফারিত নেত্রে স্পষ্ট দেখলুম, চাদরের একপাশ জোরে জোরে ড়ছে—ভিতর থেকে কি-যেন ঠেলে-ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে!

বিকটস্বরে চীৎকার করে উঠলাম—চাদরের ভিতর থেকে নির্ম্মলার পোষা বেড়ালটা বেরিয়ে এসেই একছুটে পালিয়ে গেল। আঃ—রক্ষা পাই! কিন্তু, তবু আমার ভয় ঘুচল না—বেড়ালটার সঙ্গেসঙ্গে আমিও একদৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম।……

নিজের ঘরে এসে অনেকক্ষণ পরে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হোল। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, এক গেলাস জল খেলুম। খানিকক্ষণ ঘরের মেঝেতে পাইচারি করলুম। তারপর, সেই চিঠিতে কি আছে, তাই জানবার আগ্রহ হোল।

চিঠিখানা চোখের সামনে ধরলুম। প্রথমেই হাতের লেখা দেখে মন চম্‌কে উঠ্‌ল। এ কি, এ ত পুরুষের লেখা নয়!

"শ্রীচরণেষু,

দিদি, বড় লজ্জায়, মুখ পুড়িয়ে তোমাকে এই চিঠি লিখ্‌ছি। সংসারে তুমি বৈ এ

পোড়ারমুখীর আপন-বল্‌তে আর কে আছে? দিদি, যার কথায় ভুলে ধর্ম্ম ছেড়েছি, কুলে কালি দিয়েছি, সে এখন আমায় পথে বসিয়ে কোথায় পালিয়েছে। আমি এখন খেতে পাচ্ছি না, এ-সময় তুমি যদি কিছু দাও, তবেই প্রাণে বাঁচব। আর কি লিখ্‌ব। উপরে ঠিকানা দিলুম।

অভাগিনী কমলিনী।"

চিঠি পড়ে বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম।

কমলিনীর পত্র! নির্ম্মলা তাই আমাকে এ চিঠি দেখায়-নি! তাই সে কাঁদছিল! আর আমি—আর আমি—

এতক্ষণ স্থির হয়ে ছিলুম, আর পারলুম না। মেঝেতে কপাল ঠুক্‌তে-ঠুক্‌তে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলুম।

ডাক্তার! এই আমার কথা। আমি যে কি পাষণ্ড, তা কি বুঝতে পারছ? আমার মতন আশ্চর্য্য ও অস্বাভাবিক মানুষ তুমি কি আর-কখনো দেখেছ?

কিন্তু সবুর কর, এখনো একটু বাকি আছে। সে ঘটনার পরের কথা আমি তোমাকে কিছুতেই বল্‌তে পারব-না; সুতরাং কি ফল সে বিফল চেষ্টায়? তবে, আমার নিজের কথাই আরো-কিছু বল্‌ব। মাঝখানে বাদ দেওয়াতে যদি কোথাও খাপ্‌ছাড়া বোধ হয়, তবে সেটুকু তুমি নিজেই পূরিয়ে নিও।……

আমি শ্মশানে যাই-নি—যেতে পারি-নি। গাঁয়ের লোকেরাই এসে নির্ম্মলাকে শ্মশানে নিয়ে গেল। তারা জানলে, নির্ম্মলা ভুল

করে মালিশের ওষুধটা খেয়ে ফেলাতে, এই বিপত্তি ঘটেছে। নির্ম্মলা মরে গিয়েও নাকি শিশিটা হাত থেকে ছাড়ে-নি, সেটা তার মুঠোর মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল। আহা, ছাড়বে কেন,—সেই শিশিই যে তাকে আমার কবল থেকে মুক্তি দিয়েছে!.....

খবর পেয়ে ললিতও এসেছিল। নির্ম্মলার ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এল, সে তখন কাঁদছিল। তার উপর আর আমার রাগ ছিল না। তার কান্নায় আমারও কান্না এল।

আমি কাঁদছি দেখে চোখের জল মুছে সে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

আমি বল্‌লুম," ললিতবাবু শুনেছি আপনি মস্ত ডাক্তার। একটা কথা রাখবেন কি ?"

—"বলুন।"

—"আপনি ঠিক বল্‌বেন--লুকোবেন না ?"

—"কি কথা আগে শুনি।"

—"আমার যক্ষ্মা হয়েছে, জানেন ত ?"

—"শুনেছি বটে।"

—"হ্যাঁ, আমার যক্ষ্মা হয়েছে। আপনি আমাকে একবার পরীক্ষা করে ঠিক বলুন দেখি, কতশীঘ্র আমি মরব। আপনার পায়ে পড়্‌ছি, কিছু লুকোবেন না। মরণে আমার ভয় নেই।"

ললিত একটু কুণ্ঠিত হয়ে বল্‌লে, "মাপ করবেন—এতে পায়ে-পড়াপড়ির কি আছে ? আপনি যখন জানতে চাইছেন, তখন কিছুই লুকোবো না।"

ললিত খুব মন দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নানারূপে আমাকে পরীক্ষা কর্‌লে। তার-পর বললে, "আমার যতদূর বিদ্যা, তাতে বল্‌তে পারি, আপনার একেবারেই যক্ষ্মারোগ হয়-নি।"

—"অ্যাঁ, ঠিক বলছেন ?"

—"হ্যাঁ।"

আমি দুহাতে ললিতের হাত জড়িয়ে ধরে কাতরস্বরে বল্‌লুম, – "বলুন—বলুন, লুকোবেন না। আমার যক্ষ্মা হয়-নি, বলেন কি ?"

আমার রকম দেখে ললিত আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে,—"আমি ঠিক বল্‌ছি, কিছু লুকোই-নি। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন।".....

আমার নির্ম্মল!—আমার নির্ম্মল!—এই আলোয়-ভরা পৃথিবী আমার চোখে একলহমায় আঁধার-ঢাকা হয়ে গেল! দু-চোখ মুদে যেন দেখলুম, সেই গভীর অন্ধকার ভেদ করে বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল একখানি মুখ জেগে উঠ্‌ল—চোখে সেই মধুর লজ্জা, ঠোঁটে সেই মৃদু হাসি, মুখে সেই স্বর্গের শ্রী—সে যে তারই মুখ! চকিতে সে মুখ কোথায় লুকিয়ে গেল,—তারপরেই আবার ও কি জেগে উঠল!—ও সেই পা-দুখানা,—সেই আড়ষ্ট, রক্তহীন, আঙ্গুল-দুম্‌ড়ানো পা-দুখানা!

ভয়বিভোর চোখে সেই বিকৃত পা-দুখানা দেখতে দেখতে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম.....

যখন জ্ঞান হোল—দেখলুম, স্মৃতির শ্মশানে আমি পরিত্যক্ত, উন্মত্ত, জীবন্মৃত! ডাক্তার! না, আর থাক্—"

* * * * *

এই অপূর্ব্ব পাগলের বিচিত্র কাহিনী পড়া সাঙ্গ হইল। মনটা কেমন ভারগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া

লিলাম, "চল, চল, তোমার এ গারদ থেকে বেরিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি!"

শচীশের সঙ্গে বাহিরে আসিলাম। ফটকের দিকে যাইতে-যাইতে পথে সেই পাগলের ঘর পড়িল।

সেদিকে তাকাইতেই দেখি, আকাশের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া সেই পাগল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পাণ্ডুর মুখে সূর্য্যের কিরণ লাগাতে গালের উঁচু-উঁচু হাড়দুখানা যেন আরও-বেশী বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

হঠাৎ শচীশকে দেখিয়া পাগল ডাকিল, "ডাক্তার, ডাক্তার!"

শচীশ তার কাছে গেল।

হাতটা বাড়াইয়া দিয়া পাগল কহিল, "হাতটা দেখুন ত একবার!"

শচীশ তার হাত ও বুক পরীক্ষা করিয়া বলিল, "তাইত, আপনার যে যক্ষ্মা হয়েছে!"

ম্লান হাসি হাসিয়া পাগল বলিল, "আঃ, বাঁচলুম!"

শচীশ আমার কাছে আসিয়া নিম্ন স্বরে বলিল, "যখন ভাল থাকে, তখনো এর এই পাগলামি-টুকু ঘোচে না।"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

নিষ্ফল

মনের মাঝে বীজ বুনেছি
চোখের জলে সরস করি তাই,
আ-গাছা তার ঘুচিয়ে দিতে
দুখের ফলা উজল রাখি, ভাই।
পঙ্গপালের আনাগোনা,
কোন্ কালে যে ফল্‌বে সোনা,
ভালবাসার সার দিয়াছি
একটি কণার ভর্সা তবু নাই।
ষোল-আনার মালিক নহি,
অনেক ধারি মহাজনের ঠাঁই,
জমার চেয়ে খরচ বেশী,
নেইক পুঁজি, দিন আনি দিন খাই।

শূন্য মরাই পাতার কুঁড়ে
প্রলয় ঝড়ে যায় রে উড়ে,
না পাকিতেই সবুজ ফসল
পাগল হয়ে' ক্ষেতের পানে চাই।
হায় রে আমার সাধের ফসল
ডুবিয়ে দিলে মরীচিকার জল,—
আজনমের সোনার স্বপন
বজ্র-শিখায় কর্‌ছে ঝলমল।
কোথায় ছুটি আঁধার রাতে!
প্রলোভনের আলেয়াতে
মণির মত ঝল্‌সে' আঁখি
সারা-জীবন কর্‌লে অ-সফল!

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিদিমার শক্তি

শরতের এক নির্জ্জন সন্ধ্যায় স্বামী-স্ত্রীতে দাওয়ায় বসে পরামর্শ হচ্ছিল।.....

গ্রামের এরা বহুদিনের প্রাচীন বাসিন্দা। বয়সেও তাদের জুড়ি এখন বড়-কেউ নেই। গ্রামের উপর দিয়ে আধিব্যাধির যে-সমস্ত ঝড়ঝাপ্‌টা চলে গেছে, তাতে কত বড়-বড় ঘর, ছেলে-বুড়ো-সমেত, ধূলিসাৎ হয়ে শ্মশান হয়ে গেল; কিন্তু এই ক্ষুদ্র কুটীরের এই দুটি প্রাণী যে কেমন-করে এত-সব ফাঁড়া উৎরে টিঁকে গেছে তা বলা যায় না। এদের যারা দোসর ছিল, বন্ধু ছিল, তারা কেউ এখন নেই;—এখন সব নতুন মানুষ—নতুন চেহারা, নতুন মুখ।

দুজনেই এরা এই গ্রামের। রত্ন-মঞ্জরীর সঙ্গে শ্যামাচরণের যখন বিবাহ হয়—উঃ সে কতদিনের কথা! সেই অবধি রত্ন স্বামীর এই ঘরটিতেই আছে। একে-একে তার বাপ-মা, ভাই-বোন, শ্বশুর-শাশুড়ী সবাই চলে গেল;—রইল কেবল সে আর তার স্বামী। আটবছর বয়সে এই ঘরে সে প্রথম এসেছিল; আর তাকে নড়তে হয়নি। এখানকার মাটির প্রত্যেক কণাটির সঙ্গে তার চেনা-পরিচয় হয়ে গেছে। তার চোখের সাম্‌নে কত গাছ বুড়ো হয়ে মরে পড়ল, কত পুকুর শুকিয়ে মাঠ হয়ে গেল, কত ঘর ভেঙে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে গেল;—তার সব-খবর সে জানে, তার সব-কথা তার বুকের ভিতরে পোরা আছে।

এক একসময় এখন তার পথ-চলতে ধাঁ লাগে;—হঠাৎ মনে হয়, এ যেন নতু জায়গা। ঐ শিব-মন্দিরের বাঁকের কাছ দিয়ে যাবার সময় তার মনে হয় তালপুকু একবার পা-টা ধুয়ে নি—কিন্তু কোথায় সে সারিসারি তালগাছের বন—আর কোথায় জ তলে সেই কালো জলের আরসি! শি মন্দিরটা এখনো খাড়া আছে বটে কি ঘনগাছের ছায়ার অন্ধকারে সেটাকে ম হয় যেন একটা প্রকাণ্ড প্রেত আকাশে গায়ে অশথডালের হাত-ছড়িয়ে বুক-চিতি দাঁড়িয়ে আছে। বিয়ের পরদিন তারা বর কনে এসে এই মন্দিরে ঠাকুরপ্রণামী দিয়ে ছিল—প্রদক্ষিণ করবার সময় তাদের গাঁ ছড়াটা একটা ত্রিশূলের খোঁচায় আটকে গিয়েছিল—সেকথা এখনো তার মনে আছে; কিন্তু সে ত্রিশূলের আর চিহ্নমাত্র নেই। ঐ-মন্দিরের পাশেই ছিল তার সখীর বাড়ি। দুই সখীতে মিলে কতদিন তারা দুপুরবেলা ঐ তালপুকুরে ঝাঁপাই ছুঁড়েছে, তাই নিয়ে শাশুড়ির কাছে কত বকুনি, কিন্তু তার জন্যে খেলা কখনো বন্ধ যায়নি। সখীর স্বামী যেদিন সখীকে নিয়ে গেল সেদিন দুইসখীতে মিলে কী কান্না! সে সখী আজ কোথায়? এখন কেবল এক একসময় মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ মনে হয় কে যেন ঐ নারকোল গাছটার পিছন থেকে লুকিয়ে হাওয়ার সুরে ডেকে উঠল—"সই-ই!"

মানুষ ত গ্রামে এখনো অনেক—কিন্ত



একলার খেলা
শ্রীমুকুলচন্দ্র দে অঙ্কিত

নের মতন মানুষ আর কৈ! রত্নর বলই মনে হয় যারা গেল তাদের মতন ত র কেউ ফিরে এল না। গ্রামের ছোকরা-র সঙ্গে মিলে তার স্বামী যে পাঁচালির ল খুলেছিল, তাদের প্রত্যেককে এখনো মনে ড়ে। এই দাওয়ায় বসে সে কী হল্লা! ভালো াবার জিনিষটি ঘরে থাকবার যো ছিল না;— দ পেলেই হাঁড়িকুঁড়ি ভেঙে, ভাঁড়ার লুঠ রে তারা একাকার করত। স্বামী মুখ-টিপে-টিপে হাসতে থাকত। তাই দেখে তখন ারি রাগ হত বটে কিন্তু এখন সে-সব কথা মনে করতেও আহ্লাদ হয়। ঘরের রজা ভেজিয়ে একটু ফাঁক রেখে, সে রোজ সন্ধ্যাবেলা পাঁচালির গান শুনতে বসত। তাদের হাত-মুখ-নাড়া দেখে তার কখনো কখনো হাসি পেত, আবার কখনো-কখনো গানের কথায়. সুরের টানে, তার চোখের পাতা ভিজে আসত। সব-চেয়ে তার খারাপ লাগত ঐ সবাইকে তামাক জোগানো। তার ঘরের দিকে চেয়ে থেকে-থেকে চীৎকার উঠত —"ওগো তামাক!" অমনি তাকে উঠে গিয়ে তামাক সাজতে বসতে হত। তখন মনে হত—বাবা! এত তামাকও খেতে পারে! এম্নি করে ঘড়িক-ঘড়িক তামাক সেজে তার হাত হেজে যাবার যো হয়েছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে, তামাকের ধোঁয়ায়, গানের সুরে, বাজনার ঝমাঝমে, ঘরের বাতাস এমনি ঘুলিয়ে উঠত যেন চোখে নেশা লাগত। তারপর এক একদিন পাঁচালি গাইতে তার স্বামী যখন তাকে একলাটি ফেলে চলে যেত, তার এমনি রাগ হত যে সে মনে-মনে বলত, এই যে ঘরে খিল দিলুম—কিছুতেই আর খুলচি না। এখন আর গ্রামে পাঁচালির দল নেই; —ভিন্ গাঁ থেকে মাঝেমাঝে যাত্রার দল, পাঁচালির দল আসে বটে, কিন্তু তেমনতর আর জমে না। চন্দ্রকান্ত কি নিধের মতন গাইতে পারে তেমন লোক কৈ!

আর সেই ভুঁড়িদার দাদামশাই গিয়ে অবধি ত গ্রামের হাসি চলে গেছে। তাঁর চেহারা দেখেই হাসি চাপা শক্ত, তার উপরে তিনি যখন নাতনী, নাত-বউদের সাম্নে দাঁড়িয়ে গা-দুলিয়ে-দুলিয়ে কথা বল্‌তেন তখন গাঁয়ের বউ-ঝিরা মাটিতে লুটোপুটি খেত। এখনকার ছেলেমেয়েরা হাসে বটে কিন্তু কেন যে হাসে রত্ন তা বুঝতেই পারেনা! সে বলে—ওমা, ও কি হাসি! আমাদের হাসিতে তিনদিন বুকে ব্যথা থাকত।

আর-একজন ছিলেন, তিনি রায়মশায়। তাঁকে দেখলে গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপত। পায়ে খড়ম, খালি গা, থান ধুতি, সাদা ধব্‌ধবে পৈতে গলায় তিনি যখন বেড়াতেন তখন তাঁর সামনে যাবার কারো সাহস হত না। তাঁর চোখের দিকে চায় কার সাধ্যি! সে কট্‌মটে চাহনিতে ছোটো ছেলেরা আঁতকে কেঁদে উঠত। রাগ ছিল তাঁর দুর্ব্বাসার মতন। শাপমন্নির ভয়ে কেউ তাঁকে চটাত না। তিনি খট্‌খট্-শব্দে সামনে দিয়ে চলে যেতেন, সবাই তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত—তিনি হাত-তুলে আশীর্ব্বাদ করতে থাকতেন। গাঁয়ের ছেলেগুলো এখন আর কাউকে ভয় করেনা—সব যেন

ধিঙ্গী! আর ভয়ই বা করবে কাকে? রায়মশায়ের মতন তেজস্বী লোক কোথায়!

এখনকার ছেলে-মেয়েরা কি-ছাই আমোদ-আহ্লাদই করতে জানে! তাদের কালে গ্রামে বিয়ে-থার সময়, পালপার্ব্বণে যে হৈ-হৈ রৈ-রৈ চলত, লোকে বুঝত যে হাঁ, একটা-কিছু হচ্ছে বটে! এখন সব ফুস্‌ফাস করে কোথা-দিয়ে কখন্ যে কি হয়ে যায় কেউ টেরও পায়না। এসব বিষয়ে কোনো কথা বলতে গেলে লোকে বলে—"দিদিমা, ও-সব তোমাদের সেকেলে!"

সে দিন পাড়ার এক বাসর-ঘরে রত্ন ঢুকতেই সকলকার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। রত্ন বল্লে—"ওমা তোরা সব বাসর-ঘরে মুখ গোমড়া করে বসে আছিস কেন লো? আমোদ-আহ্লাদ কর্‌না!" সবাই চুপ—কেবল হরিদাসী বলে উঠল—"দিদিমা তুমি থাকলে আমাদের আমোদ হবেনা।" রত্ন খতমত খেয়ে বেরিয়ে এল। আর-একদিন পাড়ার মেয়েরা সব শিবতলার মেলা দেখতে যাচ্ছিল; দিদিমাকে দেখে তাদের মধ্যে কানাকানি চলতে লাগল, শেষে একজন বল্লে—"দিদিমা তুমি একটু এগোও না বাছা!"

এমনিতর প্রায়ই হয়। কেউ তাকে চায় না। সে যা বলে, যা করে, কারুর তা আর মনের মতন হয় না। রত্ন বলে, তাকে নইলে আগে গ্রামের কোনো কাজই হত না। কিন্তু এখন হল কি? —কোথাও তার ডাকই পড়েনা। লোকে কেবল বলে—দিদিমা তুমি পরকালের চিন্তায় মন দাও—দিন যে হয়ে এল।

তা ঠিক বটে!.....

আজ ক-দিন থেকে শক্তির জন্যে রত্নর মন-কেমন করচে। শক্তি তার নাতনী এই মেয়েটিকে এক-মাসেরটি রেখে মা মারা যায়; সেই থেকে সে এই দাদা দিদির কাছেই মানুষ। বারোবচ্ছর এই নাতনীটিকে রত্ন কোলেপিঠে করে বেড়িয়েছে; আজ তিনবছর হল বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। কিন্তু নিশ্চিন্ত কি ঠিক হতে পেরেছে? তার ভাবনা ত এখনো মনে লেগেই আছে। উঠতে-বসতে তারই কথা কেবল মনে পড়ে। কেবলই মনে হয়—আজ শক্তি থাকলে গাছের এই আমটি খেত, এই ফুলটি নিত; পুকুরের মাছ এতগুলো নষ্ট হল—খাবার লোক কৈ? ইত্যাদি ইত্যাদি। গাঁয়ের মধ্যে কোথাও উৎসবের বাজনা বেজে উঠলে রত্নর মন-কেমন করে ওঠে—আহা, শক্তি আজ নেই, থাকলে সে কত আমোদ করত। প্রতিবছর পূজোর সময় তাকে একবার আনবার ইচ্ছে হয় কিন্তু এ পর্য্যন্ত হয়ে ওঠেনি। এই তিন বচ্ছরের মধ্যে সে একটিবারও আসেনি। রত্নর এবার কেবল মনে হচ্ছে—কবে মরে যাব ঠিক নেই, একবার শক্তিকে দেখে নিই। তাই সে রোজ স্বামীকে বলচে, ওগো শক্তিকে একবার আনো। আজও সেই কথাই হচ্ছিল।

শ্যামাচরণ কিন্তু ঘাড় নাড়ছিল বলছিল, শক্তি শ্বশুরবাড়ি আছে—বেশ আছে। এই বুড়োবুড়ির কাছে কি তার মন টিঁকবে?

ই পূজোর সময় সেখানে তার কত মোদ!

রত্নর সে-কথা মনে লাগছিল না; সে লছিল, ওগো তা নয়, শক্তি আমার তেমন য়।

পরামর্শ করে ঠিক হল শক্তিকে একখানা ঠি পাঠানো যাক। কিন্তু চিঠি কে লেখে? শ্যামাচরণ একটু-আধটু লিখতে জানে বটে কিন্তু এখন তার কলম ধরবার শক্তি নেই;—হাত এত কাঁপে যে লিখতে গেলে কেবল হিজিবিজি হয়। হরিদাসীর ভাই হরিচরণ ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে পড়ে, সে বাংলা খুব ভালো লিখতে পারে বলে গ্রামের মধ্যে তার ভারি সুখ্যাতি। তাকে ধরে-করে আনলে হয় না? রত্ন বল্লে, কাল সকালেই তাকে ধরে আনছি।

বেশী সাধ্য-সাধনা করতে হল না—হরিদাস অল্পেই রাজী হল। গ্রামের সবাই যে তাকে চিঠি-লিখতে ডাকে এতে মনের মধ্যে তার ভারি গর্ব্ব ছিল। নিজের দাম বাড়াবার জন্যে প্রথমটা সে একটু-আধটু আপত্তি দেখাত বটে কিন্তু তার জোর বেশীক্ষণ থাকত না।

পরের দিন সকালে হরিদাস নিজেই কাগজ, কলম, কালি নিয়ে হাজির হল। বল্লে—"দিদিমা কি লিখতে হবে বল?"

রত্নর কত কথাই মনে পড়তে লাগল;—সে একরাশ কথা। সমস্ত কথাগুলো তার মাথার মধ্যে একসঙ্গে ঘুরপাক খেতে লাগল। শক্তিকে এতদিন না দেখে তার মনটা যে কি হচ্ছে, সে যে কি;—কি-কথা বল্লে সেটা বলা হয়, সে তা কিছুতেই ঠিক করতে পারলে না;—কতকগুলো ভাবের আবছায়া কেবল তার মনের মধ্যে পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠতে লাগল।

দেরী দেখে হরিদাস বলে উঠল—"কি লিখতে হবে চট করে বল দিদিমা।"

রত্ন থতমত খেয়ে বলে উঠল—"এই পূজো আসছে—"

হরিদাস বল্লে,—"ওঃ!"

এই বলে, আর-কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে, সে ঘাড় গুঁজে লেখা সুরু করলে। খস্‌খস্-শব্দে কলম চলতে লাগল। যখন একপাতা ভর্ত্তি হয়ে এসেছে, সে কলম থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"দিদিমা, আর কি লিখব?"

দিদিমা এতক্ষণ যেন শক্তির স্বপ্নে ভোর হয়ে ছিল। সে শক্তিকে কি-কি বলবে তাই মনে-মনে তোলাপাড়া করছিল, —কত কথাই মনে উঠছিল। সুখময়ীর বিয়ে হয়ে গেছে, মুখুয্যেদের বাড়ির শ্রাদ্ধে এবার ভারি ধূম হয়েছে, বড় কাঁঠাল গাছটা ঝড়ে পড়ে গেছে—এমনিতর কত খবর শক্তিকে দেবার আছে। সে মনে মনে সব গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল, এমন-সময় হরিদাসের ডাকে তার চমক ভাঙল।

সে বল্লে—"কি লিখলে ভাই, শুনি।" হরিদাস চীৎকার করে পড়তে লাগল—

"শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা সমাগতা। শরতের নভোমণ্ডল স্বর্ণমণ্ডিত আলোক-সম্পাতে উজ্জ্বলশ্রী ধারণ করিয়াছে। খণ্ড খণ্ড তুষারশুভ্র জলদজালে অখণ্ড নীলিমা স্থানে স্থানে বিযুক্ত;

—তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যেন অসংখ্য বিশালকায় মরকতমণিবিচ্ছুরিত দ্যুতিতে ব্যোমমণ্ডল উদ্ভাসিত। গৃহে গৃহে দিগ্বিদিকে আনন্দ সঙ্গীত প্রবহমান। কলভাষী পক্ষি কণ্ঠের অবিরাম সুরলহরী ঊর্দ্ধপথে উত্থিত হইয়া গিরিতনয়ার পাদপ্রান্তে শুভআগমনীর আবেদন জ্ঞাপন করিতেছে। মায়াপ্রপঞ্চ-নাশিনী মহামায়ার অভ্যর্থনাব্যপদেশে প্রকৃতি সুন্দরী নবনবসাজে সুসজ্জিতা হইবার অভিলাষে পুরাতন জীর্ণ বেশ স্খলিত করিয়া সে সমুদায় দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন।"—

রত্ন একমনে চিঠি পড়া শুনতে লাগল। একটির পর একটি করে কথা যতই অগ্রসর হতে লাগল, তার চোখ ততই বড় হয়ে উঠতে লাগল। দুই লাইন শোনবার পর হরিদাসের কণ্ঠস্বর তার কানে আর পৌঁছল না। তার মনে হতে লাগল—শক্তির সেই ছেলেবেলার ময়না পাখীটা এখনো বেঁচে আছে, সে কথাটা তাকে জানানো দরকার। পাখীটাকে সে বড় ভালোবাসত, তার কথা শুনলে সে নিশ্চয় খুসী হবে। আহা, সেটাকে সে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে কত কান্নাকাটি করলে—নাতজামাই কিছুতেই নিতে দিলে না গা! বল্লে, কে বয়ে নিয়ে যাবে? শক্তি বলেছিল, সে নিজে হাতে-করে ধরে নিয়ে যাবে; কিন্তু তার পাল্কীতে এত জিনিষ যে জায়গা হল না; কর্ত্তা পাল্কীর মাথায় সেটা বেঁধে দিতে চাইলে, কিন্তু নাতজামাই বল্লে, রেলে পাখীর ভাড়া দিতে হবে। শক্তি আমার কানে-কানে বল্লে—দিদিমা বল, আমার কাছে আশীর্ব্বাদী টাকা আছে, আমি তাই থেকে ভাড়া দেব। আমার কিন্তু নাতজামাইকে সে-কথা বলতে সাহস হল না। আহা, যতক্ষণ দেখা গেল, বেচারা পাল্কীতে মুখ-শুকিয়ে বসে একদৃষ্টিতে খাঁচার পানে চেয়ে রইল।—

হরিদাস বল্লে—"দিদিমা লেখা কেমন হয়েছে?"

দিদিমা চম্‌কে উঠে বল্লে—"বেশ হয়েছে দাদা।"

হরিদাস ফুর্ত্তির সঙ্গে বল্লে—"দিদিমা, আর কি লিখতে হবে?"

দিদিমার মনের মধ্যে আবার একরাশ কথা তোলপাড় করে গেল।

হরিদাস বল্লে—"দিদিমা অমন চুপ করে থাকলে চলবে কেন? একটা কিছু বল; আমি সব গুছিয়ে ঠিক-করে লিখে দিচ্ছি।"

দিদিমা বল্লে—"লেখ—তোমার জন্যে বড় মন কেমন করছে।"

হরিদাস লিখতে গিয়ে থেমে পড়ল। উপর-দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে—"মন কেমন! মন কেমন! মন কিরূপ! মন কীদৃশ!" বলতে বলতে বলে উঠল—"দিদিমা অন্য কথা বল, ও কথা ঠিক চিঠিতে লেখা যায় না।"

দিদিমা অবাক হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল।

তারপর, অস্থির হয়ে বলে উঠল—"এই বল যে, কতদিন দেখা হয়নি, তাই মন-কেমন করছে—কবে মরে যাবো ঠিক নেই—একবার তাকে দেখবো।"

হরিদাস একটু মাথা-চুলকে নিয়ে খানিকক্ষণ ভেবে বল্লে—"আচ্ছা লিখে দিচ্ছি।" বলে সে প্রত্যেক কথাটি উচ্চারণ করে-করে লিখতে লাগল—"কতকাল

কালের করালকবলে পরিত্যাগ করিল। ইতোমধ্যে তোমার দর্শনলাভ সংঘটিত হয় নাই। সেই কারণে আমার অন্তঃকরণ কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া আছে। অতএব অবিলম্বে অত্র আগমনকরতঃ মদীয় মনঃপ্রাণ সুশীতল করিবে। যেহেতু জীবন ক্ষণবিধ্বংসী—মহাকালের ভৈরববদনব্যাদান চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত—কোন্ মুহূর্ত্তে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইবে তাহার কোন স্থৈর্য্য নাই।"

হরিদাস বল্লে—"দিদিমা এইবার চিঠি মুড়ে ফেলি?"

দিদিমা ব্যস্ত হয়ে বল্লে—"এরই মধ্যে?"

—"আর জায়গা কই? দু-পিঠ যে ভর্ত্তি হয়ে গেল।"

দিদিমা কাতর কণ্ঠে বলে উঠল—"আর জায়গা নেই?"

—"না!"

দিদিমার সমস্ত হৃদয়টা মথিত হয়ে উঠে আর্ত্তনাদ করতে লাগল।—আর জায়গা নেই? এখনো যে কিছুই বলা হয়নি! পাখীর কথা না হয় থাক—নাতজামাই রাগ করতে পারে; কিন্তু তার নিজের হাতে পোঁতা করবী-গাছে যে ফুল ধরেছে, সে খবরটা তো দেওয়া চাই—আরো—।

হরিদাস বল্লে—"দিদিমা ঠিকানা কি?"

দিদিমা তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"রোসো দাদা!"

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল শক্তির তো কোনো খবর জিজ্ঞাসা করা হয় নি! সে কেমন আছে? তার মন-কেমন করচে কি না? নাতজামাইয়ের সোহাগ, শ্বাশুড়ীর আদরযত্নে সে কি এই বুড়োবুড়িকে ভুলে গেল? নাতনী-নাতজামাইকে একটা ঠাট্টা করবারও প্রলোভন হচ্ছিল। কিন্তু জায়গা কৈ! সে ফুক্‌রে বলে উঠল—"লক্ষ্মীটি ভাই, আমার দিদির খবরটা একবার জিজ্ঞেস কর—সবাই কেমন আছে?—"

হরিদাস চিঠি ভাঁজ করে ফেলেছিল; আবার খুলে এক-কোণে ছোট ছোট অক্ষরে ঘেঁসাঘেঁসি করে লিখতে লাগল—"তত্রত্য সার্ব্বজনীন কুশল লিপিসহযোগে প্রেরণ করতঃ মানসিক উদ্বেগ দূরীভূত করিবে।"

হরিদাস চিঠিখানা মুড়ে খামের মধ্যে পুরে ফেলে বল্লে—"এইবার ঠিকানা দাও!"

—"ঐ যাঃ আশীর্ব্বাদ করা হল না যে!"

সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় হোক, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক্, স্বামী-সোহাগে চিরদিন সোহাগিনী থাকো, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীর মতন হও—এই সব কথা দিদিমার মুখের গোড়ায় ঠেলে ঠেলে আসতে লাগল। সে কাকুতি-মিনতি করে বল্লে—"লক্ষী দাদা আমার, আর একটা কথা—আশীর্ব্বাদ—

হরিদাস বিরক্ত হয়ে বলে উঠল—"দিদিমা আর পারি না।" বলে সে সবশেষে ছোট্ট করে লিখলে—"আশীর্ব্বাদমস্তু।"

"আশীর্ব্বাদমস্তু!"—দিদিমার মন ভরল না। আশীর্ব্বাদের এই বীজ মন্ত্রটি তার কানে ভারি ফাঁকা শোনাতে লাগল; —অন্ততঃ সিঁথের সিঁদুর, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক—এটুকু না বল্লে কি হল! এতে যে অকল্যাণ হবে! সে শিউরে উঠে ঠাকুরের নাম স্মরণ করতে-করতে মনেমনে বারবার বলতে লাগল—"অক্ষয় হোক্, অক্ষয় হোক্!"

হরিদাস আবার ঠিকানা চাইলে। দিদিমা বল্লে—"চিঠিখানা একবার তোর দাদামশায়কে শোনাবি না?"

হরিদাস উৎফুল্ল হয়ে বল্লে—"শোনাব বৈ কি!"

শ্যামাচরণের সামনে চিঠিখানা আগাগোড়া পড়া হল। শুনতে শুনতে দিদিমার কেবলই মনে হতে লাগল—এ সব যেন কি রকম কথা! মনের তৃপ্তি এতটুকু হল না। কিন্তু উপায় কি?

পড়া শেষ হলে দিদিমা জিজ্ঞাসা করলে—"হ্যাঁগো, কেমন হয়েছে?"

শ্যামাচরণ প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে গেল, তার পর হরিদাসের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—"ছোকরা লিখতে শিখেছে বেশ!"

তখন দিদিমার মন যেন একটু আশ্বস্ত হল; মনে হতে লাগল, আমরা হলুম সেকেলে মুখ্যু মানুষ, এরা সব বিদ্বান; নাতজামাই হয়ত এইরকম চিঠিই বুঝবে ভালো!

(২)

শক্তি এসেছে—কিন্তু চিঠির জোরে নয়, দাদামশায় বুড়োমানুষ আনতে গিয়েছিলেন বলেই তার আসা হয়েছে। রত্নমঞ্জরীর এবার এমন তাড়া যে শ্যামাচরণ না-গিয়ে পারে নি।

শক্তি বাড়ি ঢুকেই দিদিমাকে দেখে বল্লে—"আচ্ছা-মানুষ দিদিমা তুমি! বাড়িতে পূজো ছেড়ে চলে এলুম। সমস্ত পথটা বুক ঢিপ-ঢিপ করছে—দাদামশায় বল্লেন, মরবার আগে তুমি দেখতে চাও, আমি ভাবলুম না-জানি কি হয়েছে! তুমি [illegible] দিব্যি ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্চ!"

দিদিমা বল্লে—"ওলো শুধু কি ঘুরে বেড়াচ্চি? এখনও এমন শক্তি আছে [illegible] নাত-জামাইকেও ঘুরিয়ে দিতে পারি।"

শক্তি বল্লে—"ঠাট্টা রাখো দিদিমা, কেমন আছ?"

দিদিমা বল্লে—"আছি ভালো; বোস।"

শক্তি দাওয়ার উপর মাদুরে বস[illegible] গেল; দিদিমা বল্লে—"ওরে ওখানে কেন—এই আমার কোলে এসে বোস না!"

শক্তি হেসে বল্লে—"দিদিমা তুমি [illegible] কী! বুড়িধাড়ি কোলে বসব কি!"

দিদিমা বল্লে—"ওমা! তুই আবার বড় হলি কবে লো! এই সেদিন শ[illegible] বাড়ি যাবার সময় আমার কোলে ব[illegible] গলা-ধরে কেঁদে গেছিস! আয় না, অনে[illegible] দিন পরে এসেছিস, একবার কোলে করি, কতদিন তোকে কোলে করি নি।"

শক্তি বল্লে—"না বাপু, সে আমি পার[illegible] না।"

শক্তি কিছুতেই কোলে গেল না।

দিদিমার ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল শক্তিকে কোলে নিয়ে একবার খুব-কসে আদর করে নেয়। শক্তি এল না বলে তার বুকটা ভারি ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকতে লাগল।

শক্তি একটুখানি বসেই বল্লে—"দিদিমা একবার সইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

দিদিমা বল্লে—"এই এলি, একটু বোস, দুটো কথা কই!"

শক্তি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—"কথা [illegible] এখন দিদিমা—একবার দেখে আসি।"

...দিমা বল্লে—"আহা তা যা! মন-...ন করছে বুঝি?"

...ক্তি চলে গেল।

...দিমা শক্তির জন্যে রাঁধতে বসল। ...নিষগুলি শক্তি ভালোবাসে আজ ...ন থেকে দিদিমা সেগুলি জোগাড় ...রেখেছে। রাঁধতে রাঁধতে দিদিমার ...পড়তে লাগল—শক্তি শ্বশুরবাড়ি যাবার ...তেঁতুলের অম্বল খেয়ে বলেছিল—...কার হয়েছে দিদিমা! আজ সেই-...ন করে অম্বল রাঁধতে হবে। কৈ-...শক্তি বড় ভালোবাসে, কদিন ধ'রে ...ক চেষ্টা করে একটাও পাওয়া যায় ...সেই জন্য মনটা ভার হয়ে ছিল; ...সকালে হঠাৎ দুটো পেয়ে দিদিমার ...হাসি ফুটেছে।

...একটি-একটি-করে দিদিমা কত তরকারি ...শেষ করলে। শক্তি তখনো ...র এল না। খাবার ঠাঁই পেতে, সব ...ছিয়ে-গাছিয়ে দিদিমা বসে রইল। খাবার ...া হয়ে যাচ্ছে বলে মন খুঁৎ খুঁৎ ...তে লাগল। এই-আসে এই-আসে করে-...র হেঁসেল ছেড়ে উঠতেও পারছিল না। ...নক দিন পরে এসেছে, আহা একটু ...মোদ করে নিক—এই ভেবে মনে-মনে ...া করতেও পারছিল না।

অনেকক্ষণ কাটিয়ে শক্তি যখন এল, ...দিমা বল্লে—"নে চট্ করে খেতে বোস—...নক দেরী হয়ে গেছে!"

শক্তি বল্লে—"দিদিমা আমি খেয়ে ...সেছি।"

—"সে কি রে!"

—"হা দিদিমা, সই কিছুতে ছাড়লে না—বল্লে, এত বেলা হল, না-খাইয়ে ছাড়চি না।"

—"আমি যে তোর জন্যে রেঁধে-বেড়ে বসে আছি।"

—"কি করব দিদিমা! সইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে বসে কতদিন খাইনি। তারপর, হরিদাসী এসেছিল, সুখময়ী ছিল—সবাই বেশ একসঙ্গে বসে খাওয়া হ'ল। এখানে তো একলাটি বসতে হত।"

নাতনী অনেকদিন পরে দুদিনের জন্যে এসেছে—কিছু বল্লে পাছে মনে দুঃখ করে এই ভেবে দিদিমা আর-কিছু না বলে হেঁসেল তুলে ফেল্লে। সেই সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত আগুনের তাতে বসে গা-কেমন করছে বলে নিজে কিছু মুখে তুল্লে না।

সে দিন ষষ্ঠী। বিকেল-বেলা দিদিমা পেঁটরা থেকে তার লাল বেনারসী সাড়িখানি বার করলে। এখানি দিদিমা বেশী পরেনি—খুব যত্ন করে রেখেছিল, এখনো বেশ ঝকঝকে আছে। সেখানি হাতে করে নিয়ে শক্তিকে বল্লে—"দেখ, তুই বড় হলে তোকে দেব বলে এখানি রেখেছিলুম। আজ ষষ্ঠীর দিন এইখানা পর।"

শক্তি সাড়ির দিকে চেয়ে বল্লে—"ওমা, ও-সাড়ি আমি পরব না।"

দিদিমার মনের বিশ্বাস এই-রকম সাড়ি আর-একখানা খুঁজে পাওয়া শক্ত—আজ কালকার বাজারে এমন সাড়ি পাওয়া যায় না; ঢের সাড়ি তো সে চোখে দেখে

কিন্তু এমন-একখানি কৈ! এই সাড়িখানি পেয়ে তার মনে যে কী আনন্দ হয়েছিল তা এখনও সে ভুলতে পারে নি। এই সাড়ী নিয়ে সে কতবার কত স্বপ্নই দেখেছে। একবার পূজোর সময় যেন মুখুয্যেদের বাড়ি সে প্রতিমা দর্শন করতে গেছে—গিয়ে দেখে সেই প্রতিমা তার সাড়ি খানি চুরি করে পরে বসে আছে! সে ছুটে গিয়ে যেমন সাড়িখানা হাত দিয়ে ধরতে যাবে অমনি দুর্গার হাতের বর্ষা অসুরের বুক-থেকে উঠে তার বুকের উপর খোঁচা মারতে এল।

এমন-একখানা সাড়ি শক্তি পরতে চায় না শুনে দিদিমা অবাক হয়ে গেল, বল্লে—"পরবিনে কেন?"

শক্তি বল্লে—"ও-সাড়ি পরলে লোকে হাসবে দিদিমা!—উঃ যে টক্‌টকে লাল! যে বড়-বড় কল্‌কা আর বড়-বড় ফুল!"

দিদিমা বল্লে—"ওমা, এ বুঝি তোদের পছন্দ নয়?"

শক্তি বল্লে—"ও যে বড্ড সেকেলে দিদিমা!"

দিদিমা সাড়িখানি আস্তে আস্তে তুলে রাখলে। শক্তি সেদিন বাসন্তী রঙের যে একরঙা সাড়িখানি পরলে তাতে দিদিমার মন উঠল না। তার কেবলই মনে হতে লাগল শক্তির অমন ঢলে-ঢলে চেহারা—জরির সাড়িখানি পরলে কেমন দেখাত বল-দিকিন—ঠিক যেন দুর্গাঠাকরুণটি। বাসন্তী রং তার চোখে সেদিন বিঁধতে লাগল।

শক্তিকে ধরে দিদিমা সে-দিন অনেকক্ষণ বসে এঁটে-সেঁটে চুল বেঁধে দিলে। শক্তি সে চুল-বাঁধা খুলে ফেলে আলগা খোঁ বেঁধে এল।

দিদিমা বল্লে—"ওকি হ'ল চু ছিরি!"

শক্তি বল্লে—"তুমি যে কপাল বার-ক দিলে—দেখে হাসি পায়!"

দিদিমা বল্লে—"ওমা সে কি লো! কপাল তো ভাগ্যিমানীর লক্ষণ!" ব বলতে দিদিমা চুপ করে গেল, পাছে এ-ক জের টানলে আজ ষষ্ঠীর দিন কো অলক্ষণে কথা বেরিয়ে পড়ে!

অষ্টমীর দিন ভোরে মুখুয্যেদের বা যাত্রা। কত-বছর ধরে এই ভোরবে দিদিমা শক্তিকে নিয়ে যাত্রা শুনতে গেছে যে-ক'বছর শক্তি ছিলনা সে-ক'বছর যা শুনতে যেতে দিদিমার তেমন উৎসাহ হ' না;—না-গেলে নয়, তাই যেতে হত এবার আগের দিন বৈকালে শক্তি দিদিমা বল্লে—"শক্তি, কাল যাত্রা শুনতে অন্ধকারে যেন একলা যাস্‌নি—আমি স করে নিয়ে যাবো।"

শক্তি বল্লে—"দিদিমা, আমি যে আ সইয়ের কাছে থাকব—আজ রা সেখানে তাসখেলা হবে, তারপর ভোরবেল পাড়ার সব মেয়ে সেখানে জড়ো হয়ে যাত্রা শুনতে যাবো।"

দিদিমা চুপ।

সেদিন সকালে অনেকখানি বেলা পর্য্যন্ত দিদিমা বিছানা থেকে উঠতে পারলে না। শ্যামাচরণ বল্লে—"কি হল গো, যাত্রা শুনতে গেলেনা? দিদিমা কোনো উত্তর করলে



শিউলি-তলায়
শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র সিংহ অঙ্কিত

শ্যামাচরণ আবার বল্লে—"শক্তিকে য় যাবে না?" তারপর এদিক-ওদিক খ এসে বল্লে—"শক্তি চলে গেছে বুঝি!" আজ এই প্রথম দিদিমার যাত্রা-শোনা গেল।

শক্তির মেয়াদ ছিল খুব অল্প দিনের। তে দেখতে হট্টগোলের ভিতর দিয়ে ই দিনকয়টি কেটে গেল। দিদিমার কত া বলবার ছিল—কত ঠাট্টা ছিল, কত দর ছিল; সে-সব কিছুই হল না। শক্তি স তার বুকের মধ্যে কোথাও জমে বসল -ফাঁকায়-ফাঁকায় আল্‌গায়-আল্‌গায় যেন ড়-উড়ে গেল। দিদিমার কেবলই মনে ত লাগল—শক্তিকে নিয়ে এই পৃথিবী যেন কর কাছ থেকে অনেকদূরে সরে গেছে। র তাকে হাত বাড়িয়ে বুকে চেপে-বার যো নেই।

শক্তি আজ যাবে, তাই তার জন্যে দিমা একগাছা শিউলি ফুলের মালা থছিল। এক একবার মনটা আঁৎকে ছিল—যদি শক্তি মালাগাছটা না নেয়। ইজন্যে মধ্যে মধ্যে মালা গাঁথার উৎসাহ মে যাচ্ছিল কিন্তু তবুও হাত চলছিল। নি করে মালা শেষ হ'ল। নাতজামাইকে কটা ঠাট্টার জিনিষ পাঠাবার মতলব মনে-নে ছিল কিন্তু সে আর হয়ে উঠল না।

শক্তি সইয়ের কাছে বিদায় নিতে গেছে। দিমা একলাটি জিনিষপত্র সব ঠিক-করে ছিয়ে রাখচে—এইতেই তার সমস্ত দুপুরটা কটে গেল। বিকেলবেলা শক্তি এসে ভালো াপড় পরে দাঁড়াল, বল্লে—"দিদিমা আসি!"

দিদিমা শিউলি ফুলের মালাগাছটি হাতে নিয়ে বল্লে—"এগিয়ে আয় দিদি, এই মালাটা পরিয়ে দিই।"

শক্তি বল্লে—"ঐ-দেখ দিদিমা, মালা বলতে মনে পড়ল। একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। আমার শ্বাশুড়ি বৃন্দাবন থেকে হরিনামের মালা এনেছিল, তোমার জন্যে এক-ছড়া দিয়েছে।" এই বলে সে তার গোছানো পেঁটরাটা ঘেঁটে-ঘুঁটে এক-ছড়া শুক্‌নো কাঠের মালা বার করলে। দিদিমা সেই টাট্‌কা ফুলের গন্ধভরা মালাটি শক্তির গলায় পরিয়ে দিয়ে, সেই শুক্‌নো মালাটি হাতে করে নিলে। তার একটা কঠিন খট্‌-খটে আওয়াজ বিদায়বেলাকার আর্দ্র কথার মাঝে-মাঝে বেসুরে বেজে উঠতে লাগল।

শক্তি দাদা-দিদিকে পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলে। যখন সে মুখ-তুলে উঠে দাঁড়াল তখন তার দুই চোখের কোণে দু-ফোঁটা জল!

দিদিমা কাপড় দিয়ে নিজের চোখ-মুছে বল্লে—"আবার আসিস্ দিদি!"

শক্তি শুধু ঘাড়টি কাত করলে—মুখ-থেকে কোনো কথা বেরুল না।

পাল্কি চলে গেল।

দিদিমা ঘরে ফিরে এসে দাওয়ার উপর বসে পড়ল। আর-সমস্ত মুছে গিয়ে তার চোখের সামনে জাগতে লাগল—শক্তির চোখের সেই দুফোঁটা ঢলঢলে জল! মনে হতে লাগল, ঐ দুটিমাত্র ফোঁটা যেন অন্তরের সমস্ত শুষ্কতাকে আবার সরস স্নিগ্ধ করে দিয়ে গেল!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

জাফরানিস্থান

যে দেশেতে চড়ুই-পাখীর চাইতে প্রচুর বুল্‌বুলি,
যেথায় করে কাকলি কাক নীরস নিজের বোল্ ভুলি',
বারোমাসেই সরস ঘাসে সবুজ যেথা ঘরের চাল,
চালে চালে ফুলের ফসল চুম্‌কী-চমক নিত্যকাল,
ভূর্জ্জপাতার ঠোঙায় যেথা আঙুর বেচে সুন্দরী,
হাজার হাজার হৈমবতী বেড়ায় যেথা রূপ ধরি',
পথে ঘাটে রূপ-শতদল পাপ্‌ড়ি যেথা ছড়িয়েছে,
গিরিরাজের বুকের পাঁজর আলোক-লতায় জড়িয়েছে,
কোমল-কঠিন মিল্‌ছে যেথায় আঙুরে আর আখরোটে,
ভুঁই-চাঁপারি সই-স্যাঙাতি জাফরানে নীল ফুল ফোটে,
শৈল-শ্লেটে অলখ্ আঙুল যেথায় দাগা বুলিয়ে যায়,
বলাকা-বকফুলের মালা বিনি-সূতায় দুলিয়ে যায়,
পাহাড়-কোলের ফাঁকগুলি সব যেথায় তরল সুর ভরা—
দিকে দিকে নূপুর পায়ে নাম্‌ছে ঝোরা শ্রুদ্ধরা,
হাওয়া যেথা মেওয়ার সামিল, মেওয়া সে অফুরন্ত,
একলা ঝিলম্ একশো যেথা, শান্ত এবং দুরন্ত !
যেথায় লুকায়—মন্ত্রে যেন—ক্লান্তি যত কায়-মনের,
চিড়্-খাওয়া হাড় হয় সে তাজা বাতাস লেগে চীড়-বনের.
বনে ফোটে বনপ্‌ষা ফুল, পদ্ম ফোটে পল্বলে,
ধূপের গন্ধে আমোদ করে ধূপী-বনের জঙ্গলে,
ফল্‌সা চেয়ে আঙুর সুলভ, ফুলের জল্‌সা রোজ দিনই,
ঝাঁকে ঝাঁকে গুলাব ফোটে, ফোটে গুলেল্ য়োস্‌মিনী।
লাখে লাখে ম্যজারমণ্ডি গিলাস্-ফুলের খাস্-গেলাস্,
সোষম্ ফুলের নীল সুষমায় আকুল যেথা হয় আকাশ,
মর্ত্ত্যে যাহার নাই তুলনা, তাই যারে কয় ভূস্বর্গ,
মুগ্ধ ওরে ! দু-হাত ভ'রে দে তুই তারে দে অর্ঘ্য।

* * *

গোগর ঝাউয়ের গোকর্ণ-ছাঁদ শাখায় তুষার সরতেছে,
শালের পশম ঝল্‌মলিয়ে ছাগলগুলি চরতেছে,

শিস্ দিয়ে যায় রাখাল-ছেলে গুজর এবং গক্করে,
লাফিয়ে হঠাৎ হাস্‌তে থাকে উছট্ খেয়ে টক্করে,
ধান চলেছে চাল চ'লেছে পশমী মোটা বস্তাতে,
মোদো হ'য়ে উঠ্‌ছে মেতে আপেল-পেয়ার রাস্তাতে,
কল্কা-ছাঁদে নক্সা এঁকে চলছে বেঁকে ঝিলম্ গো,
ফুস্‌ছে ফেনায় সাপবাজী তার দিন-দেওয়ালীর কি রঙ্গ !
ঘুর্ণি ঘুরে চর্কী কেটে চল্‌ছে কোথাও ঝড়-গতি,
ঝঙ্কারে তার ঝঞ্ঝা বধির মঞ্জীরে ছড়ায় মোতি,
ঝম্‌ঝমিয়ে যায় রূপসী চাঁদি রূপার পায় তোড়া,
ফুলিয়ে হোথা দুলিয়ে কেশর বার হ'ল ওর সাতঘোড়া,
চল্‌ছে নেচে কাঁচিয়ে কেঁচে পাহাড়গুলোর অচল ঠাট,
ওঠা-নামার নাগর-দোলায় দুলিয়ে আঁচল পাগল নাট,
তুঁত-পাহাড় আর খয়ের-পাহাড় পাহাড় সাদা ফট্‌কিরি,
নস্যি রঙের পাহাড়গুলো ভস্ম হেন যায় চিরি,
গৈরিকে সে সাজ্‌ছে কোথাও, মাজ্‌ছে কোথাও নীল পাথর,
জম্‌কে এসে থম্‌কে হঠাৎ ঘোম্‌টা টেনে হয় নিথর।

* * *

কঠোর ধূসর নয়কো ঊষর পাথর হেথা উর্ব্বরা,
এই পাথরের স্তরে স্তরে ফসল ফলে বুক-ভরা,
এই পাথরের পাটায় পাটায় স্বর্গ হ'তে বারম্বার
লক্ষ্মী নামেন, ঐ দেখ গো পৈঠা-পাঁড়ি আসন তাঁর !
উথ্‌লে দিতে সোনার সরিৎ হরিৎ-বেশে উদয় হন
এই কঠোরের ঘাটে ঘাটে রানায় রানায় তাঁর চরণ !
এই কঠোরে কোমল ক'রে ফসল ফলায় কাশ্মীরী,
অন্ন, আয়ু, আদায় করে এই পাথরের বুক চিরি।

* * *

পৌঁছেছি গো পৌঁছেছি আজ গিরিরাজের অন্দরে,
শিবের বিয়ের ওই যে টোপর ওই যে গো বিরাজ করে,
ঐ যে 'হরমুকুট' উজল ঐ যে চির-চমৎকার,
বেড় দিয়ে ভুজঙ্গ সাথে গঙ্গা আছেন অঙ্গে যার,
ঐ যে 'নাঙ্গা' ঐ যে ধিঙ্গি ঐ যে নন্দী ভৃঙ্গী সব,
নিচ্চে মনে আজ বা মোরা শুন্‌ব শিবের শিঙার রব,

মূর্ত্তিমতী হৈমবতী কবিরা কন কাশ্মীরে,
ফুটেছে এই সোনার কমল গিরিরাজের বুক চিরে,
তপের তাপের শেষ নাহি এর, শিবের আশা-পথ চেয়ে,
দুঃসহ ক্লেশ সইল কত উষা-প্রভা এই মেয়ে।

* * *

সার দিয়েছে সফেদ্ তরু দীর্ঘ পথের দুই ধারে,
লক্ষ ময়ূরপুচ্ছ-চামর হেল্‌ছে হাওয়ার সঞ্চারে,
সবুজ ঘাসের গাল্‌চে' পরে গাব্বা পাত সুন্দরী,
গাছের ছায়ার গাব্বা—তাতে টুক্‌রো রোদের ফুলকরী,
চীনার গাছের ধবল বাহু মেল্‌ছে পাতার পাঁচ আঙুল,
দেবের ভোগ্য ফলছে গো সেব্, ফুট্‌ছে হোথা আনার ফুল,
বাদাম গাছের পাৎলা পাতায় লাগ্‌ছে হাওয়া দিক্-ভোলা,
হাস্‌ছে আলো আকাশভরা, হাস্‌ছে হাসি দিল্ খোলা।

* * *

সপ্তসেতুর শহরে আজ নূতন হিমের পড়ছে ঘের,
শৈল-পটে বরফ হরফ নূতন কেগো লিখছে ফের,
হ্রদের জলে কমল লুকায়—মন্ত্রে যেন যায় উড়ে,
পদ্মফুলের পাপ্‌ড়ি শুকায় পদ্মপাতার কোলজুড়ে,
শিঠিয়ে ওঠে কাঁটার মালা বেগ্‌নি পাতায় পানফলের,
ট্যাঁপের ট্যাঁপা ফলগুলো সব শীতের শাসন পাচ্ছে টের,
সর্ষেফুলের ঝাঁঝালো মউ, পদ্মফুলের মউ মিঠে
মৌমাছিরা ভিয়েন্ করে, নেই অপচয় এক-ছিটে,
ভাসা ক্ষেতে খাট্‌ছে চাষা শেষ-ফসলের তদ্বিরে,
কাংড়িতে ফের ভরছে আগুন বুড়োবুড়ী গম্ভীরে,
হাঁজীর মেয়ে আজকে সাঁঝে প্রাচীন কাঁথা জড়িয়েছে,
শীতের বাতাস প্রাচীন গাথা পাণ্ডু পাতা ছড়িয়েছে,
বর্‌ফি-কাটা ক্ষেতের পরে জাফরানে ফুল ফুট্‌ল রে,
শিশির-জলে ঘুম-জড়ানো চোখের ঘুম কি টুট্‌ল রে!
নীল-লোহিতের বিভূতি ওই লেগেছে আজ আস্‌মানে,
লেগেছে য়োস্‌মিনীর ফুলে, আর লেগেছে মোর প্রাণে,
নীলের কোলে সোনার কেশর 'নীলসুখেতে' স্পন্দমান,
নীলপাহাড়ের ফুলদানীতে প্রফুল্ল জাফরানিস্থান।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।



গণেশ দাদা
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত



আলাপ
শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত

সম্প্রদান

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ডিবেটিং ক্লাবে 'পণপ্রথা'র বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বক্তৃতা করিয়া গৃহে ফিরিয়া পৃথ্বীশ শুনিল, তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। সীতানাথবাবু খুব বড় দরের এক ইংরাজ হৌসের মুৎসুদ্দি, তাঁহারই জ্যেষ্ঠা কন্যা পারুলবালার সহিত বিবাহ! সীতানাথ বাবু কাল সকালে বান্ধবে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন। এক সপ্তাহ পরেই বিবাহ। দেরী করিয়া চলিবে না—সম্মুখে মলমাস পড়িতেছে, তাই এত তাড়া!

পৃথ্বীশ নবীন গ্রাজুয়েট। এ বংশের ছেলেরা চিরকাল ইংরাজীতে কোনমতে নামটা সহি করিতে শিখিয়াই সরস্বতীর সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া থাকে। পৃথ্বীশের পিতৃ-পিতামহ তিনপুরুষ ধরিয়া পাকা ব্যবসাদার; লোহার ব্যবসায়ে বাজারে তাহাদের অসাধারণ প্রতিপত্তি। লক্ষ্মীদেবীও লোহার বাঁধনে অচঞ্চলভাবে বাঁধা আছেন। পৃথ্বীশই শুধু বংশের চিরন্তন প্রথা ঠেলিয়া সরস্বতীর দরবারে হাজিরা রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রসাদ-প্রার্থী হইয়াছিল। তাই গৃহে তাহার খাতিরেরও সীমা ছিল না। পিতা নরেশ বাবু তাহাকে উপেক্ষা করিয়া কোন কাজ করিতে পারেন না; মা ছেলের কথায় চলা-ফেরা করেন। বড় দুই ভাই পরেশ ও সতীশ কোন ব্যাপারের মীমাংসার জন্য পৃথ্বীশের মুখ চাহিয়া থাকে!

তাই আজ তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা এতখানি পাকা হইয়া গিয়াছে শুনিয়া শুধুই যে সে বিস্ময় অনুভব করিল, এমন নয়—তাহার ললাটে একটু ভ্রূকুটি-রেখাও দেখা দিল।

জামা না খুলিয়াই সটান্ সে মার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। মা তখন উপরে দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন, নিকটে বামা দাসী পা মেলিয়া সুপুরি কুচাইতেছিল। পৃথ্বীশ আসিয়া হাঁকিল, "মা—"

মা বলিলেন, "কে পিতু, আয়, বোস্।"

পৃথ্বীশ কহিল, "বসব না। একটা কথা শুনলুম, সেটা সত্যি কি না, তাই জানতে এলুম।"

মা বলিলেন, "কি কথা?"

"আমার না কি বিয়ে হচ্ছে? আর কাল তারই পাকা দেখা!"

মা হাসিয়া কহিলেন, "তা পাশ-টাশ করলি ত সব, এখন আমাদের কি সাধ যায় না, যে একটি টুক্‌টুকে বৌ এনে ঘর আলো করি!"

বামা দাসী জাঁতির মধ্যে একটা আস্ত সুপুরিকে বাগাইয়া ধরিয়া আব্দারের সুরে বলিল, "ছোড়্‌দাদাবাবুর বিয়েয় কিন্তু আমার

সোনার হার চাই, মা—হাঁ, নাহলে শুনছি না বাপু।"

পৃথ্বীশ তাহাকে ধমক দিয়া কহিল, "তুই চুপ কর্।" তারপর মাকে কহিল, "কতগুলি গুণে নিচ্ছ, শুনি?"

মা বলিলেন, "আমরা কি এমনিই কসাই রে যে মেয়ের বাপের গলায় পা দিয়ে টাকা আদায় করব!"

পৃথ্বীশ কহিল, "তবু শুনিই না—"

মা কহিলেন, "সে নিজে থেকে খরচ করবে। পয়সা-ওলা মানুষ, দশ-বারো হাজার টাকা খরচ করা ত তার পক্ষে বেশী কথা নয়। তার উপর তোর মত জামাই পাচ্ছে! এমন ছেলে বাজারে কটা আছে?"

পৃথ্বীশ কহিল, "বাজারে! তা এ কথাটা ঠিকই বলেছ বটে! আলু-পটলের মত পাত্তরও আজকাল বাজারে সাজানো থাকে—যে যেমন দর দেয়, সে তেমনি জিনিস বুঝে নেয়,—না, মা?"

হরিনামের ঝুলিটা মাথায় ঠেকাইয়া মা বলিলেন, "তোর সঙ্গে আর তর্ক করতে পারি না বাপু। বাপ-মায়ে বিয়ে দিচ্ছে, তুই মুখটি বুজে বিয়ে করে আসবি, ব্যস্—এতদিন পড়াশোনা বলে যে আপত্তি করেছিলি, কোন কথা কইতে গেছলুম কি? তারপর এতগুলো পাশ করলি, এখনো বেঁকে থাকবি!"

পৃথ্বীশ কহিল, "বেঁকে থাকার কথা ত হচ্ছে না! বিয়ে করতে আমি রাজীও আছি, তবে আমার এক সর্ত্ত আছে!"

মা বলিলেন, "সর্ত্ত আবার কি, শুনি।"

পৃথ্বীশ কহিল, "গরিবের ঘরের মে বিয়ে করবো—বড়লোকের মেয়ে নয়।"

মা মনে মনে বিলক্ষণ চটিয়া ছিলেন ছোট ছেলেটির বিবাহ দিলেই তাঁহা সংসারের সব সাধ মিটে! যেমন ঘ তেমনই মনের-মত পাত্রীও জুটিয়াছে—স ঠিক-ঠাক, আর এই সময় ছেলে এক বেয়াড়া সখের বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত ভ করিয়া দিতে চায়! মা মুখ বাঁকাই বলিলেন, "গরিবের ঘরের মেয়ে আম আমাদের কখনো চলে! না জানে কায়দা-কানুন, না জানে কিছু। ছো মন নিয়ে এসে শেষে আমার এমন ভেঙ্গে খান্-খান্ করে দিক্! তার উপর মা-বাপ,ভাই-বোনকে মাসহারা দিয়ে পোষো!"

পৃথ্বীশ হাসিয়া বলিল, "গরিবের ঘরে মেয়ে আন্‌লে তার সেবা খেয়ে বাঁচবে অন্তত পানটাও ঝীয়ের হাতে সাজিয়ে খে হবে না! আর বড়মানুষী কায়দা-টায়দার কথ যা বলছ, আচ্ছা মা, আমি কথা দিচ্ছি আমি তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে ছ'মাসে মধ্যে কেতা-মাফিক গড়ে দেব।"

মা বলিলেন, "অনাছিষ্টি কথা তোর যা বাপু, নিজের কাজ দেখ্‌গে—আমার ভুলিয়ে দিস্‌নে।"

পৃথ্বীশ বুঝিল, মা চটিয়াছেন। কি মার রাগের ঔষধও তাহার বিলক্ষণ জানা ছিল। সে কহিল, "বেশ, আমি বলে-ক খালাস রইলুম, কিন্তু। ভেবো না যে, আমি বাজারের আলু-পটল, আর শ্বশুরমশায় থলি ভরে টাকা এনে আমায় বেশ করে দেখে পরখ করে দাম ছাড়বেন! দেখো, শেষ স

ভেস্তে যায়! বিয়ের রাত্রে বাজনা-নচৌকি আলোর ঘটায় স্পষ্ট না দেখ, পৃথ্বীশচন্দ্র চম্পট দেছে!"

মার গাটা শিহরিয়া উঠিল। তিনি লিলেন, "থাম্, থাম্, তোর আর অত য়ে করতে হবে না!"

পৃথ্বীশ আর কথা না বাড়াইয়া বাহিরে লিয়া গেল।

গৃহিণী আসিয়া কর্ত্তার কাছে কথাটা াড়িলে তিনি বলিলেন, "ও-সব লেখাপড়া-শখা ছোঁড়াগুলোর জ্যাঠামি! ওতে কান দিয়ো না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পৃথ্বীশ সেদিনকার ছেলে—তাহার আবার কথা, তাহার আবার ওজর-আপত্তি! সে-সব ত ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়—এমনই ভাবের ধ্য দিয়া উভয় পক্ষে অয়োজন চলিতে াগিল। ম্যারাপ, নহবৎখানা, জ্ঞাতি-কুটুম্বের বিপুল সমাগম হইতে সুরু করিয়া এসেটিলিনের ঝাড়, কাগজের পাহাড়-পর্ব্বত রাক্ষস-খোক্কস, গড়ের বাদ্য অবধি সব বন্দোবস্ত পাকা হইয়া গেল।

বিবাহের দিন সকালে পৃথ্বীশ ভারী গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিল। মার কাছে স্পষ্টই সে খুলিয়া বলিল, সে বিবাহ করিবে না—আজ রাত্রের ট্রেনেই পশ্চিম যাইবে। মা প্রথমে কৌতুক ভাবিয়া ব্যাপারটাকে আমোল দিলেন না। শেষে যখন মেজ বৌ আসিয়া খবর দিল, পৃথ্বীশ সাজগোজ করিয়া একটা ব্যাগে কাপড়-চোপড় পুরিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেছে, তখন তিনি প্রমাদ গণিলেন। সকালে নহবতের বাঁশীতে তখন ভৈরবীর সুর ছুটিয়াছিল।

কথাটা নিমেষে বাড়ীতে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কর্ত্তা চটিয়া বলিলেন, "যাক্ চলে সে হতভাগা! পাশ করে মাথায় উঠে বসেছে—দেশে আর কোন ছেলে পাশ করেনি, বটে! আমার অপমান করে সে বড় হতে চায়! খবর্দ্দার, কেউ তার খোঁজ করো না—"

গৃহিণী কাঁদিয়া কহিলেন, "আমিও এ বাড়ীতে থাকতে চাই না। গাড়ী তৈরি করতে বল, বিপিন এসেছে, ওর সঙ্গে এখনই আমি চাঁপাডাঙ্গা চলে যাব।" বিপিন গৃহিণীর ভ্রাতুষ্পুত্র—চাঁপাডাঙ্গায় তাঁহার পিত্রালয়।

বাড়ীতে হুলস্থূল বাধিয়া গেল। জ্ঞাতি-কুটুম্বের দল—যাহারা এ পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া হিংসায় জ্বলিয়া যাইত,—কলতলায় জটলা পাকাইয়া চাপা গলায় দুর্বৃত্ত পুত্রের এই বিসদৃশ বিদ্রোহের তীব্র সমালোচনা লাগাইয়া দিল। মেজ বৌ পৃথ্বীশকে একটু ভয় করিত; কারণ মেজ-বৌয়ের বাপের জমিদারীর আয় বেশী বলিয়া চাল-চলনটাকেও সে পিতৃগৃহের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খাওয়াইবার চেষ্টায় অহরহ ব্যস্ত থাকিত এবং পৃথ্বীশ মেজবৌয়ের এই গূঢ় প্রয়াসটুকু ধরিয়া ফেলিয়া তাহার প্রতি মধ্যে-মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিত। মেজবৌ দেখিত, বাড়ীর বড় হইতে ছোট অবধি সকলেই 'পৃথ্বীশ' বলিতে অজ্ঞান—কাজেই সে বিদ্রূপ অসহ্য বোধ হইলেও নিরুপায়ে সে তাহা গায়ে মাখিয়া আসিয়াছে। বামা দাসী হলুদ-মাখা

কাপড় পরিয়া প্রকাণ্ড বঁটিতে মাছ কুটিতেছিল; এখন সুযোগ পাইয়া মেজবৌ বামা দাসীর কাছে মনোভাবটা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। মেজ-বৌ বলিল, "এই ছেলেকে সুছেলে বলে সব পূজো করেন! আমারও এক বোন্-পো দুটো পাশের পড়া পড়ছে—কিন্তু বাপ-মায়ের কি বশ! হুঁঃ, এ কি র‍্যালাটাই করলে!"

বিনা-মেঘে বাজ পড়িলে লোকে যেমন স্তম্ভিত অভিভূত হইয়া পড়ে, বামা দাসীর অবস্থাটা সেইরূপ হইয়াছিল। সে কোন কথা না বলিয়া বঁটির উপর হাত রাখিয়াই বসিয়া রহিল।

বাহিরের ঘরেও আন্দোলন চলিয়াছিল। সরকার মহাশয় এইমাত্র প্রোসেশনের পুলিশ-পাশখানা কর্ত্তার কাছে লইয়া গিয়া বলিতেছিল, "এখানা বড়বাবুর জিম্মা করে দেবেন—হারিয়ে গেলে—" সে কথা আর শেষ হইল না। কর্ত্তার তাড়ায় সে হতভম্ব হইয়া থামিয়া গেল।

পাড়ার মাতব্বর নারাণ চক্রবর্ত্তী কহিল, "তাই ত, এখন উপায়—"

নরেশবাবু কহিলেন, "উপায় আর কি! ঘাড় হেঁট করে এখন মেয়ের বাপের কাছে গিয়ে দাঁড়াইগে। সব কথা তাঁকে খুলে বলে মাপ চাই গে।"

আশু সিকদার বলিল, "ঐ ত ইংরিজি পড়ার দোষ! মাথা গরম হয়ে ওঠে। হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান থাকে না! আমার ছেলেটার পড়ার অত চাড়—আমি বললুম, না বাবা,ও ইংরিজি শিখে কাজ নেই! তুমি আমার কাজ-কর্ম্ম দেখ, তাহলেই আমি হাসতে হাসতে স্বর্গে যাব!"

বিজয় বোস্ বলিল, "ও সব কথা থাক্ এখন আর-একটা দায় রয়েছে মাথার উপ মেয়েদের বাড়ী খবর পাঠাতে হবে সে ভদ্রলোক না হলে মহা ফাঁপ পড়বেন।"

যদু মণ্ডল বলিল, "ওঃ, কাল দে হল ভদ্দরলোকের সঙ্গে—বাড়ীতে যত কুটু অমনি গিস্-গিস্ করছে! কি হাসি মুখ প্রথম মেয়েটির বিয়ে দিচ্ছে—কাউকে খ বলতে বাকী রাখেনি, খরচেরও ত্রুটি ক নি। ইলেক্‌ট্রিক আলোর মালা পরে বাড়ী যেন হাসছে!"

নরেশবাবু বলিলেন, "নিজে আর এ মু নিয়ে গিয়ে দাঁড়াই কি করে? পরেশ কি সতীশ কেউ না হয় যাক্, হাতে-পায়ে ধ ব্যাপারখানা তাঁকে বুঝিয়ে আসুক!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরেশের মুখে ব্যাপার শুনিয়া সীতানা বাবু আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহার উপায় বাড়ীতে আত্মীয়-কুটুম্ব গিস্-গিস্ করিতেছে সকলের কাছে মাথা হেঁট!

বন্ধু রমাপতি বাবু নিকটেই বসিয়া ছিলেন, চুপি চুপি বলিলেন, "আরও কিছু নেবার ফিকির নয় ত হে?"

সীতানাথ বাবু পরেশের দুই হাত ধরিয়া আর্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "আরও কিছু বেশী দিতে আমি রাজী আছি, বাবা—আমায় রক্ষা কর।"

পরেশ নত শিরে কহিল, "আপনি সন্দেহ করবেন না, সীতানাথবাবু—আমি দাঁও কষতে আসিনি। যথার্থই এই বিপদ হয়েছে।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন, মূর্চ্ছা-অবধি হয়েছিল।"

সীতানাথবাবু কহিলেন, "এখন আমার ত রক্ষা হয় কি করে?" তাঁহার চক্ষু জল হইয়া উঠিল।

রমাপতিবাবু ব্যবসায়ে উকিল। সহজে নি কোন কথা বিশ্বাস করিতে পারেন না! রা করিয়া-করিয়া স্বভাবও আবার এমন ড়াইয়াছে যে নিতান্ত সহজ ব্যাপারটাকেও নি অত্যন্ত ঘোরালো করিয়া দেখেন। হার উপর পয়সা-কড়ির গন্ধ যেখানে াছে—সেখানকার সমস্তই ত দারুণ সন্দেহ-নক! আদালতে হাকিমদের সঙ্গে নানা র্ক করিয়া তাঁহার আর-একটা গুণ জন্মিয়া-ল। চক্ষু-লজ্জার তিনি ধার ধারিতেন না—রং যত কঠিন হোক না কেন, স্পষ্ট কথা নি কহিতে জানেন। তিনি এবার রেশের দিকে চাহিয়া খোলাখুলি ভাবেই লিলেন, "কেন আর ভদ্দরলোকটাকে জাও বাবাজী, আরও কিছু নয় ধরে দেবে'খন, ভাইটিকে যথাসময়ে হাজির করে দিয়ো!"

লেখাপড়া না শিখিলেও পরেশের স্বভাবটি ছিল নম্র। ব্যবসাদারের ছেলে সে—লোকের মর্য্যাদা রাখিতে বিলক্ষণ জানে এবং সহ্য করিবার শক্তিও তাহার অসাধারণ; কিন্তু রমাপতি বাবুর কথা শুনিয়া তাহার ইচ্ছা হইল, ঐ অভদ্র বর্ব্বরটার টাক-ধরা মাথায় সজোরে এক ঘুষি বাগাইয়া দেয়! মানুষ এমন হৃদয়-হীন অসভ্য হইতে পারে, মুখে এমন কঠিন কথা বলিতে পারে, তিন পুরুষ ধরিয়া কঠিন লোহার কারবার করিয়াও তাহার এ জ্ঞান জন্মে নাই। শুধু সীতানাথ বাবুর বিপন্ন অবস্থার কথা ভাবিয়াই সে কোনমতে আত্মসম্বরণ করিল।

পরেশ রমাপতির দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাহিয়া সীতানাথবাবুর পদ স্পর্শ করিয়া বলিল, "দেখুন, আপনি আমার পিতৃতুল্য—আপনার সঙ্গে ধাপ্পাবাজী করতে আসিনি। বিপদ আপনারও, আমাদেরও। তবে আপনার বিপদ আরও বেশী! আমাদের সাধ্য থাকলে যে কোন উপায়ে হোক্ আপনাকে আমরা সাহায্য করতুম! তা ছাড়া আপনি বাবাকে চেনেন—আপনি বরং তাঁর কাছে চলুন, যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয়—" পরেশের চোখের কোণে অশ্রু-বিন্দু ফুটিয়া উঠিল।

সীতানাথবাবু তাহা দেখিলেন; তিনি কহিলেন, "দাঁড়াও, বাবা, তাই যাব। এ বিপদ তাঁরও, আমারও। তবে বাড়ীতে এক বার খবরটা দিয়ে আসি।"

সীতানাথবাবু অন্দরে চলিয়া গেলেন। রমাপতি-উকিল গড়গড়ায় তামাক টানিতে টানিতে পরেশের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনি তামাক ইচ্ছা করেন?"

পরেশ হাঁ-কি না কোন কথা বলিল না, তক্তাপোষের উপর বসিয়া রহিল।

অন্দর-মহল এ দুঃসংবাদে জ্বলিয়া উঠিল। নানা কণ্ঠে নানা ভাবের সুর খেলিয়া গেল। সীতানাথবাবু হতবুদ্ধির মত চাতালে বসিয়া পড়িলেন, ভাগিনেয়ী চপলা তাড়াতাড়ি এক খানা পাখা লইয়া আসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল। শ্যালিকা মনোরমা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দিদিকে ডাকিয়া ভগ্নীপতিকে কহিল, "একটু দুধ এনে দি, খান্ দেখি—"

মনোরমার দিদি অর্থাৎ সীতানাথবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা তখন গরদের সাড়ী পরিয়া আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন। মোটাসোটা দোহারা গৌরবর্ণ দেহ, নীচে হাতে গিন্নি-প্যাটার্ণের কয়গাছা করিয়া সোনার চুড়ি ও শাঁখা, উপর-হাতে অনন্ত —গহনাগুলা সে হাতে ঠাঁই পাইয়া চমৎকার মানাইয়াছে। কুটুম্বিনীদের মুখে এ সংবাদ শুনিয়া অন্নপূর্ণা উদ্বিগ্ন হৃদয়ে স্বামীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্নপূর্ণার স্বভাবটি খুব ধীর, বিপদে টলিতে জানেন না—স্বামীর মুখের ভাব দেখিয়া তিনি কহিলেন, "তা তুমি অমন করে বসে পড়লে কেন? কলকেতা সহরে পাত্রের অভাব কি? এখনই চারদিকে লোক পাঠাও —পাত্র এনে হাজির করবে। মেয়ে ত আমার কালো-কুৎসিত নয়—আর টাকাও তুমি কম দিচ্ছ না—"

সীতানাথবাবু হতাশভাবে কহিলেন, "কিন্তু নরেশবাবুর ছেলের মত পাত্র কি আর চট্ করে মেলে! সুপাত্রের জন্যই না মেয়েকে বড় করে রেখেছিলুম—"

অন্নপূর্ণা জানিতেন, এ পাত্রটির প্রতি স্বামীর ঝোঁক কতখানি! রূপে-গুণে ধনে-মানে এমন পাত্র সহজে পাওয়া যায় না, সত্য! কালই রাত্রে উচ্ছ্বাসের মুখে স্বামী কতখানি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন,—নিজেদের জামাতৃ-ভাগ্য ও পারুলের স্বামী-ভাগ্যের আলোচনায় একেবারে পঞ্চমুখ হইয়া ছিলেন! ঘর-বরের কথা শুনিয়া তাঁহারও প্রাণটা স্নেহে-বাৎসল্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু ঘটনা যখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে, তখন আর কাঁদিয়া কি হইবে সত্যই ত, দেশে পাত্রের কিছু আকাল পড়ে নাই—ঠিক এটি না হইলে উহার-মতও মিলিতে পারে! তবে সম্মুখে এই মলমাস পড়িতেছে—পাঁচ মাস আর বিবাহ হইতে পারিবে না, এই যা! তবুও স্বামীর কাতরতা ঘুচাইবার জন্য তিনি বলিলেন, "তা বল—যে ছেলে মা-বাপের কথা অমান্য করে তার হাতে যে আমার পারুলকে পড়তে হল না, এ ওর একটা ভাগ্যি! ও ছেলে ত দেখছি, গোঁয়ার-গোবিন্দ। শিখুক লেখা পড়া বাবু, তা বলে এতই কি এ!"

তার পর পরামর্শান্তে স্থির হইল সীতানাথবাবু এখনই গিয়া নরেশবাবুর সঙ্গে স্বয়ং দেখা করিবেন, এবং তাঁহার পুত্রকে একান্ত না পাওয়া যায়, তবে এখনই চারিদিকে লোক পাঠাইয়া পাত্রের সন্ধান করাইবেন। কলিকাতার মেসগুলা ত ছেলে ঠাসা—পাত্রের অভাব কি! অন্নপূর্ণার বৃদ্ধা পিসী কহিলেন, "সত্যিই ত—ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয়! এত টাকা খরচ করবে শুনলে কত পাত্তর অমনি লুটিয়ে এসে তোমার পায়ে পড়বে!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বেলা তখন প্রায় দশটা। নরেশবাবু আত্মীয়-বন্ধুদের সহিত বৈঠকখানা ঘরেই ছিলেন। অন্দরের দিক হইতে প্রচুর বর্ষণ পাইয়া তাঁহার রোষাগ্নি একেবারে নিবিয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুরোধে সতীশ, সরকার মহাশয় এবং দুইজন ভৃত্য পৃথ্বীশের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। এত বড়

সব-ভবনের উপর দারুণ অপ্রসন্নতার ছায়া পড়িয়াছে। বৈঠকখানা-গৃহ বন্ধ; কেবল দুই-চারিজন নিতান্ত লোলুপ গড়গড়া-টানার শব্দে সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। এমন সময় পরেশের সহিত সীতানাথবাবু পাগলের মত সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সীতানাথবাবুকে দেখিয়া সকলেই একটু উস্-খুস্ করিয়া নড়িয়া বসিল।

নরেশবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "পরেশের মুখে বিপদের কথা শুনেছেন ত?"

সীতানাথবাবু বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "এখন আমার উপায়?"

"সেই কথাই ভাবছি" বলিয়া নরেশ বাবু বাহিরের দিকে তাকাইলেন।

তাহার পর বন্ধুর দলের আলোচনায় ছেলেদের ইংরাজী লেখা-পড়া শেখানো, রাণের মিটিং, খবরের কাগজ—কিছুরই নিন্দা বাদ পড়িল না। বিস্তর বাদানুবাদেও প্রথম কিনারার সন্ধান মিলিল না, তখন সীতানাথবাবু কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "এখন আমার জাত-রক্ষার উপায় করে দিন। আমার দুরদৃষ্ট—এমন ঘর, এমন বর তপস্যায় মেলে—তা এ আমার মেয়ের বরাত, আমারও বরাত!"

নরেশবাবু ঐ সকল নিন্দাবাদে যোগ দেন নাই—তিনি বাস্তবিকই সীতানাথবাবুর জাতি-রক্ষার উপায় খুঁজিতেছিলেন। সহসা একটা কথা মনে পড়িল; তিনি বলিলেন, "দেখুন, আমারই এক জ্ঞাতি-ভাই আছে, লক্ষ্মীকান্ত—অগাধ পয়সা—তার এক ছেলে আছে উমাকান্ত, ছেলেটি মন্দ নয়। সেটির জন্য দেখলে হয় না?"

সীতানাথবাবু অকূলে কূল পাইলেন। তিনি কহিলেন, "তবে উঠে পড়ুন—আমার গাড়ী আছে—তাঁকে ধরে যেমন-করে পারেন, আমায় উদ্ধার করে দিন। আজ পাত্রের ঠিক না করে আমি বাড়ী ফিরব না—এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে বেরিয়েছি। পাত্র পাই, ভাল, না পাই ত যেদিকে দু'চোখ যায়, চলে যাব। এত জ্ঞাত-কুটুমের মাঝে মাথা হেঁট! একে ত মেয়ে বড় করে রেখেছি বলে পাঁচজন পাঁচ কথা শুনিয়ে আসছে, তার উপর এই বিভ্রাট!"

নরেশবাবু একখানা চাদর কাঁধে ফেলিয়া সীতানাথবাবুর সহিত জ্ঞাতি লক্ষ্মীকান্তর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

মোটা থামওয়ালা বাড়ী। লোকজনের অপ্রতুল নাই। বাহিরের ঘরে কালো মোটা এক ভদ্রলোক শুইয়াছিলেন, একটা ভৃত্য বসিয়া তাঁহার পা টিপিয়া দিতেছিল। নরেশবাবু আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন, "লক্ষ্মী—শুনছ?"

মোটা ভদ্রলোকটি উঠিয়া বসিলেন। তখন নরেশবাবু আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন; সীতানাথবাবুও বিস্তর আবেদন-নিবেদন জানাইলেন। শুনিয়া ভারী দাঁও মিলিয়াছে ভাবিয়া লক্ষ্মীকান্ত কহিল, "তাই ত—মশায়ের এ দায় আমার দেখা ত খুবই উচিত, স্বীকার করি—কিন্তু এদিকে যে এক বিপদ ঘটেছে—"

বিপদ! সীতানাথবাবু ভড়কাইয়া গেলেন।

তিনি একেবারে লক্ষ্মীকান্তর পায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "আমায় রক্ষা করতেই হবে।"

লক্ষ্মীকান্ত পা সরাইয়া নমস্কার করিয়া কহিল, "আহাহা, করেন কি! আপনি মহাশয় ব্যক্তি! তবে বিপদটা কি জানেন? উমাকান্তর বিস্তর সম্বন্ধ আসছিল—তার মধ্যে টিকুলির জমিদাররা শেষ কথা দিয়ে গেছে। তারা সবশুদ্ধ পঁচিশ হাজার দেবে এই ত বলে পাঠিয়েছে,—আমিও একরকম মত দিয়েছি। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই তাঁরা পাকা দেখাটা সেরে রাখতে চান—তারপর প্রথম তারিখ পেলেই বিয়ে হবে। বাড়ীতে মেয়েদেরও সাধ, ঐখানে বিয়ে হয়!"

লক্ষ্মীকান্তর চেহারা ও কথাবার্ত্তার ধরণটা সীতানাথবাবুর বড় মনঃপূত হইতেছিল না। অন্য সময় হইলে তিনি এ-সকল কথা উত্থাপনও করিতেন না—কিন্তু এ যে বড়-বিপদের মুখ। এখন আর বিচার-তর্কের সময় নাই! তবুও পঁচিশ হাজার টাকার কথাটা তাঁহার কানে অত্যন্ত বেসুরা বাজিল। তিনি বলিলেন, "পঁচিশ হাজার টাকা—?"

লক্ষ্মীকান্ত বলিল, "আমার ঐ এক ছেলে, আর আমার বিষয়-সম্পত্তির সম্বন্ধে মশায় বাইরে খবর নিতে পারেন।"

সীতানাথবাবু বলিলেন, "তাহলে আমায় উঠতে হল। আমার এটি বড় মেয়ে বটে কিন্তু এটি-ছাড়া আরো দুটি মেয়ে আছে—অবশ্য প্রথমটির বিয়ের যা খরচ করব, তা যে সকলের বেলায় করতে পারব, তাও বলছি না। তবু আমার মত লোকের পক্ষে পঁচিশ হাজার দেবার চেষ্টা করাও বাতুলতা। তাহলে আর কি, নিরুপায়!" কথাটা করিয়া সীতানাথবাবু হতাশভাবে দেওয়াগায়ে টাঙানো ঘড়ির পানে চাহিলেএগারোটা বাজিতে তখন তিন মিনিট বা

লক্ষ্মীকান্ত দেখিল, শীকার বুঝি পলাতিনি ভাবিলেন, না, দর নামাইতে হইও পক্ষ খবর লইতে গেলে বিস্তর গোবাধিতে পারে! টিকুলির জমিদারের কথাএকেবারে বানানো না হইলেও, দঅবশ্য একটু অতিরঞ্জিত করিয়াই হইয়াছিল। তা এরূপ ব্যবসা-ক্ষেত্রে এআধটু অতিরঞ্জিত করায় দোষ নাইপঁচিশ হাজার না হৌক পাঁচ হাজার অবউঠিতে পারে বলিয়া তাহারা আভাস দিগিয়াছে ত! তবে এ কথাও ঠিক, ছেলেগুণের কথা জানে না বলিয়াই। পউমাকান্তর গুণের মধ্যে পাড়ার এ্যামেচাথিয়েটারের সে সেক্রেটারি। নাটকে নায়সাজিয়া বেশ চমৎকার নাকি সুরে কঅভিনয় জমাইয়া তুলিতে পারে, এবং ইয়ামহলেও পূরদস্তর 'খরচে' বলিয়া তাহানাম-ডাক আছে; রাত্রেও সবদিবাড়ীতে থাকে না! বনিয়াদি প্রথাএতখানি পোক্ত থাকার জন্য কলিকাতারকোন সম্বন্ধ জমিতেছিল না, আসিয়াই ফাঁসিয়া যাইতেছিল! ভাগ্যক্রমে যদি আজ এমন দাঁও মিলিয়াছে! লক্ষ্মীকাবলিল, "তা বেশ, আপনি ভদ্রলোকআপনি নয় বিশহাজারই দেবেন! আপনামত মশায় ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক করতেগেলে, পাঁচহাজার টাকা লোকসান করাকি-আর এমন বড় কথা!"

সীতানাথ বাবু কহিলেন, "না মশায়, বিশার দেওয়াও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য, ত্তরই বলতে হবে।" সীতানাথবাবু লেন।

লক্ষ্মীকান্ত বলিল, "আহা উঠলেন যে—ন, বসুন—একছিলিম তামাকই নয় খেয়ে ন। আপনি নরুদার সঙ্গে এসেছেন—ক, তবে নয় ঐ ষোল হাজারেই রাজী হয়ে ন—আমিও উমাকান্তকে ডাকিয়ে দি—শীর্ব্বাদ করে যান। আজই লগ্ন বললেন ? তা ও আটটার লগ্নে হতে পারবে ত! ঐ যে বললেন, দশটায় আর-একটা লগ্ন াছে, সেইটেতেই ঠিক করুন। কেন না, ামায় ত আবার সব গোছগাছ করে য়ে যেতে হবে। একটি ছেলে,—বাজনা-ছি, আলো, লোকজন, এ-সব না হলে দের যে মুখ দেখাতে পারব না।"

সীতানাথ বাবু দেখিলেন, তিনি এখন য়ে পড়িয়াছেন—সে দায়ে রক্ষা পাইতে ইলে মূল্য কিছু ধরিয়া দিতেই হয়। তবু লক্ষ্মীকান্তকে খুব ভদ্র বলিতে হইবে, তাঁহার জন্য এতগুলা টাকা লোকসান করিতেছে! তাঁহারও আজ যেমন করিয়া হোক, পাত্র চাইই! তখন আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর পনেরো হাজারেই দর রফা হইয়া গেল।

লক্ষ্মীকান্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া উমাকান্তকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

আধ ঘণ্টা পরে বংশধর উমাকান্ত আসিয়া দেখা দিল! রং শ্যামবর্ণ, চোয়াড়ে ধরণের চেহারা, মাথার চুল সম্মুখদিকে অত্যন্ত দীর্ঘ, পিছনে নাই বলিলেও চলে—চোখ দুইটি জবাফুলের মত লাল—কাল সারারাত্রি থিয়েটারে কাটাইয়া সকালে আসিয়া শয্যায় পড়িয়াছিল; বাড়ীর লোকের হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভাঙ্গিলে চিত্ত এখন বিরক্তির ভাব ধারণ করিয়াছে। সীতানাথবাবু একদৃষ্টে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন দেখিয়া লক্ষ্মীকান্ত বলিল, "কাল এক বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল, সেখানে সারারাত জেগে থাটতে হয়েছে, তাই আর কি—"

পুত্র পিতার পানে ঈষৎ কৌতুক-মিশ্রিত দৃষ্টিতে চাহিয়া মাথা নামাইয়া বসিল। সীতানাথবাবু পাত্র আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "তাহলে আমি বাড়ী গিয়ে খবর দিইগে—উদ্যোগ সব বন্ধ আছে কি না! ঐ দশটার লগ্নই তাহলে ঠিক? আর কন্যা-আশীর্ব্বাদটা আপনি—"

তাকিয়াটা কোলের উপর তুলিয়া শরীরটাকে একটু দোলাইয়া লক্ষ্মীকান্ত বলিল, "তার আর কি! আমার মা-লক্ষ্মীকে ঐ সম্প্রদানের পূর্ব্বেই আশীর্ব্বাদ করব'খন। এখন আমিও সব উদ্যোগ করি। বলেন কি, নালিশ করতে গেলেও লোকে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দেয়—আর এ আট-দশ ঘণ্টার নোটিশে বিয়ে! হাঃ-হাঃ-হাঃ—" লক্ষ্মীকান্ত গলা ছাড়িয়া উচ্চ হাস্য করিল।

লক্ষ্মীকান্তর হাসির সুরটা সীতানাথ-বাবুর প্রাণে বাজের মতই বাজিল। তিনি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সারিয়া একটু মিছরির সরবৎ

মাত্র গল্লায় ঢালিয়া সীতানাথবাবু নিজের ঘরে আসিয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িলেন। মেঝেয়-বিছানো কার্পেটের উপর বসিয়া মেয়েরা পারুলকে 'কনে' সাজাইতেছিল। সীতানাথ-বাবুর মনটা মোটেই প্রসন্ন ছিল না—প্রথম মেয়ের বিবাহ, বলিতে গেলে তাঁহার আমোলে বাড়ীতে এই প্রথম কাজ! বাহিরে বাজনা-বাদ্য, গণ্ডগোল পুরা মাত্রায় চলিলেও তিনি যেন উহারই মধ্যে কলের-পুতুলের মতই চলা-ফেরা করিতেছিলেন, কোন কাজেই তেমন মন লাগিতেছিল না। বিবাহের দিন এ-ভাবে বর-বদল হইয়া গেল! এমন ব্যাপার কোথাও কখনও ঘটিয়াছে, না, কেহ কখনো এমন ব্যাপারের কল্পনাও করিতে পারিয়াছে! একটা ভাবী অমঙ্গল-আশঙ্কায় তাঁহার বুকটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সহসা তিনি পারুলের পানে চাহিলেন। তাঁহার মনে হইল, পারুলের চোখ দুটিতে যেন আজ তাহার সে স্বাভাবিক দীপ্তিটুকু আর নাই! মুখেও কেমন বিষণ্ণতার ছায়া পড়িয়াছে, কৈ, কাল ত ও মুখ অমন ছিল না, চমৎকার দেখাইতেছিল! একটা তীব্র বেদনায় তাঁহার মনটা টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। তাঁহার মনে পড়িল, উমাকান্তর সেই চেহারা—লাল্ চোখ, কামানো ঘাড় ও মাথার সম্মুখে প্রকাণ্ড চুল! নিতান্তই গোঁয়ারের মূর্ত্তি! হায়, এমন সোনার কমল মেয়েকে তিনি শেষ কিনা একটা বানরের হাতে সঁপিয়া দিতেছেন! না হয়, আরও পাঁচ মাস অপেক্ষা করিতেন—না হয়, লোকে দূষিত! তবুও মেয়েটার ত এ ভাবে সর্ব্বনাশ হইত না। ঝোঁকের মাথায় তখনই তাড়াতাড়ি পাত্র খুঁজিতে বাহির হইয়াই ত এই বি ঘটিল! হায়, হায়, মেয়েটার কি দুর্দ না তিনি করিলেন! অমনি আবার মনে হইল, মিথ্যা আর এ-সব ভাবিয়া ফল! ভবিতব্য! ঐ উমাকান্তই যে পারু বর! নহিলে এত পাত্রের মধ্যে ঘটে কৈ কোন দিন তাহার কোন সং লইয়া আসে নাই ত—আর আজ এ ভাল পাত্র ঠিক থাকিলেও হাত-ছাড়া হ গেল এবং ঘটনাচক্র শেষে এ কোথায় আ দাঁড়াইল! যাক্, উহাকে লইয়াই পা সুখী হোক! ও বিষয়ে আর মন খা করিয়া কি হইবে?

সীতানাথবাবু এমনই নানা ভাবিতেছিলেন। এমন সময় এক মু তরুণ যুবা সে ঘরে আসিয়া উপ হইল, আসিয়াই কহিল, "মেজমামা, কি শুনছি! পৃথ্বীশবাবুর সঙ্গে না সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে?"

সীতানাথবাবুর চোখ ছলছল ক উঠিল—আপনাকে একান্তই করুণার্হ ভা মৃদু কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "কে ললিত, আ বাবা, বোস্—"

যুবার নাম ললিত। সীতানাথবাবু খুড়তুতো বোনের ছেলে সে, প্রেসিডেন্সি বি, এ পড়িতেছে। ললিত বলিল, "না বসবো কি! তার উপর শুনলুম, ঐ উমাকা টার সঙ্গে পারুলের বিয়ে দিচ্ছেন!"

"—হাঁ। কিন্তু উপায় কি?"

"উপায় কি। রামচন্দ্র! ঐ বিশ্ব-ব ছেলে উমাকান্ত! এমেচার থিয়েটারে রা সেজে বেড়ায়—নেশাটেশাও দিব্যি ধরেছে

লক্ষ্মীছাড়া সঙ্গীর সঙ্গে দিবারাত্র ইয়ার্কি ফেরে—এত টাকা খরচ করে সেইটের পারুলের বিয়ে দিচ্ছেন! হুঃ তার ওর গলা টিপে ওকে মারলেন না কেন?" মেয়েদের দলে উপবিষ্টা এক বর্ষীয়সী গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, "ললিত—" সে স্বরে চমকিয়া ললিত চাহিয়া দেখে, ঘরে পারুল বসিয়া আছে। বর্ষীয়সীর ইঙ্গিত ললিত বুঝিল, এ কথাটা পারুলের সম্মুখে কওয়া ঠিক হইতেছে না! ললিত কহিল, "আপনি এমন চুপচাপ পড়ে থাকলে চলছে না ত, মেজমামা—পৃথ্বীশবাবুকে যেমন করে হোক, পাকড়ানো চাইই। আমি সব শুনেছি, এতেই আপনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন! আসুন'দিকি, আমার সঙ্গে, একখানা মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়ি—সন্ধ্যারও এখনো দেরী আছে—"

সীতানাথবাবুর মনে হইল, এতক্ষণ তাঁহার যেন একটা কঠিন পীড়া হইয়াছিল—হাত-পাগুলা দুর্ব্বল অবশ হইয়া পড়িয়াছিল, কোন শক্তি ছিল না—এখন ললিতের কথায় যেন আবার নূতন করিয়া চেতনা, শক্তি সব তিনি ফিরিয়া পাইলেন! ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া তিনি বলিলেন, "নরেশবাবুর ছেলের, সঙ্গে তোর জানাশোনা আছে না কি?"

ললিত কহিল, "না, তবে ওঁর যে প্রধান মন্ত্রী হরিহর—ওদের ক্লাবের সেক্রে-টারি, তার সঙ্গে আমার খুব আলাপ পরিচয় আছে। চলুন দেখি, তাকে ধরে পৃথ্বীশ-বাবুকে বার করতে পারি কি না, দেখি। তাঁকে পেলে, আর ব্যাপারটা বোঝালে সহজেই তিনি রাজী হবেন বলে আমার বিশ্বাস। নিন, নিন, আপনি উঠুন, একটা জামা—থাক্‌গে না হয়, দেরী হয়ে যায় যদি, —তার চেয়ে আমার এই চাদরখানা নিয়েই চলে আসুন। আমি ত এসে এ-সব শুনেই অবাক হয়ে গেছি!" একনিশ্বাসে ললিত কথাগুলা বলিয়া গেল।

সব কথাগুলা সীতানাথবাবুর কানেও গেল না—তিনি ঠিক বুঝিতেও পারিলেন না। তিনি কেমন হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন! ললিত তাঁহাকে একরূপ টানিয়া লইয়াই বাহিরে আসিল এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পৃথ্বীশকে বাহির করিতে কষ্ট হইল না। ক্লাবের সেক্রেটারি হরিহরের বাড়ী আসিয়া তাহাকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিতেই সে বলিল, "ওঃ, তাই বুঝি রাস্কেল হঠাৎ আমার এখানে এক ব্যাগ নিয়ে এসে উপস্থিত—বললে, বিয়ের দিন পেছিয়ে গেছে, মেয়ের বাড়ীতে কার খুব অসুখ—চল, এই হিড়িকে পুরী-টুরী কোথাও ঘুরে আসি।"

ললিত কহিল, "সব মিছে কথা।" তার পর সীতানাথবাবুকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, "ইনি আমার মেজমামা, এঁরই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে। ভদ্দরলোক বাধ্য হয়ে শেষ কি না পনেরো হাজার টাকাশুদ্ধ মেয়েটিকে ধরে ঐ লক্ষ্মীছাড়া উমাকান্তর হাতে সঁপে দিচ্ছেন! কাল বিকেলে আমি মামার বাড়ী থেকে চলে এসেছি; তারপর আজ সারাদিন সেই সকাল থেকেই ত প্রেসে কেটেছে! সেখানে বসে থেকে বিয়ের পদ্য

ছাপিয়ে ফিরে গিয়ে শুনি, এই ব্যাপার! তাই ওঁকে তোমার কাছে টেনে আনলুম। এখনো সময় আছে—তুমি উপায় কর, পৃথ্বীশবাবুকে চাইই! তুমি তাঁকে এনে দাও—নাহলে মেয়েটার সারা জন্মটাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়!"

হরিহর কহিল, "দাঁড়াও,—সে রাস্কেল আমার উপরকার লাইব্রেরি-ঘরে বসে কি সব কেতাব-পত্র ঘাঁটছে। বলে, মাথায় মজার আইডিয়া এসেছে—কি বই লিখবে। বেশ, সীতানাথবাবুকে নিয়ে আমি উপরে যাচ্ছি। তুমি :এইখানে অপেক্ষা কর।"

সীতানাথবাবুকে লইয়া হরিহর লাইব্রেরী ঘরে আসিল। একখানা কৌচে প্রকাণ্ড এক কেতাবের আড়ালে মুখ গুঁজিয়া পৃথ্বীশ পড়িয়াছিল; হরিহর ডাকিল, "পৃথ্বীশ—"

পৃথ্বীশ বইখানা মুড়িয়া রাখিয়া মাথা তুলিল, কহিল, "কি?"

হরিহর কহিল, "তোমার শ্বশুর এসেছেন দেখা করতে—"

শ্বশুর! পৃথ্বীশ বিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়া কুতুহলী দৃষ্টিতে সীতানাথবাবুর পানে চাহিয়া দেখিল। সীতনাথবাবু একেবারে অগ্রসর হইয়া তাহার হাত দুইটা ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, এ দায়ে আমায় উদ্ধার কর—তোমার মঙ্গল হবে।"

হরিহর কহিল, "তুমি এত বড় পাষণ্ড যে পালিয়ে এসে ওঁর সর্ব্বনাশ করছ!"

পৃথ্বীশ কহিল, "কিন্তু—"

সীতানাথবাবু কহিলেন, "না বাবা, কোন দোষ নেই তোমার। তবে আমারও কথা শোনো, শুনে যা বলবার থাকে, বল। আজ আমায় মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে—নাহলে সে দ'পড়া হবে। দ'পড়া হ সে মেয়েকে কেউ আর বিয়ে কর না। তাই তোমার কাছে নিরাশ হ লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের ছেলে উমাকান্তর সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক করতে হয়েছে—লক্ষ্মীকা বাবু পনেরো হাজার টাকায় বিয়ে দিতে রা হয়েছেন। কিন্তু সে ছেলে কেমন, তুমি জান, বোধ হয়। তোমার এই রেঁ দাঁড়ানোতে মেয়েটাকে বাধ্য হয়ে একেবা এ যে কোথায় ফেলে দিচ্ছি, তা আমি বা হয়ে কিছু বুঝতেও পাচ্ছিনে।"

পৃথ্বীশ কহিল, "কিন্তু জানেন ত, আমা এ বিয়েয় দারুণ বাধা আছে—"

"—কি বাধা বাবা, বল।"

"আমার প্রতিজ্ঞা, যদি বিয়ে করি একপয়সা পণ নেব না, গরিবের মেয়ে বি করব, আর—"

"তাহলে আমার মেয়েটা ভেসে গেলে তুমি ফিরে চাইবে না? শোন বাবা, আমি মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছি, সুপাত্র গাইদি বলে জ্ঞাত-কুটুমের মানা ঠেলেও তাকে ব করে রেখেছি—মনের মত পাত্র পেয়ে মহা আনন্দে নিজের ইচ্ছায় আজ যখন খরচ-প করতে বসেছি, তখন এই বিপদ। বুঝছি উমাকান্তর হাতে মেয়ে দেবার চেয়ে মেয়ে গলা কেটে মেরে ফেলাও নিষ্ঠুরতা না কিন্তু তাও বাধ্য হয়ে আমায় করতে হচ্ছে—"

হরিহর বলিল, "এ তোমার অন্যা হচ্ছে, পৃথ্বীশ—তোমার গোঁয়ের জন্য একটি বালিকার ইহজন্মটাই একেবারে নষ্ট হয়ে

র! না তা কখনো হবে না!—বিশেষ পাকাপাকি বন্দোবস্তের পর—"

সীতানাথবাবু আর্দ্র স্বরে বলিলেন, "আমায় না হয় ত আমার মেয়ের মুখের পানে য়েও—একটা নারী-জন্মকে চিরদিনের দুঃখ-শা থেকে রক্ষা করবার জন্যও না হয়—"

পৃথ্বীশ বলিল, "বেশ, কিন্তু আমার র্ত্ত আছে—"

"—বল, কি সর্ত্ত—"

"এ বিয়েয় আপনি যৌতুক-হিসেবে ক-পয়সাও আমায় দিতে পারবেন না—"

"বেশ বাবা, শুধু-শাঁখা-হাতে মেয়েকেই তামার হাতে সম্প্রদান করব।"

"আর—"

"আর কি? বল।"

"বাজনাবাদ্যি করে, আলোর ঘটা নিয়ে তুর্দ্দোলে চড়েও বিয়ে করতে যাব না, আমি। একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ ভাড়াটে গাড়ী—আর আমার ক'জন আত্মীয়-বন্ধু নিয়ে—ব্যস! কিন্তু আমার বাবাকে এতে রাজী করাতে পারবেন কি?"

"সে ভার আমার। তিনি আমায় য়া না করে থাকতে পারবেন না।"

হরিহর কহিল, "তাহলে চলুন, ওকে নিয়ে যাওয়া যাক। আমি ওদের বাড়ী খবর পাঠিয়েছি—'ভয় নেই, পৃথ্বীশ কোথাও সরে যাবে না, আমি নজর রেখেছি—তাকে ফিরিয়ে বাড়ীতে আনবই' বলে। তবে ওর মা থামেন, যে কান্নাকাটি লাগিয়েছিলেন—।"

সীতানাথবাবু কহিলেন, "তাহলে আর দেরী করো না বাবা—এ ধারে সন্ধ্যা হল!"

পথে মোটর দাঁড়াইয়াছিল। সকলে পৃথ্বীশকে লইয়া মোটরে চড়িয়া তাহার গৃহের দিকে ছুটিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সীতানাথবাবু চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন; বসিয়া ভাবিতেছিলেন, আজ জীবনটার উপর দিয়া কি এ ঝড় বহিয়া গেল! এই সুখ, এই দুঃখ, আবার সুখ, ভারী বিচিত্র! আজ যে ঘটনাটা এই ঘটিয়া গেল, ইহা সত্যই ঘটিল, না, এ স্বপ্ন! —ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাড়া দিতেছিলেন, "ওগো স্ত্রী-আচার সেরে নাও—এধারে আর বিলম্ব নাই।"

পৃথ্বীশকে লইয়া মেয়ে-মহলে তখন স্ত্রী-আচার চলিতেছিল। নিরানন্দ পুরীতে আবার আনন্দের ঢেউ ছুটিয়াছিল। শাঁখের রোলে পাশের লোকের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। পৃথ্বীশও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল—বিশেষ ললিতের নবোঢ়ার জ্বালায়! সে সজোরে পৃথ্বীশের কাণ মলিয়া দিলে পৃথ্বীশ রাগিয়া উঠিল, "আঃ—"

অমনি পাঁচ-সাতটা বীণা এক সুরে ঝঙ্কার তুলিল, "ওগো মিনি-পয়সার জিনিষ পেলে লোকে এমন হেনস্তাই করে থাকে—"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আবার হাঁক পাড়িলেন, "ন্যান আপনারা—ঐ আটটা বাজল, লগ্ন বয়ে যায়—"

বর আসিয়া বসিলে কন্যাকে তাহার সম্মুখে বসানো হইল এবং মন্ত্র-পাঠ আরম্ভ হইল। ছেলে-মেয়েরা চতুর্দ্দিকে ভিড় করিয়া আসিয়া বসিল। সীতানাথবাবু যখন কন্যা-জামাতার হাত এক করিয়া দিলেন, তখন আনন্দে

তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল! আহা, সুখী হও, দু'জনে চিরসুখী হও!

কন্যা-জামাতাকে বাসরে পাঠাইয়া স্বচ্ছন্দ মনে সীতানাথবাবু বাহিরে আসিলেন; নরেশ বাবুকে অত্যন্ত আবেগে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আমায় আপনি কিনে রাখলেন, চিরদিনের জন্য কিনে রাখলেন। ওঃ, আমার যে আজ কি আনন্দ হচ্ছে, তা আর কি বলব?"

নরেশবাবু বলিলেন, "আমার সঙ্গে আর ও-সব কথা কেন? এখন এই ভদ্দরলোকরা যাঁরা আসছেন, এঁদের আর বসিয়ে রাখা কেন? ওঁদের বসাবার উদ্যোগ করা যাক্ না!"

ছাদের উপর ভোজনের স্থান হইয়াছিল —সকাল-সকাল আহারের ডাক পড়ায় উপস্থিত নিমন্ত্রিতবর্গ সন্তুষ্ট চিত্তে ছাদে গিয়া উঠিলেন। সীতানাথবাবু নিজে আগাগোড়া খাওয়া-দাওয়ার তদ্বির করিতে লাগিলেন। "এঁকে আরো মাছ দাও-হে, ও পাতে খানকতক লুচি।—না, না, তাও কি হয়! আজ বড় আমোদের রাত—আপনারা আমোদ করুন।—ফেলা যাবে? যাক্ ফেলা—তার জন্যে কি!—ওরে সরবৎটা আর-একবার এদিকে আন্—আপনার কি চাই—? পটল-ভাজা—? ওরে, পটলভাজা, পটল—" এত টাকার মানুষ হইয়াও সীতানাথবাবু নিজে দাঁড়াইয়া সকলকে খাওয়াইতেছেন—কোনদিকে এতটুকুও না ত্রুটি হয়, সে বিষয়ে এমন লক্ষ্য! দেখিয়া নিমন্ত্রিতের দল চমৎকৃত হইয়া গেল।

এমন সময় গলির মোড়ে ঝমর্‌ঝম্ শব্দে ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। প্রকাণ্ড সমা করিয়া এক বর চলিয়াছে, বিবাহ করি শব্দ নিকটে আসিল, ক্রমে আরও নি —বাড়ীর সম্মুখে! শেষ বাজনার লোকের কাণে তালা ধরিবার উপক্রম।

এমন সময় ললিত ছুটিয়া ছাদে আ ডাকিল, "মেজমামা—"

সে ডাক মেজমামার কানেও পৌঁ না। তিনি তখন ও-পাড়ার বিধ খাইয়ে নন্দ চাটুয্যের পাতে গ কচুরি দেওয়াইতে ছিলেন। ললিত তাঁ নিকটে আসিয়া কহিল, "মেজমামা, আপনি করেছেন কি? বর উমাকান্ত বাদ্যভাণ্ড নিয়ে উপস্থিত। তাদের আর খবর দিয়ে বারণ করে পাঠান নি

সীতানাথবাবু চক্ষু কপালে তুলিয়া দাঁড় উঠিলেন, কহিলেন, "তাইত—ভারী হয়ে গেছে ত! আহ্লাদের চোটে ও কথা আর মনেই পড়েনি! তাছাড়া সময়ই বা পে কখন্, বল? এদের নিয়ে ঠিকঠাক ক ফিরতেই ত পৌনে আটটা বাজল—ত পর ফিরেই বিয়ে দিতে বসলুম! তবে ফের মুখে গাড়ীতে একবার কথাটা মনে হয়েছি ভেবেছিলুম, বাড়ী ফিরে তোকে দু-একট মাতব্বরের সঙ্গে পাঠাব—কিন্তু আর মনে পড়েনি।"

ললিত কহিল, "এখন উপায়?" তাহা স্বরে অনেকখানি উদ্বেগ প্রকাশ পাইল।

সীতানাথবাবু তখন আনন্দে উচ্ছ্বসিত কোন দুর্ভাবনাই তাঁহার মনে আর স্থ ফুটাইতে পারে না! তিনি হাসি হাসিতে বলিলেন, "তার আর কি? স

র্ষনা করে বসাও। তারপর ঐ বড়ঘরে য় সমস্ত বরযাত্রীদের জন্য পাত করতে দাও গে-"

ললিত অবাক হইয়া গেল! আনন্দের তিশয্যে মেজমামার মাথা খারাপ হইয়া না কি! এ কি বলেন!

সীতানাথবাবু কহিলেন, "অবাক হচ্ছিস —? ছেলেমানুষ কি না! ওরে, আজ মার বড় আহ্লাদের দিন—আজ আমার ড়ী থেকে না খেয়ে কারো ফেরবার জো ! সব পাত করিয়ে বসিয়ে দাও গে— রপর আমিও যাচ্ছি—"

মামার খোসখেয়ালী মেজাজ দেখিয়া লতের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। মামা জানেন না, বাহিরে ঐ যে নূতন দলটি সিয়া উদয় হইয়াছে, তাহারা কি দিয়া ওয়া পদার্থ!

উপর হইতে সীতানাথবাবু নামিয়া সিলেন। বাহিরে একেবারে লোকারণ্য। ালান ও হলঘরে বরযাত্রীর বেজায় ড়! লক্ষ্মীকান্তকে দেখিয়া তিনি হাসিয়া মস্কার করিলেন, কহিলেন, "এই যে, বসুন, ক-টামাক পেয়েছেন ত ঠিক?"

লক্ষ্মীকান্ত কোন জবাব দিল না। ড়ের পূর্ব্বে বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরটা ভিতরে-তরে যেমন ফুলিতে থাকে, বাহিরে শান্ত-র্ত্তি,—লক্ষ্মীকান্তর ভাবখানাও ঠিক সেইরূপ াঁড়াইয়াছিল।

বর উমাকান্ত একখানা কৌচে বসিয়া-ছিল। গায়ে লাল ভেলভেটের উপর জরির কাজ-করা চাপকান—পরিধানে যাত্রার রাজার মতই লাল ভেলভেটের হাফ-প্যাণ্ট; হাঁটুর নীচে সে প্যাণ্টের প্রান্তভাগটুকু গুটানো-মত; মাথায় জরি-দেওয়া লাল ভেলভেটের পাগড়ী, সম্মুখে সাদা একটা পালক্ খাড়া দাঁড়াইয়া,—বায়ু-স্পর্শে মৃদু দুলিতেছে!

সীতানাথবাবু কহিলেন, "জায়গা হচ্ছে —এখনই সব বসিয়ে দেব। ততক্ষণ—ওরে, পান নিয়ে আয় না রে পান, মিঠে পান—দোনা, দোনা—আর কতকগুলো হুঁকো বেশী করে আন্—আর তামাক—"লক্ষ্মীকান্তর পার্শ্বে তাহারই এক সম্বন্ধী দাঁড়াইয়াছিল—মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি—তাড়াতাড়ি বরযাত্রী আসিতে হইয়াছে বলিয়া কামাইবার আর সময় পায় নাই! গায়ে সার্ট,—হাতা দুইটা একটু বেশী দীর্ঘ—দেখিলেই মনে হয়, নিজের জামা নয়—আর-কাহারও, ধার করিয়া আজিকার রাত্রের মত গায়ে দিয়া আসিয়াছে। সম্বন্ধী হাতা দুইটা উহারই মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে মাঝে-মাঝে টানিয়া উপরে তুলিতেছেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা আবার ঝুলিয়া পড়িতেছে! ভিতরে বরযাত্রীর দল নানাবিধ কলরব করিতেছিল।

লক্ষ্মীকান্তর ইঙ্গিতে তাহার সম্বন্ধী অর্থাৎ উমাকান্তর মাতুল বলিল, "বসতে ত বলছেন—কিন্তু এধারে ঐ কি সব শুনছি!"

সে কথা কানে না তুলিয়াই সীতানাথ বাবু বলিলেন, "ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ওরে, জায়গা হল?"

লক্ষ্মীকান্ত গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "আসল কাজটা—"

মুখের কথা লুফিয়া লইয়া মাতুল কহিল, "তার সঙ্গে খোঁজ নেই! বাড়ীতে পুরে অপমান করবার জন্যেই কি ওবেলা পায়ে ধরতে যাওয়া হয়েছিল? জুচ্চুরির আর জায়গা পাননি!" মাতুল ক্রোধে গর্জ্জিতে লাগিল।

সীতাকান্তবাবু তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "আহা, রাগ করচেন কেন? মুখে কিছু দিন আগে, তারপর কথাবার্ত্তা হবে'খন।"

লক্ষ্মীকান্ত কহিল, "আমরা নেমন্তন্ন খেতে আসিনি ত এখানে—"

মাতুল জের টানিল, "—আমাদের লুচির লোভ দেখানো হচ্ছে না কি! দু'খানা লুচি ভাজিয়ে খাবার সামর্থ্য আমাদের আছে।"

সীতানাথবাবু অপ্রতিভভাবে কহিলেন, "আজ্ঞে, তা কেন? তবে একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে কি ছাড়তে পারি?"

লক্ষ্মীকান্ত গম্ভীর স্বরে কহিল, "সীতানাথ-বাবু, চালাকি রাখুন।"

মাতুল কহিল, "পাজী ছোটলোক কোথাকার!"

বরযাত্রীদের মধ্যে একজন বলিল, "লোকটা পাগল না কি!"

লক্ষ্মীকান্ত বুক ফুলাইয়া কহিল, "জানেন, আমি লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার!"

সীতানাথ কহিল, "আজ্ঞে তা আর জানিনে!"

—"তবে চালাকি করবেন না! সম্প্রদান করুন।"

"—সম্প্রদান ত হবার যো নেই—সে যে হয়ে গেছে!"

—"তা জানিনে—সম্প্রদান হওয়া চাই

—"হওয়া চাইই?"

—"হাঁ!"

সীতানাথ একটু গম্ভীর হইয়া গেলে এত গালাগালিতে আজ তাঁহার একটুও হইতেছিল না। তাঁহার চোখে আজ সা বেশ সহজ সরল বলিয়া ঠেকিতেছি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি ললি ডাকিয়া বলিলেন, "ললিত, এই চাবি নি উত্তরের ঐ ঘরটা খোল ত বাবা!"

ললিত উত্তরের ঘর খুলিল। পাড়ে সম্প্রদানের জন্য সীতানাথবাবু এই ঘ সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন—স্তরে স্তরে দা নানা সামগ্রী সাজানো—কেমন সুন্দর আসবাব, খাট-বিছানা, টেবিল-চেয়ার, ব বহুমূল্য গহনা, আরো কত কি। তাঁহা ইচ্ছা ছিল, এই ঘরে বসিয়া এই সা সামগ্রী ও অলঙ্কারের সহিত তিনি ক সম্প্রদান করিবেন। কিন্তু পৃথ্বীশের ধনু পণের জন্যই এ ঘর বন্ধ রাখিয়া দক্ষিণে একটা ফাঁকা ঘরেই কন্যা সম্প্রদান করি হইয়াছে। সীতানাথবাবু সেই ঘরে ঢুকি বলিলেন, "লক্ষ্মীকান্তবাবু, আসুন।"

লক্ষ্মীকান্তর বুকটা একবার ছাঁৎ কৰি উঠিল—ঘরে পুরিয়া প্রহার দিবে না কি! শুভবিবাহের ইতিহাসে এরূপ ঘটনার অভা নাই। কিন্তু যখন দেখিল, ঘরে মা সীতানাথ একা, তখন সে সাহস করি দল বাঁধিয়া প্রবেশ করিল।

সীতানাথ বলিলেন "বরকে বসতে বলুন।"

একখানা আসন পাতা ছিল, উমাকা

সিয়া তার উপর বসিল। সীতানাথ শের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

লক্ষ্মীকান্তর কানে কানে মামা বলিল, াধ হয় মেজ মেয়েকে সম্প্রদান করবার লব করেছে—তা মন্দ কি! কি বল?"

লক্ষ্মীকান্তর মুখ বিজয়-গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া ঠিল।

সীতানাথ পাশের ঘর হইতে প্রকাণ্ড একটা থলি বহিয়া আনিয়া বরের সামনে রাখিল—ঝনাৎ করিয়া শব্দ হইল।

সীতানাথ বলিলেন, "সম্প্রদানের বাকি ছিল এইটে—আসুন, শুভকার্য্য সম্পন্ন করি।" বলিয়া সেই থলিটায় হাত রাখিয়া সীতানাথ বরের পাশে বসিয়া পড়িলেন।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

নিরুত্তর

চিরদিন নিরুত্তর মৌন এ অবনী,
তবু তার বক্ষে বহে মাণিক্যের খনি
অনিন্দিত পদ্মরাগ; কত না বেদনা
শষ্পে ঢাকা দিয়ে, হাস্য-প্রফুল্লবদনা
চেয়ে রহে অহর্নিশি
ব্যথা তার মূক রহে মিশি
নিশীথের শিশির সঞ্চয়ে
অন্ধকারে প্রস্ফুটিত পুষ্পের বিনয়ে!

অটল পাষাণ অদ্রি ভাষা নাহি তার,
গলাইয়া হৃদয়ের জমাট তুষার
দিকে দিকে প্রবাহিয়া দেয় নদনদী
অপার ব্যথার শান্তি চাহে নিরবধি
অপরে সান্ত্বনা দিয়ে,
বাক্য যাহা কভু বাখানিয়ে
কহিবারে নারে কোনদিন,
সে বারতা অবারিত স্রোতোমাঝে লীন!

আকাশ কহেনা কিছু, যুগ যুগ ধরি
একাগ্র অসীম স্নেহ নতনেত্রে ভরি
শুধু চেয়ে রহে, বক্ষে বহে আপনার
বিদ্যুতের বজ্রবাণ, ঝঞ্ঝা লাঞ্ছনার—
মেঘেরে মার্জ্জনা করি,
অন্ধকার দূরে অপসরি,
আনে ভানু, জ্বালে ধ্রুবতারা
নিরুত্তর চিরদিন সেও বাক্যহারা!

যে লগ্নে বচন নাহি রহে বচনীয়,
সে লগ্ন এসেছে প্রাণে আজি, বরণীয়!
আকাশ ধরিত্রী সম মৌন আমি তাই,
এ নিবিড় সমাধির কোন ভাষা নাই,
আছে অন্তরের দেখা,
অটুট নিকষে হেম-লেখা,
সে ছবি যে মুছিবার নয়,
সাধকের সাধনার অব্যর্থ প্রণয়!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সত্যং ব্রূয়াৎ

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং। প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥"—এ কথাটা পুরোনো কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেটিকে আমাদের নূতন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে আমাদের মধ্যে অনেকে যুগপৎ ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। এ ত হবারই কথা। ইংরাজিতে বলে, "তলোয়ারের চাইতে কলমের ধার বেশি।" এই মত-অনুসারে বাংলার সমালোচক-বীরেরা লেখনীকে গুপ্তি হিসেবেই ব্যবহার করাই সঙ্গত মনে করেন। এ ক্ষেত্রে, সমালোচনার থোঁতা মুখ ভোঁতা করবার উদ্দেশ্যেই যে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন উপদেশ অনুসারে লিখ্‌তে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সমালোচকদের মনে এরূপ সন্দেহ হওয়া একান্তই সম্ভব; এবং সাহিত্য সম্বন্ধে সংস্কৃত মত যে বাংলা-সাহিত্যে খাটে না একথা অস্বীকার করাও কঠিন। একটি জানা উদাহরণ নেওয়া যাক্। পূর্ব্বাচার্য্যেরা বলে গেছেন যে, "মধুমিচ্ছন্তি ষটপদাঃ"। এ-কথা এ-কালের সমালোচকদের সম্বন্ধে খাটে না এবং খাটবার কথাও নয়। কেন না, বাক্যের মধুচক্র রচনা করা কাব্যের উদ্দেশ্য হতে পারে, কিন্তু সমালোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে বোল্‌তার চাক তৈরী করা। এর থেকে প্রমাণ হয় সেকালের আলঙ্কারিকরা নিতান্ত স্থূলদর্শী লোক ছিলেন। তাঁরা খুঁজতেন রূপ, আমরা খুঁজি ছিদ্র। কাজেই তাঁদের লক্ষ্য ছিল ফুল-ফোটানোর দিকে, আমাদে লক্ষ্য হুল-ফোটানোর দিকে।

তারপর, মানব-জীবনের সকলক্ষেত্রে ঘাত-প্রতিঘাতের বলে যে সুফল ফলে সত্য অবশ্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের জা ছিল না।—সে কালে জ্ঞান থাকলেও বিজ্ঞা ছিল না। আমরা কিন্তু জ্ঞানী না হলে সকলেই বিজ্ঞানী। এও আমরা জানি আমরা যদি আঘাত না করি তা প্রতিঘাত আসবে না। সুতরাং সমালোচ দের পক্ষে লেখকদের আঘাত দেওয়া কর্ত্তব্য জীব-জগতের ধর্ম্ম রেশারেশি এবং ক পেষাপেষি—সুতরাং লেখকেরা পরস্পরের গা গলা-গলি না করে পরস্পরকে গালাগালি কর সাহিত্যের ইভলিউসন হতে বাধ্য।

এ সব কথাই সত্য। তবে উ সংস্কৃত বচনটি যে অতি সুন্দর তা আম সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য। এমন-কি কোন-কোনও ইউরোপীয় পণ্ডিত উ বাক্যটিকে এদেশের প্রাচীন সভ্যতা অত্যুজ্জ্বল নিদর্শনস্বরূপ পৃথিবীর লোকে চোখের সুমুখে তুলে ধরেছেন। সুতরা ও উপদেশটিকে আমরা হেলায় হারাতে প্রস্তুত নই। অতএব উক্ত বাক্যটির বর্ত্তমা যুগেও কোন সার্থকতা আছে কিনা তা বিচার করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ এই আপত্তি অনেকে তুলতে পারেন, যে যেহেতু ও-বাক্য সুন্দর সে

তা অকেজো। বাক্যের সৌন্দর্য্য টে যে অশিব এ-বিষয়ে ত পণ্ডিত- ত সকল-সমালোচক একমত। tarianism আমাদের একেবারে মজ্জা- ুরে গিয়েছে; সুতরাং উক্ত বাক্যের ও utility আছে কিনা তাই অবশ্য । আমি দেখিয়ে দিতে চাই যে ক্য মান্য করাতে সাহিত্যের কোনও না হোক, কোনও ক্ষতি হবে না।

বিচার্য্য শ্লোকের প্রতি ঈষৎ মনোযোগ ই দেখা যায় যে তার প্রথম-অংশে বিধি এবং শেষ-অংশে দুটি নিষেধ । আচার্য্য আদেশ করেছেন যে কথা বলিয়ো, প্রিয় কথা বলিয়ো"। টি সম্পূর্ণ পৃথক বিধি। "প্রিয়সত্য য়ো"—এ আদেশ তিনি করেন-নি। এব যে-সত্য উক্ত হলে শ্রোতা প্রীত ল, সে-সত্য গোপন করবার স্বাধীনতা াদের সম্পূর্ণ বজায় থাকল। সুতরাং বচন অনুসারে যে-বস্তু সত্যসত্যই ংসার যোগ্য তার প্রশংসা করতে আমরা নই—অর্থাৎ বঙ্গসাহিত্যে প্রতিভার য় দেওয়াটা আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে । সমালোচকেরা প্রিয়সত্য সম্বন্ধে মৌন- অবলম্বন করাতে সাহিত্যের যে াকার হয়, সে উপকার সাধন করা মাদের আয়ত্তের ভিতরই থেকে গেল। ারোক্ত বিধি দুটি সম্পূর্ণ যে পৃথক তার াণ—সত্য বলবার বিধি থাকলেও যখন য়সত্য বলবার বিধি নেই এবং অপ্রিয় া বলবার নিষেধ আছে তখন বুঝতে ব এ সত্য সেই সত্য যা প্রিয়ও নয় অপ্রিয়ও নয় অর্থাৎ নিরুপাধিক সত্য। এ-সত্য, দর্শনের অধিকারভুক্ত। অতএব "সত্য বলিয়ো" এ বিধি দার্শনিকের প্রতিই প্রযোজ্য,—সাহিত্যিকের প্রতি নয়। অপর-পক্ষে "প্রিয় বলিয়ো" এ বিধি সাহিত্যিকের প্রতিই প্রযোজ্য,—দার্শনিকের প্রতি নয়। তারপর "অপ্রিয় সত্য কহিয়ো না" এ নিষেধের দ্বারা যে-বাক্য মুখ্যতঃ অপ্রিয় তাই বাধিত হয়েছে, যা গৌণতঃ তা নয়। উক্ত বিধি শিরোধার্য্য করে সমালোচকেরা যদি এমন-কথা বলেন যার মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তি-বিশেষ কিম্বা জনসাধারণের মনোরঞ্জন করা এবং সে কথা যদি গৌণভাবে কারও পক্ষে অপ্রিয় হয় তাহলে তাতে-করে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করা হয় না। অতএব উক্ত বিধি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেও, সমালোচকেরা যথেষ্ট অপ্রিয় কথা বল্‌তে পারেন।

তারপর দেখা যাচ্ছে যে "অপ্রিয় সত্য" বলাই শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ কিন্তু "অপ্রিয় মিথ্যা" বলা সম্বন্ধে কোনই নিষেধ নেই। এ বিষয়ে সমালোচকদের অবাধ স্বাধীনতা আছে। সুতরাং সমালোচনার হালফ্যাসান বজায় রাখবার জন্য উক্ত শাস্ত্রবচন অগ্রাহ্য করবার কোনই প্রয়োজন নেই। অতএব রবীন্দ্রনাথ নববর্ষের পয়লা বৈশাখে এই পুরোনো কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে সমালোচনার স্বাধীনতা অপহরণ কর্‌বার চেষ্টা করেন-নি।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য উক্ত বাক্যটির আবৃত্তি করেই ক্ষান্ত হন-নি, সেই-সঙ্গে তিনি বলে-ছেন যে শিশুসাহিত্যের পক্ষে শাসনের চাইতে লালন-পালন বেশি কল্যাণকর।

বড়র পক্ষে ছোটর উপর হাত-চালানো অকর্ত্তব্য—একথা বলায় এ বোঝায় না যে ছোটর পক্ষে বড়র উপর হাত-চালানো অকর্ত্তব্য। সুতরাং সমালোচকদের পক্ষে কৃতি লেখকদের প্রতি ধৃষ্ট তাড়না করবার অধিকার রবীন্দ্রনাথ কেড়ে নিতে চাননি। যে-সব সমালোচকদের motto এই—"মারি ত রাজা, লুঠি ত ভাণ্ডার" রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বীরত্ব খর্ব্ব করবার প্রস্তাব করেন নি। রবীন্দ্রনাথ একথাও বলেন-নি যে, একের লেখার জন্য অপরকে গালিগ করা অন্যায়। সুতরাং দেখা গে রবীন্দ্রনাথ এমন কোনও কথা ব যার দরুন সমালোচকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে পারেন। কেননা হালফ্যাসানের সমা তাঁর নিষেধের অধিকার-বহির্ভূত। কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলুম। লেখার জন্য অপরকে প্রশংসা ক রবীন্দ্রনাথ কাউকে বারণ করেন-নি।

বীরব

রামছুঁচায়ন

ছুঁচামিতে বড় যারা তারা রামছুঁচা।
দুটা কান কাটা তাই মান ভারি উঁচা॥

* *
*

কিচ্‌ কিচ্‌ স্বরে ছুঁচা কয় একদিন।
"আমি প্রায় ক্ষুদ্রকায় কস্তূরী হরিণ"॥
খাঁদা নাক ফোলাইয়া ব্যাঙ কহে "ভাই!
এ খোঁজ রাখেনা কেউ কারো নাক নাই"॥

* *
*

সবঠাঁই গতিবিধি আছে যে ছুঁচার।
একথা সবাই জানে—ভুবনে প্রচার॥
ছুঁচার সর্ব্বত্র গতি—জানি ভালো-মতে।
দর্‌বারে সে যায়, কিন্তু, নর্দ্দমার পথে॥

* *
*

ছুঁচো কয় "শোনো মোর কুলজীর পাঁতি।
গণেশের বাহনের আমি হই জ্ঞাতি॥
বিধাতা অজাতশত্রু কৈল এ-জনায়।
অজগরও জব্দ হয় ঘাঁটালে আমায়"॥

* *
*

সাপে-কাটা ছুঁচো বার হয়েছে রে
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার!
কেউটের বিষে বিষিয়ে উঠেছে
রক্ষা নাহিক আর!
মন্ত্র ওষধি কিছু নেই ওর,
ঘাঁটাসনে ওরে, বাপ!
সাপে-কাটা ছুঁচো কাটে যদি সাপে
সাপই নাকি হয় কাব্!

* *
*

—ছুঁচা প্রতি নাই প্রীতি,—
তবে এ কেমন রীতি?—
ছুঁচার কীর্ত্তন কেন শোনে জনগণ?
—হায় বন্ধু, জান না কারণ?
বৈষ্ণব বাঙালী জাতি
তাই শুধু দিবারাতি
কীর্ত্তনের প্রীতে শোনে ছুঁচার কীর্ত্তন।

শ্রীনবকুমার কবিরা



প্রসাধন
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর-অঙ্কিত

শৈলদুর্গ

মাসকাবারী

সাত কথা

কেহ কেহ বলিতেছেন, দক্ষিণ বঙ্গের সাহিত্য-সুন্দর-বনের হলুম! হলুম! গর্জ্জনে আশপাশের জীবজন্তুরা বধির হইয়া বোবা বনিয়া যাইতেছে। মুখে তাহাদের ভাষা নাই—কেবল ইয়া ইয়া লাঙ্গুলের আস্ফালন!

* *
*

বঙ্গ-ভারতীর নবকুমারের জন্ম-পত্রিকায় দেখা গেল যে তিনি লক্ষ্মীছেলে নহেন। সেইজন্য লক্ষ্মীমন্ত ও তাঁহাদের সামন্তদের তিনি কখনো মন-যোগাইতে পারিবেন না। তিনি কেবল মরালদের জন্য মৃণালের ক্ষীর সঞ্চয় করিবেন।

* *
*

ছেলেবেলায় দেখিয়াছিলাম যাত্রার সঙে দাড়ি-গোঁফ সুদ্ধ পুরুষ, মেয়ে সাজিয়াছে। সম্প্রতি দেখিতেছি বাংলা সাহিত্যে এমনিতর সং বাহির হইয়াছে। কখনো বিবি-বেশে কখনো দিদি-বেশে লোক হাসাইতেছে। মনে পড়ে একবার দপ্তরীর বেশও দেখিয়াছিলাম—সেইটিই কিন্তু সব-চেয়ে মানাইয়াছিল।

* *
*

নাট্যশালার দৌলতে আমরা পুরাকালের মুনি-ঋষিদের চাক্ষুষ করিয়াছি, বহু দেব দেবীর দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, এইবার পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী দেখিলাম। এখন গয়া ধামের আবির্ভাবের অপেক্ষায় আছি; তাহা হইলে নাট্যশালায় পিণ্ডদানের ভারি সুবিধা হয়।

* *
*

প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, রবির আলো পেঁচা বাদুড় ও চামচিকেদের চক্ষু-চক্ষে সহে না। এখন এ আলো শীতল করিবার উপদেশ কি? কবি বলিতেছেন—

রবির গায়ে থুতু দিতে
উড়ছে বাদুড় মেলা
চামচিকে! নাম কিন্‌বি যদি
সঙ্গ নে এই বেলা!

* *
*

সাহিত্য-পুঙ্গবেরা কবি-জননী সরস্বতীকে না কি ঘুঁটে-কুড়ানী নামে অভিহিত করিতেছেন। সাহিত্যকুঞ্জে যেরূপ গোরুর পাল প্রবেশ করিতেছে তাহাতে বিল্ ঘুঁটে ডাঁই হইয়া কুঞ্জের সব ঠাঁই শীঘ্রই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। সেইজন্য জননী ভারতীর সেবকেরা এখন গোরুও তাড়াইতেছেন-ঘুঁটেও পোড়াইতেছেন।

* *
*

আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল প্রাণের দায়ে চীৎকার করিতেছে—"ভারতীর হাতে ঝাঁটা কেন?" ভারতী উত্তরে বলিতেছেন—"বাছা, তুমি আগে দূর হও—বীণা ত আমার আছেই!"

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত

ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

(১৩২৩ বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০] ভারতী কার্য্যালয়, [বার্ষিক মূল্য ৩৵০
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৩ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন)

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
তিপাণ্ডিত্যের উপদ্রব	...	শ্রীনবকুমার কবিরত্ন	...	৫৯৫
দ্ধরূপ হত্যা (সচিত্র)	...	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি-এল	...	১০২
ম্ল-মধুর	...	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম-এ	...	১৪৪
পরিমেয় (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	...	৩৫১
ল্প (গল্প)	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৩৭৪
ভিভাষণ না অতিভাষণ	...	শ্রীনবকুমার কবিরত্ন	...	৫৮৩
শীর্ব্বাদ	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	...	৫
রোহণ	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই		৬০
চোল (কবিতা)	...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম-এ	...	৩৩৩
ধুনিক ভারতের সভ্যতা	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪৪৫
র্টের আদর্শ (সচিত্র)	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৫৬৪
াদ (গল্প)	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৬৪৬
া (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	...	৩৯৬
বির নীড়	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৬
ব্য-সৌন্দর্য্যে শীল ও শ্লীলতা		শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল	...	২০০
লো ছায়া (গল্প)	...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	২৯০
ট-পতঙ্গের জীবনের কার্য্য	...	শ্রীজগদানন্দ রায়	...	৪১০
ফিয়ৎ	...	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী	...	১৪
ন-তিনেক চিঠি (গল্প)	...	শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী	...	৫০২
লা জানালায়	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	...	৪২৯
ও পদ্য (গল্প)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল		২২৬
জপুরে গোলাপক্ষেত্র (কবিতা)		শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ বার-য়্যাট-ল		১৪৬
াড়ায় গাফিলি	...	শ্রীমতী সরলা দেবী বি-এ	...	১৫১
কৃতার (গল্প)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল		৪৩২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
চয়ন—		
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী-সাহিত্য	...	২২
ষ্ট্রিণ্ডবার্গের নাটক	... ...	২৯
শেষজীবনে টলষ্টয়	... ...	২৯
চিত্র-পরিচয় ...	প্রসাদ	১৪৭, ২৮
চল্‌তি ভাষা ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	৫৫
চিত্রাবলী ...	শ্রীমতী সরলা দেবী বি-এ ...	৩৫
চৈতন চুটকি (গল্প) ...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই	৬৫
ছন্নছাড়া (কাহিনী) ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১০৬, ২৫৫, ৩৫
		৪৫৬, ৫৭৫, ৬
ছবির সাজসজ্জা ...	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম-এ, বি-এল	৫
জন্মস্মর (সচিত্র) ...	শ্রীমতী সরলা দেবী বি-এ ...	১৫
জাফরানিস্থান (কবিতা) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৬
ট্যালিসম্যান (গল্প) ...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	১
ডাক্তারির ঝক্‌মারী (গল্প) ...	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম-এ, বি-এল	৪৯
তখন ও এখন ...	স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	
দিদিমার শক্তি (গল্প) ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	
দুই সন্ধ্যা (গল্প) ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	
নব বার্ষিকী (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ...	
নব পত্রিকায় ভারতী ...	শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন ...	
নিষ্ফল (কবিতা) ...	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...	
নিরুত্তর (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি এ ...	
নূরজহান (সচিত্র) ...	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি-এল ...	
পদ্মের পাপড়ি—		
অভিনয় সমালোচনা ...	...	...
উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে	...	...
কাব্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন	...	...
কাব্য ও দুর্নীতি ...	...	...
ছিটওয়ালা সিবিলিয়ান সাহেব	...	...
বুড়ার কথা ...	...	...
ভারতী (কবিতা) ...	...	...

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ভূমিকা ...	...	৩২
রামিয়াড্‌ ...	...	২৬৩
রেলগাড়ি ...	...	৪৫৩
সমালোচনা (মেঘনাদবধ কাব্য) ...	...	৩৫
সম্পাদকের বৈঠক ...	...	৩৮
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ...	...	২৬৯
লায়নপর ও পলায়নের পর ...	শ্রীমতী সরলা দেবী বি-এ ...	৫৬০
থের প্রেম (কবিতা) ...	স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৯
রিচয় (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ...	১৮৬
রিচ্ছদ-পরিচারিকা (গল্প) ...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৬০৭
খনির্দ্দেশ ...	শ্রীজগদানন্দ রায় ...	২৭১
র্য্যায় ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ ...	৩০১
ণাম (কবিতা) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৩
থম প্রণয় (গল্প) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল	৬৬
াণশক্তির বিকাশ ...	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ ...	৩৪৭
রাতন কথা ...	শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী ...	২১২
ঞ্জলি ...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪
ঙ্কিমচন্দ্রের লিপি-রীতি বনাম সবুজ পত্র	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল ...	৮৫
ঙ্কিম-প্রসঙ্গ ...	শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	২৮৫
র্ত্তমান যুদ্ধে লিপ্ত দেশ ...	ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী পি, এইচ, ডি,	৪৯৩
চরণ ...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই...	৩৩৪
ক্ষ-সভার ছবি (নাটিকা) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল	৬২৫
বজ্ঞানিক প্রতিভা ...	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এল, এম, এস	৩০৩
ারতের কৃষিকার্য্য ...	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম-এ ; পি, আর, এস,	১১৭
ারতের অন্যান্য ধর্ম্ম ...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২০৮
ারতী ...	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	২০
ারতীর ছবি ...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই	২০
ারতী ও ভারতী-সম্পাদিকা...	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী ...	২৩
ারতী-স্মৃতি ...	শ্রীজলধর সেন ...	২৬
ারতীর ইতিহাস (সচিত্র)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ...	১২৬
ালো-মন্দ ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	৩৫৭

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
ভ্রষ্টযাত্রা (কবিতা)	...	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ	...	১০৫
মাস কাবারী—		সম্পাদকীয়		
আর্টের আধ্যাত্মিকতা	...	...	...	৬৮৩
ঋষি রবীন্দ্রনাথ	...	...	...	৫৯০
কবিতার প্রাণ	...	...	...	৪৮৩
ছোট গল্প	...	...	...	৪৮৪
নারী-সম্মান	...	...	...	৪৮২
নিধু গুপ্ত	...	...	...	৩৮১
পাঠোন্মত্ততা	...	...	...	৫৮৯
ভাষা-বিভ্রাট	...	...	...	৩৮২
ষ্ট্রাইন্ড বার্গ	...	...	...	৩৮৩
সাত কথা	...	...	...	৭১৪
সাহিত্যের ভাষা ও চলতি কথা		...	...	৩৮৪
সাহিত্য ও ভাষা-সমস্যা	...	...	...	৫৯০
হাসির গান	...	...	...	৫৮৮
মাতালের মাতলামি	...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	৫৫৬
মাতৃভাষা কি পেত্নী ভাষা ?	...	শ্রীনবকুমার কবিরত্ন	...	৪৭৮
মিলন-কথা (সচিত্র)	...	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	...	২৪৬
মৃত্যুঞ্জয় (কবিতা)	...	শ্রীমতী অনুরূপা দেবী	...	১১৪
মোদ্দা কথা	...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	..	৪২৫
যশোহর	...	রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি-এ	...	৩২৩
যুদ্ধ প্রসঙ্গে	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	...	৬৩
রাজা (কবিতা)	...	স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৩৭০
রামছুঁচায়ন (কবিতা)	...	শ্রীনবকুমার কবিরত্ন	...	৭১০
রোঁদার শিল্প-চাতুর্য্য (সচিত্র)		শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৩৫১
রেজকি	...	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বি-এ		৩৬৭
লজ্জার বিকাশ	...	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ	...	৫১৭
লেখার কথা	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৫৫০
শিশুর চরণ (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী	...	৬৪৫
শিল্পী রোঁদা (সচিত্র)	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	১৭০
শিল্পের স্বরূপ (সচিত্র)	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৪৬৯

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
শৈলপথে ও পত্রে (চিত্র)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি,এ	...	৫৩১
সত্যং ব্রূয়াৎ	...	বীরবল	...	৭০৮
সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা		শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর		১৯৬, ৫২০, ৫৩৬
সমালোচনা	...	শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা প্রভৃতি		৩৮৬, ৪৮৭,২৮২
সনেটের নিবেদন (কবিতা)	...	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম-এ	...	৯০
সপ্রতিভ (গল্প)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল		৬১
সাহিত্যিক স্মৃতি	...	রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি-এ	...	১৪০
সৌন্দর্য্যের বিজ্ঞান	...	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ	...	১৭৯
স্বেচ্ছাচারী (উপন্যাস)	...	শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বি-এল		৪১, ১৮৭, ৩০৯, ৩৯৯, ৫২৩, ৬১২
স্মৃতি	...	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম-এ	...	১৬১, ৩৭০
সংস্কৃত ভূত ও দেশী পেত্নী	...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল	...	৪৬৪

চিত্র-সূচী

চিত্র	পৃষ্ঠা
অন্ধ বাউল—	
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	১১
অভিশপ্তা ...	১৭২
অঙ্গহীন রমণী-মূর্ত্তি ...	৩৫৬, ৩৫৭
আলাপ—	
শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত	৬৮৯
আর্ম্মাডা ধ্বংসের পরে রাজ্ঞী এলিজাবেথের	
শোভাযাত্রা (বহুবর্ণ) ...	১৫৪
ইভ ...	১৭৩
উমার তপস্যা (বহুবর্ণ)	
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত	২
এগোডিন ...	৫৬৮

চিত্র	পৃষ্ঠা
উষ্ণজীবী ...	৫৭৩
একলার খেলা—	
শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে অঙ্কিত	৬৭১
ক্যালের নাগরিকগণ ...	৪৭২
গণেশ দাদা—	
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৬৮৭
চতুষ্পাঠী—	
শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৬৪৪
চলন্ত মানুষ ...	৩৫৪
জলপ্রপাত ...	২৮০
জল্‌কে (বহুবর্ণ)	
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দে অঙ্কিত	৫৯৪

চিত্র	পৃষ্ঠা
দোদুল দোলা—	
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	২১
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১২৯
তরুণী ...	১৭২
দীপ-শিখা (বহুবর্ণ)	
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার অঙ্কিত	৩৯০
দুজনে (বহুবর্ণ)	
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দে অঙ্কিত	৪৯২
প্রথম বর্ষের প্রচ্ছদপটের নমুনা	৩১
প্রসাধন—	
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর-অঙ্কিত	৭১১
পিতলের হাত ...	৫৭০
বৃদ্ধা ...	১৭৫
বামন ...	১৭৭
ভল্‌টেয়ার ...	৪৭৫
ভাবনা ...	৫৬৬
ভাগ্যদেবীত্রয় ...	৫৭৪
ভ্রান্তি ...	৫৬৯
ভিক্টর হুগো ...	৫৬৫
ম্যাগডেলিন ...	১৭৫
মার্সে ইয়েজ ...	৬৭১
মাইকেল এঞ্জিলোর নক্সা ...	৪৭৪
মিরাবো ...	৪৭৭

চিত্র	
মৃগ-তৃষা (বহুবর্ণ) ...	
মৃগয়া (বহুবর্ণ) প্রাচীন চিত্র হইতে	
মেডিসি ভেনাস ...	
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	
রোঁদার নক্সা ...	
লৌহযুগ ...	
শিউলিতলায় —	
শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র সিংহ অঙ্কিত	
শীত (ফাল্গুনী)	
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	
শের আফকনের সমাধি ...	
শৈলদুর্গ ...	
শৈলসুতা ...	
সরলা দেবী ...	১৩৪, ১
স্তব্ধ তরু—	
শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে অঙ্কিত	
স্বর্ণকুমারী দেবী ...	১৭১, ২
সেনাপতি নে ...	
সেণ্ট জন ...	
সেণ্ট পিয়ের ...	
হলওয়েল ...	
হিরণ্ময়ী দেবী ...	

পথ-শেষের পারে
পল্লীর প্রতি (
পথিক ২৮৭

ভারতীর

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

অমর (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ...	৬৯১
আশা (গল্প) ...	শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী ...	১১০৮
অভিসার (কবিতা) ...	শ্রীমতী লীলা দেবী ...	৯৬৬
অভিষেক (গল্প) ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	১০৫৫
অভ্র-আবীর (সমালোচনা) ...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ...	১০৩৭
অন্তঃপুর (নাটিকা) ...	শ্রীসুবোধ চট্টোপাধ্যায় ...	৮২৪
আচার ...	পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ...	৭১৭
আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার (সচিত্র)	শ্রীজগদানন্দ রায় ...	১০৯৭
আর্টের উপকারিতা (সচিত্র)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ...	৮৭৮
আঁধারে আলো (কবিতা) ...	শ্রীমতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য ...	৭৪৭
আমার বিরহ (কবিতা) ...	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ...	১২১০
আমার বেদনা (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ...	৮৫০
আমাদের শরীরের যুদ্ধের কথা	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এল, এম, এস	১২১৭
আলো (নাট্যচিত্র) ...	... ...	১১৩৯
আহোমরাজের বাঙ্গালী গুরু	শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ ...	১১৫৬
উত্তর বাতাস (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ...	১০৪২
একটি নূতন আবিষ্কার ...	শ্রীজগদানন্দ রায় ...	৭২৬
কাশ্মীরী বাগ্ (সচিত্র) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল	১২২২
কৃষি-কার্য্যের উপকারিতা ...	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ ...	৮১৩
কেরাণীস্থানের জাতীয় সঙ্গীত (কবিতা)	শ্রীনবকুমার কবিরত্ন ...	১০৫৫
গ্রীক আর্টের কথা (সচিত্র)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ...	১২৬০
গোয়েন্দাগিরি ...	শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত ...	৯৫৫
চোর (গল্প) ...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ..	১২২৯
ছন্নছাড়া (কাহিনী) ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	৭৭৮, ৮৭২
		৯৬৭, ১০৪৩, ১১৪৯, ১২৬৬
ডাকাত (গল্প) ...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ...	৭৭১
তরুতীর্থ (গল্প) ...	শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী ..	৮৫১
তার রূপ (কবিতা) ...	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ...	১০৩৬
তাতাজিনের মৃত্যু (নাটিকা)	শ্রীসুবোধ চট্টোপাধ্যায় ...	১১৯৫

পথ-শেষের পারে ([illegible] তা)	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ...	১০৫৮
পল্লীর প্রতি ([illegible] কবিতা ...	শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ...	৯৭৪
[illegible] ([illegible] টিকা) ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	৯৪৫
পূজার সময় (নক্সা) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল	৭৬০
প্রবাস-স্মৃতি ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ, ...	১২৫৪
পোড়াবমুখী (গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ...	১২৮৪
ফুল-শয্যায় (কবিতা) ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	১০৫৩
বঙ্কিমচন্দ্রের লিপি-রীতি বনাম সবুজ পত্র	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম-এ, বার-য়্যাট-ল	৭৫৪
বঙ্গীয় সেনরাজগণের উত্তর-চরিত	শ্রীমতী সরলা দেবী বি-এ, ...	১০৭৬
বর্ত্তমান যুদ্ধে লিপ্ত দেশ ...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ চৌধুরী পি, এইচ, ডি	১০১৩,১২৩৫
বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে ...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল ...	৯১০
ঐ ...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম-এ, বার-য়্যাট-ল	৯১১
বাঙ্গলা দেশে শিশুমৃত্যু ...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ...	৮৩৪
বাঙ্গলার শেষ হিন্দু রাজবংশ	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	১০৮৪
বিড়ম্বনা (কবিতা)	শ্রীমতী লীলা দেবী ...	১২৫৯
বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদ ...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ...	১১৩২
বৌদ্ধধর্ম্ম ও স্ত্রীলোকের সন্ন্যাস-ধর্ম্মের পরিণাম ...	পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ...	৯০৫
ভারতের উদ্যান ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল	১০৫১
মনের কথা ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ...	১১৪৫
"মা" (গল্প) ...	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল	১০২৭
মানসিক ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ...	৯২৬
মাসকাবারী—	সম্পাদকীয়	
অস্কার ওয়াইল্ডের বচন	... ...	৮৯৬
আনন্দমঠ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত	... ...	১২৭৬
ইতিহাস-রচনার প্রণালী	... ...	১২৭৭
কাব্যে নীতি ...	... ...	৯৯৭
নারীর সামাজিক অধিকার	... ...	১২৭৫
চলতিভাষা ও সাধুভাষা	... ...	১২৮০
পলায়নের ছবি ...	... ...	১০৯২
বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ (সচিত্র)	... ...	১০৮৬
বাঙ্গলার গীতি-কবিতা (সচিত্র)	... ...	১০৯৯
বাঙ্গলা মাসিক-পত্র ...	... ...	১১৮৭
বাংলার উপন্যাস	... ...	১২৭৩

[illegible]রের ছাপ	...	
[illegible]ষার আকার ও বিকার	...	
[illegible]বনমনোমোহিনী ...	... ...	
[illegible]ল স্বীকার ...	... ...	১১৯১
[illegible]ক্ষণশীল—উন্নতিশীল	... ...	১২৭৮
[illegible]বীন্দ্র-প্রসঙ্গ ...	... ...	৭৯৪
[illegible]বীন্দ্রনাথ ও জাপান	... ...	১২৮৩
[illegible]মালোচনা ও সপেনহয়র	... ...	৮৯৫
[illegible]সামাজিক সমালোচন-রীতি	... ...	১২৭৯
[illegible]হিত্যে অশ্লীলতা ...	... ...	৮৯৩
[illegible]ক-মামলের বাগান (সচিত্র)	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল	১১৮৩
[illegible]লী (গল্প) ...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই ...	১২১৪
[illegible]হাতে (গল্প) ...	রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর ...	৯১৩
[illegible]ত্তর সাহিত্য ...	শ্রীনবকুমার কবিরত্ন ...	৯৯১
[illegible]টকৃসিন্ ...	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এল, এম, এস	৮২০
[illegible]নাথ ও আধুনিক যুবক	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ ...	১১৬৯
[illegible]র বিশেষত্ব (সচিত্র) ...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ...	৯৭৫
[illegible]-প্রসঙ্গ ...	শ্রীঅসিতকুমার হালদার ... ৯৪২,	১১৪৩
[illegible]প্রসঙ্গে (সচিত্র) ...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ...	৭৮৪
[illegible]ত্তিষ্ঠতজ্ঞানরঃ (কবিতা)	শ্রীনবকুমার কবিরত্ন ...	৭৫৩
[illegible]ষয়িক ভারতের সভ্যতা	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৮৪৭
[illegible]ষয়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৪৮, ৯৬১	১১১৪, ১২১১
[illegible]লোচনা ...	শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা ৭৯৮,	১১৯১,১২৯০
[illegible]ঐ ...	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি-এ ...	৮৯৯
[illegible]লোচনার কথা ...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ...	৭৬৯
[illegible]ত সাহিত্যে মহাকবি অশ্বঘোষের [illegible]মান-নির্ণয় ...	শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, ...	৯৩৭
[illegible]ত্য-সম্বন্ধে দু-একটি কথা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ ...	৮৬২
[illegible]ত্যের ভাষা ...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম-এ, বার-য়্যাট-ল	১০৬১
[illegible]-সঙ্গীত (কবিতা) ...	শ্রীনবকুমার কবিরত্ন ...	৭৬৭
[illegible]মারী (উপন্যাস)	শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বি-এল ... ৭৩৩,	৮০৩
		৯৩০, ১০০৩, ১১১০
[illegible]ভুজীবন ও বৌদ্ধধর্ম্ম	পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ...	১১৬২

চিত্র (... তা)
দোদুল দোকবিতা ....
শ্রীটক ...
পূজার সম... ...

চিত্র সূচী

চিত্র	পৃষ্ঠা
অঞ্জলি (বহুবর্ণ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় অঙ্কিত	৭১৬
আঘাত বা উত্তেজনায় উদ্ভিদের সাড়া	১১০৯
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ...	১০৯৮
আচার্য্য বসুমহাশয়ের পরীক্ষা	১১০৫
আদম ...	৯৭৮
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—স্যর	১০৮৭
অ্যাপলোর মুখ ...	১২৭১
আন্টিনস্ ...	১২৬৭
ইভ ...	৯৭৯
উদ্যান-প্রসাধন ...	১১৮৫
একটি বন্দী-মূর্ত্তি ...	৭৯১
কলহ (বহুবর্ণ) প্রাচীন চিত্র হইতে	৯০৪
কামিনী-মূর্ত্তি ...	৭৮৬
কুস্তিগীর ...	১২৬৯
গ্রীকদেবতা অ্যাপলো ...	৯৮৪
চরণাশ্রয়ে (বহুবর্ণ) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত	৮০২
চিত্তরঞ্জন দাশ শ্রীযুক্ত ...	১০৮৯
চিন্তা-তরঙ্গিনী ...	৭৯৩
চিত্রকর শাভান ...	৮৯১
চ্যুত কমল ...	৮৮৩
তরুণী জননী ...	৮৮৯
দেবী এথেনী ...	১২৬৩
নদীতীরের বাগান ...	১২২৫
নানা রাসায়নিক যোগে পরীক্ষা	১১০৭
নিশৎ বাগ ...	১২২৮
পরীক্ষার পূর্ব্বে লজ্জাবতী লতা	১১০৩

চিত্র	
পার্থিবতায় বন্দী ...	
পার্সিপোলিসে আলেকজান্দার (বহুবর্ণ)	
পূজার পথে ...	
ফিডিয়াসের রচনা-ভঙ্গীর নমুনা	
বিজন তীর ...	
বিজয়-লক্ষ্মী ...	
বিজয়চন্দ্র মজুমদার শ্রীযুক্ত ...	
ব্যালয্যাক ...	
ভায়ের কপালে দিলুম ফোঁটা— শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	
ভাস্কর ওগস্ত্ রোঁদা ...	
ভুজবন্দিনী বিদ্যাধরী ...	
মৃত খৃষ্ট ...	
মেষ্ট্রোভিকের গঠিত মূর্ত্তি ...	
যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী শ্রীযুক্ত ...	
রূপরাণী ভেনাস ...	
লিসিপ্পাসের গড়া ক্রীড়ক-মূর্ত্তি	
হুগোর প্রতি সম্মান (শাভান অঙ্কিত)	
"হেলাফেলা সারাবেলা" (রঙিন) শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দে অঙ্কিত	
হোরি (বহুবর্ণ) শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	
শশধর রায় শ্রীযুক্ত ...	
শিখর-প্রহরী ...	
শিল্পীর পাষাণ-প্রেয়সী ...	
শিল্পে প্রথম হাস্য ...	
সেকেন্দ্রা ...	

N. C. Mathur Family Library
Navay ... Mathur
... Calcutta
29-11-15



অঞ্জলি

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় অঙ্কিত

ভারতী

৪০শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩২৩ [৭ম সংখ্যা

আচার

বেদপন্থীরা আচারকে এতদূর আবশ্যক মনে করেন যে, বালকের শিক্ষার আরম্ভ হইতেই তাহাকে প্রধানত আচারই শিক্ষা দেওয়া তাহার সহিত অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। আচারই তাহার প্রধান রক্ষণীয় থাকে। ব্রহ্ম বা বেদ-গ্রহণের জন্য তাহাকে বরাবর আচারই শিখিতে হয় (ব্রহ্মচর্য্য); যিনি তাহাকে শিক্ষা প্রদান করেন, তিনিও আচার-পরায়ণ, স্বয়ং আচরণ করিয়া বালককে শিক্ষা দেন, এই জন্যই তিনি আচার্য্য। * উপনীত বালককে আচার্য্য পুঁথী পড়াইতে আরম্ভ না করিয়া প্রথমত শৌচ, আচার অগ্নিকার্য্য ও সন্ধ্যোপাসনা, এই কয়টি শিখাইতে আরম্ভ করেন (মনু, ২-৬৯)। বচন তুলিয়া পুঁথী বাড়াইয়া লাভ নাই। বেদপন্থীরা আচারকে এতদূর আবশ্যক মনে করেন কেন, বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, সদাচার ধর্ম্মের মূল (মনু, ৪-১৫৬)। ধর্ম্ম কেবল পুঁথীতে পড়িয়া, বা উপদেশকের নিকট শুনিয়া লাভ নাই, তাহাকে অনুষ্ঠান বা অনুভব করিতে হইবে। সদাচার অবলম্বন না করিলে এই অনুষ্ঠান বা অনুভব দুই-একটি মহানুভব ব্যক্তির হইলেও সাধারণ লোকের হয় না, শক্তি বা যোগ্যতাই জন্মে না। তাঁহারা আরো বলিয়াছেন, আচার দ্বারা দীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে পারা যায়; অপর

* "আচার্য্যো ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে"—অথর্ব্ব, ১১·৭·৭; "আচারং গ্রাহয়তি"—যাস্ক, ১·২·২·, "আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থম্ আচারে স্থাপয়ত্যপি, স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন চোচ্যতে।"—ভামতীধৃত (বেদান্তদর্শন, ১·১·৪) পুরাণ।

পক্ষে যাহারা সদাচার পালন করে না,—যাহারা দুরাচার, তাহারা সংসারে নিন্দিত হয়, দুঃখভাগী হয়, ব্যাধিত হয়, এবং অল্পায়ু হয় (মনু, ৪-১৪৬-১৫৭)। যাঁহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া অপক্ষপাত হৃদয়ে বেদপন্থীর ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিতে উপদিষ্ট সদাচার-বিষয়ক অধ্যায়গুলি পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা সদাচারের ফলসম্বন্ধে উক্ত কথা কয়টির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। না পড়িয়া, না দেখিয়া-শুনিয়া তর্ক করিলে ঐ তার্কিকের সহিত আলোচনা করা বৃথা।

স্মৃতিসংহিতাসমূহে যাহা আচার ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, ধর্ম্মসূত্রসমূহে তাহা সাময়াচারিক ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুরুষ-কৃত ব্যবস্থার নাম সময়। সময়-মূলক আচার সময়াচার। যাহা সময়াচারে হয়, তাহা সাময়াচারিক। ইহাতে বুঝা যাইবে শিষ্টগণ† ব্যবস্থা করিয়া যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাই আচার। এই আচারও ধর্ম্মহেতু বলিয়া ধর্ম্ম। আপস্তম্ব বলিয়াছেন (ধর্ম্মসূত্র, ১-২০-৬-৭)—"ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলে না যে, 'আমরা এই, তোমরা (আমাদিগকে) আচরণ কর!' অথবা দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, বা পিতৃগণও আসিয়া বলেন না যে, এইটি ধর্ম্ম, বা এইটি অধর্ম্ম।' যাহা করিলে আর্য্যেরা প্রশংসা করে তাহা ধর্ম্ম, আর যাহা তাঁহারা নিন্দা করেন, তাহা অধর্ম্ম।" ‡ হিরণ্যকেশী (১-৮-২০-২৮) ও আপস্তম্ব (২-২৯-১৫) নিজ ধর্ম্মসূত্রের সর্ব্বশেষে বলিতেছেন, লোক ও অন্যান্য সমস্ত বর্ণেরই নি হইতে অবশিষ্ট ধর্ম্মসমূহ জানিবে—কে কেহ ইহা বলিয়া থাকেন। §

এই সমস্ত কথার সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রে আচারসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে যাইবে, বিহিত আচারগুলিকে কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। (১) কতকগুলি স্বাস্থ্যবিষয়ক; যেমন, ভোজনের পর, রোগাবস্থায়, বা বহু রাত্রিতে করিবে না (মনু, ৪-১২৯)। (২) কতকগুলি আধ্যাত্মিক-উন্নতি-বিষয়ক; যথা, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, শরীর ক্লেশ, বেদতত্ত্বার্থ চিন্তা করিবে (ঐ, ৯২)। (৩) কতকগুলি (আলস্যাদি) দোষের নয়ন-বিষয়ক; যেমন, (অনাবশ্যক) ঘর্ষণ করিবে না, তৃণ ছেদন করিবে দাঁত দিয়া নখ কাটিবে না (ঐ, ৭১)। (৪) কতকগুলি বিপদ্‌নিবা বিষয়ক; যথা, প্রাকারবেষ্টিত গ্রামে ভিন্ন অপর স্থান দিয়া প্রবেশ করিবে (ঐ, ৭১)। (৫) কতকগুলি নানা

† "সর্ব্বজনপদেষু একান্তসমাহিতানাম্ আর্য্যাণাং বৃত্তং সম্যগ্‌বিনীতানাং বৃদ্ধানাম্ আত্মবতাম্ অলো পানাম্ অদাম্ভিকানাং বৃত্তসাদৃশ্যং ভজেত॥ এবমুভৌ লোকৌ জয়তি॥" আপস্তম্ব, ১·২০·৮; ২·২৯· গৌতম, ১·২·২৬; তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ১১·৪।

‡ "ন ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চরত আবাং স্ব ইতি। ন দেবগন্ধর্বা ন পিতর ইত্যাচক্ষতেঽয়ং ধর্ম্মোঽয়মধর্ম ॥ ৬॥ যৎ ভার্য্যাঃ ক্রিয়মাণং প্রশংসন্তি, স ধর্ম্মো যদ্ গর্হন্তে সোঽধর্ম্মঃ॥"

§ "স্ত্রীভ্যঃ সর্ব্ববর্ণেভ্যশ্চ ধর্ম্মশেষান্ প্রতীয়াৎ॥"

-সংক্রমণের নিষেধবিষয়ক; যেমন, পতিত, ল-প্রভৃতির সহিত বাস করিবে না (ঐ, ৭৯)। (৬) কতকগুলি নীতিবিষয়ক; যেমন, সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে; কিন্তু প্রিয় সত্য বা প্রিয় অসত্য বলিবে না (ঐ, ১৩৮); হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, বিদ্যাহীন, পহীন, দ্রব্যহীন, বা জাতিহীন ব্যক্তিকে না করিবে না (ঐ, ১৪১। (৭) কতকগুলি লৌকিক বা সামাজিক অর্থাৎ প্রচলিত তি, প্রথা বা তৎকালিক ব্যবহার-বিষয়ক; যেমন, প্রসাধন পূর্ব্বাহ্ণেই করিবে (ঐ, ৫২); অথবা, কাংস্যপাত্রে পা ধুইবে না (ঐ, ৬৫)। ইন্দ্রধনু (রামধনু) উঠিলে াহাকেও তাহা বলিবে না যে, (এই) ইন্দ্রধনু; যদি বলিতেই হয় তবে মণি-নু বলিবে (বৌধায়ন, ২-৩-৩৩)। এইরূপ আরো ভাগ করিতে পারা যায়।

যাঁহারা আচারের মূলোচ্ছেদের পক্ষপাতী, তাঁহাদের শেষোক্ত লৌকিক বা সামাজিক আচারই প্রধান লক্ষ্য। অন্যান্য আচার-সম্বন্ধে বলিবার বা বিবাদ করিবার তেমন কিছু নাই, কেননা, সে সব স্থানে যুক্তি আছে। কিন্তু সামাজিক আচারে সর্ব্বত্র যুক্তি পাওয়া যায় না। প্রসাধন পূর্ব্বাহ্ণেই করিতে হইবে কেন? মধ্যাহ্নেও ত করিতে পারা যায়। কাংস্যপাত্রে পা ধুইবে না কেন? ইন্দ্রধনু বলিবে না কেন? ইহাতে কি হয়? "যে বয়সে ছোট, বা যে বয়স্থ হয়, তাহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে; ক্ষত্রিয়কে অনাময়, বৈশ্যকে অনষ্ট (অর্থাৎ কিছু নষ্ট হয় নাই ত), এবং শূদ্রকে আরোগ্য জিজ্ঞাসা করিবে (আপস্তম্ব, ১-১৪-২৬-২৯)।"—এরূপ বিশেষ বিধানের তাৎপর্য্য বা যুক্তি দেখা যায় না। এ কেবল ব্যবহার। যে সময়ে এই আচারের কথা লিখিত হইয়াছে, সমাজে তখন এই রীতিই প্রচলিত ছিল। প্রামাণিক ব্যক্তিগণ এইরূপই করিতেন। ইহাই আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অতএব ইহার ব্যতিক্রম নিন্দিত হইত, এবং ইহা অতি স্বাভাবিক। শিষ্টেরা যখন এইরূপ আচরণ করিতেন, তখন সেই শিষ্টাচার সকলেরই অনুসরণীয় হইয়াছিল। শিষ্টাচারও ধর্ম্ম। তাই সাময়াচারিক-ধর্ম্মসূত্রসমূহে এই সব স্থান পাইয়াছে।

কেবল বেদপন্থী নহে, সমস্ত-পন্থীরই এইরূপ আচার,—একরূপে না হউক, অপর-রূপে,—রহিয়াছে। শয়ন-ভোজন-ভ্রমণ-প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই বিশেষ-বিশেষ আচার আছে, এবং এই সমস্ত আচারের অল্পমাত্রও ব্যতিক্রম অত্যন্ত দূষণীয় বলিয়া মনে হয়।

আচার একটি বিশেষ নিয়ম ভিন্ন কিছুই নহে, এবং নিয়ম স্বভাবতই সঙ্কোচক হইয়া থাকে। রোগী কত কি জিনিস খাইতে চাহে, চিকিৎসক সেখানে নিয়ম করিয়া মুগের যূষ ব্যবস্থা করেন। রোগীর প্রবৃত্তি কত জিনিসে গিয়াছিল, সঙ্কুচিত হইয়া গেল। এইরূপ করিতে হইবে, এইরূপ নহে—ইহাই আচার। এই আচারও পূর্ব্ববৎ সঙ্কোচ আনয়ন করে। মানুষের প্রবৃত্তি বা গতি উন্মুক্তভাবে ছুটিতে না পারিয়া আচারের বশে সঙ্কুচিত হইয়া যায়; কতকটা গণ্ডী আসিয়া পড়ে। মানুষ যতদিন সমাজে রহে, ততদিন তাহার অনুরোধে তাহার

আচারকে অনুসরণ করিতে সে বাধ্য হয়। এবং তাহা করিয়া অজ্ঞাতসারে একটা গণ্ডী বন্ধন করিয়া ফেলে। সে হয়ত মনে করিতে পারে, আচার বিচার কিছুই মানিবে না, এসব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া চলিয়া যাইবে। ইহা হইতে পারে—যদি সে একবারে বনে চলিয়া যায়। কিন্তু যতদিন সে লোকালয়ে থাকে, ততদিন কোনো-না-কোনো সমাজে তাহাকে থাকিতেই হয়। তখন এক সমাজের আচারকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেও অন্য সমাজের আচারকে ধরিতে হয়। ফলত যেরূপেই হউক, আচারটা থাকিয়াই যায়, কেবল রূপটা পরিবর্ত্তন করে মাত্র। আচারটা থাকিয়া গেলে তাহার আনুষঙ্গিক গণ্ডীবন্ধনও আসিয়া পড়ে—তাহা যেরূপেই হোক। কেহ কোনো সমাজে থাকে, অথচ তাহার আচার মানে না, ইহা হয় না। যদি না মানে তাহা হইলে, মনু যেরূপ বলিয়াছেন (৪·১৫৭), সে ব্যক্তি নিন্দিত হয়—"দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।" এ কথাটা কেবল বেদপন্থীর সমাজের নহে, দেশ-বিদেশের সব সমাজেরই নিয়ম। লোকপরম্পরায় প্রাচীন-প্রাচীনতর কাল হইতে সমাজে অনেক আচার চলিয়া আসে, এবং খুব শিক্ষিত হইলেও লোকে এই সকল আচার অনুসরণ করিয়া থাকে—যদিও সর্ব্বত্র যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কালের পরিবর্ত্তনে আবার এই সমস্ত আচার পরিবর্ত্তন-প্রাপ্ত হয়, কতকগুলির উপর তেমন আস্থা থাকে না, কতকগুলি হইয়া যায়, আবার কতকগুলি বা উদ্ভূত হয়। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউ সামাজিক ব্যক্তি এগুলি মানিয়া চলে।

আচার জিনিসটা বাহ্য। ইহা এ বন্ধন আনয়ন করে বটে, কিন্তু এ ব বাহিরের বন্ধন, ইহা ভিতরের বন্ধন ন মানুষকে পশু করে ভিতরের বন্ধন; ম পাশবদ্ধ হয় দেহের বন্ধনে নহে, অন্ত আত্মার বন্ধনে। তাই বাহিরের যত বন্ধ কাট না কেন, ভিতরের বন্ধন কাটা যাওয়ায় বাহিরে নূতন নূতন বাঁধন আপ আপনিই ফুটিয়া বাহির হয়। একটা ব মানের ঘটনায় কথাটা সুস্পষ্ট বুঝিতে পা যায়। স্পষ্ট কথা বলিতে হইলে, এই আচার লইয়া তীব্র আলোচনা চলিতে তাহা বেদপন্থীর প্রধানত দুইটি কথা লইয়া (১) একটা, সকলের স্পৃষ্ট অন্নাদি ভোজ না করা; (২) আর একটা নির্বিচারে সর্ব জাতির মধ্যে বিবাহে আদান-প্রদান করা। দেখা যাইতেছে, দেশ যতই কে সুসভ্য, অথবা সুসভ্যম্মন্য হউক না, এ আচারকে একবারে বর্জ্জন করিতে পারি তেছে না; বরং দেখা যাইতেছে, যাহা আগে ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাকেই আবা ফিরিয়া দৃঢ়ভাবে ধরিতেছে। স ভ্য শব্দে প্রচলিত অর্থে মার্কিন মুলুক খুবই সুসভ দেশ, কিন্তু সেখানকার অনেকগুলি রা নিয়ম আঁটিয়া ফেলিয়াছে, নিগ্রোদের সহি শ্বেতাঙ্গদের আর বিবাহ হইবে না।[¶]

¶ "The constitution of six of the American States prohibit negro-white inter-marriages. Twenty-eight of the states have statute-laws forbidding the inter-

ন ইহারা এরূপ করিল? যেখানে া ছিল না, সেখানে এরূপভাবে তাহারা া আনিল কেন? মোগল-পাঠানে ওয়া-খাওয়া-বিবাহে বাধা ছিল না, কিন্তু াহাদের দ্বন্দ্ব বাধিয়া ছিল। ফরাসী-ইংরাজ র্ম্মান-প্রভৃতিরও সেরূপ বাধা নাই, াপি তাহাদের লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম াধিয়া গেল কেন? তাই দেখা যাইতেছে, াচার ত্যাগ করিলেই যে গণ্ডী ভাঙিয়া াইবে, মুক্ত হইয়া যাইবে, তাহার াশা নাই। যতদিন ভিতরের বন্ধন, িতরের গণ্ডী না যাইতেছে, ততদিন েরূপেই হউক, তাহা বাহিরে ফুটিয়া বাহির ইবেই। ভিতরে মুক্ত-উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে াহিরের আচার-আবরণ লণ্ঠনের আলোর াচের মত মানুষকে আর গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধত বাঁধিয়া রাখিতে পারে না; অথচ কার্য্যের জন্য ঐ কাচ আবরণটা আবশ্যক য়। যদি কাহারো আলোর প্রয়োজন হয়, াহাকে লণ্ঠনে কাচ-লাগাইতেই হইবে। তেমনি যদি সমাজের প্রয়োজন থাকে তবে াচারও মানিতে হইবে।

আচার থাকিলেই যে ধর্ম্ম উদার হইল না, তাহার কোনো মানে নাই। তাহা হইলে যে বৌদ্ধধর্ম্মকে অতি-উদার বলিয়া প্রশংসা করা হইয়া থকে, তাহাও উদার হইতে পারে না; কেননা তাহা অত্যন্ত আচার-বহুল। বিনয়পিটকখানি কেবল আচারই উপদেশ করিয়াছে। কয়খানি চীবর থাকিবে, কত বড় হইবে, কিরূপভাবে পরিতে হইবে; দাঁতনখানি কত বড় লম্বা হইবে, কতটুকু মোটা হইবে (চুল্ল·৫·৩১); ছুঁচ রাখিবার জায়গাটা কিসের হইবে, কিসের হইবে না (ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ, প্রায় ·৮৬); বসিবার আসনখানা কত বড় বা কিরূপ হইবে (ঐ, ৮৭); কেমন করিয়া গ্রামে যাইতে হইবে, কেমন করিয়া খাইতে হইবে; এইরূপ বিধানে বিনয়পিটক পরিপূর্ণ। আবার এই সমস্ত বিধানে বৌদ্ধদের কিরূপ নিষ্ঠা তাহা বৈশালীর দ্বিতীয় ধর্ম্ম মহাসঙ্গীতিই (Second Buddhist Council) প্রকাশ করিতেছে। যেখানে ভোজনের সময় নুন পাওয়া যায় না, সেখানকার জন্য শিং এ করিয়া তাহা লইয়া যাইতে পারা যায় কি না

marriage of negro and white persons. Twenty of the states have no such laws; in ten of those latter states bills aimed at the prevention of negro-white inter-marriages were introduced and defeated in 1913....The Florida constitution prohibits inter-marriage between white persons and other possessing even one sixteenth or more negro blood. Many such persons do not physically show their affinity with the negro race....Alabama is the only state which would seem to have attempted to reach all the causes of negro-white amalgamation. Three of these states have in addtion to laws against inter-marriage, laws against cohabitation and against concubinage.....'The Modern Review, August, p. 208. See also the chapter "Cast in America" in Lajpat Rai's "*The United States of America.*" (dp. 387—399.)

("সিঙ্গিলোণকপ্প")? মধ্যাহ্নের পর সূর্য্যের ছায়া দুই আঙুল সরিয়া গেলে ভোজন করিতে পারা যায় কি না ("দ্বঙ্গুলকপ্প")? এইরূপ আর আটটি বিষয় লইয়া (চুল্ল ১২) বৈশালীর বৃজিবংশীয় ভিক্ষুগণের সহিত অন্যান্য ভিক্ষুর বিবাদ উপস্থিত হয়। বৃজি-বংশীয় ভিক্ষুগণ ঐ সব করিতে চাহিতে-ছিলেন, আর অন্যান্য ভিক্ষুগণ তাহাতে বাধা প্রদান করিতেছিলেন। ধর্ম্ম মহাসঙ্গীতির বিচারে বৃজিবংশীয় ভিক্ষুগণের পরাজয় হয়, এবং ঐ দুরাচার সঙ্ঘমধ্যে পরিত্যক্ত হয়। বিচার করা হইয়াছিল স্বয়ং বুদ্ধদেবেরই আদেশ বা উপদেশ অনুসারে। তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন, সঞ্চিত খাদ্য খাইবে না (ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ, প্রায় ৩৮) এবং বিকালে (অর্থাৎ মধ্যাহ্নের পরে) আহার করিবে না (ঐ, ৩৭)। উল্লিখিত বিবাদের আর একটি বিষয় ছিল, ভিক্ষুরা সোনা-রূপা ধারণ বা গ্রহণ করিতে পারে কি না। বৃজিবংশীয় ভিক্ষুগণ উপোসথের দিবসে কাঁসার থালায় জল দিয়া সঙ্ঘের মধ্যে রাখিয়া উপস্থিত উপাসকগণকে বলিতেন যে, যাহার যাহা ইচ্ছা প্রদান করুন। উপাসকেরা সোনা-রূপা যে যাহা পারিত, সেই থালায় দিত। পরে ভিক্ষুরা তাহা সমান ভাগ করিয়া লইত। একবার কলন্দক-পুত্র যশ বৈশালীতে ছিলেন। ভিক্ষুরা ইঁহাকেও এক ভাগ লইতে বলিলে তিনি এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন যে সোনা-রূপা লওয়া উচিত নহে; বুদ্ধদেব নিষেধ করিয়াছেন। এইরূপেই বিবাদ আরম্ভ হয়, এবং পূর্ব্বোক্ত রূপে তাহার মীমাংসা হয়। বুদ্ধদেব ভিক্ষুদের সোনা-রূপা লওয়া নিষেধ করিয়াছি[লে]ন কেন, কলন্দকপুত্র যশ বৈশালীর উপাস[ক]গণকে তাহা এইরূপে বুঝাইয়াছিলেন [যে] যে সোনা-রূপা গ্রহণ করে, তাহার শ[ব্দ] স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চবিধ কা[মে]র বিষয়ে আসক্তি জন্মে, এবং তাহা হই[তে] শ্রমণ আর শ্রমণ থাকে না, অশ্র[মণ] হইয়া পড়ে। এইরূপ শিং-এ করিয়া এ[ক] নুন লইয়া গিয়া খাইলে কিছুই আ[সি]য়া যায় না, কিন্তু একটু-একটু নুন রাখি[তে] রাখিতে অন্যান্য খাদ্য বস্তুও সঞ্চয় করি[তে] ইচ্ছা হয়, তাহা আপনিই আসিয়া পড়ে। ত[াই] অন্যান্য উপভোগ্য বস্তুও সঞ্চয় করিতে ই[চ্ছা] হইতে পারে, এবং তাহা হইলেই অন[র্থ] একদিন মধ্যাহ্নের পর সূর্য্যের ছায়া [দু]আঙুল সরিয়া যাইবার পর আহার করি[লে] বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু তাহা[তে] কোনো দোষ হয় না বলিয়া প্রচার করি[য়া] বুদ্ধদেব যে উদ্দেশ্যে বিকাল-ভোজন নি[ষে]ধ করিয়াছেন, তাহার সফলতার অনেক বি[ঘ্ন] আসিয়া উপস্থিত হয়। নিষ্ঠা—দৃঢ়নিষ্ঠা [না] থাকিলে সিদ্ধি চিরকালই দূরবর্ত্তিনী থাকি[য়া] যায়।

সমাজের সমস্ত লোকই বিজ্ঞ-বিবেচ[ক] মনস্বী নহে। পণ্ডিত, মূর্খ, গণ্ডমূর্খ, গজমূ[র্খ] এই সকলকেই লইয়া সমাজ হইয়াছে। [এই] সমাজের হিতচিন্তা করিতে হইলে, [এ]সকলেরই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোনো মঙ্গলের জন্য নিয়ম করিলে বা উপদেশ দিলে, এরূপভাবে তাহা করি[তে] হইবে যেন সকলেই তাহা বুঝে। ভি[ন্ন] ভিন্ন বালকের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা মন্দতা ল[ক্ষ্য]

[যা] অধ্যাপককে একই বিষয় সংক্ষেপে [বি]স্তারে, এক বা বহু কথায় বলিতে [হ]য়। একই শ্রেণীতে কোন জড়বুদ্ধি [বা]লককে শিক্ষক মহাশয় যখন এক-একটি [কথা] তন্ন-তন্ন করিয়া, বহু বিশ্লেষণ করিয়া [বু]ঝাইতে থাকেন, তখন পার্শ্ববর্ত্তী তীক্ষ্ণবুদ্ধি [বা]লক বা কোনো সুবিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ সব শুনিতে [শু]নিতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন, এবং [এ]ত অনাবশ্যকও ভাবিতে পারেন, কিন্তু [অ]ভিজ্ঞ শিক্ষক মহাশয় বুঝিতেছেন, তিনি [যা] নিরর্থক কিছুই বলিতেছেন না; একের নিকট [যা] নিরর্থক হইলেও অন্যের নিকট [তা]হা সার্থক—সম্পূর্ণ সার্থক।

শাস্ত্রসমূহ—বেদপন্থীরই হউক, যা বুদ্ধ-[জি]ন-পন্থীরই হউক, অথবা অপর যে কোন [পন্থী]রই হউক,—এই ভাবেই চলিতেছে, [এবং] ঠিকই চলিয়াছে। একটা উদাহরণ [দি]ব। মলত্যাগের পর শৌচের বিধি [আ]ছে। কিরূপে শৌচ করিতে হইবে, [তৎ]সম্বন্ধে গৌতম (১-১-৪৫) ও যাজ্ঞবল্ক্য [(১-১৭)]-প্রভৃতি কেহ কেহ এই মাত্র [ব]লিয়াছেন যে, জল ও মাটি দিয়া এরূপ [ভা]বে শৌচ করিবে যেন গন্ধ বা অমেধ্য [প]দার্থ লিপ্ত না থাকে ("লেপগন্ধাপকর্ষণ," "লেপগন্ধক্ষয়কর")। তাঁহারা ইহার অতিরিক্ত কিছু বলেন নাই। যাঁহারা ধীর, তাঁহাদিগকে ইহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক বলিবারও নাই। কিন্তু ধীরের ধারে-ধারে অনেক অধীরও থাকেন। কেবল ঐটুকু বলিলে তাঁহাদের নিকট কাজ হয় না; তাই মনু (৫১৩৬-১৩৭), বিষ্ণু (৬০-২৫-২৬) প্রভৃতি কেহ-কেহ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন যে, হাত-পা প্রভৃতি কোন্-কোন্ অঙ্গে কতবার মাটি লাগাইতে হইবে। উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপ ভাবে শৌচ করিলে গন্ধ ও লেপ, উভয়েরই ক্ষয় হইবেই হইবে।

যাঁহারা সমাজের কেবলমাত্র কয়েকটি শিক্ষিত-সুশিক্ষিত লোককে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে চাহেন তাঁহারা সংক্ষিপ্ত বাক্যে মূল-তাৎপর্য্যটি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা পণ্ডিত-মূর্খ উভয়কেই টানিয়া তুলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সংক্ষেপ-বিস্তার উভয়রূপেই বলিতে হইবে। তাই প্রাতিমোক্ষের শৈক্ষ্য ধর্ম্মগুলির মধ্যে যখন নিম্নলিখিত নিয়মগুলি নয়নগোচর হয় (৪৯-৫৪) তখন হাস্য বা উপহাস করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না:—

"জিহ্বা বাহির করিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

চপ্-চপ্ শব্দ করিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

সুর্-সুর্ শব্দ করিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

পাত্র চাটিয়া চাটিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ওষ্ঠ চাটিয়া চাটিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।"

বুদ্ধদেব আনন্দ-সারিপুত্রের ন্যায় বিজ্ঞ ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই সমস্ত নিয়ম করেন নাই। যে সমস্ত ভিক্ষু নিতান্ত জড়বুদ্ধি, তাহা-দিগকেই তিনি এইরূপে বুঝাইয়াছেন। তাই ইহাদের সার্থকতা আছে, এবং সেই

জন্যই ইহা উপহাসের বিষয় নহে। আবার এই বিষয়টিই যত সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, তাহা বেদপন্থীর শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, আবার তাহা সবিস্তরেও বলা হইয়াছে। ‖

আমার এক বৌদ্ধ বন্ধু ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষের, পূর্ব্বোক্ত বিধানগুলি উল্লেখ করিয়া বলিতেছিলেন $—"সেই সময়ের লোকগুলি বড়ই অসভ্য ছিল, তাহা না হইলে ঐরূপ করিয়া শিক্ষা দিতে হয়!" ঠিক জানিনা, তিনি কি ভাবে এইমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যদি সঙ্ঘের অবস্থা মনে করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে একথা প্রকাশ করিতেন না। আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি, সঙ্ঘে উপযুক্ত-অনপযুক্ত সকলেই প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। অশিক্ষিত বা নীচ শ্রেণীর লোকেরা সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ-নিজ অভ্যস্ত আচারই অনুসরণ করিত। নীচ ও অশিক্ষিত এবং উচ্চ ও শিক্ষিত ব্যক্তির আচার-ব্যবহারে সর্ব্বত্রই এই পার্থক্য দেখা যায়। এবং প্রত্যেক দেশেই এই দুইশ্রেণীর লোক থাকে। ইহাতে সমস্ত লোককেই অসভ্য বলা সঙ্গত হয় না। বুদ্ধদেবও ঐ নিয়ম-গুলি সঙ্ঘের সমস্ত লোকের উদ্দেশ্যে বলেন নাই, যাহারা নিতান্ত জড়বুদ্ধি বা উচ্ছৃঙ্খল তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া তৎসমুদয় উক্ত হইয়াছিল।

বুদ্ধের পূর্ব্বে বেদপন্থীরা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ভিক্ষুধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে ভিক্ষু-সন্ন্যাসীর দল বা * সঙ্ঘ সৃষ্টি করে নাই। তাই বেদপন্থী সন্ন্যাসীর সহি সমাজের সম্বন্ধ বড় কম ছিল, সমাজে অপেক্ষা সে খুব কমই রাখিত। সমাজে নিন্দা-প্রশংসায় তাহার কিছু আসিয়া যাই না। কিন্তু বুদ্ধদেব দল বাঁধিয়া ছিলেন গৃহস্থদের যেমন একটা দল ছিল, ভিক্ষুদে তেমনি একটা দল হইল। ক্রমশ ভি দলের সহিত গৃহস্থদলের একটা ঘনিষ্ঠ সম্ব দাঁড়াইয়া গেল। গৃহস্থদলের বিনা অপেক্ষা ভিক্ষুদলের চলিবারই উপায় থাকিল না বিহার, তদুপযুক্ত আবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রী ভিক্ষা প্রভৃতির জন্য ভিক্ষুদলকে সর্ব্বপ্রকা উপাসকগণের উপর নির্ভর করিতে হইত তাই উপাসকদের নিন্দা-প্রশংসার ভিক্ষু সঙ্ঘে ক্ষতি-বৃদ্ধি হইত। বুদ্ধদেব লোকোক্তি —লোকাচারকে মানিতে বাধ্য হইতেন লোককে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তাঁহা সঙ্ঘের নানা নিয়ম করিতে হইত, নানা নিয় বদলাইতে হইত। বিনয়পিটক আগাগোড়া এ কথাই প্রকাশ করিতেছে। বুদ্ধদেব একদি ধর্ম্মোপদেশ করিতে-করিতে হাঁচিয়া উঠেন ভিক্ষুগণ সকলেই "জীবতু ভগবা!" "জীবতু সুগত!" ("ভগবান্ বাঁচিয়া থাকুন!" "সুগত বাঁচিয়া থাকুন!")+—বলিয়া চীৎকা করিয়া উঠায় ধর্ম্মোপদেশের ব্যাঘাত হয়

‖ "বাগ্‌যতস্তূষ্ণীমলোলুপমানঃ"—গৌতম, ১·৩·৪৭; "নচ মুখশব্দং কুর্য্যাৎ"—আপস্তম্ব, ২·১৯·১০।

$ দ্রষ্টব্য—পরাশরসংহিতা, মাধবাচার্য্য-ভাষ্য (Bombay Sanskrit Series) Vol I. Part I. P. 423. (১·৫৯)

+ কেহ হাঁচিলে নিকটস্থ লোককে "জীব" বলিতে হয়, এবং প্রত্যুত্তররূপে ঐ ব্যক্তিকেও তাহা বলিতে হয়। এ সম্বন্ধে আমার "হাঁচির কথা"—নামক প্রবন্ধে (প্রবাসী, ১৩১৪) বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

ব ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভিক্ষুগণ, 'জীব' বলিলে তজ্জন্য কেহ বাঁচে না মরে?" "না ভগবন্, কেহ ও না মরেও না।" "তাহা হইলে গণ কেহ হাঁচিলে 'জীব' বলিও না। বলিবে, তাহার দুষ্কৃত হইবে।" ইহার দিন পরে কোনো-কোনো ভিক্ষু হাঁচিলে রা "জীব" বলিত, কিন্তু ভিক্ষুরা ত্তররূপে আর "জীব" বলিত না। রা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণকে জ্ঞা ও নিন্দা করিতে লাগিল। ("মনুস্‌সা ব্বায়ন্তি, খীয়ন্তি, বিপাচেন্তি")। বান্ শুনিয়া বলিলেন—"ভিক্ষুগণ গৃহীরা ল চায়। হাঁচিলে তাহারা যদি তোমা-কে 'জীবথ' বলে, তবে তোমরাও াদিগকে 'চিরংজীব' বলিবে। (চুল্ল -৩৩—৩)।

এক সময়ে কোন স্ত্রী প্রসবের পর ক্ষুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মুখে একখানি াপড় পাতিয়া তাহার উপর দিয়া চলিয়া তে প্রার্থনা করেন। ভিক্ষুরা খারাপ ন ভাবিয়া তাহা করিলেন না। লোকটি ভিক্ষুগণকে অবজ্ঞা ও নিন্দা রিয়া নিজে-নিজে বকিতে লাগিল। ক্ষুরা তাহা শুনিতে পাইয়া ভগবান্‌কে বেদন করায় ভগবান বলিলেন—"ভিক্ষুগণ, গৃহীরা মঙ্গল চায়। অতএব তাহারা যদি প্রার্থনা করে, তবে ঐরূপ কাপড়ের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে আমি অনুজ্ঞা করিতেছি।" ঐ ৫·২১·৪।×

ভিক্ষুণীগণের নিকট প্রাতিমোক্ষ পাঠ করিবার জন্য বুদ্ধদেব প্রথমে ভিক্ষুগণকেই নির্দ্দিষ্ট করেন। তদনুসারে ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীগণের বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে চারিদিকের মানুষেরা নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল যে, ঐ ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের উপপত্নী, এবং ইহারা তাহাদের উপপতি। ভগবান্ ইহা শুনিতে পাইয়া নিষেধ করিয়া দিলেন যে, ভিক্ষুরা আর ভিক্ষুণীদের প্রাতিমোক্ষ পাঠ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার দুষ্কৃত হইবে। চুল্ল, ১০·৬·১।

মনুষ্যেরা এইরূপ অবজ্ঞা ও নিন্দা করিতেছে, এবং বুদ্ধদেব তাহা শুনিয়া-শুনিয়া নূতন-নূতন নিয়ম করিতেছেন, বা পূর্ব্বের নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতেছেন; এইরূপ দৃষ্টান্ত বিনয়ের সর্ব্বত্রই শত-শত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে এই কথাই প্রকাশ পাইতেছে যে, বুদ্ধদেব লোকাচারকে—ইহা ভালই হউক, মন্দই হউক, অথবা তাহাতে যুক্তি থাকুক আর না-ই থাকুক, একবারে অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। ইনি এই

× অশোকেরও ইহাই অনুশাসন (শিলালেখ, ৯—Rock Edict, 9)—"লোকে অনেক রকমের মঙ্গল করে; পীড়ার সময়, পুত্রের বিবাহে, কন্যার বিবাহে, সন্তানের জন্মে, প্রবাস-গমনে, এবং এতাদৃশ অন্য স্থানে লোক বহু মঙ্গল করে। শিশুর জননীরা ক্ষুদ্র ও নিরর্থক এবং বহুবিধ ও বহু মঙ্গল অনুষ্ঠান করেন। এই মঙ্গল কর্ত্তব্যই, কিন্তু ইহার ফল অল্প ("সে কটবিচেব খো মঙ্গলে, অপফলে তু খো এসে")।

লোকাচারকে মানিয়াই নিজধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। লোকহিতৈষীর এই পথই প্রশস্ত। বুদ্ধদেব কি এই কথাটা মনে করেন নাই যে, আসল তত্ত্বটা পাইলে অসার আচারগুলি আপনা-আপনিই চলিয়া যাইবে, বা থাকিলেও তাহাতে কোন বন্ধন আনিবে না? তিনি কি ইহাই ভা নাই যে, এই সকল আচার থাকি যথার্থ তত্ত্বগ্রহণে বাধা হয় না? তাহাই না হইবে, তাহা হইলে তিনি সব আচার স্বীকার করিয়াই কিরূপে প্রচার করিলেন?

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

একটি নূতন আবিষ্কার

(প্রাণিতত্ত্ব)

এখনকার বৈজ্ঞানিকগণ নীরবে গবেষণা করিয়া যে সকল নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন আমরা তাহার খবর রাখি না। সাধারণ অবৈজ্ঞানিক পাঠক, সেই সকল আবিষ্কারের বিবরণ বুঝিতে পারেন না, এ কথা বলা যায় না। পরিভাষার আবরণে ঢাকিয়া আবিষ্কারকগণ সেগুলিকে বিশেষজ্ঞ-সম্প্রদায়ের সম্মুখে এ-প্রকার ভাবে উপস্থিত করেন যে, শিক্ষিত সাধারণ-লোক তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। পরিভাষার আতঙ্ক অতি ভয়ানক; বিজ্ঞানের জন্য যদি একটি সাধারণ ভাষা থাকিত, তাহা হইলে কষ্টে তাহা আয়ত্ত করা যাইত —কিন্তু তাহা নাই। কাজেই আবিষ্কারক-গণ নিজেদের দেশীয় ভাষায় পরিভাষার গঠন করেন এবং তাহা বিদেশীর নিকটে দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। এই প্রকারে লাটিন্ জর্ম্মান্ ফরাসী ও রসিয়ান্ প্রভৃতি বি ভাষার এত পরিভাষা বিজ্ঞানে প্র করিয়াছে যে, সেগুলির অর্থ আবি করিয়া শাস্ত্রালোচনায় অবৈজ্ঞানিক জ মোটেই প্রবৃত্তি হয় না। কাব্য ও ইতি প্রভৃতির পাঠক-সংখ্যার তুলনায় বোধ এই কারণেই বিজ্ঞানের পাঠক-সংখ্যা ক বিষয়ের গুরুত্ব ও জটিলতা বিজ্ঞা আলোচনায় বাধা দিতে পারে না।

প্রাণিতত্ত্বে সম্প্রতি Anaphyla নামে একটা বিকট পারিভাষিক শব্দ প্র করিয়াছে। বলা বাহুল্য পরিভাষাটি বিষয়টির কথা মোটেই বুঝা যায় কিন্তু যে ব্যাপারটিকে anaphylaxis হইয়াছে, তাহা মোটামুটি বুঝা কঠিন আমরা এই ব্যাপারটিরই একটু পরিচয় বিষয়টি বুঝিতে হইলে প্রাণীর দে

সার কয়েকটি স্থূল কথা জানিয়া রাখা য়োজন। পাঠক অবশ্যই জানেন, বসন্ত প্রভৃতি কতকগুলি সংক্রামক ব্যাধিতে রবার ভুগিলে, সেই সকল পীড়ায় আবার াক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। শারীরবিদ্‌গণ এই ব্যাপারের কারণ আবিষ্কার রিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পীড়া হইলে কেবল ডাক্তার-মহাশয়ই ঔষধ সেবন রাইয়া আমাদিগকে সুস্থ করিবার চেষ্টা রেন না; পীড়ার বিষকে নষ্ট করিয়া স্থ হইবার জন্য দেহেরও একটা স্বাভাবিক চেষ্টা হয়। বাহির হইতে দেহে পীড়ার বীজ প্রবেশ করিলে, ঐ চেষ্টার ফলে াপনা হইতেই শরীরে বিষঘ্ন (Anti-toxin) দার্থ উৎপন্ন হয় এবং তাহার সহিত পীড়ার বিষের ঘোর সংগ্রাম চলে। সংগ্রামে বিষঘ্ন দার্থ জয়ী হইলেই রোগী আরোগ্য লাভ রে, নচেৎ তাহার মৃত্যু হয়। শারীরবিদ্‌-গণ বলেন, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে দেহে যে বিষঘ্ন পদার্থের উৎপত্তি হয়, রোগী সুস্থ হইলে তাহার জের কিছুকাল দেহে থাকিয়া যায়। ইহাই ঐ সকল ব্যাধির পুনরাক্রমণ হইতে প্রাণীদিগকে কিছুদিনের ন্য রক্ষা করে। এই জন্যই একবার লন্ত হইলে, আবার শীঘ্র বসন্ত হইবার ম্ভাবনা থাকে না।

যখন গো-বীজের টিকা লইয়া বসন্তের াক্রমণ নিবারণ করা যায়, তখনও প্রকারান্তরে দেহে বিষঘ্ন পদার্থের উৎপাদন করা হইয়া থাকে। গো-বীজ দেহস্থ হইয়া অতি ক্ষুদ্র-রকমের বসন্তের উৎপত্তি করে; আমরা তাহা বুঝিতে পারি না সত্য, কিন্তু পীড়ার কার্য্য অজ্ঞাতসারে দেহের ভিতরে চলিতে থাকে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুস্থ ও সবল দেহে পীড়ার একটুও লক্ষণ দেখা দিলে, দেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। কাজেই গো-বীজ দ্বারা দেহের ভিতরে ভিতরে বসন্তের আভাস দেখা দিলে, দেহে স্বতঃই বিষঘ্ন পদার্থের সৃষ্টি হইতে থাকে এবং ইহাই শরীরে থাকিয়া বসন্তের আক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

শরীর-তত্ত্বের আর-একটি সুপরিচিত ব্যাপারের কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। বিষ-মাত্রেই প্রাণীর অনিষ্ট করে; কিন্তু কতক-গুলি বিষের মাত্রা যদি অল্পে অল্পে বাড়াইয়া দেহস্থ করা যায়, তবে তাহাতে দেহের অনিষ্ট হয় না। আফিঙ্ ভয়ানক বিষ— অত্যল্প পরিমাণে দেহস্থ হইলেই তাহাতে প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু অহিফেন-সেবীরা ধীরে ধীরে আফিঙের মাত্রা বাড়াইয়া, তাহা এমন অধিক করিয়া ফেলে যে, তাহাদের প্রতিদিনের সেবনীয় আফিঙে হয়ত দশ জন লোকের মৃত্যু হইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ ডি কুইন্সি সাহেব ঘোর অহিফেনসেবী ছিলেন। মালয়-দেশের এক আফিঙ-খোরের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল; লোকটি প্রতি দিন এত আফিঙ্ ব্যবহার করিত যে, তাহা দিয়া অন্ততঃ ছয়দল সেনা ও তাহাদের ঘোড়াগুলিকে হত্যা করা যাইত। এক সময়ে ডি কুইন্সি নিজেই প্রতিদিন আট হাজার ফোটা লডেনম্ (Laudanum) ব্যবহার করিতেন। লডেনম্ কয়েক ফোঁটা-মাত্র সুস্থ মানুষের দেহে প্রবিষ্ট হইলেই, মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কেবল অল্পে

অল্প মাত্রা বাড়াইয়া ডি কুইন্সি ঐ মারাত্মক বিষ হজম করিতেন।

অধিক দিন নয়,—বোধ হয় দশ বারো বৎসর পূর্ব্বে বিষ-সম্বন্ধে প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের এই সকলই জানা ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী শারীরতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক রিচেট্ (Charles Richet) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রাণিদেহে বিষের ক্রিয়া-সম্বন্ধে নূতন করিয়া গবেষণা করিতেছিলেন। ইহাতে কতকগুলি বিষে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মগুলি সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছিল, কিন্তু কতকগুলিতে উহারি ঠিক্ বিপরীত ধর্ম্ম দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, কয়েক জাতীয় বিষ একবার দেহস্থ করাইয়া, পরে তাহা অপেক্ষা অল্প মাত্রায় সেই বিষ প্রয়োগ করিলে, উহার ক্রিয়া এত প্রবলভাবে চলিতে থাকে যে, তাহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রোগের বিষ বা অপর কোন বিষ একবার শরীরে প্রবেশ করিলে, তাহা বিষঘ্ন পদার্থ উৎপন্ন করে ও ভবিষ্যতে তাহাই সেই বিষের অপকারিতা নিবারণ করে বলিয়া যে কথাটা আমাদের জানা আছে, তাহা সত্য হইলেও সকল বিষের কার্য্যে খাটে না। এমন বিষ অনেক আছে, যাহা একবার দেহস্থ হইলে, দেহ এ-প্রকার অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায় যে, তখন সেই বিষ অত্যল্প পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করিলে মহা বিপদের সূচনা করে। ক্রমে মাত্রা বাড়াইয়া আফিঙের ন্যায় বিষকে যেমন সহাইয়া লওয়া যায়, এই সকল বিষে তাহা করা যায় না। অধ্যাপক রিচেট্ সাহেব গত ১৯০২ অব্দে এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করিয়া তাহাকেই Anaphyla নাম দিয়াছেন।

দুই-একটা উদাহরণ দিলে বি বুঝিবার সুবিধা হইবে। অনেক পুরু জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীর শুঁয়োতে প্রকার বিষ থাকে। রিচেট্ সাহেব বিষ সংগ্রহ করিয়া তাহা অল্প পরি কয়েকটি কুকুরের দেহে প্রয়োগ ক ছিলেন। পরিমাণে অত্যন্ত অধিক হইলে এইপ্রকার বিষে কুকুরের ন্যায় প্রাণীর মৃত্যু ঘটে না; এই পরীক্ষায় এ কুকুরের মৃত্যু হয় নাই। ইহার ক সপ্তাহ পরে রিচেট্ সাহেব আবার বিষই পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অল্পপরি প্রত্যেক কুকুরের দেহে প্রবিষ্ট করাই ছিলেন। এবারে কুকুরগুলি সুস্থ থাকি পারে নাই; পূর্ব্বের মাত্রার কুড়ি ভা এক ভাগেই সকলের মৃত্যু হইয়াছি সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, এই বিষঘ্ন পদার্থ উৎপন্ন করিয়া বা শরী সহ্য করিবার শক্তিবৃদ্ধি করিয়া, প্রাণী নিরাপদে রাখে না; বরং তাহা শরী এমন-কোনো পরিবর্ত্তন করে, যাহাতে বিষেরই কণামাত্র পরে দেহে প্রবিষ্ট হই প্রাণীর মৃত্যু ঘটে।

রিচেট্ সাহেব ও তাঁহার শিষ্যগণ আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—তাঁহ ইতর প্রাণীর দেহে নানা পদার্থ প্র করাইয়া সেগুলির কার্য্য পরীক্ষা করি আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে যে স তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা আরো অদ্ভু যে সকল বস্তুকে প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ

না স্বীকার করিতেন না, এই পরীক্ষায় দেরি অনেকগুলির কার্য্যে বিষের লক্ষণ পড়িয়াছে।

সুস্থ প্রাণীর রক্তে যে বিষ আছে, তাহা কবৎসর পূর্ব্বেও প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের না ছিল না। কিন্তু রিচেট্ সাহেব তি তাহাও আবিষ্কার করিয়াছেন। ঘোড়ার রক্তের স্বচ্ছ তরল অংশ rum) কয়েকটি খরগোসের দেহে প্রবেশ াইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ইহাতে টি খরগোসও অসুস্থ হয় নাই। কয়েকদিন পরে ঐ ঘোড়ার রক্তই মাত্রায় দেহে প্রয়োগ করায় প্রত্যেকটিরই া হইয়াছিল। কাজেই স্বীকার করিতে , বিজাতীয় প্রাণীর রক্ত দেহে প্রবিষ্ট লে বিষের কার্য্য সুরু করে।

বসন্তের টিকা দিলে বসন্তের আক্রমণ তে নিরাপদ থাকা যায়, ইহা ওলাউঠা প্লেগের আক্রমণ নিবারণ করে না। ইপ্রকার ঘোড়ার রক্তে যে সকল রগোসের দেহ বিকৃত হইয়া থাকে, তাহাদের হে অপর বিজাতীয় প্রাণীর রক্ত প্রবেশ য়াইলে অনিষ্ট হয় না, কেবল ঘোড়ার ক্তই অত্যল্প পরিমাণে দেহস্থ হইলে রগোসের মৃত্যু হয়।

সংসারে নিয়তই নরহত্যা মারপিট্ লিতেছে। অপরাধীর বস্ত্রে রক্তের চিহ্ন াইলে তাহা মানুষের রক্ত কিনা নির্ণয় য়ার প্রায়ই প্রয়োজন হয়। এই কারণে ক্ত-পরীক্ষা আজকাল আইন-আদালতের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বহু রক্ত-চিহ্নের ধ্যে কোন্‌টি মানুষের রক্ত, তাহা রসায়ন-বিদ্‌গণ নানা প্রক্রিয়ায় নির্ণয় করিতে পারেন, কিন্তু রিচেট্ সাহেবের আবিষ্কার দ্বারা এখন রক্ত-পরীক্ষার যে উপায় পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি সুন্দর।

মনে করা যাউক, কোনোস্থানে খুন হইয়া গিয়াছে ও সন্দেহসূত্রে একজনকে খুনী বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং তাহার কাপড়ে যে রক্তের দাগ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়াছে। কিন্তু অপরাধী বলিতেছে, তাহার কাপড়ের রক্ত মানুষের নয়—ছাগলের। কাজেই দণ্ড-বিধানের পূর্ব্বে, কাপড়ের রক্ত মানুষের কি ছাগলের নির্ণয় করা প্রয়োজন। রিচেট্ সাহেবের আবিষ্কৃত প্রথায় এই কাজটি অতি সহজে করা হয়। পরীক্ষাশালায় সকল সময়েই অনেকগুলি গিনি-পিগ্ রাখা হয় এবং ইহাদের প্রত্যেকটিকে ছাগল কুকুর মানুষ ঘোড়া শূকর প্রভৃতি নানা প্রাণীর রক্তে টিকা দেওয়া হয়। কোন্‌টির দেহে কোন্ প্রাণীর রক্ত মিশ্রিত আছে, তাহা পরীক্ষকের জানা থাকে। এখন পরীক্ষার জন্য কোনো রক্ত পাইলেই, তাহা জলে মিশাইয়া প্রত্যেক গিনি-পিগের দেহে প্রবেশ করানো হয়। যদি উহা প্রকৃতই মনুষ্য-রক্ত হয়, তবে যে গিনি-পিগ্‌টিকে পূর্ব্বে মনুষ্য-রক্তের টিকা দেওয়া হইয়াছে, কেবল সেইটিই অসুস্থ হইয়া পড়ে ও শেষে মরিয়া যায়; ঘোড়া ছাগল কুকুর প্রভৃতির রক্তযুক্ত গিনি-পিগ্ ইহাতে একটুও অসুস্থ হয় না। রক্ত-পরীক্ষার এমন সহজ প্রথা বৈজ্ঞানিকগণ পূর্ব্বে জানিতেন না। বলা বাহুল্য, এই প্রথায় কেবল মানুষের রক্তই

চিনিয়া লওয়া যায় না,—যে-কোনো রক্ত পরীক্ষার জন্য আনিলে, তাহা কোন্ প্রাণীর রক্ত অনায়াসে স্থির করা যায়।

রিচেট্ সাহেবের আবিষ্কার প্রাণিতত্ত্বের নানা অংশে নূতন আলোকপাত করিতেছে এবং বিষয়টি লইয়া এখনো অনেক পরীক্ষা চলিতেছে। বিষের প্রয়োগে প্রাণীর দেহ কি-প্রকার অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়; কতক বিষ দেহ কেন সহ্য করিতে পারে এবং কতকগুলি মৃদু বিষে কেন প্রাণীর মৃত্যু ঘটে,—এই সকল জটিল ব্যাপারেরও কারণ ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু সে সকল বিষয়ের আলোচনা এ-প্রকার ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। আমাদের আহার-সম্বন্ধে যে একটি নূতন কথা এই আবিষ্কার দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারি পরিচয় প্রদান করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কতকগুলি প্রাণিজ ও উদ্ভিজ বস্তু আমাদের খাদ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দেশ কাল আচার ও ধর্ম্মের বিধান মানিয়া আমরা সেইগুলির মধ্য হইতে খাদ্য মনোনীত করিয়া লই। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায়, যে খাদ্যটি আমার উপকারী তাহা আমার বন্ধুর উপকারী নয়। এ প্রকার লোক অনেক আছে, যাহারা ডিম্ব মাংস বা দুগ্ধ আহার করিতে পারে না। রুচির পার্থক্যে যে এ-প্রকার হয়, তাহা নয়। অজ্ঞাতসারে এই শ্রেণীর লোকদিগ ডিম্ব ও মাংসাদি আহার করাইলেও, তাহা অসুস্থ হইয়া পড়ে। তাহাদের পাকাশ ঐ-সকল বস্তু বিষের ন্যায় কার্য্য কর রিচেট্ সাহেবের আবিষ্কারে, এই ব্যাপা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, একব বিজাতীয় প্রাণীর রক্ত দেহস্থ করিয়া গি পিগ্ যেমন সেই রক্ত আর অত্যল্প প পরিমাণেও দেহে ধারণ করিতে পারে —সেইপ্রকারে একবার ডিম্ব আহার করি ঐ লোকগুলি তাহার এককণাও নিরাপদে আহার করিতে পারে প্রথম ডিম্ব-আহারের পর, তাহাদের দে এ-প্রকার কতকগুলি পরিবর্ত্তন হয় দ্বিতীয়বার অত্যল্প পরিমাণ ডিম্ব উদরস হইলে, দেহে বিষের কার্য্য সুরু হই পড়ে। রক্তের বীজে টিকা লইয়া গি পিগ্ প্রথমে সুস্থ থাকে এবং পরে রক্তেরই অত্যল্প সংস্পর্শে বিষের প্রভা মারা যায়। এই ব্যাপারটাও অবি সেইরূপ। মাংস আকণ্ঠ আহার করি পারে, কিন্তু এক টুক্‌রা মৎস্য খাইলে অসুস্থ হইয়া পড়ে, এ-প্রকার অদ্ভু প্রকৃতিরও অনেক লোক দেখা যায় ইহাকেও Anaphylaxis-এর কো ফেলিতে পারা যায়।

শ্রীজগদানন্দ রায়



ভায়ের কপালে দিলুম ফোঁটা।
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা॥

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত চিত্র হইতে

স্বেচ্ছাচারী

৭

শিবরামপুর এষ্টেটের ম্যানেজার মিষ্টার চাটার্জ্জি ওরফে মণিশঙ্কর অধুনা ম্যানেজার সাহেব সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সম্মুখে বসিয়া চিঠিপত্র লিখিতেছিল। নিকটেই আল্‌নায় তাহার র‍্যাংকেনের বাড়ির কোটটি ঝুলিতেছিল। মণিশঙ্কর পেণ্টালুন, সার্ট এবং তদুপরি ওয়েষ্ট কোট-সমন্বিত অবস্থায় বসিয়া কাজ করিতেছিল। এমন সময় বেয়ারা আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর, ঘোড়া তৈয়ার।" হুজুর লেখা হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "রাইডিং কোট ও জুতি লেয়াও, আউর দেখো, সর্ব্ববাবু আয়েহেঁ কেয়া নেহি।" বেয়ারা ম্যানেজার সাহেবের ঘোড়ায় চড়ার প্রকাণ্ড জুতা, চাবুক ও কোট সেই কক্ষের পার্শ্বস্থিত একটা ক্ষুদ্র কক্ষ হইতে আনিয়া ইজি চেয়ারের উপর রাখিয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল; এবং পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "হুজুর, বাবু সাহেব আয়ে হেঁ।"

সর্ব্বানন্দ সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেই ম্যানেজার সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "Oh, Sarba Babu, you are so late, আমায় এখুনি যেতে হচ্ছে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "বাঃ, কাল রাত্রে কথা হল খাওয়া-দাওয়ার পর গেলেই বেশ হবে, এর মধ্যেই মত বদলালে?"

মণি বলিল, "সাহেব-সুবোর কাণ্ড কিছুই বোঝবার জো নেই। এই দেখ, এখুনি একটা চিঠি পেলুম যে ম্যাজিষ্ট্রেট না কি স্বয়ং কাকেও কিছু না জানিয়ে আজ বিকেলে চারটের সময় কমবকৎপুরে আসবে। নায়েব লিখছে যে আগে থেকে তৈরী না থাকলে গোলে পড়তে হবে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তা হলে আর আমার গিয়ে কি হবে? ম্যাজিষ্ট্রেট যদি নিজে মিটিয়ে দিতে আসে, তাহলে ত ভালই হবে। তুমি বলছ, প্রজাদের উপর কোন অত্যাচার হচ্ছে না, অথচ তারা মিছিমিছি খাজনা বন্ধ করেছে। তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে এত ব্যস্ত হবার ত কোন দরকার নেই।"

মণি কহিল, "Oh silly! তুমি বুঝতে পারছ না যে আমাদের পক্ষ থেকে সমস্ত বুঝিয়ে দেবার জন্য কেউ না থাকলে they will make a mess of everything. আমাদের একজনকে উপস্থিত থাকতেই হবে। প্রজাদের সঙ্গে কতকগুলা rogues যোগ দিয়েছে, আর তারাই চেষ্টা করে প্রজাদের সরকারের কাছ থেকে agricultural loan নিইয়ে দিয়েছে। সেই জোরেই ত বেটারা লড়ছে, নাহলে কোন্ দিন সব শাসিত হয়ে যেত।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তাহলে আজ আর আমি যাচ্ছি নে। যদি ম্যাজিষ্ট্রেট এসে মেটাতে

না পারে তা হলে নয় আর একদিন যাওয়া যাবে।"

মণি বলিল, "তা বেশ, আমি তাহলে চল্‌লুম। তুমি বাবুকে আমার কথা জানিয়ে বলো যে আমি সব ঠিক করে দেব।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিন্তু সাহেব, কোন রকম under-hand practice চালিয়ো না।"

মণি কহিল, "Oh, everything is fair in love and war."

সর্ব্বানন্দ হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। মণিশঙ্করও মুহূর্ত্তমধ্যে চাবুক-হস্তে বাহির হইয়া অশ্বারোহণে প্রস্থান করিল।

সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের নিকট যাইতেছিল, এমন সময় কার্ত্তিকের শিশুপুত্র দেবীপ্রসাদ তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার ভৃত্যের কোল হইতে হাত বাড়াইয়া "জ্যাতা যাব, জ্যাতা যাব" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। জ্যাঠা মহাশয় তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, "দেবু তোর বাবাকে আজ যে টেনে বাইরে আনিস নি?" দেবু সজোরে তাহার ক্ষুদ্র মস্তক আন্দোলিত করিয়া বলিল, "বাবা যাব না, বেলাতে যাব।"

—"চল্ তোর বাবাকেও ধরে আনি।"

—"না, বাবা কাঁদবে, আছবে না।"

—"তুমি ডাকলে আসবে, লক্ষ্মী বাবা আমার, চল।"

সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিককে তাহার অন্ধকার কোটর হইতে বাহির করিবার কোন উপায় না পাইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় সহসা একদিন দেবীপ্রসাদকে কোলে লইয়া কার্ত্তিকের অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র কার্ত্তিক ব্যস্ত হইয়া বলিয়াছিল, "ও কি, ও কি, ওকে এ ঘরে কেন? সব্বদা, তোমার পায়ে পড়ি, ওকে এ ঘরে এনো না। আর-সব অত্যাচার সইব, কিন্তু ওকে এ ঘরে আনলে সইতে পারব না।" কার্ত্তিক তাহার গৃহের সকলকেই বিশেষ করিয়া বারণ করিয়া দিয়াছিল যেন ঐ ঘরে দেবুকে না প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিককে বাহিরে আনিবার এই এক উপায় খুঁজিয়া পাইয়া আজকাল প্রত্যহই দেবুকে লইয়া সকালে-বৈকালে কার্ত্তিকের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তোলে। পুত্র তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেই সে তাড়াতাড়ি ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা খুলিয়া দিয়া একটা কৃষ্ণবর্ণ কাঁচের eye-preserver চক্ষে দিয়া বসে।

সর্ব্বানন্দ দেবুকে লইয়া কার্ত্তিকের নিকট উপস্থিত হইল। কার্ত্তিক তাড়াতাড়ি গবাক্ষাদি উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল, "সব্বদা, কেমন জব্দ, দেবু কেমন তোমায় বেঁধেছে!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "দেবু ত' বাঁধেনি ভাই, বেঁধেছ তুমি। আর কেন কার্ত্তিক? আমায় ছেড়ে দাও ভাই। তুমি যদি একটু মনের জোর কর, তাহলেই তোমার এ মানসিক রোগ, স্বকৃত উপসর্গ ঝরে পড়ে যাবে। দেবু, তোর বাবার হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে চল্ ত বাবা।"

দেবু বিনাবাক্যব্যয়ে পিতার হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। কার্ত্তিকও কাঁচ-পোকায় ধরা তেলাপোকার মত কাঁপিতে

কাঁপিতে বাহিরে চলিল। সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের হাত ধরিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "না, আজ তোমায় নিজের শক্তিতে চলতেই হবে, ছেলেকেও রাস্তার হাঁটা-খোঁচা খানাডোবা থেকে বাঁচাতে হবে। আমি তোমায় আজ একটুও সাহায্য করব না।" কার্ত্তিক কাতরভাবে বলিল, "পড়ে যাব, সব্বদা, ধর। দেবু, বাবা আমার, একটু আস্তে চল।" সর্ব্বানন্দ স্বয়ং দেবুর হাত ধরিয়া বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। কার্ত্তিক তখন অগত্যা পুত্রের হাত ছাড়িয়া বসিয়া পড়িল এবং চোখের ঠুলি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। দেবু কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "জ্যাতা, বাবা কাঁদছে।"

সর্ব্বানন্দ গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ কার্ত্তিকের দিকে চাহিয়া শেষে বলিল, "চোখ চেয়ে আলো কার্ত্তিক, মোহ কেটে যাক, স্বপ্ন দূর হোক। এমন সুন্দর সকাল, আর তুমি ইচ্ছে করে অন্ধ হয়ে থাকবে?"

কার্ত্তিকের সমস্ত দেহ ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সে কাতরভাবে দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "বাবা দেবু, তোর হাত দুটো দে, নইলে—"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "নইলে কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "অন্ধকারে ডুবে মরি যে!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "বাঁচতে চাও? আলো চাও?"

কার্ত্তিক কহিল, "বাঁচতে চাইনে? আলোর জন্য আমি যে প্রাণ ফেটে মরে যাচ্ছি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তবে আলোকে ভয় কর কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "তা জানিনে সব্বদা। এতদিন প্রাণপণে আঁধারকে চেপেছিলুম কিন্তু যেই অন্ধকার আমার উপর নেমে আসতে আরম্ভ করেছে, অমনি বুঝতে পেরেছি কি অমূল্য বস্তু আমি হারাতে বসেছি। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। অন্ধকারের আত্মা, দুর্লভের শক্তি আমায় অভিভূত করে ফেলেছে; এখন যতই তার কাছ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করছি, ততই সে আমায় চেপে ধরছে। যা কখনও পাওয়া যায় না, যে মূর্খ তাকেই দুঃসাহসিকের মত প্রাণপণে চায়, তারই বোধ হয় এই দুর্দ্দশা হয়। যা অপ্রাপ্য, তাকেই চাইতুম, তাই সে অপ্রাপ্য নিজে না ধরা দিয়ে তার সঙ্গী চির-অন্ধকারকে আজ প্রেতের মত আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এখন আর উপায় নেই।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কি যে অপ্রাপ্য, তা ত বুঝতে পারছিনে। সেই বহুদিন পূর্ব্বে যে অন্ধ-রমণীর অন্ধ নয়নের আঘাতে মূর্খ তুমি অভিভূত হয়েছিলে, সে আজও তোমার জন্য তেমনিভাবে বসে আছে। সে তোমায় বুঝতে না পেরে প্রত্যাখ্যান করেছিল, আজও সেই অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে। কাল ঠাকুরদার চিঠি পেয়েছি যে তোমার এই অবস্থার কথা শুনে সে মূর্চ্ছাপন্ন হয়েছিল। তবে সংসারে অপ্রাপ্য কি? সুখ বল, শান্তি বল, স্নেহ বল, ভালবাসা বল, ধর্ম্ম বল, সব ত ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়। ভগবান সমস্তই সুলভ করে রেখেছেন, কেবল একটু চেষ্টা করে তা নিতে হবে। তবে যদি কেউ ইচ্ছে করে কিছু না

নিতে চায়, ইচ্ছে করে দরিদ্র হয়ে ভিখারী হয়ে থাকতে চায়, তার দেহি-দেহি রব চির-কালই থাকবে। ওঠো কার্ত্তিক, উঠে তুমি সবলে বল, আমি রাজরাজেশ্বরী মায়ের সন্তান, আমি ভিখারী নই, তাহলেই দেখবে, তোমার কিছুই অপ্রাপ্য নেই, সবই পূর্ণ ভাবে তোমার ভাণ্ডারে বিরাজ করছে। ওঠো ভাই, ওঠো, কথা শোনো।"

কার্ত্তিক সর্ব্বানন্দর হাত ধরিয়া উঠিয়া চলিতে চলিতে বলিল, "জগতে কিছুই অপ্রাপ্য নয়, বলছ, কিন্তু এই দেখ, তোমায় এত কাছে পেয়েও কৈ, পাচ্ছি না ত! তোমার-আমার মধ্যে কোথা থেকে একটা মৃত্যুর মত অন্ধকারের ব্যবধান এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তোমায় হারিয়ে দিয়ে, তোমায় টেনে এনেছি, তবু তোমায় পাচ্ছি না। যদি কোন দিন সেই অপ্রাপ্যকে এমনি করে টেনে আনতে পারি, সেইদিনই বোধ হয় এই মায়ার ঘোর কেটে যাবে। যেদিন দেখব যে সেই আকাঙ্ক্ষার ধন, না-পাওয়ার-বস্তু আমার দুয়ারে ভিখারী হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, সেইদিন বোধ হয় আবার সুস্থ হব। নইলে আর আমার উপায় নেই।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিন্তু তুমি যে বিবাহিত! এখন কোন্ সাহসে আবার তাকে তোমার কাছে টেনে আনতে চাইছ?"

কার্ত্তিক কহিল, "যে রোগী, যে canine appetiteএ ভুগছে, তার খাদ্যাখাদ্য-বিচার থাকে কখনো?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তুমি ঠিক বলছ যে যদি সে তোমায় এসে বলে যে, তোমায় সে চায়, তাহলেই তোমার এ রোগ সে যাবে?"

—"ঠিক কি করে বলি? এ ত' আর আমি আমার অধীন নই; এ আমায় ভূতে পেয়েছে। তবে এই রোগে কারণ যখন সে-ই, তখন সে আম কাছে এসে তোমার মত পরাজয় স্বীকা করলে হয়তো আবার আমি সুস্থ হ পারি।"

—"তাহলে আমি প্রতিজ্ঞা কর যে তাকে যেমন করে পারি তোমার পা কাছে এনে ফেলে দেব! কিন্তু তোমাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে অন্ধ ব তাকে নিয়ে তুমি খেলা করতে পাবে না।"

—"খেলা! যে আমায় এমন ক খেলাচ্ছে, তার সঙ্গে আমি কোন্ সাহ খেলা করব! তার পক্ষে যা খেলা আমা পক্ষে যে তা মৃত্যুর লীলা!"

—"কথার মার-পেঁচ ছেড়ে সো কথায় বল যে তাকে যদি তোমার কা আনি, তুমি তাকে বিয়ে করবে?"

—"বিয়ে? কি সর্ব্বনাশ! যা এক বারে না-পাওয়ার ধন, তাকে একেবা ধূলোমাটির মধ্যে টেনে আনব? তা পার না। বিশেষ শৈলকে আমি অত ক দেব কি করে? সে যে তাহলে ম যাবে। না সব্য দা, শৈলই আমার পথে আলো, শৈলই আমার পাওয়ার ধন, আ তাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি সে ক দি, তাহলে আমায় মরতে হবে। একে ত আমায় নিয়ে সে আজীবন কষ্ট পাচ্ছে তার উপর ও কষ্ট তাকে দিতে পারব না।"

—"এটুকু বুদ্ধি ত বেশ আছে! তাহলে তুমি তার স্বামী হয়ে সারাজীবন অন্যের উপর মন ফেলে রেখে বসে আছ কেমন করে? এতে বুঝি তার খুব সুখ হচ্চে?"

—"তুমি জান না, সব্য দা, তুমি আমায় কখনও বোঝোনি, আজও বুঝতে পারবে না। আমি কেন সেই অন্ধকে এমন করে প্রাণপণে চাই, জান? সে পাবার বস্তু নয় বলে;—যা পাবার বস্তু, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যা' তা' আমার ভাগ্যে লাভ হয়েছে, আমি শৈলকে পেয়েছি। কিন্তু চিরদিনই আমার অন্তরাত্মা যাকে-না-পাওয়া-যায়, যার অন্ধকারের মধ্যে সমস্তই দিশেহারা পথহারা হয়ে যায়, তাকেই চাচ্ছে, তার দিকেই আমার অন্তরের মানুষটীর ছুটে যাবার প্রচণ্ড চেষ্টা। এই চেষ্টার সঙ্গে শৈলর প্রতি স্নেহ বা কর্ত্তব্যের কখনও বিরোধ ঘটতে পারে না। সংসারে থেকেও যেমন মহাপুরুষেরা সেই চির-অপ্রাপ্য অনন্তশায়ী নারায়ণের দিকে তাঁদের আত্মাকে ফিরিয়ে রাখেন, আমারও যেন কতকটা সেই রকম হয়েছে। তবে তাঁরা যাঁকে চান, তাতে কেউ দোষ ধরতে পারে না, তাতে কোন দোষ ঘটেও না, তাই সংসার তাঁদের নিয়ে খুসী থাকে, সুখে থাকে। কিন্তু আমার প্রার্থিত বস্তু সংসারের বাইরে সমাজের বাইরে ধর্ম্মের বাইরে এমন কি মানুষেরও বাইরে, তাই সকলের সঙ্গেই আমার বিরোধ চলেছে।"

কার্ত্তিক চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া বলিল, "সব্য দা, দেবু কৈ? তার আওয়াজ যে অনেকক্ষণ থেকে পাচ্ছিনে!" সর্ব্বানন্দ এতক্ষণ অবাক হইয়া কার্ত্তিকের কথা শুনিতেছিল, হঠাৎ কার্ত্তিকের কথায় তাহার চৈতন্য হওয়ায় সে চাহিয়া দেখে, দেবু উদ্যানস্থ পুষ্করিণীতে নামিয়া গিয়া একেবারে এমন একটা জায়গায় দাঁড়াইয়াছে, যেখান হইতে নড়িলেই সে একেবারে গভীর জলে পড়িয়া যাইবে। তখন সে তাড়াতাড়ি কার্ত্তিকের হাত ছাড়িয়া সোপান-শ্রেণী অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহার পদশব্দে চমকিত হইয়া দেবু যেমন ফিরিয়া চাহিবে, অমনি সশব্দে জলে পড়িয়া ডুবিয়া গেল। কার্ত্তিক সে শব্দে চীৎকার করিয়া যেমন নামিতে যাইবে অমনি সেও পতিত হইয়া গুরুতর আঘাত পাইল। কিন্তু সর্ব্বানন্দর সেদিকে চাহিবার অবসর ছিল না; সে তাড়াতাড়ি লাফাইয়া পড়িয়া বালককে জল হইতে তুলিল। বালক জল হইতে উঠিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কার্ত্তিকের শরীরে নানাস্থান কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল; কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া সে হাত বাড়াইয়া বলিল, "আমার কোলে দাও, সব্যদা, আমার কোলে দাও।"

সর্ব্বানন্দ তাহার কোলে বালককে দিয়া তাহার গাত্র-বস্ত্র সমস্তই খুলিয়া দিল। দু-এক ঢোক জল তাহার উদরস্থ হইয়াছিল বটে কিন্তু সে কোথাও কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই। সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের ক্রোড় হইতে বালককে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া বলিল, "তুমি আস্তে আস্তে এস, আমি একে ওর মার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ডাক্তারকে খবর পাঠাই।"

কার্ত্তিক বলিল, "আমার কোলে রাখ ওকে, আমায় নিয়ে যেতে দাও।"

সর্ব্বানন্দ সে কথা শুনিল না। সে বালককে লইয়া দ্রুতগতি অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। কার্ত্তিকও একজন মালির হাত ধরিয়া আপনার কোটরে গিয়া প্রবেশ করিল।

এদিকে সন্ধ্যার পর ম্যানেজার সাহেব ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়াছিল এবং সমস্ত বন্দোবস্তই এমন চমৎকার হইয়াছিল যে সাহেব আর টুঁ শব্দটী না করিয়া তাঁবুতে ফিরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু ম্যানেজারের অন্তকার কার্য্যাবলীর সঠিক সংবাদ সর্ব্বানন্দ কোন গূঢ় উপায়ে অবগত হইয়া কার্ত্তিকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "কার্ত্তিক, এই বেলা সাবধান হও। তোমার এই ম্যানেজার কোন্‌দিন তোমায় বিষম বিপদে ফেলবে। আমার ভয় হচ্চে, কোন দিন তুমি কোন্ খুনী মকদ্দমার আসামী হয়ে না চালান যাও!"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "ব্যাপার কি? মণির উপর চটলে কেন?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "মণি আজ কি করেছে, জান?"

—"না। সে আজ শ্রান্ত, তাই রাতে আর আসবে না। কালই সমস্ত জানতে পারব।"

—"অতক্ষণ অপেক্ষা করার দরকার নেই, তুমি লোক পাঠিয়ে ওর কাছ থেকে সঠিক সংবাদ আনাও। আমি যা খবর পেয়েছি, তাতে ভয়ে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে ঢোকবার মত হয়েছে।"

—"তোমার চাল-কলা খেকো সাহে একটুতেই তাই ভয় লাগে। জমিদারী রাখতে গেলে অনেক রকম দুঃসাহসের কা করতে হয়। জানই ত, None bu the brave deserves the fair।"

—"অথবা তার চাইতে বল, Non but the fool-hardy deserves th gaol।"

—"কি হয়েছে, বল না?"

—"কমবকৎপুরের প্রজাদের গো মাল মিটুতে আজ ম্যাজিষ্ট্রেট স এসেছিল। তোমার ম্যানেজার নিজে লোকদের দিয়ে তাঁর পাল্কির ওপর ডাকাতি করায়, তারপর স্বয়ং অন্য লোকজন নি সেই কৃত্রিম ডাকাতদের তাড়িয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এসে বলে যে প্রজা ঐ পাল্কিতে ম্যানেজার আছে মনে করে তাকে খুন করতে আসে। ম্যানেজা ঘাগি লোক, সে বোধ হয় স চালাকি বুঝে গিয়েছে। এখন দেখ, তোমা ম্যানেজারের অদৃষ্টে কি হয়!"

সন্ধ্যায় কার্ত্তিকের সম্পূর্ণ অন্যরকম ভাব সে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "ও একটি রত্ন কালই ওর মাইনে বাড়িয়ে দেব।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিন্তু কাল যদি জেলে যায়?"

কার্ত্তিক কহিল, "ম্যানেজার হবার লো জগতে আরও আছে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "অর্থাৎ?"

কার্ত্তিক কহিল, "অর্থাৎ ও গেলে লোকে অভাব হবে না। ওর জন্য কান্নাকাটি করব, এত বড় গাধা আমি নই।"

৮

সর্ব্বানন্দ শশিভূষণের পত্রে ব্যস্ত হইয়া কাতায় উপস্থিত হইলে শশিভূষণ ল, "তুমি যদি কার্ত্তিককে নিয়ে এত হয়ে পড়, তা হলে তোমার এ কাজ চালাবে কে?"

সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "তোমার কর্ম্ম কর লোকে বলে করি আমি! তুমি করাচ্ছ, তাই আমি করছি; এখন বল যে কার্ত্তিককে ছড়ে দাও ত আমায় করতে হবে।"

শশি কহিল, "এ-সব না হয় আমার কাজ, মুকুকে শেখাবার ভারটী যে নিয়েছ, টী ত' আর আমার কাজ নয়!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সেটা তোমার কাজেরই shoot।"

শশি কহিল, "এই এত-বড় একটা কর্ত্তব্যের দায়িত্ব আমারই ঘাড়ে! এর জন্য আর-কেউ দায়ী নয়? আমি যদি থাকি, তা হলে কি আর-কেউ এ কাজের ভার নেবে না? এই হতভাগাকেই চির-দিন এই কর্ত্তব্যের চাকার তলে পড়ে প্রাণ-যন্ত্রনা সহ্য করতে হবে!"

শশি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া পাদচারণ করিতে লাগিল। সর্ব্বানন্দ কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া শেষে দুঃখিতভাবে বলিল, তা হলে কি করব, বল! কার্ত্তিককে এখন ত্যাগ করলে সে যে কি করে বসবে, কে বলতে পারে?"

শশি কহিল, "সে কি করবে না করবে, তাই কেবল ভাবছ, আমার বিষয় ত কৈ একটি বারও ভেবে দেখছ না?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার বিষয় কি আবার ভাবব, ঠাকুরদা? তুমি যে সব চিন্তার বাইরে। তুমি নিজেকে যে চিরদিন পরের করে রেখেছ। তোমার নিজের জন্য যদি নিজেকে এতটুকুও রাখতে, তা হলে তোমার জন্য জগৎ-শুদ্ধ লোক চিন্তা করত। তোমার অস্তিত্বই পরের জন্যে। এই কার্ত্তিকের জন্যই তোমার কত চিন্তা, কত উৎকণ্ঠা দেখেছি। যারা তোমার কেউ নয়, তারাই তোমার সব; তাইত তোমার দেখাদেখি কত লোক পরার্থপর হয়ে উঠছে। আজ যদি তুমি হঠাৎ নিজের জন্য চিন্তা সুরু কর, তা হলে যে সবই গোলমাল হয়ে যাবে!"

শশিভূষণ পদচারণ করিতে করিতে সহসা থামিয়া বলিল, "কি জানি সর্ব্ব, তোর সেই চিঠিটা পেয়ে পর্য্যন্ত আমার যেন সব ওলট পালট হয়ে যেতে সুরু করেছে। কার্ত্তিকের অবস্থা শুনে পর্য্যন্ত আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এত বড় আত্মপরায়ণতা! আত্মহত্যা করে আপনাকে জাহির করা! এই দৃষ্টান্তের ফল যতই unhealthy হোক এর একটা বিকট সৌন্দর্য্য আছে, এতে মদের তীব্র নেশা আছে, এর অভিভূত করবার ক্ষমতা আছে। নইলে আমার মত লোকই বা কেন আজ ক'দিন নিজের চিন্তায় ব্যস্ত হবে? আমারই বা কেন বারবার মনে হবে যে, কি করলুম আমি! কি পেলুম আমি? নিজেকে ভুলে পরের কথা ভেবে ভেবে কি আমার লাভ হল? আজ ক'দিন কেবলি মনে হচ্চে যে, আমার অন্তরে বসে আমার ক্ষুধিত অন্তরাত্মাটা কেবলি কাঁদছে। কি যে সে পায় নি,

তা বুঝতে পারছি না, তবু এটা স্পষ্ট অনুভব হচ্চে যে সেই হতভাগা মনটা আমায় আবার ব্যস্ত করতে আরম্ভ করেছে। এখন কি দিয়ে তাকে থামাই? সে যাকে চায় বলে মনে হচ্ছে, তাকে ত আর মাথা-মুড় খুঁড়ে মরলেও ফিরিয়ে আনতে পারব না। এ কথাটা সে জানে, তবুও সে কাঁদবে! এখন এই অবুঝ প্রাণটাকে নিয়ে কি করি! যা অপ্রাপ্য, তারই জন্য এত কান্নাকাটী কেন? যা পেয়েছিস, তাই নিয়ে খুসি থাক্ না বাপু!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "ঠাকুরদা, ঐ দেখ, তুমিও কার্ত্তিকের মত সুরু করলে। কার্ত্তিকও যে ঐ কথা বলে।"

শশি কহিল, "পাব না জেনেই মানুষ কাঁদে। পাব জানলে হয় ত কাঁদত না।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "মিথ্যে কথা! আকাশ-কুসুমও কেউ চায়! সোনার পাথরের বাটীর জন্য কান্নাকাটী কখনও কারও শুনেছ! মনে মনে মানুষ ঠিক জানে যে যা চাচ্ছি, তা পাওয়া গেলেও যেতে পারে, যা চাচ্ছি তা অপ্রাপ্য নয়, তাই মানুষ প্রার্থিত বস্তুর জন্য আছুরে ছেলের মত আছড়ে পড়ে কাঁদতে থাকে, যেন ভগবানের আর কোন কাজ নেই, সেই হতভাগাটার আব্দার রাখাই একমাত্র কাজ! ছি শশিদা, তোমার মুখে আজ এই অনার্য্য দুষ্ট কথা শুনে আমার ভারি রাগ হচ্ছে। আমার মনে হয়, যে-মানুষের চঞ্চল প্রকৃতি, যে অস্থির চিত্তের লোক, সে সুখেও অসুখী, দুঃখেও অসুখী। সে যদি ভাল অবস্থায় থাকে, তখন মন্দ অবস্থা পাবার জন্য সে মিছিমিছি কাঁদতে সুরু করে; সুখ যেন তার সইছে না, এইভাবে কাঁদতে সুরু করে। আর যে বাস্তবিক দুঃখী, তার কান্নাকাটির আর সীমা থাকে না। আসল কথা হচ্চে, মনের সাম্যাবস্থা, শান্তভাব হারালে মানুষের সব-চাইতে দুরবস্থা হয়। তোমায় আর কি বলব, ঠাকুর্দা, গীতার ভাষায় বলি, ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ততোঽত্থিষ্ঠ

শশি তাহার দীর্ঘ দাড়ির মধ্যে হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল "আমিও অর্জ্জুন নই, তুমিও শ্রীভগবান নও অতএব এই মশা মারতে গীতা-গদাঘাতে প্রয়োজন নেই। আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণী সুখ-দুঃখে যখন কোন মহাকবির চিত্ত আন্দোলিত হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা নেই এবং যখন কোন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র আমার এই দাড়ির শরাঘাতের ভয়ে তাঁর রাষ্ট্রের জন্য ভীত হয়ে উঠবেন না, তখন তোমার বাক্য বাণ সংহার কর। মন আমার যতই চঞ্চল হোক, তাতে এই দাড়ির একগাছি চুলও যখন নড়তে দেব না, তখন আর কি ভাই? তবে মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যদি বাষ্প জমে, তখন তাকে বের করে দেওয়া উচিত, তাই তোমার কাছে দু'কথা বল্লুম। ওতে রাগ করতে নেই।"

সর্ব্বানন্দ হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল "তোমার দাড়ির শত বর্ষ পরমায়ু হোক ওর এক এক গাছিতে যেটুকু সদ্বুদ্ধি আছে, তাই যদি অপরে পায়, তা হলে সে সারা জীবনের জন্য ধন্য হয়ে যায়।"

শশি কহিল, "তোদের আদরেই ত' এ অযথা বেড়ে যাচ্ছে। যাক্! সুকু যে এদিকে তোর জন্য প্রায় ক্ষেপে যাবার মত হয়েছে

যে তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিস, সে বাড়িসুদ্ধ লোককে পাগল করে তুলেছে; এমন কি সে দিন দেখি, মা সুদ্ধ চোখ বুজে ওর কাছ থেকে তোর সেই গুরুর ছুঁচের ডগায় হাত বুলোন শিখছেন; মাঝেমাঝে খোঁচাখুঁচিও খাচ্চেন, তবু তাঁর উৎসাহ বেড়েই চলেছে, ভয় হচ্ছে, আমিই বা কোন্ দিন চোখ বুজে ওঁদের সঙ্গে লেগে পড়ি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তবেই বোঝো ঠাকুর্দা, সৎকার্য্যের কি শক্তি! একবার পরের মঙ্গল করব এই সংকল্প করলেই অমনি কোথা থেকে এত আনন্দ এসে সেই সঙ্গে যোগ দেয় যে তখন আর কিছুতেই নিজেকে সামলানো যায় না। তখন মানুষ যতক্ষণ না নিজেকে নিঃশেষে তাতে সঁপে দিতে পারে, ততক্ষণ আর কিছুতেই থামতে পারে না। ঐই সুকুমারীর কথাটাই ভেবে দেখ। তোমার বা তোমার শাশুড়ীঠাকরুণের কথা ছেড়েই দাও, কারণ তোমরা ত চিরদিনই পরের জন্য আপনাদের সঁপে রেখেছ; কিন্তু এই অন্ধ বালিকা কোথা থেকে এতখানি উৎসাহ এতখানি সদিচ্ছা লাভ করলে?"

শশি কহিল, "কোথা থেকে যে সম্পূর্ণভাবে পেয়েছে তা বলতে পারিনে, তবে কতকটা যে তার বর্ত্তমান গুরুর কাছ থেকে পেয়েছে এটা নিঃসন্দেহ। সেজন্য আশা করি সুকুর গুরুটী তাঁর প্রিয়শিষ্যাকে অকালে ত্যাগ করবেন না। তার এই প্রাণপণ চেষ্টার ফলে যেন সে গুরুর হাত থেকে তার সাধনার চরম সার্থকতা লাভ করে।"

সর্ব্বানন্দ লজ্জিতভাবে বলিল, "সাধনায় সিদ্ধি!"

শশিভূষণ তার দাড়িতে একটা প্রচণ্ড টান দিয়া বলিল, "তবেরে চোরেরা! একটিকে কেড়ে নিলে সেই হতভাগা কার্ত্তিক এসে, আর একটিকে নেবে তুমি? আমি আজই দাড়ি মুড়িয়ে শিব সেজে গিয়ে ওদের বলছি, "বর নেরে পূর্ণ-মনস্কাম তোর"—অর্থাৎ আমায় নেরে! আহা, আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে। বাজা, ঐ টেবিলটাই বাজা।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আহাহা, অমন কাজ করো না। দাড়িওয়ালাদের মুখ থেকে বেদ-উপনিষদ বাইবেল কোরাণ ছাড়া অন্য কিছু বেরুলে আবার এখুনি কোন্ এক দাড়িওয়ালা জীবের সরস মাংসের-কথা মনে উদয় হয়ে খিদে জেগে উঠবে।"

শশিভূষণ আসন ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "Three cheers for the happy suggestion. ক্রমাগত Carbo-hydrates খেয়ে খেয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে; আয়, নিউ মার্কেট থেকে এক সের মটন্ আনা যাক্।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার অন্ত পাওয়া ভার! এই কান্নাকাটি হচ্ছিল, আবার দশ মিনিট না যেতেই ফুর্ত্তির ধুম লেগে গেল!"

শশি কহিল, "spirit damp করিস নে, আজ ভাল করে রাঁধতে হবে। পেটে কিছু ভাল-মন্দ জিনিষ না পড়াতে এতদিন মরে ছিলুম। এখন বেশ বুঝতে পারছি যে কেন এত দিন কোন কাজে মন দিতে পারি নি! ওরে বেটা রোঘো, যা, হুগ

সাহেবের বাজার থেকে এখুনি দু সের মটন নিয়ে আয়। এই নে দুটো টাকা, আর যা-যা দরকার, সব গুছিয়ে আনবি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আরে থাম, থাম! একেবারে দমকা খরচ করে ফেলো না। দু'-দু'টো টাকা! করলে কি? ওতে যে তোমার আট দিনের মাছ আর ষোল দিনের আলোর খরচ বন্ধ হয়ে যাবে।"

শশি কহিল, "তোকে আমার গিন্নিপনা থেকে বরখাস্ত করতে হবে। না খেতে দিয়ে তুই আমার ইহকাল-পরকাল সব খেলি। এবার থেকে তহবিল আমি রাখব।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তারপর দু'দিন যেতে না যেতেই ত' আমার কাছ থেকে ধার করা সুরু হবে! সে হবে না, দাও তোমার এই ক'দিনের হিসাব, আর তহবিল।"

সর্ব্বানন্দ শশিভূষণের হাত-বাক্স খুলিবার জন্য চাবিগুলি যেখানে সাধারণতঃ থাকিত সেই স্থানে হাত দিল; কিন্তু পাইল না। বিরক্ত হইয়া বলিল, "চাবি গুলো কি করলে?" শশিভূষণ মাথা চুল-কাইতে চুলকাইতে বলিল, "বাগবাজারে ফেলে এসেছি।" সর্ব্বানন্দ রাগিয়া বলিল, "তা হলে কি করে খুলব?" শশিভূষণ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "খোলাই আছে বোধ হয়।"

সর্ব্বানন্দ বিস্মিত হইয়া দেখিল, হাত বাক্সের তালা ভাঙ্গা। সে তখন ক্রুদ্ধ হইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, আর একটা আল-মারির কলেরও ঐ দশা ঘটিয়াছে, তাছাড়া অনেকগুলি নূতন দৈনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে। সে শশিভূষণকে বিশেষরূপেই চিনিত। এই সমস্ত দ্র যে বাক্সে বা আলমারিতে আছে, তাহ তালা ভাঙ্গিবার ভয়ে যে এগুলি কে হইয়াছে, তাহা সে তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া ল বলিল, "চাবিগুলো কি কাউকে পাঠি আনিয়ে নেওয়া যায় না?" শশিভূষণ হইতে পলাইয়া গেল। কারণ চাবি বাগবাজারের বাড়ীতেও খুঁজিয়া পা যায় না; তবে শশিভূষণের খুব বিশ্বাস চাবি সেইখানেই আছে।

সর্ব্বানন্দ বিরক্ত হইয়া রঘুনাথ ডাকিল; কিন্তু রঘুনাথ শশিভূষণের উপযু ভৃত্য। সে ঐ বাটির নিম্নতলে বাহিরে দিকে যে চাউলাদির দোকান ছিল, তাহাদে সরু চাউল ঘৃত ইত্যাদির বরাত দি একটা লৌহ তারের টোকা হস্তে লই বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বানন্দ বির হইয়া স্বয়ং সমস্ত দ্রব্য যথাস্থানে স্থা করিয়া ঘরটিকে পুনরায় মনুষ্যবাসযো করিয়া তুলিল।

৯

মণিশঙ্করের অত্যাচারের ফল এতদি ফলিতে চলিল। ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং সম তদন্ত করিয়া তাহাকে এবং তাহার সাঙ্গোপা সকলকে পিনাল কোডের অনেকগুলি ধারা চার্জে অভিযুক্ত করিয়া চালান দেওয়াইলে এবং জমিদার কার্ত্তিকচন্দ্রের নাম ব্লাক বু তুলিয়া দিয়া তাহাকেও শাসাইলেন, ভবিষ্যতে যদি সে সাবধান না হয়, তাহা হইলে তাহার হাত হইতে এষ্টেটের ভার কাড়িয়া লওয়া হইবে। সর্ব্বানন্দ এ সংবাদ পাইয়া কার্ত্তিককে লিখিয়া পাঠাইল যে মণি

রকে বাঁচাইবার জন্য যেন চেষ্টার ত্রুটি হয়; কারণ কার্ত্তিকের দোষেই সে এই পদে পড়িয়াছে। কার্ত্তিক সে পত্রের উত্তরে খিল যে একজন ম্যানেজার গেলে ন ম্যানেজার পাওয়া এই চাকুরী-লোলুপ দেশে খুবই সহজ, অতএব মণিশঙ্করের ন্য চিন্তা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই; শেষতঃ উহারই জন্য যখন কার্ত্তিকের ত দুর্নাম, তখন যাহাতে মণির জেল হয় াহাই করা কর্ত্তব্য; উপরন্তু ইহাতে াজিষ্ট্রেটের নিকট লুপ্ত প্রতিষ্ঠার পুন-ারেরও বিশেষ সম্ভাবনা।

শৈলজা কার্ত্তিকের এই অভিমত শুনিয়া লিল, "না, তা হবে না। তোমার জন্যই দিদা যখন এই বিপদে পড়েছে, তখন তাঁকে াঁচাবার চেষ্টা করতেই হবে। তুমি যদি না কর, বাবা বলেছেন, আমার তরফ থেকে তিনি তদ্বির করে তাকে বাঁচাবেন।"

কার্ত্তিক কহিল, "স্বামীকে ছেড়েও যে স্ত্রীর একটা অস্তিত্ব আছে, তুমি যে আমার ছায়ামাত্র নও, এটা তুমি বুঝতে পারছ দেখে আমার ভারী আনন্দ হচ্চে। আমি যদি অন্যায় করি, তুমি সাধ্যমত সে অন্যায়ের প্রতিবিধান করবে, এই হচ্চে কাজ। তাহলেই বুঝব যে তুমি মানুষ, তুমি খেলার পুতুল নও।"

শৈলজা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "অমন কথা বলো না। আমি তোমাকে লঙ্ঘন করে কোন কাজ করতে চাইনে, এত বড় দুর্গতি যেন আমার না হয়। আমি যা করতে চাই, সে তোমার ভালর জন্যই। স্বামীকে ছাড়িয়ে কোন কাজ করলে স্ত্রীর পাপ হয়।"

কার্ত্তিক কহিল, "ভুল, মস্ত ভুল! স্বামীকে ভালবাসা ভক্তি করা ছাড়াও একটা বড় জিনিষ আছে, সেটা হচ্চে নিজের ধর্ম্ম, নিজের মনুষ্যত্ব। সেটা যেখানে নষ্ট হবার ভয় থাকে, সেখানে সমস্ত ত্যাগ করেও মানুষের তাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করা উচিত। নইলে যিনি স্বামীর স্বামী, তাঁর কাছে গিয়ে কি জবাব দেবে?

শৈলজা কহিল, "তুমি যদি এত বোঝো, তবে কেন নিজে এমন হয়ে যাচ্ছ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি যে আর মানুষ নেই! নইলে দেখতে পাচ্ছ না যে যারা আমাকে কত ভয় করত, তারাও এখন আমায় তৃণ জ্ঞান করে। আমি নিজের ইচ্ছেটাকে যতদিন আমার অধীনে রেখেছিলুম, ততদিন কেউ আমার সুমুখে মুখ তুলে কথা বলতে সাহস করত না। এখন আমি সেই ইচ্ছার অধীন হয়ে সেই ইচ্ছার বিচিত্র মায়াজালে বদ্ধ হয়ে গুটি পোকার মত আবদ্ধ হয়ে পড়ছি। ইচ্ছাটা এখন আর আমার নয়, আমিই আমার ইচ্ছার—আমার মায়ার—আমার মোহের। নাহলে আমার এমন দুটো চোখ থাকতে আমি অন্ধ হয়ে যাই? অন্ধ আমি নই, তা বেশ জানি, তবু দিনের আলো আমার সহ্য হয় না। ইচ্ছে ছিল, যে আর কিছু দেখব না, অন্ধ হয়ে তোমাদের উপর প্রতিশোধ নেব। তোমরা জানতে পারতে না, কিন্তু প্রথম প্রথম আমি atropin দিয়ে চোখের দৃষ্টি কমাতে চেষ্টা করতুম, আরও কত ওষুধ ব্যবহার করতুম তার ঠিক নেই; কিন্তু তখনও আমার

আমিত্ব সম্পূর্ণ বজায় ছিল, তাই কিছুতেই এই চোখ দুটো এদের শক্তিকে ছাড়তে চাইত না। কিন্তু আজ আর কোন ওষুধ ব্যবহার করিনে, এদের শক্তিও বোধ হয় যথেষ্টই আছে, তবু যেই বাইরের আলো লাগে, অমনি কে যেন এদের বন্ধ করে দেয়, শতচেষ্টাতেও আর খুলতে পারি না। আমার একটা আত্মার পাশে কোথা থেকে আর একটা অন্ধকারের প্রেতাত্মা এসে যেন অচল অটল হয়ে বসে আছে। রাত হলেই সেটা যেন বাইরের অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যায়। তখন আবার নিজের শক্তি ফিরে পাই বটে; কিন্তু সারাদিন একটা বিশ্রী রকম শক্তির অধীন থাকার দরুণই বোধ হয় রাত্রেও আমি ঠিক মানুষের মত হতে পারি না।"

কার্ত্তিকের কথা শুনিয়া শৈল অবাক হইয়া গেল। সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না যে, এই মানুষটী কোন্ শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হইয়া সমস্ত বুঝিয়া-সুঝিয়াও এমন হইয়া আছে। যে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আপনার চরিত্রের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছে, সে কেমন করিয়া ভূতাবিষ্টের ন্যায় কাজ করিতেছে, তাহা শৈল কেমন করিয়া বুঝিবে? শৈল কাঁদিয়া-কাটিয়া দেখিয়াছে, মান-অভিমান করিয়া দেখিয়াছে, অনাহারে অনিদ্রায় কত দিন কত রাত্রি কাটাইয়া দেখিয়াছে, কিছুতেই কার্ত্তিকের দৈনিক জীবন-যাত্রার গতি এক চুলও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই। কতদিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত একাসনে কার্ত্তিকের নিকট বসিয়া কাটা

ইয়াছে, তবু কি করিলে যে সে আবার সু হইবে, আবার তাহার পূর্ব্বাবস্থা সে ফিরি পাইবে, তাহা ঠিক করিতে পারে নাই অথচ ইহা সে স্পষ্টই বুঝিয়াছে যে কার্ত্তি স্নেহহীন নহে, কার্ত্তিক তাহার পত্নীর সম্পূ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; তাহার উপর পুত্র দেবী প্রসাদের সামান্য কষ্টও সে সহ্য করিতে পা না। এমনি-পাছে তাহার নিকটে আসি দেবীপ্রসাদের কোনরূপ অমঙ্গল হয়, জন্য পুত্রকে তাহার নিকট দিনের বেলায় আসিতেই দেয় না।

শৈলজা নিরুপায় হইয়া এই পুত্রে সাহায্যেই সময় সময় স্বামীকে তাহা অন্ধকার কোটর হইতে বাহিরে আনিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার নিজে হৃদয়ে যে কতখানি অভিমানের ব্যথা জাগিয়া উঠে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তথাপি পাছে অভিমান দেখাইলে স্বামী আরও কি করিয়া বসে, এই ভয়ে সে মান-অভিমান দেখানো ইদানীং একপ্রকার ত্যাগই করিয়াছে। আজ স্বামীর মুখে তাহার অবস্থার এতটা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শুনিয়া সে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, "যদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেও তোমায় ফিরে পাই, তাও আমি করতে পারি। কিন্তু তুমি কি যে চাও, কি হলে যে তোমার ভাল হয়, তাই বুঝতে পারছি না।"

কার্ত্তিক কহিল, "যেদিন তুমি আমা-থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে একটা পূরা মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারবে, সেই দিন বুঝবে।"

শৈল কহিল, "তুমি আমায় ত্যাগ করলে যদি সুস্থ হও, তবে তাই কর না

...? আজ কতদিন থেকে সে কথা ত' ...।"

কার্ত্তিক কহিল, "কাকেও ত্যাগ করবার ...া যদি আমার থাকত, তাহলে ত' আমি ...ই থাকতুম। আমি যে এখন বদ্ধ ..., শক্তি থাকতে শক্তি-হীন! শৈল, ... আমায় বুঝতে পারবে না, কেন ... কষ্ট পাচ্ছ? যাও, বেশীক্ষণ ...ার কাছে থাকলে হয়তো তুমিও আমার ... হয়ে যাবে। আমি বলেছি ত' তোমায় ...াগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে ...ন তুমি—উঃ, সে কি দিন! যেদিন ...ও হারবে, তুমিও হারবে, আমি জিতব—"

শৈল কহিল, "কোন্ দিন? কোন্ দিনের ...া তুমি ভাবছ? বল, তোমার পায়ে ...ই।"

শৈলজা কার্ত্তিকের হাত চাপিয়া ধরিয়া ...ভব করিল, কার্ত্তিকের শরীর সঘন ...পিত হইতেছে। কার্ত্তিক শৈলর পাশে ...য়া তাহাকে অতিশয় আবেগে জড়াইয়া ...য়া বলিল, "ছিঁড়ে ফেল, ছিঁড়ে ফেল, ...ল, এ বন্ধন। তুমি মুক্ত হয়ে দাঁড়াও, ...মিও মুক্ত হয়ে দাঁড়াই। পারবে?"

...লজা কাঁদিয়া ফেলিল। কার্ত্তিক তখন ...াকে পরিত্যাগ করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ...লিল। শৈলজা চোখ মুছিতে মুছিতে ...ল, "এ জীবনে তোমার সঙ্গে আমার ...সম্বন্ধ, তাতে তোমায় ত্যাগ করা আমার ...ক অসম্ভব, সুধু অসম্ভব নয়, সে চিন্তাও ...া। তুমি আমায় ত্যাগ করে সুখী হতে ...ও, হও, কিন্তু আমায় তোমার আশায় ...দিনই বসে থাকতে হবে।"

কার্ত্তিক কহিল, "দেখদিকি শৈল, কত বড় অন্যায়! কত বড় অত্যাচার! পুরুষ মানুষ যা ইচ্ছে করতে পারবে, আর মেয়ে মানুষের বেলাতেই যত নিয়ম, যত বন্ধন, যত পাপের বিভীষিকা! কিন্তু তোমাকে এই আমারই জন্য, এই আমাকে ভালবাস বলেই আমায় ত্যাগ করতে হবে। তোমাকে দিয়েই আমি তোমাদের জাতের উপর পুরুষমানুষের এই অন্যায় অবিচারের প্রতিশোধ নেব। তোমাকেই একদিন পূর্ণ শক্তিতে বলতে হবে যে, তুমি আমায় চাও না!"

শৈল তাড়াতাড়ি কার্ত্তিককে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "সেদিন বোধ হয় আমি মরব।"

কার্ত্তিক তাহার মুখে চুম্বন করিয়া বলিল, "না, সেই দিনই তুমি তোমার যথার্থ জীবনকে খুঁজে পাবে, শৈল। সেইদিনই সামনা-সামনি মুখোমুখি হয়ে দুজনে দাঁড়াতে পারব।"

শৈলজা স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, "তোমায় এক মুহূর্ত্ত না দেখলে আমি থাকতে পারিনে। সেই-আমি তোমায় বলব, তোমায় চাইনে, তুমি চলে যাও? তুমি আমায় যে দিন গলা টিপে মারতে পারবে, সে দিনও ও কথা বলতে পারব কি না সন্দেহ।"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি স্বেচ্ছায় না পার, আমি তোমাকে দিয়ে তাই করাব। আমাকে ভালবাস বলেই তুমি আমায় বলবে যে, আমায় আর চাও না। আমি সেদিনের আশায় আমার জীবনকে ধরে রেখেছি। ভগবান কি দয়া করে এমন দিন দেবেন না?"

শৈল কহিল, "দয়া? তাকে তুমি দয়া

বল? - ছি ছি, যদি তিনি আমায় তোমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য করান, তাহলে তাঁর দয়াময় নামে কলঙ্ক হবে।"

কার্ত্তিক শৈলজার বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বলিল, "কবে তোমায় বোঝাতে পারব, শৈল? হায়, জানি না, সে কবে!"

শৈলজা আর থাকিতে পারিল না; টলিতে টলিতে বাহিরে চলিয়া গেল। কিন্তু সেদিন তাহার কোন কাজ হইল না। ভূতাবিষ্টের ন্যায় সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া, সন্ধ্যার পর গৃহ-দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া এক পাশে সে পড়িয়া রহিল। সকলেই তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আজ কাহারও কোন কথা শুনিল না; গৃহদেবতার মন্দিরে অনাহারেই শয়ন করিয়া রহিল। দেবু কাঁদিয়া কাঁদিয়া বহুবার মাতার কাছ হইতে ফিরিয়া গেল, দাসদাসীগণ সাধ্য-সাধনা করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িল; তবু শৈলজা যেন চেতনা-হীন!

তাই কি হবে ঠাকুর! আমি কি ইচ্ছা করে আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে দেব? এ আজ আমি কি শুনলুম, ঠাকুর! এ আমায় কেন শোনালে, নারায়ণ! স্বামী যখন এত জোর করে বলছেন, তখন নিশ্চয়ই তা হবে। কিন্তু তা হলে কি হবে? কি নিয়ে আমি থাকব? আমি যে আর ভাবতেও পারিনে।

শৈলজার মনে হইল, সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া একটা ভয়ানক হাহাকার উঠিতেছে। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিশ্ব-সংসার উল্কা-বৃষ্টির মত দিকে দিকে ছুটিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। তাহার কেবলি হইতেছে যে, যদি স্নেহ মিথ্যা, ভালবা মিথ্যা, ভক্তি মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, মায়া মো বন্ধনমাত্র, তবে সত্য বস্তু কি? কি? স বস্তু কি কেবল সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মু উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল উদ্দেশ্যহীন ছুটাছুটি? না, কিছুতেই তা নয়।

শৈলজা প্রাণপণ-বলে মনে মনে ব না, তা নয়। ধর্ম্ম সত্য, বন্ধন সত্য, সত্য, ভক্তি সত্য, ভালবাসা সত্য—স সত্য, সত্য! এ সত্যের জগৎ, মিথ্যার ন মিথ্যা যা, তাই মোহ, তাই মায়া, মানুষকে সত্য হতে চ্যুত করে, পা করে, চিরদিনের পথ হইতে দূরে ল গিয়া অন্ধকারের মধ্যে আপনাকে নষ্ট ক ফেলে। শৈলজা ভক্তিভরে গৃহ-দেবতা প্রণাম করিয়া পূজা-কক্ষ হইতে বা হইয়া প্রথমে দেবুকে কোলে লইয়া প্লাবিত বদনে বারবার তাহাকে চু করিল; তারপর কিছু আহার ক একজন দাসীকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুর মহাশয়ের নিকট চলিয়া গেল।

শিবচন্দ্র পুত্রবধূকে বসিতে বলিয়া প্রথম পৌত্রকে ক্রোড়ে লইয়া আশীর্ব্বাদ ও দান করিলেন। তারপর বলিলেন, "স সমস্ত দিন তোমায় দেখিনি কেন দেবু বার বার আমায় খবর দি যে তুমি আজ তাকে কোলে নাও কি হয়েছে মা?"

বধূ তখন, কন্যা যেমন স্নেহময় পি নিকট তাহার সমস্ত মর্ম্ম-কথা ব্যক্ত সেইভাবে অসঙ্কোচে সমস্ত বর্ণনা ক

, "যদি এই হয় ত' কি হবে, ?"

ায়রত্ন সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "ভয় কি তোমারই জয় হবে। কার্ত্তিক যখন ই বুঝতে পেরেছে, তখন মেঘ কেটে ছে। আমি তোমায় বলছি, মা, তোমার ন ভয় নেই। তোমার যদি পরাজয় হয়, তাহলে বুঝব, সংসার মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, সমস্ত বিশ্ব-রচনাই মিথ্যা।"

শ্বশুরের নিকট অভয় পাইয়া শৈলজা তখনই তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া শ্বশুর-গৃহে তাহার যে দৈনিক কর্ম্ম আজ অসম্পন্ন ছিল, তাহা সম্পন্ন করিয়া শ্বশুরকে আহারাদি করাইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া গেল।

ক্রমশ

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

আঁধারে আলো

১

স্বার্থের ধূলি ধূসরিত এই সংসারে,
অজানা দুঃখ তিল তিল করি সংহারে!
তাই নির্জ্জনে কাঁদি প্রাণপণ বেদনে,
মানুষ তাহার অর্থ বুঝিবে কেমনে!
বোঝে বিহঙ্গ বিটপী লতিকা,
বোঝে কোটি তারা গগন-শোভিকা,
বোঝে ফোটা কলি, নদী কুতূহলী
অন্তরে!
মানুষের ব্যথা মানুষ বোঝে না হায় গো—
ীন স্বার্থের পঙ্কিল-ঘোলা সলিলে কেবলি
সন্তরে!

২

ব্যর্থ বেদনে কেন বৃথা হই দণ্ডিত!
ওই শোন্ তুই ওই শোন্ ওরে শঙ্কিত!
পাখীরা পুলকে গেয়ে গেয়ে বলে—ভেব না,
মাথা নেড়ে নেড়ে বিটপী কহিছে—কেঁদনা,
আকাশের তারা হেসে হলো সারা,
ফোটা ফুলগুলি প্রেমে মাতোয়ারা,
নদী কুলুকুল—হাসিয়া আকুল
প্রান্তরে!
মানুষের ব্যথা মানুষ বোঝে না হায় গো—
নাই বা বুঝিল, বোঝে চন্দ্রমা
চিরমনোরমা অম্বরে!

৩

আশা রাখ্ তুই আশা রাখ্ ওরে উন্মনা!
দূর হবে দুখ-দুর্দ্দিন শত লাঞ্ছনা!
সত্য নিয়ত পূজিত হবে এ নিখিলে,
খাঁটি প্রেম সে তো মরে না ডুবালে সলিলে,
চিরজয়ী সে যে জীবনে মরণে,
সবে নত হয় তাহারি চরণে,
সার্থক সে যে আপনার তেজে,
অন্তরে!
মানুষের ব্যথা নাই বা বুঝিল মানুষে—
হেসে গেয়ে চল্, তোর পদতল
কাটিবে না কভু কঙ্করে!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা

বর্ত্তমান বর্ণভেদের তৃতীয় লক্ষণ : মর্য্যাদা-সোপানের পরিবর্ত্তন।

অচলপ্রতিষ্ঠ হওয়া দূরে থাক্, বর্ণ-ভেদের মর্য্যাদা-সোপানের মধ্যে ক্রমাগতই কিছু-কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

*
* *

একদিকে আরোহণের প্রক্রিয়া।

ব্যক্তিবিশেষ, গোষ্ঠীবিশেষ, উচ্চতর ধাপে আরোহণ করে; এইরূপে, বন্য অসভ্য জাতিদের প্রধানেরা, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে গৃহীত হয়; এইরূপে রাজাদের নিকট হইতে গোষ্ঠীবিশেষ ব্রাহ্মণের পদমর্য্যাদা বা অভিজাতবর্গের পদমর্য্যাদা লাভ করে।

জাতগুলা নিম্নতর ধাপ হইতে, উচ্চতর ধাপে সমুত্থিত হয়। উহাদের মধ্যে কোন কোন জাত মিথ্যা করিয়া কতকগুলি গুণ-মর্য্যাদা জোর-দখল করিয়া বসে, আবার কোন কোন জাতের গুণমর্য্যাদা রাজা কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়।

আর কতকগুলি জাত, কতকগুলি প্রথার নিয়ম কড়াকড়ভাবে পালন করিয়া থাকে, যথা—বিধবা-বিবাহ-নিষেধের নিয়ম, অন্তঃ-পুরে নারীর অবরোধ-নিয়ম, উচ্চতর কুল হইতে জামাতা-নির্ব্বাচন; কয়েক বংশের পরে, কালক্রমে যে সকল গোষ্ঠী এই সকল নিয়ম দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত পালন করে, তাহারাই আবার একই জাতের অন্তর্গত অন্য গোষ্ঠী হইতে পৃথক হইয়া, একটা নূতন জাত গড়িয়া তুলে ও একটা স্বতন্ত্র নাম ধারণ করে। অনেক সময় উ স্বকীয় সামাজিক শ্রেণী বদলাইয়া ক্ষে জাট ও গুর্জ্জরেরা আপনাদিগকে রাজ বলিয়া ঘোষণা করে। তাছাড়া, ধন-ঐশ্ব সঙ্গে সঙ্গে অনেক জাত সম্মান লাভ ক থাকে।

*
* *

অন্যদিকে, অবরোহণ বা অধঃপত প্রক্রিয়া। নিঃস্ব হইয়া পড়ায়, বিশেষ-বি গোষ্ঠী ও বিশেষ-বিশেষ জাত নিম্ন নামিয়া পড়ে। এই কারণে উহাদের ন দিগকে অন্তঃপুরে বদ্ধ রাখা, কতক প্রথা পালন করা, কতকগুলি যজ্ঞ অনু করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। নিম্নশ্রেণীর ভি বাধ্য হইয়া কন্যাদান করিতে হয়। আ ব্যবহার শিথিল হইয়া পড়ে; বিধবার বি দেওয়া হয়। এইরূপে কোন কোন স্বজাত হইতে বহিষ্কৃত হয়, অথবা কোন জাত পতিত হয়।

এই আরোহণ ও অবরোহণের প্রক্রি এরূপ সুস্পষ্ট যে, Ibbetson, পঞ্জা আদম-সুমারের বিবরণীতে এইরূপ লিখি পারিয়াছেন :—

"বর্ণভেদপ্রণালীটা যেরূপ পরিবর্ত্তনশী এমন আর কিছুই নহে, উহার লক্ষণ নি করা যেরূপ কঠিন এমন আর কিছুই ন কোন-এক-বংশে কোন এক বিশেষ জা লোকের উৎপত্তি হইয়াছিল, এই প্রমাণের বলে এইরূপ অনুমানের অ

হয় যে, বর্ত্তমান বংশের লোকও ঐ জাতের অন্তর্ভূত। ইতিমধ্যে এমন ক ঘটনা ও অবস্থা হইতে পারে, যে ণে এই অনুমানটা সত্য নহে বলিয়া পন্ন হইবে।"

৪

জাতের খণ্ড বিভাগ।—সংমিশ্রণ, রূপান্তর-ণ, মর্য্যাদা-সোপানের পরিবর্ত্তন,—এই ব্যাপার, জাতের ভিতর খণ্ডবিভাগ দন করিয়াছে।

মধ্যযুগে যে কাজের আরম্ভ হইয়া-, ঊনবিংশ শতাব্দী সেই কাজের ধারা-হকতা রক্ষা করিয়াছে। ১৮৮২ অব্দের ম-সুমারীর পর, হিসাব করিয়া দেখা হয়—ন ২৮৮৯ জাত বিদ্যমান ছিল; তাছাড়া তর আরো অনেক উপবিভাগের মধ্যে াহের আদান-প্রদান ছিল না।

৫

অতএব, যে সকল ব্যাপার হইতে সমাজ এইরূপ স্বাভাবিকভাবে পরিপুষ্ট া উঠিয়াছিল, সেই বর্ণভেদপ্রণালী, বর্ব্বর ভাদিগের ভারত-আক্রমণ, সামন্ততন্ত্র, াম, মধ্যযুগের চাঞ্চল্য, মোগলদিগের গত শাসনপ্রণালী, ও দশম শতাব্দীর াজকতা,—এই সমস্তই আমরা একে একে লোচনা করিয়াছি।

এক্ষণে, য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব, কি মাণে বর্ণভেদ-প্রণালীর মধ্যে পরিবর্ত্তন নিয়াছে, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া তেছে।

*
* *

৫

বৈষয়িক সভ্যতা।

গোলামী প্রথা ও কৃষকের দাসত্ব ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৫ আইনের দ্বারা রহিত হয়; তাহা হইতেই কৃষক শ্রেণীর অন্তর্ভূত নীচু জাতেরা উত্তরোত্তর উচ্চতর ধাপে আরোহণ করে।

যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায় ভারতের সমস্ত অধিবাসীরা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে;—এইরূপে ক্রমেই স্বাতন্ত্র্য-তন্ত্রের লাঘব হইয়াছে; সকল জাতের লোকই আগ্-বোটে, রেল-পথে, ট্র্যাম্-ওয়ে-গাড়ীতে, রঙ্গশালায় একত্র মেলামেশা করিতেছে।

য়ুরোপের বাজার সস্তা বলিয়া য়ুরোপের মালপত্র সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে; ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, ঐ সকল জিনিস ছুঁইলেও অশুচি হইতে হয় এইরূপ ধারণা ছিল।

দৃষ্টান্তের বশীভূত হইয়া সকল শ্রেণীর হিন্দুরাই, বিজেতাদিগের রীতি-নীতি,—এমন কি—ব্যসন-গুলিও গ্রহণ করিয়াছে। সরকারী বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যায়, সুরাপানের উত্তরোত্তর কিরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে।

সরকারী কর্ম্মচারীদিগের নিকট সকলেই সহজে যাইতে পারে।

একজন নীচু জাতের লোক, শাসন-বিভাগের কাজে প্রবেশ করিয়া রাজপুত ও ব্রাহ্মণদের উপর শাসন-ক্ষমতা জারী করে, জজের আসন লাভ করিয়া অপরাধী হইলে তাহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করে। সমস্ত পুলিসের লোক নিম্ন-শ্রেণী হইতে সংগৃহীত হয়। কতকগুলি শ্রমশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায়, যে সকল জাত ঐ সকল শ্রমশিল্পের কাজে নিযুক্ত তাহারা ধনশালী হইয়া উঠিয়াছে এবং ঐ সকল শিল্পকাজ তাহা-

দিগকে নীচত্ব হইতে উদ্ধার করিয়াছে :—যথা সূতা-কাটার কাজ, কামারের কাজ, এমন-কি চর্ম্ম-সংস্কারের কাজ। নূতন নূতন শ্রম-শিল্প প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন জাতও গড়িয়া উঠে।

অধিকন্তু, নূতন অর্থনৈতিক অবস্থা, সমগ্র সমাজের ভিতর দ্রুত পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও, সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর লোকেরা, অন্ধ সংস্কারের দরুণ রুদ্ধগতি হইয়া পড়ে; এবং প্রভুত্ব, ধন-ঐশ্বর্য্য ও ভোগ-সুখ, কুপ্রথাদিতে আসক্তি, এবং যাহাতে অহঙ্কার ও স্বার্থপরতার উদ্রেক হয় এইরূপ সম্মিলনাদি—এই সমস্ত, উহাদিগকে হীনবীর্য্য করিয়া ফেলে। দৈহিক শ্রমের কাজে যাহাদের ঘৃণা নাই, আতঙ্ক নাই, কষ্ট সহিতে যাহাদের ভয় নাই, সেই সকল নিম্নশ্রেণীর দরিদ্রসন্তানদিগের নিকট, উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত হয়। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই, ইংরাজি সভ্যতা হইতে, সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতা হইতে, বল সঞ্চয় করিয়া, নব বলে বলীয়ান হইয়া, ভারতভূমি শ্রমশিল্প ও বাণিজ্য-ব্যাপারে বড় বড় দেশের সমকক্ষ হইতে আরম্ভ করিবে। গ্রাম্য অধিবাসীর তুলনায় নগর-অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে; এবং কৃষিঘটিত যন্ত্রাদির ব্যবহার, গ্রাম্য লোকদিগের মনোভাব পর্য্যন্ত বদলাইয়া দিবে। জীবন-সংগ্রাম, ধনতৃষ্ণা, আরাম-আয়েষের ভাব, এই সমস্ত—ভারতীয় সমাজের যাহা মৌলিক জিনিস সেই ভোগ-অধিকার-সাম্যবিশিষ্ট জন-সম্মিলনকে ভাঙ্গিয়া দিবে।

*
* *

নৈতিক প্রভাব।

ভারতের সমস্ত অধিবাসী যে
প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়াছে তাহাতে সং
নাই। দেখা যায় ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে
ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্বও কমিয়া গিয়াছে
রাষ্ট্রনৈতিক অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে
পুতদিগের মানসম্ভ্রমেরও অধঃপতন হইয়া
সর্ব্বত্রই প্রাচীন প্রথাদি স্বীয় আধি
হারাইয়াছে। কিন্তু কেবল হিন্দুরাই,
কারী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া, ইংরে
রীতিনীতি ও মতামত আত্মসাৎ করি
চেষ্টা করিতেছে।

বহুকাল পর্য্যন্ত হিন্দুস্থান ও প
য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতি বিদ্রোহী ছি
পূর্ব্ব-বিজিত মাদ্রাজ ও বাঙ্গলাদেশে এরূপ
নাই। এই দুই প্রদেশের লোকেরা গো
হিন্দুজাতি হইতে উৎপন্ন নহে। দুই বিপ
ধরণের মানসিক গুণ, ঐ দুই প্রদে
লোকদিগকে উক্ত নূতন রীতিনীতি ও
মতামত গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত করে। মাদ্রা
দিগের মধ্যে উদ্যম চেষ্টা, সুবুদ্ধি, গণত
মনোভাব, খুব-একটা স্বাধীনতার ভাব আ
কিন্তু সেই স্বাধীনতার ভাব হইতে সাবধা
ও দূরদৃষ্টি বহিষ্কৃত হয় নাই। আর, বাঙ্গা
দের মধ্যে, চরিত্রের নমনীয়তা, দৈহিক শ্র
প্রতি অবজ্ঞা, বিপ্লবকারীসুলভ মনো
শব্দঝঙ্কারময়ী বাগ্মিতার দিকে ঝোঁক
অতিসূক্ষ্ম কূট যুক্তির প্রতি অনুরাগ।

রাষ্ট্রের শাসনবিভাগে প্রবেশ করি
যোগ্যতা লাভ করা—ইহাই উদ্যমশীল যু
দিগের একটা বিশেষ প্রলোভনের বিষয় ছি
যে শ্রেণীরই লোক হৌক না কেন, সক

ন কাজেরই জন্য প্রার্থী হইতে পারে।
ন একদিকে, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণেরা
াশিকের প্রদত্ত সরকারী কার্য্যের ভার
ণে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিল তেমনি
দিকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা
সকল কাজের জন্য কাড়াকাড়ি করিতে
গিল। এইরূপে,—ইতিপূর্ব্বে যাহারা
জার পাত্র ছিল, সেই কায়স্থেরা—
কারী কেরাণীরা—প্রভাবশালী হইয়া উঠায়,
াকে তাহাদিগকে ভয় করিতে লাগিল।
কারী কর্ম্মচারী, লেখক, সংবাদপত্র-
চালক, ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী, বাণিজ্য-কুঠীর
চারী—ইহারা সকলেই প্রাচীন ভারতের
তিনীতি ও ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি অবজ্ঞা
কাশ করিতে লাগিল। আর তাহারা ধর্ম্ম
নিত না, জাতি মানিত না, পারিবারিক গণ্ডী
নিত না। য়ুরোপীয় ধরণে পোষাক পরিয়া,
ারা গোমাংস আহার করিতে লাগিল,
রাপান করিতে লাগিল, গোঁড়া হিন্দুদিগকে
রূপ করিতে লাগিল, এমন-কি অপমানও
রিতে লাগিল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলী,—এই
সাহটাকে থামাইয়া দিল। হিন্দু ও য়ুরোপীয়-
গের মধ্যে মেলামেশা কঠিন হইয়া পড়িল।
রাজকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া, নব্য-হিন্দুরা
দেশীয়দিগের সহিত মেলামেশা করিতে
ারম্ভ করিল। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী হইতে
াহারা বরাবর প্রাচীন অন্ধসংস্কারের সহিত
ড়িয়া আসিয়াছে, তাহাদের মানসিক প্রকৃতি
নপ্রকারের ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক।

কঠোর অধ্যয়নের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া,
াযুঝির দ্বারা দ্রঢ়িষ্ট হইয়া, কেহ কেহ
কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল :—১৮৫০ ও ১৮৭০ এই সময়ের মধ্যে যিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন সেই মধুসূদন; বিধবা-বিবাহ-প্রস্তাবকারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; ব্রাহ্মণসমাজের দলপতিগণ; আজিকার দিনে, "পজিটিভ্"-সম্প্রদায়ের প্রধান M. Ghose; কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৌঁশুলী M. Banerjee; এবং লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু-সাহিত্যের অধ্যাপক M. Dutt। যদিও এইসব লোক জাতের সব বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, তথাপি দেশের লোকের রীতিনীতি ও ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি তাঁহাদের স্নেহদৃষ্টি আছে—এমন কি সহানুভূতিও আছে।

আর কতকগুলি লোক আরো উগ্রচণ্ড, তাহারা ভারতীয় রাষ্ট্রবিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়া থাকে; তাহারা জন্মগত বিশেষ-অধিকার, বর্ণ-ভেদ প্রথা ও ধর্ম্মবিশ্বাসকে রহিত করিতে চাহে; য়ুরোপীয় সমাজের লৌকিক ও গণতন্ত্রিক গঠনে হিন্দুসমাজকে গড়িয়া তুলিতে চাহে। উহাদের পরামর্শ-সভা, সংবাদপত্রে লিখিত উহাদের প্রবন্ধাদি, রক্ষণশীল হিন্দুদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। তথাপি ১৫ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া, উহাদের গভর্ণমেণ্টের প্রতি বৈরিতায়, স্বদেশীয়দিগের প্রতি বৈরী-ভাবটা কমিয়া আসিল। যখন হইতে উহারা ইংরেজদিগকে বেশী গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল, তখন হইতে গোঁড়া হিন্দুদের প্রতি আক্রমণটা কমিয়া আসিল।

আবার কতকগুলি লোক, আমূল-সংস্কার-তন্ত্রের মধ্যে হিন্দুসমাজের ও হিন্দুধর্ম্মের নৈতিক কর্ত্তব্যগুলি লঙ্ঘন করিবার একটা ছুতা পাইল।

"বিষবৃক্ষ" উপন্যাসে, বঙ্কিমচন্দ্র, ভ্রষ্ট-চরিত্র নব্য-হিন্দুর চিত্রটি বেশ আঁকিয়াছেন। দীর্ঘকালব্যাপী মামলা-মোকদ্দমায় এক জমিদার-বংশ 'উচ্ছন্ন' যায়; সেই বংশসম্ভূত দেবেন্দ্র দত্ত এক ধনশালিনী রমণীকে বিবাহ করে, কিন্তু ঐ রমণীর মুখশ্রী অপ্রীতিকর ও মেজাজটাও খিট্‌খিটে ছিল। দেবেন্দ্রদত্ত কলিকাতায় গিয়া মূলোচ্ছেদপন্থী যুবকদের দলে আপনাকে বিলাইয়া দিল। প্রথমেই সে সমাজ-সংস্কারের একান্ত অনুরাগী হইয়া উঠিল, তারপর ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইল, পাঠশালাদি স্থাপন করিল এবং দরিদ্র বিধবাদের বিবাহ দিবার কাজে ব্যাপৃত হইল। পরে তাহার মত দুর্ব্বলচরিত্রের লোক এই সকল কাজে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সমাজ-সংস্কার অর্থে সে এখন রীতিনীতির শিথিলতা ভিন্ন আর কিছুই বুঝেনা, সে সুরাপান করে, বালিকাদিগকে কুপথগামিনী করে, শ্রদ্ধার জিনিসকে উপহাস করে। কুসংস্কারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের কোন এক সভ্য তাহাকে নিজ অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া স্ত্রীর সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন; দেবেন্দ্র তাহার বন্ধুর স্ত্রীকে হরণ করিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিল; বন্ধুর ঐ বিধবা পত্নী তাহার কোন আত্মীয়ার ঘরে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল; আত্মীয়টি [illegible] প্রিয়বাদী নহে। ঐ বিধবাকে পুন[illegible] দেখিবার জন্য দেবেন্দ্রদত্ত এক বৈষ্ণ[illegible] গায়িকার ছদ্মবেশ ধারণ করিল, পরে [illegible] সুশ্রী দাসীর মাথা ঘুরাইয়া দিয়া [illegible] তাহাকে বশ করিয়া ঐ বাড়ীর ভিতর[illegible] সব সন্ধান লইল। দেবেন্দ্রদত্তের এই [illegible] প্রেমলীলার দরুণ, গৃহিণী মারা গে[illegible] দাসী উন্মাদগ্রস্ত হইল এবং দেবে[illegible] নিজেও সুরাজাত মস্তিষ্ক-বিকারে মৃত্যু[illegible] পতিত হইল।

মিষ্টার ঘোষ ও দত্তের মতো লো[illegible] দিগের সুন্দর-সুন্দর গ্রন্থ, স্বশ্রেণীচ্যুত সং[illegible] পত্রসম্পাদকদিগের লিখিত উগ্রচণ্ড প্রবন্ধ[illegible] দেবেন্দ্রের মতো লোকের কলুষিত ও পা[illegible] জীবন—এই তিন চরমসীমায় আমূলসংস্কা[illegible] হিন্দু আন্দোলন পর্য্যবসিত হইল। কিন্তু ত[illegible] বিপ্লব-বিপর্য্যয়ের মধ্যেই এইরূপ প্রব[illegible] আমরা দেখিতে পাই না কি? ফরাসী রা[illegible] মহাসভার মহাবাগ্মী হইবার পূর্ব্বে, "মিরা[illegible] কি সর্ব্বাপেক্ষা নীতিভ্রষ্ট যুগের সর্ব্বাপে[illegible] নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তি ছিলেন না?

এবং তাঁহার উগ্রচণ্ড কার্য্যকলাপ ব্যতী[illegible] ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের কল্যাণকর কার্য্য স[illegible] হইত কি না কে বলিতে পারে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীশ্রীবস্তুতন্ত্রাসরঃ

(বাস্তুঘুঘুরুবাচ)

(ছাখ) কাব্য-লেখ বস্তুতন্ত্র বাঁচিবে যদ্যপি।
(ওগো) ফুল ছেড়ে কণ্ঠে গেঁথে পর ফুলকপি॥
(বস্তু-) তন্ত্র মতে গোলাপ চামেলি চাঁপা ওঁচা।
(আহা) ফুল বটে ফুলকপি আর ওই মোচা॥
(ছি ছি) অবস্তু আতর কেন মাখ বাছাধন।
(হাঁহাঁ) গন্ধ চাই? শিরে ধর শ্রীগন্ধমাদন॥
(ছাখ) সর্ব্ব-গ্রাহ্য বস্তু-তন্ত্র নাই ইথে ধোঁকা।
(মরি) ফুল ঢোকাইয়া নাকে যেন ফুল শোঁকা॥
(ওগো) বস্তুতন্ত্র আমসত্ত্বে থাকিবেক আঁশ।
(আর) খুঁজিলে আঁটিও পাবে করহ বিশ্বাস॥
(শামা) কোকিল কি পাপিয়ায় কোরো না তারিফ।
(ওগো) বস্তুতন্ত্র চেনে শুধু মোরগ-শ্নাইপ্॥
(মোর) বস্তু-তন্ত্র বিনা কারো নাই কোনো পন্থা।
(অহো) বস্তু-হীরা তুলিবারে বস্তুতন্ত্র খন্তা॥
(ছাখ) পক্ষীকুলে হাড়গিলা বস্তু-পরায়ণ।
(বস্তু-) তন্ত্রমতে সেই সরস্বতীর বাহন॥
(বলি) তামাক খাওয়ার অর্থ জানে বল কারা?
(ওই) বস্তু-তন্ত্র সুখা-খোর বেহারী বেহারা॥
(কিন্তু) খাবি-খাওনের অর্থ নাহি পাই ভাবি।
(কারণ) বস্তুতন্ত্রবিদ্ আজো খায় নাই খাবি॥

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

বঙ্কিমচন্দ্রের লিপি-রীতি বনাম সবুজপত্র

(কৈফিয়ৎ)

গত-বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের সবুজপত্রে প্রকাশিত "অলঙ্কারের সূত্রপাত" নামক প্রবন্ধে আমি প্রসঙ্গত এই কথা বলি যে—

"রচনার যে রীতি বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষান্তে বর্জ্জন করিয়াছিলেন সে রীতি আমাদের গ্রাহ্য হতে পারে না।"

গত বৈশাখের ভারতী-পত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার উক্ত প্রবন্ধের আলোচনা-সূত্রে বলেছেন—

"চৌধুরী-মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে বঙ্কিমবাবু যখন তাঁহার প্রথম বয়সের লিপি-রীতি পরিহার করিয়াছিলেন, তখন সে রীতি অবলম্বিত হইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী সময়ের লিপিরীতিকে যে বঙ্গ-সাহিত্যে আদর্শ বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সত্য বলিয়া স্বীকার করি।"

উক্ত প্রবন্ধের অপর-এক-স্থলে তিনি বলেছেন যে—

"কিন্তু চৌধুরী-মহাশয় তাঁহার (বঙ্কিম-চন্দ্রের) যে প্রয়োগগুলিকে ভুল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার একটিও ভুল বলিয়া মনে হইল না।"

আমার মূল কথা যাঁর কাছে সম্পূর্ণ গ্রাহ্য হয়েছে—আমার সকল কথা তাঁর কাছে গ্রাহ্য না হওয়াটা আক্ষেপের বিষয় নয়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের ভুল ধরতে গিয়ে আমি যে পদে পদে সংস্কৃত অভিধান ও ব্যাকরণের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছি—অভিযোগের প্রতিবাদ করাটা আমি আবশ্য মনে করি-নি; বিশেষত যখন এ অভিযো যথার্থ হলে আমার মতেরই সমর্থন ক সকলেই জানেন যে আমি লেখায় মৌ ভাষা ব্যবহার করবার একান্ত পক্ষপাতী তার একটি প্রধান কারণ এই যে আ বিশ্বাস, সংস্কৃত নিয়ে কারবার করায় বাঙ্গা লেখকদের বিপদ আছে। সে বিপদ আমি এড়িয়ে যেতে পারি নি এ ত খু সম্ভব, বিশেষতঃ যখন আমার মতে ব বঙ্কিমচন্দ্রও তা এড়াতে পারেন নি।

সে যাই হোক, এখন দেখতে পা অনেকে মনে করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ভা ভুল-ধরারূপ অপরাধের জন্য আমার প সাহিত্য-সমাজের নিকট হয় মাপ-চা নয় কৈফিয়ত-দেওয়া কর্ত্তব্য। যথাসা সেই কর্ত্তব্য প্রতিপালন করবার জন্যই এ প্রবন্ধ লিখ্‌তে বাধ্য হচ্ছি।

আমার প্রথম জবাব এই যে, বঙ্কি চন্দ্রের "যে প্রয়োগগুলিকে আমি ভুল বলি সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহার একটিও ভুল নয় —এ কথা ঠিক নয়;—অন্ততঃ মজুমদার মহাশয় তার সকলগুলির শুদ্ধতা প্রমা প্রয়োগের সাহায্যে প্রতিপন্ন করতে পারেন নি

আমার দ্বিতীয় জবাব এই যে, আ পাঁজি-পুঁথি না দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের ভু ধরতে বসিনি। "অভিধানকোষতঃ প

কার"—অলঙ্কার-শাস্ত্রের এ বিধি অমান্য র আমি দুর্গেশনন্দিনীর ভাষার বিচার রিনি। উক্ত ভাষার দোষ ধরাতে যদি ছু দোষ হয়ে থাকে ত সে দোষ আমার , অভিধানকোষের।

এই বর্ণনা-পত্র দাখিল করে আমি ওয়াল-জবাব কর্‌তে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

(১) বঙ্কিমের "প্রগল্‌ভবয়সী" যে আমার ঃপূত হয়নি তার কারণ প্রগল্‌ভতা বয়সের র্ম নয়, চরিত্রের ধর্ম্ম। মজুমদার-মহাশয় ালিদাসের নজির দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন , বয়সের সঙ্গে প্রগল্‌ভতার যোগসাধন য়াটা দোষের বিষয় নয়। কালিদাসের ুপদ আমার শিরোধার্য্য—সুতরাং যদি উ বলেন যে পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশ রায় আমি কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভতার পরিচয় য়েছি তাহলে সে কথার আমি কোনও তিবাদ করব না।

তবে আত্মদোষক্ষালনের জন্য আমি নিবেদন করছি যে অভিধানকোষ হতে দার্থ নিশ্চয় করেই আমি "প্রগল্‌ভ-য়সী"তে আপত্তি করি।

মজুমদার-মহাশয় বলেছেন—"প্রগল্‌ভ র্থ যে mature, developed বা full-grown হইতেই পারে না ইহাই তিনি (আমি) জোর করিয়া বলিয়াছেন। যে-কোন ংস্কৃত কোষ-গ্রন্থেই শেষোক্ত অর্থটি পাওয়া ায়।"

উপরোক্ত ইংরাজি শব্দগুলি যে প্রগল্‌ভ ব্দের "প্রতিবাক্য" হতেই পারে না এমন কথা আমি জোর করে বলিনি,—কেননা সংস্কৃত ভাষার কোন্ কথার অর্থ কি যে না হতে পারে তা আদ্যোপান্ত অমরকোষ যাঁর কণ্ঠস্থ আছে তিনিও বল্‌তে পারেন না, "অন্যে পরে কা কথা"। এক "গো" শব্দের অর্থ খুঁজতে গেলে দেখা যায় ওর ভিতর গরু থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সব পাওয়া যায়।

আমার বক্তব্য এই যে প্রগল্‌ভ শব্দের ও-সব অর্থ আমি কোনও অভিধানে দেখ্‌তে পাইনে। "যে-কোন সংস্কৃত কোষ-গ্রন্থেই শেষোক্ত অর্থটি পাওয়া যায়"—মজুমদার-মহাশয়ের এ-কথা আমি মেনে নিতে পারছিনে, কেননা তিনি কোনও সংস্কৃত কোষগ্রন্থ থেকে তাঁর উক্তির প্রমাণ উদ্ধার করে দেন নি। সুতরাং যে-সব কোষ-গ্রন্থ আমার আয়ত্তের ভিতর আছে, সেই-সব গ্রন্থের উপর নির্ভর করে আমি পুনরায় বল্‌ছি, প্রগল্‌ভ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ mature, developed বা full-grown নয়।

আমার হাতের গোড়ায় পাঁচখানি কোষ-গ্রন্থ আছে; তার তিনখানি বাংলা, * আর দুখানি ইঙ্গ-সংস্কৃত। আমার শব্দার্থ-জ্ঞান এই পঞ্চকোষ হতেই সংগৃহীত। এর পাঁচ-খানির একখানিতেও প্রগল্‌ভ শব্দের মজুমদার-মহাশয়ের অনুমত অর্থ পাওয়া যায় না। বাংলা অভিধান অবশ্য বাঙ্গালীর নিকট গ্রাহ্য নয়, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ইঙ্গ-সংস্কৃত অভিধান-দুখানি যে প্রামাণ্য, সে কথা মজুমদার-মহাশয় অস্বীকার করতে পার্‌বেন না, কেননা তিনি ঘুরে-ফিরে ঐ অভিধান-যুগলেরই দোহাই দিয়েছেন। "আপ্তে সঙ্কলিত কোষ-গ্রন্থ" এবং "বটলিং এবং রোট

* শব্দকল্পদ্রুম, প্রকৃতিবাদ অভিধান, শব্দার্থমঞ্জরী।

প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থই" হচ্ছে তাঁর হাতের রঙের নওলা ও গোলাম। এ-দুখানি আমার হাতেও আছে এবং এর কোনো-খানিতে সংস্কৃত অক্ষরে লিখিত প্রগল্‌ভের পাশে ইংরাজি অক্ষরে লিখিত mature, developed বা full-grown অনুবীক্ষণের সাহায্যেও দৃষ্টিগোচর হয় না। আপ্তে পণ্ডিতের কোষগ্রন্থে প্রগল্‌ভ শব্দের বক্ষ্যমান অর্থ ক'টি পাওয়া যায়ঃ—Bold Ready, Resolute, Illustrious, Strong। বটলিং এবং রোটের কোষগ্রন্থ St. Petersburg Dictionary নামে সুপরিচিত। মূলগ্রন্থ আমার কাছে নেই এবং তা থাকলেও কোন সুসার হ'ত না; কেননা সে গ্রন্থ জর্ম্মান ভাষায় লিখিত এবং জর্ম্মান ভাষা আমার অবিদিত। কিন্তু আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের ইংরাজি সংস্করণটি আমার কাছে আছে এবং তাতে প্রগল্‌ভ শব্দের মজুমদার-মহাশয়ের উদ্ভাবিত অর্থ নেই। তাতে যা আছে তা এইঃ—প্রগল্‌ভ—Bold Resolute confident।

সুতরাং "যে-কোন সংস্কৃত কোষ-গ্রন্থেই শেষোক্ত অর্থটি পাওয়া যায়" এই কথাটা শুধু জোর করে নয়, গায়ের জোরে বলা হয়েছে।

"প্রগল্‌ভবয়স" এই পদে কালিদাস চরিত্রের ধর্ম্ম বয়সে আরোপ করেছেন, অর্থাৎ ও শব্দ metaphorically ব্যবহার করেছেন—যে হিসেবে আমরা বাংলায় "সমর্থ"কে "সমস্ত" "সজ্ঞান"কে "সেয়ানা" করে তুলেছি। এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, প্রগল্‌ভ শব্দের উক্তরূপ metaphori ব্যবহার চলে, কিন্তু তাতে এ প্রমাণ না যে, ও শব্দের অর্থ mature, develop বা full-grown।

(২) তারপর "মুখাবয়ব" ধরা যা এ স্থলে অবয়ব শব্দের প্রয়োগ যে এমন কথা আমি বলিনি। আমি বলেছিলুম তা এইঃ—

"মুখাবয়ব বলায় "অবয়ব" শব্দের প্র শিষ্ট হয় নি।"

শব্দের দুষ্ট প্রয়োগ ও অশিষ্ট প্র যে এক জিনিষ নয়—যাঁর অলঙ্কার-শা সঙ্গে পরিচয় আছে তিনিই তা জানেন

উক্ত শব্দের ও-ক্ষেত্রে প্রয়োগের শি সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কারণ—প্রকৃতি অভিধানে লেখা আছে, "অবয়ব" অর্থ "হ পদাদি অঙ্গ"। মজুমদার-মহাশয়ের কোষ-গ্রন্থ-দুখানির সঙ্গে এ-বিষয়ে বাদের মতভেদ নেই। আপ্তে পণ্ডি মতে "অবয়বের" অর্থ Limb, part; Cappelerএর মতে Limb, membe

সুতরাং features অর্থে Limb শ প্রয়োগ শিষ্ট কিনা, এ সন্দেহ সহজে আমার মনে উদয় হয়েছিল।

মজুমদার-মহাশয় আমাদের দেখি দিয়েছেন যে কালিদাস উক্ত শব্দ মুখে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অর্থেই ব্যবহার করেছেন সুতরাং আমাদের মানতেই হবে যে বঙ্কি চন্দ্রের ঐ শব্দের ঐ অর্থে প্রয়োগ শিষ্ট নয়, বিশিষ্ট।

"অবয়ব" শব্দের উক্ত প্রয়োগ সম্বন্ধে আ অপর-একটি আপত্তি ছিল, সে হচ্ছে এই:

"সংস্কৃত ভাষায় অবয়ব হচ্ছে তাই সমুদয় নয়। এ-স্থলে "সমুদয়" অর্থে বয়ব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সুতরাং ব্দার্থ দোষ ঘটেছে।"

মজুমদার-মহাশয় আমার এ আপত্তির নও খণ্ডন করেন নি, সম্ভবতঃ এই ণে যে কালিদাসের নজির এখানে খাটে লক্ষ্মণ যদি সূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদন করে একেবারে তাঁর মুণ্ডপাত কর্‌তেন, লে সেই ছিন্নমস্তা সূর্পনখাকে কালিদাস নই "মুখাবয়বলূনাং" বল্‌তেন না।

(৩) মজুমদার-মহাশয় আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যে "নিশীথ" মানে গভীর রাত্রি, সে কথা আমি প্রবন্ধ খবার সময় ভুলে গিয়েছিলুম। তা ভুলি র নাই ভুলি "নিশীথ" মানে যে রাত্রি, য় নয়—এ-কথা আমার মনে ছিল। থ শব্দের উক্ত উভয় অর্থই যে, সকল খানে পাওয়া যায় সে-কথা তিনিও কার করেছেন। তবে তাঁর মতে ভীর রাত্রিই" ঠিক আর অগভীর রাত্রি ঠিক। কেননা প্রাচীন সংস্কৃতে উক্ত শব্দ র্ব-অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, শুধু অর্ব্বাচীন স্কৃতে নিশীথ নিশা-অর্থে "অসাবধানে" বহার হয়। সংস্কৃত শব্দের কোন্ অর্থ াচীন ও কোন্ অর্থ অর্ব্বাচীন সে-সম্বন্ধে ামার কিছুমাত্র জ্ঞান নেই, সম্ভবতঃ বঙ্কিম-রেরও ছিল না। কিন্তু তর্কটা ত নিশীথ য়ে নয় "নিশীথ-কৌমুদী" নিয়ে। প্রথম ত্রি এবং শেষরাত্রির চাইতে গভীর রাত্রিতে ্যোৎস্না যে বেশি করে ফুটতে বাধ্য, ন কোনও প্রাকৃতিক নিয়ম নেই। জ্যোৎস্না, রাত্তিরের কোন্ ভাগে দেখা দেবে, তা পক্ষ ও তিথির উপর নির্ভর করে। সুতরাং "নিশীথ-কৌমুদী" সম্বন্ধে আমার যা আপত্তি তা প্রাচীন অর্ব্বাচীন উভয় নিশীথ সম্বন্ধে সমান খাটে।

(৪) "কুঞ্চিতালক" যে ভুল সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই; কেননা "অলক" মানে যে "কুঞ্চিতকেশ" এ-কথা বলবার জন্য কারও সঙ্কুচিত হবার দরকার নেই। যা সমর্থন করা যায় না তা সমর্থন করতে হ'লে মানুষের পক্ষে সত্যমিথ্যা বিচার করে যুক্তিযুক্ত কথা বলা অসম্ভব, সেইজন্য মজুমদার-মহাশয় "কুঞ্চিতালককে" বজায় রাখবার জন্য যা মনে এসেছে তাই বলেছেন। তাঁর কথা এইঃ—

"রঘুবংশের ৪র্থ সর্গের ৫৪ শ্লোকে দেখিতে পাইবেন যে কেরল রমণীদিগের অলকে চমূরেণু উড়িয়া পড়িতেছে। এখানে মল্লিনাথ অলককে কোঁকড়া চুল অর্থে বুঝেন নাই, এবং অলক শব্দের যে সোজাসুজি চুল অর্থ হয়, তাহাও সংস্কৃত কোষগ্রন্থে কালিদাসের এই প্রয়োগ এবং প্রয়োগের দৃষ্টান্তে লিখিত হইয়াছে। আপ্তে-সঙ্কলিত কোষগ্রন্থ দেখিতে পারেন। বহু-দৃষ্টান্ত তুলিতে পারা যাইত, কিন্তু প্রয়োজন নাই। দেখা গেল যে কুঞ্চিতালক ললাট-প্রান্তে শিষ্টভাবেই সুসজ্জ রহিয়াছে।"

উপরোক্ত বাক্যটি যে নিতান্ত বেপরোয়া ভাবে বলা হয়েছে, তার প্রথম প্রমাণ মজুমদার-মহাশয়ের ভাষা। এর মধ্যে সব-চাইতে লম্বাচওড়া বাক্যটির কোনও অন্বয় হয় না, তারপর উক্ত বাক্যের অভ্যন্তরস্থ পদগুলি অনবধানতাবশত বিপর্য্যস্তভাবে বিন্যস্ত।

সে যাই হোক "অলক শব্দের যে সোজাসুজি চুল অর্থ হয়" এ সত্য তিনি আর যেখান থেকেই পান, কালিদাসে পান নি, মল্লিনাথে পান নি, আপ্তে-সঙ্কলিত কোষগ্রন্থেও পান নি। উক্ত কোষগ্রন্থে দেখ্‌তে পাই "অলকে"র পাশে curl "শিষ্ট-ভাবেই সুসজ্জ রহিয়াছে।" নিম্নে রঘুবংশের চতুর্থ সর্গের ৫৪ শ্লোক মায় টীকা তুলে দিচ্ছি, তার থেকে সকলেই দেখতে পাবেন যে, "অলকের যে সোজাসুজি চুল অর্থ হয়" এ-কথা আর যিনিই বলুন কালিদাস বলেন-নি, মল্লিনাথও বলেন-নি :—

"ভয়োৎসৃষ্ট বিভূষাণাং তেন কেরলযোষিতাম্।
অলকেষু চমুরেণুশ্চূর্ণ প্রতিনিধিকৃতঃ॥"

কালিদাস

"ভয়েতি॥ তেন রঘুনা ভয়েনোৎসৃষ্ট বিভূষাণাং পরিহৃত ভূষণানাং কেরলযোষিতাং কেরলাঙ্গনানামলকেষু চমূরেণুঃ সেনারজশ্চূর্ণস্য কুঙ্কুমাদিরজসঃ প্রতিনিধিকৃতঃ। এতেন যোষিতাং পলায়নং চমূনাং চ তদনুধাবনং ধ্বন্যতে"॥

এ স্থলে কালিদাসের নজির বরং আমার কথারই সমর্থন করে। উদ্ধৃত শ্লোকটির প্রতি ঈষৎ মনোযোগ করলেই স্পষ্ট প্রতীয়-মান হবে যে কালিদাস উক্ত "চূর্ণ" শব্দটি নিয়ে একটি pun করবার চেষ্টা করেছেন। সে punটি প্রচ্ছন্ন হলেও যাঁরা অলক শব্দের অর্থ জানেন তাঁদের কাছে তা স্পষ্ট। অলক শব্দের অর্থ যে "চূর্ণ কুন্তল" সে বিষয়ে আভিধানিকদের মধ্যে কোনও মত-ভেদ নেই। আর কালিদাস যে pun করবার লোভ সকল সময়ে সম্বরণ করতে পারতেন না তার প্রমাণ উক্ত সর্গে

"অসহ্য বিক্রমঃ সহ্যং দুরাত্মুক্তমুদন্বতা"

এই শ্লোকে পাওয়া যায়।

তারপর "কুঞ্চিতালক কেশের" প নিয়ে তিনি punctuation-এর যে কূটতর্ক করেছেন, তা এত সূক্ষ্ম আর জটিল যে আমি তার কোনও খেই পাইনি। মোটামুটি এইমাত্র বুঝেছি কুঞ্চিতালক এবং কেশের মধ্যে এ পূর্ণচ্ছেদ দিলে ও দুয়ের বিচ্ছেদ ঘটে পাঠক যদি মনে মনে ঐ দাঁড়িটি টেনে নেন তাহলেই ঐ "সোজাসোজি চুল"-বঙ্গ-সরস্বতীর মাথায় দাঁড় করানো যায় বস্তুমাত্রকেই শোধন করে নিলে তা শুদ্ধ হয় এ কথা সকলেই জানে কি অপরের লেখার উপর ও-রকম হাত চালানো যে সঙ্গত এ কথা সকলে মানে না, কে না তাতে উল্টো উৎপত্তি হতে পারে মজুমদার মহাশয়ের প্রস্তাবিত কুল্‌সটপে গোঁজামিলন দিলে অভিধান বাঁচে না, মধ্যে থেকে ব্যাকরণ মারা যায়। বঙ্কিমের এ একটি বাক্য দুভাগে বিভক্ত করে ফেল্‌লে তাদের আর সমন্বয় হয় না। অপরের রচনার অন্বয় নষ্ট করা যে অন্যায় এ কথা মজুমদার মহাশয়ও স্বীকার করতে বাধ্য।

(৫) মজুমদার মহাশয় 'গণ্ড' নিয়ে যে সব বাক্‌বিতণ্ডা করেছেন, তাকে গণ্ডগোল ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। মজুমদার মহাশয় বল্‌তে চান যে গণ্ডের সঙ্গে কপোলের সংস্রব থাকলেও ও দুই হচ্ছে মুখের পৃথক পৃথক ভাগ অর্থাৎ কপোল হচ্ছে মুখের একদেশ আর গণ্ড হচ্ছে তার চাইতে বড়

। তাঁর মতে গণ্ডের অর্থ The whole de of the face including temple। কথা নাকি St. Petersburg কোষগ্রন্থে া আছে। আর কপোল হচ্ছে তারই ভূত, কেননা গালের গোলগাল অংশের ই কপোল, অর্থাৎ সংস্কৃতে যাকে বলে গণ্ডস্য উপরি পিণ্ড"। ধরুন তাই। তা লেও দেখা যাচ্ছে কপোল গণ্ডের গণ্ডীর ভেতরেই অবস্থিত সুতরাং কপোল গণ্ড তে পৃথক নয়। এবং "কুঞ্চিতালক কেশ কল" গণ্ডকে আচ্ছাদন করলে কপোলকেও াচ্ছাদন করতে বাধ্য।

রোট বটলিং-এর মূল জর্ম্মাণ কোষে ক লেখা আছে তা জানিনে কিন্তু উক্ত গ্রন্থের রাজি সংস্করণে দেখতে পাই কপোল মানেও া, গণ্ড মানেও তাই।

কপোল = Cheek.

গণ্ড = cheek, side of the face. ই side of the face এর পূর্ব্বে whole রং পরে including temples—মজুমদার হাশয় কোথা থেকে পেয়েছেন জানিনে। াই সন্দেহ হয় যে ও ল্যাজামুড়ো তিনি নিজেই জুড়ে দিয়েছেন। তারপর তিনি লেছেন যে—

"Temple শব্দের কোন বাংলা কথা নই···কাজেই বিশেষ বিশেষ স্থান বুঝাইবার ন্য বঙ্কিমবাবুকে সংস্কৃত গণ্ড শব্দটিকে কপোল হইতে ভিন্নভাবে প্রাচীন অর্থে ব্যহার করিতে হইয়াছে।"

"Temple শব্দের যে বাংলা কথা নই" এ অবশ্য বড়ই দুঃখের বিষয়; তাই বলে "গণ্ডকে" কেন যে Temple-এ প্রমোশন দিতে হবে তা বুঝতে পারছি নে।

গণ্ড শব্দের অনেক রকম অর্থ হতে পারে, গণ্ড-মূর্খের গণ্ড অবশ্য কপোল নয়, সম্ভবতঃ কপাল—কিন্তু মানুষের Temple হতে পারে না। "আপ্তে পণ্ডিতের সঙ্কলিত কোষগ্রন্থে" দেখ্‌তে পাই গণ্ডের অর্থ Cheek, Elephant's temple। বলা বাহুল্য হাতির Templeএর নাম গণ্ড বোলে মানুষের অবশ্য তা নয়। হাতির নাসিকার নাম হস্ত তাই বলে মানুষের নাক্‌কে হস্ত বল্‌লে আমার বিশ্বাস ও শব্দের এবং অঙ্গের প্রতি সমান অত্যাচার করা হয়।

Temple শব্দের "প্রতিবাক্য" বাংলায় না থাক সংস্কৃতে আছে, আর সে হচ্ছে শঙ্খ। আপ্তের কোষ-গ্রন্থের ভিতর খুঁজলেই মজুমদার মহাশয় ও-শব্দের সাক্ষাৎ পাবেন। উক্ত শব্দ যে শুধু অভিধানের অন্তরে লুকিয়ে আছে তা নয়—সংস্কৃত সাহিত্যে ও-শব্দের প্রয়োগও দেখতে পাওয়া যায়। বৃহৎ-সংহিতার "প্রতিমা-লক্ষণ" অধ্যায়ে বরাহ-মিহির প্রতিমার মুখের "বিশেষ বিশেষ স্থান-গুলির" শুধু নাম করেন নি, তার মাপজোখও দিয়েছেন। সেই গ্রন্থের সেই অধ্যায়ে দেখ্‌তে পাবেন যে Temple শঙ্খ,—গণ্ড নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র তিলোত্তমার চোখের সম্বন্ধে বলেছেন যে "তাহাতে কটাক্ষ নিক্ষেপ হইত না।"—এর জন্য আমার যে আক্ষেপ আশা করি মজুমদার মহাশয় ভবিষ্যতে তা দূর করবার চেষ্টা করবেন। কারণ গতপ্রবন্ধে এবিষয়ে তিনি কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

পূজার সময়

বৈশাখ মাসে অনঙ্গর বিবাহ হইয়াছে। বধূ চুনি এক বড় জমিদারের মেয়ে—ক'দিন মাত্র শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া আবার পল্লীগ্রামে বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। অনঙ্গর এবার পাশের পড়া—পাছে পড়শুনার ব্যাঘাত হয়, এইজন্য মা বৌকে আর আনেন নাই! ইচ্ছা থাকিলেও ছেলের পাশের পূর্ব্বে আনিবার উপায় নাই।

চুনি লেখাপড়া তেমন জানে না। বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিবার সময় তাহার বর্ণ-পরিচয় হয়! তবে ফুলশয্যার রাত্রে অনঙ্গর কাতর মিনতিতে গলিয়া চুনি কথা দিয়াছে, এই ক'মাসের মধ্যে দিদির কাছে সে লেখাপড়া ভাল করিয়া শিখিয়া ফেলিবে। দিদি ননী বাল-বিধবা, পিত্রালয়েই থাকে। তাহাকেও অনঙ্গ পাকে-প্রকারে জানাইয়াছে, লেখাপড়া যে না জানে,—তা সে পুরুষ হোক, আর নারীই হোক—তাহার জীবন একেবারেই ব্যর্থ! এমন কি, তাহার সংস্পর্শে যে আসে, তাহারও জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। ননীও ভরসা দিয়াছে—বাড়ীতে ত তেমন কোন কাজ নাই—চুনিকে সে নিজে ভাল করিয়া পড়াইবে—এবং লেখাপড়া শিখাইয়া অচিরে তাহাকে অনঙ্গর যোগ্যা করিয়া দিবে!

চুনি চলিয়া যাওয়ার পর হইতে—হোক দুইদিনের আলাপ-পরিচয়—অনঙ্গর দিন কি করিয়া কাটিতেছে, তাহা সে-ই জানে। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র—উঃ, চারিটা মাস গিয়াছে না যুগ গিয়াছে! বৈশাখ মাসে চুনির সঙ্গে দেখা,—সে যেন আজ স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়! আবার কবে দেখা হইবে, কে জানে!

পূজায় সময় অনঙ্গর শ্বশুর বেহান্‌কে বিস্তর প্রণাম জানাইয়া চিঠি লিখিলেন, বাড়ীতে পূজা, জামাতা বাবাজীকে একবার পাঠাইলে সকলে কৃতার্থ হইবেন; দেশের লোকও তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। অন্তত পূজার ঐ কয়টা দিনের জন্যও—অবশ্য বাবাজীর পড়ার যদি কোন ক্ষতি না হয়—বাবাজীকে পাঠাইতে পারিলে তাঁহারা অনুগৃহীত হইবেন। তাঁহার মাতৃদেবীরও সনির্বন্ধ অনুরোধ! অনুমতি পাইলেই তিনি লোক পাঠাইবেন।

অনঙ্গ আহারে বসিয়াছিল। মা আসিয়া শ্বশুরের চিঠি পড়াইয়া বলিলেন, "কি রে, যাবি?"

অনঙ্গ জলের গ্লাস মুখে তুলিয়াছিল; একটা বিষম খাইয়া গ্লাস নামাইল। মা বলিলেন, "ষাট্, ষাট্, তা দেখ্ বাপু, তোর যদি পড়ার ক্ষতি না হয় বুঝিস্—"

পড়ার ক্ষতি! পড়া! পড়া! জীবনটা যেন শুধু নোট মুখস্থ করার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল! পরীক্ষায় পাশ হইলেই মানুষ চতুর্ভুজ হইবে! আর কোন কাজ নাই! মনটাকে আনন্দ-রস দিবার কোনই প্রয়োজন নাই! শুধু কলেজের কেতাবগুলা ষ্টীম-

...ারের মত মনটাকে অহোরাত্র পিষিয়া ...টাকে হাড়ে হাড়ে গাঁথিয়া দিলেই ...ত নরজন্ম সার্থক হইবে—আর কি!

অনঙ্গ একটু কুণ্ঠিতভাবে কহিল, "কোথায় ...তে হয়, কি রাস্তা—"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তোকে ত আর ... দিয়ে পাঠাচ্ছি না, বাপু—তাদের লোক ... নিয়ে যাবে।"

"কবে যেতে হবে?"

"ষষ্ঠীর দিন না হয় যাস্—তাই লিখে দেব।"

"কিন্তু বিজয়ার প্রথম প্রণাম আমি ...মার পায়েই করতে চাই, মা—সকলের ...গে তোমায় প্রণাম করা চাই।"

ছেলের কথা শুনিয়া মার মনটা ভিজিয়া ...; তিনি বলিলেন, "তা কতক্ষণেরই বা ...! নবমীর দিন রাত্রের গাড়ীতে বেরুলে ...য়ার দিন দুপুরবেলায় এখানে এসে ...ছুতে পারবি'খন।"

অনঙ্গর বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। ...খানি ভক্তি দেখাইয়া এটুকু সে বিলক্ষণ ...শা করিয়াছিল, যে, মাও স্নেহ-বাৎসল্য ...খাইবেন, এবং ছুটিটা শ্বশুর বাড়ীতেই ...টাইয়া আসিতে বলিবেন। আহা, তাহাদেরও ... সাধ যায় না, নূতন জামাইটিকে লইয়া ... দিন আমোদ-আহ্লাদ করে! কিন্তু ...হা ঘটিল না!

তখন সে ভাবিল, যাক্, কতদিন, ...দিন পরে চুনির সঙ্গে দেখা হইবে ত! ...ই কবে বৈশাখের এক স্নিগ্ধ ঊষায় ...জনের ছাড়াছাড়ি হইয়াছে—চুনি যখন ...ড়ীতে ওঠে, অনঙ্গ তখন নিজের ঘরে ...ানায় পড়িয়াছিল। আসন্ন বিরহ-বেদনায় বুক তাহার ভারী হইয়া উঠিয়াছিল। নির্ম্মম গৃহ! বিদায়ের পূর্ব্বে চুনির সঙ্গে দেখা করানো টাও কেহ উচিত বলিয়া মনে করে নাই! তারপর চিঠি-পত্র লিখিয়া সেই সদ্য পরিচয়-টুকুকে জাগাইয়া রাখিবারও কোন উপায় ছিল না! কে জানে, আবার নূতন করিয়া পরিচয় ঝালাইতে হইবে কি না! এখানে তাহার মন মুহূর্ত্তের জন্যও চুনির কথা ভুলিতে পারে না—বই খুলিয়া সে বসে মাত্র, কিন্তু মন তাহার রঙীন্ ফানুসে চড়িয়া সেই অজানা পল্লীর কোন্ গৃহ-কোণে অহরহ এক বালিকার পিছনে উতলা হাওয়ার মতই ঘুরিয়া মরে! চুনিও কি সেখানে বসিয়া তাহার কথা এমন করিয়া ভাবে!

সপ্তমীর দিন বেলা বারোটার সময় অনঙ্গ শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিল। অভ্যর্থনার ধূম দেখিয়া সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বিশ্রামের পর স্নানাহার সারিয়া লইতেই দিদিশাশুড়ী কহিলেন, "একটু গড়িয়ে নাও, ভাই—রাত্রে গাড়ীতে ঘুম হয়নি ত।" এক সুমধুর সম্ভাবনায় অনঙ্গর প্রাণটা নাচিয়া উঠিল। সে নির্ব্বাক সম্মতি জানাইয়া দিদিশাশুড়ীর অনুসরণ করিল।

দক্ষিণের এক বড় ঘরে মেঝের উপর গদি-পাতা পাটি-বিছানো বিছানা ছিল। দিদিশাশুড়ীর ইঙ্গিতে অনঙ্গ আসিয়া বিছানায় বসিল। দিদিশাশুড়ী তাহাকে শুইতে বলিয়া সঙ্গিনী বালিকার দলকে তর্জ্জনের সুরে আদেশ দিলেন, "তোরা সব চলে আয়, দিকিন্—ও একটু ঘুমুক।"

এক-জনের আসার আশায় এপাশ ওপাশ

গড়াইয়া অনঙ্গর শেষে বিরক্তি ধরিল—সে কিন্তু আসিল না। অনঙ্গর মনটা ক্ষেপিয়া উঠিবার মত হইল--এ কি রকম ব্যবহার! সে কি তোমাদের এখানে দুইখানা লুচি খাইতে আসিয়াছে, না, তোমাদের জমিদারী-পূজার সমারোহ দেখাইয়া তোমরা তাহার তাক্ লাগাইয়া দিতে চাও! সে ত কোনটারই ধার ধারে না। সে আসিয়াছে শুধু মিলনের ব্যগ্র প্রত্যাশা লইয়া—বিরহের গ্লানি মুছিতে! সে কথাটা কেহই কি খেয়াল করিবে না? অনঙ্গ ভাবিল, জ্যেষ্ঠা শ্যালিকার সঙ্গে দেখা হইলে ইহার একটা বুঝা-পড়া করিয়া লইবে। শ্বশুরের পুত্র-দুইটি নেহাৎ নাবালক—তাহারা তাহাদের এই নূতন ভগ্নীপতিটির কাছে ঘেঁষ দিতে যথেষ্টই সঙ্কোচ বোধ করিল। দূর হইতে অনেকখানি সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াই তাহারা তাহাদের কৌতূহল পূরণ করিরা লইল। অনঙ্গ ভাবিল, তাহাদের একবার কাছে পাইলেও নয় চুনির কথাটা সে পাড়িয়া দেখে!

প্রকাণ্ড বাড়ী লোকের ভিড়ে গম্-গম্ করিতেছে, নানা চেহারার বিচিত্র নর-নারী তাহাকে দেখিয়া কৌতূহল মিটাইয়া লইতেছে, কিন্তু হায়, কোথায় তাহার সেই আপনার জনটি—চির-বাঞ্ছিতা প্রিয়া! তাহার চিত্তে কি একবিন্দুও কৌতূহল নাই! চুনি কি তাহাকে ভুলিয়া গেল? কথাটা মনে হইতেই এক গূঢ় বেদনায় প্রাণটা তাহার ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

এমন সময় শুভ্রবসনা এক কিশোরী আসিয়া মৃদু কোমল কণ্ঠে ডাকিল, "অনঙ্গ—"

অনঙ্গ ফিরিয়া দেখে, জ্যেষ্ঠা শ্যালি ননীবালা। ননী বাল-বিধবা; সুন্দর সংযমের শান্ত মাধুর্য্য, ঠোঁটের কোণে স হাসির দীপ্তি! সমস্ত অবয়বে লজ্জার কমনীয় লালিত্য ফুটিয়া রহিয়াছে। ননী হাতে শ্বেতপাথরের ছোট একখানি রেকাবি জলখাবার। ননী দ্বারের দিকে চাহি ডাকিল, "বিন্দু—আসন নিয়ে এলি?"

এক প্রৌঢ়া দাসী আসিয়া আ পাতিয়া দিল; ননী জলখাবারের রেকা নামাইয়া কহিল, "নাও ভাই, বসো।"

শ্বশুরবাড়ীর হৃদয়-হীন আচরণে অন একটু পূর্ব্বেই ভারী রাগ ধরিয়াছিল। কি এ মূর্ত্তির এই স্নেহময় সরল কণ্ঠস্বরে রাগ মুহূর্ত্তে সরিয়া গেল। সে কথ প্রতিবাদ করাও নিষ্ঠুরতা। অনঙ্গ আস বসিল।

ননী কহিল, "ওবেলায় পূজোর কা ব্যস্ত ছিলুম, তাই আসতে পারিনি, ভাই কিছু মনে করো না। চুনিকে এ বোঝালুম, ঠাকুমা কত টানাটানি কর তা মেয়ে একেবারে লজ্জায় ঘাড় গুঁ পড়ে রৈল। এত লোকজনের মাঝে ছেলেমানুষ কি না—লজ্জায় আসতে পার না। এই গোলমাল—! তা তুমি ত দু-চা দিন আছ!"

অনঙ্গ ঘাড় হেঁট করিয়া জানাইল, ন কালই তাহাকে যাইতে হইবে—কাল নেহা না ঘটে ত নবমীর দিনে যাওয়া চাইই বাড়ীতে বিস্তর কাজ—দুই দিনের জন্য যে-এই আসিতে হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি

রাত্রি বারোটার সময় যাত্রা আরম্ভ হইল

দার-বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠান লোকে কারণ্য। শ্বশুর নব-জামাতাকে লইয়া রে বসিলেন; অনঙ্গ প্রমাদ গণিল। রে, আজ রাত্রেও বুঝি চুনির সঙ্গে দেখার া একেবারেই ঘুচিয়া গেল! রাগে ার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। এ কি অসহ্য াদবি! হাতে পাইয়া এমনভাবে অপমান া! হও না, তোমরা জমিদার—হোক্ না ন, লক্ষ টাকা তোমাদের আয়—দেশের াক আর সরকারের কাছে থাকুক ামাদের খাতির! অনঙ্গও জামাই! হারও একটা প্রাপ্য খাতির আছে! সে ত র পাড়াগাঁয়ের অজভূত নয় যে যাত্রার সং াইয়া তাহাকে ভুলাইয়া দিবে! সে কি টা পথ কষ্ট করিয়া আসিয়াছে, তোমাদের পল্লীগ্রামের মজলিসে বসিয়া ঐ লক্ষ্মীছাড়া মাসা দেখিবার জন্য?

অথচ এ বিষয়ে প্রকাশ্য কোন ইঙ্গিত াও ভাল দেখায় না—আত্ম-সম্মানে ঘা গে। অনঙ্গ ভাবিল, একটা ফিকির করা ক্! সে সেই আসরে বসিয়াই নিদ্রার ণ করিল। ঔষধ ধরিল। শ্বশুর কহিলেন, তামার ঘুম পাচ্ছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়গে—" নই ভৃত্যের প্রতি আদেশ প্রচার হইল। জামাইবাবুকে উপরকার ঘরে আনিয়া টের উপর শয্যা দেখাইয়া দিল।

রাত্রেও আশার সেই নিষ্ঠুর ছল-অভিনয়। র বাহিরে কাহারও নূপুরে সরমের মৃদু গিণী বাজিয়া উঠিল না—কাহারও চরণ-শব্দ ওয়া গেল না! অনঙ্গর বুকটা অসহ্য দুঃখে টিয়া পড়িবার মত হইল। শুইয়া শুইয়া রাগে ফুলিতেছিল। প্রতিশোধ লইবার দারুণ বাসনা মনের মধ্যে বিষম ঝড় তুলিয়া দিল। তীব্র জ্বালায় অস্থি-পঞ্জরগুলা তাহার জ্বলিয়া ছাই হইতে লাগিল। তাহার পর এই অকরুণ দেশের অকরুণ আচরণের কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন্ যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

—সহসা তাহার মনে হইল, পায়ের তলায় কে যেন আসিয়া বসিয়াছে! কার এ কোমল স্পর্শ! চুনির! অনঙ্গ চোখ খুলিল না। পায়ের কাছে নির্ব্বাক মূর্ত্তি নির্ব্বাক-ভাবেই বসিয়া রহিল। থাক্ বসিয়া—অনঙ্গ কখনই চুনির পানে চাহিয়া দেখিবে না, কোন কথা কহিবে না! রাত্রিটা কোন মতে পোহাইলে হয়,—সকলের প্রাণে প্রতিশোধের এমন মুষল হানিয়া সে প্রস্থান করিবে! কাহারও সহিত কথা কহিবে না—এখানে জলস্পর্শও করিবে না—দুই-চারিটা কথা যদি কহিতেই হয় ত তাহাতে এমন ঝাঁজ সে মিশাইয়া দিবে যে, সকলে বুঝিবে, হাঁ, এও একটা মানুষ! ইহারও খাতির করা চাই! জমিদারের জামাই বলিয়া সে যে অনাদর সহিয়াও পোষা কুকুরটির মত নিরীহ আবদারে লেজ নাড়িবে, তেমন পাত্র সে নহে!

ঐ যে পদতলাসীনা উঠিয়া দাঁড়াইল। অনঙ্গ চোখ চাহিল না। চুনি আসিয়া তাহার বুকের উপর মুখ রাখিল, কহিল, "আমায় মাপ কর লক্ষ্মীটি, লোকের ভিড়ে আমি আসতে পারিনি—পাছে সকলে ঠাট্টা করে—" অনঙ্গ তবু কোন কথা কহিল না। সে বড় বেদনা পাইয়াছে—এত বড় অপরাধ, এত সহজে তাহা ক্ষমা করা চলে না। চুনি বুকে মাথা রাখিয়াই কহিল, "কথা

কবে না?" রাগে অনঙ্গর সমস্ত মনটা তখনও জ্বলিতেছিল। চুনিকে সজোরে সে ঠেলিয়া বুক হইতে সরাইয়া দিল। একটা শব্দ হইল। অনঙ্গর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—সভয়ে সে উঠিয়া বসিয়া দেখে, কোথায় চুনি! কোথায় কে! এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখিতেছিল। স্বপ্নের ঘোরে পাশ-বালিশটাকেই চুনি কল্পনা করিয়া ঠেলা দিয়া একেবারে খাটের নীচে ফেলিয়া দিয়াছে! বাহিরে জুড়ির দল তখন চীৎকার স্বরে গান ধরিয়াছে,

"ও রাই বসে আছ নিদ্রে ছেড়ে যারই আসার আশায়—
ওলো, যামিনী সে পোহায় সুখে চন্দ্রাবলীর বাসায়।"

পরদিন সকালে উঠিয়া অনঙ্গ জানাইল, আজ তাহাকে বাড়ী যাইতেই হইবে। না গেলে বিস্তর ক্ষতি হইবে! যাওয়া চাইই!

শ্যালিকা ননীবালা আসিয়া বুঝাইল, শ্বশুর বুঝাইলেন, দিদি-শাশুড়ীও বিস্তর কথা পাড়িলেন, কিন্তু অনঙ্গর সঙ্কল্প অটল, অচল। অগত্যা সকলে হাল ছাড়িয়া দিলেন।

বেলা তিনটায় ট্রেন। বারোটার সময় আহার শেষ হইলে ননীবালা চুনিকে অনঙ্গর ঘরে টানিয়া আনিল এবং একটা পুঁটুলির মতই ঘরের কোণে ধুপ্ করিয়া নিক্ষেপ করিয়া, বাহির হইতে চট্‌পট্ দ্বারে শিকল টানিয়া দিল।

অনঙ্গ কোন কথা না কহিয়া খাটের উপর গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ এমন-ভাবে কাটিয়া গেলে সে এক-নিশ্বাসে কহিল, "আমি চললুম চুনি, তোমার হাড়ে বাতাস লাগবে, এবার। আর কখনো তোমার পথে বিঘ্ন হয়ে এসে দাঁড়াব না। তুমি এখানে পরম সুখে নিশ্চিন্ত চিত্তে থাকতে প
ভেবো, তোমার লক্ষ্মীছাড়া স্বামীটা ম
তোমার আপদ দূর হয়েছে—আজ
তোমায় আমি মুক্তি দিলুম! তোমার
—চিরদিনের জন্য ছুটি!"

এত বড়-বড় কথার খোঁচা যাহার
নিক্ষেপ করা হইল, সে খোঁচা কিন্তু তা
গায়ে বিঁধিলও না। কাপড়ের আবরণে কু
পাকাইয়াই সে বসিয়া রহিল। অনঙ্গ ত
ব্যথিত হইল। আহা, এমন কথাগুলা যে-
উপন্যাসে বা কবিতায় গুঁজিয়া দিলে
খানি করুণ রস উথলাইয়া তুলিতে পা
পাঠকের শ্বাসরোধ হইত, চোখ ছল
করিত,—আর সেগুলা কি না এই মূর্খ
বালিকার বাক্‌হীনতার কঠিন অঙ্গে ঠে
একেবারে ব্যর্থ, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল! হা রে অ
এ কথায় পাষাণী প্রিয়া একটুও চঞ্চল
না! এ দুঃখ রাখিবার যে ঠাঁই নাই!

অনঙ্গ উঠিয়া দাঁড়াইল। জোর ক
চুনির মুখের কাপড় টানিয়া করুণ
ডাকিল, "চুনি—"

চুনি চমকিয়া তাহার আয়ত নয়
এমন একটি নির্ব্বাক্ সজল দৃষ্টি অন
মুখের উপর স্থাপিত করিল, যে, তা
অনঙ্গর সর্ব্বশরীর ঝিমঝিম করিয়া উঠি
সে চোখের ভাষা বড় করুণ, বড় তী
সকল মৌনতাকে নিমেষে সে মুখর ক
তুলিল। অনঙ্গ চুনির হাত ধরিয়া তা
খাটে বসাইল। বড় সুন্দর মুখখানি—নি
হীনতার সুস্পষ্ট ম্লানিমা সে সৌন্দ
বেশ মধুর একটি লালিত্যের ছায়া
করিয়াছে। অনঙ্গর সংযম টুটিল। সে

খখানি অজস্র চুম্বনে অভিষিক্ত করিয়া
ন। তাহার পর অনেক কথা সে কহিয়া
গল—এ কয়মাস তাহার অদর্শনে কি অসহ্য
ণাই না সে ভোগ করিয়াছে; পূজার
মন্ত্রণে কতখানি আশা বুকে লইয়া যে এখানে
াসিয়াছিল! সে পূজা দেখিতে আসে নাই, যাত্রা
নিতে আসে নাই, ভোজ খাইতে আসে
ই। সে আসিয়াছিল, তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব
নির এই সুন্দর মুখখানি দেখিবার জন্য, তাহার
হিত দুইটা প্রাণের কথা কহিবার জন্য!
চুনি মাথা নীচু করিয়া সব কথা
নিল—তারপর ম্লান চোখে স্বামীর পানে
রিয়া চাহিল। যে জন্য তাহাকে এ ঘরে
াঠানো হইয়াছে, সেটা কোনমতে বলিয়া
লিলেই সে দায়-মুক্ত হয়—সেটুকু বলিবার
ন্যই সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। বেশীক্ষণ
ঘরে থাকিলে গঙ্গাজলের কাছে প্রকাণ্ড
কফিয়ৎ দিতে হইবে—এক-বাড়ী লোকের
তীব্র বিদ্রূপ-দৃষ্টির সম্মুখে অত্যন্ত অপরাধীর
তই দাঁড়াইতে হইবে,—টিটকারীও বড়
ল্প সহিতে হইবে না! সে বড় গলা
করিয়া সঙ্গিনীদের বলিয়াছিল, "আমার অমন
রকে দেখবার জন্যে প্রাণ ছটফট করে
না।" তাই স্বামীর বক্তৃতা থামিলে প্রথম
অবসরে সেই কথাটাই সে পাড়িয়া বসিল।
দর্শন, বিরহ-যন্ত্রণা, এগুলা সে কিছুই
বুঝিত না—মা ও ঠাকুমার শেখানো বুলিই
আওড়াইয়া গেল। চুনি কহিল, "আজ
ত তোমার থাকবার কথা ছিল। সকলেই
বলছে, থাকো না!"

"থাকা হয় না, চুনি।"

"মা বলছিল, ঠাকুমা বলছিল, দিদি বলছিল
—আজ তুমি মনে করলেই থাকতে পারতে!"

"পারতুম, চুনি, কিন্তু এখন আর পারা যায় না। কাল রাত্রে তুমি যদি একটিবার আসতে, তাহলে আজ স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারতুম।"

"তবে যে বলেছ, তোমার কি কাজ আছে, সেখানে?" চুনির মুখে হঠাৎ কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

অনঙ্গ বলিল, "সে কাজ এ ক'দিন পরেও হতে পারত।"

"তবে বুঝি কাজের কথাটা মিছে করে বলেছ?" চুনির ঠোঁটে হাসিটুকু এবার আরও স্পষ্ট হইয়াই ফুটিল।

অনঙ্গ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "তাই বটে! তোমার উপর অভিমান করেই বলেছি। কি জন্যে থাকব এখানে? কেনই বা থাকবো? তোমার সঙ্গে দু'দিন মোটে দেখাই হল না।···কাল এলে না কেন রাত্রে? যাত্রা শুনছিলে, বুঝি?"

"হাঁ।"

অনঙ্গ আবার একটা খোঁচা দিবার অভিপ্রায়ে কহিল, "যাত্রা কেমন শুনলে?"

সুস্পষ্ট সহজ সুরে উত্তর মিলিল, "বেশ। তুমি উঠে গেলে কেন? বাবার কাছে বসেছিলে, আমি চিকের আড়াল থেকে দেখছিলুম! তোমার বুঝি ভাল লাগছিল না?"

অনঙ্গ কহিল, "না।" পরক্ষণে একটু হাসিয়া সে আবার বলিল, "তুমি আমায় চিনতে পেরেছিলে? সেই ত কবে দেখেচ!"

চুনি হাসিয়া বলিল, "বা রে, তা বুঝি মানুষ চিনতে পারে না? তার উপর তোমার সে ফটোগ্রাফখানা মা যে বাঁধিয়ে আমাদের ঘরেই টাঙ্গিয়ে রেখেছে।"

"সে ফটোগ্রাফ তুমি রোজ দেখ! লজ্জা করে না? কেউ যদি ধরে ফেলে?"

"সে ঘরে চব্বিশ ঘণ্টাই ত আর লোক থাকে না।"

এ কথায় অনঙ্গ আনন্দ পাইল। তবে চুনি পাষাণী নয়—তার হৃদয় আছে!

বাহির হইতে এমন সময় ননী কহিল, "তোমার গাড়ী তৈরি, অনঙ্গ।"

চুনি খাট হইতে একেবারে ঝাঁপাইয়া দূরে সরিয়া গেল, মৃদু কণ্ঠে কহিল, "তাহলে আসি। মাকে তা হলে বলব কি যে, আজ তোমায় যেতেই হবে?"

এ কথার কোন উত্তর অনঙ্গ আর দিতে পারিল না। তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। নিজের হঠকারিতায় নিজের উপর রাগও যে না ধরিয়াছিল, এমন নয়। নিজেই ত সে অধৈর্য্যের ঝোঁকে নিজের সুখটুকুকে পায়ে চাপিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়াছে! তাহার কলিকাতায় ফিরিবার কি এমন প্রয়োজন ছিল? কিছু না! তবে? শুধু রাগের মাথায় একটা কথার কথা বলিয়া ফেলিয়াছে বৈ নয়। কিন্তু সেই কথাটুকুর জন্যই যে কোনমতে আর থাকিয়া যাওয়া যায় না! লোকে কি ভাবিবে? প্রকৃত কারণটা এখনই প্রকাশ হইয়া পড়িবে—সকলে উপহাসের হাসি হাসিবে! ওদিকে আবার গাড়ী অবধি প্রস্তুত! নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার কথা ভাবিয়া তাহার প্রাণটা হায়-হায় করিয়া উঠিল। ব্যস্তবাগীশ হওয়ার এই ফল! ওরে লক্ষ্মীছাড়া, ধৈর্য্যহারা, আর-একটু যদি ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতিস্!

ননী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "নেহাৎ ভাই চললে! আমাদের বড় কষ্ট রইল কিন্তু! তা করে দুটো কথা-পর্য্যন্ত কইতে পেলুম না কি করব বল,—তোমার কাজের ক্ষতি হবে বলছ,—কাজেই আমরাও আর জো করতে পারি না। মা বড় দুঃখ করছিলেন!

অনঙ্গ ভাবিল, না হয়, সে কাজে কথা বলিয়াই ফেলিয়াছে—তাহাতেই কি এম মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গেল! তোমরা একটু জেদ করিতেও জানো না? আ একবার সকলে মিলিয়া একটু জেদ করিলে যে থাকিয়া যাই! ওগো, কর, একবা তোমরা একটু জেদের-অনুরোধ কর।

কিন্তু হায়, সে অনুরোধ, সে জেদ কে করিল না। দিদিশাশুড়ী শুধু বলিলেন "বড়দিনের ছুটিতে আবার এসো, দাদা এ আমোদ-আহ্লাদ কিছুই হল না।"

শাশুড়ী পল্লীগ্রামের মেয়ে, জমিদারী বাড়ীর পুরাতন প্রথা ঠেলিয়া জামাইয়ের সঙ্গে কথা কহিতে পারেন না—অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মুখ লুকাইয়া নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন

বেচারা অনঙ্গকে যাইতে হইল। যাইবা সময় দিদিশাশুড়ীর দিকে চাহিয়া, বাহিরে ঠোঁটের কোণে জোর করিয়া সচেষ্ট এক হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিলেও, ভিতরট তাহার ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছিল।

গাড়ী ষ্টেশনের দিকে ছুটিল। পথে দুইধারে বাগানের সারি—বাগানের গা পালা, শান্ত স্নিগ্ধ পল্লীর এই শ্যামল শ্রী সমস্তই অনঙ্গর চোখে ঝাপ্‌সা ঠেকিতেছিল সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

এখনও যে আশা মোটেই নাই, এ

ন! ট্রেনখানা যদি কোন-গতিকে ফেল করা য়! আহা, তেমন ভাগ্য—ঐ যে রেল-লাইন খা যায়—সিগনাল কৈ পড়িয়া নাই ত! নঙ্গ ঘড়ি খুলিয়া দেখে, ট্রেণের সময় উৎরাইয়া য়াছে! তাহার আঁধার চিত্তের মধ্যে াশার একটু ক্ষীণ বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল।

ষ্টেশনে গিয়া সে শুনিল, টাইম্ হইয়া য়াছে বটে, তবে ট্রেণ এখনো আসে নাই—ণ লেট্! শ্বশুরের যে কর্ম্মচারীটি সঙ্গে াসিয়াছিল, সে কহিল, "আঃ, বাঁচা গেল। ণ ফেল হলে আজ আমায় কম বকুনি খেতে ত! বাবু বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন, ট্রেণ রিয়ে দেওয়া চাইই, নাহলে আপনার ক্ষতি হয়ে যাবে।" কর্ম্মচারী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পকেট হইতে ডিবা বাহির করিয়া একটা পান মুখে দিল, এবং বিড়ি কিনিবার উদ্দেশ্যে চুরুট-ওয়ালার সন্ধানে সরিয়া পড়িল। অনঙ্গ অত্যন্ত হতাশভাবে প্লাট-ফর্ম্মের বেঞ্চে আসিয়া বসিল। তাহার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল; মনে হইল, চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীটা যেন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অসংখ্য আলোক-বিন্দুতে পরিণত হইয়া একটা ভয়ঙ্কর রকমের প্রেত-নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে! এমন সময় ঢং-ঢং-ঢং-ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং রেলের কুলি হাঁকিল, "কলকাত্তা-যানে-ওয়ালা গাড়ী ছোড়া—টিকেট্-টিকেট্—"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সিগার-সঙ্গীত

"দাঁতে চাপিয়া চুরুট-চোঙা—
আমি দেখেছি দেখেছি তোমারি ধোঁয়া!"

(১)

হে সিগার! তুমি মোর ভাবের ট্রিগার!
কবি শুধু কেন তুমি হ'লে না bigger?—
তা' হ'লে একটিবার জ্বালি' দেশালাই
বলান্ত যে দেখিতাম ধোঁয়া আর ছাই।
তামার ও নীল ধোঁয়া রচিত আকাশ,
ল ছাই উড়ে নীল করিত বাতাস,
লায়িত নীলে নীলে হ'তাম নিলীন,
ধু-নীল হ'ত পৃথ্বী—হ'ত রবিহীন।

(২)

হে সিগার ঈজিপ্সীয়! ঈপ্সিত! সুন্দর!
ক্লিয়োপেট্রা-প্রেতিনীয় ছায়া-কলেবর
হিত তোমার গর্ভে রয়েছে গোপনে,
মায়ায় সে রূপ ধরে—বিহরে স্বপনে,
তাই তো মদির তুমি; ওগো অপরূপ!
ও eager চুমা পেলে হব আমি চুপ;—
মুখ হ'য়ে যাবে বন্ধ, চলিবে কলম,
মগজে ডাকিবে ঝিঁ ঝি—বিশ্ব থম্ থম্।

(৩)

হে সিগার! তুমি মোর বাণী-পূজা-ধূপ,
চক্রে ধায় তব ধোঁয়া Looping the loop!
মগজের অলিগলি গরম করিয়া
কুণ্ডলিয়া তব ধোঁয়া বেড়ায় চরিয়া।
গুপো সন্দেশের চেয়ে তুমি মোর প্রিয়,
স্ত্রীর চেয়ে তুমি মোর নিকট আত্মীয়;
পরহিতব্রত তুমি দধীচির চেয়ে—
নিত্য কর আত্মদান হাভানার মেয়ে।

(৪)

হে সিগার! তুমি মোর ভাবের সবিতা,
ভস্ম-শেষ হয়ে তুমি প্রসব' কবিতা!—
মগজের নীড়ে মোর, অথবা কাগজে
রেখে যাও কৃষ্ণরেখা অতীব সহজে!
আমারে যশস্বী কর নিজে হয়ে ছাই,
ত্রিভুবনে কোথাও তুলনা তব নাই।
সিগার! ফিনিক্স-পাখী! মরিয়া-অমর!
তব ছাই মোর কাব্যে হের থরেথর।

(৫)

হে সিগার! অবসরে তুমি মোর গতি,
তোমারে জ্বালায়ে করি তন্দ্রার আরতি;
তোমারি ধোঁয়াঁয় নীল সাগরের ঢেউ,—
যে সাগর লঙ্ঘন করেছে কেউ কেউ।
সাগরে ঢেউয়ের খেলা—তোমারি সে খেল্,
যে সাগর পারে আহা রয়েছে নোবেল্!
ও বেল পাকিলে, বল, কিবা আসে যায়?
সিগারের ধোঁয়াঁ ছাড়ি সাগর-বেলায়।

(৬)

হে সিগার! ফুস্‌ফুসের হে Grave-digger!
তোমারে আরাধ্য ব'লে করেছি স্বীকার।
তুমি চির-নিরাধার ওগো ব্রহ্মদেশী!
সংহত আপনা-মাঝে বালখিল্য-বেশী!
দিগ্বসনা দিগঙ্গনাগণের নগ্নতা
হরিছ হরির মত!—একি কম কথা?—
ধোঁয়াঁয় দ্রৌপদী শাড়ী বুনিয়া বুনিয়া
দিকে দিকে বিতরিছ—ঢাকিছ দুনিয়া!

(৭)

হে সিগার! নিরাধার! তুমি দিগম্বর,
কন্ধে-বাহনেতে তুমি কর না নির্ভর;
চিটাগুড় নহে তব মিষ্টতার হেতু,
তোমার সাযুজ্যলাভে হুঁকা নয় সেতু;
আপনি পাইপ তুমি নিজে আল্‌বোলা,
তাই তো তোমার গুণে ভোলানাথ ভোলা,
পঞ্চমুখে পঞ্চানন তোমারে ধোয়াঁন্,
কল্কেটি কেড়েছ তাঁর—সাবাসি জোয়ান্!

(৮)

হে সিগার! সেবি হে তোমারে দিনযামি,
তোমার বিরহে কভু বাঁচিব না আমি;
চেয়ে চেয়ে দেখি যবে তব ধূমোদ্গার,
অনন্তের স্বাদ যেন লভি হে সিগার!
Beleaguered আত্মা মোর বন্দী সম, হায়,
মুক্তির আনন্দ লভে ও তব ধোয়াঁয়!
যতদিন যমে ফাঁক না করে দু' ঠোঁট
ঠোঁটে ও চুরোটে মোর রবে এক-জোট।

(৯)

হে সিগার! তুমি মোর হরিয়াছ ঘুম,
আরাম-কেদারা ঘিরি কুণ্ডলিত ধূম
বাসুকীর মত ফণা বিস্তারিছে তব;
আমি যেন শেষ-শায়ী নারায়ণ নব
তোমার প্রসাদে হৈনু, নব বৃন্দাবনে
কলির গোকুলে, আহা! হেন লয় মনে!
চোখে ঘুম নাই তাই কি দিবা রজনী,
সদা ভাবি ভুঁড়ি ফুঁড়ি' ওঠে পদ্মযোনি।

(১০)

হে সিগার! প্রেমাগার! সে সখা সিগার!
জানি যাহা লিখিলাম এ অতি meagre
তব গুণ তুলনায়; হে অনন্তরূপ!
বাখানিতে তব তত্ত্ব হ'য়ে যায় চুপ্
এ দাস তোমার প্রভো! ভোঁতা হয় নিব্-
অনন্ত স্পন্দনে বুক করে ঢিপ্ ঢিপ্!
পিকা তুমি উড়িয়ার, মেড়ুয়ার বিড়ি
স্বরগের স্বপনের ধোয়াঁ-ধাপ সিঁড়ি!

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

সমালোচনার কথা

(পাঠকের পত্র)

সম্পাদক মহাশয়,

বাঙ্গলা-দেশে সমালোচনার হাওয়া আজ বড় খুব জোরে বইছে দেখা যাচ্ছে। যেক্ষণ সৃষ্টি কর্‌বার কিছু থাকে ততক্ষণ সমালোচনার অবসর ততটা হয় না; সৃষ্টির কাজ ফুরিয়ে এলেই সমালোচনার পালা আরম্ভ হয়। তার মানে, সৃষ্টি করা কাজটা একটু কঠিন। তাতে এমন-কিছু ই বা ঘসে-মেজে হয় না; যা বিধাতা মানুষের ভিতর না দিলে চেষ্টা করে' দিবার উপায় নাই। স্বয়ং বিধাতা সৃষ্টি করেছেন; তাঁর সে কাজটা সকলে অনুকরণ করতে পারে না কিন্তু ন্যায়-শাস্ত্রের তর্ক তুলে ও বিজ্ঞানের মাটীর প্রদীপ ধরে তাকে পরখ কর্‌বার চেষ্টা করতে ছাড়ে না। বোধ হয় সেইজন্যই বাঙ্গলা দেশে দেখ্‌ছি সব-সব লেখক সাহিত্যের আখড়ায় মাত্র 'সারেগামা' সাধতে সুরু করেছেন, অথবা পাঠশালার পুঁথির মুখস্থ বুলি কপ্‌চানো যার এখনো শেষ হয় নি তাঁরাই সব-চাইতে বড় সমালোচক হবার কসরৎ করচেন। রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী'র কথায় এ-দলের মধ্যে যার সব-চাইতে কম বয়স, সেই সকলের চেয়ে জ্যাঠা, বোধ হয় এর কারণ এই যে সমালোচনা জিনিষটাকে এঁরা খুব সহজ বলে জানেন। কতকগুলি অভদ্র-রকম গালি ও কবির দলের অশ্লীল রকম 'চাপান' দেওয়াটাকেই এঁরা সমালোচনার সার মনে করেছেন। অবশ্য গালাগালি দেওয়াটা খুব সহজ কাজ, এ বিষয়ে কারো মত-ভেদ নাই। স্বয়ং বিধাতাকে পর্য্যন্ত যখন লোকে গাল দিয়ে ভূত-ছাড়া করেছে, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ কোন্ ছার!

এই সব বালখিল্য লেখকদের কলমের খোঁচায় বাঙ্গলা সাহিত্যের যে বিশেষ-কিছু অনিষ্ট হবে কিম্বা বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার যে কেউ অনাদর কর্‌তে শিখ্‌বে, সে-ভয় আমার বিন্দুমাত্র নাই। আমার কেবল যা কিছু ভয় হচ্ছে, এই সব অকালপক্ক লেখকদের নিজেদের জন্যই। হঠাৎ-প্রসিদ্ধ হবার যে অদ্ভুত উপায় তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, তাতে আর কারো কিছু না হোক্, তাঁরা নিজেদের যে মাথা খাচ্ছেন তা বোধ হয় বুঝতেও পার্‌ছেন না। 'পূজ্য পূজা ব্যতিক্রম' নবীনদের পক্ষে বিশেষ করে গুরুতর দোষ। এতে তাদের ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হয়। জগতের যাঁরা শ্রদ্ধা-ভাজন তাঁদের অশ্রদ্ধা দেখানো, মাননীয়দের অমান্য করা কি সমালোচনার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন? যদি কোন বিষয় কারো কাছে সত্যবিরোধী বা ভ্রমপূর্ণ বলে বোধ হয়, তা কি ভদ্র ভাষায় শ্রদ্ধার সঙ্গে বলা যায় না? যাঁরা সাহিত্যগুরু তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েই তাঁদের কাছে অগ্রসর হতে হয়, নইলে অদৃষ্টে যা জোটে তার নাম অষ্টরম্ভা! যাঁরা

পৃথিবীতে সমালোচনায় 'ঝানু' বলে বিখ্যাত তাঁরা ত সকলেই বিরুদ্ধ-পক্ষের প্রবলভাবে সমালোচনা কর্‌বার সময়েও যথেষ্ট সংযম, ধীরতা ও শীলতার পরিচয় দিয়েছেন। জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক মিল সাহেব সার উইলিয়ম হ্যামিল্টনের মতবাদকে খণ্ড খণ্ড করে কাট্‌তে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু সেই অপ্রিয়কর কার্য্যে একটিবারও তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতির দৃষ্টান্ত দেখা যায় না; মাননীয়ের প্রতি যে মান, তা পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেই আপনার মত স্থাপন করবার চেষ্টা আগাগোড়া করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্যকারেরা প্রতি পক্ষের যুক্তি খণ্ডনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোথাও পূজনীয়দের প্রতি অশ্রদ্ধা তাঁদের রচনায় প্রাধান্য লাভ করেনি। ফল কথা শ্রদ্ধাস্পদের প্রতি শ্রদ্ধার এই অভাব এক প্রকার হৃদ্রোগ বিশেষ। যাঁদের এই রোগে ধরেছে, তাঁদের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে যথার্থই ভাবনা হয়।

আমরা আজকাল ধর্ম্মে সমদর্শিতা নিয়ে খুব কোলাহল সুরু কয়েছি ও সেজন্য অনেক অনুষ্ঠানেও হাত দিয়েছি। কিন্তু সাহিত্যেও, যে 'সমদর্শিতা'র একটা স্থান আছে তা আমরা অনেকেই ভুলে' গেছি। সবাই যে এক-মতের হবে এমন কথা নয়। তাই বলে ভিন্নমতাবলম্বীকে অভদ্র ভাষায় গালাগালি দিতে হবে? না রচনা-বিশেষের অবান্তর অংশ গ্রহণ করে মক্ষিকা-বৃত্তির পরিচয় দিতে হবে? সমগ্রের দৃষ্টি না থাকলে ব্যাপারটা অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায়ই হয়ে ওঠে। অপরের মতকে ভাবে সহ্য কর্‌বার শক্তি যাদের সাহিত্যের আনন্দ-দরবারে যোগ কোন অধিকার তাদের আছে বলে মনে হয় না। নিজেদের মতকে কর্‌বার জন্য এই সব ভুঁইফোড় লেখ এমনই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন যে অন্যের সমগ্রভাবে দেখ্‌বার শক্তিও তাঁদের না। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যা একজন নায়ক (সন্দীপ) সীতাদেবীর কটাক্ষ ক'রে কথা বলেছে। তা কোন ধুরন্ধর সমালোচক সিদ্ধান্ত ক বসেছেন যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সীতাদেবী গালমন্দ দিয়েছেন। বাহবা যুক্তি! যুক্তি নিয়ে বোধ হয় কেবল বাঙ্গলা দে সমালোচনা চলতে পারে। রামায় রাবণ যদি সীতাদেবীকে গালাগালি তাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। তাই ব'লে বুড়া বাল্মীকিও আপন ম দুহিতার নিন্দাদোষে দোষী হয়েছেন, যদি কেউ সিদ্ধান্ত করে বসেন, তবে বিচার-শক্তি কতকটা গজপতি বিদ্যা গজের মতই যে সূক্ষ্ম, তাতে সন্দেহ নাই। সময় সময় আমার মনে যে বঙ্কিমের সেই গজপতিই তাঁর 'খুঙ্গী পুঁ নিয়ে বাঙ্গলার সমালোচক-অবতারে দিয়েছেন।

সূর্য্য জগতের প্রাণ—তিনি সকল প্রকাশ করেন। তাঁর আগমনে সক আনন্দিত হয়। কিন্তু এমন-এক জা জীব আছে যারা সেই সূর্য্যে আলো সহ্য কর্‌তে পারে না; আনন্দে

র্ত্তে তাদের হৃদয়ে বিষাদেরই আবির্ভাব সকল দেশেই এবং সকল সময়েই নি এমন-একদল লোক থাকে, যারা ভার আলো সহ্য কর্‌তে পারে না। আলোয় তাদের হৃদয় শতদলের মত শিত না হয়ে কুঁকড়ে যায়। কুকুরেরা চাঁদ দেখে একরকম অজ্ঞাত ভয়ে ার করতে থাকে, মানুষ-সমাজে এই লোকেরা তেম্‌নি প্রতিভার আলোতে দিশেহারা হয়ে নানারূপ আবোল বাল বক্‌তে থাকে। ধর্‌তে গেলে করুণারই পাত্র। যে সনাতন ঈর্ষাবৃত্তি মানব-হৃদয়ে পশুত্বের সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ত্তমান থেকে, তাকে নানা দুঃখের আবর্ত্তে পাক খাওয়াচ্ছে, সে-ই এদের হৃদয়ে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করে এদের প্রতিভার শত্রু করে তোলে। দাস-জাতির মধ্যে এই ঈর্ষাটা বেশী-পরিমাণে বাড়্‌তে দেখা যায়। তাই দাসজাতির মধ্যে প্রতিভার আবির্ভাব হ'লে, তারা তাকে বুঝতে পারে না, গালাগালি দেয়। কিন্তু নিজের ঘরের যে ধনে তারা ইচ্ছা করেই বঞ্চিত হয়, বিশ্বমানব তার দ্বারা লাভবান হয়ে ওঠে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।
উড়িষ্যা।

ডাকাত!

ক

গাঁয়ের বাড়ীতে বিয়ে; কিন্তু গয়না স্যাক্‌রার বাড়ীতে—গয়না নহিলে দের নেমন্তন্ন রাখা হইবে না। গয়না- রা রং করিতে দেওয়া হইয়াছে—হুকুম লাম, সেগুলো যেমন-করিয়া হোক্ কেই ফিরাইয়া আনা চাই-ই-চাই! স্যাক্‌রার দোকানে হাজির হইয়া গয়না- া চাহিলাম। সে হাতযোড় করিয়া ল, "বসুন বাবু, অ্যাদ্দূর থেকে এলেন, টু তামুক ইচ্ছে করুন।"

আমি হচ্ছি স্যাক্‌রার একজন মস্ত দের। বুঝিলাম, সে আমাকে কিঞ্চিৎ পায়িত না-করিয়া অমনি-অমনি ছাড়িবে অতএব, বসিলাম।

স্যাক্‌রার দোকানগুলিকে অনায়াসে সরকারি বৈঠকখানা বলিতে পারা যায়। তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে এখানে সকালে-বিকালে পাড়ার যত সত্যমিথ্যা গুজব, নিন্দা, কুৎসা ও ঘোঁট পাকাইয়া উঠিতে থাকে।

তামাকের মিঠে-কড়া ধোঁয়ায় বেড়ে মস্‌গুল হইয়া উঠিয়াছি, এমন সময় একটা আধ্‌বুড়ো লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে দোকানে ঢুকিয়া বলিল, "ওহে শুনেছ!"

স্যাক্‌রা বলিল, "কি?"

নেশার আরামে তখন আমার চোখদুটি স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। ধূম্রকুণ্ডলীর ফাঁক দিয়া সেই অবস্থায় দেখিলাম, আগন্তুকের মুখ-চোখ গল্প বলিবার আগ্রহে ও উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। খবরটা নিশ্চয়

যে-সে খবর নয়—শুনিবার জন্য কান খাড়া করিয়া রহিলাম।

"মুখুয্যেদের বাড়ীতে মস্ত ডাকাতি হয়ে গেছে যে!"

—"কখন্ মশাই, কখন্?"

—"এইমাত্র। পাড়ায় থাকো—পাড়ার কোন খবর রাখ না—কি-রকম লোক হে!"

—"এঁজ্ঞে, একটা গোলমাল শুন্‌ছিলুম বটে। কিন্তু নিজের দোকান ফেলে ত আর পরের বাড়ীর ডাকাতি দেখতে যেতে পারি না মশয়, আমার দোকান দেখে কে?"

—"হুঃ, দোকান দেখা! চোখে-কানে এরা দেখতে-শুনতে দিচ্ছেনা হে বাপু—এরা সেই হাওয়া-গাড়ীর বাবু-ডাকাত, হাতে এদের ইয়া ইয়া পিস্তল! লোকের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে! এই ছাখনা, মুখুয্যেদের জমিদারী থেকে আজ অনেক টাকা এসেছিল, এরা ঠিক সে সন্ধান পেয়ে দেউড়ীতে এসে হাজির! পিস্তলের একটি আওয়াজ শুনেই যত সব পাঁড়ে-দোবে-চোবের দল রাধা-কিষণকে টিকির মধ্যে লুকিয়ে ভোঁ-দৌড়, ডাকাতদের চেহারা দেখেই মুখুয্যে-মশাই ভির্‌মি খেয়ে চিৎপটাং, ডাকাত-বাবুরা সোজা এসে বুক ফুলিয়ে সোজাই চলে গেল, যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেল জমিদারীর সমস্ত টাকার তোড়া, মেয়েদের সমস্ত গয়না!"

—"অ্যাঁ—বলেন কি, বলেন কি! তারপর?"

—"তারপর—কাল শুনো সব। খবরটা টাট্‌কা থাক্‌তে-থাক্‌তে সবাইকে আগে শুনিয়ে আসি"—লোকটা যেমন হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছিল, তেমনি হঠাৎ অন্তর্হি হইল।

এতক্ষণে আমার স্তিমিত নেত্র আশ্চ রূপে বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে।

স্যাক্‌রা আমার পানে ফিরিয়া সভ বলিল, "মশয়, শুনলেন!"

"হুঁ।"—বলিয়া হুঁকায় একটি সুখ-ট মারিতে গিয়া দেখিলাম, বহুক্ষণ চুম্বন-অভা অভিমানিনী হুক্কাসুন্দরীর প্রেম-বহ্নি নি গিয়াছে। হুকাটি স্যাক্‌রার হাতে দি বলিলাম, "তাইত, এখন উপায়?"

স্যাক্‌রা দোকানে কুলুপ লাগাই লাগাইতে বলিল, "আমি ত মশয়, বা চল্লুম।"

—"তাত দেখতেই পাচ্ছি! কিন্তু আ কি করব? সঙ্গে এতগুলো গয়না, যে হবে অনেকটা!"

—"আসি মশয়, নমস্কার!"—আ কথার কোন জবাব না দিয়া, স্যাক্‌ পো ভয়ে-ভয়ে চারিদিকে চাহিতে-চাহি চট্‌পট্ চম্পট দিল।

খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলা শীতের রাত্রি। কুয়াশা আর অন্ধকারে চা দিক ঝাপ্‌সা।

খ

গয়নাগুলো পেট-কাপড়ে বাঁধিয়া উঠিলা এদিকে ওদিকে চাহিয়া লোকজন নজরে ঠেকিল না—ডাকাতের ভয়ে যার বাড়ীতে ঢুকিয়া দরজায় খিল আঁটিয়াছে

বলির পাঁঠার মত কাঁপিতে-কাঁপি প্রাণটি হস্তগত করিয়া পথ চলিতে লাগিলা আমার বাড়ী শ্যামবাজার, এখান থে

৬ মাইলেরও বেশী। প্রত্যেক গলি-ঘুঁজির মুখ দিয়া যাই, আর বুকটা দুদ্দুড়্ করিয়া উঠে! মনে হয়, ঐ অন্ধকারে, নীচে-কানাচে নিশ্চয়ই কোন-একটা বদ্‌খত্ লোক লুকাইয়া পিস্তল বাগাইয়া লুকাইয়া আছে—এল বুঝি মাথার খুলি উড়াইয়া! সেই ডাকটার কথা মনে হইল, 'এরা লোকের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে!'—ও বাবা, আমার কাছে গয়না আছে এরা কি সেটা টের পাইয়াছে? তা আর পায় নাই—যার যা কাজ! এ-সব খবর না রাখিলে কি এদের ব্যবসা চলে? চারিদিকেই এদের চর ঘুরিতেছে—তাদের চোখে ধূলা দেওয়া সহজ নয়। যে লোকটা ডাকাতির খবর দিয়া গেল সেই যে চর নয় তাই-বা কে বলিতে পারে! তারপর হঠাৎ মনে পড়িল, স্যাক্‌রার কাছ থেকে গয়নাগুলো নিয়া আমি যখন কাপড়ে বাঁধিতেছিলাম, তখন রাস্তা দিয়া একটা চোয়াড়ে চেহারার লোক কট্‌মট্ করিয়া আমার দিকে চাহিতে-চাহিতে গিয়াছিল। নিশ্চয় সে ডাকাতের চর! এতক্ষণ সে তার দলকে কি আর খবর দেয়-নি যে, আমার কাছে একরাশ গয়না আছে!

রাস্তার মাঝে-মাঝে লোকজন চলিতেছে, তাদের সকলকেই ডাকাত বলিয়া সন্দেহ হইতে লাগিল। দু পা যাই—আর চমকিয়া উঠি। হঠাৎ দেখি, একখানা মোটরগাড়ী দুই চোখে অগ্নিবর্ষণ করিতে করিতে আমার দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। গাড়ীতে অনেকগুলো লোক! যতক্ষণ-না গাড়ীখানা আমাকে পার হইয়া চলিয়া গেল, ততক্ষণ আমি একটা বাড়ীর রোয়াকে উঠিয়া গা ঢাকা দিয়া দুরু-দুরু প্রাণে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

বড় রাস্তায় আসিয়া প্রাণটা তবু কতকটা ধাতস্থ হইল। এখানে এত ভিড়, পুলিসের এমন কড়া পাহারা,—ডাকাতের দল এ-রকম জায়গায় নিশ্চয়ই কারুর গলা টিপিয়া ধরিতে পারিবে না!

শ্যামবাজারের দিকে যতই আগাইতেছি, রাস্তার ভিড় ততই পাতলা হইয়া আসিতেছে—আর আমার ভয় ততই চরমে উঠিতেছে। তবে, ভরসা এই যে, আর মিনিটদশেক মা-কালীর ইচ্ছায় ভালয়-ভালয় কাটিয়া গেলেই বাড়ী পৌঁছিতে পারিব।

হঠাৎ আমাদের পড়্‌শী রামবাবুর সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এত তাড়াতাড়ি ঝোড়ো কাকের মত কোত্থেকে হে?"

—"স্যাক্‌রার বাড়ীতে গিয়েছিলুম রাম-দা।"

—"কেন?"

চুপিচুপি বলিলাম, "গয়না আনতে।"

—"দিন-কাল ভাল নয়—খুব সাবধান।"

—বলিয়া, তিনি যেদিকে যাইতেছিলেন, সেইদিকেই চলিয়া গেলেন।

খানিক আগাইয়া একবার পিছনে ফিরিলাম। কিছু তফাতে আর-একজন লোক! একটু তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া দিলাম।

গ

রাত্রিকালে শ্যামবাজারের রাস্তায় একেই লোকজন কম চলে, তাহাতে এখন আবার শীতকাল। চারিদিক নিসাড়। আমার পায়ের জুতা ঠুকিয়া 'ফুটপাথে' বেজায় খট্‌খট্ শব্দ

হইতেছিল। কিন্তু, সেইসঙ্গে, পিছনে আর-একজনেরও পায়ের শব্দ পাইতে লাগিলাম। আবার ফিরিয়া দেখি, সেই লোকটা তখনও আমার পিছনে-পিছনে আসিতেছে। গ্যাসের আলোয় যতটা বোঝা গেল,—লোকটা খুব ঢেঙ্গা, মোটাসোটা, ষণ্ডা, একরকম গুণ্ডা বলিলেই হয়। তার হাতেও একগাছা ছড়ি,—না, তাকে শীর্ণ সংস্করণের বংশযষ্টি বলাই যুক্তিসঙ্গত—কেননা, সে-রকম লাঠি হাতে থাকিলে কোঁচানো কোঁচা ঝোলানো এবং অভাগার মাথা ফাটানো—এই দ্বিবিধ কার্য্যই সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

এ ডাকাত-টাকাত নয় ত—আমার পিছু নেয় নাই ত? পরখ করিবার জন্য একটা পানওয়ালার দোকানের সুমুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। অকারণে এক পয়সার পান কিনিলাম। পিছনের লোকটাও রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া পড়িল। পান কিনিয়া আমি অগ্রসর হইলাম, সেও অমনি চলিতে সুরু করিল। আমি একটা গলির ভিতর ঢুকিলাম, সেও সঙ্গে-সঙ্গে ঢুকিল।

না—কোন সন্দেহ নাই, এ আমারই পাছু লইয়াছে। মনে হইল, স্যাকরার দোকানে আমার দিকে যে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া গিয়াছিল, এ নিশ্চয় সেই লোক না-হইয়া আর যায় না! আমার বাড়ী দেখিয়া গিয়া দলের লোককে খবর দিবে, তারপর সকলে মিলিয়া আমার বাড়ী লুঠিয়া টাকা ও গয়না সব লইয়া যাইবে।

আমার বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করিতে লাগিল; —এখন উপায়? ইহাকে কিছুতেই আমার বাড়ী দেখানো হইবে না। সেখানে গিয়া যদি গুলি-টুলি চালায়, তাহা হইলে এ সঙ্গে ধনে-প্রাণে মজিব এবং মরিব।

চলিতে-চলিতে হঠাৎ ডানদিকের এক সরু গলিতে ঢুকিয়া পড়িলাম। তারপর অপ বিপথ-কুপথ এমন-কি আঁস্তাকুড় মাড়াইয়া অন্ধকারে হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে, হোঁ খাইতে-খাইতে, মাথা ঠুকিতে-ঠুকিতে যে গিয়া নাক ঘষিয়া গেল, সেখানে আ মাথার চাইতেও উঁচু এক পাঁচিল! সে আলোও নাই—পথও নাই। তাইত, করি? কোনদিকেই যে সুরাহা নাই যেদিকেই তাকাই, চোখে খালি সর্ষে দেখি! খানিক ভাবিয়া স্থির করিলাম, থাকে কপালে—পাঁচিল ত টপ্‌কাই, ওপা হয়ত রাস্তা আছে। নহিলে, যে পথে আসিয়া সে পথে আবার যদি ফিরি—নাঃ, সে কথা ভাবিবামাত্র বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠি আমি তার চোখে ধূলা দিবার ফিকিরে আ দেখিয়া ডাকাত নিশ্চয়ই বেজায় খাপ্পা হ আছে। বিঘোরে প্রাণ খোয়ানোর চে পাঁচিল-টপ্‌কানো ঢের ভাল অথচ সহজ।

দিলাম এক লাফ! তারপর—ওপা নামিতে-না-নামিতে, যুগপৎ হৃদয় এবং শ ভেদী চীৎকারে আকাশ এবং পৃথিবী কম্পি —প্রকম্পিত করিয়া ও আমাকে স্তম্ভি করিয়া দিল—"ওরে বাবারে—চোর, চো খুন করলে—খুন!"

সেই অহেতুক, অন্যায় ও অ চীৎকার আমাকে একেবারে পাথরের মত অ করিয়া দিল বটে, কিন্তু, অচল হইলে চলিতে হইবে,—কি করি? ঐ যে দুদ্দা করিয়া জানলা-দরজা খুলিয়া গেল না?

া, ওরা কারা—কেউ লাঠি-হাতে, কেউ লো-হাতে, কেউ বঁটি-হাতে—এ যে জলন্ত ন ছাড়িয়া ফুটন্ত তেলে আসিয়া পড়িলাম! ার সংবর্দ্ধনার জন্যই কি এই বিপুল য়োজন? না মহাশয়গণ, আপনারা আমাকে বুঝিয়াছেন, এরূপ সশস্ত্র অভ্যর্থনায় মি একেবারেই অভ্যস্ত নই, অতএব—

—দিলাম আর-এক লাফ,—যে পথে য়াছি সেই পথে ফিরিতে!

কিন্তু লোকগুলো বিষম চালাক এবং পটে। আমি নিরাপদ-ব্যবধানে যাইতে-না-ইতেই তাদের একজন খপ্ করিয়া আমার কখানা পা যত-জোরে-পারে ধরিয়া ফেলিল। আমি কিন্তু ততোধিক চালাক! ইঁদুরের ত জাঁতিকলে পড়িয়াই আমার মাথা য়া গেল! কৃত্রিম যন্ত্রণায় কাত্‌রাইয়া লাম—"ছাড় বন্ধু, ছাড়, পা ছাড় হে! য়ে ফোড়া—উঃ, উঃ!"

ফোড়ায় হাত পড়িলেই হাত সরাইয়া তে হয়—এ হচ্ছে সংস্কার! যে আমার া ধরিয়াছিল, তাহার বজ্রমুষ্টি চকিতে ল্‌কা হইয়া গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গে আমিও —সর্পমুখচ্যুত ভেকের মত—ঝুপ্ করিয়া ন্ধকারে খসিয়া পড়িলাম।

যে আমাকে এমন বাগাইয়া পাক্‌ড়াও রিয়াছিল, আমাকে ছাড়িয়া দিয়াই হতাশ-বে পাঁচিলের ওপাশ হইতে সে বলিয়া উঠিল,—"ঐ যাঃ!"—অর্থাৎ, তার মনে ড়িয়া গিয়াছে যে, সাধুর পায়ে ফোড়া লেই ছাড়িয়া দিতে হয় আর চোরের য়ে যত বড়ই ফোড়া হোক্ না কেন, সে পা ারও জোরে চাপিয়া ধরা কর্ত্তব্য!

পা-উঁচু এবং মাথা-নীচু করিয়া অন্ধকারে যে কোথায় ঠিক্‌রাইয়া পড়িলাম—ভগবান জানেন, কিন্তু আমার মনে হইল যেন, ধড়ের উপর হইতে আমার মাথাটির অস্তিত্ব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে! পড়িয়াই উঠিলাম—কেননা, মাথা থাক্ আর যাক্—পা যখন আছে, তখন এ-সময়ে বন্-বন্ বেগে সেই পদযুগল ব্যবহার করা ছাড়া মুক্তিলাভের 'নান্যঃ পন্থা'! এবার ধরিলে আর কিছুতেই বাঁচিব না—আগে প্রহার, পরে কারাগার! আমার এ ডাকাতের গল্প শুনিবে কে?

উঠিলাম এবং—বলাবাহুল্য—ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার মতই ছুটিলাম, এখানে-সেখানে দুচারবার ধাক্কা খাইয়াও ছুটিলাম, ইটে লাগিয়া দুবার হোঁচট ও একবার ডিগবাজী খাইয়াও ছুটিলাম, কাছা খুলিয়া ও একপাটি জুতা হারাইয়াও ছুটিলাম,—একেবারে গলির মোড়ে গিয়া থামিলাম—কারণ, থামিতে হইল।

—গলির মুখ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে সেই বিপুলবপু—ডাকাত!

আমাকে দেখিয়াই সে হুঙ্কার করিয়া উঠিল—"এই যে—পেয়েছি!"

আমি একদম থ! দুর্গানাম জপিতে-জপিতে ভাবিলাম, কার খপ্পরে পড়া উচিত? যে আমার ঠ্যাং ধরিয়াছিল, তার হাতে,—না, উপস্থিত যে আমার সুমুখে মূর্ত্তিমান, তার হাতে? একদিকে দমাদ্দম্ বেদম প্রহার ও অন্ধকার কারাগার—আর-একদিকে মুহূর্ত্তে সংহার—ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুমীর—শ্রেয় কি? চালাক মন বলিল, পুনর্ব্বার

মধ্যপথের যাত্রী হও—শ্রেয় হচ্ছে, পলায়ন (পার যদি)।

কোনরকম পূর্ব্বাভাস না দিয়া আচম্‌কা ভয়ানক চেঁচাইয়া উঠিলাম—"কে তুমি?" তেমন জোরে জীবনে আর-কখনো চেঁচাই নাই।

ডাকাত বিনামেঘে এমন বেয়াড়া বজ্রনাদের আশা একেবারেই করে নাই—সে চম্‌কাইল, ভড়কাইল, পিছনে হঠিল। সেই ফাঁকে পাশ কাটাইয়া পুনর্ব্বার আমার প্রাণপণ পলায়ন!

আমার প্রাণ পলায়নের দিকে নিবিষ্ট থাকিলেও, কাণ ছিল ঠিক ডাকাতের দিকেই। দ্রুত পদশব্দে বুঝিলাম, সেও ছুটিতেছে। ভাগ্য-লক্ষ্মী বুঝি এইবার আমার পক্ষ ত্যাগ করিলেন।

মোড় ফিরিতেই দেখি, সামনে মস্ত এক গাছ। পণ্ডিত-কথিত আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের অভ্যাস এখনও ভুলি নাই; সুতরাং একটুও ইতস্তত না করিয়া চট্‌পট্ গাছের উপরে উঠিয়া গেলাম।

ও-রাস্তায় বহু কণ্ঠে বিচিত্র ধ্বনি উঠিল, "ধর্ বেটাকে!" "মার্, মার্!" "পুলিশ, পুলিশ!" কিছুক্ষণ এমনি হট্টগোল চলিল। তারপর সব চুপচাপ।

প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তারপর মনে পড়িল, যারা আমার চরণ ধারণ করিয়াছিল, চোর ধরিবার আশা নিশ্চয়ই তারা ত্যাগ করে নাই। আমাকে না পাইয়া, ধাবমান ডাকাতকে দেখিয়া, চোর-সন্দেহে নিশ্চয়ই তারা সে গোঁয়ারটাকেই পাক্‌ড়াও করিয়াছে! গাছের টঙ্গে বসিয়া ঘণ্টাখানেক ধরিয়া তেত্রিশ কোটিকে গড়্ করিতে লাগিলাম। তারপর নামিলাম।

হে মা কালী, এ যাত্রা প্রাণে-প্রাণে ভারি বাঁচাইয়া দিয়াছ; আমি অকৃতজ্ঞ [illegible] মা, কালিঘাটে কাল তোমার নামে এ[illegible] আমার পয়সায় জোড়া পাঁঠা পড়িবে।

ঘ

পাশের বাড়ীতে মেয়েদের নেমন্ত[illegible] যাইতে একটু রাত হইয়াছিল বটে, কি[illegible] তারা নেমন্তন্নে গিয়াছিল এবং গ[illegible] পরিয়াই। গয়না আনিতে এত দেরি হ[illegible] বলিয়া গিন্নীর নথ প্রথমটা কিঞ্চিৎ চ[illegible] হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু আমার ইতিহ[illegible] শুনিয়া—মুখনাড়া ত দূরের কথা—অচি[illegible] তাঁকে নথনাড়াও বন্ধ করিতে হইল। তি[illegible] আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাই[illegible] মেয়েলি অভিধান হইতে এমন-কতকগু[illegible] সুনির্ব্বাচিত শক্ত শক্ত বিশেষণ ডাকাত[illegible] সপ্তগোষ্ঠীর উপরে প্রয়োগ করিলেন, য[illegible] শুনিলে যে-কোন ভদ্র দস্যু কাণে হাত দি[illegible] লজ্জায় এবং অপমানে মাথা হেঁট করিতে বা[illegible] হইত! সেইরাত্রেই গৃহিণীর মুখে আম[illegible] অপূর্ব্ব বিপদ এবং অপূর্ব্বতর উদ্ধারলাভে[illegible] কাহিনী পল্লবিত ও অতিরঞ্জিত হই[illegible] পাড়াময় রটিয়া গেল।

পরদিন সকালে বসিয়া-বসিয়া গত রাত্রি[illegible] ব্যাপারখানা ভাবিতেছি, এমন সময় বাহি[illegible] আমার নাম ধরিয়া কে ডাকিল। গল[illegible] অচেনা।

নীচে নামিয়া আসিলাম। কিন্তু স[illegible] দরজায় গিয়া যে ডাকিতেছে, তাহাকে দেখি[illegible] আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া ও মাথা ঘু[illegible] গেল। এ যে সেই,—ডাকাত! এখা[illegible] কেন? প্রতিশোধ নিতে?

ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে পায়ে-[illegible] বাড়ীর ভিতরদিকে পিছাইতে লাগিলাম।

ডাকাত হাত তুলিয়া আদেশ দিল, [illegible] দাঁড়ান!"

হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

"আমার পিঠ্‌টা আগে দেখুন"—বলিয়া [illegible] জামা তুলিয়া গম্ভীরবদনে আপনার [illegible] দেশ আমাকে দেখাইল। সমস্ত পিঠটা [illegible] লম্বা, গোল নানা আকৃতির কালশিরা [illegible] পড়িয়াছে, কত ঘা লাঠি, জুতা ও ঘুষি খাইলে [illegible] মানুষের পিঠের দশা অমনধারা সাংঘাতিক [illegible] হইতে পারে, সেটা অনুমান করা অসাধ্য।

ডাকাত চোখ পাকাইয়া বলিল, "আমার [illegible] দশা কার জন্যে, বলুন দেখি?"

কিছু বলিলাম না—আমার কাঁপুনি ক্রমেই [illegible] বাড়িয়া চলিল।

ডাকাত আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া নিজেই [illegible] নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়া কঠোর স্বরে বলিল, [illegible] আপনার জন্যে—বুঝেছেন, আপনার জন্যে।"

আমি বোবা বনিয়া ঘাড় হেঁট করিলাম।

ডাকাত বলিল, "পাড়ায় যা রটিয়েছেন, [illegible] আমি শুনেছি। তাই শুনেই বুঝে [illegible] নিয়েছি, আপনি কে!—জানেন মশাই, কাল [illegible] আমায় গারদে রাত্রিবাস করতে হয়েছিল? [illegible] জানেন মশাই, কতকষ্টে আমি খালাস [illegible] পেয়েছি? জানেন মশাই, হাজতে কত [illegible] বড় বড় মশা আছে? জানেন মশাই, কাল [illegible] সারারাত সজাগ থেকে হাজার হাজার [illegible] মশার সঙ্গে আমায় একা লড়্‌তে [illegible] হয়েছে?"—ডাকাত ক্রমে আমার কাছে আসিয়া, আমার মুখের কাছে মুখ আনিয়া উচ্চ-স্বরে বলিল, "আর জানেন কি—আমি কে?"

মনে-মনে বলিলাম, "বলা বাহুল্য।"

ডাকাত বলিল, "একজন গোবেচারী বর-যাত্রী। আপনার পাশের বাড়ীতে নেমন্তন্নে আসছিলুম। থাকি দূর পাড়াগাঁয়ে। ট্রেণ ফেল্ করাতে ঠিক সময়ে বরযাত্রীর দলে মিশ্‌তে পারি-নি। কনের বাড়ী চিনি না—পথের লোককে জিজ্ঞেস করে-করে আসছিলুম। একটি বুড়ো ভদ্রলোক আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'ওঁর বাড়ী কনের বাড়ীর পাশে—ওঁর পিছু-পিছু যান।' (ভদ্রলোকটিকে রাম-দাদা বলিয়া আন্দাজ করিলাম) তাই আসছিলুম মশায়ের পেছনে-পেছনে।"

নিজের কাণকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না—যা শুনিতেছি, এ কি সত্য? বেকুব বনিয়া বাধো-বাধো গলায় বলিলাম, "আপনি—আপনি কি ডা—!"

হো-হো করিয়া হাসিয়া সে বলিল, "আমি কেন—আমার চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কেউ ডাকাত হয়নি। আপনি ভেবেছিলেন আমি ডাকাত। যারা আমায় হাজতে পাঠিয়েছিল, তারা ভেবেছিল আমি চোর কি খুনে। কিন্তু কেউ ভাবলে না যে, আমি নিরীহ বরযাত্রী-মাত্র। আজ সকালে যখন বিয়েবাড়ীতে এসে হাজির হলুম, তখন মশায়ের 'অপূর্ব্ব উদ্ধারলাভে'র গল্প শুনে নিজের দুঃখে কাঁদব কি, হাস্‌তে-হাসতে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাবার যোগাড়! অ্যাঁ! এ যে একেবারে আস্ত উপন্যাস!"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

ছন্নছাড়া

(১০)

মে-মাসে সিল্‌ভ্যাঁ আমার ভেড়ার দলে একটা ছাগী জুটিয়ে দিলে। তাদের বিয়ের দশ-বছর পরে একটি খোকা হয়েছে, তাকে দুধ-দেবার জন্যে সে এইটি কিনেছিল। দলের মধ্যে সে ছিল সব-চেয়ে দুষ্টু;—তাকে সাম্‌লাতে আমি একেবারে হিম্‌সিম্ খেয়ে যেতুম। তারই দুষ্টুমিতে আমার ভেড়ার পাল ভরা যব-ক্ষেতের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ত। ক্ষেতের দুরবস্থা দেখে চাষা আমায় বকত; বলত, নিশ্চয় আমি কোথাও বসে ঘুমুচ্ছিলুম আর সেই সুযোগে ভেড়াগুলো ক্ষেতে সেঁধিয়ে সব তচ্‌-নচ্‌ করেছে। রোজ আমায় পাইন-বনের ধার দিয়া যেতে হত; ছাগলটা তিন লাফে তার মধ্যে সেঁধিয়ে পড়ত, আমি তাকে খুঁজতে যেতুম, আর এদিকে ভেড়াগুলো ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে পড়ত।

প্রথম দিন, সে নিজের থেকেই ফিরে আসবে এই আশায় কতক্ষণ অপেক্ষা করলুম; গলার স্বর যতদুর পারি মিষ্টি করে তাকে কত ডাকলুম; কিন্তু কোনো ফল হল না। শেষে নিজে গিয়েই ধরে আনা স্থির করলুম। কিন্তু বাচ্ছা বাচ্ছা পাইনগুলো এত ঘন যে কোথা-দিয়ে তার সন্ধানে যাবো খুঁজে পেলুম না; অথচ তাকে ছেড়ে যেতেও পারলুম না। যেখান-থেকে সে অদৃশ্য হয়েছে সেই জায়গাটা আমার মনে-মনে ঠিক ছিল, আমি সেই দিকে যেতে লাগলুম—কাঁটাগুলো মুখে এ লাগবে বলে মুখের সাম্‌নে হাত আড়াল দিলুম ঠিক সেইসময় আঙুলের ফাঁক দিয়ে তা দেখা গেল। তার একটা শিং ধরবার জ যেমন হাত বাড়িয়েছি সে অমনি ডালপা ঠেলে পিছু হঠে গেল—তারই একটা ঝাপ আমার মুখে এসে লাগল। তারপর অনে কষ্টে পাকড়াও করে তাকে ফিরিয়ে আনলুম আবার তার পরদিন ঠিক তাই—এমনিধা রোজ চলতে লাগল। আমি তখন ভেড়া যবের কাছ থেকে খানিক-দূরে নিয়ে গি ছেড়ে দিয়ে তবে তার খোঁজে ছুটে যেতু তার গায়ের রং ছিল সাদা। প্রথম-দিন তা দেখে আমার মনে হয়েছিল যে সে ঠি যেন মাদ্‌লিনের মতন। ওদের দুজনে চোখ ঠিক এক-রকমের—সেই ফাঁক-ফাঁক পাইন বন থেকে তাকে টেনে বার করব সময় সে আমার দিকে অনেকক্ষণ ধরে এ দৃষ্টে চেয়ে থাকত; আমার মনে হ মাদ্‌লিন নিশ্চয় ছাগল হয়ে এসেছে। তা আমি বলতুম, আর এমন দুষ্টুমি কো না!—কেন আমায় এত দুঃখ দাও! আম ঠিক বোধ হত সে আমার সব কথা বুঝ বন থেকে হ্যাঁচড়া-হেঁচড়ি করে বেরু সময় আমার মাথার চুল চারদিকে ছড়ি পড়ত, আমি সেগুলোকে সাম্‌নের দিকে এ ফেলবার জন্যে মাথা নাড়তে থাকতুম, তা দেখে ছাগলটা ভয়ে ভ্যা-ভ্যা করে করতে লাফিয়ে উঠত। সে শিং নীচু ক

মার দিকে এগিয়ে আসত আর আমি মার চুল উল্টে-ফেলে তার মুখের সামনে তে থাকতুম। আমার চুল খুব লম্বা ছিল মাটি অবধি লুটিয়ে পড়ত। তাই দেখে সে ড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে ছুটত। বার সে পাইন বনের মধ্যে যেত, বার আমি এমনি-করে চুল নেড়ে ভয় খিয়ে প্রতিশোধ নিতুম। একদিন সকালে ন আমি ছাগলটাকে নিয়ে এমনিতর রচি, হঠাৎ সিল্‌ভ্যাঁ সেখানে এসে পড়ল। া-হো করে তার হাসি—হাসির পর হাসি! মি যে লজ্জায় কোথায় মুখ লুকাবো খুঁজে লুম না। আমি তাড়াতাড়ি আমার লের গোছা পিছন-দিকে উল্টে ফেল্লুম—

াগলটা তখন আমার কাছে আস্তে আস্তে রে এল; ঘাড়টা এগিয়ে দিয়ে আমার কে চাইতে লাগল, আর কোমরটা এমনি ার-রকম করে বাঁকাতে লাগল যে খে হাসি পায়। চাষা আর হাসি থামাতে রে না—হাসিতে সে একেবারে দুম্‌ড়ে ড়েছিল, বুক চেপে ধরে হো-হো শব্দে তার াসি। আমি তখন তার চেহারার মধ্যে যা খতে পাচ্ছিলুম সে তার ভুরু, দাড়ি আর ার সেই টুপিটা। তার সেই হাসির শব্দে মার চোখ ফেটে যেন কান্না আসতে াগল। তারপর হাসি যখন থামল সে মায় জিজ্ঞেস করলে, ব্যাপার কি! আমি াগলটার দুষ্টুমির কথা সব বল্লুম। সে াকে আঙুল দেখিয়ে শাসাতে-শাসাতে বার হাসতে লাগল। মার্ত্তিন্ পরের দিন াকে মাঠে নিয়ে গেল কিন্তু তার পর-ন বল্লে যে চাকরি ছাড়তে হয় তাও রাজি কিন্তু অমন ছাগল সে নিতে পারবে না—ছাগল ত নয় যেন দস্যি!

বুড়ি বিবিশ্‌ বলত ছাগলদের না মারলে-ধরলে সায়েস্তা হয় না। আমার মনে আছে আমি একবার মাত্র আমার ছাগলটিকে মেরেছিলুম। উঃ তার বুকের পাঁজরের ভিতর থেকে যে গুম্‌গুম্‌ শব্দ উঠল! আমি আর তার গায়ে হাত তুলতে পারতুম না। সে গোলাবাড়ির মধ্যে ছাড়া থাকত, নিজের খুসি-মতো দৌড়ধাপ করে বেড়াত; তার পর একদিন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার যে কি হল, কোথায় সে গেল, আমরা কোনো খোঁজ পেলুম না।

সেণ্টজন-ভোজের দিন এগিয়ে আস-ছিল। আমার এখানকার আসার দিনটা নিয়ে একটা সাম্বৎসরিক উৎসব করবার জন্যে ইউ-জেন বল্লে আমায় গাঁয়ে বেড়াতে নিয়ে যাবে। এই উপলক্ষ্যে চাষার স্ত্রী তার ছেলেবেলাকার একটা হল্‌দে পোষাক আমায় উপহার দিলে। গ্রামের নাম স্যাঁৎ মঁতাঞ্‌; তার একটি মাত্র রাস্তা; তারই শেষে একটা গির্জ্জে। মার্ত্তিন্ আমায় সঙ্গে করে উপাসনায় নিয়ে গেল—যখন গিয়ে পৌঁছলুম তখন কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। সে একটা বেঞ্চির উপরে আমায় ঠেলে বসিয়ে দিলে, এবং নিজে আমার সাম্‌নের বেঞ্চিটায় গিয়ে বসল। আমার পিছনে দুজন মেয়ে বসে অনবরত কাল্‌কের বাজার-করার কথা বকে যাচ্ছিল এবং দরজার কাছের লোকগুলো বেশ মন-খুলে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কথা কইছিল। পাদ্রীমশায় যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন তাদের কথা বন্ধ হল। আমি ভাবলুম এইবার তিনি

উপদেশ আরম্ভ করবেন, কিন্তু তিনি কেবল কতকগুলো বিয়ে-হবার সংবাদ ঘোষণা করলেন। যেমন তিনি এক-একটা নাম উল্লেখ করছিলেন অমনি মেয়েরা ডাইনে বাঁয়ে ঝুঁকে পড়ে হেসে উঠছিল। প্রার্থনা করবার কথা আমার একটিবারও মনে হয়নি। আমি মার্ত্তিনের দিকে চাইলুম—সে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। কালো কোঁকড়া চুলের গোছা তার সেই নক্সা-করা টুপির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। তার কাঁধ চওড়া, তার গায়ের সাদা জামা কোমরের কাছে একটা কালো ফিঁতে-দিয়ে বাঁধা। সবসুদ্ধ নিয়ে আমার মনে হচ্ছিল যে তার মধ্যে ভারি-একটি পরিচ্ছন্নতা ও নবীনতা ফুটে উঠেছে। অথচ গুরুমা বলেছিলেন যে যারা ভেড়া চরায় তাদের মতন নোংরা আর নেই। মার্ত্তিনের কথা আমার মনে হতে লাগল। তার সেই ছোট ডোরা-কাটা ঘাগরায় তাকে কেমন সুন্দর দেখায়! তার পায়ের মোজাটি সর্ব্বদা টান করে আঁটা, চামড়া-মোড়া কাঠের জুতো-জোড়াটি পরিষ্কার,—কালি মাখিয়ে সেটিকে সে সর্ব্বদা চক্‌চকে করে রাখে। কাজে তার অমনোযোগ ছিল না, ভেড়ার পালটিকে সে খুব যত্নে রাখত; চাষার স্ত্রী প্রায়ই বলত যে সে তার পালের প্রত্যেক ভেড়াটির ধাত জানে। যখন আমরা গির্জ্জে থেকে বেরিয়ে এলুম সে আমায় একলা ফেলে একটি বুড়ির কাছে দৌড়ে গেল, ভারি-একটি আদরের সঙ্গে তাকে চুমু খেলে। তারপর সে যে কোথায় গেল দেখতে পেলুম না। আমি একলাটি দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম—কি করি! খানিক দূরে দেখলুম একটা হোটে—সেখান থেকে গলার আওয়াজ আসছি ডিস ও প্লেটের খট্‌খট্ শব্দও শুনতে পাচ্ছিলু দলে দলে লোক তার মধ্যে প্রবেশ ক ছিল; দেখতে-দেখতে বাইরে আর রইল না। মার্ত্তিন্ এসে আমায় নিয়ে যা তার অপেক্ষায় আমি গির্জ্জেয় ফিরে যাচি লুম, এমন সময় ইউজেনের সঙ্গে আ দেখা। সে আমার হাত ধরে হাস হাসতে বল্লে—"ভাগ্যিস্ তোমার পোষাকে রং এমন হলদে, নইলে হয় ত তোমায় চিন্‌তে পারতুম না।" সে আমার দিকে এ করে চাইতে লাগল যেন আমাকে নি একটা কৌতুক করছে এবং মনে হল কিসের জন্যে তার ভারি একটা আ হচ্ছে। সে আমাকে স্কুলমাষ্টারের কাছে নি গেল; বল্লে, একে খেতে দাও, আর স্কু ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে একে বেড়িয়ে নিয়ে এ স্কুলমাষ্টারের পোষাক সহুরে লোকের মত ইউজেন একটা নীল রঙের ঢিলে জ পরেছিল। তার সঙ্গে মাষ্টারের এত দেখে আমি অবাক হয়ে গেলুম। খা আসার অপেক্ষায় আমি যখন বসে আ সেইসময় মাষ্টারমশায় এসে আমাকে এ খানা রূপকথার বই দিলেন। বেড়া সময় হয়ে-এলে আমার আর উঠতে ইচ্ছে ছিলনা, মনে হচ্ছিল বইখানা বেশ এক বসে শেষ করি!

সবুজ ঘাসের উপর রৌদ্র ও খু মধ্যে ছেলেমেয়েরা নেচে বেড়াচ্ছিল। আ মনে হতে লাগল তাদের নাচ ভারি এ মেলো, আর চীৎকার বড় বিকট।

আমার মন ভারি অবসন্ন হয়ে আস- সন্ধ্যাবেলা গাড়ি করে যখন গোলা- ফিরলুম, আবার সেই নির্জ্জনতার এসে যেন আমার প্রাণ আশ্বস্ত হল,— আবার সেই মেঠো গন্ধ পেয়ে আমার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

(১১)

এর কয়েকদিন পরে একদিন বন থেকে ফিরে আসছি এমন সময় একটা ভেড়া বেড়ার ধারে চরতে চরতে হঠাৎ একেবারে সোজা শূন্য আকাশে লাফিয়ে উঠল। কি হল দেখবার জন্যে আমি ছুটে গেলুম। গিয়ে দেখি তার নাকে রক্ত ভেসে গেছে। আমার মনে হল বোধ হয় একটা খুব বড়গোছের কাঁটা গাছে এইরকম রক্ত বার করেছে, সেই জন্যে ভাল করে ধুয়ে-মুছে দিয়েই আমি নিশ্চিন্ত রইলুম। পরদিন সকালবেলা তার চেহারা দেখে আমি শিউরে উঠলুম—তার সমস্ত মাথাটা ফুলে উঠে তার ধড়টা যত-বড়, তত-বড় হয়েছে। সেই দেখে আমার এমনি ভয় হল যে আমি চীৎকার করে চেঁচিয়ে উঠলুম। মার্ত্তিন ছুটে এল—সেও দেখে চেঁচিয়ে উঠল; একে একে সবাই এল। আমি তাদের কাছে কাল্‌কের ঘটনা খুলে বলুম। চাষা বল্লে, নিশ্চয় ওকে বিষাক্ত বিছে কামড়েছে; এখন ওর ভালো করে যত্ন-নেওয়া দরকার—যে পর্য্যন্ত না ফুলো একেবারে কমে যায় সে পর্য্যন্ত গোয়াল থেকে বার করা হবে। আমার মনে হচ্ছিল বটে, বেচারার সেবা করতে পেলে আমি আর-কিছু চাইনা, কিন্তু যখন তার কাছটিতে আমি একলা থাকতুম, ভয়ে আমার প্রাণ ধুক্ ধুক্ করত। তার সেই ছোট্ট দেহের উপর প্রকাণ্ড সেই মাথাটা দেখে ভয়ে পাগলের মতন হয়ে পড়তুম। সেই বড়-বড় ড্যাব্-ডেবে চোখ, সেই বিকট মুখ, সেই লম্বা খাড়া কান এমন-একটা দৈত্যের মতন চেহারার সৃষ্টি করত যা সহজে কল্পনাতেও আনা যায় না। বেচারা গোয়ালের মধ্যিখানটিতে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে থাকত;—সেখান থেকে নড়ত না, পাছে দেয়ালের গায়ে একটু লেগে যায়। আমি তার কাছে যাবার চেষ্টা করতুম—মনকে বোঝাতুম ও ত একটা ভেড়া বৈ ত নয়—কিন্তু তবুও কাছে এগতে পারতুম না। আবার কিন্তু যেই সে আমার দিকে চাইত আমার বড় মায়া করতে থাকত। এক একসময় আমার মনে হত তার সেই বিকট মুখখানা নেড়ে-নেড়ে সে যেন আমায় তিরস্কার করছে। তারপর আমার মাথার ভিতরেও সেইরকম নড়া দেখতুম। আমার মনে হত বুঝি পাগল হয়ে যাব। আমি দেখলুম তাকে না-খেতে দিয়ে মেরে ফেলা আমার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নয়। তাই আমি রাখালটাকে সব কথা খুলে বল্লুম। সে বল্লে, যতদিন না ফুলো কমে যায় সে তাকে খেতে দেবে। কিন্তু সে আমায় ঠাট্টা করতে লাগল;—একটা রুগ্ন ভেড়া দেখে ভয়-পাবার যে কি আছে, আশ্চর্য্য!

অল্পদিন পরেই কিন্তু তার এই উপকারের একটা প্রতিদান আমি দিতে পেরেছিলুম। তাতে আমার মনটা ভারি খুসী হয়ে উঠেছিল। একদিন সকালবেলা গোয়াল থেকে ষাঁড়টাকে ছেড়ে দেবার সময় সে পা-পিছলে তার সাম্‌নে পড়ে গেল। ষাঁড়টা তার গায়ের

কাছে নাক নিয়ে গিয়ে শুঁকতে লাগল। ষাঁড়টা ছিল জোয়ান, এবং একটু বুনো-রকমের; এই গোলাবাড়িতেই সে প্রতি-পালিত হয়েছিল। রাখালটা তাকে ডরাত। তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে ষাঁড়টা যে তাকে তার পায়ের সামনে পড়ে থাকতে দেখেছে এ আর সে ভুলচে না। আমার ইচ্ছা হতে লাগল তাকে বুঝিয়ে দিই যে এতে ভয়ের কিছু নেই; কিন্তু কি বল্লে যে তার ভয় ভাঙবে তা ঠিক করতে পারলুম না। আমি সেই দিন হঠাৎ দেখে অবাক হলুম যে সে কতটা বুড়ো হয়ে পড়েছে! তার মাথার টুপিটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল—সেই সব-প্রথম আমি লক্ষ্য করলুম যে তার মাথার চুল সব পেকে গেছে। সমস্ত দিন আমি তারই কথা ভাবতে লাগলুম। তার-পর-দিন সকালে যখন গোরু-গুলোকে এক-এক-করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে আমি সেই-সময় গোয়ালের মধ্যে গেলুম। রাখাল ষাঁড়টার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল—ষাঁড়টা তার বাঁধনের শিক্‌লিটা যেন টেনে ছিড়ে ফেল্‌বে এমনি করছিল। আমি তার কাছে গিয়ে,পিঠে তার হাত বুলিয়ে শিকলটা খুলে দিলুম; রাখালটা এক-পাশে সরে দাঁড়াল; সে ঝড়ের মতো বেগে গোয়াল থেকে বেরিয়ে গেল—যেন ক্ষেপে গেছে! রাখাল অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থেকে তার পিছন-পিছন খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেল। সেই ফুলো ভেড়াটার কাছে যেতে আমার যতটা ভয় হত, ষাঁড়টার কাছে তেমন হতনা। রোজ সকালে আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে গোয়ালে গিয়ে তাকে খুলে দিতুম। কিন্তু ইউজেন্ দেখতে পেয়ে-ছিল। একদিন সকালে সে আমায় আলা ডেকে নিয়ে গিয়ে তার সেই ছোট-দে চোখ আমার চোখের উপর রেখে বল্লে "তুমি কেন রোজ ষাঁড় খুলে দাও?" আ ভয় হতে লাগল। সত্যি কথা বল্লে রাখা হয়ত বকুনি খাবে, তাই আমি কি উত্তর ভাবতে লাগলুম। আমি এমনিধারা বলতে লাগলুম যাতে বোঝায় আমি খুনি ইউজেন অমনি জিব-দিয়ে টক্-করে এ শব্দ করে বলে উঠল—"অ্যাঁ! তুমি কথা বল!" আমি তখন সব-কথা খুলে বল্লুম। পরের শনিবার ষাঁড়টাকে বিক্রি করে ফেল্লে।

(১২)

আমি লক্ষ্য করতুম সবাইয়ের ইউজেনের সমান স্নেহ। যখনই লোকজন নিয়ে চাষার কোনো গোল বাধত, সে তার ভাইকে ডেকে আনত;—সে এসে হেঙ্গাম মিটিয়ে দিত। সিল্‌ভ্যাঁ যে-সব করত ইউজেনের কাজও তাই ছিল—সে সে বাজারে যেতে চাইত না। সে যে সামান্য একটু খুদ-কুঁড়ো বিক্রি-কর ফিকিরও সে জানে না। সে আস্তে চলত—একটু দুলে-দুলে, যেন তার বলদে চলার সঙ্গে তাল রেখে-রেখে। প্রায় রবিবার সে স্যাঁৎ মঁতাঞ্‌ যেত। আকাশ পরিস্কার না থাকলে ঘরে বসে পড়ত। আমি আশা করে থাকতুম কোনো দিন সে বই ফেলে উঠে কিন্তু তার ভুল কখনো হত না; সে প্রত্যে বার বইখানি হাতে-করে নিজের ঘরে যেত। আমার এই দুঃখটাই তখন সব-

বোধ হত যে সেখানে কোথাও পড়বার খুঁজে পেতুম না। যেখানে যেটুকু কাগজ দেখতুম, কুড়িয়ে নিতুম। স্ত্রী বলত যে আমি একজন পাকা হয়ে উঠচি। এক রবিবারে আমি বুক বেঁধে ইউজেনের কাছ থেকে বই চাইলুম। সে একখানা গানের আমায় দিলে। সমস্ত গ্রীষ্মকালটা আমি বইখানা মাঠে নিয়ে যেতুম; যে-গুলো আমার সব-চেয়ে ভালো লাগত খানে বসে-বসে তাতে সুর বসাতুম। তা একঘেয়ে হয়ে উঠল। তার পর দিন পলিনের সঙ্গে ঘর পরিস্কার করতে তে কতকগুলো পাঁজি পেয়ে গেলুম। লিন বল্লে, সেগুলোকে উপরকার খুব্‌রীতে রেখে আসতে। আমি যেন নিয়ে যেতে গেছি এমনি ভান করলুম; তার পর য়ে-লুকিয়ে পড়বার জন্যে সেগুলোকে এক-করে সরিয়ে ফেল্লুম। কত মজার মজার তাতে ছিল। সেবার সমস্ত শীতকালটা কোথা দিয়ে গেল বুঝতেই পারলুম না।

তারপর যখন সেগুলোকে খুব্‌রী-ঘরে গেলুম, তখন সমস্ত ঘরটা খুঁজতে লুম যদি দু-একখানা পড়বার কিছু পাই। একখানা বই পেলুম তার মলাট নেই। াগুলো তার গুড়িয়ে গেছে;—যেন বইখানা ারুর পকেটে-পকেটে অনেক দিন ধরে েছে। প্রথম-দুখানা পাতা তার ছিল না, নের পাতাটা এত মোংরা যে ছাপার ফ পড়া যায় না। আমি একটু ভালো রে দেখবার জন্যে জানলার কাছে লুম; দেখলুম বইখানার নাম—"টেলি-মেকসের গল্প।" আমি এখানটা-ওখানটা উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলুম, যেটুকু পড়লুম তাই এত ভালো লাগল যে তৎক্ষণাৎ বইখানা পকেটে পুরে ফেল্লুম।

কিন্তু খুব্‌রী-ঘরটা থেকে যখন নেমে আসছি হঠাৎ মনে হল হয় ত ইউজেন বইখানা ওখানে রেখেছিল, আবার কোনো সময় নিতে আসবে। তাই যেখান-থেকে এনেছিলুম সেই কালো বরগাটার উপরে বইখানা ফের রেখে এলুম। তার পর যখনই একটু ফাঁক পেতুম সেখানে গিয়ে দেখতুম বইখানা তখনো আছে কি-না এবং যতটা পারি সেই অবসরে পড়ে নিতুম।

(১৩)

ঠিক সেই সময় আর-একটা ভেড়ার অসুখ হল। পেট তার একেবারে পড়ে গেল—যেন অনেকদিন কিছু খায় নি। আমি চাষার স্ত্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, ভেড়াটার কি করতে হবে? সে তখন একটা মুরগী ছাড়াচ্ছিল; আমায় জিজ্ঞাসা করলে—"পেট কি 'দম্‌সম্' হয়েছে?" কথাটার মানে কি, প্রথমে আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। তার পর আমার মনে হল হয়-ত অসুখ হলেই 'দমসম' হওয়া বলে। তাই আমি বল্লুম—"হাঁ!" কথাটাকে আরো ভালো করে পরিস্কার করবার জন্যে বল্লুম—"হাঁ, পেট একেবারে দড়ি হয়েগেছে!" পলিন শুনে হাসতে লাগল। ইউজেনকে ডেকে বল্লে—"ইউজেন শুনেছ? মারি ক্লেয়ারের একটা ভেড়ার পেট দমসম হয়ে একেবারে চেপ্টে গেছে।" শুনে সে হাসতে লাগল। বল্লে, ভেড়ার কাজ আমি এখনো কিছুই শিখিনি।

তার পর সে বুঝিয়ে দিলে যে 'দমসম' মানে পেট ফুলে ওঠা।

দুদিন পরে পলিন আমায় বল্লে যে তার নিজের ও তার স্বামীর ধারণা যে আমার দ্বারা ভেড়ার কাজ কস্মিনকালে ভালো-রকম হবে না; এইবার তারা আমায় দাসীর কাজ করতে দেবে। কারণ বুড়ি বিবিশ্ আর পারে না, পলিনও ছেলে নিয়ে কা কর্ম্ম সব দেখবার সময় পায় না। যে তাদের মুখে এই কথা শুনলুম অমনি আ মনে হল যে এইবার তাহলে আ ঘন-ঘন সেই খুবরী-ঘরটায় যাওয়ার সু হবে; আমি আনন্দে পলিনকে চুমু খে তাকে ধন্যবাদ দিতে লাগলুম। (ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

শিল্প-প্রসঙ্গে

পল বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি ঠিক বলিয়াছেন, ভাস্কর্য্যের সৌন্দর্য্য ভাস্কর আবিষ্কার করিবেন না,—করিবে জন-সাধারণ। যে প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া আপনি শিল্পসৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার রহস্য যতটুকু পারি—আমিই তবে ব্যক্ত করিব। ভুল বুঝিয়া থাকিলে আপনি তাহা সুধ্‌রাইয়া দিবেন।

আমার ত মনে হয়, দেহের নাগপাশে বাঁধা পড়িয়া প্রাণের যে অস্থিরতা,—মানবতার সেই দিক্‌টা ফুটাইবার জন্য আপনি সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। আপনার গড়া সকল মূর্ত্তিতেই দেখি ঘৃণ্য অস্থি-মাংসের পেষণচক্রে নিষ্পেষিত হইয়াও, তাহাদের আত্মা সর্ব্বদাই আদর্শের সন্ধানে যাত্রা করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে।

আপনার গঠিত সেণ্টজন, ক্যালের নাগরিকগণ ও ভাবনা প্রভৃতি প্রস্তরমূর্ত্তিতে এ সত্যটি যেন জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে। আপনি ব্যালয্যাকের যে মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, তা আমরা কি দেখিতে পাই? দেখি কল্প বিরাটতায় উদ্‌ভ্রান্ত ব্যালয্যাকের প্রতি আপন দীনদেহকে সুধুই যে অবহে করিতেছে,—তাহা নহে; পরন্তু নিজে কাজে তাহাকে গোলামের মত লাগাই রাখাইয়াছে। আচার্য্য, আমার কথা যথার্থ?"

চিন্তিত ভাবে শ্মশ্রুর মধ্যে অঙ্গু সঞ্চালন করিতে-করিতে রোঁদা কহিলে "তোমার কথার বিরুদ্ধে আমি প্রতিব করিব-না।"

—"আপনার গড়া আ-বক্ষ মূর্ত্তিগুলি ঐহিকতার শৃঙ্খলে বন্দী প্রাণের অধীর বোধহয় আরও-বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে এই মূর্ত্তিগুলির প্রায় সকলকেই দেখিলে কবি-বাণী স্মরণ হয়ঃ—

'উড়িবার আগে পাখী যেমন যে ডা বসে, সেই ডাল নোয়াইয়া দেয়, তা



ব্যালয্যাক

মাথাও তেমনি দেহের উপরে আঘাত করিয়াছে।'

আপনি যত লেখকের মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, তাহাদের সকলেরই মাথা হেঁট্-করা,—চিন্তার ভারেই যেন তাহা নুইয়া পড়িয়াছে। আপনার হাতের শিল্পীদের মূর্ত্তিতে দেখি, তাঁহারা প্রকৃতির পানে যেন স্পষ্ট চাহিয়া আছেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যেন সে দীপ্তি নাই—কারণ ভাবের স্বপ্নে তাঁহারা যাহা দেখেন কিম্বা যতদূর উধাও হইয়া যান বাস্তবে তাহার সমগ্র পরিচয় দিতে পারেন না।

আপনি যত কামিনী মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, তাহাদের মধ্যে লাক্সেমবার্গের শিল্পশালায় রক্ষিত মূর্ত্তিটি সব-চেয়ে মনোহর। স্বপ্ন-লোকের অপরিমেয় গভীরতায় ঝাঁপ দিয়া, সে মূর্ত্তির মাথা যেন ঘুরিয়া গিয়াছে, সে যেন চঞ্চল ও দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে।

আপনার আ-বক্ষ মূর্ত্তিগুলি, ওলন্দাজদের ওস্তাদ-শিল্পী রেমব্রাণ্ডের চিত্রের কথা মনে করাইয়া দেয়; কারণ তাঁহার চিত্রলিখিত পাত্র-পাত্রীদের হৃদয় যে অনন্তের ধ্যানে তন্ময়, এটি বুঝাইয়া দিবার জন্য, তিনি উপর হইতে আকাশের জ্যোতিঃধারা বর্ষণ করিয়া তাহাদের ললাট উদ্ভাষিত করিয়া তুলিয়াছেন।"

রোঁদা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—"রেমব্রাণ্ডের সঙ্গে আমার তুলনা,—মহতের একি অপমান! রেমব্রাণ্ড—শিল্পজগতের সেই বিরাটপুরুষ—আমি, আর তিনি! ভেবে দেখ, বন্ধু! এস, রেমব্রাণ্ডের সামনে আমরা ভক্তিভরে মাথা নত করি,—তাঁর পাশে



কামিনী-মূর্ত্তি

যেন আমরা আর-কারুকে বসাইতে না যাই!

সেই অসীম সত্য ও স্বাধীনতার রাজ্যের দিকে—হয়ত সে কল্পিত রাজ্য,—যাইবার জন্য আত্মার যে আবেগ, যে আকুলতা, আমার কার্য্যে যে তাহারই ছাপ্ পড়িয়াছে —তোমার এ-কথা যথার্থ। হ্যাঁ, সেখানকার রহস্য আমাকে বাস্তবিকই বিচল করিয়া তুলে।"—মুহূর্ত্তকাল থামিয়া তিনি আবার বলিলেন,—"শিল্প যে ধর্ম্মের আর-এক শাখা, এ-বিষয়ে তোমার সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে ত?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

কিঞ্চিৎ দ্বেষের সহিতই রোঁদা বলিলেন, "যাহারা এই ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবর্ত্তী এ শাস্ত্র কিন্তু তাহাদিগকে প্রথমে এ উপদেশই দেয়ঃ—'কেমন-করিয়া এক দেহ, একটি হাত বা একটি পা গড়িতে হ

নের আগে তাহাই শিখিতে হইবে!' শিল্পধর্ম্মের প্রথম দীক্ষা হয় এই মন্ত্রেই!"

* *
*

রোঁদা তাঁহার শিল্পশালায় একটি মর্ম্মর-জের সামনে বসিয়া আছেন, এমন সময় র আসিয়া জানাইল, আনাতোল ফ্রান্স সিয়াছেন। রোঁদার শিল্পশালায় অনেক প্রাচীন ছিল। সেইগুলি দেখিতেই তিনি এই খ্যাত সাহিত্যরথীকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

এই ওস্তাদ-শিল্পী ও সাহিত্যরথীর কৃতিতে কি বিচিত্র বৈপরীত্য! আনাতোল ন্সের আকার দীর্ঘ ও একহারা; তাঁহার ও লম্বা ও সরু; কালো চোখদুটি বসা-; হাতদুটি কৃশ ও কোমল; তাঁহার ভঙ্গি জীবন্ত ও তদীয় ব্যঙ্গপ্রবণ স্বভাবের চয় দেয়।—রোঁদা খর্ব্বাকার; বিশালস্কন্ধ, চওড়া; চোখদুটি সর্ব্বদাই প্রায় আধ-দা—যেন তন্দ্রালস। যখন তিনি পূর্ণ-পাত করেন, তখন তাঁর নির্ম্মল-নীল রাদুটি দেখা যায়। তাঁহার মুখের শ্মশ্রুমালা খিলে, মাইকেল এঞ্জিলোর গড়া সাধুদের মনে পড়িয়া যায়। তাঁহার গতিবিধি ধীর-ষ্ঠ, ভাবভঙ্গি বিশেষত্বপূর্ণ; ক্ষুদ্র অঙ্গুলিবিশিষ্ট করতল কোমল ও নমনশীল।

একজন যেন সকৌতুক বিশ্লেষণী-শক্তির রীরী মূর্ত্তি, আর-একজন যেন প্রবল আবেগ দূতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি।

রোঁদা তাঁহার সম্ভ্রান্ত অতিথিকে শিল্প-লা দেখাইতে লাগিলেন।

একজায়গায় গ্রীকভাস্করগঠিত একটি ন্নকার্য্য ছিল। সেটি সমাধি-শিলার উপর ক্ষোদিত। এক যুবতী কামিনী বসিয়া আছে। একটি পুরুষ তাহার দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়া; পিছনে, যুবতীর কাঁধের উপরে হেলিয়া একজন পরিচারিকা।

*Thais*এর গ্রন্থকার প্রশংসার উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন,—"গ্রীক্‌রা জীবনকে কি ভালবাসিত! দেখুন! এই সমাধি শিলায় ক্ষোদা ছবিটিতেও এমন-কিছুই নাই, যাতে মরণকে স্মরণ হয়। সমাধিসুপ্তা মৃতা রমণী এখানে জীবনের মধ্যে জাগিয়া আছে—এমন-কি সংসার-স্রোত হইতেও দূরে সরিয়া যায় নাই। কেবল,—সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং দাঁড়াইবার শক্তি নাই বলিয়া বসিয়া আছে,—এইমাত্র।

সেকালকার সমাধির স্মৃতিস্তম্ভে যে-সকল মূর্ত্তি ক্ষোদিত হইত, তাহাদের সব-গুলিতেই এই লক্ষণ থাকিত;—তাহাদের দেহ হইত দুর্ব্বল—হয় তাহারা লাঠির উপরে, নয় দেয়ালে হেলান দিয়া দাঁড়াইত —কিংবা উপবিষ্ট অবস্থায় থাকিত।

"এ-ছাড়া আর-এক বিশেষত্বও আছে। সমাধিস্তম্ভের শিলাচিত্রে মৃতের আশেপাশে যে-সকল জীবন্ত মানুষের মূর্ত্তি দেখি, তাহারা মরণাহতের প্রতি স্নেহকোমল নেত্রে চাহিয়া আছে। কিন্তু মৃতের দৃষ্টি দূর-দূরান্তরে প্রসারিত; চারিদিক হইতে যাহাদের প্রিয়-দৃষ্টি মৃতদের পানে তাকাইয়া আছে, মৃতেরা তাহাদের দিক থেকে চোখ ফিরাইয়া লইয়াছে। তবু, আপনজনের স্নেহচ্ছায়ার মধ্যেই এ-সব গতপ্রাণের মূর্ত্তি, রোগতাপিত প্রিয়-জনের মতই বাস করিতেছে। এবং এই অর্দ্ধ-অস্তিত্বে ও অর্দ্ধ-নাস্তিত্বেই মর্ম্মস্পর্শী

শোক-ভাবের যথার্থ প্রকাশ ;—প্রাচীনেরা যাহাকে বলিতেন,—'মৃতের হৃদয়ে আলোকের প্রেরণা'।"

রোঁদা প্রাচীন শিল্পের নমুনা যোগাড় করিয়াছেন অনেক। বিশেষ করিয়া হার্কি-উল্‌সের একটি দুর্লভ মূর্ত্তি পাইয়া আপনাকে তিনি গৌরবান্বিত মনে করিতেন। এই মূর্ত্তির ছিপ্‌ছিপে গড়নে বীর্য্যের বিকাশ দেখিয়া আমাদের প্রাণ প্রশংসায় পূরিয়া উঠিল। Farnese Hercules-এর যে বিখ্যাত ও বিরাট মূর্ত্তি আছে, এ মূর্ত্তিটি দেখিতে ঠিক তাহার বিপরীত। অপূর্ব্ব ইহার মোহন-শ্রী! এই অর্দ্ধদেবতার যৌবন-গর্ব্বিত দেহ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি হাল্‌কা ছিপ্‌ছিপে হওয়াতেই মানাইয়াছে চমৎকার।

রোঁদা কহিলেন, "পিত্তলক্ষুরবিশিষ্ট আর্কেদীয় মৃগকে দ্রুতগতিতে যিনি পরাস্ত করিয়াছিলেন, ইহাই সেই বীরের যোগ্য প্রতিমূর্ত্তি। লিসিপ্পাসের গুরুভার দেহ বলবান হইলেও এতটা শক্তির পরিচয় দিতে পারিত না। শক্তি, সর্ব্বদাই মোহনশ্রী'র সঙ্গী। আবার প্রকৃত সৌন্দর্য্যে যেমন বীর্য্যের বিকাশ, এমন আর কোথায়? এই হার্কিউল্‌সে তাহার প্রমাণ দেখি। অঙ্গসৌষ্ঠব সুসঙ্গত হওয়াতেই এই বীরের দেহে বলবীর্য্যের প্রকাশ হইয়াছে অধিকতর।"

আনাতোল ফ্রান্স একটি হস্তপদমস্তক-হীন দেবী-মূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "Praxteles-এর গড়া Cnidian Venus-এর অল্প-বিস্তর নকল করিয়া সেকালে যে-সব অগুন্তি দেবীমূর্ত্তি গঠিত হইত, এটিও তারই একটি। Venus of the Capitol এবং Venus di Me প্রভৃতিও প্রথমোক্ত মূর্ত্তিটির আদর্শে ই

গ্রীক্‌দের মধ্যে দেখা যায় অনেক ভাস্করও তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ওস্তাদ-অনুকরণে আপনাদের সমস্ত শক্তি করিয়াছেন; তাঁহারা মূল ভাবের বেশী ব্যতিক্রম ঘটাইতেন না,—তাঁহা নিজস্বের ছাপ্‌ থাকিত, কেবলমাত্র মূর্ত্তিটির গঠন-কৌশলে। ধর্ম্মানুরাগি উৎসাহেই বোধ হয়, এ-সব অনুকারী শিল্পী কোন-একটি প্রতিমার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িতেন যে, তাঁহারা কিছুতেই কিছু অদল-বদল করিতে পারি না। ধর্ম্ম-জন্যই স্বর্গীয় মূর্ত্তিগুলির অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃত থাকিত। তাই এত ভেনাসের মূর্ত্তি দেখি। এ-মূর্ত্তি যে পবিত্র, এ-কথা কিন্তু আমাদের থাকে না।"

পল বলিয়া উঠিলেন, "গ্রীক্‌দের কি সদয়! সে তার পূজারীদের রূপপি নয়ন রঞ্জন করিতে কত তিলোত্তমার মূ আবিষ্কার করিয়াছে!"

আনাতোল ফ্রান্স বলিলেন, "হাঁ, 'এ সব ভেনাসের মূর্ত্তি যখন দান করিয়া গ্রীক্‌দের ধর্ম্ম তখন সুন্দর নিশ্চয়ই। তা-বলিয়া তাকে দয়ালু ভাবিও না; অসহিষ্ণু ও অত্যাচারী। এই জীব প্রতীয়মান প্রতিমাগুলির সামনে অনে আত্মা দারুণ যন্ত্রণাভোগ করিয়া ওলিম্পাসের নামেই এথেন্সবাসীরা সক্রেতি বিষগুল্মের রস-ভরা পেয়ালা আগা দিয়াছিল।

বুঝিতেছ ত, এই প্রাচীন দেবতারা মাদের প্রতি আজ দয়ালু বটে, কিন্তু র কারণ এই, যে, আজ তাহারা পতিত; জ আমাদের অনিষ্ট করিতে পারে তেমন ক্তি তাহাদের নাই!"

* *
*

পলকে সঙ্গে করিয়া রোঁদা একদিন ouvre-এর বিখ্যাত কলাভবনে উপস্থিত ইলেন।

প্রাচীন মূর্ত্তিগুলির মাঝে গিয়া দাঁড়াইবা-ত্র রোঁদা খুসি হইয়া উঠিলেন,—যেন নি পুরানো বন্ধুদের সংশ্রবে আসিয়াছেন!

রোঁদা বলিলেন, "আমার বয়স যখন নেরো বছরও নয়—তখন কতবারই যে খানে আসিয়াছি! প্রথমে পটুয়া হইতে মার ভারি সাধ ছিল। রঙ্গের নেশায় প্রাণ মার ভোর হইয়া গিয়াছিল। টিসিয়ান ও রমরাণ্ড্‌কে চোখ-ভরিয়া দেখিবার জন্য সর্ব্বদাই মি উপর-তালায় উঠিতাম। কিন্তু হা দৃষ্ট, তখন আমার এমন সঙ্গতি ছিল না র, আঁকিবার সরঞ্জাম পয়সা খরচ করিয়া কিনি। কাজেই আমাকে দায়ে-পড়িয়া নীচের তালায় প্রাচীন ভাস্কর্য্যের সংগ্রহ-গৃহে কাজ করিতে আসিতে হইত! কেননা, সম্বলের মধ্যে আমার ছিল সুধু কাগজ আর পেন্সিল; ভাস্কর্য্যের নকল করিতে তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু এখানে আসিয়া কাজ করিতে-করিতে ভাস্কর্য্যের প্রেমে আমি এমনি মজিয়া গেলাম যে, আর কোন-কিছুর ভাবনা আমার মাথায় ঢুকিতে পাইত না!"

একটি মস্তক ও অঙ্গহীন মূর্ত্তির সুমুখে গিয়া রোঁদা বলিলেন, "আহা, কি সুন্দর! দেখ দেখ, এ মূর্ত্তিটির মাথা নাই, তবু কি মনে হইতেছে না যে, বসন্তের মাধুরী ও আলোর ঝরণা দেখিয়া এ-যেন পুলক-হাস্যে উছলিয়া উঠিয়াছে? চোখ আর ঠোঁট থাকিলেও এমন হাস্য-তরলতার ভাবাভাস বুঝি এর-চেয়ে ভাল-করিয়া ফুটিতে পারিত না!"

"ভেনাস অফ্‌ মিলো"র মূর্ত্তি দেখিয়া রোঁদা বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, এ অপূর্ব্বের চেয়েও অপূর্ব্বকে! এখানেও পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তির মতই ছন্দতাললয় ঠিক্‌ঠাক বজায় আছে; উপরন্তু, এ-মূর্ত্তিটিতে একটা চিন্তা-ধারাও পাওয়া যায়। ক্রীশ্চান ভাস্কর্য্যের দস্তুরমত দেবীর দেহখানি সামনের দিকে একটু হেলিয়া পড়িয়াছে। তবু কিন্তু এখানে অস্থিরতা বা যন্ত্রণা-কাতরতার কোনই আভাস নাই। প্রাচীন যুগে দৈব-প্রেরণায় যত শিল্পকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এই ভাবাভিরাম মূর্ত্তিটি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। এ ইন্দ্রিয়াসক্তির মূর্ত্তি, কিন্তু যথেচ্ছা-চারিতা এখানে সীমাবদ্ধ; এ জীবনানন্দের মূর্ত্তি— সুরে সুসঙ্গত, কারণে সংযমিত।

এ-ধরণের কারুকার্য্য দেখিলে আমি বড়ই বিভোর হইয়া পড়ি;—যে-দেশে এদের সৃষ্টি, সে-দেশের আব্‌হাওয়া আমার মনের সামনে স্পষ্ট হইয়া উঠে। আমি দেখিতে পাই সেই তরুণ গ্রীকদের, যাহাদের দীর্ঘ-কেশে ভায়োলেট ফুলের মালা, সেই তরুণীর দলকে, যাহাদের পরোনে বাতাসে ভাসন্ত ওড়না; তাহারা যেন দেব-পূজা করিতে চলিয়াছে সেই-সব মন্দিরে—



বিজয়-লক্ষ্মী

যে-সব মন্দিরের সারি বিচিত্র, মহিমময়,—যাহাদের মর্ম্মর-শিলা যেন স্বচ্ছ ও জীবনের মত উত্তপ্ত! আমি কল্পনা করি, দার্শনিকেরা যেন নগরের উপকণ্ঠে ভ্রমণ করিতেছেন —মুখে তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের প্রসঙ্গ; নিকটেই হয়ত কোন পবিত্র বেদী--কোন দেবতার মর্ত্ত্যলীলার স্মৃতিতে যাহা সমুজ্জ্বল। আইভি-লতার অন্তরালে, লরেল ও মেদির ঝোঁপের আড়ালে-আড়ালে লুকানো পাখীর দল মন-মজানো কলতান তুলিয়াছে; এবং এই বিলাসমধুর ও শান্তিসুপ্ত ভূমির উপরে ঐ যে প্রশান্ত নীলাম্বর মুকুটের মত স্থির হইয়া আছে, তাহারই ছায়ায়-ছায়ায় নাচিয়া-নাচিয়া বহিয়া চলিয়াছে না[ম] তটিনী।"

The Victory of Sa[mo]thrace নামে মূর্ত্তিটির ক[া] গিয়া রোঁদা কহিলেন:—"প্রা[চী] মূর্ত্তির মর্ম্মরপাথর, প্রমুক্ত আ[কা]শ কের অপেক্ষা রাখে। আমা[দে]র শিল্পশালার মধ্যে গভীর ছ[া]য়া তাহাদের কান্তিহরণ করে।

এই বিজয়লক্ষ্মীই গ্রীক্[দে]র স্বাধীনতার মূর্ত্তি। কিন্তু এ [কি] ও আমাদের স্বাধীনতার মূ[র্ত্তি] মধ্যে কি প্রভেদ! গ্রীক্[দে]র এই স্বাধীনতা-দেবী কাপ[ড়ে]র চোপড় গুটাইয়া বেড়া ডিঙ্গাই[তে] প্রস্তুত নন; পরোনে [তাঁ]র মোটা কাপড় নয়—মিহি পট্টব[স্ত্র] তাঁহার অপূর্ব্ব-শ্রী তনুখা[নি]

গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্মের উপযো[গী] নহে; অঙ্গভঙ্গি বলব্যঞ্জক হইলেও সুসঙ্গ[ত]

আসল কথা, এটি সর্ব্বদেশমান্য স্বাধীনত[া] মূর্ত্তি নহে—এ হচ্ছে বিদ্যানের মানসী মূর্ত্তি দার্শনিকের ধ্যানধারণায় ইনি বিকশি[ত] হন; কিন্তু পরাজিত যে, কৃতদাস [যে] —তাঁহারই নামে শৃঙ্খলাবদ্ধ যে, এ মূর্ত্তি জন্য সে প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি দিতে অক্ষম।

'হেলেনিক' আদর্শের এটি একটি ম[হা] খুঁৎ। গ্রীক্-পরিকল্পনায় শ্রী'র যে মূ[র্ত্তি] ফুটিয়াছে, তাহার নিকটে কেবল শিক্ষিতে[র] প্রাণ সাড়া দেয়;—এ মূর্ত্তি দীনকে [দূ]র করে, পতিতের জন্য ইহার হৃদয়ে এককণা স্নেহ-করুণা সঞ্চিত নাই, এ জানেনা [যে]

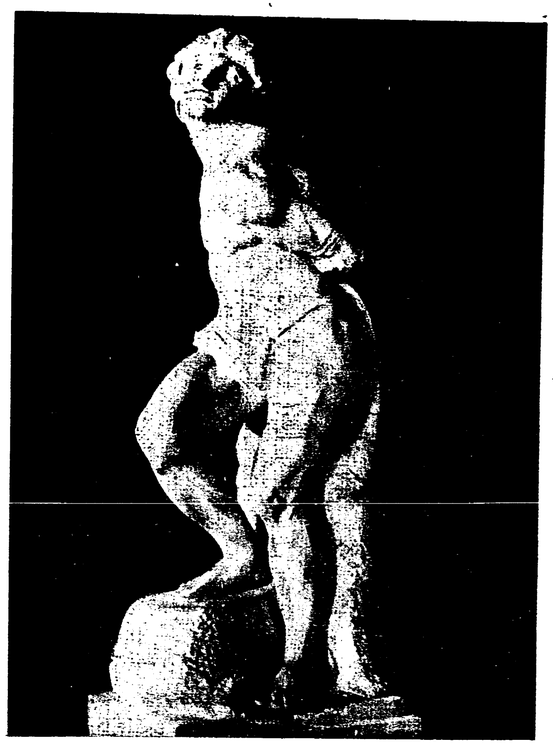

একটি বন্দী-মূর্ত্তি

বড় সকল চিত্তেই স্বর্গ-
ষ্ঠির আভাস আছে।
ন্তু এই সঙ্কীর্ণতার মধ্যেই
যতটা সমুজ্জ্বল হইতে
, ততটা আর কোথাও
। * * *
থিবীর সকল বিষয়েই
রতি আছে, —একমাত্র
ছাড়া। গ্রীকভাস্কর
াসকে আর-কোন আর্টিষ্ট
ক্রম করিয়া যাইতে পারি-
না। জগতের সর্ব্বযুগের
ষ্ঠ ভাস্কর সেইসময়ে
র্ত্তি হইয়াছিলেন,—যখন
মন্দিরের চাতালেই মানব-
ক নিখিল স্বপ্ন পুষ্পিত
পারিত। সেই সুদূর
তর মহাভাস্কর সুদূর
তেও প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হইয়া
বেন।"

াইকেল এঞ্জিলোর গঠিত "বন্দী"র
দির সামনে গিয়া রোঁদা বলিলেন,
ধিক্ ভাস্করদের মধ্যে মাইকেল এঞ্জিলোই
ম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আপনার ভিতরেই
র আছাড়ি-পিছাড়ি, যন্ত্রণার ছট্‌ফটানি,
স বিতৃষ্ণা, পার্থিব পদার্থের দাসত্বের
ক বিদ্রোহ —ইহাই হইতেছে তাঁহার
প্রেরণার উপকরণ।

ই 'বন্দী' মূর্ত্তিগুলির দাসত্ব, নৈতিক
। প্রত্যেক বন্দীই এখানে মানবাত্মার
রূপ-স্বরূপ,—অসীম স্বাধীনতা লাভের
ন আত্মা পার্থিবতার নিগড় টুটিয়া ফেলিতে পারে। ডানদিকের ঐ বন্দীমূর্ত্তির পানে তাকাও। ওর মুখখানি বীথোভেনের মুখের মত নয় কি? সঙ্গীতাচার্য্যদের মধ্যে যিনি সকলবাড়া দুঃখী, মাইকেল এঞ্জিলোর ভাস্কর্য্যে তাঁহারই মুখের পূর্ব্বাভাস দেখি!

বিথোভেন জন্ম-দুঃখী,—তাঁহার সমস্ত জীবনেই বিষাদের ছায়া পাওয়া যায়। তাঁহার একটি অতি সুন্দর সনেটে তিনি বলিয়াছেনঃ— 'আরো-দীর্ঘ জীবন ও আরো-বেশী সুখের জন্য কেন আমাদের এত আশা-আকাঙ্ক্ষা? পার্থিব আনন্দ আমাদের যতটা সুখী করে, তার চেয়ে ক্ষতি করে অধিক।'—

অন্য কবিতায়ঃ—'জন্মে যে যত-শীঘ্র মর্‌তে পারে, তার ভাগ্য তত সুপ্রসন্ন!'

মাইকেল এঞ্জিলো বৃদ্ধবয়সে আপন হাতে-গড়া অনেক প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। আর্টে আর তিনি তৃপ্ত থাকিতে পারিতেন না। তিনি চাহিতেন অনন্তকে। তিনি লিখিয়াছেনঃ—ক্রুশবদ্ধ হইয়া যে স্বর্গীয় প্রেম, আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়াছেন,—কি চিত্র আর কি ভাস্কর্য্য—কিছুই চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার দিকে ফিরাইতে পারে না।—আর সেই বিখ্যাত অতীন্দ্রিয়-বাদী—যিনি Imitation of Jesus Christ লিখিয়াছেন, তিনি ঠিক এই কথাই বলেনঃ—'সকল-জ্ঞান হচ্ছে তাই, যাতে করে পৃথিবী বীতরাগ হয়ে স্বর্গরাজ্যে পৌঁছোতে পা যায়। সেই আনন্দ— যা অশেষ, তার দি এগিয়ে না গিয়ে, যা চলচঞ্চল, তা আঁক্‌ড়ে থাক্‌লে মিছে দেমাক্ দেখা হয়।"



মৃত খৃষ্ট

রোঁদা খানিকক্ষণ হইয়া রহিলেন। তার তিনি তাঁর চিন্তার প্রকাশ করিয়া বলি "আমার মনে প ফ্লোরেন্সে গিয়ে মাই এঞ্জিলোর গঠিত *Pi* নামে ভাস্কর্য্য-কা একদিন আমি ভাবা বিভোর হইয়া নিরী করিতেছিলাম। বিখ্যাত শিল্প-নিদ সাধারণত ছায়াসুপ্তথা কিন্তু রূপার দীপদা একটি বাতির আ সেদিন তাহা উজ্জ্বল উঠিয়াছিল। একটি সুন্দর শিশু-গায়ক, মাথা-সমান উঁচু দীপদানটির কাছে আ আলো নিবাইয়া আমার চোখের

থেকে সেই আশ্চর্য্য ভাস্কর্য্য-কার্য্য অন্ধকারে পুঁছিয়া গেল। এবং আমার বোধ হইল যেন, এই শিশুটি সেই মৃত্যুরই শক্তিরূপী—জীবনকে যে অবসানে লইয়া যায়।.....সেই অমূল্য স্মৃতি-চিত্রটি আজ-পর্য্যন্ত আমার প্রাণের পরতে পরতে আঁকা আছে।"

একটু থামিয়া, রোঁদা আবার বলিলেনঃ—"আমার নিজের কথা যদি ধরি, তবে বলিতে পারি, ভাস্কর্য্যের দুটি প্রধান মতি-গতির মধ্যে—ফিডিয়াস ও মাইকেল এঞ্জিলোর দ্বারা অভিব্যক্ত দুই বিপরীতমুখী ভাবধারার মধ্যে সারাজীবন আমার চিত্ত দোলায়মান হইয়াছে।



চিন্তা-তরঙ্গিনী

প্রথমে আমি ফিডিয়াস প্রভৃতির হস্ত-গঠিত প্রাচীন শিল্পেরই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ি। কিন্তু, ইতালীতে গিয়া ফ্লোরেন্সের প্রখ্যাত ওস্তাদ-শিল্পীর প্রতিভার মহিমায় আমি একেবারে অভিভূত হইয়া গেলাম। আমার কার্য্যে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রভাব পড়িয়াছিল।

তারপরে—বিশেষ করিয়া শেষ কয় বছরে—আমি আবার প্রাচীন শিল্পের রাজত্বেই ফিরিয়া আসিয়াছি।

মাইকেল এঞ্জিলোর প্রিয় বিষয়গুলিতে একটি অনলঙ্কৃত গৌরব আছে বটে; কিন্তু তাঁহার মত জীবনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। পার্থিব কর্ম্মশীলতা অসম্পূর্ণ হইলেও, এখনো শ্রেয়ঃ এবং সুন্দর। জীবনের মধ্যে যতটুকু পাওনার প্রয়াস আছে, কেবল ততটুকুর জন্যই, এস, জীবনকে আমরা ভাল বাসি!.....প্রশান্ত এবং যথার্থ ভাবে যাহাতে আমার সতর্ক দৃষ্টি দৃশ্যমানা প্রকৃতির উপরে গিয়া পড়িতে পারে, সেজন্য সর্ব্বদাই আমি অশ্রান্ত চেষ্টা করি।—বিশ্বব্যাপী এই বিরাট রহস্যের সম্মুখে সংসারীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ত সর্ব্বদাই আমাদিগকে আকুল করিয়া রাখিবেই; কিন্তু তাহার মধ্যেই আমাদিগকে শান্তিপ্রয়াসী হইতে হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

মাসকাবারী

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ তখন এক-কথা বলিয়াছেন, এখন আর-এক-কথা বলিতেছেন এই ধূয়ায় হুজুগওয়ালারা হুজুগ তুলিয়াছে। যেন ইহা তাঁহার একটা মস্ত অপরাধ। ইহার জন্যই তাঁহার সমস্ত রচনা যেন ব্যর্থ।

জীবন যেখানে আছে, পরিবর্ত্তন সেখানে অবশ্যম্ভাবী। মোট-কথা, এই পরিবর্ত্তন দিয়াই জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। যার জীবন নাই, কেবল সে-ই চিরদিন তার অচল ঠাট বজায় রাখিয়া অটল হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে। মানুষের জন্মকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাকে কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিতে হয়;—মনের কথা ছাড়িয়া দিই, এক দেহেরই কত অদল-বদল। কিন্তু মাটির পুতুল চিরদিন যে-কে-সেই।

দেহের দিক দিয়া না হইতে পারে কিন্তু মনের দিক দিয়া এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা মাটির পুতুলেরই মতন। এঁদের কোথাও নড়চড় নাই। এঁরা অনেকটা সেই-ধরণের ভদ্রলোক যাঁহারা নিজের বয়স, কখনো ভাঁড়ান না;—একবার যা বলেন, পঁচিশ-বছর বাদে তা আর উল্টাইয়া লন না। কেহ ভুল দেখাইয়া দিলে, উত্তরে বলেন—"ভদ্রলোকের এককথা!"

রবীন্দ্রনাথ এ তন্ত্রের মানুষ নহেন।

মানুষ জীবনের পথে প্রতিপদে নব-নব আনন্দ, নব-নব বেদনা, নূতন তথ্য, নূতন তত্ত্ব লাভ করে, তারই প্রতিঘাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানের রাজ্যে মানুষ আজ যে-কথা স্বীকার করিয়াছে, আবশ্যক হইলে, কাল তাহা অস্বীকার করিতে দ্বিধা করেনা, সেই জন্যই বিজ্ঞান বাঁচিয়া থাকিতে পারিয়াছে। সাহিত্যেও এরূপ ঘটনার অভাব নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে মতপরিবর্ত্তনের বহু বহু দৃষ্টান্ত আছে। এই পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথের ভিতরেও এই স্বভাবের নিয়ম কাজ করিতেছে।

মত-পরিবর্ত্তনের পক্ষে বহু মনীষীর বহু কথা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "কৃষ্ণ-চরিত্র" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে নিজের অনেক কথা উল্টাইয়া লইয়াছেন। সেই প্রসঙ্গের কৈফিয়তে লিখিয়াছেন—"* * * আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত-পরিবর্ত্তন করিয়াছি—কে না করে? * * বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যতদূর প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ। মতপরিবর্ত্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। যাঁহার কখনো মত পরিবর্ত্তিত হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈব-জ্ঞানবিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন। * *"

এমার্সন বলিয়াছেন,—"A foolish consistency is the hobgoblin of little minds, adored by little states-

men and philosophers and divines. With consistency a great soul has simply nothing to do. He may as well concern himself with his shadow on the wall. Speak what you think now in hard words, and to-morrow speak what to-morrow thinks in hard words again, though it contradict everything you said to-day.—"Ah, so you shall be sure to be misunderstood."—Is it so bad then to be misunderstood? Pythagoras was misunderstood, and Socrates, and Jesus, and Luther, and Copernicus, and Galileo, and Newton, and every pure and wise spirit that ever took flesh. To be great is to be misunderstood.

* *
*

রসালো ফল কাঁচা-অবস্থায় সবুজ থাকে, তার হলদে হয়, শেষে টক্‌টকে লাল হইয়া উঠে। ফলটার কথার ঠিক নাই বলিয়া তার উপর যদি গাল পাড়, তুমি নিজেই ঠকিবে। যারা রসিক তারা খোলাটা দেখিবে না, অন্তরের রসের দিকেই তাদের লক্ষ্য।

ফলের মধ্যে এই যে রঙের বদল, যদি কেবলমাত্র ফলের দিকেই দৃষ্টি রাখো তাহা হলে ইহা অসঙ্গতি বলিয়া চোখে ঠেকিবে, কিন্তু সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মিলাইয়া দেখিলে এ অসঙ্গতি টিঁকিবেনা। এই অসঙ্গতিকে ছাড়াইয়া একটা বড় সঙ্গতির খেলা চলিতেছে। সেই বড় সঙ্গতি যেখানে ছিন্ন, আসল অসঙ্গতি সেইখানে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাকে সমগ্রভাবে না দেখিয়া খণ্ডভাবে দেখিলে অনেক অসঙ্গতি চোখে পড়িতে পারে। কিন্তু তেমন করিয়া বিচার করিলে ঠিক বিচার হয় না বলিতেই হইবে। তাঁর সমগ্র রচনার সঙ্গে খণ্ডকে মিলাইয়া দেখা চাই, এবং খণ্ড যেখানে সমগ্রতার মধ্যে সার্থক হইয়াছে, সেইখানটি ধরিয়া বিচার করা দরকার।

রবীন্দ্রনাথের এখনকার অনেক কথা পূর্ব্বেকার কথার বিরোধী বটে কিন্তু সে বিরোধ হঠাৎ আবির্ভূত হয় নাই, পূর্ব্ব হইতেই পর জন্মলাভ করিয়াছে; কিম্বা পূর্ব্বের পরিণতি পরের মধ্যে প্রস্ফুট হইয়াছে। এই রহস্যটি ধরিবার জন্য সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আবশ্যক। নইলে সব খাপছাড়া ঠেকিবে। একটা জিনিষ যখন বদলাইতে থাকে তখন তার বদলের প্রক্রিয়ার সব অবস্থাগুলা খুঁটিয়া আমাদের চোখে না পড়িতে পারে, কিন্তু বদলটা যে একেবারে হঠাৎ হয় না তাহা ঠিক।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার পরিণতি ধারাবাহিক ভাবে ঘটিয়া আসিয়াছে; গতির মুখে যখন যেটা তাঁহাকে অধিকার করিয়াছে সেইটার প্রতি তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন, তার পর সেটাকে যখন ছাড়াইয়া গেছেন, কিম্বা সেইটাই যখন তাঁহাকে তার পরের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে তখন তাঁহার মধ্য হইতে পূর্ব্বেকার যাহা ঝরিবার

তাহা ঝরিয়া গিয়াছে, যাহা থাকিবার তাহা থাকিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যে এ সবগুলিরই একটা স্থান আছে—কারণ সেগুলি ত ভুয়ো জিনিষ নহে—সেগুলি কবির মনের তখনকার সেই বিশেষ-অবস্থার বিশেষ-কথা। সেইজন্য সে সব কথারই একটা সার্থকতা আছে। রবীন্দ্রনাথ যে এই নানা বিচিত্র পরিচয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, তার ছাপ তাঁর রচনার মধ্যেই আছে। তাঁর এক-এক যুগের রচনা এক-একটা স্বাধীন বিশেষত্ব লইয়া জীবন্ত হইয়া আছে।

দুই কিম্বা ততোধিক বিরোধী শক্তিকে একই রঙ্গ-ভূমির মধ্যে আনিয়া রবীন্দ্রনাথ যে আশ্চর্য্য কৌশল দেখাইয়াছেন তাহা জগতের সাহিত্যেও দুর্লভ "গোরা" "ঘরে-বাইরে" প্রভৃতি বই যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারাই একথা জানেন। বিপক্ষকে সহজে হারাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাহাকে শোলার পুতুলরূপে তৈরি করেন না ;—দুই পক্ষের মধ্যে কে যে বেশী বলবান তাহা নির্ণয় করা শক্ত। সেইজন্য যাঁহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাব, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের রচনার আসল রূপটি ধরিতে না পারিয়া কতকগুলো অবান্তর কথা লইয়া হৈ-হৈ করেন।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। সেইজন্য কোনো জিনিষ তাঁহার চোখে উপর-উপর এড়াইয়া যায় না ;—সব জিনিষের সবটা দেখা তাঁহার প্রকৃতির ধর্ম্ম। সেই জন্য ভালো-মন্দ, ইষ্ট-অনিষ্ট, ন্যায়-অন্যায়, এ-সবেরই চেহারা তাঁহার রচনায় সমান তীব্রভাবে ফুটিয়া উঠে। সে ক্ষেত্রে ভালোর দিকটা বাদ দিয়া যাঁহারা কেবল মন্দের দিকটা ধরেন, কি মন্দকে অতিক্রম করিয়া যেখানে ভা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিতে পান কিম্বা যাঁহাদের অবস্থা অন্ধের হস্তিদর্শন ন্যায়, তাঁহারা কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই।

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কেবল অতী ও বর্ত্তমানের মধ্যেই আবদ্ধ নয়—তাঁহ দৃষ্টি অতি-দূর-ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত প্রসারি সাধারণের পক্ষে সেই অতিদূরের চে দেখা সম্ভব নয় বলিয়া রবীন্দ্রনাথের আ সকলের বোধগম্য হয় না। এইজন্য যায় ঘরে-বাইরের নিখিলেশের কথা কেহ বড় উচ্চবাচ্য করিল না, যত গো গোল বাধিল সন্দীপকে লইয়া। ইহা বোঝা যাইতেছে, নিখিলের চরিত্র আ করিতে এখনো দেরী আছে।

* *
*

এ ত গেল সোজাসুজি কথা। ক গুলো বাঁকা কথাও আছে। রবীন্দ্রনাথ নাটকে উপন্যাসে বিচিত্র চরিত্রের করিয়াছেন। তাহাদের একজনের মু কথার সঙ্গে আর-একজনের মুখের ক নিশ্চয় মিল নাই। কিন্তু এইরূপ উক্তি প পাশি রাখিয়া অনেক জায়গায় বলা হয় র নাথ এ-সম্বন্ধে একবার এই বলিয়া আর-একবার তার উল্টা বলিয়াছেন। খুবই অদ্ভুত ঠেকে সন্দেহ নাই, এবং সা পাঠকের অজ্ঞতার উপরে সেই অ নিশ্চয় কাজ করে। কিন্তু যাঁহারা কৌশল খেলেন, তাঁহাদের কি আমরা ত্যের শুভানুধ্যায়ী সমালোচক বলিয়া

রিয়া লইব? হইতে পারে এই অপরাধ াদের স্বেচ্ছাকৃত নহে, বুদ্ধিহীনতাই হার কারণ। তাহা হইলে অবশ্য তাঁহারা াই। কিন্তু তা যদি না হয়, তাহা হইলে াদের শাস্তি কি?

ইহা ছাড়া আর-একটি জিনিষ দেখা যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট কোনো চরিত্রের র কথা লইয়া তাহা তাঁহার নিজের ক্তি বলিয়া প্রচার করা হয়। "ঘরে-বাইরে" াসের সন্দীপ তার ডায়ারীতে একস্থানে তাদেবীর সতীত্বের জোর লইয়া সন্দেহ কাশ করিয়াছে। সে যে-তন্ত্রের লোক, হাতে তার পক্ষে এ কাজ করা খুবই জ এবং স্বাভাবিক। তার চরিত্রের গাগোড়া দেখিলে ইহা মোটেই বিসদৃশ কে না। বরং ইহাতে তাহার মনের তরটা ভালো করিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছে। যে কেমন মানুষ তাহা আর বুঝিতে কি থাকে না। কিন্তু সন্দীপ যে-কথা জের ডায়ারীতে লিখিয়াছে, সেই-কথা ীন্দ্রনাথের উক্তি বলিয়া কি ধরিয়া লইতে ইবে? তাই বলিয়াই ত চারিদিকে ক-পেটানো হইতেছে। জঘন্য চরিত্রের ন্যতা ফুটাইবার জন্য সাহিত্যের আরম্ভ ইতে আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যে এমন অনেক থা স্থান পাইয়াছে যাহা শুনিতে ভয়ঙ্কর। ন্তু সেই-সব কথার জন্য কি গ্রন্থকার দায়ী? তা যদি হয় তাহা হইলে ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস সেক্সপিয়র হইতে আধুনিক যুগের লেখকরা কেহই ত নিস্তার পান না। ইয়াগোর কথা ইয়াগোরই, সন্দীপের কথা সন্দীপেরই ;—তার জন্য কবি দায়ী নহেন। এরূপভাবে দায়ী হইতে হইতে সংসারে আর নাটক নভেল লেখা চলিত না।

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যাঁহারা এই সব গুজব রটনা করিয়া আসর গুলজার করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা যে এই সহজ কথাগুলা জানেন না, বা বোঝেন না, তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। আমাদের মনে হয়, সাহিত্যের সমালোচনা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য আর-কিছু। তাঁহাদের ঐ সব খেলো কথা লইয়া আমাদের আলোচনা করিবার কোনো দরকার ছিল না যদি বাংলায় সাময়িক কাগজের পাঠক যত আছে, সৎ-সাহিত্যের সমঝদার পাঠকও তত থাকিত। অনেকে এই সব ফাল্‌তো কথায় কান দিয়া রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়া বসেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে যাঁহারা স্বয়ং অসিদ্ধ, পরকে রসের বিচার সম্বন্ধে সিদ্ধির পথ দেখাইয়া দিবার ক্ষমতা থাকা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব।

*
* *

সমালোচনা

সুদখোর ও সওদাগর। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীসারদা কুমার দত্ত ১৭ নং ব্রীজ রোড, চেতলা, আলিপুর, কলিকাতা। ইউ রায় এণ্ড সন্‌স্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। এখানি ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত 'উপন্যাস';—সেক্সপীয়রের প্রসিদ্ধ নাটক Merchant of Venice এর Bond story অবলম্বনে রচিত। বৈদেশিক নাম ও ভাব বর্জ্জন করিয়া দেশী নামে ও যথাসম্ভব দেশী ভাবে আখ্যায়িকাটি বর্ণিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সরল—কথ্য ভাষায় রচনাটি চমৎকার ফুটিয়াছে। ভাষায় প্রবাহ আছে, গল্পটিতে প্রাণ আছ; রসও খাঁটি দাঁড়াইয়াছে—কোথাও 'জলো' হইয়া যায় নাই। 'মার্চ্চেণ্ট অফ্ ভেনিস' গ্রন্থখানি দেশীয় ছাঁচে গড়িয়া তোলা কঠিন ব্যাপার, লেখক যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। গল্পটিতে প্রথম হইতেই লেখক এমন কৌতূহল জাগাইয়া তুলিয়াছেন যে একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে তাহা শেষ করিতেই হইবে। এই অত্যন্ত-পরিচিত গল্পটিকে এতখানি সরস ও কৌতূহলে-দ্দীপক করিয়া তোলা দক্ষতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। গ্রন্থে অনেকগুলি ছবি আছে তন্মধ্যে এক খানি বহু-বর্ণে রঞ্জিত। ছবিগুলি চলনসই। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ—প্রভৃতি সৌষ্ঠব দিব্য রমণীয়; সে-হিসাবে এই আক্রার দিনে মূল্য বেশই সুলভ হইয়াছে।

চামুণ্ডার শিক্ষা। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীসারদাকুমার দত্ত, ১৭ নং ব্রীজ রোড, চেতলা, আলিপুর, কলিকাতা। ইউ রায় এণ্ড সন্‌স্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। এখানিও উক্ত লেখকের রচিত ছেলেমেয়েদের উপন্যাস—সেক্সপীয়রের Taming of the Shrew অবলম্বনে রচিত। এখানিও লেখক দেশী ছাঁচে রচনা করিয়াছেন। রচনা সুন্দর হইয়াছে। ভাষায় ভাবে প্রাণ আছে, রস আছে—চরিত্রগুলিও স্বকীয় বিশে উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়াছে। লেখকের হাতটিও ছেলেমেয়েরা এই বই দুইখানি পড়িয়া আনন্দ —তৃপ্ত হইবে। এখানিতেও অনেকগুলি ছবি তন্মধ্যে একখানি বহুবর্ণে রঞ্জিত। ছেলেমে জন্য রচিত হইলেও দুইখানি গ্রন্থই সর্ব্বসাধা উপভোগ্য হইয়াছে। এ বহির ছাপাও অপর অনুরূপ,—পরিষ্কার, মনোজ্ঞ।

সৌধ-রহস্য। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রকাশক, শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়, ভূদেবভবন চুঁ কলিকাতা, কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক এখানি উপন্যাস; প্রসিদ্ধ একখানি বিদেশী 'মর্ম্মানুবাদ'। লেখিকা 'ভূমিকা'য় বলিয়াছেন, মূল গ্রন্থের লাইন ধরিয়া অনুবাদ করেন 'প্রয়োজনীয় চরিত্রগুলি বজায় রাখিয়া নিজের লিখিয়াছেন; কিছু-কিছু পরিবর্ত্তনও করিয়াছেন। অনুবাদ উপন্যাসখানি ১৩২০ সালের বাহিকভাবে বাহির হইয়াছে—সুতরাং এ গ্রন্থ বেশী কথা বলা আমাদের পক্ষে শোভন হয় না; এ-গ্রন্থে রচনা'টি আমূল পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। 'ডিটেক্টিভের গল্প' নয়—বৌদ্ধসন্ন্যাসী সম্বন্ধে জগতের অপূর্ব্ব ধারণাই ইহার ভিত্তি। আগাগোড়া কৌতূহল জাগাইয়া রাখে। ভাষাটি চমৎকার—সহজ, সরল কোথাও বিদেশী গন্ধ নাই। উপন্যাসপ্রিয় পাঠকের কাছে এ আদর হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভাল।

অন্তর্যামী। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রকাশক, শ্রীশিশিরকুমার দত্ত, ২৫, সুকিয়া কলিকাতা। ইউ, রায় এণ্ড সন্‌স্ কর্ত্তৃক মূল্য বারো আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। গুলি ভগবদুদ্দেশ্যে রচিত। বাঁধাই ও ছাপা নয়নাভিরাম।

মালা। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত। শক, শ্রীশিশিরকুমার দত্ত, ২৫, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কাতা। ইউ, রায় এণ্ড সন্‌স্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। বারো আনা। এখানিও কবিতা-গ্রন্থ; কয়েকটি কবিতার সমষ্টি। "সব কবিতাগুলিই সাগর তের অনেক আগে লেখা। দু-একটী মালঞ্চেরও স।" কবিতাগুলির নাম,—প্রেম ও প্রদীপ, র সুখ, সে কি শুধু ভালবাসা, প্রেম-প্রতীক্ষায়, রি স্বপন, উপহার, শূন্য প্রাণ, সাঁঝের ছায়ায়, ম, প্রেম সত্য, টান, দান, রাগ, অন্তিমে, প্রাণের , স্বপ্ন, মহাশূন্য, মোছ আঁখি, বিদায়, আমার , চুম্বন, কামনা, বসন্তের শেষে, আপনার গান, , তুমি ও আমি, আপনার মাঝে, নিবেদন, র্ণনা, গান এবং নীরবতা। এ বইখানিরও া-বাঁধাই সুন্দর, নয়নাভিরাম, 'অন্তর্যামী'র রূপ।

শতদল। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ঠা প্রকাশক, শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ২৬নং বেচারাম ড়ী,—জগৎ আর্ট প্রেস, ঢাকা। প্রিণ্টার, শ্রীসতীশ রায়, ঢাকা। মূল্য দশ আনা। এখানিও বিতাগ্রন্থ—কতকগুলি খণ্ড কবিতা এই গ্রন্থে পৃহীত হইয়াছে। কবিতাগুলিতে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস তে আরম্ভ করিয়া আধুনিক সুকবিগণের রচিত র কবিতার ভাব ও ভাষার ছাপ পড়িয়াছে। বেদনে' ভাবমুগ্ধ বন্ধু 'শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ, প্রকাশক' টি-একটি সার্টিফিকেট আঁটিয়া দিয়াছেন—কিন্তু খানির মধ্যে সব-চেয়ে উপভোগ্য, উৎসর্গ-কবিতাটি! ক গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথকে 'প্রীতি-উপহার' দিতে য়া, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,

"হে চাতক, জানি আমি তুমি কোন্ আশে
ঊর্দ্ধমুখে চাহি আছ,
শুষ্ককণ্ঠে গাহিতেছ
কি গান—কাহার লাগি—আশার উল্লাসে!"

বেচারা রবীন্দ্রনাথ! 'চাতক' বলিয়া তাঁহার ষ্ঠ শুষ্ক' করাইয়াই লেখক ক্ষান্ত হন নাই—'বঁধু' লিয়া গায়ে পড়িয়া শেষে বলিতেছেন,

"বুক-ভাঙ্গা মুক ব্যথা তোমার উদ্দেশে;
দিলাম জুড়াও, তুমি স্নেহের পরশে।"

কবিতা লিখিতে বসিয়া অনেক লেখককে উদ্দাম-ভাবে মনের রাশ ছাড়িয়া দিতে দেখিয়াছি, কিন্তু এই লেখকের উদ্দামতা সকলকে টেক্কা দিয়াছে!

উৎস। রায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীদাশরথি পতি বিদ্যা-বিনোদ, কেশিয়াড়ি, মেদিনীপুর। কলিকাতা, কুসুমিকা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এই গ্রন্থের মুখ-বন্ধে শ্রীযুক্ত জলধর সেন এক 'প্রস্তুতি' আঁটিয়া দিয়াছেন। সেই 'প্রস্তুতি' একটুখানি হইলেও তাহাতে মজা আছে বিস্তর। প্রথমেই 'প্রস্তুতি-লেখক' মহাশয় বলিয়াছেন, "যাঁহারা আমাকে জানেন, আমার বিদ্যাবুদ্ধির সংবাদ রাখেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিবেন, এই পুস্তকের সম্বন্ধে সামান্য একটী কথা বলিবার যোগ্যতাও আমার নাই।" অথচ সাত-আট লাইন পরে তিনিই সার্টিফিকেট দিতেছেন, "শ্রীযুক্ত প্রহরাজ মহোদয়ের চিন্তাশীলতা, মহানুভবতা এবং ধর্ম্মপ্রাণতা এই গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পরিস্ফুট। তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ; তাঁহার লেখনী হইতে শাস্ত্রের কথাই নিঃসৃত হইয়াছে। এবং প্রত্যেক প্রবন্ধ তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, অবিচলিত ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করে" ইত্যাদি। প্রস্তুতি-লেখকের প্রথম উক্তি মানিতে গেলে দ্বিতীয় উক্তির অর্থ থাকে না! যাহা নিজে বোঝেন না তাহার সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দেওয়াও শুধু এই দেশেরই নির্লজ্জ প্রথা! যাহা হোক, এই গ্রন্থে কয়েকটি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে—'প্রস্তুতি'-পাঠে জানিলাম, "গ্রন্থকার মহোদয় সভা-সমিতিতে যে সকল অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন এবং সাময়িক পত্রাদিতে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন-তাহারই অল্প কয়েকটী সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়াছেন।" প্রবন্ধগুলির বিষয়,—অভিষেকোৎসব, ভূস্বামিগণের ভবিতব্যতা, কার্ত্তিকে মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ কেন? ইতি, অপূর্ব্ব অতিথি-সৎকার, ভাষানুবাদ, মানব-জীবনে সুখের স্থান, মেদিনীপুরের

ভাষা এবং ধর্ম্মতত্ত্ব-পরিশিষ্ট। আমাদের দুর্ভাগ্য, 'শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়' ছাপ আঁটিয়া দিলেও প্রবন্ধগুলিতে চিন্তাশীলতার কোন চিহ্ন আমরা দেখিলাম না। লেখক নূতন কথা কিছুই বলিতে পারেন নাই; চিন্তা করিয়া বলিবার সে শক্তি তাঁহার আছে বলিয়াও মনে হইল না। কোন বিষয়কে গভীর-ভাবে না দেখিয়া মামুলি যে-সকল মত সাধারণ লোকে নিত্য চক্ষু মুদিয়া ব্যক্ত করে, লেখক তাহারই পুনরুক্তি করিয়াছেন; প্রভেদ শুধু এই, তাঁহার ভাষা গাম্ভীর্য্যের মুখোস পরিয়া বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া তুলিয়াছে। লেখায় যুক্তি নাই —সংস্কৃত শ্লোক দেখিলেই লেখক ভাবে গদ্গদ হইয়া পড়িয়াছেন—বিচার-শক্তির একান্তই অভাব—তাহার উপর অবান্তর কথারও অন্ত নাই! যুক্তি-তর্কে ভাষায়-ভাবে প্রবন্ধগুলি এমন যে সেগুলিকে রচনা-শিক্ষার্থী বালকের প্রথম চেষ্টার অপরিণত ফল বলিয়াই মনে হয়! এরূপ রচনারও প্রস্তুতি লিখিতে লোকের অভাব হয় না—হারে দেশ!

ভবানী-ভাবনা। শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি, এ, ভবানীপুর, বীরভূম। কলিকাতা, লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এই গ্রন্থে লেখকের গৃহ-বিগ্রহের মাহাত্ম্য-কথা ছন্দে বিবৃত হইয়াছে। লেখকের একবার কঠিন পীড়া হয়—সেই পীড়ার সময় সহসা কে যেন কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিল * * মা ভবানী কহিলেন, "* * তোর গৃহে আমার যে বিগ্রহ আছে * * সেই বিগ্রহ কেন ভবানীপুরে আসিল, তার যাবতীয় বিবরণ তুই বর্ণনা কর্।" ইহাই এ গ্রন্থ-রচনার ইতিহাস। সাহিত্যের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

পারিবারিক প্রবন্ধ। ৺ভূদেব মুখোপা প্রণীত। শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ড অফিস হইতে প্রকাশিত। কলি ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। অষ্টম সংস্করণ। মূল্য টাকা। আশা করি, বাঙ্গালীর কাছে এ গ্র নূতন পরিচয় দিতে হইবে না। বাল্য-বি দাম্পত্য-প্রণয়, উদ্বাহ-সংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা, সতীর জ্ঞাতিত্ব, অতিথি-সেবা, পরিচ্ছন্নতা, চাকর-প্র পালন প্রভৃতি গৃহস্থের খুঁটিনাটি প্রত্যেক বি আলোচনায় গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতা, ভূয়োদর্শন, প্রভৃতি অনুধাবনযোগ্য। স্বজাতি ও স্বদেশা গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মণির ন্যায় ঝক্-ঝক্ করিতে এ গ্রন্থের একখানি শোভন সংস্করণ ছিল না—ই ছিল আক্ষেপের বিষয়। বর্ত্তমান সংস্করণে গ্রন্থ আকার ডবল-ক্রাউনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—ছাপা-কা সুন্দর হইয়াছে এবং নীল রঙের দেশী রেশমী কা বাঁধাই টুকুও বেশ পরিপাটী।

কর্ম্মযোগের টীকা ও অন্যান্য গল্প —শ্রীযুক্ত রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর প্রণী চেরি প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। সু বাবু যে একজন পাকা গল্প-লেখক তাহা নূতন ক বলিবার দরকার করেনা। তাঁহার এই বিচিত্র গল্পগুলি আমাদের বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছে তাঁহার লেখায় যে নিজস্ব একটি বিশেষত্ব আছে, পরিচয় প্রতি গল্পেই পাওয়া গিয়াছে। যে গল্পটি ল গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে, সেইটিই একটু ভারীরকমে আড়ষ্ট হইয়া আছে। 'দীক্ষা' 'গোলাপজাম', 'দী নিশ্বাস' প্রভৃতি গল্পগুলিতে করুণ ও হাস্যরস গ যমুনার মতই চমৎকার মিশ খাইয়াছে। প্লট মা নয়, তাহাতে বৈচিত্র্য আছে। 'মুস্কিল আসানে' হা রস চমৎকার ফুটিয়াছে। ছাপা কাগজ ভাল।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হই
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত

N. C. Maitra Family Library
Narayan Chandra Maitra
Bonhoogly
Barnagore P.O.
Calcutta
29-11-16

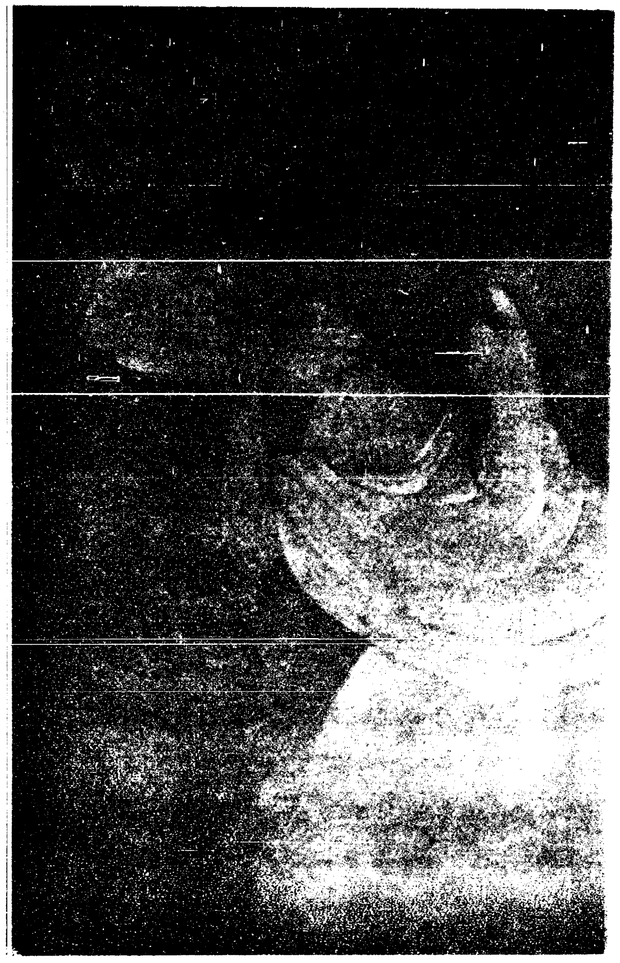

চরণাশ্রয়ে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত

ভারতী

৩০শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ [৮ম সংখ্যা

স্বেচ্ছাচারী

১০

আজ মহালয়া। আজ এমন একটা দিন যে-দিন ঘরমুখো বাঙ্গালীর 'ঘর-পোড়া' প্রাণগুলি গৃহের দিকে ফিরিবার জন্য ছটফট করে। যাহারা ছুটিতে পায় তাহারা ছোটে, যাহারা পায় না তাহারা অতি-কষ্টেই আপনাদের সংযত রাখে। আজ এমন একটা দিন যেদিন হিন্দুর ঘরে ঘরে মেশামেশি, জানাজানি, কানাকানি, আসা-আসির একটা সাড়া পড়িয়া যায়। আজ যেন বাঙ্গালীর জীবনে মায়ের প্রবল টানাটানি জাগিয়া উঠিয়া পথে ঘাটে, বাসে-প্রবাসে, কাজে-অকাজে, যে যেখানে আছে, সকলকে মনে পাড়াইয়া দেয় যে, আজ ফিরিবার দিন, আজ মায়ের কোল ছাড়া, মার কাছ ছাড়া অন্য কোথাও তাহাদের যথার্থ স্থান নাই। মা যেন হঠাৎ এক শারদ প্রভাতের নির্ম্মল আকাশের তলে শ্যামল বসনে শিশির-মুক্তাবলী-হারে সজ্জিত হইয়া তাঁহার নক্ষত্রলোক কৈলাস হইতে নামিয়া আসিয়া দাঁড়ান! অমনি চারিদিকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি পড়িয়া যায়, 'ওরে, মা আসিয়াছেন রে, মা আসিয়াছেন।' আর সকল শত্রুতা, সকল দ্বন্দ্ব, সকল হানাহানি টানাটানি থামিয়া গিয়া সমস্ত বঙ্গ সংসার হইতে মায়ের পূজার আয়োজনের জন্য স্নেহ, প্রেম, ভক্তির কোলাহল উত্থিত হয়!

আজ এমন একটা দিন, যেদিন সকলকেই মনে করিতে হইবে যে সে, এই বিশ্ব পরিবারের একান্নভুক্ত, সকলের আপনার জন। যাঁহারা বহুপূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন, "অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং সহ" আজ স্মরণ করিতে হইবে যে এই প্রকাণ্ড জগৎ একটি মহা আলয়—প্রকাণ্ড একান্ন-ভুক্ত সংসার। ইহাকে সারা বৎসর ধরিয়া বহু কোটী অংশে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছি

এবং এক একটী ক্ষুদ্রতম অংশকে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ বলিয়া মনে ভাবিয়াছি। কিন্তু আজিকার এই শিশির-স্নাত শেফালির গন্ধ দিকে দিকে ছুটিয়া সমস্ত বঙ্গের হৃদয় একটী মাত্র গন্ধের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! সমস্ত বঙ্গ দেশের শস্য-ক্ষেত্র আজ একই শোভায় একই গন্ধে সর্ব্ব দিক ভরিয়া ফেলিয়া একই জননীর আগমন জানাইয়া দিতেছে। আজ একই জননীর উৎসুক স্তন হইতে ক্ষীরধারা পান করিতে হইবে; তাই আজ এত তাড়াতাড়ি, এত হুড়াহুড়ি! আজ তাই ভাগাভাগির আঁটাআঁটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বিশ্বের প্রাঙ্গণে অনন্ত আকাশের চন্দ্রাতপ-তলে সর্ব্বলোক-মন্দিরে বিশ্ব-মাতার জন্য মঙ্গল ঘট স্থাপিত করিতে হইবে। মায়ের জন্য বিশ্ব-হৃদয়-সিংহাসন আজ গঙ্গা জলে বিল্ব-দলে পূজিতে হইবে।

আজ মা স্বয়ং ডাকিতেছেন! কে বসিয়া থাকিবে? কে এমন মাতৃহারা সর্ব্বস্ব-হারা দিক্‌ভ্রান্ত পথিক আছে যে আজ মাকে ছাড়িয়া অন্য দিকে যাইবে? মাগো, তোমার গভীর উদাত্ত স্বরে ডাক,"কে আছিস, ওরে মাতৃহারা স্নেহহারা গৃহহারা কে আছিস, ছুটে আয়! আজ আমি এসেছি, ওরে, আর ভয় নাই।" বল মা সেই বেদময়ী সমবেতকারিণী ঐক্য-সাধিনী বাণী, যাহা কোন্ সুদূর অতীতে সরস্বতী দৃষদ্বতী-তীরে প্রথম ধ্বনিত হইয়া উঠিয়া কত যুগের কত যুগান্তের মধ্য দিয়া আজও আমাদের কর্ণে এক হইবার মহামন্ত্ররূপে ধ্বনিত হইতেছে। বল সেই কথা, "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং"—'মিলিত হও, এক কথা বল, তোমাদের চিত্তও এক হউ মনে বাক্যে কার্য্যে এক হও, মিলিত এক মায়ের পুত্র বলিয়া আপনাকে বী কর। যাক্, সেই বাণী দিকে দিকে ছুটিয়া যা সমস্ত জগতের হৃদয়ে সেই বাণী ধ্বনি হউক—সকলে জাগিয়া উঠিয়া বলুক, "আ এক মায়ের ছেলে, আমরা পর নহি, আ নিতান্তই আপনার জন,—আমরা এক মা এক মহা-আলয়ে একই স্তন্য-দুগ্ধে লা পালিত জীবিত রহিয়াছি। আমরা বহু একের, আমরা বিচিত্র তবু একের, আ বিচ্ছিন্ন তবু একের সত্তায় সত্তাবান, এ কোলে আশ্রিত!'

শশিভূষণ তাহার পিতার নিকট চলি গিয়াছে। অন্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও ছু পাইয়াছে। সর্ব্বানন্দ আজ সকালে জাগি ভাবিল, সে কোথায় যাইবে? তাহার যাইব মত স্থান কোথায়? মন তাহার যাই-য করিতেছে, অথচ যাইবার মত, আজিকার দি দিনে আশ্রয় পাইবার মত স্থান তাহ নাই! সর্ব্বানন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শয্যা উপর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। এমন স রঘুনাথ আসিয়া তাহার শয্যার উপর কয়ে খানি পত্র ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ছোট বা আজ কি রান্না হবে,—বামুন ঠাকুর জিজ্ঞে করছেন।" সর্ব্বানন্দ উঠিয়া বসিয়া একখা চিঠি খুলিতে খুলিতে বলিল, "আজ আ এখানে খাব না, বাগবাজারে যাব, তোম যা হয় রেঁধে নাও গে।" রঘুনাথ হাসি বলিল, "আজ আমারও নেমন্তন্ন আছে বামুন ঠাকুরও কালীঘাটে যাবেন।"

সর্ব্বানন্দ কোন উত্তর দিল না দেখি

গেল। কিন্তু সর্ব্বানন্দ পত্র করিতে করিতে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া , কারণ কার্ত্তিক লিখিয়াছে যে আজ দিন হইতে দেবুর সর্দ্দি কাশী হইয়া জ্বর দেখা দিয়াছে। ডাক্তার বলিতেছে উহার ভয়ানক নিউমোনিয়া হইয়াছে। যে হইবে, কে জানে!

সর্ব্বানন্দ তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল; পোষ্ট অফিসে গিয়া জরুরি টেলিগ্রামে র বিষয় প্রশ্ন করিয়া পাঠাইল; এবং লিকাতা হইতে ডাক্তার লইয়া যাইবে কি তাহাও টেলিগ্রামের উত্তরে জানাইতে খিল।

পোষ্ট অফিস হইতে গৃহে ফিরিয়া সর্ব্বানন্দ কে বলিল, "আমি এখনি বাগবাজারে যাচ্ছি, মি তোমার নেমন্তন্ন সারতে বারোটার পর ব। আমার নামে কোন টেলিগ্রাম এলে মন করে পার তা নিয়ে রাখবে, আমি রোটার মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরব।"

রাস্তায় চলিতে চলিতে সর্ব্বানন্দ মনে নে বলিল, আগমনীর বাঁশী বাজিতে না জিতে এ কি বাঁশী বাজাইয়া তুলিলি ? আমি কোথায় যাইব, কোথায় যাইব, হাই ভাবিতেছিলাম বলিয়া কি এইভাবে ামায় ডাকিতে হয়? দেবুকে যদি বাঁচাইতে পারি, তাহা হইলে কার্ত্তিকের সুস্থ হওয়ার আর কোন আশাই থাকিবে না!

সর্ব্বানন্দ ব্যস্তভাবে রান্না ঘরের দিকে াইবামাত্র সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, আজ যে এত তাড়া সর্ব্ব-দা? বেলা শটা না বাজতেই খাবার তাগিদ করছ! মার আর সুকুর হুকুমে তোমার জন্য আজ যে কত রকম আহার্য্যের ব্যবস্থা হচ্ছে, তার আর ঠিক নেই। তোমার যদি অন্য কোন কাজ থাকে ত আজ আর তা হচ্ছে না, সেটা জেনে রেখো।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তা হবে না সরোজ, আমি গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছি। ফিরে এলে যা হয় তাই চাট্টি বেড়ে দিয়ো। আমায় আবার বারোটার আগেই বাসায় পৌছুতে হবে।"

সরোজ কহিল, "ব্যাপার কি? বাসায় আজ কিসের আয়োজন করেছ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কোন আয়োজন নেই, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে।"

সরোজ কহিল, "তা হবে না, সর্ব্ব-দা; আজ তোমায় ভাল করে না খাইয়ে আমরা ছাড়তে পারব না। আমাদের সমস্ত আয়োজন নষ্ট করো না।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সরোজ, আমার বড্ড দরকার; আজ আমায় মাপ কর, ভাই। আজ কিছুতেই দেরী করতে পারব না।"

ইতিমধ্যে সুকুমারী আসিয়া পড়িয়া বলিল, "বাঃ, তা কেমন করে হবে? কাল আপনি নিজে যেচে নেমন্তন্ন নিয়ে গেলেন, মস্ত একটা খাবারের ফর্দ্দ দিয়ে গেলেন, আর আজ আপনার মত ঘুরে গেল! এ হতেই পারে না, আমি মাকে বলে দিচ্ছি।"

সর্ব্বানন্দ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ও সুকু, শোনো, শোনো।" আর শোনো! সুকুমারী চিন্ময়ীর নিকট চলিয়া গেল। সরোজ একটু চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে সর্ব্ব দাদা, আমায় বলবে না?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "তোমাদের মিছিমিছি ব্যস্ত করে কি হবে?"

সরোজ কহিল, "না বললে আরও বেশী ব্যস্ত হব, তা কি বুঝতে পারছ না?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "দেবুর নিউমোনিয়া হয়েছে, হয় তো আজই তিনটের ট্রেনে আমায় ডাক্তার সঙ্গে করে শিবরামপুর যেতে হবে। আজ চিঠি পেয়েই টেলিগ্রাম করেছি, দেখি, সে এখন কি লেখে!"

সরোজ কহিল, "টেলিগ্রামের কি উত্তর আসবে, আমরা তা কি করে জানতে পারব?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "ঐ দেখ, ঐ ভয়ে আমি তোমাকে কিছু বলতে চাচ্ছিলুম না।"

সরোজ কহিল, "এই খবর তুমি আমার কাছে লুকিয়ে রাখতে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমাকেই আমার বিশেষ ভয়। যাক্, ব্যস্ত হয়ো না, ব্যস্ত হয়ে ত কোন লাভ নেই।"

আজ প্রভাতে উঠিয়া সরোজ মনের মধ্যে যতখানি উৎসাহ অনুভব করিয়াছিল, এক নিমেষে সে সমস্তই চলিয়া গেল। দেবু যে কার্ত্তিকের পক্ষে কতখানি, তাহা সে বহুবার সর্ব্বানন্দর মুখে শুনিয়াছে, সেই দেবীপ্রসাদের এমন অসুখ! না জানি, কার্ত্তিক তাহার অন্ধকার ঘরের মধ্যে কি করিতেছে! যে দেবী-প্রসাদের জন্য সরোজও এই দূর হইতে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে, না জানি, সেই পুত্রের জন্য কার্ত্তিকের অন্ধকার কারাগারের প্রাচীর আরও কত-না কঠিনতর, দুর্ভেদ্য-তর হইয়া উঠিয়াছে! সরোজের মুখ উৎকণ্ঠায়, আশঙ্কায় বারবার বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। সর্ব্বানন্দ তাহার মানসিক অবস্থা অনুভব করিয়া বলি "সরোজ, ব্যস্ত হয়ো না ভাই, ভগবানের উপর কারও হাত নেই। তিনি যা চাইবে তা হবেই। তাড়াতাড়ি আমায় যা একটা ভাতে-ভাত দিয়ে বিদেয় দিয়ো। আমি স্নান করে আসি।"

সর্ব্বানন্দ স্নান করিতে চলিয়া গে আর সরোজ সেই রান্নাঘরের চৌকা উপর বসিয়া পড়িয়াই ভাবিতে লাগি সুকুমারী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কি হ সরোদি? তুমি অমন করে বসে পড়লে কে সরোজ কোন উত্তর দিল না। হইতে রাঁধুনী ঠাকুরাণী বলিলেন, "সরোজ তাহলে ভাতে ভাত চড়িয়ে দি

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কে কেন? কি হয়েছে?"

রাঁধুনি বলিলেন, "সর্ব্ববাবু বলে গে যে ওঁকে এখুনি যেতে হবে, দেবু কে, তার ভারী অসুখ করেছে। শুনে সরোজ দি ভয়ে অমনি কাঁটা বসে পড়েছে।"

সুকুমারী বুঝিতে না পারিয়া বলি "কি হয়েছে? কার অসুখ করেছে?"

সরোজ এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলি "বামুন দি, তুমি ভাতে ভাত চ দাও। এস সুকু, আমরা উপরে যাই। নিউমোনিয়া হয়েছে, এখান থেকে ডা নিয়ে সর্ব্বদাদাকে আজই যেতে হবে।"

সুকুমারী এবার সমস্তই বু তাহারও মনে আজ অনেকখানি আ সঞ্চিত হইয়াছিল। সেও রাত্রি থাকি উঠিয়া সর্ব্বানন্দর জন্য বহু আয়ো

রিতেছিল। কিন্তু হায়, সমস্তই বৃথা ল! সর্ব্বানন্দকে আজ সে কিছুতেই রিয়া রাখিতে পারিবে না।

সর্ব্বানন্দ আহারাদি সারিয়া গমনোদ্যত লে, সরোজ সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "সর্ব্ব , আমি কি কোন দরকারে লাগতে রি না?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "তুমি আর এ বিষয়ে করতে পার?"

সরোজ কহিল, "দয়া করে ভেবে দেখ র্ব্ব-দা, হয়তো আমার দ্বারাও কোন কাজ তে পারে।"

সর্ব্বানন্দ তাহার কাতরতা দেখিয়া মনে নে কি একটা কথা চিন্তা করিয়া বলিল, য়তো এ বিষয়ে তুমি অনেকখানি সাহায্যই রতে পারতে, কিন্তু আমি তা নিতে ারছি না।"

সরোজ কহিল, "কেন?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কেন—তা কি তুমি ুঝতে পারছ না?"

সরোজ কহিল, "আমি বুঝতে চাইনে, আর ুঝবও না, সর্ব্ব-দা—"

সর্ব্বানন্দ বাধা দিয়া বলিল, "ছি সরোজ, ছেলেমানুষী করো না। মা কি মনে করবেন? শশি ঠাকুরদা কি মনে করবে? শজনে কি ভাববে? তোমার সেখানে াওয়া হতেই পারে না। তবে—"

সরোজ কহিল, "কি তবে? বল, কি লছিলে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "জানিনে, হয় তো যদি তোমাকে ছাড়া আর কোন উপায় না পাই, তখন ভগবান হয়তো আমাকে তোমার কাছেও সাহায্য নিতে বাধ্য করতে পারেন। তখন তোমার কাছে আসব, আজ তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই।"

সরোজ কহিল, "তোমার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। আমি আর থাকতে পারছি না। পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে আমি এ মরণের দিকেই এগিয়ে চলেছি। তুমি কি একটুও দয়া করবে না? এক দিনের জন্য, এক মুহূর্ত্তের জন্য কর্ত্তব্যের দিক থেকে সাধারণের মতামতের দিক থেকে ফিরে মানুষের অন্তরের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাও,—সহানুভূতি নিয়ে কাতর প্রাণীদের প্রাণের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াও, সর্ব্ব-দা, তা হলেই তোমার মনে দয়া হবে।"

সুকুমারী নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। সে সরোজের হাত ধরিয়া কাতরভাবে বলিল, "সরো দি, তুমি ত এমন অবুঝ ছিলে না! ছি, এ-সব কথা কেন বলছ? যাও, আপনার কাজে যাও। আর দাঁড়িয়ো না।"

সরোজ কহিল, "না, না, দাঁড়াও। একটা কথা শোনো, যাবার আগে, কি টেলিগ্রাম আসে, সেটা বলে যেও।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি নিজে আসতে পারব না, সরোজ, কেন না বড্ড দেরী পড়ে যাবে, তাহলে। তবে বলে যাচ্ছি, রোজ চিঠি দেব, মাকে দিয়ে পড়িয়ে নিও। আর আজ টেলিগ্রামে কি খবর আসে, রঘু এসে বলে যাবে।"

সর্ব্বানন্দ চলিয়া গেলে সুকুমারী সরোজকে বলিল, "ছি সরো দি, তুমি এমন হয়ে যাচ্ছ কেন?"

সরোজ কহিল, "তুই কি জানবি সুকু, ঐ দেবু যে তাঁর কতখানি, তা যে তুই কিছুই

জানিস নে। দেবু যদি না বাঁচে, তা হলে কি যে হবে, তা মনে করতে আমার সমস্ত দেহ-মন অসাড় হয়ে যাচ্ছে! আজ মহালয়ার দিনে এ কি কথা শুনলুম, সুকু! আজকের আগমনীর বাঁশীতে আমি যেন বিজয়ার বিদায়ের কাতর কান্না শুনতে পাচ্ছি! মা মঙ্গলময়ী, মঙ্গল কর মা।"

সরোজ কাঁদিতে কাঁদিতে উদ্দেশে জগৎ-জননীর পদে প্রণাম করিল।

১১

শিবরামপুরের জমিদার-গৃহে প্রতি বৎসর যেরূপ ধূমধামে পূজা হইয়া থাকে, এবার তদপেক্ষা অধিকতর আয়োজন হইয়াছে। সমস্ত হিতৈষী ব্যক্তির, সমস্ত আমলা-ফয়লার অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করিয়া জমিদার বাবু এ বৎসর পূজার উপচার বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। নৃত্য-গীতের জন্য দুই দল যাত্রা, চার দল কবি, ছয় দল বাই এমন কি একদল থিয়েটার পার্টীকে আনাইয়া স্থানে স্থানে আসর করিয়া বোধনের দিন হইতে আমোদ চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কেহ স্বেচ্ছায়, কেহ-বা অনিচ্ছায় এই সমস্ত আয়োজনের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়াছে। কার্ত্তিক কাহারও কথা শুনিতেছে না। আজ কয় দিন হইতে তাহার সম্মুখে লোকের তিষ্ঠানো দায় হইয়া উঠিয়াছে। অন্ধকার ঘর হইতে কেবল আজ্ঞাই প্রচারিত হইতেছে, সেখানে উপদেশ বা মন্ত্রণা দিবার জন্য কাহারও যাইবার সাধ্য নাই। সর্ব্বানন্দ এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বকিয়া ঝকিয়া সারা হইয়াছে, তবু কার্ত্তিক অচল, অটল।

দেবু যখন রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, তখন বহির্ব্বাটীতে ও অন্তঃপুরে, সর্ব্বত্রই এক বিরাট কোলাহল। সর্ব্বোপরি চারিটী যে তো রচিত হইয়াছে, তাহার উপর হইতে ক্রমা আগমনীর বাঁশী বাজিতেছে। শৈলজা যেন এ কয়দিনে পাগলের মত হ গিয়াছে। তাহার ইচ্ছা, তাহার পুত্র লইয়া এই বীভৎস কোলাহল হইতে সে দূ পলাইয়া যায়। কিন্তু স্বামীর মূর্ত্তি দেখি সে ইচ্ছা সে প্রকাশ করিয়া বলি পারিতেছে না। সর্ব্বানন্দ কাতর হ সপ্তমীর প্রভাতে কার্ত্তিকের ঘরে প্র করিয়া বলিল, "পুত্র-হত্যা করবার যদি ই না থাকে, তা হলে এখনই এ-সব থা দাও। দেবু কাল সারারাত ঘুমোতে পা নি।"

কার্ত্তিক কহিল, "দেবু ঘুমোতে পা নি,—তাতে শিবরামপুরের জমিদারের কি এসে যায়? তার মস্ত নাম-ডাক, ত সম্ভ্রম, সে-সব রাখতে হবে ত! আমা ছেলে মরছে, সে কথা সে শুনবে কেন?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার পায়ে প কার্ত্তিক, তুমি একটু স্থির হও।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমার চাইতে স্থির কে আমার যেটুকু প্রাণ ছিল, তাও মা দুর্গা এ কেড়ে নিচ্ছেন। তাই ত' ভাল করে তাঁ পূজার বন্দোবস্ত করেছি। মা এসেছেন লোকে পাঁঠা-মহিষ বলি দিচ্ছে। আমি শি রামপুরের জমিদার, আমার ত একটা ব রকম কিছু করার দরকার, আমি আমা ছেলে বলি দেব। পারবে কেউ আমা সঙ্গে?"

সর্ব্বানন্দ অনেক বুঝাইল। কার্ত্তিক এক

ট হাস্যে তাহার সমস্ত যুক্তি-তর্ক ইয়া দিয়া বলিল, "চারি দিক থেকে অন্ধকার য়ের পাঁচিলের মত ঘিরে আসছে। ুক, কিন্তু আমিও দেখে নেব। ডুবে ত' এমন করে ডুবব, যাতে তোমরা বুঝতে বে যে কাকে বেঁধে রেখেছিলে, কাকে য়ে মারলে। বুনো সিংহকে শেকল দিয়ে লে সমস্ত ঘরখানাকে ভেঙ্গে-চুরে সে সেই চাপা পড়ে' তবে ত মরবে! এখন এ য়েছে কি!"

কার্ত্তিক বদ্ধ জন্তুর মত একটা সুগভীর করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্ষণ পরে হঠাৎ থামিয়া অতি করুণস্বরে কিল, "দেবু, বাবা আমার—"এবং পরক্ষণে র্ব্বানন্দর নিকটে আসিয়া তর্জ্জন করিয়া ল, "বেরোও এ ঘর থেকে, এ ঘরে আমি া থাকব—অন্ধকারের মধ্যে আমি একা—া।" সর্ব্বানন্দ জোর করিয়া কার্ত্তিককে টস্থ বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া একটা জানালা য়া দিল। বাহিরের আলো কার্ত্তিকের মুখের র আসিয়া পড়িতেই দুই হাতে সে ঢাকিয়া পাশ ফিরিয়া বালিশে মুখ কাইল। সর্ব্বানন্দ একখানা পাখা লইয়া াহাকে বাতাস করিতে করিতে বলিল, ার্ত্তিক, বল, তুমি কি চাও?"

কার্ত্তিক কাতর কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, ালো, আলো—অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি। লো দাও। আলোকে অবজ্ঞা করেছিলুম, মান করেছিলুম, সেই পাপে সে আমার মনে থেকে আজ তার ক্ষীণ রশ্মিটুকুও সরিয়ে চ্ছে। দাও, আলো দাও, আলো, সর্ব্ব-দা, লো দিয়ে আমায় বাঁচাও।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "চোখ চেয়ে ফেলো, কার্ত্তিক, চেয়ে দেখ, আকাশ-ভরা আলো এসে তোমার দরজায় দাঁড়িয়েছে। তুমি তাকে ডেকে নাও।"

কার্ত্তিক উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় একবার মাথা তুলিয়া চাহিল। কি ভীষণ উন্মাদের ন্যায় দৃষ্টি! সর্ব্বানন্দ অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কি দেখছ কার্ত্তিক?"

কার্ত্তিক পুনরায় বালিশে মুখ লুকাইয়া বলিল, "দেখছিলুম,—তোমার কথা সত্য কি না, অন্ধকার আমার কাছে হেরে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে কি না! সে না গেলে ত আর আলো আমার কাছে আসতে পারবে না!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "এমন অবস্থাতেও তুমি পাগলামি ছাড়বে না? আলো-অন্ধকার, ছাই-পাঁশ, সেই সব অর্থহীন প্রলাপ বকবে? যাক ছাই, তোমার যা ইচ্ছে যায়, তুমি তাই কর, কিন্তু ঐ ছোট্ট ছেলেটা ত কোন দোষ করে নি, ওর উপর এ অত্যাচার কেন? ওকে বাঁচতে দাও। এই সব গোল-মাল থামিয়ে দিয়ে নমো-নমো করে কোনমতে মায়ের পূজা সারো।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমার কষ্ট হচ্চে, কি শৈলর কষ্ট হচ্চে, কি দেবুর কষ্ট হচ্চে, এ কথা আর সবাই শুনবে কেন? আমরা যদি কেউ মরি, তাতে ত কারও কিছু আসবে-যাবে না। তবে কেন তাদের প্রাপ্য আমোদে বাধা দেব? যদি তারা শোনে যে দেবু মরেছে, তাহলে তারা মা দুর্গার সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে বলবে, 'মা, জমিদারের ছেলেটিকে নিয়েছ, তা বেশ করেছ, তুমি

যা ভাল বুঝেছ করেছ, কিন্তু দেখো মা, আমার ছেলেটিকে নিয়ো না। আমার ছেলেটিকে যে বাঁচিয়ে রেখেছ, এর জন্য এই নাও আমার নৈবিদ্দি, এই নাও আমাদের প্রণাম।' তাদের মধ্যে যদি কারো আমার মত অবস্থা হত ত আমিও যে রকম কথা ভাব্‌তুম, যে রকম কাজ কর্‌তুম, তারাও তাই কর্‌ছে, কেন না, তারাও মানুষ। তুমি মানুষকে এখনও চেন নি, সব্ব-দা।"

সর্ব্বানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি-একটা কথা চিন্তা করিল, শেষে বলিল, "তা হলে আমি দেবুকে এখান থেকে সরিয়ে টোলে খুড়ো মশায়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখছি। আর আমি কিছুতেই তোমার কথা শুনব না।"

কার্ত্তিক কহিল, "কি! তুমি আমার কাছ থেকে দেবুকে কেড়ে নিয়ে যাবে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তুমি যদি রাক্ষসের মত তাকে মারবার বন্দোবস্ত কর, তাহলে সাধ্য-মত তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে বৈ কি!" কার্ত্তিক লাফাইয়া উঠিয়া অন্তঃপুরাভি-মুখে ছুটিল, কিন্তু দুই-চারি পা যাইতে না যাইতেই ধরাশায়ী হইল। সর্ব্বানন্দ তাহাকে আরও দুই-একজন লোকের সাহায্যে তাহার কোটরে আনিয়া শয়ন করাইল। কার্ত্তিক তখন সংজ্ঞা-হীন।

সর্ব্বানন্দ বহু চেষ্টা করিয়াও যখন তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইতে পারিল না, তখন ব্যস্ত হইয়া সে ডাক্তারের নিকট সংবাদ পাঠাইল। ডাক্তার আসিয়া নানাবিধ ঔষধাদি প্রয়োগে প্রায় দুই ঘণ্টার উদ্যোগে কার্ত্তিককে সম্পূর্ণ সুস্থ করিলেন। সর্ব্বানন্দর আদেশে পূজা স্থানের সমস্ত শব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছি কিন্তু কার্ত্তিক জাগিয়াই বলিল, "এ কি, বাজছে না কেন?" ডাক্তার তৎ কার্ত্তিকের আজ্ঞা পালন করিতে আ দিলেন।

সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিককে না জানাইয়া প্রসাদকে সন্তর্পণে বুকে তুলিয়া লইয়া গেল। শৈলজা শিবচন্দ্রের কাতরভাবে চাহিয়া বলিল, "বাবা, বিপরীত হবে না ত?"

শিবচন্দ্র ম্লান মুখে বলিলেন, "কোন নেই মা, আমার কাছে সে কিছুই পারবে না। তবে আমার ভয় এই, যদি দেবুর ব্যাধির আরও বৃদ্ধি হয়, তা কি করব?"

শৈলজা কহিল, "এই ত ওর আপ ঘর, এ ঘরে যদি ও ভাল না হয়, তা আর কোথাও আশা নেই।"

সন্ধ্যার পর কার্ত্তিক যখন তাহার পু ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সে শূন্য, তখন সে সর্ব্বানন্দকে ডাকাইয়া পাঠা বলিল, "দেবুকে এ ঘর থেকে নিয়ে গে ভাল করনি সর্ব্ব-দা। এর ফল ভো টের পাবে।"

সর্ব্বানন্দ ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "তা প পাব, তাই বলে তোমার মত বাপের ভ বধানে ছেলেকে রাখতে পারি নে!"

কার্ত্তিক কহিল, "শৈলকে একবার পা দেবে?"

সর্ব্বানন্দ "দিচ্ছি" বলিয়া চলিয়া গে কার্ত্তিক পুত্রের ত্যক্ত শয্যার উপর প অতি মর্ম্মভেদী কণ্ঠে অথচ মৃদুস্বরে ডা

ফিরে আয় বাবা!" কতক্ষণ যে সে ভাবে ছিল, তাহা তাহার স্মরণ নাই; কিন্তু তাহার সংজ্ঞা হইল, তখন সে দেখিল, জা তাহার নিকটে বসিয়া তাহাকে াস করিতেছে। কার্ত্তিক হঠাৎ তাহার চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "শৈল, সত্যই দেবু আমায় ছেড়ে গেল?" শৈলজা অপ্রত্যাশিত ভয়ানক প্রশ্নে ভীত হইয়া কাঁদ-কাঁদ ভাবে বলিল, "ষাট্, ও কথা বলছ তুমি? তুমি চল, তোমায় নিতে এসেছি,—দেবু ডাকছে।"

কার্ত্তিক একদৃষ্টে শৈলর মুখের দিকে কিছু-চাহিয়া থাকিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "ডাকছে কিন্তু আমি যাব না! কেমন প্রতিশোধ ছি শৈল? আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি, দেবুও যাচ্ছে,—কেমন, আমায় বেঁধে রাখবে? ার যেটুকু আলো ছিল, তাও আমি করছি, যদি চোখে জল আসে ত চোখ ড়ে ফেলব, তবু দেবুকে আর দেখতে যাব । এইখানেই পড়ে থাকব, আমায় কেউ মরা আর এখান থেকে অন্য কোথাও য়ে যেতে পারবে না। হয় এইখানে মারও শেষ হবে, না হয়, অন্ধকার কারাগার কে একেবারে পূর্ণ আলোর মধ্যে আমি ক্তি পাব!"

একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, বু মাতার জন্য ক্রন্দন করিতেছে; লজা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, তরভাবে বলিল, "আমায় যে শাস্তি হয় ও, কিন্তু চল, একবার ছেলেটার কাছে চল।" কার্ত্তিক তর্জ্জন করিয়া বলিল, "যাও তুমি, মি যাব না।"

শৈলজা উপায়ান্তর না দেখিয়া চলিয়া গেল। কার্ত্তিক সে রাত্রে কিছু আহার করিল না। মায়ের প্রসাদ লইয়া অনেক রাত্রে স্বয়ং শিবচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কার্ত্তিক তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া পিতৃ-চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার প্রদত্ত আহার্য্য হইতে যৎসামান্য গ্রহণ করিয়া বলিল, "বাবা, আমায় দয়া করুন, এই ঘরে আমায় থাকতে দিন।"

"তোমার সুমতি হোক" বলিয়া শিবচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

সপ্তমী গেল, মহা অষ্টমীও চলিয়া গেল, কিন্তু দেবীপ্রসাদের ব্যাধি না কমিয়া বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে। কলিকাতা হইতে যে ডাক্তার আসিয়াছিলেন, তিনি নবমীর দিন সর্ব্বানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, "আশা ত মোটেই দেখছি না। এক অক্সিজেন inhale করানো ছাড়া এখন আর ওষুধও কিছু নেই।" সর্ব্বানন্দ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "তাই বলে আপনি এখন কোথাও যাবেন না।"

ডাক্তারটি ভদ্র; তিনি বলিলেন, "না, না, আমি কোথাও যাচ্ছি না। তবে আপনাদের আগে থেকে জানিয়ে রাখলুম।"

সর্ব্বানন্দ টেলিগ্রাম করিয়া আর একজন ডাক্তার আনাইবার বন্দোবস্ত করিল বটে কিন্তু প্রকৃতই যাহার সর্ব্বনাশ হইয়া যাই-তেছে, সেই কার্ত্তিককে কিছুতেই তাহার পুত্রের নিকট আনিতে পারিল না। শৈলজা বুদ্ধিমতী। সেও তাহার পুত্রের অবস্থা দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিতেছিল; তথাপি পাছে কি করিতে কি হয়, এই জন্যই

শুধু স্বামীকে ব্যস্ত করে নাই। কিন্তু তাহার স্বামীর অমতে পুত্রকে শ্বশুরালয়ে আনিয়া শেষে যে তাহাকে বাঁচাইতে পারিতেছে না, এই দুঃখেই তাহার প্রাণটা ছিঁড়িয়া যাইতেছিল। সপ্তমীর রাত্রে স্বামী যাহা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, শেষে যে তাহাই ঘটিতে চলিল! ইহা দেখিয়া সে অনাহারে অনিদ্রায় দিন রাত্রি যাপন করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল যে হয়তো কার্ত্তিকের কাছে থাকিলে দেবুকে এমনভাবে হারাইতে হইত না। হায়, হায়, এখানে আসিয়া সে এ কি করিল! এই দেবুকে যদি ফিরাইতে না পারে, তাহা হইলে সে কি করিয়া কার্ত্তিকের সম্মুখে গিয়া আবার কোন্ মুখে দাঁড়াইবে?

আজ বিজয়ার সন্ধ্যা। বর্দ্ধিষ্ণু শিবরামপুরের বহু গৃহ হইতে আজ বহু দুর্গা-প্রতিমা বাহির হইয়া গ্রামের রথতলায় সমবেত হইয়াছে। বহু ঢাক-ঢোলের শব্দে সারা গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। রথতলায় প্রকাণ্ড মেলা বসিয়াছে। জমিদারের আজ্ঞায় কোন অনুষ্ঠানেই ত্রুটি হয় নাই। আনন্দময়ীর আগমন ও অবস্থান যেরূপ সাড়ম্বরে হইয়াছিল, তাঁহার বিজয়াও তেমনি আলোকে গন্ধে শব্দে বিরাট হইয়া উঠিয়াছে। দুঃখ করিবার বা পরের দুঃখের বিষয় চিন্তা করিবার অবসর আজ কাহারও নাই।

জমিদার মহাশয় তাঁহার দ্বিতল কক্ষের বাতায়ন হইতে স্বীয় প্রতিমার বিজয়া প্রোসেশনের আলো দেখিতে ছিলেন। পাশে কেবল তাঁহার একজন ভৃত্য। সে-ই মধ্যে মধ্যে তাঁহার অনুজ্ঞা বহন করিয়া লইয়া গিয়া অনুষ্ঠানের ত্রুটি শোধন করিতেছিল। অবশেষে আলোক জনতা ও নানাবিধ বাদ্যের সঙ্গে লইয়া মা যখন চলিয়া গেলেন, কার্ত্তিক সহসা দুই হাত ঊর্দ্ধে উৎক্ষি করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "ওঃ পারিনে, ফিরে আয়, একেবারে সব আ নিয়ে যাস্‌নে! ওরে দেবু, ফিরে আয়!"

ভৃত্য তাহাকে ধরিয়া না ফেলিলে পড়িয়া যাইত। কিন্তু সে যখন কার্ত্তিক ধরিল, তখন কার্ত্তিক প্রায় সংজ্ঞাহীন। তাহাকে ধীরে ধীরে লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিল এবং ডাক্তারকে সং দিতে গেল।

কিন্তু প্রতিমা-বিসর্জ্জনের বাজনা বা উঠার সঙ্গে সঙ্গেই যেন দেবীপ্রসাদে জগৎ-সংসার হইতে বিদায়ের সময় আ উপস্থিত হইল। সর্ব্বানন্দ ছুটিয়া আ কার্ত্তিককে বলিল, "যদি একবার দে চাও ত এখনই এস।"

কার্ত্তিক তখন বিকট হাস্য করিয়া ব "আমি ত বিসর্জ্জন দিয়েছি, আবার ডাকতে এসেছ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "ওরে রাক্ষস, নিজের ছেলে যে!"

কার্ত্তিক কহিল, "অন্ধকারের ছেলে আলো হয়? তুমি ভুল করছ সর্ব্ব আমার আবার ছেলে কোথায়? তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ!"

সর্ব্বানন্দ তাহার সমস্ত বল প্রয়োগ ক কার্ত্তিককে কোনমতে টানিয়া আনিয়া তা পুত্রের মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড় করাইয়া দি

র্ত্তিকের সে সময়ের সে মূর্ত্তি বর্ণনার তীত! শৈলজা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার য়ের নিকটে আসিয়া বলিল, "ওগো তোমারই , তুমি ফিরিয়ে আনো। তোমারই নে,—ওগো শোনো, একবার শোনো!" র্ত্তিক কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া শয্যার উপর ছড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "নিয়ে গেছিস রাক্ষসি! সত্য সত্যই নিয়েছিস! একটুও আমার জন্য রাখলিনে? ওঃ, আলো,—আলো একটু আলো—"

শৈলজা কার্ত্তিকের পায়ের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

ক্রমশ

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

কৃষি-কার্য্যের উপকারিতা

জমিই লক্ষ্মী, এই প্রবাদ-বচনটি আমাদের শে সুপরিচিত। জমিই মাতার ন্যায় আমাদের লালন-পালন করিয়া থাকে। মি হইতে আমাদের খাদ্য উৎপন্ন হয়, আর ই খাদ্য খাইয়া আমরা জীবন ধারণ করি। মি হইতে তুলা উৎপন্ন হয়, সেই তুলা হইতে তা প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে বস্ত্র বয়ন র্ব্বক আমরা আমাদের লজ্জা নিবারণ রি। জমি হইতে উৎপন্ন খড় ইত্যাদি াইয়া গাভী আমাদিগকে দুগ্ধ দেয়, সেই ধ আমাদের একটি অতি-প্রয়োজনীয় পদার্থ; এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াই বোধ হয় মধ্য-যুগে ইউরোপের Physiocrat গণ এবং আমাদের কৃষকগণ, জমিকেই সমস্ত সম্পত্তির মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল।

জমি আমাদের সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের আধার হইলেও, আমরা labourকে (পরিশ্রম) একেবারে ত্যাগ করিতে পারি না। Labour ব্যতীত জমি কর্ষিত হইবে না। জমি কর্ষিত না হইলে, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফসল পাওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং এখনকার মত সভ্য অবস্থায়, পর্য্যাপ্ত ফসল সংগ্রহ করিতে গেলে, জমির যেমন প্রয়োজন, সেই সঙ্গে labourএরও তেমনি প্রয়োজন।

এখনকার যুগে অনেকেই কৃষিবিদ্যাকে একটা science (বিজ্ঞান) বলিতে প্রস্তুত নন। তাঁহাদের মতে manufacture জাতিমাত্রেরই অবলম্বনীয়। Manufactureএর সৃষ্টি না হইলে, জুতা প্রস্তুত হইত না, এবং তাহা হইলে শ্রীচরণের শোভার ব্যাঘাত ঘটিত; নানাপ্রকার পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত না হইলে, সৌখীন-প্রকৃতির মানবগণকে দারুণ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, ইত্যাদি। তাঁহাদের কথায় সায় দিয়া অনেক অর্থবিদ্ পণ্ডিতও বলেন যে, manufacture না থাকিলে, জগতের ব্যবসায়-বাণিজ্য এত বিস্তারিতভাবে চলিত না। ব্যবসায়-বাণিজ্য বিস্তারিতভাবে না চলিলে, জগতের বিভিন্ন দেশবাসীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হইতে পারিত না। সুতরাং manufacture বিহনে জগতে এত বিস্তারিতভাবে সভ্যতার বিকাশ ঘটিত কি না সন্দেহ!

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিগুলি একান্ত সারহীন নয়।

জগতে সভ্যতার বিকাশের জন্য manufactureএর যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। কোন্ অচিন্তনীয় কালে মানব যখন বন-জঙ্গলে ব্যাঘ্রাদি পশুর সহিত উলঙ্গ অবস্থায় ভ্রমণ করিত, তখন manufacture-এর কোন প্রয়োজন ছিল না। মৃগয়ালব্ধ আমমাংস এবং স্বচ্ছন্দ বন-জাত ফলমূলই তাহার রক্ষা-কার্য্য সম্পাদন করিত; পশুচর্ম্ম লজ্জা-নিবারণ করিত। তাহার পর একটু সভ্য হইয়া মানব যখন কৃষি-কার্য্যের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিল, তখন হইতে মানব স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসারী হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল। কৃষি-বিদ্যা অসভ্য মানবকে পশুর অবস্থা হইতে ফিরাইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রদান করিয়াছে। সমাজের সেই প্রথম স্তরে manufacture দেখা দিলেও উহার বিস্তার ঘটে নাই। তাহার পর মানব ক্রমশঃ pasture stage ছাড়াইয়া যখন agriculture stageএ উঠিল, তখন manufacture আসিয়া সমাজে স্পষ্টভাবে দেখা দিল। তখন হইতে চর্ম্মের পরিবর্ত্তে, মানব তুলা হইতে সুতা প্রস্তুত করিয়া কাপড় বয়ন পূর্ব্বক লজ্জা নিবারণ করিতে লাগিল; গৃহস্থালীর জন্য হাঁড়ি-কলসী ইত্যাদিও প্রস্তুত করিতে লাগিল; পুত্রকন্যাগণের জন্য নানা-প্রকার মাটীর খেলনা প্রস্তুত করিতেও শিখিল।

কিন্তু manufacfure কিসের উপর দাঁড়াইয়া আছে,— যে সমস্ত manufacturing জিনিষ আমরা দেখিতে পাই, সে সমুদয় কি কি দ্রব্য হইতে প্রস্তুত হইয়াছে? Manufacture এর উন্নতি agricultu এর উন্নতির সহিত এক সূত্রে আবদ্ধ। ভাল হইলে কাপড়ও ভাল হয়; আবার খারাপ হইলে কাপড়ও খারাপ হয়। মুদ্র দেখা যাইতেছে যে, বয়ন-শিল্পের উ বা অবনতি তুলার চাষের উপর নি করিতেছে। এইরূপে সমুদয় manufacturi artই কৃষির উপর নির্ভর করে।

বিশেষজ্ঞগণ তবে বলিতে পারেন mining art ত agricultureএর উ নির্ভর করে না। Mining art না থাকি আজ কি মানব বিবিধ কার্য্যে এত উ করিতে পারিত? খনিজ পদার্থ না থাকি কোন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ জন্মানে কঠিন হইত। খনিজ পদার্থ আছে বলি আজ জাহাজাদি নির্ম্মিত হইতে পারিয়া কল-কারখানা সম্ভবপর হইয়াছে। রূপা ইত্যাদি বহুমূল্য পদার্থগুলি medi of exchange রূপে জগতে বিভিন্ন দে বাণিজ্য কার্য্যের সুবিধা করিয়া দিয়াছে লৌহের উপকারিতা এক মুখে বলিয়া করা যায় না। Locke সত্যই বলিয়াছে যে, "লৌহের আবিষ্কারক সমুদয় শিল্প-শা পিতা।"

খনিজ পদার্থের ন্যায় Animal pr ducts: মানবগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনী পদার্থ। আদিম অবস্থায় মানবগণ প্রাণী-জ হইতে খাদ্য এবং বস্ত্র দুইই আহরণ করিত এখন সভ্য হইয়াও খাদ্য এবং বস্ত্র-বয়নে উপাদানের জন্য মানবকে প্রাণী-জগতে মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। ইউরোপে সমুদয় জাতিই মাংসাশী। মাংস না হইলে

হাদের ভোজন-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না। আবার বস্ত্র-বয়নের জন্য, পশম শম ও চামড়া, জগতের সমুদয় সভ্য তিরই প্রয়োজন। সেই জন্যই প্রাণী ৎ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যগুলিও বাণিজ্য পণ্য-পে ব্যবহৃত হয়।

আমরা প্রাণী-জগৎ এবং বাণিজ্য দার্থের উপর নির্ভর করি বলিয়া, কৃষি-র্য্যের শ্রেষ্ঠতা লোপ পাইতে পারে না। ষি না থাকিলে কোন প্রাণীই বাঁচিতে ারিত না। তাহা হইলে চমরী, ভেড়া ত্যাদি পশুগণ হইতে পশম সংগ্রহ কি রিয়া হইত! কৃষি-উৎপন্ন খাদ্য না াইলে গরু-বাছুর জীবন ধারণ করিতে ারিত না, তাহা হইলে দুগ্ধ পাওয়া কি ম্ভবপর হইত! আবার মানবগণ এবং বগণ যদি খাদ্যাভাবে প্রাণধারণ করিতেই ক্ষম হইত, তাহা হইলে খনিজ পদার্থ কল কোন্ কার্য্যে লাগিত? সুতরাং মরা যেরূপেই দেখি না কেন, ইহা শ বুঝা যাইতেছে যে, কৃষিই আমাদের বন-ধারণের একমাত্র মূল সহায়, তার অন্যতম যষ্টি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের র্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্য।

ভিন্ন ভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন কার বিশেষত্ব আছে। ফুল আমাদের বতা-পূজার প্রধান উপকরণ, সৌখীন-াকদের ভোগের জিনিষ। তুলা হইতে তা প্রস্তুত হয়, সেই সুতা হইতে আমা-র কাপড় হয়। বাঁশ ঝাড় হইলে বাঁশ াটিয়া একদিকে যেমন লাঠি, বর্শা ইত্যাদি াক-সংহারকারী অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হয়, অপর দিকে সেইরূপ গৃহাদি-নির্ম্মাণকালে নানা-রূপে সাহায্য প্রদান করে। গম, ধান, বজ্‌রা ইত্যাদি শস্যগুলি খাইয়া আমরা জীবন-ধারণ করি। আলু, এরোরুট, চেসনট ইত্যাদিও আমাদের বিশেষ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। দুর্ভিক্ষে পূর্ব্বোক্ত ফসলগুলি না জন্মাইলে আলু, এরোরুট, চেসনট ইত্যাদি খাইয়াও জীবনধারণ করিতে পারা যায়। গরিব আইরিশগণ ঊনবিংশ শতাব্দী অবধি গোধূম চোখে দেখিতে পাইত না, তাহারা আলু খাইয়াই জীবন ধারণ করিত। শর্করা হইতে মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। Resin-এর সহিত spirit মিশ্রিত করিয়া বার্নিশ তৈয়ারি হয়। উদ্ভিদজাত ঘৃত ও তৈলেও আমাদের অভাব দূর হয়। নারিকেল, সরিষা, তিল, বাদাম, আণ্ডুর ইত্যাদি হইতে নানাপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। অল্‌মোরা, চীন, এবং কানারায় ঘৃত-বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত বৃক্ষ হইতে বিস্তর ঘৃত সংগৃহীত হয়। তত্রত্য অধিবাসীগণ উদ্ভিদ-জাত নীল ইত্যাদি হইতে নানাপ্রকার রং তৈয়ারী করে। আমাদের কবিরাজী শাস্ত্রে কতকগুলি গাছের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি হইতে acid উৎপন্ন হয়।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, কৃষি-জাত দ্রব্য দ্বারা আমাদের যে শুধু জীবিকা-নির্ব্বাহই হয় তাহা নহে; কৃষি-জাত দ্রব্য হইতে আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য এমন কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যেগুলি না হইলে আমাদের বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। আবার কৃষি-জাত অনেক দ্রব্য দ্বারা প্রাণী-জগৎ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের

অভাবও দূর হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দ্রব্য একই দেশে জন্মায় না। এক এক প্রকার দ্রব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মাটী ও বিভিন্ন জল-বায়ুর প্রয়োজন। আমাদের বাঙ্গালার মাটীতে লবণের অংশ যথেষ্ট থাকায় এখানে নারিকেল ইত্যাদি বৃক্ষ বেশ পর্য্যাপ্ত জন্মায়। ভারতের উত্তরে মাটীতে লবণের অল্পতা হেতু, উক্ত অংশে অবস্থিত প্রদেশগুলিতে নারিকেল বৃক্ষ জন্মায় না। আপেল, আঙুর শীত-প্রধান দেশেই উৎপন্ন হয়, এইজন্য উক্ত ফসলগুলি আমাদের বাঙ্গালা দেশে দুষ্প্রাপ্য। একই দেশে সকল প্রকার ফসল না জন্মাইলেও সকল প্রকার ফসল পাইতে সকলেরই আগ্রহ হয়, এই জন্যই manufactured articlesএর ন্যায়, কৃষি-জাত দ্রব্যগুলিও বাণিজ্য-পণ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। কোন্ কোন্ দেশে কত পরিমাণে কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

গম ঃ—* রুশিয়া ৯ কোটী, ভারতবর্ষ ৪ কোটী ৮০ লক্ষ, কানাডা ৩ কোটী ৪০ লক্ষ, হঙ্গেরী ২ কোটী ৩০ লক্ষ, ইটালী ২১ কোটী, আরজেন্‌টাইন্ ২১ কোটী। ইক্ষুরসজাত শর্করা ঃ—ভারতবর্ষ ২৩ লক্ষ ৯০ হাজার টন, কিউবা ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টন, যাভা ১৩ লক্ষ ৯৫ হাজার, আমেরিকা ৩ লক্ষ ২৪ হাজার। বীট হইতে উৎপন্ন শর্করা ঃ—রুশিয়া ২১ লক্ষ টন, জর্ম্মানি ১৪ লক্ষ ৫৭ হাজার, অষ্ট্রীয়া-হঙ্গেরী ১ লক্ষ ৫৪ হাজার, আমেরিকা ৫ লক্ষ ৪১ হাজার, ফ্রান্স ৫ লক্ষ ... হাজার, হল্যাণ্ড ২ লক্ষ ৫১ হাজার, বে... জিয়ম ২ লক্ষ ৪০ হাজার। চাল ঃ... ভারতবর্ষ ৪ হাজার কোটী ৪৫ লক্ষ ... চীন আড়াই হাজার কোটী ২৪ লক্ষ ... জাপান ৫০০ কোটী ২৫ লক্ষ মণ। ... (wine)—ফ্রান্স ১০০ কোটী গ্যালন, ইটা... ৯৫ কোটী গ্যালন, স্পেন ৩৭ কোটী গ্যাল... অলজেরিয়া ২০ কোটী গ্যালন ×, রুশি... ১০ কোটী গ্যালন্স। চা ঃ—ভারতবর্ষ ... কোটী পাউণ্ড, চীন ২১ কোটী পাউণ্ড ... সিংহল ১৯ কোটী পাউণ্ড, জাপান ৫ কো... ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। তামাক ঃ—আমেরি... ১১১ কোটী ৩৪ লক্ষ পাউণ্ড, ভারত... ৪৫ কোটী পাউণ্ড, রুশিয়া ২০ কোটী পাউ... অষ্ট্রীয়া-হঙ্গেরী ১৮ কোটী ৪০ লক্ষ পাউ... জাপান ৯ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড, হলাণ্ড... ইষ্ট ইণ্ডিজ্ ১২ কোটী ৮৬ ... পাউণ্ড। তুলা ঃ—আমেরিকা ১১১ কো... ৩৪ লক্ষ বেল (bale)‡ ভারতবর্ষ ... লক্ষ ৪২ হাজার বেল, রুশিয়া ২০ ... বেল, মিশর ১৫ লক্ষ।

কৃষি-জাত দ্রব্য বাণিজ্য-পণ্যরূপে বিভি... দেশে নীত হইয়া বিভিন্ন আকার ধা... করে। ফল-মূল ইত্যাদি সাধারণতঃ ভো... রূপেই এক দেশ হইতে অন্য দেশে নী... হয়। ধান, গম ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্যরূ... বিভিন্ন দেশে নীত হইলেও, স্থান-বিশে... উহা রূপান্তরিত হইয়া যায়। কতকগু... পদার্থ Raw-material হিসাবে এক ...

* অঙ্কগুলি grs হিসাবে। ×আলজেরিয়া ফ্রান্সের উপনিবেশ।
† শুধু রপ্তানি হয়। ‡ ১ বেল=৫০০ পাউণ্ড।

...তে অন্য দেশে নীত হয়। কতকগুলি ...ংভাবে বা পরোক্ষভাবে ঔষধরূপে ...বহৃত হইবার জন্যই দেশ-বিদেশে নীত ...।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, কৃষিকার্য্য ...নবের উন্নতির মূল হইলেও, এখন এই ...ত্যতার দিনে জগতে উন্নতিশীল জাতিদের ...হিত ঐক্য রাখিতে গেলে কৃষিকার্য্য ...ষ্ঠ, না, manufacture শ্রেষ্ঠ—এই প্রশ্নের ...মাংসা করা বড় কঠিন। ইউরোপীয় ...ভ্যতায় মুগ্ধ অনেকেই হয়ত বলিবেন, ইউ-...রোপের সভ্যতা যখন manufactureএর ...পর প্রতিষ্ঠিত, তখন manufactureই, ...ভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু তাহা কি ...তা? ব্যবসায়ের তুলনায় আমেরিকা ইউরোপের ...মকক্ষ। কিন্তু আমেরিকাকে এখনও ...আমরা agricultural country বলিব। ...র্ম্মানি, অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী প্রভৃতি মধ্য-ইউরোপের ...দেশগুলি এখন কৃষি-কার্য্যের দিকে যথেষ্ট ...নজর দিতেছে। Manufacture এর উপাসক ...ইংলণ্ডও এখন শস্য-উৎপাদনের দিকে মনো-...নিবেশ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ড ...অন্যান্য বৎসরের দ্বিগুণ শস্য উৎপাদন ...করিয়াছে। আর এক কথা, বিশ্বব্যাপী ...Blockade হইলে, দেশে যদি পর্য্যাপ্ত শস্য ...উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে ত ক্ষমতা ...সত্ত্বেও হার মানিতে হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধে ...এই কথা সুন্দরভাবে প্রমাণিত হইতেছে। ...সুতরাং যে দেশে দেশ-ভরা নদী এবং সীমানায় ...সীমানায় অনন্ত সমুদ্র লাফাইয়া ছুটিয়া ...চলিয়াছে, যাহার পর্ব্বতরাজি হইতে বৎসরে ...বৎসরে ভরা-ভাদ্রের ভীষণ বন্যা ছুটিয়া বাহির হয়, সে দেশ যে কৃষি-প্রধান দেশ এবং সে দেশের অধিবাসীদের কৃষিই যে বিধাতার নির্দ্দিষ্ট জীবিকা, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইংলণ্ড শিল্প-প্রধান দেশ, আমাদের আসমুদ্র হিমাচল পরিবেষ্টিত ভারতবর্ষও কৃষি-প্রধান দেশ! ইংলণ্ডের আমদানি দ্রব্যের শতকরা ৯৮।০ অংশ কাঁচা মাল বা Raw material আর আমাদের শতকরা ৯৫।৯৬ ভাগ পাকা মাল বা manufactured articles.

ইহার জন্য দুঃখ করিবার বা ভাবিবার কিছুই নাই। কৃষি কার্য্য আমাদের বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট জীবিকা বলিয়াই যে আমরা তাঁহার ত্যাজ্য-পুত্র, তাহাও নয়। কৃষির উপরই শিল্প-চাতুর্য্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত। কৃষির উন্নতি-অবনতির সহিত উহাদের ভাগ্য-সূত্র গভীররূপে সংলগ্ন। সুতরাং কৃষি ছাড়া বা কৃষিকে অবহেলা করিয়া উহাদের অগ্রসর হওয়া কঠিন। বড় বড় জাহাজ তৈয়ারী হইয়াছে। এক একখানা জাহাজ হাজার টন মাল বোঝাই লইতে পারে। সে কালে যখন জাহাজ ছোট ছিল, তাহাদের মাল বোঝাই লইবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল, তখন নানাপ্রকার শিল্প এবং বহুমূল্য ধাতু দ্রব্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। কাজেই কৃষিজাত দ্রব্যেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্যদ্রব্য রূপে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইতেছে। দেশ কৃষি-প্রধান হইলে তাহার isolation হয়, এ ধূয়া এখন আর টিঁকিতে পারে না। ইংলণ্ডকে

কাপড় বুনিবার তুলা লইবার জন্য আমাদের এই ভারতবর্ষে আসিতেই হইবে। জর্ম্মানিকে পাট লইবার জন্য এখানে আসিতে হইবে। ইউরোপের সমস্ত জাতিকেই মদ লইবার জন্য ফ্রান্স বা ইটালীতে যাইতে হইবেই। চিনি লইতে গেলে জাভা বা ভারতবর্ষকে বাদ দিলে চলিবে না। সেকাল ও একালে ইহাই প্রভেদ। সেকালে প্রত্যেক দেশ self-sufficient ছিল। বাহিরের পণ্য না আসিলে তাহার বিশেষ কোন ক্ষতি হইত না। সভ্যতার বিকাশের সহিত division of labour বা শ্রম-বিভাগ যেমন সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম হইতেছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মানব-জাতিও ক্রমশ self-sufficiency হারাইয়া ফেলিতেছে, কাজেই আমাদের দেশ যদি কৃষি-প্রধান হয় এবং কৃষিই যদি আমাদের জীবিকা হয়, তাহাতে আমরা সভ্যতায় অন্য-জাতির পশ্চাতে পড়িয়া রহিব এরূপ ভয় করিবার কারণ নাই। Steam navigation-এ এক দেশ হইতে অন্য-দেশের দূরতা সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃহৎ অর্ণবপোতগুলি এক একটা জগৎ বিশেষ; তাহাদের মাল ধারণ করিবার ক্ষমতা অসীম!

তবে এইটুকুও বলিবার আছে যে, আমরা কৃষি-প্রধান দেশে থাকি এবং কৃষিই আমাদের জীবিকা বলিয়া দুইটা হেলে গরু এবং একখানা লাঙ্গল কিনিয়া ক্ষেতে দৌড়িলেই যে আমাদের দুঃখ দূর হইবে, তাহাও নয়; আমি তাহা করিতে বলিতেছি না। আবার ইহাও কেহ মনে ভাবিবেন না যে, আমাদের মত গরীব দেশে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড বা আমেরিকার ন্যায় scientific agriculture করিবার উপদেশ দিতেছি। উক্ত দেশগুলির ন্যায় extensive agriculture এখানে একেবারে অসম্ভব। প্রথমতঃ আমাদের ঐরূপ চাষ করিবার জমির অভাব। বাঙ্গালার জমিদারগণ বিস্তৃত ভূতাগ-সমূহের অধিপতি হইলেও উহা নানা প্রভাবে বিলি-বন্দোবস্ত থাকায়, বিলি জমিগুলি সংগ্রহ করা তাঁহাদের পক্ষে যেমন এক পক্ষে কষ্টসাধ্য সেইরূপ অন্য পক্ষে ধর্ম্মত অন্যায়। গরীব প্রজা যে জমিতে পুরুষানুক্রমে কায করিয়া জমি রক্ষা করিয়া আসিতেছে, এখন হঠাৎ খেয়ালের মাথায় তাহার হাত হইতে সে জমি কাড়িয়া লওয়াও মহাপাপ। বাঙ্গালার বাহিরে যেখানে Permenent settlement নাই, সেখানকার প্রজাদের জমির পরিমাণ খুব কম। সমস্ত কৃষককে রক্ষা করিবার জন্য সরকার একজনকে পাঁচ প্রকারের বেশী জমি দেন না। দ্বিতীয় অভাব, অর্থ। খেয়ালের মাথায়, দেশের কায করিবার জন্য হয়ত দুই-একজন ঝোঁকে পড়িয়া দুই-চারি হাজার টাকা বা চারি লাখ টাকা বাহির করিতে পারেন, স্বীকার করি; কিন্তু কোন কায করিতে গেলেই প্রথমে নানা প্রকার experiment-এর প্রয়োজন। Experiment করিতে গেলেই নানা প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা তাহা করিতে স্বীকার করিবেন না, জানি। তাঁহারা গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি চাহিয়া বসেন।

এই সমস্ত কারণেই আমাদের কৃষির দুরবস্থা ঘটিয়াছে। আমরা manufacture

করিতে পারিতেছি বলিয়াই যে, অন্যান্য কারণ অপেক্ষা পিছাইয়া পড়িতেছি তাহা নয়। আমরা পিছাইয়া পড়িতেছি তাহার প্রধান কারণ, আমরা কৃষি-জীবি হইয়াও আমাদের ব্যবসায় আমরা ভালরূপে চালাইতে পারিতেছি না। সমস্ত নৈসর্গিক সুবিধা সত্ত্বেও আমরা আমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলা করিতেছি। চাষাকে চাষা বলিয়া ঘৃণা করি, চাষ করাকে ছোটলোকের কাজ বলিয়া মনে করি। খান-কয়েক ইংরাজী বইয়ের পাতা উল্টাইয়া আমাদের মেজাজ সাহেবি হইয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া বহুব্যয়-সাপেক্ষ সহর-বাসী হই; পল্লী-বাসীদের ঘৃণার চক্ষে দেখি; দেশ পল্লীগ্রামে হইলে ভদ্রসমাজে উহার নাম করিতেও কুণ্ঠা বোধ করি। পল্লী-সমাজস্থিত কোন কুটুম্ব আসিলে, চাকরের ঘরে তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করি। তাই বলিতেছিলাম, দোষ আমাদের,—আর-কাহারও নয়। সেই পুরাকালে ভেরী নিনাদ করিতে করিতে আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা আপনাদিগকে "আর্য্য" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ভট্ট মোক্ষমূলর আর্য্য শব্দের অর্থ "চাষা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্য আমরা এদেশবাসী অনেকে ভট্ট-মহাশয়ের উপর খড়্গ-হস্ত। আমি কিন্তু ঐ অর্থ, সত্য না হইলেও, গ্রহণ করিতে রাজী। যখন সমস্ত জগৎ সূচিভেদ্য গাঢ় অজ্ঞানের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, জগতের সমুদয় লোকই যখন আম-মাংসাশী, উলঙ্গ, সেই অচিন্তনীয় কালেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সভ্য হইয়া ক্ষেত্র-কর্ষণ পূর্ব্বক শস্য উৎপাদন করিতে শিখিয়াছিলেন। তাহাতে লজ্জিত হইবার কারণ নাই; ইহা আমাদের গৌরবের কথা, সম্মানের কথা, বিশেষ পৌরুষের কথা। সংস্কৃতে বা অন্য প্রাচীন সাহিত্যেও ত এমন অনেক কথা পাই যাহা সামান্য গৃহস্থের কোন-না কোন কার্য্যভার মাত্র নির্দ্দেশ করে। যে দোহন করে, সে-ই দুহিতা। সেই পবিত্র দিনে হিন্দুর ঘরে ঘরে লক্ষ্মীরূপা গাভীগণ বিরাজ করিত। অনূঢ়া কন্যাগণের উপর গাভী-দোহন-ভার দেওয়া হইত; তাই তাঁহারা দুহিতা নামে অভিহিতা হইতেন। ক্রমশ এই দুহিতা কথা চলিত অর্থে কন্যারূপে ব্যবহৃত হইয়া রাজার কন্যাকেও বুঝাইয়া থাকে। কোন রাজকন্যাকে রাজ-দুহিতা বলা হইয়াছে বলিয়া তিনি ক্ষুব্ধা হইয়াছেন, এমন কথা ত শুনা যায় না।

এইরূপে ইউরোপে অবিবাহিতা কন্যাগণের উপর বস্ত্র-বয়ন-ভার ছিল বলিয়া তাহারা spinsters নামে অভিহিত হইত। সুতরাং আর্য্য শব্দের অর্থ ভট্ট মোক্ষমূলর-নির্দ্দিষ্ট "চাষা"ই যদি হয়, তবে তাহাতে আমরা ক্ষুব্ধ হইব কেন?

সুতরাং কৃষি-কার্য্য যে শিল্প বা ব্যবসায়-বাণিজ্য অপেক্ষা হীন নয়, বরং ব্যবসায়-বাণিজ্য বা শিল্পই কৃষির মুখাপেক্ষী, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম। আর ইহাও দেখা গেল যে, কৃষি-বিদ্যা হইতে যে isolation আসে, এরূপ আশঙ্কা করিবারও কোন বিশেষ কারণ নাই। কৃষি-ব্যবসায় হীন নয়, ভালরূপে চালাইতে পারিলে উহাও অন্যান্য ব্যবসায়ের সমান লাভজনক দাঁড়াইতে পারে। ভারতবর্ষ

যে কৃষিপ্রধান দেশ তাহাতেও কাহারও সন্দেহ নাই। সুতরাং এখন আমাদের দেশোপযোগী কৃষি-চর্চ্চাই আমাদের উন্নতির উপায়। আমেরিকার কৃষি বা জর্ম্মানির কৃষি-শিল্প এখানে চলিবে না। এখানকার উপযোগী করিয়া, আমাদের সামর্থ্যে কুলায় এমন-ভাবে কৃষিকার্য্য চালানোই আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র।

য়্যাণ্টি-টক্‌সিন্

(Anti-toxin)

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যে কয়টি কন্যা জন্মিয়াছে, তাহাদের মধ্যে bacteriology (ব্যাকটেরিয়োলজী) বা বীজাণুবিদ্যা সকলের ছোট। বয়স দেখিতে গেলে ইনি ৩০।৩৫ বৎসরের বেশী বড় হইবেন না। কিন্তু এই অল্প বয়সেই ইনি যেরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে ইহাঁর হাজার হাজার বৎসরের প্রাচীন ভগিনীগণের পক্ষে বিস্মিত ও মুগ্ধ নেত্রে ইহাঁর মুখের পানে চাহিয়া থাকা ভিন্ন আর উপায় নাই! বীজাণুবিদ্যা বা bacteriology-র শেষ কীর্ত্তি anti-toxin (য়্যাণ্টি-টক্‌সিন্) এর আবিষ্কার। চিকিৎসা জগতে বর্ত্তমান সময়ে এত বড় আবিষ্কার বুঝি আর দ্বিতীয়টি হয় নাই। সেদিন যখন মহামতি পাস্তর (pasteur) সর্ব্বজন-সমক্ষে প্রমাণ করিলেন যে পচন ব্যাপারটা (putrefaction) কতকগুলি উদ্ভিদাণুর কায ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেদিন কে মনে করিয়াছিল—পাস্তরের এই আবিষ্কারের উপরই বীজাণুবিদ্যার (bacteriology) প্রস্তর প্রোথিত হইল! এই ঘটনার পর তিনি যখন আরও প্রমাণ করিলেন যে পশুদের কতকগুলি রোগের মূল কারণ এক-এক প্রকার বীজাণু ভিন্ন আর কিছুই নয়, তখন এই বীজাণুদের বিষয় জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের দলে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। কয়েক বৎসরের উদ্যোগে পণ্ডিতগণ এই বীজাণুদের পৃথক করিতে পারিলেন এবং তাহাদের চাষ-আবাদ (culture) করিতেও সমর্থ হইলেন। ইহার পর বীজাণুদের জীবন-যাত্রার ধরণ-ধারণ, বংশ-বিস্তারের রকম-সকম এবং তাহাদের বিশেষত্ব প্রভৃতি বুঝিতে আর বিশেষ বিলম্ব ঘটিল না।

ব্যাকটেরিয়া বা বীজাণুদের সহিত এতখানি পরিচয় হওয়ার পর স্পষ্ট দেখা গেল, মানুষের যে-সব সংক্রামক রোগ হয়, তাহাদের কতকগুলির এক-এক প্রকার বিশেষ বিশেষ ব্যাকটেরিয়া বা বীজাণু আছে। ইহার পর প্রমাণ হইল যে, রোগের কারণ ঠিক এই বীজাণু নয়—বীজাণুদের শরীর হইতে যে এক প্রকার বিষ (toxin) নির্গত হয়,

জীবদেহে তাহাই রোগোৎপত্তির কারণ। এই বিষকে বীজাণুবাদীরা (bacteriologists) টক্‌সিন্ (toxin) নাম দিয়াছেন।

ইহার পর bacteriologist (বীজাণুবিদ্)দের সকল চেষ্টা "i nmunity—" বা রোগ-প্রতিরোধ-শক্তির আলোচনায় নিযুক্ত হয়। Immunity বিষয়টা অত্যন্ত জটিল এবং একান্ত দুর্জ্ঞেয়। Bacteriologistদের চেষ্টায় ও উদ্যমে immunity-র কতক রহস্য প্রকাশ হইতে পারিয়াছে। বসন্ত, হাম প্রভৃতি সংক্রামক রোগ যাহার একবার হয়, জীবনে আর দ্বিতীয়বার প্রায় তাহার সে রোগ হইতে দেখা যায় না, হইলেও খুব মৃদু আকারেই হইতে দেখা যায়। ইহা অবশ্য খুব প্রাচীনকাল হইতেই লোকে জানে ত, কিন্তু ইহা হইতে যে একটা কাজের বিষয় শিক্ষা করা যাইতে পারে, সে কথা ইহার পূর্ব্বে কাহারও মনে উদয় হয় নাই। বীজাণুবাদীরাই সর্ব্বপ্রথমে এ সত্যটি কাযে লাগাইবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন, কৃত্রিম উপায়ে কোন ব্যক্তির শরীরে রোগ-প্রতিরোধ-শক্তি (immunity) জন্মাইয়া দেওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। ইহার জন্য তাঁহাদিগকে বিবিধ পরীক্ষা এবং তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, শরীরের মধ্যে এমন কতকগুলি পদার্থের সৃষ্টি করা যাইতে পারে, যাহা toxin (টক্‌সিন্) এর বিরোধী, সুধু বিরোধী নয়, টক্‌সিন্‌কে বিনাশ করিতে পারে। এই জন্য তাঁহারা এই সকল পদার্থকে anti-toxin (য়্যাণ্টি-টক্‌সিন্) নাম দিলেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল, toxin (টক্‌সিন্) হইতে ব্যাকটেরিয়াদের ছাঁকিয়া বাদ দিয়া যদি সেই toxin কাহারও শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহাতেও শরীরের মধ্যে য়্যাণ্টি-টক্‌সিনের উদ্ভব হয়। সুতরাং য়্যাণ্টি-টক্‌সিনের উৎপত্তির জন্য যে ব্যাকটেরিয়া বা বীজাণুকে দেহের মধ্যে প্রবেশ করাইতেই হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই। ব্যাকটেরিয়া কর্ত্তৃক উৎপন্ন toxin (বিষ) প্রবেশ করাইলেই চলিতে পারে। রোগ-বীজাণুকে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করানো অনেক সময় নিরাপদ নয়,—কেন না, দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহারা অনবরত সংখ্যা-বৃদ্ধি করিতে থাকে, তখন আর ইহাদের উপর আমাদের কোন হাত থাকে না। কিন্তু toxinএর (টক্‌সিন্) বেলায় ঠিক সে কথা বলা যায় না। অন্যান্য বিষের মত ইহার মাপ করা চলে—ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুসারে ইহার মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সুতরাং ইহা দেখা যাইতেছে কোন জীব দেহে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ toxin (টক্‌সিন্) প্রবেশ করাইয়া দিলে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ anti-toxin (য়্যাণ্টি-টক্‌সিন্) এরও উদ্ভব হয়। এই সামান্য পরিমাণ toxin প্রবেশ করায় কতকগুলি দোষ দেখা দিতে পারে বটে, কিন্তু তাহারা এত মৃদু যে কখনও মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায় না। ইহার পর উক্ত জীব-দেহে যদি অধিক মাত্রায় toxin প্রবেশ করানো হয়, তাহাতেও সে জীবের কোন ক্ষতি হয় না—কেন না, পূর্ব্বে যে toxin প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তাহার জন্য জীবটির দেহে যে anti-toxin উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই য়্যাণ্টি-

টক্‌সিনের দরুণ কতকটা toxin নষ্ট হইল।

য়্যান্টি-টক্‌সিন্ (anti-toxin)এর ইতিহাসে ইহাকে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় আবিষ্কার মনে করিতে হইবে। কেননা ইহা হইতে জানা গেল, একটি প্রাণীর শরীরে অল্পমাত্রায় প্রয়োগ আরম্ভ করিয়া যদি ক্রমশঃ toxinএর মাত্রা বাড়ানো যায়, তাহাতে প্রাণীটির কোনই অনিষ্ট ঘটে না, সে অবাধে তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হয়। সহ্য করিতে পারে তাহার কারণ এই যে, যেমন একদিকে toxinএর মাত্রা বাড়িতে থাকে, সেই সঙ্গে রক্তের মধ্যে anti-toxin এর মাত্রাও বাড়িয়া যায়। এইরূপ কয়েকবার করায় জন্তুটির রক্তে anti-toxin এর পরিমাণ এত বৃদ্ধি পায় যে, তখন আসল রোগটির আক্রমণেও তাহার কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে না। এতখানি জ্ঞান জন্মাইবার পর পণ্ডিতদের মনে কল্পনার উদয় হইল যে, কোন-একটা বৃহত্তর পশুর রক্তে যথেষ্ট পরিমাণ য়্যান্টি-টক্‌সিন্ উৎপন্ন করিয়া, সেই রক্তের কতকটা যদি কোন ক্ষুদ্রতর পশুর শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্র পশুটির পক্ষে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। পরীক্ষা দ্বারা পণ্ডিতদের এই অনুমান সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে।

এতদিন পর্য্যন্ত কেবল পশুদের উপরই পরীক্ষা চলিতেছিল। এখন হইতে মানুষের উপরও পরীক্ষা করিবার মত অবস্থা উপস্থিত হইল। কোন পশুর রক্তে anti-toxin উৎপন্ন করিয়া, সেই পশুর রক্ত হইতে serum (সেরাম্) প্রস্তুত করিয়া লইয়া মানুষের শরীরে প্রয়োগ করিলে অদ্ভুত ফল পাওয়া যায়, ইহা বোধ করি সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। ডিপ্‌থেরিয়া (diphtheria) নামক রোগে এই serum যে কি আশ্চর্য্য ফল দেয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই রোগে প্রথম মাত্রা anti-toxin serum (য়্যান্টি-টক্‌সিন্ সেরাম্) প্রয়োগে কতটা কি ফল হইবে, তাহা যে অঙ্ক কষিয়া বলা না যায় এমনও নয়। ডিপ্‌থেরিয়া (diphtheria) রোগে anti-toxin serum (য়্যান্টি-টক্‌সিন্ সেরাম) প্রয়োগে যতটা ফল হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য সংক্রামক রোগে আজ পর্য্যন্ত তেমন ফল পাইতে দেখা যায় নাই। শরীরের মধ্যে toxin (টক্‌সিন্) প্রবেশ করাইয়া দিলে, কি প্রণালীতে anti-toxin (য়্যান্টি-টক্‌সিন্)এর উদ্ভব হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না—বিষয়টা এখনও যথেষ্ট স্পষ্ট হয় নাই—ইহার ব্যাপার অনেকটা আন্দাজী। এ বিষয়ে মতভেদও যথেষ্ট আছে; তা যতই মতভেদ থাক্ ব্যাক্‌টেরিয়া বা রোগ-রীজাণু প্রবেশ না করাইয়া শুধু টক্‌সিন্ (toxin) প্রবেশ করাইয়াও যে anti-toxin উৎপন্ন হইতে পারে, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কোন মত-বিরোধ নাই। Anti-toxin (য়্যান্টি-টক্‌সিন্) থাকে রক্তের সেরামের (serum) মধ্যে। সেরাম (serum)এর যে রোগ-প্রতিরোধ-শক্তি আছে, এ কথা প্রাচীন কালেও লোকের অবিদিত ছিল না। রোগ-বীজ শরীরে প্রবেশ করিয়া, সকলেরই যে রোগ উৎপন্ন করিতে

পারে না, তাহার কারণ রক্ত বা সেরামের (serum) মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই anti-toxin (য়্যান্টি-টক্‌সিন্) মজুত্ থাকে বলিয়া।

ডিপ্‌থেরিয়া রোগের anti-toxin (য়্যান্টি-টক্‌সিন্) ঘোড়ার রক্ত হইতে সংগ্রহ করা হয়। কি করিয়া সংগ্রহ হয়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। একটা খুব বলিষ্ঠ ঘোড়া বাছিয়া লইতে হয়; তাহার ত্বকের এক স্থানে কতকটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ toxin (টক্‌সিন্) প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। ঘোড়াটার একটু জ্বর হয়, এবং তাহার চামড়ার যে স্থানটিকে বিদ্ধ করা হয়, সেখানে একটু প্রদাহ হয়, ইহার বেশী আর বড় একটা কিছু হইতে দেখা যায় না। ইহার কয়েক দিন পরে, আরও একটু বেশী মাত্রায় toxin (টক্‌সিন্) প্রয়োগ করা হয়—এইরূপে ক্রমশ টক্‌সিন্ (toxin) এর মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হয়। ঘোড়াটার রক্তের মধ্যে anti-toxin (য়্যান্টি-টক্‌সিন্) এর উদ্ভব হয় এবং টক্‌সিনের মাত্রা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে য়্যান্টি-টক্‌সিন্ (anti-toxin) এর পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, শেষে এক সময় ইহার পরিমাণ এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, তাহার অধিক anti-toxin (য়্যান্টি-টক্‌সিন্) সৃষ্টি করা ঘোড়াটার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন ঘোড়াটার একটা শিরা কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া লইয়া, তাহা হইতে serum (সেরাম্) পৃথক করিলেই anti-toxin serum (য়্যান্টি-টক্‌সিন্ সেরাম) প্রস্তুত হইল। এই serum-(সেরাম)-কে কাঁচের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশিতে পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। এক একটি শিশিতে এতখানি সেরাম থাকে, যাহা একবার প্রয়োগের পক্ষে পর্য্যাপ্ত।

য়্যান্টি-টক্‌সিনের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের মনে এককালে খুবই কুসংস্কার ছিল—এখনও যে তাহা নাই, এমন নয়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে কুসংস্কারটি ক্রমশ লোকের মন হইতে দূর হইয়া যাইতেছে। Anti-toxin (য়্যান্টি-টক্‌সিন্) এর প্রয়োগে কতকগুলা উপসর্গ যে না ঘটিতে পারে, এমন নয়। কিন্তু তাহার জন্য ভয় করিবার কোন কারণ নাই। য়্যান্টি-টকসিন্-প্রয়োগের দ্বিতীয় সপ্তাহে কাহারও কাহারও গায়ে এক প্রকার লাল লাল দাগ বাহির হইতে দেখা যায়। কাহারও বেলায় বা অন্যবিধ উপসর্গও দেখা দেয়। এ সকল তত মারাত্মক ব্যাপার নয়—ইহার জন্য ভীত হইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

ডিপ্‌থেরিয়া (diphtheria) রোগে য়্যান্টি-টক্‌সিন্ যে অমোঘ ঔষধ, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা দ্বারা ফল পাইতে হইলে রোগ সন্দেহ হইবামাত্রই য়্যান্টি-টক্‌সিন্ (anti-toxin) প্রয়োগ করা আবশ্যক—এ বিষয়ে যতই বিলম্ব ঘটিবে, ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ততই সুদূরবর্ত্তী হইবে। পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে, রোগের প্রথম দিন প্রয়োগ করিতে পারিলে, শতকরা ৪·৭ জনের মৃত্যু সম্ভব; আর রোগের পঞ্চম দিনে প্রয়োগ করিলে শতকরা ৩৫·৩ জনের মৃত্যু হইতে দেখা যায়। অতএব ডিপথেরিয়া রোগ সন্দেহ হইবা মাত্রই anti-toxin প্রয়োগ করা আবশ্যক; এ বিষয়ে কাল

বিলম্ব করিলে শেষে মনস্তাপ পাইতে হয়।

ডিপথেরিয়া রোগের য়্যান্টি-টক্‌সিন্ যে কেবল এই রোগের ঔষধ, তাহা নহে—ইহার প্রতিষেধকও বটে। যদি কেহ ডিপথেরিয়া রোগীর সংস্পর্শে আসে, তাহার পক্ষে প্রতিষেধক-হিসাবে এই য়্যান্টি-টক্‌সিন্ ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বসন্ত রোগের টীকা দিলে যেমন অনেক দিন বসন্ত রোগ হওয়ার ভয় থাকে না, ডিপ্‌থেরিয়া য়্যান্টি-টক্‌সিনের বেলায় কিন্তু সে কথা বলা যা না। ইহার শক্তি বড় জোর দুই-তিন সপ্ত পর্য্যন্ত থাকিতে পারে, তাহার বেশী নয়।

ডিপ্‌থেরিয়া রোগে যেমন ডিপ্‌থেরি য়্যান্টি-টক্‌সিন্ ব্যবহৃত হয়, তেমনি অন্যা সংক্রামক রোগেও ভিন্ন ভিন্ন য়্যান্টি-টক্‌সিনে ব্যবহার হইয়া থাকে! দুঃখের বিষয়, ডিপ থেরিয়া-য়্যান্টি-টক্‌সিনের মত ইহাদের ম তেমন অব্যর্থ ও ধ্রুব বলিতে পারিবার ম সুযোগ এখনও উপস্থিত হয় নাই।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

অন্তঃপুর*

পাত্র-পাত্রী

বাগানে—		বাড়ীর মধ্যে—
বৃদ্ধ		পিতা
অপরিচিত		মাতা — সকলে
মার্থা, মেরি — বৃদ্ধের নাতনী		দুইটি বালিকা — নির্ব্বাক
জনৈক কৃষক		একটি শিশু
লোকের দল		

[উইলো গাছে পরিপূর্ণ একটি পুরাতন বাগান, বাগানের পিছনে একখানি বাড়ী—বাড়ীর একতলা একটি ঘরে তিনটি শার্সির মধ্য দিয়া আলো দেখা যাইতেছে, তন্মধ্যে পরিবারস্থ সকলে সমবেত হইয়া অগ্নিকুণ্ডের চারিপার্শ্বে বসিয়া আছে—পিতা চিমনির পার্শ্বে এককোণে বসিয়া আছেন, মাতা টেবিলের উপর এক হাত রাখিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন—শ্বেত-পরিচ্ছদ-পরিহিত দুইটি বালিকা সীবনে ব্যস্ত, ঘরের নিস্তব্ধতার মধ্যে তাহাদের মুখে ও চোখে এক স্বপ্ন-জড়ানো হাসির ভাব—একটি শিশু নিদ্রিত, মাতার বাম হস্তের উপর শিরটি ন্যস্ত—যখনই কেহ তাহাদের মধ্যে স্থান ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ নড়িতেছে

* বেলজিয়মের কবি Maurice Maeterlinck রচিত Interior এর বঙ্গানুবাদ। দুর্ঘটনা ঘটা ও যাহার দুঃস্থ, তাহাদের সংবাদ দেওয়া,—এই দুই অবস্থার মধ্যে যে সময়টুকু, তাহা কি করুণ ও শোকাবহ, এই নাটকে তাহাই প্রতিপাদ্য।

যদিও তাহাদের গতি দেখিয়া মনে হয় বেশ গম্ভীর, ধীর; এবং আলোটুকুও দূরত্ব ও শার্সির স্বচ্ছ কাঁচের জন্য ঠিক জগতের নহে বলিয়া মনে হইতেছে।

বৃদ্ধ ও অপরিচিত ব্যক্তিটি সন্তর্পণে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল।]

বৃদ্ধ। এধারটা হল বাড়ীর পেছন দিক। ওরা এদিকে কখনো আসে না—দরজাগুলো সবই ওদিকে; সবগুলিই বন্ধ, খড়খড়িগুলোও বন্ধ রয়েছে—কিন্তু এধারে কোন খড়খড়ি নেই বলে আমি আলো দেখতে পেয়েছি—ঘরের মধ্যে আলো জ্বালিয়ে এখনো ওরা বসে আছে, কিন্তু এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে যে আমরা এখানে এসেছি, তা ওরা জানতে পারেনি—মেয়েটি কিম্বা ওদের মা যদি বাইরে আসতেন তাহলে আমরা কি করতুম?

অপরিচিত। আমরা কি করবো?

বৃদ্ধ। বাড়ীর সকলেই ঘরে আছে কি না প্রথমে দেখতে চাই। চিমনির ধারে এক-কোণে বাপ ঐ বসে, দেখতে পাচ্ছ—তিনি চুপ করেই বসে আছেন, কিছু করছেন না, হাতদুটো হাঁটুর উপর—মা টেবিলের উপর হাত রেখে হেলান দিয়ে রয়েছেন····

অপরিচিত। তিনি আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন না?

বৃদ্ধ। না, বিশেষ কোন দিকে চেয়ে নেই তবে তাঁর দৃষ্টি খুব স্থির—আমাদের তিনি দেখতে পাবেন না। আমরা বড় বড় গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছি কি না, যাক্, আর কাছে যেও না। ওই যে সেই মরা মেয়েটির ছোট বোন দুটি—ওরা বসে কি বুনছে, ছোট ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে—কোণের ঘড়িতে ন'টা বেজেছে·····ওরা কেউ কোন অমঙ্গলের কথা ভাবছেও না, কারো মুখে কথাটি নেই—

অপরিচিত। একটু ইসারা করি, বাপের নজর পড়বে। তিনি এদিকে মুখ ফিরিয়ে আছেন—জানালায় একটা ধাক্কা দি? সকলে শোনবার আগে একজন অন্তত শুনুক·····

বৃদ্ধ। কি যে করবো তা আমি জানি না···কিন্তু আমাদের খুব হুঁসিয়ার হওয়া আগে দরকার। বাপ বুড়ো, অসুখে ভুগছেন, মায়েরও অবস্থা তাই, আর বোনেরা খুবই ছোট···এরা সবাই তাকে ভালবাসত, কাউকে যেন আর তেমনটি বাসবে না। এ রকম সুখের সংসার আমি আর দেখি নি।···না, না! জানলার কাছে যেও না, তাহলে ভারি খারাপ হবে। ব্যাপারটা যেন কিছু নয় এমনিভাবেই আমাদের বলা ভালো। আর আমরাও যে দুঃখিত এ রকম ভাব দেখাবো না, কারণ তাহলে ওরা একেবারে মুষড়ে পড়বে—আর কি যে করবে তা ভেবেই পাবে না·····চল, আমরা বাগানের ওধারে যাই—দরজায় ধাক্কা দিয়ে যেন কিছু হয়নি এমনি ভাবে ঘরে ঢুকিগে। আমি প্রথমে যাবো আর আমাকে দেখে ওরা কিছু আশ্চর্য্যও হবে না, কেননা প্রায়ই সন্ধ্যার সময় ফুলটা-ফলটা নিয়ে এখানে এসে গল্পস্বল্প করে ঘণ্টাখানেক আমি কাটিয়ে যাই—

অপরিচিত। আমার যাবার কি দরকার? তুমি একলাই যাও; যতক্ষণ না ডাকে ততক্ষণ

না হয় তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করবো আমাকে ওরা কখনো দেখে নি—আমি একজন বাজে লোক, অচেনা·····

বৃদ্ধ। না, না,আমার একলা যাওয়াও ঠিক নয়। একজনের মুখে দুর্ঘটনার খবর শুনলে সেটা বিশেষ করেই মনে লাগে, আসবার সময় এই কথাটাই ভাবছিলুম···যদি একলা যাই, তাহলে প্রথমে আমাকেই কথা কইতে হবে আর অল্প কথায় ব্যাপারটাও ওরা জানতে পারবে—আমার বলবার কিছু থাকবে না। আর আসল কথা কি জানো, কোন দুঃসংবাদ দেবার পরই যে স্তব্ধ অবসরটুকু আসে সেটুকুকে আমি বড় ভয় করি। তখন বুকখানা যেন ভেঙ্গে যায়—যদি আমরা দুজনে যাই, তাহলে আমি ঘুরিয়ে কথাটা পাড়বো; ধর না যেমন, আমি বলবো'খন "তারা তাকে দেখলে···সে জলের উপরে ভাসছিল···দুটি হাত জোড় করে···"

অপরিচিত। হাত দুটো তার মুঠো করা ছিল না; দুপাশে ভাস্‌ছিল—

বৃদ্ধ। দেখছ ত, আমরা নিজেরাই তর্ক আরম্ভ করেছি, আসল দুর্ঘটনার ব্যাপারটা বর্ণনার ভেতর ঢাকা পড়ে গেল! যদি আমি একলা গিয়ে ব্যাপারখানা বলি তাহলে নিশ্চয় বলতে পারি যে প্রথম কথাতেই একটা ভয়ানক গোল বেধে যাবে, আর কি-যে ঘটবে তা ভগবানই জানেন—অথচ যদি আমরা ওদের কাছে গিয়ে একজনের পর একজনে কথা কই তাহলে ওরা আমাদের কথা ধীর হয়ে শুনবে আর আসল ব্যাপারটাতেও মন দেবে না—মাও যে সেখানে থাকবে, সে কথাটি ভুলো না,···তার জীবন ত একটা সুতোয়-বাঁধা ঝুলছে—কিন্তু . এক কা করতে হবে, বাজে কথায় প্রথমে দুঃখটাকে অনেকখানি চাপা দিতে হবে। সকলে এ সঙ্গে মিলে যে যার আপনার মত কথা বল্লে সকলের চেয়ে ভালো হবে; তাহলে যে আপনা-হতে দুঃখেরও অনেকটা উপশম হতে পারে -আলো কি বাতাসের মত বিনা চেষ্টায় বিনা-গোলমালে দুঃখটা ছড়িয়ে পড়বে·····

অপরিচিত। তোমার কাপড়-চোপড় ভিজে আর টস্‌টস্ করে জল ঝরছে—

বৃদ্ধ। না, না, আমার জামার তলাটা কেবল জলে একটু ভিজে গেছে—তোমার খুব ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে? কাদায় তোমার জামা ভরে গিয়েছে—ভয়ানক অন্ধকার বলে পথে এটা আমার চোখে পড়েনি—

অপরিচিত। কোমর-ভোর জলে নেমে-ছিলুম—

বৃদ্ধ। আমার আসবার অনেক আগেই তাকে পেয়েছিলে?

অপরিচিত। না, বেশী নয়, একটু আগে —আমি গাঁয়ের দিকে যাচ্ছিলুম; তখন বেলা গেছে, নদীর চারিধারে অন্ধকার ছেয়ে এসেছে। জলের দিকে চেয়ে চেয়ে যাচ্ছি, এমন সময় জলের কোলের কাছে যে গাছগুলো, তারই ধারে কি রকম হঠাৎ নজর পড়ল যেন কি একটা অদ্ভুত জিনিষ ওখানে রয়েছে, তখন কাছে গিয়ে দেখি এই কাণ্ড! চুলগুলো তার মুখের চারধারে গোল হয়ে রয়েছে, আর স্রোতে একবার এদিকে একবার ওদিকে ভাসছে·····

[ঘরের ভিতর বালিকা দুইটি জানালার দিকে মুখ ফিরাইল]

বৃদ্ধ। দেখছ, বোনদুটির চুলগুলি কাঁধের উপর কাঁপছে—

অপরিচিত। আমাদের দিকে তারা এমি ঘাড় নাড়লে, বোধ হয় আমি জোরে কথা বলছি তা, [বালিকা দুইটি পূর্ব্বের মত আবার সেই ভাবে বসিল]—না, আবার মাথা ফিরিয়ে নিয়েছে·····হাঁ, কোমর-ভোর জলে নেমে গিয়ে কোন রকমে তার হাত ধরে পাড়ের কাছে টেনে নিয়ে এলুম—দেখতে সে ঠিক তার ঐ-বোনেদের মতই সুন্দর ছিল·····

বৃদ্ধ। না, সে আরও-বেশী সুন্দর ছিল, ···আমার আর সে সাহস নেই কেন, বুঝতে পাচ্ছি না·····

অপরিচিত। সাহস কি বলছো? মানুষে যা করে বা করতে পারে, তা সবই আমরা করেছি। এক ঘণ্টার বেশী হল সে চলে গেছে—

বৃদ্ধ। আহা, আজ সকালে সে বেঁচে ছিল! গিরাজ থেকে বেরিয়ে আসবার সময় পথে আমার সঙ্গে দেখা—সে বল্লে যে, আমি চলে যাচ্ছি—যে নদীতে তাকে পেয়েছ তারই ওপারে তার ঠাকুমাকে সে দেখতে যাচ্ছিল—আর যে দেখা হবে না, সে তা জানত না ত, আমায় কি-যেন সে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমার মনে হয়, সাহস হল না, তাই আর কি আমার কাছ থেকে হঠাৎ তাড়াতাড়ি চলে গেল। এখন সে সব কথা ভাবছি, তখন কিন্তু কিছুই লক্ষ্য করি নি—লোকে চুপ্ করতে চাইলে কিম্বা তাকে কেউ বুঝতে পারবে না এই ভয় হলে, যেমন ভাবে হাসে, সেও সেই রকম ভাবে হসেছিল ···তার চোখে পরদা পড়ে গেল, আমার দিকে আর চাইলেও না·····

অপরিচিত। কতকগুলো চাষা বল্লে সমস্ত বিকেলটায় তাকে পাড়ের ধারে তারা ঘুরে বেড়াতে দেখেছে—তারা ভেবেছিল, বুঝি, ফুলের সন্ধানে ঘুরছে। এটা যে সম্ভব হবে, তার মৃত্যু·····

বৃদ্ধ। কেউই তা ভাবতে পারে নি····· লোকে কি জানতে পারে!—অনেক লোক আছে যারা কথা কইতে কুণ্ঠিত হয়; বোধ হয় সেও সেই রকমের ছিল এবং একটা ছাড়া মরবার নানা কারণ থাকতে পারে—তুমি ঘরের ভিতর সব দেখতে পাচ্ছো বটে, কিন্তু মনের ভিতর দেখতে পাও না ত —সবাই ঐ রকম আর কি-বাজে কথা ছাড়া কিছুই কয় না! কোথাও কোন গোলমাল আছে কি না স্বপ্নেও তা কেউ ভাবে না, পরশু দিন সে ওখানে ছিল, ঠিক তার বোনেদের মত অম্‌নি আলোয় বসেছিল .....কিন্তু আর তুমি তাদের সে রকমটি দেখতে পাবে না—, যদি এই কাণ্ডটা না ঘটত···আমার বোধ হয় তাকে সেই প্রথমবার দেখেছি··· আমাদের বোঝবার আগে আমাদের রোজকার জীবনে এতখানি বৈচিত্র্য ঘটবে—কে তা বুঝতে পারে! কি অদ্ভুত তার জীবন—মন কি শিশুর মত সরল, গম্ভীর...হয়তো কি বলতে এসেছিল, কিম্বা কিছু করতে এসেছিল তা করতও— কিন্তু হায়, সব শেষ হয়ে গেছে·····

অপরিচিত। দেখ, ঘরের নিস্তব্ধতার মধ্যে ওদের মুখে কেমন হাসির রেখা—

বৃদ্ধ। ওরা মোটেই উদ্বিগ্ন নয়···ওরা নিশ্চিন্ত আছে, জানে, সেখানে সে নির্ব্বিঘ্নে আছে—কিছুই ঘটেনি!

অপরিচিত। ওরা নিস্তব্ধ হয়ে বসে হাসছে —কিন্তু দেখ, বাপ ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকাচ্ছেন .....

বৃদ্ধ। মায়ের কোলে যে ছেলেটি ঘুমোচ্ছে তারই দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছেন.....

অপরিচিত। ছেলেটির ঘুম ভেঙ্গে যাবার ভয়ে মা মাথা তুলতে সাহস কচ্ছেন না .....

বৃদ্ধ। আর ত ওরা বুনছে না···এবার সব মরার মত নিস্তব্ধ.....

অপরিচিত। শিল্কের সাদা পরদা ফেলে দিয়েছে.....

বৃদ্ধ। ছোট ছেলেটির দিকে দেখছে···

অপরিচিত। ওদের দিকে যে অপরে তাকিয়ে আছে, তা জানেও না.....

বৃদ্ধ। ভাবতেও পারছে না, যে ওদের আবার অপরে দেখছে!

অপরিচিত। এবার আমাদের দিকে ফিরছে.. ...

বৃদ্ধ। তবু কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না...

অপরিচিত। ওদের খুব খুসী বোধ হচ্ছে, তবু যেন কি হয়েছে.....কী যে তা বলতে পারি না.....

বৃদ্ধ। ওরা ভাবছে, ওরা বিপদের বাইরে রয়েছে—বিপদ ওদের কিছু করতে পারবে না—দরজাগুলো সব বন্ধ আর জানালায় সব লোহার গরাদ আঁটা—বাড়ীটা যদিও পুরানো তবু মেরামত করে শক্ত করা আছে; আর তিনটে ওক্ কাঠের দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়েছে.....এমন কি আগে যে সব বিষয়ে সাবধান হবার কথা তা সব দেখে-শুনেই ওরা সাবধান হয়েছে.....

অপরিচিত। আগেই হোক আর পরেই হোক আমাদের বলে ফেলা উচিত...হঠাৎ কেউ এসে বলে ফেলে কোন গোল বাধিয়ে দিতে পারে ত! মাঠে সেই মরা মেয়েটিকে যেখানে রেখে এলুম, সেখানে অনেক চাষার ভিড় হয়েছে—হঠাৎ যদি তাদের ভিতর কেউ এসে দরজায় ধাক্কা—

বৃদ্ধ। মার্থা আর মেরি তাকে চৌকি দিচ্ছে···চাষারা সব গাছের ডাল কেটে একটি খাটিয়ার মত করেছে—আমার বড় নাতনিকে বলে এসেছি যেই তারা সেখান থেকে বেরুবে অম্নি যেন আগে এসে আমাদের খবর দেয়—যতক্ষণ সে না আসে ততক্ষণ অপেক্ষা করা যাক্—তাকেই আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব.....আর এরকমভাবে ওদের পানে তাকিয়ে থাকা যায় না, আমি ভাবছি দরজায় ধাক্কা দিয়ে ঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢুকে খুব কম কথায় বলা যাক্···এখানে অনেকক্ষণ ধরেই দাঁড়িয়ে আছি—

[মেরির প্রবেশ]

মেরি। দাদা, ওরা আসছে.....

বৃদ্ধ। ও, তুমি! কোথায় ওরা?

মেরি। ওরা ঐ ঢালু জায়গাটার নীচে—

বৃদ্ধ। ওরা খুব আস্তে আস্তে চুপ্‌চাপ করে আসছে ত!

মেরি। খুব চাপা গলায় ওদের প্রার্থনা করতে বলে এসেছি.....মার্থা ওদের সঙ্গে আছে—

বৃদ্ধ। লোক কি অনেকজন?

মেরি। গ্রামের প্রায় সকলেই সেই সঙ্গে

আসছে—ওরা সব আলো আনছিল, আমি নিবিয়ে দিতে বলে এসেছি—

বৃদ্ধ। কোন্ পথ দিয়ে আসছে?

মেরি। গলি-পথ দিয়ে খুব আস্তে আস্তে আসছে—

বৃদ্ধ। সময় হয়েছে.....

মেরি। দাদা, এদের তুমি সব বলেছ?

বৃদ্ধ। কিছু বলিনি দিদি, তা তুই বুঝতেই পাচ্ছিস্ ত—ঐ যে এখনো আলোয় বসে রয়েছে—মেরি, দেখ্, জীবনটা যে কি তা একবার ঘরের ভিতরে চেয়ে দেখ্.....

মেরি। ওঃ, মনে হচ্ছে যেন ওরা কত শান্তিতে রয়েছে—আমার মনে হচ্ছে যেন ওদের আমি এ স্বপ্নের ঘোরে দেখছি—

অপরিচিত। ঐদিকে দেখ, মেয়ে দুটি এবার নড়ছে—

বৃদ্ধ। ঐ যে, এবার ওরা উঠছে...

অপরিচিত। বোধ হয় জানলার দিকে আসবে—

(ঠিক সেই সময়ে একজন প্রথম জানালায় এবং অপরটি তৃতীয় জানালায় আসিয়া কাঁধের উপর হাত রাখিয়া অন্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দাঁড়াইল]

বৃদ্ধ। মাঝখানের জান্‌লায় কেউ এল না—

মেরি। ওরা বাইরের দিকে চেয়ে আছে, ওরা শুনছে.....

বৃদ্ধ। বড়টি কিছু দেখতে পাচ্ছে না বলে হাসছে—

অপরিচিত। ছোটটির মুখ দেখেই মনে হচ্ছে, যেন ও ভয় পেয়েছে—

বৃদ্ধ। সাবধান, কেউ যেন শুনতে না পায়—

[অনেকক্ষণ সব নিস্তব্ধ—মেরি তাহার ঠাকুরদার খুব নিকটে গিয়া তাহাকে চুম্বন করিল]

মেরি। দাদা.....

বৃদ্ধ। মেরি, কাঁদিস্ নে, আমাদেরও একদিন সময় আসবে—

[সব নিস্তব্ধ)

অপরিচিত। কতক্ষণ ধরে ওরা দেখছে...

বৃদ্ধ। বেচারা! কি অন্ধকার রাত—হাজার বছর ধরে দেখলেও কিছু দেখতে পাবে না! ওরা এই দিকে চেয়ে আছে কিন্তু ঠিক উল্টো দিক্ থেকেই বিপদটা এসে পড়বে!

অপরিচিত। হাঁ, এইদিকেই ওরা চেয়ে আছে। মাঠের পথ দিয়ে যেন কিছু আসছে, কি, তা বুঝতে পাচ্ছি না—

মেরি। ও, হয়েছে, সেই ভিড়টা আসছে —অনেকদূরে বলে ওদের ভালো করে দেখা যাচ্ছে না—

অপরিচিত। আঁকাবাঁকা পথ সব ঘুরে আসছে—চাঁদের আলোয় ঐ যে ওদের দেখা যাচ্ছে।

মেরি। ও, ওরা কত লোক! যখন আমি চলে এলুম তখনও সহরের আশপাশ থেকে লোক আস্‌ছিল—অনেক ঘুরে সব আসছে.....

বৃদ্ধ। তারা যে এসে পৌঁছুবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—আমিও ওদের দেখতে পাচ্ছি —ঐ যে—ওরা মাঠ পার হচ্ছে—সব এত ছোট দেখাচ্ছে যে গাছপালা থেকে ওদের তফাৎ করা যায় না—দেখে মনে হয় যেন ছেলেরা চাঁদের আলোয় খেলা করছে —যদি ঐ মেয়ে দুটি দেখে, তাহলে

তারা কিছুই বুঝতে পারবে না—যে বিপদটা ঘণ্টা দুই ধরে উঁকি মারছিল এবার সেটা প্রকাশ হয়ে পড়বে তা ওরা যতই অনিশ্চিত থাক্! আর চেপে রাখা যায় না! যারা আনছে তাদের চেপে রাখবার সে শক্তিও নেই... ..এতক্ষণ এটা চাপা ছিল কিন্তু আর থাকে না—এর শেষ কোথায় জানা আছে বলে এবার সেই পথ ধরছে—এ চল্‌তে চল্‌তে কোথাও থামে না আর এর লক্ষ্য কেবল একদিকেই.....এতে শক্তির দরকার.....ওদেরও প্রাণে বেজেছে কিন্তু তবুও সব আসছে.....ওদের মনটা দয়ায় ভরা···ঐ সব এগিয়ে আসছে·····

মেরি। দাদা, বড়টি আর হাসছে না—

অপরিচিত। ওরা জানলা থেকে চলে যাচ্ছে·····

মেরি। মাকে চুমু খাচ্ছে·····

অপরিচিত। ছেলেটিকে না জাগিয়ে বড়টি তার কোঁকড়ান চুলে হাত বুলোচ্ছে—

মেরি। দেখ, বাপের ইচ্ছে যে ওরা তাঁকে চুমু খায়—

অপরিচিত। এখন সব নিস্তব্ধ·····

মেরি। আবার ওরা মায়ের কাছে ফিরে এসেছে—

অপরিচিত। বাপ ঘড়ির সেই পেণ্ডুলামের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন—

মেরি। কি করছে ওরা তা নিজেরা জানেও না, তবে দেখে মনে হচ্ছে যেন প্রার্থনা কচ্ছে···

অপরিচিত। এক-মনে নিজেদের মনের কথা শুনছে বোধ হয়!

[সব নিস্তব্ধ]

মেরি। দাদা, থাক্, আজ আর কি বলো না!

বৃদ্ধ। দেখ্, তুইও সাহস হারাচ্ছিস্— আমি জানি, ওদের দিকে তোর চাওয়া উচিত নয়। আজ প্রায় তিরেশি বছর হল এতদিন পরে জীবনের বাস্তবতা প্রথম বুঝতে পারছি—ওদের এত অদ্ভুত আর গভীর বোধ হচ্ছে কেন, বুঝতে পারছি না। বাড়ীতে আমরা যেমন থাকি, ঠিক সেই রকম ওরা একটা আলো জ্বালিয়ে বসে বসে রাত কাটাচ্ছে কিন্তু তবু আমার মনে হচ্ছে যেন আর একটা পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে আমি ওদের দেখছি! কারণ আমার অজ্ঞ ব্যাপারই জানা আছে যা ওদের মোটেই জানা নেই, মেরি, তাই নয় কি? তোদের এত বিবর্ণ দেখাচ্ছে কেন, বল্ দেখি! হয়তে কিছু হয়েছে, সেটা আমরা কথায় প্রকা করতে পারছি না বটে, কিন্তু কেমন কা আসছে। জীবনে এত দুঃখ ঘটতে পারে কি লোকের মনে এত ভয় জাগতে পারে ত আমি জানতুম না। এমন কি যদি কিছু না ঘটত তাহলেও এরকমভাবে বসে আছে দেখলেই আমার ভয় হত—জগতের উপর ওদের বেশীরকম বিশ্বাস আছে— কেবল কতকগুলো কাঁচের আড়ালে শত্রু কাছ থেকে দূরে বসে আছে আর ভাবছে যখন দরজা বন্ধ, তখন কোন বিপদই ঘটতে পারে না কিন্তু যা কিছু ঘটে তা যে সব মনের ভিতর ঘটে— আর জগৎটার ঘরের দরজার কাছেই তার শেষ নয়। ওরা জীবন-সম্বন্ধে এতই নিরা পদ যে স্বপ্নেও ভাবছে না, এ সম্বন্ধে

ের চেয়ে অপরে বেশী জানে কি, ঐ দরজা, থেকে দু'পা দূরে দাঁড়িয়ে, আমি এই বুড়ো মানুষ ওদের সারা জীবনের সুখটুকুকে ধরে রেখেছি!—ঠিক যেমন লোকে চোট্ খাওয়া পাখীকে হাতের মধ্যে পুরে রাখে! হাত খুলতে আমার সাহস হচ্ছে না—

মেরি। দাদা, তোমার কি একটুও দয়া হচ্ছে না·····

বৃদ্ধ। মেরি, এদের আমি দয়া করছি কিন্তু আমাদের ত কেউ করে না—

মেরি। দাদা, তাহলে কাল দিনের বেলা তখন বলো—দিনের আলোয় বিপদ আমাদের অভিভূত করতে পারে না—

বৃদ্ধ। মেরি, তুই ঠিক বলেছিস্, রাতে এ-সব না বলাই ভাল। কারণ দুঃখের পক্ষে দিনের আলোই ভালো— কিন্তু কাল আমাদের বলবে কি? বিপদ আপদ লোকের হিংসে বাড়িয়ে দেয়— যাদের ঘটেছে, তারা অপরের আগে জানতে চায়—অচেনা লোকের মুখে তারা খবর পেতে চায় না—কিছু থেকে ওদের যেন বঞ্চিত করেছি, আমার এমনি মনে হচ্ছে।

অপরিচিত। আরও অনেক দেরী হয়ে গেছে—প্রার্থনার গুনগুন শব্দটা আমি যেন শুনতে পাচ্ছি—

মেরি। ঐ যে ওরা ওখানে, ঝোপ্‌ঝাপ্ সব পার হয়ে এগিয়ে আসছে—

[মার্থার প্রবেশ]

মার্থা। আমি এসেছি, ওদের নিয়ে এসেছি.....রাস্তায় সকলকে দাঁড়াতে বলেছি·····

[বালকদের চীৎকার শ্রুত হইল]

ওই, ছেলেরা এখনো চেঁচাচ্ছে—ওদের আমি আসতে বারণ করলুম কিন্তু দেখতে চায় বলে সব এল! আর তাদের মায়েরা আমার কথা ত শুনবেই না—যাই, আমি বারণ করিগে,—না, চীৎকার থেমেছে। সবই তো ঠিক? ওর হাতে যে ছোট আংটিটি পাওয়া গেছে, তা আমি এনেছি আর ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু এনেছি—নিজে জিরিয়ে নেবার জন্য তাকে খাটিয়ার উপর রেখেছি · তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কত ঘুমোচ্ছে! চুলগুলো নিয়ে আমাকে ভারী কষ্ট পেতে হয়েছে, কিছুতেই ঠিক করতে পারলুম না—সকলেই ফুল যোগাড় কল্লে কিন্তু ঐ মার্গারিট্ ফুল ছাড়া আর কোন রকম ফুল পাওয়া গেল না। তুমি এখানে কি করছো? ওদের কাছে যাও নি? (জানালা দিয়া ঘরের ভিতর দেখিয়া) ওরা ত কাঁদছে না—ওরা,—তুমি কিছু বলোনি, বুঝি?

বৃদ্ধ। মার্থা, মার্থা, তোর প্রাণের আবেগ বড় বেশী, তুই বুঝতে পারবি না .....

মার্থা। কেন পারব না? [কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকার পর তিরস্কার-গম্ভীর স্বরে] দাদা, এ তোমার উচিত হয়নি·····

বৃদ্ধ। মার্থা, তুই বুঝিস্ না···

মার্থা। আমি গিয়ে ওদের সব বলবো।

বৃদ্ধ। মার্থা, এখানে থাকো, একবারটি দেখে নাও—

মার্থা। ও, আমার দয়া হচ্ছে! আর দেরী করা ঠিক নয়···

বৃদ্ধ। কেন?

মার্থা। তা আমি জানি না, আর সে সম্ভবও নয়—

বৃদ্ধ। মার্থা, এদিকে এসো···

মার্থা। দেখ, ওরা কত ধীর, শান্ত—

বৃদ্ধ। মার্থা, এদিকে এসো···

মার্থা। (ফিরিয়া) দাদা, তুমি কোথায় —মনটা আমার এতই খারাপ যে তোমাকে পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না—কি করবো নিজেই বুঝতে পারছি না···

বৃদ্ধ। যতক্ষণ না ওরা সব টের পাচ্ছে, ততক্ষণ আর ওদিকে চেয়ে দেখো না···

মার্থা। আমি তোমার সঙ্গে যাবো···

বৃদ্ধ। না, মার্থা, এখানে থাকো, বাড়ীর দেয়ালে ঠেসান দিয়ে ঐ পুরোণো পাথরের বেঞ্চে তোমার দিদির কাছে বসে থাকো, আর ওদিকে চেয়ো না—তুমি বড় ছোট, এ তুমি কখনো ভুলতে পারবে না। মৃত্যুকে চোখের উপর দেখলে মানুষের মুখের ভাব কি রকম হয়ে যায় তা তুমি জানো না। হয়তো ওরা কেঁদে উঠতে পারে, উঠবেই, কিন্তু ওদিকে দেখো না; কিম্বা হয়তো ওখানে কোন সাড়া-শব্দ থাকবে না, তা হলেও ওদিকে ফিরে দেখো না—দুঃখ যে কিভাবে প্রকাশ পাবে তা কেউ আগে জানতে পারে না—সাধারণতঃ প্রাণ থেকে কতক-গুলো দীর্ঘনিশ্বাস ঝরে পড়ে আর বেশী-কিছু ঘটে না, সেগুলো আমি নিজে যখন শুনবো তখন যে কি করবো তা নিজেই জানি না —সে রকম নিশ্বাস সব সময় আসে না। ···আমার যাবার আগে তোরা দু'জনে আমায় চুমু দে—

[প্রার্থনার গুণগুণ শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইল—জনতার কতকগুলি লোক বেগে বাগা মধ্যে প্রবেশ করিল; মৃদু পদশব্দ ও কথাবা গুঞ্জনধ্বনি শ্রুত হইল]

অপরিচিত। (জনতাকে) সব ঐখা থাকো, জানলার কাছে যেও না—সে কই

চাষা। কে? কার কথা বল্‌ছ?

অপরিচিত। বাকী সব লোক—ম বয়ে আনছে।

চাষা। সদরের দিকে যে পথ, তা ঐ পথের দিকে গেছে—

[বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন—মার্থা ও মেরি জানাল দিকে পিছন করিয়া সেই বেঞ্চের উপর ব জনতার মধ্যে সামান্য গুণগুণ শব্দ শ্রুত হইল]

অপরিচিত। চুপ! কথা কয়ো না—

[বড় মেয়েটি ঘরের মধ্যে দরজার নিকটে দরজা খিল দিয়া বন্ধ করিতেছে]

মার্থা। ওই যে দরজা খুলছে।

অপরিচিত। না, ভাল করে বন্ধ করছে

[সব নিস্তব্ধ]

মার্থা। দাদা ত ভিতরে যান নি!

অপরিচিত। না, আবার মায়ের কা গিয়ে বসছে—কেউ আর নড়ছে ছেলেটা এখনো ঘুমোচ্ছে—

[সব নিস্তব্ধ]

মার্থা। মেরি, ছোট বোনটি আমা তোর হাতদুখানি একবার দে—

মেরি। মার্থা—

[পরস্পরে আলিঙ্গন ও চুম্বন]

অপরিচিত। উনি নিশ্চয়ই গিয়ে দরজ ধাক্কা দিয়েছেন—সকলেই এক সঙ্গে ঐ মা তুলেছে—পরস্পরের দিকে চাইছে—

মার্থা। ওঃ মেরি, ছোট বোনটি আমা আর না কেঁদে আমি থাকতে পাচ্ছি না

[মেরির কাঁধে মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে করিল]

অপরিচিত। নিশ্চয়! আবার দোরে ধাক্কা য়েছেন·····বাপ ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন··· যে, এবার উঠছেন·····

মার্থা। মেরি, আমিও ভিতরে যাই— রের একলা ছাড়া হবে না—

মেরি। দিদি, দিদি—

[তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল]

অপরিচিত। বাপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে য়েছে—এবার খিল খুলছে—কি সন্তর্পণে ছে—চোখে কি উদ্বেগ—এখান থেকে মি তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি!

মার্থা। ও, তুমি দেখো না·····

অপরিচিত। কি?

মার্থা। ঐ এসেছে ·····

অপরিচিত। একটুখানি দোর কেবল লেছেন—মাঠ আর ফোয়ারার একটা ণ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না— রজায় হাত দিচ্ছেন, এক পা পেছিয়ে গেলেন—বোধ হয়, বললেন—ওঃ, তুমি! হাত তুলে আবার দরজা সাবধানে বন্ধ করে দিলেন—তোমার ঠাকুরদা এবার ঘরে ঢুকেছেন.....ঐ...

[জনতা জানালার নিকটে আসিল—মার্থা ও মেরি প্রথমে একটু ও পরে একেবারে স্থান ত্যাগ করিয়া গলা-জড়াজড়ি করিয়া জানালার দিকে দলের অনুসরণ করিল—বৃদ্ধকে দলের মধ্যে অগ্রসর হইতে দেখা গেল—ছোট বালিকা দুইটি উঠিল, মাতাও সেই সঙ্গে উঠিলেন এবং যে চেয়ারে বসিয়াছিলেন, সেই চেয়ারে সাবধানে ছোট ছেলেটিকে এরূপভাবে স্থাপিত করিলেন যে বাহির হইতে তাহাকে নিদ্রিত বেশ দেখিতে পাওয়া যায়—শিশুর মাথাটি সম্মুখের দিকে অল্প নত হইয়া রহিয়াছে—মাতা বৃদ্ধকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া হস্ত প্রসারিত করিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ তাহা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই সরাইয়া লইলেন—আগন্তুকের উপরের জামাটি খুলিবার জন্য বালিকার মধ্যে একজন চেষ্টা করিল এবং অপরজন তাহার জন্য একটি চেয়ার অগ্রসর করাইয়া দিল কিন্তু বৃদ্ধ অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা অস্বীকার প্রকাশ করিলে—পিতা আশ্চর্য্য হইয়া হাসিতে লাগিলেন, এবং বৃদ্ধ জানালার দিকে চাহিয়া রহিল]

অপরিচিত। বলতে সাহস কচ্ছেন না .....আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন—

[জনতার মধ্যে গোলমাল]

অপরিচিত। চুপ!

[জানালার নিকট সকলকে দেখিতে পাইয়া বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলেন—ছোট বালিকাটি ক্রমাগত চেয়ার অগ্রসর করিয়া দেওয়াতে তিনি অবশেষে তাহাতে বসিলেন এবং পুনঃপুন কপালে হাত ঘষিতে লাগিলেন]

অপরিচিত। এবার বসেছেন.....

[ঘরের ভিতর সকলে বসিল—পিতাকে দেখিয়া মনে হইল খুব তাড়াতাড়ি তিনি কথা কহিতেছেন— শেষকালে বৃদ্ধ কথা কহিল এবং তাহার গলার স্বর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—পিতা তাহাকে থামাইয়া দিলেন কিন্তু বৃদ্ধ আবার কথা কহিতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমশঃই সকলে ভয়ে শক্ত হইয়া পড়িল—মাতা হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন]

মার্থা। ও, এবার মা নিশ্চয় সব শুনেছেন।

[মাতা ঘাড় ফিরাইয়া হাত দিয়া মুখ ঢাকিলেন— জনতার মধ্যে আবার শব্দ শ্রুত হইল—সকলে হাত দিয়া ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল—যাহাতে দেখিতে পায় তাহার জন্য বালকেরা চীৎকার করিতে লাগিল এবং তাহাদের মায়েরা ইচ্ছামত কাজ করিতে লাগিল]

অপরিচিত। চুপ! এখনো উনি বলেন নি.....

[মাতা আগ্রহের সহিত বৃদ্ধকে প্রশ্ন করিতেছে, দেখা গেল—তিনি আরও কত কথা বলিলেন; তারপর হঠাৎ সকলেই উঠিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে দেখা গেল—তারপর তিনি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন]

অপরিচিত। ওদের বলেছেন, বলেছেন, সবাইকে একসঙ্গে বলেছেন—

[জনতার মধ্যে স্বর। বলেছেন, বলেছেন —বলা হয়েছে—]

অপরিচিত। কিছু শুনতে পাচ্ছি না ··

[বৃদ্ধ উঠিল এবং না ফিরিয়া তাহার পশ্চাৎ-দিকের দরজার দিকে অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা সঙ্কেত করিল—পিতা-মাতা এবং বালিকা দুইটি সকলে বেগে দরজার দিকে অগ্রসর হইল—পিতা অতি কষ্টে দরজা খুলিলেন—মাতা যাহাতে বাহিরে না যাইতে পারেন, তাহার জন্য বৃদ্ধ চেষ্টা করি লাগিল]

[জনতার মধ্যে স্বর। বাইরে আসছে ঐ সব বাইরে আসছে—]

[বাগানের মধ্যে নানারূপ গোলমাল উঠিল সকলেই বাড়ীর অন্যদিকে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল কেবল সেই অপরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহাকে দেখা গেল না—তিনি জানালার কাছে দাঁড়াই আছেন—পাট-করা দরজা খুলিয়া সকলেই একসঙ্গে বাহিরে আসিল—দূরে চাঁদের আলোয় কে ফোয়ারা, মাঠ এবং নক্ষত্র-খচিত আকাশ দৃষ্ট হইল ঘরের মধ্যে শিশুটি একলা বেশ শান্তিতে চেয়ারে নিদ্রা যাইতেছে--আর সব নিস্তব্ধ]

অপরিচিত। ছেলেটি এখনো জাগে নি

[তিনিও বাহিরে চলিয়া আসিলেন]

সমাপ্ত

সুবোধ চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গলাদেশে শিশুমৃত্যু

শিশুমৃত্যু ও জাতীয় জীবন

অত্যধিক শিশুমৃত্যু জাতীয় জীবনের পক্ষে ঘোরতর আশঙ্কার কারণ। যখন দেখা যায়, কোন জাতির মধ্যে বহুদিন ধরিয়া শিশুমৃত্যুর হার খুব প্রবলভাবে প্রকাশ পাইতেছে, তখনই জানিতে হইবে যে লক্ষণটা খুব ভাল নহে। আর যদি ঐ মৃত্যুর হার ক্রমাগতই বাড়িয়া চলে, তবে জাতির অস্তিত্বের পক্ষেই সন্দিহান হইয়া উঠিতে হয়। ধ্বংসোন্মুখ জাতিসমূহের মধ্যে যে সকল দুর্লক্ষণ দেখা যায়, ক্রমবিবর্দ্ধমান শিশুমৃত্যুর হার তাহার মধ্যে একটি ট্যাসমানিয়ান, নিউজিল্যাণ্ডের মেওরি ও স্যাণ্ডউইচের প্রাচীন অধিবাসী প্রভৃতি ধ্বংসোন্মুখ জাতিদের মধ্যে সর্ব্বত্রই ঐরূ দেখা গিয়াছিল। ধ্বংসপ্রবণ জাতির মধ্যে একদিকে যেমন স্ত্রীলোকদের উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি আবার অত্যধিক শিশুমৃত্যু ঘটিতে থাকে। এই দুইটি লক্ষণ একযোগে সকল ধ্বংস প্রবণ জাতির মধ্যে নাও দেখা দিতে পারে। কোন জাতির মধ্যে কেবল শিশু

মৃত্যুর হার যদি অত্যধিক পরিমাণে বাড়িতে থাকে, তবে তাহা যথেষ্ট ভয়ের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

বঙ্গে শিশুমৃত্যুর হার

বাঙ্গলাদেশে বহুদিন হইতে শিশুমৃত্যুর হার খুব প্রবলভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। বলিতে গেলে বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়াই এইরূপ হইতেছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে এ বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। সুতরাং আমরা সুবিধার জন্য এখানে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পরের হিসাবই আলোচনা করিব। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বঙ্গে এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুমৃত্যুর হার ছিল ২০৯; —অর্থাৎ যত শিশু জন্মিয়াছিল, তাহাদের প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন করিয়া মরিয়াছিল। ঐ বৎসরেই পূর্ব্ববঙ্গে শিশুমৃত্যুর হার ছিল শতকরা ১৮, উত্তরবঙ্গে ২১, ও পশ্চিমবঙ্গে ২২। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বঙ্গে শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ২১·২৩; ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে শতকরা ২০·৯৫ ও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শতকরা ২২·১৪ দেখা গিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শিশুমৃত্যুর হার না কমিয়া বৎসরের পর বৎসর ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। যদিও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শিশুমৃত্যুর হার কিঞ্চিৎ কম (২১·৮৯) দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। ঐ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশের অনেক স্থলেই শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ২৫ এর উপর রহিয়া গিয়াছে। কোন কোন পল্লীগ্রামে শতকরা ২৬ হইতে ৬৪ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

আবার বাঙ্গলার রাজধানী, ভারতের প্রধান সহর কলিকাতা নগরের শিশুমৃত্যুর হার আরও ভীতিজনক। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার শিশুমৃত্যুর হার ছিল শতকরা ৩০ জন, অর্থাৎ জন্মগ্রহণের পর প্রতি ৩ জন শিশুতে ১ জন করিয়া মরিয়াছিল। ১৯১১—১৫ পর্য্যন্ত কলিকাতা সহরের ১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের মৃত্যুর হার এইরূপ দেখা যায়—

১৯১১	শিশুমৃত্যুর হার হাজারকরা	২৫১·৬
১৯১২	....	২৫৯·৬
১৯১৩	....	২৭৪·৮
১৯১৪	....	২৮২·৭
১৯১৫	....	২৮৭·৬

সুতরাং এই কয় বৎসরে কলিকাতাতেও শিশুমৃত্যুর হার ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। আর এই কয় বৎসরে (১৯১১—১৯১৫) কলিকাতার জন্মের হারও যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার জন্মের হার ছিল ২১·৭ (হাজারকরা), আর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে উহা কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ১৮·৫ (হাজারকরা)। প্রধান সহর কলিকাতা ছাড়িয়া বাঙ্গলার অন্যান্য সহরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও এই অত্যধিক শিশুমৃত্যুর হার দেখিয়া হৃদয় বিষণ্ণ হইয়া উঠে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার কয়েকটি সহরের শিশুমৃত্যুর হার কিরূপ ছিল তাহা নিম্নে দেখানো গেল।

বীরভূমি	শতকরা	৩০·৭৭
নদীয়া	” ”	৩০·৩৬
পাবনা	” ”	২৮·২৮
মুর্শিদাবাদ	” ”	২৭·৮৫
দিনাজপুর	” ”	২৫·০৭

জলপাইগুড়ি	শতকরা	২৪
যশোহর	” ”	১৯·৯৬

বাঙ্গলাদেশের ও তাহার সহরগুলির শিশুমৃত্যুর হার বাস্তবিকই কিরূপ অস্বাভাবিক ও আশঙ্কাজনক, তাহা বিদেশের কয়েকটি সহরের শিশুমৃত্যুর হারের সহিত তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—

শিশুমৃত্যুর হার (১৯১০)

ভিয়েনা	শতকরা	১৭
বার্লিন	” ”	১৫·৫
গ্লাসগো	” ”	১৪
নিউইয়র্ক	” ”	১২·৫
পারিস	” ”	১২
লণ্ডন	” ”	১০·৩৩
ষ্টকহলম্	” ”	৮·৭৫

এই তুলনায় আমরা দেখিতে পাইতেছি যে প্রাণবন্ত সজীব জাতি সকলের তুলনায় আমাদের শিশুমৃত্যুর হার কিরূপ ভয়ানক। এই অত্যধিক শিশুমৃত্যুর হার যে বাঙ্গলার সাধারণ মৃত্যুর হারও বাড়াইয়া তুলিতেছে, তাহা নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে।

বাঙ্গলার সাধারণ মৃত্যুর হার

১৯১২	হাজারকরা	২৯·৭৭
১৯১৩	” ”	২৯·৯
১৯১৪	” ”	৩১·৫
১৯১৫	” ”	৩২·৮৩

দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গলাদেশে বৎসরের পর বৎসর মৃত্যুর হার ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহা যে জাতীয় জীবনের পক্ষে একটা প্রবল দুর্ল্লক্ষণ তাহা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাঙ্গলার এই মৃত্যুর হার যার পর নাই বেশী। বাঙ্গলার সাধারণ জন্মহারের তুলনায় সাধারণ মৃত্যুহার কিরূপ তাহা নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে—

বঙ্গে জন্মমৃত্যুর হার

(হাজারকরা)

	জন্ম	মৃত্যু
১৯১২	৩৫·৩০	২৯·৭৭
১৯১৩	৩৩·৭৮	২৯·৯
১৯১৪	৩৩·৮৬	৩১·৫
১৯১৫	৩১·৮০	৩২·৮৩

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে একদিকে যেমন জন্মের হার ক্রমাগত কমিয়া যাইতেছে, অন্যদিকে তেমনই মৃত্যুর হার বাড়িয়া চলিয়াছে। এমন কি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জন্মের হারের তুলনায় মৃত্যুর হার বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশে মোট জন্মসংখ্যা হইতে মোট মৃত্যুসংখ্যা ৪৬,৯৩৯ বেশী! আমাদের জাতীয় জীবনের মূল কিরূপ দ্রুত ক্ষয় হইতেছে, ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার ফলে বাঙ্গলা দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কিরূপ হ্রাস হইয়া আসিতেছে তাহা আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি (১)। ১৯১৪ ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে দেখিতে পাইতেছি যে বাঙ্গলা দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার, বিদেশের কথা দূরে থাকুক, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনাতেও যার পর নাই কম। এইরূপ ভাবে চলিলে কিছুদিনের মধ্যেই যে আমাদের অস্তিত্ব লোপ হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

(১) জাতীয় জীবনে ধ্বংসের লক্ষণ—“নারায়ণ” —মাঘ, ১৩২২।

শিশুমৃত্যুর গোড়ার কথা

অত্যধিক হারে ক্রমবিবর্দ্ধমান শিশুমৃত্যুর গোড়ার কথা জাতীয়জীবনে শক্তিহীনতা। প্রত্যেক জীবদেহের একটা আভ্যন্তরীণ শক্তি আছে, যাহার বলে সে প্রতিকূল বাহ্য অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারে; পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী জীবদেহের ক্ষয়কারী শক্তিকে নিবারণ করিয়া উন্নতির দিকে সে অগ্রসর হয়। এই আভ্যন্তরীণ শক্তিকেই জীবদেহের জীবনী-শক্তি বলা যায়। এই জীবনীশক্তির ক্ষয় হইলে জীবদেহের আত্মরক্ষার শক্তির হ্রাস হয়; পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামে তখন সে অকৃতকার্য্য হইতে থাকে; নানা রোগ ও প্রতিকূল শক্তিকে প্রতিহত করিবার শক্তি তাহার হ্রাস হইয়া যায় ও এই-রূপে ক্রমেই সে মৃত্যুর দিকে যাইতে থাকে। জীবদেহের ন্যায় জাতিরও জীবনী-শক্তি আছে বলা যায়। কোন জাতির এই জীবনীশক্তি যখন হ্রাস হইয়া যায়, তখন আর সে বাহ্যশক্তির সঙ্গে সংগ্রামে পূর্ব্বের ন্যায় আত্মরক্ষা করিতে পারে না; বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামে তাহাকে পদে পদে হটিতে হয় ও দ্রুতগতিতে তাহার ধ্বংসের দিকে যাইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। জাতির জীবনী-শক্তি হ্রাস হইলে নানাপ্রকারে তাহার লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোকের উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস, জাতীয় আয়ু পরিমাণের হ্রাস, অত্যধিক সাধারণ মৃত্যুর হার, বিশেষতঃ অত্যধিক শিশুমৃত্যুর হারই, সে সকলের মধ্যে প্রধান। জীবনীশক্তিহীন জাতির মধ্যে যে সকল শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অতি ক্ষীণপ্রাণ লইয়াই ভূমিষ্ঠ হয়। বাহ্যশক্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিবার ক্ষমতা তাহাদের অতি অল্পই থাকে। কাজেই জন্মগ্রহণের পর বেশীদিন তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না; ধরাপৃষ্ঠ হইতে শীঘ্রই তাহাকে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। সাধারণতঃ সকল সমাজেই ১-৫ এই বয়সের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার সাধারণ মৃত্যুর হার অপেক্ষা বেশী। কেননা, যাহারা অযোগ্য, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কঠোর নিয়মে এই বয়সের মধ্যেই তাহারা শীঘ্র শীঘ্র অপসৃত হয়। কিন্তু জীবনীশক্তিহীন জাতির মধ্যে এই বয়সের শিশুমৃত্যুর হার আরও বেশী হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং কোন জাতির মধ্যে অত্যধিক শিশুমৃত্যুর হার দীর্ঘকাল ধরিয়া দেখা গেলে, তাহার ভবিষ্যৎ বড় আশাজনক নহে বলিতে হইবে। এই হিসাবে বাঙ্গলাদেশের অত্যধিক শিশুমৃত্যু বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের পক্ষে বড়ই আশঙ্কার কথা। ইহা কেবলমাত্র সাময়িক ব্যাপার নহে। একেবারে জাতীয় জীবনের গোড়ার কথা।

বিশেষ কারণ

কিন্তু সাধারণভাবে শিশুমৃত্যুর এই গোড়ার কথা বলিয়াই সন্তুষ্ট থাকা যায় না। কি কি বিশেষকারণে বাঙ্গালীর এই জীবনীশক্তিহীনতা বর্দ্ধিত হইতেছে, কি কি কারণে এত অধিক ক্ষীণপ্রাণ দুর্ব্বল শিশু জন্মগ্রহণ করিতেছে ও শীঘ্র শীঘ্র জীব-

লীলা শেষ করিতেছে, তাহা একটু বিশেষ-রূপে ভাবিয়া দেখা উচিত।

দেশব্যাপী দারিদ্র্য

সেই কথা বলিতে গেলে প্রথমেই আমাদের দেশব্যাপী দারিদ্র্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে। এই দারিদ্র্য যে কিরূপ ভীষণভাবে বাঙ্গালী জাতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, কিরূপে তাহার শিরায় উপশিরায় বিষাক্ত জীবাণুর ন্যায় বাসা বাঁধিয়াছে, তাহার অস্থিমজ্জা চুষিয়া খাইতেছে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণনা করা অসম্ভব। যেদিকেই চাই দারিদ্র্যের এই কঙ্কালসার চেহারা চোখের সম্মুখে আসিয়া পড়ে; বাঙ্গলার জাতীয়জীবনের শ্মশানে অনাহারের প্রেতনৃত্য ভয়াবহরূপে দেখা দেয়। যে দেশের অধিকাংশ লোক নিত্য একবেলাও খাইতে পায় কিনা সন্দেহ, যে দেশে দুর্ভিক্ষ বৎসরের পর বৎসর লাগিয়াই আছে, যে দেশের মর্ম্মস্থান হইতে 'মৈ ভুঁখা হুঁ' শব্দ চিরন্তন কাতরতার ন্যায় প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার দারিদ্র্যের কথা না বলাই ভাল। এই সর্ব্বগ্রাসী দারিদ্র্যই যে বংশের পর বংশ বাঙ্গলাদেশের পিতামাতার জীবনীশক্তি ক্ষয় করিয়া দিতেছে ও দুর্ব্বল ক্ষীণপ্রাণ শিশুর জন্ম ঘটাইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনাহারক্লিষ্ট পিতার বীজ স্বভাবতঃই শক্তিহীন। তারপর অনাহারক্লিষ্টা দুর্ব্বল মাতার জঠরে যে শিশু বর্দ্ধিত হয়, তাহার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইবে ও জন্মগ্রহণের কিছুদিন পরেই সে যে মরিয়া যাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? খাদ্যাভাবে জীবন্মৃতা এরূপ মাতার শিশু গর্ভ হইতেই নানা স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত হইতে পারে; প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার শক্তি তাহার সহজেই হ্রাস হইয়া পড়ে ও ভূলোকের আলোকদর্শন তাহার ভাগ্যে আর বেশীদিন ঘটে না।

ম্যালেরিয়া

বাঙ্গালীর জীবনীশক্তিহীনতার আর এক কারণ ম্যালেরিয়া। বিগত অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া এই ম্যালেরিয়া অক্টোপাসের ন্যায় বাঙ্গলাদেশকে জুড়িয়া ফেলিয়াছে; এখন ইহা বাঙ্গালীর বুকের উপর বসিয়া তাহার কণ্ঠ রোধ করিতেছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিসাব করিলে দেখা যায় যে গড়ে প্রতিবৎসরে এক ম্যালেরিয়াতে বাঙ্গলাদেশে ১০ লক্ষ হইতে ১৫ লক্ষ মরিয়া থাকে। যাহারা এই রোগগ্রস্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকে তাহাদেরও জীবন্মৃত অবস্থা। এই ভীষণ রোগের ফলে তাহাদের সমস্ত দৈহিক যন্ত্রই বিকৃত ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। বংশের পর বংশ তাহাদের জীবনীশক্তি ইহাদ্বারা অত্যধিকরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানেরা আবার কিরূপ জীবনীশক্তিহীন হইয়া জন্মায় তাহা অনুমানই করা যায়। কঠিন রোগগ্রস্ত পিতার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বীজও দুষ্ট ও বিকৃত হইয়া উঠে; রুগ্না মাতার জঠরস্থ সন্তান অনেক স্থলে জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই রোগবীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে। আর বংশানুক্রমে এই রোগ-প্রবণতা ও জীবনীশক্তিহীনতা

তর বেগে বাড়িয়াই চলে। এই পঞ্চাশ সরের ম্যালেরিয়ার ফলে বাঙ্গালীর যে বস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখিয়া ভাবিতেও য় হয় যে আর পঞ্চাশ বৎসরে ইহার ফল রূপ ভীষণ দাঁড়াইবে। এখনই আমরা ামিতির সরলরেখায় দাঁড়াইয়াছি, বোধ হয় ার পঞ্চাশবৎসরে জ্যামিতির বিন্দুতে বসিত হইব। ম্যালেরিয়ার ফলে জীবনী-ক্তিহীনতার সঙ্গে সঙ্গে যে জাতীয়জীবনে বসাদ ও নৈতিক অধঃপতনও হইতেছে, হাও মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বাল্যবিবাহ

বাঙ্গালীজাতির জীবনীশক্তিহীনতার আর একটা গুরুতর কারণ বাল্যবিবাহ। যত-র জানা যায়, এখনকার আকারে প্রচলিত াল্যবিবাহ বাঙ্গলাদেশে পূর্ব্বে ছিল া। ৪০০।৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান াজার আমলে এইরূপ বাল্যবিবাহ-বিধি বিশেষ করিয়া প্রচলিত হয়। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত এই কুপ্রথা বাঙ্গালীজাতির জীবনীশক্তিকে ক্ষয় করিয়া আসিতেছে ও তাহার ফলে আমরা পঙ্গু, বামন, ক্ষীণকায়, উদ্ভিদের জাতিতে দাঁড়াইয়াছি। দুই এক দিনে একটি কুপ্রথা জাতীয়জীবনে তাহার অনিষ্টকর শক্তির পরিচয় না দিতে পারে; কিন্তু ক্রমাগত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া জাতির ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া থাকিলে, শেষে সে আত্মপ্রকাশ করিবেই।

অপুষ্টদেহ বালক-পিতার বীর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে তেজবিশিষ্ট হয় না, তাহার রস, রক্ত, মজ্জা কিছুই পরিপুষ্ট হয় না। সুতরাং তাহার ঔরসে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে তাহার পক্ষে ক্ষীণপ্রাণ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু বাল্যপিতৃত্ব অপেক্ষা বাল্য-মাতৃত্বই আরও বেশী অনিষ্টের কারণ। কারণ, মাতার সঙ্গেই সন্তানের জীবনের বেশী সম্বন্ধ। প্রাণসূচনা হইতে মাতারই দেহের মধ্যে তাহাকে বাস করিতে হয়, তাঁহারই রসরক্তের দ্বারা উহার দেহের পুষ্টি হয়। এই মাতা যদি অপরিণতবয়স্কা ও অপুষ্টদেহা হয়, তবে কুক্ষিস্থ সন্তান যে যথেষ্ট জীবনীশক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয়। এ বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শারীরতত্ত্ববিদগণ একমত। পাশ্চাত্য মতাবলম্বী সকল শারীরতত্ত্ববিদ এক-বাক্যে বলিয়াছেন, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে মাতার শরীর পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। তৎপূর্ব্বে তাহাদের সন্তান হইলে জীবনীশক্তিহীন হইবারই কথা। প্রাচ্য শারীরতত্ত্ববিদগণেরও এই মত। সুশ্রুত স্পষ্ট বলিতেছেন—

উন ষোড়শবর্ষায়াং অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশতিঃ।
যথাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥

(সুশ্রুত সংহিতা—শারীর-স্থানম্)

ষোড়শ বর্ষের কম বয়সের পত্নীতে পঁচিশ বৎসরের কম বয়সের পিতা যদি গর্ভ উৎপাদন করে, তবে সেই শিশু গর্ভেই বিপদাপন্ন হয়। এর চেয়ে স্পষ্ট কথা আর কি হইতে পারে? কিন্তু তবুও আমাদের দেশে কোন কোন গতানুগতিক ব্যক্তি বলেন যে ঋতুকালই স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক যৌবনসূচনা করে। আর যখন যৌবন সূচনা হয় তখনই রমণীর গর্ভধারণের

স্বাভাবিক ও প্রশস্ত সময়। এ দেশের স্ত্রীলোকদের স্বাভাবিক ঋতুকাল গড়ে ১৩ বৎসর বয়স। অতএব ঐ সময়েই তাহাদের পক্ষে গর্ভধারণের স্বাভাবিক কাল। ইঁহারা যে এই অদ্ভুত মত কোথায় পাইলেন, জানি না। বোধ হয় শারীর-বিদ্যার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় না রাখিয়াই ইঁহারা এ বিষয়ে রক্ষণশীলতার রিহার্সাল দিতে লাগিয়া যান। গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসী হিন্দুদী নারীদের ঋতুকালের বয়স গড়ে ৯—১১ বৎসর। জিজ্ঞাসা করি ঐ বয়স কি তাহাদের সন্তান প্রসবেরও উপযুক্ত সময়? অধিক তর্কের প্রয়োজন নাই। অপুষ্টদেহা অপরিণত-বয়স্কা মাতার গর্ভের সন্তান যে জীবনীশক্তিহীন হইবে, তাহা এত বেশী সোজা কথা যে কাহারও বুঝিতে গোলমাল হয়, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

বাঙ্গলা দেশে হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদের মধ্যেই ইহার প্রচলন বেশী। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মধ্যে কিরূপ হারে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, তাহা নিম্নের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে।

(১৯১১)

বাল্যবিবাহ

বয়স	হিন্দু	মুসলমান
৫—১০	শতকরা—১২·৫	৯
১০—১৫	,, ৬৭	৫৬

সুতরাং বাঙ্গলা দেশের এই শিশুমাতাদের শিশুরা যে জন্মিয়াই ইহলীলা সংবরণ করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?

এই বাল্যমাতৃত্বের দোষে যে শি মৃত্যুরই আধিক্য হয়, তাহা নহে, প্রসূ দেরও বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। অল্পবয়সে সন্ত প্রসব করিয়া তাহাদের শরীর ভগ্ন ও চি রুগ্ন হইয়া পড়ে। বাঙ্গলাদেশের অন্তঃপু খুঁজিলেই ইহার দৃষ্টান্ত অনেক পাও যাইবে। প্রধানতঃ এই বাল্যমাতৃত্বের ফলে কিছুদিন হইল কলিকাতাতে পুরুষ অপে স্ত্রীর মৃত্যুর হার প্রায় দেড়গুণ বাড়ি উঠিয়াছে। কলিকাতার পুরুষের মৃত্যু হার হাজারকরা ২৩·৫, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু হার হাজারকরা ৩৮·৫। আর এই সক স্ত্রীলোকদের মধ্যে ক্ষয়রোগে মৃত্যুর সংখ্যা খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। সাধারণতঃ সক স্থানেই স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষদের মৃত্যুর হার বেশী হয়। কিন্তু কলিকাতাতে এ স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

দারিদ্র্য, ম্যালেরিয়া ও বাল্যবিবাহ এ তিন রাক্ষস একযোগে বাঙ্গালীর র শোষণ করিতেছে; সুতরাং বাঙ্গালী ক্রমেই জীবনীশক্তিহীন হইয়া পড়িবে তাহার শিশুরা যে অত্যধিক পরিমা মরিতে থাকিবে, তাহা আর বিচিত্র কি

আনুষঙ্গিক কারণ

আবার এই বিশেষ কারণগুলির স কতকগুলি আনুষঙ্গিক কারণ জুটিয়া শি মৃত্যুর হার বেশী করিয়া তুলিয়াছে। এ আনুষঙ্গিক কারণগুলি প্রধানতঃ শি জন্মগ্রহণের পর কার্য্য করিয়া থাকে। এ ত বাঙ্গলার শিশুরা ক্ষীণ জীবনীশক্তি লই জন্মায়। তার উপরে জন্মগ্রহণের পরে

তাহারা অনুকূল অবস্থার মধ্যে বর্দ্ধিত হয় তবে ত তাহাদের স্তিমিতজ্যোতি দীপ শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইবার কথা। গ্রহণের পর যে সকল প্রতিকূল অবস্থা শিশুর জীবনের বিরুদ্ধে কার্য্য করে হার সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। মরা তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কটির কথা এখানে বলিতে চেষ্টা রিব।

বাঙ্গলার সূতিকাগৃহ

শিশু যেরূপ গৃহে ভূমিষ্ঠ হয় ও ভূমিষ্ঠ ইবার পর কিছুকাল ধরিয়া বর্দ্ধিত হয় হা তাহার স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির উপর ষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এককথায় তিকা-গৃহের অবস্থার সঙ্গে শিশুর জীবন-রণ অনেক পরিমাণে জড়িত। আবার সূতির স্বাস্থ্যও সূতিকা-গৃহের অবস্থার পর নির্ভর করে। অস্বাস্থ্যকর সূতিকা-গৃহে থাকিয়া যদি প্রসূতির স্বাস্থ্যভগ্ন হয়, বে তাহার স্তনে পুষ্ট শিশুর অবস্থাও চনীয় হইয়া উঠে। অনেক বাতাস-ন, সঙ্কীর্ণ, স্যাঁৎসেঁতে, দুর্গন্ধময়, নিরানন্দ তিকাগৃহ শিশুর ও প্রসূতির জীবনের ক্ষে সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ। আর বলিতে ষ্ট হয় যে, বাঙ্গলার সূতিকা-গৃহের অবস্থা বিকল ঐরূপ। শুনিতে পাই হিন্দুর কাছে দ্যোজাত শিশু দেবতা ও প্রসূতি গণেশ-জননীরূপে কল্পিত হন। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখি যে আমাদের জন্মাশৌচের শুদ্ধযুক্তির প্রভাবে সূতিকাগৃহ দেবমন্দির না হইয়া কাগারের চেয়েও জঘন্য হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গলা পল্লীজীবনের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় আছে। আর পল্লীগ্রামের যেখানেই গিয়াছি, সূতিকাগৃহের অবস্থা দেখিয়া হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে। বাড়ীর প্রাঙ্গণের এক কোণে (যেখানে 'ছুঁৎমার্গ' ধর্ম্মনষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা নাই) তালপাতা বা চাটাই দিয়া ঘেরা যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঁড়ে প্রসবের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয় তাহাই আমাদের সূতিকাগৃহ। ইহার 'মেজ' অবশ্য মাটীর সঙ্গে সমান। রৌদ্র হোক, ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, তাহার মধ্যে হাঁটু-সমান জল উঠুক বা বিষাক্ত বাষ্প নির্গত হোক, সেই অপূর্ব্ব সূতিকা-গৃহেই বঙ্গের প্রসূতি ও সদ্যোজাত শিশুকে বাস করিতে হয়। সাধারণতঃ নীচজাতীয় রমণীরাই সেখানে তাহাদের একমাত্র সঙ্গিনী। বাড়ীর পুণ্যবতী গৃহিণীরা পুণ্যভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কায় পারত পক্ষে সেদিক মাড়ান না। আমি জানি যে কোন এক শুদ্ধাচারিণী হিন্দু বিধবা, শ্রাবণের জলধারার মধ্যে, এইরূপ সূতিকা-গৃহে তাঁহার বালিকা কন্যা একাকিনী কষ্ট পাইলেও, তিনি 'সুকৃতি' নাশের আশঙ্কায়, কিছুতেই সে দিক দিয়া যান নাই। তাঁহারই বা অপরাধ কি? হয়ত কন্যা-স্নেহের স্বাভাবিক আকর্ষণে সেখানে গেলে আমাদের সমাজের 'ট্রষ্টিগণ' তখনই তাঁহার পরকালের পথ রুদ্ধ করিয়া দিতেন ও তাঁহার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতেন।

পল্লীর কথা যেরূপ বলিলাম, সহরের অবস্থাও তার চেয়ে কোন অংশে ভাল নহে। সেই আলোক-বাতাসহীন, অস্বাস্থ্যকর,

বিষময় পর্ব্বতগুহা এখানেও সূতিকাগৃহরূপে ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত অস্বাস্থ্যকর, সাক্ষাৎ রোগের ক্ষেত্রস্বরূপ জঘন্যগৃহে বাস করিয়া প্রসূতিরা যে নানারূপ কঠোর রোগে আক্রান্ত হইবে ও শিশুরাও শীঘ্র শীঘ্র ভবলীলা সংবরণ করিবে তাহা বোধ হয় আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। প্রসবের পর প্রসূতি ও সদ্যোজাত শিশু উভয়েরই দেহ অতি দুর্ব্বল ও অব্যবস্থিত থাকে। তাহার উপর যদি এরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাহাদিগকে পড়িতে হয়, তবে তাহাদের বাঁচিবার আশা কোথায়? বরং ইহা সত্ত্বেও যে বৎসর বৎসর কতকগুলি শিশু বাঙ্গলাদেশে বাঁচিয়া থাকে, ইহাই আমার কাছে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

খাদ্যের অভাব

যেমন সূতিকাগৃহের কুব্যবস্থা, তেমনই প্রসূতি ও শিশুর উপযুক্ত খাদ্যাভাবও—শিশুমৃত্যুর আর-একটা আনুষঙ্গিক কারণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সদ্যপ্রসবের পর প্রসূতির দেহ দুর্ব্বল ও অব্যবস্থিত থাকে। এই সময়ে তাহার শরীরের যাহাতে পুষ্টি হয়, এমন খাদ্যের প্রয়োজন। উপযুক্ত খাদ্যাভাবে প্রসূতির শরীর পূর্ব্বের বল ফিরিয়া পায় না। আবার সন্তানও এরূপ অপুষ্টদেহা, দুর্ব্বল মাতার স্তন্যে পালিত হইয়া রুগ্ন, দুর্ব্বল ও জীবনীশক্তিহীন হইয়া পড়ে। অবশ্য দেশব্যাপী দারিদ্র্যের সঙ্গে খাদ্যাভাবের কারণ অনেক পরিমাণে জড়িত। বাঙ্গলার অধিকাংশ লোকেরই দুবেলা অন্ন জুটে না, সে অবস্থায় প্রসূতির যে উপযুক্ত খাদ্য মিলিবে, সে সম্ভাবনা কোথায়? তবে স্বাস্থ্যতত্ত্বে অনভিজ্ঞতাও এর জন্য কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী। যেখানে তেমন খাদ্যাভাবের কারণ নাই, সেখানে অজ্ঞতা ও দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার দরুনও প্রসূতির ভালরূপ পুষ্টির ব্যবস্থা হয় না। আবার বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবেও শিশুর পুষ্টির যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়। আজকাল নানাকারণে একদিকে যেমন গবাদি পশুর হ্রাস হইতেছে, অন্য দিকে তেমনই বিশুদ্ধ দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে বিশুদ্ধ দুগ্ধ মিলে না বলিলেই হয়, যদিও মিলে তবে তাহা এত দুর্মূল্য যে সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্লভ। পল্লীগ্রামের অবস্থাও আজকাল প্রায় তাহাই দাঁড়াইয়াছে। মাতৃদুগ্ধের পরে গোদুগ্ধই শিশুর প্রধান খাদ্য। বিশুদ্ধ গোদুগ্ধের অভাবে বাঙ্গালী শিশুর পুষ্টির যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়, সন্দেহ নাই। কতকটা-বা বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবে কতকটা-বা 'ফ্যাসানের' বশবর্ত্তী হইয়া আজকাল অনেকে শিশুদিগকে বিদেশে প্রস্তুত নানারূপ কৃত্রিম 'ফুড' খাওয়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেগুলি শিশুর পক্ষে সুপথ্য কিনা, সন্দেহ আছে। বরং অনেক সুচিকিৎসক বলেন, যে ঐ সকল কৃত্রিম খাদ্য শিশুদের পক্ষে অনেক সময় অনিষ্টকর হয়।

পরিচর্য্যার অভাব

প্রসূতি ও শিশুর উপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাবও শিশুমৃত্যুর পক্ষে অনেক সহায়তা করে। আজকাল সভ্যদেশসমূহে ধাত্রী-

বিদ্যার কত উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু আমরা সেই 'সেকেলে দাই'দের উপরই নির্ভর করিয়া বসিয়া আছি। সভ্যতার ফলে, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি প্রভৃতি নানাকারণে মানবজাতির মধ্যে অনেক নূতন নূতন রোগের সৃষ্টি হইতেছে। প্রসূতি ও শিশুদের সম্বন্ধেও অনেক নূতন রোগ দেখা দিয়াছে। উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও ধাত্রীবিদ্যার ফলে সভ্যদেশসমূহে ঐ সকল রোগ নিরাকরণের উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে। কিন্তু আমরা সেই অনাদিকালের 'সনাতন' প্রথা আঁকড়াইয়া বসিয়া আছি এবং পরম-নিশ্চিন্তভাবে প্রসূতি ও শিশুদিগকে মরিতে দিতেছি। প্রসবের পর প্রসূতির রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নানা রোগের সম্ভাবনা হয়। অজ্ঞতার ফলে আমাদের দেশে অনেক সময় প্রসূতিদিগকে ঐ সকল রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যায় না। ব্যাধি-পীড়িতা মাতার শিশুও নানারূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে অবশ্য সুশিক্ষিতা ধাত্রী আছে। কিন্তু লোকসংখ্যার তুলনায় তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম; তাহাদিগকে অর্থ দিয়া ডাকিতে পারে এরূপ সামর্থ্যও অতি অল্প লোকেরই আছে। শিশুপালনে অনভিজ্ঞতাও শিশুর জীবনীশক্তি হ্রাসের আর একটা কারণ। বাঙ্গলাদেশের বালিকা মাতারা শিশুপালনে স্বভাবতঃই অনভিজ্ঞ ও অক্ষম। আবার আধুনিক কালের প্রবীণারাও নানা-কারণে সে বিদ্যাটা ভুলিয়া যাইতেছেন।

প্রতিকারের উপায়

কি কি কারণে বাঙ্গলাদেশে এইরূপ অত্যধিক শিশুমৃত্যু হইতেছে, তাহা আমরা একপ্রকার বুঝিলাম। কিন্তু কেবল বুঝিয়া কি হইবে? যদি তাহার কোন প্রতিকারের উপায় না করা যায়, তবে সকলই বৃথা। দেশব্যাপী দারিদ্র্য, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বৃহত্তর সমস্যা। ও-গুলি জাতীয় জীবনের গোড়ার কথা; জাতীয় জীবনের নানা জটিল প্রশ্নের সঙ্গে সেগুলির সম্বন্ধ। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সকল বিষয়ের আলোচনা করা অসম্ভব। কিন্তু ঐগুলি ছাড়িয়া দিলেও শিশুমৃত্যুর অন্য কারণগুলির নিরাকরণের চেষ্টা আমরা করিতে পারি এবং তাহার ফলেও শিশুমৃত্যুর সংখ্যা অনেক পরিমাণে কমানো যাইতে পারে।

বাল্যমাতৃত্ব নিবারণ

বাল্যবিবাহ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ঘোরতর শত্রু তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই বাল্যবিবাহের কুপ্রথা যাহাতে আমাদের সমাজ হইতে লুপ্ত হয়, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু উহা আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে, যে তাহা নির্ম্মূল করা তেমন সহজ নহে। সেজন্য বহুদিনের সাধনার ও বহুকর্ম্মীর চেষ্টার প্রয়োজন। কিন্তু আপাততঃ আমরা বাল্যবিবাহের যে প্রধান কুফল—বাল্যমাতৃত্ব, তাহার নিবারণের চেষ্টা করিতে পারি। বর্ত্তমান যুগের বালক-বালিকাদের জন্য আমরা এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি, যাহাতে তাহাদের মনে ব্রহ্মচর্য্য ও সংযমের ভাব মুদ্রিত হইয়া যায়, জীবনের দায়িত্ববোধ জন্মে;—যথেচ্ছ সন্তান উৎপাদন

ও প্রসব করাই মানবজীবনের একমাত্র কার্য্য বলিয়া ভ্রম না হয়। আর বাল্য-বিবাহ হইলেই যে বাল্যমাতৃত্ব অবশ্যম্ভাবী, এমন কথাও নয়। বিহার, উড়িষ্যা, ও উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের অনেক স্থলেও বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু সেখানে বিবাহের পরই মেয়েকে শ্বশুরঘরে পাঠানো হয় না। মেয়ের উপযুক্ত বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত মেয়ে পিতৃগৃহেই থাকে, পরে 'যোগ্যা' হইলেই 'দ্বিরাগমন' হয়। আমরা একটু চেষ্টা করিয়া এ প্রথাও আমাদের মধ্যে চালাইতে পারি। বাঙ্গলার পিতামাতারাও চেষ্টা করিলে বাল্যবিবাহের অনেক কুফল নিবারণ করিতে পারেন। বালকপুত্র ও বালিকা পুত্রবধূ যাহাতে অতি তরুণ বয়সেই দৈহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ না হইতে পারে, তাঁহারা চেষ্টা করিলে সে সম্বন্ধে অনেক উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন। আত্মসুখ ও বিলাসই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যেকেরই জাতি ও সমাজের প্রতি মহত্তর কর্ত্তব্য আছে। সেই কর্ত্তব্যের জন্য আত্মসুখ ও ব্যক্তিগত বাসনা প্রভৃতি বিসর্জ্জন দেওয়াতেই উন্নততর মনুষ্যত্ব।

সূতিকাগৃহের সংস্কার

আমাদের সূতিকাগৃহের যাহাতে সংস্কার হয়, তাহা আমরা অনায়াসেই করিতে পারি। বাড়ীর যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুন্দরগৃহ, তাহা সূতিকাগৃহরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। এ বিষয়ে 'ছুঁৎমার্গ' অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইলে, প্রসূতির জন্য পূর্ব্ব হইতে উত্তমগৃহ প্রস্তুত করা উচিত। সেই গৃহে যাহাতে আলো ও বাতাস প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিতে পারে, তাহার মেজ যাহাতে উচ্চ ও শুষ্ক হয়, তাহা বেশ প্রশস্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। আমাদের শাস্ত্রে আছে শিশু, দেবতা। দেবতার মন্দির কি লোকে অশ্রদ্ধার সঙ্গে তৈরী করে? আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রেও ত এ বিষয়ে বেশ সুব্যবস্থা আছে। চরক বলিতেছেন—

"সূতিকাগারং কারয়েদপহৃতাস্থি শর্করা কপালে দেশে প্রশস্ত রূপরসগন্ধায়াং প্রাগ্-দ্বারমুদগদ্বারং বা। তদ্বসনা লেপনাচ্ছাদনা পিধান সম্পদুপেতং বাস্তুবিদ্যাৎ।.....হৃদয় যোগাগ্নি সলিলোদূখল বর্চ্চঃ স্থান স্নানভূমি—মহানস মৃতুসুখঞ্চ। (চরকসংহিতা শারীরস্থানম্)

অর্থাৎ অস্থি, শর্করা ও কপালশূন্য স্থানে, প্রশস্ত রূপ, রস ও গন্ধ বিশিষ্ট ভূমিতে পূর্ব্বদ্বারী বা উত্তরদ্বারী সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। * * * বস্ত্র, আলেপন, আচ্ছাদন ও আবরণ পদার্থ সেই গৃহে স্থাপন করিবে। অগ্নি, জল ও উদূখল সেই গৃহে রাখিতে হইবে। সেখানে ঋতুসুখকর ভাবে মলত্যাগের স্থান, স্নানের স্থান ও উনুন বিবেচনাপূর্ব্বক নির্ম্মাণ করিবে।

নিরানন্দ গৃহও প্রসূতির পক্ষে অনিষ্ট-কর। কি প্রকারে প্রসূতির রক্ষা ও আনন্দ বর্দ্ধন করিতে হইবে, তাহাও চরক বলিতেছেন।—

"স্ত্রিয়শ্চৈনাং যথোক্তগুণাঃ সুহৃদশ্চানুদ্যাযুর্দশাহং দ্বাদশাহং বা নু পরত-প্রদান মঙ্গলাশীঃ স্তুতিগীতবাদিত্র অন্নপান বিশদমনুরক্ত প্রহৃষ্টজনসম্পূর্ণং চ তদ্বেশ্ম কার্য্যং। (চরকসংহিতা...শারীরস্থানম)

অর্থাৎ দশ বা বারদিন পর্য্যন্ত যথোক্ত গুণ-সম্পন্ন স্ত্রীগণ এবং সুহৃদগণ তাহাদের রক্ষার্থ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিবেন। অবিরত গান, মঙ্গলাচরণ, আশীর্ব্বাদ, স্তুতি, গীত ও বাদ্য করিবেন। সূতিকা-গৃহে নির্দ্দোষ অন্নপান এবং হৃষ্ট ও অনুরক্ত জনের বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমরা বৃদ্ধ চরকের এই সকল ব্যবস্থা অনুসরণ করিলেও ত অনেক বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি।

বিশুদ্ধ দুগ্ধের ব্যবস্থা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দেশে বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব হইয়া পড়িতেছে। সহরের ত কথাই নাই, পল্লীতেও সেই অভাব অনুভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার প্রতিকারের উপায় দেশের শিক্ষিত লোকদের হাতে। তাঁহারা যদি শুধু গোয়ালাদের উপর ভার না দিয়া নিজেরা গোপালন ব্যবসা আরম্ভ করেন ও দেশের নানা স্থানে দুগ্ধশালা খুলিতে থাকেন তবেই ইহার প্রতিকার হয়। দেশের এই অর্থসমস্যার দিনে, শিক্ষিত লোকদের এই এক ব্যবসায়ের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। বৃথা গর্ব্বত্যাগ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যদি এই পথ অবলম্বন করেন, তবে নিজেদেরও অর্থাগম হয়, দেশেরও উপকার হয়। আমেরিকা দেশের মিউনিসিপালিটীর লোকেরা নানা স্থানে বিশুদ্ধ দুগ্ধের দোকান খুলিয়া অল্পমূল্যে দরিদ্রদের জন্য বিক্রয় করে। আমাদের মিউনিসিপালিটী, বিশেষতঃ কলিকাতা মিউনিসিপালিটী বিশেষ করিয়া এ ভার গ্রহণ করিতে পারে। 'জলো দুধে পুষ্ট দেহ' কলিকাতার শিশুদের প্রাণরক্ষার জন্য মিউনিসিপালিটীর ইহা করা উচিত; কেন না স্বাস্থ্যরক্ষার নানা ব্যবস্থা সত্বেও কলিকাতাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শিশু-মৃত্যুর হার দেখা যাইতেছে।

ধাত্রীর ব্যবস্থা

দেশে যাহাতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুশিক্ষিতা ধাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের যেরূপ লোকসংখ্যা, সেই তুলনায় সুশিক্ষিতা ধাত্রী নাই বলিলেই হয়। এমন কি কলিকাতা সহরেও লোকসংখ্যার অনুপাতে ধাত্রী-সংখ্যা অতি কম। আবার আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক যেরূপ গরীব, তাহাতে এই ধাত্রীদের ডাকিবার সামর্থ্যও তাহাদের নাই। ইহার একমাত্র উপায় অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপালিটী দ্বারা ধাত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা করা। গরীব লোকে যাহাতে বিনাব্যয়ে বা স্বল্পব্যয়ে এই সকল ধাত্রীর সাহায্য পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বসন্তের টীকা যেমন নানাস্থানে লোকে বিনাব্যয়ে বা স্বল্পব্যয়ে পাইতেছে, ধাত্রীর সাহায্যও সেইরূপভাবে লোকের পাওয়া উচিত। এ-বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসি-পালিটীর দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী। দেশে আজ-কাল শিক্ষিতা নারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহারা সকলে মিলিয়া নানা স্থানে শিশু ও প্রসূতি-সেবা-সমিতি প্রভৃতি স্থাপন করিতে পারেন। দরিদ্র, অশিক্ষিতা

ভগিনীদের যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় ও শিশুদের জীবনরক্ষা হয়, তাহা বিশেষ করিয়া শিক্ষিতা নারীদেরই করা উচিত। গত দামোদরের বন্যার সময় দেশের ছেলেরা প্রাণ দিয়া দেশের সেবা করিয়াছিল। সভা করিয়া তাহার জন্য বাহবা দিলেই, দেশের ও সমাজের শিক্ষিত রমণীদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। তাঁহারাও নিজেদের চেষ্টায় দেশের ও সমাজের জন্য কিছু করুন। আধুনিক শিক্ষিত রমণীদের সম্বন্ধে রক্ষণ-শীলদলের এই এক প্রধান অনুযোগ, যে তাঁহারা না পারেন এ দেশের রমণীদের মত 'গৃহধর্ম্ম' করিতে, না পারেন পাশ্চাত্য রমণীদের মত দেশের ও সমাজের সেবা করিতে। এই ত এতবড় একটা সেবার ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। শিক্ষিত রমণীরা দেশের শিশু ও প্রসূতিদের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া নিজেদের কলঙ্কমোচন করুন। তাহা হইলেই তাঁহাদের শিক্ষা সার্থক হইবে।

শিশু-পালন বিষয়ে শিক্ষাপ্রচার

আর একটি কার্য্য মিউনিসিপালিটী, গবর্ণমেণ্ট, এবং শিক্ষিত নারীরা, সকলেই করিতে পারেন। সেটী হইতেছে আধুনিক উন্নততর প্রণালীতে শিশু-পালন সম্বন্ধে শিক্ষা-প্রচার। এ-বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপালিটী পুস্তক লিখাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতে পারেন। যাহারা পড়িতে পারে না, তাহাদের জন্য মৌখিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। শিক্ষিত মহিলারাও এ বিষয়ে পুস্তকাদি প্রচার করিয়া বা বাড়ী বাড়ী গিয়া উপদেশ দিয়া অনেক কাজ করি পারেন। ভারত-স্ত্রী-মণ্ডল, অন্তঃপুরিকা শিক্ষার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন এ বিষয়েও তদনুরূপ ব্যবস্থা করা যাই পারে। মহিলা-শিল্প-বিদ্যালয়ের ন্যায়-শি পালন-বিদ্যালয় খুলিয়াও তাঁহারা বিষয়ে কুমারী ও বধূদিগকে শিক্ষা দি পারেন। অন্যান্য সভ্যদেশের মেয়েরা সকল উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন।

মানব-জীবনের মূল্য-বোধ

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দরকার দে মধ্যে ব্যক্তির জীবনের মূল্যবোধ। মানু জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে জাতির লো সংখ্যা কমিয়া যায়, তাহার জগতে দাঁড়া কঠিন হইয়া উঠে। শিশুরাই ভবিষ্যতে আশা। তাহাদের মৃত্যু যে জাতীয় জীবনে পক্ষে মহাঅমঙ্গলকর, তাহা আমাদের বুঝি হইবে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদের প্রাণরক্ষ চেষ্টা করিতে হইবে। সভ্যদেশসমূ এইরূপই হয়। পাশ্চাত্য দেশে শিশুমৃত্যু আধিক্য দেখা দিলেই লোকেরা ব্যস্ত হই উঠে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করে। সুফলও হা হাতে দেখা যায়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরি প্রভৃতি সভ্যদেশসমূহে শিশু-মৃত্যু হ্র করিবার নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে নিউজিল্যাণ্ড ইংলণ্ডের একটি ক্ষুদ্র উপনিবে —লোকসংখ্যার অধিকাংশই আদিম অস জাতিতে পূর্ণ। কিন্তু সেখানেও শিশুমৃ কমাইবার জন্য নানা উদ্যোগ-আয়োজ হইয়া থাকে এবং ইহাতে আশ্চর্য্য সুফ

গিয়াছে। ১৯০২-১৯১২ এই বৎসরে সেখানকার শিশুমৃত্যুর হার শত-করা ৮·৩ হইতে শতকরা ৫·১তে দাঁড়াইয়াছে। সকল দেশে গবর্ণমেণ্টই যে কেবল চেষ্টা করেন তাহা নহে। সাধারণেরও বিষয়ে যথেষ্ট কর্ত্তব্যবোধ আছে। মিউনিসিপালিটী, লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতি সর্ব্বদাই এ জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। শিশুমৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য নানা সমিতি ও সঙ্ঘও আছে। দেশের শিক্ষিত মহিলারাও নিঃস্বার্থভাবে এ সম্বন্ধে অকাতরে পরিশ্রম করিয়া থাকেন। শুধু তাঁহাদের দ্বারাই পরিচালিত অনেক সমিতি ঐ উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের Women's League Service, Imperial Health Association এবং নিউজিল্যাণ্ডের New Zealand Society for the Health of Woman & Children প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এই সকল দেশের দৃষ্টান্তে আমরাও দেশের ভয়াবহ শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে পারি। কেবল গবর্ণমেণ্টের উপর ভার দিলেই চলিবে না। আমাদের নিজেদেরই এ বিষয়ে অনেক কার্য্য করিতে হইবে। এ বিষয়ে দেশের মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, ও লোক্যাল বোর্ড সমূহেরও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাঁহাদিগকে খুব সতর্কভাবে শিশুমৃত্যুর হিসাব রাখিতে হইবে ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর হার বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বায়ত্বশাসনের জন্য শুধু বক্তৃতা করিলে চলিবে না। কার্য্যতঃ স্বায়ত্বশাসনের উপায় করিতে হইবে। নিজেদের জীবনমৃত্যু-সমস্যার সমাধানের উপায়ই যদি না করিতে পারি, তবে বড় বড় ব্যাপারে বাগাড়ম্বর করিয়া কি হইবে! দেশের শিক্ষিত নরনারীরা নানারূপ বাজে সভাসমিতি করিয়া শক্তিক্ষয় না করিয়া এই আত্মরক্ষার কার্য্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করুন। এ বিষয়ে সভাসমিতি করুন—শিক্ষাপ্রচার করুন। সহর ও গ্রামের মধ্যে —শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যোগসূত্র বাঁধিয়া কার্য্যক্ষেত্র গড়িয়া তুলুন। আপনাকে আপনিই বাঁচাইতে হইবে। যে শক্তি দেশের মধ্যে গুপ্ত আছে তাহা জাগ্রৎ করিয়া তুলিতে হইবে। শক্তিমানেরাই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকে; আর অলস, পরমুখাপেক্ষী দুর্ব্বলেরা শীঘ্রই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায়।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

সমসাময়িক ভারতের সভ্যতা

নব্য-হিন্দু

আমূল পরিবর্ত্তনের দিকে এক-দলের একটা যে প্রবণতা ছিল সেই প্রবণতার বিরুদ্ধে নব্য-হিন্দু মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া একটু ধীরভাবে সমাজের উন্নতিসাধনে অভিলাষী হইলেন।

তাঁহাদের মনস্তত্ত্বটা অনুশীলন করিলে সমস্ত বিষয়টার আলোচনার পক্ষে সুবিধা

হইবে। য়ুরোপে ধর্ম্মসংক্রান্ত সংশয়ই তীব্রতর নৈতিক বিভ্রাট উদ্দীপিত করে; ধর্ম্মে অবিশ্বাসই লামনে, জুফ্রোয়া ও রেনার গ্রন্থ-পৃষ্ঠাকে অনুপ্রাণিত করে। অপর কোন রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক সমস্যা এতাদৃশ বিভ্রাট উৎপাদন করে নাই। চিরপ্রথা অনুসরণ করা যে-দেশের মূলভাব, যেখানে ধর্ম্মের বাঁধাবাঁধি মতগুলা অবাধে চলিয়া আসিতেছে সেই ভারতবর্ষে এইরূপ সামাজিক পরিবর্ত্তন, ধর্ম্মের মত বিশ্বাসকেও সংশয়াপন্ন করিয়া তুলিয়া গুরুতর বিভ্রাট আনয়ন করিবে তাহাতে বিচিত্র কি।

বোম্বাই-হাইকোর্টের জজ তেলং-এর মৃত্যুতে, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত রাণাডে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন:—

"আপনাদের মধ্যে অনেকেই একটি সমগ্র ও পূর্ণাবয়ব সভ্যতা-সম্পদের অধিকারী —আপনাদের পক্ষে কল্পনা করাই কঠিন হইবে যে আপনারা পরস্পর-বিরোধী যুগল-জীবন যাপন করিতেছেন,—আপনারা দুই সভ্যতার মধ্যে থাকিয়া, দুই প্রকার বিশ্বাস, জীবন ও আচরণের দুই প্রকার আদর্শ লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যাঁরা ভাবেন এরূপ বিভক্ত জীবন যাপন করিবার কোন উপলক্ষ্য নাই। কেহ কেহ মনে করেন অতীতকাল, যাহাকে পুনরানয়ন করা যায় না—সেই অতীতকাল এখনো জীবন্ত বর্ত্তমানরূপেই রহিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন, কালের প্রবাহ কোন পরিবর্ত্তনই আনয়ন করে নাই, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেরূপ সমস্ত জগতের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবন-যাপন ও জীবনের কাজ করিয়াছিলে তাঁহারা এখনও সেইরূপভাবে জীবন-যাপ ও জীবনের কাজ করিতে পারিবেন আবার এমন লোকও আমাদের ম আছেন যাঁহারা ভাবেন যে, অতীত মৃত ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে; অতীতের সহি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নাই, বর্ত্তমা ও ভবিষ্যতেরই আমরা অনুগত ভক্ত। এ দুই চরম সীমার মাঝামাঝি আমরা কয়েকটি লোক আছি—আমরা অতীতকে ভক্তি করি, কিন্তু আমাদের মঙ্গলের জ বিধাতা আমাদিগকে যে নূতন অবস্থায় স্থাপন করিয়াছেন, আমরা ক্রমশঃ অতীতকে সেই অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতে চাহি। আমরা অতীতকে আঁকড়াইয়া ধরিব, কিন্তু সেই সঙ্গে বর্ত্তমানকেও হাতছাড়া করিব না। এইজন্য শত্রু মিত্র উভয়ই অনেক সময় আমাদিগকে ভুল বুঝিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে আমাদের পরলোকগত বন্ধু একজন। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত ছিলেন, তিনি বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি যদি অকপটভাবে বর্ত্তমানকে একেবারে অস্বীকার করিয়া অতীতের মধ্যেই থাকিতে পারিতেন; যদি বিভক্ত জীবনের কষ্টভোগ তাঁহাকে না করিতে হইত, অথবা অকপটভাবে ও সরল বিশ্বাসে অতীতকে অস্বীকার করিয়া বর্ত্তমানকে লইয়াই থাকিতেন তাহা হইলে তিনি আরো কিছু দিন বাঁচিতে পারিতেন; তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইত না, তিনি নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিতেন।

ং ও তাঁহার বন্ধুগণের কি প্রকার বাধা য়ের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, আমাদের রোপীয় বন্ধুগণ তাহা ধারণা করিতে রেন না।"

নিজের সংশয়-সঙ্কোচকে প্রশমিত রিবার নিমিত্ত, নব্য-হিন্দুরা হিন্দুসভ্যতার -প্রকৃতি বজায় রাখিয়া সেই সঙ্গে য়ুরোপীয় ভ্যতার প্রেরণা অনুসারে সমাজ সংস্কার রিতে সচেষ্ট হইলেন।

রাণাডের লেখা হইতে এইখানে আর কটা স্থান উদ্ধৃত করিব।

"নিশ্চিতরূপে উন্নতিসাধন করিতে হইলে ীরে ধীরে উন্নতিসাধন করা আবশ্যক। সাহসিকেরা শত বৎসরের কাজ দশ ৎসরে সম্পন্ন করিতে চাহে। এই লোভনকে দমন করা উচিত। এই ম্বন্ধে উদ্‌বর্ত্তনবাদ হইতে আমরা যে শিক্ষা াভ করি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষা ার কিছুই নাই।

উদ্‌বর্ত্তনবাদ (Evolution) কি আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয় না যে, অভিবৃদ্ধি গঠনগত ও জৈবিক, এবং সমগ্র দেহযন্ত্রের সমস্ত অংশের উপরেই উহার ক্রিয়া প্রকটিত হয়? এবং কতকগুলি অংশের ক্ষতি করিয়া অপর কতকগুলি অংশের বৃদ্ধি করা তাহার কাজ নহে? অতীতের বন্ধন ছিন্ন করিতে আমরা পারি না—ছিন্ন করা উচিতও নহে। কেননা, অতীতের সহিত অতীত গৌরবের আমরা উত্তরাধিকারী; উহার জন্য আমরা গর্ব্ব করিতে পারি, উহা হইতে আমাদের লজ্জা পাইবার কিছুই নাই।" (১)

* * *

নব্য হিন্দুরা সভাসমিতি স্থাপন করিয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি রক্ষণশীল যথা "ধর্ম্মমণ্ডল"; আর কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অগ্রসর যথা;—"Poona Reform

(১) মহাদেও গোবিন্দ রাণাডে ২০ জানুয়ারী ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (Fellow ১৮৬৫) Elphinstone College এর অধ্যাপক। ১৮৬৬, মেজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। জানুয়ারী ১৯০১ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। বিদ্যা বুদ্ধি ও জনহিতকর কার্য্যে একজন সর্ব্বপ্রধান প্রভাবান্বিত হিন্দু।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গের প্রাদেশিক পরামর্শ-সভা চাহিতেছে, হিন্দুদের শিক্ষার জন্য সমুদ্রযাত্রায় জাতের লোকেরা যেন বাধা না দেয়। অন্যান্য পরামর্শ-সভাও এই সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছে।

মিষ্টার বোস্ কতকগুলি কৌতুকাবহ হিসাবের অঙ্ক দিয়াছেন:—দার্জিলিঙ্গের স্বাস্থ্যনিবাসে ১৮৮৮-৮৯ অব্দে ১১৪ জন হিন্দু হিন্দুরীতি অনুসারে এবং ১৮১ জন য়ুরোপীয়রীতি অনুসারে আহার করিয়াছে; ১৮৯১-৯০ অব্দে অঙ্কের সংখ্যা ১৬৩ ও ২২০ হইয়াছিল। ১৮৯০-৯১তে ১৩৫ ও ১৮৬ হইয়াছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে দার্জিলিংএর স্বাস্থ্যনিবাসে গোঁড়া হিন্দু খুব কমই যায়।

সভাসমিতির মধ্যে "কায়স্থ পরামর্শ সভা" ও "ওয়ালটরক্‌ৎ রাজপুত্র হিতকরী সভা" উল্লেখযোগ্য। তাহারা বিবাহের ব্যয়-সঙ্কোচের চেষ্টা করিতেছে। এবং ৬ মাসের আয়ের অধিক পুত্রের বিবাহে এবং একবৎসরের আয়ের অধিক কন্যার বিবাহে খরচ করিবে না এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছে। বরেলীর কংগ্রেস ১৮৯১ (Bose 1-68)

Association"। "National Social Conference" ভারতের কোন-না কোন নগরে সভা আহ্বান করিয়া থাকে। এই সভাসমিতির কার্য্যপন্থা বিভিন্ন; সভার সাময়িক অধিবেশন, পুস্তক, সংবাদপত্র, পুস্তিকাদির প্রচার, বাড়ী-বাড়ী গিয়া লোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ; উহারা সভ্যদিগকে প্রতিজ্ঞার বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। এই সকল বিষয়ে তাহাদের প্রধান চেষ্টা যথাঃ— বিধবা-বিবাহে সম্মতিদান; বাল্য-বিবাহ না দেওয়া; বিবাহ ও শ্রদ্ধাদি উপলক্ষে অতিব্যয়সাপেক্ষ অনুষ্ঠান না করা; পারিবারিক উৎসবাদিতে বাই-নাচ না দেওয়া।

যে সকল বিষয় খুব গুরুতর তৎসম্বন্ধে সমাজ-সংস্কারকেরা বড় একটা সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। তাহাদের অনুবর্ত্তিগণের সংখ্যা খুবই কম।

কিন্তু জাতসংক্রান্ত নিয়মের কঠোরতা অনেকটা কমিয়াছে। কেবল কতকগুলি উচ্চতম জাতের মধ্যেই এখনো মদ্য-মাংসের ব্যবহার নিষিদ্ধ; এমন-কি বড় বড় সহরে গোমাংস আহারও চলে। এবং যাহারা সমুদ্র যাত্রা করে (একটা মহাপাতক) তাহারা সহজে ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়।

অনেকটা অনিশ্চিত হইলেও, য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। ৬ লক্ষ যুবক মধ্য-শিক্ষা অথবা উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে; তাহার ফলে, লক্ষ লক্ষ হিন্দু য়ুরোপীয় ধরণে শিক্ষিত হইয়া উঠে। সরকারী ছোট পদস্থ কর্ম্মচারী, সাধারণ কর্ম্মচারী, পুলিসের লোকে, সেপাই, দোকান ও ব্যাঙ্কের কেরানি, কারখানার শ্রমজীবী, যে-কেহ ইংরেজী বা দেশী খবরের কাগজ পড়ে,—ইহাদের সকলেরই ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার কিয়ৎপরিমাণে চলিয়া যায়। তাহারাও আবার জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। জাতের খণ্ডবিভাগের ন্যায়, য়ুরোপের নৈতিক মতবাদ ও য়ুরোপের ভৌতিক উন্নতি চেষ্টাও সুদৃঢ় প্রাচীন সমাজগঠনকে ধীরে ধীরে ভাঙ্গিবার পক্ষে সাহায্য করিতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার বেদনা

আমার বেদনা আর ধরিল না বুকে,
সে যে ছেয়ে গেল দূর আকাশের মুখে,
তীব্র দাব দাহে
পাণ্ডুর করিয়া দিল ঘন নীলিমায়,
রৌদ্রের প্রবাহে
অরণ্যের সঙ্গোপন স্নিগ্ধ তন্দ্রিমায়
দগ্ধ করি, জ্বালাইল পলাশ, শিমুল,
স্ফুলিঙ্গের গুচ্ছে-বাঁধা অশোকের ফুল!

আমার এ ফেটে-পড়া ক্রন্দনের স্বরে,
নির্ঝরে, উৎসের মুখে, নদীর অন্তরে
উঠিছে গুমরি
তরঙ্গের আন্দোলনে অনন্ত বিলাপ,
উঠিছে মর্ম্মরি
তরুপত্রে ছন্দোহীন মর্ম্মের প্রলাপ;
প্রান্তরের নিরন্তর অশান্ত নিশ্বাস,
হায়, হায়, হাহাকারে ভরিছে আকাশ!

মৌন আমি, বহুদিন বিনিদ্র নয়ন,
প্রত্যেক নিমেষে খসি পড়িছে স্বপন,
আশা মাধুকরী
যা কিছু অঞ্চলে মোর এত দিন ধরি
দিয়েছিল ভরি,
আন্‌মনা আকর্ষণে পড়ে গেছে ঝরি!
শূন্য পড়ে আছে মোর সকল অন্তর
ব্যথায় ভরিয়া গেছে বিশ্ব চরাচর!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

তরুতীর্থ

(১)

নদীর ওপারে নগর ও তীর্থক্ষেত্র। অনেক যাত্রী সেখানে যায়। দেখিবার ও পুণ্যসঞ্চয় করিবার কত কী সেখানে আছে! কিন্তু নদীর এপারে বনের মধ্যে এই যে পুরানো আম গাছটি—এখানে দেশের ও বিদেশের এত পথিক, এত তীর্থযাত্রী, সকলেই একবার করিয়া আসে কেন? এ কি তীর্থস্থান? কোন্ দেবতার অধিষ্ঠান এখানে?

আমাদের সঙ্গী বা সহযাত্রীরা কেহই এ-কথার ঠিক উত্তর দিতে পারিল না। কেহ বলিল, 'এই তরুতলে জল দিলে সর্ব্বদুঃখ দূর হয়,' কেহ বলিল, 'মনস্তাপ যায়,' কেহ বলিল, 'দীর্ঘজীবী হয়,' ইত্যাদি। আর স্থানীয় পাণ্ডা-মহাশয় শিব-দুর্গার কথা-মিশ্রিত যে দীর্ঘ ইতিহাস আবৃত্তি করিলেন, তাহা নূতন হইলেও শুনিয়া হাসি থামানো গেল না।

ফিরিবার সময় আমি নদী-তীরে দাঁড়াইয়াছিলাম; দেখিলাম নৌকায় পার হইবার জন্য এক বৃদ্ধ আমাদের সাথী হইয়াছেন। পূর্ব্বে যখন আমি জনে-

জনে বৃক্ষটির ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, তখন এই প্রাচীন আমার প্রতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহাকে আর দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাই নাই। তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া আমার কৌতূহল আবার জাগিল; কাছে গিয়া বলিলাম, "মহাশয়, অনেকেই অনেক কথা বলিল, আপনি এ গাছটির সম্বন্ধে নূতন কিছু জানেন কি?"

—"নূতন নয়, তবে আমিও একটা কাহিনী জানি বটে—কিন্তু আর সময় কৈ?"

সন্ধ্যার বিলম্ব ছিল না, নৌকা তখন যাত্রী লইয়া পরপারে—আমি বলিলাম, "বড় গল্প না কি?—"

"গল্প নয়—ঘটনা সত্য। আচ্ছা, যতটুকু হয় বলিতেছি।" বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, নদীর ধারে সবুজ ঘাসের উঁচু জমির উপর বসিয়া আমি শুনিতে লাগিলাম।

"এই নদীর ধারে পূর্ব্বে এমনি বন ছিল বটে, কিন্তু এখানটি এমন বিজন ছিল না। বনের মধ্যে এই গাছটির আশেপাশে কয়েকখানি কুটীর তাহাদের সুখ-দুঃখ দিয়া

ঘেরিয়া একখানি ক্ষুদ্র পল্লী রচনা করিয়াছিল। উপার্জ্জনের সুবিধা নাই, ভূমি উর্ব্বরা নয়, তবু এখানে মানুষ ছিল। সম্মুখে নগরের উজ্জ্বল প্রলোভন ছিল বটে, কিন্তু এই ভগ্ন কুটীর আর নির্জ্জন নদীতীরটির মায়া তাহারা কাটাইতে পারে নাই। পিতা-মাতার চরণধূলিপূত সোনার মাটি ত্যাগ করিয়া যাওয়া তো সহজ নয়! বনের কাঠ কাটিয়া, নদীতে মাছ ধরিয়া, ফল বেচিয়া দুঃখে-কষ্টেই কোনরকমে সকলের দিনগুজরাণ হইত।

তাহাদেরই মধ্যে ছিল দুইটি রাজপুত পরিবার। কাঠুরিয়াদের সঙ্গে তাহারাও কাঠ কাটিত, ফল বেচিত, কিন্তু উচ্চবংশের উদার প্রকৃতিতে গ্রামখানির যেন প্রাণ ছিল তাহারাই। সুশ্রী-সবল আকৃতিতে, শিষ্ট ব্যবহারে, বন্যদের চক্ষে তাহারা পূজার দেবতা ছিল।

ইঁহাদেরই এক পরিবারের বালক শঙ্কর, আর অন্য-গৃহের বালিকা কৃষ্ণা। বনের মধ্যে দুটি বনফুলের মত তাহারা ফুটিয়া ছিল। শিশুকাল হইতে আর-কেহ তাহাদের সঙ্গী ছিল না, এক-বৃন্তের ফুলদুটির মত তাহারা পরস্পরে এক-হইয়া আপনাদের মিলন-খেলার নিত্যনবীন মাধুর্য্যে সর্ব্বদাই চঞ্চল থাকিত। আকারে তাহাদের বিভিন্নতা ছিল বটে কিন্তু অন্তরের প্রাণ ছিল যেন এক! হাসি-কান্নায়, খেলা-ধূলায়, আহার-নিদ্রায় কোথাও তাহাদের অমিলন ঘটিত না। যেন একতারে বাঁধা ক্রমোচ্চ গ্রামের দুটি একই সুর। নির্জ্জন পল্লী, নির্জ্জন নদীতীর—তাহার মাঝের এই যে দুটি ক্ষুদ্র হৃদয়, ইহারা পিতামাতা ও আপনাদের ছাড়া জগতের আর-কিছুই জানিত না।

(২)

তাহাদের বয়স যেমন বাড়িতেছিল, বনবাসী এই দুই ক্ষত্রিয়-পরিবারের লোকসংখ্যাও তেমনি ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। কৃষ্ণা ও শঙ্করের বিবাহ স্থির—কিন্তু সে মিলন দেখিবার জন্য শঙ্করের ঘরে কেহ রহিল না, আর কৃষ্ণার বৃদ্ধা রুগ্না মাতার জীবন-দীপটি নিবিলে তাহার গৃহও শূন্য হয়। বালক-বালিকা—না আর তাহারা বালক-বালিকা নয়—কৃষ্ণার বয়স ত্রয়োদশ আর শঙ্কর বিংশবর্ষের বলিষ্ঠ যুবক; তাহারা দুটিতে মিলিয়া আপনাদের ক্ষুদ্র সংসারের চিত্রখানি—ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখের আলোক-ছায়ায় আঁকিয়া তুলিতে লাগিল।

গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যাও ধীরে ধীরে নিঃশেষপ্রায় হইতেছিল। বৃদ্ধের দল দেহত্যাগ করিবার পরই তাহাদের বংশধরেরা জীবিকার তাড়নায় বন ছাড়িয়া নগরে চলিয়া গিয়াছে। পল্লী প্রায় শূন্য; কুটীর পড়িয়া মৃত্তিকার স্তূপ তুলিয়াছে। শঙ্কর ভাবিত, কৃষ্ণাকে বিবাহ করিয়া সেও নগরে বাস করিতে যাইবে, চিরদারিদ্র্যের কষ্ট আর সহ্য হয় না,—অন্নাভাবে শীর্ণা বালিকাকে ত সুখী করা চাই।

কিন্তু এ আনন্দ-কল্পনায় ম্লান ছায়া ফেলিত কৃষ্ণাই। সে কিছুতেই বনপল্লী ছাড়িতে চাহিত না। এই নদীতট, এই চঞ্চল জলধারা—এমন-কি এই ছোট-খাটো তরুলতাগুলিরও উপর তাহার অপরিসীম মমতা। সে যাইবে না, কিছুতেই

আর-কোথাও যাইবে না! সে সুখ চায় না, ঐশ্বর্য্য চায় না—শঙ্কর থাকিলে একাই এ বনে থাকিবে। সে লোকসঙ্গ ভালবাসে না, এই জনহীন বন তাহার বড় প্রিয় —বড় মনোরম!

মুখে কৃষ্ণা যাহাই বলুক, শঙ্কর জানিত, এই বনের মধ্যে সবচেয়ে দুশ্ছেদ্য আকর্ষণের বাহু মেলিয়াছে একটি ছোট আমগাছ! আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা দুটিতে মিলিয়া সেই গাছটি রোপণ করিয়াছিল,—তাহার পর যেমন তাহাতে অঙ্কুর দেখা দিয়াছে, সেই অবধি কৃষ্ণা তাহার হৃদয়ের স্নেহধারা ঢালিয়া তাহাকে পালন করিয়া আসিতেছে। তাহার যত্ন ও স্নেহ দেখিয়া শঙ্করও সে ক্ষুদ্র শ্যামল তরুটির প্রতি অনুরক্ত। কৃষ্ণা জানিত, সে গাছ শঙ্করের—আর শঙ্কর ভাবিত, তাহা তাহার প্রাণাধিক কৃষ্ণার। তাই দুটি হৃদয়ের ভালবাসার অমিয় স্পর্শে সেই ক্ষুদ্র রসাল তরুটি—পিতা-মাতার একমাত্র দুলালের ন্যায় পালিত হইতেছিল।"

(৩)

বৃদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে আমার চিত্ত কেমন আর্দ্র হইয়া আসিতেছিল। একবার চোখ তুলিয়া সেই কাণ্ডপত্রহীন বৃহৎ বৃক্ষটির প্রতি চাহিলাম;—প্রেমিকযুগলের স্নেহপালিত এই সেই তরু! ঔৎসুক্যের সঙ্গেই বলিলাম—"তারপর!"

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, "তারপর?—তারপরই অনর্থ আসিল। কৃষ্ণা সেদিন কার্য্য-শেষে নদীর তীরে বসিয়াছিল; শঙ্কর বাড়ী ছিল না, তাহারই জন্য আহার্য্য সাজাইয়া সে পথের পানে চাহিয়া অধীর ভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। কেবলই ভাবিতেছিল, শঙ্কর এখনো ফিরিল না কেন?

অদূরে নদীর উচ্চ পাড়ে তাহার সেই আমগাছ। রৌদ্রে তাহার কোমল পাতাগুলি নুইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণা এক-একবার তাহার প্রতিও চাহিয়া দেখিতেছিল; মধ্যাহ্নে ত জল দেওয়া যায় না,—আহা! কিন্তু শঙ্কর কোথা গেল? সে তো জানে, বেশীক্ষণ তাহাকে না দেখিলে কৃষ্ণা ভয় পায়;—এ বনে সে ছাড়া তাহাদের আর কে আছে? কেন সে আসে না! কোথায় গেল?—বালিকা ক্রমেই অবসন্ন হইতেছিল, তাহার ঘুম পাইতে লাগিল। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মাটিতে আঁচল বিছাইয়া সে শুইয়া পড়িল।

"শঙ্কর—শঙ্কর!" হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণা ডাকিল—"শঙ্কর আসিলে?"

কিন্তু শঙ্কর ত নয়, ইহারা কে? সে সভয়ে দেখিল, চার-পাঁচজন অশ্বারোহী অদূরে নদী পার হইতেছে। তাহাদের মধ্যে দুজন একেবারে তাহার সম্মুখে! কে ইহারা? বেশ-ভূষা অসাধারণ উজ্জ্বল। তাহাদের বাহন অশ্বগুলিও দরিদ্রা বালিকার চক্ষে বড় সুন্দর, বড় প্রকাণ্ড দেখাইতেছিল। সে ক্ষণকাল স্তব্ধ—ভীত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর পিছাইয়া গেল, —চারিদিকে চাহিয়া কাহাকে খুঁজিল।

অপরিচিত, কিন্তু স্নিগ্ধকোমলস্বরে কে প্রশ্ন করিলেন,—"কে তুমি? এখানে একা বসিয়া কেন? এই বনেই কি তোমার বাড়ী?"

সে মুখ তুলিয়া প্রশ্নকর্ত্তার দিকে চাহিল; সজ্জিত সুন্দর তরুণ যুবা, দেখিলে ভয় হয় না। ক্ষত্রিয়-কন্যা একবার ইতস্তত করিয়া

উত্তর করিল, "হাঁ!" তারপর তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎপদ হইয়া কুটীরের দিকে চলিয়া গেল।

তাহার মা তখন নিদ্রিত ছিল; সে অর্গল রুদ্ধ করিয়া ছিদ্রপথে দেখিল কেহ তাহার পশ্চাতে আসিতেছে কিনা। কিন্তু না, তাহারা কেহ এদিকে আসিল না; হাসিতে হাসিতে কুটীরের পানে চাহিতে চাহিতে তাহারা নদী পার হইতেছিল। রৌদ্রে তাহাদের শিরোভূষণ জ্বলিতেছে! তাহাদের কোষবদ্ধ তরবারি অসাধারণ দীর্ঘ ও স্বর্ণমণ্ডিত; অশ্বের প্রতি পদক্ষেপে একটা ঝিন্-ঝিন্ শব্দ উঠিতেছিল।

এই সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া কৃষ্ণার কেমন ভয় করিতে লাগিল। শঙ্কর আসিলে রোদনরুদ্ধস্বরে বলিল, "কেন তুমি আমায় ফেলিয়া যাও? আমার বড় ভয় করে যে!"

শঙ্করের সবল বাহুর ছায়া পাইয়া তাহার ভয় নিমেষে দূর হইয়া গেল; সে তখন নবাগতদের কাহিনী বলিতে লাগিল।

শঙ্কর ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তাহারা এদিকেও আসিয়াছিল! এদিকে তাহাদের প্রয়োজন কি? তাহারা রাজকুমার অচলাদিত্যের দল। কিন্তু এ পল্লীর পথে কেন?"

কথাটা লইয়া কৃষ্ণা আরও দুই চারিবার কি জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু অন্যমনস্ক শঙ্কর তাহাতে যোগ দিল না।

(৪)

তৃতীয় দিন প্রাতে শঙ্কর আবার বাহির হইয়া গেল। যেখানে বনের সমতল ভূমিতে তাহার শষ্যক্ষেত্র ও একটি ক্ষুদ্র ফলোদ্যান, প্রভাতে প্রায় সেইখানেই সে থাকিত। ফিরিতে কতদিন বিলম্বও হইত।

আজও সে দ্বিপ্রহরের পর ফিরিল। নদীর ধারে-ধারে পথ, শঙ্কর সাশ্চর্য্যে দেখিল, সেই পথে অসংখ্য অশ্ব ও মানুষের পদচিহ্ন। ব্যাপার কি? অচলাদিত্যের দল আবার মৃগয়ায় আসিয়াছিল নাকি? বারবার এখান দিয়া তাহাদের যাতায়াত আরম্ভ হইল কেন?

গৃহদ্বারে আসিয়া তাহার প্রাণে চমক আসিল। এ কি? কৃষ্ণা কোথায়?—তাহার মা কৈ? কুটীর শূন্য! রাজসৈন্য দেখিয়া তাহারা কোথাও লুকাইয়াছে বোধ হয়! শঙ্কর তাহাদিগকে খুঁজিতে গিয়া কাঠুরিয়া-রমণীদের নিকট সকল কথাই শুনিল।

রাজপুরোহিত ও সেনাপতি আসিয়া কৃষ্ণা ও তাহার মাতাকে নগরে লইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণা অচিরে রাজবধূ হইবে!

যুবক স্তব্ধ হইয়া গেল। কথাটা বিশ্বাস হয় না যে!—এতখানি সর্ব্বনাশের কথা হঠাৎ বিশ্বাস হয় কি করিয়া? কিন্তু তবু তাহা সত্য;—ঐ যে দীন কুটীর দৈন্যের অর্গল ফেলিয়া, তাহার অন্ধকার দৃষ্টি সবটা মেলিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে!—তবে সত্য, সব সত্য!

সে নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। বালুকার উপর সেই সব পদচিহ্ন; তাহারা যেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে গভীর ক্ষতচিহ্ন আঁকিয়া বসিয়া গেল। মাথার মধ্যে অশ্বের পদধ্বনি আঘাত দিয়া দিয়া বাজিতে লাগিল।

উপরে মধ্যাহ্ন সূর্য্য;—বাতাসে অগ্নিবৃষ্টি!

সে গৃহহীন, সর্ব্বস্বহীন—পথের কাঙাল! সে একবার নিজের দীর্ঘব্যাপী বিস্তৃতের প্রতি চাহিল; কে আছে তার? কেউ নাই! কি করিতে পারে সে? কিছু না! শুধু এই বাহুদুটি ত আহার সম্বল! কিন্তু এই বিশাল দেশের নরপতি বিপুলাদিত্যের অধীনে এমন শত শত বলিষ্ঠ বাহু! প্রাণ দিলেও কি আর কৃষ্ণাকে উদ্ধার করিতে পারিবে?

আর, কৃষ্ণা! সে চলিয়া গেল? দ্বিরুক্তি না করিয়া শঙ্করের অপেক্ষাটুকু না রাখিয়াই সে চলিয়া গেল? না যাইবেই-বা কেন? এই চিরদারিদ্র্যের জ্বালা এড়াইয়া রাজবধূ হইবে,—তাহারপর এই মহাদেশের মহারাণী! এ সম্মানের, এ সুখের প্রলোভন এড়াইতে পারে ক-জন?

নদীর জলে মৃদুবীচিবিক্ষেপ তপ্ত রৌদ্রে অঙ্গারখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে। সে পরপারের দীর্ঘ পথরেখার প্রতি চাহিয়া বসিয়াছিল—তাহার মনে হইতে লাগিল সে পথেও যেন আগুন ধরিয়াছে। পাষাণী না হইলে কৃষ্ণা কেমন করিয়া ঐ আগুনের পথে অম্লানবদনে চলিয়া গেল?—সে পাষাণী, পাষাণী!

শঙ্কর আপনার হাতের দীর্ঘ যষ্টি নদীর জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তৃষ্ণার্ত্ত শুষ্ক ওষ্ঠ দাঁতের চাপে কাটিয়া নীল হইয়া গিয়াছে, চক্ষে আর বিন্দুমাত্র আর্দ্রতা নাই, সে উঠিয়া আবার গ্রামে চলিল।

নারীদলে সেদিন মহানন্দ, তাহাদের গ্রামলক্ষ্মী কৃষ্ণা আজ রাজরাণী হইতে চলিয়াছে। তাহারই গুঞ্জন-গান শঙ্করের কানে আসিয়া লাগিতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতে আর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না।

(৫)

কয়েক বৎসর কাটিয়াছে। ইতিমধ্যে সেই জনবিরল গ্রামখানি একেবারে মনুষ্য-সম্পর্কশূন্য হইয়া গিয়াছে। পল্লী-কুটীর ভগ্ন, প্রাঙ্গণে কাঁটাগাছ! পথে বন, তাহাতে আর মানুষের পদচিহ্ন পড়ে না। সব চূর্ণবিচূর্ণ, অবহেলায় লাঞ্ছিত—হতশ্রী।

কিন্তু তাহারই মধ্যে শঙ্কর ও কৃষ্ণার সেই কিশোর সহকার,—সেই গ্রামের মাঝখানটিতে, নদীজলে ছায়া ছড়াইয়া নবযৌবনে আচ্ছন্ন প্রচুর শ্যামলপত্রপল্লবে সজ্জিত দেহে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

তখন অচিরাগত বসন্তের সরসস্পর্শে বনশ্রী উজ্জল, লতান্দোলনে পুষ্পগুচ্ছ লীলাচঞ্চল। কৃষ্ণার যত্নপালিত রসাল নবমুকুলের বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত। তাহার মধুর মদির গন্ধে মৃত পল্লীখানিও যেন নবজাগরণের অলস চক্ষু মেলিয়া মৃদুহাস্যের চেষ্টা করিতেছে। সেই মৃত্যু-রাজ্যের অমর সৌন্দর্য্যের মধ্যে সেদিন এক মৃত-প্রায় মানব আসিয়া বসিল।

সে শঙ্কর। বহু-দিন নিরুদ্দেশের পর আজ সে দেশে ফিরিয়াছে। সে বুঝিয়াছিল যে তাহার ভগ্ন শরীরে আর বেশিদিন প্রাণ-দেবতার অধিষ্ঠান থাকিবে না, তাই একবার জন্মভূমির সহিত শেষ-সাক্ষাৎ করিতে বা তাঁহারই কোলে অন্তিমশয়ন বিছাইতে, সে আসিয়াছে।

গাছতলাটিতে পড়িয়া সে স্থিরদৃষ্টিতে উপরদিকে চাহিল। গাছে নূতন পাতা

নূতন ফুল ও ভবিষ্যতের ফল-সম্ভাবনার প্রচুর আভাস! তাহার রক্তপল্লব বাতাসে নাচিতেছে, মুকুলগুচ্ছে গন্ধ বুঝি ধরে না! ক্ষণকাল শঙ্কর মুগ্ধ হইল। প্রাণাধিক প্রিয় তরুটির প্রফুল্ল সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার আনন্দ হইল। কিন্তু কৃষ্ণা তো এসকল কিছুই দেখিল না! এ তরুর কথা হয় তো তাহার স্মরণও নাই। কেনই বা থাকিবে? এ যে শঙ্করের রোপিত বৃক্ষ! বাল্যক্রীড়ার ক্রীড়নক এই সামান্য তরুটি, ইহার কথা মহিষী কৃষ্ণার স্মরণ থাকার সম্ভাবনা কোথায়? ভুল ভুল, সব মিথ্যা! এ বৃক্ষ মিথ্যা, গ্রাম মিথ্যা, এ জন্মভূমি, বাল্যস্মৃতি—সব মিথ্যা!

হতভাগ্য রুগ্ন চীৎকার-শব্দে কাঁদিতে চাহিতেছিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠ দিয়া ধ্বনি বাহির হইল না। যাতনায় চক্ষু রক্তবর্ণ, তবু এক ফোঁটা অশ্রু গলিয়া তাহার বেদনা হ্রাস করিয়া দিল না।

অবশভাবে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে শঙ্কর সহসা লাফাইয়া উঠিল। অনতিদূরে তাহাদের সেই কুটীরগুলি। সে দীর্ঘপদক্ষেপে সেইদিকে চলিল। কৃষ্ণাদের কুটীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ধ্বসিয়া, মাটি জলে গলিতেছে। কিন্তু তাহার ঘরখানা জীর্ণ তৃণাচ্ছাদন মাথায় লইয়া এখনও বাঁচিয়া!

কেন? সে এখনও মাথা তুলিয়া আছে কেন? শঙ্কর খানিকক্ষণ সেই দৃশ্য চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া—একটা ভাঙ্গা বাঁশ তুলিয়া লইয়া ঘরে আসিল। চাল জীর্ণ, তাহার বংশ-পঞ্জর বাহির হইয়া পড়িয়াছে; হাতের বাঁশের আঘাতে শঙ্কর তাহা ভাঙ্গিতে লাগিল। বাঁশ ভাঙ্গিয়া, খড় ছড়াইয়া, আঘা আঘাতে দেয়াল ফেলিয়া সে সব চূর্ণ কি দিল। এই কুটীরটার মতই যদি কেহ এই ভগ্নদেহটি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দি তাহা হইলে সে একটুও বাধা দিত আঃ, সেই তো তাহার সুখ!

ঘর-ভাঙ্গা শেষ হইলে সে টলি টলিতে নদীতীরে বালির উপর আমি পড়িল। জলপান করিতে সাধ নাই থাকিতে পারিল না, নদীর স্বচ্ছশীতল দুই হাত ভরিয়া যত পারিল, পান করিল

শীতল শান্তি! শরীরে আবার শ আসিতেছে। হঠাৎ সেই পুষ্পভূষিত তরু প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। হুঁ! সে ইহার মধ্যে হর্ষপ্রফুল্ল, সে-ই যেন তাহ দুঃখে হাসি-পরিহাস ছড়াইতেছে! নি হও, একটু অপেক্ষা কর রে নিষ্ঠুর বৃ মৃত্যুর পূর্ব্বে শঙ্কর তোমাকেও শেষ করি যাইবে! সন্ধ্যা সমাগত, একখানি কুঠারে খোঁজে সে নদীপারে চলিল।

রাত্রে ফিরিয়া আরও ক্লান্তিবো হইতেছে, প্রভাতে উঠিয়া অগ্রে বৃক্ষটি ধ্বং করিতে হইবে! নহিলে হয়ত আর শক্তি থাকিবে না!

সে নদীতীরে দূর্ব্বাদলের উপর পড়ি আকুল হইয়া ভাবিতেছিল—কখন্ অজ্ঞাতসা চোখে ঘুম আসিয়া পড়িল জানিতে পারি না।

নিদ্রার ঘোরে সে অদ্ভুত স্ব দেখিল। দেখিল যেন সেই আম্রবৃ হইতে এক পরমসুন্দরী বালিকা বাহি হইয়া তাহার নিকট আসিতেছে। তাহ

নীল চক্ষু জলে ভরা, রক্তওষ্ঠ পিতেছে, সে যেন ভয়ে বিবশা,—ব্যথিত ানি তুলিয়া বালিকা তাহারই দিকে য়া ছিল। শঙ্কর প্রশ্ন করিল,—"তুমি কে? দিতেছ কেন?"

বালিকা বলিল,—"আমি তোমার ণ—"

"আমার প্রাণ? তুমি ঐ গাছটির তর হইতে আসিলে না?'

উত্তর হইল, "হাঁ, আমি ইহার মধ্যে স করি—কিন্তু তুমি তাহাকে কাটিতে ও কেন?"

স্বপ্নেও শঙ্কর উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। র স্বরে বলিল, "কেন কাটিব না?"

"তাহা হইলে যে আমি মরিব,—তুমি রিবে! এ কাজ করিয়ো না গো!"

"নিশ্চয় করিব! গাছ মরিলে যদি মার মৃত্যু হয় তবে তাহার অপেক্ষা আর ধ কি?"

বালিকা আর বাধা দিতে পারিল না, হার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। শঙ্কর লিল, "তুমি আমার প্রাণ? দূর হও—র হও আমার সম্মুখ হইতে, নতুবা খুন রিব তোমায় আমি।"

স্বপ্ন মিলাইয়া আসিতেছিল, অর্দ্ধস্ফুট তন্দ্রার মধ্যেও শঙ্কর শুনিল, মধুর-তীব্র রে কে বলিতেছে,—"ও গাছ কাটিও না, আমায় মারিয়ো না! ও গাছ কাটিয়ো া—কাটিয়ো না—কাটিয়ো না।"

তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সেই নদীতীর, রজলে খরস্রোত তর-তর-বেগে বহিয়া াইতেছে। মাথার উপর কালো আকাশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নক্ষত্র জ্বলিতেছে। সে এ কী স্বপ্ন দেখিল?

"স্বপ্ন? হউক স্বপ্ন; ঐ বৃক্ষ কাটিতেই হইবে!" বলিতে বলিতে তাহার শীর্ণগণ্ড চক্ষুজলে ভাসিয়া গেল। সত্যই ত, একদিন তাহারা ঐ তরুর শিশু-প্রাণটিকে নিজের প্রাণের ন্যায়ই ভালবাসিত! বিছানা ছাড়িয়া আগে সেই বৃক্ষতলে জল দিবার জন্য ছুটিয়া আসিত! সে যে কত কথা, স্নেহস্নিগ্ধ প্রাণের কত সাধের ইতিহাস সে সব। পরে এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের ব্যথাময় দিন-রাত্রিগুলার মধ্যে সে এক নিমেষের জন্যও সেই প্রাণাধিক তরুকে ভুলিয়া ছিল কি?

তাহার সুখের জীবনের একমাত্র স্মৃতি-চিহ্ন, কৃষ্ণার হাতের যত্নের ধন এই গাছটি তাহার প্রাণতুল্য বৈ কি? শঙ্কর তাহার অশ্রুসিক্ত স্নেহার্দ্র চক্ষু তুলিয়া আদরে ব্যগ্রভাবে গাছটির দিকে চাহিয়া রহিল।

কতক্ষণ এইভাবে কাটিল। নদীজলে ঊষালোক ছলকিতেছিল। দূরে কোথায় ভোরের পাখী শিস্ দিতেছে। বহুদূরে নগরশীর্ষে, মন্দির-চূড়ায় নবোদিত আলোক-রশ্মির স্বর্ণসম্পাত। দেখিয়া আবার শঙ্করের হৃদয়ে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। ঐ সুবর্ণ-শক্তিই তাহার প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে যে! —আঃ, তুচ্ছ বনের এ সামান্য বৃক্ষ, এ বাঁচিলে বা মরিলে—কিছুতেই ও স্বর্ণবর্ণের কোন ম্লানিমা ঘটিবে না! তবে কেন? —তাহার মরাই মঙ্গল, সে মরুক্।

(৬)

ভূমিশয্যা ত্যাগ করিতে গিয়া সে বুঝিল, তাহার শরীরে আর শক্তি নাই, পা চলিতে

চায় না, সর্ব্বাঙ্গ অবশ ; ক্ষুধাতৃষ্ণায় দেহ জ্বলিয়া যাইতেছে। পানাহারে আর তাহার প্রবৃত্তি নাই—ঐ তরু ও এই দেহটির নাশই এখন তাহার জীবনের শেষ কাজ ও চরম সাধ।

মৃদুপদে সে গাছটির নিকট আসিল। কোমল রৌদ্রে তরুর সর্ব্বাঙ্গে চঞ্চল চাক্‌চিক্য, তলায় মুকুল ঝরিতেছে, কূলহারা বাতাসে গন্ধের বিস্তার। শঙ্করের চিত্তও যেন মুহূর্ত্তকাল প্রীতিরসে ভরিয়া উঠিল, সতৃষ্ণ নয়নে সে গাছটির দিকে তাকাইয়া রহিল। আহা, এই সুন্দর সুকোমল তরুর অঙ্গে কেমন করিয়া সে অস্ত্রক্ষেপ করিবে?

ভাবিতে তাহার নয়নে জল আসিল। একদিন তাহার নিজের জীবনও এমনি পুষ্পিত শ্যামল তরুর ন্যায় প্রাণ-প্রচুরতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ কোথায় সেদিন?……কেন গেল? নির্ম্মম হস্তে কঠোর কুঠারে কে তাহাকে সমূলে উৎপাটন করিয়াছে? কে কাটিল? বিধাতা,—কিন্তু কে সেই বিধাতা? স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা? যিনি একদিন সুখের ছবি দেখাইয়া তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিইতো স্বহস্তে সে চিত্রে কালি ঢালিয়া দিয়াছেন?

তবে শঙ্করের অপরাধ কি? স্বহস্তে রোপিত এই সুন্দর তরু, সেও স্বহস্তেই কাটিবে না কেন? স্বপ্নের বালিকা ঠিক বলিয়াছে, এ তরু তাহার প্রাণতুল্যই বটে, ইহার মৃত্যুপর্ব্ব শেষ হইলেই শঙ্করের জীবনের কর্ম্মসূত্র নিঃশেষে ছিন্ন হইয়া যায়। ইহাকে মারিতেই হইবে,—এ মরুক! তাহার জীবন যেমন ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড হইয়া শুকাইয়া মরিতেছে, তেমনি নষ্ট ভ্রষ্টশ্রী হইয়া এও মরুক।

অসম্বৃত চিত্তে সে কুঠার খুঁজিতে লাগিল; কৈ তাহা! আঃ, সেটা বুঝি নদীতীরেই পড়িয়া আছে! থাক্, আনিতে যাইবার বিলম্ব শঙ্কর সহ্য করিতে পারিবে না! দ্রুতচরণে গাছে উঠিয়া—সে ক্ষিপ্রহস্তে তাহার পুষ্পিত পল্লবরাশি ছিঁড়িতে লাগিল।

অনাহার-শীর্ণ বাহুতে এত বল! বৃক্ষতলে শাখা-পত্ররাশি স্তূপীকৃত হইতে লাগিল।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত; প্রভাত হইতে সে এতক্ষণ এই কার্য্যই করিয়া গিয়াছে নাকি?—আঃ, আর যে শরীরে এতটুকুও বল নাই, কি করিয়া নদীতীরে যাইবে! তৃষ্ণায় বুক ফাটিতেছে যে!

শরীরকে টানিয়া কোনমতে সে তীরে আসিয়া পড়িল। তটে কোমল-শ্যাম শৈবালদল তাহাতে পদস্পর্শ হইতেই যেন সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেল। জলপানের অপেক্ষা না করিয়া সে তথায় শুইয়া পড়িল। থাক্ তৃষ্ণা মরিতেই যখন হইবে, তখন তৃষ্ণার জল নিবাইয়া তাহাকে অবসর দেওয়া কেন? আসুক মৃত্যু!

বসন্ত-সায়াহ্নের মধুর বায়ু তাহার দগ্ধ দেহে স্পর্শ দিয়া ফিরিতেছিল। কোমল আলোক-দীপ্ত জলধারা যেন সহস্রবীচি নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। পূর্ব্বাকাশে জলভারগম্ভীর শ্যামসুন্দর শীতল মেঘ; তটের বৃহৎ বটবৃক্ষ তাহার বিশাল ছায়া প্রসারিত করিয়া শঙ্করের পাশে দণ্ডায়মান। চারিদিকই জুড়িয়া যেন সহানুভূতির বিপুল আয়োজন;—প্রকৃতির

ব্যাকুল মাতৃহৃদয় তাহার মৃতপ্রায় দুঃখী সন্তানকে কোলে তুলিয়া স্নেহাঞ্চল দিয়া ঢাকিতে উদ্যত।

অজ্ঞাতসারে কখন্ সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আজ দুইদিন তাহার আহার নাই, জলপান করিতে আসিয়াও তাহা ঘটিল না। বন্য কুকুর-শৃগাল তাহার পাশে আসিয়া দেখিল সে মৃত কিনা! মৃদু নিঃশ্বাস ব্যতীত সে জীর্ণ দেহে জীবনের কোন চিহ্ন পাইল না। ঊষার আবির্ভাবের সঙ্গে সুষুপ্তির ঘনঘোর কাটাইয়া আবার তাহার স্বপ্ন দেখা দিল। সেই স্বপ্ন! আবার সেই বালিকা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। আজ যেন শঙ্করের চক্ষু মেলিবার শক্তি নাই,—তবু দেখিল, বালিকার শরীরে সেদিন প্রচুর আঘাত, যন্ত্রণায় তাহার মুখ-চক্ষু বিবর্ণ,—ব্যথাকাতর। সে দূরে দাঁড়াইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "তুমি কি আমাকে সত্যই হত্যা করিবে?"

শঙ্কর বলিল—"কেন, এখনও তোমার সন্দেহ আছে না কি?"

"কিন্তু আমি কে তাহা শুনিয়াছ ত? আমি যদি মরি—"

"তাহা হইলে আমিও মরিব—এই ত কথা? কিন্তু আমি যে তাই চাই!—তুমি যাও—"

"যাইতেছি, কিন্তু একটা কথা। আমি তোমারই বটে, কিন্তু একদিন কৃষ্ণাও কি আমার পরে তাহার অন্তর হইতে স্নেহের ধারা সিঞ্চন করে নাই?"

স্বপ্নের ঘোরেই সবেগে শঙ্কর বলিল, "করিয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া এখন তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ কি? অনর্থক কৃষ্ণার দোহাই দিও না, সে তোমার কেউ নয়—যাও—"

"কিন্তু শঙ্কর"—

"আবার কিন্তু?"—বলিয়া শঙ্কর কুঠার তুলিল।

উত্থিত বাহু আসিয়া শৈবালে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কোথায় বালিকা?

সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল কুঠারখানি দূরে পড়িয়া আছে। তাহার শরীরে আবার বল আসিল নাকি! গাছ কাটিবার উৎসাহে সে জলে নামিয়া পেট ভরিয়া জল খাইল। তাহার পর কুঠার-হাতে ধীরে ধীরে গাছের দিকে উঠিতে লাগিল। জল খাইয়া যে সামান্য শক্তিটুকু ফিরিয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই কার্য্যটি শেষ করিয়া লইতে হইবে—নয় ত পরে আর আশা নাই!

(৭)

গাছে কুঠার পড়িতে লাগিল, দুর্ব্বল বাহুর বলে বৃক্ষকাণ্ডে কুঠার বিদ্ধ হয় না, হাতও বুঝি উঠে না! এমন সময় সহসা কার্য্যে বাধা আসিল। নদী পার হইয়া ও কারা আসে? রাজসৈন্য কি? হাঁ, তাহাই বটে। ঐ যে উচ্চ অশ্বে রাজসেনাপতি, হস্তীপৃষ্ঠে ও কে—রাজপুরোহিত নয়?—

পশ্চাতে ও কি? দোলা! রৌপ্যদণ্ড, স্বর্ণচূড়, মুক্তাঝালর ইত্যাদিতে সজ্জিত রাজরাণীর শিবিকাই ত! শঙ্কর জানিত,—বিপুলাদিত্যের মৃত্যুর পর অচলাদিত্যই এখন রাজা। তবে কি কৃষ্ণা কোথাও চলিয়াছে?

শঙ্করের নিঃশেষপ্রায় শক্তিটুকু ঝড়ের

প্রদীপের মত যেন হঠাৎ নিভিয়া গেল; সে ঝোপের মধ্যে অসাড়ভাবে শুইয়া পড়িল। দৃষ্টি বাধিয়া যাইতেছে তবু প্রাণপণে চোখ মেলিয়া থাকিল। শোভাযাত্রা সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়,—হঠাৎ দেখা গেল যেন কি গোল বাধিয়াছে। হস্তীর আরোহীর সহিত কাহার কি কথা হইতেছিল, সেনাপতির অশ্ব স্থির, তাঁহারও সহিত কাহার বাক্যালাপ হইল। অবশেষে সেই গমনোন্মুখ যাত্রীদল সকলেই দাঁড়াইল।

দোলার পশ্চাতে অগণ্য ব্রাহ্মণের হাতে ফুল-ফল-নৈবেদ্য-সম্ভার। শঙ্কর বুঝিল, এই রাজমহিলা বনপ্রান্তে নর্ম্মদাতীরের শিবালয়ে চলিয়াছেন। বাল্যকালে সে কতবার এই পথ দিয়া এমনি পূজাযাত্রা দেখিয়াছে। কিন্তু আজ হঠাৎ ইহারা এখানে দাঁড়াইল কেন?

শুধু দাঁড়ান নয়, দেখিতে দেখিতে দোলা আসিয়া তাহাদের সেই বৃক্ষতলে নামিল ও অনতিবিলম্বে তাহার আবরণ সরাইয়া সূর্য্যালোকঝলসিত উজ্জল বস্ত্রমণ্ডিত কে এক মহিয়সী মহিলা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বৃক্ষ হতশ্রী; তাহার সরস পত্র-পুষ্প মাটিতে পড়িয়া শুকাইতেছে! বৃক্ষকাণ্ডে অস্ত্রচিহ্ন।

একি,—একি, কৃষ্ণা না কি! হাঁ, সেই তো বটে! সেই মুখ, সেই চুল, সেই—সেই সব। রাজসংসারে সুখসম্পদে তাহার সৌন্দর্য্য কি বাড়িয়াছে? কৈ, না!

ক্ষণকাল শঙ্কর স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঠিক্ সেই কিশোরী কৃষ্ণা, তেমনি লঘু তনু আকৃতিটি, সে যেন তাহারই বাল্যসা আর সেও যেন সেই অচিরাগত সু আশায় প্রলুব্ধ, মুগ্ধহৃদয় প্রফুল্ল শঙ্কর!

—"দাঁড়াও, দাঁড়াও কৃষ্ণা!"

তাহার মুখ দিয়া শব্দ বাহির হইল কিন্তু কৃষ্ণা দাঁড়াইল। সে গাছটির প্র একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, মুখে বিস্ময় বেদনার গভীর কালিমা ক্রমেই স্পষ্টভাবে ফু উঠিতেছে। পায়ের তলায় কয়েকটা মু চাপা গিয়াছিল, ব্যথিত ভাবে তুলিয়া সে তাহাদের ওষ্ঠের উপর ধরিল।

"আমার গাছ কে কাটিল গো —করুণ আর্ত্তনাদ! কৃষ্ণা দুইহাতে বৃক্ষকাণ্ড জড়াইয়া ব্যাকুল ভাবে কাঁদি লাগিল! দাসী পুরনারীরা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কিন্তু কেহ তাহার বাহুপাশ হইতে সে ছাড়াইতে পারে না। সামান্য বৃক্ষের রাজমহিষী কাঁদিয়া আকুল, কেহ আশ্ব কেহবা সমবেদনায় কাতর।

শঙ্করের রক্তহীন বক্ষ একবার সব স্পন্দিত হইয়া আবার নিঃস্পন্দ হইয়াছে সকলে ধরাধরি করিয়া কৃষ্ণাকে শিবিক লইয়া গেল। তাহার শেষকথা—ক্রন্দনে সুর, করুণ গানের মত শঙ্করের হৃৎতন্ত্রী বাজিতেছিল;—"আমার গাছকে মা ফেলিয়াছে, আমার গাছ,—ওগো আম গাছ!"

যেমন আসিয়াছিল, তেমনি সমারো তাহারা চলিয়া গেল। বন আবার নির্জ্জন দূরে কোথায় করুণস্বরে সুকণ্ঠ পাখী গ ধরিয়াছে। কম্পিত স্খলিত পদে শ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার গাছ! কৃষ্ণা নিজে বলিয়াছে, আমার গাছ! সে কাঁদিয়া বলিয়া গেল, 'এ গাছ আমার'। শঙ্কর দাঁড়াইতে পারিল না, দুই হাতে সেই ক্ষতবিক্ষত বৃক্ষকে জড়াইয়া তাহার গায়ে মাথা রাখিল।

পা চলে না, বসিয়া উঠিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় সে বনের সুখাদ্য ফলের সন্ধানে চলিল। এতক্ষণ আহারের যেন কোনো প্রয়োজন ছিলনা, আবার নূতন করিয়া সে প্রয়োজন জাগিয়া উঠিল। আহার-শেষে নদীর জল পান করিয়া বটের ছায়ায় শুইতেই, সে তন্দ্রাবিষ্ট হইল।

আবার, সেই স্বপ্ন! গাছ হইতে সেই কিশোরী বাহির হইয়াছে, কিন্তু আজ সে একা নয়, তাহার সঙ্গে কৃষ্ণা স্বয়ং। উজ্জল বস্ত্রাবৃতা রাণী নয়,—পূর্ব্বের সেই দীনবেশা কৃষ্ণা। বালিকা ও কৃষ্ণা তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, ব্যথিত বিস্ময়ে কৃষ্ণা বলিল, "শঙ্কর, তুমি? তুমিই আমার গাছ কাটিয়াছ?"

স্পন্দিত রবে ইতস্তত করিয়া শঙ্কর বলিল, "তোমার গাছ? না কৃষ্ণা, ও যে আমার ব্যর্থ প্রাণ—"

"তোমার প্রাণ! তা বটে! শঙ্কর, ও কি তোমার একলারই জিনিষ! আমি কি ওর—"

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। কি অদ্ভুত স্বপ্ন! কিন্তু স্বপ্নের মিথ্যা মোহের মধ্যেও কৃষ্ণার স্বর যে অবিকল তাহার কণ্ঠস্বরের মতই মিষ্ট করুণ ধ্বনিতে শব্দিত হইল।

তাহার দেহে তখন যেন প্রচুর শক্তি ফিরিয়াছে। সে তালপাতার জলাধার বাঁধিয়া নদীজল বহিয়া বৃক্ষতলে চলিল। দয়াময় সূর্য্যদেব! বাঁচাও, এ তরুটিকে বাঁচাও, সমস্ত বুকের রক্ত ঢালিয়া দিলেও যদি এ বাঁচে, শঙ্কর এখনি তাহা দিতেছে!

* * *

বর্ষা শেষ। সতেজপ্রাণ তরুণ বৃক্ষে আবার নবীন পল্লব দেখা গিয়াছে। তাহার তলায় ক্ষুদ্র কুটীর। তাহার মধ্যে বৃক্ষের তদ্গতচিত্ত সেবক দিবারাত্রব্যাপী যত্ন ঢালিয়া তরুপূজায় নিযুক্ত। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত যে এইখানেই বাস করিয়া গিয়াছে।

ইহাই এ তরুর ইতিহাস। ভক্তের মৃত্যুর পর দেশবাসীরা সে বৃক্ষকে কামনা-তরু বলিয়াই জানে, ক্রমে সেই কাহিনীই ইহাকে তীর্থের মাহাত্ম্য দিয়াছে।"

বৃদ্ধ নীরব হইলেন। অস্তগত সূর্য্যের শেষরশ্মি তাঁহার আর্দ্র নেত্রপল্লবে ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল, আমার আবেগমুগ্ধ হৃদয়ও সজল প্রীতিতে বৃক্ষটি ও তাহার সেবকের উদ্দেশে প্রণত হইল।

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

সাহিত্য-সম্বন্ধে দু-একটি কথা

"সবুজপত্র"-প্রকাশের পর হইতে রবীন্দ্রনাথের লেখা লইয়া আমাদের দেশের সাহিত্যিকদিগের মধ্যে যেন একটা দলাদলি জমিয়া উঠিয়াছে। যাহা পূর্ব্বে অস্পষ্ট ভাবে ছিল এখন যেন তাহা দিনে দিনে স্ফুটতর হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের লেখনী কোনদিনই আমাদের মামুলি চালের গতির মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই; তাঁহার ভাব ও ভাষা বঙ্গ-সাহিত্যে প্রচুর বৈচিত্র্য আনিয়াছে, অভিনব শ্রী-সম্পদে সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে। এ-কথা পূর্ব্বে ইংরাজি-পড়া নব্যসম্প্রদায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন এবং রক্ষণশীল বৃদ্ধের দল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অস্বীকার করিয়া বলিতেন, "আগাগোড়া ছেলেমানুষী —সব নষ্ট করলে।"

নব্য এবং বৃদ্ধদের মতভেদের কারণ সহজেই নির্ণয় করা যায়। অভ্যাস জিনিষটা মানুষকে এমন বাবু করিয়া তুলে যে তাহার অন্যথা হইলে মানুষের মন রাগের আগুনে জ্বলিয়া উঠে। মানুষের জীবনে এমন একটা বয়স আসে যখন কোন পরিবর্ত্তনই আর সহ্য হয় না।

"বৃদ্ধস্য বচনম্ গ্রাহ্যম্" ইহা আমি অবনত মস্তকে স্বীকার করিলেও বৃদ্ধদের অকারণ হাহাকারের প্রতি সকল সময়ে কর্ণপাত করাকে যুক্তিসিদ্ধ মনে করি না।

বাংলা দেশের ঐতিহাসিক অবস্থা-বিপর্য্যয়ে আমাদের ভাবরাজ্যে সমূহ পরিবর্ত্তন উত্তরোত্তর ঘটিয়া আসিয়াছে তাহার মধ্যে অন্যতম, বৈদেশিকতার মো আমাদের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

আমাদের দেশের একটা সময় গিয়া যখন মনে হইত, যাহা-কিছু য়ুরোপ হই আসিয়াছে, তাহাই পরম উপাদেয়। সে সময় নব্যবাঙ্গালীকে গরুর হাড় মুখে করি গঙ্গাতীরে বসিয়া বাহাদুরী করিতে আম দেখিয়াছি। তখন ইহাকে সভ্যতার বিশে অঙ্গ বলিয়াই মনে করা হইত। কা কাজেই বৃদ্ধের দল, যা-কিছু বিদেশ হই আমদানি হইত তাহাকেই সন্দেহ এ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।

তাই একদিন বিদ্যাসাগর যাহা করি গিয়াছিলেন তাহাতে সমাজ এত বাধা দি ছিল; যখন বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য এবং তার উপরে য়ুরোপীয় আদর্শকে আমদানি করিল তখন দেশে একটা বিপ্লবের মত ব্যাপ ঘটিবার মত হইয়াছিল। মাইকেল আমাদে হাতে কম নির্য্যাতন সহ্য করেন নাই মাইকেলের মৃত্যুপ্রসঙ্গে মনে হয়, আ আমাদের দেশে ক্রীশ্চানের সহিত আচা ব্যবহারটা কত গা-সহা হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু কিছুদিন আগে আমাদের দেশের অবস্থা ছিল!

মানুষের মন যখন জ্ঞানলাভে আকাঙ্খায় আগ্রহান্বিত থাকে তখন নূতনকে, পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনকে আহ্বান করিতে থাকে; কিন্তু হঠাৎ

র্ত্তে মানুষের মন নিজেকে পরম বিজ্ঞ ওরাইয়া লয় তখন হইতে সে বিশ্ব-সংসারের কটানা গতির বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়— খন সে স্থিতি চায়, প্রভুত্ব চায়—তখনই একেবারে রক্ষণশীল হইয়া উঠে।

এ সকল কথা আমাদের দৈনিক ভিজ্ঞতার কথা, ইহার জন্য প্রমাণ-প্রকরণের রকার নাই।

প্রবীণ এবং নবীনের মধ্যে যে বিরোধ লিয়া আসিতেছিল তাহার কারণটা আমরা ইরূপে কিছু-কিছু নির্ণয় করিতে পারি —প্রবীনের স্থিতিশীলতা, নবীনের উদ্দামতা, মানুষের ক্ষমতাপ্রীতি এবং অহঙ্কার।

এ-সকল বিরোধ জগতে চিরদিন থাকিবে —ইহাদের জন্ম মানুষের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা হইতে। যেদিন মানুষের এই দুর্ব্বলতা থাকিবে না সেদিন এই জগৎ-সংসারও থাকিবে না। আইন-আদালত মামলা-মোকদ্দমা সব শেষ হইয়া সংসার স্বর্গ হইবে। অবশ্য আপাততঃ যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে তাহার সম্ভাবনা বহুদূরগত।

তাহাহইলে দেখা যাইতেছে যে এই বিরোধের ভিতর কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না—তাই ইহার বিষয় এতদিন আলোচনারও প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ আজকাল যে একটা বিরোধ এবং দলাদলি খাড়া হইয়া উঠিতেছে তাহা কি, কেনই-বা আজ হঠাৎ মাথা তুলিল, তাহার বিষয় জানা দরকার হইয়াছে। যদি তাহার মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা থাকে তবে তাহাকে দূর করা যাইতে পারে কিনা বিবেচনা করা উচিত।

আমাদের দেশের নব্য সম্প্রদয়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের মতভেদ স্বদেশী আন্দোলনের গোড়া-গুড়িতে মোটেই ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি ছাত্ররূপে কিছুদিন কলিকাতায় ছিলাম। তখনো বঙ্গবিচ্ছেদ হয় নাই কিন্তু ছাত্র-সম্প্রদায়ের মনে তখন স্বদেশীর আগুন ধোঁয়াইতে ছিল। তখন আমরা সাড়ে চার আনা দিয়া চটের মত গেঞ্জি কিনিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং সেই গেঞ্জি গায়ে দিয়া দেশকে যে উদ্ধার করিতেছি এমন একটা গর্ব্বও অনুভব করিতাম। আমাদের ভিতর যে দল ছিল না এমন নয়। একদল ছাত্র, (বোধ হয় কিঞ্চিৎ অবস্থাপন্ন) ব্যালব্রিগন গেঞ্জিই ব্যবহার করিত—আর তর্ক করিয়া বলিত, শিল্পজিনিষটার ভিতর স্বদেশী-বিদেশী নাই। বেশী পয়সা দিয়া মোটা, মন্দ জিনিষ খরিদ করিলে জগতের শিল্প-জিনিষটার যে সমূহ ক্ষতি করা হয়, তাহার কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে কেন?

ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ "স্বদেশী-সমাজ" ইত্যাদি কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কলিকাতার ছাত্র-সমাজকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিলেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বে স্বদেশী আন্দোলনের মন্ত্রদাতা রবীন্দ্রনাথই ছিলেন। তাঁহার স্বদেশী সঙ্গীতগুলি ছাত্রগণকে যে নব-জীবনে উদ্বোধিত করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। "মরা গাঙ্গে" "ওদের বাঁধন যতই" ইত্যাদি সঙ্গীত তখনকার দিনে কোন্ ছাত্র জানিত না?

স্বদেশী আন্দোলন যেদিন তালপাতার আগুনের মত বাংলা দেশে দাউ-দাউ

করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সেদিনের কথা সকলেরই মনে আছে—সে যজ্ঞের হোতার আসন রবীন্দ্রনাথ আর গ্রহণ করিলেন না। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি নেতার দল রবীন্দ্রনাথের বহু অগ্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

যখন স্বদেশী আন্দোলন এমন একটা ভাবগ্রহণ করিল যাহা দেশের শাসন-কর্ত্তারা পছন্দ করিলেন না; যখন স্বদেশীর দেশকে বিস্মৃত হইয়া দেশের লোক, বিদ্বেষের কথাই বেশী করিয়া মনে করিতে লাগিল —তখন রবীন্দ্রনাথকে এই আন্দোলন হইতে আমরা সরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়াছি। এই-খানেই রবীন্দ্রনাথের সহিত নব্য সম্প্রদায়ের ঐক্যের সূত্র যেন ছিন্ন হইয়া গেল। সেই সময়ে তাঁহাকে লোকে কাপুরুষ বলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। দেশের এক সম্প্রদায় এই সময়ে তাঁহাকে বস্তু-তন্ত্রহীন কল্পনার দাস, কেবল-মাত্র কবি বলিয়াও তিরস্কার করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের লোকের মনে যে উন্মত্ততা আসিয়াছিল তাহাকে কটাক্ষ করিয়া কবি যে সে সময়ে দু-এককথা বলেন নাই—তাহাও নহে। সে সময়ে সেগুলিকে লোকে আত্মরক্ষার উপায় মনে করিয়া ঘৃণা করিত।

স্বদেশী আন্দোলনের কথা যে বলিতেছি, তাহার একটু বিশেষ কারণ আছে। বাঙ্গালীজাতির যদি কোনদিন ইতিহাস লিখা হয় তবে ঐতিহাসিক নিশ্চয় লক্ষ্য করিবেন যে এই জাতির জীবনের ধারায় এই যুগে একটা সমূহ পরিবর্ত্তন হয়।

স্বদেশীর সময় মনে হইল যাহা-কি বিদেশ হইতে আসিতেছে তাহাই আমাদে পক্ষে বিষ এবং যাহা-কিছু আমাদে দেশের, তাহা অমৃত—তাহা গ্রহণ করি বিবেচনা-বুদ্ধির কোন দরকার নাই।

জাতির শৈশবে বিবেচনা-বুদ্ধির ব্যবহ বেশী না হইবারই কথা। জাতির জী যে মানুষের জীবনের অভিব্যক্তি হই বিভিন্ন নিয়মে চলে—এমন মনে হয় না।

শিশুর যেমন মাত্রা-বোধ নাই— তাহাকে ঠেকিয়া শিখিতে হয়—নয় উপদেশের দ্বারা দেখিয়া শিখিতে হ আমাদের জাতির অবস্থাও এখন কতক সেইরূপ। আমাদের এখন অনুভূতিটা সব-চেয়ে বেশী তীব্র। যেদিন সকা আমাদের দৈনিক-পত্রগুলি বলে যে দে ম্যালেরিয়ায় উচ্ছন্ন গেল—সেদিন আমাদে হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে; মনের সম্মুখে কঙ্কালস স্ফীতোদর ম্যালেরিয়াকে দেখিতে পাই আবার যেদিন কাগজে বলে যে দেশে অ অন্ন নাই—বিদেশী বণিক সব রপ্তা করিয়া আমাদিগকে নিরন্ন করিল—সেদি কাল খাইবার সংস্থান আর নাই বলি আমরা কাঁদিতে বসিয়া যাই! যখন নেতা বলিলেন যে যা-কিছু বিদেশী তাহা বর্জ্জ কর—তখন আমাদের দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দ্বারের উপর আমরা প্লাকার্ড মারিয়া দিলা "গোলামখানা",—ঘরে গিয়া তর্ক জুড়িলা যে বিলাতি কুমড়ার তরকারি পরিত্যা করিব।

মাত্রার হিসাব বড় কঠিন হিসাব ইহাতে ভুল হয় না এমন অল্প লোক

আছে। অহং প্রবৃত্তির মুখে রাশ দিয়া তাহাকে সব সময়ে সংযত রাখিতে পারা সহজ কাজ নয়। ইহা মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা এবং বিবেচনার উপর নির্ভর করে। দেশের অধিকাংশ লোকই নিজের জ্ঞান বুদ্ধি খরচ করিয়া চলিতে পারে না— কাহারো বুদ্ধির অভাব ঘটে, কাহারো-বা উদ্যোগের অভাব হয়। তাই সমাজের মধ্যে নিয়মাদি প্রবর্ত্তন করিতে হয়—তাই পথ-প্রদর্শকের দরকার হয়।

কবি সর্ব্বসমক্ষে আসিয়া নেতৃত্বের পদ গ্রহণ না করিলেও ভাব-রাজ্যের উপর কিছু-কিছু অধিকার রাখেন। আমাদের দেশের জনসাধারণের সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগ নাই বলিলে মিথ্যাকথা বলা হয়। দেশের শিক্ষিত সাধারণের সহিত জনসাধারণের যোগ আছেই আছে। সে যোগ প্রত্যক্ষ। এমনি করিয়া কবির ভাব এবং চিন্তা দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু এ-কাজ একদিনে হয় না। তাহা অল্পসময়ের মধ্যে করিতে গেলে সমাজের মধ্যে বিপ্লব ঘটিয়া পড়ে।

দেশের লোক যখন বিদেশী সভ্যতার চাকচিক্যে মুগ্ধ, তখন কবি তাহাদের কানে কানে মন্ত্র দিয়াছেন—তোমারও দেশ ছিল— তার সভ্যতাও ছিল, সে কথা ভুলিলে চলিবে না! তাহার পর দেশে যখন স্রোত ফিরিল কবি তখন দেশের লোকের কানে অন্য মন্ত্র গুঞ্জন করিয়াছেন—তোমার দেশের যাহা আছে তাহাকে অমন সহজভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। তাহার কি আছে কি নাই বিচার করিয়া বিবেচনা করিয়া লও। ঘরের জিনিষ বাইরের সঙ্গে যাচাই করিয়া লইতে তোমাদের আপত্তি কি?

বৎসর-দুই আগে—কবি যখন য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন —তখন আমরা সদলবলে একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেদিন তিনি যে কথাগুলি আমাদের বলিয়াছিলেন—এই দুই বৎসর ধরিয়া সবুজপত্রের পৃষ্ঠা অবলম্বন করিয়া তাহাই বলিয়া আসিয়াছেন। যে কথা নীতিকথা বলিয়া আমরা শুনিতে চাই নাই—সেই কথা গল্পের আকারে "ঘরে-বাইরে"র মধ্যে তিনি বলিয়া গিয়াছেন। গল্পের আবরণ খসিয়া পড়াতে আমরা বুঝিয়াছি এ সেই কবির নীতিকথাই—তাই আমরা একটা হৈ-চৈ বাধাইয়া তুলিয়াছি। আমরা বলিতেছি এমন করিয়া বাহিরের বিষ ঘরের মধ্যে আনিয়া ছড়াইয়া দিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই।

যদি আমরা বিশ্বাস করিতাম যে কবি যাহা বলেন তাহা দেশের লোকের অন্তর পর্য্যন্ত পৌছায় না—তাহা হইলে আমাদের এত মাথা-ব্যথার প্রয়োজন ছিল না। তিনি বস্তুতন্ত্রহীন কল্পনার ফাঁকা আকাশে ডানা মেলিয়া যত পারেন উড়ুন, তিনি তাঁর নিভৃত কক্ষের শূন্যতার মধ্যে যত পারেন বকুন—তাহাতে দেশের কি যায়-আসে? দেশের রাজা-রাজড়ার অধ্যাপক-প্রফেসারদের মাথায় এমন টনক নড়িল কেন? এ-কথার উত্তর তাঁহারাই ভাল করিয়া দিবেন,— যাঁহারা বলিতেছেন যে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবের কাঠ নহেন—তিনি অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে দেশের হৃদয়তন্ত্রীর সহিত নিজেকে বিচ্ছিন্ন

করিয়া—কষ্টকল্পনার অখণ্ডিত্ব প্রসব করিতেছেন।

আমরা এখন এই কূটতর্কের মধ্যে প্রবেশ করিব না—আমরা উপস্থিত ক্ষেত্রে ধরিয়া লইতেছি যে কবির সহিত দেশের জীবনী-শক্তির এবং হৃদ্-স্পন্দনের একটা নিগূঢ় যোগ আছে।

যখন আমাদের লোলুপ দৃষ্টি য়ুরোপের উপর পড়িয়াছিল, তখন কবি আমাদের নিকট দেশের গৌরব গায়িতেছিলেন। তাহার পর যখন আমাদের একান্ত আগ্রহ দেশের উপর পড়িল, এবং যখন কবি জানিলেন যে তাহা সহজে টলিবার নয়; যখন কবি অনুভব করিলেন যে তাহাতে ঈর্ষা-বিদ্বেষের গন্ধ আছে, তখন দেশের গৌরব-গান পরিত্যাগ করিয়া তিনি দেশের যাহাকিছু সবই অবাধে গ্রহণ না করিয়া বিচার-বিবেচনার সহিত গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। এখানেই যত গোল বাধিয়াছে।

কবি এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করিবার পূর্ব্বে বিদেশের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারগুলি একবার স্বচক্ষে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। য়ুরোপ কেন যে এতবড় হইয়া উঠিয়াছে তাহার কারণটা তিনি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া আসিয়াছিলেন! তিনি বলিয়াছিলেন, বিদেশের কয়েকটা জিনিষ আমাদের দেশের মধ্যে আনা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। আমাদের দেশ নিয়ম-নিগড়ে এমন শৃঙ্খলিত যে দুনিয়ার গতির সহিত এক হইয়া চলা তাহার পক্ষে অসম্ভব। দেশের আচার-ব্যবহার নিয়ম-কানুনগুলিকে আগাগোড়া বুঝিতে হইবে—যেগুলি মর্চ্চে ধরিয়া অচল-প্রায় হইয়াছে তাহাকে সংস্কার করিতে হইবে।

দেশের সামাজিক নিয়মের পরিবর্ত্তন ও সংস্কার একেবারে যে ঘটিতেছে না, তাহা নহে; অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত সেগুলি যে আপন হইতে বদলাইয়াছে তাহা অনুধাবন করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়। তবে এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ কি আপত্তি থাকিতে পারে? আমাদের সমাজের দোষ-গুণ যদি আমরা না দেখি, তাহা হইলে বাহির হইতে কে আসিয়া তাহার পরিবর্ত্তন করিবে?

সামাজিক সংস্কারের ভিতর দুইটি জিনিষের উপর কবির কড়া নজর পড়িয়াছে; প্রথম জাতিভেদ এবং দ্বিতীয় স্ত্রী-পরাধীনতা ও অবরোধ। এই দুইটির বিষয়ই আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে আমাদের সমাজ এমন সকল অযথা এবং ফজুল নিয়ম সকলের দ্বারা আষ্টে-পৃষ্ঠে আবদ্ধ যে, সে-গুলিকে শিথিল না করিতে পারিলে জাতির জড়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে।

কবি যদি এই কথা বুঝিয়া জাতিভেদ ও স্ত্রীপরাধীনতার বিরুদ্ধে—সমাজের কল্যাণের জন্যই লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার সহিত দেশের শিক্ষিত সাধারণের বিরোধ না হইবার কথা।

কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা যে শিক্ষিত সাধারণ কবির এই কটাক্ষ সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন এবং তাঁহার উপর কয়েকটা দোষ চাপাইয়া দিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। পাকে-প্রকারে কবির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ যে তিনি হিন্দু নন, তিনি ব্রাহ্ম

এব তিনি নিজ ধর্ম্মের উন্নতির কথা করিয়াই হিন্দুসমাজকে ভাঙ্গিয়া দিতে হেন। বিধর্ম্মী হইয়া হিন্দু সমাজের ারে হাত দিতে যাওয়া তাঁহার অনধিকার ী হইয়াছে।

এই অভিযোগের উত্তরে এইটুকু বলিলেই ষ্ট হইবে যে কবিকে আমরা যেন কটু খাট করিয়া দেখিতেছি। তাঁহার গোরা"য় তিনি যে উদার মতের পরিচয় য়াছেন তাহা হইতে পরিস্কার বুঝা যায় তিনি কোন ধর্ম্মের সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর াবদ্ধ নহেন। তিনি মানুষকে বিশ্বমানবের হত্তর যোগ হইতে ছিন্ন করিয়া সংকীর্ণ ণ্ডীর ভিতর আনিতে চাহেন না। যে ধর্ম্ম ানুষকে বিশ্বমানবের উদার ধাপ হইতে ানিয়া ক্ষুদ্রতার পঙ্কে ফেলিতে চাহে তাহাকে তিনি ধর্ম্মই বলিতে নারাজ।

ধর্ম্ম মানুষের জন্য—নীতির নিয়ম, ধর্ম্মের নিয়মগুলি যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষকে মানুষ হইতে সাহায্য করে ততক্ষণ সেগুলির সহিত মানব-সন্তানের কোন বিরোধই উপস্থিত হয় না; কিন্তু মানুষ যখন কেবলমাত্র তাহার ভার বহন করিতে থাকে তখন সেগুলিকে বর্জ্জন করাই মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য।

ইহার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে একান্ত বিরল নয়।

বৈদিক ধর্ম্ম যখন অবসাদগ্রস্ত হইল তখন বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবসাদে শঙ্করাচার্য্যের হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইল। আমাদের দেশের চৈতন্য মহাপ্রভু, রামমোহন রায় এবং পরমহংস-দেবের আবির্ভাবও যথাসময়ে হইয়া গেছে। ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে তিনি অবতীর্ণ হন—এমন কথাই গীতায় উক্ত হইয়াছে।

য়ুরোপের ইতিহাসে ধর্ম্মের উত্থান-পতনের যে ক্রম দেখিতে পাওয়া যায় তাহারও এই একই কথা। যখন গ্লানি উপস্থিত হয় তখন সংস্কার করিতে হয়।

আমাদের দেশের ধর্ম্ম এবং সমাজের মধ্যে যে গ্লানি আসিয়াছে—তাহার সংস্কার আবশ্যক—সে কথায় আমাদের রাগ করাটা অবিবেচনার কাজই হইবে।

রাম জন্মিবার পূর্ব্বে কবি রামায়ণ গান করিয়াছিলেন। সমস্ত দেশের অন্তরের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা পুঞ্জীভূত হইয়া ব্যথা দেয়, কবি তাহাকে প্রকাশ করেন। আমাদের অন্তরের নিগূঢ় বেদনা হয়ত এমনি করিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে কবির বাণীরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে। হিন্দুসমাজের কয়েকটা অঙ্গ একেবারে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে-গুলির প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি যে পড়ে নাই তাহাও নহে। সমাজ ঠিক যেন কিসের প্রতীক্ষাতেই আছে, যেন কি চাহে তাহা লাভ না করিলে তাহার আর কল্যাণ নাই।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে আমাদের সমাজে নীচ-জাতি ও স্ত্রী-জাতি যে ব্যবহারটা সহ্য করিয়া আসিয়াছে তাহা আর অধিকদিন সহ্য করিতে তাহারা রাজি নয়।

এখন ব্রাহ্মণ আর আমাদের নেতা নন। এখন ধনীই সমাজের নেতা। ধনীর যথেচ্ছাচার সমাজ নতমস্তকে সহ্য করিতেছে। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে বিদ্যার গৌরব

নাই, কুলের গৌরব নাই—চরিত্রের গৌরব নাই—আছে কেবল ধনের গৌরব।

এদিকে সমাজের আর্থিক অবস্থাও দিন দিন অবনত হইয়া পড়িতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও স্ত্রীর সাহচর্য্য ব্যতীত আমাদের সংসার বেশ চলিয়াছে। কিন্তু ক্রমেই জীবন-সংগ্রাম কঠিন হইতে এমন কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইতেছে যে স্ত্রীলোককে বাদ দিয়া সংসার-চালানো দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। স্বামীর পার্শ্বে যখন স্ত্রীকে দাঁড়াইতেই হইবে তখন তাহাকে দাঁড়াইতে দিবার মত উপযুক্ত করিয়া লইতে আমাদের কি আপত্তি থাকিতে পারে? তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া আজ সে আমাদের গলগ্রহ হইয়াছে। আমরা এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি যে তাহাদের ভার বহন করিবার সাধ্য আর আমাদের নাই—তখন যাহাতে আমরা নারীগণের সহায়তা লাভ করিতে পারি, তাহার পথ এখন হইতে নির্ণয় করা আমাদের একান্ত উচিত হইয়া পড়িয়াছে।

সবুজপত্রের পৃষ্ঠায় কবি এই কথা-গুলিরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহার জেঠা-মহাশয় যে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছেন তাহা বিশ্বমানবের ধর্ম্ম,—হিন্দু সে ধর্ম্মের অধিকারী নয় এমন কথা ত তিনি কোথাও বলেন নাই। নীচজাতির নীচত্ব না মানিয়া তাহাদের সহিত আহার-বিহার রবীন্দ্র-নাথের গল্পের নায়কই যে শুধু করিয়াছেন তাহা নহে। বঙ্গদেশের ধর্ম্মের ইতিহাসে এ-সব কাহিনী উজ্জ্বল অক্ষরে লিখা আছে—তাহা কেবলমাত্র কবির মানসসম্ভূত অলীক কল্পনা নহে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বঙ্গের শিক্ষিত-সমাজ কখনই মনে করেন না যে, আমাদের পতিত জাতির উদ্ধারের কোন উপায় নাই। যে নীচে আছে তাহাকে উপরের পথে উঠিতে না দিবার যে চেষ্টা তাহা স্বার্থপ্রণোদিত, তাই তাহা দেশের কল্যাণের জন্য নহে—তাহাতে আমাদের জাতির সমূহ অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

অবহিত হইয়া চিন্তা করিলে দেখা যায় যিনি সমাজের কাণে এই সকল উপদেশ দিতেছেন তিনি সমাজের শত্রু নহেন—তিনি সমাজের মঙ্গল-অমঙ্গলের মধ্যে আপনাকে এমন গভীর ভাবে নিহিত করিয়াছেন যে, লোক-নিন্দা এবং স্তুতি-প্রশংসা তাঁহাকে স্পর্শ করে না। কবি যখন বাণীর কাব্য-কুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া সংসারের কঠোর কর্ত্তব্যের মধ্যে আপনাকে টানিয়া আনেন তখন তাঁহাকে বহুতর নিন্দাস্তুতির ব্যূহভেদ করিয়া চলিতে হয়—একথা তিনি যে জানেন না—তাহাও নহে। আমার এই প্রবন্ধ তাঁহাকে নিন্দা-বাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যও নহে—তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্যও নহে। যাহা কবি আমাদিগকে দিতেছেন আমরা যেন তাহা অবিচারে অস্বীকার না করি, তাহা নির্ব্বিচারে গ্রহণও যেন আমরা না করি।

সবুজপত্রের "স্ত্রীর পত্র" লইয়া যে বাক্য এবং মসি-যুদ্ধ হইয়া গেছে তাহাও বোধ হয় আপনারা জানেন। সমাজের মধ্যে স্ত্রীর অধিকার লইয়া সমস্ত জগৎময় একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। দেখা

যাইতেছে যে সমাজের নিয়মাদি পুরুষের সৃষ্টি, তাহাতে নারীকে পুরুষের চেয়ে খাট করা হইয়াছে। স্ত্রী এবং পুরুষের প্রভেদ আছে; এই প্রভেদ এক জিনিষের তারতম্যের সহে ইহা বস্তুগত পার্থক্যের ফল; তাই হঠাৎ একটিকে বড় করা এবং অপরটিকে ছোট করার ভিতর ন্যায়ের চেয়ে অন্যায়ের পরিমাণ আছে বেশী। মানুষ যতই সভ্যতার উচ্চ স্তরে উঠিতেছে দৃষ্টি তাহার ততই উদার হইতেছে। নারীর অধিকারের বিষয় চিন্তা করা সমাজের কল্যাণের জন্যই। স্ত্রী এবং পুরুষের সাহচর্য্যে সকল সমাজ চলিতেছে। যদি এই সাহচর্য্যের সম্বন্ধটা আরো সুন্দর করিতে পারা যায়—যাহাতে নারীত্ব অধিকতর স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া সমাজকে শক্তিমান্ করিতে পারে—সে বিষয়ের আন্দোলনে আমাদের খড়্গহস্ত হইবার কি আছে!

তর্ক উঠিতে পারে যে আমাদের সমাজে নারীকে কোনদিন অবহেলা করা হয় নাই। গৃহের মধ্যে নারীই অধিষ্ঠাত্রী, সেখানে পুরুষ কোনদিন কর্ত্তৃত্ব করিতে যায় নাই। বহু অভিজ্ঞতার ফলে নারীকে অবরোধের মধ্যে রাখাই সমীচীন মনে হইয়াছে। হঠাৎ আজ য়ুরোপের অনুকরণে আমাদের দেশের এই স্থায়ী ব্যবস্থাগুলিকে উলট-পালট করিতে যাওয়া গণ্ডমূর্খতা হইবে।

এ কথার মধ্যে যে কোন সত্য নাই এমন মনে হয় না। যে সকল আচার-ব্যবহার বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের সমাজ গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে এককথায় বদল করিতে যাওয়া বুদ্ধির পরিচায়ক নহে, সত্য বটে; কিন্তু সেইগুলির বিষয় বিচার করিতে বসিলে তাহাদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না—সে-গুলিকে অতিক্রম করিয়া দীর্ঘকালে সেগুলি সমাজকে কোন পথে লইয়া চলিয়াছে তাহার কথাও মনে করিতে হইবে। আমাদের সমাজ যে উন্নতিশীল নহে তাহা বোধহয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। এ অবনতির কারণ কি? তাহা নির্ণয় করিতে যাওয়া নিতান্ত দোষের হইবে বলিয়াত মনে হয় না। কবি যদি আমাদের মধ্যে সেই অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তিটি জাগাইয়া তুলিতে চাহেন ত তাঁহাকে আমাদের সমাজের হিতৈষীই মনে করিতে হইবে। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ-বিষয়ে যে সকল কথা সবুজপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার শেষ কথা কবি বলেন নাই। তিনি ঐ বিষয়টিকে এমন ভাবে তুলিয়াছেন যে তাহা এখনো সমস্যার আকারেই আছে; তার শেষ সীমাংসায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আলোচনার আবশ্যক তাহাই যেন নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আমাদের সমাজ ধরিয়া লইয়াছে যে স্ত্রীলোক স্বভাবতই দুর্ব্বল, তাই তাহাকে সংসারের লোভ-পাপ হইতে দূরে রাখিলে সমাজের কল্যাণ হয়। কবি বলিতেছেন যে, যে দুর্ব্বলতা তোমরা স্ত্রী-চরিত্রের উপর আরোপ করিয়া আজ তাহাকে অবরোধের মধ্যে রাখিয়াছ সেটা কি তোমাদেরই সৃষ্টি নয়? স্ত্রীলোক যদি পুরুষের মত প্রকৃতির উদার আকাশ এবং বাতাসের মধ্যে, সংসারের দুঃখ-কষ্ট বিপদ-আপদের মধ্যে, জীবনযাপন করিতে পায়,

তাহা হইলে তাহার সেই দুর্ব্বলতাটুকু ঘুচিয়া যাইতে পারে। অন্যান্য দেশের ইতিহাসও এই কথাই বলিয়া থাকে। আমাদের সমাজে এতবড় একটা অভাব থাকিয়া যায় কেন? কঠিন জীবন-সংগ্রামের মধ্যে যে জাতি বড় হইয়া উঠিতে চায়, তাহার ভিতর এতবড় একটা গলদ থাকিলে চলিবে কেন? ইহা চিন্তা করিবার বিষয়—ইহা লইয়া দেশময় হৈ-হৈ করিয়া একটা কোঁদল পাকাইলে লাভ কি?

অবশ্য কবি এমন কথা বলেন নাই যে, হে সমগ্র বঙ্গদেশের লোক, তোমাদের সমক্ষে যে বিমলার চরিত্রটি ধরিলাম, তাহা তোমাদের স্ত্রী-কন্যাগণের আদর্শরূপে; অতঃপর বঙ্গনারী এই ছাঁচেই তৈরী হইবে; অন্যরূপ হইতে আমি দিব না।

"ঘরেবাইরে"র বিমলা-চরিত্রের সূক্ষ্ম সমালোচনা করিবার অবসর এখানে নাই; কয়েকটি স্থূল কথার অবতারণা মাত্র করিতেছি।

বিমলা ঠিক আমাদের দেশের আধুনিক মহিলা। স্বামীর কড়া শাসনের দুর্ভাগ্য তাহার ঘটে নাই; তাই তাহার মানসিক বৃত্তিগুলিও একেবারে মরিয়া যায় নাই। সামাজিক নিয়মে সেগুলি নিদ্রিত ছিল মাত্র। হঠাৎ একদিন সন্দীপের রংমশালের দীপ্তিতে সেগুলি চোখ মেলিয়া চাহিল। প্রথম জাগরণে তাহার নিদ্রার প্রমত্ততার, স্বপ্নের জড়িমার ঘোর কাটে নাই। জাগার আনন্দতেই সে দিশেহারা হইয়া পড়িল। পথ এবং বিপথের প্রভেদ তাহার মনের মধ্যে প্রথম উত্তেজনায় কোন স্থানই পাইল না। কিন্তু উত্তেজনা যাহা বাহির হইতে আসে তাহা ক্ষণস্থায়ী—তাই বিমলা অবশেষে যাহা সাঁচ্চা পথ তাহাই দেখিতে পাইল।

নিখিলেশের ভালবাসা বর্ণহীন সূর্য্যের কিরণের মত। যে অনভিজ্ঞ সে জানে যে, তাহাতে সকল বর্ণই আছে। সেই জানিতে যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, বিমলা তাহা নাই। সন্দীপ কিন্তু বর্ণহীন নয়। তাহার প্রেম মদির রক্তের মত লাল, তাহার আস্বাদ লঙ্কার মত ঝাল। সে লাল রং এবং ঝাল আস্বাদ শিশুকে আকর্ষণ করে; কিন্তু ইহার মোহ ঘুচিতে বেশি বিলম্ব হয় না।

বিমলাকে খণ্ডিত করিয়া দেখিলে তাহাকে ঠিক দেখা হয় না—তাহাকে সমগ্র করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে নারীর স্ফুরণ কিছুতেই পরিতৃপ্ত নয়; তাহার আকাঙ্খার শেষ পরিণতি মাতৃত্বে। "ঘরে-বাইরে"র মধ্যে ইহার ইঙ্গিত করা দিয়াছেন।

নিখিলেশের মধ্যে মানুষের সমস্ত প্রবৃত্তি গুলি বিশুদ্ধতা পাইয়া জমাট বাঁধিয়াছে। নিখিলেশ যেন বরফের পাহাড়। সন্দীপ যেন ক্ষারময় প্রবৃত্তির তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র। বিমলা উভয়ের মধ্যে লীলাময়ী নির্ঝরিণী।

নিখিলেশ কোন জিনিষ বিনা ওজনে দান করেনা, গ্রহণও করে না। সন্দীপ যাহা পায় নিঃশেষে গ্রহণ করে, যাহা দেয় নিঃশেষে দান করিয়া ফকির হইয়া বসে। নিখিলেশ সাত্বিক—সন্দীপ তামসিক। "ঘরে-বাইরে"তে নিখিলেশের শেষ আছে, সন্দীপের শেষ আছে; কিন্তু বিমলার শেষ নাই।

বি তাহার ভিতর অনেক সমস্যার ইঙ্গিত রিয়াছেন, কিন্তু তাহার মীমাংসা করেন াই; তাই বিমলা-চরিত্র অসমাপ্ত।

আমাদের কিন্তু গোল বাধিয়াছে এই মলাকে লইয়া। কবি নিজেও বিমলাকে াগাগোড়া বুঝাইয়া দেন নাই এবং খিলেশ ও সন্দীপকে দিয়াও দিতে পারেন াই। শেষ-পর্য্যন্ত বিমলা সন্দীপের নিকট হেলিকার মতই আছে। এ-কথাও আমরা লিতে পারি না যে নিখিলেশ বিমলাকে াগাগোড়া বুঝিয়াছে। বিমলার আত্মকথার ধ্যে সে যেটুকু আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে াহার অন্তরালে যে কথার আভাস আছে াহা—বিমলাকে বুঝিতে হইলে,—ত্যাগ রিলে চলিবে না। মানুষের সব ব্যথার কথাই যে অশ্রু ও রোদনে প্রকাশ পায় াহা কে বলিতে পারে? কবির ভাষায় লিতে গেলে Some are too deep for tears.

বিমলার ভিতর যে সামাজিক সমস্যা নিহিত আছে তাহার সমাধান হট্টগোলে হইবে না। অরসিকের চীৎকারেও তাহা াগা পড়িবার নহে। জগতের নারীর হৃদয়-কোরক উদ্ভেদ করিয়া যে বেদনা বিশ্বের বিচার-দ্বারে আত্মনিবেদন করিয়াছে, তাহাকে অবহেলায় পুরুষের কল্যাণ নাই—কিঞ্চিৎ পৌরুষ থাকিলেও থাকিতে পারে।

নিখিলেশ-চরিত্রের ভিতর আদর্শের ইঙ্গিত আছে। সমস্ত জীবন দিয়া নিখিলেশ যে ধ্রুব সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছে তাহার উদ্দেশ একটি জীবনে সমগ্র পাওয়া যায় না। জন্মজন্মান্তের কঠোর সংযমের উদ্দীপনার আলোকে তাহাকে পাওয়া যায়; তাহাকে আয়ত্ত করা সুকঠিন। নিখিলেশ পাশা-পাশি দুইটা জিনিষকে বুঝিতে চাহিয়াছে। প্রথম বিমলা; দ্বিতীয় দেশ। বিমলাকে তেমন করিয়া বুঝা হয় নাই; কিন্তু দেশকে নিখিলেশ তার প্রকৃত স্বরূপে দেখিয়াছে।

"ঘরে-বাইরে"র দেশের কথাগুলি বড় মূল্যবান। ইহাতে আমাদের স্বদেশী-আন্দোলন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া খপ্ করিয়া কেন নিবিয়া গেল তাহার কারণটি সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে কবি যেন একটা মীমাংসায় আসিয়া পৌছিয়াছেন।

দেশের উপর মাতৃত্ব আরোপ করিয়া কেমন সহজে একটা হুলস্থুল করা যায় তাহা আমরা জানি। সে বেশীদিনের কথা নয়, যখন বঙ্গদেশ এই দেশভক্তি এবং মাতৃভক্তির নেশায় মাতাল হইয়াছিল। কবি অল্পকথায় এই আন্দোলনের বিফলতার কারণ দেখাইয়াছেন। দেশকে জানিতে হইলে তাহার প্রথম উপায় তাহার সেবক হওয়া—সেবা না করিয়া ভক্ত হইয়া বসিলে গোড়ায় গলদ হয়।

নিখিলেশ সেবার বৃহৎ গণ্ডী উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই; কিন্তু সন্দীপ সেবার ধার না ধারিয়া একেবারে ভক্ত হইয়া দাঁড়াইল। যদি কেহ বস্তুতন্ত্রহীন থাকে ত সে সন্দীপ। সন্দীপের মত দেশভক্তের অভাব—অন্য কোন দেশে থাকিলেও আমাদের সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমিতে যে নাই—তাহার সাক্ষ্য কি আপনারা দিবেন না?

প্রতিভাবান কবি যে কথা বলিয়াছেন

তাহা উপেক্ষা করিবার নহে। দল-বাঁধিয়া ঘোট করিলে তাহাতে দেশের ক্ষতি। তিনি যাহা দিয়াছেন যদি তাহা সত্য না হয় তবে অধীর হইবার কোন দরকার নাই। "মিথ্যা চিরদিনই তাহার ব্যর্থতা লইয়া যথাসময়ে বিদায়গ্রহণ করে। "ঘরে-বাইরে" যদি কল্পনার আকাশ-কুসুম হয় তাহাহইলে দেশের মাটির বাস্তব-সত্যকে কিছুতেই ক্ষুন্ন করিতে পারিবে না। তাহাকে ত্যাগ করিবার জন্য এতবড় আড়ম্বর করিয়া আমরা শক্তিক্ষয় করিতেছি কেন?

যদি "ঘরে-বাইরে"র মধ্যে কবি কিছু সারবান পদার্থ দিয়া থাকেন—যদি তাহা আমাদের রক্ষণশীল বিশ্রামপ্রিয় প্রাণে আঘাত দিয়া থাকে ত তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্যই। মানুষ যখন ব্যাধিগ্রস্ত হয় তখন ডাক্তার মুখরোচক ঔষধ দেন না। কবিকে অনেক সময় সমাজের ডাক্তারি করিতে হয় সে ক ভুলিলে চলিবে কেন?

সবুজপত্রের মধ্যে কবি যে লিখ পাঠাইয়াছেন তাহা দিয়াই আমরা তাঁহা পরখ করিতে পারি। বেশীদূরে যাইতে হয় না।

অবশেষে নিবেদন, "ঘরেবাইরে" পড়িয়া যাঁহারা তাঁহার নিন্দা করিতেছেন তাঁহাদিগকে আমরা ক্ষমা করিতেছি। অর্দ্ধা পাঠ করিয়া যাঁহারা তর্ক জুড়িয়াছেন তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ পড়িতে বলি। যাঁহা মাসে মাসে পড়িয়া একটা ধোঁয়ার ম আবছায়া ধারণা করিয়া কোমর বাঁধিয়াছে তাহাদিগকে অনুরোধ করি, একবার সম ভাবে পাঠ করিতে।

সহানুভূতির সহিত এই পুস্তকখানি প করিলে আমরা অনেক শিখিতে পারিব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ছন্নছাড়া

(১৪)

এখন-থেকে আমি দাসীর কাজ পেলুম। আমাকে মুরগি ও খরগোস জবাই করতে হত। কিন্তু সে আমার এত খারাপ লাগত যে কি বলব! পলিন বুঝতেই পারত না যে কেন আমার এই বিতৃষ্ণা। সে বলত আমি ঠিক ইউজেনের মতন;—কারণ শূয়োর কাটা হচ্ছে দেখলেই সে পালাত। যাই হোক, এই বলে বুক বাঁধলুম যে একটা মুরগি জবাই করবই—সকলকে দেখাব যে আমি পিছপাও নই। মুরগিটাকে আমি গোলা-ঘরে নিয়ে গেলুম। আমার হাতের মধ্যে সেট ঝট্‌পট্ করতে লাগল, আর আশপাশে খড়গুলো রাঙা হয়ে উঠল। তারপর সে একেবারে স্থির। আমি সেটাকে রেখে দিলুম —বিবিশ্ এসে তার পালক ছাড়াবে। কিন্ত বিবিশ্ ঘরের মধ্যে ঢুকেই খিক্-খিক্ করে হেসে উঠল। দেখি-না মুরগিটা তখন দিব্যি মাটি ছেড়ে উঠে একেবারে ধানের ঝুড়ির মধ্যিখানে গিয়ে বসেচে। ভারি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সে টপ্-টপ্ টপ্-টপ্ করে খেয়ে যাচ্ছিল;—যেন আমার হাতে

যা জখম হয়েছে সেটা সে যত শীঘ্র পারে সাম করে নিতে চায়। বিবিশ্ তাকে ফেল্লে এবং তার ছুরির ফলাটা যখন গলা পেঁচিয়ে চলে গেল তখন খড়গুলো গের চেয়ে ঢের বেশি রাঙা হয়ে উঠল। দুপুরবেলা ঘুমুতে না গিয়ে আমি বই বার জন্যে সেই খুব্‌রি-ঘরটায় উঠে যেতুম। য়ের যেখানটা হোক খুলতুম এবং একই গা যতবারই পড়ি না, একটা নূতনত্ব তুমই পেতুম। আমার এই বইখানিকে মি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতুম। আমার ছে সেখানি ছিল যেন একজন যুবা রীর মতন, যাকে রোজ লুকিয়ে আমি তে আসি। আমার মনে হত তার য়ে যেন রাজপুত্রের সাজ;—সেই কালো গার উপরে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে সে পেক্ষা করে রয়েচে। একদিন সন্ধ্যাবেলা র সঙ্গে ভারি চমৎকার বেড়ানো হয়েছিল। খানা মুড়ে আমি কনুইয়ের উপর ভর য়ে জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে-লুম। তখন প্রায় সন্ধ্যা। পাইন গাছ-লোর গায়ের সবুজের জেল্লা তখন বেশ মে এসেছে। আকাশে সাদা মেঘের পুঞ্জ লে সূর্য্য চলেছেন;—মেঘের রাশ একবার াল খেয়ে গিয়ে আবার ফুলে উঠছে—তুলো া পালকের বস্তায় একটা ভারি জিনিষ ঁজে দিলে যেমন হয়।

জানিনা কেমন করে হ'ল—হঠাৎ দেখি মি উড়ে চলেছি—টেলিমেকসের সঙ্গে। আমার হাত ধরেছে; আমাদের মাথা ছে আকাশের যে নীল তার গায়ে! লিমেকস্ কোনো কথা বলেনি, কিন্তু আমি বুঝলুম আমরা সূর্য্যের মধ্যে যাবার জন্যে উড়ে চলেছি। নীচে থেকে বুড়ি বিবিশ্ আমায় ডাকতে লাগল। অনেক দূর থেকে শব্দ আসছিল কিন্তু আমি তার গলার স্বর ঠিক বুঝতে পারছিলুম। আমার মনে হতে লাগল এত চেঁচাতে হচ্চে বলে সে ভারি রেগে উঠছে। কিন্তু সে-কথা আমি গ্রাহ্যই করলুম না। আমার চোখে আর-কিছু পড়ছিল না—কেবল দেখছিলুম, সূর্য্যের চারদিকে ঝক্‌ঝকে সাদা পালক থাক-থাক সাজানো;—তারা সবাই ধীরে ধীরে ফাঁক হয়ে আমাদের যাবার পথ করে দিচ্ছিল। হঠাৎ আমার হাতের উপর একটা থাব্‌ড়া লাগতেই আমি একেবারে হুস্ করে সেই খুবরী-ঘরটার মধ্যে এসে পড়লুম। বুড়ি বিবিশ্ জানলা থেকে আমায় টানতে লাগল, বলতে লাগল—"হয়েছে কি তোর! চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মরচি যে! কিছু না হ'ক বিশ বার চেঁচিয়েছি—খাবার খাবি, নেমে আয়!" কয়েকদিন পরে দেখি সেই বইখানি আমার একেবারে অন্তর্দ্ধান করেছে। কিন্তু যাক্! সেখানি তখন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতন হয়ে গিয়েছিল—যাকে আমি দিনরাত বুকের মধ্যে রেখে বেড়িয়েছি, যাকে কখনো ভুলতে পারব না।

(১৫)

ক্রিষ্টমাসের দুদিন আগে মাষ্টার সিল্‌ভ্যাঁ একটা শূয়োর কাটবার জন্যে সব ঠিক করতে লাগল। দুটো বড়-বড় ছুরি সান দেওয়া হল; টাট্‌কা খড় দিয়ে একটা বিছানার মতন তৈরি করা হলে সিল্‌ভ্যাঁ শূয়োরটাকে আনতে বল্লে। শূয়োরটা এমন

কাতরাতে লাগল যে আমার মনে হল সে নিশ্চয় টের পেয়েছে যে তার কথালে কি আছে। সিল্‌ভ্যাঁ তার পা-চারটে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল্লে, তারপর মাটিতে পোঁতা একটা খোঁটার সঙ্গে তাকে বাঁধতে-বাঁধতে স্ত্রীকে বলতে লাগল—"ছুরি দুখানা লুকিয়ে ফেল পলিন! যেন দেখতে না পায়।" পলিন আমার হাতে একটা খোরা দিলে রক্ত ধরবার জন্যে; বল্লে, খুব সাবধানে ধরতে হবে, যেন এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে না পড়ে। শূয়োরটার কাছে চাষা এগিয়ে গেল—সে তখন মাটিতে চিৎ হয়ে পড়েছিল। একটা পায়ের হাঁটু মাটিতে গেড়ে সে তার সাম্‌নে গিয়ে বসল, এবং তার টুঁটিটা এক হাতে ধরে, আর-একটা হাত লুকিয়ে পিছন দিকে এগিয়ে দিলে—পলিন বড় ছুরিখানা সেই হাতে তুলে দিলে। সিল্‌ভ্যাঁ শূয়োরটার গলার যেখানে আঙুল দিয়ে টিপ করে রেখেছিল, ছুরির ডগাটা সেই জায়গায় বসিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে সেঁধিয়ে দিতে লাগল। ছোট ছেলেরা যেমন করে কাঁদে ঠিক তেমনি করে শূয়োরটা কেঁদে উঠল। ক্ষত স্থান থেকে এক-ফোঁটা রক্ত চুঁইয়ে একটা সরল রেখার মতন গড়িয়ে পড়ল;—ছুরি থেকে ছিট্‌কে দুফোঁটা রক্ত চাষার হাতের উপর এসে লাগল। ছুরিখানার বাঁট পর্য্যন্ত সমস্ত ফলাটা যখন ভিতরে চলে গেল তখন চাষা তার সমস্ত দেহের ভার তার উপর খানিক ক্ষণের জন্যে চাপিয়ে রাখলে; তার পর যেমন ধীরে ধীরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল তেমনি ধীরে ধীরে ছুরিখানা বার করে আনলে। রক্তে রাঙা টক্‌-টক্‌ করছে সেই ছুরিখানা দেখে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল—সমস্ত জিবখানা শুকিয়ে গেল। হাতের আঙুলগুলো একেবারে অবশ হয়ে খোরাখানা একদিকে কাৎ হয়ে পড়ল। সিল্‌ভ্যাঁ তা দেখতে পেলে। আমার মুখের দিকে একটা দৃষ্টি হেনে তার স্ত্রীকে বল্লে—"নাও, নাও, ওর হাত থেকে খোরাখানা তুলে নাও।" মুখ দিয়ে আমার কথা বার হলনা, কিন্তু আমি জোর দিয়ে ঘাড়-নেড়ে জানালুম—"না।" চাষার সেই দৃষ্টিতে আমার মনের সব দুর্ব্বলতা কেটে গিয়েছিল; আমি খোরাখানা খুব শক্ত করে ধরলুম—তার উপরে রক্তের স্রোত এসে পড়তে লাগল। যখন শূয়োরটা একেবারে স্থির হয়ে গেছে, তখন ইউজেন এসে দাঁড়াল; আমার হাতে রক্তের খোরা দেখে সে চমকে উঠল! আমি তখনো খুব সাবধানে খোরাখানা ধরে আছি—রক্তের শেষ-বিন্দুগুলি চোখের জলের মতন একটির পর একটি করে গড়িয়ে এসে পড়ছে। সে বল্লে—"তুমি সমস্তক্ষণ ঐ খোরাখানা ধরে ছিলে না কি!" চাষা উত্তর দিয়ে বল্লে—"হাঁ, ও তোমার মতন অমন প্যান্‌পেনে নয়।" ইউজেন বল্লে—"কথাটা ঠিক! সত্যি আমি ঐ জানোয়ার জবাই করা সইতে পারি না।" সিল্‌ভ্যাঁ বলে উঠল—"যেমন তোমার বুদ্ধি! জানোয়ারগুলো হয়েছে কি করতে? কাঠ যেমন আমাদের আগুন দেবার জন্যে হয়েছে, জানোয়ারগুলো তেমনি আমাদের পেট পোরাবার জন্যে।" ইউজেন তার মুখ ফিরিয়ে নিলে—যেন তার অন্তরের দুর্ব্বলতার জন্যে সে একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছে। তার কথা

ছিল পাতলা কিন্তু খাড়টা গোলগাল, দৃঢ়—মার্ত্তিনের মতন। সিল্‌ভ্যাঁ বলত ওকে দেখতে ঠিক তাদের মায়ের মতন—যেন তাঁর জীবন্ত ছবি!

ইউজেনকে আমি কখনো রাগতে দেখিনি। সে সমস্ত দিন আপনার মনে গুণ-গুণ সুরে গান গাইত। সন্ধ্যাবেলা একটা ষাঁড়ের পিঠে, পাশ-ফিরে বসে, সে মাঠ থেকে ফিরে আসত—এবং প্রায় প্রতিদিনই সে একই গান গাইত। গানটা ছিল একটা সেপাইয়ের কাহিনী নিয়ে তৈরি। যে মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা ছিল, যখন শুনলে সে আর-একজনকে বিয়ে করেছে তখন সে যুদ্ধে চলে গেল। সেই গানের যেখানটা পাতোগ ইউজেন সেইখানটা অনবরত গেয়ে যেত! তার শেষটা ছিল এই রকম:—

(যখন) ছর্‌রা ছুটে লাগবে,—আমার
জীবন যাবে চলে,
(সাধের) জীবন যাবে চলে।
জেনো আমি মলাম,—তুমি
পরের হলে বলে॥

পলিন ইউজেনের প্রতি বেশ একটা সম্ভ্রম রেখে চলত। সে অবাক হত আমি কেমন করে তার সঙ্গে এমন স্বাধীনভাবে মিশি। প্রথম যেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি বাইরের বেঞ্চিতে ঠিক তার পাশে বসি, পলিন ইসারা করে আমায় ভিতরে ডেকেছিল। কিন্তু ইউজেন তখনই আমায় ফিরে ডেকে বল্লে—"এস, এখানে বসে বুনো পেঁচার ডাক শুনবে এস!" যখন সবাই শুতে যেত আমরা দুজনে প্রায়ই সেই বেঞ্চিটিতে চুপ করে বসে থাকতুম। পেঁচাটা দরজার পাশে একটা এল্‌ম্‌ গাছের খুব কাছে এসে বসত; আমাদের মনে হত সে যেন রাত্রের বিদায়-সম্ভাষণ আমাদের শোনাচ্চে। তার পর সে উড়ে যেত; তার বড় বড় ডানা দুটো আমাদের মাথার উপর দিয়ে নিঃশব্দে বহে যেত। কখনো-কখনো পাহাড়ের ধার থেকে মানুষের গলার গানের সুর ভেসে আসত। শুনতে শুনতে আমার সমস্ত শরীর ঝিম্‌ ঝিম্‌ করতে থাকত। রাত্রের ভিতর থেকে ভরাট গলার সেই সুর এসে কোলেৎকে আমার মনে পড়িয়ে দিত। গান থামলেই ইউজেন উঠে দাঁড়াত—আমি চুপ করে বসে থাকতুম—আবার সেই গানের সুরটি এসে কখন্‌ কানে লাগবে! কিন্তু ইউজেন বলে উঠত—"উঠে এস—গান ত শেষ হয়ে গেল!"

(১৬)

শীত এসে পড়তে আমরা আর বাইরের সেই বেঞ্চিতে বসতে পারতুম না বলে আমাদের মধ্যে যেন কি-একটা গোপন বোঝা-পড়া হয়ে গেল। যখনই সে কাউকে নিয়ে মজা-ঠাট্টা করত, তার সেই ক্ষুদে ক্ষুদে অদ্ভুত চোখ-দুটি আমার দৃষ্টি খুঁজে বেড়াত এবং যখনই সে কোনো বিষয়ে মত প্রকাশ করত, আমি তা অনুমোদন করচি কি না যেন তাই জানবার জন্যে আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকাত। আমার বোধ হত সে যেন আমার আজন্মপরিচিত; এবং আমার অন্তরের একেবারে ভিতরে তাকে আমার বড় ভাইটির মতন দেখতুম। সে সর্ব্বদাই পলিনকে জিজ্ঞাসা করত যে সে আমার প্রতি সন্তুষ্ট কি না। পলিন উত্তরে বলত একই কথা বার-বার বলে লাভ

কি? পলিন একটা বিষয়ে আমার ভারি খুঁত ধরত; সে বলত আমার কাজের একটা বিলি নেই;—যখন যেমন মর্জ্জি তেমনি করে চলি। মারি এমেকে আমি ভুলি নি; কিন্তু তার জন্যে আগের মতন সেই মনের উদ্বেগ- আর নেই। এখানে আমার কোনো দুঃখ ছিল না।

(১৭)

জুন মাস পড়তেই, যেমন প্রতি-বছর হয়, এ বছরও ভেড়ার লোম কাটতে লোক এসে হাজির হল। তারা একটা দুঃসংবাদ দিলে; বল্লে, এবার দেশময় কি হয়েছে, লোম ছাঁটা হতেই সব ভেড়া রোগে পড়ছে—এবং তাতে মরচে অনেক। মাষ্টার সিল্‌ভ্যাঁ তাই শুনে খুব সাবধান হল, কিন্তু যথাসাধ্য করেও কিছু হলনা,—বিস্তর ভেড়াকে রোগে ধরলে। একজন ডাক্তার বল্লে যদি নদীতে স্নান করানো হয় তাহলে অনেক ভেড়া বাঁচতে পারে। সিল্‌ভ্যাঁ এক-কোমর জলে নেমে একটি-একটি-করে ভেড়া নিয়ে ডুব দেওয়াতে লাগল। গরমে তার মুখ রাঙা হয়ে উঠল; কপাল থেকে ঘাম ঝরে বড়-বড় ফোঁটায় নদীতে পড়তে লাগল। সেই রাত্রে শুতে যাবার সময় তার একটু জ্বর হল—এবং পরের দিন ফুস্‌ফুসের প্রদাহে তার মৃত্যু হল। পলিন যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে তার কপালে এত-বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেচে। ইউজেন চোখে একটা আতঙ্কের অন্ধকার নিয়ে গোয়ালঘর এবং বাড়িময় কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

(১৮)

চাষা মারা যাবার ঠিক পরেই জমীদার আমাদের খোঁজ নিতে হাজির হল। শুকনো কাঠির মতন লোকটি—একদণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না। যদি-ক একটু স্থির হয়ে দাঁড়ায় ত সেটুকু সময় পা নাচাতে থাকে। দাড়িগোঁফ তার পরিষ্কা করে কামানো। নাম তার তিরাঁদ। সে একেবারে শোবার ঘরে এসে উপস্থিত হল;— আমি সেখানে পলিনের কাছে বসেছিলুম কাঁধ দুটো উঁচু করে তুলে সমস্ত ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার পর খোকা দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল—"ওটাকে এখান থেকে নিয়ে যাও; গিন্নীর সঙ্গে আমার কথা আছে।" আমি উঠে উঠোনে চলে গেলুম—এবং থেকে-থেকে এক একবার জানলার কাছ-দিয়ে ঘুরে যেতে লাগলুম। দেখলুম, পলিন তার চৌকি ছেড়ে ওঠেনি হাত-দুটো তার হাঁটুর উপরে পড়ে আছে মাথাটা সাম্‌নের দিকে সে খুব ঝুঁকি দিয়েছে—যেন কি-একটা শক্ত জিনি বোঝবার চেষ্টা করচে। তিরাঁদ তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই কথা বলে যাচ্ছিল। এ ঘরের একধার থেকে আর-একধার পর্য্যন্ত অনবরত পায়চারি করছিল—টালির মে থেকে তার পায়ের খট্‌খট্ শব্দ উঠে তার ভা গলার আওয়াজের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। যে ঝড়ের মতন ঘরে প্রবেশ করেছিল তেম বেগে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আ তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করে পলিন জিজ্ঞাসা করলুম—"ও কি বলে গেল?" আমার হাত থেকে খোকাকে কোলে তু নিলে এবং কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, তির বলে গেল আমাদের কাছ থেকে গোলাবাড়ি

কেড়ে নিয়ে তার ছেলেকে দেবে;—তার ছেলে সম্প্রতি বিয়ে করেছে।

সেই সপ্তাহের শেষে তিরাঁদ তার ছেলে, বৌ নিয়ে ফের এল। প্রথমে তারা গোর-বাড়িগুলো সব দেখলে, তারপরে ভিতরে প্রবেশ করবার সময় আমার সাম্‌নে এক-মিনিট দাঁড়িয়ে বল্লে যে তার বৌমা আমাকে দাসী রাখবে ঠিক করেচে। পলিন এ-কথা শুনতে পেয়ে আমার দিকে এক-পা এগিয়ে এল। কিন্তু ঠিক সেই সময় ইউজেন হাতে করে একগাদা কাগজপত্র এনে ফেল্‌তে সবাই টেবিলের চারদিকে বসে পড়ল। সবাই যখন সেই সব কাগজ পড়তে ব্যস্ত আমি তিরাঁদের বৌমাকে একবার দেখে নিলুম। শ্যামলা রঙের প্রকাণ্ড মেয়ে মানুষ, বড় বড় চোখ—সর্ব্বদাই একটা বিরক্তির ভাব মাখানো। স্বামীর সঙ্গে সে গোলাবাড়ি থেকে চলে গেল—আমার দিকে একবার ফিরেও চাইলে না। যখন তাদের গাড়িখানা গাছের মধ্যে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, পলিন ইউজেনকে ডেকে তিরাঁদ আমায় যা বলেছে তাই শুনিয়ে দিলে। ইউজেনের চেহারা দেখে বোধ হল সে ভারি রেগে উঠেছে; কথার স্বর তার সম্পূর্ণ বদলে গেল। সে বলতে লাগল, আমি যেন ঐ লোকগুলোর একটা আসবাবের মধ্যে গণ্য—যেমন ওদের খুসি তেমনি আমার বিলি হবে! পলিন আমার জন্যে সমবেদনা প্রকাশ করতে লাগল; ইউজেন সেই সময় বল্লে যে ঐ তিরাঁদের কথাতেই সিল্‌ভ্যাঁ আমাকে এখানকার কাজে ভর্ত্তি করে নেয়। সে-সময় আমায় রুগ্ন দেখে আমার জন্যে সিল্‌ভ্যাঁর যে ভাবনার অন্ত ছিল না, সে-কথা সে পলিনের মনে পড়িয়ে দিতে লাগল; তার পর, তারা যেখানে চলে যাচ্ছে সেখানে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারচে না বলে একটা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। আমরা তিনজনেই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলুম। পলিনের দুঃখকাতর দৃষ্টির একটা স্পর্শ আমার মাথার উপরে আমি অনুভব করছিলুম; ইউজেনের কণ্ঠস্বর গম্ভীর একটি স্তোত্র-গাওয়ার মতন আমার কানে এসে লাগছিল। গ্রীষ্মের শেষেই পলিন চলে যাবে ঠিক হল।

বাড়িতে যত সব ছেঁড়াখোড়া কাপড়-চোপড় ছিল আমি তাই নিয়ে পড়লুম,—রোজ সমস্ত দিন বসে সেই সব সেলাই করতে লাগলুম—একটিও ছেঁড়া কাপড় যেন পলিনকে না নিয়ে যেতে হয়। বন্ জিস্তিনের কাছ থেকে যেমন শিখেছিলুম রিপুকর্ম্মের ছুঁচ নিয়ে প্রাণপণে তেমনি সেলাই করতে লাগলুম। এবং প্রত্যেক কাপড়ের টুকরো যতদূর পারি পরিস্কার করে-পাট করে রাখতে লাগলুম।

সন্ধ্যাবেলা দেখলুম ইউজেন দরজার পাশে সেই বেঞ্চিটিতে গিয়ে বসেছে। খোঁয়াড়ের ছাদের উপর তখন জ্যোৎস্না যেন ঢেলে দিয়েছে। গোবরগাদার ঠিক উপরে একটুকরা সাদা মেঘ ভাসছিল—দেখাচ্ছিল ঠিক যেন একটি জরীর ঢাকা! চারিদিক নিস্তব্ধ—কোথা থেকেও কোনো শব্দ আসছিল না; পলিন তার খোকাকে দোল্‌নায় শুইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিল, তার থেকে কেবল একটা কিঁচ্ কিঁচ্ শব্দ উঠছিল।

শস্ত যখন সব ঘরে তোলা হল, ইউজেন যাত্রার আয়োজন করতে আরম্ভ করলে। রাখালটা গোরুর পাল নিয়ে চলে গেল, বুড়ি বিবিশ্ পাখী-পাখালিগুলোকে তাদের আস্তানা থেকে বার করে গোরুর গাড়ি বোঝাই দিয়ে নিয়ে গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই বাড়ি একেবারে শূন্য; রইল কেবল দুটি সাদা ষাঁড়। ইউজেন নিজে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে—আর-কারুর কাছে দিয়ে তার বিশ্বাস নেই। পলিন ও খোকা যে গাড়িতে যাবে তারই পিছনে সে দুটোকে বেঁধে দেওয়া হল। খোকা একটা খড়-ভরা চুব্ড়ির মধ্যে অগাধে নিদ্রা যাচ্ছিল, ইউজেন তাকে না জাগিয়ে আস্তে আস্তে গাড়িতে তুলে দিলে। পলিন তার গায়ে একখানা শাল চাপা দিয়ে, বাড়ির দিকে একবার ক্রসের চিহ্ন করলে, তার পর ঘোড়ার লাগামটা হাতে তুলে নিলে। গাড়ি চেস্নাট-গাছের তলা দিয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগল।

আমি সঙ্গ নিলুম—বড়-রাস্তা পর্য্যন্ত যাবার জন্যে। ষাঁড় দুটোর পিছনে, ইউজেন ও মার্ত্তিনের মাঝখানে থেকে আমি চলতে লাগলুম। থেকে-থেকে ষাঁড় দুটোর পিঠে ইউজেন একএকবার আদরের থাব দিচ্ছিল। অনেকটা রাস্তা যখন এগি গেছি, পলিন দেখলে সন্ধ্যা হয়ে আসছে সে ঘোড়া থামিয়ে নিলে। আমি গাড়ি পাদানে উঠে তাকে একটি চুমু দিয়ে বিদা নিলুম। সে করুণ স্বরে বল্লে—"ভগবা তোমার ভালো করুন—তুমি লক্ষ্মীটি হ থেকো, বুঝলে।" তার পর তার গলার স্ব কান্নায় বন্ধ হয়ে এল। সে বলতে লাগল— "আজ যদি আমার স্বামী বেঁচে থাকতেন তাহ কখনো এমন করে তোমায় ত্যাগ করতে না।" মার্ত্তিন হাসি-মাখা মুখে আমাকে চুমু দিলে; বল্লে—"আবার আমাদের দে হবে।" ইউজেন তার মাথার টুপি তু খানিকক্ষণ আমার হাত ধরে রইল, ধীরে ধীরে বল্লে—"বিদায় বন্ধু বিদায়!—তোমা কখনো ভুলত পারব না!"

আমি কিছু দূর ফিরে গিয়ে আবা তাদের দেখবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালুম তখন অনেকটা অন্ধকার হয়ে এসেছে— কিন্তু বেশ দেখা যাচ্ছিল ইউজেন ও মার্ত্তি হাত-ধরাধরি করে চলেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

আর্টের উপকারিতা

রোঁদা ও তাঁহার দুইজন শিষ্যের সঙ্গে পল এক হোটেলে গিয়া ঢুকিলেন। শিষ্য দুইজনের নাম Bourdelle ও Despiau। শিল্পজগতে এঁরা আপনাদের নাম রে জাহির করিয়া তুলিয়াছেন।

Bourdelle-এর দিকে একথালা খাবার

পাইয়া দিয়া, তাঁহাকে চটাইবার মতলবে Despiau বলিলেন, "খাও হে, খাও! তোমাকে খাইতে দেওয়া উচিত নয়; কেননা, তুমি হচ্ছ আর্টিষ্ট—কারুর কোন কাজে আস না!"

Bourdelle উত্তর দিলেন, "নিজের বেলাতেও তুমি যখন খাবারের ভাগ কিছু নাও নাই, তখন আমি তোমার এই ত্রুটা মার্জ্জনা করিলাম।" বেশ খুসী হইয়া তিনি কথাগুলি আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের একটা ক্ষণিক ভাবে ক্রমেই তাঁহার মুখ গাঢ় হইয়া আসিল। সে ভাব গোপন করিয়াই তিনি বলিলেন, "কিন্তু আমি তোমার কথার প্রতিবাদ করিব না। সত্য কথা, আমরা—শিল্পীরা একেবারে অপদার্থ। আমার বাবার দিন-গুজরাণ হইত পাথর কাটিয়া। তাঁহাকে স্মরণ করিলেই কিন্তু মনে হয় সমাজে তাঁহার মত কারিকরেরও দরকার আছে; কারণ, তিনি তবু ঘর-বাড়ী মেরামতীর মালমসলা যোগাইতেন; কিন্তু আমি— আমরা সমাজের কোন্ কাজে লাগিতে পারি? আমরা হচ্ছি বাজীকর, প্রতারক, মিথ্যাদর্শী,—হাটে দাঁড়াইয়া আমরা পাঁচজনকে একটু হাসাইতেছি, একটু মজা দেখাইতেছি —এইমাত্র! আমাদের চেষ্টা কাহারও চিত্ত স্পর্শ করে না—খুব কম লোকেই তা বুঝিবার শক্তি রাখে। বলিতে পারি না, সার্থই আমরা সকলের দয়াপাত্র হইবার উপযুক্ত কিনা! কেননা, আমরা থাকি আর না থাকি, তবে পৃথিবী আপনপথে যেমন চলিতেছে ঠিক তেমনিই চলিবে—তাহার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না।"

* *
*

রোঁদা স্তব্ধভাবে বসিয়াছিলেন। এতক্ষণে তিনি কথা কহিলেন। বলিলেন, "Bourdelle যা বলিলেন, সে যে তাঁর যথার্থ প্রাণের কথা, আমি তা মনে করি না। আমার নিজের মত, এ মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমার বিশ্বাস, মনুষ্য-সমাজের মধ্যে কলাবিদই সকলের চেয়ে উপকারী।"

Bourdelle হাসিয়া কহিলেন, "স্বকর্ম্ম-প্রীতিতে আপনি অন্ধ হইয়া উঠিয়াছেন।"

—"একেবারেই নয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াই আমি আমার মতগঠন করিয়াছি। আচ্ছা, তবে শোন।

সবপ্রথমে একটি কথা আছে। তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, আধুনিক সমাজে একমাত্র কলাবিদেরাই কাজ করিয়া আমোদ পান?"

Bourdelle উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়! কার্য্যই আমাদের আনন্দ……আমাদের জীবন…… কিন্তু তাতে এ বুঝায় না ত যে……"

—"চুপ, আগে শোন। আমি দেখিয়াছি, একালে অন্য-অন্য কাজের কাজীরা আপনাদের কাজে আর আমোদ পান না। তাঁরা কাজ করেন, দায়ে ঠেকিয়া। কাজ যেন তাঁদের বোঝা, সে বোঝা কোনমতে ঘাড় থেকে নামাইতে পারিলেই তাঁরা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বর্ত্তাইয়া যান। একালের রাজনীতিজ্ঞেরা তাঁহাদের সেকালের সমকর্ম্মীদের মত দেশের কাজ করিয়া আর আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন না—তাঁহাদের অভিপ্রায় সুধু স্বার্থসিদ্ধি।—

সমাজের আগা-গোড়া এখন এই দোষে দুষ্ট। ব্যবসায়ীরা সততা ভুলিয়াছেন,—তাঁরা নকলকে আসল বলিয়া চালাইয়া দু-পয়সা বেশী রোজগার করিতে চান। কারিকরেরা, মনিবের প্রতি অসন্তুষ্ট, তারা খালি ফাঁকি দিবার ফিকিরে থাকে। যেদিকেই তাকাই, সেইদিকেই দেখি, কাজ যেন-একটা বিষম বালাই, একটা ঘৃণিত দাসত্ব হইয়া উঠিয়াছে—কাজ যেন আর জীবনের হেতু, সুখ-সোয়াস্তির মূল নহে। কিন্তু সেকালের ধারা ছিল স্বতন্ত্র।

কার্য্যকে কেবল জীবিকারূপে না দেখিয়া, কার্য্যকে আমরা যদি কার্য্যরূপেই গ্রহণ করিতে পারি, তাহাহইলে সমাজের কতটা মঙ্গল!—কিন্তু, এরূপ বিচিত্র পরিবর্ত্তন যদি সম্ভব হয়, তবে মনুষ্যমাত্রকেই শিল্পীর পদচিহ্ন ধরিয়া চলিতে হইবে—কিংবা, শিল্পী হইতে হইবে। কেননা, আমার মতে, 'আর্টিষ্ট' কথাটির প্রশস্ত অর্থ হচ্ছে এই :—

কাজে যিনি সুখী। সুতরাং, সকল ব্যবসায়ের ব্যবসায়ীকেই আর্টিষ্ট হইতে হইবে। তাহাহইলে যে নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা দেখিব, তাহা যেমন নিখুঁত, তেমনি সুন্দর।

দেখ, আর্টিষ্টের আদর্শ কি মহান, সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে পৃথিবীর কি উপকার!"

* * *

পল বলিলেন, "আচার্য্য, আপনার যে মতপ্রতিষ্ঠা করিবার চমৎকার শক্তি আছে, আমরা তা স্বীকার করি; কিন্তু আর্টিষ্টের উপকারিতা দেখাইয়া কিছু লাভ আছে কি? অবশ্য, কলাবিদের কর্ম্মানুরক্তি এক মহৎ আদর্শ স্থাপন করিতে পারে। তবু তাঁহাদের কাজ মূলত অকেজো নয় কি? আর অকেজো বলিয়াই ত শিল্পকর্ম্মের মূল্য বেশী।"

—"তোমার কথার মানে কি?"

—"আমি বলিতেছি, আর্ট যে আমাদের নিত্যকার দরকারে লাগে না—অর্থাৎ, যে-সবের জন্য আমরা অশন-বসন-ভবন পাই, যে-সবের জন্য আমরা দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করি, আর্ট যে সে-সবের মধ্যে গণ্য নয়—এ অতি সুখের কথা। আর্ট আমাদিগকে কর্ম্মজীবনের কঠোর দাসত্ব হইতে মুক্ত করে এবং আমাদের সম্মুখে এই মায়াসম্ভব ধ্যান ও স্বপ্নরাজ্যের সিংহদ্বার খুলিয়া দেয়।"

—"আদত কথা কি-জান বন্ধু? যি যে দরকারী আর কি যে নয়, তা নি প্রায়ই আমরা ভুল করি। সত্য বটে যাহা-কিছু আমাদের দৈনিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে সাহায্য করে, তাহাই আম দরকারী বলি। কিন্তু, তা-ছাড়া হীরা-জহরত বিশেষ-কোন কাজে না লাগিলেও আমাদে কাছে প্রয়োজনীয়—অধিকন্তু, এগুলি অকেজো নহে—কদর্য্যও বটে।

কি-জান, আমার মতে যাহা-কি **সুখকর, তাহাই কার্য্যকরী।** আ তাই যদি হয়, তবে ধ্যান ও স্বপ্নের ছ আমাদিগকে যতটা খুসী করিতে পা দুনিয়ার আর-কিছুই ততটা পারে কি? তা পারে না। এখন আমরা এই সত্য ভুলিতে বসিয়াছি।

প্রতিদৃষ্টিপাতে চতুর্দ্দিকে যে অপূর্ব্ব বিতা আত্মপ্রকাশ করিতেছে, যিনি তাহা র্ণ ভাবে উপভোগ করিতে পারেন; র্দ্দিকে সবল-শোভন যৌবনের যে শক্তি-নৈর্য্যের বিকাশ হয়, তাহা দেখিয়া যাঁহার য় পুলকোচ্ছ্বাসে ভরিয়া যায়; জীবন্তযন্ত্রবৎ সব আশ্চর্য্য জীবজন্তুর নমনশীল দেহের ভঙ্গি, তাহাদের মাংসপেশীর মোহনলীলা নি দেখিতে পারেন, দেখিতে জানেন; ল-শিখরে, গিরি-উপত্যকায়—শ্যামল বসন্ত খানে সুগন্ধের তরঙ্গে, মধুপের গুঞ্জরণে, ঙ্গের প্রেম-সঙ্গীতে পুষ্পোৎসবে মত্ত য়া উঠিয়াছে, সেখানে যিনি আনন্দকে ঠিনান দেখেন; নদ-নদীর বুকে রূপালী ঢ়েরীমালা ছুটাছুটি-খেলা খেলিতে-খেলিতে ন কৌতুক-হাস্যে মুখর হইয়া পড়ে, তখন হার অন্তর নন্দিত হইয়া উঠে—এ থিবীতে তিনি নরদেবতা। এ মরজগতে ার চেয়ে কে বেশী ভাগ্যবান?

আর্ট, আমাদিগকে এই সুখের শিক্ষা য়। অতএব, আর্ট যে অপরিহার্য্য, আর্ট উপকারী, এ-কথা কে অস্বীকার করিবে? যে সুধু মানস-আনন্দ, তা নয়;—ততোধিক ারো-কিছু।

আর্ট আমাদিগকে জীবনের অর্থ বুঝাইয়া য়, অদৃষ্টসম্বন্ধে আমাদিগকে জ্ঞানদান রে, এবং ধ্রুবপন্থা নির্দ্দেশ করে।

কলাবিদেরা, চিত্রে-ভাস্কর্য্যে আমাদের াতীয় আত্মার প্রতিধ্বনি জাগ্রৎ করেন। াঁহাদের কেহ দেখান নিয়ম, কেহ দেখান ক্তি, কেহ দেখান সৌন্দর্য্য, কেহ দেখান কৌতুক-সরসতা, কেহ দেখান বীরত্ব-গরিমা; —উপরন্তু, সকলেই দেখান জীবন ও স্বাধীন গতির মহান আনন্দ।

স্বদেশবাসীর প্রাণে-প্রাণে কলাবিদেরা জাতীয় বিশেষত্বজ্ঞাপক গুণগুলিকে সজীব করিয়া রাখেন।

আমাদের কালে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী, সেই Puvis de Chavannesকে স্মরণ কর। যাহার জন্য আমরা সকলে আকুল হইয়া আছি, তিনি কি সেই চিরকাম্য শান্তির প্রসাদে আমাদের তপ্ত চিত্তকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলেন নাই? তাঁহার অঙ্কিত নিসর্গ-পটগুলিতে,—যেখানে প্রকৃতি-মাতা, প্রেমিক, সরল, মহান মানবতাকে যেন বুকের উপর টানিয়া লইয়াছেন—আমরা কি বিচিত্র শিক্ষা লাভ করি না? এই অতুলনীয় প্রতিভা সমস্ত রসের বিকাশসাধন করিয়াছে—মহৎ ভাবের প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মত্যাগ, দুর্ব্বলে দয়া, কর্ম্মে অনুরাগ, এ-সমস্তই তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের যুগ এই প্রতিভার অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল। Chavannes-এর অঙ্কিত "ভিক্টর হুগোর সম্মান" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট চিত্রগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আপনাকে যেন মহৎ কার্য্যসাধনে উপযোগী বলিয়া মনে হয়।

ললিতকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি খুব অল্প লোকেই উপভোগ করিতে পারে। সেগুলিকে মুক্তজনতার মধ্যে আনিয়া রাখিলেও দু-চারজনের বেশী সমঝদার মিলিবে না। কিন্তু, তাহাতে যে-সকল সৎ ভাব মূর্ত্তিমন্ত হয় পরিণামে তাহারা আবাল-বৃদ্ধবনিতার চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া তুলে। প্রতিভাবানদের পরে নিম্নশ্রেণীর অনেক

শক্তিমান লোক থাকেন, ওস্তাদদের ভাব ও কল্পনাকে তাঁহারা সরল ও জনপ্রিয় করিয়া আনেন। লেখকের উপরে শিল্পীর প্রভাব পড়ে, শিল্পীর উপরে লেখকের প্রভাব পড়ে; প্রত্যেক যুগের সকল মানুষের মধ্যে চিন্তার আদান-প্রদান চলে—সাময়িক-পত্রলেখক, জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ও শিল্পী প্রভৃতি সকলেই, সমকালের মহাপ্রতিভাবানদের দ্বারা আবিষ্কৃত সত্যের বীজ জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দেন। এ-যেন এক আধ্যাত্মিক স্রোতের বিপুল ধারা—প্রপাতের সহস্রধারার মত প্রথমে নানামুখে বহিয়া, পরিণামে তাহা এক হইয়া যে বিশাল নদের সৃষ্টি করে—তাহাতে এক-এক যুগের সমগ্র মানসচ্ছবির অখণ্ড প্রতিচ্ছায়া পড়ে।

কেহ-কেহ বলেন, শিল্পীরা তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক ভাব ও কল্পনাকেই আকারদান করেন। ইহা ভ্রম। তাঁহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্ত্তী যবনিকা ভেদ করে। তাঁহারা স্রষ্টা ও পথপ্রদর্শক। Chardin ও Grewze রাজতন্ত্রের মধ্যে জীবন কাটাইয়াও ভবিষ্য প্রজাতন্ত্রের আভাস দিয়াছিলেন। Courbet ও Millet, Second Empireএর সময়ে জনসাধারণের যে দুঃখদারিদ্র্য ও মহত্ব দেখাইয়াছিলেন, তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের সময়ে সর্ব্বত্র তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। Poussin ও Watteau প্রভৃতি চিত্রকরের কার্য্যেও ভবিষ্যতের এমনি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

আমি এ-কথা বলিতে চাই না যে, ঐ-সকল শিল্পী এ-সব স্রোতঃধারা নিয়মিত ও সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু আমার বক্তব্য, যে-জন্য তাহা আকার পাইয়াছিল, তাঁহারা অজ্ঞাতভাবে সে-পক্ষে সাহায্য করিয়াছিলেন। লেখক, দার্শনিক ও ঔপন্যাসিকের সঙ্গে শিল্পীরা এখানে যোগ দিয়াছেন,—ইঁহাদের একীকৃত চেষ্টার ফলেই ভবিষ্যতের যুগধর্ম্ম বিকসিত হইয়াছিল।

শিল্পীরা যে নূতন ভাব ও নূতন মতি-গতি সৃষ্টি করেন, তাহার আরও প্রমাণ আছে। তাঁহারা প্রায়ই জনসাধারণের সহিত সহজে পরিচিত হইবার সুযোগ পান না। এজন্য তাঁহাদের অনেককেই জীবনভোর চেষ্টা করিতে হইয়াছে। যাঁহার যত-বেশী প্রতিভা তিনি তত-বেশী দিন দুর্ব্বোধ হইয়া থাকিয়াছেন। Corot, Courbet, Millet, Puvis de Chavannes প্রভৃতি প্রতিভাধর কলাবিদ যখন যশের মুকুট পাইয়াছিলেন —তখন তাঁহাদের জীবনের সন্ধ্যাকাল।

বন্ধুগণ, কলাবিদের উপকারিতা-সম্বন্ধে ইহাই আমার বক্তব্য।"

* *
*

রোঁদার চমৎকার যুক্তি শুনিয়া সকলের সমস্ত সন্দেহভঞ্জন হইল।

খানিকক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না, একাগ্রভাবে রোঁদার কথাগুলি মনে-মনে নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন।

ওস্তাদ-শিল্পীদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা বলিবার সময়ে বিনয়ী রোঁদা আপন শক্তি সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই; সে অসম্পূর্ণতাটুকু পূরাইয়া লইবার জন্য পল বলিলেন, "আচার্য্য বিদ্যমান যুগের উপরে আপনার প্রতি

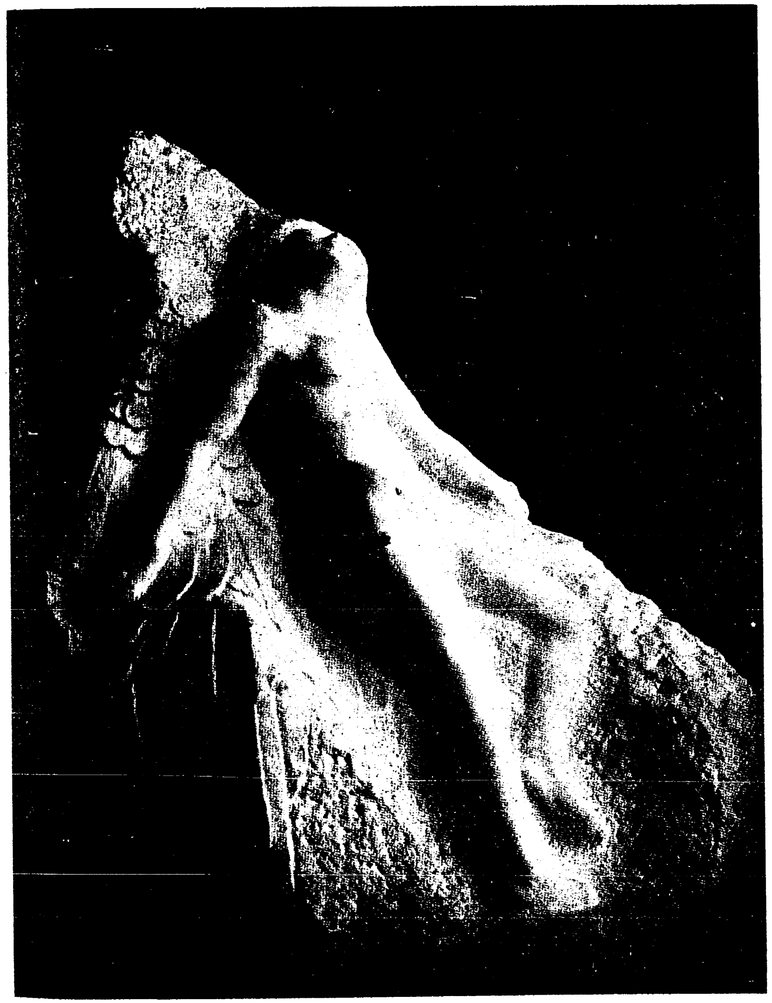

চ্যুত কমল

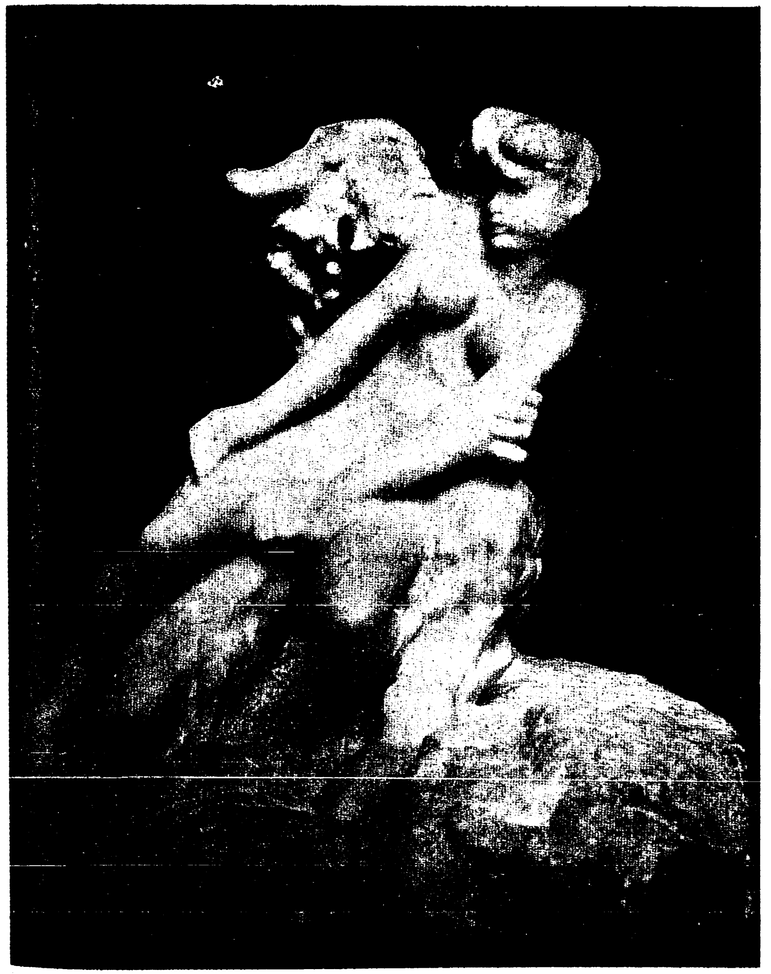

ভুজবন্দিনী বিদ্যাধরী

হুগোর প্রতি সম্মান (শাতান-অঙ্কিত)



তরুণী জননী

যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ভবিষ্যতেও নিশ্চয় তাহার কাজ চলিতে থাকিবে।

অন্তঃপ্রকৃতির সত্যকে এমন গভীরভাবে উপলব্ধি ও প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আধুনিক জীবনের ক্রমবিকাশলাভের পক্ষে আপনি যথেষ্ট সাহায্য করিবেন। আমরা প্রত্যেকেই আপনাদের মানস-ভাব, স্নেহমমতা, কল্পনা-জল্পনা ও আবেগ-উত্তেজনার মূল্য যে কতটা বেশী-করিয়া জানি, আপনি তাহা দেখাইয়াছেন। প্রেমের মাদকতা, বিচিত্র কল্পনা, উদ্‌ভ্রান্ত বাসনা, ধ্যানের ঐকান্তিকতা, আশার চঞ্চলতা—এ-সমস্তকেই আপনি মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ব্যক্তিগত বিবেকের গূঢ় মর্ম্মদেশটি তন্ন-তন্ন ভাবে পরখ করিয়া, তাহার বিশালতর রূপটি আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন। আমরা যে-যুগের লোক, এ-যুগে আমাদের কাছে আপন ব্যক্তিত্ব এবং অনুভূতি ছাড়া বহুমূল্য আর কিছুই যে নাই, এ সত্যও আপনি আবিষ্কার করিয়াছেন। আপনি আরও দেখিয়াছেন যে, আমাদের প্রত্যেকেই —কি চিন্তাশীল, কি কর্ম্মশীল, কি জননী, কি কন্যা আর কি প্রেমিক — আপন-আপন আত্মাকেই বিশ্বের কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছেন। অথচ, আমাদের এই স্বভাবসম্বন্ধে আমরা নিজেরাই অচেতন ছিলাম; কিন্তু আপনার সূক্ষ্মদৃষ্টি আমাদের নিকটে তাহাও প্রকাশ করিয়াছে।



চিত্রকর শাভান (Chavannes)

ভিক্টর হুগো তাঁহার কাব্যে সংসারের লুকানো সুখ-দুঃখের যে-সব উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়াছেন, তাহাতে কোথাও দেখি খোকার দোলনা দোলাইয়া মা ঘুম-পাড়ানিয়া গান ধরিয়াছেন, কোথাও

দেখি পুত্রের সমাধির উপরে পিতা অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন, কোথাও দেখি প্রেমিক আপন সুখস্মৃতিতে নিমগ্ন হইয়া আছে। আপনিও পাথরের উপরে মানবাত্মার সুগভীর, সুগোপন ভাবাবেগ পরতে-পরতে অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রাচীন সমাজের উপর দিয়া ব্যক্তিত্বের যে খরস্রোত প্রবহমান, ক্রমে-ক্রমে তাহা যে পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহা-শিল্পী ও মহা-চিন্তাশীলগণ, মানবকে এই শিক্ষাই দেন যে, সে-যেন আত্মমধ্যেই আত্মসীমা নির্দ্দেশ করিতে এবং কেবল আপন বিবেকেই সম্বল করিয়া জীবন-পথে চলিতে সক্ষম হয়। যে-সকল অত্যাচার



পার্থিবতায় বন্দী

ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে কণ্টক হয়, যে সামাজিক ভেদ-জ্ঞানে সবলের কাছে দুর্ব্বল, ধনীর কাছে দরিদ্র, পুরুষের কাছে রমণী দাসত্ব-স্বীকারে বাধ্য হয়,—ভবিষ্যতে মানবজা যখন আপন চরমে গিয়া পৌঁছিবে, তখন সে অত্যাচার, সে ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

আশ্চর্য্য! অকপট শিল্পমন্ত্রে এই নব-জাগরণের বাণী ফুটাইবার জন্য আপনি সাধনা করিয়া আসিয়াছেন।"

ঈষৎ হাস্যের সহিত রোঁদা উত্তর দিলেন, "বর্ত্তমান চিন্তা-রাজ্যের ধুরন্ধরগণের সঙ্গে আমাকে এতটা উচ্চাসন দিবার কারণ হচ্ছে আমার সঙ্গে তোমার একাত্ম বন্ধুত্ব! তবে, এটা সত্য বটে যে, এ বিশ্বে মানব বা যাহা-কিছু আমার মানস-নেত্রের সম্মুখে আসে, তাহাদিগকে যথার্থ আকার দিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি।"

একটু থামিয়াই রোঁদা আবার বলিলেন, "কলাবিদের উপকারিতা বুঝাইতে গিয়া আমি যদি কিছু জেদ জাহির করিয়া থাকি, তবে তাহা অকারণ নয়, জানিও; কেননা এ-সম্বন্ধে স্থিরভাবে চিন্তা না করিলে আমাদের মনে পড়িবে না যে, এ পৃথিবীর সহানুভূতি যথার্থই আমাদের প্রাপ্য। একালে স্বার্থ-চিন্তা প্রত্যেককেই গ্রাস করিয়াছে; আমি দেখিতে

পাই, এই স্বার্থান্ধ সমাজ বুঝিতে পারিয়াছে যে, ইঞ্জিনীয়ার বা ব্যবসাদারকে উচ্চাসন দিলে যতটুকু উপকার, কলাবিদের প্রতি সম্মান দেখাইলেও তাহার ঠিক ততটুকুই উপকার!"

সমাপ্ত

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

মাসকাবারী

সাহিত্যে অশ্লীলতা

অশ্লীলতা জিনিষটা ভালো নয় এ কথা ঠিক কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের একদল লোক যেখানে-সেখানে কুরুচি দেখচেন। আসল অশ্লীলতা বলে কাকে, তা যে তাঁরা তলিয়ে দেখচেন এমন মনে হয় না। এঁরা যা অশ্লীল বলচেন তা মান্‌তে হলে বিশ্বসাহিত্যকে চণ্ডালের হাত দিয়ে পোড়ানো ছাড়া উপায় নেই। তাহলে (মোপাসা, ব্যালযাক্ ও জোলা ত দাগী—তাঁদের কথা নেই বা তুল্‌লুম) সেক্‌সপিয়ার, কালিদাস, বাইরণ, ইব্‌সেন, ষ্ট্রাইণ্ডবার্গ, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, জয়দেব, ফ্লবেয়ার, জ্যুদারমান, অস্কার ওয়াইল্ড, বার্ণার্ড স, দোদে, গটিয়ের, ম্যাক্সিম গোর্কি, গিরিশ ঘোষ ও দীনবন্ধু প্রভৃতি নানাশ্রেণীর সাহিত্য-ধুরন্ধরেরা নরকের অন্ধকারে যেতে বাধ্য; এমন-কি রামায়ণ ও মহাভারতেরও সুগতি হয় না। জগতে এমন সাহিত্য দুর্ল্লভ, কোমর বেঁধে বসলে, যা থেকে কুরুচি বার করা না যায়। কিন্তু সেগুলি যে কুরুচি বলেই মানুষ আদর করে এসেছে তা ত নয়। সেখানে মানুষ কুরুচিকে ছাড়িয়েও এমন-কিছু পেয়েছে যাকে সে অমূল্য সম্পদ বলে মেনে নিয়েছে। মানুষের দেহে কদর্য্যতা বড় কম নেই, কিন্তু সেই কদর্য্যতাকেও অতিক্রম করে এমন একটা সৌন্দর্য্য আছে যার জন্যে মানুষকে মানুষ বরদাস্ত কর্‌তে পারে। মানুষের দেহকে খুঁটিয়ে দেখলে তার কুশ্রীর অন্ত থাকে না; কিন্তু তার সমগ্র রূপের মধ্যে একটি শ্রী-ছাঁদ আছে। এই সমগ্রতার শ্রী নিয়েই তার বিচার হয়। যেখানে সমগ্রতা থেকে কেবলই কদর্য্য রূপ ফুটে ওঠে, সেখানে অবশ্য তাকে কদর্য্য বলতেই হবে। সাহিত্যেও তাই। তুমি যদি তার সমগ্র রূপ না দেখে তার খণ্ড রূপের মধ্যে কদর্য্যতা খুঁটে বার করে বল, এ কদর্য্য, তাহলে আমাদের বলতেই হবে যে, তোমার দেখবার শক্তি নেই বলেই তুমি কেবল কদর্য্যকে দেখচ। এই সমগ্রের দিকে দৃষ্টি না থাকার দরুন অনেক সময় আমরা গোড়ায় গলদ করে বসি। অশ্লীলতা সাহিত্যে স্থান পাবে না—এ ঠিক, কিন্তু কোন্‌টা বাস্তবিক অশ্লীল আগে সেটা জানা চাই। অশ্লীলতার কয়েকটা সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে, সেই জন্যে তার একটু আদল দেখলেই আমরা আঁৎকে উঠি, অথচ সেই অশ্লীলতার যথার্থ তাৎপর্য্য কি, তা ভেবে দেখি না।

কিন্তু এই তাৎপর্য্য দিয়েই আসল

অশ্লীলতাকে ধরা যায়। নইলে জগতে কিছুই অশ্লীল নয় এ বলে খুব তর্ক করা চলে। জিনিষ তখনই সত্য অশ্লীল যখন অশ্লীলতায় তার পর্য্যবসান। যে সাহিত্য অশ্লীলতার মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েও অশ্লীলতাকে ছাড়িয়ে উঠেছে তাকে কখনই অশ্লীল বলতে পারি না। অনেকে বলবেন, সাহিত্যে অশ্লীলতার আমোল একেবারে না-দেওয়াই উচিত। কিন্তু তথাকথিত অশ্লীলতাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য যে গড়ে উঠতে পারচে না এটাও স্পষ্ট দেখচি। কারণ, যাকে অশ্লীলতা বলা হচ্ছে তা মানুষের জীবনের সঙ্গে এমন আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে যে, মানুষ আঁকতে গেলেই তার আনুষঙ্গিক কদর্য্যতা এসে পড়ে—নইলে মানুষ আঁকাই দুষ্কর। মানুষের সব দোষ বাদ দিয়ে কেবল তার গুণ নিয়ে যদি মানুষ আঁকো তবে বলতেই হবে—সে আর যাই হোক মানুষ নয়। মানুষের মধ্যে এই অশ্লীলতা আছে বলে তার সর্ব্বস্বই যে অশ্লীলতায় ভরা, তাও নয়, সেই জন্যে এই অশ্লীলতাকে বর্জ্জন করে নয়—এই অশ্লীলতাকে রেখেও সাহিত্য শ্রী-সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে, তার সমগ্র রূপের ভিতর থেকে জ্যোতির আভা ফুটে বেরিয়েছে। যাঁরা সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন তাঁদের মনের সামনে ঐ সমগ্র রূপের দিব্য জ্যোতি জাজ্জ্বল্যমান হয়ে থাকে বলে তাঁদের মন খণ্ড রূপের অশ্লীলতায় বাধে না—তাঁরা নির্ভীক হৃদয়ে সমগ্রতার স্ফূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হয়ে যান।

আর তাছাড়া মানুষের ভিতরকার এই কদর্য্যতাকে বাইরে আনবার কি কোনো দরকার নেই?

আধুনিক জার্ম্মানির শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক জ্যুদারমানের "The song of songs' নামে উপন্যাসখানির প্রকাশ বন্ধ করবার জন্যে বিলাতে যখন আন্দোলন উঠেছিল, বার্নার্ড স তখন বলেছিলেন—

"It (জ্যুদারমানের নভেল) is full of vivid character-sketches which not only amuse us as we read but give us a whole social atmosphere to reflect on. If the reflections are bitter and even terrifying, serve us right; it is not Suderm mann's business to keep us in a fool's paradise. The suppression of this book would not only be a deliberate protection of vice—which is always best served by turning off the light—but the reduction of every English adult to the condition of a child under tutelage. But even if the book were as false and mischievous as any of the romances which make the same theme agreeable and seductive I should object to its suppression all the same. No harm that the worst book could possibly do even if people could be forced to read it against their will could be as great as the intellectual suffocation of the whole nation which a censorship effects."

* * *

সমালোচনা ও সপেনহয়র

আজকাল দেখা যাচ্ছে বাঙ্গলাসাহিত্যে যে-সে যা-খুসী-তাই সমালোচনা লিখতে বসেছেন। আমাদের সাহিত্যে যাঁরা বিরাট শক্তিশালী তাঁদের প্রতিভাকেও যা-তা বলে খর্ব্ব করতে এইসকল সমালোচকের হাত এতটুকু কাঁপে না। ঐরকম প্রতিভার সামনে মাথা যেখানে আপনি নীচু হয়ে আসে, সেখানে দেখি মূর্খতায় অসমসাহসিক সমালোচক বুক-ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের দেখে এই কথা মনে হয় যে যেখানকার মাটি নাড়াতে 'এঞ্জেল'রা ইতস্তত করেন সেখানে 'ফুল্'এর দল হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। এ ব্যাপার যে সুধু আমাদের দেশেই ঘটেছে তা নয়—সব-দেশেই এমনতর লোক আছে। কিন্তু সে-সব দেশে এতদিনের সাহিত্য-সমালোচনায়, সমালোচনার একটা standard দাঁড়িয়ে গেছে—যার নীচে তা আর নামে না। কিন্তু আমাদের এখানে প্রায়ই কোন standardকেই মানা হয় না। সমালোচনার যা গোড়ার কথা তা যে অনেকের জানা নেই, তা তাঁদের লেখা থেকেই বুঝতে দেরী লাগে না। সকলকে বিচার করবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে—সে অধিকার কেউ কেড়ে নিতে চায় না; কিন্তু এই বিচারের সময় কতকগুলো জিনিষকে মান্‌তে হয় যা না-মানলে বিচার করাই হয় না। সেই জন্যে বিচারের একটা রীতি দাঁড়িয়ে গেছে।

সে রীতিকে ছেঁটে দিলে তোমার বিচার মান্‌তে কেউ বাধ্য নয়। তুমি যদি বিচার করতে চাও তোমার বিচার-রীতি জানা দরকার। নয়ত যা-খুসী বলে কেবল গাল পাড়লে এবং চীৎকার করলে তোমার বুদ্ধির বিকারের পরিচয় পাওয়া যাবে—বিচারের নয়। এইরূপ যা-তা সমালোচনার অস্ত্র নিয়ে তুমি যদি সাহিত্যকে কেবল আঘাত দিতে চাও, দাও, কিন্তু শত্রুকেও অস্ত্রাঘাত করবার সময় সভ্য-সমাজে যে অস্ত্রব্যবহারের আদব-কায়দা প্রচলিত আছে, সভ্যতার অভিমান বজায় রাখতে হলে তোমাকেও তা মানতে হবে।

সমালোচনা-সম্বন্ধে অনেক মহাপুরুষের অনেক কথা আছে। হয়ত আমাদের সাহিত্যে কিছু কাজে লাগতে পারে এই মনে করে সপেনহয়রের উক্তি কিছু তুলে দিলুম:—

"সমালোচক যখন-কোন প্রতিভার রস-উপভোগ করবেন, তখন প্রতিভাবানের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কোন কার্য্য অথবা কতকগুলি ভ্রমপ্রমাদ দেখে তাঁহাকে যেন নিন্দাসন দিতে অগ্রসর না হন। সমালোচক, প্রতিভাবানের কেবল সেই গুণ-গুলি দেখবেন, যেগুলিতে তিনি অত্যন্ত উৎকর্ষলাভ করেছেন। কেননা, অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মত বিচার-বুদ্ধির মানস-ক্ষেত্রেও, মানুষের স্বভাবের সঙ্গে দুর্ব্বলতা ও একগুঁয়েমি জড়ানো থাকে; এমন-কি মহা-প্রতিভাধরের একান্ত উদার চিত্তও সম্পূর্ণরূপে এবং সকল সময়ে ঐ দোষ হতে মুক্ত থাকতে পারে না। কাজেই, যার তুলনা মেলে না, এমন প্রতিভার ভিতরেও বিষম বিষম গলদ দেখা যায়।

প্রতিভাবানের হৃদয় যখন প্রশান্ত থাকে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে তিনি চিন্তালোকের উত্তুঙ্গ-স্থানে আরোহণ করতে পারেন; যাহারা সাধারণ শক্তির অধিকারী,—ঐ বিপুল উচ্চতা তাহাদের পক্ষে বামনের কাছে চাঁদের মতন। এই যে উচ্চতা, এতেই প্রতিভার পরিচয় এবং এই উচ্চতার পরিমাণই হচ্ছে প্রতিভার মাপকাঠি।

সমশ্রেণীর দুইজন প্রতিভাশালীকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করাও অত্যন্ত বিপদ-জনক;—যেমন কবির সঙ্গে কবির, গায়কের সঙ্গে গায়কের, দার্শনিকের সঙ্গে দার্শনিকের এবং শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর। কেননা, এ-রকম তুলনা-মূলক বিচারে অবিচারের আশঙ্কাই পদে-পদে। * * * *

প্রতিযুগেই, আদিকালের ভাল লেখা-গুলিকে খুবই সম্মানের চোখে দেখা হয়—অথচ সমসাময়িক প্রতিভাবানেরা একেবারেই আমোল পান না—লোকে তাঁদের ভুল বোঝে; তাই তাঁদের প্রাপ্য যে আদর,—তা দেওয়া হয় রোখো লিখিয়েদের রদ্দী লেখাকে। সাধারণে যে সমসাময়িক যুগে আসলকে চিন্‌তে পারে না, এ-থেকে এই প্রমাণিত হয় যে, বহুপ্রশংসিত, গতযুগের প্রতিভাবানদেরও যথার্থ গুণ তারা উপলব্ধি করতে অক্ষম; কেননা, ভাল লোকে ভাল বলেছেন বলেই তারা অতীতকালের প্রতিভাধরদের প্রতি সম্মান দেখায়।

অন্ধ যেমন সূর্য্যালোক দেখতে পায় না, কালা যেমন গান শুনতে পায় না, আর্ট ও বিজ্ঞান বুঝে-উঠাও তেমনি যে-সে মনের সাধ্য নয়। সাধারণ মনের সামনে শ্রেষ্ঠশিল্প হচ্ছে তালাবন্ধ দেরাজের গুপ্তরহস্যের মত। ঘরের অন্ধকার-কোণ থেকে টেনে এ যখন কোন চিত্রপট প্রমুক্ত আলোকে ধ যায়, তখন তার শ্রী কতটা আলাদা হ পড়ে! তেমনি, যার যতটা রসগ্রাহিতা শক্তি, তার মন-পটে ঠিক সেই অনুপাতে শ্রেষ্ঠশিল্প আপনার ছাপ্ দেগে দিতে পারে।"

* *
*

অস্কার ওয়াইল্ডের বচন

আমাদের শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে অস্কার ওয়াইল্ডের রচনার পরিচয় নিশ্চয় আছে। কিন্তু তাঁর সব সংবাদ সবাই হয়ত না জানতে পারেন—বিশেষত তাঁর যে বচনগুলি এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে তার বিশেষ মূল্য আছে বলে আমাদের মনে হয়। সেইজন্য তাঁর সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা গেল। তাঁর উক্তিগুলি আমাদের চিন্তারাজ্যের কিছু খোরাক জোগাবার দাবী রাখে; কারণ সে গুলি অনেক সাধারণ-প্রচলিত মতের উপর ঘা মেরেছে, এবং অনেক আবছায়ায় ঢাকা জিনিষের উপর আলোও ফেলেছে।

অস্কার ওয়াইল্ড, কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও সন্দর্ভ-লেখক। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিলাতে তাঁহার জন্ম। J. M. Whistler, "Art for art's sake" নামে যে মন্ত্ররচনা করেন, অস্কার ওয়াইল্ড সেই মন্ত্রে দীক্ষিত।

ওয়াইল্ডের ব্যক্তিগত জীবন বিশুদ্ধ ছিল না বটে, কিন্তু তাঁর সাহিত্য-জীবন প্রতিভার প্রখর প্রভায় সমুজ্জ্বল। তাঁর ভাষার কাব্যের যে মোহন অনুরণন পাওয়া যায়, ইংরেজী সাহিত্যে এখনও তা দুর্লভ।

এমন দিন গেছে, অস্কার ওয়াইল্ড সাহিত্যে নিন্দিত ও সমাজে ঘৃণিত হয়ে দেশত্যাগী হয়েছিলেন। প্রবাসে, পরের কালে দোসরহারা হয়ে অকালে তিনি প্রাণত্যাগ করেছিলেন।

এখনো ষোলবছর ভর্‌তি হয়নি—অস্কার ওয়াইল্ডের দুঃখের জীবনের অবসান হয়েছে। কিন্তু এরি মধ্যে যে ইংরেজ-সমাজ ওয়াইল্ডকে মনে-প্রাণে ত্যাগ করেছিল, আজ সেই ইংরেজ-সমাজই আবার তাঁকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে! জীবন যে প্রতিভাকে চেনাতে পারে-নি, মরণ তাকে চিনিয়ে দিয়েছে।

অস্কার ওয়াইল্ডের নিখুঁত পরিচয় দেওয়া এতটুকু জায়গায় সম্ভব নয়; আমরা এখানে তাঁর গুটিকয় বচন তুলে দিলুম—তা থেকে তাঁকে কিছু-কিছু চেনা যেতে পারে:—

যে-সব বই পৃথিবীর নিজের লজ্জার কথা প্রকাশ করে দেয়, সে-সব বইকে পৃথিবী দুর্নীতিমূলক বলে ঘোষণা করে।

আর্টের উপরে জ্ঞানাভিমানী প্রাচীনেরা যে মতপ্রকাশ করে, তার মূল্য এককড়াও নয়।

সাহিত্যের যথার্থ উপভোগ স্বভাবের উপর নির্ভর করে—শিক্ষার উপর নয়।

বৃদ্ধেরা সমস্ত বিশ্বাস করে: মধ্যবয়সীরা সমস্তেই সন্দেহ করে: যুবকেরা সবজান্তা!

সুরুচির সুচিবায়ু তখনই সাংঘাতিক ও অপমানকর হয়ে ওঠে, ললিতকলা নিয়ে যখন তা অনধিকার চর্চ্চা করতে বসে।

যখন কারুকে বেসুরো গান শুনতে হয়, তখন তার উচিত,—গলগুজবে সে গানের আওয়াজ ডুবিয়ে দেওয়া!

সৎপুত্র দুর্লভ; সৎ ঔপন্যাসিক দুর্লভতর।

পৃথিবী জনপ্রিয়তার মুকুট পরিয়ে দেয়, কুশ্রী আর্টের মাথায়।

আর্ট হচ্ছে একমাত্র জিনিষ, মৃত্যু যাকে মলিন করতে অক্ষম।

একটা আইনজারি করা উচিত যে, কোন সাধারণ খবরের কাগজ আর্টের উপরে যেন কলম না চালাতে পারে।

যে ইতিহাস পড়েছে, সে জানে যে, অবাধ্যতা হচ্ছে মানুষের আসল ধর্ম্ম। অবাধ্যতার মধ্য দিয়েই যত-কিছু উন্নতি সাধিত হয়েছে;—অবাধ্যতা এবং বিদ্রোহিতার মধ্য দিয়েই!

আর্টকে ভালবাস' আর্টেরই জন্য; তাহলে তোমার যা-কিছু দরকার, সব মিলে যাবে।

ব্যক্তিত্ব জিনিষটা রহস্যময়;—সকল সময়ে কোন মানুষকে তার কার্য্যের দ্বারা বিচার করা চলে না।

গদ্যরচনার মধ্যে তানলয়মধুর সঙ্গীত ও কলানিপুণতাকেই সর্ব্বদা বড় করে দেখতে হবে—বিশুদ্ধতার মান এখানে খাট।

বাসন্তী সন্ধ্যায় কবির চেয়ে প্রাণের দোসর আর কেউ নেই,—যে কবির কণ্ঠ হচ্ছে কিন্নরের মত এবং যাঁর একেবারেই বলবার-কিছু নেই।

নীতির ভিত্তি হচ্ছে সমাজভীতি; ধর্ম্মের গোপনকথা হচ্ছে ঈশ্বরভীতি—এই দুই ভয়ের দ্বারাই আমরা শাসিত।

দশজনের মতে যে উপন্যাস কুরুচিপূর্ণ, আসলে শিল্পক্ষেত্রে তা হচ্ছে সুন্দর ও সুরুচিসঙ্গত।

শিল্পের রাজ্য ও নীতির রাজ্য—এ দুই রাজ্য সম্পূর্ণরূপে পরস্পর থেকে বিভিন্ন ও পৃথক।

সমাজ দুর্জ্জনের জন্ম দেয়; এবং শিক্ষা এক দুর্জ্জনকে অন্য দুর্জ্জনের চেয়ে চতুর করে তোলে।

পরীক্ষাক্ষেত্রে মূর্খের প্রশ্নে পণ্ডিত হন নিরুত্তর!

সংবাদপত্র, শিশুশিক্ষা ও বিশ্বকোষের পড়ুয়া ছাড়া ইংলণ্ডে সাহিত্যরসজ্ঞ জনসাধারণ নেই।

কোন কলা-কর্ম্মই মতপ্রকাশ করে না। মত জাহির করে তারা, যারা কালোয়াৎ নয়।

একালে যত খুনখারাপি হয়, তা পাপের জন্যে নয়—শূন্য-উদর তার জনক।

পুরুষ বিয়ে করে—কেননা, তারা শ্রান্ত; নারী বিয়ে করে কেননা, তারা কৌতূহলী; —দুজনেই নিরাশ হয়।

কলা-কার্য্য দর্শককেই শাসন করে। কলা, দর্শকের দ্বারা শাসিত হবার জিনিষ নয়।

বড় হওয়ার মানে, দুর্ব্বোধ হওয়া।

জীবন, বিকিকিনির জিনিষ নয়। এ হচ্ছে ধর্ম্মবিধি। এর আদর্শ, প্রেম। এর বিশুদ্ধতা, আত্মত্যাগে।

স্বাধীন সমালোচনা একটা অজানা ব্যাপার।

কুচরিত্র লোক,—আর্টের দিক থেকে দেখতে গেলে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। তারা বর্ণ, বৈচিত্র্য ও অপূর্ব্বতা প্রকাশ করে; তারা কল্পনাকে উত্তেজিত করে।

কলাবিদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, সৃষ্টি করা—ঘটনা-বিবৃতি নয়।

আমার লেখা যদি দু-চারটি রসিকের ভাল লাগে, তাতেই আমি খুসী; ভাল না লাগলেও আমার খেদ নেই। আর, গায়ে তলার পড়ুয়ার কথাই যদি ধর, তবে তাদের মাঝে জনপ্রিয় হতে আমার কোন সাধ নেই। কেননা, সেটা খুবই সোজা।

বন্ধুর দুঃখকষ্টে যে-কোন লোক সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারে; কিন্তু, বন্ধুর সাফল্যে সহানুভূতি প্রকাশ করতে হলে, খুব একটা মহৎপ্রাণের আবশ্যক।

রাগের আবেগে ভাল কাব্য লেখা যায়; —কিন্তু, মাথা-গরম হলে ভাল সমালোচনা লেখা চলে না।

কলাবিদ আপন প্রকৃতি-বহির্ভূত কোন আদর্শকে স্বীকার করেন না।

তখনি ধর্ম্মের মৃত্যু, যখনি তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। বিজ্ঞান হচ্ছে বহু বহু মৃত ধর্ম্মের ইতিহাস।

'ইংরেজী আর্ট,'—এ উক্তি নিরর্থক। আর্ট হচ্ছে সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান—তার মধ্যে জাতীয়তা থাকতে পারে না।

যে-সব লোককে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে পছন্দ করি না, তাদের মুস্কিলে ফেলবার ফিকিরেই সুনীতির জন্যে প্রাণ আমাদের ককিয়ে উঠে।

যে-কোন ছবি ভাব-বিভোর প্রাণে আঁকা হয়—তা চিত্রকরেরই প্রতিমূর্ত্তি;—যার ছবি আঁকা হচ্ছে তার প্রতিমূর্ত্তি নয়।

বিশ্বে এমন-কিছুই নেই, আর্ট যা অভিব্যক্ত করতে অক্ষম।

আর্টমাত্রই একেবারে অকেজো। সাহিত্যে এমন কোন পুস্তক নেই, যাকে সুনীতিপূত

দুর্নীতিদুষ্ট বলে অভিহিত করা যেতে পারে। বই সুলিখিত কি কুলিখিত—তাইটেই খালি দেখা দরকার।

যদি কোন জাতিকে আমরা আর্টের মধ্য দিয়ে বুঝতে চাই, তবে তার স্থাপত্য আর সঙ্গীতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

যিনি মহাকবি, তিনি সব-চেয়ে অকবি; কিন্তু ক্ষুদে কবির দল লোকের মনে একেবারে ঠিক লাগিয়ে দেয়।

সাধারণ ধন-দৌলত মানুষের ভাঁড়ার থেকে চুরি যেতে পারে। আসল রতন চুরি যায় না।

রমণী, ভালবাসবার জন্যে—বোঝবার জন্যে নয়!

অদ্যাবধি পৃথিবী যত অশ্রুমোচন করেছে, তার চেয়ে তার ঐ হাস্য—ঐ ভয়ানক হাস্য, ঢের বেশী দুঃখময়।

সমালোচনা

গৃহশ্রী।

সতী, বেহুলা, জড়ভরতাদি প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সংপ্রতি "গৃহশ্রী" নামক আর এক-খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। দীনেশবাবুর পত্রে যখন প্রথম এই সংবাদ পাইলাম, তখন মনে করিলাম, তিনি হয়ত কোনো পুরাণ ঘাঁটিয়া মঞ্জুশ্রীর ন্যায় কোন গৃহশ্রীর আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং তাঁহার জগদ্বিখ্যাত ব্যাকরণে ভুল অথচ সুমিষ্ট ভাষায় সেই নায়িকার চরিতকথা বর্ণন করিয়াছেন,। তার পুস্তকখানি যখন হস্তগত হইল তখন দেখিলাম ইহা ৩৫৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক বিশাল গ্রন্থ; মূল্য ১৷৷০ টাকা—ইহার মলাটের উপরে 'গৃহশ্রী' নামের নীচে কালো চওড়া—চুড়ীপাড়ওয়ালা শাড়ী-পরা এক হাতে একট বিষাদিনী সুন্দরী রমণীর ছবি। ৩৫৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৷০ টাকা, আর এই বিষাদিনীর ছবি দিয়া কে মনে করিবে ইহা একখানি উপন্যাস নয়! তখন মনে করিলাম, বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান দুরবস্থাক্ষেত্রে উপন্যাসরসপিপাসু চাতক, চাতকিতীগণের জন্য দূর করিয়া দীনেশবাবু বুঝি পুণ্যসঞ্চয় করিলেন। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! মলাট উল্টাইতেই আমার সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। টাইটেল্ পেজে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "খ্যাতনামা ডাক্তার, কবিরাজ ও বিশেষজ্ঞগণের পরিশিষ্ট সহ।" তবে কি ইহা একখানা চিকিৎসা-গ্রন্থ? অথবা আজ-কাল উপন্যাসের পাঠক-পাঠিকাদিগকে কোনো বিশেষ রোগগ্রস্ত মনে করিয়া গ্রন্থকার কৃপাপরবশ হইয়া গ্রন্থের পরিশিষ্টে সেই রোগ-প্রতিকারের ব্যবস্থা-পত্র পর্য্যন্ত লিখিয়া দিয়াছেন? কিন্তু আমার এই সংশয় বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। সূচীপত্র দেখা মাত্রই বুঝিতে পারিলাম, ব্যাপার কি। গল্প, আখ্যায়িকা, উপন্যাসের পাঠক-পাঠিকাগণ এই সূচী দেখিয়া নিশ্চয়ই দীনেশবাবুকে আশীর্ব্বাদ করিবেন না। কোথায় অমৃতময় কাব্য-রসের পরিবেশন—আর কোথায় "স্ত্রীশিক্ষা", "গৃহিণীর কর্ত্তব্য" ইত্যাদি নিরেট অকপট গুরুমহাশয়গিরি!

এই পুস্তকে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"একজন একটি গল্প বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পাড়ার এক দিক হইতে তাঁহারা ক্রমাগত এক ব্যক্তির প্রাণপণ চেষ্টা শুনিতে পাইলেন; সে ব্যক্তি খুব চীৎকার করিয়া কেবলই বলিতেছে—'টান্ দে—বাঁকা কর—টানিয়া ওঠা' এই অবিরত চীৎকারে কৌতূহল বৃদ্ধি

পাওয়াতে এবং ভীত হইয়া পাড়ার লোকেরা সেই বাড়ীতে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, এবং "মহাশয়, কি হইয়াছে" বলিয়া বহুকণ্ঠে একবারে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। চীৎকারকারী ব্যক্তি লজ্জিত হইয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাশয়, কিছু নয়—ছেলেটাকে 'ক' লেখাচ্ছি।"

কোন কোন পাঠক হয়ত মনে করিবেন, দীনেশ বাবুও এই ৩৫৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী পুস্তকে বহু চীৎকার করিয়া আমাদের মেয়েদিগকে 'ক' লেখা শিখাইতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার কতকগুলি উপদেশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যথা—

"যিনি রান্না করিবেন, তাঁহার এটা দেখা উচিত, যে সকল বস্ত্র শুকাইতে দেওয়া হইয়াছিল তাহা বৃষ্টিতে ভিজিতেছে কিনা; ছোট ছোট সকলের কে কোথায় কি অবস্থায় আছে; যাঁহারা যে সময়ে খাইয়া থাকেন তাঁহারা খাইয়াছেন কি না; রুগ্ন ব্যক্তির খাদ্য যথাসময়ে প্রদত্ত হইয়াছে কি না, ইত্যাদি।"

"মশারির উপরে কোন জিনিষ রাখা একেবারেই উচিত নহে।"

"শীতান্তে লেপ-তোষক উঠাইয়া রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করা উচিত।"

"পরিবেশনকালে কে কতটা খাইতে পারেন, তাহা বুঝিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দেওয়া উচিত।"

"অন্ধ-আতুরের প্রতি দয়া রাখা গৃহস্থের কর্ত্তব্য।"

দীনেশবাবু কি তবে এই সকল Truism শিক্ষা দেওয়ার জন্য এতবড় একখানা বই লিখিয়াছেন?

যিনি মনোযোগের সহিত এই পুস্তকখানি পড়িবেন তিনি দেখিতে পাইবেন, ইহাতে কেবল সংসারানভিজ্ঞা বালিকাগণের নহে, আমাদের মত বুড়া-লোকেরও শিখিবার ও ভাবিবার বিষয় অনেক আছে।

"গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"—এই বাক্যটি অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত থাকিলেও ইহার উপযোগিতা সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশে সমান। গৃহের সুখ-শান্তি একমাত্র গৃহিণীর উপরই নির্ভর করে। আমাদের সমাজের এই ভাঙ্গা-গড়ার যুগে আমাদের গৃহিণীর প্রাচীন আদর্শ ক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছে অথচ নূতন আদর্শও আমরা একটা-কিছু ঠিক করি উঠিতে পারিতেছি না। অন্য-দিকে যাঁহারা পাশ্চা আদর্শে ঘর বাঁধিতেছেন, তাঁহারাও অনেক বিষ ভুল করিতেছেন কিনা তাহাও বিচার্য্য বিষয় হইয়াছে আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় মেয়েদিগ কিরূপ শিক্ষা দিলে তাঁহারা উপযুক্ত গৃহিণী হই পারেন, ইহা বর্ত্তমান যুগের একটি কঠিন সমস্যা দীনেশবাবু এ সম্বন্ধে বলেন, "স্ত্রীলোক পুরুষের উচ্চশিক্ষা লাভ করিবেন কি না, সেই দুরূহ প্রশ্নে সমালোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এখনও আমাদে সমাজে যে অবস্থা আছে, তাহাতে গৃহস্থালি-শিক্ষা তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা। সমাজ যদি সম্পূর্ণ ভিন্নভাব ধারণ করে, তবে কেহ বা আজন্মকুমা থাকিবেন, কেহ বা রাজনীতিক্ষেত্রে বা বিষয়-ক বিভাগে পুরুষের সমকক্ষতা করিতে অগ্রসর হইবে যদি সত্যসত্যই এরূপ অবস্থান্তর ঘটে তখন ভাল হইবে, তাহা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরে চিন্তা করিবেন, এখনও সেরূপ চিন্তা করার উপস্থিত হয় নাই। গৃহের শিক্ষা সম্পূর্ণ করি পারিলেই স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, বর্ত্তমানে সামাজি অবস্থায় তাহাই মনে করিতে হইবে।"

কিন্তু তাই বলিয়া গ্রন্থকার নারীগণের উচ্চশিক্ষ বিরোধী নহেন। তিনি বলেন—"স্ত্রীলোকের উ শিক্ষার কেহ ন্যায়তঃ বিরোধী হইতে পারেন এই হিন্দুসমাজে বহুসংখ্যক রমণী পূর্ব্বকালে উ শিক্ষা পাইয়াছিলেন। * * * * কিন্তু বর্ত্তম সামাজিক জীবনরক্ষার জন্য যে শিক্ষা না হই সংসারে নানা অসুবিধা ও ক্ষতির সম্ভাবনা, আ মাত্র সেই শিক্ষা সম্বন্ধেই লিখিয়া যাইব। যাঁহা সঙ্গীতে মীরাবাই, শাস্ত্রালোচনায় গার্গী, গুণগ অরুন্ধতী ও কবিত্বে আনন্দময়ী হইবেন, আ তাঁহাদের পথে কাঁটার বেড়ায় ব্যবস্থা করিতে ই নহি। কিন্তু আমরা আটপৌরে গৃহস্থালীর জন্য শিক্ষার দরকার, তাহাই লইয়া এই পুস্তক লিখিতে এটি পুনঃ পুনঃ পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতেছি

কিন্তু উচ্চশিক্ষিতা রমণীর পক্ষেও যে "আট-পৌরে" গৃহস্থালী অর্থাৎ ঘরকন্না শিক্ষা করা দরকার ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। বঙ্কিম বাবুর প্রফুল্ল দেবীচৌধুরাণী হইয়াও স্বহস্তে বাসন মাজিয়াছেন। আমি আর একটি বি, এ পাশ করা দেবীচৌধুরাণীর স্বহস্তে লাড়ু প্রস্তুত করার কথাও শুনিয়াছি। উচ্চশিক্ষিতা রমণীবৃন্দ স্বাধীনভাবে হোটেলে বাস করিয়া আফিসে চাকুরী করিবেন, এরূপ দৃশ্য যেন কখনও এ দেশে দেখিতে না হয়। স্কুল-কলেজের শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন ও বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ হইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের স্নেহ প্রীতি সমবেদনার বিকাশক্ষেত্র একমাত্র গৃহ, এ কথা সর্ব্বসিদ্ধ। আর আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারই একসময়ে সেই হৃদয়ের শিক্ষার স্থল ছিল। এ কথা সকলেই জানেন। দীনেশবাবুও বলেন, "বহু আত্মীয়ের সঙ্গে একত্র থাকায় যে আত্মত্যাগ, ক্ষমা ও উদার ভাবের চর্চ্চা করিতে হয়,—তাহাতে মানুষ উন্নত হয় এবং ভগবানের বেশী সম্মুখীন হয়।" গীতায় আছে, "যিনি নিজের মত সকলকে সমভাবে সুখে ও দুঃখে দেখিতে পাবেন তিনিই পরম যোগী।" আবার বিষ্ণুপুরাণে আছে "বিষ্ণুর আরাধনা কি? না, সকলকে সমান ভাবে দেখা।" সুতরাং একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করিয়া যিনি আলস্য-দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া প্রীতি ও ত্যাগ শিক্ষা করেন তিনি যে কেবল ইহকালে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তাহা নহে, তিনি পরকালেও ভগবানের জন্য নিজের আত্মাকে প্রস্তুত করেন। কিন্তু বর্ত্তমান ঘোর স্বার্থপরতা ও দ্বেষ হিংসা বিলাসিতার যুগে সেই ত্যাগ ও প্রীতির ভাব দিন দিনই দুর্ল্লভ হইয়া পড়িতেছে। যেখানে সেই ত্যাগ ও প্রীতির অসদ্ভাব হইয়াছে, সেখানে একান্নবর্ত্তী পরিবার গঠনের চেষ্টা বৃথা। দীনেশবাবুও বলেন, "যেখানে ত্যাগ নাই, উচ্চ ধর্ম্মভাব নাই, সেখানে যেন কেহ যৌথ পরিবার গড়িবার বিফল প্রয়াস না পান।"

পূর্ব্বকালে এই একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকিয়া আমাদের গৃহিণীগণ কিরূপ শিক্ষা লাভ করিতেন, দীনেশবাবু তাহার একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আমি এস্থলে তাহা আগাগোড়া উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এই আদর্শের সহিত তুলনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব, আমরা প্রাচীন আদর্শ হইতে কত দূরে সরিয়া পড়িয়াছি, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ গৃহিণীগণের শিক্ষা কোন্ প্রণালীতে হওয়া উচিত। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন—"আগেকার দিনে ঘরে ঘরে সেইরূপ লক্ষ্মীরা ছিলেন তাঁহারা উলের টুপী বুনিতে জানিতেন না, বা ফার্ষ্ট বুক হইতে দু'ছত্র ইংরেজী পড়িতে জানিতেন না, কিন্তু তাঁহারা বাড়ীর সকলের মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন এবং সকলকে ভালবাসিতেন; তাঁহারা ক্ষুধার সময় অন্ন দিতেন, গালি দিয়া বিদায় করিতেন না; বাড়ীর কাহারও কোন কষ্ট হইলে তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন এবং আদর ও উপদেশে সেই ব্যথা ঘুচাইতে চেষ্টা করিতেন; খাইবার ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন কাহার কি অসুখ করিয়াছে, এবং কে কোন্ জিনিষ খাইতে ভালবাসে, তাহা হয়ত সেই ব্যক্তি নিজে যতটা না জানে গৃহিণী তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জানিতেন। শ্রান্ত ব্যক্তিকে তাঁহারা খাটাইতেন না; যে দুঃখ পাইয়া আসিয়াছে তাহাকে তাড়া দিতেন না; যে একটু শান্তির জন্য গৃহে ফিরিত তাহাকে দ্বিগুণ অশান্তির মধ্যে ফেলিতেন না। তাঁহারা সরল কথায় দোষ দেখাইতে দ্বিধা করিতেন না, যে অন্যায় করিয়াছে তাহার উপযুক্ত শাসন করিতেন, কিন্তু অন্যায়রূপ শাসন করিতেন না—যে শাসনে বিগড়িয়া যায় সে শাসন করিতেন না; এবং যে আদরে ছেলেদের ভবিষ্যৎ মাটি হয় সেরূপ আদর করিতেন না। ভাঁড়ার ঘরের তাঁহারা লক্ষ্মী ছিলেন, রান্নাঘরের তাঁহারা অন্নপূর্ণা ছিলেন, এবং পরিবেশনকালে তাঁহারা দয়াময়ী ছিলেন। তাঁহারা নিজের সুখ খুঁজিতেন না। এবং নিজের দুঃখকে যতটা সরাইয়া রাখা কর্ত্তব্য তাহা রাখিতেন, এবং পরের দুঃখকে নিজের দুঃখের মত মনে করার দরুণ সকলকে আপন করিতে পারিতেন। আমি কি খাইব, কি পরিব এবং সেকরার বাড়ীর

গহনার ফর্দ্দ কিরূপ হইবে, বাজারে নূতন ধরণের কোন্ বহুমূল্য শাড়ী আসিয়াছে, স্বামীর কাছে দিনরাত্রি তাহারই বায়না ধরিয়া থাকিতেন না। বাড়ীর সকলে সুখী হইলেই তাঁহারা সুখী হইতেন। সকলের সেবায় প্রাণপণে নিজকে নিবেদন করিয়া দিয়া সেই সেবায় সকলে সন্তুষ্ট হইলে তিনি তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পুরস্কার মনে করিতেন। স্বামীর প্রতি ভালবাসা লইয়া তাঁহারা বেশী আড়ম্বর করিতেন না, সেই প্রেম একান্ত-ভাবে গুপ্ত থাকিত, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে তাঁহাদের সেই অপূর্ব্ব প্রেম ধরা যাইত, নিজের ছেলেদের নিদারুণ শোক উপেক্ষা করিয়া—বিবাহের সময় যেরূপ নববস্ত্র পরিয়া সিন্দুর মাথায় তিনি স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন সেইরূপ—নূতন বস্ত্র পরিয়া সিন্দুর মাথায় তিনি স্বামীর মৃতদেহের পার্শ্বে অগ্নিশয্যা আশ্রয় করিতেন। বৈধব্যেও তাঁহারা পাতিব্রত্য ও ধর্ম্মের কঠোরতা অবলম্বন করিয়া এবং ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া যে উন্নত জীবন দেখাইতেন তাহার তুলনায় এখনকার নবেল-পড়ায় উৎপন্ন মনের সাময়িক উত্তেজনাগুলি একান্ত খেলো মনে হয়। তাঁহারা সারাদিন পরিশ্রম করিয়া রান্না ও পরিবেশনাদি করিয়া তৃতীয় প্রহর বেলার পর খাইতে বসিতেন, এমন সময়ে অতিথি আসিল—আর নিজের ভাতের থালাটি ধরিয়া তাহাকে দিয়া হাসিমুখে উপবাস করিয়া রহিলেন, হয়ত তাহা বাড়ীর কেহই জানিবে না। কিন্তু যিনি লোকের সুখ-দুঃখের নিয়ন্তা, উহা নিশ্চয়ই তাঁহার দয়ার দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না।

"কেহ হয়ত বলিবেন যে, এ সকল স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচারের কথা, ইহাতে প্রসংসার কথা কি আছে? পুরুষেরা যে একান্ত স্বার্থপর ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু যেখানে বাধ্যবাধকতা নাই, এবং প্রেমের জন্য কষ্টস্বীকার করা হয়, সেখানে সে কষ্ট তপস্যা; তাহাতে জীবন উন্নত হয়, সেই কষ্ট খুব বেশী হইলেও তাহা অসহনীয় হয় না, কারণ তাহা স্নেহ-মমতার কষ্ট। স্নেহের জন্য, মা কি না করিয়া থাকেন? তাহাতে কি তিনি কষ্টবোধ করেন। বরং তাহা সুখের, সেই সেবাতেই আমাদের জীবন সফল হয় এবং উহা আনন্দময়ের কাছে লইয়া যায়। যিনি বৃহৎ সংসারের মাতৃরূপিণী, তিনি মাতার মত স্নেহের সহিত বুক পাতিয়া সেই সংসারের দুঃখ-কষ্ট সহিয়া থাকেন।"

প্রাচীনা গৃহিণীর এই চিত্র অতিরঞ্জিত নহে এ বিষয়ে হয়ত অনেকেই সাক্ষ্য দিবেন। আমার কথা এই, নবীনাগৃহিনীগণ উলের টুপী বুনুন কিম্বা কবিতা লিখুন, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা প্রাচীনাদের স্নেহমমতা উদারতা ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করুন। তাঁহারা ভাল শাড়ী কি মূল্যবান্ গহনা পরুন আপত্তি নাই, কিন্তু নিত্য নূতন ফ্যাসান বা সখের খাতিরে অভাবগ্রস্ত-সংসারের দারিদ্র্য বৃদ্ধি যেন না করেন।

দীনেশবাবু হিন্দুর হৃদয় লইয়া এই প্রাণহীন হিন্দুসমাজের অশেষ সম্মান-কামনায় তাঁহার পুস্তক লিখিয়াছেন। আশা করি হিন্দুগৃহস্থ-মাত্রেই তাঁহার পুস্তকপাঠে উপকারলাভ করিবেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

কলিকাতা ২২, মুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত

N. C. Maitra Family Library
Narayan Chandra Maitra
Barisal



(ফরাসীর মহাকবি মলিয়ের রচিত কমেডি "পারিসিপোলিসে আলেকজান্দার")

ভারতী

৪০শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩২৩ [১২শ সংখ্যা

তাঁতাজিলের মৃত্যু*

পাত্র-পাত্রী

তাঁতাজিল

ইগ্রেন, বেলান্‌জিয়ার } তাঁতাজিলের দুই বোন

আগ্লোভাল

রাণীর তিনজন ভৃত্য

প্রথম অঙ্ক

স্থান—পর্ব্বত-শিখর, দূরে প্রাসাদ দেখা যাইতেছে।

তাঁতাজিলের হাত ধরিয়া ইগ্রেনের প্রবেশ।

ইগ্রেন—তাঁতাজিল, তোমার আজকের রাতটা বড় সুবিধার মনে হচ্ছে না। ঐ সাগরের ডাক শোনা যাচ্ছে—গাছগুলো যেন কাঁদছে মনে হচ্ছে—অনেক দেরী হয়ে গেছে। প্রাসাদের সামনে ঝাউ গাছগুলোর পিছনে চাঁদ ডুবে যাচ্ছে, এখানে আমরা দু'জনে শুধু আছি—আর কেউ নেই—ভারী সাবধানে থাকতে হবে...একটু সুখও আয়ত্ত না হয়, এই তাদের লক্ষ্য। একদিন আমি মনে মনে বলেছিলুম,—এত চুপি চুপি সে, যে আমার অন্তর্যামীও তা শুনতে পান্‌নি—বলেছিলুম, এখন সুখে আছি···অম্নি আর কিছু নয়—দুদিন পরেই বুড়ো বাপ মারা গেলেন, দুটি ভাই কোথায় যেন উবে গেল! তুমি, আমি আর আমার ছোট বোনটি—এ ছাড়া আর আমাদের কেউ নেই ভাই। ভবিষ্যৎ! আর আমার বিশ্বাস নেই··· এস, কাছে এস···আমার কোলে বসে আমায় চুমু দাও···তোমার হাত দুটি দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধর...হাঁ···ঠিক···এ বাঁধন আর তারা খুল্‌তে পারবে না···একদিন সন্ধ্যাবেলা তোমায় নিয়ে যাচ্ছিলুম, আর সেই ঘুলিপথ দিয়ে যাবার সময় একটা ছায়া দেখে কি

*মেটারলিঙ্ক রচিত The Death of Tintagiles এর অনুবাদ।

রকম তুমি ভয় পেয়েছিলে··· তা কি তোমার মনে আছে, তাঁতাজিল? আজ সকালে হঠাৎ আবার যখন তোমাকে দেখলুম, তখন মনে হল যেন আমার প্রাণটা বেরিয়ে আসছে···ভাবছিলুম, তুমি দূরে আছ, বেশ ভালই আছ...কে তোমাকে এখানে আনলে?

তাঁতাজিল—আমি ত জানিনা।

ইগ্রেন। তারা যা বল্লে, তোমার সব মনে আছে?

তাঁতাজিল—তারা বললে, আমায় আসতে হবে।

ইগ্রেন—আসবার কারণ···

তাঁতাজিল—কারণ আবার কি, রাণীর ইচ্ছে, তাই.....

ইগ্রেন—রাণীর এ রকম ইচ্ছে কেন, তা তারা বল্লে না? নিশ্চয়ই বলেছে।

তাঁতাজিল—আমি শুনিনি।

ইগ্রেন—তারা নিজেরা যখন কথা কইছিল, তখন কি বলাবলি করছিল?

তাঁতাজিল—তারা ভারী ফিস্ ফিস্ করে কথা বল্‌ছিল, আমি তার কিছুই শুনতে পাইনি।

ইগ্রেন—সমস্ত ক্ষণই—?

তাঁতাজিল—সমস্তক্ষণই; কেবল আমার দিকে যখন চাইলে, তখন.....

ইগ্রেন—রাণীর সম্বন্ধে কিছুই বলেনি? কোন কথা না?

তাঁতাজিল—তারা কেবলই বলছিল, তাঁকে কেউ কখন দেখেনি।

ইগ্রেন—জাহাজে তোমার সঙ্গে যারা ছিল, তারাও কিছু বল্লে না?

তাঁতাজিল—সমস্তক্ষণই তারা বাতাস আর পালের সম্বন্ধে কথা বলছিল!

ইগ্রেন—হুঁ···তাতে আশ্চর্য্য কিছু নেই...

তাঁতাজিল—তারা আমাকে একলা রেখে গেল।

ইগ্রেন—তবে শোন, তাঁতাজিল, যা জানি, সব তোমায় বলছি।

তাঁতাজিল—বল দিদি।

ইগ্রেন—সে বড় বেশী কথা নয়, সামান্যই। ···আমরা দু বোনে আজন্মই এখানে আছি, কিন্তু কখনো, এই যে সব চার দিকে যা ঘটছে, তা বুঝতে সাহস করিনি...এ দ্বীপে অনেক দিন আছি। ভাবি, যদি কখনো অন্ধ হয়ে যাই, তাতে বিশেষ কষ্ট হবে না, কারণ সব আমার মুখস্থ হয়ে গেছে ···ব্যাপার ত ভারী...হয় একটা পাখী উড়বে, গাছের পাতা কেঁপে কেঁপে পড়ে যাবে, আর না হয় কোথাও একটা ফুল ফুটে উঠবে ···এই ত এক একটা ঘটনা! চারদিকে এখানে সব এমন চুপ্‌চাপ্ যে দূরে বাগানে একটা পাকা ফল পড়লে সকলেই জানলায় পানে ফিরে তাকায়! কারো মুখে কোন সন্দেহের ছায়া পর্য্যন্ত নেই—কিন্তু একদিন রাত্রে জানতে পারলুম, ব্যাপার শুধু এই নয় ···এর ভিতরে আরও ঢের-কিছু আছে··· পালিয়ে যাব, ঠিক করলুম, কিন্তু পারলুম না...যা বল্লুম, সব বুঝতে পারছ?

তাঁতাজিল—হ্যাঁ দিদি, সব বুঝতে পেরেছি...

ইগ্রেন—না, আর এ সম্বন্ধে কোন কথা বলে না···কি যে হবে, বল্‌তে পারি না...ভূতের মত ঐ যে মরা গাছগুলো

দাঁড়িয়ে আছে, তার পিছনে সেই দূরে ঐ পাহাড়ের ঠিক নীচে একটা বাড়ী দেখতে পাচ্ছ?

তাঁতাজিল—খুব কালো একটা কি দেখতে পাচ্ছি, দিদি, ঐটেই কি প্রাসাদ?

ইগ্রেন—হাঁ, ঐ প্রাসাদ। প্রাসাদটা খুব কালো···খুব ঘন ছাওয়ার ভিতর অনেক নীচে ···ওখানেই আমাদের থাকতে হয়···আশপাশের চারদিকের পাহাড়ের উপর তারা মনে করলেই প্রাসাদটা তৈরি করাতে পারত, কিন্তু করায়নি! দিনের বেলায় পাহাড়ের নীল রং দেখে আর পাহাড়ের চূড়ো থেকে দূরে সাগর আর সমতল ভূমি দেখে সকলে নিশ্বাস ফেলে বাঁচত আরামও পেত কিন্তু অত নীচে তারা ইচ্ছে করেই প্রাসাদটা তৈরী করালে; ওটা এত নীচে যে বাতাসও যেন আসতে পারে না! এখন সব ভেঙ্গে চুরে যাচ্ছে আর কেউ দেখছেও না...দেয়াল-গুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে খসে যাচ্ছে...অন্ধকারেই সব বোধ হয় লোপ পেয়ে যাবে...কেবল একটা বাড়ী আছে যার আজও কিছু হয় নি। কত কাল হয়ে গেল, তবু ঠিক সেই রকমই রয়েছে...ওটা খুব বড় আর সব সময়েই ওর ছায়া বাড়ীটার উপর গড়িয়ে পড়ে আছে·····

তাঁতাজিল—দিদি, ওরা ও কি জ্বালাচ্ছে ···দেখ, দেখ, বড় বড় জানলাগুলো আলোয় ভরা—লাল টক্‌টক্ করছে!

ইগ্রেন—তাঁতাজিল, ওগুলো সেই প্রাসাদের জানলা···কেবল ঐ জানলা গুলোতেই আলো দেখতে পাবে...ঐ ঘরেই রাণীর সিংহাসন···

তাঁতাজিল—রাণীকে দেখতে পাব না?

ইগ্রেন—না, কেউ তাঁকে দেখতে পায় না।

তাঁতাজিল—দেখতে পায় না! কেন?

ইগ্রেন—তাঁতাজিল, কাছে এসো··· একটা পাখী কেন, একটা ঘাসের শিষও যেন আমাদের এসব কথা শুনতে না পায়।

তাঁতাজিল—দিদি, এখানে ত একটিও ঘাস নেই... [ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

রাণী কি করেন?

ইগ্রেন—কেউ তা জানে না...তাঁকে কেউ চোখেও দেখেনি কখনো। ওখানে, ঐ প্রাসাদে তিনি একলা আছেন। যারা তাঁর কাজ করে, তারা আবার দিনের বেলা কেউ বাইরে আসে না...তাঁর বয়স অনেক হয়েছে; সম্পর্কে তিনি আমাদের দিদিমা... তাঁর ইচ্ছে তিনি একলা রাজত্ব করেন—অপরের উপর তাঁর ভারী সন্দেহ, পরের সুখ সহ্য করাও তাঁর স্বভাব নয়! তবে লোকে বলে, তাঁর মাথা কিছু খারাপ... তাঁর রাজত্ব যাবার ভয়েই বোধ হয় তোমাকে এখানে আনা হয়েছে...তাঁর হুকুম-মত কাজ হল, কিন্তু কেমন করে, তা কেউ জানতে পারলে না...বাড়ীর বাইরে তিনি কখনো যান না, সদর দরজাগুলো দিন রাতই বন্ধ থাকে···আমি কখনো তাঁকে দেখিনি তবে আমার বোধ হয় তাঁকে অপরে যারা দেখেছে, সে যখন তিনি খুব ছোট ছিলেন, তখন।

তাঁতাজিল—তাঁর চেহারা কি বিশ্রী?

ইগ্রেন—আমি ত দেখিনি, সকলে বলে, দেখতে সুন্দরী নন, তবে গড়নটা

কেমন এক রকমের! কিন্তু যারা দেখেছে তারা একটি কথাও বলতে সাহস করে না —তারা যে সত্যি সত্যি দেখেছে, তাই বা কে জানে! তাঁর কিন্তু একটা শক্তি আছে, সেটা আমরা ঠিক বুঝতে পারি না, আর এখানে রয়েছি বটে তবে মনের উপর যেন সব সময়ে কি এক পাথর চাপানো রয়েছে··· ভয় পাচ্ছো? না, না, ভয় কি! এ নিয়ে আর ভেবো না...তাঁতাজিল, ভয় নেই! আমরা থাকতে তোমার কিছুই হবে না, আমরা তোমাকে রক্ষা করবো। কিন্তু একটা কথা ভুলো না, সব সময়ে আমাদের কাছে কাছে থাকবে, দূরে কখনো থেকো না...হয় আমাদের কাছে, না হয় আগ্নো-ভালের কাছে...

তাঁতাজিল—আগ্নোভালও···

ইগ্রেন—হাঁ, সেও এখানে থাকে... আমাদের খুব ভালবাসে...

তাঁতাজিল—তার বয়স অনেক হল, না দিদি?

ইগ্রেন—বুড়ো বটে কিন্তু খুব বুদ্ধি তার ···থাকবার ভিতর সেই-ই কেবল একজন বন্ধু আছে। আর বলবো কি, তার অনেক ব্যাপার জানা আছে···কিছু বুঝতে পারছি না—রাণী তোমাকে এখানে আনালেন, অথচ আগে কেউ শুনলে না, জানলে না... নিজের মনে যে কি আছে, তাই-ই জানি না···আগে দুঃখ করতুম, তবে তুমি সেই দূরে সমুদ্রের ও পারে আছ শুনে ভারী আমোদ হল কিন্তু এখন...আমি একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি...সকালে পাহাড়ের উপর থেকে সূর্য্য ওঠা দেখতে বেরিয়েছিলুম··· বাইরে বেরিয়েই তোমাকে দেখলুম···আর দেখেই তোমাকে চিনতে পারলুম—

তাঁতাজিল—না দিদি, তোমার মিছে কথা...আমি ত আগে হাসলুম...

ইগ্রেন—তখন হাসা অসম্ভব...বিশেষ আবার সে সময়ে...তুমি বুঝতে পারছ না ...তাঁতাজিল, চল, সময় হয়েছে; দেখ, সাগরের উপর বাতাস জমে যেন কালো হয়ে যাচ্ছে...আমাকে চুমু দাও, ওঠবার আগে চুমু দাও···আবার···আবার···ওরে ভালবাসার মর্ম্ম তুই কি বুঝবি...! তোর হাত দুখানা দে···আমার হাতের মধ্যে দে···চল, আবার সেই ভীষণ বাড়ীতে ফিরে যাই.....

[তাহারা চলিয়া গেল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রাসাদের একটি ঘর।

ইগ্রেন এবং আগ্নোভাল বসিয়া আছে।

বেলান্‌জিয়ারের প্রবেশ

বেলা—তাঁতাজিল কই? কোথায় গেল সে?

ইগ্রেন—এইখানেই আছে, জোরে কথা কয়ো না। পাশের ঘরে সে ঘুমোচ্ছে সে যেন একটু শুকিয়ে গেছে—ভাল আছে বলে আমার মনে হয় না। এতটা পথ আসতেই বোধ হয় কষ্ট হয়েছে—আর সমুদ্দুরে ত অনেকক্ষণ ছিল। না, না, তা নয়, বোধ হয় এ বাড়ীর হাওয়া তার মনে কেমন ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে—সে কাঁদছিল কিন্তু কেন তা সে জানে না...আমি তাকে কোলে নিয়ে কত আদর করলুম! এস, এস, দেখবে

এস...আমাদের বিছানায় শুয়ে কেমন ঘুমুচ্ছে ...কিন্তু মুখখানা যেন ভারি-ভারি দেখাচ্ছে। রাজার মত কপালে ছোট হাতখানি রেখেছে, রাজ্যের সমস্ত চিন্তা যেন ওরই মাথায়.....

বেলা—[হঠাৎ কাঁদিতে আরম্ভ করিল] দিদি···

ইগ্রেন—তুই কাঁদছিস কেন?

বেলা—যা জানি তা বলতে সাহস হচ্ছে না···না, না, আমি কিছুই জানি না ...কিছু ঠিক বলতে পারছি না...কিন্তু আমি শুনেছি, নিজের কানে শুনেছি... দাঁড়িয়ে সে কথা আর কেউ শুনতে পারত না···

ইগ্রেন—বল্ না, তুই কি শুনেছিস্ বল্। দেরী করিস নে...

বেলা—ঘুলি দিয়ে যাচ্ছিলুম, এমন সময়...

ইগ্রেন—এমন সময় কি?...

বেলা—একটা দরজা একটু ফাঁক ছিল। আস্তে আস্তে তাতে ধাক্কা দিলুম, তারপর ভিতরে গেলুম...

ইগ্রেন—কোথায়? কোথায় গেলি?

বেলা—সে সব কখনো দেখিনি...সে সব কত দালান—আলোয় একেবারে জল্ জল্ করছে—থাকে-থাকে আসন সাজানো আর সে এত যে বলবার নয়...বেশী এগিয়ে যাওয়া বারণ ছিল আমি জানতুম ...ভয় হল কিন্তু যেই ফিরে আসব, অমনি একটা গলার আওয়াজ পেলুম··· আওয়াজটা ভারি অস্পষ্ট...

ইগ্রেন—বোধ হয়, রাণীর চাকরেরা কথা কইছিল; তারা ঐ নীচের তলায় থাকে, তা জানিস না?

বেলা—ব্যাপারটা এখনো ভাল করে বুঝতে পারছি না...মাঝে যে কেবল একটা দরজা তা নয়, অনেকগুলো দরজা...আর গলার আওয়াজ যা শুনলুম, সে কি বিশ্রী, কি ভয়ানক.....গলায় দড়ি দিয়ে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে যেন কথা বলছে...সে কি চাপা স্বর···যতখানি পারলুম কাছ ঘেঁসে গেলুম··· কিন্তু ঠিক বল্‌তে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে, হাঁ, বেশ মনে আছে, আজ যে ছেলেটি এসেছে, তারই কথা—না, না, শুধু তাই নয়, একটা সোনার মুকুটের কথাও তারা বলাবলি করছিল—মনে হল, তারা খুব হাসছে.....

বেলা—হাঁ, আমার বেশ মনে আছে, তারা হাসছিল···শেষে কিন্তু কাঁদতে আরম্ভ করলে...না, না, ভুল শুনেছি, বোধ হয়...কি করছিল বোধ হয় বুঝতে পারিনি...কারণ সে শোনবার জো ছিল না···আর বলবো কি, সে এত চাপা কিন্তু কি ভয়ানক স্বর...ঘরের মধ্যে অনেক লোক পায়চারি করছে বুঝতে পারলুম— একটা ছেলের কথা তারা বলছিল, রাণী কিন্তু তাকে দেখতে চাইলে...হাঁ, আজই সন্ধ্যাবেলা বোধ হয় তারা এখানে আসবে···

ইগ্রেন—কি? ঠিক বলছিস্···আজই সন্ধ্যাবেলা...

বেলা—হাঁ, আজই সন্ধ্যাবেলা···আমার বেশ মনে আছে···না, না, আমি ভুল করি নি...

ইগ্রেন—কোন নাম করলে না?

বেলা—একটি ছেলের কথা বলছিল··· ছোট একটি ছেলে···

ইগ্রেন—এখানে ত আর কোন ছোট ছেলে নেই···

বেলা—ঠিক সেই সময় জোরে জোরে কথা কইতে লাগলা, যেন তাদের সন্দেহ হচ্ছিল, যে ঠিক দিনটা এসেছে কিনা—

ইগ্রেন—ভিতরকার ব্যাপার এবার বুঝতে পেরেছি... তারা যে বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে, ভেবো না, এ এই প্রথমবার... তাকে রাণী কেন যে আনালেন, এবার খুব ভাল করেই তা বুঝতে পেরেছি··· কিন্তু···এত তাড়াতাড়ি করবার মানে ঠিক বুঝতে পারছি না···আচ্ছা, দেখা যাক্...আমরা ত তিনজন আছি আর হাতে সময়ও ঢের আছে...

বেলা—তুমি কি করবে ভাব্‌ছো?

ইগ্রেন—কি যে করবো, তা নিজেই ভাল করে বুঝছি না, কিন্তু তাঁকে একেবারে অবাক্ করে দেব···তুই ত কেবল কাঁপ্‌তেই জানিস্, ভিতরের ব্যাপার বুঝতে পারছিস্···শোন্, বল্‌ছি...

বেলা—কি?

ইগ্রেন—এবার তাঁকে বেগ পেতে হবে, তা বলে রাখছি।

বেলা—দিদি, আমরা যে একলা···

ইগ্রেন—হাঁ, আমরা একলা আছি, সে কথা সত্যি কিন্তু কাজও কেবল একটা করবার আছে, আর তাতেই আমাদের জয় হবে···এসো, আমরা আগেকার মত সে রকম ভাবে হাঁটু গেড়ে বসে থাকি, হয়তো তা দেখে তাঁর দয়াও হতে পারে···লোকের কান্না দেখলে তাঁর মন গলে যায়···তাঁর সব কামনাই আমরা পূরণ করবো; হয়তো তিনি হেসেই উঠবেন আর এরকম ভাবে লোককে বসে থাকতে দেখলে ক্ষমা না করে থাকতে পারবেন না।...আজ কত বছর ধরে ঐ বাড়ীটার মধ্যে তিনি রয়েছেন আর কেবলি আমাদের ভালবাসার জিনিষগুলিকে নষ্ট করে আসছেন! কিন্তু তাঁকে আঘাত করতে, তা কেন, তাঁর সুমুখে যেতেও কারো সাহসে কখনো কুলিয়ে উঠ্‌ল না...কবরের উপর যেমন পাথর চাপানো থাকে, ঠিক সেই রকম তিনি আমাদের বুকের উপর চেপে রয়েছেন আর নিজেদের হাতগুলো বাড়াতেও কারো সাহস হচ্ছে না···যখন এখানে ছিল, তখন ভয়ে ভয়েই সব থাকত...কিন্তু সে দিন আর নেই···এখন আমাদের দিন এসেছে...এবার আমরা দেখে নেবো···এ সময় একজনকে সাহস করে উঠতেই হবে··· তাঁর শক্তিটা কিসের উপর...তা কারো জানা নেই! আর এ বাড়ীতে আমি বাস করছি না···ও কি, কাঁপছ? তবে যাও, চলে যাও; দুজনেই যদি এরকম ভাবে ভয়ে কাঁপবে, তাহলে চলে যাও··· আমার দরকার নেই···যাও, দুজনেই যাও... আমাকে একলা রেখে যাও...একলাই আমি তাঁর অপেক্ষায় থাকবো...

বেলা—দিদি, কি করবে, তা জানি না, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে আমি যাচ্ছি না···

আগ্লোভাল—মা আমার, আমি থাকবো ···আমি যাচ্ছি না···আমার জীবনটাও ভারী অসহ্য হয়ে পড়েছে...এবার তুমি চেষ্টা করো...একবার কেন, আমরা অনেকবার চেষ্টা করে দেখেছি...

ইগ্রেন—তোমরা চেষ্টা করেছো··· তুমিও...

আগ্লোভাল—সবাই চেষ্টা করে দেখেছে ...কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে তাদের জোর কোথায় চলে যায়...তুমি...হাঁ, তুমিও দেখতে পাবে...আজই সন্ধ্যাবেলা তাঁর কাছে যাবার জন্য যদি হুকুম আসে, তাহলে হাত জোড় করে আমি কিছু বলবো না, কিন্তু আমার পাদুটো ঠিক গিয়ে সেখানে হাজির হবে; আর সে কোথাও থামবে না, দেরী করবে না, তাড়াতাড়িও করবে না, কারণ এটুকু আমার জানা আছে যে ধরে নিতে কেউ আসবে না···অথচ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি আমাদের নেই! আমাদের হাতগুলো এখন আর কোন কাজের নয়, এমন কি কিছু ছোঁবার শক্তি পর্য্যন্ত নেই...এখন যাক্···তোমাকে দেখে আমার আশা হচ্ছে, তোমাকে আমি সাহায্য করবো...মা আমার, দরজাগুলো সব বন্ধ করে দাও··· তাঁতাজিলকে জাগাও···তাকে বুকের মধ্যে চেপে হাত দিয়ে জড়িয়ে রাখো···তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই!

তৃতীয় অঙ্ক

সেই ঘর

ইগ্রেন ও আগ্লোভাল।

ইগ্রেন—দোরগুলো সব দেখছিলুম। তিনটে দরজা, বড়টার উপরই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে...আর দুটো খুব ছোট, চাবিগুলো অনেকদিন হারিয়ে গেছে, লোহার গরাদগুলো দেয়ালের মধ্যে একবারে আঁটা...এ দরজাটা বন্ধ করে দিতে হবে; দরজাটা কি ভারী! সহরের ফটক থাকে, তার চেয়ে এটা ভারী, শুধু তাই নয়...কি প্রকাণ্ড···এ-সব দরজায় বাজ পড়লেও কোন ক্ষতি হয় না...কি যে ঘটবে, তা কে জানে···তুমি ঠিক আছ ত?

আগ্লোভাল—[দরজার চৌকাঠের উপর বসিয়া]—সিঁড়ির ধাপে আমি বসে থাকবো···তলোয়ারখানাও হাঁটুর উপর থাক্। ভেবো না মা, যে এই রকম ভাবে বসে এই প্রথম আমি এ দোরে পাহারা দিচ্ছি, তা নয়...কতবার যে এ কাজ করেছি, তার ঠিকানা নেই···এমন সব পুরানো ব্যাপার লোকের সময়ে সময়ে মনে পড়ে, যে সে নিজেই তার কিছু অর্থ ঠাওরাতে পারে না···এ সবই আমি করেছি, অথচ কখন যে করেছি, তার কিছুই মনে নেই··· তবে কখনো তলোয়ার বার করবার সাহস হয় নি...এই যে আমার সেই তলোয়ার-খানা রয়েছে, কিন্তু আমার হাতের সে ধরবার শক্তি আর নেই; এবার চেষ্টা করে দেখবো···এখন সময় এসেছে, নিজেদের সব করতে হবে···

[তাঁতাজিলকে কোলের মধ্যে লইয়া বেলানজিয়ার পাশের ঘর হইতে আসিল]

বেলা—এ জেগেছিল···

ইগ্রেন—কেমন শুকিয়ে গেছে···কি যেন ভয় পেয়েছে···

বেলা—আমি ত জানি না...চুপ করে ছিল···তারপর কাঁদতে লাগল...

ইগ্রেন—তাঁতাজিল, ভাই···

বেলা—অন্যদিকে চেয়ে রয়েছে—

ইগ্রেন—আমাকে বোধ হয় চিনতে

পারে নি...তাঁতাজিল...চেয়ে দেখ...তোমার দিদি তোমার সঙ্গে কথা কইছে...একদৃষ্টে ওধারে ও কি দেখছ...এদিকে দেখ... এস, তোমাতে আমাতে খেলা করি...

তাঁতাজিল—না...

ইগ্রেন—খেলা করতে চাও না ? কেন...

তাঁতাজিল—আমি দাঁড়াতে পারছি না...

ইগ্রেন—দাঁড়াতে পারছ না ? কেন ? কি হল তোমার...কি কষ্ট হচ্ছে ?

তাঁতাজিল—কষ্ট হচ্ছে...

ইগ্রেন—কি কষ্ট, বল,...আমি সারিয়ে দেব...

তাঁতাজিল—বলতে পাচ্ছি না...এক জায়গায় নয়...গায়ের চার দিকে...সব জায়গায়...

ইগ্রেন—ভাই আমার, এসো, আমার কোলে এসো...আমার কোলে বসে থাকলেই তোমার সব ব্যথা সেরে যাবে...দাও, ওকে আমার কাছে দাও...বেলা, আমার কাছে দে...আমার কোলে বসে থাকুক্, তাহলে আর কোন ব্যথা থাকবে না...ভাই, আমার হাত দুখানা কেমন নরম, নয় কি ? এই হাত তোমার গায়ে বুলিয়ে দেব—সব কষ্ট সেরে যাবে। তোমার বড় বোনেরা তোমার কাছে রয়েছে, তোমার পাশেই রয়েছে, কোন ভয় নেই। আমরা তোমায় রক্ষা করবো...তোমার কোন অনিষ্ট ঘটবে না...বিপদ তোমার কাছে আসতেই পারবে না...

তাঁতাজিল—বিপদ ত এসে গেছে দিদি, ; আসার কথা কি বলছ...ওখানে কোন আলো নেই কেন, দিদি..

ইগ্রেন—ওখানে ত আলো রয়েছে ভাই...কড়ি কাঠে ঐ যে একটা আলো ঝুলছে, দেখতে পাচ্ছ না ?

তাঁতাজিল—হাঁ, হাঁ, দেখতে পেয়েছি... কিন্তু বড় নয়, ছোট...আর আলো কৈ ?...

ইগ্রেন—তার দরকার কি...যা দেখবার সব ত দেখতে পাচ্ছি...

তাঁতাজিল—হাঁ, তা পাচ্ছি বটে...

ইগ্রেন—পাচ্ছ ! তোমার চোখের জোর ত খুব...

তাঁতাজিল—দিদি, তোমারও কি কম... তোমার ত ভাই...

ইগ্রেন—না, আজ সকালে আমি ত দেখি নি...এখন তোর চোখে দেখলুম... মন যে কখন কি ভাবে, কি দেখে, তা আমরা সব সময় ঠিক বুঝতে পারি না...

তাঁতাজিল—দিদি, মনকে ত আমি দেখিনি...আগ্নোভাল ওখানে বসে আছে কেন ?

ইগ্রেন—ওখানে বসে ও একটু জিরুচ্ছে... শুতে যাবার আগে তোমাকে চুমু খেয়ে যেতে চায়...তোমার কখন ঘুম ভাঙ্গবে, সেইজন্যে বসে আছে..

তাঁতাজিল—ওর হাঁটুর উপর কি ও?

ইগ্রেন—হাঁটুর উপর ? কৈ না, আমি ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না—

আগ্নোভাল—ও কিছু নয়...আমার তলোয়ারখানা দেখছিলুম, কিন্তু একে আর চেনা যায় না...অনেক দিন ধরে এখানা আমার কাজ করে আসছে, কিন্তু আর একে আমার বিশ্বাস নেই...আমার মনে হচ্ছে এবার ভেঙে যাবে...এই যে, বাঁটের কাছে

এখনও একটু রং...মরচে ধরে ক্ষয়ে যাচ্ছে ...তাই দেখে আমি নিজের মনেই কি সব বকছিলুম...কখন যে কি সব করলুম, কিছুই আর মনে নেই...মনটা কেমন ভাল নেই...কি করা যায় ?...মানুষকে বাঁচতেই হবে, কারণ অদৃষ্টে তার যা আছে, তা ত হওয়া চাই, আবার তারপরও আশায় বুক বেঁধে কাজ করতে হবে ..এক একটা সময় আসে, যখন জীবনটা নিজেদেরই কাছে ভারী বিশ্রী বিরক্তিকর ঠেকে, তখন আর বাঁচবার ইচ্ছা থাকে না...এখন অনেক দেরী হয়ে গেল, আর পারছি না...বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—

তাঁতাজিল—দিদি, ওর গায়ে কাটার দাগ রয়েছে—

ইগ্রেন—কৈ, কোথায়...

তাঁতাজিল—ওই যে, কপালে, হাতে...

আগ্নোভাল—ওগুলো অনেকদিনের কাটার দাগ, ভাই ওতে আর আমার কিছু হয় না, ...আলো আজ পড়েছে কি না.. ভাই, তুমি এতদিন দেখনি...

তাঁতাজিল—দিদি, দেখ, ওর বোধ হয় খুব দুঃখ হয়েছে—

ইগ্রেন—না, না, দুঃখ হয় নি, ও বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে...

তাঁতাজিল—দিদি, তোমাকেও কেমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে—

ইগ্রেন—কৈ, না...আমার দিকে চেয়ে দেখ দিকি...আমি যে হাসছি...

তাঁতাজিল—দিদি, মেজদিরও তাই...মুখ দেখ...

ইগ্রেন—না, না, মিছে কথা, ও ত ঐ হাসছে...

তাঁতাজিল—না, ও হাসি নয়...আমি বুঝতে পেরেছি ..

ইগ্রেন—না, ও কিছু নয়—অন্য কিছু ভাবো...এ সব কথা আর ভেবো না...

[ইগ্রেন তাহাকে চুম্বন করিল]

তাঁতাজিল—আর কি ভাববো ?...দিদি, চুমু খাবার সময় আমাকে মারলে কেন ?

ইগ্রেন—তোমায় মারলুম ?

তাঁতাজিল—হাঁ,...দিদি, তোমার বুকের মধ্যে কিসের শব্দ শুনতে পেলুম কেন, বুঝতে পাচ্ছি না...

ইগ্রেন—তুমি বুকের শব্দ শুনতে পেলে ?

তাঁতাজিল—হাঁ, হাঁ...কি যেন কি...

ইগ্রেন—কি ?

তাঁতাজিল—আমি বুঝতে পারছি না...

ইগ্রেন—মিছিমিছি ভয় পাওয়া ভারী অন্যায় ! আর এ রকম ভাবে কথা কওয়া... এ কি, তুমি কাদছ...কেন—কিসের কষ্ট বোধ করছ ? আমি তোমার বুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছি যে...হাঁ, এইবার বেশ শুনতে পাচ্ছি। এত কাছাকাছি থাকলে সকলেই পরস্পরের বুকের শব্দ শুনতে পায়...তখন মনে মনে কথা হয় কি না ! সে সব কথা জিভ্ জানেও না, তা বলবে কি...

তাঁতাজিল—আগে ত কিছু শুনি নি...

ইগ্রেন—তার কারণ... হাঁ, কিন্তু তোমার বুকে কি হয়েছে ..কাঁদছ কেন ?

তাঁতাজিল—[কাঁদিতে কাঁদিতে]—দিদি

ইগ্রেন—কি হয়েছে...বল ভাই... বল...

তাঁতাজিল—শুনতে পেয়েছি...তারা... তারা আসছে—

ইগ্রেন—কারা ? কারা আসছে··· কি হয়েছে ?

তাঁতাজিল—দরজায়...দরজায়—ঐ দরজার কাছে—

[পিছনদিকে সে পড়িয়া গেল]

ইগ্রেন—কি হল ? অজ্ঞান হয়েছে যে !

বেলা—দেখো, দেখো, পড়ে যাবে—

আগ্নোভাল—[হাতে তলোয়ার লইয়া, লাফ দিয়া উঠিল]—আমিও শুনতে পাচ্ছি—ঐ যে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে—

ইগ্রেন—কৈ ?

[ক্ষণেকের জন্য সব চুপ, তারপর সকলেই শুনিতে লাগিল]

আগ্নোভাল—হাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি—শুনতে পাচ্ছি। কারা একদল আসছে—

ইগ্রেন—একদল ? কি বলছ—একদল কেমন করে—

আগ্নোভাল—আমি বুঝতে পারছি না—একবার শুনতে পাচ্ছি, আর একবার পাচ্ছি না। চলার ভঙ্গি সব আলাদা তবু তারা আসছে, ঐ যে দরজা ছুঁয়েছে—

ইগ্রেন—[তাঁতাজিলকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া]—ভাই, তাঁতাজিল—

বেলা—[তাহাকে চুম্বন করিয়া]—ভাই তাঁতাজিল,—

আগ্নোভাল—দরজাটা নাড়ছে শোন, শোন, জোরে নিশ্বাস ফেলো না। ফিস্‌ফিস্ করে সব কথা কইছে !

[কুলুপের মধ্যে চাবি ঘোরানোর শব্দ শুনা গেল]

ইগ্রেন—তাদের চাবি আছে ?

আগ্নোভাল—হাঁ, আমি ত জানতুম—সবুর কর—[সিঁড়ির শেষ ধাপে তলোয়ার বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া বোন দুটিকে বলিল]—এসো, দুজনেই এসো—

[কিছুক্ষণের জন্য সব চুপ—ধীরে ধীরে দ্বার খুলিতে আরম্ভ করিল—আগ্নোভাল সেই ফাঁকের মধ্য দিয়া তলোয়ারখানি খুব জোরে নিক্ষেপ করায়, তার ডগাটা কড়ি কাঠের মধ্যে আটকাইয়া গেল এবং অল্প চাপেই তলোয়ার সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল—খণ্ড খণ্ড ইস্পাতগুলি টুং টাং শব্দ করিতে করিতে সিঁড়িতে গড়াইয়া গেল—ইগ্রেন লাফাইয়া উঠিল, তাঁতাজিলকে কোলের মধ্যে রাখিয়া—সে তখনও অচেতন অবস্থায় —তাহারা তিনজনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আটকাইতে পারিল না—দরজা আস্তে আস্তে খুলিতে লাগিল ; কিন্তু কাহাকেও দেখা বা কোন শব্দ শুনা গেল না—অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটা আলোক-রশ্মি আসিল ; তখন তাঁতাজিল তাহার হাত বাড়াইয়া চেতনা লাভ করিয়া মুক্তির চীৎকার করিয়া উঠিল ; তারপর তাহার বোনকে আদর করিল—আর সেই সময় তাহাদের অল্প চেষ্টাতেই দ্বার বন্ধ হইয়া গেল—]

ইগ্রেন—তাঁতাজিল, ভাই—

[বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে লাগিল]

আগ্নোভাল—[দরজায় দাঁড়াইয়া]—এখন আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

ইগ্রেন—[আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া]—তাঁতাজিল, তাঁতাজিল, দেখ বেঁচে গেছ ! চোখের দিকে চেয়ে দেখ, তারাটা দেখতে পাবে। এই যে, এবার কথা কইবে। ওর

দেখলে আমরা পাহারা দিচ্ছি, তাই আর সাহস হল না। আয় ভাই, চুমু দে, আমাদের চুমু দে, তাঁতাজিল। শুধু আমাকে নয়—সবাইকে, প্রাণের ভিতরটা পর্য্যন্ত জুড়িয়ে যাক্ ! আঃ—

[চারিজনেরই চোখ জলে ভরিয়া আসিল এবং পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল]

চতুর্থ অঙ্ক

সেই ঘরের সম্মুখে একটি বড় দালান

[রাণীর তিনজন চাকর আসিল—সকলেরই মুখ কাপড়ে ঢাকা ; আর পরনের কালো লম্বা পোষাক মাটীতে লুটাইতেছে—]

প্রথম ভৃত্য—[দরজায় কান পাতিয়া শুনিয়া] ওরা পাহারা দিচ্ছে।

দ্বিতীয় ভৃত্য—আমাদের কিছু করবার দরকার নেই—

তৃতীয় ভৃত্য—রাণীর ইচ্ছে কাজটা চুপি চুপি সারা হয় —

প্রথম ভৃত্য—আমি জানতুম ওরা ঘুমিয়ে পড়বে—

দ্বিতীয় ভৃত্য—শীগ্‌গির, শীগ্‌গির দরজা খোল—

তৃতীয় ভৃত্য—সময় হয়েছে—

প্রথম ভৃত্য—ওখানে থাকো, আমি একলা যাই। তিনজনের যাবার কোন দরকার নেই—

দ্বিতীয় ভৃত্য—ঠিক বলেছ ; আর সে কল খুব ছোট—

তৃতীয় ভৃত্য—কিন্তু বড় বোনের সামনে ভারী সাবধান—

দ্বিতীয় ভৃত্য—মনে আছে ত রাণীর ইচ্ছা, তারা যেন কিছু না জানতে পারে—

প্রথম ভৃত্য—কোন ভয় নেই, আমার পায়ের শব্দ কেউ কখনো শুনতে পায় না—

[প্রথম ভৃত্য আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল]

প্রায় দুপুর রাত হবে, না ?

তৃতীয় ভৃত্য—হাঁ, প্রায় ঐ রকম—

[ক্ষণিক স্তব্ধতা—প্রথম ভৃত্য ঘর হইতে বাহিরে আসিল]

দ্বিতীয় ভৃত্য—কৈ সে ?

প্রথম ভৃত্য—বোনেদের মাঝখানে সে ঘুমুচ্ছে। ছেলেটার হাত তাদের গলায় জড়ানো রয়েছে, আর তারা দু'হাতে ওকে জড়িয়ে আছে, আমার একলার কাজ নয়

দ্বিতীয় ভৃত্য—চল, আমি যাচ্ছি।

তৃতীয় ভৃত্য—হাঁ, তোমরা দুজনে যাও—আর বাইরে আমি পাহারা দি।

প্রথম ভৃত্য—খুব সাবধান ! ওরা বোধ হয় জানে ! একটা-কিছু খারাপ স্বপ্নও নিদেন এ-সময় দেখছে !

[তাহারা দুইজনে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল]

তৃতীয় ভৃত্য—লোকে সব সময়ে জানে, তবে কিছু বুঝতে পারে না !

[কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ—তাহারা দুইজনে আবার ঘর হইতে বাহিরে আসিল]

তৃতীয় ভৃত্য—কি হল ?

দ্বিতীয় ভৃত্য—তোমাকেও আসতে হবে, আমরা দুজনে ছাড়াতে পারব না।

প্রথম ভৃত্য—যেই তাদের হাত ছাড়াই, অম্নি ওরা আবার ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরে।

দ্বিতীয় ভৃত্য—আর ছেলেটাও তত ওদের দিকে ঘেঁসে যায়—

প্রথম ভৃত্য—বড় বোনের বুকের উপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে—

দ্বিতীয় ভৃত্য—আর বুকের উপর মাথাটা একবার উঠছে আর পড়ছে!

প্রথম ভৃত্য—হাত খোলা আমাদের দ্বারা হবে না।

দ্বিতীয়—বোনেদের মাথার চুলের ভিতর হাত দুখানা একেবারে ঢোকানো রয়েছে!

প্রথম ভৃত্য—ছোট ছোট দাঁত দিয়ে সোনালি রংয়ের এক গোছা চুল কামড়ে ধরে আছে!

দ্বিতীয় ভৃত্য—বড় বোনের চুলগুলো আগে কেটে দিতে হবে—

প্রথম ভৃত্য—ছোট বোনেরও।

দ্বিতীয় ভৃত্য—তোমার কাছে কাঁচি আছে?

তৃতীয় ভৃত্য—হাঁ।

প্রথম ভৃত্য—শীগ্‌গির এসো।

দ্বিতীয় ভৃত্য—ওদের চোখের পাতা আর বুক একসঙ্গেই কাঁপছে—

প্রথম ভৃত্য—হাঁ, বড় বোনের নীল চোখের একটুখানি দেখতে পাচ্ছি—

দ্বিতীয় ভৃত্য—আমাদের দিকে চেয়ে আছে, তবে দেখতে পাচ্ছে না—

প্রথম ভৃত্য—ভারী মুস্কিল! একজনকে ছুঁলেই দুজনে কেঁপে ওঠে—

দ্বিতীয় ভৃত্য—ওরা চেষ্টা করছে কিন্তু নড়তে পারছে না—

প্রথম ভৃত্য—বড় বোন চেঁচাবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

দ্বিতীয় ভৃত্য—শীগ্‌গির এসো, ওরা বোধ হয় জানে।

তৃতীয় ভৃত্য—সে বুড়োটা কোথায়?

প্রথম ভৃত্য—সেও ঘুমোচ্ছে···এদের কাছ থেকে একটু সরে—

দ্বিতীয় ভৃত্য—সে ঘুমোচ্ছে, মাথাটা কিন্তু তলোয়ারের বাঁটের উপর রেখে—

প্রথম ভৃত্য—সে কিছুই জানে না।

তৃতীয় ভৃত্য—এসো, এসো, আর দেরী নয়।

প্রথম ভৃত্য—ওদের সব একে একে ছাড়ানো ভারী শক্ত!

দ্বিতীয় ভৃত্য—এসো, এসো।

[তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিল। তন্দ্রাচ্ছন্ন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ এবং যন্ত্রণার অস্ফুট কাতর-উক্তি উঠিতেছিল। নিমেষে তাহারা তিনজনেই ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। তাঁতাজিলকে লইয়া আসিল; সে তখনও নিদ্রিত। তাহার বোনেদের মাথা হইতে কাটিয়া-লওয়া সোনালি রংয়ের একগোছা চুল তার ছোট হাতের মুঠিতে ঝুলিতেছিল। মুখ যন্ত্রণায় কাতর দেখাইতেছিল—তাহারা তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। চারিদিকে সব নিস্তব্ধ; যেমন তাহারা দালানের প্রান্তে গিয়াছে, অমনি তাঁতাজিল জাগিয়া উঠিয়া গভীর দুঃখে চীৎকার করিয়া উঠিল]

তাঁতাজিল—[দালানের প্রান্ত হইতে]—উঃ—

[পুনরায় সব নিস্তব্ধ। তারপর পাশের ঘর হইতে দুই বোনের অস্থিরভাবে ইতস্ততঃ পদ-চারণের শব্দ শুনা গেল]

ইগ্রেন—(ঘরের ভিতর হইতে)—তাঁতাজিল! কৈ সে—

বেলা—সে ত এখানে নেই!

ইগ্রেন—(বর্দ্ধমান যন্ত্রণায়)—তাঁতাজিল! —আলো—আলো—আলো জ্বালো—

বেলা—হাঁ, জ্বালো, জ্বালো—

(প্রজ্বলিত আলোক হস্তে ইগ্রেন ঘর হইতে বাহিরে আসিল)

ইগ্রেন—এ কি, দোর যে একেবারে খোলা—

তাঁতাজিল—(দূরত্ব-হেতু একেবারে অস্পষ্ট স্বরে)—দিদি—দিদি—

ইগ্রেন—ঐ যে ডাকছে...তাঁতাজিল··· তাঁতাজিল—[ইগ্রেন বেগে দালানে প্রবেশ করিল; বেলা তাহার অনুসরণ করিতে গিয়া চৌকাঠের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল]

পঞ্চম অঙ্ক

স্থান—লৌহ দ্বারযুক্ত একটি অন্ধকার খিলানের সম্মুখ। আলোক-হস্তে আলুলায়িত কেশে ইগ্রেনের প্রবেশ।

ইগ্রেন—[পাগলের মত ইতস্তত ফিরিয়া]—আমার পিছনে তারা ত এল না—বেলা, বেলা—আগ্নোভাল—কৈ, তারা কোথায়? তারা আমাকে ভালবাসত—এই তাদের ভালবাসা! আমাকে ছেড়ে গেল! তাঁতাজিল...তাঁতাজিল···কৈ! আমার মনে পড়েছে—পাষাণ দেয়ালের মাঝে সিঁড়ির কত ধাপ···কত ধাপ যে উঠেছি, তার সংখ্যা নেই···আর আমার বাঁচতে সাধ নেই... এ খিলান, এ সবই যেন ঘুরছে...[থামের গায়ে হেলান দিল]...আমি পড়ে যাচ্ছি... উঃ.....আমার যে তুচ্ছ জীবন···বুঝতে পারছি, আমি বেশ বুঝতে পারছি...জীবনটা ঠোঁটের উপর এসে কাঁপছে—প্রাণটা, না, এ আর থাকবে না···এবার বেরিয়ে যাবে! কি যে করেছি, তা জানি না···কিছুই দেখি নি কিছুই শুনিনি...হায়···এই স্তব্ধতা... দেয়ালের পাশে ঐ সিঁড়ির ধাপে ধাপে বরাবর এই সোনার রংয়ের চুল দেখে আসছি! আর তাই ধরে এত দূর এলুম...কুড়িয়ে নিলুম ...চুলগুলি কি সুন্দর...কি সুন্দর...ভাই, ভাই তাঁতাজিল···কি বলছিলুম? হাঁ, আমার মনে পড়েছে···আমি বিশ্বাস করি না···যখন একজন ঘুমোচ্ছে···যা দরকার নেই, আর যা সম্ভব নয়, তা...কি ভাব-ছিলুম?.....না, এ সব ভেবে ঠিক করতে হল···একজন এক কথা বলে, আর এক জন আর এক কথা বলে; কিন্তু জীবনের ধারা ত একেবারে অন্য রকম...ছোট্ট আলোটা নিয়ে এলুম—সিঁড়িতে এত হাওয়া, তবু নিবল না ত···[চারিদিকে চাহিয়া]—আগে এ সব দেখিনি—এতদূর আসাও শক্ত, উঃ, কি ঠাণ্ডা...কি অন্ধকার, নিশ্বাস ফেলতেও ভয় হয়—দরজাটা কি ভয়ানক—[দ্বারের নিকট গিয়া হাত দিয়া স্পর্শ করিল]—উঃ, কি ঠাণ্ডা, এ যে লোহার —একেবারে নিরেট লোহার—খোলে কি করে?—কল-কব্জা ত কিছুই দেখছি না —দেয়ালে বোধ হয় আঁটা—এর বেশী আর আসা যায় না, আর ধাপও নেই—[হঠাৎ ভয়ানক চীৎকার করিয়া]—এ কি, এখনও চুল! তাঁতাজিল—তাঁতাজিল—দরজা বন্ধ

হতে শুনেছি—হাঁ—তার কোন ভুল নেই—[পাগলের মত দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল]—উঃ···রাক্ষসী—রাক্ষসী··

[দরজার অপর দিক হইতে মৃদু আঘাত শুনা যাইতে লাগিল এবং কিছু পরে লোহার খোপের মধ্য হইতে তাঁতাজিলের স্বরও অতি মৃদুভাবে শুনা যাইতে লাগিল]

তাঁতাজিল—দিদি...দিদি

ইগ্রেন—তাঁতাজিল, তাঁতাজিল, কি, —কি বলছ তুমি ?—

তাঁতাজিল—শীগ্‌গির দরজা খোলো। দরজা খোলো—সে এখানেই রয়েছে···

ইগ্রেন—না, না—কে ?—তাঁতাজিল, ভাইটি আমার—আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ···কি হয়েছে···কি হয়েছে...তাঁতাজিল··· তোমায় তারা মেরেছে...কোথায় তুমি...

তাঁতাজিল—দিদি, দিদি···শীগগির খোলো, না হলে মলুম···

ইগ্রেন—চেষ্টা করছি—একটু সবুর কর, ভাই। আমি খুলবো...দোর খুলে দেব···

তাঁতাজিল—তুমি বুঝতে পাচ্ছ না—দিদি, আর সময় নেই! আমায় ধরবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি মেরেছি—তাকে মেরেছি—মেরে দৌড়ে চলে এসেছি। শীগগির···শীগগির—দরজা খোল···সে আবার আসছে···

ইগ্রেন—না···না···কোথায় সে ?

তাঁতাজিল—কিছু দেখতে পাচ্ছি না—কিন্তু শুনতে পাচ্ছি···আমার ভয় করছে, দিদি, আমার বড় ভয় করছে—শীগগির দরজা খোল—দিদি, দরজা খোল, বলছি। হা ভগবান!

ইগ্রেন—[অন্ধকারে দরজার সামনে হাতড়াইয়া]—নিশ্চয়ই বার করবো। দেরী, একটু দেরী—এক মিনিট—না, এক সেকেণ্ড—

তাঁতাজিল—দিদি, আর পারবো না—ঐ সে এসে পড়ল!

ইগ্রেন—ও, কিছু নয়, ভয় পেয়ো না—যদি একবার দেখতে পাই...

তাঁতাজিল—না, তুমি দেখতে পাবে না। এখান থেকে তোমার আলো দেখতে পাচ্ছি ···দিদি, তোমার ওখানে আলো আছে, এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছি না!

ইগ্রেন—আমায় দেখতে পাচ্ছ...কেমন করে...দরজায় ত কোন ফুটো নেই···

তাঁতাজিল—হাঁ, আছে; কিন্তু ভারী ছোট।

ইগ্রেন—কোন্ দিকে ? এই এখানে—বল, বল···না, ওই ওখানটায় ?

তাঁতাজিল—এই যে এইখানে···শোন, আমি ধাক্কা দিচ্ছি···

ইগ্রেন—এইখানে···

তাঁতাজিল—আর একটু উপরে—কিন্তু খুব ছোট—একটা ছুঁচ্ গল্‌তে পারে না...

ইগ্রেন—ভয় পেয়ো না...এই যে, আমি এখানে···

তাঁতাজিল—হাঁ, আমি জানি...দিদি, টানো, টানো·· ঐ এসেছে সে···যদি একটু খুল্‌তে পারো···একটুখানি...আমার ছোট্ট শরীর···

ইগ্রেন—আমার নখ সব ভেঙ্গে গেছে··· টেনেছি, ধাক্কা দিয়েছি, বেশ জোরে গায়ের সমস্ত শক্তি নিয়ে—[আবার ধাক্কা দিল এবং সেই প্রকাণ্ড দরজাকে নড়াইবার চেষ্টা করিল]—দুটো আঙুল অসাড় হয়ে গেছে, কেঁদো না ..এ যে লোহার...

তাঁতাজিল—[হতাশভাবে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে]—তোমার খোলবার কিছু নেই দিদি, কিছু নেই—একেবারে কিছু নেই··· আমি যেতে পারতুম—এই ত ছোট শরীর দিদি, তুমি ত জান···

ইগ্রেন—কেবল আলোটা আছে···হাঁ, ঐ যে, ঐখানে—[মাটির প্রদীপ দিয়া বারবার আঘাত করায় সেটী নিবিয়া ভাঙ্গিয়া গেল এবং খণ্ডগুলি মাটিতে পড়িল]—যাঃ, এবার সব অন্ধকার—তাঁতাজিল! ...কোথায় তুমি ? শোন, শোন···তুমি ভিতর থেকে কোন রকমে দোরটা খুলতে পার না ?

তাঁতাজিল—না, না, এখানে কিছু নেই—কিছু বুঝতেও পারছি না—আর ত আমি আলো দেখতে পাচ্ছি না···

ইগ্রেন—ব্যাপার কি, তাঁতাজিল ? আর ত তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না—

তাঁতাজিল—দিদি, বড্ড দেরী হয়ে গেছে!

ইগ্রেন—কি হয়েছে, তাঁতাজিল—কোথায় যাচ্ছ ?...

তাঁতাজিল—সে এসেছে—দিদি, দিদি—আমার কাছে এসেছে...

ইগ্রেন—কে ? কে এসেছে ?

তাঁতাজিল—তা জানি না, কে, তাকে দেখতেও পাচ্ছি না...কিন্তু দেরী হয়ে গেছে... সে...আমার গলা টিপে ধরেছে···উঃ, —দিদি, এসো—

ইগ্রেন—যাচ্ছি···যাচ্ছি···

তাঁতাজিল—বড় অন্ধকার...দিদি···

ইগ্রেন—চেষ্টা করো, লড়ো, তাকে একেবারে ছিঁড়ে ফেলো···ভয় পেয়ো না, একটু দেরী করো—এই যে আমি এখানে ···তাঁতাজিল...জবাব দাও—সাড়া দাও... কোথায় তুমি ? তোমার কাছে যাচ্ছি,—দোরের ভিতর দিয়ে—এই যে, এখান দিয়ে···

তাঁতাজিল—[অতি ক্ষীণ স্বরে]—এখানে—এইখানে দিদি—

ইগ্রেন—কোন্ খানে ? কৈ—এই যে, এই আমি—

তাঁতাজিল—[আরও ক্ষীণ স্বরে] আমিও —এখানে—দিদি, দিদি...উঃ!···

[দ্বারের পশ্চাতে দেহ-পতনের শব্দ হইল]

ইগ্রেন—তাঁতাজিল! তাঁতাজিল—কি করছ ? কে আছ ? ফিরিয়ে দাও, তাকে ফিরিয়ে দাও...আমার কাছে ফিরিয়ে দাও··· কিছুই শুনতে পাচ্ছি না···তাকে কি করছো ? মেরো না, ওগো, মেরো না...ও যে খুব ছোট...তোমায় মারবে না...তোমার কোন অনিষ্ট করবে না...আমি হাঁটু গেড়ে বসে আছি—আমার কাছে ফিরিয়ে দাও। দোহাই—আমি ভিক্ষা চাইছি যা বলবে তাই করবো···বুঝতেই পারছো আমার কোন কু-মতলব নেই···হাত জোড় করে আমি বলছি, বিশ্বাস কর...আমি ভুল বলেছিলুম—আর কিছু বলবো না···যা ছিল আমার, সব হারিয়েছি—অন্য কোন সাজা দাও... সাজা যদি দেবেই, অন্য রকমে দাও।

উপায় ত অনেক রয়েছে...এইটুকু ছোট ছেলে,—এ তোমার কিছু করেনি... যা বলেছিলুম, তা সত্যি নয়...আমি জানতুম না.....আমি জানি, তুমি খুব ভাল ...এখন ক্ষমা করবার সময় এসেছে...ও যে বড় ছোট, বড় সুন্দর! অত ছোট... ওকে মেরো না, মেরো না...তোমার গলা জড়িয়ে যখন চুমু খাবে, তখন তাকে মেরো না...তাড়িয়ে দিও না...দাও, ছেড়ে দাও... কি! দেবে না?...এত করে বলছি... একটিবার দাও...একটুখানির জন্যে...এক মুহূর্ত্তের জন্যে...সে খুব ছোট ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে...খুব ছোট ফাঁক দিয়ে পারে... বেশ পারবে...কোন কষ্ট হবে না—(অসহ্য নিস্তব্ধতা)—রাক্ষসী ..রাক্ষসী শুনলি না? ভগবান তোকে মেরে ফেলুন! আমি তোকে শাপ দিচ্ছি.....তুমি মর, মর.....

(দরজার গায়ে দুই হাত ছড়াইয়া দিয়া অন্ধকারে ধীরে ধীরে কাঁদিতে লাগিল এবং মাথা নত হওয়ায় সমস্ত দেহও সেই সঙ্গে নত হইয়া পড়িল)

সমাপ্ত

শ্রীসুবোধ চট্টোপাধ্যায়।

আমার বিরহ

আজো সেই মনে হয় দূর—অতি দূর—
কোথা কোন্ অলকার সুনিভৃত পুর
আমার বিরহ জাগে। বিরহিনী হিয়া
মৃত্তি'পরে নিত্য নব লীলাফুল দিয়া
অন্তিম দিবস গণে মিলনের পারে
ধীর নির্ব্বিকার। ভুলিয়া গিয়েছি তারে;
ভুলে গেছি মৃদু ভীরু গূঢ় পরশন;
মুহূর্ত্তের মৌন-ঘন অনন্ত স্বপন
মুছিয়া গিয়েছে এবে; বাহিরের ডাকে
আঁচল বাধিয়া যাওয়া কণ্টকীর শাখে,
মনে হয় কবেকার মনের বিকার!—
কোথা কার কালো ছিল দুটি আঁখি তার!
কবে কার মুখখানি হাসিয়া হাসিয়া
সুধার ছুরিকা হয়ে গিয়েছে বিঁধিয়া
সদ্যরাঙা রক্তের পিয়াসে! আমি জানি
আমার বিরহ; তারে সত্য বলে মানি;
মানি তারে মরমের পরতে পরতে
অনাদি অনন্ত স্থির স্বাধীন জগতে।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা

(La Mazalierreর ফরাসী হইতে)

হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যেমন আইনগত অবস্থার দরুণ, তেমনি আচার-ব্যবহারের ভিন্নতাপ্রযুক্ত হিন্দুপরিবার-সমূহের মধ্যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। কোথাও পুরাকালের রীতিনীতি, কোথাও অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিবর্ত্তিত সমাজের রীতিনীতি, আবার কোথাওবা য়ুরোপীয়দিগের আচার-ব্যবহার, পোষাকপরিচ্ছদ ও আহারপদ্ধতি।

সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণদিগের গার্হস্থ্যজীবনের একটা চিত্র দিতেছি। কাহারও কাহারও প্রভূত ধনসম্পত্তি, অনেকেরই মধ্য-অবস্থা, বা দৈন্য-অবস্থা। কিন্তু গর্ব্ব সকলেরই সমান, সকলেই কড়াক্কড়ভাবে ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়া-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

সহোদর ভাই, ভাই-পো, ভাগ্‌নে, খুড়তুতো পিসতুতো প্রভৃতি জ্ঞাতি-ভাই একগৃহে একত্র বাস করে, এবং কৌলিক সম্পত্তি সম্ভোগ করে। তাহাদের সঙ্গে থাকে,—গরীব আত্মীয়-কুটুম্ব, আশ্রিত বন্ধুবর্গ, বহু ভৃত্য। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন জাতের চাকর নির্দ্দিষ্ট। (১)

পল্লিগ্রামে, একটা বৃহৎ ঘেরা-জায়গা; বাগান-বাগিচার মধ্যস্থলে পুরুষদের জন্য, স্ত্রীলোকদের জন্য, ভৃত্যদের জন্য, বিশেষ বিশেষ মণ্ডপ। নগরে চৌকোণা উঠান ঘিরিয়া বড়বড় কোঠা উঠিয়াছে; তন্মধ্যে প্রধান কোঠাটি রাস্তার উপর: খিলানের আকারে একটা বৃহৎদ্বার, উপরে প্রত্যেক তলায় এক-একটা বড় জান্‌লা: ইহাই লোক অভ্যর্থনার ঘর; ঘরগুলায় আলো আসিবার জন্য খুব ছোট ছোট গবাক্ষ; এই কোঠা-বাড়ীটা পুরুষদের জন্য রক্ষিত। যে ঘরগুলা খুব ছোট, খুব নীচু, খুব আঁধারে—যাহার নীচে একটা উঠান—সেই ঘরগুলাই অন্তঃ-পুরের ঘর।

প্রত্যেক ধর্ম্মনিষ্ঠ পরিবারের এক-একটি ঠাকুর-ঘর আছে। একটা থালের উপর একটা ছোট ঘণ্টা, বিষ্ণুর নামে উৎসর্গীকৃত একটা শঙ্খ, তর্পণ-জলের জন্য একটা ঘট, এবং পাঁচটি বিগ্রহ প্রস্তর:—সাদা পাথর শিবের বিগ্রহমূর্ত্তি; কালো পাথর বিষ্ণুর, ধাতব প্রস্তর পার্ব্বতীর, স্ফটিক সূর্য্যদেবের, লাল পাথর গণেশের। কোন কোন ব্রাহ্মণ, প্রাচীনকালের প্রথা অনুসারে পুণ্য-অগ্নিও বরাবর জ্বালাইয়া রাখে। (২)

---

(১) ১৮৯১ অব্দের আদমসুমারে, গৃহ-ভৃত্যের সংখ্যা ১০,০০৮, ৩৮৭; তন্মধ্যে গৃহাভ্যন্তরের কাজ করে ২,৪৯২,৫৪৪ জন; বিভিন্ন প্রকারের কাজ করে ১,২৪১,৫২১ জন. বাকীর অধিকাংশই ধোপা ও নাপিত।

(২) বিষ্ণুর শিলা—শালগ্রাম, শিবের শিলা বান-লিঙ্গ।

প্রাতঃস্নান: স্নান। ভস্ম ধারণ। ভস্মের দ্বারা ললাট চিহ্নিত করা: পুণ্ড্র বা তিলক। শিখা বন্ধন। প্রাতঃসন্ধ্যা। আচমন। প্রাণায়াম।

ওঁ শব্দ বস্তুত তিন অক্ষরে গঠিত। হিন্দুদের মতে "অ" ও "উ" যোগ করিয়া "ওঁ" নিষ্পন্ন হয়;

* * *

সনাতনপন্থী হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা।—রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতেই গৃহকর্ত্রী শয্যা হইতে উঠিয়া, দাসী চাকরদিগকে জাগাইয়া গৃহের সমস্ত সুব্যবস্থা করেন। একটু ফর্সা হইবামাত্র, গৃহকর্ত্তা শয্যা হইতে উঠিয়া, একটা দাঁতন-কাঠি দিয়া দাঁত মাজেন (এইটি প্রথম "শুদ্ধির" অনুষ্ঠান)। তারপর নদীর ধারে কিংবা সরোবরের ধারে গমন করেন।

অরুণের প্রথম রশ্মিপাতেই, গঙ্গার তট-দেশে শতসহস্র হিন্দুর সমাগম। তখন কোন স্ত্রীলোক যায় না; কেননা তাহাদের অধিষ্ঠানে স্থান অপবিত্র হইবে। এই হিন্দুদের মধ্যে, গর্ব্বিত-ললাট ব্রাহ্মণগণ ও একান্ত-বাসী নিম্নশ্রেণীর লোক।

কেবল উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করে।

দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণ এই কথা বলে:—"আমার মানসিক, বাচনিক, দৈহিক সমস্ত পাপ ও ত্রুটি ক্ষালন করিবার নিমিত্ত, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সমক্ষে, এই পবিত্র নদীতে আমি অবগাহন করিতেছি।"

তাহার পর উনানের ছাই লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করে এবং কপালে শিবের চিহ্ন-রেখা বা বিষ্ণুর চিহ্ন-রেখা ধারণ করিয়া, চুল মাথার উপর তুলিয়া গ্রন্থিবদ্ধ করে।

এখনো দিগ্বলয় হইতে প্রাথমিক সৌর কিরণ উছলিয়া পড়িতেছে। সূর্য্যদেবের দিকে ফিরিয়া, ব্রাহ্মণ একটু জল লইয়া মুখ শোধন করে, নাসারন্ধ্র ভরিয়া নিঃশ্বাস গ্রহণ করে; পবিত্র শব্দ ওঁ উচ্চারণ করিতে করিতে, মহাভূতদিগের নাম আবৃত্তি করিতে থাকে এবং এই প্রার্থনা-মন্ত্রটি পাঠ করে—(৩)

"সেই জগৎ প্রসবিতা পরমদেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি—যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।"

হঠাৎ সূর্য্যদেবের আবির্ভাব হইল; তাহার আলোকে, বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র, নদীতটের উচ্চ সৈকতভূমি পরিপ্লাবিত হইল, নদীর জলে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ গঙ্গাজলে মাথা ডুবাইলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন:—

"পবিত্র গঙ্গোদক, তুমি আমাদিগকে স্বাস্থ্য দেও, বল দেও, আনন্দ দেও। শুভঙ্কর বৃষ্টিরূপে আকাশ হইতে নিপতিত হও। স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, আমাদিগকে তোমার দিব্য-স্বরূপের অংশী কর। পাপী হইয়াই তোমার নিকট আমরা আসিয়াছি: আমাদিগকে পরিশুদ্ধ কর। দুর্ব্বল হইয়াই আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি, আমাদিগকে সুখী কর, সু-মনা কর। (৪)

"সূর্য্যদেব, ও বিজয়ী রুদ্র দেবতারা, বিলাস-সুখ হইতে, গর্ব্ব হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। রাত্রি আমাকে মানসিক বাচনিক কায়িক পাপে প্রবৃত্ত করিয়াছে। হস্ত দিয়া, পদ দিয়া, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া আমাকে পাপাচরণ করাইয়াছে। রাত্রির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে আমার পাপরাশি যেন তিরোহিত হয়। তোমার অমৃতময় আলোকের দ্বারা পরিশুদ্ধ হইবার জন্য, হে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য, আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি।" (৫)

গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ, বিগ্রহ-শিলাদের নিকট তুলসী ও বিল্বপত্র উৎসর্গ করেন। তাহার পর নিত্য-নিয়মিত বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু আরও দুইবার, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে দেবপূজা করিতে হয়।

মধ্যাহ্নেই মুখ্য ভোজন। কেবল পুরুষেরাই একত্র ভোজন করে। দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহারা দেবতাদের গুণকীর্ত্তন করে, এবং স্বকীয় খাদ্যের প্রথমাংশ তাঁহাদিগকে অর্পন করে; তাহার পর, একটা লম্বা সারি বাঁধিয়া পা-দুমড়াইয়া কুশাসনে উপবেশন করে; মা, বোন্ ও মেয়েরা পরিবেশন করে। খাদ্যের মধ্যে—মিষ্টান্ন, রুটি, লুচি, ভাত ইত্যাদি কলাপাতা বা শালপাতার উপর সাজাইয়া দেওয়া হয়। না-মাছ, না-মাংস, না-কোন মাদক পানীয়। রাত্রে দ্বিতীয়বার ভোজন, কিন্তু মধ্যাহ্নের ন্যায় ভূরি-ভোজন নহে। তাহার পর, পুরুষেরা হুকার ধূমপান করে, স্ত্রীলোকেরা সুপারী প্রভৃতি নানা মশলা দিয়া প্রস্তুত পাণ চর্ব্বণ করে।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা এখনো সেকেলে পরিচ্ছদ পরিধান করে:—শেলাই-না-করা দুখানা সাদা কাপড়; কোমরে জড়ানো একখানা ধুতি, কাঁধের-উপর-দিয়া-ফেলা একখানা উড়ানি। (৬)

উহারা নাচের নিন্দা করে; অনেকেই গানবাজনা ভালবাসে; কিন্তু অল্প লোকেই নিজের স্ত্রীকে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে দেয়। বাড়ীতে ধর্ম্মসংক্রান্ত নাট্যাভিনয় হইয়া থাকে ("যাত্রা" ও "রাস")।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

"অ" ব্রহ্মের স্থানীয়. "উ" বিষ্ণুর স্থানীয় এবং আনুনাসিক শিবের স্থানীয়। বেদের এক মন্ত্র—"গায়ত্রী" বা "সাবিত্রী"।

"মাজ্জন" বেদের X সূক্ত, ১৯০: "অঘমর্ষণ"। সূর্য্যকে "অর্ঘ্য দান"। "করন্যাস"। "মিত্রে,"র প্রতি প্রযুক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা শেষ হয়। (এই সন্ধ্যাপূজা দাঁড়াইয়া করিতে হয়, তাই ইহার নাম "উপস্থান")। "গোত্রোচ্চার" এবং ত্রিমূর্ত্তির উদ্দেশে একটি মন্ত্র।

এই প্রাতঃসন্ধ্যার পর, সনাতনপন্থী হিন্দু আর দুইটি ক্রিয়া সাধন করেন—"ব্রহ্মযজ্ঞ" ও "তর্পণ"। তাহার পর নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া "হোম" করেন। শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি পূজাকে "দেবপূজা" বলে। "হোমশালা"। "মন্দির"। একটা থালায় বিগ্রহ শিলাদি, শঙ্খ, ও ঘণ্টা থাকে। ইহাকে "পঞ্চায়তন" বলে। ঘণ্টা। "পাঞ্চজন্য" শঙ্খ। তর্পণের পাত্র—কলস"; মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রিয়া-কলাপ:—"বৈশ্বদেব" ও "বলিহরণ"। "ভোজন-বিধি"।

এই সকল অনুষ্টান Monier-Williamsএর গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে:—Brahmanism and Hinduism, Chap. X. V.

(৩) ঋগ্‌বেদ।

(৪) ঋগ্‌বেদ।

(৫) তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

(৬) মুসলমান-বিজয়ের পর হইতে, সাধারণের মধ্যে শৈলাই-করা কাপড়ের ব্যবহার প্রচলিত হয়; অনেকেই চাপকান পরে। খুব সনাতনপন্থী যারা তাদের উপরেও য়ুরোপীয় প্রভাব প্রকটিত হইয়াছে দেখা যায়;—কেহ কেহ "লিনেনের" (শন) জামা পরে, মোজা পরে, জুতা পরে, কেহ কেহ গলা পর্য্যন্ত বোতাম-আঁটা কালো কোর্ত্তা পরে।

মোহিনী

ফেরি-ষ্টীমারে অবিনের সঙ্গে অনেক বছরের পর দেখা হতেই সে আমাকে একেবারে একখানা ছবি দেখিয়ে বল্লে—দেখতে পাচ্ছ? তোমার-আমার মতো হলে প্রথম প্রশ্ন হতো—তুমি কে হে? বা তোমাকে তো চিন্‌লেম না! কিন্তু অবিন, সে কোনো-দিনই আমাদের মতো সাধারণ-একটা-কিছু ছিল না, সুতরাং সে আমাকে না চিনলেও, সে যে অবিন এটার প্রমাণ পেতে আমার একটুও দেরী হল না। ছবিটার সবটা দেখলেম অন্ধকার; কেবল নীচে একটা পিতলের ফলকে বড়-বড়-করে লেখা ছিল—'মোহিনী'। আমি সেইটে দেখিয়ে বল্লেম—মোহিনী বুঝি?

অবিন খানিকটা নিশ্বাস ফেলে বল্লে,—পেলে না। তবে শোনো!—বলেই আমাকে টেনে মাঝের বেঞ্চে বসালে। তখন শীতের সকাল; কুয়াশা ঠেলে জাহাজখানা আস্তে আস্তে জল-কেটে চলেছে। অবিন সুরু কল্লে—

কলকাতায় আমাদের বাসা-বাড়িখানা অনেক-দিনের। এখন সেটা আমাদের বসত-বাড়ি হয়েছে বটে, কিন্তু সেকালে কর্ত্তারা সে বাসাটা কেবল গঙ্গাস্নান আর কালীঘাট করবার জন্যেই বানিয়েছিলেন। খুবই পুরোনো এই বাসাবাড়ির ঘরগুলো, ঝাড়-লণ্ঠন কৌচ-কেদারা ওয়াটার-পেন্টিং অয়েল-পেন্টিং বড় বড় আয়না এবং সোনার ঝালর-দেওয়া মখমলের ভারি-ভারি পর্দ্দা দিয়ে যতদূর সম্ভব জাঁকালো এবং মানুষের প্রতিদিন বস বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী করে কর্ত্তা সাজিয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে সেকালে সেই ধূলোয় ভরা, পুরোনো মদের ছোপ ধরা, সাবেকী আতরের গন্ধমাখানো এ সব ফার্‌নিচার তখন কতক বিক্রি করে কতক ঝেড়ে-ঝুড়ে মেরামত করে, আ কতক-বা একেবারে ফেলে দিয়ে বাড়িখানাকে একালের বসবাসের মত করে নিতে হচ্ছিল আমি এখনো যেমন, তখনো অবিবাহিত সেই সময় একদিন এই ছবিটা আমার হাতে পড়ল। খানিকটা কালো অন্ধকারের রং লেপা —কেবলমাত্র দুটি সুন্দর চোখ—তা অনেকক্ষণ ধরে ছবিটার দিকে চেয়ে থাকতে তবে দেখা যেত।

জাহাজ এসে কাশীপুরের জেটিতে লাগল। একদল থার্ড ক্লাস যাত্রী মাড়োয়ারী নেমে গেল, এবং তার চে আরও বড় একদল কলের কুলী, মিস্ত্রী চিনে মিস্ত্রী উঠে এল। অবিন ডেকের এধা থেকে ওধারে একবার পায়চারি করে নি ফিরে এসে বল্লে—

এই ছবিটা রাবিস্ বলে নিশ্চয় বৌবাজারে পুরোনো জিনিষের স চালান যে'তো, কিন্তু যে-ঘরের দেয়া এটা খাটানো ছিল, সেই ঘরটার ইতিহাস বেশ-একটু রকমওয়ারী রকমের ছি বলেই সে ঘরটায় আমি কোনো অদল-ব ঘটতে দিইনি। আমাদের যিনি ছোটক

তাঁরই সেটা বৈঠকখানা। এই ছোটকর্ত্তাই আমাদের সেকালের শেষ-ঐশ্বর্য্যের বাতিগুলো দিনের বেলায় ঝাড়ে-লণ্ঠনে জ্বালিয়ে-জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছেন; এবং নিজের হাতের হীরের আংটির বড়-বড় আঁচড়ে বিলিতি আয়নাগুলোকে সেই সব দিনকে রাত, রাতকে দিন করবার ইতিহাসের সন তারিখ এবং নামের তালিকায় ভরে দিয়ে গেছেন। এই কর্ত্তার বাবুগিরির কীর্ত্তিকলাপের গল্প ছেলে-বেলায় আরব্য-উপন্যাসের মতোই আমার কাছে লাগ্‌তো; এবং বড় হয়ে যখন আমি এই ঘরের চাবি খুল্লুম, তখন গোলাপী আতর-মাখানো পুরোনো কিংখাবের গন্ধ-ভরা একটা অন্ধকারের মধ্যে এই ছবির দুটি কালো চোখ আমার দিকে এমনি একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে চেয়ে রইল যে সে-ঘরটায় কোনো অদল-বদল করতে আমার সাহস হল না। কিন্তু সে ঘরটাকে তালা-বন্ধ করে ফেলে রাখতেও আমার ইচ্ছে ছিল না। বাড়ির মধ্যে সেই ঘরটা সব-চেয়ে আরামের,—একেবারে ফুল-বাগানের ধারেই; দক্ষিণের হাওয়া এবং পূবের আলোর দিকে সম্পূর্ণ খোলা ঘরখানি! আমি সেইখানেই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব নিয়ে খাস-মজলিস—সেকালের মতো নয়, একালের ক্লাব-রুমের ধরণে—গড়ে তুল্লেম। আমরা সেই সাবেক-কালের নাচ-ঘরটায় বসে চা-চুরুটের সঙ্গে পলিটিক্স সোসিওলজি থিওলজি এবং জার্ম্মান ওয়ারের চর্চ্চায় ঘোরতর তর্কযুদ্ধে যখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছি তখন হঠাৎ এক-একদিন এই ছবিখানার দিকে আমার চোখ পড়লেই সেকালের বিলাসিতার সাজসরঞ্জামের মধ্যে, বিলাতী কেতায় আমাদের এই একালের মজলিস এত কুশ্রী বোধ হত—দুই কালের ব্যবধানটা এমন স্পষ্ট হয়ে দেখা দিত যে আমাদের তর্ক আর অধিক দূর অগ্রসর হতো না। আমাদের মনে হত এ ঘরের স্বামী যিনি তাঁর অবর্ত্তমানে অনাহুত আমরা একদল এখানে অনধিকার প্রবেশ করে গোলমাল বাধিয়েছি; এখনি যেন বাবুর খানসামা এসে আমাদের এখান থেকে ঘাড়-ধরে বিদায় করে দেবে। মনের এই সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে ও-ঘরখানার মধ্যে আড্ডা জমিয়ে তোলা অসম্ভব দেখে আমার বন্ধুরা বলতে লাগল—ওহে অবিন্, তোমার ভাই ওই মোহিনীকে এখান থেকে না নড়ালে চলছে না; ওর ওই ভুতুড়ে-রকমের চাহনিটায় আমাদের এখানে স্থির হয়ে থাকতে দেবেনা দেখছি। কিন্তু বন্ধুদের অনুরোধ রক্ষে হল না;—মোহিনী যেখানকার সেইখানেই রইলেন; বন্ধুরা একে-একে সরে পড়তে থাকলেন। এই সময় আমার মনে হতো—একালটা যেন একটা খোলসের মতো আস্তে আস্তে আমার চারিদিক থেকে খসে যাচ্ছে, আর আমার নিজ মূর্ত্তিটা পুরোনো খাপ থেকে ছোরার মতো ক্রমে বেরিয়ে আস্‌ছে। আমার মধ্যে যে সেকালটা ছিল, সে যেন দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠছে,—বুঝছি আমার রক্তের সঙ্গে সেকালের বিলাসিতার গোলাপী আতর এসে মিশ্‌ছে, আমার দুই চোখের কোণে উদ্দাম বাসনার অগ্নিশিখা কাজলের রেখা টেনে দিচ্ছে! এই সময় আমি এক-এক দিন এই ছবিখানার দিকে চেয়ে-চেয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছি। ঐ ছবির অন্ধকার

ঠেলে ওপারে গিয়ে পৌঁছবার জন্য—ঐ কালোর মাঝখানে যে সুন্দর চোখ তারি আলোক-শিখায় নিজেকে পতঙ্গের মতো পুড়িয়ে মারবার জন্যে আমার দেহ-মন আবেগে থর-থর-করে কাঁপতো! আমার মনের এই তিমিরাভিসার বন্ধুরা পাগলামির প্রথম লক্ষণ বলে ধার্য্য করে নিয়ে আমাকে সাবধান কল্লেন, উপহাস কল্লেন, নানাপ্রকার উত্যক্ত করে ভয় দেখিয়ে শেষে আমার ভরসা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র গমন কল্লেন—যেখানে চায়ের এবং চুরুটের আড্ডা ভালো জম্‌তে পারে।

আমি একলা ঘরে; আর আমার মনের শিয়রে অন্ধকারের পর্দ্দার ওপারে 'মোহিনী'! যবনিকা তখনো সরেনি, চাঁদ তখনো ওঠে নি। এ সেই-সব দিনের কথা হৃদয়তন্ত্রীতে যখন মিনতির সুর অন্ধকারে লুটিয়ে পড়ে বিনয় করছে—"এসো এসো দেখা দাও।" একখানা ছবি, তাও আবার প্রায় ষোলো-আনাই ঝাপ্‌সা—সে যে এমন করে মনকে টান্‌তে পারে এটা আমার নিজেরই স্বপ্নের অগোচর ছিল, বন্ধুদের কথাতো দূরে থাক। বল্লে বিশ্বাস করবে না, তখন বসন্তকালে ফুলের গন্ধ যদি আসতো, আমার মনে হতো ঐ ছবিখানার মধ্যে যে আছে তারি যেন মাথাঘষার সুবাস পাচ্ছি! হাফেজ যে সজীব ছবিটি দেখে দেওয়ানা হয়েছিলেন তার চেয়ে পটের অন্দরে লুকিয়েছিল যে 'মোহিনী' সে যে কম জীবন্ত, কম সুন্দরী তাতো আমার মনে হতো না। নীল ঘেরাটোপ-দেওয়া খাঁচার মধ্যেকার সে আমার শ্যামা পাখী!—তার সুর আমি শুন্‌তে পাই, তার দুখানি ডানার বাতাসে নীল আবরণ দুলছে দেখতে পাই। আমার প্রাণের কান্না সে গান দিয়ে সাজিয়ে সুর দিয়ে গেঁথে আমাকেই ফিরে দেয়—কেবল চোখে দেখা আর দুই বাহুর মধ্যে—বুকের মধ্যে এসে ধরা দেওয়ার বাকি!

এতটা বলে অবিন হঠাৎ চুপ কল্লে। তখন আধখানা নদীর উপর থেকে কুয়াশা সরে গিয়ে জলের গায়ে সকালের আকাশ থেকে বেলফুলের মতো সাদা আলো এসে পড়েছে, আর আধখানা নদীর বুকে ভোরের অন্ধকার টল্‌টল্ করছে—এরি মাঝে দুই ডিঙায় দুই জেলে কালোর আলোর বুকে জাল ফেলে চুপ-করে বসে রয়েছে দেখছি। আমাদের জাহাজ থেকে একটা ঢেউ গড়িয়ে গিয়ে ডিঙা দুখানাকে খুব-একটা দোলা দিয়ে চলে গেল। অবিন সুরু কল্লে—

শুনেছিলেম তান্ত্রিক সাধকেরা না-কি মন্ত্রবলে জড়ে জীবনদান, অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলতে পারেন; আমি আমার মোহিনীকে মন্ত্রবলে কাছে—একেবারে আমার চোখের সম্মুখে—টেনে আনবার জন্য এমন-এক সাধকের সন্ধান করছি, সেই সময় আমার এক আর্টিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে কথায় কথায় 'মোহিনী'র ছবিটা যে কেমন-করে আমাকে পেয়ে বসেছে সেই ইতিহাস উঠল। বন্ধু আগাগোড়া ব্যাপারটা আমার মুখে শুনে বল্লেন—তোমার দশা সেই গ্রীসদেশের ভাস্করটার সঙ্গে মিলছে দেখছি! আমি বল্লেম—তার সামনে তো তবু তার 'মোহিনী' প্রাণটুকু ছাড়া আর-সমস্তটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু আমার 'মোহিনী' যে অবগুণ্ঠনের আড়ালেই রহে গেছে হে! এর উপায় কিছু বাৎলাতে পার? বন্ধু আমায় উপায় বাৎলে—বাড়ি গিয়ে এক শিশি আরক আমাকে দিয়ে পাঠালেন। সেকালটা যদিও আমাকে বারো-আনা গ্রাস করেছিল তবু মনের এক-কোণে একালের বিজ্ঞানটার উপরে একটু যে শ্রদ্ধা তা তখনো দূর হয় নি। আমি বন্ধুবরের কথা-মতো ঘড়ি-ধরে হিসাব করে সেই আরকটা সমস্ত 'মোহিনী'র ছবিখানায় ঢেলে দিলেম। সে আরকটার এমন তীব্র গন্ধ যে আমায় যেন মাতালের মতো বিহ্বল করে তুল্লে। তারপর কখন যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছি তা মনে এইটুকু মাত্র জানি যে আরক জ্বালবার পরে 'মোহিনী'র ছবিখানা ধোঁয়ায় ক্রমে ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌ছে আর আমি ভাবছি এইবার মেঘ কাট্‌লো।

একমাস পরে কঠিন রোগশয্যা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আর-একবার এই ছবিখানার দিকে চেয়ে দেখলেম, সেটার উপর থেকে সেই চাহনিটা সরে গেছে কেবল তার নামটা আঁটা রয়েছে—সোনালী ফলকে, বড়-বড় অক্ষরে।

তখন শিবতলার ঘাটে জাহাজ লেগেছে, আমি তাড়াতাড়ি অবিনকে নমস্কার করে নেমে চলেছি, এমন সময় সে সজোরে আমার হাতে এক ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল—ওহে আর্টিষ্ট! মোছেনি হে, ভয় নেই; ছবিখানা পটের গভীর থেকে গভীরতর অংশ গিয়েই আমার অন্তর থেকে অন্তরতম স্থানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমাদের শরীরের যুদ্ধের কথা

আজ ইউরোপে যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার সংবাদ জানিবার জন্য আমরা সকলেই ব্যস্ত; কিন্তু এদিকে আমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে যে কত বড় যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার খবর আমরা একবারেই রাখি না। আমাদের এই যে শরীর—ইহাকে টিকিয়া থাকিবার জন্য রীতিমত যুদ্ধ করিতে হয়; কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হয় সে-সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে, দেহ-সম্বন্ধে দুই-চারিটা কথা বলা প্রয়োজন।

আমাদের দেহ একটা রাজ্যবিশেষ—নিতান্ত ছোটখাট রাজ্য নয়, বিশাল রাজ্য বলিলেই হয়। রাজ্য হইলেই তাহার একটা রাজা ও শাসনকেন্দ্র (Central Government) থাকার দরকার। মস্তিষ্ক ও কশেরুকা-মজ্জা (brain and spinal cord) আমাদের দেহ-রাজ্যের রাজা ও শাসন-কেন্দ্র। কিন্তু সুধু রাজা থাকিলেই রাজ্য চলেনা; রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে, রাজার তাহা জানা আবশ্যক এবং তাঁহার আদেশ রাজ্যের সর্ব্বত্র যাহাতে প্রেরিত হইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা থাকার আবশ্যক। আমাদের দেহরাজ্যে তাহার কোন অভাব নাই। আমাদের

স্নায়ু (nerve) গুলি দ্বারা সে উদ্দেশ্যটি সাধিত হইয়া থাকে। রাজ্যরক্ষার জন্য প্রচুর খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করা প্রয়োজন; আমাদের দেহরাজ্যেও তাহা হইয়া থাকে। যকৃত (liver), পাকাশয় (stomach), অন্ত্র (intestine), ক্লোমযন্ত্র (pancreas) প্রভৃতির সাহায্যে ইহা হইয়া থাকে। আমরা খাদ্য-হিসাবে যে-সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহারা ঠিক সেই অবস্থায় শরীরের কোন কাজে লাগিতে পারে না। পাকাশয়, যকৃত প্রভৃতির পাচক রসে তাহাদের পরিবর্ত্তন হয়; তখন তাহারা কাজে লাগিবার মত হয়।

খাদ্য যেখানে উৎপন্ন হয়, সেখানেই থাকিয়া গেলে, রাজ্যরক্ষা হয় না। খাদ্য-দ্রব্যের যাহাতে রপ্তানি চলে, তাহারও ব্যবস্থা থাকার আবশ্যক। আমাদের হৃৎপিণ্ড (heart) ও রক্তবহানালী (blood-vessel) গুলির সাহায্যে এই খাদ্য দেহের সর্ব্বত্র নীত হইয়া থাকে।

রাজ্যকে স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখিতে গেলে, রীতিমত পয়ঃপ্রণালী ও ময়লা আবর্জ্জনা প্রভৃতি দূর করিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমাদের দেহরাজ্যে ত্বক্, মূত্রযন্ত্র প্রভৃতি থাকায় সেই কার্য্যটি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

রাজ্য যাহাতে শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত না হয়, তাহার জন্য রীতিমত ফৌজ থাকার দরকার; আমাদের দেহরাজ্যেও তাহার অভাব নাই; সে কথা পরে হইবে।

দেহ-রাজ্যটা যে কি, তাহা কতকটা বোঝা গেল। এখন ইহার শত্রু কে, সেই সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলা যাক্।

দেহের শত্রু আর কেহ নয়,—রোগবীজ (disease germs); সাধারণতঃ ইহারা ব্যাক্টেরিয়া (bacteria) বা ব্যাসিলাস্ (bacillus) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গত বৎসর যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের গোলা-গুলিতে যতগুলি ইংরাজের প্রাণনাশ হইয়াছে, এক টিউবার্কিউলার্ ব্যাসিলাস্ (tubercular bacillus) কর্ত্তৃক তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ইংরাজের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে; জর্ম্মান্ শার্পনেল ও বুলেট্ দ্বারা যতগুলি ফরাসী ও রুশিয়ানের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এক বৎসরে টাইফয়েড ব্যাসিলাস্ (typhoid bacillus) দ্বারা তাহার অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের প্রাণনাশ হইয়াছে। অতএব রোগবীজের সঙ্গে আমাদের দেহের এই যুদ্ধ-ব্যাপার উপেক্ষা করিবার বিষয় নয়। ইউরোপের এই মহাসমর আজ না হোক্ কাল, এক একদিন থামিবেই থামিবে। কিন্তু রোগ-বীজের সঙ্গে আমাদের এই যে যুদ্ধ, ইহার বিরাম নাই। প্রত্যেকবার নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে, প্রত্যেক অন্নগ্রাসটির সঙ্গে, প্রত্যেক ঢোক জলের সঙ্গে, রোগবীজ আমাদের দেহে প্রবেশলাভ করিতেছে; তবে যে সব সময় আমাদের রোগ হয় না, তাহার কারণ প্রকৃতি আমাদের দিকে আছে বলিয়া। এই কারণে রোগবীজ আমাদের বড়-একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু যেই আমরা প্রকৃতির সাহায্য হইতে বঞ্চিত হই, অমনি রোগবীজের জয় হয়, তখন আমাদের দেহে রোগ দেখা দেয়।

এই রোগবীজকে আমাদের বিশেষ ভ

দ্বার আবশ্যক। ইহারা বড়ই গোপনচারী —কখন্ কি-ভাবে, কেমন করিয়া দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা জানিবার যো নাই। ইহাদের কোনপ্রকার যুদ্ধ-সজ্জা নাই; ইহারা যখন যুদ্ধযাত্রা করে তখন রণভেরী বাজেনা, কামান দাগার শব্দও হয় না। সুতরাং দেহের রাজা মস্তিষ্ক ইহাদের আক্রমণ ঘূণাক্ষরেও টের পাইতে পারে না। ইহাদের একটা মস্ত বিশেষত্ব এই যে, কাজের হিসাবে, ইহারা নানা-শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের কতকগুলি সুধু ফুস্‌ফুস্‌কেই আক্রমণ করে, কতকগুলি সুধু কণ্ঠনালীকে অক্রমণ করে, কতকগুলি সুধু পেটের মধ্যে অনিষ্ট সাধন করে। যখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, তখন উভয়-পক্ষকে কত সৈন্যসংগ্রহ করিতে হয়, কত গোলাগুলি বারুদ সংগ্রহ করিতে হয়, কিন্তু আমাদের দেহের শত্রু এই রোগবীজদের সে-সব কিছুই করিতে হয় না। তাহাদের দল বাঁধিয়া যুদ্ধ করিতে যাইতে হয় না। কোনরকমে দুই-চারিটা দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই হইল। দেখিতে দেখিতে উহাদের ভিতর হইতে অসংখ্য বীজের সৃষ্টি হইয়া থাকে। একটি মাত্র কলেরা-বীজ দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ২৮,১ ৪,৭৪, ৯৭,১ ৭,১০, ৬৫৬টি বীজাণু সৃষ্টি করিতে পারে। ইহারা এত সূক্ষ্মদেহ যে, খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ না হইলে, ইহাদের দেখিতেই পাওয়া যায় না। পঁচিশ হাজার রোগবীজকে পাশাপাশি করিয়া সাজাইলে, তবে এক ইঞ্চ মাত্র স্থান অধিকার করিতে পারে। দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও, ইহাদের শক্তি কিন্তু সামান্য নহে। ইহারা একরূপ বিষ উৎপন্ন করে, সেই বিষই হইতেছে রোগের আসল কারণ। মানুষে মানুষে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তবুও কতকগুলা নিয়ম মানিয়া চলার আবশ্যক হয়। কিন্তু দেহের এই শত্রুরা কোন নিয়মেরই ধার ধারে না। ইহাদের দয়ামায়া কিছুই নাই। আবালবৃদ্ধবনিতা—ইহারা কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহে না।

আজকালকার যুদ্ধে ড্রেড্‌নট্ এরোপ্লেন (dreadnaught airoplane) প্রভৃতির ব্যবহার হয়। রোগবীজদেরও এ-সকলের অভাব নাই। জলের মধ্যে অন্য কোন পদার্থ থাকিলে, সেগুলি ইহাদের সাব্‌মেরিন্ ও ড্রেড্‌নট্ (submarine and dread-naught) এর কায করে। আর ধূলিকণাদের ইহাদের এরোপ্লেন্ airoplane বলা যাইতে পারে; কেন না ধূলিকণার উপর ভর করিয়া, ইহারা একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন করিতে পারে। ইহাদের মিত্রও যে না আছে এমন নয়। অমিতাচার ও অশুচিতা ইহাদের বিশেষ মিত্র। অমিতাচার ও অশুচিতা যেমন শত্রুপক্ষের মিত্র, মিতাচার ও শুচিতা আবার তেমনি দেহের পক্ষে মিত্র। মিতাচার বলিলে, সুধু পানাহার বিষয়ে মিতাচার বুঝিলে হইবে না। নিদ্রা, শারীরিক ও মানসিক শ্রম এবং শৈত্যাতপ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। আমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমশক্তির এবং শৈত্যাতপ সহ্য করিবার ক্ষমতার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। এই সীমা অতিক্রম করিতে গেলেই অমিতাচার হইয়া উঠে। স্বাভাবিক অবস্থায়,

সীমা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিলেই, আমাদের কষ্ট হয় এবং আমরা সতর্ক হই। কিন্তু যাহারা মাদকদ্রব্য সেবন করে, তাহাদের বেলায় তাহা হইতে পারে না। নেশার বশে মানুষ নিজের অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারে না। সে যখন বাস্তবিক দুর্ব্বল, সে সময় হয়ত নিজেকে সবল মনে করে; যখন তাহার ক্ষুধা নাই, তখন হয়ত নিজেকে ক্ষুধার্ত্ত মনে করে; যখন তাহার বিশ্রামের একান্ত দরকার, সে সময় হয়ত নিজেকে একটুকুও পরিশ্রান্ত মনে করে না; সে হয়ত অন্যায়ভাবে শরীরে ঠাণ্ডা বা গরম লাগায়, তাহাতে যে তাহার অনিষ্ট হইতেছে, সেটা মোটেই বুঝিতে পারে না। অতএব যাহারা মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে, তাহাদের পক্ষে, অমিতাচার একান্ত স্বাভাবিক বলিলেই হয়। এই জন্যই নেশাখোর লোকদের যত সহজে সংক্রামক রোগ হয়, এমন অন্য কাহারও নয়।

এইবার আমরা রোগবীজদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের দেহের যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহারই উল্লেখ করিব। দেহরাজ্যের সেনাবিভাগের কাজটিও নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নয়। সকলেই জানেন রক্তের মধ্যে দু-রকম দানা (corpuscless) থাকে; লোহিত কণিকা (red corpuscles) ও শ্বেতকণিকা (white corpuscles); এই শ্বেতকণিকাগুলিকে লিউকোসাইট্‌স্ (leueocytes) নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। লিউকোসাইট্‌স্ বা শ্বেতকণিকাগুলিই হইতেছে দেহরাজ্যের সৈন্যফৌজ। যখনই আমাদের দেহের মধ্যে বাহির হইতে কোন শত্রু প্রবেশ করে, অমনি শ্বেতকণিকা তাহার দিকে ধাবিত হয় এবং শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই যুদ্ধে শ্বেতকণিকার যদি জয় হয়, তাহা হইলে, দেহ রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়; আর যদি শ্বেতকণিকার পরাজয় ঘটে, তাহা হইলে, রোগ দেখা দেয়। একটা দৃষ্টান্ত দিলে, কথাটা স্পষ্ট হওয়ার সম্ভব। বিষফোড়ার সঙ্গে সকলের পরিচয় আছে। জীবনে কখনও বিষফোড়া হয় নাই, এমন লোক অতি বিরল। এই বিষফোড়া কিন্তু একপ্রকার বীজাণুর কাজ ভিন্ন আর কিছুই নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের শরীরটি চামড়ার দ্বারা উত্তমরূপে সংরক্ষিত। এই অবস্থায় বীজাণু চামড়ার ভিতর দিয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু কোন কারণে যদি চামড়ার কোন স্থান ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে, সেই স্থানটি দিয়া, রোগবীজাণু অনায়াসে দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। বিষ-ফোড়াটি যে স্থানটিতে হয়, সেখানকার চামড়া একটু-না-একটু যে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, ইহা একবারে ধ্রুব কথা। এই স্থান দিয়া জীবাণুরা ভিতরে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানটির অনিষ্ট করিতে থাকে। সংবাদটা দেহের রাজা যে মস্তিষ্ক, তাহার কানে পৌঁছিল। মস্তিষ্কও অমনি শ্বেতকণিকা সেনাদলকে সেইস্থানে যাইতে আদেশ করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্বেতকণিকারা থাকে রক্তের মধ্যে; তাহাদের যুদ্ধ-স্থানটিতে যাইতে হইলে, রক্তের সাহায্যেই যাইতে

হয়। এইজন্য স্থানটিতে অধিক রক্ত যায়। অধিক রক্ত যায় বলিয়াই স্থানটি অমন রাঙা দেখায় এবং গরম ও স্ফীত হয়। কিছু কাল পরে, স্থানটি আর তেমন রাঙা দেখায় না, কেন না পূর্ব্বের মত আর সেখানে বেশি রক্ত যাওয়ার আবশ্যক হয় না। শ্বেতকণিকা-সৈন্যদল বাহির হইয়া, শত্রুকে এমনি করিয়া ঘিরিয়া ফেলে, যে, শত্রুর আর অগ্রসর হইবার যো থাকে না। ইহার পর প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শ্বেতকণিকারা যদি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল থাকে, তাহা হইলে, তাহারা শত্রুকে অনায়াসে পরাজিত করে এবং এই পরাজিত শত্রু শেষে পুজের সহিত বাহির হইয়া যায়। কিন্তু যদি এমন হয় যে শ্বেত-কণিকারা এইস্থলে শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হইল, তখন শত্রুপক্ষের ক্রমিক অগ্রসর নিবারিত করিবার কি কোন উপায় নাই? অবশ্য আছে। আমাদের শরীরে স্থানে স্থানে কতকগুলি করিয়া লীম্ফ্যাটিক্ গ্ল্যাণ্ড (lymphatic gland) আছে। এ-গুলিকে একহিসাবে দুর্গ বলিলে, কিছু অন্যায় হয় না। শ্বেতকণিকা ও রোগবীজের যুদ্ধে শ্বেতকণিকার পরাজয় ঘটিলে, রোগবীজ কিছুদূর অগ্রসর হইতে-না-হইতে এই সকল দুর্গে আসিয়া বাধা প্রাপ্ত হয়। এখানকার শ্বেতকণিকাদের সঙ্গে তাহাদের বিষম যুদ্ধ হয়। অমিতাচার বশতঃ কিম্বা অন্য কোন কারণে শ্বেতকণিকারা যদি নিতান্ত অপটু না হইয়া পড়ে, তাহা হইলে, এই যুদ্ধে তাহাদেরই জয় হয়, অন্যথা শত্রুপক্ষের জয় হয়। তখন রোগের বীজ সমস্ত দেহময় ছড়াইয়া পড়ে এবং রক্তকে দূষিত করিয়া ফেলে। এই অবস্থারই নামান্তর সেপ্‌টিসেমিয়া (septicaemia) নামক ভীষণ রোগ। শত্রুপক্ষ যে সময় লীম্ফ্যাটিক্ গ্ল্যাণ্ড (lymphatic gland)-এ পৌঁছায় সে সময় লীম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ড স্ফীত হয়, সেখানে বেশি রক্ত যায়, একটু বেদনাও অনুভূত হয়। সকলেই জানেন, হাতের কোন স্থানে ক্ষত থাকিলে, অনেক সময় বগলে ব্যথা হয় এবং সেখানে বীচির মত কতকগুলা কি যেন হাতে ঠেকে। এই বীচির মত জিনিসগুলাই হইতেছে স্ফীত লীম্ফ্যাটিক্ গ্ল্যাণ্ড্‌স্ (lymphatic glands)।

এইবার আমরা শ্বেতকণিকা সৈন্যশ্রেণীর জন্মস্থান কোথায়, সেই বিষয়ে উল্লেখ করিব। প্রধানতঃ ইহারা প্লীহার মধ্যে জন্মায়; এ-ছাড়া কিয়ৎপরিমাণে অস্থি-মজ্জা (bone-marrow) লীম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ডের মধ্যেও জন্মাইয়া থাকে।

দেহ যে সুধু শ্বেতকণিকার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে, তাহা নহে; শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য ইহা আরও অনেক কৌশল ও উপায় অবলম্বন করে, সে সকলের উল্লেখ করিবার এখানে আবশ্যক নাই। তবে এই প্রসঙ্গে যদি য়্যান্টিটক্‌সিন্ (anti-toxin)-এর কথা না বলি, তাহা হইলে, এই যুদ্ধ-কাহিনীটি নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, রোগবীজ বা ব্যাসিলাসের অস্ত্র হইতেছে টক্‌সিন্ (toxin) নামে এক প্রকার বিষ। এই বিষ রোগবীজের শরীরের মধ্যে জন্মায়। এই বিষই রোগের

লক্ষণ সকল উৎপন্ন করিয়া থাকে। রোগবীজ যে সময় টক্‌সিন্ (toxin) উৎপন্ন করে, সেই সময় আমাদের শরীরও তাহার প্রতিষেধক একপ্রকার পদার্থ সৃষ্টি করে; পণ্ডিতেরা তাহাকে য়্যাণ্টিটক্‌সিন্ (anti-toxin) নাম দিয়াছেন। এই য়্যাণ্টিটক্‌সিন (anti-toxin) টক্‌সিন্ (toxin)-কে নষ্ট করিয়া ফেলে; কাজেই দেহ রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

কাশ্মীরী বাগ্

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর ছিল মোগল বাদশাহদের ভারী পছন্দ-সই দেশ—গ্রীষ্মকালটা তাঁহারা কাশ্মীরেই কাটাইয়া দিতেন। চারিধারে উঁচু পাহাড়—স্থানও ছিল দুর্গম—কাজেই যে সকল আমীর-ওমরাহ বাদশাহদের বিশেষ প্রীতির পাত্র, তাঁহারাই শুধু কাশ্মীরে পদার্পণ করিবার সুযোগ লাভ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেককে আবার কাশ্মীরের নীচে উপত্যকা-প্রদেশে আস্তানা পাতিয়া থাকিতে হইত—বাদশাহ, বেগম ও যে দুই-চারিজন অমাত্য কাশ্মীরে থাকিতেন, তাঁহাদের রসদ জোগানো এবং সর্ব্বপ্রকার সুশৃঙ্খল বন্দোবস্তের ভার থাকিত এই সকল অমাত্যের উপর।

ভারতবর্ষ হইতে তখন কাশ্মীরে যাইবার তিনটি পথ ছিল;—কিষণগঙ্গা ও ঝিলামের ধার দিয়া যে পথ, সেইটিই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সুগম। এই পথেরই একপ্রান্তে হাসান আবুলে অর্থাৎ ঠিক উপত্যকা-ভূমির সীমান্ত প্রদেশে—মোগল-আমলের প্রসিদ্ধ উদ্যান 'ওয়া বাগ' এখনও বর্ত্তমান আছে। এই 'ওয়া বাগে' বাদশাহী তাঁবু পড়িত।

এই হাসান আবুল জায়গাটিতে সকল ধর্ম্মের সম্মিলন ঘটিয়াছে—এটিকে ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মিলন-তীর্থ বলিলেও চলে। এ স্থানের অসংখ্য ঝরণার সহিত হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও শিখের বহু পুণ্য-কাহিনীর স্মৃতি জড়িত আছে। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিউয়েনসাং তক্ষশীলা হইতে এখানকার ঝরণা দেখিতে আসিয়াছিলেন।

'ওয়া-বাগের' নাম-করণের ইতিহাসেও বেশ একটু কৌতুক আছে। এ উদ্যানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হৃদয়ে আকবর না কি বলিয়াছিলেন, "ওয়া বাগ!" (বাঃ, কি সুন্দর বাগান!) তাহা হইতেই উদ্যানের নাম হয়, "ওয়া বাগ!" কিন্তু আকবর নাম দিলেও উদ্যানটিকে শোভায় সৌন্দর্য্যে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, জাঁহাগীর বাদশাহ।

শ্রীনগরের পথে উলার হ্রদ পার হইলেই কয়টি উদ্যান চোখে পড়ে—মানস হ্রদের পশ্চিমে গিলগিটের পথে মোগল আমলের অসংখ্য উদ্যানের ধ্বংশাবশেষ পড়িয়া আছে। এগুলির মধ্যে দরগা বাগ সমধিক প্রসিদ্ধ। দরগা বাগ

সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের আদেশে রচিত হয়—এখন লোকে আদর করিয়া এ উদ্যানের নাম রাখিয়াছে, "লালা রুকের বাগান" (Lalla Rookh's garden)। মানস হ্রদের তীরে জন-সমাগম এখন বড়-একটা না হইলেও এ স্থানের দৃশ্য অতি রমণীয়; প্রকৃতি যেন অপরূপ বেশভূষায় মোহিনী মূর্ত্তিতে সাজিয়া বসিয়া আছে!

মোগল বাদশাহদের মধ্যে আকবরই প্রথম কাশ্মীরে পদার্পণ করেন। শ্রীনগরে তাঁহার আদেশে নির্ম্মিত দুর্গ হরি-পাবাৎ (সবুজ পর্ব্বত) এবং দল হ্রদের তীরে রচিত অপূর্ব্ব উদ্যান নিশিম বাগ আজও বর্ত্তমান আছে। প্রাচীরাদির সে পূর্ব্ব গৌরব লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু চেনার কুঞ্জের অপূর্ব্ব শোভা আজও তিরোহিত হয় নাই। কাশ্মীরে চেনারের চাষ এই উদ্যান-রচনা-কল্পেই প্রথম সুরু হয়। আকার ও সৌন্দর্য্যের জন্যই চেনারের আদর। ঘন ছায়া বিস্তার করিতে এমন গাছ আর নাই বলিলেও চলে। কাশ্মীরের পথে মাঝে মাঝে চেনার গাছ আজও অজস্র দেখা যায়। পথে এ গাছ লাগাইবার কারণ, পত্রাবলীর দীর্ঘ-ঘন ছায়ায় শ্রান্ত পথিকের জন্য রৌদ্রাতপ-নিবারী চমৎকার বিরাম-কুঞ্জ রচিত হইত; এবং এই ছায়া-দানের জন্যই কাশ্মীরে এ গাছ 'রাজগাছ' নামে অভিহিত হইয়াছে—এবং এ গাছ কাটিতে হইলে এখনও রাজ-দরবার হইতে আদেশ সংগ্রহ করিতে হয়।

নিশিম বাগে জলের মধ্য হইতে সৌধ উঠিয়াছে—দেওয়ালগুলি শ্যাম শৈবাল-দলে আচ্ছন্ন—চারিধারে তুষার-মণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ—ও বুকে অজস্র ফুলে ভরা তরু-কুঞ্জ—সে এক অপূর্ব্ব ছবি!

নিশিম বাগ ও দুর্গের মধ্যে আর একটি রমণীয় উদ্যান আছে, নাজিন বাগ—সেটি আকারে ছোট। তাহার পর দল হ্রদের আর এক প্রান্তে সুবিখ্যাত শালিমার বাগ। এই শালিমার বাগ চিরকাল রাজ-আদর লাভ করিয়া আসিয়াছে। এখনও কাশ্মীর-ভূপতি শালিমার বাগকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন; কাজেই মোগল আমলের এই প্রাচীন উদ্যানটির শোভা-সৌন্দর্য্য এখনও অটুট আছে।

কাশ্মীর-নৃপতি দ্বিতীয় প্রবর সেন (৭৯—১৩৯ খৃঃঅব্দ) শ্রীনগর সহর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দল হ্রদের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি বাগান-বাড়ী তৈয়ার করান, তাহার নাম রাখেন, শালিমার (অর্থাৎ প্রেম-কুঞ্জ)। এই উদ্যানের কিছু দূরে হারোয়ানে সুকর্ম্মা স্বামী নামে এক সাধু থাকিতেন—রাজা প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। সেই সময় এই শালিমার বাগ ছিল, রাজার বিশ্রাম-স্থল। ক্রমে কালের প্রভাবে সে উদ্যানের দশা শোচনীয় হইয়া উঠে—কিন্তু উদ্যানের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান শালিমার নামেই অভিহিত হইতে থাকে। পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে সেই জীর্ণ কঙ্কালের উপর নূতন বাগানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

সেকালের উদ্যান-সজ্জায় জলটুঙ্গিই ছিল, প্রধান আভরণ। মিশরের প্রাচীন উদ্যানাদিতে এখনও বিস্তর জলটুঙ্গির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। বাগানের বুক চিরিয়া

যে দীর্ঘ পথ থাকিত,তাহার দুই ধারে জাফ্‌রির কাজ-করা বেড়া ঘেরিয়া লতায়-পাতায় থোলো থোলো আঙুর ঝুলিত, পথের মাঝে মাঝে বহু-স্তম্ভ-বিশিষ্ট মন্দিরাকৃতি বিরাম-কুঞ্জ থাকিত—বাগানের শোভা অপরূপ হইত! দিল্লীর রোশিনারা বাগে আজও জলটুঙ্গি এবং এইরূপ বিরাম-কুঞ্জের ধ্বংশ-স্তূপ পড়িয়া আছে।

পাশ্চাত্য রুচির সংস্পর্শে এ-সকল ছায়া-শ্যামল পথ ও জলটুঙ্গি আজ কাশ্মীরী বাগ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। দুই-একটা বিক্ষিপ্ত উদ্যানে দ্রাক্ষা-কুঞ্জ আজও দেখা যায়, কিন্তু বাগানের অনেকখানি সে প্রাচীন সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে।

দল হ্রদের তীরে আর একটি রমণীয় উদ্যান আছে—নিশৎ বাগ; সম্রাজ্ঞী নূর-জাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁ এ উদ্যান রচনা করান। এই নিশৎ বাগের পাশে অপর মোগল উদ্যানগুলিকে শোভায় সৌন্দর্য্যে নিতান্তই ম্লান দেখায়। এ উদ্যানে বারোটি থাক্ আছে—সবগুলি সমতল, আয়তনে দীর্ঘ অর্থাৎ যেন বারোটি সিঁড়ির ধাপ উঠিয়াছে—শেষ ধাপটি একেবারে পাহাড়ের কোলে গিয়া মিশিয়াছে,—দেখিলে মনে হয় যেন রঙ্গপীঠ—এই সকল ধাপের বুক চিরিয়া স্রোতস্বিনী তর-তর ধারে বহিয়া চলিয়াছে—তাহার মাঝে মাঝে প্রস্রবণে জলের অবিরাম নৃত্য-লীলা—স্রোতস্বিনীর উভয় তীরে লতা-পাতার বিচিত্র বাহার, নানা রঙের ফুলের মেলা—সমস্ত উদ্যানটিতে যেন আনন্দের কলহাসি মূর্ত্তি ধরিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে!

১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাজাহান কাশ্মীরে আসিয়া নিশৎ বাগ দেখিয়া এতখানি মু হন যে, তিনি বলেন, একজন প্রজার প এমন বাগানের মালিক থাকা ভাল দেখায় —তা সে প্রজা, হৌন্ না কেন, তাঁহার উজী ও শ্বশুর! আসফ খাঁ ছিলেন সম্রাটের শ্বশুর আসফ খাঁর কাছে সম্রাট এই বাগানের অজস্র সুখ্যাতি করিলেন, কিন্তু মু ফুটিয়া বাগানটি চাহিতে পারিলেন না উজীর আসফ খাঁও অল্প চতুর ছিলেন না সম্রাটের ইচ্ছা বুঝিয়াও তিনি সম্রাট জামাতাকে তাঁহার সাধের বাগানটি দান করিতে পারিলেন না। উভয় পক্ষের মৌনতার ফলে নিশৎ বাগ আসফ খাঁরই সম্পত্তি রহিয় গেল— রুষ্ট সম্রাট কিন্তু আর এক দিক দিয়া মনের ঝাল মিটাইলেন। শালিমার বাগ শ্রীনগরের মধ্যে একটি নদী ছিল, তাহা হইতে একটি কৃত্রিম ধারা বহিয়া রাজোদ্যানে ও নিশৎবাগে জল আসিত— সম্রাট সাজাহান রাজোদ্যানের সীমানায় সেই ধারা বাঁধ দিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন; ফলে নিশৎ বাগে জলস্রোত রুদ্ধ হইল এবং তাহার অনেকখানি সৌন্দর্য্যও সেই সঙ্গে অচিরে ম্লানিমায় ঢাকিয়া গেল।

দীর্ণ শুষ্ক খাতে জল নাই, জলের অভাবে বাগানের দশা শোচনীয়—এ দৃশ্যে আসফ খাঁ একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন! গ্রীষ্মের এক অপরাহ্ণে জল-হীন শুষ্ক খাতের তীরে এক কুঞ্জে আসফ খাঁ কাতর চিত্তে শুইয়া ছিলেন —ক্ষোভে ও নৈরাশ্যে বুক ভরিয়া গিয়াছিল— তিনি একবার ভাবিতেছিলেন, বাগান ত মজিতে বসিয়াছে, সম্রাটকে দিয়া ফেলি— পরক্ষণেই আবার ভাবিলেন, না, এ বড়



নদীতীরের বাগান

াধের বাগান,—এ বাগান কাহাকেও দেওয়া
ায় না। এমনই নানা কথা ভাবিতে
াবিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ
দ্রার পর হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া
গেল। জাগিয়া দেখেন, কি আশ্চর্য্য!
কি স্বপ্ন! ঐ যে শুষ্ক খাত আবার
লে ভরিয়া গিয়াছে, ফোয়ারায়
াবার জলের সেই অপরূপ ফেনিল নৃত্য-
লা ফুটিয়া উঠিয়াছে! আসফ খাঁ সবিস্ময়ে
ারণ-সন্ধানে উদ্যত হইয়া দেখিলেন,
হারই প্রিয় ভৃত্য প্রভুর এই কাতরতা
খিয়া নিজের জানের মায়া ত্যাগ করিয়া
লিমার-প্রান্তে বাদশাহের হুকুমে বাঁধা
ধ কাটিয়া দিয়াছে এবং মুক্তি পাইয়া
বাধ জলরাশি আকুল উল্লাসে নিশৎ
াগে ছুটিয়া আসিয়াছে! আসফ খাঁ সভয়ে
াবার সে ধারা বন্ধ করাইলেন—কিন্তু
য়াটের দরবারে এ বেয়াদবির খবর
াঁছিতে বিলম্ব ঘটিল না। তখনই দরবারে
নফর আসফ খাঁর তলব পড়িল। গম্ভীর
রে সম্রাট কহিলেন, "এ বাঁধ কাটিল কে?"

শঙ্কিত চিত্তে কম্পিত স্বরে ভৃত্য কহিল
"আমি—"

"এ স্পর্দ্ধা তোমার কেন হইল? জানের
ায়া নাই?"

"জলের অভাবে অমন বাগান মরিয়া
য়—মনিবেরও প্রাণ যায়,—তাই জানের
ায়া ত্যাগ করিয়াছি, সম্রাট!"

"বটে—!" সম্রাটের কঠোর স্বরে দরবারে
কলের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল—না জানি,
কি কঠোর শাস্তির আদেশ হইবে! কিন্তু
াহা হইল না—সম্রাট সাজাহান সহাস্যে
কহিলেন, "ঠিক করিয়াছ। অমন বাগান নষ্ট করিতে নাই! তোমার দুঃসাহসের পুরস্কার দিব।" সম্রাট সেই ভৃত্যকে তখনই রাজ-উপহারে ভূষিত ও উপাধি-দানে সম্মানিত করিলেন; এবং তাহার মনিবকে শালিমারের স্রোতস্বিনী হইতে নিশতে জল লইবার সনদ দান করিলেন।

* * *

কাশ্মীরীদের বাগানের সখ এখনও পূরা মাত্রায় বর্ত্তমান আছে। কাশ্মীরে বৎসরে তিনবার পুষ্পোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসে যখন কুমুদ, গোলাপ অজস্র ফুটিয়া উঠে– সেই সময়ই হইল, পুষ্পোৎসবের প্রশস্ত কাল। পুষ্পিত গুল্মে (narcissus ও tulip) যখন সমগ্র কাশ্মীর রঙিন্ হইয়া উঠে তখনও এই পুষ্পোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দলে দলে তখন কাশ্মীরী নর-নারী এই সকল উদ্যানে সমবেত হয়—নৃত্য-গীতের বিপুল সমারোহের মধ্যে সকলে বাগানে বসিয়া ফুলের মধু অসীম উল্লাসে পান করিয়া থাকে। এই উৎসব-উপলক্ষে শালিমার বাগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জন-সমাগম হয়। বিচিত্র সজ্জায় সাজিয়া দেশের যত নরনারী শালিমারে আসিয়া আত্মীয়-পরিজন সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া আমোদ-আহ্লাদ করে। ছাত্রেরাও পুষ্পোৎসবের সময় ছুটি পায় এবং পর্দ্দানশীন মহিলারাও সে সময় আব্রু কাটাইয়া পর্দ্দার বাহিরে আসিয়া ফুলের সভায় ফুলের মেলায় ফুলের মত সুন্দর মুখের কোমল হাসি ফুটাইয়া তোলেন।

দল হ্রদের তীরে আর একটি উদ্যান আছে, চশ্‌ম্ শাহী বাগ—আকারে ছোট

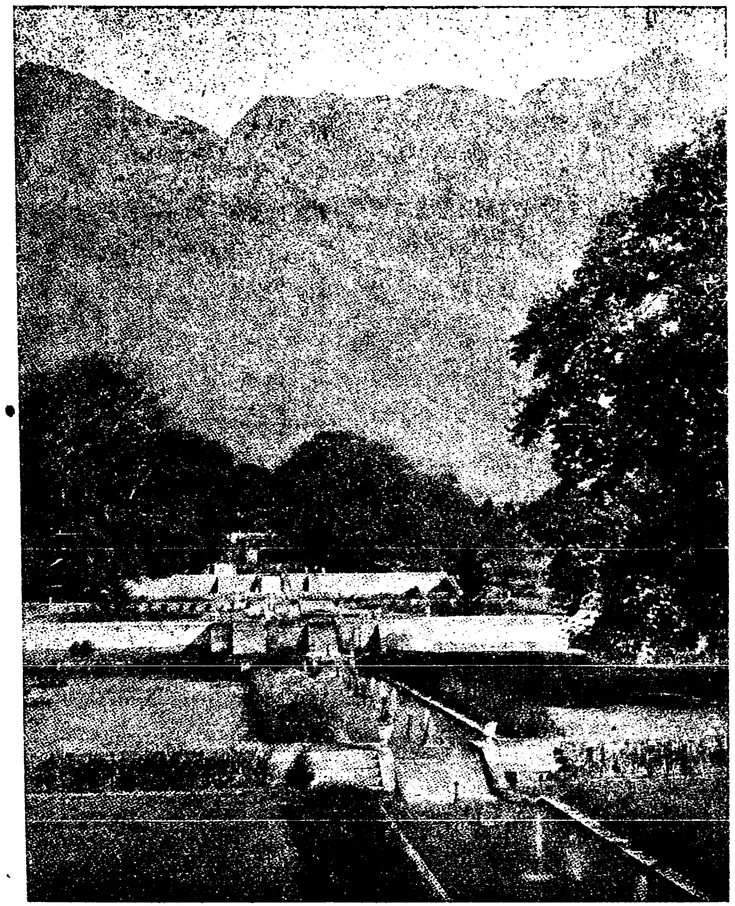

নিশৎ বাগ

হলেও সৌন্দর্য্যে অপরূপ রমণীয়। এ বাগানটিও মোগল আমলের।

এই কাশ্মীরী বাগানগুলির সম্বন্ধে একটি কথা প্রচলিত আছে,—"সকালবেলা নিশৎ বাগের শ্যামল সৌন্দর্য্যে গা ঢালিয়া, সন্ধ্যাটুকু শালিমের স্নিগ্ধ অনিলে ভাসিয়া ও দীর্ঘ দিনটুকু শালিমারে গড়াইয়া কাটিয়া যাক্, ওগো, এমন সুখ কাশ্মীরে আর কোথাও মিলিবে না!" যাঁহারা এ উদ্যানগুলি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এ কথার যাথার্থ্য তাঁহারা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিবেন। *

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

চোর

সুনীতিকে বাঁচাতেই হবে! আমার এ আলিঙ্গনের ভিতর থেকে, আমাকে কাঙ্গাল করে সে যেতে পারবে না,—পারবে না!

এতদিন আমার সঙ্গে থেকে মুখ-বুঁজে সে যে সংসারের শত জ্বালা পুইয়ে এসেছে! দারিদ্র্যে, হতাশায় আমি যখন চারিদিক অন্ধকার দেখিছি, দুঃখের সাগরে সুখের দ্বীপের মত সে তখন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তার মধুর হাসির আলোয় আমার মনের সকল কালো ঘুচিয়ে দিয়েছে, তার স্নেহে-যত্নে-প্রেমে আমার মৃতদেহে নূতন জীবনের সঞ্চার করেছে! সে যদি না থাকত, তাহলে এতদিনে আমি যে আশাহত হয়ে আত্মহত্যা করতুম!… …

এতকাল পরে আজ সবে যেই সুখের আভাস পেয়েছি, আর অমনি অদৃষ্টের এ কী বিড়ম্বনা! আমার দুঃখে যে নিজের বুক পেতে দিয়েছে, বিধাতা কি তাকে আমার সুখে একটু হাসবার অবকাশও দেবেন না? কাঁদতে-কাঁদতেই সে কি চিরবিদায় নিয়ে যাবে? আর, অসহায় আমি—বুকে পাথর বেঁধে হাত-গুটিয়ে বসে বসে অম্লানবদনে তাই দেখব? না, সে হবে না—হোতে পারে না!… …

কিন্তু, কি করব? সুনীতিকে বাঁচাতে হোলে ভাল ডাক্তার চাই—ডাক্তার ডাকতে হোলে টাকা চাই! টাকা কে দেবে? দেনার দায়ে মাথা বিকিয়ে যেতে বসেছে, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অর্দ্ধাহারে অনাহারে কোন-রকমে দিন কাটছে, অর্থাভাবে বেঁচে থেকেও রোজ মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করছি—আমার পানে মুখ তুলে তাকায় এমন দরদী ত কেউ কোথাও নাই! আমাকে বিশ্বাস করে আর কেউ টাকা দিতে চায় না—ভিখারীর মত সারাদিন দোরে-দোরে হাত পেতে ঘুরে মরেছি, কিন্তু আমাকে কেউ ত একটি টাকাও ধার দিলে না!

জ্বরের ঘোরে সুনীতি অজ্ঞান হয়ে গেছে, চিকিৎসার অভাবে তার অবস্থা ক্রমেই সঙ্গিন হয়ে উঠছে; এই হাড়ভাঙ্গা

* ইংরাজি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

শীতে একখানা শতছিন্ন পাতলা র‍্যাপার গায়ে দিয়ে, অজ্ঞান অবস্থাতেও তার দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। স্বামী হয়ে এ নিদারুণ দৃশ্য আর যে প্রাণ ধরে দেখতে পারছি না —এ যে অসহ্য!

পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম, গণ্ডাকতক পয়সা আর আমার দরখাস্তের উত্তরের চিঠিখানা রয়েছে। চিঠিখানা বের করে আর-একবার পড়লুম। কত কষ্ট, কত নিরাশার পর বিদেশের এক আফিসে আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। সাহেব লিখেছেন, আর সপ্তাহদুয়েকের মধ্যে কর্ম্মস্থলে গিয়ে আমার হাজির হওয়া চাই।

এ সুখবরে আমার চেয়ে যে বেশী আনন্দিত হোত, সেই সুনীতি আজ যেতে বসেছে! এতদিন যা চাচ্ছিলুম আজ তা পেয়েছি—কিন্তু সুনীতি যদি জন্মের মত ফাঁকি দিয়ে পালায়, তবে কার মুখ চেয়ে আমি আর পরের চাকরী স্বীকার করব?

আস্তে-আস্তে সুনীতির শিয়রে গিয়ে দাঁড়ালুম। তার কোটরগত চোখদুটি মোদা,—ঠোঁটদুখানি ঘন-ঘন কাঁপছে। প্রদীপের ম্লান আলোয় তার রোগশীর্ণ মুখখানি কি ভয়ানক ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে! তার কপালে হাত দিয়ে হাত যেন পুড়ে গেল,—মনে হোল জ্বরের তাপে এরি মধ্যে তার প্রাণ যেন দগ্ধে অসাড় হয়ে গেছে! অসহ উদ্বেগে আমার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করতে লাগল।

কি করি—কি করি! সুনীতির জীবন যে পলে-পলে ক্ষীণ হয়ে আসছে—কি-করে তাকে রক্ষা করব?... ...

সেইখানে বসে-বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলুম। সে যে কি তীব্র ভাবনা, আমার অন্তর্যামীই জানেন!..... ভাবনার সে অকূল-পাথারে যখন কোন দিকেই সুরাহা দেখতে না পেয়ে, আমার মন ক্রমেই নেতিয়ে পড়তে লাগল, তখন কে-যেন হঠাৎ চুপিচুপি আমার কাণে-কাণে বললে, 'তুমি চুরি কর!'... ...

চুরি?.....হ্যাঁ, চুরি! তা-ছাড়া আর উপায় কি? পৃথিবীতে কত লোক অর্থ লোভে কত মহাপাপ কত নরহত্যা করছে, আর আমি একজনের জীবনরক্ষার জন্যে একটি দিনের তরে যদি চুরি করি, তাতে দোষ কি?... ...

দু-হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজে মনে-মনে ক্রমাগত এই কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। যতই ভাবি, ততই মনে হয়, এর চেয়ে সহজ উপায় নেই! কেউ জানবে না, দেখবে না, শুনবে না—চুরি করে সুনীতিকে যদি বাঁচাতে পারি, তবে আমি তাই করব, তাই-ই করব।... ...

স্তব্ধ রাত্রি—শীতার্ত্ত বিপুল নগরী এখন ঘুমে-অচেতন। জানলা খুলে দেখলুম, কুয়াশায় চারিদিক ঝাপসা; দীর্ঘ পথে জনমনুষ্য নেই; কেবল গ্যাসের প্রদীপ্ত থামগুলো, চিরজাগ্রত নির্ব্বাক প্রহরীর মত সারি সারি দাঁড়িয়ে, একমনে যেন প্রহরের পর প্রহর গুণে যাচ্ছে!

পাগলের মতন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম।.....এম্‌নি করেই কি নিরাশায় পড়ে লোকে চোর হয়?

* *
*

সেই অন্ধকার গলিতে, পরের বাড়ীর প্রাচীরের উপরে দাঁড়িয়ে আমার বুক ধড়াস্ করে' উঠল!

যদি ধরা পড়ি!.....গরীব হলেও আমি ভদ্রলোক! চরিত্রবান বলে আমার খ্যাতি আছে, চোর বলে ধরা পড়লে আমার কি দশা হবে?

দূর থেকে হঠাৎ পাহারাওয়ালার উচ্চ কণ্ঠের চীৎকারধ্বনি অস্পষ্ট শুনতে পেলুম। সেই প্রাচীরের উপরেই এলিয়ে বসে পড়লুম—ভয়ে আমার বুকের কাছটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

কতক্ষণ বসে রইলুম, জানি না! যে ভরসায় বুক বেঁধে বেরিয়ে পড়েছিলুম, সে সাহস আর করতে পারলুম না। মনে হোতে লাগল, চারিদিকের আনাচ-কানাচ থেকে কারা যেন শত-শত সতর্ক দৃষ্টি মেলে নীরবে আমার পানে তাকিয়ে রয়েছে! আর একটু পরেই তারা সবাই যেন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠবে, 'ঐ চোর, চোর, চোর!'

তাড়াতাড়ি প্রাচীরের উপর থেকে নামতে গেলুম। অমনি হঠাৎ বিদ্যুতের মত চোখের সামনে ফুটে উঠল, সুনীতির মুখ!—সেই বিশীর্ণ, পাণ্ডুর, মরন্ত মুখ! আচ্ছন্নের মত দেখলুম, তার মুখের চারিপাশ ঘিরে যেন শ্মশানের চিতা দাউ-দাউ জ্বলছে, সে আগুনে এখনি যেন সমস্ত পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে... ...

সব ভয় ঘুচে গেল,—মরিয়া হয়ে পাঁচিল পেরিয়ে পাশের বাড়ীর ছাদে গিয়ে পড়লুম।

* * * *

সে ঘরের ভিতরে কারুর সাড়াশব্দ পেলুম না। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না—আস্তে-আস্তে দেশলাইয়ের একটা কাঠি ধরালুম। আধখানা কাঠের দেয়াল দিয়ে একটা বড় ঘরকে দু-ভাগ করা হয়েছে —তারই একটা অংশে আমি দাঁড়িয়ে। দেয়ালের মাঝে একখানা পর্দ্দা ঝুলছে, বোধহয় সেইখান দিয়ে ঘরের অন্য অংশে যাওয়া যায়।

একদিকে দুটো আলমারি আর-একটা দেরাজ। আর-একদিকে একটি আন্‌লা—তাতে স্ত্রীলোকের খানকত কোঁচানো কাপড় ঝুলছে; একটা আয়নাওয়ালা টেবিলও রয়েছে—তার উপরে পমেটম, এসেন্সের শিশি, সাবানের বাক্স, পাউডার ও সিঁদুরের কৌটো, চিরুণী এবং বুরুস্ প্রভৃতি নানারকম জিনিস পাশে-পাশে সাজানো। নক্সাকরা মেদিনীপুরী মাদুরে ঘরের মেঝেটি আগাগোড়া ঢাকা।—বুঝলুম, এটি কোন রমণীর সাজঘর; সে রমণী যে ধনীর ঘরণী—তাতেও কোন সন্দেহ রইল না।

দেরাজের টানাগুলো একে-একে টেনে দেখলুম, বন্ধ। আলমারি-দুটোতেও চাবি লাগানো। হতাশ হয়ে ভাবতে লাগলুম, এতদূর এগিয়ে শেষটা কি সুধু হাতে ফিরতে হবে?

আর-একটা দেশলায়ের কাঠি জ্বেলে, আয়নাবসানো টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলুম। তার একটা টানার দিকে চোখ পড়তেই আমার হতাশ প্রাণ আবার আশার আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। দেখলুম একটি টানায় রিংসুদ্ধ একগোছা চাবি লাগানো

রয়েছে! এই জঘন্য অপবিত্র কাজেও আমি না মনে করে থাকতে পারলুম না যে—ভগবান আজ আমার সহায়!

আস্তে-আস্তে টানা খুলতেই, ভিতরে কি-সব চিক্‌চিক্ করে' উঠল! আর-একটি কাঠি জেলে দেখলুম, একগাছা হার, গাছ-কতক চুড়ী আর একজোড়া রতনচূড়,—সবই জড়োয়া গয়না! এত গয়নায় ত আমার দরকার নেই! আমি ত চুরির জন্যেই চুরি করতে আসিনি—আমি যে দায়ে-পড়ে নাচার হয়ে এসেছি!

ভেবে-চিন্তে ঠিক করলুম, রতনচূড়-দুখানাই আমি নিয়ে যাব। এ গয়নাও বিক্রী করব না—শ-দুয়েক টাকায় আপাতত কোথাও বাঁধা রাখব। সেই টাকায় স্ত্রীর চিকিৎসা চলবে। তারপর ধার শুধে, গয়না উৎরে, যেমন-করে-পারি যার জিনিস তাকেই ফের ফিরিয়ে দেব!

রতনচূড়-জোড়া কম্পিত হস্তে বার করে' নিলুম। মনে-মনে বললুম—ভগবান, আমাকে ক্ষমা কর! এই আমার প্রথম ও শেষ পাপ,—জীবনে এ-পথ আর-কখনো মাড়াবো না।

টানাটা বন্ধ করে' যেমন সরে আসতে যাব—আমার হাত-লেগে টেবিলের উপর থেকে কি-একটা জিনিস সশব্দে নীচে পড়ে গেল!

অন্ধকারে জড়সড় হয়ে কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইলুম—যদি কেউ শুনতে পেয়ে থাকে··· ···

আমার মনে হোল, যেন খস্‌খস্ করে কার কাপড়ের আওয়াজ হচ্ছে—ঘরের মাঝে কে-যেন পা টিপে-টিপে চল্‌ছে! আতঙ্কে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল!

খট্ করে কিসের শব্দ হোল—সেই সঙ্গে-সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিকের প্রখর আলোক-তরঙ্গ এসে আমার চোখের উপর যেন হঠাৎ একটা প্রবল ধাক্কা মারলে!—মুহূর্ত্তের জন্যে আমি একেবারে অন্ধ হয়ে গেলুম।

চোখের জড়তা যখন কেটে গেল, তখন ভয়স্তম্ভিত নেত্রে দেখলুম—ঠিক আমার সুমুখেই একজন রমণী আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন!

রমণীও বিস্ময়ে ভয়ে নির্ব্বাক হয়ে আমার পানে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিলেন!

মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল—পড়ে যেতে যেতে তাড়াতাড়ি দেয়ালটা ধরে ফেললুম। মনে হোল, আমাতে যেন আর আমি নেই!

বিস্ময়ের প্রথম বেগটা কেটে যেতেই রমণী ব্যাকুলভাবে দরজার দিকে ছুটে গেলেন। তখন আমার হুঁস হোল। বুঝলুম, তিনি লোক ডাকতে যাচ্ছেন! পাগলের মত একলাফে আমিও দরজার কাছে গিয়ে পড়লুম। ভয়ে একটা অস্ফুট চীৎকার করে তিনি দু পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন।

আমি মাটির উপর বসে পড়ে সকাতরে বললুম, "মা, আমাকে ক্ষমা করুন—আমার সর্ব্বনাশ করবেন না—লোক ডাকবেন না!"

অচল প্রতিমার মত স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সন্দেহের সহিত তিনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি আবার বললুম, "মা, আমি ভদ্র-লোকের ছেলে—দায়ে-পড়ে আজ একদিনের

জন্যে চোর হয়েছি—এ ভিন্ন আমার আর কোন উপায় ছিল না—আমাকে বিশ্বাস করুন—আমাকে বিশ্বাস করুন!"

রমণী কোন কথা কইলেন না—তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকালুম। মা-বলে তাঁকে ডেকেছি বলেই হোক্ বা আমার কাতরতা দেখেই হোক্,—তাঁর মুখ থেকে ভয়ের ভাবটা কেটে গেল। তিনি বোধহয় বুঝতে পারলেন যে, আমার দ্বারা তাঁর কোন অহিত হবে না। নইলে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই তিনি চেঁচিয়ে উঠতেন।

আমি নিম্নস্বরে, খুব সংক্ষেপে, আমার অবস্থা তাঁর কাছে প্রকাশ করে বললুম। আর, তা-ছাড়া আমার অন্য উপায় ত কিছু ছিল না!

রমণীর দৃষ্টি কোমল হয়ে এল। আমার কথায় তিনি যেন বিশ্বাস করলেন! কিন্তু তখনো তিনি একটি কথাও বললেন না।

আমি বললুম, "আমি চুরি করেছি—কিন্তু আমি চোর নই! আপনি টানা খুলে দেখুন, আমি আপনার আর কোন গয়নায় হাত দিই-নি। ভেবেছিলুম, এই গয়না বাঁধা দিয়ে আমার স্ত্রীর প্রাণ বাঁচাব, কিন্তু এখন দেখছি ভগবানের সে ইচ্ছে নয়! নিন্ মা, আপনার গয়না আপনি ফিরিয়ে নিন্,—আমি চোর হলুম বটে, কিন্তু স্ত্রীকে তবু বাঁচাতে পারলুম না!"—এই বলে আমি সাশ্রুনেত্রে রতনচূড়-জোড়া তাঁর পায়ের কাছে রেখে দিলুম।

রমণী একবার তাঁর গয়নার দিকে, একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপর ঘাড় হেঁট করে ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে, খুব মৃদুস্বরে বললেন, "ও গয়না আপনি নিয়ে যান!"

আমি অবাক-অভিভূত হয়ে তাঁর দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলুম। তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললুম, "মা, আপনি দেবী! আপনার দয়ায় আজ আমার স্ত্রীর প্রাণরক্ষা হোল! এ উপকার আমি ভুলব না, এ গয়নাও যেমন-করে-পারি আবার আপনাকে ফিরিয়ে দেব।"

—"আমি ফেরৎ চাই-না, আপনি শীঘ্র এখান থেকে চলে যান"—বলে, রমণী দরজার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন!

ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম—আমার মন তখন নানা ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

অন্যমনস্ক হয়ে ছাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছি—হঠাৎ কে উচ্চস্বরে চীৎকার করে উঠল, "চোর! চোর!"

আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন পাথর হয়ে গেল! মনে হোল, পায়ের নীচে পৃথিবী ঘুরছে!

নীচের সিঁড়িতে কার দ্রুত পদধ্বনি শুনলুম—আরো নানাদিক থেকে নানা লোকের গলার স্বরও কাণে এল!

জ্ঞানহারার মত ছুটতে-ছুটতে আবার রমণীর ঘরে এসে ঢুক্‌লুম।

রমণীও সেই 'চোর'-বলে চীৎকার শুনেছিলেন। অত্যন্ত বিবর্ণমুখে উৎকর্ণ হয়ে তিনি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন।

বালকের মত তাঁর পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে বললুম, "মা, আমাকে বাঁচান!"

চোখের পলক-না-পড়তে রমণী ইলেক-ট্রিকের আলো নিবিয়ে দিলেন। তারপর একটুও ইতস্তত না করে আমার হাত ধরে সেই অন্ধকারেই পাশের ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন।

পিছনে-পিছনে যে লোকটা ছুটে আসছিল, ঘরের বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই সে চেঁচাতে লাগল। বোধ-হয়, অন্ধকারে এ ঘরে ঢুকতে তার সাহসে কুলোল না।

আমার কাণে-কাণে রমণী বল্‌লেন, "বিছানায় উঠে গায়ে লেপ ঢাকা দিন!"

আমি বিস্মিত কণ্ঠে বললুম, "আপনার বিছানায়!"

—"উঠুন, দেরি করবেন না! আপনি আমাকে মা বলেছেন!"

—"কিন্তু, আমি ধরা পড়লে, আপনার কি হবে?"

—"ওরা এখনি এসে ঘর খুঁজবে, এ-ছাড়া উপায়ও নেই। যদি বাঁচতে চান, আপনার স্ত্রীকে বাঁচাতে চান, তাহলে উঠুন—বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে শুয়ে থাকুন।"

আমি আর কিছু বলতে পারলুম না—সেই অপূর্ব্ব রমণী যা বললেন, তাই করলুম। আমার সঙ্গে-সঙ্গে তিনিও বিছানায় উঠলেন, তারপর আমার সর্ব্বাঙ্গ লেপ দিয়ে ঢেকে পালঙ্কের একপ্রান্তে সরে গিয়ে তিনি চুপ করে বসে রইলেন। বেশ বুঝতে পারলুম,—তাঁর দেহ থেকে-থেকে থর্‌থরিয়ে কেঁপে উঠছে!

দু-এক মুহূর্ত্ত পরেই হুড়্‌মুড়্‌ করে অনেক লোক ঘরে এসে ঢুকল।

কে-একজন ব্যস্তভাবে বললে, "মেজ-বউ-দি, মেজবউ-দি, তোমার ঘরে চোর ঢুকেছে!"

রমণী বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই বললেন, "আমার ঘরে চোর! ঠাকুর-পো, তুমি পাগল হলে নাকি? মিছিমিছি চেঁচিয়ে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে!"

—"না, না,—আমি স্বচক্ষে তাকে তোমার ঘরে ঢুকতে দেখেছি! একি, মেজ্‌দাদা আজকেও ঘরে আসেন-নি!.....কিন্তু, এ ত ভারি আশ্চর্য্য, চোর-বেটা গেল কোথা?"

—"ঠাকুর-পো, স্বপ্নের চোরকে জাগলে আর ধরতে পারা যায় না!"

—"না মেজবউ-দি, আমি ঠিক দেখেছি, —তোমার দিব্যি!"

—"দেখেছ ত, সে গেল কোথায়?"

—"তাইত ভাবছি!"

—"কি ঠাকুর-পো, বিছানার দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন? তুমি কি ভাবছ, চোর এসে আমার লেপের ভিতর ঢুকে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ভালমানুষটির মত ঘুমিয়ে পড়েছে?" বলে রমণী উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন! কিন্তু সে হাসির ভিতরেও তাঁর গলার স্বর কেমন যেন কাঁপছিল!

"না, না, তা ভাবছি না—তা ভাবছি না! চোরটা তাহলে এ ঘর থেকে কোন-গতিকে সরে পড়েছে দেখছি। কিন্তু, কোন্‌দিক দিয়ে পালাল?"

—"দুঃখের বিষয় ঠাকুর-পো! চোরেরা যে কোন্‌দিক দিয়ে পালায় সেটা চেঁচিয়ে

বাহির করে তারা সৎসাহস দেখিয়ে যেতে পারে না।"

আর-একজন কে বললে, "বাবু, আসুন! চোরটা বোধ হয় অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে!"

—"চল্‌, চল্‌, দেখা যাক্‌! এখানে দাঁড়িয়ে মিছে সময় নষ্ট করলে তাকে আর ধরতে পারব না!"

সকলে দ্রুতপদে ঘর থেকে আবার বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে রমণীও পালঙ্কের উপর থেকে নেমে পড়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

আমিও একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে শয্যাত্যাগ করে নীচে নেমে দাঁড়ালুম।

উদ্বেগে ভয়ে লজ্জায় মুখ মলিন করে আমার সেই দেবীরূপিণী রক্ষাকর্ত্তী হাঁটু-গেড়ে কক্ষতলে বসে আছেন। অত্যধিক উত্তেজনায় তিনি তখন যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠছিলেন!

আমি তাঁর সামনে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললুম, "মা, আমি এখন কি-করে যাব? আর এখানে থেকে আপনাকে ত বিপদে ফেলতে পারব না!"

মাথা না তুলেই চিন্তিত স্বরে তিনি বললেন, "আর-একটু অপেক্ষা করুন—সকলে আবার ঘুমোক।"

—"কিন্তু যদি আপনার স্বামী এসে পড়েন?"

মাটির দিকে মুখ আরো নামিয়ে রমণী করুণস্বরে বললেন, "রাত্রে তিনি ত বাড়ী আসেন না!"

আশ্চর্য্য! এমন রূপবতী গুণবতী স্ত্রী যার ঘরে, কী আকর্ষণে সে বাইরে-বাইরে রাত কাটায়!... ...

শোনা যায়-কি-না-যায়, এমনি অস্পষ্ট স্বরে, রমণী যেন আপন মনেই বললেন, "স্ত্রীর জন্যে স্বামী চোর হচ্ছে! আর, আমার স্বামী—আমার স্বামী"... ... ...হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে, বলতে-বলতে থেমে পড়ে, তিনি দু-হাতে আপনার মুখ ঢেকে ফেললেন।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বর্ত্তমান যুদ্ধে লিপ্ত দেশ

(৩) সার্বিয়া

তুরস্ক ব্যতীত বর্ত্তমানে বলকান্‌ উপদ্বীপে পাঁচটি রাজ্য আছে—যথা সার্বিয়া, মণ্টেনিগ্রো, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া ও গ্রীস। ১৯১২ খৃঃঅব্দের বলকান সমরের পর অষ্ট্রীয়ার চেষ্টায় আলবেনিয়াকে একটি পৃথক রাজ্যে পরিণত করা হয়; কিন্তু এই নূতন রাজ্যের অস্তিত্ব কয়েক মাসের ভিতরই লুপ্ত হয়। পূর্ব্বে যেমন বেলজিয়াম ইউরোপের আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইত সেইরূপ বর্ত্তমান যুগে বলকান উপদ্বীপও ইউরোপের আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান

যুগে ইউরোপের প্রায় সকল গোলযোগেরই উৎপত্তি বলকান উপদ্বীপে হইয়াছে এবং বর্ত্তমান যুদ্ধেরও সূত্রপাত এইখানে।

বলকান উপদ্বীপে অনেকগুলি জাতি বাস করে,কিন্তু ইহাদের ভিতর স্লাভজাতীয় অধিবাসীদের সংখ্যাই অধিক। এখানকার স্লাভ অধিবাসীগণ দক্ষিণ-স্লাভ বলিয়া পরিচিত; রুশদিগকে উত্তর-স্লাভ বলা হয়। ইউরোপের মধ্যযুগে স্লাভ জাতির এই উভয় শাখারই অদৃষ্ট সমান ছিল। রুষিয়ার উত্তর-স্লাভগণ তাহাদের রাষ্ট্রীয় শক্তির বিকাশের প্রারম্ভেই যেমন দুর্দ্দান্ত তাতার জাতির দ্বারা পদদলিত হইয়াছিল—সেইরূপ বলকানের দক্ষিণ স্লাভরাও তুর্কিদের দ্বারা বারংবার আক্রান্ত হয়। প্রায় পাঁচ শত বৎসর সমানে দক্ষিণ স্লাভরা তুর্কীদের নানা অত্যাচার সহ্য করে এবং রুষিয়ানরা যেমন পশ্চিম ইউরোপকে মঙ্গোলিয়ানদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল সেইরূপ ইহারাও পশ্চিম ইউরোপকে তুর্কীদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। এই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া ইউরোপের অন্যান্য দেশ নির্ব্বিঘ্নে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল, কিন্তু রক্ষাকারীরা যুদ্ধবিগ্রহের হাঙ্গামায় ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া সভ্যতায় ইউরোপের অন্যান্য জাতির পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। আজ-পর্য্যন্ত বলকানের স্লাভ অধিবাসীগণ শিক্ষা-বিষয়ে পশ্চিম-ইউরোপের অনেক জাতির পিছনে পড়িয়া আছে। বুলগেরিয়াতেই শিক্ষার বিস্তার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে, কিন্তু সেখানেও শতকরা পঞ্চাশ জন নিরক্ষর। পশ্চিম ইউরোপের লোকরা ইহাদের এই দুরবস্থার প্রকৃত কারণ জানিয়াও অনেক সময় ইহাদিগকে অর্দ্ধসভ্য মনে করিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে। জর্ম্মানরা এখনও সার্বিয়া এবং মণ্টেনিগ্রোর অধিবাসীদিগকে "ভেড়াচুর" বলিয়া ডাকে। সার্ব্ব এবং বুলগারই বলকানের প্রধান জাতি। এই দুই জাতির ভিতর অতি প্রাচীন কাল হইতে শত্রুতা চলিয়া আসিতেছে। এই পুরাতন শত্রুতাই, বর্ত্তমান যুদ্ধে সার্বিয়ার শত্রুপক্ষের সহিত বুলগেরিয়ায় যোগ দেওয়ার প্রধান কারণ।

সার্বিয়ানরা স্লাভজাতির একটি শাখা। ধর্ম্মমতে ইহারা Orthodox Greek Churchএর অন্তর্ভুক্ত। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সার্ব্বরা দানিয়ুব নদী পার হইয়া বলকান উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমভাগে উপনিবেশ স্থাপন করে। তখন সমস্ত বলকান উপদ্বীপ গ্রীক সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল, কিন্তু কনস্তান্তিনোপলের গ্রীক সম্রাটগণ বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার দরুণ সার্বিয়ানরা অতি সহজেই স্বাধীন হইয়া পড়ে এবং বলকান উপদ্বীপে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা দুশানের সময় সার্বিয়ার রাষ্ট্রীয় শক্তি পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছিল। সে সময়ে সমগ্র বলকান উপদ্বীপ সার্বিয়ার অধিকারভুক্ত ছিল। দুশানের রাজত্বকালে সার্বিয়া সভ্যতায় ইউরোপের কোন দেশ অপেক্ষা হীন ছিল না। তখন কনস্তান্তিনোপলের গ্রীক সম্রাটদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়ছিল এবং তুর্কীরা বাইজানতাইন সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল।

দুশান বুঝিলেন, তুর্কীরা অতি সহজেই দুর্ব্বল গ্রীক সম্রাটকে পরাজিত করিতে পারিবে এবং অবশেষে বলকান উপদ্বীপও আক্রমণ করিবে। তাই তিনি নিজে বাইজানতাইন সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া আগে থাকিতেই তুর্কীদের আগমনে বাধা দিতে মনস্থ করিলেন। ১৩৪৫ খৃঃঅব্দে দুশান গ্রীশ এবং বলকানের সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পরে কনস্তান্তিনোপল অধিকার করিতে অগ্রসর হয়েন। কিন্তু কনস্তান্তিনোপলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দুশানের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরই তুর্কীরা বলকান আক্রমণ করে। তখন বলকানের প্রায় সমস্ত খৃষ্টীয়ান জাতিই তুর্কীর আক্রমণে বাধা দিবার নিমিত্ত কোস্যোভো'র সমতল ক্ষেত্রে সমবেত হয়; কিন্তু তুর্কী সেনাপতি আমুরথ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। কোস্যোভোর যুদ্ধই বলকান ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শোকাবহ ঘটনা। এই কোস্যোভোর ক্ষেত্রেই সার্বিয়ার এবং সমগ্র বলকানের সৌভাগ্যসূর্য্য পাঁচ শত বৎসরের জন্য অস্তমিত হয়। এই যুদ্ধে তুরস্কের সুলতান মুরাদ এবং সার্বিয়ার সম্রাট লাজার ও তাঁহার দ্বাদশ ভগ্নিপতি হত হয়েন। ইহা ব্যতীত সার্বিয়ার অভিজাত-সম্প্রদায়ের প্রায় সকল ব্যক্তিই প্রাণ হারান। যাঁহারা বাঁচিয়া ছিলেন—তাঁহারাও দেশ ত্যাগ করিয়া মণ্টেনিগ্রোর দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লয়েন। বলকানের দক্ষিণ-স্লাভরা আজ-পর্য্যন্ত এই যুদ্ধের কথা ভুলিতে পারে নাই। এই যুদ্ধের এবং তাহার আনুসঙ্গিক ঘটনার অবলম্বনে বলকানে এক বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। স্লাভনিক সাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্য ও কবিতা এই যুদ্ধের কথা লইয়া লিখিত, এবং সার্বিয়ার অনেক জাতীয়-সঙ্গীত এই পরাজয়ের জন্য করুণ বিলাপ মাত্র। আজ-পর্য্যন্ত সার্বিয়ার ভিক্ষুকরা এই সব করুণ-গীতি গায়িয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া থাকে। গ্রীম, গেটে প্রমুখ জর্ম্মান মনিষীগণ এই সব কাব্যের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। একমাত্র ইংরাজী ছাড়া ইউরোপের আর সমস্ত প্রসিদ্ধ ভাষাতেই এই সকল কাব্য অনুদিত হইয়াছে।

কোস্যোভোর যুদ্ধের ৭০ বৎসর পর সুলতান মহম্মদ সমগ্র সার্বিয়াকে তুরস্ক-সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত করেন। ইতিমধ্যে সার্বিয়ানরা অনেকবার খৃষ্টীয়ান ইউরোপের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু তুরস্কের ভয়ে ইউরোপের কোন দেশই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় নাই। পোপ একবার সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সার্বিয়ানরা সে সাহায্য উপেক্ষা করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, তাহারা বরং তুরস্কের দাসত্ব স্বীকার করিবে, তবুও রোমান ক্যাথলিক হইবে না। তুরস্কের অধীনে সার্বিয়ার দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। সুলতান, সার্বিয়াকে নয় শত জায়গীরে বিভক্ত করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুরূপ নয় শত লোকের নিকট বিলি করিয়া দেন। এই সকল জায়গীরদার প্রজার ধনপ্রাণের মালিক ছিল। খৃষ্টীয়ান প্রজাবর্গের কোন বিষয়েই স্বাধীনতা ছিল না। আদালতে খৃষ্টীয়ানদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইত না এবং কোন তুর্কীর বিরুদ্ধে

আদালতে অভিযোগ করিবার অধিকারও তাহাদের ছিল না। পুরুষদিগকে সর্ব্বদা দীনহীন বেশে থাকিতে হইত এবং স্ত্রীলোকদেরও ভাল অলঙ্কার কিংবা বস্ত্র পরিধান করিবার অধিকার ছিল না। ভাল কাপড়-চোপড় পরা কিম্বা সুন্দর গৃহে বাস করা দণ্ডনীয় ছিল। সহরের রাস্তায় খৃষ্টীয়ানদের গাড়ী-ঘোড়া চড়িবার অধিকার ছিল না। সহরের বাহিরেও কেহ ঘোড়ায় চড়িতে চাহিলে তার জন্য অনুমতি-পত্র লইতে হইত। কিন্তু, কোন তুর্কীকে রাস্তায় দেখিলে সব খৃষ্টীয়ানকে তখনই ঘোড়া হইতে নামিতে হইত। তুর্কীর সম্মুখে খৃষ্টীয়ানদের বসিবার অধিকার ছিল না। দেশের সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগকে তুর্কী রাজকর্ম্মচারীগণের সেবার নিমিত্ত নিযুক্ত করা হইত এবং প্রত্যেক পাঁচ বৎসরের পর দেশের শত শত যুবককে কনস্তান্তি-নোপলে লইয়া গিয়া জেনেসেরি সৈন্যদলে ভর্ত্তি করান হইত। ইহাদের সকলকেই মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইত। খৃষ্টীয়ানদের কোনপ্রকার অস্ত্রধারণ করিবারও অধিকার ছিল না। প্রজাদের নিকট হইতে হরেক-রকম কর আদায় করা হইত। প্রথমত, সুলতানের নিমিত্ত একটা বিশেষ কর গৃহীত হইত। তারপর ৭ বৎসরের অন্যূন এবং ৬০ বৎসরের অনধিক বয়স্ক সকল পুরুষ প্রজার নিকট হইতে একটা প্রাদেশিক কর আদায় করা হইত। ইহা ভিন্ন যাহারা বিবাহিত, তাহাদেরও পৃথক কর দিতে হইত। প্রত্যেক শিশু-সন্তানের জন্য, গরুর জন্য, শূকরের জন্য, রান্নাঘরের উনারের জন্য প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করা হইত। ইহা ছাড়া তাহাদিগকে ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ রাজকোষে দিতে হইত এবং গ্রীষ্মকালে কৃষকদিগকে বিনা মজুরিতে সুলতানের এবং তাঁহার কর্ম্মচারীদের উদ্যানে কাজ করিতে হইত। তুর্কীরা সার্বিয়া হইতে অর্থশোষন করিয়াই ক্ষান্ত ছিল। যে-সমস্ত প্রজা দেশে থাকিত, তাহাদের ধর্ম্ম কিম্বা ভাষার উপর তুর্কীরা কখনো হস্তক্ষেপ করিত না। তাই সার্বিয়ানরা নিজেদের জাতীয়তা হারাইয়া ফেলে নাই; তাহারা উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন অষ্ট্রীয়ানরা তুর্কীদিগকে পরাজিত করিতে লাগিল তখন সার্বিয়ানরা ভাবিল যে, তাহাদেরও মস্তক উত্তোলন করিবার সময় আসিয়াছে। তখন সার্বিয়ানরা দলে দলে অষ্ট্রীয়ায় পলায়ন করিয়া সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইতে লাগিল। সার্বিয়ানদের ভিতর এক জনশ্রুতি ছিল যে একদিন কোন অজানা দেশ হইতে একজন বীরপুরুষ উষ্ট্রে চড়িয়া খোলা তরবারি হস্তে তাহাদের দেশে উপস্থিত হইবেন এবং তিনি অতি অল্পদিনের ভিতরই মুসলমানদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবেন। এ প্রবাদ অনেকটা আমাদের কল্কি-অবতারের ন্যায়। অষ্ট্রীয়ার সার্বিয়ান সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত একদিন একজন অষ্ট্রীয়ান সেনাপতি উষ্ট্রে চড়িয়া তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েন। এই সংবাদ পাইয়া সমস্ত সার্বিয়া আশান্বিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। সার্বিয়ানরা ভাবিল, তাহাদের উদ্ধারের আর বিলম্ব নাই। কিন্তু তাহাদের নেতারা একা একা কিছু করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইলেন। অষ্ট্রীয়া সার্বিয়াকে স্বাধীন করিয়া দিবে এই ভাবিয়া তাঁহারা অষ্ট্রীয়ার নিকট অনেক কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। সার্বিয়ান কবিগণ অষ্ট্রীয়ার সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "একবার আমাদের দিকে মুখ তুলিয়া চাও, আমাদের পুরাতন দেশ তুর্কীর হাত হইতে আমাদিগকে ফিরাইয়া দাও"। ইহাদের ক্রন্দন শুনিয়া অষ্ট্রীয়া ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিল। অতি অল্পদিনের ভিতরই তুর্কীরা পরাজিত হইয়া সার্বিয়ার অধিকাংশ ভূভাগ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। তখন দেশময় আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সার্বিয়ানদের এই আনন্দ বেশীদিন স্থায়ী হইল না। এক বৎসর যাইতে-না-যাইতেই অষ্ট্রীয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত তুরস্কের সহিত এক সন্ধি করিয়া বসিল এবং এই সন্ধির ফলে তুর্কীরা আবার সমস্ত সার্বিয়া ফেরত পাইল। তুর্কীদের অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ সার্বিয়ান দেশত্যাগী হইল। সার্বিয়ার সব আশা স্বপ্নে পরিণত হইল। কিন্তু সার্বিয়ান নেতারা তবুও অষ্ট্রীয়ার প্রতি বিশ্বাস হারাইলেন না। কয়েক বৎসর পর তাঁহারা আবার অষ্ট্রীয়ার দ্বারস্থ হইলেন। এবারও অষ্ট্রীয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল এবং রুষিয়ার সহিত একযোগ হইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। তুর্কীরা আবার বাধ্য হইয়া সার্ভিয়া পরিত্যাগ করিল।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সে রাষ্ট্র-বিপ্লব আরম্ভ হইল। অষ্ট্রীয়া এই বিপ্লবের খবর পাইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং তাড়াতাড়ি তুরস্কের সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলিল এবং এই সন্ধির ফলে তুরস্ক আবার সার্বিয়া ফেরত পাইল। সার্বিয়ানরা আবার হতাশ হইল বটে, কিন্তু ইহাতে একটা সুফল ফলিল। বারম্বার নিরাশ হইয়া সার্বিয়ানরা শেষটা বুঝিতে পারিল যে, স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে পর-মুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না—নিজেদেরই যুদ্ধ করিতে হইবে। সুতরাং অতঃপর তাহারা সেইজন্যই প্রস্তুত হইতে লাগিল।

বলকানের প্রায় সকল দেশই অপরের সাহায্যে তুর্কীর হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। গ্রীশ এবং বুলগেরিয়া ইউরোপের অন্যান্য শক্তির সাহায্যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু সার্বিয়া স্বাধীন হইয়াছিল তাহার নিজের এক দরিদ্র এবং নিরক্ষর কৃষক-সন্তানের চেষ্টায়। এই কৃষক-সন্তানের নাম জর্জ। তাঁহার চুল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলিয়া লোকে তাঁহাকে কালো জর্জ বলিত এবং তিনি ও তাঁহার পরিবার এই নামেই পরিচিত। ইনি সার্বিয়ার বর্ত্তমান রাজার পিতামহ। সার্বিয়ার বর্ত্তমান রাজার নাম পিটার কারাজর্জোভিচ। কালো জর্জ ১৭৮৭ খৃঃঅব্দের বিদ্রোহে তুরস্কের বিরুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া, বৃদ্ধ পিতাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া তিনি স্বগ্রাম হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য

হয়েন। তাঁহারা সেভ্ নদীর তীরে পৌঁছিবার পর কালোজর্জের বৃদ্ধ পিতা আর অগ্রসর হইতে রাজি হইলেন না। তুর্কীরা তাঁহাদের পশ্চাতে অনুসরণ করিতেছিল, তুর্কীর হাতে পড়িলে অশেষ যন্ত্রণা পাইয়া মরিতে হইবে জানিয়া পিতা আপন পুত্রকে আদেশ করিলেন, "আমাকে এখনই হত্যা করিয়া পলায়ন কর; আমার জন্য নিজে বিপন্ন হইও না।" কালোজর্জ পিস্তলের গুলি মারিয়া পিতাকে হত্যা করিলেন এবং তুর্কীরা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সেভ্ নদী পার হইয়া অষ্ট্রীয়ায় পলায়ন করিলেন। সেখানে যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কয়েক বৎসর পর তিনি আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। সার্বিয়ানরা অতিশয় ভাবপ্রবণ এবং বক্তৃতা-প্রিয় জাতি; কিন্তু কালোজর্জ কারো সহিত বেশী মিশামিশি করিতেন না কিম্বা কথা-বার্ত্তা বলিতেন না। তাঁহাকে হাসিতে দেখা যাইত না; তাই সকলে তাঁহাকে ভয় করিত। সেই সময় হাজি মুস্তফা নামক একজন অতি সদাশয় তুর্কী সার্বিয়ার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হয়েন। তিনি সার্বিয়াতে আসিয়াই অত্যাচারী জেনেসেরি-দিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দেন। জেনে-সেরি সৈন্যগণ কনস্তান্তিনোপলে গিয়া সুলতানের নিকট অভিযোগ করে এবং বিদ্রোহের ভয় দেখায়। সুলতান ভয় পাইয়া শাসনকর্ত্তার আদেশ রদ করিলেন এবং তাহাদিগকে আবার সার্বিয়ায় প্রেরণ করিলেন। জেনেসেরিগণ সার্বিয়ায় পৌঁছিয়াই সদাশয় হাজি মুস্তফাকে হত্যা করে এবং সমস্ত দেশ নিজেদের ভিতর ভাগ করিয়া লয়। তারপর ইহারা গ্রামে গ্রামে গিয়া সক্ষম পুরুষদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করে। এই অমানুষিক অত্যাচারের ভয়ে সার্বিয়ার অধিকাংশ সক্ষম অধিবাসী দেশত্যাগ করিয়া মোরাভার অগম্য জঙ্গলে পর্ব্বতে পলায়ন করে। এবং এইখানে সকলে একত্র হইয়া অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ১৮০৪ খৃঃঅব্দে এক জাতীয় সভা আহ্বান করে। এই সভায় কালোজর্জ একবাক্যে-সমগ্র সার্বিয়ান জাতির নেতা এবং সার্বিয়ান বাহিনীর সেনাপতিরূপে মনোনীত হয়েন। এই সভায় কালোজর্জ তাঁহার স্বদেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, —"দেখ, আমি নিতান্ত সাদাসিদে মানুষ, আমি তোমাদের মতন বক্তৃতা দিতে পারিব না। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি আমার কথার অবাধ্য হও, তাহা হইলে আমি তাহাকে বক্তৃতা দিয়া আমার মতে আনিতে পারিব না; আমি তাহাকে সোজাসুজি গুলি করিয়া মারিব।" সার্বিয়ানরা তবুও তাঁহাকেই একবাক্যে গ্রহণ করিল। এই মহাপুরুষের চেষ্টাতেই সার্বিয়া অবশেষে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। কালোজর্জ অসীম ক্ষমতাশালী হইয়াও তাঁহার সাদাসিদে অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি সর্ব্বদা কৃষকের বেশে থাকিতেন এবং কৃষকের কাজ করিতেন। তাঁহার কন্যাকে অন্যান্য কৃষক-কন্যাগণের সহিত কূপ হইতে জল তুলিয়া আনিতে হইত। কালোজর্জ একেবারে নিরক্ষর ছিলেন, নিজের নামটি পর্য্যন্ত সহি করিতে পারিতেন না।

কালোজর্জের নেতৃত্বে সার্বিয়ানরা প্রথমা-বস্থায় তুরস্কের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন

করিতে চাহে নাই। তাহারা তুরস্ক-সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়াই স্বায়ত্ব-শাসনের প্রার্থী হইয়াছিল। তাহারা আরও চাহিয়াছিল যে, সার্বিয়ার দুর্গসমূহে সুলতান তুর্কী সৈন্য না রাখিয়া একমাত্র দেশী সৈন্য রাখিবেন। সুলতান সার্বিয়ানদের এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না এবং তাঁহার শাসনকর্ত্তা সমস্ত সার্বিয়ান জাতিকে নিরস্ত্র করিতে আদেশ দিলেন। এই সংবাদ পাইয়া সমস্ত জাতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং অল্পদিনের যুদ্ধের পরই তুর্কীদিগকে তাহারা দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে সক্ষম হইল। তুর্কীদিগকে স্বদেশ হইতে তাড়াইবার পর কালোজর্জ রাজ্যে অনেকগুলি সংস্কারের প্রবর্ত্তন করেন। সার্বিয়ানরা যাহাতে ইউরোপের অন্যান্য উন্নতিশীল জাতির সমকক্ষ হয় ইহাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। সেই অনুসারে তিনি সর্ব্বপ্রথমেই সার্বিয়ার গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং সুশাসনের নিমিত্ত একটি ব্যবস্থাপক সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। সুলতান কালোজর্জের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া ১৮০৭ খৃঃ অব্দে সার্বিয়াকে কালোজর্জের অধীনে স্বায়ত্ব-শাসন প্রদান করিতে প্রস্তুত হয়েন এবং তাহার পরিবর্ত্তে বাৎসরিক একটা কর ধার্য্য করেন। সার্বিয়ানরা সুলতানের প্রস্তাবে প্রথমে রাজী হয়, কিন্তু ইতিমধ্যে রুষ-জার তাহাদিগকে জানাইলেন যে, তিনি শীঘ্রই তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন, এই যুদ্ধে সার্বিয়ানরা তাঁহার সহিত যোগদান করিলে তুরস্ক নিশ্চয়ই ইউরোপ হইতে বিতাড়িত হইবে এবং তাহারা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে—সুতরাং তাহারা যেন সুলতানের এই স্বায়ত্ব-শাসনের প্রস্তাবে মত না দেয়। সরল সার্বিয়ানরা রুষ-জারের কথায় বিশ্বাস করিয়া সুলতানের আপোশের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল এবং রুষিয়ার সহিত একযোগ হইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কিন্তু পূর্ব্বে অষ্ট্রীয়া তাহাদিগের সহিত যেরূপ অভদ্র ব্যবহার করিয়াছিল এবার রুষিয়াও ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিল। ১৮১২ খৃঃ অব্দে রুষিয়া সার্বিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া বুখারেষ্টের সন্ধির দ্বারা তুরস্কের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিল। তুরস্ক অবিলম্বে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আবার সার্বিয়া আক্রমণ করিল। বিপন্ন কালোজর্জ নেপোলিয়নের নিকট সাহায্য-প্রার্থী হইলেন কিন্তু তিনিও সাহায্য করিলেন না। কালোজর্জ অবশেষে সার্বিয়া পরিত্যাগ করেন এবং অষ্ট্রীয়ার আশ্রয় লয়েন। সার্বিয়ার অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও কালোজর্জের সহিত দেশত্যাগী হয়েন। যাঁহারা দেশে থাকিলেন, তাঁহারা মিলস নামক এক ব্যক্তিকে কালোজর্জের স্থানে দেশনায়করূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মিলস প্রথমে তুরস্কের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু দুই বৎসর পরেই বিদ্রোহী হইয়া তুর্কীদের আক্রমণ করেন। তখন নেপোলিয়নের পতন হইয়াছে; তাই সুলতান ভাবিলেন যে, রুষিয়া হয়ত সার্বিয়ার সাহায্যে অগ্রসর হইবে। এই ভয়ে তিনি বাৎসরিক একটা কর ধার্য্য করিয়া সার্বিয়াকে স্বায়ত্ব শাসন প্রদান করিলেন। কালোজর্জ তখন বেসারা-বিয়াতে নির্ব্বাসনে ছিলেন। স্বায়ত্ব-শাসন

লাভ করিবার পর সার্বিয়ানরা তাঁহাকে দেশে ফিরিতে অনুরোধ করে। কালোজর্জ এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, ১৮১৭ খৃঃঅব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মিলস্ তখনও সার্বিয়ার শাসন-কর্ত্তা ছিলেন; কিন্তু কালোজর্জের আগমনে দেশের উপর তাঁহার আধিপত্য কমিয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে তাঁহার হিংসা হইল এবং তিনি সুলতানের প্রতিনিধিকে জানাইলেন যে, কালোজর্জের দরুণ দেশ আবার বিদ্রোহী হইবে এবং সার্বরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিবে। ইহা শুনিয়া পাশা কালোজর্জের ছিন্নমুণ্ড দেখিতে চাহিলেন। মিলসের গুপ্তচর তখনই কালোজর্জের অন্বেষণে বাহির হইল এবং কিছুদিন পর তাঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় হত্যা করিয়া তাঁহার ছিন্নমস্তক পাশাকে উপহার প্রদান করিল। সার্বিয়ার জাতীয় বীর এবং উদ্ধারকর্ত্তার জীবন এইরূপে শেষ হইল। কালোজর্জের মৃত্যুর দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯০৩ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার এবং মিলসের বংশধরগণের মধ্যে সার্বিয়ার সিংহাসন লইয়া সমানে বিবাদ চলিয়াছিল এবং ইহার দরুণ অনেক রক্তপাতও হইয়াছিল।

১৮৭৬ খৃঃ অব্দে সার্বিয়া আবার সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার চেষ্টা করে এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে তুরস্কের জয় হইয়াছিল, কিন্তু সেই সময়ই রুষ, তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করায়, তুরস্ক সার্বিয়ার বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে নাই। এই যুদ্ধের পর বার্লিনএর সন্ধি হয় এবং তাহার ফলে সার্বিয়া বলকানের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। সার্বিয়া প্রায় পাঁচশত বৎসর তুরস্কের অধীনে ছিল। বার্লিনসন্ধির পর মিলান সার্বিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মিলান অতিশয় উদারমতাবলম্বী ছিলেন—তাই রুষ-জার তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না। বার্লিন-সন্ধির পর হইতে রুষ-জার সার্বিয়ার রক্ষণশীল-সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক হইলেন এবং মিলানের প্রত্যেক সংস্কারকার্য্যে বাধা দিতে লাগিলেন। মিলান নেটালি নাম্নী এক পরম রূপবতী রুষরমণীর পাণিগ্রহণ করেন। রাণী নেটালি রক্ষণশীল দলের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বিবাহের পর হইতেই রাজার সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হয় এবং অবশেষে রাজা রাণীকে ত্যাগ করেন। ইহার দরুণ দেশের রক্ষণশীল সম্প্রদায় রুষিয়ার নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়া রাজার নামে নানারূপ কুৎসা রটনা করিয়াছিল এবং তদ্দ্বারা উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তির হানি করিতে পারিয়াছিল। এই সময় তুরস্কের পূর্ব্ব-রুমেলিয়া নামক প্রদেশ-বাসীরা তুরস্কের অধীনতা ত্যাগ করিয়া বুলগেরিয়ার সহিত যুক্ত হয়। সার্বিয়া চিরশত্রু বুলগেরিয়ার আয়তন বৃদ্ধি হইল দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হয় এবং বিনা কারণে বুলগেরিয়াকে আক্রমণ করে। বুলগেরিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাই মিলান ভাবিয়াছিলেন যে তিনি অতি সহজেই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন এবং নূতন দেশ অধিকার করিয়া নিজের এবং গবর্মেণ্টের প্রতিপত্তি বাড়াইতে পারিবেন। কিন্তু যুদ্ধে বুলগেরিয়ারই জয় হইল।

তখন বুলগেরিয়ানরা সমস্ত সার্বিয়া অধিকার করিতে পারিত, কিন্তু অষ্ট্রীয়ার ভয়ে তাহারা ততটা অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। এই পরাজয়ের দরুণ সার্বিয়াতে রুষের প্রতিপত্তি আরো বাড়ে, কিন্তু তবুও মিলান উন্নতিশীল দলের সাহায্যে ভোটদান অধিকার সম্বন্ধে খুব উদার আইন পাশ এবং সংবাদ-পত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পূর্ব্বে বলকানে কিম্বা তুরস্কে যখনই কোন সংস্কারের প্রস্তাব হইত, তখনই রুষ-জার শঙ্কিত হইয়া উঠিতেন এবং সংস্কার-কার্য্যে বাধা প্রদান করিতেন। সার্বিয়ার জাতীয় সভাতে যাহাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতামূলক উক্ত আইন পাশ না হয়—তাহার জন্য রুষিয়ার চরেরা অনেক সদস্যকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়াছিল কিন্তু তবু উন্নতিশীল দলেরই জয় হইয়াছিল। ১৮৮৯ খৃঃঅব্দে রাজা মিলান এই সব রাজ-নৈতিক এবং পারিবারিক গোলযোগের দরুণ ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া সিংহাসন পরিত্যাগ করেন। মিলানের পর তাঁহার পুত্র আলেক-জান্দার সার্বিয়ার রাজা হন। আলেকজান্দারের সময় দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভিতর ঝগড়ার দরুণ গবর্মেণ্টের এবং দেশের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আলেকজান্দার নূতন আইন করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অনেকটা খর্ব্ব করিয়া ফেলেন। এই আইন-মতে রাজনৈতিক সংবাদপত্রের সত্বাধিকারীদিগকে গবর্মেণ্টের নিকট তিন হাজার টাকা জামিন স্বরূপ জমা রাখিতে হইতে। ইহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধীধারী ভিন্ন আর কাহারও সম্পাদক হইবার অধিকার ছিল না। ১৯০০ খৃঃঅব্দে আলেকজান্দার তাঁহার মাতার দ্রাগা নাম্নী এক পরিচারিকাকে বিবাহ করেন এবং বিবাহের পরেই তাঁহার পিতা রাজ্যত্যাগী রাজা মিলানকে সার্বিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি নিজেই অনুরোধ করিয়া পিতাকে প্যারী হইতে দেশে আনাইয়াছিলেন। এই বিবাহের দরুণ আলেকজান্দার দেশে আরো অপ্রিয় হইয়া পড়েন এবং দেশের সংবাদ-পত্রসমূহ তাঁহাকে এবং রাজ্ঞী দ্রাগাকে যথেচ্ছ আক্রমণ করিতে থাকে। ইতিমধ্যে এক জনরব উঠে যে রাজা আলেকজান্দার রাণী দ্রাগার এক ভ্রাতাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী সাব্যস্থ করিয়াছেন। ইহাতে দেশের লোক আরো উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা একদিন রাত্রে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে এবং রাজ্ঞী দ্রাগাকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং কালোজর্জের পৌত্র পিটারকে সিংহাসনে বসায়। ইনিই সার্বিয়ার বর্ত্তমান রাজা। এই হত্যাকাণ্ডের পর রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদ হত্যাকারীরা নিজে দখল করে এবং তাহাদেরই একজন নেতা সার্বিয়ার মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েন। কিছুদিন পর সার্বিয়ার পার্লিয়ামেণ্টে একবাক্যে ষড়যন্ত্রকারীদিগকে রাজা ও রাণীর হত্যার দরুণ ধন্যবাদ দিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সংবাদ পাইয়া ইউরোপের অন্যান্য শক্তিরা ঘৃণায় সার্বিয়াকে কিছুদিনের জন্য একঘরে করিয়া রাখেন এবং তাঁহাদের রাজদূত-

দিগকে দেশে ফিরাইয়া নেন। ১৯০৩ খৃঃ হইতে ১৯০৬ খৃঃ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সঙ্গে সার্বিয়ার কোন সংশ্রব ছিল না।

১৯০৮ খৃঃঅব্দে অষ্ট্রীয়া বার্লিনের সন্ধি অমান্য করিয়া তুরস্কের বস্‌নিয়া ও হার্জেগভিনা প্রদেশ অষ্ট্রীয়-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলে। এই দুইটি প্রদেশে বিশ লক্ষ সার্বিয়ান বাস করে। এককালে বস্‌নিয়া, হার্জেগভিনা, নবিবাজার এবং মণ্টোনিগ্রো সার্ব-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সার্বিয়ান দেশহিতৈষীদের চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল এই সকল দেশ সার্বিয়ার সহিত সংযোজিত করিয়া আবার পুরাতন সার্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। তাহারা ভাবিয়াছিল, তুরস্ককে ইউরোপ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিলেই তাহাদের এই আশা পূর্ণ হইবে; কিন্তু অষ্ট্রীয়া এই দুইটি প্রদেশ তুরস্কের হাত হইতে কাড়িয়া লওয়ায় তাহাদের এই আশা হত হইল। তখন সার্বিয়া এবং মণ্টোনিগ্রো অষ্ট্রীয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল—কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য শক্তিবর্গ প্রকারান্তরে অষ্ট্রীয়ার কার্য্য অনুমোদন করায় তাহারা আর যুদ্ধঘোষণা করিতে সাহস করিল না। কিছুদিন পর অষ্ট্রীয়া ঘোষণা করিল যে, সার্বিয়ার প্রতি তাহার কোন বিদ্বেষ-ভাব নাই এবং সে কখনও সার্বিয়ার অখণ্ডতার উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। সার্বিয়ার রাজকুমারের খুব ইচ্ছা ছিল, অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করা। দেশের অনেক লোকও তাঁহার পক্ষাবলম্বী ছিল। রাজা পিটার ইহাতে মত না দেওয়ায় রাজকুমারের সহিত তাঁহার খুব ঝগড়া বাধিয়া যায়। রাজকুমার পিতাকে দুই-তিনবার প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ করেন। অবশেষে তিনি পৈত্রিক সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সার্বিয়ার ভাবী উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হয়েন।

বার্লিন সন্ধির পর ইউরোপের অনেক রাজপুরুষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বলকানে প্রকৃত শান্তিস্থাপন করিতে হইলে, বলকানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একতাসূত্রে বন্ধন করিয়া একটা Balkan Confederationএর সৃষ্টি করিতে হইবে। ১৮৯১ খৃঃঅব্দে গ্রীশের রাজমন্ত্রী ট্রিকোপিস ইহার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার একগুঁয়েমির দরুণ তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। বলকান রাজ্যগুলির ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল প্রধানত মেসিডনিয়া লইয়া। মেসিডনিয়া তখন তুরস্কের অধীনে ছিল। তুর্কী ব্যতীত মেসিডনিয়াতে সার্ব, বুলগার, গ্রীক ও রুমেনিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি বাস করে;—তাই বলকান-উপদ্বীপের প্রত্যেকটি রাজ্যই মেসিডনিয়া অধিকার করিতে চায় এবং ইহা লইয়া বলকানের সকল জাতির ভিতর বহুকাল ধরিয়া প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। সুলতান আবদুল হামিদের রাজ্যশাসন-প্রণালীর প্রধান লক্ষ্য ছিল, মেসিডনিয়ার বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে বিবাদ বাঁধাইয়া দিয়া এই শত্রুতা সজীব রাখা;—তাই আবদুল হামিদের সময় মেসিডনিয়াতে সমানে অরাজকতা চলিতেছিল। ১৯০৮ খৃঃঅব্দে যখন নব্য তুর্কীদের অভ্যুদয় হয়—তখন সকলেই আশা করিয়াছিল, মেসিডনিয়ার এই অরাজকতার

অবসান হইবে; কিন্তু ফলে ঠিক তাহার উল্টা হইল। নব্যতুর্কীরা ভাবিলেন যে, তুরস্কের সার্ব, বুলগার, গ্রীক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় অধিবাসীদিগের জাতি-ধর্ম্মের ব্যবধান দূর করিয়া সকলকে একবারে তুর্কী বানাইবেন। তাঁহাদের এই অদূরদর্শিতার ফল এই হইল যে, এই সকল বিভিন্ন জাতি তাহাদের পূর্ব্বের শত্রুতা ভুলিয়া গেল এবং তুর্কীকে ইউরোপ হইতে তাড়াইবার নিমিত্ত একদল হইল। এই উদ্দেশ্যে ১৯১২ খৃঃঅব্দে Balkan League স্থাপিত হইল এবং ঐ বৎসরই ঐ League তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল। এই যুদ্ধের ফলে সার্বিয়ার আয়তন প্রায় পনর হাজার বর্গ মাইল বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কোস্তোভোর বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র পাঁচশত বৎসরেরও অধিককাল পর আবার সার্বিয়ার সীমানাভুক্ত হইয়াছে।

বলকান-সমরের পর সার্বিয়াতে অষ্ট্রীয়ার প্রতি বিদ্বেষ আরো বাড়ে। জার্ম্মানির চক্ষু যেমন অনেক দিন যাবৎ কনস্তান্তিনোপলের উপর পড়িয়াছে, সেইরূপ অষ্ট্রীয়ার নজর সালোনিকার উপর। এই উভয় স্থানেই পৌঁছিতে হইলে সার্বিয়ার মোরাভা উপত্যকার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, তাই অষ্ট্রীয়া সার্বিয়াকে যতদূর সম্ভব গ্রাস করিতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্যেই সে বস্‌নিয়া এবং হার্জেগভিনা অষ্ট্রীয়-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। বাণিজ্য-হিসাবে সার্বিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মানির করতলে ছিল। সার্বিয়ার বাণিজ্যের তিনভাগের দুইভাগই অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মানির হাতে ছিল। সার্বিয়ান কৃষকদের অবস্থা খুব সচ্ছল—কিন্তু দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা নিতান্ত খারাপ। শূকর-পালনই সার্বিয়ানদের প্রধান ব্যবসা এবং শূকরই সার্বিয়ার প্রধান সম্পত্তি। দেশের খনিজ সম্পত্তি প্রায় সমস্তই যুদ্ধের পূর্ব্বে বেলজিয়ানদের হাতে ছিল। সার্বিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিলে অষ্ট্রীয়ার চির-অসন্তুষ্ট স্লাভ অধিবাসীগণ সহজেই বিদ্রোহী হইতে পারে; তাই সার্বিয়ার আয়তন বৃদ্ধি হয়,—ইহা অষ্ট্রীয়ার ইচ্ছা নহে। সার্বিয়ার সীমানা কোথাও সমুদ্র স্পর্শ করে না। বলকান-সমরের পর সার্বিয়ানরা আড্রিয়াতিক সাগরের উপকূলে দুই-একটী বন্দর পাইবার আশা করিয়াছিল; কিন্তু অষ্ট্রীয়ার চক্রান্তে তাহাদিগের সেই আশা পূর্ণ হইল না। যাহাতে সার্বিয়া আড্রিয়াতিকের উপকূল পর্য্যন্ত না পৌঁছিতে পারে, তাহার জন্য অষ্ট্রীয়ার প্রস্তাবে আলবেনিয়াকে একটা পৃথক রাজ্যে পরিণত করা হইল এবং একজন জার্ম্মান রাজকুমার ঐ দেশের রাজা নিযুক্ত হইলেন। ইহাতে বলকানে জার্ম্মানীর প্রভাব আরো বাড়িয়া গেল। ১৯১৩ খৃঃঅব্দের বুখারেষ্টের সন্ধিতে এই সব ঠিক করা হইয়াছিল। এই বুখারেষ্টের সন্ধিই বর্ত্তমান যুদ্ধে বলকান রাজ্যগুলির লিপ্ত হওয়ার মূল কারণ। জর্ম্মানি ও অষ্ট্রীয়া বলকান উপদ্বীপে প্রধান হইয়া উঠে, ইহা রুষিয়ার অভিপ্রায় নহে। বলকানের—বিশেষতঃ সার্বিয়ার অধিবাসীরা অধিকাংশই জাতিতে স্লাভ এবং ধর্ম্মমতে Orthodox Churchএর অন্তর্ভুক্ত। রুষিয়া স্লাভ জাতিদের

রক্ষক এবং Orthodox Churchএর নেতা;—তাই যখন সারাজেভোর হত্যা-কাণ্ডের পর অষ্ট্রীয়া সার্বিয়াকে আক্রমণ করিল, রুষিয়াও অমনি বিপন্ন সার্বিয়াকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। বর্ত্তমানে এক মনাষ্টির ভিন্ন সমুদয় সার্বিয়া শত্রুর হস্তগত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

ছন্নছাড়া

(১৫)

ভোর হবার অনেক আগেই উঠে, আমি রান্নাঘরের বাসি-পাট সারতে লেগে গেলুম। বড়-বড় তামার হাঁড়িগুলো কেমন-করে তুলতে হয় মেলানি আমায় দেখিয়ে দিলে। এগুলো তুলতে শুধু গায়ের জোর নয়, একটু কায়দারও দরকার। একটা হাঁড়ি নিয়েই ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে আমার সপ্তাহ-খানেকের উপর কেটে গেল। ঘুম-ভাঙাবার ভারি ঘণ্টাটা কেমন-করে দড়ি-টেনে বাজাতে হয় মেলানি তাও আমায় শিখিয়ে দিলে। সে-কাজ খুব শীঘ্রই আমার সড়গড় হয়ে গেল। রোজ সকালে—বৃষ্টিই হোক, আর বরফই পড়ুক—আমি মহা ফুর্ত্তি করে ঘণ্টা বাজাতুম। তার আওয়াজ ছিল খুব স্পষ্ট—বাতাসের গতিকে তার জোর বাড়ত, কমত। এই শব্দ শুনে-শুনে আমার কখনো বিরক্তি ধরতনা। একএকদিন আমি এতক্ষণ-ধরে বাজিয়ে যেতুম যে সিষ্টার আঁজ্ তার ঘরের জানলা খুলে কাকুতি-মিনতি করে বলে উঠত—ব্যস্, ব্যস্,—আর নয়।

রান্নাঘরের কাজে আমি এসে অবধি বেহায়া ভেরোনিক্‌টা আমার সঙ্গে কথা কইবার সময় মুখ-ফিরিয়ে থাকত। আমি যদি জিজ্ঞাসা করতুম অমুক জিনিষটা কোথায় আছে, সে কথা না বলে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত। সিষ্টার আঁজ্ তার এই ব্যবহার চুপ-করে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করত;—দেখতে-দেখতে তার ঠোঁট কুঁকড়ে-আসত। আগেকার মতন এখন তার মেজাজ আর তেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠেনা বটে কিন্তু এখনো তার সেই স্ফূর্ত্তি, সেই রঙ্গ-রস মরেনি। রোজ সন্ধ্যাবেলা আমরা দুজনে যখন ঘরে গিয়ে বসতুম, দিনের বেলায় যে-সব ব্যাপার ঘটেছে তাতে মজার মজার টিপ্পনি কেটে সে আমায় হাসাত। একএকসময় আমার হাসি কান্নায় গিয়ে শেষ হত। তখন সে সাধুপুরুষদের ছবিতে যেমন আছে তেমনিধারা হাত জোড় করে উপর দিকে চেয়ে বলত—"তোমার সকল দুঃখ দূর হোক—তোমার সকল কষ্টের অবসান হোক!" বলে সে মাটিতে হাঁটুগেড়ে প্রার্থনা করতে বসত। তার মাটি-ছেড়ে ওঠবার আগেই আমি প্রায় ঘুমিয়ে পড়তুম।

রান্নাঘরের কাজে ভারি মেহনৎ ছিল। সেই বড়-বড় হাঁড়িগুলো মাজা, টালির

রেঁধে ধোয়ামোছা, মেলানির সঙ্গে-থেকে আমি করতুম। প্রায় সবটা সে নিজে একাই করত। পুরুষমানুষের মতন তার সামর্থ্য ছিল। আমাকে সে বেশি খাটতে দিত না। যেমন দেখত আমি একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছি অমনি আমায় জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দিত; বলত—"এইবার তোমার জিরেনের সময়!" আমার এখানে আসবার দু-একদিন পরেই সে আমার মনে পড়িয়ে দিলে যে তার সেই স্কুলের পড়ামুখস্থ করতে কী মুস্কিল হত। সে এখনো ভোলেনি যে একটা বছর আগাগোড়া আমি খেলার সময় খেলা না করে তার পড়া মুখস্থ করিয়ে দিয়েছি। তাই বোধ হয় এখন সে আমায় এই বিশ্রাম দিয়ে খুসি বোধ করছে।

ভেরোনিকের কাজ ছিল কুট্‌নো কোটা। এ-ছাড়া সে কসাইয়ের কাছ-থেকে মাংস দেখে নিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কসাই-ছেলেদের পাল্লায় মাংস তোলা শেষ হত, সে ওজনের সাম্‌নে গোঁ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। মাংস নিয়ে তার ঝগড়ার অন্ত ছিল না; হয় বলত মাংস-গুলো আজ বেজায় বড়-করে কাটা হয়েছে, নয় বলত বেজায় ছোট হয়েছে। কসাই-ছেলেরা মাঝে-মাঝে রেগে উঠে কড়া কথা শুনিয়ে দিত। শেষে একদিন সিষ্টার আঁজ্ আমায় বল্লে, এবার থেকে তোমায় মাংস দেখে নিতে হবে। পরের দিন ভেরোনিক যথা-সময়ে ওজনের সামনে এসে হাজির; কিন্তু আমি তার আগেই এসে সিষ্টার আঁজের সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়েছি;—সে আমায় বুঝিয়ে দিচ্ছে কেমন-করে ওজন দেখে নিতে হয়।

(১৬)

একদিন সকালে কসাই-ছেলেদের মধ্যে একজন আমার পানে চেয়ে আমার নাম করলে। সিষ্টার আঁজ্ ও আমি তার দিকে অবাক হয়ে চাইলুম। সে-ছেলেটা নতুন এসেছিল। আমি দেখেই তাকে চিনতে পারলুম। সে জাঁ-ল্য-রুজের বড়-ছেলে। আমাকে দেখে সে আহ্লাদ করতে লাগল। সে বল্লে তার বাপ দেলোয়াঠাকরুণের বাড়িতে বেশ ভালো চাকরি পেয়েছে। চাষের কাজ তার মনের মতন হলনা বলে সে নিজে সহরে এসে এক কসাইয়ের দোকানে ঢুকেছে। তার পর সে বল্লে যে দেলোয়া-ঠাকরুণের বাড়ি ভিলেভিয়েইর খুব কাছে। বলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে যে আমি সে বাড়ি চিনি কি-না। আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম, হাঁ—চিনি। সে বলে যেতে লাগল যে তার বাপ-মা আজ কয়েক মাস হল সেখানে আছে; গেল-সপ্তাহে সেখানে খুব-একটা বড় ভোজ হয়ে গেছে—আঁরির বিয়ে হয়ে গেল তাই। তারপর আরো-কতকগুলো কি কথা আমার কানে এসে লাগলমাত্র—কিছুই বুঝতে পারলুম না। হঠাৎ রান্নাঘরের মধ্যেকার দিনের আলো অমাবস্যার রাত্রের মতন অন্ধকার হয়ে এল; বোধ হ'ল পায়ের তলা থেকে মেঝের টালি সরে গিয়ে আমি যেন অতল গহ্বরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। দেখলুম সিষ্টার আঁজ্ আমাকে ধরবার জন্যে এগিয়ে এল, কিন্তু কি-একটা জানোয়ার আমার বুকের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে বেঁধে ফেলেছিল—তার করুণ কাৎরানিতে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল। সে যেন ঠিক ফুঁপিয়ে-

ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দের মতন—প্রত্যেকবারই একজায়গায় এসে থামছিল। তার পর হঠাৎ আবার আলো ফিরে এল, সিষ্টার আঁজ ও মেলানির মুখ আমার শিয়রে দেখতে পেলুম। দুজনেরই মুখে উৎকণ্ঠা-জড়ানো মৃদু হাসি। মেলানির সেই পুরোন্ত গোলাপি মুখখানা সিষ্টার আঁজের শীর্ণ ফেকাশে মুখের মতনই দেখাচ্ছিল। আমি আশ্চর্য্য হয়ে উঠে বসলুম—এই দিনের বেলায় বিছানায় শুয়ে কেন? জাঁ-ল্য-রুজের ছেলের কথা আমার মনে পড়ে গেল; ঘণ্টার পর ঘণ্টা-ধরে আমার হৃদয়ের বেদনার সঙ্গে আমার লড়াই চলতে লাগল।

রাত্রে শোবার সময় সিষ্টার আঁজ্ ঘরে এসে আমার বিছানার পাশতলায় বসল। সাধু-মহাত্মাদের মতন হাতদুটি জোড় করলে; বল্লে—"তোমার কি দুঃখ আমায় বল।" আমি তাকে সব বল্লুম। বলতে বলতে মনে হতে লাগল যেন আমার প্রত্যেক কথার সঙ্গে আমার দুঃখের খানিকটা করে হাল্‌কা হয়ে যাচ্ছে।

যখন সব বলা হয়ে গেল সিষ্টার আঁজ "ইমিটেশন অফ্ ক্রাইস্‌ট" এনে চেঁচিয়ে পড়তে লাগল। সে ধীর, হতাশ সুরে পড়ে যাচ্ছিল; তারমধ্যে এমন-এক-একটা কথা ছিল যা হাহাকারের শেষ-রেশের মতন কানে এসে লাগতে লাগল।

এখন থেকে জাঁ-ল্য-রুজের ছেলের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হত। সে দেলোয়াঠাকরুণের বাড়ি "লষ্ট ফোর্ডের" অনেক গল্প আমায় শোনাত। সে যখন বলে যেত তার বাপ-মা সেখানে কেমন সুখে আছে, তাদের মনিব তাদের কত যত্ন করে, তখন আমার চোখের সামনে ফুটে উঠত পাহাড়ের উপর-কার সেই ছোট বাড়িটি—সেই ফুলে ভরা বাগান, সেই ছোট ঝরণা—যা ঝোপঝাপের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে গড়িয়ে গিয়ে নদীতে পড়েছে। ঐখানকার গল্প আমি আঁজ্‌কে প্রায়ই বলতুম; সে স্তব্ধ হয়ে শুনত। আশ পাশের সব জায়গা—সেখানকার নাড়ি-নক্ষত্র সমস্ত সে জানত। একদিন সন্ধ্যাবেলা সে স্বপ্নাবিষ্টের মত বসে ছিল, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি কি ভাবছ? সে বল্লে, আমি ভাবছি, গ্রীষ্ম শীঘ্রই শেষ হয়ে আসবে, কিন্তু ঐ গাছগুলো ফলে-ফলে ভরে রয়েছে।

(১৭)

সমস্ত সেপ্টেম্বর মাসটা ধরে, যাঁরা ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন এমন অনেক মেয়ে গুরুমায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতে লাগলেন। তাঁরা যেমন-যেমন আসতেন "গোরুচোখী" ঘণ্টা বাজিয়ে খবর দিত। প্রত্যেক ঘণ্টার শব্দে ভেরোনিক্ বেরিয়ে গিয়ে দেখে আসত, কে এলেন। যাঁদের সে চিনত তাঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু নিন্দের কথা সে বলতই। একদিন সন্ধ্যাবেলা ঘণ্টা বেজে উঠল। ভেরোনিক্ বাইরের দিকে চেয়ে বলে উঠল—"যাকে কেউ কোনো দিন প্রত্যাশা করেনি—তিনিও যে এলেন দেখছি!" বলে সে রান্নাঘরের ভিতর মাথা ঢুকিয়ে নিয়ে বল্লে—"আমাদের মারি এমে এলেন!" আমি তখন হাঁড়িতে হাতা দিচ্ছিলুম, সেখানা হাত-থেকে পিছলে হাঁড়ির মধ্যে পড়ে গেল। আমি

ঊর্দ্ধশ্বাসে দরজার কাছে ছুটে গেলুম। ভেরোনিক আমাকে ধরতে, তাকে সজোরে এক ঠেলা মারলুম। মেলানি আমার পিছনে ছুটে এসে বলতে লাগল—"যেয়োনা যেয়োনা, গুরুমা এখনি দেখে ফেলবে।" আমি কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে একেবারে মারি এমের গায়ের উপরে এমন জোরে ঝাঁপিয়ে পড়লুম যে দুজনেই আর-একটু হলে পড়ে যেতুম। তিনি আমাকে আঁকড়ে ধরে রইলেন। তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল,—আনন্দে যেন পাগলের মতন হয়ে গেলেন। তাঁর হাতের মধ্যে আমার মাথাটি রেখে, যেন আমি এখনো কচি-মেয়ে এমনি করে আমার মুখ-ভরে চুমু খেতে লাগলেন। তাঁর মাথার স্মৃতির শক্ত টুপিটা কাগজের মতন খড়খড় শব্দ করতে লাগল, এবং তাঁর জামার আস্তিন উল্টে কাঁধের উপর গিয়ে পড়ল। মেলানি ঠিক বলেছিল;—গুরুমা আমাকে দেখে ফেল্লেন। তিনি উপাসনা মন্দির থেকে বেরুলেন, বেরিয়ে আমাদের দিকে এলেন। মারি এমে তাঁকে দেখতে পেলেন, অমনি আমাকে চুমু খাওয়া তাঁর বন্ধ হয়ে গেল—তিনি আমার কাঁধের উপর হাত রাখলেন। আমি তাঁকে দু-হাত দিয়ে একেবারে জড়িয়ে ধরলুম—পাছে কেউ তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে গুরুমাকে লক্ষ্য করতে লাগলুম। তিনি আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেলেন—চোখ তুল্লেন না; মারি এমে তাঁকে গম্ভীরভাবে একটা নমস্কার করলেন; কিন্তু তিনি দেখলেন বলে মনে হল না।

যেমন গুরুমা চলে গেলেন, আমি টানতে-টানতে মারি এমেকে সেই পুরোনো বেঞ্চিখানার কাছে নিয়ে গেলুম। বেঞ্চির সামনে তিনি চুপ করে খানিক দাঁড়িয়ে রইলেন; বসবার আগে বল্লেন—"দেখে মনে হচ্ছে যেন এই সব জিনিষগুলো আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করেছিল।" বলে তিনি বসে পড়লেন। সেই গাছটার গায়ে হেলান দিলেন। আমি তাঁর পায়ের তলায় ঘাসের উপর হাঁটু-গেড়ে বসলুম। তাঁর চোখে আর সেই জ্যোতি নেই—সেই বিচিত্র রঙের আভা যেন একসঙ্গে ঘুলিয়ে গেছে। তাঁর সেই সুন্দর ছোট্ট মুখখানি আরো ছোটো হয়ে এসেছে, এবং মনে হচ্ছে যেন টুপির ভিতর তা আরো সেঁধিয়ে গেছে। তাঁর সেই সুন্দর গড়ন একেবারে ভেঙে পড়েছে; হাত দুখানি এত রোগা হয়ে গেছে যে নীল-নীল শিরার দাগ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর নিজের ঘরের জানলার দিকে তিনি বড় চোখ-দিচ্ছেলেন না; গাছগুলোর উপর দিয়ে এবং উঠানের চারপাশে তাঁর চোখ ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ যেমন গুরুমায়ের বাড়ির দিকে তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল তিনি দীর্ঘশ্বাসের মতন করুণ অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন—"আমরা নিজেরা যদি ক্ষমা চাই, তবে অপরকেও আমাদের ক্ষমা করতে হবে।" বলে আমার দিকে আবার ফিরে চেয়ে বল্লেন—"তোমার চোখ দেখছি বিষাদে ভরা।" বলে তিনি আমার চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন—যেন আমার চোখের উপরকার কি-একটা জিনিষ তাঁর ভালো লাগছে না বলে তিনি মুছে ফেলে দিতে চান। তাঁর হাত আমার দৃষ্টি বন্ধ করে

চোখের উপর পড়ে রইল। তিনি বল্লেন—"আমাদের এ কী দুঃখ ভোগ!" তারপর আমার চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে আমার হাত চেপে ধরলেন, আমার মুখের উপর চোখ রেখে এমন সুরে বল্লেন, যেন প্রার্থনা করছেন—তিনি বল্লেন—"লক্ষ্মী-মা আমার, বলি শোনো, কখনো এই যেমন-তেমন-গোছের ধর্ম্মসেবিকা হয়োনা।" তারপর একটা অনুশোচনার দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলতে লাগলেন—"আমাদের এই সাদা-কালো পোষাক দেখে লোকেরা মনে করে আমরা শক্তির আধার, আনন্দের উৎস। আমাদের কথায় সকলের চোখের জল শুকোয়, জগতে যারা দুঃখী, সান্ত্বনা পাবার জন্যে আমাদের কাছে আসে, কিন্তু আমাদেরও যে দুঃখ থাকে একথা কারোর মনেই হয় না।—আমরা যেন কাঠের পুতুল।" এই-সব বলবার পর তিনি ভবিষ্যতে কি করবেন সেই সব কথা বলতে লাগলেন। তিনি বল্লেন—"পাদরিরা যেখানে যায়, আমি এখন সেইখানে যাবো। সেখানে আমায় এমন একটা বাড়িতে থাকতে হবে যেখানে আছে কেবল ভয়। যাকিছু ভয়ানক, যা বীভৎস, যা বিশ্রী, যা মন্দ তাই কেবল আমার চোখের সামনে অনবরত ঘটতে থাকবে।" আমি তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে যাচ্ছিলুম। আমার মনে হচ্ছিল তাঁর এই কথার ভিতরে ভারি-একটি আবেগের সুর রয়েছে—যেন জগতের সমস্ত দুঃখের ভার তিনি নিজের মাথায় তুলে নিতে যাচ্ছেন। আমার হাত থেকে তাঁর হাতের আঙুল আল্‌গা হয়ে এল, আমার গায়ের উপর হাত বুলিয়ে তিনি স্থির স্নিগ্ধ স্বরে আমায় বল্লেন—"তোমার মুখের এই পবিত্রতাটুকু আমার মনে চিরদিন আঁকা থাকবে।" বলতে-বলতে তাঁর দৃষ্টি আমাকে ছাড়িয়ে দূরের দিকে চলে গেল। তিনি বল্লেন—"ভগবান আমাদের স্মৃতি দিয়েছেন, কারো সাধ্য নেই আমাদের সে-সম্পদ কেড়ে নেয়।" বলে তিনি বেঞ্চি ছেড়ে উঠে পড়লেন। আমি তাঁর সঙ্গে উঠোন পেরিয়ে গেলুম। তারপর "গোরুচোখী" যখন তাঁকে বার করে দিয়ে প্রকাণ্ড ফটকটা সশব্দে বন্ধ করে দিলে আমি দাঁড়িয়ে শুধু তার প্রতিধ্বনি শুনতে লাগলুম।

সেদিন রাত্রে সিষ্টার আঁজ্‌ অন্য দিনের চেয়ে একটু দেরী করে ঘরে এল। মারি এমে কুষ্ঠরোগীদের সেবা করতে যাচ্ছেন বলে সে দিন যে বিশেষ-উপাসনা হল তাতে সে যোগ দিতে গিয়েছিল।

(১৮)

আবার শীত ঘুরে এল। সিষ্টার আঁজ্‌ জানতে পেরেছিল যে আমি বই পড়তে ভালোবাসি। সে লাইব্রেরী থেকে আমার জন্যে এক-এক-করে সব বই আনতে লাগল। অধিকাংশই ছেলেমানুষী বই। আমি হু-হু-করে পড়ে যেতুম—এক-সঙ্গে খানকতক-করে পাতা উল্টে-উল্টে। ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বই আমার সব চেয়ে ভালো লাগত—আমি রাত জেগে প্রদীপের আলোয় পড়তুম। সিষ্টার আঁজ্‌ যখন হঠাৎ ঘুম-ভেঙে জেগে উঠত আমাকে তিরস্কার করত, কিন্তু সে যেমনি ঘুমিয়ে পড়ত আমি আবার বই তুলে নিতুম। একটু-একটু-করে আমাদের বন্ধুত্ব

জমে উঠছিল। রাত্রে সেই সাদা পর্দ্দার আড়াল আর ছিল না। আমাদের দুজনের মধ্যে সকল বাধাবন্ধ ঘুচে গিয়েছিল;—আমাদের মনের ভাবনা একই ধারায় চলেছিল। সর্ব্বদাই তার ফুর্ত্তি, তার জল্‌জলে ভাব। কেবল একটি জিনিষ যার জন্যে তার খুঁৎখুঁতুনি ছিল তা হচ্ছে তার সেই ধর্ম্ম-সেবিকার পোষাক। এ পোষাক তার গায়ে বড় ভারী ঠেকত, অসোয়াস্তি হত—মনে হত যেন গায়ে বিঁধচে। সে বলত, আমি যখন এই পোষাক পরি তখন আমার মনে হয় যেন একটা ঘোর অন্ধকার বাড়ির মধ্যে গিয়ে সেঁধলুম। রাত্রিবেলা কাপড় ছাড়বার সময় হলে সে ভারি খুসি হত—রাত্রের কাপড় পরে ঘরের মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াতে তার আনন্দ দেখে কে! সে সেই মজার-রকম মুখভঙ্গী করে বলত—"ক্রমেই আমার সয়ে আসছে, কিন্তু প্রথম-প্রথম মনে হত টুপিটা যেন আমার গাল দুটোকে চেপ্‌টে ধরেছে, পোষাকের ভার আমার ঘাড়টাকে নীচের দিকে চেপে দিচ্ছে।

বসন্তকাল আসতেই সে খুক-খুক করে কাশতে আরম্ভ করলে। তার শুকনো কাশি ছিল; মধ্যে মধ্যে তা কঠিন হয়ে উঠে তার সেই দীর্ঘ পাতলা দেহটিকে একেবারে শীর্ণ করে ফেলত। তার সেই ফুর্ত্তি, সেই জল্‌জলে ভাব আগের মতন সমান বজায় ছিল বটে কিন্তু সে বলত তার পোষাকটা যেন ক্রমেই আরো ভারি হয়ে উঠছে।

(১৯)

মে-মাসের এক রাত্রে সে ছট্‌ফট্‌ করে স্বপ্নে বিড়-বিড় করে বকতে লাগল। আমি সমস্ত রাত্রি ধরে বই পড়ে যাচ্ছিলুম—হঠাৎ চমকে উঠে দেখি ভোরের আভা ফুটে উঠেছে। আমি প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। বিছানায় গড়াতে যাচ্ছি এমন সময় সিষ্টার আঁজ্‌ বলে উঠল—"জানলাটা খুলে দাও—আজ তিনি আসবেন।" সে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে বকছে কি-না দেখবার জন্যে আমি উঁকি মারলুম। কিন্তু দেখি সে বিছানায় উঠে বসেছে, গায়ের কম্বল ঠেলে ফেলে দিয়েছে, রাত-টুপিটার ফিতে বসে-বসে খুলছে। টুপিটা খুলে সে পাশ্‌ তলায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর মাথাটা ঝাড়া দিতেই তার সেই ছোট্ট চুলের গোছা কপালের উপর কুঁকড়ে-কুঁকড়ে ছড়িয়ে পড়ল। এ দেখি আমাদের সেই ছেলেবেলাকার দেজিরে জোলি যেন আবার ফিরে এল! আমার কেমন-একটু ভয় করতে লাগল, আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লুম। সে আবার বল্লে—"জানলা খোলো; তাঁকে আসতে দাও।" আমি জানলাটা একেবারে খুলে দিলুম; ফিরে দেখি সিষ্টার আঁজ্‌ হাত-দুটি জোড় করে সূর্য্যের দিকে তুলে ধরেছে; হঠাৎ অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে গেছে এমন কণ্ঠস্বরে সে বলে উঠল—"আমার পোষাক খুলে ফেলেছি। আর সহ্য করতে পারলুম না।" বলে সে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল;—তার মুখের ভাব একেবারে শান্ত হয়ে গেল। আমি তার নিশ্বাসের শব্দ শোনবার জন্যে খানিকক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর আমার শ্বাস ঘন ঘন পড়তে লাগল—যেন আমার এই শ্বাস তাকে দিয়ে দিতে চাইছিলুম। তার পর যখন কাছে গিয়ে

ভালো-করে দেখলুম, তখন দেখি তার শেষ-নিশ্বাসটি ফেলা হয়ে গেছে। তার চোখ সম্পূর্ণ খোলা—মনে হচ্ছিল ঐ যে সূর্য্যের রেখাটি তীরের মতন তার কাছে ছুটে আসছে, সে তারই দিকে চেয়ে আছে। গোটাকতক ছোটো পাখী জানলা দিয়ে একবার উড়ে গেল, আবার ফিরে এসে ছোট মেয়েদের মতন কিচ্-কিচ্ কলরব করতে লাগল। আমার কানের কাছে কত-রকম যে অজানা-অশোনা শব্দ হতে লাগল তা বলতে পারি না। আমি স্কুল-বাড়ির শোবার-ঘরের জানলার দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখলুম—যদি কাউকে দেখতে পাই ত বলি। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলুম না—কেবল দেখলুম সেই প্রকাণ্ড ঘড়িটা মুখ নীচু করে গাছের উপর দিয়ে আমাদের ঘরের দিকে চাইছে।

তখন ভোর পাঁচটা। আমি কম্বলখানা সিষ্টার আঁজের গায়ের উপর টেনে দিয়ে ঘণ্টা বাজাবার জন্যে ঘর-থেকে বেরিয়ে গেলুম। অনেকক্ষণ ধরে বাজাতে লাগলুম। তার শব্দের রেশ দূর থেকে দূরে যেতে লাগল। সিষ্টার আঁজ যেখানে গেছে সেই শব্দও যেন সেইখানে গেল। আমি ক্রমাগতই বাজিয়ে যাচ্ছিলুম—কারণ আমার মনে হচ্ছিল যে এই ঘণ্টার শব্দ পৃথিবীময় প্রচার করে বেড়াচ্চে সিষ্টার আঁজ্ আর নেই। আমি আরো বাজাচ্ছিলুম এই আশায় যে সে তার সেই সুন্দর মুখখানি জানলা দিয়ে বাড়িয়ে এখনি বলে উঠবে—"হয়েছে হয়েছে আর নয়—মারি ক্লেয়ার, খুব হয়েছে!"

মেলানি হঠাৎ আমার হাত থেকে ঘণ্টার দড়িটা কেড়ে নিলে। ঘণ্টাটা তখন দুলে উঁচু হয়ে উঠেছে,—বেচাল হয়ে পড়ে কাতর-ধ্বনির মতন একটা শব্দ করে উঠল। মেলানি বল্লে—"তুমি প্রায় পনেরো মিনিট ধরে ঘণ্টা বাজাচ্ছ।" আমি বলে উঠলুম—"সিষ্টার আঁজ্ যে মারা গেছে।" আমাদের পিছনে পিছনে ভেরোনিকও এসে ঘরে ঢুকল। সে লক্ষ্য করে-করে দেখতে লাগল যে আমাদের দুজনের বিছানার মধ্যেকার সেই সাদা পরদাটা খোলা রয়েছে। সে বলতে লাগল—"মাগো, যে ধর্ম্মসেবিকা হয়েছে তার কি এমনি-করে মাথার চুল দেখাতে আছে?—ছি ছি কী ঘেন্নার কথা!" মেলানির দুই-গালে দুই-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছিল, সে তাড়াতাড়ি মুছে নিয়ে চুপি চুপি বল্লে—"কী সুন্দর দেখাচ্চে ভাই—আগেও এত রূপ ছিল না।" সূর্য্যের কিরণে তখন সমস্ত বিছানা একেবারে ভেসে গেছে,—সিষ্টার আঁজের সর্ব্বাঙ্গ তার সোনালি আভায় ভরে উঠেছে।

সমস্ত দিন আমি তার কাছটিতে রইলুম। সিষ্টারদের মধ্যে কেউ-কেউ তাকে দেখতে এলেন। একজন একটুকরা কাপড় দিয়ে তার মুখটা ঢেকে দিলেন। কিন্তু যেমন তিনি চলে গেলেন আমি তৎক্ষণাৎ তা খুলে দিলুম। মেলানি রাত্রিবেলা এসে সেই বিছানার পাশে আমার সঙ্গে বসে রাত কাটালে। ঘরের জানলা বন্ধ করে দিয়ে সে বড় আলোটা জ্বাললে, বল্লে—"আমাদের আঁজকে অন্ধকারের মধ্যে থাকতে দেব না।"

(২০)

একসপ্তাহ পরে একদিন গোরুচোখী রান্নাবাড়িতে এল, আমাকে বল্লে, তৈরি

হয়ে নাও, আজই তোমাকে যেতে হবে। তার হাতের মুঠোয় দুটো মোহর ছিল; সেই দুটো মোহর বড় উনুনটার এক-কোণে পাশা-পাশি রেখে একটার পর আর-একটার উপর আঙুল দিয়ে-দিয়ে বল্লে—"আমাদের গুরুমা তোমাকে এই দুই মোহর পাঠিয়ে দিয়েছেন।" কোলেৎ এবং ইসমেরির কাছে একবার বিদায় না নিয়ে আমার যাবার ইচ্ছে হচ্ছিলনা—তাদের দুজনকে উঠোনের ঐ ওপারে প্রায়ই দেখতুম। মেলানি কিন্তু বল্লে, কেন তাদের জন্য ব্যস্ত হচ্ছ? তারা কেউ তোমায় মনেও করেনা। কোলেতের এই রাগ যে আমি এখনও বিয়ে করিনি কেন? আর ইস্‌মেরি এখনো ভুলতে পারিনি যে আমি মারি এমেকে ভালো বলতুম ও ভালোবাসতুম।

মেলানি আমার সঙ্গে ফটক পর্য্যন্ত এল। সেই পুরোনো বেঞ্চিটার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলুম তার একটা পায়া ভেঙে গেছে,—একদিকটা তার ঘাসের উপর কাৎ হয়ে পড়েছে। ফটকের সামনে দেখলুম একজন মেয়েমানুষ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তার চাহনি ভারি কর্কশ। সে বল্লে—"আমি তোর দিদি।" আমি তাকে চিন্‌তে পারলুম না। এই বারো বচ্ছর তার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। ফটক থেকে বেরতেই সে আমার হাত ধরলে; তার চাহনি যেমন কর্কশ তেমনিধারা কর্কশ কণ্ঠে সে আমায় জিজ্ঞাসা করলে, তোর কাছে কত টাকা আছে? আমি তাকে সেই সোনার মোহর দুটো দেখালুম। সে বল্লে—"তোর সহরে থাকাই ভালো—কাজকর্ম্মের সুবিধা করে নিতে পারবি।" তারপর আমরা চলতে-চলতে সে বল্লে যে এই কাছাকাছি এক জায়গায় সে থাকে; এক মালির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। এখন আমার ঝক্কি সে আর পোয়াতে পারবে না। আমরা ষ্টেশনে এসে পৌঁছলুম। আমাকে সে প্ল্যাটফর্ম্ম অবধি নিয়ে গেল—কারণ তার কয়েকটা জিনিষ বহে নিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। গাড়ি ছেড়ে দিতে সে শুধু বল্লে—"চল্লুম।" গাড়ি চলতে লাগল, আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। তৎক্ষণাৎ আর-একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল। রেলের লোকেরা প্ল্যাটফর্ম্মের এধার-ওধার দৌড়াদৌড়ি করে পারি যাবার যাত্রীদের ডাকাডাকি করতে লাগল। সেই মুহূর্ত্তে আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল পারি সহর—তার সেইসব বড়-বড় বাড়ি যা দেখতে রাজপ্রাসাদের মতন, যার চূড়ো মেঘের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। একজন ছোকরা হঠাৎ আমার গায়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ল। সে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনি কি পারি যাবেন?" বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে আমি বলে ফেল্লুম—"হাঁ যাবো, কিন্তু আমার টিকিট কেনা হয়নি।" সে বল্লে—"দাম দিন, আমি এখনি কিনে এনে দিচ্চি।" আমি তার হাতে আমার সেই মোহর থেকে একটা দিলুম;—সে ছুটে চলে গেল। তারপর টিকিট আর মোহর-ভাঙানি বাকি পয়সা আমাকে এনে দিলে, আমি সেগুলো পকেটে পুরে তার সঙ্গে রেল-লাইন পেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলুম।

প্রায় মিনিটখানেক সেই ছোকরা গাড়ির

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে, চলে গেল; —যাবার সময় একবার ফিরে দেখলে। তার চোখে ভারি একটি মিষ্টিভাব মাখানো ছিল—ঠিক আঁরির চোখের মতন।

রেলের বাঁশি সজোরে একবার বেজে উঠল—যেন আমাকে সাবধান করে দেবার জন্যে। তারপর গাড়ি ছেড়েই টানাসুরে বাঁশি আবার-একবার ফুকরে উঠল—বুক-ফাটা কান্নার মতন!

সমাপ্ত। *

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রবাস-স্মৃতি

আমরা পঞ্জাব মেলে যাত্রা করে, পরদিন রাত্রি দশটায় আগ্রা পৌঁছলাম। গাড়ী ছাড়বামাত্র একজন সহযাত্রীর হাতের উপর জানালা হঠাৎ পড়ে গিয়ে একটি আঙুলে তিনি অত্যন্ত আঘাত পেলেন, রক্তে চারিদিক ভেসে গেল। যাত্রার মুখেই এ অঘটন দেখে সবারি মন বড় দমে গেল, যাই হোক, নিরাপদে এসে পৌঁছন গিয়েছে। ষ্টেশন ছাড়িয়ে সহরের মধ্যে দিয়ে যখন আস্‌ছি, আমি বুঝতে পারলাম যে, বহুদূরে এসেছি, আর আমাদের বঙ্গ-দেশের রাজধানী হ'তে এই প্রাচীন মোগল রাজধানী খুবই বিভিন্ন। রেলপথে আস্‌তে আস্‌তে দৃশ্য যেমন বিচিত্র নূতন দেখব মনে করেছিলাম, তা দেখ্‌লাম না। বাংলা দেশের মতই চারিদিক সবুজ মনে হ'ল, তবে এটা এবারকার প্রচুর বর্ষার জন্যে হয়েছে কিনা জানিনা। পাটনায় ভোর হ'ল। সূর্য্যোদয়ের আকাশ বড় সুন্দর হয়েছিল। ধোঁয়াটে-নীল; ঘন মেঘের গায়ে, পানের পিকের মত মরা মরা নারাঙ্গী-রাঙা আকাশ বড় চমৎকার দেখাচ্ছিল। বাড়ী-ঘর আমাদের বাংলা দেশের থেকে তফাৎ। বাঁকীপুরে অনেক নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ হচ্ছে, সবই হাল ফেশানের। ইউরোপের এই যুদ্ধের দিনে যখন, অদৃষ্ট সবারি তুলাদণ্ডে পরিমাপ হওয়া সমাপন হয়নি, তখন এই নূতনের আয়োজন বড় করুণ মনে হ'ল। ভাগ্যবিধাতা কি বিধান করবেন, তা তো অজ্ঞেয়, কি মানুষের আশার অন্ত নাই, নূতনকে ভুলে থাক্‌তে পারেনা; যে অজানিত, যে কি রহস্যের টানে মনকে সম্মুখের দিকে টেনে নিয়ে চলে, তা বোঝা সহজ নয়। মানুষ যদি অতীতে অভিভূত হয়ে, বর্ত্তমানে

* Margaurite Audoux প্রণীত Marie Claire নামক গ্রন্থের অনুবাদ। ফরাসী-সাহিত্যে এ একখানি নামজাদা বই। লেখার সহজ সরল আবেশময় ভঙ্গীর বিশেষত্বটুকুর জন্য ইহার বেশি আদর। পাশ্চাত্য সমালোচকের দ্বারা এখানি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত এবং Vie Heureuse Committee কর্ত্তৃক বৎসরে শ্রেষ্ঠ পুস্তকরূপে পুরস্কৃত।

স্থবির ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পঙ্গু হয়ে থাকত, তাহলে জগৎ-গতি স্থগিত হয়ে যেত। তাই মানুষের মন অহেতুকী সংস্কার-বশতঃই সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলে, কিম্বা বাধ্য হয়েই যেতে হয়। অতীতের দিকে পিছিয়ে যাবার যে যো-ই নেই! যে মানুষের মন ও জীবন ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে গেছে, তার সম্বন্ধে বিধাতার হিসাব-নিকাশ পরিষ্কার হয়েছে বল্‌তে হবে।

আমাদের এ বাড়ীটি সহর হতে অনেক দূরে, খুব নির্জ্জন ও শান্তিময়। সারাদিন ধরে কেবলি ঘুঘু ডাকে, বড় বড় গাছের ছায়ায় ঘেরা এই বাড়ীখানি, যেন একখানি কুলায়, বড় নিভৃত। আকাশে মেঘ নেই, স্বচ্ছ নীল, সূর্য্যালোকে অতি পরিষ্কার, তার কোথাও কোন আবেশ নেই; ঘুমের ছায়া কি স্বপনের আবছায়া কিছুই নেই। এই দীপ্ত আলোকে গাছপালাগুলিকে নিস্পন্দ স্থির হয়ে থাক্‌তে দেখে মনে হয় তারা জ্যোতির ধারণা করে প্রাণসঞ্চয় করছে। আমারও মনটাকে অম্নি একান্ত আগ্রহে আলোর দিকে নিচেষ্টভাবে ছেড়ে দিয়ে বসে আছি, আমিও আমার দেহ-মনের প্রত্যেক অণু পরমাণু দিয়ে জ্যোতির সাধনা করছি, আমিও প্রাণ-শক্তি সঞ্চয় করতে পারব।

আজ আমরা সহরের কতক অংশ আর তাজমহল দেখে এলাম। এখানকার পথ-ঘাট খুব প্রশস্ত ও পরিষ্কার, নিজ সহরের ছাড়া, একটু দূরের এই বাড়ীগুলিতে, অনেকখানি করে জমি আর বাগান আছে। তাই সহরের ধূলো আর কলরব দুইই দূরে থাকে। আমরা যখন তাজমহলের দ্বারস্থ হ'লাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, চতুর্থীর চাঁদের আলো অস্পষ্ট। তাই স্বল্প আলোকে সবই আকারবিশিষ্ট মনে না হয়ে ভাবের আভাসের মত মনে হ'ল। তাজের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে দূরে বড় গম্বুজটি আকাশের গায়ে সাদা মেঘস্তূপের মত দেখাচ্ছিল, সে যে ভারী, বড় বড় পাথরে গঠিত, তা মনে হয় নি, সে যেন ধূমবর্জ্জিত শুভ্র বাষ্পের, যার সঙ্গে পৃথিবীর ধূলোর কোন সম্পর্ক নেই। তাজ নিঃস্বার্থ ভালবাসার মত পবিত্র শুভ্র, একাগ্র কামনার মত অটল দৃঢ়, পাষাণ হয়েও ফুলের মত সুকুমার। তারি মত চির-সুন্দর, কত যুগ যুগান্ত গত হয়ে গিয়েছে, তবু তার সৌন্দর্য্য অখণ্ড। এ যেন শিবের জন্যে পাষাণতনয়া গৌরী পার্ব্বতীর সাধনা। প্রার্থিতের অপার্থিব সৌন্দর্য্য একে স্বর্গীয় করেছে। কৌমুদী-কর-স্নাত, পতিতপাবনী গঙ্গাধারায় বিধৌত; মহাদেবের অমল লাবণ্যের মতই সুষমাময়। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল তাই অন্তরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ভাল করে দৃষ্টিগোচর হয়নি।

ফিরবার পথে গাড়ী বাজারের মধ্যে দিয়ে এল, সেখানে দোকানে স্তূপাকার করে সাজান আঙ্গুর আপেল নাস্‌পাতি দেখতে চোখে বড় ভাল লাগল। তরকারীও রাশীকৃত, কতরকমের সবুজের সমাবেশ। হাল্কা ধানী হ'তে আরম্ভ করে ক্রমে প্রগাঢ় মরকত-শ্যামে গিয়ে শেষ হয়েছে।

আকবর সাহের সমাধি সিকান্দ্রা আমরা শনিবার বৈকালে দেখে এসেছি। সে

মথুরা যাবার পথে, পথটি বড় সুন্দর। কিছুদূর আগে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর বাঁধান ঘাটের ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। পুকুরটি কম-করে ১০।১৫ বিঘা জমির উপরে, তার চারদিকে মিনারেট দেওয়া ২১টি জল-টুঙী আছে। ঘাটগুলি সুপ্রশস্ত, পুকুরে এখন বিন্দুমাত্র জল নেই, রাখাল গরু চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, বর্ষায় কিছু জল জমে বোধ হয়। এরি কিছুদূরে রেল-লাইনের ধারে আকবর সাহের ভালবাসার ঘোড়ার কবর রয়েছে। কবরের উপর ঘোড়ার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত; কালের তাড়নায় তার সাজ-সজ্জা আর কিছুই নেই, কাণদুটিও অন্তর্ধান, কেবল একখানি গোটাপাথর হ'তে ঘোড়ার যে মূর্ত্তি ভাস্কর গড়েছিলেন সে তেম্নি জীবিতের মতই আছে। এতদিনেও তার গায়ের বর্ণ ম্লান হয়নি। এরি কাছে একটি ধর্ম্মশালা ও দেববন্দির আছে, মন্দিরের চারিদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা প্রকাণ্ড বাগান। প্রাচীরের উপর কত ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছিল, নির্জ্জন শান্তিময় স্থান, বাতাসটি পরিষ্কার, পথখানি দুধারের ছায়ায় সুস্নিগ্ধ।

সিকান্দ্রা আকবর বাদশাহ নির্ম্মাণ করিয়ে ছিলেন, তাঁর ইচ্ছা ছিল রাজ-পরিবারের সকলেরি সেখানে সমাধি হয়, তা হয়নি। চারিদিকে চারটি ফটক—বাগানের পরিমাণ একক্রোশ বিস্তৃত। সমাধি-প্রাসাদ চৌতলা। প্রত্যেক তলার চারিদিকে চারটি গম্বুজ, তারি সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতে হয়। একতলার চেয়ে দোতলা, তার চেয়ে তেতলা, সবচেয়ে চৌতলা ক্রমে ছোট হয়ে এসেছে। সব-নীচের তলায় একটি স্নিগ্ধ অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে আকবর বাদশাহের আসল সমাধি—সাদা পাথরের, একেবারে সাদাসিধে, তার গায়ে কোন কারুকাজ নেই। সুড়ঙ্গের মধ্যে কথা কইলে স্বর ক্রমে ক্ষীণ হয়ে দূরে দূরে মিলিয়ে যায়। দুদিকে দুটি জালি-কাটা ঝরোকা আছে, তাই দিয়ে অবিরাম ঝির ঝির করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, ঝাউগাছের সারির মধ্যে দিয়ে বাতাস বয়ে গেলে, যেমন একটি দীর্ঘনিশ্বাসের মত শব্দ শোনা যায়, এই বাতাসেরও তেম্নি বিষণ্ণ উদাসীন ভাব আছে। এই কবরখানি বাড়ীটির ঠিক মাঝে, আশে-পাশে সম্মুখে রাজপরিবারের অনেকের সমাধি; তারি মধ্যে জাহাঙ্গীর নূরজাহানের দুই বৎসরের মেয়ের ছোট্ট কবরটি দেখে দুঃখ হল।

সেটি এম্নি করে তৈরি করেছে যে তার উপর ছোট চৌবাচ্চার মত জায়গায়, একমণ দুধ ভরে, সেকালে প্রতিদিন কাঙাল ছেলেদের মধ্যে সেটা বিলি করে দেওয়া হ'ত। এখন আর সে অনুষ্ঠান নেই। উপরে উঠ্‌লে চারিদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখায়। দূরে যমুনা, তারি কোলের উপর হতে তাজের সাদা মেঘের মত গম্বুজগুলি দেখা যায়। উপরের চাতালটি সাদা পাথরের জালি-কাজ করা, প্রাচীর দিয়ে ঘেরা; বস্‌বার জায়গাগুলি সুন্দর, তাতে সাদা, কাল ও রঙীন পাথর-বসান লতাপাতার কাজ। কাজ সুন্দর, পরিপাটী, আড়ম্বর-হীন। বিচিত্র হয়েও সাম্যরক্ষা করেছে, কোনও আকার কি বর্ণ, নিকটের অপরকে পীড়া দিচ্ছে না। চৌতলার ছাদের উপর

আকবরের নকল গোর, এটি তিনি নিজেই করিয়ে গিয়েছিলেন। সমাধি-শিয়রে একটি স্তম্ভ, তারি উপরে একটি আধারে সোণার নকল গাছে আসল হীরক-কহিনূর ফলের মত সাজান ছিল। এখন সে গাছ কি ফল কিছুই নেই!

ঔরঙ্গজীবের রাজত্বের পর ভরতপুরের রাজা সুরযমল ১২ বৎসরের জন্যে মোগল সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, সেই সময় জাঠেরা মুসলমান সম্রাটদের অনেক কীর্ত্তি নষ্ট করে। সিকান্দ্রার প্রবেশদ্বারের খিলানের চারিদিকে সুন্দর মীনার কাজের মত নানা বর্ণের বিচিত্র চিত্র করা ছিল; সেইখানে ঘাস পুরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, তাতেই অনেক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যা নষ্ট হয়নি তারি নমুনা দেখে বাকী অংশটা সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা, লর্ড কুর্জ্জন করেছিলেন, কিন্তু সে কাজ এমন ব্যয়-বহুল যে করিয়ে উঠ্‌তে পারেন নি। আগে বুরুজ গম্বুজের মাথায় খাঁটি সোণার কলস আর অর্দ্ধচন্দ্র ছিল, এখন তার স্থানে গিল্টিকরা পিতল। যে সব মুসলমান প্রহরী মৌলভী আছে, তারা ত বলে, হিন্দুরাই সব নিয়ে গেছে। ঔরঙ্গজেব ধার্ম্মিকতার প্রবল আধিক্যে হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির প্রভৃতির অবমাননা করে ছিলেন, হিন্দুরা হাতে পেয়ে তাঁদের মৃতের সমাধিস্থানের অগ্নিসংকার করেছিল। জাতি যখন জাতির বিরোধী হয়ে ধর্ম্মকে অপদস্থ করে, তখনই মনুষ্যত্বের পদবী হারিয়ে হিংস্র পশুতে পরিণত হয়।

ফিরবার পথে চন্দ্রোদয় হল, সপ্তমীর আধখানা চাঁদ, কিন্তু কি পরিষ্কার জ্যোৎস্না! নির্জ্জন পথ, তাতে আলো-ছায়ার আলপনা, পত্রবহুল, স্তবকের মত ছত্রাকার নিম-গাছগুলি প্রথম উত্তর-বাতাসে সির সির করে কাঁপছিল। দুপাশে খোলামাঠ যেখানে দিগন্তে মিলিয়ে আসছিল, সেখানে হাওয়া-ধুতির মত হাল্কা কুয়াশার পর্দ্দা খাটান, চাঁদের আলোতে স্বচ্ছ মনে হলেও, সে সীমানার পর আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

কথায় বলে, "সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই"—সে রাম আর না থাক্‌লেও সেই রামের স্মৃতি এদেশের হিন্দুর মনে জীবন্ত জাগ্রতই আছে—বিশেষতঃ এই পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুর মনে, বিজয়ার দিনে প্রতিবৎসর রামলীলার অভিনয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আমরা আজ রামলীলা দেখ্‌বার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম, যমুনার ধারে একটি প্রকাণ্ড তাঁবু খাটান তারি সম্মুখে এ শোভা-যাত্রা হয়। সহরের মধ্য দিয়ে গাড়ীতে যাবার সময় স্পষ্টই বোঝা গেল, আজ পর্ব্ব দিন, সবারি সাজ-সজ্জায়, হাসিমুখের উজ্জ্বলতায় একটু বিশেষত্ব ছিল। যে কাঙাল, ছোট ছেলেটিকে নতুন পোষাক দিতে পারেনি, সে তাকে একটি লাল টুপি কিনে দিয়েছে, মুখখানি মুছিয়ে, মাথায় তেল দিয়ে সীঁথে করে, সাজিয়ে কোলে কোরে নিয়ে চলেছে। পথের ধারে হিন্দুর দোকান পাট আজ বন্ধ, সবাই এই শোভা-যাত্রা দেখ্‌তে চলেছে। যমুনার ধারে গিয়ে দেখি অসংখ্য জনতা, কত লোক যে পায়ে হেঁটে চলেছে তার ধারণা হয় না, এক্কা, ঘোড়গাড়ী, হাওয়া-গাড়ী, সবই চলেছে। যেখানে গিয়ে আমাদের দেখবার

কথা, এ ভিড়ে আমাদের গাড়ী সে পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারল না আমরা নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ করে গিয়েছিলাম, কাজেই গাড়ী দাঁড়াতে দিল না, প্রহরী বল্লে, "বিলম্বে এসেছ রুদ্ধ এবে দ্বার"—আমরা ফিরে এলাম। রামলীলা ইতিপূর্ব্বে মৃজাপুরে দেখেছিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ী ফিরে আসা গেল, যাবার সময় যে জনতা দেখে ছিলাম ফিরবার পথে তার চিহ্নমাত্র ছিলনা। নাগরিকগণ সব তখন যমুনাতীরে রামলীলার অভিনয় দেখছে দশমীর চন্দ্রালোকে চারিদিক সুন্দর উজ্জ্বল পরিপূর্ণ নির্জ্জনতা, বিসর্জ্জনের ঔদাস্য বিদায়ের দুঃখে চারিদিক বৈরাগ্যময়। রাস্তা দিয়ে একটি অন্ধ ভিখারী লাঠী ঠক্‌ঠক্ করে চলে গেল, তার সেই অসমান লক্ষ্য-দণ্ডের কম্পমান শব্দ আমার বুকের উপর যেন বারবার আঘাত করতে লাগ্‌ল! হায় দৃষ্টিহীন, এত আলোর মধ্যেও তার সবই অন্ধকার!

নূরজাহানের বাপের সমাধি-মন্দির ও সিকান্দ্রা দেখে মনে হয়, এঁরা মৃত্যুকে স্বীকার করে দুঃখ-নম্র মনে এই স্মৃতি-গৃহগুলি নির্ম্মাণ করেছিলেন, সাদা পাথরের অতি নিড়াম্বর, কারুকার্য্যের বাহুল্য নেই। এই জীবনে মানব-আয়ত্বের অতীত যে শক্তি আছে, তাকে না মানা মনের শক্তির পরিচয় নয় দুর্ব্বলতার প্রমাণ। মৃত্যুর অসীম বৈরাগ্যকে স্মৃতির সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখবার অপরিমেয় চেষ্টার মধ্যে একটা আত্মন্তরিতার ভাব প্রকাশ পায়, সেটা যেন দর্শকের মনকে পীড়িত করে। নূরজাহানের বাপের সমাধি জাহাঙ্গীর নির্ম্মাণ করিয়ে ছিলেন, এর উপরে তাজের মত গোল গম্বুজ নয় চৌকণা ঢালু ছাদ, ছবিতে দেখেছি, মধ্য এসিয়ার মন্দির ইত্যাদির উপর এই রকম আবরণ। এই সমাধি-গৃহের গঠন-পারিপাট্য ও আকারের সুষমা বড় হৃদয়গ্রাহী, একটি সুন্দর ছোট কবিতার মত, যেমন সংযত, তেমনি ভাবময়, প্রকাশ-ভঙ্গিটি একেবারে আত্মসমাহিত, তার মধ্যে এতটুকুও চাঞ্চল্য কি বাহুল্য নেই। যে সকল পণ্ডিত কারু শিল্পের মর্ম্মগ্রাহী তাঁরা অনেকে শিল্প-সৌন্দর্য্যের হিসাবে একে তাজের চেয়ে উচ্চস্থান দিয়ে থাকেন। মন্দিরটি যমুনার ধারে, চারিদিকের বাগানটিও সুন্দর। আসল কবরের ঘরে সোণালি গেরুয়া রংএর মর্ম্মর পাথরে নূরজাহানের মা ও বাপের সমাধি ঢাকা, সেখানে প্রতিদিন নতুন করে ফুল সাজিয়ে দেয়; আর এমন চমৎকার ধূপ জালান হয় যে, ঘরে প্রবেশ করবামাত্র পূজার কথা মনে আসে।

প্রথম যেদিন তাজ দেখি, সেদিন আমি হতাশ হয়েছিলাম, হয়ত আশাতীতের আশা করেছিলাম তাই আশানুরূপ সুখ-টুকুও পেলাম না। একদিনে আজ দেখা হয় না, বার বার দেখ্‌তে হয়; রাত্রিদিনের উদয়াস্ত কালের, চন্দ্রকিরণে আলো-ছায়ার বিচিত্র পর্য্যায়ে নানাভাবে দেখা আবশ্যক, তবে ক্রমে ক্রমে ভাবগ্রহ হয়, মন তার মনের কথাটি ঠিক্ ধরতে পারে। প্রথম যে দিন দেখি সে সময় সূর্য্যাস্ত হয়ে গিয়েছিল, কৃষ্ণ পক্ষ, চাঁদ তখনো উঠেনি, নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোকে সবই অস্পষ্ট ছিল, তাজের অমন শুভ্রতা অনুমানও হয়নি। দ্বিতীয় দিন আবার যখন দেখ্‌লাম তখন সূর্য্য অস্ত যাবার সবে আয়োজন করেছেন, পশ্চিম আকাশ বর্ণ-সমারোহে মহিমান্বিত, পূর্ব্ব দিগন্তে সেই উজ্জ্বল তেজোদীপ্তি নম্র হয়ে, কোমল হয়ে সৌকুমার্য্যের আভাসে আপনাকে প্রতিভাত করছে। ভিতরে গিয়ে আবার আমরা সব দেখ্‌লাম, তাজের বহিরঙ্গণ হতে যমুনার স্রোতরহিত ম্রিয়মান ম্লান বুকের উপর আকাশের আলোর প্রতি-চ্ছায়া ক্ষণিকের সৌন্দর্য্য অভিনয় করছিল। ক্রমে চন্দ্রোদয় হল, আমরা বাহিরে বসে একটু একটু করে আলোর প্রভাবে আকা-শের স্বচ্ছনীল প্রচ্ছদ-পটের উপর তাজকে একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছবির মত ফুটে উঠ্‌তে দেখ্‌লাম। আলো যত উজ্জ্বল হতে লাগ্‌ল তাজ যেন তার কঠিন মর্ম্মর মূর্ত্তি পরিহার করে, বাষ্প-সুকুমার হয়ে উঠ্‌তে লাগল। যতক্ষণে তাজের প্রত্যেক অঙ্গ শোভা আলোর স্পর্শে অশরীরিরূপ ধারণ না করল, ততক্ষণ স্থির হয়ে বসে কেবলি দেখ্‌লাম। তাজ সুন্দর, অপূর্ব্ব কারুকার্য্য, স্থাপত্যের আশ্চর্য্য পরিচয়, তবু আমার মনে কোথায় যেন কি একটা অভাব রয়ে গেল। হয়ত আমার মনের গ্রহণ করবার শক্তি আপাততঃ স্তম্ভিত হয়ে আছে, আবার ভবিষ্যতে যদি আস্‌তে পারি, তবে এ অপূর্ব্ব মর্ম্মর-ছন্দে গ্রথিত কাব্যের ভাষ্য করে নিতে পারব। আজ চোখই দেখ্‌ল, মন কিছু পেলনা, কাব্যের শ্লোক পড়লাম শুধু ভাব হৃদয়ঙ্গম হলনা। তবে আলোক-স্নাত নীল আকাশ-সাগরে ভাসমান শুভ্র পদ্ম-কোরকের মত তাজের যে অনুপম সুন্দর ও সুকুমার শ্রী দেখলাম তার স্মৃতি মন হ'তে কখনো মুছে যাবেনা।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বিড়ম্বনা

এসে এসে বার বার শুধু ফিরে যাওয়া
পেতে পেতে কেমনে যে হয়নাক পাওয়া
এ কি বিড়ম্বনা!
দুঃখ নিশীথিনী মাঝে পরশ তোমার
এনেছে ফুলের বাস অন্তরে আমার
হ'য়েছে চেতনা
সুখের প্রভাতে কোথা তুমি আর আমি
না পাই খুঁজিয়া তোমা হে জীবনস্বামী,
শুধুই ছলনা?
এর চেয়ে না পাওয়া যে ছিল ওগো ভালো
ক্ষণিকের তরে কেন ও মুখের আলো
বুঝিতে পারি না—
এত পথ এসে এসে শুধু ফিরে যাওয়া
কি গভীর হাহাকারে বহে ক্ষুব্ধ হাওয়া
এ কি বিড়ম্বনা!

শ্রীলীলা দেবী।

গ্রীক আর্টের কথা

হোমারের কাব্য এবং ফিডিয়াসের ভাস্কর্য্য প্রাচীন গ্রীকজাতিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ফিডিয়াসের ভাস্কর্য্যে আমরা প্রাচীন গ্রীকদের স্বরূপ মূর্ত্তি দেখি; হোমার সেই সকল পাষাণ মূর্ত্তির মুখে কাব্যের ভাষা দিয়াছেন। আধুনিক গ্রীশভূমিতে অতীতের সেই প্রাচীন যোদ্ধারা আর বিদ্যমান নাই,—তাহারা এখন জীবন্ত আছে সাহিত্যে এবং শিল্পে—ইলিয়াডে এবং পার্থেননে! সাহিত্য-শিল্পের অমৃত-রসে যাহা নশ্বর ছিল, তাহা অবিনশ্বর হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রীক-আর্টের মত বিচিত্র আর্ট জগতের আর-কোন দেশে দুর্লভ। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ যেমন স্থাপত্য-কলায়, ইতালী যেমন চিত্রকলায় বিশেষত্ব দেখাইয়াছিল, গ্রীশ তেমনি ভাস্কর্য্য-কলায় আপন মৌলিকতা ও শক্তির পরিচয় দিয়াছিল।

গ্রীশের পূর্ব্বে মিশর ও চাল্‌ডিয়াতে ভাস্কর্য্য-কলার প্রাথমিক চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু ঐ-দুটি দেশে ভাস্কর্য্যের বিশেষ-কিছু উন্নতি হয় নাই; কারণ, সেখানকার ভাস্কররা স্বাভাবিক বা সতেজ মূর্ত্তি গড়িত বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া ভাবের প্রকাশ দেখাইতে পারিত না। আর্টে অখণ্ড সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়, গ্রীশদেশে।

সেই প্রাচীন যুগে গ্রীশদেশে ভাস্কর্য্যকলা সকলদিকেই এতটা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, যে অদ্যাবধি আর-কোন দেশ তাহার সামনে সমানভাবে মাথা উঁচু করিতে পারে নাই। প্রতীচ্যে আজ-পর্য্যন্ত যত বিখ্যাত ভাস্কর জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের উপরেই গ্রীক শিল্পীর অল্পবিস্তর প্রভাব পড়িয়াছে। কিন্তু সে প্রভাবের ফলেও নকলিয়ারা গ্রীক আর্টের যথার্থ মহিমা বজায় রাখিতে পারেন নাই। গ্রীকদের বিরাট পরিকল্পনা এবং উদার আদর্শ অনুকরণে অনুদার এবং সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে মাত্র। আলেকজান্দারের ভারত-আক্রমণের পরে ভারতীয় ভাস্কর্য্যেও গ্রীক শিল্পের পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল। তবে, ভারতবর্ষ গ্রীক আর্টের পদ্ধতি লইলেও, তাহার আদর্শ গ্রহণ করে নাই। গান্ধারে গ্রীক-প্রভাব এক সম্পূর্ণ ভিন্ন-আদর্শের নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু এমন-যে গ্রীক শিল্প, যাহার বিশ্বব্যাপী প্রভাব-প্রতিপত্তি আজও অটুট হইয়া আছে, তাহার সম্পূর্ণ লাবণ্য দেখিবার সুযোগ আমাদের ঘটে নাই। গ্রীক ভাস্কর্য্যের যে-সব উদাহরণ কালের ও মানুষের অত্যাচার এড়াইয়া এখনো টিকিয়া আছে, সংখ্যায় তাহারা সামান্য। তাহার উপরে, ধ্বংসাবশিষ্ট যে-কয়টি মূর্ত্তি আমাদের চোখে পড়ে, তাহাদেরও বেশীর ভাগ ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। কাহারও হাত নাই, কাহারও পা নাই, কাহারও মাথা নাই, কাহারও দেহ নাই। সুতরাং একালে সমগ্র গ্রীক শিল্পের পূর্ণ ধারণা করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার।

সুধু ভাস্কর্য্য-শিল্পে নহে,—চিত্রকলাতেও

গ্রীক পটুয়ারা সুপটু হস্তের ছাপ্ মারিয়া গিয়াছে। ভগ্নে-চূর্ণে পরিণত হইয়াও গ্রীশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের কিছু-কিছু নমুনা এখনো বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু তাহার চিত্রকলার প্রায়-সমস্ত চিহ্নই আজ মুছিয়া গিয়াছে। কেবল দু-তিনখানি পট ও খানকতক ভিত্তি-চিত্র ভাগ্যক্রমে কোনরকমে টিকিয়া যাওয়াতেই আমরা প্রাচীন গ্রীক চিত্রকরের অবাক-করা হাতের কাজ এবং মন-মজানো শ্রী-ছাঁদের যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি। তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, প্রাচীন গ্রীশের এই-সব ছবি যদি টিকিয়া থাকিত, আজ তাহাহইলে পৃথিবীর চিত্রকলা এর চেয়ে ঢের-বেশী শ্রীমৎ হইয়া উঠিত। কিন্তু যাহা যায়, তাহা যায়,—খেদে-পরিতাপে আর ত তা ফেরে-না!

খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর হইতে গ্রীক আর্টের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। Dr. Schliemann ঐ সময়টিকে Mycenaean Period বলিয়াছেন। এই যুগে গ্রীশ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে—বিশেষ-করিয়া ক্রীট ও এজিয়ান-দ্বীপপুঞ্জে, আর্টের চর্চ্চা সুরু হয়। তখনকার অস্ত্রশস্ত্র ও ব্যবহার্য্য পাত্র প্রভৃতির উপরে সূক্ষ্ম শিল্পের যে পরিপাটি কারিকরি দেখা যায়, নির্দ্দোষ না হইলেও তাহা নয়নকে আহত করে না। Mycenae নামক স্থানে প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যে-সমস্ত ভগ্নাবশেষ আছে তাহার মধ্যে আর্টেইয়াসের ধনাগারের প্রবেশ-পথ ও সিংহদ্বার, এই দুটিই বেশী বিখ্যাত।

কিন্তু সে যুগে ললিতকলার প্রথম যে মুকুল অঙ্কুরিত হয়, ভাল-করিয়া ফুটিবার আগেই রাজনৈতিক বিপ্লব তাহার ক্রম-বিকাশে বাধা দেয়। এই সময় হইতেই গ্রীশে ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ।

আসীরীয়, মিশরীয় ও ভারতীয় প্রাচীন শিল্পিগণ হরেকরকমের শক্ত পাথরে মূর্ত্তি গড়িতে বাধ্য হইয়াছেন—কেননা, তাঁহারা হাতের কাছে মার্ব্বেল পাথরের যোগান পান নাই। কিন্তু গ্রীশদেশে শিল্পচর্চ্চার গোড়াগুড়ি হইতেই, সেখানকার ভাস্কররা এই মস্ত সুবিধাটি পাইয়াছিলেন। মর্ম্মরপ্রস্তর স্বভাবতই কোমল ও সুন্দর; সেইজন্য ভাস্করদের কাজও যেমন সহজ হইয়া আসিয়াছিল, তাঁহাদের গড়া মূর্ত্তিগুলিও তেমনি-শীঘ্র সকলের নয়নরঞ্জন করিতে পারিত।

শিল্পক্ষেত্রে নামিয়াই গ্রীকরা আপনাদের প্রতিভা, কৃতিত্ব ও নূতনত্বের পরিচয় দিতে পারিয়াছিল। তাহাদের সমকালিক অন্যান্য জাতিদের মত, গ্রীকরা তখনো স্বেচ্ছাচারী রাজা ও কুসংস্কারের গোলামী স্বীকার করে নাই। গ্রীক শিল্পীরা স্বভাবতই স্বাধীনতা ও নবীনতার ভক্ত এবং উন্নতিপ্রয়াসী ছিল। মানুষকে তাহারা মানুষরূপেই দেখিত—খোসখেয়ালে চলিয়া মানুষকে তাহারা কার্য্য ও কারণের বাহিরে লইয়া গিয়া ফেলিত-না। গ্রীক শিল্পের এই মতি-গতির নাম দেওয়া হইয়াছে Rationalism বা হেতুবাদ। স্বাধীনতার আকর্ষণ ও সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এই হেতুবাদের মিল হওয়াতে, জগতে গ্রীক আর্ট অতুল্য হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথমযুগের গ্রীকশিল্পে আমরা মিশরীয় ও আসীরীয় আর্টের প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাই; কিন্তু এ প্রভাব বেশীদিন টেঁকে নাই। মিসরীয়

আর্টে রমণী-মূর্ত্তির পা-দুটি এমন ভাবে থাকিত —যেন তাহা একটি খাপের মধ্যে বন্ধ ও আড়ষ্ট হইয়া আছে। আর, আসীরীয় আর্টে রমণীমূর্ত্তিই অত্যন্ত দুর্লভ।

কিন্তু গ্রীক আর্টের জন্মের পর দেড়-শো বছর যাইতে-না-যাইতেই একটি ধাবমানা রমণী-মূর্ত্তি আমাদের চোখে পড়ে। সে মূর্ত্তি সুধু যে দৌড়াইতেছে, তাহা নয়; সে হাসিতেছেও বটে! শিল্পজগতে হাস্যের এই



শিল্পে প্রথম হাস্য

প্রথম জন্ম! মিসরীয় ও আসীরীয় শিল্পে যে-সকল মূর্ত্তি দেখা যায়, মানুষের মত তাহারা হাসিতে পারিত-না। নররূপী হইয়াও তাহারা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কিছু ধার ধারিত-না। পৃথিবীতে থাকিয়াও তাহারা পৃথিবীর সুখ-দুঃখে বিচল হইত-না।

খৃঃ পূঃ ৫৫০ বৎসরে গ্রীশদেশে Archermos নামে এক ভাস্কর ছিলেন। তিনি এক নূতন পদ্ধতি-মতে মূর্ত্তি গড়িতেন। পূর্ব্বকথিত ঈষৎস্মিতমধুর মূর্ত্তিটি তাঁহারই পদ্ধতি-অনুসারে গঠিত। এই মূর্ত্তিটি Nike of Delos নামে বিখ্যাত। এতদিন শিল্প ভিতরের শাঁষ-জল ফেলিয়া সুধু বাহিরের ছোব্‌ড়ার নকল করিয়াই আসিতেছিল। Nike of Delosএ দেখি, অন্তরের বিচিত্র ভাবধারাকেও সে পাষাণপটে লীলায়িত করিতে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে! এখন সে আর সুধু দেহ লইয়া সুখী নয়, এখন তাহার

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।"

এই যুগ গ্রীশীয় ললিত-কলার জীবনে প্রথম সূর্য্যোদয়ের যুগ। কেননা, শিল্পকে জীবন্ত করিতে হইলে যে সঞ্জীবন-মন্ত্রের আবশ্যক, গ্রীক ভাস্কররা এই প্রথম তাহা অনুভব করিতে পারিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, "ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা" না করিলে, শিল্পসৃষ্টি নিতান্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

এখন হইতে গ্রীক শিল্প ক্রমেই উন্নতির উচ্চপথে উঠিতে লাগিল। Nike of Delosএর অনুকরণে অনেক নূতন মূর্ত্তি গঠিত হইল। নব নব অভিজ্ঞতায় ভাস্কররা প্রথমযুগের অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে পারস্য জাতি আসিয়া গ্রীশদেশ আক্রমণ করিল। গ্রীক শিল্পীরা যে-সকল অপূর্ব্বগঠন মন্দির ও পরমসুন্দর মূর্ত্তি গড়িয়াছিল, শত্রুদের হাতে তাহাদের অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া তছ্‌নছ্‌ হইয়া গেল; কিন্তু গ্রীকরা এই বিপ্লবে পড়িয়াও হাল ছাড়িয়া দিলেন না। শত্রুরা প্রস্থান করিলে পর, দেশে যখন শান্তি স্থাপিত হইল, ধ্বংসাবশেষের উপরে তখন তাঁহারা আবার নূতন-করিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইলেন। যে-সকল

বিশেষত্বের জন্য গ্রীক আর্ট জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, এই নবপ্রতিষ্ঠার যুগেই তাহার প্রথম বিকাশ।

আফাইয়া ও যিয়াস মন্দির-চূড়ার বিখ্যাত কারুকার্য্য এই যুগের গ্রীক ভাস্কর্য্যের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই দুটি মন্দিরে যুদ্ধবিগ্রহের,



দেবী এথেনী
(ফিডিয়াসের গড়া মূর্ত্তির নকল)

দেব-দেবীর ও মানব-মানবীর যে অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য-চিত্র উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহার অনেক-গুলিই পরযুগের পরিণত ও নির্দ্দোষ গ্রীক আর্টের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। Paeonios, Alcamenes, Myron ও Polyclitus প্রভৃতি গ্রীক ভাস্করগণ এই সময়ে অত্যন্ত নামজাদা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শেষোক্ত দুইজন ভাস্করের সমকালেই গ্রীশদেশে ফিডিয়াস (Pheidias) নামে যে প্রতিভাবান ভাস্কর আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তিতেই গ্রীক শিল্প পৃথিবীর শিরোমণি হইয়া উঠে। খৃঃ পূঃ ৫০০ বৎসরে ফিডিয়াস জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীশ-পারস্যের রণকোলাহলের মধ্যে তাঁহার বাল্যকাল কাটিয়া যায়। মারাথনে (খৃঃ পূঃ ৪৯০), স্যালামিসে (খৃঃ পূঃ ৪৮০), ও প্লেটায় (খৃঃ পূঃ ৪৭৯) পারসীরা বারবার হারিয়া গেলে পর, সমস্ত গ্রীশদেশ এথেন্সের অধীনতা স্বীকার করে। তখন এথেন্সনগরীকে শিল্পে-সৌন্দর্য্যে মনোরমা ও নিরুপমা করিয়া তুলিবার কথা হয়।

সেই সময়ে পেরিক্লিশ (Periclcs) এথেন্সের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। পেরিক্লিশের হুকুমে এথেন্সে যে-সকল শিল্পবিচিত্র প্রাসাদ ও মন্দির তৈয়ারি হয়,

তাহার ভিতরে সকলের সেরা হইতেছে, এথেনী-দেবীর মন্দির পার্থেনন।

পার্থেননের স্থাপত্যকার্য্যের কর্ত্তা ছিলেন ইক্টিনস (Ictinos)। কিন্তু মন্দিরের পরিকল্পনা ও ভাস্কর্য্য-কার্য্য সম্পন্ন হয় ফিডিয়াসের প্রতিভাবলেই। ফিডিয়াস নিজের হাতে অনেক মূর্ত্তি গড়িলেও, এতবড় মন্দিরের সমস্ত মূর্ত্তি গড়া, একলা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল-না। সুতরাং আরও অনেক ভাল কারিকর তাঁহার সহকারী হইয়া এখানে কাজ করেন। কিন্তু ফিডিয়াসের সহকারীরা তাঁহারই হাতের যন্ত্রের মত ছিলেন;—ধরিতে গেলে, এই ভাস্কর-কার্য্যের জন্য যাহা-কিছু সুখ্যাতি, তাহা ফিডিয়াসেরই প্রাপ্য। খৃঃ পূঃ ৪৪৭ বৎসরে আরম্ভ হইয়া খৃঃ পূঃ ৪৩৩ বৎসরে পার্থেননের নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হয়। মন্দিরের প্রধান গৃহে Athene Parthonosএর যে বিরাট প্রতিমা ফিডিয়াসের হাতে তৈয়ারি হইয়াছিল, সেটি এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নানা যুদ্ধবিগ্রহে পার্থেননের অধিকাংশই এখন একটা ভাঙ্গা-চোরা ঢিপির সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার দেওয়ালে-দেওয়ালে যে অতুল ভাস্কর্য্যের মোহন অলঙ্কার ছিল, তাহারও প্রায় কোন জায়গাই অটুট নাই।

এখনকার সকল শিল্পী ও সমালোচকই একবাক্যে মানিয়া লইয়াছেন যে, পার্থেননে যে-সমস্ত মার্ব্বেলের মূর্ত্তি ও হাতের কাজ দেখা যায়, পৃথিবীর আর-কোন দেশে তাহার তুলনা মেলা ভার। মানব-শিল্প যতটা উপরে উঠিতে পারে, পার্থেননের গ্রীক আর্ট ততটাই উঠিয়াছিল। ফিডিয়াসের আর্ট একেবারে সকলদিকেই নিখুঁত—যেমন সুন্দর তেমনি সরল। চিত্র-শিল্পে র‍্যাফেলের যে স্থান, ভাস্কর্য্য-কলায় ফিডিয়াসও তেমনি উচ্চাসন দখল করিয়া আছেন। দেবী এথেনী ও দেবতা যিয়াসের মূর্ত্তি ফিডিয়াসের শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলা হয়। এই দুটি মূর্ত্তিই সোনা আর হাতীর দাঁতে গড়া হইয়াছিল। এথেনীর বিনষ্ট মূর্ত্তির একটি ছোট নকল-প্রতিমূর্ত্তি অন্য-কোন শিল্পী গড়িয়াছিলেন—সেটি এখন এথেন্সের যাদুঘরে আছে। কিন্তু যিয়াসের মূর্ত্তি যে কেমন ছিল, এখন আর তাহা জানিবার উপায় নাই। পার্থেননের Theseusএর যে মূর্ত্তিটি ছিল, সেটিও ফিডিয়াসের রচনা-ভঙ্গী অনুসারেই গড়া। Theseusএর মূর্ত্তি যদিও এখন অটুট নাই, তবু, তাহার ভগ্নদশার ভিতর হইতেই ফিডিয়াসের প্রতিভার মহিমা বুঝা যাইবে।

পার্থেনন দেখিলে হোমার-বর্ণিত সেই প্রাচীন গ্রীকজাতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি ও মতি-গতি, তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, তাহাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম—এককথায়, প্রাচীন গ্রীশভূমি তাহার বিচিত্র সভ্যতা এবং অপূর্ব্ব বিশেষত্ব লইয়া এই পার্থেননের ভগ্নস্তূপে আজ-পর্য্যন্ত মূর্ত্তিমান ও জাগ্রৎ হইয়া আছে।

ফিডিয়াসের পরেও গ্রীশদেশে প্র্যাক্সিটিল্‌স, স্কোপাস ও লিসিপ্পাস প্রভৃতি ওস্তাদ-শিল্পী জন্মিয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলেরই আলাদা আলাদা নিজস্ব ধরন ছিল এবং ইঁহাদের এক-একজনের হাতে ভাস্কর্য্যের এক-একটি দিক পুরস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রীক

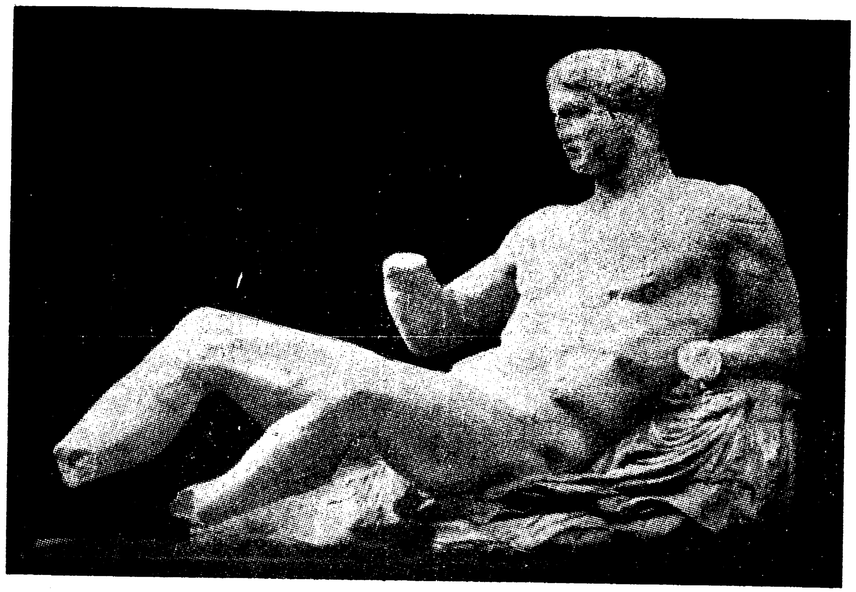

ফিডিয়াসের রচনা-ভঙ্গীর নমুনা
(Theseus এর মূর্ত্তি)

আর্টের এই উন্নতির ধারা দিগ্বিজয়ী আলেক-জান্দারের পরেও সমান একটানা বর্ত্তমান থাকে। তাহার পর গ্রীক সভ্যতার অধোগতির সঙ্গে-সঙ্গে গ্রীক আর্টেরও অধঃপতন আরম্ভ হয়।

প্রথম যুগের গ্রীক ভাস্কররা কাপড়-পরা মূর্ত্তিই গড়িতেন। কিন্তু পরযুগের গ্রীক ভাস্কর্য্যে এ রীতি অনেকটা বদলাইয়া যায়। কাপড়ের আড়ালে দেহের আসল রূপটি ঢাকা পড়ে বলিয়া নগ্নমূর্ত্তিই শিল্পীদের অধিক পছন্দসই হইয়া উঠে। কিন্তু এ নগ্নতার ভিতর দিয়া গ্রীক শিল্পীরা কামভাব জাহির করিতেন-না। গ্রীক আর্টের নগ্নতা, শিশুর সরল, নিষ্পাপ নগ্নতা। তখনকার বস্ত্রহীন মূর্ত্তিগুলিকে দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, আপনাদের নগ্নতা-সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণরূপেই উদাসীন ও অচেতন। কোন মানুষের গা হইতে কাপড় খুলিয়া লইলে, দশজনের সামনে সে যেমন লজ্জায় জড়সড় হইয়া যেন-তেন-প্রকারে আপনার নগ্নতা ঢাকিয়া ফেলিতে চায়, এ-সব মূর্ত্তির মুখে বা দেহে সে-রকম লুকাচুরির ভাব আদোপেই নাই। এই লুকাচুরির ইঙ্গিত আছে বলিয়াই একালের অনেক মূর্ত্তি কাপড়-পরা হইলেও, কামের প্রদীপ উস্কাইয়া দেয়। নগ্নতা দেখিলেই যাঁহারা চোখে রুমাল-চাপা দেন, এ কথাগুলি মনে রাখিলে নগ্ন আর্টের সৌন্দর্য্য তাঁহাদিগকে ক্ষুব্ধ না করিয়া মুগ্ধই করিবে। বস্ত্র যে কতটা কুৎসিত, কতটা কৃত্রিম দেখাইতে পারে,

গ্রীকশিল্পীর কোন নগ্ন মূর্ত্তিকে বস্ত্রভূষিত করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

আমরা শিল্পাচার্য্য রোদাঁর জীবন-প্রসঙ্গে (১) পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে:—"গ্রীক আর্টে পুরুষত্বের পূজার পরিচয় Sophocles, Mars, Hermes, Apollo, Antinous, Eros প্রভৃতি অসংখ্য মূর্ত্তির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রীকশিল্পী পৌরুষের এতই ভক্ত যে, তাঁহারা রমণীত্বের মধ্যেও বহুস্থলে পুরুষত্বের বিকাশ না দেখাইয়া পারেন নাই। Dianna, Athena প্রভৃতি অগুন্তি রণরঙ্গিণী রমণী-মূর্ত্তি এবং ভেটিক্যান মিউজিয়মের "Battle of Amazons" নামে শিল্পকার্য্যটি তাহার জলন্ত প্রমাণ।"

প্রাচীন গ্রীশদেশের জীবন-যাত্রার মধ্যে শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যই প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমান সভ্যতা শান্তিপ্রধান; যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইলেও এখন গায়ের জোরের ততটা দরকার করে-না। কিন্তু সেকালে, গ্রীশে যুদ্ধবিগ্রহ একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল—এবং তালপাতার সেপাইয়ের পক্ষে লড়াই করাও তখন পোষাইত-না। প্রাচীন গ্রীকরা তাই বাধ্য হইয়া শক্তির পূজারী হইয়াছিলেন। বাস্তব জীবনের এই শক্তি-সাধনা গ্রীক আর্টকেও শক্তির ভক্ত করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচীন আর্টে পুরুষত্বের পূজা এবং আধুনিক আর্টে রমণীত্বের ভক্তির মূল কারণই হইতেছে, যুগধর্ম্ম।

পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক ভাস্কররা সকলের চেয়ে বেশী গড়িতেন, রণরঙ্গিনী রমণী-মূর্ত্তি। গ্রীক অবদানে আছে, এসিয়া হইতে রমণীরা পুরুষের সহিত শক্তি-পরীক্ষা করিতে গ্রীশ দেশে আসিয়াছিল। এই অবদান অবলম্বন করিয়া শিল্পীরা রূপকের মধ্য দিয়া গ্রীক-পারসীর যুদ্ধ-ব্যাপারেরই ইঙ্গিত দিয়াছেন।

ভারতীয় শিল্পেও দুর্গা-কালী-জগদ্ধাত্রীর প্রতিমাতে আমরা বীররমণীর মূর্ত্তি দেখি। কিন্তু অস্ত্রধারিণী হইলেও রমণী এখানে রমণীই বটে—ফিডিয়াসের Athenaর মত তাঁহারা নারীবেশী পুরুষদেহী নন।

যৌবন, শক্তির নির্ঝর। গ্রীক শিল্পীরা তাই যৌবনের জয়োৎসাহে আপনাদের অধিকাংশ প্রতিমাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন। Hermesএর প্রতিমূর্ত্তিতে Praxiteles সবল যৌবনের যে নিখুঁত আদর্শ গড়িয়াছেন, শিল্পসমাজে সকলেই তাহার অত্যন্ত আদর করেন। এ মূর্ত্তির মধ্যে একটুও বিলাসিতার আভাস নাই অথচ ইহার বলিষ্ঠ দেহের মোহন-রূপ কী অপরূপ! মূর্ত্তির জীবন্ত মুখখানি "ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিলোলে" সুন্দর এবং সুবিন্যস্ত দৈহিক মাংসপেশীগুলি যেন ছন্দের আনন্দে ভরপূর!

ভেটিক্যান মিউজিয়মে "Antinous Belvedere" নামে যে মূর্ত্তিটি আছে, সেটিও সবল যৌবনের আর-একটি বিখ্যাত প্রতি-মূর্ত্তি। এই Antinousএর অগুন্তি মূর্ত্তি য়ুরোপের মিউজিয়মগুলিতে দেখা যায়। তাঁহার মাথাটি হতাশভাবে একদিকে হেলিয়া

(১) পৌষের ভারতীতে "রোদাঁর বিশেষত্ব" দেখুন। এ বৎসরে প্রকাশিত রোদাঁ-সংক্রান্ত প্রবন্ধমালায় গ্রীকশিল্পীর গড়া অ্যাপলো. বিজয়লক্ষ্মী, ভাগ্যদেবীত্রয় ও ভেনাস ডি মেডিসি প্রভৃতি বিখ্যাত মূর্ত্তির ছবিও বাহির হইয়া গিয়াছে বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে আবার সে-সব ছবি আর দেওয়া হইল না।

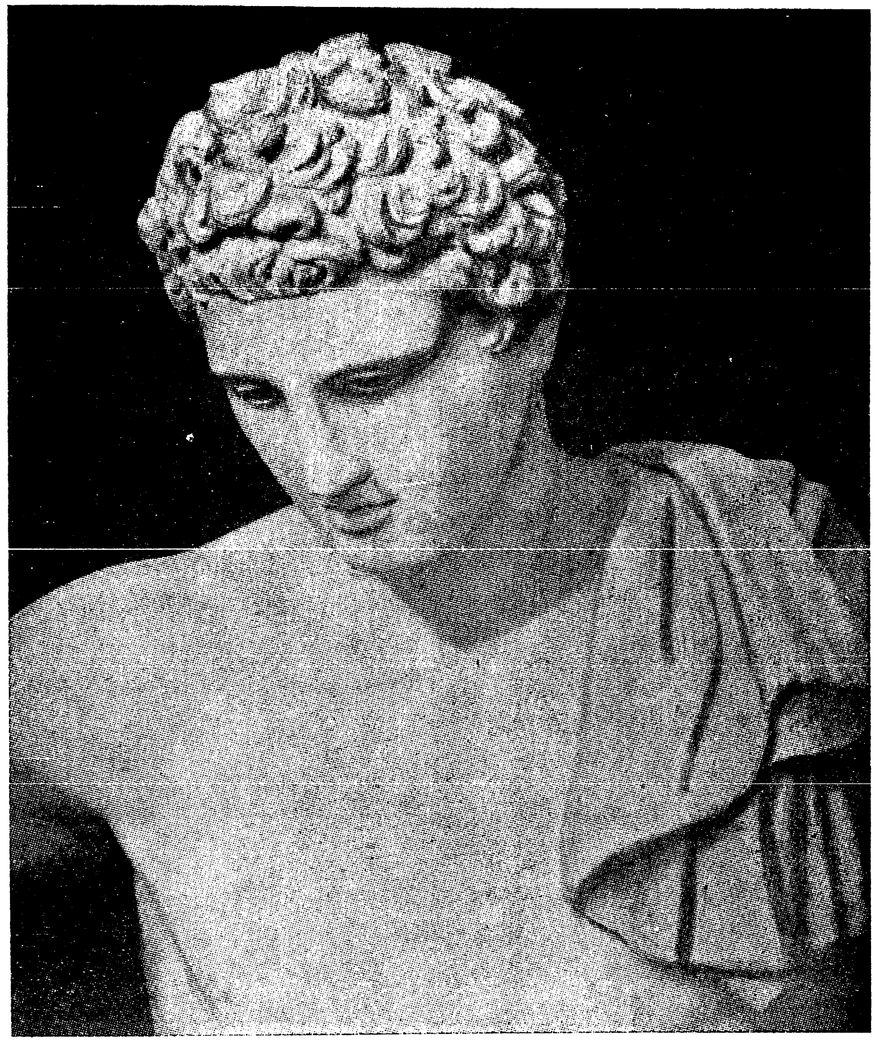

অ্যান্টিনস্

পড়িয়াছে; দৃষ্টি স্বপ্নাতুর। তাঁহার মুখ যেন কি-এক রহস্যের আবরণে আবৃত; তিনি যেন কোন প্রহেলিকার সমস্যায় পড়িয়া আপনাকেও একটি প্রহেলিকা করিয়া তুলিয়াছেন। মূর্ত্তির মুখখানিও চমৎকার। সাধারণত গ্রীক ভাস্কর্য্যে যেমন দেখা যায়, ইঁহারও নাক তেমনি একেবারে কপালের উপর হইতে সোজা নামিয়া আসিয়াছে। মুখের তরঙ্গিত রেখাগুলি ভাবে অভিরাম; মার্ব্বেলের উপরে এমন রেখাপাত করা ভারি কঠিন,—ইহাতে শিল্পীর সচ্ছন্দ শক্তি ও নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। Antinous, সম্রাটের প্রিয়পাত্র ছিলেন। একবার দৈববাণীতে সম্রাটের উপরে আদেশ হয়, তিনি যেন তাঁহার কোন প্রিয়তমের প্রাণ, দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। Antinous, স্বেচ্ছায় আত্মদানে অগ্রসর হইলেন। এবং নীলনদে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার পর, তাঁহার স্মৃতিকে স্মরণীয় এবং বরণীয় করিবার জন্য দেশের চারিদিকে তাঁহার অগণ্য প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রীক ভাস্কর্য্যে ব্যায়াম-ক্রীড়কের সংখ্যা হয় না! গ্রীক শিল্পী যত ক্রীড়কের মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, তত আর-কিছুর নহে। Myronএর গঠিত Discobolus বা চক্রনিক্ষেপকারী, Lysippusএর গঠিত Apoxyomenus প্রভৃতি ক্রীড়কের মূর্ত্তির কথা ভুবনবিখ্যাত।

গ্রীশের যুবকদের রীতিমত প্রকাশ্য ব্যায়াম-ক্রীড়া শিল্পীদের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছিল। নগ্নদেহে নির্ব্বিকার মনে ক্রীড়করা



লিসিপ্পাসের গড়া ক্রীড়ক-মূর্ত্তি

কুস্তি লড়িত, লাফাইত, ছুটিত ও চক্র ছুঁড়িত। তাহাদিগকে দেখিয়া শিল্পীরাও সবল পুরুষত্বের উচ্চ আদর্শের পরিকল্পনা করিতে পারিতেন। নগ্নতার যে নির্দ্দোষ, পরিপূর্ণ আকার সে যুগের শিল্পীরা দেখিতে পাইতেন, এ যুগে তাহা দুর্লভ। তেমন পরিপুষ্ট ও বলিষ্ঠ জীবন্ত আদর্শই এখন বড়-একটা পাওয়া যায় না, সুতরাং এ অবস্থায় আধুনিক শিল্পজগতে যে প্রাচীন গ্রীক আর্টের সমযোগ্য প্রতিমূর্ত্তির অভাব হইয়াছে, সেটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

গ্রীক আর্টিষ্টদের প্রাণ জীবনের বিপুল পুলকে বিভোর হইয়া থাকিত। এই যে মানব-জীবন—ইহার প্রতি মুহূর্ত্তটিকে তাঁহার প্রাণ-ঢালিয়া ভালবাসিতেন। একালের অনেক আর্টিষ্টের মত জীবনকে তাঁহারা ঘৃণা করিতেন না—করিতে পারিতেন-না। মানবজীবন কিছুই নহে, সেটা সুধু একটা ক্ষণিকের প্রদীপ, একটা চপল ছায়া; তাহাকে লইয়া খেলায় মাতিয়া-উঠা অবোধ শিশুর কাজ;—এমন দার্শনিকতা গ্রীক শিল্পীর ধাতে সহিত-না।

তুমি যদি বল, "জীবন ত তুচ্ছ ক্রীড়নক!" গ্রীকশিল্পী তাহাহইলে জবাব দিবেন, "হ্যাঁ, খেলার জন্যই যখন খেলনা, তখন একে লইয়া আমি খেলিব বৈকি! তুচ্ছ ভাবিয়া এমন সুন্দর খেলার জিনিসটিকে অসার্থক করিব কেন?" এইজন্যই গ্রীক ভাস্কর্য্যে সাধারণত আমরা জীবনের অপূর্ব্ব মহোৎসব দেখি। গ্রীক শিল্পী মানুষের জীবন ও দেহ লইয়া সসীমে অসীমের সাধনা করিয়াছেন। একালের কবির ভাষায় তিনি বলিতে পারিতেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়!
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়।··· ··· ···

* * * *

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া!"

এই যে শত শত ক্রীড়কের মূর্ত্তি, ইহাদের প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গিতে, প্রতি মাংস-

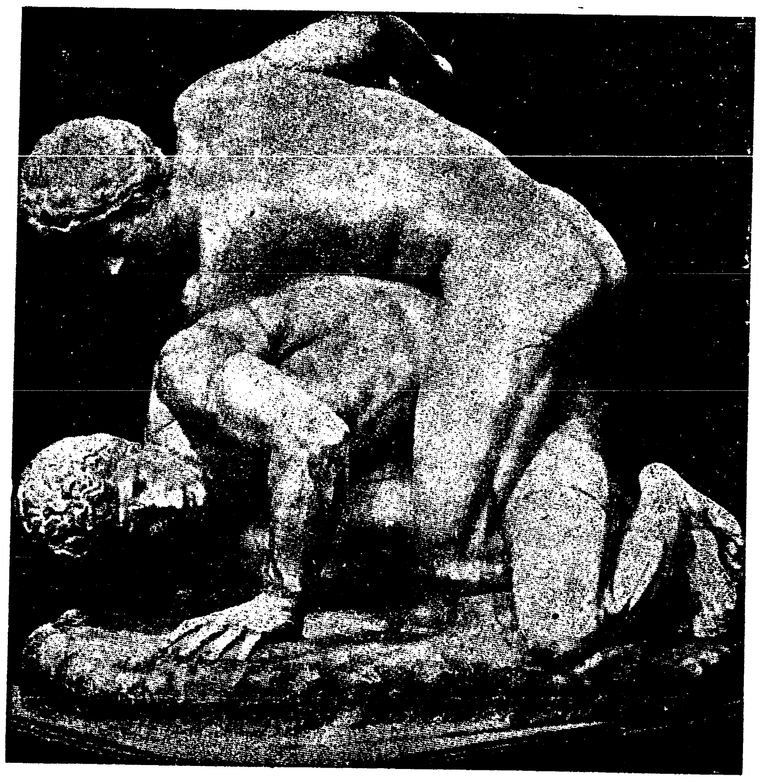

কুস্তিগীর

পেশীর লীলায়, প্রতি ভাবে-ইঙ্গিতে আমরা যেন জীবন-পাত্রের সুধাপানের বাসনাকে জাগ্রৎ হইয়া উঠিতে দেখি! গ্রীকদের জাতীয় জীবনে ক্রীড়া যে কতখানি-বেশী জায়গা অধিকার করিয়াছিল, গ্রীক কলায় ক্রীড়ক-মূর্ত্তির আধিক্য তাহারই প্রমাণ দিতেছে। মানুষ এখন গোঁফ না-গজাইতেই গম্ভীর বনিয়া যায়; খেলা-করাকে সে এখন বাজে সময়-নষ্ট-করা ভাবে; বড় বড় কথা, দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজ লইয়া সে এখন ব্যতিব্যস্ত; তাই তাহার আর্টও এখন ভারি হইয়া উঠিয়াছে—কারণ, তরলতাকে সে তাচ্ছীল্য করে। সুতরাং সেকালে এই সকল খেলোয়াড়ের মূর্ত্তিকে যে চোখে যে ভাবে দেখা হইত, এ যুগে সে চোখও নাই, সে ভাবও নাই। আধুনিক ললিত কলায় তাই এমন নিছক আনন্দের মূর্ত্তিও আর বড় গড়া হয়-না। বর্ত্তমান যুগের চিন্তাশীলতা ও জীবন-সংগ্রামের কাঠিন্য, আনন্দ এবং স্ফূর্ত্তিকে প্রায় নির্ব্বাসিত করিয়াছে।

গ্রীকরা দেহ ও আত্মাকে একই বস্তুর দুটি দিক বলিয়া ভাবিত। তাহার একটি দিক না থাকিলে অন্য-দিকটিও থাকিবে-না—এই ছিল তাহাদের বিশ্বাস। তাহারা জানিত অন্তর্গূঢ় আত্মার রূপ বাহিরের দেহের উপরেই ফুটিয়া উঠে। প্লেটোর উক্তিতে এই ভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। (২) এ-যুগের ভাবের ধারা কিন্তু আলাদা। এখন শারীরিক বলের চর্চ্চা হয় যেখানে, মানসিক চর্চ্চা সেখানে হয়-না। এখন যাহারা পালোয়ানী করে, দৈহিক গঠন-সৌন্দর্য্যে তাহাদের কেহ-কেহ প্রাচীন গ্রীক প্রতি-মূর্ত্তির সহিত তুলনীয় হইতে পারে। কিন্তু মানসিক সৌন্দর্য্যে গ্রীক প্রতিমূর্ত্তির কাছে তাহারা দাঁড়াইতেই পারিবে-না। আবার, এখন যাঁহারা মনের চর্চ্চা করেন, দেহের চর্চ্চা তাঁহাদের দ্বারা হয় না;—সুতরাং বাহিরের আকারে তাঁহারাও গ্রীক প্রতিমূর্ত্তির সমকক্ষ হইতে পারিবেন-না। চিন্তাশীল পণ্ডিত বলিতে আমাদের মনে সাধারণত একটি অপুষ্টদেহ মানুষের ছবি জাগিয়া উঠে। কিন্তু গ্রীক আর্টিষ্ট যে-সকল চিন্তাশীল পণ্ডিতের মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উন্নত বলিষ্ঠ দেহ—অনেকেই একালের যে-কোন কুস্তি-গীরের বিপুলবপুর পাশে গিয়া অনায়াসে দাঁড়াইতে পারেন। এইজন্যই সক্রেটিস বলিয়াছেন যে, "ভাস্কর সুধু আত্মাই দেখাইবেন না—সেইসঙ্গে দেহকেও সমান ভাবে দেখাইবেন।" ("A sculptor must render the action of a soul equally with bodily form.")

সৌন্দর্য্যের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে এই বিচিত্র শক্তির সাধনা প্রাচীন গ্রীকজাতির জীবনে, কাব্যে, ভাস্কর্য্যে ও স্থাপত্যে একেবারে এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। দুর্ব্বলতা তখন ছিল কদর্য্যতার নামান্তর।

(২) "Surely then, to him who has an eye to see, there can be no fairer spectacle than that of a man who combines the possession of moral beauty in his soul with outward beauty of form, corresponding and harmonising, with the former, because the same great pattern enters into both."

পুরুষ বা রমণী, ধনী বা নির্ধন, উচ্চ বা নীচ,—কাহাকেও তাহারা কুৎসিত ও দুর্ব্বল রূপে দেখিতে পারিত-না। গ্রীক আর্টের মূলমন্ত্র এই সৌন্দর্য্য এবং শক্তি।

আদর্শ পুরুষ-রূপের পাশেই গ্রীকশিল্পী আদর্শ রমণী-রূপও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গ্রীক আর্টে আদর্শ পুরুষ যেমন দেবতা



অ্যাপলোর মুখ
(ফিডিয়াসের শিষ্যের গড়া)

অ্যাপলো, আদর্শ রমণীও তেমনি দেবী ভেনাস। জগতের কলারাজ্যে নির্দ্দোষ দৈহিক গঠনে এই অ্যাপলো ও ভেনাসমূর্ত্তি আজ-পর্য্যন্ত আদর্শস্থানীয় হইয়া আছে। গ্রীকশিল্পীরা অনেকগুলি ভেনাসের মূর্ত্তি গড়িয়াছেন। মিলোস নামক দ্বীপে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী ভেনাসের যে মূর্ত্তিটি আবিষ্কৃত হয়, সেইটিই সকলের-চেয়ে বিখ্যাত। এই প্রতিমার দুটি হাতই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সম্পূর্ণ অবস্থায় ইহার হাতের ভঙ্গী কিরূপ ছিল, আধুনিক কলাবিদরা অনেক কথা-কাটাকাটি ও কল্পনা-জল্পনার পরেও তাহা ঠিক-করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অনুমান খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী ইহার নির্ম্মাণকাল,—কিন্তু কারিকরের নাম অজ্ঞাত। তবে, পার্থেননের মতই ইহার মহিমময়, বলব্যঞ্জক ও অচঞ্চল ভাব দেখিয়া কেহ-কেহ বলেন, এই সরল-সৌন্দর্য্যে রমণীয় মূর্ত্তিটি ফিডিয়াসের কোন শিষ্যের দ্বারাই গঠিত। এই রহস্যময়ী প্রতিমায় সুধু দেহের কান্তিই নাই; ইহার মুখে মনের কান্তিও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

খৃঃ পূঃ ৩০৬ বৎসরে গ্রীকরা সাইপ্রাস দ্বীপের কাছে মিশরীয়দিগকে জলযুদ্ধে হারাইয়া দেয়। এই উপলক্ষে বিজয়লক্ষ্মীর যে পরমরমণীয় মূর্ত্তি গঠিত হয়, তাহার নাম Victory of Samothrace। দুঃখের বিষয়, এটিরও হাত আর মুখ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গ্রীশীয় ভাস্কর্য্যে তখন Lysippus ও Scopasএর অত্যন্ত প্রভাব। এই মূর্ত্তিতে শেষোক্ত ভাস্করের গঠন-ভঙ্গী ও বিশেষত্বের ছাপ পড়িয়াছে। ভাঙ্গা হইলেও বিজয়লক্ষ্মীর দেহের মধ্য হইতে একটি জীবন্ত ভাব ও অদম্য উৎসাহ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সুন্দর তনুর সঙ্গে একেবারে মিশিয়া-মিশিয়া গায়ের কাপড়খানি ভাঁজে-ভাঁজে ফুলের মত ছড়াইয়া পড়িয়া সাগর-সমীরে কী মোহন লীলায় উড়িতেছে! একটু ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, প্রাচীন গ্রীক শিল্পের এই অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তিটিতেও সৌন্দর্য্যের সঙ্গে শক্তির সমাহার হইয়াছে। (ভারতীতে রোদাঁর প্রসঙ্গে বিজয়লক্ষ্মীর ছবি দেখুন)

গ্রীক আর্টে পুরুষ ও রমণীর আরও অনেক আশ্চর্য্য ও সুন্দর মূর্ত্তি আছে; এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সে-সমস্তের পরিচয় দেওয়া



রূপরাণী ভেনাস

অসম্ভব—আমরা কেবল দু-চারিটির উল্লেখ করিলাম মাত্র। এ-বৎসরের ভারতীতে ওগস্ত্ রোদাঁর যে অমূল্য উপদেশগুলি বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যেও গ্রীক শিল্প-সম্বন্ধে অনেক দরকারি কথা আছে। গ্রীক আর্টের বিশেষত্ব মোটামুটি বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

গ্রীক ভাস্কররা জীবনকে যতটা বুঝিতেন, মরণকে ততটা নয়। "বল্ দেখি ভাই কি হয় মলে?"—এ মহা প্রশ্নের উত্তর গ্রীক ভাস্কর্য্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। গ্রীক কলাবিদরা জীবনকে উপভোগ করিতে যেমন ভালবাসিতেন, মৃত্যুকে তেমনি ভয় করিতেন।

"আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!"—

হিন্দুকবির মত গ্রীকশিল্পী সাহসে ভর করিয়া এমন কথা বলিতে পারিতেন-না। প্রতীচ্যেরও অন্যান্য দেশের শিল্পে মৃত্যুর পরে কি হয়, তাহার অনেক কাল্পনিক চিত্র আছে। কিন্তু গ্রীকশিল্পীরা এ সমস্যা-পূরণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। তবে, নরকের একটি অসম্পূর্ণ ছবি গ্রীক শিল্পে একটিমাত্র স্থানে আছে বটে। আর, প্রাচীন গ্রীশের সমাধি-শিল্পেও ভবিষ্য জীবনের সামান্য-সামান্য আভাস পাওয়া যায়—কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। কারণ, ফিডিয়াস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাস্করের কার্য্যে আমরা মৃত্যুর পরের জীবনের কোন চিত্র দেখিতে পাই-না। বিশেষ, অনেক স্থলে সমাধি-ভবনের ভাস্কর্য্যে দেখি, মৃত্যুর মধ্য দিয়াও গ্রীকশিল্পী মৃতের অতীত জীবনকেই ফুটাইয়া তুলিতেছেন, মৃত ব্যক্তি যেন মরিয়াও জীবনকেই আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহিতেছে! এই সমাধি-শিল্পের কারিকর যে কাহারা, তাহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। কিন্তু এখানে স্থানে-স্থানে যে-সকল শোক-বিহ্বল মূর্ত্তি চোখে পড়িয়া যায়, তাহাদের গভীর ভাব সকলেরই মর্ম্ম স্পর্শ করিবে।

আধুনিক ললিত কলায় সরলতার যে অভাব হইয়াছে, প্রাচীন গ্রীক আর্টে তাহা ছিল-না। সকল ভাবের তন্ত্রীতেই সে গভীর সুর তুলিয়াছে, অথচ কোনস্থানেই সে দুর্ব্বোধ নহে। একালের আর্টিষ্টরা আমাদের জটিল সভ্যতা এবং সামাজিক জীবনের সমস্যা-পূরণের জন্য অনেকসময়ে আর্টের আশ্রয়গ্রহণ করেন, অনেকসময়ে কুৎসিতকেও তাঁহারা তাই আর্টের মধ্যে স্থান দিতে বাধ্য হন; কিন্তু গ্রীক-শিল্পী কখনই এদিক ঘেঁষিয়া যাইতেন-না। সৌন্দর্য্য ছিল তাঁহাদের ভাব-পুরীর সিংহদ্বার; সৌন্দর্য্যের মধ্যেই তাঁহাদের ভাবের ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকাশ করিত, অসুন্দরকে তাঁহারা সাধ্যমত বর্জ্জন করিয়া চলিতেন এবং প্রাণের আনন্দকেই তাঁহারা ললিত কলায় নানা ভাবে, রূপে ও আকারে জাগাইয়া তুলিতেন;—তাঁহাদের আর্ট ছিল সুধু আর্টের জন্যই। আর্ট আপনিই তাঁহাদের জীবনকে শোভন ও হৃদয়কে উদার করিয়া তুলিত, উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ললিত-কলাকে তাঁহারা জোর-করিয়া দাসী-বাঁদীর মত কাজে খাটাইতেন-না। এইটুকু বুঝিতে পারিলেই, গ্রীক আর্টের ভিতরের কথা ঠিকমত বুঝা যাইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

মাসকাবারী ও মন্তব্য

বাংলার উপন্যাস

বাংলা মাসিক-পত্র এখনো আদিম প্রাণ-পঙ্কের মত অবয়ববৈশিষ্ট্যবিহীন হইয়া আছে। বিলাতি ম্যাগাজিন, জর্ণাল ও রিভিয়ু প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মাসিক-পত্রের খিচুড়ি বানাইয়া বাংলা মাসিকপত্র তৈরি। বাংলা মাসিকে পিয়ার্সন্, ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিনের মত ঝুড়িঝুড়ি বাজে গল্প ও ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসও আছে; ফর্টনাইট্‌লি, কণ্টেম্‌পোরারির মত নানা সাময়িক ও অসাময়িক প্রসঙ্গের আলোচনা ও নিবন্ধও আছে; 'মাইণ্ড', 'হিবার্টজর্ণাল' প্রভৃতি দার্শনিক কাগজে কেবলমাত্র দার্শনিকদের প্রবন্ধাদি যেমন বাহির হয়, এখানেও তাহার অভাব নাই; প্রত্নতত্ত্বের আলোচনাও বাংলা মাসিকে যথেষ্ট জায়গা জোড়ে। তবে উপন্যাস ও গল্পের পরিমাণের কাছে আর-সকলেরি হীনমান। উপন্যাসের বহর যে-পরিমাণে বাড়িতেছে তাহাতে সাহিত্যের অন্যান্য অংশ পরিমাণে হারিতেছে কিনা তাহা ঠাহর করা কঠিন।

উপন্যাস বাড়িয়া যাওয়া সম্বন্ধে আমি আপত্তি করিতেছি মনে করিলে উপন্যাসের সপক্ষে যে-সব উপপত্তি জাগিবে তাহা আমি জানি। গজকাঠির মাপ ঠিক সাহিত্যের

বেলায় খাপ খায়না ; তবু যদি মাপা সম্ভব হইত তবে উপন্যাস জিতিত সন্দেহ নাই। কারণ অনুপাত কসিলে উপন্যাস ও গল্প বোধ হয় শতকরা ৬০, নাট্য ২০, কবিতা ৮, প্রবন্ধাদি ৮, আর খুচরা ৪ এই দাঁড়ায়।

উপন্যাসে আমি আপত্তি করিনা, যদি সে উপন্যাস সাহিত্যের আসরে স্থান পাইবার মত হয়। কুঁড়েমির কেল্লায় রসদ জোগাই-বার মত বাজে উপন্যাসের চাষ বিলাতে যথেষ্ট হইয়া থাকে, এদেশে তাহার আমদানি করিবার এখনো প্রয়োজন হয় নাই। কারণ ভাল উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া অরুচি ধরিবার মত অবস্থায় আমরা এখনো পৌঁছি নাই। তারপর আমার আপত্তি যাকে আমরা গার্হস্থ্য উপন্যাস বলি সেই ধরণের উপন্যাস সম্বন্ধে

মাসিকপত্রে কোনো নূতন উপন্যাস দেখিলেই মনে হয়, তবে সেটা কোন্ শ্রেণীর ! কারণ একটু ভালগোচের উপন্যাস হইলেই সেটা গার্হস্থ্য উপন্যাস না হইয়া যায়না। 'স্বর্ণলতা'র পর হইতে এই ধরণের উপন্যাস ক্রমাগতই চলিয়া আসিতেছে। শক্তিমান লেখকের হাতে পড়িলে হয়ত ঐ শ্রেণীর উপন্যাসেই আর-একটু ঘটনার ও চরিত্রের জটিল সমাবেশ, চরিত্র-বিশ্লেষণের নৈপুণ্য, বা মানবপ্রকৃতির গভীরতম বৃত্তিগুলির উদ্ঘাটন পাওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু লৌকিক গার্হস্থ্য ঔৎসুক্য (local interest) ছাড়াইয়া পাঠকের মন একটা বিশ্ব-ঔৎসুক্যে (universal interest) উত্তীর্ণ হয়না। বাঙালী যে গার্হস্থ্যের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়াইয়া বড়-অর্থে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপকতর পরিধির মধ্যে গিয়া পড়ে নাই, বাঙালীর গার্হস্থ্য উপন্যাসই তার একটা প্রমাণ।

বাল্‌জাক্ তাঁহার Le Comedie Humaine উপন্যাসাবলীতে তাঁহার কালের ফ্রান্সের বাস্তব মানবজীবন ও চরিত্রের সকল বৈচিত্র্য অসাধারণ ক্ষমতার সহিত আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। সমাজের কোনো শ্রেণীর মানুষই তাঁর আয়ত্তের বাহিরে পড়ে নাই। একজন লেখক তাঁর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "The whole of France is crammed into his pages,and electri-fied there into intense vitality." —গোটা ফ্রান্সটাকে তাঁর উপন্যাসের পাতাগুলার মধ্যে ঠাসিয়া দেওয়া হইয়াছে, গভীর প্রাণশক্তিতে তাহা বিদ্যুন্ময় হইয়াছে।

বাল্‌জাকের পর উপন্যাসের আরও যে কি পূর্ণতরতা হইতে পারে তাহা ভাবিয়া পাওয়া শক্ত ছিল। রুশ-উপন্যাস আবিষ্কারের পর দেখা গেল যে বাল্‌জাক্ যেমন ভিক্তর হুগোকে ছাড়াইয়া গেছেন, রুশ ঔপন্যাসিক ডষ্টয়ভ্স্কি বা গোগোল তেম্‌নি বাল্‌জাক্‌কে ছাড়াইয়া গেছেন। তাঁহারা বাল্‌জাকের মত কেবল type বা শ্রেণী-হিসাবে মানুষকে আঁকেন নাই। একটা ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতের ওলটপালটের মত সমাজের গভীরতম, প্রচ্ছন্নতম, অন্ধকারতম স্তরগুলি পর্য্যন্ত নাড়া দিয়া সেই সমাজস্তরগুলির অবিরত উত্থানপতন অবিরত ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতরে মানব-প্রকৃতিকে স্থাপিত করিয়া তাঁহারা তাহার অশেষ বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন। বাস্তববোধ তাঁহাদের মধ্যে আরও বেশি, আরও গভীর।

বাংলা উপন্যাসে সেই আরও বেশি বাস্তবতা কবে দেখা দিবে ?

নারীর সামাজিক অধিকার

পৌষের প্রবাসীতে "বঙ্গে অন্যান্য প্রদেশে নারীজীবন" প্রসঙ্গে দেখানো হইয়াছিল যে, এ-দেশে আত্মঘাতিনী মেয়েদের সংখ্যা আত্মঘাতী পুরুষের সংখ্যার চেয়ে বেশি। প্রবাসী লিখিয়াছিলেন যে বাঙ্গালী মেয়েরা উপন্যাস বেশি পড়ে বলিয়া আত্মহত্যা করে না, কারণ ইউরোপের মেয়েরা শতগুণ বেশি উপন্যাস পড়ে অথচ তাহাদের মধ্যে আত্মঘাতিনী নারীর সংখ্যা আত্মঘাতী পুরুষের তুলনায় ঢের কম।

ইউরোপে মেয়েদের প্রশস্ত সামাজিক অধিকার আছে, আমাদের দেশে নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে, এদেশে যখন একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার চল ছিল, তখন মেয়েদের পাঁচজন আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে সর্ব্বদা মেলা-মেশা ও হৃদয়ের আদানপ্রদানের ক্ষেত্রও বিস্তৃততর ছিল, সুতরাং কাজের ও সেবার ক্ষেত্রও বিস্তৃততর ছিল। নানা কারণে এখন যখন পরিবার জিনিসটাই সংকীর্ণতর হইয়া আসিতেছে, তখন মেয়েদের শরীর ও মন দুইই গৃহকোটরবদ্ধ করিলে তাহাদের শরীর জীর্ণ এবং মন অসুস্থ ও অবসাদগ্রস্ত হইবারই কথা। তারপর সেই গৃহকোটর-টুকুর ভিতরে যদি স্বামী-স্ত্রীর বনিবনাও থাকে তবেই ভাল, আর যদি না থাকে ? তখন সেই হতভাগী মেয়েদের মন ভুলাইবার মত বা তাহাদের পীড়িত মনকে ছাড়া দিবার মত আর কি ব্যবস্থা থাকিতে পারে তাহা ভাবিয়া পাওয়া শক্ত। এমন অবস্থায় অনেক মেয়েই যে আত্মঘাতিনী হয়, তাহা স্বাভাবিক।

'প্রবাসী'র এই প্রসঙ্গের উপর 'উপাসনা'র এক লেখক টিপ্পনি করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, "বাংলাদেশে নারীজীবন পুরুষের তুলনায় অধিকতর দুঃখপূর্ণ।" এবং "সে দুঃখের প্রতিকার করা উচিত।" আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি ইহাও বলিয়াছেন, "বিলাতের আদর্শে বাংলার সমাজ গঠিত হইলে বাঙালী সমাজে আত্মঘাতিনী নারীর সংখ্যা কমিতে পারে।" কিন্তু দুটি কারণে মেয়েদের সামাজিক অধিকার দিতে তাঁর আপত্তি। প্রথম কারণ, তাঁর বিশ্বাস সে ব্যবস্থায় আত্মঘাতী পুরুষের সংখ্যা বাড়িবে। দ্বিতীয় কারণ, তাঁর মনে হয় যে মেয়েদের সামাজিক অধিকার দিলে 'চিরস্থায়ী শান্তি ও সন্তোষ' আসিবে না। সুতরাং পুরুষজাতির জীবন রক্ষার জন্য, এবং মৃত্যুর স্থায়ী ও ধ্রুব 'শান্তি'কে নারী-সমাজে অচলপ্রতিষ্ঠ রাখিবার জন্য, লেখক মেয়েদের সামাজিক অধিকার দিতে নারাজ। তাঁর কথায় মোটমাট্ দাঁড়ায় এই যে, মেয়েরা যেমন মরিতেছে তেমনি মরিতে থাক্।

বিলাতী সমাজের হুবহু নকল না করিয়াও মেয়েদের সামাজিক অধিকারকে প্রশস্ততর করা যায় কি না, এ বিষয়ে লেখক ভাবিবার লেশমাত্রও চেষ্টা করেন নাই। মাহরাট্টাদেশে মেয়েদের সমাজে প্রশস্ততর অধিকার আছে ! সে দেশে তো ইউরোপের নকল করা হয় নাই। মেয়েরা পৃথিবীতে জন্মিয়াছে, অথচ পৃথিবীর আলোবাতাস হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগগ্রস্ত জীবন যাপন

করিতেছে—তাহাদিগকে একটু হাঁটিতে চলিতে দিলেই কি বিলাতী সমাজের নকল করা হয়? তাহারা তাহাদের বাড়ীর সহিত ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত বান্ধববর্গের সঙ্গে শোভনতা ও লজ্জা রক্ষা করিয়া দুটো কথা বলিলে কি বিলাতী সমাজের নকল করা হয়? এমনি করিয়া তাহাদের চিত্তকে নানা দিকে ছাড়া দিবার ও আনন্দ দিবার কত সহজ ব্যবস্থাই উদ্ভাবিত ও ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে; কেবল হয় না এইজন্য যে মেয়েদের দুঃখ সম্বন্ধে এ দেশের পুরুষেরা মোটেই সচেতন নয়। তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই ত হাতে-হাতেই দেখিতেছি—'উপাসনা'র এই টিপ্পনি। লেখক মেয়েদের উপন্যাস পড়াও বন্ধ করিতে চান্, কারণ আধুনিক উপন্যাসে বিলিতি গন্ধ বড্ড বেশি। মেয়েদের উপন্যাস পড়া বন্ধ-করার একমাত্র উপায় উপন্যাস-রচনাকেই বন্ধ করা। তাহা যখন বন্ধ হইবার নয় তখন কড়া শাসনের দ্বারা মেয়েদের পড়িবার স্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত হরণ করিলে আত্মঘাতিনী মেয়ের সংখ্যা বাড়িবে না কমিবে? এইসব কথা যে-সব লেখক নিশ্চিন্তে লিখিয়া যান্, আত্মঘাতিনী মেয়ের সংখ্যা বাড়াইয়া তুলিবার অনেকটা দায় কি তাঁহাদের উপর পড়ে না?

ভাবের ছাপ

ফাল্গুনের "মানসী"তে 'ভাব-শক্তি' প্রবন্ধের লেখক ভাব যে একটা সূক্ষ্ম পদার্থ এবং তাহার ছাপ যে তাহা শরীরের মধ্যেও রাখিয়া যায় তাহা প্লেটের উপর মুদ্রা রাখিয়া হাই তুলিয়া নানারকমে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভাবের ছাপ সূক্ষ্ম শরীরে লাগিয়া থাকে বলিয়া মৃত্যুর পর আমাদের দেহ ভাবময় হয়, তাহাও তিনি এই অভাবময় চর্ম্মচক্ষেই দেখিয়া ফেলিয়াছেন। মনোবিজ্ঞানের Subliminal consciousness বা মগ্নচৈতন্যের দ্বারা যে-সকল বিষয় প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহাকে ভূততত্ত্ব বা Spiritualismএর দিক্ হইতে প্রতিপন্ন করিবার জন্য লেখক অনেকগুলি হাইয়ের অবতারণা করিয়াছেন। প্রমাণ ভিন্ন এসব পরলোকতত্ত্ব বা ভূততত্ত্ব যে দাঁড়ায় না, ইহা Psychical Research Societyর লোকেরা বুঝে– বুঝেনা শুধু আমাদের আধুনিক যোগীর দল, যাহারা পরীক্ষা না করিয়াই অন্বীক্ষায় উপনীত হয়!

আনন্দমঠ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত

ঐ সংখ্যার 'মানসীতে' 'রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে' রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ সম্বন্ধে কথাচ্ছলে যে-সব মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রকাশ করিয়াছেন। আনন্দমঠ সম্বন্ধে রবিবাবুর সমালোচনা সংক্ষেপে এই ঃ—

(১) "বঙ্কিমবাবু যেখানে individualএর চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেইখানে তিনি চমৎকার সফল হইয়াছেন, তাঁহার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু যেখানে মানুষের সমষ্টি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, সেইখানেই সমস্তটা একটা পিণ্ডবৎ তাল পাকাইয়া গিয়াছে, কোনও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিবার চেষ্টা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।...আনন্দমঠে সমস্ত 'আনন্দ' গুলিই যেন একরকমেরই। একটা প্রকাণ্ড ideaয় যে বিচিত্র মানবপ্রকৃতিকে revolutionএর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়াছে, তাহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য, তাহাদের বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহ, বিচিত্র ভাবপ্রবাহ, নানা শক্তির উন্মেষ, যে একটা প্রকাণ্ড ideaর আবর্ত্তে পড়িয়া একটা দিকে চলিয়াছে, বঙ্কিমবাবু তাহা দেখাইলেন কই! কেন তিনি তাঁহার 'আনন্দ'গুলিতে স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য দিলেন না?"

(২) "জঙ্গলের মধ্যে এই ছায়াবাজির কোথাও একটু সমাজের সহিত নাড়ীর সংযোগ দেখিতে পাই না।...কত অত্যাচার, উৎপীড়ন, কত বেদনা, কত নিষ্ফলপ্রয়াসের ভিতর দিয়া এই বিপ্লববীজ অঙ্কুরিত হইল, তাহার আভাসমাত্রও পাইলাম না।"

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার এই শেষ অংশটুকুর উদাহরণ Turgenevএর Fathers and Children বা On the eve প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমমূলক উপন্যাসে পাওয়া যায়। উহাদের সঙ্গে আনন্দমঠের যদি তুলনা করা যায়, তবেই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার সমীচীনতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। কারণ, উপন্যাসে ব্যক্তির সমষ্টিগত রূপ নয়, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যগত চেহারা ফুটাইয়া তোলাই দরকার।

কিন্তু উপন্যাস হিসাবে আনন্দমঠের শ্রেষ্ঠতা নয়, তাহার শ্রেষ্ঠতার অন্য কারণ। আনন্দমঠ সম্বন্ধে রবিবাবুর এই সমালোচনা বহুকাল পূর্ব্বেকার—আনন্দমঠ যখন প্রকাশিত হয়, তখন চন্দ্রনাথবাবুর সহিত পত্র-ব্যবহারে এই সমালোচনা তিনি করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের পরেও তাঁহার এই মত অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে কিনা, বিপিনবাবুর লেখা হইতে তাহা ঠিক জানা যাইতেছেনা। কারণ, স্বদেশী-আন্দোলনে আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম্' বাঙালীর প্রাণে একটা নূতন প্রেরণা আনিয়াছে। এ তো উপন্যাস নয়, এযে স্বদেশ-প্রেমের অপূর্ব্ব ভাগবত! বিপ্লবচেষ্টাকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ভূমিকায় নিন্দা করিয়াছেন; সুতরাং আনন্দমঠ পড়িয়া বাঙালীর মধ্যে যদি বিপ্লবচেষ্টা দেখা দিয়া থাকে তবে তাহা স্বয়ং লেখক কর্ত্তৃক নিন্দিত। আনন্দমঠের মধ্যে যে intensity, যে আবেগতন্ময়তা আছে, তাহা লিরিকের উপযুক্ত। নাটক যদি লিরিক্যাল হয়, তবে এ উপন্যাসকে লিরিক্যাল উপন্যাস বলায় কোনো হানি নাই।

ইতিহাস-রচনার প্রণালী

ফাল্গুনের "মানসী"তে "ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক প্রণালী" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করা গেল। ইতিহাস রচনা করিতে গেলে কি কি প্রমাণ আবশ্যক তাহা লেখক অতি সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন। কিন্তু সে তো গেল, তথ্য যাচাই করিবার বেলায় যে-সব প্রমাণের প্রয়োজন, তাহার কথা। ইতিহাসের কঙ্কালটা তৈরি হইলে তাহাতে রক্তমাংস কি করিয়া দেওয়া যায় তাহাই তো ভাবিবার বিষয়।

গ্রীকদের মধ্যে থুকিদীদিস্, বা হেরোডোটাস্, কিম্বা গিবন, গ্রোট, কার্লাইল প্রভৃতির ইতিহাস কঙ্কাল-হিসাবে অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাদের মধ্যে রক্তমাংস আছে। এখনকার প্রত্নতাত্ত্বিক যুগের কঙ্কালসার ইতিহাসে সেটি নাই। লেখক যে ইতিহাসকে রসপূর্ণ করিবার বিপদ দেখাইয়াছেন, তাহা ঐ কঙ্কালটা গড়িবার বেলায় খাটে বটে, কিন্তু

উহাতেই কি ইতিহাস-সৃজন সম্পূর্ণ হইল তিনি মনে করেন? Epigraphy, Numismatics প্রভৃতির কাজ হইলে cultural history—জাতীয় সভ্যতা গঠনের ইতিহাস—লেখা দরকার। তখন তথ্যে কুলায় না, তত্ত্ব চাই। কঙ্কালে কুলায় না, রক্তমাংস চাই। সে ইতিহাস এ যুগে লিখিবার অপেক্ষা আছে। তার আগে মাটী খোঁড়ার কাজ (Spade work) যেমন চলিতেছে চলুক্।

রক্ষণশীল—উন্নতিশীল

মাঘের সবুজপত্রে 'নূতন কিছু' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক বলেন, 'নূতন কিছু'কেই আমাদের সমাজ গ্রহণ করিতে ডরায়। সমাজ পুরাতনের জের টানিতে চায়। অথচ রক্ষণশীলতার প্রয়োজন লেখক খুবই মানিয়াছেন। তিনি বলেন "মানব-মনের রক্ষণশীলতার আগুনে পুড়ে ছাই না হ'য়ে বরং খাঁটি হয়ে যা বেরিয়ে আসে তাই হবে গ্রহণযোগ্য।" এ বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে তিনি একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন —"এ যুগেও দেখুন, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পত্তনের মূলে ইংলণ্ডের রক্ষণশীলতা।"

লেখকের মনের ধারণা এই যে আমাদের সমাজে এই রক্ষণশীলতা জিনিষটাই নাই। তিনি বলেন "আমাদের রক্ষণশীলতা .....অনেক স্থলেই আমাদের কর্ম্মবিমুখ মনের সুনিপুণ ছদ্মবেশ।" রক্ষণশীলতার প্রধান কাজ—জাতিগত বিশিষ্টতা রক্ষা করা। সে সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "জাতীয় বিশিষ্টতা বলে যদি সত্যিই কিছু আমাদের থাকে, তবে তা নিজের গুণেই রয়েছে। আমাদের তরফ থেকে তাকে রাখবার জন্য জাতিগত ভাবে খুব বেশী চেষ্টা করতে হয়নি।"

রক্ষণশীলতার প্রয়োজন স্বীকার করিয়া আমাদের সমাজে তাহার অস্তিত্ব কেন যে লেখক অস্বীকার করেন, তাহার কারণ আমি পাই না। আমার মনে হয় negative criticism বা অভাব-জ্ঞাপক সমালোচনা-রীতির একটা মহৎ দোষ এই যে তাহাতে অভ্যস্ত হইলে মানুষ সবই 'না' 'না' বলিতে বলিতে, যেখানে হাঁ বলা উচিত সেখানেও অভ্যাসের দোষে মাথা নাড়িয়া ফেলে।

যেমন ধরুন—জাতীয় বিশিষ্টতাকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে কোনো চেষ্টা করিতে হয় নাই, লেখকের এ কথা কি প্রমাণসাপেক্ষ? প্রাচীনকালে, বৌদ্ধযুগের পর পৌরাণিক যুগের ইতিহাসকে ধর্ম্ম, সমাজতত্ত্ব, রীতিনীতি, শিল্প, প্রভৃতি সকল-দিক হইতে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ সকল দিকের বিচিত্র চেষ্টার মূলে জাতীয় বিশিষ্টতাকেই রক্ষা করিবার প্রয়াস বিদ্যমান রহিয়াছে। দর্শনের তরফে শঙ্করাচার্য্য ও গীতাকার এই একই চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে বৌদ্ধযুগে আমরা হইয়াছিলাম বিশ্বপ্রেমিক; পৌরাণিক যুগে হইয়াছিলাম রক্ষণশীল।

আধুনিক যুগেও জাতীয় বিশিষ্টতাকে প্রাণপণে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমস্ত জীবন তো এই কাজেই নিয়োজিত

হইয়াছে। বিশ্বের সর্ব্বত্র হইতে প্রাণের উপকরণ রামমোহন রায়ের মত এত বিচিত্র ভাবে আর কেহই আহরণ করেন নাই, কিন্তু সে-সমস্তই তিনি জাতীয় বিশিষ্টতার ছাঁচে ঢালাই করিয়া লইয়াছেন। দেবেন্দ্র নাথও তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার 'রক্ষণ-শীলতা' আরও বেশি। বিদেশ হইতে তিনি নানা তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু 'রক্ষণ-শীলতার আগুনে' পুড়াইয়া খাঁটি করিয়া লইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহারা স্বাজাত্য-বোধের জনকস্বরূপ হইয়া আছেন, বলা যাইতে পারে। তাঁহারা কি রক্ষা করিয়া-ছেন এবং কি 'নূতন কিছু' আনিয়াছেন তাহা আমাদের জানা দরকার। অথচ আমরা সে সম্বন্ধে কত অল্পই জানি।

জাতীয় বিশিষ্টতা রক্ষার কাজ এখনও বন্ধ হইয়া যায় নাই। সাহিত্যে, শিল্পেও সেই কাজ চলিতেছে। জাতীয়-বিশিষ্টতার পথেই বিকশিত হইয়া তাহারা ক্রমশ সার্ব্ব-জাতিক সাহিত্য-শিল্পের মধ্যে গণ্য হইতেছে। এ সম্বন্ধেও বেশ ভাল করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।

সুতরাং লেখকের এ মন্তব্য কি সত্য যে "যখন রক্ষা করবার জিনিস আমাদের প্রচুর ছিল, তখন আমরা হয়ে পড়েছিলাম বিশ্বপ্রেমিক; আর এখন, যখন আমাদের সবই চাই—আমরা হয়েছি রক্ষণশীল।"?

বরং মনে হয় যে, লেখক যে-হিসাবে বলিয়াছেন সে-হিসাবে আমাদের বেশি করিয়া রক্ষণশীল হওয়ার দরকার। ব্যাপ্ত হইবার আগে সংহত হইবার প্রয়োজন আছে। আমাদের জাতীয়তা জিনিষটা নিবিড় হইলে পর, বিশ্বভৌমিকতার দিকে যাত্রাটা স্বচ্ছন্দগতি হইতে পারে।

সামাজিক সমালোচন-রীতি।

সাহিত্যে একদল সমালোচক আছেন, তাঁহাদের সমালোচনার মোটামুটি দুইটি সূত্র দেখিতে পাই—(১) আমাদের ভাল লাগিল; (২) আমাদের ভাল লাগিলনা। কেন ভাল লাগিল এবং কেন ভাল লাগিলনা—কি মানদণ্ডে তাঁহারা সাহিত্যের ভাল ও মন্দের বিচার করিতে চান, তাহা তাঁহাদের নিকটে পাইবার প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। সমাজ সম্বন্ধেও এই সমালোচন-পদ্ধতিই দেখা যায়।

সামাজিক-সমালোচনরীতিতে, এক-রকম দেখা যায়—জোর করিয়া ভাল-লাগা। অর্থাৎ সেটা স্বাভাবিক ও সহজ ভাল-লাগা নয়। তাহার মধ্যে একটা কৃত্রিম উত্তেজনা আছে। তাহা প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা মন্দ লাগিবার কারণগুলিকে নিরস্ত করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা করে। ইংরাজীতে এই চেষ্টাকে special pleading বলা হয়। ইহার উদাহরণের অভাব নাই।

আর-একরকম দেখা যায়—কিছুই ভাল নয় বলিবার চেষ্টা। তাহাকেই বলি অভাবজ্ঞাপক সমালোচনা বা negative criticism। দর্শনে যেমন একরকমের নেতি নেতি বাদ আছে, ইতিত্ব কোথায় তাহা বুঝাই যায় না—এখানেও ইতিত্ব অংশ নেতিত্বের চোটে একেবারেই লোপ পাইয়া বসে। এই নেতিত্বের মূলে একটা নৈরাশ্য আছে, কিম্বা ইহা নৈরাশ্যেরই জন্মদাতা।

Special pleading বরং ভাল; negative criticism মারাত্মক। অর্থাৎ 'না' কে 'হাঁ' করা ঢের ভাল, নিছক বিশুদ্ধ 'না'য়ের চেয়ে।

এই দুই সমালোচন-রীতিতে বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে যথেষ্ট অনিষ্ট হইতেছে বলিয়া মনে হয়। একপক্ষে বাড়িতেছে—জাতীয় অহমিকা; অন্যপক্ষে বাড়িতেছে জাতীয় অবজ্ঞা।

তবে কোন্ সমালোচন-রীতির দরকার?

যুগযুগান্তর ধরিয়া নানা ভাঙাগড়া, নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া সমাজ যে ক্রমশ আপনাকে-আপনি অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতেছে, সেই অভিব্যক্তির ইতিহাসে সমাজের গঠন, প্রকৃতি, রীতি-নীতি, সমস্তই কি ভাবে বিকশিত হইয়াছে—গোড়ায় তাহা জানাটাই সবচেয়ে বড় দরকার। কারণ ঐসব না জানিয়া সমাজ-সম্বন্ধে মনগড়া থিওরি খাড়া করায় কোনো লাভ নাই। সুতরাং সেই জানার পূর্ণতা-সাধনের জন্য গোড়ায় বিস্তর মালমসলা সংগ্রহ, বিস্তর মাটি-খোঁড়ার কাজ (spade work) পড়িয়া রহিয়াছে। জীববিজ্ঞান (biology), মনোবিজ্ঞান (psychology), নৃ-বিজ্ঞানাদির (anthropology) সাহায্যে যাহাতে সমাজবিজ্ঞানের উপকরণ-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, সেইদিকে শ্রম চাই। যে-কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান ধরি—যেমন বিবাহ—সে সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানানুমোদিত কোনো সত্য ধারণা আমাদের নাই। সর্ব্বত্রই আগে সংগ্রহ, পরে থিওরি। কিছুই জানা নাই, শুধু জল্পনা-কল্পনার উপর থিওরি খাড়া করা হইতেছে, ইহার চেয়ে লজ্জাকর ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না।

সমাজ সম্বন্ধে ভাল করিয়া জানিলেই, সমাজ-চৈতন্য (social consciousness) প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চৈতন্যে অধিষ্ঠিত হইয়া ভূত-কালকে বর্ত্তমানে সজীব করিবে এবং বর্ত্তমানকে ভূতকালের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবে। সেই সমাজ-চৈতন্যময় বৃহৎ সামাজিক ব্যক্তিত্ব (social personality) আমাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে জাগ্রত হওয়ার পূর্ব্বে সমাজসম্বন্ধে আমরা যাহাই বলিব তাহা হয় 'না'-কে 'হাঁ' করিতে থাকিবে, নয় সমস্তই 'না' বলিয়া নৈরাশ্যের কুলার বাতাস গায়ে লাগাইতে থাকিবে।

চল্‌তিভাষা ও সাধুভাষা

সংস্কৃত ভাষার ছাঁচে যে বাংলা ভাষা গড়িবে না, বাংলা ভাষার যে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, এ-সব কথা এতই পুরানো যে পুনরুক্ত হইলে বিরক্তিকর হয়। প্রত্যেক ভাষার genius স্বতন্ত্র; বাংলা ভাষারও একটা genius বা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এ-কথা মানুন আর নাই মানুন, সংস্কৃতের সংস্কারবর্জ্জিত প্রাকৃত আপামরসাধারণ একথা প্রতিদিনই তাহাদের ব্যবহৃত ভাষায় স্বীকার করিয়া আসিতেছে।

কিন্তু সংস্কৃতভাষা যখন আমাদের পৈতামহী ভাষা, তখন তাহা হইতে নানা শব্দ ও পদ বাংলাভাষা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে। বাংলায় সেগুলি চলিয়া গিয়াছে, বাংলার নিজস্ব সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বোধ করি সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ তাহার

সাহিত্য নয়, তাহার দর্শন। এই সংস্কৃত দর্শন মানুষের সর্ব্বোচ্চ চিন্তাকে যেমন সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিয়াছে, তেমনি নানা অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট্ তত্ত্বকে ও আইডিয়াকে সূক্ষ্ম অর্থদ্যোতক ও ভাবব্যঞ্জক শব্দের মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছে। এইজন্য সংস্কৃত দর্শনের সেই সকল শব্দ বা terms ইংরাজী বা অন্য ভাষায় অনুবাদ করা দুঃসাধ্য হয়। অনেক জর্ম্মাণ বলেন যে জর্ম্মাণ-দর্শনেরও বিস্তর terms ইংরাজীতে অনুবাদের বেলায় ভারি ঝাপসা ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

সেইজন্য ঐ সকল সংস্কৃত শব্দ বা terms বাংলায় ব্যবহার না করিলে উপায় নেই।

প্রাচীন বাংলাভাষার আর যাই সম্পদ থাকুক, তত্ত্বসম্পদ্ ছিল না। বাংলা ছিল সত্যিকারের প্রাকৃতজনের ভাষা। তাহাদের হাসিকান্না, ঠাট্টাতামাসা,—তাহাদের সাদাসিধা জীবনযাত্রার যাহা ব্যক্ত করা দরকার হয়—তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল বাংলা ভাষা।

সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের বিদূষকের অতি স্থূল রসিকতা ভিন্ন কৌতুকহাস্যের আর বড় একটা নমুনা ঐ সাহিত্যে পাওয়া যায়না। humour সংস্কৃত সাহিত্যে নাই; উদ্ভট শ্লোকে কিছু কিছু satire আছে বটে কিন্তু তাহারও ধার যথেষ্ট নাই, ভার আছে কেবল। এইজন্য গল্পসাহিত্য সংস্কৃতে তেমন করিয়া জমে নাই। যে ভাষায় গতি জিনিষটা যথেষ্ট পরিমাণে নাই, সে ভাষায় উঁচুদরের সাহিত্য সম্ভবে না।

বাংলাভাষায় যে হাসিকান্নার জীবনলীলা বেশ প্রকাশ পাইতে পারে, তাহা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় প্রথম আবিষ্কৃত হয়। তখনই বাংলার বিশিষ্টতাটা ধরা পড়ে। তবে তখনও সংস্কৃত রীতিতে বাংলা লেখা চলিত বলিয়া সে বৈশিষ্ট্যটার দৌড় কতদূর তাহা পরীক্ষিত হয় নাই।

তবু প্রাচীন বাংলায় তত্ত্বকথা মোটেই প্রকাশ পায় নাই বলা অন্যায় হইবে। মহাভারত রামায়ণ এই বাংলা ভাষায় লেখা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম্মের প্লাবন যখন বাংলায় আসিল, তখন তত্ত্বকথাও নানা বৈষ্ণব গ্রন্থের ভিতর দিয়া বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। তবে তখনও সংস্কৃতের পূরাপূরি চল ছিল সুতরাং এসব ব্যাপারে বাংলা অচল ছিল।

এ যুগে রামমোহন রায়ই প্রথমে সাহস করিয়া বেদান্তকেই বাংলায় প্রকাশ করিতে বসিলেন। তাঁর পরে দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তত্ত্ববোধিনী সভা, সংস্কৃতের সকল সম্পদ বাংলার ভাণ্ডারে জমাইয়া তুলিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন। সুতরাং সাধুভাষা বলিয়া একটা জিনিস আপনিই তৈরি হইয়া উঠিল। তাহা সংস্কৃতেরই ছাঁচে তৈরি হইল বটে, কারণ তাহার মুখ্য কাজ ছিল সংস্কৃতেরি অনুবাদ।

ক্রমে যখন সাহিত্যসৃষ্টি সুরু হইল, তখন সাধুভাষায় কুলাইল না। কারণ অন্যভাষার শুধু শব্দসম্পদ পাইলেই তো হয় না; কোনো ভাষা সাহিত্য-সৃষ্টির উপযোগী হইতে গেলে তাহার মধ্যে জীবন-গতি (life-movement) যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চারিত হওয়া চাই। তাহার মধ্যে বেগও চাই, আবেগও চাই। সুতরাং আসল জীবনের ধারার

সঙ্গে সে ভাষার যোগ চাই। জীবনের ধারা কি আর প্রাচীন মৃত ভাষায় আছে, না থাকিতে পারে? কাজেই চল্‌তি বাংলা ভাষার তলব পড়িল। লোকের জীবনের মধ্যে চলিতেছে বলিয়াই ইহার নাম চল্‌তি।

বঙ্কিম এই সাধু ভাষা ও চল্‌তি ভাষার মিলনসাধন করিয়া দিলেন। অর্থাৎ সাধুভাষা ক্রমশ চল্‌তি ভাষার চলমান জীবনস্রোতের বেগে তাহার স্থবির স্থানুরূপ বদল করিতে লাগিল।

কিন্তু চল্‌তি ভাষা বলিতে কি কোনো প্রাদেশিক ভাষা (provincial dialect) বুঝিব? প্রাদেশিক ভাষা প্রাদেশিকতা-বর্জ্জিত হইয়া সাহিত্যিক ভাষা কেমন করিয়া হইবে? তবে কি চল্‌তি ভাষা কলিকাতার ভাষা? সে ভাষা অবশ্য ঠিক্ প্রাদেশিক না হইলেও প্রাদেশিকতাবর্জ্জিত ত নয়।

চল্‌তি ভাষা বলিতে কোন প্রাদেশিক ভাষা বা কলিকাতার ভাষাও বুঝায় না। তাহার জন্ম কলিকাতায় হইলেও কলিকাতার প্রাদেশিক ভাষা হইতে তাহার উদ্ভব হয় নাই। কলিকাতা সহরের নূতন শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মানসলোকে ইহার আসল উৎপত্তি। এই শিক্ষিতসম্প্রদায়ের কথাবার্ত্তা আলাপ আলোচনা তর্কবিতর্ক ও বক্তৃতা তাঁহাদের উচ্চশিক্ষা ও চিন্তার অনুরূপ হইতে স্বভাবতই বাধ্য। তাঁহারা তাই কলিকাতার চল্‌তি ভাষার উপর বনিয়াদ্ করিয়া আর একটা নূতন চল্‌তি ভাষা—সাধু-চল্‌তি ভাষার পত্তন করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহারা সেই কাজ করিতেছেন। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যতই বাড়িতেছে, আমাদের এই সাধু-চল্‌তি ভাষা, কথাবার্ত্তা আলাপ আলোচনার ভাষা ততই উন্নতিলাভ করিতেছে। এই দশের মুখের ভাষা হইতেই সাহিত্য তাহার সৃজনক্ষম ভাষাকে আহরণ করে। বাংলাদেশেও এমনি করিয়াই সাধু ও চল্‌তি ভাষার ব্যবধান ক্রমশঃ ঘুচিয়াছে ও ঘুচিতেছে।

অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে শিক্ষা আবদ্ধ থাকিলে চল্‌তি ভাষা ক্রমশ সংস্কৃত ভাষার মত একটা অচল স্থাণুত্বে গিয়া ঠেকে। তখন তাহার মধ্যে জীবন-গতি, জীবন-বেগ কমিয়া আসে। যখন শিক্ষা সর্ব্বসাধারণে গ্রাম্যলোকমধ্যেও ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে, তখন আমাদের এই সাহিত্যিক ভাষার আরও নব নব উন্মেষ, নব নব বিকাশ, নব নব গতি দেখা যাইবে। তখন যাহাকে বলে ভাষায় virility বা তেজ তাহা আরও ফুটিবে। তাহার ভার আরও কমিবে, তাহার ধার আরও বাড়িবে।

কিন্তু তাহার জন্য অপেক্ষা চাই। 'করিতেছে' না লিখিয়া 'করচে' লিখিলেই চল্‌তি ভাষার জীবনধারার মধ্যে সাহিত্যের ভাষাকে ফেলিয়া দেওয়া হইল, মনে করা ভুল। don't এর জায়গায় do not লিখিলে ইংরাজী লিখিত ভাষার সচলতা একটুও নষ্ট হয় না। তা ছাড়া প্রধান বিপদ এই যে, চল্‌তি ভাষা চালাইতেই হইবে মনে করিলে, চিন্তাকে খুব সংহত রূপ দেওয়াই যে শ্রেষ্ঠ ভাষার কাজ সে কথা ভুলিয়া হয়ত সোজা সংস্কৃত একটি শব্দ বা পদ যেখানে ব্যবহার করিলে চুকিয়া যায় সেখানে বাধ্য হইয়া ভাষা অযথা

ফেনাইতে সুরু করা যাইতে পারে। এরূপ দৃষ্টান্ত যে মিলে না তাহা বলিতে পারি না।

চল্‌তি ভাষা ও সাধুভাষা সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গেছে। মাঘ মাসের 'উপাসনা'য় সম্পাদক এ সম্বন্ধে ছাইচাপা তর্ক-বিতর্কের আগুনে পুনরায় খোঁচা দিয়াছেন; তাই আমাদের এ সম্বন্ধে বক্তব্য বেশ খোলসা করিয়া বলা প্রয়োজন বোধ করিলাম।

'উপাসনা'র সম্পাদক মহাশয়ের দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে সার কথা এই যে abstract ভাব বা অনুভাব প্রকাশ করিবার উপযোগী ভাষা সাধুভাষা, আর concrete ভাব বা অনুভাব প্রকাশ করিবার উপযোগী ভাষা চল্‌তি ভাষা যাহাকে বলা হয়।

তিনি বলেন "সাধু ভাষা ও চল্‌তি ভাষার আলাদা আলাদা অধিকার।" এ জায়গাতেও, ভাষার মধ্যেও, তিনি 'বর্ণধর্ম্ম' রক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত দেখা যাইতেছে। তাঁহার ধারণা, রবীন্দ্রনাথ ভাষার এই জাতিভেদ তুলিয়া দিতেছেন বলিয়াই "অনেক স্থলে তাঁহার ভাবের গৌরব হানি ও ভাষার পঙ্গুত্ব ঘটিয়াছে।" ইহার উদাহরণ তিনি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মতের পোষকতার জন্য যে সব উদাহরণ উদ্ধার করিয়াছেন, ভিন্ন মতের সমর্থনের জন্য সেই একই উদাহরণ উদ্ধার করা যাইতে পারিত। "ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে খেলার আগুন যখন লাগে" এই পংক্তিতে লেখকের মতে "বাস্তব ছবির পশ্চাতে প্রকৃতির সৃষ্টির যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা চল্‌তি ভাষার অযোগ্যতা হেতু প্রকাশিত হয় নাই।" এটা একেবারেই থিওরি সমর্থনের জন্য গায়ের জোরের কথা। কেননা উল্লিখিত বাক্যে, 'ভীষণ' 'রক্তরাগ' ও 'ভয়'—এ তিনটি শব্দই সংস্কৃত শব্দ। শুধু 'খেলা' 'আগুন' 'যখন' 'লাগে' এই চারিটি শব্দ বাংলা। ক্রিয়াপদ বাদ দিলে দুটি মাত্র শব্দ বাংলা দাঁড়ায়। অতএব 'খেলার আগুন' কথাটাতেই তাঁর যত গোল বাধিয়াছে বুঝা গেল। খেলার symbolএ সৃষ্টির ভিতরকার আগুনকে প্রকাশ করিতে গিয়া 'চল্‌তি ভাষার অযোগ্যতা হেতু', প্রকাশ যে কোথায় বাধাগ্রস্ত হইল তাহা তো দেখিতে পাই না। প্রকৃতির খেলার মধ্যে মাধুর্য্যও যেমন আছে, শক্তিও তেমনি আছে; সৌন্দর্য্যও যেমন আছে, রুদ্রতাও তেম্‌নি আছে—এই ভাবটি প্রকাশের জন্য কবি খেলার symbol এবং আগুনের symbol দুটি উপযুক্ত বাস্তব symbolকেই ধরিয়াছেন। সাধু ও চল্‌তি ভাষার সাঙ্কর্য্য তো অনিবার্য্য দেখা গেল; এখানে symbolএরও সাঙ্কর্য্য ঘটিয়াছে বলিয়া বর্ণধর্ম্মরক্ষার পক্ষপাতী সম্পাদকের বোধ হয় আপত্তির কারণ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ও জাপান

"ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অওর জাপান" এই সম্বন্ধে "ভারতবর্ষে"র কোনো লেখক লিখিতে গিয়া গোটাকতক জাপানী কাগজ হইতে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ যে জাপান গ্রাহ্য করে নাই তাহাই উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন। যে সকল কাগজে কবির প্রশংসা বাহির হইয়াছে তাহাও উদ্ধার করিয়া দেখাইলে লেখক ভাল করিতেন।

জাপানে দুইটি-দল আছে। একদল অতি নব্য দল, তাহারা ইউরোপীয় সভ্যতাকে সর্ব্বাংশে নকল করিতে ব্যস্ত। আর-একদল প্রাচীননিষ্ঠ ও ভাবুক। শ্রীমৎ ওকাকুরা এই দ্বিতীয় দলের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার Ideals of the East যাঁহারা পড়িয়াছেন ও তাঁহার সম্বন্ধে কিছু খবরও যাঁহাদের জানা আছে, তাঁহারা জানেন যে এই জাপানীটি আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের উৎসকে উৎসারিত করিতে কম সাহায্য করেন নাই।

অতি-নব্য দলের কাছে রবীন্দ্রনাথের বাণী যে রুচিরোচন হইতে পারে না, তাহা তো জানা কথা। তিনি তাহাদের আদর্শ ও পদ্ধতিকে কঠিন ভাবে বিচার করিয়াছেন—ব্যক্তিই হউক, জাতিই হউক, কোনো বিদেশীর এতটা কঠোর অভিবাদ সহ্য করিতে কেহ পারে না। অতি-নব্য জাপান যে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার মৌখিক প্রশংসা না করিয়া সমালোচনা করিয়াছে, ইহাতেই কবির বাণীর যথেষ্ট সার্থকতা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ বড় জিনিষকে গ্রহণ করিবার দুটি মাত্র প্রশস্ত প্রণালী আছে:—অর্দ্ধচেতনভাবে প্রীতি ও শ্রদ্ধার বিনিময়ের ভিতর দিয়া এক-রকমের গ্রহণ করা আছে, ভক্তরা সেই ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর সংগ্রামের ভিতর দিয়া গ্রহণ; তাহাতেও খুব বড় ভাবেই গ্রহণ করা হয়। প্রতিবাদীরা সেই ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

জাপানের ভাবুক ও রসিকসম্প্রদায় কবিকে প্রথম ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের ভিতরে-ভিতরে অজ্ঞাতসারে প্রীতি ও শ্রদ্ধার যোগে কবির প্রভাব কাজ করিতে থাকিবে। তারপর যে অতি-নব্য দল তাঁহার এই প্রভাব ঠেকাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের সেই চেষ্টাই প্রমাণ যে, তাঁহারা কবির বাণীকে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য ও উপেক্ষার ভাবে দেখিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে একটা লড়াইয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া থাকিল।

'ভারতবর্ষে'র লেখককে আমাদের প্রশ্ন এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাবাদের খোঁজ না লইয়া বিরুদ্ধবাদের খোঁজটাই তাঁহারা লইলেন কেন? ভূদেববাবুর 'স্বজাতি-বিদ্বেষ' কথাটাকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য লেখকের এত ব্যস্ততা দেখিয়া নিজের দেশসম্বন্ধে লজ্জা বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথের গৌরবে কি আমাদের দেশের গৌরব নয়?

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

পোড়ারমুখী

এইখানেই আমার জন্ম। শুনেছি, আমার মা কুলত্যাগ করে এসেছিলেন। লোকে বলে, সেটা পাপ। পাপ কি পুণ্য জানিনা; কারণ সে-শিক্ষা আমার কখনো হয়-নি। যদি পাপ হয়, তবে বলতে হবে যে, মার সে পাপের শাস্তি ভোগ করছি, আমি।

রূপকথায় এক কুৎসিত রাজকন্যার কথা শুনেছি, আরসিতে নিজের মুখ দেখে

তিনি আরসিখানাকেই ভেঙ্গে খান্-খান্ করে ফেলেছিলেন। জানিনা, তিনি আমার চেয়েও কুৎসিত ছিলেন কিনা! ..... আরসিতে আমিও মুখ দেখি; দেখি, আর আমার বুকটা কেমন করে ওঠে। মনে হয় আমিও আরসিখানাকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলি। কিন্তু তাতে হবে কি? আমার এ কুরূপের ছায়া শুধু ঐ এক আয়নাতেই ত ধরা পড়েনা—এ যে মানুষের চোখে-চোখে ছড়িয়ে বেড়ায়!

নিজের চেহারার খুঁৎ, নিজের চোখে একরকম মানান-সই হয়ে যায়; কিন্তু হায়, আমার মুখে এমন কিছুই নেই, যা আমার নিজের চোখেও ভাল লাগতে পারে—এ-যেন মানুষের মুখই নয়! তাই কিছুতেই আমি মনকে চোখ-ঠেরে বোঝ-মানাতে পারি না! মানুষকে গড়বার সময়ে ভগবান এতটাও নিষ্ঠুর হতে পারেন!

বুঝতে পারিনা, আমার মুখে কী এমন আছে, যাতে-করে লোকে আমার দিকে তাকালে হাসি চাপতে পারে না! সাহেবদের দোকানের জানলায় যে-সব বেয়াড়ারকমের অস্বাভাবিক মুখোস দেখা যায়, আমার মুখটাও যেন অনেকটা সেই ধরণের। তাই কি লোকে অমন-করে হাসে? ওঃ, এ কী হাসি! মানুষের অবজ্ঞার চেয়ে মানুষের এই হাসি আমার প্রাণে যেন আরো নিদারুণ হয়ে বাজে!

বিকালে পাউডারে, রঙে, গয়নায় আর রঙ্গিন জামা-কাপড়ে আমার এই কুরূপ যতটা-পারি ঢেকে-ঢুকে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। যতক্ষণ দিন থাকে, ততক্ষণ কেউ আমার কাছে ঘেঁসে না। সন্ধ্যে হলে যখন আর চোখ চলে না, তখন রাস্তা থেকে ঠাহর না-পেয়ে কেউ-কেউ আমার কাছে উপরে উঠে আসে। তারপর, আমার চেহারা দেখবার জন্যে সিগারেট ধরাবার অছিলায় ফস্ করে একটা দেশলায়ের কাঠি জেলে আমার মুখের কাছে ধরে; আর আমাকে দেখেই হেসে ওঠে!

ওগো, দুনিয়ায় যার ভালবাসবার কেউ নেই, যার প্রেমের ফুল আপনি ফুটে আপনি ঝরে যায়, যার বাসনা কখনো তৃপ্তির স্বাদ পায়-নি, সে অভাগিনীর মনের ব্যথা প্রাণের কথা তোমরা কেউ বুঝতে পারবে না! আমার রূপ নেই, কিন্তু যৌবনের আকাঙ্ক্ষা ত আছে!

কুরূপা কুব্জা এই জ্বালা বুকে পূরে না-জানি কত কান্নাই কেঁদেছিল! কিন্তু তার নিন্দিত জীবনও নন্দিত করে একদিন ত শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন! আমারও এই অনাদৃত জীবন-যৌবন কি একদিন কোন অজানা অতিথির পদস্পর্শে সফল হয়ে উঠবে না?

অন্ধকারে, বিছানার উপরে শুয়ে-শুয়ে আমি সেই অজানা অনাগত অতিথির কথা ভাবি! আর সবাই আমাকে পায়ে ঠেলে চলে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি যেদিন আসবেন সেইদিনই বুঝতে পারবেন, ছাই-ঢাকা আগুনের মত আমার এই কুদর্শন কুগঠন দেহের তলে-তলে প্রাণ-যৌবনের শতমুখী সৌন্দর্য্যের ফোয়ারা নৃত্য-করে উঠছে!

আমি সেই অজানা অতিথির পথ চেয়ে আছি। সেই আশাই যে আমার এই আঁধার প্রাণের ধ্রুবতারা! আমার এই

তৃষাতাপিত জীবনের পথে আজ কোন পথিক নেই বটে, কিন্তু আমি জানি, একদিন তিনি আসবেন, তিনি আসবেনই!

* * * *

রূপের বিকিকিনি যার ব্যবসা, রূপ না থাকলে তার ত চলে না। আমারও দিন চলত-না—ভাগ্যে মা একখানা বাড়ী রেখে গেছেন, তাই কোনগতিকে আমার দিন গুজ্‌রান হচ্ছে!

বাড়ীতে আমার জনকত ভাড়াটিয়া আছে—তারা সবাই স্ত্রীলোক, কারুরই সমাজে ঠাঁই নেই। রোজ তাদের ঘরে লোক আসে, গান-বাজনা হয়, হাসির হল্লা ওঠে! তাদের সেই আমোদ-প্রমোদের ধ্বনি যখন আমার ঘরে এসে ঢোকে, তখন ইচ্ছা হয়, দি সব ভাড়াটেকে দূর-করে তাড়িয়ে! কিন্তু তাহলে যে আমার দিন চলবে না—পেটের অন্ন জুটবে না! মনের হিংসা মনেই চেপে আমি যেন গুম্‌রে মর্‌তে থাকি!

বাড়ীর দোতলায় একটি মেয়ে দুখানা ঘর নিয়ে আছে, তার সঙ্গে আমি 'মকর' পাতিয়েছি। মকর দেখতে যেমন পরীর মত, তার গানের গলাও তেমনি চমৎকার। সহরের বড়-বড় বাবু তার ঘরে আসবার জন্যে লালায়িত—'মুজ্‌রো'য় গিয়ে প্রায়ই সে মোটা টাকা ঘরে আনে।

সেদিন শুনলুম, কোন বাবুর বাগানে সে গান গাইতে যাবে। আমার কেমন সখ হোল, আমি তাকে বললুম, "মকর, ভাই, আমাকে তোর সঙ্গে নিয়ে যাবি?"

মকর বল্‌লে, "বেশ ত, চল না!"

বাগানে যাবার সুবিধা আমার ত কখনো ঘটেনি—ঘটবে না; যার মুখ দেখলে লোকে নাক-বেঁকিয়ে মুখ-ফিরিয়ে নেয়, পয়সা খরচ করে তাকে বাগানে নিয়ে যাবে এমন বাবু কে আছে? অথচ শুনতে পাই, বাগানে নাকি ভারি ঘটা হয়! তাই দেখতে বড় সাধ ছিল; দেখি, মকরের দৌলতে সে সাধটা যদি মিটিয়ে নিতে পারি!

হা আমার ছার কপাল, এমন জানলে কে বাগানে আসতে চাইত! সেই জমকালো সাজানো ঘরে গিয়ে যখন ঢুক্‌লুম্ তখন চারদিক থেকে অনেকগুলো চোখ বিস্ময়ে-কৌতুকে একেবারে বিস্ফারিত হয়ে আমার পানে স্থির হয়ে রইল। সে কী নিষ্ঠুর, ব্যঙ্গভরা দৃষ্টি! আমি যেন মরমে মরে গেলুম।

মকর চালাক মেয়ে, সে তখনি এই চাহনির অর্থ ধরে ফেললে। আমার এক-হাত নিজের হাতে নিয়ে সে সকলকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বললে, "ইনি আমার মকর, এঁকে আমিই সঙ্গে করে এনেছি!" রূপসী মকর জানত, আমি তার সঙ্গে এসেছি শুনলে সকলের কাছে এখনি আমার কদর বেড়ে যাবে! কেননা, আমাকে তাচ্ছল্য করে তার নেক্-নজর থেকে বঞ্চিত হতে কেউ ত চাইবে না!

বাগানের যিনি মালিক, সেই বাবুটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, "আরে এস—এস, তুমি ডালিম-বিবির মকর—আমাদের মাথার মণি!"

অমনি আরো-অনেকে বলে উঠল, "বসুন, বসুন!"

বুঝলুম, এ আমাকে আদর নয়—আমার ভিতর দিয়ে এ আদর গিয়ে পড়তে চাইছে, সুন্দরী মকরের রাঙা পায়ের তলায়! যাক্—এও তবু মন্দের ভাল!

সভার মাঝখানে গিয়ে, চোখে-মুখে রূপের দেমাক নিয়ে মকর দিব্যি জাঁকিয়ে বস্‌ল। চারিদিকে সবাই তাকে খাতির জানাবার জন্যে একেবারে তটস্থ! কেউ পাণের ডিবেটা তার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, কেউ নিজের হাতেই তাকে বাতাস করছে, তার মন-রাখা কথা কইছে, আর কেউ-বা কিছুই করতে না পেয়ে দীন চোখে নীরবে তার পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে! মাগো মা, রূপ দেখলে পুরুষগুলো কি এম্‌নি হয়ে যায়! রূপ, রূপ, রূপ! দুনিয়ায় প্রাণ কেউ খোঁজে না, চায় সুধু ছাই রূপ!

বাগানের কর্ত্তাটি, একেবারে বিনয়ের অবতার! দুটিহাত যোড় করে মকরের সামনে এসে তিনি নিবেদন জানালেন, "ডালিম-বিবি, অধীনের একটি আরজি আছে!"

মকর সিল্কের রঙ্‌চঙে রুমালখানা মুখের কাছে ঘোরাতে-ঘোরাতে, ভঙ্গিভরে যেন ভেঙে পড়ে বল্‌লে, "হুকুম!"

—"সে কি ভাই, আমরা হুকুম করবার কে, হুকুম-দেনেওয়ালা ত তুমি! বল্‌ছি কি—এতগুলো ভদ্রলোক তীর্থের কাকের মত হাঁ-করে বসে আছে, একটা গান গাইতে আজ্ঞা হোক্!"

মকর সদর্পে অবহেলাভরে সেলাম করে অনুগ্রহ জানিয়ে বললে, "যো হুকুম!"—বলে একটু নড়েচড়ে বসে সে হারমোনিয়মে সুর ধরলে।

ঘরসুদ্ধ সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে ক্রমাগত বলতে লাগল, 'এই, গোল কোরো না—গোল কোরো না!' গোল থামাতে গিয়ে গোলমাল এমনি বেড়ে উঠল যে, কাণ পাতে কার সাধ্যি!

হঠাৎ আমার চোখ একটি লোকের উপরে পড়্‌ল। তাঁকে দেখতে বেশ হোম্‌রা-চোম্‌রা,—বুকের পকেটে সোনার ঘড়ি-ঘড়ির চেন, হাতের আঙুলে অনেকগুলো আংটি, বোধ হয় তিনি খুব বড়মানুষ। লোকটি একদৃষ্টিতে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়েছিলেন। তিনি কি দেখছেন? আমার এই অপরূপ রূপ?

মকরের গান সুরু হোল। গানের সুর বেমালুম ডুবিয়ে 'বাহবা'র উচ্চস্বরে সারা ঘরখানা ভরে উঠল!

আর-একবার সেই লোকটির দিকে তাকালুম। গান বা বাহবা—কিছুই তিনি শুনছিলেন না—মৃদুমৃদু হাসতে-হাসতে তেমনি-করে তখনো আমার দিকে চেয়েছিলেন। সে দৃষ্টিতে আমার কুরূপের প্রতি যে কিছু-মাত্র কটাক্ষ বা ঘৃণার ভাব ছিল না, তাও আমি বুঝতে পারলুম। তবে?·· তবে কি ··· ··· ··· না, না, সে যে অসম্ভব! আমাকে দেখে তিনি··· ···না, তা হোতেই পারে না!

হঠাৎ তিনি উঠে-পড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর—আমি যেন নিজের

চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না—তারপর, তিনি সত্যি-সত্যিই আমাকে ইসারা করে ডাকলেন।

প্রথমটা আমি যেন কেমন• মূর্চ্ছাহতের মত হয়ে গেলুম! এমন-করে কোন অজানা পুরুষ ত আজ-পর্য্যন্ত আমাকে কাছে ডাকেন-নি! এই এক আহ্বানের মধুর রসেই আমার সকল প্রাণমন যে পুলকে পূরে উঠল! অনেক কষ্টে আপনাকে সামলে আবার তাঁর দিকে তাকালুম—আবার তিনি আমাকে হাত-নেড়ে ডাকলেন।

ঘরের ভিতরে তখনও সবাই বাহবা দিতে ব্যস্ত; সেই অবকাশে আস্তে-আস্তে উঠে, আমি বাইরে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

আমার দিকে হাসিমাখা চোখে চেয়ে তিনি বললেন, "তোমার নাম কি?"

—"কামিনী।"

—"কোথায় থাক?"

আমি ঠিকানা বললুম।

"তোমার বাড়ীতে কাল সন্ধ্যের সময়ে আমি যাব। এই নাও, আগাম কিছু বায়না দিচ্ছি।"—এই বলে আমার হাতে তিনি চারটে টাকা গুঁজে দিলেন।

আমি আর কি বলব—কি বলতে পারি?.....আমার বুকের মাঝে আনন্দের স্রোত যেন উথলে উঠে আছড়ে-আছড়ে পড়তে লাগল—আমি যেন কেমন বিহ্বলের মত হয়ে গেলুম!

তিনি আর-কিছু না বলে সুধু একটু মুচকে হেসে ফের ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলেন।

মকর তখন মাথার উপর মদ-ভরা গেলাস বসিয়ে, দু-হাত দু-দিকে লীলায়িত করে নাচতে-নাচতে গান ধরেছিল—

"চলো গুঁইয়া, আজু খেলে হোরি!"

এতদিন কাল-গুণে বসে থাকবার পর, আজ কি সত্যই আমার ঘরে অতিথি আসবেন? আমার সকল কুরূপ আজ কি তাঁর স্পর্শে ধন্য হয়ে উঠবে? হায়, জীবনে এই আমার প্রথম অতিথি—কি দিয়ে তাঁকে তাঁর যোগ্য অভ্যর্থনা করব, কেমন করে তাঁর সঙ্গে কথা কইব?

ফুলের মালায় ঘর সাজিয়ে, আলো জেলে, সেজেগুজে আমি বসে আছি, আকুলপ্রাণে নববধূটির মত! দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে প্রথম-বসন্তের মৃদু-মৃদু মন-ভোলান হাওয়া আমার বুকের পরে এসে আবেগ-ভরে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হোল—দুরু-দুরু প্রাণে আমি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। হ্যাঁ, তিনিই বটে!

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললুম, "আসুন, আসুন!"

তিনি সেদিনকার মত তেমনি চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে ঘরে এসে ঢুকলেন।

আমি তাঁকে খাটের উপরে বসিয়ে পানের ডিবেটা তাঁর সামনে এগিয়ে দিলুম। কেমন এক যন্ত্রণাভরা সুখে আমার প্রাণ-মন যেন আচ্ছন্ন হয়ে নেতিয়ে এল। মনে হোতে লাগল, আজ যেন এ জগতে আর কেউ কোথাও নেই—সুধু তিনি আর আমি, তিনি আর আমি!... ... ...

আমার চিবুকে হাত দিয়ে আমার মুখখানা তিনি তুলে ধরলেন—সে স্পর্শে আমার সারা দেহ শিউরে-শিউরে উঠল, আমার দু-চোখ ধীরে-ধীরে আপনি মুদে গেল!

কিন্তু এ কি! আমি চোখ মুদতে-না-মুদতে, তিনি যে একেবারে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন!

সে হাসির পরিচয় আমি জানি, আমি জানি!..... আমার দিকে তাকালে আর সবাই যে হাসি হাসে, আজ এঁর গলাতেও আমি যে ঠিক সেই হাসিই শুন্‌ছি! চমকে চোখ চেয়ে আমি দু পা পিছিয়ে এলুম। থেমে-থেমে বললুম, "আপনি হাসচেন যে!"

অনেক চেষ্টায় হাসি থামিয়ে তিনি বললেন, "উঃ, এ যে হেসে মরে যাবার গতিক! তুমি যখন চোখ বুঁজে কেমন একরকম মুখ করেছিলে, বাপ্, তখন তোমাকে দেখলে মড়াও যে হেসে উঠত!"

আমি কর্কশস্বরে বললুম, "কি বলচেন?"

—"কামিনী, সত্যি বলচি, তোমার মুখের ষোড়া মেলা ভার! তোমাকে যদি দুদিন শিখিয়ে-টিখিয়ে থিয়েটারে নামাই, তাহলে তোমার চেয়ে ভাল হাসির অভিনয় আর কেউ করতে পারবে না। লোকে চেষ্টা করে, বিতিকিচ্ছি মুখভঙ্গী করে লোক হাসায়; তোমাকে কিন্তু সে-সব কিছু করতে হবে না! ভগবান তোমাকে এমনি আশ্চর্য্য মুখ দিয়েছেন যে, আমার মত গম্ভীর লোকও তোমাকে দেখে না হেসে থাকতে পারলে না।"

আমি ঠোঁট কাম্‌ড়ে অধীর স্বরে বললুম, "কে আপনি?"

—"আমি 'ভেনাস'-থিয়েটারের ম্যানেজার।"

—"কি চান এখানে?"

—"তুমি আমার থিয়েটারে অভিনয় করবে? দু-চারিদিন শিখলেই তুমি হাস্য-রসের খুব ভাল অভিনেত্রী হতে পারবে। তোমার ঐ মজার মুখ দেখেই আমি সেটা বুঝে নিয়েছি! তাতে তোমার-আমার দুজনেরই লাভ।"

আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, "না না! চলে যান আপনি! যান,—যান বলছি!"

অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও হতভম্ব হয়ে লোকটা ঘর-থেকে সুড়্‌সুড়্‌ করে বেরিয়ে গেল।... ... ...

একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসের মত দক্ষিণ বাতাস আমার ঘরে ঢুকে ফুলের মালা-গুলোকে দোলা দিয়ে গেল।

মালাগুলো ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে, জানলা বন্ধ করে আমি আলো নিবিয়ে দিলুম।... ... ওরে আমার পোড়ার মুখ, এ অন্ধকারে তোকে আর কেউ দেখতে পাবে না রে, কেউ দেখতে পাবে না!

শ্রী:—

সমালোচনা

কবিকথা। প্রথম খণ্ড, কালিদাস ও ভবভূতি। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রণীত। কলিকাতা, ৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এই গ্রন্থে কালিদাস-রচিত "অভিজ্ঞান-শকুন্তল", "বিক্রমোর্ব্বশী" ও "মালবিকাগ্নিমিত্র", এবং ভবভূতি-রচিত "মহাবীর-চরিত", "উত্তর-রামচরিত" ও "মালতী-মাধব" নাটকের গল্পাংশ ইংরাজী Lamb's Tales from Shakespeare গ্রন্থের ধরণে—আখ্যায়িকার আকারে বর্ণিত হইয়াছে। গল্পগুলি খুব বিস্তারিতভাবেই দেওয়া হইয়াছে—অর্থাৎ নাটকের কথাবার্ত্তা ইহাতে হুবহু বজায় আছে। যদি অনুবাদের ভাষা বেশ সরল ও সহজ হইত, তাহা হইলে যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থপাঠে মূলের রস উপভোগ করিবার সম্ভাবনা থাকিত। দুর্ভাগ্যক্রমে অনুবাদের আমরা সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না; অধিকাংশ স্থলেই লেখক সংস্কৃতের অনুস্বার-বিসর্গটুকু মাত্র বাদ দিয়া মূলের ভাষা রাখিয়া গিয়াছেন; ফলে সরল বাঙলায় ভাব আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—মূল "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" নাটকের পঞ্চম অঙ্কে এক জায়গায় আছে, শার্ঙ্গ-রব বলিতেছেন, "ইত্থমপ্রতিহতং চাপল্যং দহতি। অতঃ পরীক্ষ্য কর্ত্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং রহঃ। অজ্ঞাতহৃদয়েষেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্॥" কবি-কথার লেখক তাহার অনুবাদ করিয়াছেন, "শার্ঙ্গরব বলিতে আরম্ভ করিলেন, তোমার আত্মকৃত চপলতা এক্ষণে তোমাকে দগ্ধ করিতেছে। সকল কার্য্যই, বিশেষতঃ যাহা গোপনে সাধিত হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া করাই উচিত। অজ্ঞাত-হৃদয়ের মিত্রতা শেষে শত্রুতায় পরিণত হইয়া থাকে।" (৫৬ পৃষ্ঠা) অথচ বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথাই এইভাবে লিখিয়াছিলেন, "শার্ঙ্গরব কহিলেন, না বুঝিয়া কর্ম্ম করিলে পরিণে এইরূপ মনস্তাপ পাইতে হয়। এই নিমিত্ত সক কর্ম্মই, বিশেষত যাহা নির্জ্জনে করা যায়, সবিশে পরীক্ষা না করিয়া করা বিধেয় নহে। পরস্পরের ম না জানিয়া বন্ধুতা করিলে, সেই বন্ধুতা পরিণে শত্রুতাতে পর্য্যবসিত হয়।" (বিদ্যাসাগর মহাশয়ে শকুন্তলা—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস সংস্করণ; ১৯০৯।৮৮ পৃষ্ঠা) কবিকথার লেখক লিখিয়াছেন, "তোমার আত্মকৃ চপলতা তোমাকে দগ্ধ করিতেছে" যাঁহারা সংস্কৃ জানেন না, প্রধানতঃ যাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থের সৃ —তাঁহারা ইহার কি অর্থ করিবেন! বিদ্যাসাগ মহাশয়ের মত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সেকালের পণ্ডিতীযু ঐ ভাবই কিরূপ সহজ ভাষায় ফুটাইয়া ছিলেন, লেখক সেইটুকু লক্ষ্য করিলে ভাল হয়। এরূপ বিস্তর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে! সেই জন্যই বলিতেছিলাম অনুবাদে লেখক শুধু নাটকের দৃশ্য-যোজনা ভাঙ্গির উপাখ্যানের পরিচ্ছেদ আঁটিয়াছেন, এবং অনুস্বার-বিস ছাঁটিয়া ও সংস্কৃত অক্ষর ছাড়িয়া বাঙলা ঢপে বাঙ্ক অক্ষর সাজাইয়া গিয়াছেন; কাজেই অনুবাদে কো কৃতিত্ব নাই। ভাষা অত্যন্ত কটমট—যাঁহারা সংস্কৃ জানেন না, তাঁহাদের কাছে সংস্কৃতের ন্যায়ই দুর্ব্বো রহিয়া গিয়াছে। আশা করি, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ-কা লেখক মহাশয় আমাদের কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবেন

বিকাশ। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন প্রণীত কলিকাতা, কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত মূল্য বারো আনা মাত্র। এখানি কবিতা-গ্রন্থ- সুতরাং ইহারও ললাট-পটে যে 'ভূমিকা'-বালাইটু আঁটা আছে, সে কথা বলা বাহুল্য এবং অধিকাং 'ভূমিকা'-আঁটা 'কবিতা'-গ্রন্থের মতই 'বিকাশে কবিতাগুলিও মিলে-ছন্দে অপাঠ্য।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।